রবীন্দ্র-রচনাবলী

রবীন্দ্র-রচনাবলী

দ্বাদশ খণ্ড

—

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

জাপান-যাত্রী

যাত্রী

ভানুসিংহের পত্রাবলী

রাশিয়ার চিঠি

জাপানে-পারস্যে

পথে ও পথের প্রান্তে

পথের সঞ্চয়

রবীন্দ্র-রচনাবলী

দ্বাদশ খণ্ড

প্রবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

নিবেদন

কোনো প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিকের রচনাবলী প্রকাশ, বিশেষত যাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ কোনোক্রমেই দুর্লভ হয়ে ওঠে নি, সচরাচর সরকারী প্রকাশন উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হয় না। সেই বিবেচনায় বর্তমান রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ সরকারী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ১৯৬১ সালে তদানীন্তন রাজ্য সরকার সুলভ মূল্যে রবীন্দ্র-রচনাবলীর যে-সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন তার একটি বিশেষ উপলক্ষ ছিল দেশব্যাপী কবির জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব। কিন্তু এবারের রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের পটভূমিকায় কোনো উৎসবের পরিবেশ নেই, বরং এক বিপরীত প্রয়োজনের তাগিদেই বর্তমান রাজ্য সরকার এই রচনাবলী প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আজ দেশব্যাপী যে-সংকীর্ণতাবাদ, বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং সুস্থ জীবনের পরিপন্থী ভ্রান্ত মূল্যবোধ আমাদের মানবিক আবেদনকে ক্ষুণ্ণ করতে উদ্যত, সেখানে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরম অবলম্বন। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের রচনা বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার এই আয়োজন।

অপর দিকে বিপুল আয়তন রবীন্দ্রসাহিত্যের সামগ্রিক সংকলন অদ্যাবধি সম্পূর্ণ হয় নি। অথচ যাঁরা রবীন্দ্রনাথের জীবিতকাল থেকে রবীন্দ্রসাহিত্য সংকলন ও প্রকাশ-কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান পুরুষ এখনো এই সংকলন কার্যে নিরত রয়েছেন। তাঁদের সহায়তায় রবীন্দ্র-রচনাবলীর এই সংস্করণ প্রকাশের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকার রবীন্দ্র-রচনা সংকলনের কাজকে যতদূর সাধ্য সম্পূর্ণ করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। রবীন্দ্র-রচনা রক্ষা, সংকলন এবং সুসম্পাদিতভাবে প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরবর্তীকালের উপরেই বিশেষভাবে ন্যস্ত। যতই কালক্ষেপ ঘটবে ততই রবীন্দ্র-রচনার সম্পূর্ণ সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ জটিল ও কঠিন হয়ে পড়বে।

রাজ্য সরকার এ-যাবৎ অসংকলিত রচনা-সংবলিত বর্তমান রচনাবলী প্রকাশের উদ্দেশ্যে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করে তাঁদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আনুমানিক ষোলো খণ্ডে এই রচনাবলী প্রকাশের আয়োজন করেছেন।

কেবল এ-যাবৎ অসংকলিত রচনা সংকলন নয়, অদ্যাবধি প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনায় পাঠের বিভিন্নতা হেতু অচিরে যে-জটিল সমস্যা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে সে-কারণেও আদর্শ পাঠ-সংবলিত রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করবেন। বর্তমান রচনাবলী এই দিক দিয়ে ভাবীকালের কাজকে বহুলাংশে সুগম করে তুলবে আশা করা যায়। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ৫০ বৎসর পর, ১৯৯১ সালে কপিরাইট উত্তীর্ণ হবার পূর্বে রবীন্দ্র-রচনার পাঠ ও সম্পাদনকর্মে যে-যত্ন প্রত্যাশিত সে-বিষয়ে সম্পাদক-মণ্ডলী বিশেষভাবে অবহিত।

রাজ্য সরকার সাধারণ পাঠকের সীমিত ক্রয়ক্ষমতার কথা চিন্তা করে এবং একই সঙ্গে প্রকাশন সৌষ্ঠব ও সম্পাদনার মান অক্ষুণ্ণ রেখে এই রচনাবলী প্রকাশের পরিকল্পনা করেছেন। কাগজ মুদ্রণ ইত্যাদির দুর্মূল্যতা সত্ত্বেও রচনাবলীর দাম সাধারণ পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে রাজ্য সরকার সরকারী তহবিল থেকে যথেষ্ট পরিমাণ অনুদানের ব্যবস্থা করেছেন।

মানবিক মূল্যবোধের কঠিন পরীক্ষার দিনে সংঘবদ্ধ জনশক্তি আজ 'মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে' না মেনে নিয়ে সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী তাঁদের শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হলে রাজ্য সরকারের এই প্রকল্প সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

বিশ্বভারতী
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলাভবন। শান্তিনিকেতন
রবীন্দ্রভবন। শান্তিনিকেতন
শ্রীঅশোক মিত্র
শ্রীদেবব্রত রায়
শ্রীজিতেন্দ্রকিশোর আচার্যচৌধুরী
শ্রীমতী উমা সেহানবীশ

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ড সম্পাদনকার্যে সম্পাদকমণ্ডলীর সহায়কবর্গের নিষ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকাশ-ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও মুদ্রণকার্যে শ্রীসরস্বতী প্রেস (১৯৮৪) লিমিটেডের কর্মীগণ সহ-যোগিতা ও বিশেষ শ্রমস্বীকার করেছেন। সম্পাদনা, মুদ্রণ সৌষ্ঠব, বিশেষত চিত্র নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে যাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশ পাওয়া গিয়েছে তাঁদের কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

১৮৮১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর ১৯০৪ সালে 'হিতবাদী' গ্রন্থাবলীভুক্ত হলেও এর পর 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' দীর্ঘকাল পুনঃপ্রকাশিত হয় নি। 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র দুই খণ্ডও (১৮৯১, ১৮৯৩) দীর্ঘকাল স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে অমুদ্রিত ছিল, যদিও 'গদ্য-গ্রন্থাবলী'র বিভিন্ন গ্রন্থে ডায়ারির বিভিন্ন অংশ প্রচুর সম্পাদন ও সংক্ষেপণপূর্বক সংরক্ষিত হয়, এবং 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র 'ভূমিকা' বা 'প্রথম খণ্ড'কে দুটি প্রবন্ধে ভাগ করে 'স্বদেশ' ও 'সমাজ' গ্রন্থে সংকলন করা হয়।

১৯৩৬ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রভূত সম্পাদনান্তে 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' 'দ্বিতীয় খণ্ড'-এর সঙ্গে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' একত্র 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ' নামে সংকলন করেন এবং এই নতুন সংকলনের সূচনায় উভয় গ্রন্থের সংশোধন এবং সম্পাদনার কৈফিয়ত হিসেবে চারুচন্দ্র দত্তকে লিখিত একখানি পত্র সংযোজন করা হয়।

সেই পত্রটি ভূমিকাস্বরূপ ব্যবহার করে 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ'-এর পাঠ অনুযায়ী 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' এবং 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' প্রথম প্রকাশের কালানুক্রমে মুদ্রিত হল।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত বন্ধুবরেষু

আমার বয়স ছিল সতেরো। পড়াশুনোয় ফাঁকি দিয়ে গুরুজনের উদ্‌বেগভাজন হয়েছি। মেজদাদা তখন আমেদাবাদে জজিয়তি করছেন। ভদ্রঘরের ছেলের মানরক্ষার উপযুক্ত ইংরেজি যে-করে-হোক জানা চাই; সেজন্যে আমার বিলেত-নির্বাসন ধার্য হয়েছে। মেজদাদার ওখানে কিছু দিন থেকে পত্তন করতে হবে তার প্রথম ভিত, হিতৈষীরা এই স্থির করেছেন। সিভিল সার্ভিসের রঙ্গভূমিতে আমার বিলিতি কায়দার নেপথ্য-বিধান হল।

বালক-বয়সে আত্মপ্রকাশটা থাকে চাপা। জীবনে তখন উপরওআলাদেরই আধিপত্য; চলৎশক্তির স্বাতন্ত্র্যটা দখল করে আদেশ উপদেশ অনুশাসন। স্বভাবত মেনে-চলবার মন আমার নয়, কিন্তু আমি ছিলুম ভোলা মনের মানুষ, আপন খেয়াল নিয়ে থাকতুম, আমাকে দেখতে হত নেহাত ভালোমানুষের মতো। ভাবীকালে বিস্তর কথাই কইতে হয়েছে, তার অঙ্কুরোদ্গম ছিল নিঃশব্দে। একদিন যখন বারান্দার রেলিং ধরে একলা চুপ করে বসে ছিলুম, পাশ দিয়ে যেতে যেতে বড়দাদা আমার মাথা নাড়া দিয়ে বললেন, রবি হবে ফিলজফর। চুপ করে থাকার খেতে ফিলজফি ছাড়াও অন্য ফসল ফলে।

খেতে প্রথম দেখা দিল কাঁটাগাছ, চাষ-না-করা জমিতে। বিশ্বকে খোঁচা মেরে আপন অস্তিত্ব প্রমাণ করবার সেই ঔদ্ধত্য। হরিণ-বালকের প্রথম শিং উঠলে তার যে চাল হয় সেই উগ্র চাল প্রথম কৈশোরের। বালক আপন বাল্যসীমা পেরোবার সময়-সীমা লঙ্ঘন করতে চায় লাফ দিয়ে। তার পরিচয় শুরু হয়েছিল মেঘনাদবধকাব্যের সমালোচনা যখন লিখেছিলেম পনেরো বছর বয়সে। এই সময়েই যাত্রা করেছি বিলেতে। চিঠি যেগুলো লিখেছিলুম তাতে খাঁটি সত্য বলার চেয়ে খাঁটি স্পর্ধা প্রকাশ পেয়েছে প্রবল বেগে। বাঙালির ছেলে প্রথম বিলেতে গেলে তার ভালো লাগবার অনেক কারণ ঘটে। সেটা স্বাভাবিক, সেটা ভালোই। কিন্তু কোমর বেঁধে বাহাদুরি করবার প্রবৃত্তিতে পেয়ে বসলে উল্টো মূর্তি ধরতে হয়। বলতে হয়, আমি অন্য পাঁচজনের মতো নই, আমার ভালো লাগবার যোগ্য কোথাও কিছুই নেই। সেটা যে চিত্তদৈন্যের লজ্জাকর লক্ষণ এবং অর্বাচীন মূঢ়তার শোচনীয় প্রমাণ, সেটা বোঝবার বয়স তখনো হয় নি।

সাহিত্যে সাবালক হওয়ার পর থেকেই ঐ বইটার 'পরে আমার ধিক্কার জন্মেছিল। বুঝেছি, যে-দেশে গিয়েছিলুম সেখানকারই যে সম্মানহানি করা হয়েছে তা নয়, ওটাতে নিজেরই সম্মানহানি। বিস্তর লোকের বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও বইটা প্রকাশ করি নি। কিন্তু আমি প্রকাশে বাধা দিলেই ওটা যে অপ্রকাশিত থাকবে এই কৌতূহলমুখর যুগে তা আশা করা যায় না। সেইজন্যে এ লেখার কোন্ কোন্ অংশকে লেখক স্বয়ং গ্রাহ্য এবং ত্যাজ্য বলে স্বীকার করেছে সেটা জানিয়ে রেখে দিলুম। যথাসময়ে ময়লার ঝুলি হাতে আবর্জনা কুড়োবার লোক আসবে, বাজারে সেগুলো বিক্রি হবার আশঙ্কাও যথেষ্ট আছে। অনেক অপরাধের অনেক প্রায়শ্চিত্ত বাকি থাকে ইহলোকে, প্রেতলোকে সেগুলো সম্পূর্ণ হতে থাকে।

এ বইটাকে সাহিত্যের পঙ্‌ক্তিতে আমি বসাতে চাই, ইতিহাসের পঙ্‌ক্তিতে নয়। পাঠ্য জিনিসেরই মূল্য সাহিত্যে, অপাঠ্য জিনিসেরও মূল্য ইতিহাসে। ঐতিহাসিককে যদি সম্পূর্ণ বঞ্চিত করতে পারতুম তবে আমার পক্ষে সেটা পুণ্যকর্ম, সুতরাং মুক্তির পথ হত। নিজের কাব্য সম্বন্ধে এই ত্যাগের সাধনায় প্রবৃত্ত হতে বার বার সংকল্প

করেছি। কিন্তু দুর্বল মন, সংঘবন্ধ আপত্তির বিরুদ্ধে ব্রতপালন করতে পারি নি। বাছাই করবার ভার দিতে হল পরশুপাণি মহাকালের হাতে। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের যুগে মহাকালেরও কর্তব্যে ত্রুটি ঘটছে। বইগুলির বৈষয়িক স্বত্ব হারিয়েছি বলে আরও দুর্বল হতে হল আমাকে।

য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রশ্রেণী আগাগোড়া অরক্ষণীয়া নয়। এর সপক্ষে একটা কথা আছে সে হচ্ছে এর ভাষা। নিশ্চিত বলতে পারি নে কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম। আজ এর বয়স হল প্রায় ষাট। সে-ক্ষেত্রেও আমি ইতিহাসের দোহাই দিয়ে কৈফিয়ত দাখিল করব না। আমার বিশ্বাস বাংলা চলতি ভাষার সহজ প্রকাশপটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।

তার পরে লেখার জঙ্গলগুলো সাফ করবামাত্র দেখা গেল, এর মধ্যে শ্রদ্ধা বস্তুটাই ছিল গোপনে, অশ্রদ্ধাটা উঠেছিল বাহিরে আগাছার মতো নিবিড় হয়ে। আসল জিনিসটাকে তারা আচ্ছন্ন করেছিল, কিন্তু নষ্ট করে নি। এইটে আবিষ্কার করে আমার মন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছে। কেননা, নিন্দানৈপুণ্যের প্রাখর্য ও চাতুর্যকে আমি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। ভালো লাগবার শক্তিই বিধাতার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার মানব-জীবনে। সাহিত্যে কুৎসাবিলাসীদের ভোজের দাদন আমি নিই নি, আর কিছু না হোক, এই পরিচয়টুকু আমি রেখে যেতে চাই।

একটা কথা আপনাকে বলা বাহুল্য। ইংরেজের চেহারা সেদিন আমার চোখে যেমনটা ধরা পড়েছিল সেটা যে নেহাত আমার বাল্যবুদ্ধি ও অনভিজ্ঞতার সৃষ্টি সে কথা বললে সম্পূর্ণ সত্য কথা বলা হবে না। এই প্রায় ষাট বছরের মধ্যে সেখানকার মানুষের যে পরিবর্তন হয়েছে তাকে ক্রমশ অভিব্যক্তির আখ্যা দেওয়া যায় না। এক-এক সময়ে ইতিহাস-শতরঞ্চের বোড়ে তার এক পা চাল ছেড়ে দিয়ে লম্বা চালে চলতে শুরু করে। পাশ্চাত্যে তাই ঘটেছে। সেদিনকার পাসপোর্টে তার যে ছবিটা ছিল সে ছবি আজ একেবারেই চলবে না।

সেই প্রথম-বয়সে যখন ইংলন্ডে গিয়েছিলেম ঠিক মুসাফেরের মতো যাই নি। অর্থাৎ রাস্তা থেকে চলতে চলতে বাহির থেকে চোখ বুলিয়ে যাওয়া বরাদ্দ ছিল না। ছিলেম অতিথির মতো, ঘরের মধ্যে প্রবেশ পেয়েছিলুম। সেবা পেয়েছি, স্নেহ পেয়েছি, কোথাও কোথাও ঠকেছি, দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু তার পরে আবার যখন সেখানে গিয়েছি, তখন সভায় থেকেছি, ঘরে নয়। আমার তৎপূর্বকালে অভিজ্ঞতা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ যদি বা না হয় তবু সত্য। যে ডাক্তারের বাড়িতে ছিলুম তিনি ভদ্রশ্রেণীর এবং শ্রদ্ধেয়, কিন্তু সমুদয় ভদ্রশ্রেণীর প্রতীক তিনি না হতে পারেন। ইংলন্ডে আজও বর্ণসাম্য যতই থাক্‌ শ্রেণীভেদ যথেষ্ট। সেখানে এক শ্রেণীর সঙ্গে আর-এক শ্রেণীর মনোবৃত্তি ও ব্যবহারের মিল না থাকাই স্বাভাবিক। সেদিনও নিঃসন্দেহ ছিল না। আমি সেদিনকার সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের এবং একটি বিলাসিনী-ঘরের পরিচয় কাছে থেকেই পেয়েছি। তার কিছু কিছু বর্ণনা চিঠিগুলির মধ্যে আছে।

কয়েকটি চিঠিতে তখনকার দিনের ইঙ্গবঙ্গের বিবরণ কিছু বিস্তারিত করেই দিয়েছি। আজ এরা লুপ্ত জীব। কোথাও কোথাও তার বর্তমান অভিব্যক্তির কিছু কিছু চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়, এমন-কি যাঁরা বিলেতে যান নি তাঁদেরও কারও কারও চালচলনে ইঙ্গবঙ্গী লক্ষণ অকস্মাৎ ফুটে ওঠে। সেকালের ইঙ্গবঙ্গদের অনেককে আমি প্রত্যক্ষ জানতুম। তাঁদের অনেকখানি পরিচয় পেয়েছি তাঁদের নিজেরই মুখ থেকে। যদি এর মধ্যে কোনো অত্যুক্তি থাকে সে তাঁদেরই স্বকৃত। আমার সামনে বর্ণনায় নিজেদেরও বে-আবরু করতে ভয় পান নি, যেহেতু মুখচোরা ভালোমানুষ বালকটিকে

তাঁরা বিপদ্‌জনক বলে সন্দেহ করেন নি। আজ তাঁদের কাছে ক্ষমা চাইতে গেলে আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে। তাঁরা আছেন বৈতরণীর পরপারে।

আমার বিলাতের চিঠিতে 'এবার মলে সাহেব হব' গানটি উদ্ধৃত করেছিলেম। আমার স্নেহভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ঐ গানটি আমার রচনা বলে প্রচার করেছেন। তাতে অনামা রচয়িতার মান বেঁচে গেছে, কিন্তু আমার বাঁচে নি। আমার বিশ্বাস যথোচিত গবেষণা করলে আমার লেখা থেকে ওর চেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতেও পারে।

এই পত্রগুলি যখন লেখা হয়েছিল তার বারো বছর পরে আর-এক বার বিলেতে গিয়েছিলেম। তখনো দেশের বদল খুব বেশি হয় নি। সেদিন যে ডায়ারি লিখেছি তাতে আছে আঁচড়কাটা ছবি—এক্কাগাড়িতে চলতে চলতে আশেপাশে এক-নজরে দেখার দৃশ্য।

বইগুলির পুনঃসংস্করণের মুখবন্ধে এই চিঠিখানি আপনাকে সম্বোধন করে লিখছি। তার কারণ, বিলেত সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা অনেক প্রশস্ত ও গভীর—সেই ভূমিকার উপর রেখে এই চিঠিগুলি ও ডায়ারির যথাযোগ্য স্থান নির্ণয় করতে পারবেন এবং ভুলত্রুটি ও অতিভাষণের অপরিহার্যতা অনুমান করে ক্ষমা করাও আপনার পক্ষে কঠিন হবে না। ইতি ২৯ আগস্ট, ১৯৩৬

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র

প্রকাশ : ১৮৮১

রবীন্দ্রনাথ। ১৮৯০

উপহার

ভাই জ্যোতিদাদা,

ইংলন্ডে যাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত
তাঁহারই হস্তে এই পুস্তকটি
সমর্পণ করিলাম।

স্নেহভাজন
রবি

'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের (১৮৮১) 'ভূমিকা'য় রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'বন্ধুদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এই পত্রগুলি প্রকাশ করিলাম। প্রকাশ করিতে আপত্তি ছিল— কারণ, কয়েকটি ছাড়া বাকি পত্রগুলি ভারতীর উদ্দেশে লিখিত হয় নাই, সুতরাং সে সমুদয়ে যথেষ্ট সাবধানের সহিত মত প্রকাশ করা যায় নাই; বিদেশীয় সমাজ প্রথম দেখিয়াই যাহা মনে হইয়াছে তাহাই ব্যক্ত করা গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে, আর কোনো উপকার হউক বা না হউক, একজন বাঙালি ইংলন্ডে গেলে কিরূপে তাহার মত গঠিত ও পরিবর্তিত হয় তাহার একটা ইতিহাস পাওয়া যায়।

'আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে। আত্মীয়স্বজনদের সহিত মুখামুখি এক-প্রকার ভাষায় কথা কহা ও তাঁহারা চোখের আড়াল হইবামাত্র আর-এক-প্রকার ভাষায় কথা কহা কেমন অসংগত বলিয়া বোধ হয়।

'পূজনীয় ভারতীর সম্পাদক মহাশয় আমার পত্রের উত্তরে তাঁহার যে-সকল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাও পুস্তকে নিবিষ্ট হইল। সকল বিষয়েরই দুই পক্ষ আছে। উভয় পক্ষই পাঠকদের দেখা আবশ্যক।

'এই পুস্তক ছাপা হইবার সময় নানা কারণে আমি কোনোমতেই নিজে তদারক করিতে পারি নাই, এই নিমিত্ত ইহাতে ভুল আছে বলিয়া সন্দেহ হইতেছে। এই অপরিহার্য ত্রুটি পাঠকেরা মার্জনা করিবেন।'

'পূজনীয় ভারতীর সম্পাদক মহাশয়' অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট বাদ-প্রতিবাদ পরবর্তীকালে 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ' গ্রন্থে বর্জিত হয়। 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে বর্জিত অংশসমূহ সংকলিত হবে।

প্রথম পত্র

বিশে সেপ্টেম্বরে আমরা 'পুনা' স্টীমারে উঠলেম। পাঁচটার সময় জাহাজ ছেড়ে দিলে। আমরা তখন জাহাজের ছাতে দাঁড়িয়ে। আস্তে আস্তে আমাদের চোখের সামনে ভারতবর্ষের শেষ তটরেখা মিলিয়ে গেল। চারি দিকের লোকের কোলাহল সইতে না পেরে আমি আমার নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেম। গোপন করবার বিশেষ প্রয়োজন দেখছি নে, আমার মনটা কেমন নির্জীব, অবসন্ন, ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু দূর হোক গে—ও-সব করুণরসাত্মক কথা লেখবার অবসরও নেই ইচ্ছেও নেই; আর লিখলেও, হয় তোমার চোখের জল থাকবে না, নয় তোমার ধৈর্য থাকবে না।

সমুদ্রের পায়ে দণ্ডবৎ। ২০শে থেকে ২৬শে পর্যন্ত যে করে কাটিয়েছি তা আমিই জানি। সমুদ্রপীড়া কাকে বলে অবিশ্যি জান কিন্তু কী রকম তা জান না। আমি সেই ব্যামোয় পড়েছিলেম, সে কথা বিস্তারিত করে লিখলে পাষাণেরও চোখে জল আসবে। ছটা দিন, মশায়, শয্যা থেকে উঠি নি। যে ঘরে থাকতেম, সেটা অতি অন্ধকার, ছোটো, পাছে সমুদ্রের জল ভিতরে আসে তাই চার দিকের জানলা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। অসূর্যম্পশ্যরূপ ও অবায়ুস্পর্শ্যদেহ হয়ে ছয়টা দিন কেবল বেঁচে ছিলেম মাত্র। প্রথম দিন সন্ধেবেলায় আমাদের একজন সহযাত্রী আমাকে জোর করে বিছানা থেকে উঠিয়ে খাবার টেবিলে নিয়ে গেলেন। যখন উঠে দাঁড়ালেম তখন আমার মাথার ভিতর যা-কিছু আছে সবাই মিলে যেন মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ করে দিলে, চোখে দেখতে পাই নে, পা চলে না, সর্বাঙ্গ টলমল করে! দু-পা গিয়েই একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসে পড়লেম। আমার সহযাত্রীটি আমাকে ধরাধরি করে জাহাজের ডেক-এ নিয়ে গেলেন। একটা রেলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেম। তখন অন্ধকার রাত। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। আমাদের প্রতিকূলে বাতাস বইছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে সেই নিরাশ্রয় অকূল সমুদ্রে দুই দিকে অগ্নি উৎক্ষিপ্ত করতে করতে আমাদের জাহাজ একলা চলেছে; যেখানে চাই সেইদিকেই অন্ধকার, সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠছে—সে এক মহা গম্ভীর দৃশ্য।

সেখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারলেম না। মাথা ঘুরতে লাগল। ধরাধরি করে আবার আমার ক্যাবিনে এলেম। সেই যে বিছানায় পড়লেম, ছ-দিন আর এক মুহূর্তের জন্যও মাথা তুলি নি। আমাদের যে স্টুঅর্ড ছিল (যাত্রীদের সেবক)—কারণ জানি নে—আমার উপর তার বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল। দিনের মধ্যে যখন-তখন সে আমার জন্যে খাবার নিয়ে উপস্থিত করত; না খেলে কোনোমতেই ছাড়ত না। সে বলত, না খেলে আমি ইঁদুরের মতো দুর্বল হয়ে পড়ব (weak as a rat)। সে বলত, সে আমার জন্যে সব কাজ করতে পারে। আমি তাকে যথেষ্ট সাধুবাদ দিতেম, এবং জাহাজ ছেড়ে আসবার সময় সাধুবাদের চেয়ে আরও কিঞ্চিৎ সারবান পদার্থ দিয়েছিলেম।

ছ'দিনের পর আমরা যখন এডেনের কাছাকাছি পেঁছিলেম, তখন সমুদ্র কিছু শান্ত হল। সেদিন আমার স্টুঅর্ড এসে নড়ে চড়ে বেড়াবার জন্যে আমাকে বার বার অনুরোধ করতে লাগল। আমি তার পরামর্শ শুনে বিছানা থেকে তো উঠলেম, উঠে দেখি যে সত্যিই ইঁদুরের মতো দুর্বল হয়ে পড়েছি। মাথাটা যেন ধার-করা, কাঁধের সঙ্গে তার ভালোরকম বনে না; চুরি-করা কাপড়ের মতো শরীরটা যেন আমার ঠিক গায়ে লাগছে না। ঘর থেকে বেরিয়ে ছাতের উপর গিয়ে একটা কেদারায় হেলান দিয়ে পড়লেম। অনেক দিনের পর বাতাস পেয়ে বাঁচলেম। দুপুরবেলা দেখি একটা ছোটো নৌকা সেই সমুদ্র দিয়ে চলেছে। চার দিকে অনেক দূর পর্যন্ত আর ডাঙা নেই, জাহাজসুদ্ধ লোক অবাক। তারা আমাদের স্টীমারকে ডাকতে আরম্ভ করলে, জাহাজ থামল। তারা একটি ছোটো নৌকায় করে কতকগুলি লোক জাহাজে পাঠিয়ে দিলে। এরা সকলে আরবদেশীয়, এডেন থেকে মস্কটে যাচ্ছে। পথের মধ্যে দিক্‌ভ্রম হয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে যা জলের পিপে ছিল, তা ভেঙে গিয়ে জল সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে, অথচ যাত্রী অনেক। আমাদের জাহাজের লোকেরা তাদের জল দিলে। একটি ম্যাপ খুলে কোন্‌ দিকে ও কত দূরে মস্কট, তাদের দেখিয়ে দিলে,

তারা আবার চলতে লাগল। সে নৌকো যে মস্কট পর্যন্ত পৌঁছবে তাতে সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগল।

২৮শে সেপ্টেম্বর শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি, আমাদের সম্মুখে সব পাহাড়-পর্বত উঠেছে। অতি সুন্দর পরিষ্কার প্রভাত, সূর্য সবেমাত্র উঠেছে, সমুদ্র অতিশয় শান্ত। দূর থেকে সেই পর্বতময় ভূ-ভাগের প্রভাতদৃশ্য এমন সুন্দর দেখাচ্ছে যে কী বলব। পর্বতের উপরে রঙিন মেঘগুলি এমন নত হয়ে পড়েছে যে, মনে হয় যেন অপরিমিত সূর্যকিরণ পান করে তাদের আর দাঁড়াবার শক্তি নেই, পর্বতের উপরে যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছে। আয়নার মতো পরিষ্কার শান্ত সমুদ্রের উপর ছোটো ছোটো পাল-তোলা নৌকাগুলি আবার কেমন ছবির মতো দেখাচ্ছে।

এডেনে পৌঁছে বাড়িতে চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেম কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখি যে এই ক-দিন নাড়াচাড়া খেয়ে মাথার ভিতরে যেন সব উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে, বুদ্ধির রাজ্যে একটা অরাজকতা ঘটেছে। কী করে লিখব, ভালো মনে আসছে না। ভাবগুলো যেন মাকড়সার জালের মতো, ছুঁতে গেলেই অমনি ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে। কিসের পর কী লিখব, তার একটা ভালোরকম বন্দোবস্ত করতে পারছি নে। এই অবস্থায় লিখতে আরম্ভ করলেম, এমন বিপদে পড়ে তোমাকে যে লিখতে পারি নি তাতে তোমার ক্ষোভের কারণ কিছুই নেই।

দেখো, সমুদ্রের উপর আমার কতকটা অশ্রদ্ধা হয়েছে। কল্পনায় সমুদ্রকে যা মনে করতেম, সমুদ্রে এসে দেখি তার সঙ্গে অনেক বিষয় মেলে না। তীর থেকে সমুদ্রকে খুব মহান বলে মনে হয়, কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে এলে আর ততটা হয় না। তার কারণ আছে; আমি যখন বম্বের উপকূলে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতেম, তখন দেখতেম দূরদিগন্তে গিয়ে নীল জল নীল আকাশে মিশিয়ে গিয়েছে, কল্পনায় মনে করতেম যে, এক বার যদি ঐ দিগন্তের আবরণ ভেদ করতে পারি, ঐ দিগন্তের যবনিকা ওঠাতে পারি, অমনি আমার সুমুখে এক অকূল অনন্ত সমুদ্র একেবারে উথলে উঠবে। ঐ দিগন্তের পরে যে কী আছে তা আমার কল্পনাতেই থাকত; তখন মনে হত না, ঐ দিগন্তের পরে আর-এক দিগন্ত আসবে। কিন্তু যখন সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়ি, তখন মনে হয় যে, জাহাজ যেন চলছে না, কেবল একটি দিগন্তের গণ্ডির মধ্যে বাঁধা আছে। আমাদের কল্পনার পক্ষে সে দিগন্তের সীমা এত সংকীর্ণ যে কেমন তৃপ্তি হয় না। কিন্তু দেখো, এ কথা বড়ো গোপনে রাখা উচিত; বাল্মীকি থেকে বায়রন পর্যন্ত সকলেরই যদি এই সমুদ্র দেখে ভাব লেগে থাকে, তবে আমার না লাগলে দশজনে যে হেসে উঠবে; গ্যালিলিওর সময়ে এ কথা বললে হয়তো আমাকে কয়েদ যেতে হত। এত কবি সমুদ্রের স্তুতিবাদ করেছেন যে আজ আমার এই নিন্দায় তাঁর বোধ হয় বড়ো একটা গায়ে লাগবে না। যখন তরঙ্গ ওঠে, তখন বোধ করি সমুদ্র বেশ দেখায়, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সমুদ্রের তরঙ্গ উঠলেই আমার এমন মাথা ঘুরতে থাকে যে আমার দেখাশুনো সব ঘুরে যায়।

আমি যখন ঘর থেকে বেরোতে আরম্ভ করলেম, তখন জাহাজের যাত্রীদের উপর আমার নজর পড়ল ও আমার উপর জাহাজের যাত্রীদের নজর পড়ল। আমি স্বভাবতই 'লেডি' জাতিকে বড়ো ডরাই। তাঁদের কাছে ঘেঁষতে গেলে এত প্রকার বিপদের সম্ভাবনা যে, চাণক্য পণ্ডিত থাকলে লেডিদের কাছ থেকে দশ সহস্র হস্ত দূরে থাকতে পরামর্শ দিতেন। এক তো মনোরাজ্যে নানা-প্রকার শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা—তা ছাড়া সর্বদাই ভয় হয় পাছে কী কথা বলতে কী কথা বলে ফেলি. আর আমাদের অসহিষ্ণু লেডি তাঁদের আদবকায়দার তিলমাত্র ব্যতিক্রম সইতে না পেরে দারুণ ঘৃণায় ও লজ্জায় একেবারে অভিভূত হন। পাছে তাঁদের গাউনের অরণ্যের মধ্যে ভ্যাবাচেকা খেয়ে যাই, পাছে আহারের সময় তাঁদের মাংস কেটে দিতে হয়, পাছে মুরগির মাংস কাটতে গিয়ে নিজের আঙুল কেটে বসি—এইরকম সাত-পাঁচ ভেবে আমি জাহাজের লেডিদের কাছ থেকে অতি দূরে থাকতেম। আমাদের জাহাজে লেডির অভাব ছিল না. কিন্তু জেন্টলম্যানেরা সর্বদা খুঁত খুঁত করতেন যে, তার মধ্যে অল্পবয়স্কা বা সুশ্রী এক জনও ছিল না।

পুরুষ যাত্রীদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল। ব— মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁর কথা অনর্গল, হাসি অজস্র, আহার অপরিমিত। সকলের সঙ্গেই তাঁর আলাপ, সকলের সঙ্গেই তিনি হাসিতামাশা করে বেড়ান। তাঁর একটা গুণ আছে, তিনি কখনো বিবেচনা করে, মেজে ঘষে কথা কন না; ঠাট্টা করেন, সকল সময়ে তার মানে না থাকুক, তিনি নিজে হেসে আকুল হন। তিনি তাঁর বয়সের ও পদমানের গাম্ভীর্য বুঝে হিসাব করে কথা কন না, মেপে জুকে হাসেন না ও দু-দিক বজায় রেখে মত প্রকাশ করেন না, এই সকল কারণে তাঁকে আমার ভালো লাগত। কত প্রকার যে ছেলেমানুষি করেন তার ঠিক নেই। বৃদ্ধত্বের বুদ্ধি ও বালকত্বের সাদাসিদা নিশ্চিন্ত ভাব একত্রে দেখলে আমার বড়ো ভালো লাগে। আমাকে তিনি 'অবতার' বলতেন, গ্রেগরি সাহেবকে 'গড়গড়ি' বলতেন, জাহাজের আর-এক যাত্রীকে 'রুহি মৎস্য' বলে ডাকতেন; সে-বেচারির অপরাধ কী তা জান? সাধারণ মানুষদের চেয়ে তার ঘাড়ের দিকটা কিছু খাটো ছিল, তার মাথা ও শরীরের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র যোজক পদার্থ ছিল না বললেও হয়। এইজন্যে ব—মহাশয় তাকে মৎস্যশ্রেণীভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু আমি যে কেন অবতারশ্রেণীর মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেম, তার কারণ সহজে নির্দেশ করা যায় না।

আমাদের জাহাজের T— মহাশয় কিছু নূতন রকমের লোক। তিনি ঘোরতর ফিলজফর মানুষ। তাঁকে কখনো চলিত ভাষায় কথা কইতে শুনি নি। তিনি কথা কইতেন না, বক্তৃতা দিতেন। একদিন আমরা দু-চার জনে মিলে জাহাজের ছাতে দু-দণ্ড আমোদপ্রমোদ করছিলেম, এমন সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে ব—মহাশয় তাঁকে বললেন, 'কেমন সুন্দর তারা উঠেছে'। এই আমাদের ফিলজফর তারার সঙ্গে মনুষ্যজীবনের সঙ্গে একটা গভীর সম্বন্ধ বাধিয়ে দিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন— আমরা 'মূর্খেতে চাহিয়া থাকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া' রইলেম।

আমাদের জাহাজে একটি আস্ত জনবুল ছিলেন। তাঁর তালবৃক্ষের মতো শরীর, ঝাঁটার মতো গোঁফ, শজারুর কাঁটার মতো চুল, হাঁড়ির মতো মুখ, মাছের চোখের মতো ম্যাড়মেড়ে চোখ, তাঁকে দেখলেই আমার গা কেমন করত, আমি পাঁচ হাত তফাতে সরে যেতেম। এক-এক জন কোনো অপরাধ না করলেও তার মুখশ্রী যেন সর্বদা অপরাধ করতে থাকে। প্রত্যহ সকালে উঠেই শুনতে পেতেম তিনি ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, হিন্দুস্থানি প্রভৃতি যত ভাষা জানেন সমস্ত ভাষায় জাহাজের সমস্ত চাকরবাকরদের অজস্র গাল দিতে আরম্ভ করেছেন, ও দশ দিকে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছেন। তাঁকে কখনো হাসতে দেখি নি; কারও সঙ্গে কথা নেই বার্তা নেই, আপনার ক্যাবিনে গোঁ হয়ে বসে আছেন। কোনো কোনো দিন ডেক-এ বেড়াতে আসতেন, বেড়াতে বেড়াতে যার দিকে একবার কৃপাকটাক্ষে নেত্রপাত করতেন, তাকে যেন পিঁপড়াটির মতো মনে করতেন।

প্রত্যহ খাবার সময় ঠিক আমার পাশেই B—বসতেন। তিনি একটি ইয়ুরাশীয়। কিন্তু তিনি ইংরেজের মতো শিস দিতে, পকেটে হাত দিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়াতে সম্পূর্ণরূপে শিখেছেন। তিনি আমাকে বড়োই অনুগ্রহের চোখে দেখতেন। একদিন এসে মহাগম্ভীর স্বরে বললেন, 'ইয়ংম্যান্, তুমি অক্সফোর্ডে যাচ্ছ? অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি বড়ো ভালো বিদ্যালয়।' আমি একদিন ট্রেঞ্চ সাহেবের 'Proverbs and their lessons' বইখানি পড়ছিলেম, তিনি এসে বইটি নিয়ে শিস দিতে দিতে দু-চার পাত উল্টিয়ে পাল্টিয়ে বললেন, 'হাঁ, ভালো বই বটে।'

এডেন থেকে সুয়েজে যেতে দিন-পাঁচেক লেগেছিল। যারা ব্রিন্দিসি-পথ দিয়ে ইংলন্ডে যায় তাদের জাহাজ থেকে নেবে সুয়েজে রেলওয়ের গাড়িতে উঠে আলেকজান্দ্রিয়াতে যেতে হয়; আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরে তাদের জন্যে একটা স্টীমার অপেক্ষা করে— সেই স্টীমারে চড়ে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে ইটালিতে পৌঁছতে হয়। আমরা overland ডাঙা-পেরোনো যাত্রী, সুতরাং আমাদের সুয়েজে নাবতে হল। আমরা তিনজন বাঙালি ও একজন ইংরেজ একখানি আরব নৌকা ভাড়া করলেম। মানুষের 'divine' মুখশ্রী কতদূর পশুত্বের' দিকে নাবতে পারে, তা সেই নৌকোর মাঝিটার মুখ দেখলে জানতে পারতে। তার চোখ দুটো যেন বাঘের মতো, কালো কুঁচকুচে রঙ, কপাল

নিচু, ঠোঁট পুরু, সবসুদ্ধ মুখের ভাব অতি ভয়ানক। অন্যান্য নৌকোর সঙ্গে দরে বনল না, সে একটু কম দামে নিয়ে যেতে রাজি হল। ব— মহাশয় তো সে নৌকোয় বড়ো সহজে যেতে রাজি নন; তিনি বললেন আরবদের বিশ্বাস করতে নেই—ওরা অনায়াসে গলায় ছুরি দিতে পারে। তিনি সুয়েজের দুই-একটা ভয়ানক ভয়ানক অরাজকতার গল্প করলেন। কিন্তু যা হোক, আমরা সেই নৌকোয় তো উঠলেম। মাঝিরা ভাঙা ভাঙা ইংরেজি কয়, ও অল্পস্বল্প ইংরেজি বুঝতে পারে। আমরা তো কতক দূর নির্বিবাদে গেলেম। আমাদের ইংরেজ যাত্রীটির সুয়েজের পোস্ট আপিসে নাববার দরকার ছিল। পোস্ট আপিস অনেক দূর এবং যেতে অনেক বিলম্ব হবে, তাই মাঝি একটু আপত্তি করলে; কিন্তু শীঘ্রই সে আপত্তি ভঞ্জন হল। তার পরে আবার কিছু দূরে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে 'পোস্ট আপিসে যেতে হবে কি? সে দুই-এক ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া অসম্ভব।' আমাদের রুক্ষস্বভাব সাহেবটি মহাক্ষাপা হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'Your grandmother।' এই তো আমাদের মাঝি রুখে উঠলেন, 'What? mother? mother? what mother, don't say mother।' আমরা মনে করলুম সাহেবটাকে ধরে বুঝি জলে ফেলে দিলে, আবার জিজ্ঞাসা করলে, 'What did say? (কী বললি?)' সাহেব তাঁর রোখ ছাড়লেন না। আবার বললেন, 'Your grandmother'। এই তো আর রক্ষা নেই, মাঝিটা মহা তেড়ে উঠল। সাহেব গতিক ভালো নয় দেখে নরম হয়ে বললেন, 'You don't seem to understand what I say!' অর্থাৎ তিনি তখন grandmother বলাটা যে গালি নয় তাই প্রমাণ করতে ব্যস্ত। তখন সে মাঝিটা ইংরেজি ভাষা ছেড়ে ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল 'বস—চুপ'। সাহেব থতমত খেয়ে চুপ করে গেলেন, আর তাঁর বাক্যস্ফূর্তি হল না। আবার খানিক দূর গিয়ে সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন 'কতদূর বাকি আছে?' মাঝি অগ্নিশর্মা হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'Two shilling give, ask what distance!' আমরা এইরকম বুঝে গেলেম যে, দু-শিলিং ভাড়া দিলে সুয়েজ-রাজ্যে এইরকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আইনে নেই! মাঝিটা যখন আমাদের এইরকম ধমক দিচ্ছে তখন অন্য অন্য দাঁড়িদের ভারি আমোদ বোধ হচ্ছে, তারা তো পরস্পর মুখচাওয়াচাওয়ি করে মুচকি মুচকি হাসি আরম্ভ করলে। মাঝিমহাশয়ের বিষম বদমেজাজ দেখে তাদের হাসি সামলানো দায় হয়ে উঠেছিল। একদিকে মাঝি ধমকাচ্ছে, একদিকে দাঁড়িগুলো হাসি জুড়ে দিয়েছে, মাঝিটির উপর প্রতিহিংসা তোলবার আর কোনো উপায় না দেখে আমরাও তিনজনে মিলে হাসি জুড়ে দিলেম—এরকম সুবুদ্ধি অনেক স্থলে দায়ে পড়ে খাটাতে হয়। মানে মানে সুয়েজ শহরে গিয়ে তো পেঁছিলেম। সুয়েজ শহর সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার অধিকার নেই, কারণ আমি সুয়েজের আধ মাইল জায়গার বেশি আর দেখি নি। শহরের চার দিকে একবার প্রদক্ষিণ করবার বাসনা ছিল, কিন্তু আমার সহযাত্রীদের মধ্যে যাঁরা পূর্বে সুয়েজ দেখেছিলেন, তাঁরা বললেন, 'এ পরিশ্রমে শ্রান্তি ও বিরক্তি ছাড়া অন্য কোনো ফললাভের সম্ভাবনা নেই।' তাতেও আমি নিরুৎসাহ হই নি কিন্তু শুনলেম গাধায় চড়ে বেড়ানো ছাড়া শহরে বেড়াবার আর কোনো উপায় নেই। শুনে শহরে বেড়াবার দিকে টান আমার অনেকটা কমে গেল, তার পরে শোনা গেল, এ-দেশের গাধাদের সঙ্গে চালকদের সকল সময়ে মতের ঐক্য হয় না তারও একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন ইচ্ছে আছে; এইজন্যে সময়ে সময়ে দুই ইচ্ছের বিরোধ উপস্থিত হয়, কিন্তু প্রায় দেখা যায়, গাধার ইচ্ছে পরিণামে জয়ী হয়। সুয়েজে একপ্রকার জঘন্য চোখের ব্যামোর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব—রাস্তায় অমন শত শত লোকের চোখ ঐরকম রোগগ্রস্ত দেখতে পাবে। এখানকার মাছিরা ঐ রোগ চার দিকে বিতরণ করে বেড়ায়। রোগগ্রস্ত চোখ থেকে ঐ রোগের বীজ আহরণ করে তারা অরুগ্‌ণ চোখে গিয়ে বসে, চার দিকে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। সুয়েজে আমরা রেলগাড়িতে উঠলেম। এ রেলগাড়ির অনেকপ্রকার রোগ আছে, প্রথমত শোবার কোনো বন্দোবস্ত নেই, কেননা বসবার জায়গাগুলি অংশে অংশে বিভক্ত, দ্বিতীয়ত এমন গজগামিনী রেলগাড়ি সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায় না। সমস্ত রাত্রিই গাড়ি চলেছে, দিনের বেলা যখন জেগে উঠলেম তখন দেখলেম ধুলোয় আমাদের কেবল গোর হয় নি, আর সব হয়েছে। চুলে

হাত দিতে গিয়ে দেখি, চুলে এমন এক স্তর মাটি জমেছে যে, মাথায় অনায়াসে ধান চাষ করা যায়। এইরকম ধুলোমাখা সন্ন্যাসীর বেশে আমরা আলেকজান্দ্রিয়াতে গিয়ে পৌঁছলেম। রেলের লাইনের দু-পারে সবুজ শস্যক্ষেত্র। জায়গায় জায়গায় খেজুরের গাছে থোলো থোলো খেজুর ফলে রয়েছে। মাঠের মাঝে মাঝে কুয়ো। মাঝে মাঝে দুই-একটা কোঠাবাড়ি—বাড়িগুলো চৌকোনা, থাম নেই, বারান্দা নেই—সমস্তটাই দেয়ালের মতো, সে দেয়ালের মধ্যে মধ্যে দুই-একটা জানলা। এই-সকল কারণে বাড়িগুলোর যেন শ্রী নেই। যা হোক আমি আগে আফ্রিকার মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেরকম অনুর্বর মরুভূমি মনে করে রেখেছিলুম, চার দিক দেখে তা কিছুই মনে হল না। বরং চার দিককার সেই হরিৎ ক্ষেত্রের উপর খেজুরকুঞ্জের মধ্যে প্রভাতটি আমার অতি চমৎকার লেগেছিল।

আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে আমাদের জন্য 'মঙ্গোলিয়া' স্টীমার অপেক্ষা করছিল। এইবার আমরা ভূমধ্যসাগরের বক্ষে আরোহণ করলেম। আমার একটু শীত-শীত করতে লাগল। জাহাজে গিয়ে খুব ভালো করে স্নান করলেম, আমার তো হাড়ে হাড়ে ধুলো প্রবেশ করেছিল। স্নান করার পর আলেক্জান্দ্রিয়া শহর দেখতে গেলেম। জাহাজ থেকে ডাঙা পর্যন্ত যাবার জন্যে একটা নৌকো ভাড়া হল। এখানকার এক-একটা মাঝি স্যার উইলিয়ম জোন্সের দ্বিতীয় সংস্করণ বললেই হয়। তারা গ্রীক ইটালিয়ান ফ্রেঞ্চ ইংরেজি প্রভৃতি অনেক ভাষায় চলনসই রকম কথা কইতে পারে। শুনলেম ফ্রেঞ্চ ভাষাই এখানকার সাধারণ ভাষা। রাস্তাঘাটের নাম, সাইনবোর্ডে দোকানগুলির আত্মপরিচয়, অধিকাংশই ফরাসি ভাষায় লেখা। আলেকজান্দ্রিয়া শহরটি সমৃদ্ধিশালী মনে হল। এখানে যে কত জাতের লোক ও কত জাতের দোকানবাজার আছে তার ঠিকানা নেই। রাস্তাগুলি পাথর দিয়ে বাঁধানো, তাতে বেশ পরিষ্কার থাকে, কিন্তু গাড়ির শব্দ বড়ো বেশিরকম হয়। খুব বড়ো বড়ো বাড়ি, বড়ো বড়ো দোকান, শহরটি খুব জমকালো বটে। আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দর খুব প্রকাণ্ড। বিস্তর জাহাজ এখানে আশ্রয় পায়। য়ুরোপীয় মুসলমান সকল প্রকার জাতিরই জাহাজ এ বন্দরে আছে, কেবল হিন্দুদের জাহাজ নেই।

চার-পাঁচ দিনে আমরা ইটালিতে গিয়ে পৌঁছলেম। তখন রাত্রি একটা-দুটো হবে। গরম বিছানা ত্যাগ করে জিনিসপত্র নিয়ে আমরা জাহাজের ছাতে গিয়ে উঠলেম। জ্যোৎস্নারাত্রি, খুব শীত; আমার গায়ে বড়ো একটা গরম কাপড় ছিল না, তাই ভারি শীত করছিল। আমাদের সুমুখে নিস্তব্ধ শহর, বাড়িগুলির জানলা দরজা সমস্ত বন্ধ—সমস্ত নিদ্রামগ্ন। আমাদের যাত্রীদের মধ্যে ভারি গোল পড়ে গেল, কখনো শুনি ট্রেন পাওয়া যাবে, কখনো শুনি পাওয়া যাবে না। জিনিসপত্রগুলো নিয়ে কী করা যাবে ভেবে পাওয়া যায় না, জাহাজে থাকব কি বেরোব কিছুই স্থির নেই। একজন ইটালিয়ান অফিসার এসে আমাদের গুনতে আরম্ভ করলে—কিন্তু কেন গুনতে আরম্ভ করলে তা ভেবে পাওয়া গেল না। জাহাজের মধ্যে এইরকম একটা অস্ফুট জনশ্রুতি প্রচারিত হল যে, এই গণনার সঙ্গে আমাদের ট্রেনে চড়ার একটা বিশেষ যোগ আছে। কিন্তু সে-রাত্রে মূলেই ট্রেন পাওয়া গেল না। শোনা গেল, তার পরদিন বেলা তিনটের আগে ট্রেন পাওয়া যাবে না। যাত্রীরা মহা বিরক্ত হয়ে উঠল। অবশেষে সে-রাত্রে ব্রিন্দিসির হোটেলে আশ্রয় নিতে হল।

এই তো প্রথম য়ুরোপের মাটিতে আমার পা পড়ল। কোনো নূতন দেশে আসবার আগে আমি তাকে এমন নূতনতর মনে করে রাখি যে, এসে আর তা নূতন বলে মনেই হয় না। য়ুরোপ আমার তেমন নূতন মনে হয় নি শুনে সকলেই অবাক।

আমরা রাত্রি তিনটের সময় ব্রিন্দিসির হোটেলে গিয়ে শুয়ে পড়লেম। সকালে একটা আধমরা ঘোড়া ও আধভাঙা গাড়ি চড়ে শহর দেখতে বের হলেম। সারথির সঙ্গে গাড়িঘোড়ার এমন অসামঞ্জস্য যে কী বলব! সারথির বয়স চোদ্দো হবে, কিন্তু ঘোড়াটির বয়স পঞ্চাশ হবে—আর গাড়িটি পৌরাণিক যুগের মনে হল। ছোটোখাটো শহর যেমন হয়ে থাকে ব্রিন্দিসিও তাই। কতকগুলি কোঠাবাড়ি, দোকানবাজার, রাস্তাঘাট আছে। ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা করে ফিরছে, দু-চার জন লোক মদের দোকানে বসে গল্পগুজব করছে, দু-চার জন রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে হাসি-

তামাশা করছে; লোকজনেরা অতি নিশ্চিন্তমুখে গজেন্দ্রগমনে গমন করছে; যেন কারও কোনো কাজ নেই, কারও কোনো ভাবনা নেই—যেন শহরসুদ্ধ ছুটি। রাস্তায় গাড়িঘোড়ার সমারোহ নেই, লোক-জনের সমাগম নেই। আমরা খানিক দূর যেতেই একজন ছোকরা আমাদের গাড়ি থামিয়ে হাতে একটা তরমুজ নিয়ে গাড়োয়ানের পাশে গিয়ে বসল। ব—মহাশয় বললেন, 'বিনা আয়াসে এ'র কিছু রোজগার করবার বাসনা আছে।' লোকটা এসে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে মাঝে মাঝে আমাদের দেখিয়ে দিতে লাগল, 'ঐটে চর্চ, ঐটে বাগান, ঐটে মাঠ' ইত্যাদি। তার টীকাতে আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞানবৃদ্ধি হয় নি, আর তার টীকা না হলেও আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞানের ব্যাঘাত হত না। তাকে কেউ আমাদের গাড়িতে উঠতে বলে নি, কেউ তাকে কোনো বিষয় জিজ্ঞাসাও করে নি, কিন্তু তবু এই অযাচিত অনুগ্রহের জন্য তার যাচ্ঞা পূর্ণ করতে হল। তারা আমাদের একটা ফলের বাগানে নিয়ে গেল। সেখানে যে কত প্রকার ফলের গাছ, তার সংখ্যা নেই। চার দিকে থোলো থোলো আঙুর ফলে রয়েছে। দু-রকম আঙুর আছে, কালো আর সাদা। তার মধ্যে কালোগুলিই আমার বেশি মিষ্টি লাগল। বড়ো বড়ো গাছে আপেল পিচ প্রভৃতি অনেক প্রকার ফল ধরে আছে। একজন বুড়ি (বোধ হয় উদ্যানপালিকা) কতকগুলি ফলফুল নিয়ে উপস্থিত করলে। আমরা সেদিকে নজর করলেম না· কিন্তু ফল বিক্রয় করবার উপায় সে বিলক্ষণ জানে। আমরা ইতস্তত বেড়াচ্ছি, এমন সময়ে দেখি একটি সুন্দরী মেয়ে কতকগুলি ফল আর ফুলের তোড়া নিয়ে আমাদের সম্মুখে হাজির হল. তখন আর অগ্রাহ্য করবার সাধ্য রইল না।

ইটালির মেয়েদের বড়ো সুন্দর দেখতে। অনেকটা আমাদের দেশের মেয়ের ভাব আছে। সুন্দর রঙ, কালো কালো চুল, কালো ভুরু, কালো চোখ, আর মুখের গড়ন চমৎকার।

তিনটের ট্রেনে ব্রিন্দিসি ছাড়লেম। রেলোয়ে পথের দু-ধারে আঙুরের খেত, চমৎকার দেখতে। পর্বত, নদী, হ্রদ কুটীর, শস্যক্ষেত্র, ছোটো ছোটো গ্রাম প্রভৃতি যত কিছু কবির স্বপ্নের ধন সমস্ত চার দিকে শোভা পাচ্ছে। গাছপালার মধ্যে থেকে যখন কোনো একটি দূরস্থ নগর, তার প্রাসাদচূড়া. তার চার্চের শিখর, তার ছবির মতো বাড়িগুলি আস্তে আস্তে চোখে পড়ে তখন বড়ো ভালো লাগে। সন্ধেবেলায় একটি পাহাড়ের নীচে অতি সুন্দর একটি হ্রদ দেখেছিলেম তা আর আমি ভুলতে পারব না। তার চার দিকে গাছপালা, জলে সন্ধ্যার ছায়া—সে অতি সুন্দর, তা আমি বর্ণনা করতে চাই নে।

রেলোয়ে করে যেতে যেতে আমরা Mont Cenis-এর বিখ্যাত সুড়ঙ্গ দেখলেম। এই পর্বতের এ-পাশ থেকে ফরাসিরা ও-পাশ থেকে ইটালিয়ানরা, একসঙ্গে খুদতে আরম্ভ করে, কয়েক বৎসর খুদতে খুদতে দুই যন্ত্রীদল ঠিক মাঝামাঝি এসে পরস্পরের সমুখাসমুখি হয়। এই গুহা অতিক্রম করতে রেলগাড়ির ঠিক আধ ঘণ্টা লাগল। সে অন্ধকারে আমরা যেন হাঁপিয়ে উঠছিলেম। এখানকার রেলগাড়ির মধ্যে দিনরাত আলো জ্বালাই আছে, কেননা এক-এক স্থানে প্রায় পাঁচ মিনিট অন্তর এক-একটা পর্বতগুহা ভেদ করতে হয়—সুতরাং দিনের আলো খুব অল্পক্ষণ পাওয়া যায়। ইটালি থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা—নির্ঝর নদী পর্বত গ্রাম হ্রদ দেখতে দেখতে আমরা পথের কষ্ট ভুলে গিয়েছিলেম।

সকালবেলায় প্যারিসে গিয়ে পেঁছিলেম। কী জমকালো শহর। অভ্রভেদী প্রাসাদের অরণ্যে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। মনে হয় প্যারিসে বুঝি গরিব লোক নেই। মনে হল, এই সাড়ে তিন হাত মানুষের জন্যে এমন প্রকাণ্ড জমকালো বাড়িগুলোর কী আবশ্যক। হোটেলে গেলেম, এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড যে, ঢিলে কাপড় পরে যেমন সোয়াস্তি হয় না, সে হোটেলেও বোধ করি তেমনি অসোয়াস্তি হয়। স্মরণস্তম্ভ, উৎস, বাগান, প্রাসাদ, পাথরে বাঁধানো রাস্তা, গাড়ি, ঘোড়া, জন-কোলাহল প্রভৃতিতে অবাক হয়ে যেতে হয়। প্যারিসে পেঁছিয়েই আমরা একটা 'টার্কিশ-বাথে' গেলেম। প্রথমত একটা খুব গরম ঘরে গিয়ে বসলেম, সে-ঘরে অনেকক্ষণ থাকতে থাকতে কারও কারও ঘাম বেরতে লাগল, কিন্তু আমার তো বেরল না, আমাকে তার চেয়ে আর একটা গরম ঘরে

নিয়ে গেল, সে ঘরটা আগুনের মতো, চোখ মেলে থাকলে চোখ জ্বালা করতে থাকে, মিনিট কতক থেকে সেখানে আর থাকতে পারলেম না, সেখান থেকে বেরিয়ে খুব ঘাম হতে লাগল। তার পরে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে আমাকে শুইয়ে দিলে। ভীমকায় এক ব্যক্তি এসে আমার সর্বাঙ্গ ডলতে লাগল। তার সর্বাঙ্গ খোলা, এমন মাংসপেশল চমৎকার শরীর কখনো দেখি নি। 'ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।' মনে মনে ভাবলেম ক্ষীণকায় এই মশকটিকে দলন করার জন্যে এমন প্রকাণ্ড কামানের কোনো আবশ্যক ছিল না। সে আমাকে দেখে বললে, আমার শরীর বেশ লম্বা আছে, এখন পাশের দিকে বাড়লে আমি একজন সুপুরুষের মধ্যে গণ্য হব; আধ ঘণ্টা ধরে সে আমার সর্বাঙ্গ অবিশ্রান্ত দলন করলে, ভূমিষ্ঠকাল থেকে যত ধুলো মেখেছি, শরীর থেকে সব যেন উঠে গেল। যথেষ্টরূপে দলিত করে আমাকে আর-একটি ঘরে নিয়ে গেল, সেখানে গরম জল দিয়ে, সাবান দিয়ে, স্পঞ্জ দিয়ে শরীরটা বিলক্ষণ করে পরিষ্কার করলে। পরিষ্করণ-পর্ব শেষ হলে আর-একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে একটা বড়ো পিচকিরি করে গায়ে গরম জল ঢালতে লাগল, হঠাৎ গরম জল দেওয়া বন্ধ করে বরফের মতো ঠাণ্ডা জল বর্ষণ করতে লাগল; এইরকম কখনো গরম কখনো ঠাণ্ডা জলে স্নান করে একটা জলযন্ত্রের মধ্যে গেলেম, তার উপর থেকে নীচে থেকে চার পাশ থেকে বাণের মতো জল গায়ে বিঁধতে থাকে। সেই বরফের মতো ঠাণ্ডা বরুণ-বাণ-বর্ষণের মধ্যে খানিকক্ষণ থেকে আমার বুকের রক্ত পর্যন্ত যেন জমাট হয়ে গেল— রণে ভঙ্গ দিতে হল, হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এলেম। তার পরে এক জায়গায় পুকুরের মতো আছে, আমি সাঁতার দিতে রাজি আছি কি না জিজ্ঞাসা করলে। আমি সাঁতার দিলেম না, আমার সঙ্গী সাঁতার দিলেন। তাঁর সাঁতার দেওয়া দেখে তারা বলাবলি করতে লাগল, 'দেখো, দেখো, এরা কী অদ্ভুত রকম করে সাঁতার দেয়, ঠিক কুকুরের মতো।' এতক্ষণে স্নান শেষ হল। আমি দেখলেম টার্কিশ-বাথে স্নান করা আর শরীরটাকে ধোপার বাড়ি দেওয়া এক কথা। তার পরে সমস্ত দিনের জন্যে এক পাউন্ড দিয়ে এক গাড়ি ভাড়া করা গেল। প্যারিস এক্‌জিবিশন দেখতে গেলেম। তুমি এইবার হয়তো খুব আগ্রহের সঙ্গে কান খাড়া করেছ, ভাবছ আমি প্যারিস এক্‌জিবিশনের বিষয় কী না জানি বর্ণনা করব। কিন্তু দুঃখের বিষয় কী বলব, কলকাতার য়ুনিভার্সিটিতে বিদ্যা শেখার মতো প্যারিস এক্‌জিবিশনের সমস্ত দেখেছি কিন্তু কিছুই ভালো করে দেখি নি। একদিনের বেশি আমাদের প্যারিসে থাকা হল না—সে বৃহৎ কাণ্ড একদিনে দেখা কারও সাধ্য নয়। সমস্ত দিন আমরা দেখলেম— কিন্তু সেরকম দেখায়, দেখবার একটা তৃষ্ণা জন্মাল কিন্তু দেখা হল না। সে একটা নগরবিশেষ। এক মাস থাকলে তবে তা বর্ণনা করবার দুরাশা করতেম। প্যারিস এক্‌জিবিশনের একটা স্তূপাকার ভাব মনে আছে, কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাব কিছুই মনে নেই। সাধারণত মনে আছে যে চিত্রশালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য চমৎকার ছবি দেখেছি, স্থাপত্যশালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য প্রস্তরমূর্তি দেখেছি, নানা দেশবিদেশের নানা জিনিস দেখেছি; কিন্তু বিশেষ কিছু মনে নেই। তার পর প্যারিস থেকে লন্ডনে এলেম— এমন বিষণ্ণ অন্ধকার পুরী আর কখনো দেখি নি—ধোঁয়া, মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা, কাদা আর লোকজনের ব্যস্তসমস্ত ভাব। আমি দুই-এক ঘণ্টামাত্র লন্ডনে ছিলেম, যখন লন্ডন পরিত্যাগ করলেম তখন নিশ্বাস পরিত্যাগ করে বাঁচলেম। আমার বন্ধুরা আমাকে বললেন, লন্ডনের সঙ্গে প্রথম-দৃষ্টিতেই ভালোবাসা হয় না, কিছু দিন থেকে তাকে ভালো করে চিনলে তবে লন্ডনের মাধুর্য বোঝা যায়।

দ্বিতীয় পত্র

ইংলন্ডে আসবার আগে আমি নির্বোধের মতো আশা করেছিলেম যে, এই ক্ষুদ্র দ্বীপের দুই হস্ত-পরিমিত ভূমির সর্বত্রই গ্ল্যাডস্টোনের বাগ্মিতা, ম্যাক্স্‌মুলরের বেদব্যাখ্যা, টিন্ড্যালের বিজ্ঞানতত্ত্ব, কার্লাইলের গভীর চিন্তা, বেনের দর্শনশাস্ত্রে মুখরিত। সৌভাগ্যক্রমে তাতে আমি নিরাশ হয়েছি। মেয়েরা বেশভূষায় লিপ্ত, পুরুষেরা কাজকর্ম করছে, সংসার যেমন চলে থাকে তেমনি চলছে, কেবল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে কোলাহল শোনা যায়। মেয়েরা জিজ্ঞাসা করে থাকে, তুমি নাচে গিয়েছিলে কি না, কনসর্ট কেমন লাগল, থিয়েটারে একজন নূতন অ্যাক্টর এসেছে, কাল অমুক জায়গায় ব্যান্ড হবে ইত্যাদি। পুরুষেরা বলবে, আফগান যুদ্ধের বিষয় তুমি কী বিবেচনা কর, Marquis of Lorneকে লন্ডনীয়েরা খুব সমাদর করেছিল, আজ দিন বেশ ভালো, কালকের দিন বড়ো মিজরেব্‌ল্‌ ছিল। এ-দেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজায়, গান গায়, আগুনের ধারে আগুন পোয়ায়, সোফায় ঠেসান দিয়ে নভেল পড়ে, ভিজিটরদের সঙ্গে আলাপচারি করে ও আবশ্যক বা অনাবশ্যক মতে যুবকদের সঙ্গে ফ্লার্ট করে। এদেশের চির-আইবুড়ো মেয়েরা কাজের লোক। টেম্‌পারেন্স মীটিং, ওয়ার্কিং মেন্‌স্‌ সোসাইটি প্রভৃতি যত প্রকার অনুষ্ঠানের কোলাহল আছে, সমুদয়ের মধ্যে তাদের কণ্ঠ আছে। পুরুষদের মতো তাঁদের আপিসে যেতে হয় না, মেয়েদের মতো ছেলেপিলে মানুষ করতে হয় না, এদিকে হয়তো এত বয়স হয়েছে যে 'বল'-এ গিয়ে নাচা বা ফ্লার্ট করে সময় কাটানো সংগত হয় না, তাই তাঁরা অনেক কাজ করতে পারেন, তাতে উপকারও হয়তো আছে।

এখানে দ্বারে দ্বারে মদের দোকান। আমি রাস্তায় বেরোলে জুতোর দোকান, দরজির দোকান, মাংসের দোকান, খেলনার দোকান পদে পদে দেখতে পাই কিন্তু বইয়ের দোকান প্রায় দেখতে পাই নে। আমাদের একটি কবিতার বই কেনবার আবশ্যক হয়েছিল, কিন্তু কাছাকাছির মধ্যে বইয়ের দোকান না দেখে একজন খেলনাওয়ালাকে সেই বই আনিয়ে দিতে হুকুম করতে হয়েছিল— আমি আগে জানতেম, এ দেশে একটা কসাইয়ের দোকান যেমন প্রচুররূপে দরকারি, বইয়ের দোকানও তেমনি।

ইংলন্ডে এলে সকলের চেয়ে চোখে পড়ে লোকের ব্যস্ততা। রাস্তা দিয়ে যারা চলে তাদের মুখ দেখতে মজা আছে— বগলে ছাতি নিয়ে হুস হুস করে চলেছে, পাশের লোকদের উপর ভ্রূক্ষেপ নেই, মুখে যেন মহা উদ্‌বেগ, সময় তাদের ফাঁকি দিয়ে না পালায় এই তাদের প্রাণপণ চেষ্টা। সমস্ত লন্ডনময় রেলোয়ে। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর এক-একটা ট্রেন যাচ্ছে। লন্ডন থেকে ব্রাইটনে আসবার সময় দেখি প্রতি মুহূর্তে উপর দিয়ে একটা, নীচে দিয়ে একটা, পাশ দিয়ে একটা, এমন চারি দিক থেকে হুস হাস করে ট্রেন ছুটেছে। সে ট্রেনগুলোর চেহারা লন্ডনের লোকদেরই মতো, এদিক থেকে ওদিক থেকে মহা ব্যস্তভাবে হাঁসফাঁস করতে করতে চলেছে। দেশ তো এই এক রত্তি, দু-পা চললেই ভয় হয় পাছে সমুদ্রে গিয়ে পড়ি, এখানে এত ট্রেন যে কেন ভেবে পাই নে। আমরা একবার লন্ডনে যাবার সময় দৈবাৎ ট্রেন মিস করেছিলেম, কিন্তু তার জন্যে বাড়ি ফিরে আসতে হয় নি, তার আধ ঘণ্টা পরেই আর-এক ট্রেন এসে হাজির।

এ-দেশের লোক প্রকৃতির আদুরে ছেলে নয়, কারুর নাকে তেল দিয়ে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে থাকবার জো নেই। একে তো আমাদের দেশের মতো এ-দেশের জমিতে আঁচড় কাটলেই শস্য হয় না, তাতে শীতের সঙ্গে মারামারি করতে হয়— প্রথমত শীতের উপদ্রবে এদের কত কাপড় দরকার হয় তার ঠিক নেই, তার পরে কম খেলে এ-দেশে বাঁচবার জো নেই, শরীরে তাপ জন্মাবার জন্যে অনেক খাওয়া চাই। এ-দেশের লোকের কাপড়, কয়লা, খাওয়া অপর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকলে চলে না, তার উপরে আবার মদ আছে। আমাদের বাংলার খাওয়া নামমাত্র, কাপড় পরাও তাই। এ-দেশে যার ক্ষমতা আছে সেই মাথা তুলতে পারে, দুর্বল লোকদের এখানে রক্ষা নেই— একে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ, তাতে কার্যক্ষেত্রে সহস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা রোখারুখি করছে।

ক্রমে ক্রমে এখানকার দুই-এক জন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হতে চলল। একটা মজা দেখছি, এখানকার লোকেরা আমাকে নিতান্ত অবুঝের মতো মনে করে। একদিন Dr.— এর ভাইয়ের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়েছিলেম। একটা দোকানের সম্মুখে কতকগুলো ফোটোগ্রাফ ছিল, সে আমাকে সেইখানে নিয়ে গিয়ে ফোটোগ্রাফের ব্যাখ্যান আরম্ভ করে দিলে— আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে, একরকম যন্ত্র দিয়ে ঐ ছবিগুলো তৈরি হয়, মানুষে হাতে করে আঁকে না। আমার চার দিকে লোক দাঁড়িয়ে গেল। একটা ঘড়ির দোকানের সামনে নিয়ে, ঘড়িটা যে খুব আশ্চর্য যন্ত্র তাই আমার মনে সংস্কার জন্মাবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল। একটা ঈভনিং পার্টিতে মিস— আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি এর পূর্বে পিয়ানোর শব্দ শুনেছি কি না। এ-দেশের অনেক লোক হয়তো পরলোকের একটা ম্যাপ এঁকে দিতে পারে কিন্তু ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যদি একবিন্দুও খবর জানে। ইংলন্ড থেকে কোনো দেশের যে কিছু তফাত আছে তা তারা কল্পনাও করতে পারে না। ভারতবর্ষের কথা দূরে থাক্‌—সাধারণ লোকেরা কত বিষয় জানে না তার ঠিক নেই।

তৃতীয় পত্র

আমরা সেদিন ফ্যান্সি-বলে অর্থাৎ ছদ্মবেশী নাচে গিয়েছিলেম— কত মেয়ে পুরুষ নানারকম সেজেগুজে সেখানে নাচতে গিয়েছিল। প্রকাণ্ড ঘর, গ্যাসের আলোয় আলোকাকীর্ণ, চার দিকে ব্যান্ড বাজছে— ছ-সাত শ' সুন্দরী, সুপুরুষ। ঘরে ন স্থানং তিল ধারয়েৎ— চাঁদের হাট তো তাকেই বলে। এক-একটা ঘরে দলে দলে স্ত্রীপুরুষে হাত ধরাধরি করে ঘুরে ঘুরে নাচ আরম্ভ করেছে, যেন জোড়া জোড়া পাগলের মতো। এক-একটা ঘরে এমন সত্তর আশি জন যুগলমূর্তি; এমন ঘেঁষাঘেঁষি যে কে কার ঘাড়ে পড়ে তার ঠিক নেই। একটা ঘরে শ্যাম্পেনের কুরুক্ষেত্র পড়ে গিয়েছে, মদ্যমাংসের ছড়াছড়ি, সেখানে লোকারণ্য; এক-একটা মেয়ের নাচের বিরাম নেই, দু-তিন ঘণ্টা ধরে ক্রমাগত তার পা চলছে। একজন মেম তুষার-কুমারী সেজে গিয়েছিলেন, তাঁর সমস্তই শুভ্র, সর্বাঙ্গে পুঁতির সজ্জা, আলোতে ঝকমক করছে। একজন মুসলমানিনী সেজেছিলেন; একটা লাল ফুলো ইজের, উপরে একটা রেশমের পেশোয়াজ, মাথায় টুপির মতো— এ কাপড়ে তাঁকে বেশ মানিয়ে গিয়েছিল। একজন সেজেছিলেন আমাদের দিশি মেয়ে, একটা শাড়ি আর একটা কাঁচুলি তাঁর প্রধান সজ্জা, তার উপরে একটা চাদর, তাতে ইংরেজি কাপড়ের চেয়ে তাঁকে ঢের ভালো দেখাচ্ছিল। একজন সেজেছিলেন বিলিতি দাসী। আমি বাংলার জমিদার সেজেছিলেম, জরি দেওয়া মখমলের কাপড়, জরি দেওয়া মখমলের পাগড়ি প্রভৃতি পরেছিলেম। আমাদের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ অযোধ্যার তালুকদার সেজে গিয়েছিলেন, সাদা রেশমের ইজের জরিতে খচিত সাদা রেশমের চাপকান, সাদা রেশমের জোব্বা, জরিতে ঝকমকায়মান পাগড়ি, জরির কোমরবন্ধ— তাঁর সজ্জা। অযোধ্যার তালুকদারেরা যে এইরকম কাপড় পরে তা হয়তো নয়, কিন্তু ধরা পড়বার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আফগান সেনাপতি সেজেছিলেন।

গত মঙ্গলবারে আমরা এক ভদ্রলোকের বাড়িতে নাচের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেম। সন্ধেবেলায় কোথাও নিমন্ত্রণে যেতে হলে শীতের জন্য সচরাচর মোটা কাপড় পরতে হয়, কিন্তু ঈভ্‌নিং পার্টি প্রভৃতিতে পাতলা কালো বনাতের কাপড় পরাই রীতি! সান্ধ্য পরিচ্ছেদের কামিজটি একেবারে নিষ্কলঙ্ক ধবধবে সাদা হওয়া চাই, তার উপরে প্রায় সমস্ত-বুক খোলা এক বনাতের ওয়েস্টকোট, কালো ওয়েস্টকোটের মধ্যে সাদা কামিজের সুমুখ দিকটা বেরিয়ে থাকে, গলায় সাদা ফিতে (নেকটাই) বাঁধা, সকলের উপর একটি টেল-কোট (লাঙুল-কোট); টেলকোটের সুমুখ দিকটা কোমর পর্যন্ত কাটা, আমাদের চাপকান প্রভৃতি পোশাকগুলি যেমন হাঁটু পর্যন্ত পড়ে, এ তা নয়। এর সুমুখ দিকটার সীমা কোমর পর্যন্ত, কিন্তু পিছন দিকটা কাটা নয়, সুতরাং কতকটা লেজের

মতো ঝুলতে থাকে। ইংরেজদের হনুকরণে এই লেজকোট পরতে হল। নাচ-পার্টিতে যেতে হলে হাতে একজোড়া সাদা দস্তানা পরা চাই, কারণ যে মহিলাদের হাতে হাত দিয়ে নাচতে হবে, খালি হাত লেগে তাঁদের হাত ময়লা হয়ে যেতে পারে কিংবা তাঁদের হাতে যদি দস্তানা থাকে সেটা ময়লা হবার ভয় আছে। অন্য কোনো জায়গায় লেডিদের সঙ্গে শেক্‌হ্যান্ড করতে গেলে হাতের দস্তানা খুলে ফেলতে হয়, কিন্তু নাচের ঘরে তার উল্টো।

যা হোক, আমরা তো সাড়ে নটার সময় তাঁদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেম। তখনো নাচ আরম্ভ হয় নি। ঘরের দুয়ারের কাছে গৃহকর্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি বিশেষ পরিচিতদের সঙ্গে শেক্‌হ্যান্ড করছেন, অপরিচিতদের প্রতি শিরঃকম্পন ও সকলকে অভ্যর্থনা করছেন। এ গোরাদের দেশে নিমন্ত্রণসভায় গৃহকর্তার বড়ো উঁচু পদ নেই, তিনি সভায় উপস্থিত থাকুন বা শয়নগৃহে নিদ্রা দিন, তাতে কারও বড়ো কিছু এসে যায় না। আমরা ঘরে প্রবেশ করলেম, গ্যাসের আলোয় ঘর উজ্জ্বল, শত শত রমণীর রূপের আলোকে গ্যাসের আলো ম্রিয়মাণ; রূপের উৎসব পড়ে গিয়েছে, ঘরের ভিতরে প্রবেশ করবামাত্রই চোখে ধাঁধা লেগে যায়। ঘরের একপাশে পিয়ানো, বেহালা, বাঁশি বাজছে, ঘরের চারি ধারে কৌচ চৌকি সাজানো, ইতস্তত দেয়ালের আয়নার উপর গ্যাসের আলো ও রূপের প্রতিবিম্ব পড়ে ঝকমক করছে। নাচবার ঘরের মেজে কাঠের, তার উপর কার্পেট প্রভৃতি কিছু পাতা নেই, সে কাঠের মেজে এমন পালিশ করা যে, পা পিছলে যায়। ঘর যত পিছল হয় ততই নাচবার উপযুক্ত হয়, কেননা পিছল ঘরে নাচের গতি সহজ হয়, পা কোনো বাধা পায় না, আপনা-আপনি পিছলে আসে। ঘরের চারি দিকে আশেপাশে যে-সকল বারান্দার মতো আছে, তাই একটু ঢেকেঢুকে, গাছপালা দিয়ে, দু-একটি কৌচ চৌকি রেখে তাকে প্রণয়ীদের কুঞ্জ নামে অভিহিত করা হয়েছে। সেইখানে নাচে শ্রান্ত হয়ে বা কোলাহলে বিরক্ত হয়ে যুবক-যুবতী নিরিবিলি মধুরালাপে মগ্ন থাকতে পারেন। ঘরে ঢোকবার সময় সকলের হাতে সোনার অক্ষরে ছাপা এক-একখানি কাগজ দেওয়া হয়, সেই কাগজে কী কী নাচ হবে তাই লেখা থাকে। ইংরেজি নাচ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, একরকম হচ্ছে স্ত্রীপুরুষে মিলে ঘুরে ঘুরে নাচা, তাতে কেবল দু-জন লোক একসঙ্গে নাচে; আর-একরকম নাচে চারটি জুড়ি নর্তক-নর্তকী চতুষ্কোণ হয়ে সুমুখাসুমুখি দাঁড়ায় ও হাতধরাধরি করে নানা ভঙ্গিতে চলাফেরা করে বেড়ায়, কোনো কোনো সময় চার জুড়ি না হয়ে আট জুড়িও হয়। ঘুরে ঘুরে নাচকে রাউন্ড ডান্স বলে ও চলাফেরা করে নাচার নাম স্কোয়ার ডান্স। নাচ আরম্ভ হবার পূর্বে গৃহকর্ত্রী মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে আলাপ করিয়ে দেন অর্থাৎ পুরুষ-অভ্যাগতকে সঙ্গে করে কোনো এক অভ্যাগত-মহিলার কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন, 'মিস অমুক, ইনি মিস্টার অমুক।' অমনি মিস ও মিস্টার শিরঃকম্পন করেন। কোনো মিসের সঙ্গে পরিচয় হবার পর নাচবার ইচ্ছে করলে পকেট থেকে সেই সোনার জলে ছাপানো প্রোগ্রামটি বের করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে হয়, 'আপনি কি অমুক নৃত্যে বাগ্‌দত্তা হয়ে আছেন?' তিনি যদি 'না' বলেন তা হলে তাঁকে বলতে হবে, 'তবে আমি কি আপনার সঙ্গে নাচবার সুখভোগ করতে পারি?' তিনি 'থ্যাংক য়ু' বললে বোঝা যাবে কপালে তাঁর সঙ্গে নাচবার সুখ আছে। অমনি সেই কাগজটিতে সেই নাচের পাশে তাঁর নাম এবং তাঁর কাগজে আবেদনকারীর নাম লিখে দিতে হয়।

নাচ আরম্ভ হল। ঘুর-ঘুর-ঘুর। একটা ঘরে, মনে করো, চল্লিশ-পঞ্চাশ জুড়ি নাচছে; ঘেঁষাঘেঁষি, ঠেলাঠেলি, কখনো বা জুড়িতে জুড়িতে ধাক্কাধাক্কি। তবু ঘুর-ঘুর-ঘুর। তালে তালে বাজনা বাজছে তালে তালে পা পড়ছে, ঘর গরম হয়ে উঠেছে। একটা নাচ শেষ হল, বাজনা থেমে গেল; নর্তক মহাশয় তাঁর শ্রান্ত সহচরীকে আহারের ঘরে নিয়ে গেলেন, সেখানে টেবিলের উপর ফলমূল মিষ্টান্ন মদিরার আয়োজন; হয়তো আহার-পান করলেন না-হয় দুজনে নিভৃত কুঞ্জে বসে রহস্যালাপ করতে লাগলেন। আমি নতুন লোকের সঙ্গে বড়ো মিলে মিশে নিতে পারি নে, যে-নাচে আমি একেবারে সুপণ্ডিত, সে-নাচেও নতুন লোকের সঙ্গে নাচতে পারি নে। সত্যি কথা বলতে কি,

নাচের নেমন্তন্নগুলো আমার বড়ো ভালো লাগে না। যাদের সঙ্গে বিশেষ আলাপ আছে, তাদের সঙ্গে নাচতে মন্দ লাগে না। যেমন তাস খেলবার সময় খারাপ জুড়ি পেলে তার 'পরে তার দলের লোক চটে যায়, তেমনি নাচের সময় খারাপ জুড়ির 'পরে মেয়েরা ভারি চটে যায়। আমার নাচের সহচরী বোধ হয় নাচবার সময় মনে মনে আমার মরণ কামনা করেছিলেন। নাচ ফুরিয়ে গেল, আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেম, তিনিও নিস্তার পেলেন।

প্রথমে নাচের ঘরে ঢুকেই আমি একেবারে চমকে উঠেছিলেম, দেখি যে শত শ্বেতাঙ্গিনীদের মধ্যে আমাদের একটি ভারতবর্ষীয়া শ্যামাঙ্গিনী রয়েছেন। দেখেই তো আমার বুকটা একেবারে নেচে উঠেছিল। তার সঙ্গে কোনোমতে আলাপ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেম। কতদিন শ্যামলা মুখ দেখি নি! আর, তার মুখে আমাদের বাঙালি মেয়েদের ভালোমানুষি নম্রভাব মাখানো। আমি অনেক ইংরেজ মেয়েদের মুখে ভালোমানুষি নরম ভাব দেখেছি কিন্তু এর সঙ্গে তার কী একটা তফাত আছে বলতে পারি নে। তার চুল বাঁধা আমাদের দেশের মতো। সাদা মুখ আর উগ্র অসংকোচ সৌন্দর্য দেখে দেখে আমার মনটা ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল, এতদিনে তাই বুঝতে পারলেম। হাজার হোক, ইংরেজ মেয়েরা সম্পূর্ণ আলাদা জাত, আমি এতদূর ইংরেজি কায়দা শিখি নি যে, তাদের সঙ্গে বেশ খোলাখুলিভাবে কথাবার্তা কইতে পারি। পরিচিত বাঁধিগতের সীমা লঙ্ঘন করতে সাহস হয় না।

আজ ব্রাইটনের অনেক তপস্যার ফলে সূর্য উঠেছেন। এদেশে রবি যেদিন মেঘের অন্তঃপুর থেকে বের হন সেদিন একটি লোকও কেউ ঘরে থাকে না। সেদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াবার রাস্তায় লোক কিলবিল করতে থাকে। এদেশে যদিও 'বাড়ির ভিতর' নেই, তবু এদেশের মেয়েরা যেমন অসূর্যম্পশ্যারূপা এমন আমাদের দেশে নয়।

সাড়ে আটটার কমে আমাদের বিছানা থেকে ওঠা হয় না, ছ-টার সময় বিছানা থেকে উঠলে এখানকার লোকেরা আশ্চর্য হয়। তার পরে উঠেই আমি রোজ ঠাণ্ডা জলে স্নান করি। এদেশে যাকে স্নান বলে, আমি সেরকম স্নানের বিড়ম্বনা করি নে। আমি মাথায় জল ঢেলে স্নান করি, গরম জল নয়—এখানকার এই বরফের মতো ঠাণ্ডা জল। ন-টার সময় আমাদের খাবার আসে। এখানকার ন-টা আর সেখানকার ছ-টা সমান। আমাদের আর-একটি খাওয়া দেড়টার সময়, সেইটিই প্রধান খাওয়া—মধ্যাহ্নভোজন। মধ্যে একবার চা রুটি প্রভৃতি আসে, তার পরে রাত আটটার সময় আর-একটি সুপ্রশস্ত ভোজনের আয়োজন হয়ে থাকে; এইরকম আমাদের দিনের প্রধান বিভাগগুলি খাওয়া নিয়ে।

অন্ধকার হয়ে আসছে, চারটে বাজে ব'লে, চারটে বাজলে পরে আলো না জেবলে পড়া দুষ্কর। এখানে প্রকৃতপক্ষে ন-টার সময় দিন আরম্ভ হয়, কেননা গড়ে রোজ আটটার কমে ওঠা হয় না। তার পরে আবার বৈকাল চারটের সময়েই এখানকার দিনের আলো নিভে যায়। দিনগুলো যেন দশটা-চারটে আপিস করতে আসে। ট্যাঁক-ঘড়ির ডালা খুলতে খুলতেই এদেশে দিন চলে যায়। এখানকার রাত্তির তেমনি ঘোড়ায় চড়ে আসে, আর পায়ে হেঁটে ফেরে।

মেঘ বৃষ্টি, বাদল, অন্ধকার, শীত—এ আর একদণ্ডের তরে ছাড়া নেই। আমাদের দেশে যখন বৃষ্টি হয় তখন মুষলধারে বৃষ্টির শব্দ, মেঘ, বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়—তাতে একটা কেমন উল্লাসের ভাব আছে; এখানে এ তা নয়, এ টিপ টিপ করে সেই একঘেয়ে বৃষ্টি ক্রমাগতই অতিনিঃশব্দ পদসঞ্চারে চলছে তো চলছেই। রাস্তায় কাদা, পত্রহীন গাছগুলো স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে, কাঁচের জানলার উপর টিপ টিপ করে জল ছিটিয়ে পড়ছে। আমাদের দেশে স্তরে স্তরে মেঘ করে; এখানে আকাশ সমতল, মনে হয় না যে মেঘ করেছে, মনে হয় কোনো কারণে আকাশের রঙটা ঘুলিয়ে গিয়েছে, সমস্তটা জড়িয়ে স্থাবরজঙ্গমের একটা অবসন্ন মুখশ্রী। লোকের মুখে সময়ে সময়ে শুনতে পাই বটে যে, কাল বজ্র ডেকেছিল, কিন্তু বজ্রের নিজের এমন গলার জোর নেই যে তার মুখ থেকেই সে খবরটা পাই। সূর্য তো এখানে গুজবের মধ্যে হয়ে পড়েছে। যদি অনেক

ভাগ্যবলে সকালে উঠে সূর্যের মুখ দেখতে পাই, তবে তখনই আবার মনে হয়—

এমন দিন না রবে, তা জানো।

দিনে দিনে শীত খুব ঘনিয়ে আসছে; লোকে বলছে, কাল পরশুর মধ্যে হয়তো আমরা বরফ পড়া দেখতে পাব। তাপমান যন্ত্র ত্রিশ ডিগ্রি পর্যন্ত নেবে গিয়েছে— সেই তো হচ্ছে ফ্রীজিং পয়েন্ট। অল্পস্বল্প ফ্রস্ট দেখা দিয়েছে। রাস্তার মাটি খুব শক্ত। কেননা তার মধ্যে যা জল ছিল সমস্ত জমাট হয়ে গিয়েছে। রাস্তার মাঝে মাঝে কাঁচের টুকরোর মতো শিশির খুব শক্ত হয়ে জমেছে। দুই-এক জায়গায় ঘাসের মধ্যে কে যেন চুন ছড়িয়ে দিয়েছে, বরফের এই প্রথম সূত্রপাত। খুবই শীত পড়েছে, এক-এক সময়ে হাত-পা এমন ঠাণ্ডা হয়ে যায় যে জ্বালা করতে থাকে। সকালে লেপ থেকে বেরোতে ভাবনা হয়।

আমাদের দিশি কাপড় দেখে রাস্তার এক-একজন সত্যি সত্যি হেসে ওঠে, এক-একজন এত আশ্চর্য হয়ে যায় যে, তাদের আর হাসবার ক্ষমতা থাকে না। কত লোক হয়তো আমাদের জন্যে গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছে। প্যারিসে আমাদের গাড়ির পিছনে পিছনে একদল ইস্কুলের ছোকরা চীৎকার করতে করতে ছুটেছিল, আমরা তাদের সেলাম করলেম। এক-একজন আমাদের মুখের উপর হেসে ওঠে, এক-একজন চেঁচাতে থাকে— 'Jack, look at the blackies!'

চতুর্থ পত্র

আমরা সেদিন হাউস অফ কমন্সে গিয়েছিলেম। পার্লামেন্টের অভ্রভেদী চূড়া, প্রকাণ্ড বাড়ি, হাঁ-করা ঘরগুলো দেখলে তাক লেগে যায়। একটা বড়ো ঘরে হাউস বসে, ঘরের চারি দিকে গোল গ্যালারি, তার এক দিকে দর্শকেরা আর-এক দিকে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা। গ্যালারি অনেকটা থিয়েটারের ড্রেস-সার্কলের মতো। গ্যালারির নীচে স্টলে মেম্বাররা বসে। তাদের জন্যে দু-পাশে হদ্দ দশখানি বেঞ্চি। এক পাশের পাঁচখানি বেঞ্চিতে গবর্নমেন্টের দল, আর-এক পাশের পাঁচখানিতে বিপক্ষ দল। সুমুখের প্ল্যাটফর্মের উপর একটা কেদারা আছে, সেইখানে প্রেসিডেন্টের মতো একজন (যাকে স্পীকার বলে) মাথায় পরচুলা পরে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বসে থাকেন। যদি কেউ কখনো কোনো অন্যায় ব্যবহার বা কোনো আইনবিরুদ্ধ কাজ করে তা হলে স্পীকার উঠে তাকে বাধা দেয়। যেখানে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা সব বসে, তার পিছনে খড়খড়ি-দেওয়া একটা গ্যালারিতে মেয়েদের জায়গা, বাইরে থেকে তাদের দেখা যায় না। আমরা যখন গেলেম, তখন ও'ডোনেল বলে একজন আইরিশ সভ্য ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, প্রেস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে ও অন্যান্য নানা বিষয় নিয়ে তিনি আন্দোলন করছিলেন। তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেল। হাউসের ভাবগতিক দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেম। যখন একজন কেউ বক্তৃতা করছে, তখন হয়তো অনেক মেম্বার মিলে 'ইয়া' 'ইয়া' 'ইয়া' 'ইয়া' করে চীৎকার করছে, হাসছে। আমাদের দেশে সভাস্থলে ইস্কুলের ছোকরারাও হয়তো এমন করে না। অনেক সময়ে বক্তৃতা হচ্ছে আর মেম্বাররা কপালের উপর টুপি টেনে দিয়ে অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছেন। একবার দেখলেম যে, ভারতবর্ষের বিষয় নিয়ে একটা বক্তৃতার সময় ঘরে নয়-দশ জনের বেশি মেম্বার ছিল না, অন্যান্য সবাই ঘরের বাইরে হাওয়া খেতে বা সাপার খেতে গিয়েছেন; আর যেই ভোট নেবার সময় হল অমনি সবাই চার দিক থেকে এসে উপস্থিত। বক্তৃতা শুনে বা কোনো প্রকার যুক্তি শুনে যে কারও মত স্থির হয়, তা তো বোধ হল না।

গত বৃহস্পতিবারে হাউস অফ কমন্সে ভারতবর্ষ নিয়ে খুব বাদানুবাদ চলেছিল। সেদিন ব্রাইট সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে, গ্ল্যাডস্টোন তুলা-জাতের শুল্ক ও আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধে, ভারত-

বর্ষীয়দের দরখাস্ত দাখিল করেন। চারটের সময় পার্লামেন্ট খোলে। আমরা কয়েকজন বাঙালি চারটে না বাজতেই হাউসে গিয়ে উপস্থিত হলেম। তখন হাউস খোলে নি, দর্শনার্থীরা হাউসের বাইরে একটা প্রকাণ্ড ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের চার দিকে বার্ক, ফক্স, চ্যাটাম, ওঅলপোল প্রভৃতি রাজনীতিবিশারদ মহাপুরুষদের প্রস্তরমূর্তি। প্রতি দরজার কাছে পাহারাওআলা পাকা চুলের পরচুলাপরা। গাউন-ঝোলানো পার্লামেন্টের কর্মচারীরা হাতে দুই-একটা খাতাপত্র নিয়ে আনাগোনা করছিলেন। চারটের সময় হাউস খুলল। আমাদের কাছে স্পীকার্স গ্যালারির টিকিট ছিল। হাউস অফ কমন্সে পাঁচ শ্রেণীর গ্যালারি আছে— স্ট্রেঞ্জার্স গ্যালারি, স্পীকার্স গ্যালারি, ডিপ্লম্যাটিক গ্যালারি, রিপোর্টার্স গ্যালারি, লেডিজ গ্যালারি। হাউসের যে-কোনো মেম্বারের কাছ থেকে বৈদেশিক গ্যালারির টিকিট পাওয়া যায়, আর বক্তার অনুগ্রহ হলে তবে বক্তার গ্যালারির টিকিট পাওয়া যেতে পারে। ডিপ্লম্যাটিক গ্যালারিটা কী পদার্থ তা ভালো করে বলতে পারি নে, আমি যে ক-বার হাউসে গিয়েছি দুই-এক জন ছাড়া সেখানে লোক দেখতে পাই নি। স্ট্রেঞ্জার্স গ্যালারি থেকে বড়ো ভালো দেখাশুনো যায় না; তার সামনে স্পীকার্স গ্যালারি; তার সামনে ডিপ্লম্যাটিক গ্যালারি। আমরা গিয়ে তো বসলেম। পরচুলাধারী স্পীকার মহাশয় গরুড় পক্ষীটির মতো তাঁর সিংহাসনে উঠলেন। হাউসের সভ্যেরা সব আসন গ্রহণ করলেন। কাজ আরম্ভ হল। হাউসের প্রথম কাজ প্রশ্নোত্তর করা। হাউসের পূর্ব অধিবেশনে এক-একজন মেম্বার বলে রাখেন যে, 'আগামী বারে আমি অমুক অমুক বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব, তার উত্তর দিতে হবে।' সেদিন ও'ডোনেল নামে একজন আইরিশ মেম্বার জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'একো এবং আরও দুই-একটি খবরের কাগজে জুলুদের প্রতি ইংরেজ সৈন্যদের অত্যাচারের যে বিবরণ বেরিয়েছে, সে বিষয়ে গভর্নমেন্ট কি কোনো সংবাদ পেয়েছেন? আর সে-সকল অত্যাচার কি খৃস্টানদের অনুচিত নয়?' অমনি গভর্নমেন্টের দিক থেকে সার মাইকেল হিক্‌স্‌বিচ উঠে ও'ডোনেলকে কড়া কড়া দুই-এক কথা শুনিয়ে দিলেন, অমনি একে একে যত আইরিশ মেম্বার ছিলেন, সকলে উঠে তার কড়া কড়া উত্তর দিতে লাগলেন। এইরকম অনেকক্ষণ ঝগড়াঝাঁটি করে দুই পক্ষ শান্ত হয়ে বসলেন। উত্তর-প্রত্যুত্তরের ব্যাপার সমাপ্ত হলে পর যখন বক্তৃতা করবার সময় এল, তখন হাউস থেকে অধিকাংশ মেম্বার উঠে চলে গেলেন। দুই-একটা বক্তৃতার পর ব্রাইট উঠে সিভিল সার্ভিসের রাশি রাশি দরখাস্ত হাউসে দাখিল করলেন। বৃদ্ধ ব্রাইটকে দেখলে অত্যন্ত ভক্তি হয়, তাঁর মুখে ঔদার্য ও দয়া যেন মাখানো। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রাইট সেদিন কিছু বক্তৃতা করলেন না। হাউসে অতি অল্প মেম্বারই অবশিষ্ট ছিলেন, যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিদ্রার আয়োজন করছিলেন, এমন সময় গ্ল্যাডস্টোন উঠলেন। গ্ল্যাডস্টোন ওঠবামাত্র সমস্ত ঘর একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল, গ্ল্যাডস্টোনের স্বর শুনতে পেয়ে আস্তে আস্তে বাইরে থেকে দলে দলে মেম্বার আসতে লাগলেন, দুই দিকের বেঞ্চি পুরে গেল। তখন পূর্ণ উৎসের মতো গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতা উৎসারিত হতে লাগল। কিছুমাত্র চীৎকার, তর্জনগর্জন ছিল না, অথচ তাঁর প্রতি কথা, ঘরের যেখানে যে-কোনো লোক বসেছিল, সকলেই একেবারে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। গ্ল্যাডস্টোনের কী একরকম দৃঢ়স্বরে বলবার ধরন আছে, তাঁর প্রতি কথা মনের ভিতর গিয়ে যেন জোর করে বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়। একটা কথায় জোর দেবার সময় তিনি মুষ্টি বন্ধ করে একেবারে নুয়ে নুয়ে পড়েন, যেন প্রত্যেক কথা তিনি একেবারে নিংড়ে নিংড়ে বের করছেন। আর সেইরকম প্রতি জোর-দেওয়া কথা দরজা ভেঙে চুরে যেন মনের ভিতর প্রবেশ করে। গ্ল্যাডস্টোন অনর্গল বলেন বটে কিন্তু তাঁর প্রতি কথা ওজন করা, তার কোনো অংশ অসম্পূর্ণ নয়; তিনি বক্তৃতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্বরে জোর দিয়ে বলেন না, কেননা সেরকম বলপূর্বক বললে স্বভাবতই শ্রোতাদের মন তার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়ায়। তিনি যে-কথায় জোর দেওয়া আবশ্যক মনে করেন, সেই কথাতেই জোর দেন; তিনি খুব তেজের সঙ্গে বলেন বটে, কিন্তু চীৎকার করে বলেন না, মনে হয় যা বলছেন, তাতে তাঁর নিজের খুব আন্তরিক বিশ্বাস।

গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতাও যেমন থামল, অমনি হাউস শূন্যপ্রায় হয়ে গেল, দু-দিকের বেঞ্চিতে ছ-সাত জনের বেশি আর লোক ছিল না। গ্ল্যাডস্টোনের পর স্মলেট যখন বক্তৃতা আরম্ভ করলেন তখন দুই দিককার বেঞ্চিতে লোক ছিল না বললেও হয়; কিন্তু তিনি ক্ষান্ত হবার পাত্র নন, শূন্য হাউসকে সম্বোধন করে অত্যন্ত দীর্ঘ এক বক্তৃতা করলেন। সেই অবকাশে আমি অত্যন্ত দীর্ঘ এক নিদ্রা দিই। দুই-এক জন মেম্বার, যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা কেউ বা পরস্পর গল্প করছিলেন, কেউ বা চোখের উপর টুপি টেনে দিয়ে ডিসরেলির পদচ্যুতির পর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছিলেন।

হাউসে আইরিশ মেম্বারদের ভারি মুশকিল; তাঁরা যখন বক্তৃতা করতে ওঠেন, তখন চারি দিক থেকে ঘোরতর কোলাহল আরম্ভ হয়, মেম্বারেরা হাঁসের মতো 'ইয়া' 'ইয়া' করে চেঁচাতে থাকে। বিদ্রূপাত্মক 'হিয়ার' 'হিয়ার' শব্দে বক্তার স্বর ডুবে যায়। এইরকম বাধা পেয়ে বক্তা আর আত্মসংবরণ করতে পারেন না খুব জ্বলে ওঠেন, আর তিনি যতই রাগ করতে থাকেন ততই হাস্যাস্পদ হন। আইরিশ মেম্বারেরা এইরকম জ্বালাতন হয়ে আজকাল শোধ তুলতে আরম্ভ করেছেন। হাউসে যে-কোনো কথা ওঠে, প্রায় সকল বিষয়েই তাঁরা বাধা দেন, আর প্রতি প্রস্তাবে একজনের পর আর-এক জন করে উঠে দীর্ঘকালব্যাপী বক্তৃতায় হাউসকে বিব্রত করে তোলেন।

পঞ্চম পত্র

বিলেতে নতুন এসেই বাঙালিদের চোখে কোন্ জিনিস ঠেকে, বিলিতি সমাজে নতুন মিশে প্রথমে বাঙালিদের কী রকম লাগে, সে-সকল বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আপাতত কিছু বলব না। কেননা, এ-সকল বিষয় আমার বিচার করবার অধিকার নেই, যাঁরা পূর্বে অনেক কাল বিলেতে ছিলেন ও বিলেত যাঁরা খুব ভালো করে চেনেন তাঁরা আমাকে সঙ্গে করে এনেছেন, আর তাঁদের সঙ্গেই আমি বাস করছি। বিলেতে আসবার আগেই বিলেতের বিষয় তাঁদের কাছে অনেক শুনতে পেতেম, সুতরাং এখানে এসে খুব অল্প জিনিস নিতান্ত নতুন মনে হয়েছে। এখানকার লোকের সঙ্গে মিশতে গিয়ে প্রতি পদে হুঁচট খেয়ে খেয়ে আচার-ব্যবহার আমাকে শিখতে হয় নি। তাই ভাবছি যে, আমার নিজের অভিজ্ঞতার বিষয় আপাতত তোমাদের কিছু বলব না। এখানকার দুই-এক জন বাঙালির মুখে তাঁদের যে-রকম বিবরণ শুনেছি তাই তোমাদের লিখছি।

জাহাজে তো তাঁরা উঠলেন। যাত্রীদের সেবার জন্যে জাহাজে অনেক ইংরেজ চাকর থাকে তাদের নিয়েই প্রথম গোল বাধে। এঁরা অনেকে তাদের 'সার' 'সার' বলে সম্বোধন করতেন, তাদের কোনো কাজ করতে হুকুম দিতে তাঁদের বাধো-বাধো করত। জাহাজে তাঁরা অত্যন্ত সসংকোচ ভাবে থাকতেন। তাঁরা বলেন, সকল বিষয়েই তাঁদের যে ওরকম সংকোচ বোধ হত, সেটা কেবল ভয়ে নয়, তার সঙ্গে কতকটা লজ্জাও আছে। যে-কাজ করতে যান, মনে হয় পাছে বেদস্তুর হয়ে পড়ে। জাহাজে ইংরেজদের সঙ্গে মেশা বড়ো হয়ে ওঠে না। তারা টাটকা ভারতবর্ষ থেকে আসছে, 'হুজুর ধর্মাবতার'গণ দেশী লোক দেখলে নাক তুলে, ঘাড় বেঁকিয়ে চলে যায়। মাঝে মাঝে ভদ্র ইংরেজ দেখতে পাবে, তাঁরা তোমাকে নিতান্ত সঙ্গীহীন দেখে তোমার সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করবেন, তাঁরা যথার্থ ভদ্র, অর্থাৎ ভদ্র ও উচ্চ পরিবারের লোক। এখানকার গলিতে গলিতে যে 'জন-জোন্স্-টম্যাস'গণ কিলবিল করছে, তারা ভারতবর্ষের যে-অঞ্চলে পদার্পণ করে, সে-অঞ্চলে ঘরে ঘরে তাদের নাম রাষ্ট্র হয়ে যায়, যে-রাস্তায় তারা চাবুক হস্তে ঘোড়ায় চড়ে যায় (হয়তো সে চাবুক কেবলমাত্র ঘোড়ার জন্যেই নয়) সে রাস্তাসুদ্ধ লোক শশব্যস্ত হয়ে তাদের পথ ছেড়ে দেয়, তাদের এক-একটা ইঙ্গিতে ভারতবর্ষের এক-একটা রাজার সিংহাসন কেঁপে ওঠে, এরকম অবস্থায় তাদের যে বিকৃতি ঘটে আমি তো তাতে বিশেষ অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পাই নে। কোনো জন্মে যে-মানুষ ঘোড়া

চালায় নি, তাকে ঘোড়া চালাতে দাও, ঘোড়াকে চাবুক মেরে মেরেই জর্জরিত করবে; সে জানে না যে একটু লাগাম টেনে দিলেই তাকে চালানো যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে এক-একটি ভদ্র সাহেবকে দেখা যায়, তাঁরা অ্যাংগ্লো-ইন্ডিয়ানত্বের ঘোরতর সংক্রামক রোগের মধ্যে থেকেও বিশুদ্ধ থাকেন, অপ্রতিহত প্রভুত্ব ও ক্ষমতা পেয়েও উদ্ধত গর্বিত হয়ে ওঠেন না। সমাজশৃঙ্খল ছিন্ন হয়ে, সহস্র সেবকদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে ভারতবর্ষে থাকা উন্নত ও ভদ্র মনের এক প্রকার অগ্নিপরীক্ষা।

যা হোক, এতক্ষণে জাহাজ সাউদ্যাম্পটনে এসে পেঁচেছে। বঙ্গীয় যাত্রীরা বিলেতে এসে পেঁছলেন। লন্ডন উদ্দেশে চললেন। ট্রেন থেকে নাববার সময় একজন ইংরেজ গার্ড এসে উপস্থিত। বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, তাঁদের কী প্রয়োজন আছে, কী করে দিতে হবে। তাঁদের মোট নাবিয়ে দিলে, গাড়ি ডেকে দিলে, তাঁরা মনে মনে বললেন, 'বাঃ! ইংরেজরা কী ভদ্র!' ইংরেজরা যে এত ভদ্র হতে পারে, তা তাঁদের জ্ঞান ছিল না। তার হস্তে একটি শিলিং গুঁজে দিতে হল বটে। তা হোক, একজন নবাগত বঙ্গ-যুবক একজন যে-কোনো শ্বেতাঙ্গের কাছ থেকে একটিমাত্র সেলাম পেতে অকাতরে এক শিলিং ব্যয় করতে পারেন। আমি যাঁদের কাছ থেকে সব কথা শুনতে পাই, তাঁরা অনেক বৎসর বিলেতে আছেন, বিলেতের নানা প্রকার ছোটোখাটো জিনিস দেখে তাঁদের প্রথম কী রকম মনে হয়েছিল, তা তাঁদের স্পষ্ট মনে নেই। যে-সব বিষয়ে তাঁদের বিশেষ মনে লেগেছিল, তাই এখনো তাঁদের মনে আছে।

তাঁরা বিলেতে আসবার পূর্বে তাঁদের বিলিতি বন্ধুরা এখানে তাঁদের জন্যে ঘর ঠিক করে রেখেছিলেন। ঘরে ঢুকে দেখেন, ঘরে কার্পেট পাতা, দেয়ালে ছবি টাঙানো, একটা বড়ো আয়না এক জায়গায় ঝোলানো, কৌচ কতকগুলি চৌকি, দুই-একটা কাঁচের ফুলদানি, এক পাশে একটি ছোটো পিয়ানো। কী সর্বনাশ! তাঁদের বন্ধুদের ডেকে বললেন, 'আমরা কি এখেনে বড়োমানুষি করতে এসেছি? আমাদের বাপু বেশি টাকাকড়ি নেই, এরকম ঘরে থাকা আমাদের পোষাবে না!' বন্ধুরা অত্যন্ত আমোদ পেলেন, কারণ তখন তাঁরা একেবারে ভুলে গেছেন যে বহুপূর্বে তাঁদেরও একদিন এইরকম দশা ঘটেছিল। নবাগতদের নিতান্ত অন্নজীবী বাঙালি মনে করে অত্যন্ত বিজ্ঞতার স্বরে বললেন, 'এখানকার সকল ঘরই এইরকম!' নবাগত ভাবলেন, আমাদের দেশে সেই একটা স্যাঁতসেঁতে ঘরে একটা তক্তা ও তার উপরে একটা মাদুর পাতা, ইতস্তত হুঁকোর বৈঠক, কোমরে একটুখানি কাপড় জড়িয়ে জুতোজোড়া খুলে দু-চার জন মিলে শতরঞ্চ খেলা চলছে, বাড়ির উঠোনে একটা গোরু বাঁধা, দেয়ালে গোবর দেওয়া, বারান্দা থেকে ভিজে কাপড় শুকোচ্ছে ইত্যাদি। তাঁরা বলেন, প্রথম প্রথম দিনকতক চৌকিতে বসতে, কৌচে শুতে, টেবিলে খেতে, কার্পেটে বিচরণ করতে অত্যন্ত সংকোচ বোধ হত। সোফায় অত্যন্ত আড় হয়ে বসতেন, ভয় হত, পাছে সোফা ময়লা হয়ে যায় বা তার কোনো প্রকার হানি হয়। মনে হত সোফাগুলো কেবল ঘর সাজাবার জন্যেই রেখে দেওয়া, এগুলো ব্যবহার করতে দিয়ে মাটি করা কখনোই ঘরের কর্তার অভিপ্রেত হতে পারে না। ঘরে এসে প্রথম মনের ভাব তো এই, তার পরে আর-একটি প্রধান কথা বলা বাকি।

বিলেতে ছোটোখাটো বাড়িতে 'বাড়িওআলা' বলে একটা জীবের অস্তিত্ব আছে হয়তো, কিন্তু যাঁরা বাড়িতে থাকেন 'বাড়িওআলী'র সঙ্গেই তাঁদের সমস্ত সম্পর্ক। ভাড়া চুকিয়ে দেওয়া কোনো প্রকার বোঝাপড়া আহারাদির বন্দোবস্ত করা, সে সমস্তই বাড়িওআলীর কাছে। আমার বন্ধুরা যখন প্রথম পদার্পণ করলেন, দেখলেন, এক ইংরেজনী এসে অতি বিনীত স্বরে তাঁদের 'সুপ্রভাত' অভিবাদন করলে, তাঁরা নিতান্ত শশব্যস্ত হয়ে ভদ্রতার যথাযোগ্য প্রতিদান দিয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন, তাঁদের অন্যান্য ইঙ্গবঙ্গ বন্ধুগণ তাঁর সঙ্গে অতি অসংকুচিত স্বরে কথাবার্তা আরম্ভ করে দিলেন, তখন আর তাঁদের বিস্ময়ের আদি অন্ত রইল না। মনে করো এক সজীব বিবিসাহেব জুতো-পরা, টুপি-পরা, গাউন-পরা! তখন ইঙ্গবঙ্গ বন্ধুদের উপর সেই নবাগত বঙ্গযুবকদের ভক্তির উদয় হল, কোনো কালে যে এই অসমসাহসিকদের মতো তাঁদেরও বুকের পাটা জন্মাবে, তা তাঁদের সম্ভব বোধ হল না। যা হোক, এই নবাগতদের যথাস্থানে

প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে ইঙ্গবঙ্গ বন্ধুগণ স্ব স্ব আলয়ে গিয়ে সপ্তাহকাল ধরে তাঁদের অজ্ঞতা নিয়ে অপর্যাপ্ত হাস্যকৌতুক করলেন। পূর্বোক্ত গৃহকর্ত্রী প্রত্যহ নবাগতদের অতি বিনীতভাবে, কী চাই, কী না চাই, জিজ্ঞাসা করতে আসত। তাঁরা বলেন, এই উপলক্ষে তাঁদের অত্যন্ত আহ্লাদ হত। তাঁদের মধ্যে একজন বলেন, প্রথম দিন যেদিন তিনি এই ইংরেজ মেয়েকে একটুখানি ধমকাতে পেরেছিলেন, সেদিন সমস্ত দিন তাঁর মন অত্যন্ত প্রফুল্ল ছিল। অথচ সেদিন সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠে নি, পর্বত চলাফেরা করে বেড়ায় নি, বহ্নিও শীতলতা প্রাপ্ত হয় নি।

কার্পেট মোড়া ঘরে তাঁরা সুখে বাস করছেন। তাঁরা বলেন, 'আমাদের দেশে নিজের ঘর বলে একটা স্বতন্ত্র পদার্থ ছিল না; যে-ঘরে বসতেম, সে-ঘরে বাড়ির দশজনে যাতায়াত করছেই। আমি একপাশে লিখছি, দাদা একপাশে একখানা বই হাতে করে ঢুলছেন, আর-এক দিকে মাদুর পেতে গুরুমশায় ভুলুকে উচ্চৈঃস্বরে সুর করে করে নামতা পড়াচ্ছেন। এখানে আমার নিজের ঘর; সুবিধামত করে বইগুলি এক দিকে সাজালেম, লেখবার সরঞ্জাম একদিকে গুছিয়ে রাখলেম, কোনো ভয় নেই যে, একদিন পাঁচটা ছেলে মিলে সমস্ত ওলট-পালট করে দেবে, আর-একদিন দুটোর সময় কলেজ থেকে এসে দেখব, তিনটে বই পাওয়া যাচ্ছে না, অবশেষে অনেক খোঁজ-খোঁজ করে দেখা যাবে বইগুলি নিয়ে আমার ছোটো ভাগ্নীটি তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহচরীদের ডেকে ছবি দেখতে ঘোরতর ব্যস্ত। এখানে নিজের ঘরে বসে থাকো, দরজাটি ভেজানো, সট করে না বলে কয়ে কেউ ঘরের মধ্যে এসে পড়ে না, ঘরে ঢোকবার আগে দরজায় শব্দ করে, ছেলেপিলেগুলো চারি দিকে চেঁচামেচি কান্নাকাটি জুড়ে দেয় নি, নিরিবিলি নিরালা, কোনো হাঙ্গামা নেই।' দেশের সম্বন্ধে মেজাজ খিটখিটে হয়ে ওঠে। প্রায় দেখা যায় আমাদের দেশের পুরুষেরা এখানকার পুরুষ-সমাজে বড়ো মেশেন না। কারণ এখানকার পুরুষ-সমাজে মিশতে গেলে একরকম বলিষ্ঠ স্ফূর্তির ভাব থাকা চাই, বাধো-বাধো মিঠে সুরে দু-চারটে সসংকোচ 'হাঁ না' দিয়ে গেলে চলে না। বাঙালি অভ্যাগত ডিনার টেবিলে তাঁর পার্শ্বস্থ মহিলাটির কানে কানে মিষ্টি মিষ্টি টুকরো টুকরো দুই-একটি কথা মৃদু ধীর স্বরে কইতে পারেন, আর সে মহিলার সহবাসে তিনি যে স্বর্গ-সুখ উপভোগ করছেন, তা তাঁর মাথার চুল থেকে বুট জুতোর আগা পর্যন্ত প্রকাশ হতে থাকে, সুতরাং মেয়ে-সমাজে বাঙালিরা পসার করে নিতে পারেন। আমাদের দেশে ঘোমটাচ্ছন্ন-মুখচন্দ্র-শোভী অনালোকিত অন্তঃপুর থেকে এখানকার রূপের মুক্ত জ্যোৎস্নায় এসে আমাদের মন-চকোর প্রাণ খুলে গান গেয়ে ওঠে।

এক দিন আমাদের নবাগত বঙ্গযুবক তাঁর প্রথম ডিনারের নিমন্ত্রণে গিয়েছেন। নিমন্ত্রণসভায় বিদেশীর অত্যন্ত সমাদর। তিনি গৃহস্বামীর যুবতী কন্যা মিস অমুকের বাহু গ্রহণ করে আহারের-টেবিলে গিয়ে বসলেন। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মুক্তভাবে মিশতে পাই নে, তার পরে নতুন নতুন এসে এখানকার স্ত্রীলোকদের ভাবও ঠিক বুঝতে পারি নে। কোনো সামাজিকতার অনুরোধে তারা আমাদের মনোরঞ্জন করবার জন্যে যে-সকল কথাবার্তা হাস্যালাপ করে, আমরা তার ঠিক মর্মগ্রহণ করতে পারি নে, আমরা হঠাৎ মনে করি, আমাদের উপরেই এই মহিলাটির বিশেষ অনুকূল দৃষ্টি। আমাদের বঙ্গযুবকটি মিসকে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত অনেক কথা জানালেন। বললেন তাঁর বিলেত অত্যন্ত ভালো লাগে, ভারতবর্ষে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না, ভারতবর্ষে অনেক প্রকার কুসংস্কার আছে। শেষকালে দুই-একটি সাজানো কথাও বললেন। যথা, তিনি সুন্দরবনে বাঘ শিকার করতে গিয়ে একবার মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলেন। মিসটি অতি সহজে বুঝতে পারলেন যে, এই যুবকের তাঁকে অত্যন্ত ভালো লেগেছে। তিনি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হলেন ও তাঁর মিষ্টতম বাক্যবাণ যুবকের প্রাণে হানতে লাগলেন। 'আহা, কী গোছালো কথা! কোথায় আমাদের দেশের মেয়েদের মুখের সেই নিতান্ত শ্রমলভ্য দুই-একটি 'হাঁ না' যা এত মৃদু যে ঘোমটার সীমার মধ্যেই মিলিয়ে যায়; আর কোথায় এখানকার বিম্বোষ্ঠ-নিঃসৃত অজস্র মধুধারা, যা অযাচিতভাবে মদিরার মতো শিরায় শিরায় প্রবেশ করে!'

হয়তো বুঝতে পারছ, কী কী মসলার সংযোগে বাঙালি বলে একটা পদার্থ ক্রমে ইঙ্গবঙ্গ নামে একটা খিচুড়িতে পরিণত হয়। সমস্ত প্রক্রিয়াটা বিস্তারিত করে লিখতে পারি নি। এত সব ছোটো ছোটো বিষয়ের সমষ্টি মানুষের মনে অলক্ষিত পরিবর্তন উপস্থিত করে যে, সে-সকল খুঁটিনাটি করে বর্ণনা করতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়।

ইঙ্গবঙ্গদের ভালো করে চিনতে গেলে তাদের তিন রকম অবস্থায় দেখতে হয়। তাঁরা ইংরেজদের সম্মুখে কী রকম ব্যবহার করেন, বাঙালিদের সম্মুখে কী রকম ব্যবহার করেন ও তাঁদের স্বজাত ইঙ্গবঙ্গদের সম্মুখে কী রকম ব্যবহার করেন। একটি ইঙ্গবঙ্গকে একজন ইংরেজের সম্মুখে দেখো, চক্ষু জুড়িয়ে যাবে। ভদ্রতার ভারে প্রতি কথায় ঘাড় নুয়ে নুয়ে পড়ছে, তর্ক করবার সময় অতিশয় সাবধানে নরম করে প্রতিবাদ করেন ও প্রতিবাদ করতে হল বলে অপর্যাপ্ত দুঃখ প্রকাশ করেন, অসংখ্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কথা কন আর না কন, একজন ইংরেজের কাছে একজন ইঙ্গবঙ্গ চুপ করে বসে থাকলেও তাঁর প্রতি অঙ্গভঙ্গি প্রতি মুখের ভাবে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ হতে থাকে। কিন্তু তাকেই আবার তাঁর স্বজাতিমণ্ডলে দেখো, দেখবে তাঁর মেজাজ। বিলেতে যিনি তিন বৎসর আছেন এক বৎসরের বিলেতবাসীর কাছে তাঁর অত্যন্ত পায়া ভারী। এই তিন বৎসর ও এক বৎসরের মধ্যে যদি কখনো তর্ক ওঠে, তা হলে তুমি 'তিন বৎসরের' প্রতাপটা একবার দেখতে পাও। তিনি প্রতি কথা এমন ভাবে, এমন স্বরে বলেন যে, যেন সেই কথাগুলি নিয়ে সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ বোঝাপড়া হয়ে একটা স্থিরসিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। যিনি প্রতিবাদ করছেন তাঁকে তিনি জিজ্ঞাসা না করাও একটা মূল নিয়মের মধ্যে।

সেদিন একজন গল্প করছিলেন যে তাঁকে আর-এক জন বাঙালি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, 'মশায়ের কী কাজ করা হয়?' এই গল্প শুনবামাত্র আমাদের একজন ইঙ্গবঙ্গবন্ধু নিদারুণ ঘৃণার সঙ্গে বলে উঠলেন, 'দেখুন দেখি, কী বার্বারিস!' ভাবটা এই যে, যেমন মিথ্যে কথা না বলা, চুরি না করা, নীতিশাস্ত্রের কতকগুলি মূল নিয়ম, তেমনি অন্য মানুষকে তার জীবিকার কথা জিজ্ঞাসা না করাও একটা মূল নিয়মের মধ্যে।

সেদিন এক জায়গায় আমাদের দেশের শ্রাদ্ধের কথা হচ্ছিল, বাপ-মার মৃত্যুর পর আমরা হবিষ্য করি, বেশভূষা করি নে ইত্যাদি। শুনে একজন ইঙ্গবঙ্গ যুবক অধীর ভাবে আমাকে বলে উঠলেন যে, 'আপনি অবিশ্যি, মশায়, এ-সকল অনুষ্ঠান ভালো বলেন না।' আমি বললেম, 'কেন নয়? আমি দেখছি ইংরেজেরা যদি আত্মীয়ের মৃত্যু উপলক্ষে হবিষ্যান্ন খেত, আর আমাদের দেশের লোকেরা না খেত, তা হলে হবিষ্যান্ন খায় না বলে আমাদের দেশের লোকের উপর তোমার দ্বিগুণতর ঘৃণা হত ও মনে করতে হবিষ্যান্ন খায় না বলেই আমাদের দেশের এত দুর্দশা।' তুমি হয়তো জান, ইংরেজেরা এক টেবিলে তেরোজন খাওয়া অলক্ষণ মনে করে, তাদের বিশ্বাস তা হলে এক বৎসরের মধ্যে তাদের একজনের মৃত্যু হবেই। একজন ইঙ্গবঙ্গ যখন নিমন্ত্রণ করেন তখন কোনোমতে তেরোজন নিমন্ত্রণ করেন না, জিজ্ঞাসা করলে বলেন, 'আমি নিজে বিশ্বাস করি নে, কিন্তু যাঁদের নিমন্ত্রণ করি তাঁরা পাছে ভয় পান তাই বাধ্য হয়ে এ নিয়ম পালন করতে হয়।' সেদিন একজন ইঙ্গবঙ্গ তাঁর একটি আত্মীয় বালককে রবিবার দিনে রাস্তায় খেলা করতে যেতে বারণ করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, 'রাস্তার লোকেরা কী মনে করবে?'

কতকগুলি বাঙালি বলেন, এখানকার মতো ঘর ভাড়া দেবার প্রথা তাঁরা আমাদের দেশে প্রচলিত করবেন। তাঁদের সেই একটিমাত্র সাধ। আর-এক জন বাঙালি বাংলা সমাজ সংস্কার করতে চান, বিলেতের সমাজে মেয়ে পুরুষে একত্রে নাচটাই তাঁর চোখে অত্যন্ত ভালো লেগেছে। কতকগুলি সাধারণ বিষয়ে আমাদের দেশের ও এ-দেশের মেয়েদের অমিল দেখে তার পরে তিনি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয় নিয়ে ছেলেমানুষের মতো খুঁতখুঁত করতে থাকেন। একজন ইঙ্গবঙ্গ নালিশ করছিলেন যে, আমাদের দেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজাতে পারে না, ও এখানকার মতো ভিজিটারদের সঙ্গে দেখা করতে ও ভিজিট প্রত্যর্পণ করতে যায় না। এইরকম ক্রমাগত

প্রতি ছোটোখাটো বিষয়-নিয়ে এ-দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করে করে তাঁদের চটাভাব চটনমান যন্ত্রে ব্লাড হীট ছাড়িয়ে ওঠে। একজন ইঙ্গবঙ্গ তাঁর সমবেদক বন্ধুদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে বলছিলেন যে, যখন তিনি মনে করেন যে, দেশে ফিরে গেলে তাঁকে চারি দিকে ঘিরে মেয়ে-গুলো প্যান প্যান করে কাঁদতে আরম্ভ করবে, তখন আর তাঁর দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। অর্থাৎ তিনি চান যে, তাঁকে দেখবামাত্রেই 'ডিয়ার ডার্লিং' বলে ছুটে এসে তাঁর স্ত্রী তাঁকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করে তাঁর কাঁধে মাথা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। ডিনারের টেবিলে কাঁটা ছুরি উল্টে ধরতে হবে, কি পাল্টে ধরতে হবে তাই জানবার জন্যে তাঁদের গবেষণা দেখলে তাঁদের উপর ভক্তির উদয় হয়। কোটের কোন্ ছাঁটটা ফ্যাশন-সংগত, আজকাল নোবিলিটি আঁট প্যান্টলুন পরেন কি ঢল্‌কো পরেন, ওয়ালট্‌স্ নাচেন কি পোলকা মজুর্কা, মাছের পর মাংস খান কি মাংসের পর মাছ, সে-বিষয়ে তাঁরা অভ্রান্ত খবর রাখেন। ঐরকম ছোটোখাটো বিষয়ে একজন বাঙালি যত দস্তুর-বেদস্তুর নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, এমন এ-দিশি করে না। তুমি যদি মাছ খাবার সময় ছুরি ব্যবহার কর তবে একজন ইংরেজ তাতে বড়ো আশ্চর্য হবেন না, কেননা তিনি জানেন তুমি বিদেশী, কিন্তু একজন ইঙ্গবঙ্গ সেখানে উপস্থিত থাকলে তাঁর স্মেলিং সল্‌টের আবশ্যক করবে। তুমি যদি শেরি খাবার গ্লাসে শ্যাম্পেন খাও তবে একজন ইঙ্গবঙ্গ তোমার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকবেন, যেন তোমার এই অজ্ঞতার জন্যে সমস্ত পৃথিবীর সুখ শান্তি নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে। সন্ধেবেলায় তুমি যদি মর্নিং কোট পর, তা হলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট হলে জেলে নির্জনবাসের আজ্ঞা দিতেন। একজন বিলাত-ফেরতা কাউকে মটন দিয়ে রাই দিয়ে খেতে দেখলে বলতেন, 'তবে কেন মাথা দিয়ে চল না?'

আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করে দেখেছি যে, বাঙালিরা ইংরেজদের কাছে স্বদেশের লোকেদের ও আচার-ব্যবহারের যত নিন্দে করেন, এমন একজন ভারতদ্বেষী অ্যাংগ্লো ইন্ডিয়ানও করেন না। তিনি নিজে ইচ্ছা করে কথা পাড়েন ও ভারতবর্ষের নানা প্রকার কুসংস্কার প্রভৃতি নিয়ে প্রাণ খুলে হাস্যপরিহাস করেন। তিনি গল্প করেন যে, আমাদের দেশে বল্লভাচার্যের দল বলে একরকম বৈষ্ণবের দল আছে। তাদের সমস্ত অনুষ্ঠান সবিস্তারে বর্ণনা করতে থাকেন। সভার লোকদের হাসাবার অভিপ্রায়ে, নেটিব নচ-গার্লরা কী রকম করে নাচে অঙ্গভঙ্গি করে তার নকল করেন ও তাই দেখে সকলে হাসলে আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁর নিতান্ত ইচ্ছে, তাঁকে কেউ ভারতবর্ষীয় দলের মধ্যে গণ্য না করে। সাহেব-সাজা বাঙালিদের প্রতি পদে ভয়, পাছে তাঁরা বাঙালি বলে ধরা পড়েন। একজন বাঙালি একবার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর-এক জন ভারতবর্ষীয় এসে তাঁকে হিন্দুস্থানিতে দুই-এক কথা জিজ্ঞাসা করে, তিনি মহা খাপা হয়ে তার উত্তর না দিয়ে চলে যান। তাঁর ইচ্ছে, তাঁকে দেখে কেউ মনে না করতে পারে যে, তিনি হিন্দুস্থানি বোঝেন। একজন ইঙ্গবঙ্গ একটি 'জাতীয় সংগীত' রামপ্রসাদী সুরে রচনা করেছেন; এই গানটার একটু অংশ পূর্ব পত্রে লিখেছি, বাকি আর-একটুকু মনে পড়েছে, এইজন্য আবার তার উল্লেখ করছি। এ গীত যাঁর রচনা, তিনি রামপ্রসাদের মতো শ্যামার উপাসক নন, তিনি গৌরীভক্ত। এইজন্যে গৌরীকে সম্বোধন করে বলছেন,

মা, এবার মলে সাহেব হব;
রাঙা চুলে হ্যাট বসিয়ে, পোড়া নেটিব নাম ঘোচাব।
সাদা হাতে হাত দিয়ে মা, বাগানে বেড়াতে যাব
(আবার) কালো বদন দেখলে পরে 'ডার্কি' বলে মুখ ফেরাব।

আমি পূর্বেই বিলাতে বাড়িওআলী শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছি। তারা বাড়ির লোকদের আবশ্যকমত সেবা করে। অনেক ভাড়াটে থাকলে তারা চাকরানী রাখে বা অন্য আত্মীয়েরা তাদের সাহায্য করবার জন্যে থাকে। অনেকে সুন্দরী ল্যান্ডলেডি দেখে ঘর ভাড়া করেন। বাড়িতে পদার্পণ

করেই ল্যান্ডলেডির যুবতী কন্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে নেন, দু-তিন দিনের মধ্যে তার একটি আদরের নামকরণ করা হয়, সপ্তাহ অতীত হলে তার নামে হয়তো একটা কবিতা রচনা করে তাকে উপহার দেন। সেদিন ল্যান্ডলেডির মেয়ে তাঁকে এক পেয়ালা চা এনে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, চায়ে কি চিনি দিতে হবে? তিনি হেসে বললেন, 'না নেলি, তুমি যখন ছুঁয়ে দিয়েছ, তখন আর চিনি দেবার দরকার দেখছি নে।' আমি জানি, একজন ইঙ্গবঙ্গ তাঁর বাড়ির দাসীদের মেজদিদি সেজদিদি বলে ডাকতেন।

আমি একজনকে জানি, তিনি তাঁর মেজদিদি-সেজদিদিবর্গকে এত মান্য করে চলতেন যে, তাঁর ঘরে বা তাঁর পাশের ঘরে যদি এদের মধ্যে কেউ উপস্থিত থাকত, এবং সে অবস্থায় যদি তাঁর কোনো ইঙ্গবঙ্গ বন্ধু গান বা হাস্যপরিহাস করতেন তা হলে তিনি মহা অপ্রতিভ হয়ে বলে উঠতেন, 'আরে চুপ করো, চুপ করো, মিস এমিলি কী মনে করবেন?' আমার মনে আছে, দেশে থাকতে একবার এক ব্যক্তি বিলেত থেকে ফিরে গেলে পর, আমরা তাকে খাওয়াই। খাবার সময় তিনি নিশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, 'এই আমি প্রথম খাচ্ছি, যেদিন আমার খাবার টেবিলে কোনো লেডি নেই।' একজন ইঙ্গবঙ্গ একবার তাঁর কতকগুলি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। খাবার টেবিলে কতকগুলি ল্যান্ডলেডি ও দাসী বসে ছিল, তাদের একজনের ময়লা কাপড় দেখে নিমন্ত্রণকর্তা তাকে কাপড় বদলে আসতে অনুরোধ করেছিলেন। শুনে সে বললে, 'যাকে ভালোবাসা যায়, তাকে ময়লা কাপড়েও ভালোবাসা যায়।'

এইবার ইঙ্গবঙ্গদের একটি গুণের কথা তোমাকে বলছি। এখানে যাঁরা আসেন, অনেকেই কবুল করেন না যে তাঁরা বিবাহিত, যেহেতু স্বভাবতই যুবতী কুমারীসমাজে বিবাহিতদের দাম অল্প। অবিবাহিত বলে পরিচয় দিলে এখানকার অবিবাহিতদের সঙ্গে মিশে অনেক যথেচ্ছাচার করা যায়, কিন্তু বিবাহিত বলে জানলে তোমার অবিবাহিত সঙ্গীরা ওরকম অনিয়ম করতে দেয় না; সুতরাং অবিবাহিত বলে পরিচয় দিলে অনেক লাভ আছে।

অনেক ইঙ্গবঙ্গ দেখতে পাবে তাঁরা আমার এই বর্ণনার বহির্গত। কিন্তু সাধারণত ইঙ্গবঙ্গত্বের লক্ষণগুলি আমি যতদূর জানি তা লিখেছি।

ভারতবর্ষে গিয়ে ইঙ্গবঙ্গদের কী রকম অবস্থা হয় সে-বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতাও নেই, বক্তব্যও নেই। কিন্তু কিছু কাল ভারতবর্ষে থেকে তার পরে ইংলন্ডে এলে কী রকম ভাব হয় তা আমি অনেকের দেখেছি। তাঁদের ইংলন্ড আর তেমন ভালো লাগে না; অনেক সময়ে তাঁরা ভেবে পান না, ইংলন্ড বদলেছে, কি তাঁরা বদলেছেন। আগে ইংলন্ডের অতি সামান্য জিনিস ভালো লাগত; এখন ইংলন্ডের শীত ইংলন্ডের বর্ষা তাঁদের ভালো লাগছে না, এখন তাঁরা ভারতবর্ষে ফিরে যেতে হলে দুঃখিত হন না। তাঁরা বলেন, আগে তাঁরা ইংলন্ডের স্ট্রবেরি ফল অত্যন্ত ভালোবাসতেন। এমন-কি, তাঁরা যত রকম ফল খেয়েছেন তার মধ্যে স্ট্রবেরিই তাঁদের সকলের চেয়ে স্বাদু মনে হত। কিন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যে স্ট্রবেরির স্বাদ বদলে গেল নাকি। এখন দেখছেন তার চেয়ে অনেক দিশি ফল তাঁদের ভালো লাগে। আগে ডেভনশিয়রের ক্রীম তাদের এত ভালো লাগত যে, তার আর কথা নেই, কিন্তু এখন দেখছেন আমাদের দেশের ক্ষীর তার চেয়ে ঢের ভালো। তাঁরা ভারতবর্ষে গিয়ে স্ত্রীপুত্র-পরিবার নিয়ে সংসারী হয়ে পড়েন, রোজগার করতে আরম্ভ করেন, ভারতবর্ষের মাটিতে তাদের শিকড় একরকম বসে যায়। মনটা কেমন শিথিল হয়ে আসে, তখন পায়ের উপর পা দিয়ে টানা পাখার বাতাস খেয়ে কোনো প্রকারে দিন কাটিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত থাকেন। বিলেতে আমোদ বিলাস ভোগ করতে গেলেও অনেক উদ্যমের আবশ্যক করে। এখানে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে হলে গাড়ির চলন নেই, হাত পা নাড়তে চাড়তে দশটা চাকরের উপর নির্ভর করলে চলে না। গাড়িভাড়া অত্যন্ত বেশি, আর চাকরের মাইনে মাসে সাড়ে তিন টাকা নয়। থিয়েটার দেখতে যাও; সন্ধেবেলা বৃষ্টি পড়ছে, পথে কাদা, একটা ছাতা ঘাড়ে করে মাইল কতক ছুটোছুটি করে তবে ঠিক সময়ে পেঁছিতে পারবে। যখন রক্তের তেজ থাকে তখন এ-সকল পেরে ওঠা যায়।

ষষ্ঠ পত্র

আমাদের ব্রাইটনের বাড়িটি সমুদ্রের কাছে একটি নিরালা জায়গায়। এক সার কুড়ি-পঁচিশটি বাড়ি, বাড়িগুলির নাম মেডিনা ভিলাজ। হঠাৎ মনে হয়েছিল বাগানবাড়ি। এখানে এসে দেখি, 'ভিলা'ত্বর মধ্যে আমাদের বাড়ির সামনে দু-চার হাত জমিতে দু-চারটে গাছ পোঁতা আছে। বাড়ির দরজায় একটা লোহার কড়া লাগানো, সেইটেতে ঠক ঠক করলেম, আমাদের ল্যান্ডলেডি এসে দরজা খুলে দিলে। আমাদের দেশের তুলনায় এখানকার ঘরগুলো লম্বা চৌড়া ও উঁচুতে ঢের ছোটো। চারি দিকে জানলা বন্ধ, একটু বাতাস আসবার জো নেই, কেবল জানলাগুলো সমস্ত কাঁচের বলে আলো আসে। শীতের পক্ষে এরকম ছোটোখাটো ঘরগুলো ভালো, একটু আগুন জ্বাললেই সমস্ত বেশ গরম হয়ে ওঠে, কিন্তু তা হোক, যেদিন মেঘে চারি দিক অন্ধকার টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, তিন-চার দিন ধরে মেঘ-বৃষ্টি-অন্ধকারের এক মুহূর্ত বিরাম নেই, সেদিন এই ছোটো অন্ধকার ঘরটার এক কোণে বসে আমার মনটা অত্যন্ত বিগড়ে যায়, কোনোমতে সময় কাটে না। খালি আমি বলে নয়, আমার ইংরেজ আলাপীরা বলেন সে-রকম দিনে তাঁদের অত্যন্ত swear করার প্রবৃত্তি জন্মায় (swear করা রোগটা সম্পূর্ণ য়ুরোপীয়, সুতরাং ওর বাংলা কোনো নাম নেই), মনের ভাবটা অধার্মিক হয়ে ওঠে। যা হোক এখানকার ঘর-দুয়ারগুলি বেশ পরিষ্কার; বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে কোথাও ধুলো দেখবার জো নেই, মেজের সর্বাঙ্গ কার্পেট প্রভৃতি দিয়ে মোড়া, সিঁড়িগুলি পরিষ্কার তক্ তক্ করছে। চোখে দেখতে খারাপ হলে এরা সইতে পারে না। প্রতি সামান্য বিষয়ে এদের ভালো দেখতে হওয়াটা প্রধান আবশ্যক। শোকবস্ত্রও সুশ্রী দেখতে হওয়া চাই। আমরা যাকে পরিষ্কার বলি সেটা কিন্তু আর-একটা জিনিস। এখানকার লোকেরা খাবার পরে আঁচায় না, কেননা আঁচানো জল মুখ থেকে পড়ছে সে অতি কুশ্রী দেখায়। শ্রী হানি হয় বলে পরিষ্কার হওয়া হয় না। এখানে যেরকম কাশি-সর্দির প্রাদুর্ভাব, তাতে ঘরে একটা পিকদানি নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু তার ব্যবহার কুশ্রী বলে ঘরে রাখা হয় না, রুমালে সমস্ত কাজ চলে। আমাদের দেশের যেরকম পরিষ্কার ভাব, তাতে আমরা বরঞ্চ ঘরে একটা পিকদানি রাখতে পারি, কিন্তু জামার পকেটে এরকম একটা বীভৎস পদার্থ বহন করতে ঘৃণা হয়। কিন্তু এখানে চোখেরই আধিপত্য। রুমাল কেউ দেখতে পাবে না, তা হলেই হল। চুলটি বেশ পরিষ্কার করে আঁচড়ানো থাকবে, মুখটি ও হাত দুটি সাফ থাকবে, স্নান করবার বিশেষ দরকার নেই। এখানে জামার উপরে অন্যান্য অনেক কাপড় পরে বলে জামার সমস্তটা দেখা যায় না, খালি বুকের ও হাতের কাছে একটু বেরিয়ে থাকে। একরকম জামা আছে, তার যতটুকু বেরিয়ে থাকে ততটুকু জোড়া দেওয়া, সেটুকু খুলে ধোবার বাড়ি দেওয়া যায়; তাতে সুবিধে হচ্ছে যে ময়লা হয়ে গেলে জামা বদলাবার কোনো আবশ্যক করে না, সেই জোড়া টুকরোগুলো বদলালেই হল। এখানকার দাসীদের কোমরে এক আঁচল বাঁধা থাকে, সেইটি দিয়ে তারা না পোঁছে এমন পদার্থ নেই; খাবার কাঁচের প্লেট যে দেখছ ঝক্ ঝক্ করছে, সেটিও সেই সর্ব-পাবক-আঁচল দিয়ে মোছা হয়েছে, কিন্তু তাতে কী হানি, কিছু খারাপ দেখাচ্ছে না। এখানকার লোকেরা অপরিষ্কার নয়, আমাদের দেশে যাকে 'নোংরা' বলে তাই। এখানে পরিষ্কার ভাবের যে অভাব আমরা দেখতে পাই, সে অনেকটা শীতের জন্যে। আমরা যে-কোনো জিনিস হোক-না কেন, জল দিয়ে পরিষ্কার না হলে পরিষ্কার মনে করি নে। এখানে অত জল নিয়ে নাড়াচাড়া পোষায় না। তা ছাড়া শীতের জন্য এখানকার জিনিসপত্র শীঘ্র নোংরা হয়ে ওঠে না। এখানে শীতেও গায়ের আবরণ থাকাতে শরীর তত অপরিষ্কার হয় না। এখানে জিনিসপত্র পচে ওঠে না। এইরকম পরিষ্কারের পক্ষে নানা বিষয়ে সুবিধে। আমাদের যেমন পরিষ্কার ভাব আছে, তেমনি পরিষ্কার হওয়ার বিষয়ে অনেক ঢিলেমিও আছে। আমাদের দেশের পুষ্করিণীতে কী না ফেলে? অপরিষ্কার জলকুণ্ডে স্নান; তেল মেখে দুটো ডুব দিলেই আমরা শুচিতা কল্পনা করি। আমরা নিজের শরীর ও খাওয়া-দাওয়া সংক্রান্ত জিনিসের বিষয়ে বিশেষ পরিষ্কার থাকি, কিন্তু ঘরদুয়ার যথোচিত পরিষ্কার করি নে। এমন-কি অস্বাস্থ্যকর করে তুলি।

আমাদের দুই-একটি করে আলাপী হতে লাগল। ডাক্তার ম—একজন আধবুড়ো চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। তিনি একজন প্রকৃত ইংরেজ, ইংলন্ডের বহির্ভূত কোনো জিনিস তাঁর পছন্দসই নয়। তাঁর কাছে ক্ষুদ্র ইংলন্ডই সমস্ত পৃথিবী, তাঁর কল্পনা কখনো ডোভার প্রণালী পার হয় নি। তাঁর কল্পনার এমন অভাব যে, তিনি মনে করতে পারেন না যারা বাইবেলের দশ অনুশাসন মানে না, তাদের মিথ্যে কথা বলতে কী করে সংকোচ হতে পারে। অখৃস্ট লোকদের নীতির বিরুদ্ধে এই তাঁর প্রধান যুক্তি। যে ইংরাজ নয়, যে খৃস্টান নয়, এমন একটা অপূর্ব সৃষ্টি দেখলে তার মনুষ্যত্ব কী করে থাকতে পারে ভেবে পান না। তাঁর মটো হচ্ছে Gladly he would learn and gladly teach, কিন্তু আমি দেখলুম তাঁর লার্ন করবার ঢের আছে, কিন্তু টীচ করবার মতো সম্বল বেশি নেই। তাঁর স্বদেশীয় সাহিত্যের বিষয়ে তিনি আশ্চর্য কম জানেন; কতকগুলি মাসিক পত্রিকা পড়ে তিনি প্রতি মাসে দুই-চারিটি করে ভাসা ভাসা জ্ঞান লাভ করেন। তিনি কল্পনা করতে পারেন না এক-জন ভারতীয় কী করে এড়ুকেটেড হতে পারে। এখানকার মেয়েরা শীতকালে হাত গরম রাখবার জন্যে একরকম গোলাকার লোমশ পদার্থের মধ্যে হাত গুঁজে রাখে, তাকে মাফ্ বলে। প্রথম বিলেতে এসে সেই অপূর্ব পদার্থ যখন দেখি, তখন ডাক্তার ম—কে সে-দ্রব্যটা কী জিজ্ঞাসা করি। আমার অজ্ঞতায় তিনি আকাশ থেকে পড়লেন। এখানকার অনেক লোকের রোগ দেখেছি, তাঁরা আশা করেন, আমরা তাঁদের সমাজের প্রত্যেক ছোটোখাটো বিষয় জানব। একদিন একটা নাচে গিয়েছিলুম একজন মেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বধূটিকে (bride) তোমার কী রকম লাগছে? আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'বধূটি কে?' অতগুলি মেয়ের মধ্যে একজন নববধূ কোথায় আছেন তা আমি জানতুম না। শুনে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন, তিনি বললেন, 'তার মাথায় কমলালেবুর ফুল দেখে চিনতে পার নি?'

দুই মিস ক—র সঙ্গে আলাপ হল। তাঁরা এখানকার পাদরির মেয়ে। পাড়ার পরিবারদের দেখা-শুনো, রবিবাসরিক স্কুলে বন্দোবস্ত করা, শ্রমিকদের জন্যে টেম্পারেন্স সভা স্থাপন ও তাদের আমোদ দেবার জন্যে সেখানে গিয়ে গানবাজনা করা—এই-সকল কাজে তাঁরা দিনরাত্রি ব্যস্ত আছেন। বিদেশী বলে আমাদের তাঁরা অত্যন্ত যত্ন করতেন। নগরে কোথাও আমোদ-উৎসব হলে আমাদের খবর দিতেন, আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন, অবসর পেলে সকালে কিংবা সন্ধেবেলায় এসে আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন, ছেলেদের নিয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে গান শেখাতেন, এক-এক দিন তাঁদের সঙ্গে রাস্তায় বেড়াতে যেতুম। এইরকম আমাদের যথেষ্ট যত্ন ও আদর করতেন। বড়ো মিস ক—অত্যন্ত ভালোমানুষ ও গম্ভীর। একটা কথার উত্তর দিতে কেমন থতমত খেতেন। 'হাঁ—না—তা হবে—জানি নে' এইরকম তাঁর উত্তর। এক-এক সময় কী বলবেন, ভেবে পেতেন না, এক-এক সময় একটা কথা বলতে বলতে মাঝখানে থেমে পড়তেন, আর কথা জোগাত না, কোনো বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করলে বিব্রত হয়ে পড়তেন। যদি জিজ্ঞাসা করা যেত, 'আজ কি বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে?' তিনি বলতেন, 'কী করে বলব।' তিনি বুঝতেন না যে অভ্রান্ত বেদবাক্য শুনতে চাচ্ছি নে। তিনি আন্দাজ করতে নিতান্ত নারাজ। ছোটো মিস ক—র মতো প্রশান্ত প্রফুল্ল ভাব আর কারও দেখি নি। দেখে মনে হয় কোনো কালে তাঁর মনের কোনোখানে আঁচড় পড়ে নি। খুব ভালোমানুষ, সর্বদাই হাসিখুশি গল্প। কাপড়চোপড়ের আড়ম্বর নেই—কোনো প্রকার ভান নেই; অত্যন্ত সাদাসিদে।

ডাক্তার ম—র বাড়িতে একদিন আমাদের সান্ধ্যনিমন্ত্রণ হল। খাওয়াই এখানকার নেমন্তন্নের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় গানবাজনা আমোদপ্রমোদের জন্যই দশজনকে ডাকা। আমরা সন্ধের সময় গিয়ে হাজির হলুম। একটি ছোটো ঘরে অনেকগুলি মহিলা ও পুরুষের সমাগম হয়েছে। ঘরে প্রবেশ করে কর্তা-গিন্নিকে আমাদের সম্মান জানালুম। সমাগত লোকদের সঙ্গে যথাযোগ্য অভিবাদন সম্ভাষণ ও আলাপ হল। ঘরে জায়গার এত টানাটানি ও লোক এত বেশি যে চৌকির অত্যন্ত অভাব হয়েছিল; অধিকাংশ পুরুষে মিলে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প জুড়ে দিয়েছিলুম। নতুন কোনো অভ্যাগত মহিলা এলে গিন্নি কিংবা কর্তা তাঁর সঙ্গে আমাদের

আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন, আলাপ হবামাত্র তাঁর পাশে গিয়ে একবার বসছি কিংবা দাঁড়াচ্ছি ও দুই-একটা করে কথাবার্তা আরম্ভ করছি। প্রায় আবহাওয়া নিয়ে কথার আরম্ভ; মহিলাটি বললেন 'ড্রেডফুল ওয়েদার'। তাঁর সঙ্গে আমার নিঃসংশয়ে মতের ঐক্য হল। তার পরে তিনি অনুমান করলেন যে আমাদের পক্ষে অর্থাৎ ভারতীয়দের পক্ষে এমন ওয়েদার বিশেষ ট্রায়িং ও আশা করলেন আকাশ শীঘ্র পরিষ্কার হয়ে যাবে ইত্যাদি। তার পরে এই সূত্রে নানা কথা। সভার মধ্যে দুইজন সুন্দরী উপস্থিত ছিলেন। বলা বাহুল্য যে তাঁরা জানতেন তাঁরা সুন্দরী। এখানে সৌন্দর্যের পুজো হয়; এখানে রূপ কোনোমতে আত্মবিস্মৃত থাকতে পারে না, রূপাভিমান সুপ্ত থাকতে পারে না; চার দিক থেকে প্রশংসার কোলাহল তাকে জাগিয়ে তোলে। নাচঘরে রূপসীর দর অত্যন্ত চড়া; নাচে তাঁর সাহচর্য-সুখ পাবার জন্যে দরখাস্তের পর দরখাস্ত আসছে; তাঁর তিলমাত্র কাজ করে দেবার জন্যে বহু লোক প্রস্তুত। রূপবান পুরুষদেরও যথোচিত আদর আছে। তারা এখানকার ড্রয়িং রুমের ডার্লিং। আমি দেখছি, এ কথা শুনে তোমার এখানে আসতে লোভ হবে। তোমার মতো সুপুরুষ এখানকার মতো রূপমুগ্ধ দেশে এলে চতুর্দিকে উঠবে—

......ঘন
নিশ্বাস প্রলয়বায়ু, অশ্রুবারিধারা
আসার, জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব—

যা হোক নিমন্ত্রণ-সভায় Miss—দ্বয় রূপসীশ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু তাঁরা দু জনেই কেমন চুপচাপ গম্ভীর। বড়ো যে মেশামেশি হাসিখুশি তা ছিল না। ছোটো মিস একটা কৌচে গিয়ে হেলান দিয়ে বসলেন, আর বড়ো মিস দেয়ালের কাছে এক চৌকি অধিকার করলেন। আমরা দুই-এক জনে তাঁদের আমোদে রাখবার জন্যে নিযুক্ত হলুম। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি কথোপকথনশাস্ত্রে বিচক্ষণ নই, এখানে যাকে উজ্জ্বল বলে তা নই। গৃহকর্তা, একজন সংগীতশাস্ত্রজ্ঞতাভিমানিনী প্রৌঢ়া মহিলাকে বাজাতে অনুরোধের জন্যে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন। গৃহের মহিলাদের মধ্যে তাঁর বয়স সব চেয়ে বেশি; তিনি সব চেয়ে বেশি সাজগোজ করে এসেছিলেন, তাঁর দু হাতের দশ আঙুলে যতগুলো ধরে তত আংটি ছিল। আমি যদি নিমন্ত্রণকর্তা হতুম তা হলে তাঁর আংটির বাহুল্য দেখেই বুঝতে পারতুম যে তিনি পিয়ানো বাজাবেন বলে বাড়ি থেকে স্থিরসংকল্প হয়ে এসেছেন। তাঁর বাজনা সাঙ্গ হলে পর গৃহকর্ত্রী আমাকে গান গাবার জন্যে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলেন। আমি বড়ো মুশকিলে পড়লুম। আমি জানতুম, আমাদের দেশের গানের উপর যে তাঁদের বড়ো অনুরাগ আছে তা নয়। ভালোমানুষ হবার বিপদ এই যে নিজেকে হাস্যকরতা থেকে বাঁচানো যায় না। তাই মিস্টার টি—গান গাওয়ার ভূমিকা স্বরূপ দুই-একটি আরম্ভসূচক কাশি-ধ্বনি করলেন। সভা শান্ত হল। কোনো প্রকারে কর্তব্য পালন করলুম। সভাস্থ মহিলাদের এত হাসি পেয়েছিল যে, ভদ্রতার বাঁধ টলমল করছিল; কেউ কেউ হাসিকে কাশির রূপান্তরে পরিণত করলেন, কেউ কেউ হাত থেকে কী যেন পড়ে গেছে ভান করে ঘাড় নিচু করে হাসি লুকোতে চেষ্টা করলেন, একজন কোনো উপায় না দেখে তাঁর পার্শ্বস্থ সহচরীর পিঠের পিছনে মুখ লুকোলেন; যাঁরা কতকটা শান্ত থাকতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে চোখে চোখে টেলিগ্রাফ চলছিল। সেই সংগীত-শাস্ত্রবিশারদ প্রৌঢ়াটির মুখে এমন একটু মৃদু তাচ্ছিল্যের হাসি লেগে ছিল যে, সে দেখে শরীরের রক্ত জল হয়ে আসে। গান যখন সাঙ্গ হল তখন আমার মুখ কান লাল হয়ে উঠেছে, চার দিক থেকে একটা প্রশংসার গুঞ্জনধ্বনি উঠল, কিন্তু অত হাসির পর আমি সেটাকে কানে তুললুম না। ছোটো মিস হ—আমাকে গানটা ইংরেজিতে অনুবাদ করতে অনুরোধ করলেন, আমি অনুবাদ করলেম। গানটা হচ্ছে 'প্রেমের কথা আর বোলো না'। তিনি অনুবাদটা শুনে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের দেশে প্রেমের স্বাধীনতা আছে নাকি। কতকগুলি রোমের ভগ্নাবশেষের ফোটোগ্রাফ ছিল, সেইগুলি নিয়ে গৃহকর্ত্রী কয়েকজন অভ্যাগতকে জড়ো করে দেখাতে লাগলেন।

ডাক্তার ম—একটা টেলিফোন কিনে এনেছেন, সেইটে নিয়ে তিনি কতকগুলি লোকের কৌতূহল তৃপ্ত করছেন। পাশের ঘরে টেবিলে খাবার সাজানো। এক-এক বার গৃহকর্তা এসে এক-এক জন পুরুষের কানে কানে বলে যাচ্ছেন, মিস অথবা মিসেস অমুককে নিশিভোজনে নিয়ে যাও; তিনি গিয়ে সেই মহিলার কাছে তাঁকে খাবার ঘরে নিয়ে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করছেন ও তাঁর বাহু-গ্রহণ করে তাঁকে পাশের ঘরে আহারস্থলে নিয়ে যাচ্ছেন। এরকম সভায় সকলে মিলে এক বারে খেতে যায় না, তার কারণ তা হলে আমোদপ্রমোদের স্রোত অনেকটা বন্ধ হয়ে যায়। এইরকম একসঙ্গে পুরুষ মহিলা সকলে মিলে গানবাজনা গল্প আমোদপ্রমোদ আহারাদিতে একটা সন্ধ্যা কাটানো গেল।

এখানে মিলনের উপলক্ষ কতপ্রকার আছে, তার সংখ্যা নেই। ডিনার, বল, conversazione, চা-সভা, লন পার্টি, এক্সকার্শন, পিকনিক ইত্যাদি। থ্যাকারে বলেন, English society has this eminent advantage over all others—that is, if there be any society left in the wretched distracted old European continent—that it is above all others a dinner-giving society. অবসর পেলে এক সন্ধে বন্ধুবান্ধবদের জড়ো করে আহারাদি করা ও আমোদপ্রমোদ করে কাটানো এখানকার পরিবারের অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে। ডিনার-সভার বর্ণনা করতে বসা বাহুল্য। ডাক্তার ম—র বাড়িতে যে পার্টির কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তার সঙ্গে ডিনার পার্টির প্রভেদ কেবল দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারে (এ স্লেচ্ছদের দেশে ভক্ষণটা আবার দক্ষিণ বাম উভয় হস্তের ব্যাপার)। আমি একবার এখানকার একটি বোট-যাত্রা ও পিকনিক পার্টিতে ছিলুম। এখানকার একটি রবিবারিক সভার সভ্যেরা এই বোট-যাত্রার উদ্‌যোগী। এই সভার সভ্য এবং সভ্যারা রবিবার পালনের বিরোধী। তাই তাঁরা রবিবারে একত্র হয়ে নির্দোষ আমোদপ্রমোদ করেন। এই রবিবারিক সভার সভ্য আমাদের এক বাঙালি মিত্র ম—মহাশয় আমাদের অনুগ্রহ করে টিকিট দেন। লন্ডন থেকে রেলোয়ে করে টেমসের ধারে এক গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছলুম। গিয়ে দেখলুম টেমসে একটা প্রকাণ্ড নৌকো বাঁধা, আর প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন রবিবার-বিদ্রোহী মেয়েপুরুষে একত্র হয়েছেন। দিনটা অন্ধকার, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আর যাঁদের যাঁদের আসবার কথা ছিল, তাঁরা সকলে আসেন নি। আমার নিজের এ পার্টিতে যোগ দেবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু ম—মহাশয় নাছোড়বান্দা। আমরা অনেক ভারতবর্ষীয় একত্র হয়েছিলুম, বোধ হয় ম—মহাশয় সকলকেই সুন্দরীর লোভ দেখিয়েছিলেন, কেননা সকলেই প্রায় বাহারে সাজগোজ করে গিয়েছিলেন। অনেকেই গলায় লাল ফাঁসি বেঁধেছিলেন। ম—মহাশয় স্বয়ং তাঁর নেকটাইয়ে একটি তলবারের আকারের পিন গুঁজে এসেছিলেন। আমাদের মধ্যে একজন তাঁকে ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেশের সমস্ত টাইয়ে যে তলবারের আঘাত করা হয়েছে, ওটা কি তার বাহ্য লক্ষণ?' তিনি হেসে বললেন, 'তা নয় গো, বুকের কাছে একটা কটাক্ষের ছুরি বিঁধেছে, ওটা তারই চিহ্ন।' দেশে থাকতে বিঁধেছিল, কি এখানে, তা কিছু বললেন না। ম—মহাশয়ের হাসিতামাশার বিরাম নেই: সেদিন তিনি স্টীমারে সমস্ত লোকের সঙ্গে সমস্ত দিন ঠাট্টা ও গল্প করে কাটিয়েছিলেন। একবার তিনি মহিলাদের হাত দেখে গুনতে আরম্ভ করলেন। তখন তিনি বোটসুদ্ধ মেয়েদের এত প্রচুর পরিমাণে হাসিয়েছিলেন যে, সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর উপর আমার মনে মনে একটুখানি ঈর্ষ্যার উদ্রেক হয়েছিল। যথাসময়ে বোট ছেড়ে দিল। নদী এত ছোটো যে, আমাদের দেশের খালের কাছাকাছি পৌঁছয়। স্টীমারের মধ্যে আমাদের আলাপ-পরিচয় গল্পসল্প চলতে লাগল। একজন ইংরেজের সঙ্গে আমাদের একজন দিশি লোকের ধর্মসম্বন্ধীয় তর্ক উঠল। আমাদের সঙ্গে একজনের আলাপ হল, তিনি তাঁদের ইংরেজি সাহিত্যের কথা তুললেন, তাঁর শেলির কবিতা অত্যন্ত ভালো লাগে; সে-বিষয়ে আমার সঙ্গে তাঁর মতের মিল হল দেখে তিনি ভারি খুশি হলেন: তিনি আমাকে বিশেষ করে তাঁর বাড়ি যেতে অনুরোধ করলেন। ইনি ইংরেজি সাহিত্য ও তাঁর নিজের দেশের রাজনীতি ভালোরকম করে চর্চা করেছেন, কিন্তু যেই ভারতবর্ষের কথা উঠল, অমনি তাঁর অজ্ঞতা

বেরিয়ে পড়ল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন্ রাজার অধীনে।' আমি অবাক হয়ে বললুম, 'ব্রিটিশ গবর্মেন্টের।' তিনি বললেন, 'তা আমি জানি, কিন্তু আমি বলছি, কোন্ ভারতবর্ষীয় রাজার অব্যবহিত অধীনে।' কলকাতার বিষয়ে এঁর জ্ঞান এইরকম। তিনি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'আমার অজ্ঞতা মাপ করবেন, ভারতবর্ষের বিষয়ে আমাদের ঢের জানা উচিত ছিল, কিন্তু লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি আমি এ-বিষয়ে খুব কম জানি।' এইরকম বোটের ছাতের উপর আমাদের কথাবার্তা চলতে লাগল; আমাদের মাথার উপরে একটা কানাতের আচ্ছাদন। মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি হচ্ছে, কানাতের আচ্ছাদনে সেটা কতকটা নিবারণ করছে। যেদিকে বৃষ্টির ছাঁট পোঁচচ্ছে না, সেইদিকে মেয়েদের রেখে আর-এক পাশে এসে ছাতা খুলে দাঁড়ালুম। দেখি আমাদের দিশি বন্ধু ক—মহাশয় সেই মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। এই নিয়ে তাঁকে ঠাট্টা করাতে তিনি বার বার করে বললেন যে, বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়া ছাড়া তাঁর অন্য অভিসন্ধি ছিল না। কিন্তু কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। যা হোক সে-দিন আমরা বৃষ্টিতে তিন-চার বার করে ভিজেছি। এইরকম ভিজতে ভিজতে গম্যস্থানে গিয়ে পোঁছলেম। তখন বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু আকাশে মেঘ আছে ও জমি ভিজে। মাঠে নেবে আমাদের খাওয়াদাওয়ার কথা ছিল, আকাশের ভাবগতিক দেখে তা আর হল না। আহারের পর আমরা নৌকা থেকে নেবে বেড়াতে বেরোলেম। কোনো কোনো প্রণয়ীযুগল একটি ছোটো নৌকো নিয়ে দাঁড় বেয়ে চললেন, কেউ বা হাতে হাতে ধরে নিরিবিলি কানে কানে কথা কইতে কইতে মাঠে বেড়াতে লাগলেন। আমাদের সঙ্গে একজন ফোটোগ্রাফওআলা তার ফোটোগ্রাফের সরঞ্জাম সঙ্গে করে এনেছিল, আমরা সমস্ত দল মাঠে দাঁড়ালেম, আমাদের ছবি নেওয়া হল। সহসা ম—মহাশয়ের খেয়াল গেল যে আমরা যতগুলি কৃষ্ণমূর্তি আছি, একত্রে সকলের ছবি নেওয়া হবে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন, তাঁরা এ-প্রস্তাবে ইতস্তত করতে লাগলেন, এরকম একটা ইন্‌ভিডিয়স ডিস্টিংশন তাঁদের মনঃপূত নয়; কিন্তু ম—মহাশয় ছাড়বার পাত্র নন। অবশেষে স্টীমার লন্ডন অভিমুখে ছাড়া হল। তখন ভগবান মরীচিমালী তাঁহার সহস্র রশ্মি সংযমন পুরঃসর অস্তাচলচূড়াবলম্বী জলধরপটলশয়নে বিশ্রান্ত মস্তক বিন্যাসপূর্বক অরুণবর্ণ নিদ্রাতুর লোচন মুদ্রিত করিলেন; বিহগকুল স্ব স্ব নীড়ে প্রত্যাবর্তন করিল, গাভীবৃন্দ হাম্বারব করিতে করিতে গোপালের অনুবর্তন করিয়া গোষ্ঠাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। আমরা লন্ডনের অভিমুখে যাত্রা করলেম।

সপ্তম পত্র

এখানকার ধনী ফ্যাশনেবল মেয়েদের কথা একটু বলে নিই। তাঁদের দোরস্ত করতে হলে দিন-দুই আমাদের দিশি শাশুড়ির ও বিধবা ননদের হাতে রাখতে হয়। তাঁরা হচ্ছেন বড়োমানুষের মেয়ে কিংবা বড়োমানুষের স্ত্রী। তাঁদের চাকর আছে, কাজকর্ম করতে হয় না, একজন হাউস-কীপার আছে, সে বাড়ির সমস্ত ঘরকন্না তদারক করে, একজন নার্স আছে, সে ছেলেদের মানুষ করে, একজন গভর্নেস আছেন, তিনি ছেলেপিলেদের পড়াশুনা দেখেন ও অন্যান্য নানাবিধ বিষয়ে তদারক করেন; তবে আর পরিশ্রম করার কী রইল বলো। কেবল একটা বাকি আছে, সেটা হচ্ছে সাজসজ্জা; কিন্তু তার জন্য তাঁর লেডিজ মেড আছে, সুতরাং সেটাও সমস্তটা নিজের হাতে করতে হয় না। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত দিনটা তাঁর হাতে আস্ত পড়ে থাকে। সকালবেলায় বিছানায় পড়ে দরজাজানলা বন্ধ করে সূর্যের আলো আসতে না দিয়ে দিনটাকে কতকটা সংক্ষেপ করেন, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ব্রেকফাস্ট খান ও এগারোটার আগে শয়নগৃহ থেকে বেরোলে যথেষ্ট ভোরে উঠেছেন মনে করেন। তার পরে সাজসজ্জা; সে-বিষয়ে তোমাকে কোনো প্রকার খবর দিতে পারছি নে। শোনা যায় খুব সম্প্রতি বিলেতে স্নানটা ফ্যাশন হয়েছে কিন্তু এখনো এটা খুব কম দূর ব্যাপ্ত।

সীমন্তিনীরা হাতের যতটুকু বেরিয়ে থাকে—মুখটি ও গলাটি—দিনের মধ্যে অনেকবার অতি যত্নে ধুয়ে থাকেন; বাকি অঙ্গ পরিষ্কার করবার তাঁরা তত আবশ্যক দেখেন না; কেননা মনো-হরণের প্রধান সিঁধ মুখটিতে কোনো প্রকার মরচে না পড়লেই হল। মাসে দু-বার একটা স্পঞ্জ-বাথ নিলেই তাঁরা যথেষ্ট মনে করেন। আমি কোনো ইংরেজ পরিবারের মধ্যে বাস করতে গিয়েছিলেম, আমি স্নান করি শুনে তাঁরা বিপন্ন হয়েছিলেন। কোনো প্রকার স্নানের সরঞ্জাম ছিল না, সেজন্যে অগভীর একটা গোল জলাধার ধার করে আনতে হয়েছিল। বাড়িতে লোক দেখা করতে এলে তাদের সঙ্গে আলাপচারি করা গৃহিণীর কাজ, অনেক লোক একসঙ্গে এলে তাঁর কর্তব্য হচ্ছে তাঁর বাক্য ও হাসির অমৃত সকলকে সমানভাবে বিতরণ করা, বিশেষ কারও সঙ্গে বেশি কথা কওয়া বা বিশেষ কাউকে বেশি যত্ন করাটা উচিত নয়। এ কাজটা অত্যন্ত দুরূহ, বোধ হয় অনেক অভ্যেসে দুরস্ত হয়। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি তাঁরা একজনের মুখের দিকে চেয়ে একটা কথা কন, তার পরে শেষ করেই সকলের দিকে চেয়ে একবার হাসেন, কখনো বা তাঁরা একজনের মুখের দিকে চেয়ে একটা কথা আরম্ভ করেন, তার পর বলতে বলতে এক-এক বার করে সকলের মুখের দিকে চেয়ে নেন, কখনো বা, তাস খেলবার সময় যেরকম করে চটপট তাস বিতরণ করে, তেমনি তাঁরা আগন্তুকদের একে একে করে একটি একটি কথার টুকরো ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেন, এমন তাড়াতাড়ি ও এমন দক্ষতার সঙ্গে যে, তাঁদের হাতে যে অনেক কথার তাস গোছানো রয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। একজনকে বললেন, 'Lovely morning, isn't it?' তার পরেই তাড়াতাড়ি আর-এক জনের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'কাল রাত্তিরে সংগীতশালায় মাডাম নীল্‌সন গান করেছিলেন, it was exquisite!' যতগুলি মহিলা ভিজিটর বসেছিলেন সকলে ঐ কথায় এক-একটা বিশেষণ যোগ করতে লাগলেন; একজন বললেন, 'charming,' একজন বললেন, 'superb,' একজন বললেন, 'something unearthly,' আর-এক জন বাকি ছিলেন, তিনি বললেন, 'Isn't it?' আমার বোধ হয়, এ একরকম সকালবেলা উঠে কথোপকথনের মুগুর ভাঁজা। যা হোক এইরকম মাঝে মাঝে ভিজিটর আনাগোনা করছে। মুডীজ লাইব্রেরিতে তিনি চাঁদা দিয়ে থাকেন। সেখান থেকে অনবরত ক্ষণজীবী নভেলগুলো তাঁর ওখানে যাতায়াত করে। সেগুলো অনবরত গলাধঃকরণ করেন। তা ছাড়া আছে ভালোবাসার অভিনয়। মিষ্টি হাসি ও মিষ্টি কথার আদান-প্রদান, অলীক ছুতো নিয়ে একটু অলীক অভিমান, হয়তো পুরুষ-পক্ষ থেকে একটু রসিকতা, অপর পক্ষে উদ্যত ক্ষুদ্র মুষ্টি সহযোগে সুমধুর লাঞ্ছনা, 'Oh you naughty, wicked, provoking man!' তাতে নটি ম্যান-এর পরিপূর্ণ তৃপ্তি। এইরকম ভিজিটর অভ্যর্থনা, ভিজিট প্রত্যর্পণ, নতুন নভেল পড়া, নতুন ফ্যাশন সৃষ্টি ও নতুন ফ্যাশনের অনুবর্তন করা, এবং তার সঙ্গে মধুর রস যোগ করে ফ্লার্ট এবং হয়তো 'লাভ' করা তাঁদের দিনকৃত্য। আমাদের দেশে যেমন ছেলেবেলা থেকে মেয়েদের বিয়ের জন্যে প্রস্তুত করে, যথেষ্ট লেখাপড়া শেখায় না, কেননা মেয়েদের আপিসে যেতে হবে না; এখানেও তেমনি মাগ্‌গি দরে বিকোবার জন্যে মেয়েদের ছেলেবলা থেকে পালিশ করতে থাকে, বিয়ের জন্যে যতটুকু লেখাপড়া শেখা দরকার ততটুকু যথেষ্ট। একটু গান গাওয়া, একটু পিয়ানো বাজানো, ভালো করে নাচা, খানিকটা ফরাসি ভাষা বিকৃত উচ্চারণ, একটু বোনা ও সেলাই করা জানলে একটি মেয়েকে বিয়ের দোকানের জানলায় সাজিয়ে রাখবার উপযুক্ত রঙচঙে পুতুল গড়ে তোলা যায়। এ-বিষয়ে একটা দিশি পুতুল ও একটা বিলিতি পুতুলের যতটুকু তফাত, আমাদের দেশের ও এদেশের মেয়েদের মধ্যে ততটুকু তফাত মাত্র। আমাদের দিশি মেয়েদের পিয়ানো ও অন্যান্য টুকিটাকি শেখবার দরকার করে না, বিলিতি মেয়েদেরও অল্পস্বল্প লেখাপড়া শিখতে হয়, কিন্তু দুই-ই দোকানে বিক্রি হবার জন্যে তৈরি। এখানেও পুরুষেরাই হর্তাকর্তা, স্ত্রীরা তাদের অনুগতা; স্ত্রীকে আদেশ করা, স্ত্রীর মনে লাগাম লাগিয়ে নিজের ইচ্ছেমত চালিয়ে বেড়ানো স্বামীরা ঈশ্বরনির্দিষ্ট অধিকার মনে করেন। ফ্যাশনী মেয়ে ছাড়া বিলেতে আরও অনেকরকম মেয়ে আছে, নইলে সংসার চলত না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ

মেয়েদের অনেকটা মেহনত করতে হয়, বাবুয়ানা করলে চলে না। সকালে উঠে একবার রান্নাঘর তদারক করতে হয়, সে-ঘর পরিষ্কার আছে কি না, জিনিসপত্র যথাপরিমিত আনা হয়েছে কি না, যথাস্থানে রাখা হয়েছে কি না ইত্যাদি দেখাশুনো করা; রান্না ও খাবার জিনিস আনতে হুকুম দেওয়া, পয়সা বাঁচাবার জন্যে নানা প্রকার গিন্নিপনার চাতুরী খেলা, কালকের মাংসের হাড়গোড় কিছু যদি অবশিষ্ট থাকে তা হলে বন্দোবস্ত করে তার থেকে আজকের সূপ চালিয়ে নেওয়া, পরশু দিনকার বাসি রাঁধা মাংস যদি খাওয়া-দাওয়ার পর খানিকটা বাকি থাকে তা হলে সেটাকে রূপান্তরিত করে আজকের টেবিলে আনবার সুবিধে করে দেওয়া, এইরকম নানা প্রকার গৃহিণীপনা। তার পর ছেলেদের জন্য মোজা কাপড়-চোপড়, এমন-কি নিজেরও অনেক কাপড় নিজে তৈরি করেন। এঁদের সকলের ভাগ্যে নভেল পড়া ঘটে ওঠে না; বড়োজোর খবরের কাগজ পড়েন, তাও সকলে পড়েন না দেখেছি; অনেকের পড়াশুনোর মধ্যে কেবল চিঠি পড়া ও চিঠি লেখা, দোকানদারদের বিল পড়া ও হিসাব লেখা। তাঁরা বলেন, 'পলিটিক্স এবং অন্যান্য গ্রাম্ভারি বিষয় নিয়ে পুরুষরা নাড়াচাড়া করুন; আমাদের কর্তব্য কাজ স্বতন্ত্র।' দুর্বলতা মেয়েদের একটা গর্বের বিষয়; সুতরাং অনেক মেয়ে শ্রান্ত না হলেও এলিয়ে পড়েন। বুদ্ধি-বিদ্যার বিষয়েও এইরকম; মেয়েরা জাঁক করে বলেন, 'আমরা বাপু ও-সব বুঝিসুঝি নে।' বিদ্যার অভাব, বুদ্ধির খর্বতা একটা প্রকাশ্য জাঁকের বিষয় হয়ে ওঠে। এখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েরা বিদ্যাচর্চার দিকে ততটা মনোযোগ দেন না, তাঁদের স্বামীরাও তার জন্যে বড়ো দুঃখিত নন, তাঁদের জীবন হচ্ছে কতকগুলি ছোটোখাটো কাজের সমষ্টি। সন্ধেবেলায় স্বামী কর্মক্ষেত্র থেকে এলে একটি আদরের চুম্বন উপার্জন করেন; (পরিবার-বিশেষে যে তার অন্যথা হয় তা বলাই বাহুল্য) ঘরে তাঁর জন্যে আগুন জ্বালানো, খাবার সাজানো আছে। সন্ধেবেলায় স্ত্রী হয়তো একটা সেলাই নিয়ে বসলেন, স্বামী তাঁকে একটি নভেল চেঁচিয়ে পড়ে শোনাতে লাগলেন, সুমুখে আগুন জ্বলছে, ঘরটি বেশ গরম, বাইরে পড়ছে বৃষ্টি, জানলা-দরজাগুলি বন্ধ। হয়তো স্ত্রী পিয়ানো বাজিয়ে স্বামীকে খানিকটা গান শোনালেন। এখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গিন্নিরা সাদাসিদে। যদিও তাঁরা ভালো করে লেখাপড়া শেখেন নি, তবু তাঁরা অনেক বিষয় জানেন, এবং তাঁদের বুদ্ধি যথেষ্ট পরিষ্কার। এ দেশে কথায়-বার্তায় জ্ঞানলাভ করা যায়, তাঁরা অন্তঃপুরে বন্ধ নন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলাপ করেন, আত্মীয়-সভায় একটা কোনো উচ্চ বিষয় নিয়ে চর্চা হলে তাঁরা শোনেন ও নিজের বক্তব্য বলতে পারেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা একটা বিষয়ের কত দিক দেখেন ও কী রকম চক্ষে দেখেন তা বুঝতে পারেন। সুতরাং একটা কথা উঠলে কতকগুলো ছেলেমানুষি আকাশ-থেকে-পড়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন না ও তাঁকে হাঁ করে থাকতে হয় না। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খুব সহজভাবে গল্পসল্প করতে পারেন, নিমন্ত্রণসভায় মুখ ভার করে বা লজ্জায় অবসন্ন হয়ে থাকেন না, পরিচিতদের সঙ্গে অন্যায় ঘেঁষাঘেঁষি নেই, কিংবা তাদের কাছ থেকে নিতান্ত অসামাজিক ভাবে দূরেও থাকেন না। লোকসমাজে মুখটি খুব হাসিখুশি, প্রসন্ন; যদিও নিজে খুব রসিকা নন, কিন্তু হাসিতামাশা বেশ উপভোগ করতে পারেন, একটা-কিছু ভালো লাগলে মন খুলে প্রশংসা করেন, একটা-কিছু মজার কথা শুনলে প্রাণ খুলে হাস্য করেন।

আমি দিনকতক আমার শিক্ষকের পরিবারের মধ্যে বাস করেছিলুম। সে বড়ো অদ্ভুত পরিবার। মিস্টার ব— মধ্যবিত্ত লোক। তিনি লাটিন ও গ্রীক খুব ভালোরকম জানেন। তাঁর ছেলেপিলে কেউ নেই; তিনি, তাঁর স্ত্রী, আমি, আর একজন দাসী, এই চারজন মাত্র একটি বাড়িতে থাকতুম। কর্তা আধবুড়ো লোক, অত্যন্ত অন্ধকার মূর্তি, দিনরাত খুঁতখুঁত খিট্‌খিট্‌ করেন, নীচের তলায় রান্নাঘরের পাশে একটি ছোট্ট জানলাওয়ালা দরজা-বন্ধ অন্ধকার ঘরে থাকেন। একে তো সূর্যকিরণ সে ঘরে সহজেই প্রবেশ করতে পারে না, তাতে জানলার উপরে একদা পর্দা ফেলা, চার দিকে পুরোনো ছেঁড়া ধুলোমাখা নানা প্রকার আকারের ভীষণদর্শন গ্রীক-

লাটিন বইয়ে দেয়াল ঢাকা, ঘরে প্রবেশ করলে একরকম বন্ধ হাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠতে হয়। এই ঘরটা হচ্ছে তাঁর স্টাডি, এইখানে তিনি পড়েন ও পড়ান। তাঁর মুখ সর্বদাই বিরক্ত। আঁট বুটজুতো পরতে বিলম্ব হচ্ছে, বুটজুতোর উপর চটে ওঠেন; যেতে যেতে দেয়ালের পেরেকে তাঁর পকেট আটকে যায়, রেগে ভুরু কুঁকড়ে ঠোঁট নাড়তে থাকেন। তিনি যেমন খুঁতখুঁতে মানুষ, তাঁর পক্ষে তেমনি খুঁতখুঁতের কারণ প্রতি পদে জোটে। আসতে যেতে হুঁচট খান, অনেক টানাটানিতে তাঁর দেরাজ খোলে না, যদি বা খোলে তবু যে-জিনিস খুঁজছিলেন তা পান না। এক-এক দিন সকালে তাঁর স্টাডিতে এসে দেখি, তিনি অকারণে বসে বসে ভ্রূকুটি করে উঁ আঁ করছেন, ঘরে একটি লোক নেই। কিন্তু ব— আসলে ভালোমানুষ— তিনি খুঁতখুঁতে বটে, রাগী নন; খিট্‌খিট্‌ করেন, কিন্তু ঝগড়া করেন না। নিদেন তিনি মানুষের উপর রাগ প্রকাশ করেন না, টাইনি বলে তাঁর একটা কুকুর আছে তার উপরেই তাঁর আক্রোশ। সে একটু নড়লে চড়লে তাকে ধমকাতে থাকেন, আর দিনরাত তাকে লাথিয়ে লাথিয়ে একাকার করেন। তাঁকে আমি প্রায় হাসতে দেখি নি। তাঁর কাপড়চোপড় ছেঁড়া অপরিষ্কার। মানুষটা এইরকম। তিনি এককালে পাদরি ছিলেন; আমি নিশ্চয় বলতে পারি, প্রতি রবিবারে তাঁর বক্তৃতায় তিনি শ্রোতাদের নরকের বিভীষিকা দেখাতেন। তাঁর এত কাজের ভিড়, এত লোককে পড়াতে হত যে, এক-এক দিন তিনি ডিনার খেতে অবকাশ পেতেন না। এক-এক দিন তিনি বিছানা থেকে উঠে অবধি রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাকতেন। এমন অবস্থায় খিটখিটে হয়ে ওঠা কিছু আশ্চর্য নয়। গৃহিণী খুব ভালোমানুষ, রাগী উদ্ধত নন, এককালে বোধ হয় ভালো দেখতে ছিলেন, যত বয়স তার চেয়ে তাঁকে বড়ো দেখায়, চোখে চশমা, সাজগোজের বড়ো আড়ম্বর নেই। নিজে রাঁধেন, বাড়ির কাজকর্ম করেন, ছেলেপিলে নেই, সুতরাং কাজকর্ম বড়ো বেশি নয়। আমাকে খুব যত্ন করতেন। খুব অল্প দিনেতেই বোঝা যায় যে, দম্পতির মধ্যে বড়ো ভালোবাসা নেই, কিন্তু তাই বলে যে দুজনের মধ্যে খুব বিরোধ ঘটে তাও নয়, অনেকটা নিঃশব্দে সংসার চলে যাচ্ছে। মিসেস ব— কখনো স্বামীর স্টাডিতে যান না; সমস্ত দিনের মধ্যে খাবার সময় ছাড়া দুজনের মধ্যে দেখাশুনা হয় না, খাবার সময়ে দুজনে চুপচাপ বসে থাকেন। খেতে খেতে আমার সঙ্গে গল্প করেন, কিন্তু দুজনে পরস্পর গল্প করেন না। ব—র আলুর দরকার হয়েছে, তিনি চাপা গলায় মিসেসকে বললেন, 'some potatoes' (please কথাটা বললেন না কিংবা শোনা গেল না)। মিসেস ব— বলে উঠলেন 'I wish you were a little more polite'। ব— বললেন I did say 'please'; মিসেস ব— বললেন 'I did not hear it'; ব— বললেন 'it was no fault of mine'। এইখানেই দুই পক্ষ চুপ করে রইলেন। মাঝে থেকে আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুতে পড়ে যেতেম। একদিন আমি ডিনারে যেতে একটু দেরি করেছিলেম, গিয়ে দেখি, মিসেস ব—, ব—কে ধমকাচ্ছেন, অপরাধের মধ্যে তিনি মাংসের সঙ্গে একটু বেশি আলু নিয়েছিলেন। আমাকে দেখে মিসেস ক্ষান্ত হলেন, মিস্টার সাহস পেয়ে শোধ তোলবার জন্যে দ্বিগুণ করে আলু নিতে লাগলেন, মিসেস তাঁর দিকে নিরুপায় মর্মভেদী কটাক্ষপাত করলেন। দুই পক্ষই দুই পক্ষকে যথারীতি ডিয়ার ডার্লিং বলে ভুলেও সম্বোধন করেন না, কিংবা কারও ক্রিশ্চান নাম ধরে ডাকেন না, পরস্পর পরস্পরকে মিস্টার ব— ও মিসেস ব— বলে ডাকেন। আমার সঙ্গে মিসেস হয়তো বেশ কথাবার্তা কচ্ছেন, এমন সময় মিস্টার এলেন, অমনি সমস্ত চুপচাপ। দুই পক্ষেই এইরকম। একদিন মিসেস আমাকে পিয়ানো শোনাচ্ছেন, এমন সময় মিস্টার এসে উপস্থিত; বললেন, 'When are you going to stop?' মিসেস বললেন, 'I thought you had gone out!' পিয়ানো থামল। তার পরে আমি যখন পিয়ানো শুনতে চাইতেম মিসেস বলতেন, 'that horrid man যখন বাড়িতে না থাকবেন তখন শোনাব,' আমি ভারি অপ্রস্তুতে পড়ে যেতুম। দুজনে এইরকম অমিল অথচ সংসার বেশ চলে যাচ্ছে। মিসেস রাঁধছেন বাড়ছেন, কাজকর্ম করছেন, মিস্টার রোজগার করে টাকা এনে দিচ্ছেন; দুজনে কখনো প্রকৃত ঝগড়া হয় না, কেবল কখনো কখনো দুই-এক বার দুই-একটা কথা-কাটাকাটি হয়, তা এত মৃদুস্বরে

যে পাশের ঘরের লোকের কানে পর্যন্ত পৌঁছয় না। যা হোক আমি সেখানে দিনকতক থেকে বিব্রত হয়ে সে অশান্তির মধ্যে থেকে চলে এসে বেঁচেছি।

অষ্টম পত্র

আমরা এখন লন্ডন ত্যাগ করে এসেছি। লন্ডনের জনসমুদ্রে জোয়ারভাঁটা খেলে তা জান? বসন্তের আরম্ভ থেকে গরমির কিছুদিন পর্যন্ত লন্ডনের জোয়ার-ঋতু। এই সময়ে লন্ডন উৎসবে পূর্ণ থাকে— থিয়েটার, নাচগান, প্রকাশ্য ও পারিবারিক 'বল', আমোদপ্রমোদে ঘেঁষাঘেঁষি ঠেসাঠেসি। ধনী লোকদের বিলাসিনী মেয়েরা রাতকে দিন করে তোলে। আজ তাদের নাচে নেমন্তন্ন, কাল ডিনারে, পরশু থিয়েটর, তরশু রাত্তিরে ম্যাডাম পার্টির গান, দিনের চেয়ে রাত্তিরের ব্যস্ততা বেশি। সুকুমারী মহিলা, যাঁদের তিলমাত্র শ্রম লাঘবের জন্যে শত শত ভক্ত সেবকের দল দিনরাত্রি প্রাণপণ করছেন— চৌকিটা সরিয়ে দেওয়া, প্লেটটা এগিয়ে দেওয়া, দরজাটা খুলে দেওয়া, মাংসটা কেটে দেওয়া, পাখাটা কুড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি— তাঁরা রাত্তিরের পর রাত্তির ন-টা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত গ্যাসের ও মানুষের নিশ্বাসে গরম ঘরের মধ্যে অবিশ্রান্ত নৃত্যে রত; সে আবার আমাদের দেশের অলস নড়েচলে বেড়ানো বাইনাচের মতো নয়, অনবরত ঘুরপাক। ললিতা রমণীরা কী করে টিঁকে থাকেন, আমি তাই ভাবি। এই তো গেল আমোদপ্রমোদ, তা ছাড়া এই সময়ে পার্লামেন্টের অধিবেশন। ব্যান্ডের একতান স্বর, নাচের পদশব্দ, ডিনার-টেবিলের হাস্যালাপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র একটা পোলিটিকাল উত্তেজনা। স্থিতিশীল ও গতিশীল দলভুক্তরা প্রতি রাত্রের পার্লামেন্টের রাজনৈতিক মল্লযুদ্ধের বিবরণ কী আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা করতে থাকে। সীজ্‌নের সময় লন্ডনে এইরকম আলোড়ন। তার পরে আবার ভাঁটা পড়তে আরম্ভ হয়, লন্ডনের কৃষ্ণপক্ষ আসে। তখন আমোদ-কোলাহল বন্ধ হয়ে যায়, বাকি থাকে অল্পস্বল্প লোক, যাদের শক্তি নেই, বা দরকার আছে, বা বাইরে যাবার ইচ্ছে নেই। সেই সময়ে লন্ডন থেকে চলে যাওয়া একটা ফ্যাশন। আমি একটা বইয়ে (*Sketches and Travels in London* : Thackeray) পড়েছিলুম, এই সময়টাতে অনেকে যারা নগরে থাকে তারা বাড়ির সম্মুখে দরজা জানলা সব বন্ধ করে বাড়ির পিছন দিকের ঘরে লুকিয়ে-চুরিয়ে বাস করে। দেখাতে চায় তারা লন্ডন ছেড়ে চলে গেছে। সাউথ কেনসিংটন বাগানে যাও; ফিতে, টুপি, পালক, রেশম, পশম ও গাল-রঙ-করা মুখের সমষ্টি চোখ ঝলসে প্রজাপতির ঝাঁকের মতো বাগান আলো করে বেড়াচ্ছে না; বাগান তেমনি সবুজ আছে, সেখানে তেমনি ফুল ফুটেছে, কিন্তু তার সজীব শ্রী নেই। গাড়ি ঘোড়া লোকজনের হিজিবিজি ঘুচে গিয়ে লন্ডনটা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

সম্প্রতি লন্ডনের সীজ্‌ন অতীত, আমরাও লন্ডন ছেড়ে টন্‌ব্রিজ ওয়েল্‌স বলে একটা আধা-পাড়াগেঁয়ে জায়গায় এসেছি। অনেক দিনের পর হালকা বাতাস খেয়ে বাঁচা গেল। হাজার হাজার চিমনি থেকে অবিশ্রান্ত পাথুরে কয়লার ধোঁয়া ও কয়লার গুঁড়ো উড়ে উড়ে লন্ডনের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করেছে। রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাত ধুলে সে হাত-ধোয়া জলে বোধ করি কালির কাজ করা যায়। নিশ্বাসের সঙ্গে অবিশ্রান্ত কয়লার গুঁড়ো টেনে মগজটা বোধ হয় অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ হয়ে দাঁড়ায়। টন্‌ব্রিজ ওয়েল্‌স অনেক দিন থেকে তার লৌহপদার্থমিশ্রিত উৎসের জন্যে বিখ্যাত। এই উৎসের জল খাবার জন্যে এখানে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। উৎস শুনেই আমরা কল্পনা করলেম— না জানি কী সুন্দর দৃশ্য হবে; চারি দিকে পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, সারসমরালকুল-কূজিত, কমলকুমুদকহ্লার-বিকশিত সরোবর, কোকিল-কূজন, মলয়-বীজন, ভ্রমর-গুঞ্জন ও অবশেষে এই মনোরম স্থানে পঞ্চশরের প্রহার ও এক ঘটি জল খেয়ে বাড়ি ফিরে আসা। গিয়ে দেখি, একটা হাটের মধ্যে একটা ছোটো গর্ত পাথর দিয়ে বাঁধানো, সেখানে একটু একটু করে জল উঠছে,

একটা বুড়ি কাঁচের গেলাস হাতে দাঁড়িয়ে। এক-এক পেনি নিয়ে এক-এক গেলাস জল বিতরণ করছে ও অবসরমত একটা খবরের কাগজে গতরাত্রের পার্লামেন্টের সংবাদ পড়ছে। চার দিকে দোকানবাজার; গাছপালার কোনো সম্পর্ক নেই; সম্মুখেই একটা কসাইয়ের দোকান, সেখানে নানা চতুষ্পদের ও 'হংসমরালকুল'এর ডানা ছাড়ানো মৃতদেহ দড়িতে ঝুলছে; এই-সব দেখে আমার মন এমন চটে উঠল যে, কোনোমতে বিশ্বাস হল না যে, এ জলে কোনো প্রকার রোগ নিবারণ বা শরীরের উন্নতি হতে পারে।

টন্‌ব্রিজ ওয়েল্‌স শহরটা খুব ছোটো, দু-পা বেরোলেই গাছপালা মাঠ দেখতে পাওয়া যায়। বাড়িগুলো লন্ডনের মতো থামবারান্দাশূন্য, ঢালু ছাতওআলা সারি সারি একঘেয়ে ভাবে দাঁড়িয়ে; অত্যন্ত শ্রীহীন দেখতে। দোকানগুলো তেমনি সুসজ্জিত, পরিপাটি, কাঁচের জানলা দেওয়া। কাঁচের ভিতর থেকে সাজানো পণ্যদ্রব্য দেখা যাচ্ছে; কসাইয়ের দোকানে কোনো প্রকার কাঁচের আবরণ নেই, চতুষ্পদের আস্ত আস্ত পা ঝুলছে— ভেড়া, গোরু, শুওর, বাছুরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নানা-প্রকার ভাবে চোখের সামনে টাঙিয়ে রাখা, হাঁস প্রভৃতি নানা প্রকার মরা পাখি লম্বা লম্বা গলাগুলো নীচের দিকে ঝুলিয়ে আছে, আর খুব একটা জোয়ান পেটমোটা ব্যক্তি হাতে একটা প্রকাণ্ড ছুরি নিয়ে কোমরে একটা আঁচলা ঝুলিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

বিলেতের ভেড়াগোরুগুলো তাদের মোটাসোটা মাংসচর্বিওআলা শরীরের ও সুস্বাদের জন্য বিখ্যাত, যদি কোনো মানুষ-খেগো সভ্য জাত থাকত, তা হলে বোধ হয় বিলেতের কসাইগুলো তাদের হাটে অত্যন্ত মাগ্‌গি দামে বিকোত। একজন মেমসাহেব বলেন যে, কসাইয়ের দোকান দেখলে তাঁর অত্যন্ত তৃপ্তি হয়; মনে আশ্বাস হয়, দেশে আহারের অপ্রতুল নেই, দেশের পেট ভরবার মতো খাবার প্রচুর আছে, দুর্ভিক্ষের কোনো সম্ভাবনা নেই। ইংরেজদের খাবার টেবিলে যেরকম আকারে মাংস এনে দেওয়া হয়, সেটা আমার কাছে দুঃখজনক। কেটে-কুটে মসলা দিয়ে মাংস তৈরি করে আনলে একরকম ভুলে যাওয়া যায় যে একটা সত্যিকার জন্তু খেতে বসেছি; কিন্তু মুখ-পা বিশিষ্ট আস্ত প্রাণীকে অবিকৃত আকারে টেবিলে এনে দিলে একটা মৃতদেহ খেতে বসেছি বলে গা কেমন করতে থাকে।

নাপিতের দোকানের জানলায় নানা প্রকার কাঠের মাথায় নানা প্রকার কোঁকড়ানো পরচুলো বসানো রয়েছে, দাড়িগোঁফ ঝুলছে, মার্কামারা শিশিতে টাকনাশক চুল-উঠে-যাওয়া-নিবারক অব্যর্থ ওষুধ রয়েছে; দীর্ঘকেশী মহিলারা এই দোকানে গেলে সেবকেরা (সেবিকা নয়) তাঁদের মাথা ধুয়ে দেবে, চুল বেঁধে দেবে, চুল কুঁকড়ে দেবে। এখানে মদের দোকানগুলোই সব চেয়ে জমকালো, সন্ধের সময় সেগুলো আলোয় আকীর্ণ হয়ে যায়, বাড়িগুলো প্রায় প্রকাণ্ড হয়, ভিতরটা খুব বড়ো ও সাজানো, খদ্দেরের ঝাঁক দোকানের বাইরে ও ভিতরে সর্বদাই, বিশেষত সন্ধেবেলায় লেগে থাকে। দরজির দোকানও মন্দ নয়। নানা ফ্যাশনের সাজসজ্জা কাঁচের জানলার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে, বড়ো বড়ো কাঠের মূর্তিকে কাপড় পরিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে; মেয়েদের কাপড়চোপড় একদিকে ঝোলানো; এইখানে কত লুব্ধ নেত্র দিনরাত্রি তাকিয়ে আছে তার সংখ্যা নেই। এখানকার বিলাসিনীরা, যাদের নতুন ফ্যাশনের দামি কাপড় কেনবার টাকা নেই, তারা দোকানে এসে কাপড়-গুলো ভালো করে দেখে যায়, তার পরে বাড়িতে গিয়ে সস্তায় নিজের হাতে তৈরি করে।

আমাদের বাড়ির কাছে একটা খোলা পাহাড়ে জায়গা আছে; সেটা কমন অর্থাৎ সরকারি জায়গা; চারি দিক খোলা, বড়ো গাছ খুব অল্প; ছোটো ছোটো গুল্মের ঝোপ ও ঘাসে পূর্ণ, চারি দিক সবুজ, বিচিত্র গাছপালা নেই বলে কেমন ধু ধু করছে, কেমন বিধবার মতো চেহারা। উঁচুনিচু জমি, কাঁটাগাছের ঝোপঝাপ, জায়গাটা আমার খুব ভালো লাগে। মাঝে মাঝে এইরকম কাঁটা-খোঁচা এবড়ো-খেবড়োর মধ্যে এক-এক জায়গায় ব্লু-বেল্‌স্‌ নামক ছোটো ছোটো ফুল ঘেঁষা-ঘেঁষি ফুটে সবুজের মধ্যে স্তূপাকার নীল রঙ ছড়িয়ে রেখেছে, কোথাও বা ঘাসের মধ্যে রাশ রাশ সাদা ডেজি ও হলদে বাটার্‌-কাপ অজস্র সৌন্দর্যে প্রকাশিত। ঝোপঝাপের মাঝে মাঝে এবং গাছের

তলায় এক-একটা বেঞ্চি পাতা। এইটে সাধারণের বেড়াবার জায়গা। এখানে মানুষ এত অল্প ও জায়গা এত বেশি যে ঘেঁষাঘেঁষি নেই। লন্ডনের বড়ো বড়ো বেড়াবার বাগানের মতো চার দিকেই ছাতা-হস্তক, টুপি-মস্তক, চোখ-ধাঁধক ভিড়ের আনাগোনা নেই; দূর-দূর বেঞ্চির মধ্যে নিরালা যুগলমূর্তি রোদ্দুরে এক ছাতার ছায়ায় আসীন; কিংবা তারা হাত ধরাধরি করে নিরিবিলি বেড়াচ্ছে। সবসুদ্ধ জড়িয়ে জায়গাটা উপভোগ্য। এখনো গরমিকাল শেষ হয় নি। এখানে গরমিকালে সকাল ও সন্ধে অত্যন্ত সুন্দর। গরমির পূর্ণযৌবনের সময় রাত দুটো-তিনটের পরে আলো দেখা দিতে আরম্ভ করে, চারটের সময় রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে ও রাত্রি ন-টা দশটার আগে দিনের আলো নেবে না। আমি একদিন পাঁচটার সময় উঠে কমন-এ বেড়াতে গিয়েছিলুম। পাহাড়ের উপর একটা গাছের তলায় গিয়ে বসলুম, দূরে ছবির মতো ঘুমন্ত শহর, একটুও কুয়াশা নেই। নির্জন রাস্তাগুলি, গির্জের উন্নত চূড়া, রৌদ্ররঞ্জিত বাড়িগুলি নীল আকাশের পটে যেন একটি কাঠে খোদাই করা ছবির মতো আঁকা। আসলে এই শহরটা কিছুই ভালো দেখতে নয়; এখানকার বাড়িগুলোতে জানলা-কাটা-কাটা চারটে দেয়াল, একটা ঢালু ছাদ ও তার উপরে ধোঁয়া বেরোবার কতকগুলি কুশ্রী নল। ক্রমে ক্রমে যতই বেলা হতে লাগল শত শত চিমনি থেকে অমনি ধোঁয়া বেরোতে লাগল, ধোঁয়াতে ক্রমে শহরটা অস্পষ্ট হয়ে এল, রাস্তায় ক্রমে মানুষ দেখা দিল, গাড়িঘোড়া ছুটতে আরম্ভ হল, হাতগাড়ি কিংবা ঘোড়ার গাড়িতে করে দোকানিরা মাংস রুটি তরকারি বাড়ি বাড়ি বিতরণ করে বেড়াতে লাগল (এখানে দোকানিরা বাড়িতে বাড়িতে জিনিসপত্র দিয়ে আসে), ক্রমে কমন-এ লোক জমতে শুরু হল, আমি বাড়ি ফিরে এলেম।

এখানে আমার একটি শখের বেড়াবার জায়গা আছে। গাড়ির চাকার দাগে এবড়ো-খেবড়ো উঁচুনিচু পাহাড়ে রাস্তা, দুধারে ব্ল্যাকবেরী ও ঘন লতা-গুল্মের বেড়া, বড়ো বড়ো গাছে ছায়া করে আছে, রাস্তার আশেপাশে ঘাস ও ঘাসের মধ্যে ডেজি প্রভৃতি বুনো ফুল। শ্রমজীবীরা ধুলোকাদা-মাখানো ময়লা কোট-প্যান্টলুন ও ময়লা মুখ নিয়ে আনাগোনা করছে, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে লাল লাল ফুলো ফুলো মুখে বাড়ির দরজার বাইরে কিংবা রাস্তায় খেলা করছে—এমন মোটাসোটা গোলগাল ছেলে কোনো দেশে দেখি নি। এক-একটা বাড়ির কাছে ছোটো ছোটো পুকুরের মতো, সেখানে পোষা হাঁসগুলো ভাসছে। মাঠগুলো যদিও পাহাড়ে, উঁচুনিচু. কিন্তু চষা জমি সমতল ও পরিষ্কার। ঘাসগুলো অত্যন্ত সবুজ ও তাজা, এখানে রৌদ্র তীব্র নয় বলে ঘাসের রঙ আমাদের দেশের মতন জ্বলে যায় না, তাই এখানকার মাঠের দিকে চেয়ে থাকতে অত্যন্ত ভালো লাগে, অজস্র স্নিগ্ধ সবুজ রঙে চোখ যেন ডুবে যায়। মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো গাছ ও সাদা সাদা বাড়িগুলো দূর থেকে ছোটো ছোটো দেখাচ্ছে। এইরকম শূন্য মাঠ ছাড়িয়ে অনেক দূরে এসে এক-একটা প্রকাণ্ড পাইন গাছের অরণ্য পাওয়া যায়, ঘেঁষাঘেঁষি গাছে অনেক দূর জুড়ে অন্ধকার, খুব গম্ভীর, খুব নিস্তব্ধ।

নবম পত্র

গরমি কাল। সুন্দর সূর্য উঠেছে। এখন দুপুর দুটো বাজে। আমাদের দেশের শীতকালের দুপুর-বেলাকার বাতাসের মতো বেশ একটি মিষ্টি হাওয়া। রোদ্দুরে চার দিক ঝাঁ ঝাঁ করছে। এমন ভালো লাগছে আর এমন একটু কেমন উদাস ভাব মনে আসছে যে কী বলব।

আমরা এখন ডেভনশিয়রের অন্তর্গত টর্কি বলে এক নগরে আছি। সমুদ্রের ধারে। চার দিকে পাহাড়। অতি পরিষ্কার দিন। মেঘ নেই, কুয়াশা নেই, অন্ধকার নেই; চারি দিকে গাছপালা, চারি দিকে পাখি ডাকছে, ফুল ফুটছে। যখন টন্‌ব্রিজ ওয়েল্‌সে ছিলুম, তখন ভাবতুম এখানে যদি মদন থাকে, তবে অনেক বনবাদাড় ঝোপঝাপ কাঁটাগাছ হাতড়ে দু-চারটে বুনো ফুল নিয়েই কোনোমতে তাকে

ফুলশর বানাতে হয়। কিন্তু টর্কিতে মদন যদি গ্যাট্‌লিং কামানের মতো এমন একটা বাণ উদ্ভাবন করে থাকে, যার থেকে প্রতি মিনিটে হাজারটা করে তীর ছোঁড়া যায় আর সেই বাণ দিনরাত যদি কাজে ব্যস্ত থাকে, তবু মদনের ফুলশরের তহবিল এখানে দেউলে হবার কোনো সম্ভাবনা নেই, এত ফুল। যেখানে সেখানে, পথে-ঘাটে, ফুল মাড়িয়ে চলতে হয়। আমরা রোজ পাহাড়ে বেড়াতে যাই। গোরু চরছে, ভেড়া চরছে; এক-এক জায়গায় রাস্তা এত ঢালু যে, উঠতে-নাবতে কষ্ট হয়। এক-এক জায়গায় খুব সংকীর্ণ পথ, দু ধারে গাছ উঠেছে আঁধার করে, ওঠবার সুবিধের জন্যে ভাঙা ভাঙা সিঁড়ির মতন আছে, পথের মধ্যেই লতা গুল্ম উঠেছে। চার দিকে মধুর রোদ্দুর। এখানকার বাতাস বেশ গরম, ভারতবর্ষ মনে পড়ে। এইটুকু গরমেই লন্ডনের প্রাণীদের চেয়ে এখানকার জীব-জন্তুদের কত নির্জীব ভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। ঘোড়াগুলো আস্তে আস্তে যাচ্ছে, মানুষগুলোর তেমন ভারি ব্যস্ত ভাব নেই, গড়িমসি করে চলেছে।

এখানকার সমুদ্রের ধার আমার বড়ো ভালো লাগে। যখন জোয়ার আসে, তখন সমুদ্রতীরের খুব প্রকাণ্ড পাথরগুলো জলে ডুবে যায়, তাদের মাথা বেরিয়ে থাকে। ছোটো ছোটো দ্বীপের মতো দেখায়। জলের ধারেই ছোটো বড়ো কত পাহাড়। ঢেউ লেগে লেগে পাহাড়ের নীচে গুহা তৈরি হয়ে গেছে; যখন ভাঁটা পড়ে যায়, তখন আমরা এক-এক দিন এই গুহার মধ্যে গিয়ে বসে থাকি। গুহার মধ্যে জায়গায় জায়গায় অতি পরিষ্কার একটু একটু জল জমে রয়েছে, ইতস্তত সমুদ্র-শৈবাল জমে আছে, সমুদ্রের একটা স্বাস্থ্যজনক গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, চার দিকে পাথর ছড়ানো। আমরা সবাই মিলে এক-এক দিন সেই পাথরগুলো ঠেলাঠেলি করে নাড়াবার চেষ্টা করি, নানা শামুক ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে আসি। এক-একটা পাহাড় সমুদ্রের জলের উপর খুব ঝুঁকে পড়েছে; আমরা প্রাণপণ করে এক-এক দিন সেই অতি দুর্গম পাহাড়গুলোর উপর উঠে বসে নীচে সমুদ্রের ঢেউয়ের ওঠাপড়া দেখি। হু হু শব্দ উঠছে, ছোটো ছোটো নৌকো পাল তুলে চলে যাচ্ছে, চার দিকে রোদ্দুর, মাথার উপর ছাতা খোলা, পাথরের উপর মাথা দিয়ে আমরা শুয়ে শুয়ে গল্প করছি। আলস্যে কাল কাটাবার এমন জায়গা আর কোথায় পাব? এক-এক দিন পাহাড়ে যাই, আর পাথর-দিয়ে-ঘেরা ঝোপঝাপে-ঢাকা একটি প্রচ্ছন্ন জায়গা দেখলে সেইখানটিতে গিয়ে বই নিয়ে পড়তে বসি।

দশম পত্র

ক্রিস্‌মাস ফুরোল, আবার দেখতে দেখতে আর-একটা উৎসব এসে পড়ল। আজ নূতন বর্ষের প্রথম দিন। কিন্তু তার জন্যে কিছুই গোলমাল দেখতে পাচ্ছি নে। নূতন বৎসর যে এখানে এমন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আসবে তা জানতেম না। শুনেছি ফ্রান্সে লোকে নতুন বৎসরকে খুব সমাদরের সঙ্গে আবাহন করে। কাল পুরাতন বৎসরের শেষ রাত্রে আমাদের প্রতিবেশীরা বাড়ির জানলা খুলে রেখেছিল। পাছে পুরোনো বৎসর ঘরের মধ্যে আটকা পড়ে থাকে, পাছে নতুন বৎসর এসে জানলার কাছে বৃথা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

টর্কি থেকে বহুদিন হল আমরা আবার লন্ডনে এসেছি। এখন আমি ক—র পরিবারের মধ্যে বাস করি। তিনি, তাঁর স্ত্রী, তাঁদের চার মেয়ে, দুই ছেলে, তিন দাসী, আমি ও টোবি বলে এক কুকুর নিয়ে এই বাড়ির জনসংখ্যা। মিস্টার ক—একজন ডাক্তার। তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি প্রায় সমস্ত পাকা। বেশ বলিষ্ঠ ও সুশ্রী দেখতে। অমায়িক স্বভাব, অমায়িক মুখশ্রী। মিসেস ক—আমাকে আন্তরিক যত্ন করেন। শীতের সময় আমি বিশেষ গরম কাপড় না পরলে তাঁর কাছে ভর্ৎসনা খাই। খাবার সময় যদি তাঁর মনে হয় আমি কম করে খেয়েছি, তা হলে যতক্ষণ না তাঁর মনের মতো খাই ততক্ষণ পীড়াপীড়ি করেন। বিলেতে লোকে কাশিকে ভয় করে; যদি দৈবাৎ আমি দিনের মধ্যে দু-বার কেশেছি তা হলেই তিনি জোর করে আমার স্নান বন্ধ করান, আমাকে দশ রকম ওষুধ গেলান, শুতে

যাবার আগে আমার পায়ে খানিকটা গরম জল ঢালবার বন্দোবস্ত করেন, তবে ছাড়েন। বাড়ির মধ্যে সকলের আগে বড়ো মিস ক— ওঠেন। তিনি নীচে এসে ব্রেকফাস্ট তৈরি হয়েছে কি না তদারক করেন; অগ্নিকুণ্ডে দু-চার হাতা কয়লা দিয়ে ঘরটি বেশ উজ্জ্বল করে রাখেন। খানিক বাদে সিঁড়িতে একটা দুদ্দাড় পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। বুড়ো ক— শীতে হি হি করতে করতে খাবার ঘরে এসে উপস্থিত। তাড়াতাড়ি আগুনে হাত-পা পিঠ-বুক তাতিয়ে খবরের কাগজ হাতে খাবার টেবিলে এসে বসেন। তাঁর বড়ো মেয়েকে চুম্বন করেন, আমার সঙ্গে সুপ্রভাত অভিবাদন হয়। লোকটা প্রফুল্ল। আমার সঙ্গে খানিকটা হাসিতামাশা হয়, খবরের কাগজ থেকে এটা-ওটা পড়ে শোনান। তাঁর এক পেয়ালা কফি শেষ হয়ে গেছে, এমন সময়ে তাঁর আর দুটি মেয়ে এসে তাঁকে চুম্বন করলেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁর বন্দোবস্ত ছিল যে, তাঁরা যেদিন মিস্টার ক—র আগে উঠবেন, সেদিন মিস্টার ক— তাঁদের পাঁচ সিকে পুরস্কার দেবেন, আর যেদিন মিস্টার ক— তাঁদের আগে উঠবেন, সেদিন তাঁদের চার আনা দণ্ড দিতে হবে। যদিও এত অল্প দিতে হত, তবু তাদের কাছে প্রায় দু-তিন পাউন্ড পাওনা হয়েছে। রোজ সকালে পাওনাদার পাওনার দাবি করেন। কিন্তু দেনদাররা হেসেই উড়িয়ে দেন। ক— বলেন, 'এ ভারি অন্যায়।' আমাকে মাঝে মাঝে মধ্যস্থ মেনে বলেন, 'আচ্ছা মিস্টার টি— তুমিই বলো, এরকম ডেট অফ অনর ফাঁকি দেওয়া কি ভদ্রতা?' যা হোক পরিশোধের অভাবে পাওনা বেড়েই চলেছে। তার পরে মিসেস ক— এলেন। আমাদের ব্রেকফাস্ট প্রায় সাড়ে ন-টার মধ্যে শেষ হয়। বাড়ির বড়ো ছেলে আগেই খাওয়া সেরে কাজে গিয়েছেন, আর মিস্টার ক—র ছোটো ছেলেটি ও ছোটো মেয়েটি অনেকক্ষণ হল খাওয়া শেষ করেছে। একজনের কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। টেবি কুকুরটি অনেকক্ষণ হল এসে আগুনের কাছে আরামে বসে আছে। ছোট্ট কুকুরটি। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রোঁয়া। রোঁয়াতে চোখমুখ ঢাকা। বুড়ো হয়েছে, আর তার একটা চোখ কানা হয়ে গেছে। আদর পেয়ে পেয়ে এই ব্যক্তির অভ্যাস হয়েছে নবাবি চাল। ড্রয়িংরুম ছাড়া অন্য কোনো ঘরে তার মন বসে না। ঘরের সকলের চেয়ে ভালো কেদারাটিতে অম্লানবদনে লাফিয়ে উঠে বসে, এক পাশে যদি আর কেউ এসে বসল, অমনি সে সদর্পে পাশের কৌচটির উপরে গিয়ে বসে পড়ে। সকালবেলায় ব্রেকফাস্টের সময় তার তিনটি বিস্কুট বরাদ্দ। সে বিস্কুটগুলি নিয়ে খাবার ঘরে বসে থাকে, যতক্ষণ না আমি গিয়ে সেই বিস্কুটগুলি নিয়ে তার সঙ্গে খানিকটা খেলা করি, একবার তার মুখ থেকে কেড়ে নিই একবার গড়িয়ে দিই। আগে আগে যখন আমার উঠতে দেরি হত, সে তার বরাদ্দ বিস্কুট নিয়ে আমার শোবার ঘরের কাছে বসে ঘেউ ঘেউ করত। কিন্তু গোল করলে বিরক্ত হতুম দেখে সে এখন আর ঘেউ ঘেউ করে না। আস্তে আস্তে পা দিয়ে দরজা ঠেলে, যতক্ষণ না দরজা খুলে দিই চুপ করে বাইরে বসে থাকে। দরজা খুলে ঘর থেকে বেরোলেই লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে লেজ নেড়ে উৎসাহ প্রকাশ করে; তার পরে একবার বিস্কুটের দিকে চায় একবার আমার মুখের দিকে। যা হোক সাড়ে ন-টার মধ্যে ব্রেকফাস্ট শেষ হয়। তার পরে হাতে দস্তানা-পরা গৃহিণী দাসীদের নিয়ে তাঁর চৌতলা থেকে একতলা পর্যন্ত, জিনিসপত্র গুছিয়ে ঘরদ্বার পরিষ্কার ও গৃহকার্য তদারক করে ওঠা-নাবায় প্রবৃত্ত। একবার রান্নাঘরে যান, সেখানে শাকওআলা রুটিওআলা মাংসওআলার বিল দেখেন, দেনা চুকিয়ে দেন। মাঝে মাঝে উপরে এসে কর্তার সঙ্গে গৃহকার্যের পরামর্শ হয়। রান্নাঘরের উপকরণ পরিষ্কার আছে কি না ও যথাস্থানে তাদের রাখা হয়েছে কি না দেখেন, ভালো মাংস এনেছে কি না, ওজনে কম পড়েছে কি না তদন্ত করেন। রাঁধুনীর সঙ্গে মাঝে মাঝে যোগ দেন। এইরকম ব্রেকফাস্টের পর থেকে প্রায় বেলা একটা-দেড়টা পর্যন্ত তাঁকে নানাবিধ কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে তাঁর বড়ো মেয়ে যোগ দেন। মেজো মেয়ে প্রত্যহ একটি ঝাড়ন নিয়ে ড্রয়িংরুম সাফ করেন। দাসীরা ঘর ঝাঁট দিয়ে যায়, আর জিনিসপত্রে যা-কিছু ধুলো লাগে তা তিনি নিজের হাতে ঝেড়ে-ঝুড়ে সাফ করেন। তৃতীয় মেয়ে বালিশের আচ্ছাদন আসন মোজা কাপড় প্রভৃতি নানাবিধ সেলাইয়ে নিযুক্ত হন, চিঠিপত্র লেখেন, এক-এক দিন বাজনা ও গান অভ্যাস করেন। বাড়ির মধ্যে তিনিই গাইয়ে বাজিয়ে। আজকাল স্কুল বন্ধ, ছোটো ছেলেটি ও মেয়েটি ভারি খেলায় মগ্ন। দেড়টার সময়

আমাদের লাঞ্চ খাওয়া সমাপন হলে আবার যিনি যাঁর কাজে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ভিজিটরদের আসবার সময়। হয়তো মিসেস ক— তাঁর স্বামীর এক জোড়া ছেঁড়া মোজা নিয়ে চশমা পরে ড্রয়িং-রুমে বসে সেলাই করছেন। ছোটো মেয়ে একটি পশমের জামা তাঁর ভাইপোর জন্যে তৈরি করে দিচ্ছেন। মেজো মেয়েটি একটু অবসর পেয়ে আগুনের কাছে বসে হয়তো গ্রীনের লিখিত ইংরেজ জাতির ইতিহাস পড়তে নিযুক্ত। বড়ো মিস ক— হয়তো তাঁর কোনো আলাপীর বাড়িতে ভিজিট করতে গিয়েছেন। তিনটের সময় হয়তো একজন ভিজিটর এলেন। দাসী ড্রয়িংরুমে এসে নাম উচ্চারণ করলে 'মিস্টার ও মিসেস এ—' বলতে বলতে ঘরের মধ্যে তাঁরা দুজনে উপস্থিত। মোজা জামা রেখে, বই মুড়ে, গৃহিণী ও তাঁর কন্যারা আগন্তুকদের অভ্যর্থনা করলেন। আবহাওয়া সম্বন্ধে পরস্পরের মতামতের ঐক্য নিয়ে আলাপ শুরু হল। মিসেস এ— বললেন, 'মিস্টার এক্স-এর তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে হাম হয়। হাম হয়েছিল বলে তিনি চার দিন আপিসে যেতে পারেন নি। কাল আপিসে গিয়েছিলেন। তাঁর হামের প্রসঙ্গে আপিসের লোকেরা তাঁকে নির্দয়রূপে ঠাট্টা করতে আরম্ভ করেছে।' অন্যেরা লোকটি সম্বন্ধে দরদ প্রকাশ করলে। এই কথা থেকে ক্রমে হামরোগের বিষয়ে যত কথা উঠতে পারে উঠল। মিস ক— খবর দিলেন মিস্টার জ-এর তৃতীয় ছেলেটির হাম হয়েছে। তার থেকে কথা উঠল যে, মিস্টার জ-এর যে এক পিতৃব্য বোন মিস ই— অস্ট্রেলিয়ায় আছেন, তাঁর কাপ্তেন ব-এর সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেছে। এইরকম খানিকক্ষণ কথোপকথন হলে পর তাঁরা চলে গেলেন। বিকেলে হয়তো আমরা সবাই মিলে একটু বেড়াতে গেলুম। বেড়িয়ে এসে সাড়ে ছ-টার সময় আমাদের ডিনার। ডিনার খেয়ে সাতটার সময় আমরা সবাই মিলে ড্রইংরুমে গিয়ে বসি। আগুন জ্বলছে। ঘরটি বেশ গরম হয়ে উঠেছে। আমরা আগুনের চার দিকে ঘিরে বসলুম। এক-এক দিন আমাদের গান-বাজনা হয়। আমি ইতিমধ্যে অনেক ইংরেজি গান শিখেছি। আমি গান করি। মিস ক— বাজান। মিস ক— আমাকে অনেকগুলি গান শিখিয়েছেন। কিন্তু প্রায় সন্ধেবেলায় আমাদের একটু আধটু পড়াশুনা হয়। আমরা পালা করে ছ দিনে ছ রকমের বই পড়ি। বই পড়তে পড়তে এক-এক দিন প্রায় সাড়ে-এগারোটা বারোটা হয়ে যায়।

ছেলেদের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে। তারা আমাকে আর্থার খুড়ো বলে। এথেল ছোটো মেয়েটির ইচ্ছে যে আমি কেবল একলা তারই আংক্‌ল্‌ আর্থার হই। তার ভাই টম যদি আমাকে দাবি করে তবেই তার দুঃখ। একদিন টম তার ছোটো বোনকে রাগাবার জন্যে একটু বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিল, আমারই আংক্‌ল্‌ আর্থার। তখনই এথেল আমার গলা জড়িয়ে ধরে ঠোঁট দুটি ফুলিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে দিলে। টম একটু অস্থির, কিন্তু ভারি ভালোমানুষ। খুব মোটাসোটা। মাথাটা খুব প্রকাণ্ড। মুখটা খুব ভারী ভারী। সে এক-এক সময়ে আমাকে এক-একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, 'আচ্ছা, আংক্‌ল্‌ আর্থার, ইঁদুররা কী করে?' আংক্‌ল্‌ বললেন, 'তারা রান্নাঘর থেকে চুরি করে খায়।' সে একটু ভেবে বললে, 'চুরি করে? আচ্ছা, চুরি করে কেন?' আংক্‌ল্‌ বললেন, 'তাদের খিদে পায় বলে।' শুনে টমের বড়ো ভালো লাগল না। সে বরাবর শুনে আসছে যে, জিজ্ঞাসা না করে পরের জিনিস নেওয়া অন্যায়। আর-একটি কথা না বলে সে চলে গেল। যদি তার বোন কখনো কাঁদে, সে তাড়াতাড়ি এসে সান্ত্বনার স্বরে বলে, 'Oh, poor Ethel, don't you cry! Poor Ethel!' এথেলের মনে মনে জ্ঞান আছে যে, সে একজন লেডি। সে কেমন গম্ভীরভাবে কেদারায় ঠেস দিয়ে বসে। টমকে এক-এক সময়ে ভর্ৎসনা করে বলে, 'আমাকে বিরক্ত কোরো না।' একদিন টম পড়ে গিয়ে কাঁদছিল। আমি তাকে বললেম, 'ছি, কাঁদতে আছে!' অমনি এথেল আমার কাছে ছুটে এসে জাঁক করে বললে, 'আংক্‌ল্‌ আর্থার, আমি একবার ছেলেবেলায় রান্নাঘরে পড়ে গিয়েছিলেম, কিন্তু কাঁদি নি।' ছেলেবেলায়!

মিস্টার ন—, ডাক্তারের আর-এক ছেলে, বাড়িতে থাকেন কিন্তু তাঁকে দেখতে পাই নে। তিনি সমস্ত দিন আপিসে। আপিস থেকে এলেও তাঁর বড়ো একটা দেখা পাওয়া যায় না। তার কারণ মিস ই—র সঙ্গে তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ। তাঁদের দুজনে কোর্টশিপ চলছে। রবিবার দু-বেলা

প্রেয়সীকে নিয়ে তাঁর চার্চে যেতে হয়। যখন বিকেলে একটু অবসর পান, প্রণয়িনীর বাড়িতে গিয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে আসেন। প্রতি শুক্রবার সন্ধেবেলা তাঁদের বাড়িতে তাঁর নেমন্তন্ন। এই রকমে তাঁর সময় ভারি অল্প। উভয়ে পরস্পরকে নিয়ে এমন সুখী আছেন যে, অবসরকাল কাটাবার জন্যে অন্য কোনো জীবের সঙ্গ তাঁদের আবশ্যক করে না। শুক্রবার সন্ধেবেলায় যদি আকাশ ভেঙে পড়ে তবু মিস্টার ন— পরিষ্কার করে চুলটি ফিরিয়ে, পমেটম মেখে, কোট ব্রাশ করে ফিটফাট হয়ে, ছাতা হাতে বাড়ি থেকে বেরোবেনই। একবার খুব শীত পড়েছিল, আর তাঁর ভারি কাশি হয়েছিল; মনে করলেম, আজ বুঝি বেচারির আর যাওয়া হয় না। সাতটা বাজতে-না-বাজতেই দেখি তিনি ফিটফাট হয়ে নেবে এসেছেন।

যা হোক, আমার এই পরিবারের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। সেদিন মেজো মেয়ে আমাকে বলছিলেন যে, প্রথম যখন তাঁরা শুনলেন যে একজন ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক তাঁদের মধ্যে বাস করতে আসছে, তাঁদের ভারি ভয় হয়েছিল। যেদিন আমার আসবার কথা সেই দিন মেজো ও ছোটো মেয়ে. তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় এক হপ্তা বাড়িতে আসেন নি। তার পর হয়তো যখন তাঁরা শুনলেন যে, মুখে ও সর্বাঙ্গে উল্কি নেই, ঠোঁট বিঁধিয়ে অলংকার পরে নি, তখন তাঁরা বাড়িতে ফিরে এলেন। ওঁরা বলেন যে, প্রথম প্রথম এসে যদিও আমার সঙ্গে কথাবার্তা কয়েছিলেন তবুও দু-দিন পর্যন্ত আমার মুখ দেখেন নি। হয়তো ভয় হয়েছিল যে কী অপূর্ব ছাঁচে ঢালাই মুখই না জানি দেখবেন। তার পর যখন মুখ দেখলেন— তখন?

যা হোক, এই পরিবারে সুখে আছি। সন্ধেবেলা আমোদে কেটে যায়— গান বাজনা, বই পড়া। আর এথেল তার আঙ্কল্ আর্থারকে মুহূর্ত ছেড়ে থাকতে চায় না।

১২৮৮

সংযোজন

'পূজনীয় ভারতীর সম্পাদক মহাশয়' রবীন্দ্রনাথের পত্রের উত্তরে 'যে-সকল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাও পুস্তকে [য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র] নিবিষ্ট' হয়েছিল। কিন্তু 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ' গ্রন্থে ভারতী-সম্পাদকের মন্তব্য সন্নিবিষ্ট হয় নি এবং সে কারণে তিনটি পত্র (সপ্তম, নবম ও দশম) সম্পূর্ণত বর্জিত হয়। ভারতী-সম্পাদকের মন্তব্য বর্জন করে সেই তিনটি পত্র 'সংযোজন' অংশে সংকলিত হল। ভারতী-সম্পাদকের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ অংশ, রবীন্দ্রনাথ যাকে 'সকল বিষয়েরই দুই পক্ষ আছে। উভয় পক্ষই পাঠকদের দেখা আবশ্যক' বলে উল্লেখ করেছিলেন তা 'গ্রন্থপরিচয়'-এ স্থান পাবে।

দেখো, তোমাকে যে পত্র লিখেছি তা ভারতীতে আমার ইচ্ছামত প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে এক জায়গায় স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশ করেছিলুম, সম্পাদক-মহাশয় তার বিরুদ্ধে এক নোটের বাণ বর্ষণ করেছেন। কিন্তু সেটা সম্পাদক-মহাশয়ের লেখা কি না সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ বর্তমান। তিনি যে সেটা লেখেন নি তার প্রধান প্রমাণ হচ্ছে এই যে, সম্পাদক-মহাশয়ের গাম্ভীর্য এতদূর বিচলিত হতে আর কখনো দেখি নি; দ্বিতীয়ত যে-সকল যুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে তা সম্পাদক-মহাশয়ের লেখনীর অযোগ্য। খুব সম্ভব, কোনো উদ্ধত যুবক সম্পাদকের ক্ষমতা নিজের তরুণ স্কন্ধে গ্রহণ করে ভারতীর এক কোণে অলক্ষিত ভাবে এই নোটটি গুঁজে দিয়েছেন। নোটে খোঁচা মারার প্রধান গুণ হচ্ছে যে, তার উত্তর দিতে বসতে প্রবৃত্তি হয় না। একটা নোটের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধং দেহি' বলে কোমর বেঁধে আড়ম্বর করা শোভা পায় না। গোলা দিয়ে ওড়াতে এলে রীতিমত যুদ্ধসজ্জা করতে হয়, কিন্তু তুড়ি দিয়ে ওড়াতে এলে আর কথাটি নেই। যা হোক, নানা কারণে একটা উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হলুম। লেখক-মহাশয় আমার মুখে কতকগুলো কথা গুঁজে দিয়েছেন, যা আমি একেবারেই বলি নি; তিনি কতকগুলো কথা নিয়ে অনর্গল বকাবকি করে গিয়েছেন, যা একেবারে উত্থাপন করবারই কোনো আবশ্যক ছিল না। তিনি অনেক জায়গায় তলোয়ার নিয়ে তুমুল আস্ফালন করেছেন, কিন্তু তার ঘা লেগেছে বাতাসের গায়ে। আবার অনেক জায়গায় তিনি আমার লেখার বিরুদ্ধে বন্দুক ছুঁড়েছেন; তার থেকে আগুনও ছুটেছে, ধোঁয়াও বেরিয়েছে, শব্দও হয়েছে, কিন্তু তাতে গুলি নেই, ফাঁকা আওয়াজ; ধোঁয়ার প্রাচুর্য ও শব্দের প্রাখর্য থেকে পাঠকেরা কল্পনা করবেন যে, যার প্রতি লক্ষ করা হয়েছে সে ব্যক্তি বাসায় গিয়ে মরে থাকবে—কিন্তু সে ব্যক্তির কানে তালা ধরা ও নাকে ধোঁয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনো-রকম সাংঘাতিক অপকার হয় নি। লেখক-মশায় বলেছেন যে, 'শুধু কেবল স্বাধীনতা হইলেই যদি স্ত্রীলোকদের আর কোনো গুণের প্রয়োজন না হইত, তাহা হইলেও আমরা লেখকের মতে সম্পূর্ণ মত দিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা তো নহে—যেমন স্বাধীনতা চাই তেমনি তাহার সঙ্গে শোভন লজ্জাশীলতা, বিনয়, সরলতা, উচ্চের প্রতি ভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য ইত্যাদি অনেক গুণ থাকা চাই।' ইত্যাদি। কিন্তু এতটা হাঙ্গামা কেন? বাংলা বা সংস্কৃত, আর্য বা অনার্য, সাধু বা অসাধু কোনো ভাষার অভিধানে যদি স্বাধীনতা অর্থে বেহায়ামো, অবিনয়, অসরলতা, উচ্চের প্রতি অ-ভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি অ-দয়াদাক্ষিণ্য লেখা থাকত তা হলে এতটা বাক্যব্যয় শোভা পেত; নইলে সরলহৃদয় পাঠকদের চোখে ধুলো দেওয়া ছাড়া লাথি মেরে মেরে এতটা বাক্যের ধুলো ওড়ানোর আর তো কোনো ফল দেখি নে। এই-সকল বকাবকির পর লেখক-মহাশয় যেখানে 'প্রকৃত কথা' বলেছেন সেইখানেই আমি সব চেয়ে কম আয়ত্ত করতে পেরেছি। তিনি বলেন, 'প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের দেশে এক্ষণে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, শিক্ষাবিষয়ক স্বাধীনতা, রুচিবিষয়ক স্বাধীনতা ইত্যাদি অনেক স্বাধীনতার অভাব আছে, তাহার সঙ্গে কী মাত্রায় স্ত্রী-স্বাধীনতা ভালোয় ভালোয় টেঁকিয়া থাকিতে পারে তাহাই এখন বিবেচনাস্থলে।' প্রথমত, 'শিক্ষাবিষয়ক স্বাধীনতা' 'রুচিবিষয়ক স্বাধীনতা' ও 'ইত্যাদি অনেক স্বাধীনতা'র অর্থ আমি তো ভালো করে বুঝতেই পারলুম না; দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে স্ত্রী-স্বাধীনতার কোন্‌খানটা যোগ আছে তাই আমি ভালো করে দেখতে পেলেম না। আমাদের দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নেই বললে এই বোঝায় যে, আমরা ইংরেজদের অধীনে বাস করছি; যদি এমন হত যে, স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত বলিষ্ঠ জাতি, তাদের অন্তঃপুর থেকে মুক্ত করে দিলে ইংরাজদের রাজত্ব লোপ হবার সম্ভাবনা, তা হলে বুঝতাম যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নেই বলে আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতার ঘোরতর ব্যাঘাত বর্তমান। একটা স্বাধীনতা নেই বলে পৃথিবীতে যদি আর কোনোরকম স্বাধীনতা না থাকে, তা হলে আমাদের

দেশে পুরুষদের স্বাধীনতা আছে কী করে? আমাদের দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নেই, অতএব পুরুষরা অন্তঃপুরে প্রবেশ করে না কেন? রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে স্ত্রী-স্বাধীনতার যদি কোনো যোগ থাকে, তবে পুরুষ-স্বাধীনতার সঙ্গেও তার সেই পরিমাণে যোগ আছে সন্দেহ নাই। দেশীয় রাজার অধীনে থাকলে স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে আমাদের এখনকার চেয়ে কী সুবিধা হত ও কোন্ সুবিধা হত সেইটে বললেই আমি চুপ করব। লেখক-মহাশয় হয়তো বলবেন, এখনো আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতার সময় আসে নি, সময় এলে স্বাধীনতা আপনা-আপনিই আসত। হঠাৎ যদি আজই সমস্ত স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন হয়, তা হলে তার থেকে খারাপ ফল হতে পারে। খুব সম্ভব আমাদের দেশে আজও স্ত্রীলোকদের স্বাধীন হবার সময় হয় নি, কিন্তু আমি তো আর তলবার হাতে করে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচার করছি নে; কিংবা আমি তো আজই ভারতবর্ষের Governor-General হয়ে আইন বের করছি নে যে, যারা স্ত্রী-কন্যাদের স্বাধীনতা না দেয়, তাদের ফাঁসি দেওয়া হবে। আমি একটা কাগজে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রার্থনীয় কি না সে বিষয়ে আমার মত প্রকাশ করেছি; আমার আশাও ছিল না উদ্দেশ্যও ছিল না যে, আমার প্রবন্ধটি পড়বামাত্র অমনি ভারতবর্ষের বিংশতি কোটি লোক তৎক্ষণাৎ তাদের স্ত্রী কন্যা ভগ্নীদের অন্তঃপুর থেকে মুক্ত করে তাঁদের অসূর্যম্পশ্যরূপত্বের গর্ব থেকে বঞ্চিত করবে। আমি বিলক্ষণ জানতেম, সূর্যের এত সৌভাগ্য আজও হয় নি যে, এত সহজে তার যুগযুগান্তরের আশা পূর্ণ হবে। আমার অভিপ্রায় এই ছিল যে, যদি বা স্ত্রী-স্বাধীনতার সময় আমাদের দেশে এখনো না এসে থাকে তবে সেই সময় যত শীঘ্র আসে আমাদের তার চেষ্টা করা উচিত। প্রথমে আন্দোলন, তার পরে কাজ, তার পরে সিদ্ধি। সময় আসে নি বলে যদি মুখ বন্ধ করে বসে থাকতে হয় তা হলে সময় কোনো কালে আসে না। পৃথিবীতে কোন্ দেশে এমন কোন্ বৃহৎ সমাজসংস্কার হয়েছে যা আন্দোলন না করেই হয়েছে? অত কথায় কাজ কী? আমাদের বাংলাদেশে অতি অল্প দিন পূর্বে যে ধর্মসংস্কারের আরম্ভ হয় ও আজ পর্যন্ত যার আন্দোলন চলছে সেই বিষয়ে উদাহরণ দিলেই আমার যুক্তি অতি সহজে বোধগম্য হবে। ভারতবাসীদের মন এখনো অজ্ঞতা-কুসংস্কারাচ্ছন্ন আছে, নিরাকার ঈশ্বরের ভাব তারা বুঝতে পারবে না, সুতরাং এখনো সত্যধর্ম-প্রতিষ্ঠার সময় হয় নি বলে যদি রামমোহন রায় নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতেন, যদি তখনকার বৃদ্ধ পৌত্তলিক সমাজের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম না করতেন—সময়ের অভাব—সময়ের শূন্য ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করবার চেষ্টা না করে তিনি যদি ভিক্ষুক ভাবে অঞ্জলি পেতে সময়ের মুখপ্রতীক্ষা করে বসে থাকতেন, তা হলে আজকের এই ব্যাপ্যমান ব্রাহ্মধর্ম কোথায় থাকত? আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতার অভাব লোকে এখনো ভালো করে অনুভব করতে পারে নি, কিন্তু তাই বলে কি চুপ করে বসে থাকতে হবে? ব্যক্তিবিশেষের যদি অস্বাভাবিক কারণে ক্ষিদে আদবে না থাকে তা হলে তাকে খেতে দিয়ো না, কেননা, সে হজম করতে পারবে না; কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাকে কবিরাজ দেখানো কর্তব্য, যাতে তার ক্ষিদে হয় এমন বটিকা সেবন করানো আবশ্যক। আমি তাই ভেবে-চিন্তে ভারতীতে সমাজের জন্যে এক রতি বটিকার ব্যবস্থা করেছিলুম; কিন্তু রোগ এমন বদ্ধমূল ও কবিরাজের সাধ্যমত বটিকার মাত্রা এমন যৎসামান্য যে, তাতে উপকার হবার সম্ভাবনা অতি অল্প। কিন্তু আমাদের দেশের সকল কবিরাজ মিলে যদি এইরকম বটিকা সেবন আরম্ভ করান তা হলে অচিরাৎ রোগীর ক্ষুধার সঞ্চার হবে। লেখক-মহাশয় বলেন—'"উঃ ইনি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছেন" এরূপ কেউ যদি মনে করেন, তবে তাঁহাদের জানা উচিত যে, এ স্বাধীনতা দেশেরও স্বাধীনতা নহে, আত্মারও স্বাধীনতা নহে, কেবল পরপুরুষগণের সহিত স্ত্রীলোকগণের আমোদপ্রমোদে মেলামেশা!' কথাগুলো এমন করে বসানো হয়েছে যে, শুনলে অনেক পাঠকের গা শিউরে উঠবে। 'পরপুরুষ'! 'আমোদপ্রমোদ'!! 'মেলামেশা'!!! কী সর্বনাশ! আমাদের ভাষায় 'পরপুরুষ' কথাটার সঙ্গে একটা দারুণ বিভীষিকা লিপ্ত আছে, লেখক-মহাশয় সেই সুবিধা পেয়ে কথাটা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আমি জানতে চাই, গরিব 'পরপুরুষ' কথাটি কী অপরাধ করেছে,

যে, সে বেচারির ওপরে এত নিগ্রহ! পর বলেই কি তার এত দোষ? কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে বলে মহাত্মা লোকদের 'বসুধৈব কুটুম্বকং'। 'আমোদ-প্রমোদ' ও 'মেলা-মেশা' কথা দুটো এমন ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে তার মধ্যে থেকে একটা ঘোরতর রহস্যপূর্ণ অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু আমি আশা করি, আমাদের দেশের রুচি এখনো এমন বিকৃত হয়ে যায় নি, দেশীয় লোকের মন এমন পশুত্বে পরিণত হয় নি, তাঁদের দৃষ্টি এমন 'পিঙ্গল' হয়ে যায় নি ও তাঁদের 'কল্পনার দূরবীক্ষণ' এত দূর পর্যন্ত বিগড়ে যায় নি যে তাঁরা 'আমোদ-প্রমোদ' ও 'মেলা-মেশা' মাত্রেরই মধ্যে একটা হীন, একটা জঘন্য, একটা বীভৎস ভাব দেখতে পান। অতএব যদি 'আমোদ-প্রমোদ' ও 'মেলা-মেশা' মাত্রেরই খারাপ অর্থ না থাকে ও 'পরপুরুষ' মাত্রেই যদি বাঘ ভাল্লুক বা চোর ডাকাত না হয় তা হলে 'পরপুরুষের' সঙ্গে 'আমোদ-প্রমোদ' 'মেলা-মেশায়' কী দোষ আছে? একজন অন্যায়রূপে কারাবদ্ধ ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দেবার বিরুদ্ধে তুমি তো বলতে পার যে, 'এ স্বাধীনতা আত্মারও স্বাধীনতা নহে, দেশেরও স্বাধীনতা নহে, কেবল স্বজাতিবর্গের সহিত এক ব্যক্তির আমোদ-প্রমোদে মেলা-মেশা—এ কতদূর স্বাধীনতা নামের যোগ্য তাহাই সন্দেহস্থল!' আত্মার স্বাধীনতা ও দেশের স্বাধীনতা ব্যতীতও আরও অসংখ্য স্বাধীনতা আছে যা প্রার্থনীয়। উপসংহারে সম্পাদক-মহাশয় বলেছেন যে, স্ত্রীগণকে অন্তঃপুরে রাখা পুরুষদের স্বার্থপরতার ফল নয়, সাংসারিক কাজকর্মের অনুরোধে তা স্বভাবতই হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্ত্রী-স্বাধীনতাবিরোধীদের এই এক অতি পুরোনো যুক্তি আছে; কিন্তু আমার বোধ হয় এটা আর কারও চক্ষে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে না যে, প্রাচীরবদ্ধ অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকালের জন্যে প্রবেশ করা ও সমস্ত পৃথিবীর থেকে আপনাকে রুদ্ধ করে রাখা স্বাভাবিক হওয়াই নিতান্ত অস্বাভাবিক। যদি সত্যই স্বাভাবিক হত তা হলে য়ুরোপে কেন এ স্বভাবের নিয়মের পরিবর্তন হল? এখানে কি স্ত্রীলোকদের স্বামী নেই, না সন্তান হলেই তারা গঙ্গাসাগরে বিসর্জন দিয়ে আসে? লেখক-মহাশয় বলেন 'কুলরমণীরা যে যে-সে পুরুষের সঙ্গে আমোদ করিয়া বেড়ায় না, সে কেবল পতির শাসনভয়ে নহে, পতির প্রতি ভালোবাসাই তাহার কারণ।' ও হরি! আমি কি বলেছি যে কুলরমণীরা 'যে-সে' পুরুষের সঙ্গে কেবল 'আমোদই' করে বেড়াবে? রেখাগুলিকে ঈষৎ বেঁকিয়ে-চুরিয়ে বাড়িয়ে-কমিয়ে একটি সুশ্রী ছবিকেও কদর্য করা যায়, শিবকেও বাঁদর গড়ে তোলা যায়। কোনো পাঠক-মহাশয় কি আমার লেখা থেকে মনে করেছেন যে আমাদের কুলরমণীরা পথে ঘাটে যাকে তাকে দেখবে তারই সঙ্গে আমোদ করে বেড়াবে? অত কথায় কাজ কী, কোন্ দেশের পুরুষেরাই 'যে-সে' পুরুষের সঙ্গে 'আমোদ' করে বেড়ায়? আমরা তো অনেক লোকের সঙ্গে মিলে থাকি, আমরা কি কেবলমাত্র আমোদ করবার জন্যেই মিলি? আমরা কাজ-কর্মের জন্যে মিলি, ভদ্রতার খাতিরে মিলি, বন্ধুভাবে মিলি, সাহায্য করতে মিলি, সাহায্য গ্রহণ করতে মিলি এবং মেলবার আরও অসংখ্য উপলক্ষ আছে। পৃথিবীতে শত সহস্র মানুষ আছে ও মানুষ সামাজিক জীব, সুতরাং মানুষে মানুষে পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হওয়াই স্বাভাবিক। নিতান্ত চোকে ঠুলি দিয়ে না বেড়ালে বা অন্তঃপুরের সিন্ধুকে চাবিবন্ধ না থাকলে এ রকম দেখাসাক্ষাৎ নিবারণের আর তো কোনো উপায় নেই। তা ছাড়া অন্য লোকের সঙ্গে মেশা কি স্বামীর প্রতি অপ্রীতির চিহ্ন? আমি তো তার একটা অর্থ খুঁজে পাই নে। তোমার একটি নিতান্ত অন্তরঙ্গ প্রাণের বন্ধু আছে, কিন্তু তাই বলে কি তুমি ঘোমটা টেনে বসে থাকবে, ও পরপুরুষের (অর্থাৎ বন্ধু ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের) মুখ দেখবে না বা তাদের সঙ্গে কথা কবে না? তাদের মুখ দেখলে বা তাদের সঙ্গে কথা কইলে কি তোমার বন্ধুর ভালোবাসার প্রতিদান দেওয়া হল না? এমন বন্ধুর সঙ্গে আমি তো কোনো কারবার রাখি নে।

যা হোক—'এই-সকল যৎপরোনাস্তি দুরূহ বিষয়ের তত্ত্ব' এই বাঙালিকে শিক্ষা দেবার জন্যে লেখক-মহাশয় একটা নূতন বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করবার পরিশ্রম স্বীকার না করে যদি তাঁর অবসরমত এই ভারতীতে এ বিষয়ে মাঝে মাঝে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন, তা হলে এই য়ুরোপ-

প্রবাসী বঙ্গযুবক গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ তাঁর নোটানলের ইন্ধনযোগ্য আরও কতকগুলো সৃষ্টিছাড়া সমাজসংস্কারক মত পাঠিয়ে দেবে।

২

আর-বারে আমি অন্য লোকদের মুখ থেকে তাঁদের বিলেতের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করেছিলুম তোমাদের উপকারার্থে তা আমি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করে যথা সময়ে পাঠিয়েছি। আমার যা কর্তব্য তা আমি করেছি, এখন তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে সেটি আদ্যোপান্ত পাঠ করা ও সে বিষয়ে তোমাদের মতামত ব্যক্ত করে যত শীঘ্র পার আমাকে একটা উত্তর লিখে পাঠানো। কেমন?

এর আগে তোমাদের যে-সব চিঠি পাঠিয়েছি তাতে যখন যা মনে হয়েছে বলেছি, এখন সেই-গুলোকে আর-একটু শৃঙ্খলবদ্ধ করে লিখতে চাই। এখেনে কী কী দেখে আমার মনে কিরকম সংস্কার হল, আমি কী নতুন জ্ঞান লাভ করলুম, আমার মনে কী নতুন মত গড়া হল ও কী পুরোনো মত ভেঙে গেল, তাই লিখতে চেষ্টা করব। অতএব এবারকার চিঠির প্রধান নায়ক হচ্ছেন 'আমি'। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত—'আমি'। সুতরাং খুব সম্ভব যে, এই চিঠির কাগজের চার পৃষ্ঠা-পূর্ণ অহমিকা পড়তে পড়তে অর্ধপথে তোমার গা ঝিমিয়ে আসবে, চোখের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে ও নাসারন্ধ্র হতে একটা বেসুরো কোলাহল উত্থিত হতে থাকবে। 'আমি' পদার্থের মতো প্রিয় ও আমোদজনক আর কী হতে পারে বলো। কিন্তু আমরা সকল সময়ে বিবেচনা করি নে যে, 'আমি' আমারই কাছে 'আমি', কিন্তু তোমার কাছে 'তুমি' বৈ আর কিছুই নয়। এইরকম সাত পাঁচ ভেবে 'আমি' বলে একটা বস্তুকে সহসা তোমাদের সভার মধ্যে নিয়ে গিয়ে বলপূর্বক খাড়া করে তুলতে আমার কেমন সংকোচ বোধ হচ্ছে। বিলেত সম্বন্ধে আমার নিজের যৎসামান্য অভিজ্ঞতার সারাংশ প্রকাশ করতে প্রস্তুত হয়েছি। এইখানে একটা কথা বলে রাখি, কথাটা কিছু গম্ভীর ছাঁচের। অভিজ্ঞতা বলতে কী বোঝায়? কতকগুলি বিশেষ ঘটনার বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ করা ও তার থেকে একটা সাধারণ মত প্রতিষ্ঠা করে নেওয়া। আমি অতি বিনীত ভাবে নিবেদন করছি যে, যে দিক থেকে দেখো, আমার অভিজ্ঞতার মূল্য বড়ো অধিক নয়। প্রথমত, আমি এখেনে এত অধিক দিন নেই ও এত বিশেষ সুবিধে পাই নি যা থেকে এখানকার সমাজের অনেক দেখে শুনে নিতে পারি; দ্বিতীয়ত, বিশেষ ঘটনাবলী থেকে একটি যথার্থ সাধারণ মত তৈরি করে নিতে যতটা বুদ্ধির আবশ্যক ততটা আপাতত আমার তহবিলে আছে কি না সে বিষয়ে আমার নিজের ও আমার আলাপী বন্ধুবর্গের ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে। অতএব আমার এই আধ-সিদ্ধ অভিজ্ঞতার ব্যঞ্জনগুলো তোমাদের পাতে দিচ্ছি, যদি রুচিজনক হয় ও তোমাদের পাকযন্ত্রের হানি-জনক বিবেচনা না কর তা হলে সেবা কোরো। এইখানে আমার উদ্যোগপর্ব ও বিনয়পর্ব শেষ করে প্রবন্ধের যথাশাস্ত্র মুখবন্ধ করে প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ করি।

আমরা লন্ডনে দুই-এক ঘণ্টা থেকেই ব্রাইটনে প্রস্থান করি। ব্রাইটন সমুদ্রের ধারে—একটা বড়ো শৌখিন (fashionable) শহর। দেখতে শুনতে আকারে ইঙ্গিতে লন্ডনেরই মতো, কেবল লন্ডনের মতো সে রকম অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন ভ্রূকুটিকুটিলমুখ নয়। আমাদের একটি বাঙালি পরিবার ব্রাইটনে বাস করেন, তাঁদের সেখেনে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। দেখি যে আমাদের গৃহিণী তাঁর দিশি বস্ত্র পরে ছেলেপিলে নিয়ে ঘরে অন্নপূর্ণার মতো বিরাজ করছেন।

তাঁর দিশি কাপড় দেখে তাঁর বিলিতি বন্ধুরা অত্যন্ত প্রশংসা করেন ও তাঁর দিশি বন্ধুরা সেই পরিমাণে খুঁতখুঁত করেন। তাঁর দিশি কাপড় দেখে তাঁর বিলিতি বন্ধু Miss—বলেন 'ঐ রকম ভাঁজ-ভাঁজ কাপড়ে যে-একটি সুন্দর শ্রী আছে, তা আঁট-সাঁট ছাঁটা-ছোঁটা গাউনে পাওয়া যায় না'; তাঁর দিশি বন্ধু Miss—(একজন বিলিতি বাঙালি) বলেন যে, 'যে কাপড়টা পরা হচ্ছে

সেটা একে তো সম্পূর্ণ দিশি নয় (অর্থাৎ ফিন্‌ফিনে শান্তিপুরে শাড়ি নয়) তার উপরে তাতে যদি এক রত্তি শ্রী থাকত তা হলেও নাহয় ভদ্রসমাজে পরা যেত, কিন্তু তাও নেই।' এইরকম বিলিতি ও দিশি বন্ধুদের মধ্যে মতের আকাশ পাতাল তফাত দেখা যাচ্ছে। আমি তো আগেই বলেছি যে, বাঙালি সাহেব হয়ে উঠলে তিনি সাহেবের ঠাকুরদাদা হয়ে ওঠেন; আপনার লোক পর হয়ে গেলে সে যেমন পর হয়ে যায় এমন আর কেউ হয় না। যা হোক, আমাদের দেবীর যে এখনো অনেকগুলি 'কুসংস্কার' আছে দেখে আমরা তৃপ্তি লাভ করলেম। এমন-কি তিনি বললেন যে, বিলেতে এসে তাঁর 'কুসংস্কার'গুলি আরও বদ্ধমূল হচ্ছে। কী সর্বনাশ! দেশের উপর ভালোবাসা আরও বেড়েছে। কী আশ্চর্য! তিনি বললেন তাঁর মনের এতদূর পর্যন্ত উন্নতি হয় নি যে, সার্বভৌমিক ভাব তাঁর মনে বদ্ধমূল হতে পারে, বরঞ্চ সে বিষয়ে তাঁর মন আরও সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। তোমরাই বলো, বিলেতে এসেও এঁর যদি এই দুর্দশা তা হলে এঁর কি আর শোধরাবার উপায় আছে? ছেলেপিলেরা দেখলুম অত্যন্ত খুশিতে আছে, তাদের স্ফূর্তি ও উদ্যম দেখে কে! সমস্ত দিনের মধ্যে লাফালাফি হুটোপাটির তিলেক বিশ্রাম নেই। এইমাত্র সু— এসে আমার লেখার সম্বন্ধে কত শত প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিল। জিজ্ঞাসা করছিল কী করে আমি এত বড়ো চিঠি বাড়িতে লিখি, সে এর অর্ধেকও লিখতে পারে না। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল এত বড়ো চিঠি লেখবার আবশ্যক কী, ছোটো করে লিখলে তো সেই একই কথা। তৃতীয় প্রশ্ন হল, 'অত কষ্ট করে হাতে করে না লিখে যদি ছাপিয়ে পাঠিয়ে দেও তা হলে কী হানি'— ছাপিয়ে পাঠালে তার মতে কত প্রকার সুবিধে তাই একে একে বলতে লাগল। তার পরে আমার চিঠি পড়তে চেষ্টা করতে লাগল। তার পরে তার শেষ উপসংহার হচ্ছে যে আমার লেখা অত্যন্ত খিজিবিজি, বাঁকা-চোরা, অপরিষ্কার (সে নিজে বুঝতে পারলে না বলে বোধ হয়)—মুক্ত কণ্ঠে এই মতটি ব্যক্ত করে টেবিলের চারি দিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করলে। ইতিমধ্যে কখন বি— এসে আমার চৌকির পিছন দিক থেকে আমার কাঁধে চড়ে বসবার বন্দোবস্ত করছে, তাকে কাঁধে চড়তে দেখে সু—র জেদ হল সেও কাঁধে চড়বে, অবশেষে দুজনে আমার দুই কাঁধে চড়ে বসেছে— আমি তো এই অবস্থায় লিখছি। তোমরা এ কথা শুনে হয়তো অবাক হয়ে গেছ— বিশেষত তুমি যে শাসনভক্ত, তোমার চুল হয়তো দাঁড়িয়ে উঠেছে। এ ছেলেদের পেলে তুমি দিন-কতক পিটিয়ে মনের সাধ মেটাও— না? দুরন্ত ছেলে তুমি দু চক্ষে দেখতে পার না। তুমি চাও— ছেলেরা গুরুলোকদের কাছে চুপচাপ করে ঘাড়টি গুঁজে বসে থাকবে, কথা জিজ্ঞাসা করলে তবে কথা কবে, কথা কবার সময় গলার স্বর অত্যন্ত নিচু হবে, গুরুলোকদের সাক্ষাতে কোনো প্রকার নিজের মত ব্যক্ত করবে না, তাঁদের অত্যন্ত ভক্তি ও মান্য করবে ইত্যাদি। এ যে শুধু ছেলেপিলেদের প্রতিই খাটবে তা নয়, গুরুলোকদের কাছে লঘু লোক মাত্রেরই এই-সকল কর্তব্য। তোমার মত হচ্ছে: লালনে বহবোদোষাস্তাড়নে বহবোগুণাঃ, তস্মাৎ পুত্রঞ্চ ভৃত্যঞ্চ তাড়য়েন্নতু লালয়েৎ। যা হোক, এই গুরু-ভক্তির বিষয়ে আমার অনেকটা মতপরিবর্তন হয়েছে, সে বিষয়ে তোমাদের একটুকু বিস্তৃত করে বলছি। আমাদের সমাজের পথে ঘাটে ভালোবাসার চেয়ে ভক্তির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। আমাদের দেশে পরিবারের মধ্যে গুরুজনের সম্বন্ধে ভালোবাসার সম্পর্ক যেন একেবারে নেই; সমস্তই ভক্তি ও স্নেহ। বয়সের অতি সামান্য তারতম্যে, সম্পর্কের অতি সামান্য উঁচু-নিচুতে, ভক্তি ও স্নেহের সম্পর্ক স্থাপিত হয়; অত কথায় কাজ কী, আমাদের তা ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক মূলে নেই— কেবল যমজ সন্তানদের মধ্যে কিরকম হয় বলতে পারি নে। কিন্তু এরকম ভক্তিকে ভক্তি নাম দিলে সে নামের অসদ্‌ব্যবহার করা হয়—এ একরকম অস্বাভাবিক মনোবৃত্তি, একরকম অস্বাভাবিক ভয়। বড়োদের আমরা স্বভাবতই ভক্তি করি, তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেখে আমরা স্বভাবতই তাঁদের উপর নির্ভর করি, কিন্তু আমাদের পরিবারের মধ্যে যে ভক্তি যে নির্ভরের ভাব বদ্ধমূল সে কি স্বাভাবিক? প্রতি পদে শিক্ষা শাসন ও অভ্যাসের প্রভাবেই কি তার জন্ম হয় না? ছেলেবেলা থেকে প্রতি পদে আমাদের কানে মন্ত্র দিতে হয় যে, পিতা দেবতুল্য, গুরু দেবতুল্য।

কেন, দেবতুল্য কেন? দেবভাবের কঠোর ও সুদূর সম্ভ্রম কেন তাঁদের উপর অর্পণ করা হয়? তাঁরা আমাদের ভালোবাসার পিতা, ভালোবাসার মাতা, ভালোবাসার সঙ্গে আমরা তাঁদের মুক্ত আলিঙ্গনে গিয়ে বদ্ধ হব না যোড়হস্তে বিনীত ভাবে, আমাদের মানুষ পিতার কাছে না গিয়ে, আমাদের জাতের বহির্ভূক্ত কোনো দেবতুল্য ব্যক্তির কাছে গিয়ে অতি সন্তর্পণে বসে থাকব— অতি মৃদুস্বরে কথা কব—অতি নত ভাবে আত্মনিবেদন করব? এর মধ্যে কোন্‌টা স্বাভাবিক? আমাদের পরিবারে গুরুলোকদের 'পরে এইরকম একটা অস্বাভাবিক ভক্তির উদ্রেক করে দেওয়া হয়, গুরুলোকেরাও সেই অন্ধ ভক্তির প্রভাবে বলীয়ান হয়ে ছোটোদের উপর যথেচ্ছব্যবহার করেন। তাঁরা চান, তাঁদের সমস্ত মত সমস্ত আজ্ঞা ছোটোরা অবিচারে শিরোধার্য করে নেয়, সে বিষয়ে তারা তিলমাত্র দ্বিরুক্তি বা দ্বিধা না করে; যেন ছোটোরা কতকগুলি কলের কাঠের পুতুল, তাদের মন নেই, তাদের মনোবৃত্তি নেই, তাদের ইচ্ছে নেই, তাদের বিচারশক্তি নেই! সংসারে তোমার যত প্রকার বড়ো আছে (কেবল লম্বায় ছাড়া) তাদের কাছে তোমার বিবেচনা ও ইচ্ছে কিছুমাত্র খাটিয়ো না, সেগুলি আপাতত সঞ্চিত করে রেখে দেও, অবসর পেলে তোমার ছোটোদের কাছে তা অন্ধভাবে খাটাতে পারবে; তাতে সমাজের কোনো আপত্তি নেই। আমাদের শাস্ত্রে বলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুত্রতুল্য; শুনে শুনে অভ্যেস হয়ে গেছে বলে ও আমাদের দেশে এই-রকম একটা ভাব বর্তমান আছে বলে এর হাস্যজনকতা ঘুচে গিয়েছে, নইলে এর চেয়ে অদ্ভুত আর কী হতে পারে? ভ্রাতা কি ভ্রাতার তুল্য হতে পারে না? সংসারে কি পিতা পুত্র ছাড়া আর কোনো প্রকার সম্পর্ক নেই? ভাই-ভাইয়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বলে কি একটা ভাব বর্তমান নেই? কোনো প্রকারে কান ধরে ভাইয়ের সম্পর্ক কি পিতাপুত্রের সম্পর্কের সঙ্গে মেলাতে হবেই? এমন যন্ত্রণাও তো দেখি নি। তা হলে তো তুমি বলতে পারো হাত মাথার তুল্য; কিন্তু আমি বলি ও রকম তুলনার স্পৃহাটি পরিত্যাগ করে হাতকে হাতের স্থানে ও মাথাকে মাথার স্থানে স্ব স্ব কাজে বজায় রাখা হোক। প্রকৃতি যা করে দিয়েছে সেটাকে ভেঙেচুরে মুচড়ে একটা বিকৃতাকার করে তুলো না। আমাদের দেশের শাস্ত্র যেমন (শাস্ত্র বোধ হয় সকল দেশেই সমান) আজ্ঞা করে, বুঝিয়ে বলে না—ভয় দেখায়, কারণ দেখায় না—আমাদের গুরুলোকেরাও তাই করেন। তাঁরা প্রতিপদে কারণ না দেখিয়ে আজ্ঞা করেন, ছোটো যদি একবার জিজ্ঞাসা করে 'কেন?' তা হলে তাঁরা চোখ রাঙিয়ে বলেন, 'হাঁ, এত বড়ো স্পর্ধা!' এতে যে ছোটোদের মনের একেবারে সর্বনাশ হয় তা তাঁরা বোঝেন না। একটা ঘোড়া কিংবা এক পাল গোরুকে অবিচারে যেখানে ইচ্ছে চালিয়ে বেড়াও তাতে হানি নেই, কেননা তাতে বড়ো জোর তাদের শরীরের কষ্ট হবে, কিন্তু তাতে তাদের মনোবৃত্তির বিকাশ ও বিচারশক্তি-পরিস্ফুটনের কোনো ব্যাঘাত হবে না। কিন্তু কোনো মানুষকে সে রকম কোরো না, বিশেষত তোমার নিজের ভাই নিজের ছেলেকে। তুমি নিশ্চয় জেনো যে, ছেলেবেলা, যখন আমাদের মন খুব কোমল থাকে, তখন থেকে যদি আমরা ক্রমাগত যুক্তিবিহীন আজ্ঞা পালন করে আসতে থাকি, বড়ো লোক বলছেন বলেই দ্বিরুক্তি না করে সব কথা আমাদের শিরোধার্য করে নিতে হয়, তা হলে বড়ো হলেও আমাদের মনের সে অস্বাভাবিক অভ্যাস দূর হয় না, প্রশ্ন করার স্বভাবটা একেবারে চলে যায় আর সে রকম মনে কুসংস্কার অতি শীঘ্র আপনার শিকড় বিস্তার করতে পারে। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের একবার দেখো-না— তাঁরা অনেক পড়েছেন, কিন্তু তবু নিজের একটা স্বাধীন মত প্রকাশ করতে তাঁদের কেমন সাহস হয় না। যদি মিল কিংবা স্পেন্‌সেরের নাম করে তাঁদের নিতান্ত একটা আজগুবি কথা বল, দ্বিরুক্তিমাত্র না করে তা তাঁরা মাথায় করে নেন; বিলিতি কেতাবে ইংরাজি ছাপার অক্ষরে যা লেখা আছে তা তাঁরা আর বুঝে হজম করতে শ্রম স্বীকার করেন না, শুক পাখির মতো মুখস্থ করে যান, কেননা বিলিতি 'authority'র উপর তাঁদের এমন অটল ভক্তি যে বিচার না করেই ধরে নেন যে কথাগুলো সত্য হবেই। তাতে আমি তাঁদের দোষ দিতে পারি নে; কেননা ছেলেবেলা থেকে তাঁদের মন এমনি ছাঁচে গড়া যে, বড়ো লোকের মুখের সামনে একটা প্রশ্ন করতে তাঁদের

বুক ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করে, বড়ো লোক যা বলেছেন তার উপরে আর কথা নেই। তবে দুই বড়ো লোকের মধ্যে যখন মতের অনৈক্য হয়, তখন আমরা চুপ করে অপেক্ষা করতে থাকি— আর-একজন বড়ো লোক এসে তার কী মীমাংসা করে দেন। আমরা বড়ো লোকের নামের ঢেউ দেখলেই যুক্তির হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকি। কিন্তু এরকম না হওয়াই আশ্চর্য। আমাদের নীতিশাস্ত্রে গুরু-লোকের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জন করাই হচ্ছে পুণ্য। ছোটোদের পক্ষে গুরুদের আজ্ঞা পালন করা বাস্তবিকই ভালো, আমি ছোটোদের গুরুদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করতে বলছি নে, কিন্তু গুরুদের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন যে তাঁরা যেন ছোটোদের আজ্ঞা না করেন; হয় অনুরোধ করেন নয় কারণ প্রদর্শন করেন, যখন কারণ প্রদর্শন করেও ফল হল না তখন একটুখানি গুরুত্ব প্রয়োগ করতে পারেন। কেননা, অপরিমিত ভক্তির রাজ্যে যুক্তির অত্যন্ত হীন পদ; তিনি ক্রমে এত মুষড়ে যেতে থাকেন যে অবশেষে তাঁর আর মাথা তোলবার শক্তি থাকে না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের আবার একটা-আধটা গুরুলোক নয়, পদে পদে গুরুলোক। এইরকম ছেলেবেলা থেকে গুরুভারে অবসন্ন হয়ে একটি মুমূর্ষু জাতি তৈরি হচ্ছে। ছেলেবেলা থেকে বলের অন্ধ দাসত্ব করে আসছে, সুতরাং বড়ো হলে সে অবস্থা তার নতুন বা অরুচিজনক বলে ঠেকে না, তার কাছে এ অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আজ্ঞা পালন করে করে তার এমন অবস্থা হয়ে যায় যে, আজ্ঞা করে বললেই তবে সে একটা কথা গ্রাহ্য করে, বুঝিয়ে বলতে গেলেই তবে বেঁকে দাঁড়ায়। এখনকার বিখ্যাত বাংলা-লেখকদের লেখায় কেমন একটা আজ্ঞার ভাব দেখতে পাওয়া যায়— কথাগুলি অসন্দিগ্ধ, স্পষ্ট, জোর-দেওয়া; পাঠকদের সঙ্গে সমান আসনে বসে যে বিচার করছেন তা মনে হয় না কিংবা কথা কয়ে কয়ে যে চিন্তা করছেন তাও মনে হয় না, তাঁরা কতকটা গুরু-মহাশয়ের মতো কথা কন; মনে হয় হাতে একটা বেত আছে, চোখে একটা চশমা আছে, মুখে একটা কঠোর স্বাতন্ত্র্যের ভাব বর্তমান— ইংরাজিতে যাকে dogmatic বলে তাঁদের লেখার আপাদমস্তক সেইরকম। তাতে তাঁদের দোষ নেই, নইলে পাঠকেরা তাঁদের কথা মানে না; পাঠকেরা যেই দেখেছেন তুমি একটু ইতস্তত করছ কিংবা একটা কথা খুব জোর দিয়ে বলছ না, কিংবা তোমার উচ্চ আসন থেকে এতদূর পর্যন্ত নেবে এসেছ যে তাঁদের সঙ্গে সমান ভাবে বিচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছ, তা হলেই তোমার কথা একেবারে অগ্রাহ্য হয়ে দাঁড়ায়। তুমি যুক্তি না দেখিয়ে একটা কথা জোর করে বলো (অবিশ্যি তোমার একটু নাম থাকা দরকার) তাঁরা মনে করেন 'এটা বুঝি একটা ধরা-কথা, কেবল অজ্ঞতাবশত আমরা জানি নে'; তাঁরা অপ্রস্তুত হয়ে সমস্বরে সবাই মিলে বলে ওঠেন, 'হাঁ এ কথা সত্য, এ কথা সত্য।' যুক্তি দেখাতে গেলেই তাঁরা মনে করেন তবে বুঝি এটাতে কোনো প্রকার সন্দেহ আছে, এটা একটা স্থির সিদ্ধান্ত নয়; অমনি তাঁরা চোখ-টেপাটেপি করতে থাকেন; অত্যন্ত অবিশ্বাসের ভাব দেখান; মনে করেন এ বিষয়ে অনেক কথা ওঠানো যেতে পারে, অর্থাৎ আমি যদি বা না পারি আমার চেয়ে আর কোনো বুদ্ধিমান জীব হয়তো পারেন, যুক্তিটা শুনেই যে আমি বলে যাব 'হাঁ সত্যি'— আবার দুদণ্ড বাদে যদি ওর একটা ভুল বেরিয়ে পড়ে তা হলে কি অপ্রস্তুত হয়ে পড়ব? পাঠকেরা যে-লেখকের কথা পালন করতে চান সে-লেখকের পাঠকদের চেয়ে একটা স্বতন্ত্র প্রাণী হওয়া আবশ্যক; পাঠকদের কাছে এমন বিশ্বাস জন্মিয়ে দিতে হবে যে তিনি সব জানেন, তাঁর উপরে আর কারও কিছু বলবার কথা নেই। বলবার কথা থাকলেই তিনি একেবারে মাটি হয়ে গেলেন। তার মূল কারণ, ছেলেবেলা থেকে আমরা শাসনের বশ, যুক্তির রামরাজ্যে আমরা বাস করি নি। তুমি ঘর থেকে গড়ে-পিটে তৈরি করে আমাদের একটা অসন্দিগ্ধ আজ্ঞা দেও আমরা পালন করব, কিন্তু তোমার ঝুড়ি থেকে তোমার যুক্তির মালমশলাগুলি বের করে আমাদের সুমুখে একটি পরামর্শ তৈরি করো সে কোনো কাজে লাগবে না। কেননা আমরা ছেলেবেলা থেকে আমাদের গুরুলোকদের অভ্রান্ত বুদ্ধির উপর নির্ভর করছি, আমরা যেখেনেই আমাদের নিজের মত খাটাতে গিয়েছি সেইখেনেই তাঁরা ছেলেমানুষ বলে আমাদের চুপ করিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু কখনো যুক্তি দিয়ে আমাদের মুখ

বন্ধ করেন নি। ছেলেমানুষের কাছে যুক্তি প্রয়োগ করা তাঁরা বৃথা পরিশ্রম মনে করেন। আমাদের শাস্ত্রকারেরাও এক কালে তাই মনে করতেন; তাঁরা শ্রম সংক্ষেপ করবার জন্যে সত্যকথাগুলিও মিথ্যার আকারে প্রচার করেছেন ও যুক্তির বদলে বিভীষিকা দেখিয়ে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছেন। যদি বল গুরুলোকেরা আমাদের চেয়ে জ্ঞানী, সুতরাং তাঁদের হাতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে গচ্ছিত রাখা আমাদের পক্ষে ভালো—তা যদি বল তা হলে ইংরাজদের কাছ থেকে কতকগুলি স্বাধীনতা পাবার জন্যে আমরা খবরের কাগজে দাপাদাপি করে মরি কেন? ইংরাজরা যে আমাদের চেয়ে জ্ঞানে ও গুণে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। সম্পর্কে-বড়ো কিংবা বয়সে-বড়োর চেয়ে গুণে-বড়োর কাছে আত্মবিসর্জন করা ঢের বেশি যুক্তিসিদ্ধ। তবে কেন তাঁদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে আমরা নিজের হাতে কতকগুলি স্বাধীনতা নিতে চাই? তুমি বলবে, যাঁদের আমাদের উপরে স্বাভাবিক অধিকার আছে, তাঁদের কাছে আমরা সর্বতোভাবে আজ্ঞাবহ হয়ে থাকব। তা থাকো-না কেন। কিন্তু ফলে যে সমানই কথা। তোমার চড় মারবার অধিকার আছে বলে যে ব্যক্তি চড় খাবে তার যে কিছু কম লাগবে তা তো নয়। যেখানেই অন্ধ একাধিপত্য সেইখানেই খারাপ। যখন গুরুলোকেরা আপনার ইচ্ছা ও সংস্কার এমন-কি কুসংস্কারের বিরোধী হল বলে ছোটোর প্রত্যেক ইচ্ছা অবিচারে দলন না করবেন, তখন অনেক উপকার হবে। আমাদের দেশের অশুভের মূল ঐখান থেকে অনেকটা পোষণ পাচ্ছে। এখানকার তুলনায় আমি সেইটি ভালো করে বুঝতে পেরেছি। সু—বি—দের দেখো, তাদের উদ্যম উৎসাহ, অধীর বাল্যভাব ও স্বাধীনতাস্পৃহার সঙ্গে আমাদের দেশের ছেলেদের শুষ্ক মলিন গম্ভীর ধীর ভাব ও সম্পূর্ণ-রূপে পরনির্ভরতার তুলনা করে দেখো—সে কী অনৈক্য! আমি ইংরেজের ছেলেদের সঙ্গে তুলনা করলুম না, পাছে তুমি বল তাদের জাতিগত স্বভাবের সঙ্গে আমাদের জাতীয় স্বভাবের ভিন্নতা আছে। কিন্তু আমাদের দেশীয় ছেলেই যথোপযুক্ত স্বাধীনতার সঙ্গে পালিত হলে তার কিরকম স্ফূর্তি হয়, তার মনের স্বাস্থ্য কিরকম অক্ষুণ্ণ থাকে তাই দেখো। ছেলেদের স্বাভাবিক ভাব হচ্ছে প্রশ্ন করা, একটা জানবার ইচ্ছে। এখানকার ছেলেরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে করে সারা হয়। সু— আমাকে প্রশ্ন করে করে অস্থির করে তোলে; আকাশের তারা থেকে পৃথিবীর তৃণ পর্যন্ত এমন কোনো পদার্থ নেই, বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটি করে সে যার ঘরের খবর না জানতে চায়। আমি যখন টর্কিতে ছিলুম তখন একটি ছেলে আমার সঙ্গে খুব ভাব করে নিয়েছিল; পৃথিবীর যা-কিছু দেখত তাই যেন তার ভারি আশ্চর্য লাগত, প্রতিপদে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করে আমাকে ভারি মুশকিলে ফেলত---তার কৌতূহলের আর আদি অন্ত নেই। তা ছাড়া এখানকার ছেলেদের এক-রকম স্বাধীন ও পৌরুষের ভাব দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। তার প্রধান কারণ, এখানকার গুরুলোকেরা তাদের প্রতি পদে বাধা দেয় না, আর অনেকটা সমান সমান ভাবে রাখে। আমি এখানকার একটা প্রাইবেট স্কুল দেখেছিলেম—মাস্টার ছেলেদের সঙ্গে ঠাট্টাঠুট্টি করেন, খেলা করেন, কত যে স্বাধীনতা দেন তার ঠিক নেই; অথচ তাতে কিছু তাদের 'মাথা-খাওয়া' হয় নি, পড়া-শুনোতে তাদের কিছু মাত্র ত্রুটি নেই। এই তো গেল ছেলেদের কথা। আর বড়োরা যে গুরুর সঙ্গে খুব কম সম্পর্ক রাখে তা বলাই বাহুল্য। এখানে এমন স্বাধীনভাব বর্তমান যে, প্রভু-ভৃত্যের মধ্যেও সেরকম আকাশ-পাতাল সম্পর্ক নেই। এখানে চাকরকে গালাগালি দেওয়া ও মারাও যা একজন বাইরের লোককে গালাগালি দেওয়া ও মারাও তাই। আমাদের দেশের মতো চাকরদের বেঁচে থাকা ছাড়া অন্য সমস্ত অধিকার মনিবদের হাতে নেই। চাকর কোনো কাজ করে দিলে 'thank you' ও তাকে কিছু আজ্ঞা করবার সময় 'please' বলা আবশ্যক। একবার কল্পনা করে দেখো দেখি, আমরা চাকরদের বলছি 'অনুগ্রহ করে জল এনে দেও' বা 'মেহেরবানি কর্‌কে পানি লে আও' ও জল এনে দিলে বলছি 'বাধিত রইলুম'। তুমি হয়তো বলবে 'thank you' ও 'please'—ও কেবল একটা মুখের কথা মাত্র। কিন্তু জাতীয় আচার-ব্যবহার প্রতি পদে যে কথা-দুটোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় জাতীয় হৃদয়ে তার কারণ নিশ্চয়ই বর্তমান আছে। কিন্তু এ বিষয়ে

তোমার সঙ্গে হয়তো জোর করে তর্ক করছি, তুমি হয়তো মান যে হৃদয়ের মাটিতে শিকড় না থাকলে একটা কথা তিন দিনে শুকিয়ে মারা যায়। এখানে মনিবরা টাকা দেন ও চাকরেরা কাজ করে দেয়, উভয়ের মধ্যে কেবল এইটুকু বাধ্যবাধকতা আছে। তুমি টাকা না দিলে চাকর কাজ করবে না, চাকর কাজ না করলে তুমি টাকা দেবে না। কিন্তু একটুখানি কাজের ত্রুটি হলে তাকে ও তার অনুপস্থিত নির্দোষ পিতা পিতামহ বেচারিদের সম্পর্কবিরুদ্ধ বিশেষণ প্রয়োগ করবার কী অধিকার আছে? এখানে চাকরদের মধ্যে দাসত্বের ভাব যে কত কম তা হয়তো তুমি না দেখলে ভালো করে বুঝতে পারবে না। আমি একটি পরিবার জানি, সেখানে মনিবরা রান্না ঘরে যেতে হলে রাঁধুনির অনুমতি চেয়ে পাঠাতেন, পাছে তার কাজের মধ্যে intrude করলে সে বিরক্ত হয়ে ওঠে! এই থেকে কতকটা বুঝতে পারবে। এইরকম এখানকার পরিবারে স্বাধীনতা মূর্তিমান, কেউ কাউকে প্রভুভাবে আজ্ঞা করে না ও কাউকে অন্ধ আজ্ঞা পালন করতে হয় না। এমন না হলে একটা জাতির মধ্যে এতটা স্বাধীনভাব কোথা থেকে আসবে? কিংবা হয়তো আমি উল্টো বলছি, একটা জাতির হৃদয়ে স্বভাবত এতটা স্বাধীনভাব না থাকলে এমন কী করে হবে? যাদের হৃদয়ে স্বাধীনভাব নেই তারা যেমন অম্লানবদনে নিজের গলায় দাসত্বের রজ্জু বাঁধতে পারে, একটু অবসর পেলেই পরের গলায়ও তেমনি অকাতরে দাসত্বের রজ্জু বাঁধতে ভালোবাসে। আমাদের সমাজের আপাদমস্তক দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্ধ। আমরা পারিবারিক দাসত্বকে দাসত্ব নাম দিই নে; কিন্তু নামের গিলটি করে আমরা বড়োজোর দাসত্বের লোহার শৃঙ্খলকে সোনার আকার ধরাতে পারি, কিন্তু তার শৃঙ্খলত্ব ঘোচাতে পারি নে, তার যা কুফল তা থেকে যায়। আমি আগে মনে করতুম যে হিন্দুদের মনে একটা সহজ স্বাভাবিক ভাব আছে, কোনো প্রকার অস্বাভাবিক বাঁধাবাঁধি আইন-কানুন নেই। কিন্তু কোন্ লজ্জায় আর তা বলব বলো। হিন্দুদের মধ্যে অস্বাভাবিক আইন-কানুন নেই? তাদের পরিবারের মধ্যে দেখো! আপনার ভাই-বোন পিতা-মাতা স্ত্রী-পুত্রের মধ্যে কতটা বাঁধাবাঁধি আছে একবার দেখো। ভাইয়ের প্রতি কিরকম ব্যবহার করতে হবে তা কোন্ দেশে শেখাতে হয় বলো দেখি। তবে যদি বল যে, ভাইয়ের প্রতি পিতা বা পুত্রের মতো ব্যবহার করতে হবে, তা হলে শেখাবার খুব আবশ্যক করে বটে, কোনো মানুষের সহজ অবস্থায় আত্ম-প্রত্যয় থেকে ও কথা মনে আসবার কোনো সম্ভব নেই। গুরুলোকদের কাছে বেশি কথা কওয়া বা হাসা পর্যন্ত নিষেধ। কী ভয়ানক! যাদের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা অনবরত থাকতে হবে তাদের সঙ্গে যদি মন খুলে কথাবার্তা না কবে, প্রাণ খুলে না হাসবে, তাদের কাছেও যদি জিবের মুখে লাগাম লাগিয়ে, হাস্যোচ্ছ্বাসের মুখে পাথর চাপিয়ে আর মুখের ওপর একটা সম্ভ্রমের মুখোশ পরে দিনরাত্রি থাকতে হয় তা হলে কোথায় গিয়ে আর বিশ্রাম পাবে? ইনি দাদা, উনি কাকা, তিনি মামা, এ ছোটো ভাই, ও ভাইপো, সে ভাগ্নে, কারু কাছে ভালো করে মুখ খোলবার জো নেই। কী করা যায়? বাড়ি থেকে বেরিয়ে বোসেদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে আড্ডা গাড়তে হয়, সেখানে পাঁচ জনে মিলে তামাক খাওয়া, দাবা খেলা ও হাসি-তামাশা করা যায়। এ দুর্দশা কেন বলো দেখি! আফিস থেকে এসে যেমন আফিসের কাপড়-চোপড় ছেড়ে হাঁফ ছাড়া যায় তেমনি বাড়িতে প্রবেশ করেই লৌকিক ব্যবহারের খোলস পরিত্যাগ করে মনটাকে কেন একটুখানি হাত-পা ছড়াতে দেওয়া হয় না? তখনো কেন আমি স্ত্রীর সঙ্গে চুপিচুপি ফিস্ ফিস্ করে কথা কব, পাছে পাশের ঘর থেকে শ্বশুর ভাসুর বা ঐরকম একটা কোনো মান্যবর পূজনীয় সম্পর্কের ব্যক্তি আমার স্ত্রীর গলা শুনতে পায়? স্ত্রীর গলা বা হাসি শুনলে কার কী সর্বনাশ হয় বলো দেখি। একেই কি সহজশোভন ভাব বলে? এর মধ্যে সহজ ভাবটা কোন্‌খানে বলো দেখি। বিলিতি-বাঙালিরা যে দেশে ফিরে গিয়ে খুঁতখুঁত করেন ও বলেন আমাদের দেশে 'home' নেই, বিলেতেই যথার্থ 'home' আছে, তাঁরা বোধ হয় তার এই অর্থ করেন যে—বিলাতের পরিবারে একটা স্বাধীন-উচ্ছ্বাসের ভাব আছে। বাপ-মা ভাই-বোন স্ত্রী-পুত্রে মিলে হাসি গল্প গানে অগ্নিকুণ্ডের চার ধার উচ্ছ্বাসময় করে তোলে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বাড়িতে এসে একটা উল্লাস—একটা

মেশামেশির ভাব দেখতে পাওয়া যায়। এক ঘরে শ্বশুর তাঁর দুই-চারটি বৃদ্ধ বন্ধু জুটিয়ে তামাক খেতে খেতে এখনকার ছেলেপিলেদের অশাস্ত্রীয় ব্যবহারে কলির দ্রুত উন্নতির আশঙ্কা করছেন, আর-এক ঘরে বউ সাত হাত ঘোমটা টেনে তাঁর শাশুড়ির কাছ থেকে নীরবে তাঁর দৈনিক তিরস্কার সেবন করছেন, আর-এক ঘরে স্বামী তাঁর দুই-একটি যুবা বন্ধু জুটিয়ে নিন্দালাপ করছেন— এরকম চিত্র এখানকার কেউ কল্পনা করতে পারে না। আমাদের মুখ খোলবার জায়গা পরের কাছে। বউয়ের দুই-চারটি সমবয়সী সই আছে, তাদের কাছে অবসরমত স্বামীর ভালোবাসার গল্প করে; শাশুড়ির কতকগুলি প্রৌঢ়া প্রতিবাসিনী আছে, সকলে মিলে পাড়ার অন্তঃপুরের সুস্বাদ গুপ্ত খবরের আলোচনা করা হয়; স্বামীর কতকগুলি যুবা বন্ধু আছে তাদের সঙ্গে কালেজীয় অশাস্ত্র আলোচনা চলে; আর শ্বশুরের চণ্ডীমণ্ডপে পাড়ার কতকগুলি খুড়ো ও দাদা-মহাশয়ের আমদানি হয়, ও ঐ-সকল পাকা বুদ্ধিতে মিলে ইহকাল ও পরকালের অনেক কঠিন বিষয় মীমাংসা করেন। আমাদের পরিবারে পরকে আপনার করে নিতে হয়, কেননা আপনার সকলে পর। অসদ্‌ব্যবহার বা পাপকার্যে লোকের স্বাধীনতা যত কমাও ততই ভালো, কিন্তু নির্দোষ এমন-কি উপকারজনক বিষয়ে স্বাধীনতা যত কম ছাঁটা যায় ততই ভালো। শ্বশুরে স্ত্রীর গলা শুনলে পৃথিবীর কী হানি ও নরকের কী শ্রীবৃদ্ধি হয় বলো দেখি। আপনার লোক সকলে মিলে মিশে গল্পসল্প করলে উপকার ছাড়া অপকার কী হয় বলো দেখি। অনেকে সমাজের অনেক রকম বড়ো বড়ো সংস্কারের কথা পাড়েন, আমি একটা ছোটোখাটো পরামর্শ দিচ্ছি শোনো দেখি— আমাদের পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্যজনক স্বাধীনতা সঞ্চার করে দেও দেখি, টানাটানি বাঁধাবাঁধি শাসন ও পরনির্ভরতা কমিয়ে দেও দেখি। তুমি হয়তো ভারি চটে উঠেছ; তুমি বলছ যে, 'তুমি বিলেতে কী দেখেছ শুনেছ তাই বলো, আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনি; কিন্তু এরকম যদি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ কর তা হলে তো আর আমাদের ধৈর্য থাকে না।' কিন্তু তোমাকে এইখেনে বলে রাখছি, আমি এ চিঠিতে টেম্‌স্‌ টানেল ও ওয়েস্ট্‌মিনিস্টর হলের বর্ণনা করতে বসি নি। বিলেতের সমাজ আদি দেখে আমার কী মনে হল ও আমার কিরকমে মত পরিবর্তন ও গঠিত হল তাই বলব। আজ আমার যে মত তোমাদের বিস্তৃত করে লিখলুম তা এখানকার সমাজ দেখে আস্তে আস্তে আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছে। একটা সমাজের ভিতরে না থেকে, বাইরে থেকে তা আলোচনা করলে তার অনেক বিষয় যথার্থরূপে চোখে পড়ে; ভিতরে থাকলে খুব কম বিষয় আমাদের চোখে পড়ে, সকলই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। আমার তাই একটি মহা সুবিধে, আর-একটি সমাজের সঙ্গে তুলনা করতে পারছি। তোমার নিজের মতের সঙ্গে মিলল না বলে তুমি হয়তো বলবে 'বিলেতে গিয়ে লোকটার মাথা ঘুরে গিয়েছে'। এ কথা বললে কোনো যুক্তি না দেখিয়ে আমার সমস্ত কথা-গুলো এক তোপে উড়িয়ে দিতে পারো। কিন্তু আমি তোমাদের বিশেষ করে বলছি, বিলেতে এসে কারু যদি মাথা না ঘুরে থাকে তো সে তোমাদের এই বিনীত দাসের।

৩

স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে সম্পাদক-মহাশয়ের সঙ্গে আমার ঝগড়াটা নিতান্তই চলল দেখছি। কিন্তু সে তো এক প্রকার সুখেরই বিষয়। বিষয়টা গুরুতর; সে সম্বন্ধে দু পক্ষের মতামত ব্যক্ত হয়ে একটা আন্দোলন হওয়াই প্রার্থনীয়। কিন্তু কথাটা যতই গুরুতর ও সারবান হোক-না, আমার গলার দোষে মারা যায় বা! অর্থাৎ সম্পাদক-মহাশয় পাছে তাঁর অতুচ্চ অট্টহাস্যের প্লাবনে আমার ক্ষীণ-কণ্ঠের কথাগুলো একেবারে ভেঙে-চুরে উল্টে-পাল্টে তোলপাড় করে ভাসিয়ে নিয়ে যান, কথাগুলো একেবারে পাঠকদের কানে ভালো করে না পোঁছয়। এখেনে একটা সেখেনে একটা তাঁর ছুঁচোলো নোটের হাস্যবিষাক্ত খোঁচা খেয়ে খেয়ে আমার গরিব ভালোমানুষ মতগুলি প্রাণের দায়ে উর্ধ্বশ্বাসে

দেশছাড়া হয় বা! পাঠক-মহাশয়েরা আমার কথাটা একবার অবধান করুন; আর কিছু নয়, লেখক-মহাশয় আমার কথাটা আপনাদের ভালো করে শুনতে দিচ্ছেন না। আমি একটা কথা বলতে মুখ খোলবার উপক্রম করেছি-কি, অমনি তিনি দশটা কথা কয়ে একটা ঘোরতর কোলাহল উত্থাপন করেছেন আর আমার কথাটা একেবারে মাথা তুলতে পারে নি। পাঠক-মহাশয়েরা যদি এক পক্ষের কথা শুনতে না পান ও গোলেমালে একটা ভুল বুঝে যান তবে বড়ো দুঃখের বিষয় হবে।

লেখক-মহাশয়ের নোটের বিরুদ্ধে আমার প্রধান নালিশ ছিল এই যে, আমি যে কথা বলি নি সেই কথা আমার মুখে বসানো হয়েছে। তার উত্তরে তিনি বলেন যে, 'লেখক কী ভাবে কী কথা বলিয়াছেন তাহার প্রতি তত আমাদের লক্ষ নহে যত পাঠকেরা তাঁহার কথা কী ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহার প্রতি।' দোহাই পাঠক-মহাশয়দের, আমি এক কথা বললে আপনারা আর-এক কথা যদি শোনেন তবে আমি গরিব মারা যাই কেন? আমি যদি বলি বিশ্বম্ভর বাবুর দুই পা আর আপনাদের মধ্যে কেউ শোনেন বিশ্বম্ভর বাবুর চার পা, তা হলে যদি সম্পাদক-মহাশয় আমার চুলের ঝুঁটি ধরে বিধিমতে নিগ্রহ করেন ও দশটা শাস্ত্র থেকে প্রমাণ উদ্ধৃত করে দশ জন পশুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মত নিয়ে আমাকে দশ ঘণ্টা ধরে গম্ভীরভাবে বোঝাতে আরম্ভ করেন যে বিশ্বম্ভর বাবুর দুই পায়ের অধিক পা হবার কোনো প্রকার সম্ভাবনা নেই—শুদ্ধ তাই নয়, তাই নিয়ে হাসি-টিটকিরি করে, ঠাট্টা-মস্করা করে, দশ জন ভদ্রলোকের কাছে আমাকে বিধিমতে অপদস্থ করেন যদি—তবে আমি সহ্য করি কী করে বলুন দেখি! শাশুড়িরা যে ঝিকে মেরে বউকে শিক্ষা দেন, তাতে যে অনেক সময়ে অনেক উপকার হয় সে বিষয়ে আমি দ্বিরুক্তি করি নে, কিন্তু আপনারা কি অস্বীকার করতে পারেন যে, উপকারটা বউয়ের হোক কিন্তু যদি কারু পিঠে বেদনা হয় তো সে ঝিয়েরই। আচ্ছা, ভালো—আমার পিঠ বেকার অবস্থায় পড়ে আছে আর সম্পাদক-মহাশয়ের মুষ্টির যদি আর কোনো কাজ না থাকে তবে আমার নিরীহ পিঠের ওপর যথেচ্ছাচার করুন, কিন্তু এটা যেন মনে থাকে সে কিলগুলো প্রাপ্য আপনাদের, কেবল সম্পাদক-মহাশয়ের অপূর্ব বিচারে সে কিলের ভার যিশুখৃস্টের মতো আপনাদের হয়ে সমস্ত আমাকেই বহন করতে হচ্ছে।

লেখক-মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটা বিবাদ ছিল এই যে, তিনি স্বাধীনতা অর্থে বেহায়ামো, অবিনয়, অসরলতা, উচ্চের প্রতি অ-ভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি অ-দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি ঠাউরেছেন কেন? তার উত্তরে তিনি যা বলেন তার ভাবটা হচ্ছে এই যে, পাছে পাঠকেরা তাই ঠাউরে থাকেন এই কারণ-বশত, আর কিছু নয়! কিন্তু আমার অপরাধ? 'লেখক বিলাতি বিবিদের চাল-চোল-ধরন-ধারণের আনুষঙ্গিক-রূপে স্ত্রীস্বাধীনতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, এজন্য বিলাতানভিজ্ঞ অধিকাংশ লোকের মনে এইরূপ একটা কুসংস্কার জন্মিতে পারে যে কার্যত স্ত্রীস্বাধীনতা আর কিছু নহে, কেবল বিবিদিগের চাল-চোল-ধরন-ধারণ ইত্যাদি। ইহা একটি লোকবিখ্যাত বিষয় যে, বিবিদের shopping-এর জ্বলায়, নির্দোষ (?) আমোদাসক্তির জ্বালায়, তাহাদের স্বামীরা ধনে প্রাণে মারা যায়, অথচ স্ত্রীস্বাধীনতার একটু কোথাও পাছে আঁচড় লাগে এই ভয়ে তাঁহারা সকল অত্যাচার ঘাড় পাতিয়া লন—সকল বিষ হজম করিয়া ফেলেন।' ইত্যাদি। এর থেকে অনেক কথা উঠতে পারে। প্রথমত সম্পাদক-মহাশয় তা হলে এই কথা বলেন যে, বিবিদের চাল-চোল-ধরনে অবিনয়, অসরলতা, বেহায়ামো, উচ্চের প্রতি অ-ভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি অ-দয়াদাক্ষিণ্য প্রকাশ পায়; দ্বিতীয়ত, যেন আমি বিবিদের অবিনয় অসরলতা বেহায়ামো প্রভৃতির আনুষঙ্গিক স্বরূপেই স্ত্রীস্বাধীনতা উল্লেখ করেছিলুম। সম্পাদক-মহাশয় যে কেন বলেন, বিবিরা অবিনয়ী, অসরল, উচ্চের প্রতি তাদের ভক্তি নেই, নীচের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য নেই—তা সম্পাদক-মহাশয়ই জানেন। একমাত্র shopping-এর উদাহরণ দিয়ে তিনি ইংরেজ-মহিলাদের স্কন্ধে অতগুলো পাপের বোঝা চাপিয়েছেন। আমি ইংলন্ডে যতই বেশি দিন থেকেছি ততই সেখানকার ইংরেজ-পরিবারের মধ্যে ভালো করে মিশেছি, আমি যতদূর জানি তাতে এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি (অনেক পাঠক-মহাশয়ের অযথা

দেশানুরাগে হয়তো আঘাত লাগতে পারে) যে, সম্পাদক-মহাশয় ইংরাজ মহিলাদের প্রতি যতগুলি দোষারোপ করেছেন তার কোনোটা সত্য নয়। কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ অভিধানে যদি বিনয় অর্থে যথাসাধ্য কথার উত্তর না দিয়ে, ঘোমটা টেনে, সংকোচে নিতান্ত ম্রিয়মাণ হয়ে বসে থাকা না হয় তা হলে ইংরেজ ভদ্রমহিলারা বিনয়ের আদর্শ। ইংরাজ-পরিবারের মধ্যে এমন কত শত বালিকা (আমাদের দেশের পূর্ণযৌবনা) দেখা যায় যারা সরলতার প্রতিমা, যারা তুষারের মতো, নিজের শুভ্র ললাটের মতো নিষ্কলঙ্ক; নিষ্কলংক অর্থে শুদ্ধ কার্যত নিষ্কলঙ্ক নয়, তাদের মন বিশুদ্ধ; ছেলেবেলা থেকে তাদের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস স্ফূর্তি পেয়েছে, দাসীদের কাছ থেকে বা অসংযমনা সমবয়স্কা প্রতিবেশিনীদের কাছ থেকে বিয়ের কথা, বরের কথা, সংসারধর্মের কথা বা কোনো রকম অসৎ কথা একটিমাত্র শোনে নি— সর্বদা হাস্যোচ্ছ্বাসময়ী। উচ্চের প্রতি ভক্তিমত্তা যদি বল তবে তা ইংলন্ডে যেমন আছে এমন অন্যত্র সচরাচর পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। যেখেনে Carlyle-কে গাড়ি চড়ে যেতে দেখলে কত শত রাস্তার লোক টুপি খুলে গাড়ির পেছনে পেছনে ছুটেছিল— যেখানে কোথায় Shakespeare একটা গাছ পুঁতেছিলেন, কোথায় Addison-এর একটা চৌকি আছে, সে-সমস্ত লোকে একেবারে তীর্থস্থান করে তুলেছে— যেখেনে একজন কবির পাণ্ডুলিপি, একজন খ্যাত ব্যক্তির নিজের হাতের নামসই পেলে লোকে আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করে— সেখেনে উচ্চের প্রতি ভক্তিমত্তা নেই কী করে বলব? আর সেই উচ্চের প্রতি ভক্তিমত্তা হতে সেখানকার স্ত্রীলোকেরাই যে বিশেষ বঞ্চিত এমন নয়। এ কথার উত্তর তেমন আর কিছু হতে পারে না যেমন, একটিবার বিলেতে যাওয়া। কেননা আমি বলব 'না', সম্পাদক-মহাশয় বলবেন 'হাঁ', আবার আমি বলব 'না', আবার তিনি বলবেন 'হাঁ'— এমন করে যতক্ষণে না হাঁপিয়ে পড়া যায় ততক্ষণ হয়তো 'হাঁ' 'না' চালানো যেতে পারে। কিন্তু খুব সম্ভবত এ বিষয়ে সম্পাদক-মহাশয়ের আমার চেয়ে ঢের বেশি অভিজ্ঞতা আছে, সুতরাং এমন স্থলে আমার চুপ করে থাকাই শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু সম্পাদক-মহাশয়ের মতে যাই হোক, আমি কখনো বিবিদের অবিনয় অসরলতা ইত্যাদির আনুষঙ্গিকরূপে স্ত্রীস্বাধীনতার উল্লেখ করেছি কি না সেইটি বিবেচ্য স্থল। বিলেতে নিমন্ত্রণ-সভায় স্ত্রীপুরুষ সকলে মিলে নির্দোষ আমোদপ্রমোদ করে, একটা নতুন ভালো বই উঠলে সে বিষয়ে পরস্পর আপনাদের মতামত ব্যক্ত করে, একটা নতুন যন্ত্র উঠলে গৃহকর্তা তাই নিয়ে অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গকে দেখান, গৃহকর্ত্রী রোমে গিয়েছিলেন, সেখানকার প্রসিদ্ধ স্থানের যে-সকল ফোটোগ্রাফ নিয়েছিলেন তাই দেখিয়ে সকলকে আমোদে রাখেন ইত্যাদি প্রসঙ্গ উপলক্ষে কথায় কথায় আমি স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে নিজের মত ব্যক্ত করি; এর থেকে যদি কোনো বিলাতানভিজ্ঞ ব্যক্তি মনে করে থাকেন যে, shopping করাকেই স্ত্রীস্বাধীনতা বলে বা বিলাতের মহিলারা যা-কিছু মন্দ-আচরণ করেন (সত্যই হোক আর জনশ্রুতিই হোক) তারই নাম স্ত্রীস্বাধীনতা, তা হলে (বেয়াদবি মাপ করবেন) তাঁদের মস্তিষ্কের দোষ জন্মেছে এ কথা স্বীকার করতেই হয়।

সত্য-সত্য যা-কিছু দোষ করি, একে তো তার জন্যই আমরা ইহকালে পরকালে দায়ী; কিন্তু যে দোষ করি নি তার জন্যেও যদি কৈফিয়ত দিতে হয় তা হলে সংসারের পায়ে গড় করি! সম্পাদক-মহাশয় মহা খাপা হয়ে চক্ষু রাঙিয়ে বলছেন, 'য়ুরোপ ভিন্ন আর কোথাও যে স্ত্রীস্বাধীনতা নাই এমন নহে— জাপানে আছে, বোম্বাইয়ে আছে, কিন্তু সে-সকল নিয়ে আন্দোলন করা লেখকের উদ্দেশ্য নহে। সর্বদেশসম্মত স্ত্রীস্বাধীনতার বিশুদ্ধ আদর্শ নিয়ে আলোচনা করাও লেখকের উদ্দেশ্য নহে। ইংলন্ডে যেরূপ স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত তাই যা কেবল লেখকের একমাত্র আলোচ্য বিষয়, এরূপ যখন— তখন ইংলন্ডের প্রচলিত স্ত্রীস্বাধীনতা যে কী ভয়ানক বস্তু, তাহা যে শত সহস্র স্থানে নামে স্বাধীনতা কাজে স্বৈরচারিতা— লেখক সে-সকল কথার উল্লেখ না করাতে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে বিবিদের অনুকরণ করিলেই আমাদের কুলরমণীরা স্বাধীনতাপথে বিচরণ করিতে পারিবেন।' ইংলন্ডের ধান ভানতে গিয়ে আমি জাপানের বা বোম্বাইয়ের শিবের গান তুলব, সম্পাদক-মহাশয় যদি কখনো এ রকম আশা করে থাকেন তা হলে বলা বাহুল্য আমার

মতো প্রকৃতিস্থ লোকের কাছে সে আশা করা দুরাশা। আমি চোখে চশমা এ'টে, চাপকান পরে, জগতের অজ্ঞানতিমিরমোচন নিতান্ত মহামূল্য মতগুলি অনুগ্রহপূর্বক পাঠকদের বিতরণ করছিলুম না; আমি বৈঠকখানায় বসে পাঠক-মহাশয়ের সঙ্গে দু দণ্ড গল্পসল্প করছিলুম। একটা গল্প থেকে আর-একটা গল্প ওঠে। একটা নিমন্ত্রণসভা বর্ণনা করে সেই সূত্রে স্ত্রীস্বাধীনতার কথা আমার মনে এল, সে বিষয়ে আমার যা-কিছু বক্তব্য ছিল সব বলে ফেললুম। আমার সে বক্তব্যের মধ্যে ইংলন্ডের স্ত্রীস্বাধীনতার উল্লেখমাত্র ছিল না, আর, সত্যের খাতিরে সম্পাদক-মহাশয়ের কাছে নিতান্ত লজ্জার সহিত স্বীকার করতে হচ্ছে, জাপানের ও বোম্বায়ের স্ত্রীস্বাধীনতা আমার মনেও আসে নি। মনে আসে নি—অপরাধ হয়েছে বটে! তা, সম্পাদকীয় বেত্রাঘাতে মনে না আসবার জন্যে যথেষ্ট শাস্তিও পেয়েছি। আচ্ছা, নাহয় এবার থেকে আমি যখনি স্ত্রীস্বাধীনতার কথা ভাবব তখনি জাপান ও বোম্বায়ের কথা মনে করতে ভুলব না। সে কথা যাক, আমার মত হচ্ছে এই যে, বুট জুতো পরাকেও স্ত্রীস্বাধীনতা বলে না, গৌন পরাকেও স্ত্রীস্বাধীনতা বলে না, আর মটন দিয়ে রাই খেলেও স্ত্রীস্বাধীনতার ব্যত্যয় হয় না। যদি কোনো পাঠক এমন বুঝে থাকেন যে, বিবিরা যা করে তাই স্ত্রীস্বাধীনতা ও সেইজন্যে আমার প্রতি মহা রুক্ষ হয়ে থাকেন, তা হলে তাঁকে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, এই ভুল বোঝা সম্বন্ধে যদি কারু কোনো দোষ থাকে তো সেটা তাঁর বুদ্ধির। তাঁর কানের যদি এমন একটা সৃষ্টিছাড়া রোগ হয়ে থাকে যে, যা তাঁকে বলা যায় নি তা তিনি শোনেন তা হলে সে কান-দুটো যতক্ষণে না বিশেষরূপে মেরামত করা হয় ততক্ষণ তাঁর সঙ্গে আমার মতো লেখক কোনো এলাকা রাখেন না। যা হোক, আমি যদি বলি যে, ইংরাজ বিবিয়ানাকে স্ত্রীস্বাধীনতা বলে না (কিন্তু সেইসঙ্গে এও বলি, জাপান-বিবিয়ানা বা বোম্বাই-বিবিয়ানাকেও স্ত্রীস্বাধীনতা বলে না) তা হলেই বোধ করি সম্পাদক-মহাশয়ের সঙ্গে ও সম্বন্ধে আমার বিবাদটা চুকে গেল। কেননা সম্পাদক-মহাশয় এক প্রকার স্বীকারই করেছেন যে বিবিদের বিষাক্ত (!) অশোভন (!!) স্বাধীনতা পরিত্যাগ করে যদি 'নির্বিষ শোভন' স্বাধীনতা লেখক প্রচার করেন তা হলে তিনি তা আদরের সহিত গ্রহণ করবেন। অনর্থক একটা ভুল বোঝার দরুন গোড়াতেই তিনি তা করতে পারেন নি। ভালো, এখন তো সব মিটমাট হয়ে গেল—তবে এখন স্বস্তিবাচন-পূর্বক স্বাগতসম্ভাষণ করে আমার মতটিকে আদরের সহিত ঘরে নিয়ে যাওয়া হোক—দরজা থেকেই হাঁকিয়ে না দেওয়া হয়।

সম্পাদক-মহাশয়ের সঙ্গে সাধারণ বিষয়ে তো একরকম ঐক্য হল, এখন বিশেষ বিশেষ বিষয়ে এমনি ভালোয় ভালোয় মতের মিল হয়ে গেলে বড়ো খুশি হওয়া যায়। সম্পাদক-মহাশয় তো বললেন 'নির্বিষ' স্ত্রীস্বাধীনতার সঙ্গে তাঁর কোনো মনান্তর নেই; এখন কাকে তিনি 'নির্বিষ স্ত্রীস্বাধীনতা' বলেন সেইটে মীমাংসা হয়ে গেলেই অধিক বক্তব্য থাকে না। সম্পাদক-মহাশয়ের লেখা দেখে বোধ হয়, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে আলাপ মাত্র হওয়া তাঁর মতে প্রার্থনীয় নহে, কেননা 'তাহাতে পাছে কু লোকে কু ভাবে, সু লোকে কু ভাবে ও স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পায়।' তা যদি হয় তা হলে বাইরের কিছু দেখবার জন্যে মহিলাদের অন্তঃপুর থেকে বের হওয়াও প্রার্থনীয় নয়—কেননা পাছে তাতে করে 'কু লোকে কু ভাবে, সু লোকে কু ভাবে, ও স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পাবার কোনো কারণ ঘটে।' তা হলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের যতটুকু স্বাধীনতা আছে তাই 'নির্বিষ' স্বাধীনতা। কেন, তাঁদের তো নিশ্বাস ফেলবার স্বাধীনতা আছে, সেটা একটা 'নির্বিষ স্বাধীনতা'; হাই তোলবার ও পান সাজবার স্বাধীনতা আছে, সেটা আর-একটা 'নির্বিষ স্বাধীনতা'; আহার করবার স্বাধীনতা আছে, যদি কেউ আড়ি করে তাতে বিষ না মিশিয়ে দেয় তা হলে সেটাও একটা 'নির্বিষ স্বাধীনতা'! তা হলে তো আমাদের অনেক পরিশ্রম বেঁচে গেল, আর কিছু করবার নেই। কিন্তু সেইটে গোড়ায় বললেই তো হত। এটা কিরকম হল জানো? করুণরসে নিতান্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে একজন গরিবকে বলা হল, 'আমার পকেটে যা আছে, বাপু, সব তুই নে।' অথচ পকেটে একটি সিকি পয়সা মাত্র নেই। ভাগ্যি

ছিল না, তাই তো এতটা করুণরসের কথা শোনা গেল। 'পাছে কু লোকে কু ভাবে ও সু লোকে কু ভাবে এইজন্যেই কোনো স্ত্রীলোকের কোনো পরপুরুষের সহিত মেশা অবৈধ'— এর চেয়ে অযৌক্তিক কথা সচরাচর শোনা যায় না। এমন কী কাজ করা যেতে পারে যা কু লোকে কু না ভাবতে পারে, এমন-কি সু লোকের কু ভাবতে আটক থাকে? বলো-না কেন, আহার করা অবৈধ— দুধেতে প্রুসিক অ্যাসিড মেশানো থাকতে পারে, মাছের ঝোলে খানিকটা আফিম গোলা থাকতে পারে, আর ভাতের মধ্যে খানিকটা হোর্তেল থাকাও নিতান্ত অসম্ভব নয়। যদি সম্পাদক-মহাশয় বলতেন পরপুরুষের সঙ্গে এমন করে মেশা কর্তব্য নয় যাতে করে সাধারণত প্রকৃতিস্থ লোকে স্বভাবতই কু ভাবতে পারে, সে এক স্বতন্ত্র কথা হত; কিন্তু পাছে লোকে কু ভাবে সেইজন্যে একেবারে পরপুরুষের সঙ্গে মেশাই কর্তব্য নহে এ যে বড়ো ভয়ানক কথা! যদি বল এমন স্থলে সাবধানে আহার করা উচিত যেখানে খাদ্যে বিষ থাকবার যথার্থ সম্ভাবনা আছে, তা হলে কথাটা মানি; কিন্তু খাদ্যে বিষ থাকা অসম্ভব নয় বলে আহার বন্ধ করতে পরামর্শ দিলে— আর যে-কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তা পালন করুন-না কেন, আমি করি নে। পাছে 'স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পায়' এ সম্বন্ধেও পূর্বোক্ত কথাটা খাটে, অর্থাৎ পরপুরুষের সহিত যদি এমন করে মেশা যায় যাতে করে স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পাবার সম্ভাবনা থাকে তা হলে তার থেকে হানি হতে পারে, নতুবা নয়। সম্পাদক-মহাশয় বলেন, 'স্বামীর হয়তো এইরূপ একটা মাত্রা নির্ধারিত আছে যে, পরপুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের এইটুকু মেলামেশাই ভালো, তাহা অপেক্ষা বেশি ঘনিষ্ঠতা ভালো না। যে স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসে সেই স্ত্রী সেই মাত্রাটি অতিক্রম করিয়া স্বামীর মনে আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হইবে না তো কে হইবে?' সত্যই তো। সচরাচর তো এমন হয়েই থাকে। Jealous স্বামীরা পাছে মনে আঘাত পায় এইজন্যে তো য়ুরোপে অনেক হতভাগ্য রমণী ইচ্ছা করেই হোক বা শাসনভয়েই হোক সমাজে মেশে না। এখানেও অনেক সময়ে তাই ঘটবে। রমণীদের জীবন পর্যন্ত যখন স্বামীর ওপর নির্ভর করে তখন স্বামীর মন জুগিয়ে চলবার জন্যে প্রাণপণ করতে, ভালোবাসায় না হোক, দায়ে পড়ে হয়। সম্পাদক-মহাশয় বলেন, 'সে মাত্রা (মেলামেশার মাত্রা) কতটুকু স্বামীই তাহা জানে, স্ত্রী তাহা জানে না'। সে কী কথা! স্ত্রী তাহা জানে না এমনও হয়? হতে পারে, কোনো স্ত্রীবিশেষ কোনো স্বামীবিশেষের মনের ভাব ভালো করে বুঝতে পারে নি; কী করা যাবে বলো? তার জন্যে তাকে কষ্ট সইতেই হবে। কিন্তু তাই বলে চুলটা কাটতে মাথাটা কাটবে কে বলো? দু-চার জনের জন্যে সকলে কষ্ট পাবে কেন? অন্তঃপুরবদ্ধ এমন তো অনেক স্ত্রীলোক আছে যারা স্বামীর মনের ভাব ভালো করে আয়ত্ত করতে পারে নি বলে পদে পদে কষ্ট পায়, তবে কি তুমি বিবাহটা একেবারে উঠিয়ে দেবে! অতএব কথা হচ্ছে এই যে, পরপুরুষের সহিত এমন করে মেশা উচিত নয় যাতে করে স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পায় ও সাধারণত প্রকৃতিস্থ কু লোক বা সু লোকে ন্যায্যরূপে কু ভাবতে পারে। এতেও একটা 'কিন্তু' আছে। লোকের কু ও সু ভাবা অনেক সময়ে আবার দেশাচারের ওপর নির্ভর করে। একজন স্ত্রীলোক অতি ফিন্‌ফিনে শান্তিপুরে শাড়ি পরলে কু লোকেও কু ভাবে না, সু লোকেও কু ভাবে না, স্বামীর মনেও কু-আশঙ্কা স্থান পায় না, কিন্তু সে যদি সেই ফিনফিনে শাড়িতে দৈবাৎ ঘোমটা দিতে ভুলে যায় তা হলে কু লোকেও কু ভাবে, সু লোকেও কু ভাবে, আর স্বামীর মনেও হয়তো কু-আশঙ্কা স্থান পায়! অতএব নিরর্থক দেশাচারের পান থেকে একটু চুন খসলে যদি কু লোকে কু বা সু লোকে কু ভাবে, তা হলে সেটা গ্রাহ্য করা যাবে না। আজ আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে খোলা গাড়িতে একটু হাওয়া খেয়ে এলুম বলে যদি লোকে কু বলে তা তারা বলুক, কিন্তু যদি আমার স্ত্রী কোনো এক পুরুষের বাড়িতে সমস্ত দিন বা রাত্রি যাপন করে আসে তা হলে লোকে যদি কু ভাবে তা হলে সে কু ভাবাকে যথার্থ একটু সমীহ করে চলতে হয়। সম্পাদক-মহাশয় নানা উদাহরণ প্রয়োগ করে রাজকীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে যা বললেন, সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মতের ঐক্য হয়। উদ্ধত গর্বিত বিকৃত নীচস্বভাব অ্যাংগ্লো-ইন্ডিয়ানরা আমাদের যেরকম নিচু নজরে দেখে

তারা যে আপনাদের স্বজাতি-প্রচলিত গ্যালান্ট্রি আমাদের পুরস্ত্রীদের প্রতি প্রয়োগ না করবে—তা আশ্চর্য নয়। কিন্তু তাতে বিশেষ কী এল গেল? স্ত্রী পুত্র পরিবার সমেত লাঙুল নাড়তে নাড়তে একটা গর্বস্ফীত অ্যাংগ্লো-ইন্ডিয়ানের পা চাটতে যাবার প্রয়োজন কী? অধীনতার প্রতি আমাদের যেরকম অনুরাগ, খোসামোদ আমাদের যেরকম উপজীব্য হয়ে উঠেছে, তাতে হয়তো আমাদের অনেকে স্ত্রীকন্যাগণকে স্বচ্ছন্দে একজন শ্বেতবদনের কাছে নিয়ে যাবেন, যদিও হয়তো নিজের কৃষ্ণচর্ম বন্ধুর কাছে বের করতে কুণ্ঠিত হবেন! সেরকম স্থলে তাঁরা ঠেকে শিখবেন। যদি আপনাদের নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করবার বল না থাকে তা হলে নাহয় ট্রেনে প্রভৃতি যাবার সময় বন্ধসন্ধ করে নিয়ে যাবেন, অ্যাংগ্লো-ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে সহস্র হস্ত দূরে থাকবেন। আমি বলি কি, আমাদের আপনাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষে পরস্পর মেলা-মেশা আলাপ-পরিচয় হোক। নিমন্ত্রণসভায় স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত থাকুন। যেখানে নানা প্রকার বিষয় আলোচনা চলছে সেখেনে তাঁরাও যোগ দেন। এই প্রকারে সংকীর্ণস্থানবদ্ধ তাঁদের কুণ্ঠিত মন বিস্তার লাভ করুক, স্বাধীন মুক্তবায়ু-সেবনে স্বাস্থ্য উপভোগ করুন।

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রকাশ : ১৮৯৩

'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি। (ভূমিকা) প্রথম খণ্ড' আখ্যায় স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে (১৮৯১) যা প্রকাশিত হয় তা পরবর্তীকালে সম্পাদনান্তে দুটি প্রবন্ধে ভাগ করে সূচনাংশ "নূতন ও পুরাতন" নামে 'স্বদেশ' গ্রন্থে আর পরবর্তী অংশ "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য" নামে 'সমাজ' গ্রন্থে সংকলিত হয়। 'প্রথম খণ্ড' স্বতন্ত্রভাবে পুনর্মুদ্রিত হয় নি। স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে মুদ্রিত (১৮৯৩) 'দ্বিতীয় খণ্ড' বা ভ্রমণবৃত্তান্ত অংশ সংক্ষিপ্ত আকারে রক্ষিত হয় গদ্যগ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থে।

'পাশ্চাত্য ভ্রমণ' গ্রন্থে 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র 'দ্বিতীয় খণ্ড' সংশোধিত আকারে স্থান পায়। বর্তমান সংস্করণে সেই পাঠ অনুযায়ী মুদ্রিত হল।

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত
সুহৃদ্‌বরকে এই গ্রন্থ
স্মরণোপহারস্বরূপে
উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার

শুক্রবার। ২২শে আগস্ট ১৮৯০। দেশকালের মধ্যে যে একটা প্রাচীন ঘনিষ্ঠতা আছে, বাষ্পযানে সেটা লোপ করে দেবার চেষ্টা করছে। পূর্বে সময় দিয়ে দূরত্বের পরিমাণ হত; লোকে বলত এক প্রহরের রাস্তা, দু-দিনের রাস্তা। এখন কেবল গজের মাপটাই অবশিষ্ট। দেশকালের চির-দাম্পত্যের মাঝখান দিয়ে অবাধে বড়ো বড়ো কলের গাড়ি এবং কলের জাহাজ চলে যাচ্ছে।

কেবল তাই নয়—এশিয়া এবং আফ্রিকা দুই ভগ্নীর বাহুবন্ধন বিচ্ছিন্ন করে মাঝে বিরহের লবণাম্বুরাশি প্রবাহিত করা হয়েছে। আমেরিকার উত্তর দক্ষিণ যমজ ভ্রাতার মতো জন্মাবধি সংলগ্ন হয়ে আছে, শোনা যায় তাদের মধ্যেও লৌহাস্ত্র চালনার উদ্যোগ করা হয়েছিল। এমনি করে সভ্যতা সর্বত্রই জলে স্থলে দেশে কালে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়ে আপনার পথটি করে নেবার চেষ্টা করছে।

পূর্বে যখন দীর্ঘ পথ প্রদক্ষিণ করে য়ুরোপে পৌঁছতে অর্ধেক বৎসর লাগত তখন এই দুই মহাদেশের যথার্থ ব্যবধান সম্পূর্ণ ধারণা করবার দীর্ঘকাল অবসর পাওয়া যেত। এখন ক্রমেই সেটা হ্রাস হয়ে আসছে।

কিন্তু দেশকালের ঘনিষ্ঠতা যতই হ্রাস হোক, চিরকালের অভ্যাস একেবারে যাবার নয়। যদিও তিন মাসের টিকিট মাত্র নিয়ে য়ুরোপে চলেছি, তবু একটা কাল্পনিক দীর্ঘকালের বিভীষিকা মন থেকে তাড়াতে পারছি নে। মনে হচ্ছে যেন অনেক দিনের জন্যে চলেছি।

কালিদাসের সময়ে যখন রেলগাড়ি ইস্টিমার পোস্ট-আপিস ছিল না তখনই খাঁটি বিরহ ছিল; এবং তখনকার দিনে বছরখানেকের জন্য রামগিরিতে বদলি হয়ে যক্ষ যে সুদীর্ঘচ্ছন্দে বিলাপ-পরিতাপ করেছিল সে তার পক্ষে অযথা হয় নি। কিন্তু স্তূপাকার তুলো যেমন কলে চেপে একটি পরিমিত গাঁটে পরিণত হয়, সভ্যতার চাপে আমাদের সমস্তই তেমনি সংক্ষিপ্ত নিবিড় হয়ে আসছে। ছয় মাসকে জাঁতার তলায় ফেলে তিন মাসের মধ্যে ঠেসে দেওয়া হচ্ছে; পূর্বে যা মুটের মাথার বোঝা ছিল এখন তা পকেটের মধ্যে ধরে। এখন দুই-এক পাতার মধ্যেই বিরহগীতির সমাপ্তি এবং বিদ্যুৎযান যখন প্রচলিত হবে তখন বিরহ এত গাঢ় হবে যে, চতুর্দশ-পদীও তার পক্ষে ঢিলে বোধ হবে।

সূর্য অস্তপ্রায়। জাহাজের ছাদের উপর হালের কাছে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের তীরের দিকে চেয়ে রইলুম। সমুদ্রের জল সবুজ, তীরের রেখা নীলাভ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সন্ধ্যা রাত্রির দিকে এবং জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে ক্রমশই অগ্রসর হচ্ছে। বামে বোম্বাই বন্দরের দীর্ঘ রেখা এখনও দেখা যাচ্ছে।

ক্রমে বন্দর ছাড়িয়ে গেলুম। সন্ধ্যার মেঘাবৃত অন্ধকারটি সমুদ্রের অনন্ত শয্যায় দেহ বিস্তার করলে। আকাশে তারা নেই। কেবল দূরে লাইট-হাউসের আলো জ্বলে উঠল; সমুদ্রের শিয়রের কাছে সেই কম্পিত দীপশিখা যেন ভাসমান সন্তানদের জন্যে ভূমিমাতার আশঙ্কাকুল জাগ্রত দৃষ্টি।

জাহাজ বোম্বাই বন্দর পার হয়ে গেল।

ভাসল তরী সন্ধেবেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা,
মধুর বহিবে বায়ু, ভেসে যাব রঙ্গে।

কিন্তু সী-সিক্‌নেসের কথা কে মনে করেছিল!

যখন সবুজ জল ক্রমে নীল হয়ে এল এবং তরঙ্গে তরীতে মিলে আন্দোলন উপস্থিত করে দিলে তখন দেখলুম সমুদ্রের পক্ষে জলখেলা বটে কিন্তু আমার পক্ষে নয়।

ভাবলুম এইবেলা মানে মানে কুঠরির মধ্যে ঢুকে কম্বলটা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ি গে। যথাসত্বর ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ করে কাঁধ থেকে কম্বলটা বিছানার উপর ফেলে দরজা বন্ধ করে দিলুম। ঘর অন্ধকার। বুঝলুম, আলো নিবিয়ে দিয়ে দাদা তাঁর বিছানায় শুয়েছেন।

শারীরিক দুঃখ নিবেদন করে একটুখানি স্নেহ উদ্রেক করবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'দাদা, ঘুমিয়েছেন কি?' হঠাৎ নিতান্ত বিজাতীয় মোটা গলায় কে একজন হুংকার দিয়ে উঠল, 'হুজ দ্যাট!' আমি বললুম, 'বাস রে! এ তো দাদা নয়!' তৎক্ষণাৎ বিনীত অনুতপ্ত স্বরে জ্ঞাপন করলুম, 'ক্ষমা করবেন, দৈবক্রমে ভুল কুঠরিতে প্রবেশ করেছি।' অপরিচিত কণ্ঠ বললে, 'অল রাইট!' কম্বলটি পুনশ্চ তুলে নিয়ে কাতর শরীরে সংকুচিত চিত্তে বেরোতে গিয়ে দেখি দরজা খুঁজে পাই নে। বাক্স তোরঙ্গ লাঠি বিছানা প্রভৃতি বিচিত্র জিনিসের মধ্যে খট্ খট্ শব্দে হাতড়ে বেড়াতে লাগলুম। ইঁদুর কলে পড়লে তার মানসিক ভাব কী রকম হয় এই অবসরে কতকটা বুঝতে পারা যেত, কিন্তু তার সঙ্গে সমুদ্রপীড়ার সংযোগ হওয়াতে ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত জটিল হয়ে পড়েছিল।

মন যতই ব্যাকুল হয়ে উঠছে শরীর ততই গলদ্‌ঘর্ম এবং কণ্ঠাগত অন্তরিন্দ্রিয়ের আক্ষেপ উত্তরোত্তর অবাধ্য হয়ে উঠছে। অনুসন্ধানের পর যখন হঠাৎ মসৃণ চিক্কণ শ্বেতকাচ-নির্মিত দ্বারকর্ণটি হাতে ঠেকল, তখন মনে হল এমন প্রিয়স্পর্শসুখ বহুকাল অনুভব করা হয় নি। দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে নিঃসংশয়চিত্তে পরবর্তী ক্যাবিনের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত। গিয়েই দেখি, আলো জ্বলছে; কিন্তু মেজের উপর পরিত্যক্ত গাউন পেটিকোট প্রভৃতি স্ত্রীলোকের গাত্রাবরণ বিক্ষিপ্ত। আর অধিক কিছু দৃষ্টিপথে পড়বার পূর্বেই পলায়ন করলুম। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে বার বার তিন বার ভ্রম করবার অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু তৃতীয় বার পরীক্ষা করতে সাহস হল না। এবং সেরূপ শক্তিও ছিল না। অবিলম্বে জাহাজের ছাতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সেখানে বিহ্বলচিত্তে জাহাজের কাঠরার 'পরে ঝুঁকে পড়ে শরীরমনের একান্ত উদ্‌বেগ কিঞ্চিৎ লাঘব করা গেল। তার পরে বহুলাঞ্ছিত অপরাধীর মতো আস্তে আস্তে কম্বলটি গুটিয়ে তার উপর লজ্জিত নতমস্তক স্থাপন করে একটি কাঠের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়লুম।

কী সর্বনাশ! এ কার কম্বল! এ তো আমার নয় দেখছি। যে সুখসুপ্ত বিশ্বস্ত ভদ্রলোকটির ঘরের মধ্যে রাত্রে প্রবেশ করে কয়েক মিনিট ধরে অনুসন্ধান-কার্যে ব্যাপৃত ছিলুম নিশ্চয় এ তারই। একবার ভাবলুম ফিরে গিয়ে চুপিচুপি তার কম্বল স্বস্থানে রেখে আমারটি নিয়ে আসি; কিন্তু যদি তার ঘুম ভেঙে যায়! পুনর্বার যদি তার ক্ষমা প্রার্থনা করবার প্রয়োজন হয় তবে সে কি আর আমাকে বিশ্বাস করবে! যদি বা করে, তবু এক রাত্রের মধ্যে দুবার ক্ষমা প্রার্থনা করলে নিদ্রাকাতর বিদেশীর খৃস্টীয় সহিষ্ণুতার প্রতি অতিমাত্র উপদ্রব করা হবে না কি! আরও একটা ভয়ংকর সম্ভাবনার কথা মনে উদয় হল। দৈববশত দ্বিতীয় বার যে ক্যাবিনের দ্বারে গিয়ে পড়েছিলুম তৃতীয় বারও যদি ভ্রমক্রমে সেইখানে গিয়েই উপস্থিত হই এবং প্রথম ক্যাবিনের ভদ্রলোকটির কম্বলটি সেখানে রেখে সেখানকার একটি গাত্রাচ্ছাদন তুলে নিয়ে আসি তা হলে কী রকমের একটা রোমহর্ষণ প্রমাদ-প্রহেলিকা উপস্থিত হয়! ইত্যাকার দুশ্চিন্তায় তীব্র তাম্র-কূটবাসিত পরের কম্বলের উপর কাষ্ঠাসনে রাত্রি যাপন করলুম।

২৩ আগস্ট। আমার স্বদেশীয় সঙ্গী বন্ধুটি সমস্ত রাত্রির সুখনিদ্রাবসানে প্রাতঃকালে অত্যন্ত প্রফুল্ল পরিপুষ্ট সুস্থ মুখে ডেকের উপর দর্শন দিলেন। আমি তাঁর দুই হস্ত চেপে ধরে বললুম, 'ভাই, আমার তো এই অবস্থা।' শুনে তিনি আমার বুদ্ধিবৃত্তির উপর কলঙ্ক আরোপ করে হাস্যসহকারে এমন দুটো-একটা বিশেষণ প্রয়োগ করলেন যা গুরুমশায়ের সান্নিধ্য পরিত্যাগের পর থেকে আর কখনো শোনা হয় নি। সমস্ত রজনীর দুঃখের পর প্রভাতের এই অপমানটাও নিরুত্তরে সহ্য করলুম। অবশেষে তিনি দয়াপরবশ হয়ে আমার ক্যাবিনের ভৃত্যটিকে ডেকে দিলেন। তাকেও আবার একে একে সমস্ত ঘটনাটি খুলে বলতে হল। প্রথমে সে কিছুই বুঝতে পারলে না, মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার জীবনের অভিজ্ঞতায় নিঃসন্দেহ এরকম ঘটনা এই প্রথম। অবশেষে ধীরে ধীরে সে সমুদ্রের দিকে এক বার মুখ ফেরালে এবং ঈষৎ হাসলে; তার পর চলে গেল।

সী-সীক্‌নেস ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। সে-ব্যাধিটার যন্ত্রণা অনভিজ্ঞ স্থলচরদের কিছুতে বোঝানো যেতে পারে না। নাড়িতে ভারতবর্ষের অন্ন তিলমাত্র অবশিষ্ট রইল না। য়ুরোপে প্রবেশ করবার পূর্বে সমুদ্র এই দেহ হতে ভারতবর্ষটাকে যেন ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে একেবারে সাফ করে ফেলবার চেষ্টা করছে। ক্যাবিনে চার দিন পড়ে আছি।

২৬ আগস্ট। শনিবার থেকে আর আজ এই মঙ্গলবার পর্যন্ত কেটে গেল। জগতে ঘটনা বড়ো কম হয় নি—সূর্য চার বার উঠেছে এবং তিন বার অস্ত গেছে, বৃহৎ পৃথিবীর অসংখ্য জীব দন্তধাবন থেকে দেশ-উদ্ধার পর্যন্ত বিচিত্র কর্তব্যের মধ্যে দিয়ে তিনটে দিন মহা ব্যস্তভাবে অতিবাহিত করেছে—জীবনসংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্বাচন, আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা প্রভৃতি জীবরাজ্যের বড়ো বড়ো ব্যাপার সবেগে চলছিল—কেবল আমি শয্যাগত জীবন্মৃত হয়ে পড়ে ছিলুম। আধুনিক কবিরা কখনো মুহূর্তকে অনন্ত কখনো অনন্তকে মুহূর্ত আখ্যা দিয়ে প্রচলিত ভাষাকে নানাপ্রকার বিপরীত-ব্যায়ামবিপাকে প্রবৃত্ত করান। আমি আমার এই চারটে দিনকে বড়ো রকমের একটা মুহূর্ত বলব, না এর প্রত্যেক মুহূর্তকে একটা যুগ বলব স্থির করতে পারছি নে।

যাই হোক কষ্টের সীমা নেই। মানুষের মতো এতবড়ো একটা উন্নত জীব যে সহসা এতটা উৎকট দুঃখ ভোগ করে তার একটা মহৎ নৈতিক কিংবা আধ্যাত্মিক কারণ থাকাই উচিত ছিল; কিন্তু জলের উপরে কেবল খানিকটা ঢেউ ওঠার দরুন জীবাত্মার এত বেশি পীড়া নিতান্ত অন্যায় অসংগত এবং অগৌরবজনক বলে বোধ হয়। কিন্তু জাগতিক নিয়মের প্রতি দোষারোপ করে কোনো সুখ নেই, কারণ সে নিন্দাবাদে কারও গায়ে কিছু ব্যথা বাজে না, এবং জগৎ-রচনার তিলমাত্র সংশোধন হয় না।

যন্ত্রণাশয্যায় অচেতনপ্রায় ভাবে পড়ে আছি। কখনো কখনো ডেকের উপর থেকে পিয়োনোর সংগীত মৃদু মৃদু কর্ণে এসে প্রবেশ করে, তখন স্মরণ হয় আমার এই সংকীর্ণ শয়ন-কারাগারের বাইরে সংসারের নিত্য আনন্দস্রোত সমভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। বহুদূরে ভারতবর্ষের পূর্বসীমায় আমার সেই সংগীতধ্বনিত স্নেহমধুর গৃহ মনে পড়ে। সুখ-স্বাস্থ্য-সৌন্দর্যময় জীবজগৎকে অতিদূরবর্তী ছায়ারাজ্যের মতো বোধ হয়। মধ্যের এই সুদীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করে কখন সেখানকার জীবন-উৎসবের মধ্যে ফিরে যেতে পারব, এই কথাই কেবল ভাবি। মঙ্গলবার প্রাতে যখন শরীরের মধ্যে প্রাণটা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, তখন আমার বন্ধু অনেক আশ্বাস দিয়ে আমাকে জাহাজের ছাদের উপর নিয়ে গেলেন; সেখানে লম্বা বেতের চৌকিটির উপর পা ছড়িয়ে বসে পুনর্বার এই মর্ত্য পৃথিবীর স্পর্শ এবং নবজীবনের আস্বাদ লাভ করা গেল।

জাহাজের যাত্রীদের বর্ণনা করতে চাই নে। অতিনিকট হতে কোনো মসীলিপ্ত লেখনীর সূচ্যগ্রভাগ যে তাদের প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য স্থাপন করতে পারে এ কথা তারা স্বপ্নেও না মনে করে বেশ বিশ্বস্তচিত্তে ডেকের উপর বিচরণ করছে, টুংটাং শব্দে পিয়োনো বাজাচ্ছে, বাজি রেখে হার-জিত খেলছে, ধূমপানশালায় বসে তাস পিটোচ্ছে; তাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তিন বাঙালি তিন লম্বা চৌকিতে জাহাজের একটি প্রান্ত সম্পূর্ণ অধিকার করে অবশিষ্ট জনসংখ্যার প্রতি অত্যন্ত ঔদাস্যদৃষ্টিপাত করে থাকি।

আমার সঙ্গী যুবকটির নিত্যকর্ম হচ্ছে তামাকের থলিটি বার বার হারানো, তার সন্ধান এবং উদ্ধারসাধন। আমি তাঁকে বারংবার সতর্ক করে দিয়েছি যে, যদি তাঁর মুক্তির কোনো ব্যাঘাত থাকে সে তাঁর চুরোট। মহর্ষি ভরত মৃত্যুকালেও হরিণশিশুর প্রতি চিত্তনিবেশ করেছিলেন বলে পরজন্মে হরিণশাবক হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। আমার সর্বদাই আশঙ্কা হয়, আমার বন্ধু জন্মান্তরে ব্রহ্মদেশীয় কোন্ এক কৃষকের কুটীরের সম্মুখে মস্ত একটা তামাকের খেত হয়ে উদ্ভূত হবেন। বিনা প্রমাণে তিনি শাস্ত্রের এ-সকল কথা বিশ্বাস করেন না, বরঞ্চ তর্ক করে আমারও সরল বিশ্বাস নষ্ট করতে চান এবং আমাকে পর্যন্ত চুরুট ধরাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এ-পর্যন্ত কৃতকার্য হতে পারেন নি।

২৭।২৮ আগস্ট। দেবাসুরগণ সমুদ্র মন্থন করে সমুদ্রের মধ্যে যা-কিছু ছিল সমস্ত বাহির

করেছিলেন। সমুদ্রদেবেরও কিছু করতে পারলেন না, অসুরেরও কিছু করতে পারলেন না, হতভাগ্য দুর্বল মানুষের উপর তার প্রতিশোধ তুলছেন। মন্দরপর্বত কোথায় জানি নে এবং শেষ-নাগ তদবধি পাতালে বিশ্রাম করছেন, কিন্তু সেই সনাতন মন্থনের ঘূর্ণিবেগ যে এখনো সমুদ্রের মধ্যে রয়ে গেছে তা নরজঠরধারী মাত্রেই অনুভব করেন। যাঁরা করেন না তাঁরা বোধ করি দেবতা অথবা অসুরবংশীয়। আমার বন্ধুটিও শেষোক্ত দলের, অর্থাৎ তিনিও করেন না।

রোগশয্যা ছেড়ে এখন 'ডেকে' উঠে বসেছি। সম্পূর্ণ বললাভ হয় নি। শরীরের এইরকম অবস্থার মধ্যে একটু মাধুর্য আছে। এই সময়ে পৃথিবীর আকাশ বাতাস সূর্যালোক সবসুদ্ধ সমস্ত বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে যেন একটি নূতন পরিচয় আরম্ভ হয়। তাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কিছুকালের মতো বিচ্ছিন্ন হওয়াতে আবার যেন নবপ্রেমিকের মতো উভয়ের মধ্যে মৃদু সলজ্জ মধুর ভাবে কথাবার্তা জানাশোনার অল্প অল্প সূত্রপাত হতে থাকে।

২৯ আগস্ট। আজ রাত্রে এডেনে পৌঁছব। সেখানে কাল প্রাতে জাহাজ বদল করতে হবে। সমুদ্রের মধ্যে দুটি-একটি করে পাহাড়-পর্বতের রেখা দেখা যাচ্ছে।

জ্যোৎস্না রাত্রি। এডেন বন্দরে এসে জাহাজ থামল। আহারের পর রহস্যালাপে প্রবৃত্ত হবার জন্যে আমরা দুই বন্ধু ছাদের এক প্রান্তে চৌকি দুটি সংলগ্ন করে আরামে বসে আছি। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র এবং জ্যোৎস্নাবিমুগ্ধ পর্বতবেষ্টিত তটচিত্র আমাদের আলস্য-বিজড়িত অর্ধনিমীলিত নেত্রে স্বপ্ন-মরীচিকার মতো লাগছে।

এমন সময় শোনা গেল এখনই নূতন জাহাজে চড়তে হবে। সে জাহাজ আজ রাত্রেই ছাড়বে। ক্যাবিনের মধ্যে স্তূপাকার বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্র যেমন-তেমন করে চর্মপেটকের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়ে তার উপরে তিন-চারজনে দাঁড়িয়ে নির্দয়ভাবে নৃত্য করে বহুকষ্টে চাবি বন্ধ করা গেল। ভৃত্যদের যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়ে ছোটো বড়ো মাঝারি নানা আকারের বাক্স তোরঙ্গ বিছানাপত্র বহন করে নৌকারোহণপূর্বক নূতন জাহাজ 'ম্যাসীলিয়া' অভিমুখে চললুম।

অনতিদূরে মাস্তুল-কণ্টকিত ম্যাসীলিয়া তার দীপালোকিত ক্যাবিনগুলির সুদীর্ঘশ্রেণীবদ্ধ বাতায়ন উদ্ঘাটিত করে দিয়ে পৃথিবীর আদিম কালের অতিকায় সহস্রচক্ষু জলজন্তুর মতো স্থির সমুদ্রে জ্যোৎস্নালোকে নিস্তব্ধভাবে ভাসছে। সহসা সেখান থেকে ব্যান্ড বেজে উঠল। সংগীতের ধ্বনিতে এবং নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নানিশীথে মনে হতে লাগল, অর্ধরাত্রে এই আরবের উপকূলে আরব্য উপন্যাসের মতো কী একটা মায়ার কাণ্ড ঘটবে।

ম্যাসীলিয়া অস্ট্রেলিয়া থেকে যাত্রী নিয়ে আসছে। কুতূহলী নরনারীগণ ডেকের বারান্দা ধরে সকৌতুকে নবযাত্রীসমাগম দেখছে। কিন্তু সে-রাত্রে নূতনত্ব সম্বন্ধে আমাদেরই তিনজনের সব চেয়ে জিত। বহুকষ্টে জিনিসপত্র উদ্ধার করে ডেকের উপর যখন উঠলুম মুহূর্তের মধ্যে এক জাহাজ দৃষ্টি আমাদের উপর বর্ষিত হল। যদি তার কোনো চিহ্ন দেবার ক্ষমতা থাকত তা হলে আমাদের সর্বাঙ্গ কটা কালো ও নীল ছাপে ভরে যেত। জাহাজটি প্রকাণ্ড। তার সংগীতশালা এবং ভোজন-গৃহের ভিত্তি শ্বেতপ্রস্তরে মণ্ডিত। বিদ্যুতের আলো এবং ব্যান্ডের বাদ্যে উৎসবময়।

অনেক রাত্রে জাহাজ ছেড়ে দিলে।

৩০ আগস্ট। আমাদের এ জাহাজে ডেকের উপরে আর-একটি দোতলা ডেকের মতো আছে। সেটি ছোটো এবং অপেক্ষাকৃত নির্জন। সেইখানেই আমরা আশ্রয় গ্রহণ করলুম।

আমার বন্ধুটি নীরব এবং অন্যমনস্ক। আমিও তদ্রূপ। দূর সমুদ্রতীরের পাহাড়গুলো রৌদ্রে ক্লান্ত এবং ঝাপসা দেখাচ্ছে। একটা মধ্যাহ্নতন্দ্রার ছায়া পড়ে যেন অস্পষ্ট হয়ে এসেছে।

খানিকটা ভাবছি, খানিকটা লিখছি, খানিকটা ছেলেদের খেলা দেখছি। এ জাহাজে অনেকগুলি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে আছে; আজকের দিনে যেটুকু চাঞ্চল্য সে কেবল তাদেরই মধ্যে। জুতোমোজা খুলে ফেলে তারা আমাদের ডেকের উপর কমলালেবু গড়িয়ে খেলা করছে—তাদের

তিনটি দাসী বেঞ্চির উপরে বসে নতমুখে নিস্তব্ধভাবে সেলাই করে যাচ্ছে এবং মাঝে মাঝে কটাক্ষ-পাতে যাত্রীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে।

বহুদূরে এক-আধটা জাহাজ দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সমুদ্রে এক-একটা পাহাড় জেগে উঠছে, অনুর্বর কঠিন কালো দগ্ধ তপ্ত জনশূন্য। অন্যমনস্ক প্রহরীর মতো সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারা উদাসীনভাবে তাকিয়ে আছে, সামনে দিয়ে কে আসছে কে যাচ্ছে তার প্রতি কিছুমাত্র খেয়াল নেই।

এইরকম করে ক্রমে সূর্যাস্তের সময় হল। 'কাস্‌ল্‌ অফ ইন্‌ডোলেন্স্‌' অর্থাৎ কুঁড়েমির কেল্লা যদি কাকেও বলা যায় সে হচ্ছে জাহাজ। বিশেষত গরম দিনে প্রশান্ত লোহিতসাগরের উপরে। যাত্রীরা সমস্ত বেলা ডেকের উপর আরামকেদারায় পড়ে ভ্রূর উপরে টুপি টেনে দিয়ে দিবাস্বপ্নে তলিয়ে রয়েছে। চলবার মধ্যে কেবল জাহাজ চলছে এবং তার দুই পাশের আহত নীল জল নাড়া পেয়ে অলস আপত্তির ক্ষীণ কলস্বরে পাশ কাটিয়ে কোনোমতে একটুখানিমাত্র সরে যাচ্ছে।

সূর্য অস্ত গেল। আকাশ এবং জলের উপর চমৎকার রঙ দেখা দিয়েছে। সমুদ্রের জলে একটি রেখামাত্র নেই। দিগন্তবিস্তৃত অটুট জলরাশি যৌবনপরিপূর্ণ পরিস্ফুট দেহের মতো একেবারে নিটোল এবং সুডোল। এই অপার অখণ্ড পরিপূর্ণতা আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত থম্‌থম্‌ করছে। বৃহৎ সমুদ্র হঠাৎ যেন একটা জায়গায় এসে থেমেছে যার ঊর্ধ্বে আর গতি নেই, পরিবর্তন নেই; যা অনন্তকাল অবিশ্রাম চাঞ্চল্যের পরম পরিণতি, চরম নির্বাণ। সূর্যাস্তের সময় চিল আকাশের নীলিমার যে একটি সর্বোচ্চ সীমার কাছে গিয়ে সমস্ত বৃহৎ পাখা সমতল-রেখায় বিস্তৃত করে দিয়ে হঠাৎ গতি বন্ধ করে দেয়, চিরচঞ্চল সমুদ্র ঠিক যেন সহসা সেইরকম একটা পরম প্রশান্তির শেষ সীমায় এসে ক্ষণেকের জন্যে পশ্চিম অস্তাচলের দিকে মুখ তুলে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে আছে। জলের যে বর্ণবিকাশ হয়েছে সে আকাশের ছায়া কি সমুদ্রের আলো ঠিক বলা যায় না। যেন একটা মাহেন্দ্রক্ষণে আকাশের নীরব নির্নিমেষ নীল নেত্রের দৃষ্টিপাতে হঠাৎ সমুদ্রের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে থেকে একটা আকস্মিক প্রতিভার দীপ্তি স্ফূর্তি পেয়ে তাকে অপূর্ব মহিমান্বিত করে তুলেছে।

সন্ধ্যা হয়ে এল। ঢং ঢং ঢং ঢং ঘণ্টা বাজল। সকলে বেশভূষা পরিবর্তন করে সান্ধ্যভোজনের জন্যে সুসজ্জিত হতে গেল। আধঘণ্টা পরে আবার ঘণ্টা। নরনারীগণ দলে দলে ভোজনশালায় প্রবেশ করলে। আমরা তিন বাঙালি একটি স্বতন্ত্র ছোটো টেবিল অধিকার করে বসলুম। আমাদের সামনে আর-একটি টেবিলে দুটি মেয়ে একটি উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে খেতে বসেছেন।

চেয়ে দেখলুম তাঁদের মধ্যে একটি যুবতী আপনার যৌবনশ্রী বহুলপরিমাণে উদ্ঘাটিত করে দিয়ে সহাস্যমুখে আহার এবং আলাপে নিযুক্ত। তাঁর শুভ্র সুগোল সুচিক্কণ গ্রীবাবক্ষবাহুর উপর সমস্ত বিদ্যুৎ-প্রদীপের অনিমেষ আলো এবং পুরুষমণ্ডলীর বিস্মিত সকৌতুক দৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিল। একটা অনাবৃত আলোকশিখা দেখে দৃষ্টিগুলো যেন কালো পতঙ্গের মতো চারি দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে লম্ফ দিয়ে পড়ছে। এমন-কি, অনেকে মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে তাকে নিরীক্ষণ করছে এবং তাই নিয়ে ঘরের সর্বত্র একটা চাপা হাসির চাঞ্চল্য উঠেছে। অনেকেই সেই যুবতীর পরিচ্ছদটিকে 'ইন্‌ডেকোরাস' বলে উল্লেখ করছে। কিন্তু আমাদের মতো বিদেশী লোকের পক্ষে তার বেআব্রু বেআদবিটা বোঝা একটু শক্ত। কারণ, নৃত্যশালায় এরকম কিংবা এর চেয়ে অনাবৃত বেশে গেলে কারও বিস্ময় উদ্রেক করে না।

কিন্তু বিদেশের সমাজনীতি সম্বন্ধে বেশি উৎসাহের সঙ্গে কিছু বলা ভালো নয়। আমাদের দেশে বাসরঘরে এবং কোনো কোনো বিশেষ উপলক্ষে মেয়েরা যেমন অবাধে লজ্জাহীনতা প্রকাশ করে, অন্য কোনো সভায় তেমন করলে সাধারণের কাছে দূষ্য হত সন্দেহ নেই। সমাজে যেমন নিয়মের বাঁধাবাঁধি, তেমনি মাঝে মাঝে দুটো-একটা ছুটিও থাকে।

৩১ আগস্ট। আজ রবিবার। প্রাতঃকালে উঠে উপরের ডেকে চৌকিতে বসে সমুদ্রের বায়ু সেবন করছি, এমন সময় নীচের ডেকে খৃস্টানদের উপাসনা আরম্ভ হল। যদিও জানি এদের মধ্যে অনেকেই শুষ্কভাবে অভ্যস্ত মন্ত্র আউড়িয়ে কল্‌-টেপা আর্গিনের মতো গান গেয়ে যাচ্ছিল— কিন্তু তবু এই যে দৃশ্য, এই যে গুটিকতক চঞ্চল ছোটো ছোটো মনুষ্য অপার সমুদ্রের মাঝখানে স্থির বিনম্রভাবে দাঁড়িয়ে গম্ভীর সমবেত কণ্ঠে এক চির-অজ্ঞাত অনন্ত রহস্যের প্রতি ক্ষুদ্র মানব-হৃদয়ের ভক্তি-উপহার প্রেরণ করছে, এ অতি আশ্চর্য।

কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ এক-একবার অট্টহাস্য শোনা গেল। গতরাত্রের সেই ডিনর-টেবিলের নায়িকাটি উপাসনায় যোগ না দিয়ে উপরের ডেকে বসে তাঁরই একটি উপাসক যুবকের সঙ্গে কৌতুকালাপে নিমগ্ন আছেন। মাঝে মাঝে উচ্চহাস্য করে উঠছেন, আবার মাঝে মাঝে গুন গুন স্বরে ধর্মসংগীতেও যোগ দিচ্ছেন।

আজ আহারের সময় একটি নূতন সংবাদের সৃষ্টি করা গেছে। ছোটো টেবিলটিতে আমরা তিন জনে ব্রেকফাস্ট খেতে বসেছি। একটা শক্ত গোলাকার রুটির উপরে ছুরি চালনা করতে গিয়ে ছুরিটা সবলে পিছলে আমার বাম হাতের দুই আঙুলের উপর এসে পড়ল। রক্ত চার দিকে ছিটকে পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ আহারে ভঙ্গ দিয়ে ক্যাবিনে পলায়ন করলুম। ইতিহাসে অনেক রক্তপাত লিপিবদ্ধ হয়েছে— আমার ডায়ারিতে আমার এই রক্তপাত লিখে রাখলুম; ভাবী বঙ্গবীরদের কাছে গৌরবের প্রার্থী নই; বর্তমান বঙ্গাঙ্গনাদের মধ্যে কেউ যদি একবার 'আহা' বলেন।

১ সেপ্টেম্বর। সন্ধ্যার পর আহারান্তে উপরের ডেকে আমাদের যথাস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল। মৃদু শীতল বায়ুতে আমার বন্ধু ঘুমিয়ে পড়েছেন এবং দাদা অলসভাবে ধূমসেবন করছেন, এমন সময় নীচের ডেকে নাচের বাজনা বেজে উঠল। সকলে মিলে জুড়ি জুড়ি ঘূর্ণনৃত্য আরম্ভ হল।

তখন পূর্বদিকে নব কৃষ্ণপক্ষের পূর্ণপ্রায় চন্দ্র ধীরে ধীরে সমুদ্রশয়ন থেকে উঠে আসছে। এই তীররেখাশূন্য জলময় মহামরুর পূর্বসীমান্তে উদয়পথের ঠিক নীচে থেকে আমাদের জাহাজ পর্যন্ত অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে প্রশস্ত দীর্ঘ আলোকপথ ঝিক্‌মিক্‌ করছে। জ্যোৎস্নাময়ী সন্ধ্যা কোন্‌ এক অলৌকিক বৃন্তের উপরে অপূর্ব শুভ্র রজনীগন্ধার মতো আপন প্রশান্ত সৌন্দর্যে নিঃশব্দে চতুর্দিকে দলপ্রসারণ করল। আর মানুষগুলো পরস্পরকে জড়াজড়ি করে ধরে পাগলের মতো তীব্র আমোদে ঘুরপাক খাচ্ছে, হাঁপাচ্ছে, উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

৩ সেপ্টেম্বর। বেলা দশটার সময় সুয়েজখালের প্রবেশমুখে এসে জাহাজ থামল। চারি দিকে চমৎকার রঙের খেলা। পাহাড়ের উপর রৌদ্র, ছায়া এবং নীলিম বাষ্প। ঘননীল সমুদ্রের প্রান্তে বালুকাতীরের রৌদ্রদুঃসহ গাঢ় পীত রেখা।

খালের মধ্যে দিয়ে জাহাজ সমস্ত দিন অতি ধীর গতিতে চলছে। দু-ধারে তরুহীন বালুকা। কেবল মাঝে মাঝে এক-একটি ছোটো কোঠাঘর বহুযত্নবর্ধিত গুটিকতক গাছে-পালায় বেষ্টিত হয়ে আরামজনক দেখাচ্ছে।

অনেক রাতে আধখানা চাঁদ উঠল। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে দুই তীর অস্পষ্ট ধূ ধূ করছে।— রাত দুটো-তিনটের সময় জাহাজ পোর্ট্‌সৈয়েদে নোঙর করলে।

৪ সেপ্টেম্বর। এখন আমরা ভূমধ্যসাগরে, য়ুরোপের অধিকারের মধ্যে। বাতাসও শীতল হয়ে এসেছে, সমুদ্রও গাঢ়তর নীল। আজ রাত্রে আর ডেকের উপর শোয়া হল না।

৫ সেপ্টেম্বর। বিকালের দিকে ক্রীট দ্বীপের তটপর্বত দেখা দিয়েছিল। ডেকের উপর একটা স্টেজ বাঁধা হচ্ছে। জাহাজে একদল নাট্যব্যবসায়ী যাত্রী আছে, তারা অভিনয় করবে। অন্যদিনের চেয়ে সকাল সকাল ডিনর খেয়ে নিয়ে তামাশা আরম্ভ হল। প্রথমে যাত্রীদের মধ্যে যারা গানবাজনা কিঞ্চিৎ জানেন এবং জানেন না, তাঁদের কারও বা দুর্বল পিয়োনোর টিং টিং কারও বা মৃদু ক্ষীণকণ্ঠে গান হল। তার পরে যবনিকা উদ্ঘাটন করে নটনটী-কর্তৃক 'ব্যালে' নাচ, সঙ, নিগ্রোর গান, যাদু, প্রহসন,

অভিনয় প্রভৃতি বিবিধ কৌতুক হয়েছিল। মধ্যে নাবিকাশ্রমের জন্যে দর্শকদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ হল।

৬ সেপ্টেম্বর। খাবার ঘরে খোলা জানলার কাছে বসে বাড়িতে চিঠি লিখছি। একবার মুখ তুলে বামে চেয়ে দেখলুম 'আয়োনিয়ান' দ্বীপ দেখা দিয়েছে। পাহাড়ের কোলের মধ্যে সমুদ্রের ঠিক ধারেই মনুষ্যরচিত ঘনসন্নিবিষ্ট একটি শ্বেত মৌচাকের মতো দেখা যাচ্ছে। এইটি জান্তি শহর (Zanthe)। দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন পর্বতটা তার প্রকাণ্ড করপুটে কতকগুলো শ্বেত পুষ্প নিয়ে সমুদ্রকে অঞ্জলি দেবার উপক্রম করছে।

ডেকের উপর উঠে দেখি আমরা দুই শৈলশ্রেণীর মাঝখান দিয়ে সংকীর্ণ সমুদ্রপথে চলেছি। আকাশে মেঘ করে এসেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—ঝড়ের সম্ভাবনা। আমাদের সর্বোচ্চ ডেকের চাঁদোয়া খুলে ফেলে দিলে। পর্বতের উপর অত্যন্ত নিবিড় মেঘ নেমে এসেছে; কেবল দূরে একটিমাত্র পাহাড়ের উপর মেঘছিদ্রমুক্ত সন্ধ্যালোকের একটি দীর্ঘ আরক্ত ইঙ্গিত এসে স্পর্শ করেছে, অন্য সবগুলো আসন্ন ঝটিকার ছায়ায় আচ্ছন্ন। কিন্তু ঝড় এল না। একটু প্রবল বাতাস এবং সবেগ বৃষ্টির উপর দিয়েই সমস্ত কেটে গেল। ভূমধ্যসাগরে আকাশের অবস্থা অত্যন্ত অনিশ্চিত। শুনলুম, আমরা যে পথ দিয়ে যাচ্ছি এখান দিয়ে জাহাজ সচরাচর যায় না। জায়গাটা নাকি ভারি ঝোড়ো।

রাত্রে ডিনরের পর যাত্রীরা কাপ্তেনের স্বাস্থ্যপান এবং গুণগান করলে। কাল ব্রিন্দিসি পৌঁছব। জিনিসপত্র বাঁধতে হবে।

৭ সেপ্টেম্বর। আজ সকালে ব্রিন্দিসি পৌঁছনো গেল। মেলগাড়ি প্রস্তুত ছিল, আমরা গাড়িতে উঠলুম।

গাড়ি যখন ছাড়ল তখন টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। আহার করে এসে একটি কোণে জানলার কাছে বসা গেল।

প্রথমে, দুই ধারে কেবল আঙুরের খেত। তার পরে জলপাইয়ের বাগান। জলপাইয়ের গাছগুলো নিতান্ত বাঁকাচোরা, গ্রন্থি ও ফাটল-বিশিষ্ট, বলি-অঙ্কিত, বেঁটেখাটো রকমের; পাতাগুলো ঊর্ধ্বমুখ; প্রকৃতির হাতের কাজে যেমন একটি সহজ অনায়াসের ভাব দেখা যায়, এই গাছগুলোয় তার বিপরীত। এরা নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া, কায়ক্লেশে অষ্টাবক্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; এক-একটা এমন বেঁকে ঝুঁকে পড়েছে যে পাথর উঁচু করে তাদের ঠেকো দিয়ে রাখতে হয়েছে।

বামে চষা মাঠ; সাদা সাদা ভাঙা ভাঙা পাথরের টুকরো চষা মাটির মধ্যে মধ্যে উৎক্ষিপ্ত। দক্ষিণে সমুদ্র। সমুদ্রের একেবারে ধারেই এক-একটি ছোটো ছোটো শহর দেখা দিচ্ছে। চর্চ্‌চূড়া-মুকুটিত সাদা ধব্‌ধবে নগরীটি একটি পরিপাটি তন্বী নাগরীর মতো কোলের কাছে সমুদ্র-দর্পণ রেখে নিজের মুখ দেখে হাসছে। নগর পেরিয়ে আবার মাঠ। ভুট্টার খেত, আঙুরের খেত, ফলের খেত, জলপাইয়ের বন; খেতগুলি খণ্ড প্রস্তরের বেড়া দেওয়া। মাঝে মাঝে এক-একটি বাঁধা কূপ। দূরে দূরে দুটো-একটা সঙ্গীহীন ছোটো সাদা বাড়ি।

সূর্যাস্তের সময় হয়ে এল। আমি কোলের উপর এক থোলো আঙুর নিয়ে বসে বসে এক-আধটা করে মুখে দিচ্ছি। এমন মিষ্ট টস্‌টসে সুগন্ধ আঙুর ইতিপূর্বে কখনো খাই নি। মাথায় রঙিন রুমাল বাঁধা ঐ ইতালীয়া যুবতীকে দেখে আমার মনে হচ্ছে, ইতালীয়ানীরা এখানকার আঙুরের গুচ্ছের মতো, অমনি একটি বৃন্তভরা অজস্র সুডোল সৌন্দর্য, যৌবনরসে অমনি উৎপূর্ণ—এবং ঐ আঙুরেরই মতো, তাদের মুখের রঙ—অতি বেশি সাদা নয়।

এখন একটা উচ্চ সমুদ্রতটের উপর দিয়ে চলেছি। আমাদের ঠিক নীচেই ডান দিকে সমুদ্র। ভাঙাচোরা জমি ঢালু হয়ে জলের মধ্যে প্রবেশ করেছে। গোটা চার-পাঁচ পাল-মোড়া নৌকো ডাঙার উপর তোলা। নীচেকার পথ দিয়ে গাধার উপর চড়ে লোক চলেছে। সমুদ্রতীরে কতকগুলো গোরু চরছে—কী খাচ্ছে ওরাই জানে; মাঝে মাঝে কেবল কতকগুলো শুকনো খড়কের মতো আছে মাত্র।

রাত্রে আমরা গাড়ির ভোজনশালায় ডিনরে বসেছি, এমন সময়ে গাড়ি একটা স্টেশনে এসে

দাঁড়াল। একদল নরনারী প্ল্যাটফর্মে ভিড় করে বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে আমাদের ভোজ দেখতে লাগল। তারই মধ্যে গ্যাসের আলোকে দুটি-একটি সুন্দর মেয়ের মুখ দেখা যাচ্ছিল, তাতে করে ভোজনপাত্র থেকে আমাদের চিত্তকে অনেকটা পরিমাণে বিক্ষিপ্ত করছিল। ট্রেন ছাড়বার সময় আমাদের সহযাত্রীগণ তাদের প্রতি অনেক টুপি রুমাল আন্দোলন, অনেক চুম্বন-সংকেত-প্রেরণ, তারস্বরে অনেক উল্লাসধ্বনি প্রয়োগ করলে; তারাও গ্রীবা-আন্দোলনে আমাদের প্রত্যভিবাদন করতে লাগল।

৮ সেপ্টেম্বর। কাল আড্রিয়াটিকের সমতল শ্রীহীন তীরভূমি দিয়ে আসছিলুম, আজ শস্য-শ্যামলা লম্বার্ডির মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলছে। চারি দিকে আঙুর জলপাই ভুট্টা ও তুঁতের খেত। কাল যে আঙুরের লতা দেখা গিয়েছিল সেগুলো ছোটো ছোটো গুল্মের মতো। আজ দেখছি খেতময় লম্বা লম্বা কাঠি পোঁতা, তারই উপর ফলগুচ্ছপূর্ণ দ্রাক্ষালতা লতিয়ে উঠেছে।

ক্রমে পাহাড় দেখা দিচ্ছে। পাহাড়গুলি উপর থেকে নীচে পর্যন্ত দ্রাক্ষাদণ্ডে কণ্টকিত হয়ে উঠেছে, তারই মাঝখানে এক-একটি লোকালয়।

রেলের লাইনের ধারে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র কুটীর; এক হাতে তারই একটি দুয়ার ধরে এক হাত কোমরে দিয়ে একটি ইতালীয়ান যুবতী সকৌতুক কৃষ্ণনেত্রে আমাদের গাড়ির গতি নিরীক্ষণ করছে। অনতিদূরে একটি বালিকা একটা প্রখরশৃঙ্গ প্রকাণ্ড গোরুর গলার দড়িটি ধরে নিশ্চিন্তমনে চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তার থেকে আমাদের বাংলা দেশের নবদম্পতির চিত্র মনে পড়ল। মস্ত একটা চশমা-পরা গ্যাজুয়েট-পুঙ্গব, এবং তারই দড়িটা ধরে ছোটো একটি চোদ্দ-পনেরো বৎসরের নোলক-পরা নববধূ; জন্তুটি দিব্যি পোষ মেনে চরে বেড়াচ্ছে, এবং মাঝে মাঝে বিস্ফারিত-নয়নে কর্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করছে।

ট্যুরিন স্টেশনে আসা গেল। এ দেশের সামান্য পুলিসম্যানের সাজ দেখে অবাক হতে হয়। মস্ত চূড়াওয়ালা টুপি, বিস্তর জরিজড়াও, লম্বা তলোয়ার—সকল ক'টিকেই সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র বলে মনে হয়।

দক্ষিণে বামে তুষাররেখাঙ্কিত সুনীল পর্বতশ্রেণী। বামে ঘনচ্ছায়াস্নিগ্ধ অরণ্য। যেখানে অরণ্যের একটু বিচ্ছেদ পাওয়া যাচ্ছে সেইখানেই শস্যক্ষেত্র তরুশ্রেণী ও পর্বত-সমেত এক-একটা নব নব আশ্চর্য দৃশ্য খুলে যাচ্ছে। পর্বতশৃঙ্গের উপর পুরাতন দুর্গশিখর, তলদেশে এক-একটি ছোটো ছোটো গ্রাম। যত এগোচ্ছি অরণ্যপর্বত ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে যে গ্রামগুলি আসছে সেগুলি তেমন উদ্ধত শুভ্র নবীন পরিপাটি নয়; একটু যেন ম্লান দরিদ্র নিভৃত; একটি আধটি চর্চের চূড়া আছে মাত্র; কিন্তু কল-কারখানার ধুমোদ্গারী বৃংহিতধ্বনিত ঊর্ধ্বমুখী ইষ্টকশুণ্ড নেই।

ক্রমে অল্পে অল্পে পাহাড়ের উপরে ওঠা যাচ্ছে। পার্বত্য পথ সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলেছে; ঢালু পাহাড়ের উপর চষা খেত সোপানের মতো থাকে থাকে উঠেছে। একটি গিরিনদী স্বচ্ছ সফেন জলরাশি নিয়ে সংকীর্ণ উপলপথ দিয়ে ঝরে পড়ছে।

গাড়িতে আলো দিয়ে গেল। এখনই মন্ট্ সেনিসের বিখ্যাত দীর্ঘ রেলোয়ে-সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। গহ্বরটি উত্তীর্ণ হতে প্রায় আধঘণ্টা লাগল।

এইবার ফ্রান্স। দক্ষিণে এক জলস্রোত ফেনিয়ে ফেনিয়ে চলেছে। ফরাসি জাতির মতো দ্রুত চঞ্চল উচ্ছ্বসিত হাস্যপ্রিয় কলভাষী।

ফ্রান্সের প্রবেশদ্বারে একবার একজন কর্মচারী গাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করে গেল আমাদের মাশুল দেবার যোগ্য জিনিস কিছু আছে কি না। আমরা বললুম, না। আমাদের একজন বৃদ্ধ সহযাত্রী ইংরেজ বলেন, I don't parlez-vous francaise.

সেই স্রোত এখনো আমাদের ডান দিক দিয়ে চলেছে। তার পূর্ব তীরে 'ফার্' অরণ্য নিয়ে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। চঞ্চলা নির্ঝরিণী বেঁকেচুরে ফেনিয়ে ফুলে নেচে কলরব করে পাথরগুলোকে

সর্বাঙ্গ দিয়ে ঠেলে রেলগাড়ির সঙ্গে সমান দৌড় দিয়েছে। মাঝে মাঝে একটা লোহার সাঁকো মুষ্টি দিয়ে তার ক্ষীণ কটিদেশ পরিমাপ করবার চেষ্টা করছে। এক জায়গায় জলরাশি খুব সংকীর্ণ; দুই তীরের শ্রেণীবদ্ধ দীর্ঘ বৃক্ষগুলি শাখায় শাখায় বেষ্টন করে দুরন্ত স্রোতকে অন্তঃপুরে বন্দী করতে বৃথা চেষ্টা করছে। উপর থেকে ঝরনা এসে সেই প্রবাহের সঙ্গে মিশছে। বরাবর পূর্ব তীর দিয়ে একটি পার্বত্য পথ সমরেখায় স্রোতের সঙ্গে বেঁকে চলে গেছে। এক জায়গায় আমাদের সহচরীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হল। হঠাৎ সে দক্ষিণ থেকে বামে এসে এক অজ্ঞাত সংকীর্ণ শৈলপথে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন পর্বতশ্রেণীর মধ্যে এক-একটা পাহাড় তৃণহীন সহস্র-রেখাঙ্কিত পাষাণ-কঙ্কাল প্রকাশ করে নগ্নভাবে দাঁড়িয়ে আছে; কেবল তার মাঝে মাঝে এক-এক জায়গায় খানিকটা করে অরণ্যের খণ্ড আবরণ রয়েছে। প্রচণ্ড সংগ্রামে একটা দৈত্য সহস্র সহস্র নখের বিদারণরেখা রেখে যেন ওর শ্যামল ত্বক অনেকখানি করে আঁচড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে।

আবার হঠাৎ ডান দিকে আমাদের সেই পূর্বসঙ্গিনী মুহূর্তের জন্যে দেখা দিয়ে বামে চলে গেল। একবার দক্ষিণে, একবার বামে, একবার অন্তরালে। আবার হয়তো যেতে যেতে কোন্ এক পর্বতের আড়াল থেকে সহসা কলহাস্যে করতালি দিয়ে আচমকা দেখা দেবে।

সেই জলপাই এবং দ্রাক্ষাকুঞ্জ অনেক কমে গেছে। বিবিধ শস্যের ক্ষেত্র এবং দীর্ঘ সরল পপ্‌লার গাছের শ্রেণী। ভুট্টা, তামাক, নানাবিধ শাকসবজি। কেবলই যেন বাগানের পর বাগান। এই কঠিন পর্বতের মধ্যে মানুষ বহুদিন থেকে বহুযত্নে প্রকৃতিকে বশ করে তার উচ্ছৃঙ্খলতা হরণ করেছে। প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের উপর মানুষের কত প্রয়াস প্রকাশ পাচ্ছে। এ দেশের লোকেরা যে আপনার দেশকে ভালোবাসবে তাতে কিছু আশ্চর্য নেই। এরা আপনার দেশকে আপনার যত্নে আপনার করে নিয়েছে। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বহুকাল থেকে একটা বোঝাপড়া হয়ে আসছে, উভয়ের মধ্যে ক্রমিক আদানপ্রদান চলছে, তারা পরস্পর সুপরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। এক দিকে প্রকাণ্ড প্রকৃতি উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে আর-একদিকে বৈরাগ্যবৃদ্ধ মানব উদাসীনভাবে শুয়ে— য়ুরোপের সে ভাব নয়। এদের এই সুন্দরী ভূমি এদের একান্ত সাধনার ধন, একে এরা নিয়ত বহু আদর করে রেখেছে। এর জন্যে যদি প্রাণ না দেবে তো কিসের জন্যে দেবে! এই প্রেয়সীর প্রতি কেউ তিলমাত্র হস্তক্ষেপ করলে কি আর সহ্য হয়? আমরা তো জঙ্গলে থাকি; খালবিল বনবাদাড় ভাঙারাস্তা এবং পানাপুকুরের ধারে বাস করি। খেত থেকে দু-মুঠো ধান আনি, মেয়েরা আঁচল ভরে শাক তুলে নিয়ে আসে, ছেলেরা পাঁকের মধ্যে নেমে চিংড়িমাছ ধরে আনে, প্রাঙ্গণের গাছ থেকে গোটাকতক তেঁতুল পাড়ি, তার পরে শুকনো কাঠকুট সংগ্রহ করে এক-বেলা অথবা দু-বেলা কোনোরকম করে আহার চলে যায়; ম্যালেরিয়া এসে যখন জীর্ণ অস্থিকঙ্কাল কাঁপিয়ে তোলে তখন কাঁথা মুড়ি দিয়ে রৌদ্রে পড়ে থাকি, গ্রীষ্মকালে শুষ্কপ্রায় পঙ্ককুণ্ডের হরিদ্‌বর্ণ জলাবশেষ থেকে উঠে এসে ওলাউঠা যখন আমাদের গৃহ আক্রমণ করে তখন ওলাদেবীর পূজা দিই এবং অদৃষ্টের দিকে কোটরপ্রবিষ্ট হতাশ শূন্যদৃষ্টি বদ্ধ করে দল বেঁধে মরতে আরম্ভ করি। আমরা কি আমাদের দেশকে পেয়েছি না পেতে চেষ্টা করেছি? আমরা ইহলোকের প্রতি ঔদাস্য করে এখানে কেবল অনিচ্ছুক পথিকের মতো যেখানে-সেখানে পড়ে থাকি এবং যত শীঘ্র পারি দ্রুতবেগে বিশ-পঁচিশটা বৎসর ডিঙিয়ে একেবারে পরলোকে গিয়ে উপস্থিত হই।

কিন্তু এ কী চমৎকার চিত্র! পর্বতের কোলে, নদীর ধারে, হ্রদের তীরে পপ্‌লার-উইলো-বেষ্টিত কাননশ্রেণী। নিষ্কণ্টক নিরাপদ নিরাময় ফলশস্যপরিপূর্ণ প্রকৃতি প্রতিক্ষণে মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছে এবং মানুষকে দ্বিগুণ ভালোবাসছে। মানুষের মতো জীবের এই তো যোগ্য আবাসস্থান। মানুষের প্রেম এবং মানুষের ক্ষমতা যদি আপনার চতুর্দিককে সংযত সুন্দর সমুজ্জ্বল করে না তুলতে পারে তবে তরুকোটর-গুহাগহ্বর-বনবাসী জন্তুর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ কী?

৮ সেপ্টেম্বর। পথের মধ্যে আমাদের প্যারিসে নাববার প্রস্তাব হচ্ছে। কিন্তু আমাদের এই

ট্রেন প্যারিসে যায় না—একটু পাশ কাটিয়ে যায়। প্যারিসের একটি নিকটবর্তী স্টেশনে স্পেশল ট্রেন প্রস্তুত রাখবার জন্যে টেলিগ্রাফ করা গেল।

রাত দুটোর সময় আমাদের জাগিয়ে দিলে। ট্রেন বদল করতে হবে। জিনিসপত্র বেঁধে বেরিয়ে পড়লুম। বিষম ঠাণ্ডা। অনতিদূরে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে। কেবলমাত্র একটি এঞ্জিন, একটি ফর্স্ট্ ক্লাস এবং একটি ব্রেকভ্যান। আরোহীর মধ্যে আমরা তিনটি ভারতবর্ষীয়। রাত তিনটের সময় প্যারিসের জনশূন্য বৃহৎ স্টেশনে পৌঁছনো গেল। সুপ্তোত্থিত দুই-একজন 'মসিয়' আলো-হস্তে উপস্থিত। অনেক হাঙ্গাম করে নিদ্রিত কাস্টম-হউসকে জাগিয়ে তার পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করলুম। তখন প্যারিস তার সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে স্তব্ধ রাজপথে দীপশ্রেণী জ্বালিয়ে রেখে নিদ্রামগ্ন। আমরা হোটেল টার্মিনুতে আমাদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করলুম। পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন, বিদ্যুদুজ্জ্বল, স্ফটিকমণ্ডিত, কার্পেটাবৃত, চিত্রিতভিত্তি, নীলযবনিকাপ্রচ্ছন্ন শয়নশালা; বিহগপক্ষসুকোমল শুভ্র শয্যা।

বেশ বদল করে শয়নের উদ্যোগ করবার সময় দেখা গেল আমাদের জিনিসপত্রের মধ্যে আর-একজনের ওভারকোট গাত্রবস্ত্র। আমরা তিনজনেই পরস্পরের জিনিস চিনি নে; সুতরাং হাতের কাছে যে-কোনো অপরিচিত বস্তু পাওয়া যায় সেইটেই আমাদের কারও-না-কারও স্থির করে অসংশয়ে সংগ্রহ করে আনি। অবশেষে নিজের নিজের জিনিস পৃথক করে নেবার পর উদ্‌বৃত্ত সামগ্রী পাওয়া গেলে, তা আর পূর্বাধিকারীকে ফিরিয়ে দেবার কোনো সুযোগ থাকে না। ওভারকোটটি রেলগাড়ি থেকে আনা হয়েছে; যার কোট সে বেচারা বিশ্বস্তচিত্তে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। গাড়ি এতক্ষণে সমুদ্রতীরস্থ ক্যালে নগরীর নিকটবর্তী হয়েছে। লোকটি কে, এবং সমস্ত ব্রিটিশ রাজ্যের মধ্যে তার ঠিকানা কোথায়, আমরা কিছুই জানি নে। মাঝের থেকে তার লম্বা কুর্তি এবং আমাদের পাপের ভার স্কন্ধের উপর বহন করে বেড়াচ্ছি—প্রায়শ্চিত্তের পথ বন্ধ। মনে হচ্ছে একবার যে লোকটির কম্বল হরণ করেছিলুম এ-কুর্তিটি তার। সে বেচারা বৃদ্ধ শীতপীড়িত, বাতে পঙ্গু, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পুলিস-অধ্যক্ষ। পুলিসের কাজ করে মানবচরিত্রের প্রতি সহজেই তার বিশ্বাস শিথিল হয়ে এসেছে, তার পরে যখন কাল প্রত্যুষে ব্রিটিশ চ্যানেল পার হবার সময় তীব্র শীতবায়ু তার হৃতকুর্তি জীর্ণ দেহকে কম্পান্বিত করে তুলবে তখন সেইসঙ্গে মনুষ্যজাতির সাধুতার প্রতিও তার বিশ্বাস কম্পিত হতে থাকবে।

৯ সেপ্টেম্বর। প্রাতঃকালে দ্বিতীয়বার বেশপরিবর্তন করবার সময় দেখা গেল আমার বন্ধুর একটি পোর্টম্যান্টো পাওয়া যাচ্ছে না।

পুলিসে সংবাদ দিয়ে প্রাতঃকালে তিনজনে প্যারিসের পথে পদব্রজে বেরিয়ে পড়লুম। প্রকাণ্ড রাজপথ দোকান বাগান প্রাসাদ প্রস্তরমূর্তি ফোয়ারা লোকজন গাড়িঘোড়ার মধ্যে অনেক ঘুরে ঘুরে এক ভোজন-গৃহের বিরাট স্ফটিকশালার প্রান্তটেবিলে বসে অল্প আহার করে এবং বিস্তর মূল্য দিয়ে ঈফেল স্তম্ভ দেখতে গেলেম। এই লৌহস্তম্ভ চারি পায়ের উপরে ভর দিয়ে এক বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। কলের দোলায় চড়ে এই স্তম্ভের চতুর্থ তলায় উঠে নিম্নে সমস্ত প্যারিসটাকে খুব একটা বড়ো ম্যাপের মতো প্রসারিত দেখতে পেলুম।

বলা বাহুল্য, এমন করে একদিনে তাড়াতাড়ি চক্ষুদ্বারা বহির্ভাগ লেহন করে প্যারিসের রসাস্বাদন করা যায় না। এ যেন, ধনীগৃহের মেয়েদের মতো বন্ধ পালকির মধ্যে থেকে গঙ্গাস্নান করার মতো—কেবল নিতান্ত তীরের কাছে একটা অংশে এক ডুবে যতখানি পাওয়া যায়। কেবল হাঁপানিই সার।

হোটেলে এসে দেখলুম পুলিসের সাহায্যে বন্ধুর পোর্টম্যান্টো ফিরে এসেছে, কিন্তু এখনো সেই পরের হৃত কোর্তা সম্বন্ধে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আছি।

১০ সেপ্টেম্বর। লন্ডন অভিমুখে চললুম। সন্ধ্যার সময় লন্ডনে পৌঁছে দুই-একটি হোটেল অন্বেষণ করে দেখা গেল স্থানাভাব। অবশেষে একটি ভদ্রপরিবারের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল।

১১ সেপ্টেম্বর। সকালবেলায় আমাদের পুরাতন বন্ধুদের সন্ধানে বাহির হওয়া গেল। প্রথমে লন্ডনের মধ্যে আমার সর্বাপেক্ষা পরিচিত বাড়ির দ্বারে গিয়ে আঘাত করা গেল। যে দাসী এসে দরজা খুলে দিলে তাকে চিনি নে। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম আমার বন্ধু বাড়িতে আছেন কি না। সে বললে তিনি এ বাড়িতে থাকেন না। জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় থাকেন? সে বললে, আমি জানি নে, আপনারা ঘরে এসে বসুন, আমি জিজ্ঞাসা করে আসছি। পূর্বে যে ঘরে আমরা আহার করতুম সেই ঘরে গিয়ে দেখলেম সমস্ত বদল হয়ে গেছে—সেখানে টেবিলের উপর খবরের কাগজ এবং বই—সে ঘর এখন অতিথিদের প্রতীক্ষাশালা হয়েছে। খানিকক্ষণ বাদে দাসী একটি কার্ডে লেখা ঠিকানা এনে দিলে। আমার বন্ধু এখন লন্ডনের বাইরে কোন্ এক অপরিচিত স্থানে থাকেন। নিরাশহৃদয়ে আমার সেই পরিচিত বাড়ি থেকে বেরোলুম।

আমাদের গাড়ি মিস্ শ—এর বাড়ির সম্মুখে এসে দাঁড়াল। গিয়ে দেখি তিনি নির্জন গৃহে বসে একটি পীড়িত কুক্কুরশাবকের সেবায় নিযুক্ত। জলবায়ু, পরস্পরের স্বাস্থ্য এবং কালের পরিবর্তন সম্বন্ধে কতকগুলি প্রচলিত শিষ্টালাপ করা গেল।

সেখান থেকে বেরিয়ে, লন্ডনের সুড়ঙ্গপথে যে পাতাল-বাষ্পযান চলে, তাই অবলম্বন করে বাসায় ফেরবার চেষ্টা করা গেল। কিন্তু পরিণামে দেখতে পেলুম পৃথিবীতে সকল চেষ্টা সহজে সফ া হয় না। আমরা দুই ভাই তো গাড়িতে চড়ে বেশ নিশ্চিন্ত বসে আছি; এমন সময় গাড়ি যখন হ্যামারস্মিথ নামক দূরবর্তী স্টেশনে গিয়ে থামল তখন আমাদের বিশ্বাসপরায়ণ চিত্তে ঈষৎ সংশয়ের সঞ্চার হল। একজনকে জিজ্ঞাসা করাতে সে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে আমাদের গম্যস্থান যে দিকে এ গাড়ির গম্যস্থান সে দিকে নয়। পুনর্বার তিন-চার স্টেশন ফিরে গিয়ে গাড়ি বদল করা আবশ্যক। তাই করা গেল। অবশেষে গম্য স্টেশনে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে আমাদের বাসা খুঁজে পাই নে। বিস্তর গবেষণার পর বেলা সাড়ে তিনটের সময় বাড়ি ফিরে ঠান্ডা টিফিন খাওয়া গেল। এইটুকু আত্মজ্ঞান জন্মেছে যে, আমরা দুটি ভাই লিভিংস্টোন অথবা স্টান্লির মতো ভৌগোলিক আবিষ্কার-কার্যের যোগ্য নই। পৃথিবীতে যদি অক্ষয় খ্যাতি উপার্জন করতে চাই তো নিশ্চয় অন্য কোনো দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

১২ সেপ্টেম্বর। আমাদের বন্ধুর একটি গুণ আছে; তিনি যতই কল্পনার চর্চা করুন-না কেন, কখনো পথ ভোলেন না। সুতরাং তাঁকেই আমাদের লন্ডনের পান্ডাপদে বরণ করেছি। আমরা যেখানে যাই তাঁকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যাই এবং তিনি যেখানে যান আমরা কিছুতেই তাঁর সঙ্গ ছাড়ি নে। কিন্তু একটা আশঙ্কা আছে, এরকম অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব এ পৃথিবীতে সকল সময় সমাদৃত হয় না। হায়! এ সংসারে কুসুমে কণ্টক, কলানাথে কলঙ্ক এবং বন্ধুত্বে বিচ্ছেদ আছে—কিন্তু ভাগ্যিস আছে!

১৫ সেপ্টেম্বর। স্যাভয় থিয়েটারে 'গন্ডোলিয়র্স' নামক একটি গীতিনাট্য অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম। আলোকে সংগীতে সৌন্দর্যে বর্ণবিন্যাসে দৃশ্যে নৃত্যে হাস্যে কৌতুকে মনে হল একটা কোন্ কল্পনারাজ্যে আছি। মাঝে এক অংশে অনেকগুলি নর্তক-নর্তকীতে মিলে নৃত্য আছে; আমার মনে হল যেন হঠাৎ এক সময়ে একটা উন্মাদকর যৌবনের বাতাসে পৃথিবী জুড়ে নরনারীর একটা উলট-পালট ঢেউ উঠেছে—তাতে আলোক এবং বর্ণচ্ছটা, সংগীত এবং উৎফুল্ল নয়নের উজ্জ্বল হাসি সহস্র ভঙ্গিতে চারি দিকে ঠিকরে পড়ছে।

১৬ সেপ্টেম্বর। আজ আমাদের গৃহস্বামীর কুমারী কন্যা আমার কতকগুলি পুরাতন পূর্বশ্রুত সুর পিয়ানোয় বাজাচ্ছিলেন; তাই শুনে আমার গৃহ মনে পড়তে লাগল। সেই ভারতবর্ষের রৌদ্রালোকিত প্রাতঃকাল, মুক্ত বাতায়ন, অব্যাহত আকাশ এবং পিয়োনো যন্ত্রে এই স্বপ্নবহ পরিচিত সংগীতধ্বনি।

১৭ সেপ্টেম্বর। যে দুর্ভাগার শীতকোর্তা আমরা বহন করে করে বেড়াচ্ছি ইন্ডিয়া আপিস যোগে সে আমাদের একটি পত্র লিখেছে— আমরাই যে তার গাত্রবস্ত্রটি সংগ্রহ করে এনেছি সে বিষয়ে

পত্রলেখক নিজের দৃঢ়বিশ্বাস প্রকাশ করেছে; তার সঙ্গে 'ভ্রমক্রমে' বলে একটা শব্দ যোগ করে দিয়েছিল। একটা সন্তোষের বিষয় এই, যার কম্বল নিয়েছিলুম এটা তার নয়। ভ্রমক্রমে দুবার একজনের গরম কাপড় নিলে ভ্রম সপ্রমাণ করা কিছু কঠিন হত।

১৯ সেপ্টেম্বর। এখানে রাস্তায় বেরিয়ে সুখ আছে। সুন্দর মুখ চোখে পড়বেই। শ্রীযুক্ত দেশানুরাগ যদি পারেন তো আমাকে ক্ষমা করবেন। নবনীর মতো সুকোমল শুভ্র রঙের উপরে একখানি পাতলা টুকটুকে ঠোঁট, সুগঠিত নাসিকা এবং দীর্ঘপল্লববিশিষ্ট নির্মল নীলনেত্র—দেখে প্রবাসদুঃখ দূর হয়ে যায়। শুভানুধ্যায়ীরা শঙ্কিত এবং চিন্তিত হবেন, প্রিয় বয়স্যেরা পরিহাস করবেন কিন্তু এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে সুন্দর মুখ আমার সুন্দর লাগে। সুন্দর হওয়া এবং মিষ্ট করে হাসা মানবীয় যেন একটি পরমাশ্চর্য ক্ষমতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার ভাগ্যক্রমে ঐ হাসিটা এ দেশে কিছু বাহুল্যে পরিমাণে পেয়ে থাকি। অনেক সময়ে রাজপথে কোনো নীলনয়না পান্থরমণীর সম্মুখবর্তী হবামাত্র সে আমার মুখের দিকে চেয়ে আর হাসি সংবরণ করতে পারে না। তখন তাকে ডেকে বলে দিতে ইচ্ছা করে, 'সুন্দরী, আমি হাসি ভালোবাসি বটে, কিন্তু এতটা নয়। তা ছাড়া বিম্বাধরসংলগ্ন হাসি যতই সুমিষ্ট হোক-না কেন, তারও একটা যুক্তি-সংগত কারণ থাকা চাই; কারণ, মানুষ কেবলমাত্র যে সুন্দর তা নয়, মানুষ বুদ্ধিমান জীব। হে নীলাব্জনয়নে, আমি তো ইংরেজের মতো অসভ্য খাটো কুর্তি এবং অসংগত লম্বা ধুচুনি টুপি পরি নে, তবে হাস কী দেখে? আমি সুশ্রী কি কুশ্রী সে বিষয়ে কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করা রুচিবিরুদ্ধ কিন্তু এটা আমি জোর করে বলতে পারি বিদ্রূপের তুলি দিয়ে বিধাতাপুরুষ আমার মুখমণ্ডল অঙ্কিত করেন নি। তবে যদি রঙটা কালো এবং চুলগুলো কিছু লম্বা দেখে হাসি পায়, তা হলে এই পর্যন্ত বলতে পারি, প্রকৃতিভেদে হাস্যরস সম্বন্ধে অদ্ভুত রুচিভেদ লক্ষিত হয়। তোমরা যাকে 'হিউমার' বল, আমার মতে কালো রঙের সঙ্গে তার কোনো কার্যকারণ-সম্বন্ধ নেই। দেখছি বটে, তোমাদের দেশে মুখে কালি মেখে কাফ্রি সেজে নৃত্যগীত করা একটা কৌতুকের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু, কনককেশিনি, সেটা আমার কাছে নিতান্ত হৃদয়হীন বর্বরতা বলে বোধ হয়।'

২২ সেপ্টেম্বর। আজ সন্ধ্যার সময় গোটাকতক বাংলা গান গাওয়া গেল। তার মধ্যে গুটি দুই-তিন এখানকার শ্রোত্রীগণ বিশেষ পছন্দ করেছেন। আশা করি, সেটা কেবলমাত্র মৌখিক ভদ্রতা নয়। তবে চাণক্য বলেছেন—ইত্যাদি।

২৩ সেপ্টেম্বর। আজকাল সমস্ত দিনই প্রায় জিনিসপত্র কিনে দোকানে দোকানে ঘুরে কেটে যাচ্ছে। বাড়ি ফিরে এলেই আমার বন্ধু বলেন, এসো বিশ্রাম করি গে। তার পরে খুব সমারোহে বিশ্রাম করতে যাই। শয়নগৃহে প্রবেশ করে বান্ধবটি অনতিবিলম্বে শয্যাতল আশ্রয় করেন, আমি পার্শ্ববর্তী একটি সুগভীর কেদারার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে বসি। তার পরে, কোনো বিদেশী কাব্যগ্রন্থ পাঠ করি, না-হয়, দুজনে মিলে জগতের যত-কিছু অতলস্পর্শ বিষয় আছে দেখতে দেখতে তার মধ্যে তলিয়ে অন্তর্ধান করি। আজকাল এইভাবে এতই অধিক বিশ্রাম করছি যে, কাজের অবকাশ তিলমাত্র থাকে না। ড্রয়িংরুমে ভদ্রলোকেরা গীতবাদ্য সদালাপ করেন, আমরা তার সময় পাই নে, আমরা বিশ্রামে নিযুক্ত। শরীররক্ষার জন্যে সকলে কিয়ৎকাল মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণাদি করে থাকেন, সে হতেও আমরা বঞ্চিত, আমরা এত অধিক বিশ্রাম করে থাকি। রাত দুটো বাজল, আলো নিবিয়ে দিয়ে সকলেই আরামে নিদ্রা দিচ্ছে, কেবল আমাদের দুই হতভাগ্যের ঘুমোবার অবসর নেই, আমরা তখনো অত্যন্ত দুরূহ বিশ্রামে ব্যস্ত।

২৫ সেপ্টেম্বর। আজ এখানকার একটি ছোটোখাটো এক্‌জিবিশন দেখতে গিয়েছিলুম। শুনলুম, এটা প্যারিস এক্‌জিবিশনের অত্যন্ত সুলভ এবং সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় সংস্করণ। সেখানে চিত্রশালায় প্রবেশ করে কারোলু ড্যুরাঁ-নামক একজন বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকর-রচিত একটি বসনহীনা মানবীর ছবি দেখলুম। আমরা প্রকৃতির সকল শোভাই দেখি, কিন্তু মর্ত্যের এই চরম সৌন্দর্যের উপর, জীব-অভিব্যক্তির এই সর্বশেষ কীর্তিখানির উপর, মানুষ স্বহস্তে একটি চির-অন্তরাল টেনে

রেখে দিয়েছে। এই দেহখানির স্নিগ্ধ শুভ্র কোমলতা এবং প্রত্যেক সুঠাম সুনিপুণ ভঙ্গিমার উপরে অসীম সুন্দরের সযত্ন অঙ্গুলির সদ্যস্পর্শ দেখা যায় যেন। এ কেবলমাত্র দেহের সৌন্দর্য নয়, যদিও দেহের সৌন্দর্য যে বড়ো সামান্য এবং সাধুজনের উপেক্ষণীয় তা বলতে পারি নে— কিন্তু এতে আরও অনেকখানি গভীরতা আছে। একটি প্রীতিরমণীয় সুকোমল নারী-প্রকৃতি, একটি অমরসুন্দর মানবাত্মা এর মধ্যে বাস করে, তারই দিব্য লাবণ্য এর সর্বত্র উদ্ভাসিত। দূর থেকে চকিতের মতো সেই অনির্বচনীয় চির-রহস্যকে দেহের স্ফটিক-বাতায়নে একটুখানি যেন দেখা গেল।

২৭ সেপ্টেম্বর। আজ লাইসীয়ম নাট্যশালায় গিয়েছিলুম। স্কট-রচিত 'ব্রাইড অফ লামারমুর' উপন্যাস নাট্যাকারে অভিনীত হয়েছিল। বিখ্যাত অভিনেতা আর্ভিং নায়ক সেজেছিলেন। তাঁর উচ্চারণ অস্পষ্ট এবং অঙ্গভঙ্গি অদ্ভুত। তৎসত্ত্বেও তিনি কী এক নাট্যকৌশলে ক্রমশ দর্শকদের হৃদয়ে সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করতে পারেন।

আমাদের সম্মুখবর্তী একটি বক্সে দুটি মেয়ে বসে ছিল। তার মধ্যে একটি মেয়ের মুখ রঙ্গভূমির সমস্ত দর্শকের চিত্ত এবং দূরবীন আকৃষ্ট করেছিল। নিখুঁত সুন্দর ছোটো মুখখানি, অল্প বয়স, দীর্ঘ বেণী পিঠে ঝুলছে, বেশভূষার আড়ম্বর নেই। অভিনয়ের সময় যখন সমস্ত আলো নিবিয়ে দিয়ে কেবল স্টেজের আলো জ্বলছিল এবং সেই আলো স্টেজের অনতিদূরবর্তী তার আধখানি মুখের উপর এসে পড়েছিল— তখন তার আলোকিত সুকুমার মুখের রেখা এবং সুভঙ্গিম গ্রীবা অন্ধকারের উপর চমৎকার চিত্র রচনা করেছিল। হিতৈষীরা আমাকে পুনশ্চ মার্জনা করবেন— অভিনয়কালে সে দিকে আমার দৃষ্টি বদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু দূরবীন কষাটা আমার আসে না। নির্লজ্জ স্পর্ধার সহিত পরস্পরের প্রতি অসংকোচে দূরবীন প্রয়োগ করা নিতান্ত রূঢ় মনে হয়।

২ অক্টোবর। একটি গুজরাটির সঙ্গে দেখা হল। ইনি ভারতবর্ষ থেকে সমস্ত পথ জাহাজের ডেকে চড়ে এসেছেন। তখন শীতের সময়। মাছ-মাংস খান না। সঙ্গে চিঁড়ে শুষ্কফল প্রভৃতি কিছু ছিল এবং জাহাজ থেকে শাকসবজি কিছু সংগ্রহ করতেন। ইংরেজি অতি সামান্য জানেন। গায়ে শীতবস্ত্র অধিক নেই। লন্ডনে স্থানে স্থানে উদ্ভিজ্জ ভোজনের ভোজনশালা আছে, সেখানে ছয় পেনিতে তাঁর আহার সমাধা হয়। যেখানে যা-কিছু দ্রষ্টব্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, সমস্ত অনুসন্ধান করে বেড়ান। বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে অসংকোচে সাক্ষাৎ করেন। কী রকম করে কথাবার্তা চলে বলা শক্ত। মধ্যে মধ্যে কার্ডিনাল ম্যানিঙের সঙ্গে ধর্মালোচনা করে আসেন। ইতিমধ্যে এক্‌জিবিশনের সময় প্যারিসে দুই মাস যাপন করে এসেছেন এবং অবসরমত আমেরিকায় যাবার সংকল্প করছেন। ভারতবর্ষে এঁকে আমি জানতুম। ইনি বাংলা শিক্ষা করে অনেক ভালো বাংলা বই গুজরাটিতে তরজমা করেছেন। এঁর স্ত্রীপুত্র পরিবার কিছুই নেই। ভ্রমণ করা, শিক্ষা করা, এবং স্বদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন করা এঁর একমাত্র কাজ। লোকটি অতি নিরীহ, শীর্ণ, খর্ব, পৃথিবীতে অতি অল্প পরিমাণ স্থান অধিকার করেন। এঁকে দেখে আমার আশ্চর্য বোধ হয়।

৬ অক্টোবর। এখনো আমাদের প্রবাসের সময় উত্তীর্ণ হয় নি, কিন্তু আমি আর এখানে পেরে উঠছি নে। বলতে লজ্জা বোধ হয়, আমার এখানে ভালো লাগছে না। সেটা গর্বের বিষয় নয়, লজ্জার বিষয়— সেটা আমার স্বভাবের ত্রুটি।

যখন কৈফিয়ত সন্ধান করি তখন মনে হয় যে, য়ুরোপের যে ভাবটা আমাদের মনে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে, সেটা সেখানকার সাহিত্য ইতিহাস পড়ে। সেটা হচ্ছে আইডিয়াল য়ুরোপ। অন্তরের মধ্যে প্রবেশ না করলে সেটা প্রত্যক্ষ করবার জো নেই। তিন মাস, ছ-মাস কিংবা ছ-বৎসর এখানে থেকে আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার কেবল হাত-পা নাড়া দেখতে পাই মাত্র। বড়ো বড়ো বাড়ি, বড়ো বড়ো কারখানা, নানা আমোদের জায়গা; লোক চলছে ফিরছে, যাচ্ছে আসছে, খুব একটা সমারোহ। সে যতই বিচিত্র, যতই আশ্চর্য হোক-না কেন, তাতে দর্শককে শ্রান্তি দেয়; কেবলমাত্র বিস্ময়ের উত্তেজনা চিত্তকে পরিপূর্ণ করতে পারে না বরং তাতে মনকে সর্বদা বিক্ষিপ্ত করতে থাকে।

অবশেষে এই কথা মনে আসে— আচ্ছা ভালো রে বাপু, আমি মেনে নিচ্ছি তুমি মস্ত শহর, মস্ত দেশ, তোমার ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্যের সীমা নেই। অধিক প্রমাণের আবশ্যকতা নেই। এখন আমি বাড়ি যেতে পারলে বাঁচি। সেখানে আমি সকলকে চিনি, সকলকে বুঝি; সেখানে সমস্ত বাহ্যাবরণ ভেদ করে মনুষ্যত্বের আস্বাদ সহজে পাই। সহজে উপভোগ করতে পারি, সহজে চিন্তা করতে পারি, সহজে ভালোবাসতে পারি। যেখানে আসল মানুষটি আছে সেখানে যদি অবাধে যেতে পারতুম, তা হলে বিদেশেও আপনার স্বজাতীয়কে দেখে এ স্থানকে আর প্রবাস বলে মনে হত না। কিন্তু এখানে এসে দেখি কেবল ইংরেজ, কেবল বিদেশী, তাদের চালচলন ধরনধারণ যা-কিছু নূতন সেইটেই কেবল ক্রমিক চক্ষে পড়ে, যা চিরকেলে পুরাতন সেটা ঢাকা পড়ে থাকে; সেইজন্যে এদের সঙ্গে কেবল পরিচয় হতে থাকে কিন্তু প্রণয় হয় না।

এইখানে কথামালার একটা গল্প মনে পড়ছে।

একটা চতুর শৃগাল একদিন এক সুবিজ্ঞ বককে আহারে নিমন্ত্রণ করেছিল। বক সভায় গিয়ে দেখে বড়ো বড়ো থালা সুমিষ্ট লেহ্য পদার্থে পরিপূর্ণ। প্রথম শিষ্টসম্ভাষণের পর শৃগাল বললে, 'ভাই, এসো আরম্ভ করে দেওয়া যাক।' বলেই তৎক্ষণাৎ অবলীলাক্রমে লেহন করতে প্রবৃত্ত হল। বক তার দীর্ঘ চঞ্চু নিয়ে থালার মধ্যে যতই ঠোকর মারে মুখে কিছুই তুলতে পারে না। অবশেষে চেষ্টায় নিবৃত্ত হয়ে স্বাভাবিক অটল গাম্ভীর্যে সরোবরকূলের ধ্যানে নিমগ্ন হল। শৃগাল বোধ করি মাঝে মাঝে কটাক্ষপাত করে বলছিল, 'ভাই, খাচ্ছ না যে। এ কেবল তোমাকে মিথ্যা কষ্ট দেওয়াই হল। তোমার যোগ্য আয়োজন হয় নি।' বক বোধ করি মাথা নেড়ে উত্তর দিয়েছিল, 'আহা সে কী কথা। রন্ধন অতি পরিপাটি হয়েছে। কিন্তু শরীরগতিকে আজ আমার ক্ষুধা বোধ হচ্ছে না।' পরদিন বকের নিমন্ত্রণে শৃগাল গিয়ে দেখেন, লম্বা ভাঁড়ের মধ্যে বিবিধ উপাদেয় সামগ্রী সাজানো রয়েছে। দেখে লোভ হয় কিন্তু তার মধ্যে শৃগালের মুখ প্রবেশ করে না। বক অনতিবিলম্বে লম্বচঞ্চু চালনা করে ভোজনে প্রবৃত্ত হল। শৃগাল বাহিরের থেকে পাত্রলেহন এবং দুটো-একটা উৎক্ষিপ্ত খাদ্যখণ্ডের স্বাদগ্রহণ করে নিতান্ত ক্ষুধাতুরভাবে বাড়ি ফিরে গেল।

জাতীয় ভোজে বিদেশীর অবস্থা সেইরকম। খাদ্যটা উভয়ের পক্ষে সমান উপাদেয় কিন্তু পাত্রটা তফাত। ইংরেজ যদি শৃগাল হয় তবে তার সুবিস্তৃত শুভ্র রজতথালের উপর উদ্ঘাটিত পায়সান্ন কেবল চক্ষে দর্শন করেই আমাদের ক্ষুধিতভাবে চলে আসতে হয়, আর আমরা যদি তপস্বী বক হই, তবে আমাদের সুগভীর পাথরের পাত্রটার মধ্যে কী আছে শৃগাল তা ভালো করে চক্ষেও দেখতে পায় না— দূর থেকে ঈষৎ ঘ্রাণ নিয়েই তাকে ফিরতে হয়।

প্রত্যেক জাতির অতীত ইতিহাস এবং বাহ্যিক আচারব্যবহারে তার নিজের পক্ষে সুবিধা, কিন্তু অন্য জাতির পক্ষে বাধা। এইজন্য ইংরেজসমাজ যদিও বাহ্যত সাধারণসমক্ষে উদ্ঘাটিত কিন্তু আমরা চক্ষুর অগ্রভাগটুকুতে তার দুই-চার ফোঁটার স্বাদ পাই মাত্র, ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারি নে। সর্বজাতীয় ভোজ কেবল সাহিত্যক্ষেত্রেই সম্ভব। সেখানে যার লম্বা চঞ্চু সেও বঞ্চিত হয় না, যার লোলজিহ্বা সেও পরিতৃপ্ত হয়।

কারণটা সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হোক বা না হোক এখানকার লোকের সঙ্গে হৌ-ডু-য়ু-ডু বলে, হাঁ করে রাস্তায় ঘাটে পর্যটন করে, থিয়েটার দেখে, দোকান ঘুরে, কলকারখানার তথ্য নির্ণয় করে— এমন-কি, সুন্দর মুখ দেখে আমার শ্রান্তি বোধ হয়েছে।

অতএব স্থির করেছি এখন বাড়ি ফিরব।

৭ অক্টোবর। 'টেম্‌স্‌' জাহাজে একটা ক্যাবিন স্থির করে আসা গেল। পরশু জাহাজ ছাড়বে।

৯ অক্টোবর। জাহাজে ওঠা গেল। এবারে আমি একা। আমার সঙ্গীরা বিলেতে রয়ে গেলেন। আমার নির্দিষ্ট ক্যাবিনে গিয়ে দেখি সেখানে এক কক্ষে চারজনের থাকবার স্থান; এবং আর-একজনের জিনিসপত্র একটি কোণে রাশীকৃত হয়ে আছে। বাক্স-তোরঙ্গের উপর নামের সংলগ্নে লেখা আছে 'বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস।' বলা বাহুল্য, এই লিখন দেখে ভাবী সঙ্গসুখের কল্পনায়

আমার মনে অপরিমেয় আনন্দের সঞ্চার হয় নি। ভাবলুম ভারতবর্ষের রোদে ঝলসা শুকনো খটখটে হাড়-পাকা অত্যন্ত ঝাঁজালো ঝুনো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের সঙ্গে আমাকে এক জাহাজে পুরেছে। গালে হাত দিয়ে বসে ভাবছি এমন সময়ে একজন অল্পবয়স্ক সুশ্রী ইংরেজ যুবক ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাকে সহাস্যমুখে শুভপ্রভাত অভিবাদন করলেন—মুহূর্তের মধ্যে আমার সমস্ত আশঙ্কা দূর হয়ে গেল। সবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইনি ভারতবর্ষে যাত্রা করছেন। এঁর শরীরে ইংলন্ডবাসী ইংরেজের স্বাভাবিক সহৃদয় ভদ্রতার ভাব এখনো সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

১০ অক্টোবর। সুন্দর প্রাতঃকাল। সমুদ্র স্থির। আকাশ পরিষ্কার। সূর্য উঠেছে। ভোরের বেলা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আমাদের ডান দিক থেকে অল্প অল্প তীরের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। অল্পে অল্পে কুয়াশার যবনিকা উঠে গিয়ে ওয়াইট দ্বীপের পার্বত্য তীর এবং ভেন্ট্নর শহর ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

এ জাহাজে বড়ো ভিড়। নিরিবিলি কোণে চৌকি টেনে যে একটু লিখব তার জো নেই, সুতরাং সম্মুখে যা-কিছু চোখে পড়ে তাই চেয়ে চেয়ে দেখি।

ইংরেজ মেয়ের চোখ নিয়ে আমাদের দেশের লোক প্রায়ই ঠাট্টা করে, বিড়ালের চোখের সঙ্গে তার তুলনা করে থাকে। কিন্তু এমন সর্বদাই দেখা যায়, তারাই যখন আবার বিলেতে আসে তখন স্বদেশের হরিণনয়নের কথাটা আর বড়ো মনে করে না। যতক্ষণ দূরে আছি কোনো বালাই নেই, কিন্তু লক্ষ্যপথে প্রবেশ করলেই ইংরেজ সুন্দরীর দৃষ্টি আমাদের অভ্যাসের আবরণ বিদ্ধ করে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে। ইংরেজ সুনয়নার চোখ মেঘমুক্ত নীলাকাশের মতো পরিষ্কার, হীরকের মতো উজ্জ্বল এবং ঘন পল্লবে আচ্ছন্ন, তাতে আবেশের ছায়া নেই। এমন ভারত সন্তান আমার জানা আছে যে নীলনেত্রের কাছেও অভিভূত এবং হরিণনয়নকেও কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারে না। কৃষ্ণ কেশপাশও সে মূঢ়ের পক্ষে বন্ধন এবং কনককুন্তলও সামান্য দৃঢ় নয়।

সংগীত সম্বন্ধেও দেখা যায়, পূর্বে যে ইংরেজি সংগীতকে পরিহাস করে আনন্দলাভ করা গেছে, এখন তার প্রতি মনোযোগ করে ততোধিক বেশি আনন্দলাভ করা যায়। এখন অভ্যাসক্রমে য়ুরোপীয় সংগীতের এতটুকু আস্বাদ পাওয়া গেছে যার থেকে নিদেন এইটুকু বোঝা গেছে যে যদি চর্চা করা যায় তা হলে য়ুরোপীয় সংগীতের মধ্যে থেকে পরিপূর্ণ রস পাওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশী-সংগীত যে আমার ভালো লাগে সে কথার বিশেষ উল্লেখ করা বাহুল্য। অথচ দুয়ের মধ্যে যে সম্পূর্ণ জাতিভেদ আছে তার আর সন্দেহ নেই।

১৩ অক্টোবর। একটি রমণী গল্প করছিলেন, তিনি পূর্বেকার কোন্ এক সমুদ্রযাত্রায় কাপ্তেন অথবা কোনো কোনো পুরুষযাত্রীর প্রতি কঠিন পরিহাস ও উৎপীড়ন করতেন—তার মধ্যে একটা হচ্ছে চৌকিতে পিন ফুটিয়ে রাখা। শুনে আমার তেমন মজাও মনে হল না এবং সেই-সকল বিশেষ অনুগৃহীত পুরুষদের স্থলাভিষিক্ত হতেও একান্ত বাসনার উদ্রেক হল না। দেখা যাচ্ছে, এখানে পুরুষদের প্রতি মেয়েরা অনেকটা দূর পর্যন্ত রূঢ়াচরণ করতে পারেন। যেমন বালকের কাছ থেকে উপদ্রব অনেক সময় আমোদজনক লীলার মতো মনে হয় স্ত্রীলোকদের অত্যাচারের প্রতিও পুরুষেরা সেইরকম স্নেহময় উপেক্ষা প্রদর্শন করে এবং অনেক সময় সেটা ভালোবাসে। পুরুষদের মুখের উপরে রূঢ় সমালোচনা শুনিয়ে দেওয়া স্ত্রীলোকদের একটা অধিকারের মধ্যে। সেই লঘুগতি তীব্রতার দ্বারা তাঁরা পুরুষের শ্রেষ্ঠতাভিমান বিদ্ধ করে গৌরব অনুভব করেন। সামাজিক প্রথা এবং অনিবার্যকারণবশত নানা বিষয়ে তাঁরা পুরুষের অধীন বলেই লৌকিকতা এবং শিষ্টাচার সম্বন্ধে অনেক সময়ে তাঁরা পুরুষদের লঙ্ঘন করে আনন্দ পান। কার্যক্ষেত্রে যেখানে প্রতিযোগিতা নেই সেখানে দুর্বল কিঞ্চিৎ দুরন্ত এবং সবল সম্পূর্ণ সহিষ্ণু এটা দেখতে মন্দ হয় না। বলাভিমানী পুরুষের পক্ষে এ একটা শিক্ষা। অবলার দুর্বলতা পুরুষের ইচ্ছাতেই বল প্রাপ্ত হয়েছে, এইজন্য যে-পুরুষের পৌরুষ আছে স্ত্রীলোকের উপদ্রব সে বিনা বিদ্রোহে আনন্দের সহিত সহ্য করে, এবং সহিষ্ণুতায় তার পৌরুষেরই চর্চা হতে থাকে। যে দেশের পুরুষেরা

কাপুরুষ তারাই নির্লজ্জভাবে পুরুষ-পূজাকে, পুরুষের প্রাণপণ সেবাকেই, স্ত্রীলোকের সর্বোচ্চ ধর্ম বলে প্রচার করে; সেই দেশেই দেখা যায় স্বামী রিক্তহস্তে আগে আগে যাচ্ছে আর স্ত্রী তার বোঝাটি বহন করে পিছনে চলেছে, স্বামীর দল ফার্স্টক্লাসে চড়ে যাত্রা করছে আর কতকগুলি জড়োসড়ো ঘোমটাচ্ছন্ন স্ত্রীগণকে নিম্নশ্রেণীতে পুরে দেওয়া হয়েছে, সেই দেশেই দেখা যায় আহারে বিহারে ব্যবহারে সকল বিষয়েই সুখ এবং আরাম কেবল পুরুষের, উচ্ছিষ্ট ও উদ্‌বৃত্ত কেবল স্ত্রীলোকের, তাই নিয়ে বেহায়া কাপুরুষেরা অসংকোচে গৌরব করে থাকে এবং তার তিলমাত্র ব্যত্যয় হলে সেটাকে তারা খুব একটা প্রহসনের বিষয় বলে জ্ঞান করে। স্বভাবদুর্বল সুকুমার স্ত্রীলোকদের সর্বপ্রকার আরামসাধন এবং কষ্টলাঘবের প্রতি সযত্ন মনোযোগ যে কঠিনকায় বলিষ্ঠ পুরুষদের একটি স্বভাবসিদ্ধ গুণ হওয়া উচিত এ তারা কল্পনা করতে পারে না— তারা কেবল এইটুকুমাত্র জানে শাসনভীতা স্নেহশালিনী রমণী তাদের চরণে তৈল লেপন করবে, তাদের বদনে অন্ন জুগিয়ে দেবে, তাদের তপ্ত কলেবরে পাখার ব্যজন করবে, তাদের আলস্যচর্চার আয়োজন করে দেবে, পঙ্কিল পথে পায়ে জুতা দেবে না, শীতের সময় গায়ে কাপড় দেবে না, রৌদ্রের সময় মাথায় ছাতা দেবে না, ক্ষুধার সময় কম করে খাবে, আমোদের সময় যবনিকার আড়ালে থাকবে এবং এই বৃহৎ মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে যে আলোক আনন্দ সৌন্দর্য স্বাস্থ্য আছে তার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকবে। স্বার্থপরতা পৃথিবীর সর্বত্রই আছে কিন্তু নির্লজ্জ নিঃসংকোচ স্বার্থপরতা কেবল সেই দেশেই আছে যে দেশে পুরুষেরা ষোলো-আনা পুরুষ নয়।

মেয়েরা আপনার স্নেহপরায়ণ সহৃদয়তা থেকে পুরুষের সেবা করে থাকে এবং পুরুষেরা আপনার উদার দুর্বলবৎসলতা থেকে স্ত্রীলোকের সেবা করে থাকে; যে দেশে স্ত্রীলোকেরা সেই সেবা পায় না, কেবল সেবা করে, সে দেশে তারা অপমানিত এবং সে দেশও লক্ষ্মীছাড়া।

কিন্তু কথাটা হচ্ছিল স্ত্রীলোকের দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে। গোলাপের যে-কারণে কাঁটা থাকা আবশ্যক, যেখানে স্ত্রীপুরুষে বিচ্ছেদ নেই সেখানে স্ত্রীলোকেরও সেই কারণে প্রখরতা থাকা চাই, তীক্ষ্ণ কথায় মর্মচ্ছেদ করবার অভ্যাস অবলার পক্ষে অনেক সময়েই কাজে লাগে।

আমাদের গোলাপগুলিই কি একেবারে নিষ্কণ্টক? কিন্তু সে বিষয়ে সমধিক সমালোচনা করতে বিরত থাকা গেল।

১৪ অক্টোবর। জিব্রাল্টার পৌঁছনো গেল। মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছে।

আজ ডিনার-টেবিলে একটা মোটা আঙুল এবং ফুলো গোঁফ-ওআলা প্রকাণ্ড জোয়ান গোরা তার সুন্দরী পার্শ্ববর্তিনীর সঙ্গে ভারতবর্ষীয় পাখাওআলার গল্প করছিল। সুন্দরী কিঞ্চিৎ নালিশের নাকিস্বরে বললেন— পাখাওআলারা রাত্রে পাখা টানতে টানতে ঘুমোয়। জোয়ান লোকটা বললে, তার একমাত্র প্রতিবিধান লাথি কিংবা লাঠি। পাখা-আন্দোলন সম্বন্ধে এইভাবে আন্দোলন চলতে লাগল। আমার বুকে হঠাৎ যেন একটা তপ্ত শূল বিঁধল। এইভাবে যারা স্ত্রীপুরুষে কথোপকথন করে তারা যে অকাতরে একসময় একটা দিশি দুর্বল মানব-বিড়ম্বনাকে ভবপারে লাথিয়ে ফেলে দেবে তার আর বিচিত্র কী? আমিও তো সেই অপমানিত জাতের লোক, আমি কোন্‌ লজ্জায় কোন্‌ সুখে এদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাই এবং একত্রে দন্তোন্মীলন করি। শরীরের সমস্ত রাগ কণ্ঠ পর্যন্ত এল কিন্তু একটা কথাও বহু চেষ্টাতে সে জায়গায় এসে পৌঁছল না। বিশেষত ওদের ঐ ইংরেজি ভাষাটা বড়োই বিজাতীয়— মনটা একটু বিচলিত হয়ে গেলেই ও-ভাষাটা মনের মতো কায়দা করে উঠতে পারি নে। তখন মাথার চতুর্দিক হতে রাজ্যের বাংলা কথা চাক-নাড়া মৌমাছির মতো মুখদ্বারে ভিড় করে ছুটে আসে। ভাবলুম এত উতলা হয়ে উঠলে চলবে না, একটু ঠাণ্ডা হয়ে দুটো-চারটে ব্যাকরণশুদ্ধ ইংরেজি কথা মাথার মধ্যে গুছিয়ে নিই। ঝগড়া করতে গেলে নিদেন ভাষাটা ভালো হওয়া চাই।

তখন মনে মনে নিম্নলিখিতমতো ভাবটা ইংরেজিতে রচনা করতে লাগলুম :

কথাটা ঠিক বটে মশায়, পাখাওআলা মাঝে মাঝে রাত্রে ঢুললে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। দেহধারণ

করলেই এমন কতকগুলো সহ্য করতে হয় এবং সেইজন্যই খৃস্টীয় সহিষ্ণুতার প্রয়োজন ঘটে। এবং এইরূপ সময়েই ভদ্রাভদ্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

যে লোক তোমার আঘাতের প্রতিশোধ নিতে একেবারেই অক্ষম, খপ করে তার উপরে লাথি তোলা চূড়ান্ত কাপুরুষতা; অভদ্রতার চেয়ে বেশি।

আমরা জাতটা যে তোমাদের চেয়ে দুর্বল সেটা একটা প্রাকৃতিক সত্য—সে আমাদের অস্বীকার করবার জো নেই। তোমাদের গায়ের জোর বড্ড বেশি—তোমরা ভারি পালোয়ান।

কিন্তু সেইটেই কি এত গর্বের বিষয় যে, মনুষ্যত্বকে তার নীচে আসন দেওয়া হবে?

তোমরা বলবে—কেন, আমাদের আর কি কোনো শ্রেষ্ঠতা নেই?

থাকতেও পারে। তবে, যখন একজন অস্থিজর্জর অর্ধ-উপবাসী দরিদ্রের রিক্ত উদরের উপর লাথি বসিয়ে দাও এবং তৎসম্বন্ধে রমণীদের সঙ্গে কৌতুকালাপ কর এবং সুকুমারীগণও তাতে বিশেষ বেদনা অনুভব করেন না, তখন কিছুতেই তোমাদের শ্রেষ্ঠ বলে ঠাহর করা যায় না।

বেচারার অপরাধ কী দেখা যাক। ভোরের বেলা অর্ধাশনে বেরিয়েছে, সমস্ত দিন খেটেছে। হতভাগ্য আর-দুটো পয়সা বেশি উপার্জন করবার আশায় রাত্রের বিশ্রামটা তোমাকে দু-চার আনায় বিক্রি করেছে। নিতান্ত গরিব বলেই তার এই ব্যবসায়, বড়োসাহেবকে ঠকাবার জন্যে সে ষড়্‌যন্ত্র করে নি।

এই ব্যক্তি রাত্রে পাখা টানতে টানতে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে—এ দোষটা তার আছে বলতেই হবে।

কিন্তু আমার বোধ হয় এটা মানবজাতির একটা আদিম পাপের ফল। যন্ত্রের মতো বসে বসে পাখা টানতে গেলেই আদমের সন্তানের চোখে ঘুম আসবেই। সাহেব নিজে একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

এক ভৃত্যের দ্বারা কাজ না পেলে দ্বিতীয় ভৃত্য রাখা যেতে পারে, কিন্তু যে কাপুরুষ তাকে লাথি মারে সে নিজেকে অপমান করে, কারণ তখনই তার একটি প্রতিলাথি প্রাপ্য হয়—সেটা প্রয়োগ করবার লোক কেউ হাতের কাছে উপস্থিত নেই, এইটুকুমাত্র প্রভেদ।

তোমরা অবসর পেলেই আমাদের বলে থাক যে, তোমাদের মধ্যে যখন বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথা প্রচলিত তখন তোমরা রাজ্যতন্ত্রের মধ্যে কোনো স্বাধীন অধিকার প্রাপ্তির যোগ্য নও।

কিন্তু তার চেয়ে এ কথা সত্য যে, যে-জাত নিরাপদ দেখে দুর্বলের কাছে 'তেরিয়া'—অর্থাৎ তোমরা যাকে বল 'বুলি'—যার কোনো বাংলা প্রতিশব্দ নেই—অপ্রিয় অশিষ্ট ব্যবহার যাদের স্বভাবত আসে, কেবল স্বার্থের স্থলে যারা নম্রভাব ধারণ করে, তারা কোনো বিদেশী রাজ্যশাসনের যোগ্য নয়।

অবশ্য যোগ্যতা দু-রকমের আছে—ধর্মত এবং কার্যত। এমন কতকগুলি স্থল আছে যেখানে শুদ্ধমাত্র কৃতকারিতাই যোগ্যতার প্রমাণ নয়। গায়ের জোর থাকলে অনেক কাজই বলপূর্বক চালিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু বিশেষ বিশেষ কাজে বিশেষ বিশেষ উপযোগী নৈতিক গুণের দ্বারাই সে কার্যবহনের প্রকৃত অধিকার পাওয়া যায়।

কিন্তু ধর্মের শাসন সদ্য সদ্য দেখা যায় না বলে যে, ধর্মের রাজ্য অরাজক তা বলা যায় না। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিষ্ঠুরতা এবং প্রতিদিনের ঔদ্ধত্য প্রতিদিন সঞ্চিত হচ্ছে, একসময় এরা তোমাদেরই মাথায় ভেঙে পড়বে।

যদি বা আমরা সকল অপমানই নীরবে অথবা কথঞ্চিৎ-কলরব-সহকারে সহ্য করে যাই, প্রতিকারের কোনো ক্ষমতাই যদি আমাদের না থাকে, তবু তোমাদের মঙ্গল হবে না।

কারণ, অপ্রতিহত ক্ষমতার দম্ভ জাতীয় চরিত্রের মূল আক্রমণ করে। যে স্বাধীনতাপ্রিয়তার ভিত্তির উপর তোমাদের জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত, তলে তলে সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তার বিশুদ্ধতা

নষ্ট করে। সেইজন্য ইংলন্ডবাসী ইংরেজের কাছে শোনা যায় ভারতবর্ষীয় ইংরেজ একটা জাতই স্বতন্ত্র। কেবলমাত্র বিকৃত যকৃৎই তার একমাত্র কারণ নয়, যকৃতের চেয়ে মানুষের আরও উচ্চতর অন্তরিন্দ্রিয় আছে, সেটাও নষ্ট হয়ে যায়।

কিন্তু আমার এই বিভীষিকায় কেউ ডরাবে না। যার দ্বারে অর্গল নেই সেই অগত্যা চোরকে সাধুভাবে ধর্মোপদেশ দিতে বসে; যেন চোরের পরকালের হিতের জন্যই তার রাত্রে ঘুম হয় না।

লাথির পরিবর্তে উপদেশ দেওয়া এবং ধর্মভয় দেখানো যদিচ দেখতে অতি মনোহর বটে কিন্তু লাথির পরিবর্তে লাথি দিলেই ফলটা অতি শীঘ্র পাওয়া যায়। এই পুরাতন সত্যটি আমাদের জানা আছে, কিন্তু বিধাতা আমাদের সমস্ত শরীরমনের মধ্যে কেবল রসনার অগ্রভাগটুকুতে বল-সঞ্চার করেছেন। সুতরাং হে জোয়ান, কিঞ্চিৎ নীতিকথা শোনো।

শোনা যায় ভারতবর্ষীয়ের পিলে যন্ত্রটাই কিছু খারাপ হয়ে আছে, এইজন্য তারা পেটের উপরে ইংরেজ প্রভুর নিতান্ত 'পেটার্নাল ট্রিটমেন্ট'-টুকুরও ভর সইতে পারে না। কিন্তু ইংরেজের পিলে কী রকম অবস্থায় আছে এ-পর্যন্ত কার্যত তার কোনো পরীক্ষাই হয় নি।

কিন্তু সে নিয়ে কথা হচ্ছে না; পিলে ফেটে যে আমাদের অপঘাতমৃত্যু হয় সেটা আমাদের ললাটের লিখন। কিন্তু তার পরেই সমস্ত ব্যাপারটা তোমরা যেরকম তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাও, তাতেই আমাদের সমস্ত জাতিকে অপমান করা হয়। তাতেই একরকম করে বলা হয় যে, আমাদের তোমরা মানুষ জ্ঞান কর না। আমাদের দুটো-চারটে মানুষ যে খামকা তোমাদের চরণতলে বিলুপ্ত হয়ে যায় সে আমাদের পিলের দোষ। 'পিলে যদি ঠিক থাকত তা হলে লাথিও খেতে, বেঁচেও থাকতে এবং পুনশ্চ দ্বিতীয়বার খাবার অবসর পেতে।'

যা হোক, ভদ্রনাম ধারণ করে অসহায়কে অপমান করতে যার সংকোচ বোধ হয় না, তাকে এত কথা বলাই বাহুল্য; বিশেষত যে ব্যক্তি অপমান সহ্য করে দুর্বল হলেও তাকে যখন অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা না করে থাকা যায় না।

কিন্তু একটা কথা আমি ভালো বুঝতে পারি নে। ইংলন্ডে তো আমাদের এত বিশ্বহিতৈষিণী মেয়ে আছেন, তাঁরা সভাসমিতি করে নিতান্ত অসম্পর্কীয় কিংবা দূরসম্পর্কীয় মানবজাতির প্রতিও দূর থেকে দয়া প্রকাশ করেন। এই হতভাগ্য দেশে সেই ইংরেজের ঘর থেকে কি যথেষ্ট পরিমাণে মেয়ে আসেন না যাঁরা উক্ত বাহুল্য করুণরসের কিয়দংশ উপস্থিত ক্ষেত্রে ব্যয় করে মনোভার কিঞ্চিৎ লাঘব করে যেতে পারেন। বরঞ্চ পুরুষমানুষে দয়ার দৃষ্টান্ত দেখেছি। কিন্তু তোমাদের মেয়েরা এখানে কেবল নাচগান করেন, সুযোগমতে বিবাহ করেন এবং কথোপকথনকালে সুচারু নাসিকার সুকুমার অগ্রভাগটুকু কুঞ্চিত করে আমাদের স্বজাতীয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। জানি না, কী অভিপ্রায়ে বিধাতা আমাদের ভারতবাসীকে তোমাদের ললনাদের স্নায়ুতন্ত্রের ঠিক উপযোগী করে সৃজন করেন নি।

যাই হোক, স্বগত উক্তি যত ভালোই হোক স্টেজ ছাড়া আর কোথাও শ্রোতাদের কর্ণগোচর হয় না। তা ছাড়া যে কথাগুলো আক্ষেপবশত মনের মধ্যে উদয় হয়েছিল সেগুলো যে এই গোঁফ-ওআলা পালোয়ানের বিশেষ কিছু হৃদয়ংগম হত এমন আমার বোধ হয় না। এদিকে, বুদ্ধি যখন বেড়ে উঠল চোর তখন পালিয়েছে— তারা পূর্বপ্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য কথায় গিয়ে পড়েছে। মনের খেদে কেবল নিজেকেই ধিক্‌কার দিতে লাগলুম।

১৫ অক্টোবর। জাহাজে আমার একটি ইংরেজ বন্ধু জুটেছে। লোকটাকে লাগছে ভালো। অল্প বয়স, মন খুলে কথা কয়, কারও সঙ্গে বড়ো মেশে না, আমার সঙ্গে খুব চট করে বনে গেছে। আমার বিবেচনায় শেষটাই সব চেয়ে মহৎ গুণ।

এ জাহাজে তিনটি অস্ট্রেলিয়ান কুমারী আছেন— তাঁদের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছে। বেশ সহজ সরল রকমের লোক, কোনোপ্রকার অতিরিক্ত ঝাঁজ নেই। আমার নববন্ধু এঁদের প্রশংসা-স্বরূপে বলে, 'They are not at all smart.' বাস্তবিক, অনেক অল্পবয়সী ইংরেজ মেয়ে

দেখা যায় তারা বড়োই smart—বড্ড চোখমুখের খেলা, বড্ড নাকে মুখে কথা, বড্ড খরতর হাসি, বড্ড চোখাচোখা জবাব—কারও কারও লাগে ভালো, কিন্তু শান্তিপ্রিয় সামান্য লোকের পক্ষে নিতান্ত শ্রান্তিজনক।

১৬ অক্টোবর। আজ জাহাজে দুটি ছোটো ছোটো নাট্যাভিনয় হয়ে গেল। দলের মধ্যে একটি অভিনেত্রীকে যেমন সুন্দর দেখতে তিনি তেমনি সুন্দর অভিনয় করেছিলেন।

আজ অনেক রাত্রে নিরালায় একলা দাঁড়িয়ে জাহাজের কাটরা ধরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে গুন্‌গুন্ করে একটা দিশি রাগিণী ধরেছিলুম। তখন দেখতে পেলুম অনেকদিন ইংরেজি গান গেয়ে গেয়ে মনের ভিতরটা যেন অতৃপ্ত হয়ে ছিল। হঠাৎ এই বাংলা সুরটা পিপাসার জলের মতো বোধ হল। আমি দেখলুম সেই সুরটি সমুদ্রের উপর অন্ধকারের মধ্যে যেরকম প্রসারিত হল, এমন আর কোনো সুর কোথাও পাওয়া যায় বলে আমার মনে হয় না। আমার কাছে ইংরেজি গানের সঙ্গে আমাদের গানের এই প্রধান প্রভেদ ঠেকে যে, ইংরেজি সংগীত মানবজগতের সংগীত, আর আমাদের সংগীত প্রকাণ্ড নির্জন প্রকৃতির অনির্দিষ্ট অনির্বচনীয় বিষাদগভীর সংগীত। কানাড়া টোড়ি প্রভৃতি বড়ো বড়ো রাগিণীর মধ্যে যে গাম্ভীর্য এবং কাতরতা আছে সে যেন কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয়—সে যেন অকূল অসীমের প্রান্তবর্তী এই সঙ্গীহীন বিশ্বজগতের।

১৭ অক্টোবর। বিকালের দিকে জাহাজ মাল্টা দ্বীপে পেঁছল। কঠিন দুর্গপ্রাকারে বেষ্টিত অট্টালিকাখচিত তরুগুল্মহীন শহর। এই শ্যামল পৃথিবীর একটা অংশ যেন ব্যাধি হয়ে কঠিন হয়ে গেছে। দূর থেকে দেখে নাবতে ইচ্ছে করে না। অবশেষে আমার নববন্ধুর অনুরোধে তাঁর সঙ্গে একত্রে নেবে পড়া গেল। সমুদ্রতীর থেকে সুড়ঙ্গপথের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ঘাটের মতো উঠেছে, তারই সোপান বেয়ে শহরের মধ্যে উঠলুম। অনেকগুলি গাইড পাণ্ডা আমাদের ছেঁকে ধরলে। আমার বন্ধু বহুকষ্টে তাদের তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু একজন কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়লে না। বন্ধু তাকে বার বার ঝেঁকে ঝেঁকে বললেন, 'চাই নে তোমাকে, একটি পয়সাও দেব না।' তবু সে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে লেগে ছিল। তার পরে যখন তাকে নিতান্তই তাড়িয়ে দিলে তখন সে ম্লানমুখে চলে গেল। আমার তাকে কিছু দেবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বন্ধু বললেন, লোকটা গরিব সন্দেহ নেই কিন্তু কোনো ইংরেজ হলে এমন করত না। আসলে মানুষ পরিচিত দোষ গুরুতর হলেও মার্জনা করতে পারে কিন্তু সামান্য অপরিচিত দোষ সহ্য করতে পারে না।

মাল্টা শহরটা দেখে মনে হয় একটা অপরিণত বিকৃত য়ুরোপীয় শহর। পাথরে বাঁধানো সরু রাস্তা একবার উপরে উঠছে একবার নীচে নামছে। সমস্তই দুর্গন্ধ ঘেঁষাঘেঁষি অপরিষ্কার। রাত্রে হোটেলে গিয়ে খেলুম। অনেক দাম দেওয়া গেল, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য কদর্য। আহারান্তে, শহরের মধ্যে একটি বাঁধানো চক আছে, সেইখানে ব্যান্ড বাদ্য শুনে রাত দশটার সময় জাহাজে ফিরে আসা গেল। ফেরবার সময় নৌকোওআলা আমাদের কাছ থেকে ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে কিছু বেশি আদায়ের চেষ্টায় ছিল। আমার বন্ধু এদের অসৎ ব্যবহারে বিষম রাগান্বিত। তাতে আমার মনে পড়ল এবারে লন্ডনে প্রথম যেদিন আমরা দুই ভাই গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলুম গাড়োয়ান পাঁচ শিলিং ভাড়ার জায়গায় আমাদের কাছে বারো শিলিং ঠকিয়ে নিয়েছিল। সে লোকটার তত দোষ ছিল না, দোষ আমাদেরই। আমাদের দুই ভাইয়ের মুখে বোধ করি এমন কিছু ছিল যা দেখলে সৎলোকেরও ঠকিয়ে নিতে হঠাৎ প্রলোভন হতে পারে। যা হোক, মাল্টাবাসীর অসাধু স্বভাবের প্রতি আমার বন্ধুর অতিমাত্র ক্রোধ দেখে এ ঘটনাটা উল্লেখ করা আমার কর্তব্য মনে করলুম।

১৮ অক্টোবর। আজ ডিনার-টেবিলে 'স্মাগলিং' সম্বন্ধে কেউ কেউ নিজ নিজ কীর্তি রটনা করছিলেন। গবর্মেন্টকে মাশুল ফাঁকি দেবার জন্যে মিথ্যা প্রতারণা করাকে এরা তেমন নিন্দা বা

লজ্জার বিষয় মনে করে না। অথচ মিথ্যা এবং প্রতারণাকে যে এরা দূষণীয় জ্ঞান করে না সে কথা বলাও অন্যায়। মানুষ এমনি জীব! একজন ব্যারিস্টার তার মক্কেলের কাছ থেকে পুরা ফি নিয়ে যদি কাজ না করে এবং সেজন্যে যদি সে হতভাগ্যের সর্বনাশ হয়ে যায় তা হলেও কিছু লজ্জা বোধ করে না, কিন্তু ঐ মক্কেল যদি তার দেয় ফি-র দুটি পয়সা কম দেয় তা হলে কৌঁসুলির মনে যে ঘৃণামিশ্রিত আক্রোশের উদয় হয় তাকে তাঁরা ইংরেজি করে বলেন 'ইন্ডিগ্নেশন'!

১৯ অক্টোবর। আজ সকালে জাহাজ যখন ব্রিন্দিসি পৌঁছল তখন ঘোর বৃষ্টি। এই বৃষ্টিতে এক দল গাইয়ে বাজিয়ে হার্প্‌ বেয়ালা ম্যান্ডোলিন নিয়ে ছাতা মাথায় জাহাজের সম্মুখে বন্দরের পথে দাঁড়িয়ে গানবাজনা জুড়ে দিলে।

বৃষ্টি থেমে গেলে বন্ধুর সঙ্গে ব্রিন্দিসিতে বেরোনো গেল। শহর ছাড়িয়ে একটা খোলা জায়গায় গিয়ে পৌঁছলুম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পাহাড়ে রাস্তা শুকিয়ে গেছে, কেবল দুই ধারের নালায় মাঝে মাঝে জল দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার ধারে গাছে চড়ে দুটো খালি-পা ইটালিয়ান ছোকরা ফিগ পেড়ে খাচ্ছিল; আমাদের ডেকে ইশারায় জিজ্ঞাসা করলে, তোমরা খাবে কি? আমরা বললুম, না। খানিক বাদে দেখি তারা ফলবিশিষ্ট একটা ছিন্ন অলিভ শাখা নিয়ে এসে উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করলে, অলিভ খাবে? আমরা অসম্মত হলুম। তার পরে ইশারায় তামাক প্রার্থনা করে বন্ধুর কাছ থেকে কিঞ্চিৎ তামাক আদায় করলে। তামাক খেতে খেতে দুজনে বরাবর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল। আমরা পরস্পরের ভাষা জানি নে— আমাদের উভয় পক্ষে প্রবল অঙ্গভঙ্গিদ্বারা ভাবপ্রকাশ চলতে লাগল। জনশূন্য রাস্তা ক্রমশ উঁচু হয়ে শস্যক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে বরাবর চলে গিয়েছে। কেবল মাঝে মাঝে এক-একটা ছোটো বাড়ি, সেখানে জানলার কাছে ফিগ ফল শুকোতে দিয়েছে। এক-এক জায়গায় ছোটো ছোটো শাখাপথ বক্রধারায় এক পাশ দিয়ে নেমে নীচে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ফেরবার মুখে একটা গোরস্থানে ঢোকা গেল। এখানকার গোর নূতন রকমের। অধিকাংশ গোরের উপরে এক-একটি ছোটো ঘর গেঁথেছে। সেই ঘর পর্দা দিয়ে, ছবি দিয়ে, রঙিন জিনিস দিয়ে, নানারকমে সাজানো, যেন মৃত্যুর একটা খেলাঘর— এর মধ্যে কেমন একটি ছেলেমানুষি আছে, মৃত্যুটাকে যেন যথেষ্ট খাতির করা হচ্ছে না।

গোরস্থানের এক জায়গায় সিঁড়ি দিয়ে একটা মাটির নীচেকার ঘরে নাবা গেল। সেখানে সহস্র সহস্র মড়ার মাথা অতি সুশৃঙ্খলভাবে স্তূপাকারে সাজানো। আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই নিশিদিন যে একটা কঙ্কাল চলে বেড়াচ্ছে ঐ মুণ্ডগুলো দেখে তার আকৃতিটা মনে উদয় হল। জীবন এবং সৌন্দর্য এই অসীম জীবলোকের উপর একটা চিত্রিত পর্দা ফেলে রেখেছে— কোনো নিষ্ঠুর দেবতা যদি হঠাৎ একদিন সেই লাবণ্যময় চর্মযবনিকা সমস্ত নরসংসার থেকে উঠিয়ে ফেলে, তা হলে অকস্মাৎ দেখতে পাওয়া যায় আরক্ত অধরপল্লবের অন্তরালে গোপনে বসে বসে শুষ্ক শ্বেত দন্তপঙ্‌ক্তি সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছে। পুরোনো বিষয়! পুরোনো কথা! ঐ নরকপাল অবলম্বন করে নীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা অনেক বিভীষিকা প্রচার করেছেন, কিন্তু অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখে আমার কিছুই ভয় হল না। শুধু এই মনে হল, সীতাকুণ্ডের বিদীর্ণ জলবিম্ব থেকে যেমন খানিকটা তপ্ত বাষ্প বেরিয়ে যায়, তেমনি পৃথিবীর কত যুগের কত দুশ্চিন্তা দুরাশা অনিদ্রা ও শিরঃপীড়া ঐ মাথার খুলিগুলোর, ঐ গোলাকার অস্থি-বুদ্‌বুদ্‌গুলোর মধ্যে থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। এবং সেইসঙ্গে এও মনে হল, পৃথিবীতে অনেক ডাক্তার অনেক টাকের ওষুধ আবিষ্কার করে চীৎকার করে মরছে, কিন্তু ঐ লক্ষ লক্ষ কেশহীন মস্তক তৎপ্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, এবং দন্তমার্জনওআলারা যতই প্রচুর বিজ্ঞাপন প্রচার করছে এই অসংখ্য দন্তশ্রেণী তার কোনো খোঁজ নিচ্ছে না।

যাই হোক, আপাতত আমার নিজের কপালফলকটার ভিতরে বাড়ির চিঠির প্রত্যাশা সঞ্চরণ করছে। যদি পাওয়া যায় তা হলে এই খুলিটার মধ্যে খানিকটা খুশির উদয় হবে, আর যদি না পাই

তা হলে এই অস্থিকোটরের মধ্যে দুঃখ-নামক একটা ব্যাপারের উদ্ভব হবে, ঠিক মনে হবে আমি কষ্ট পাচ্ছি।

২৩ অক্টোবর। সুয়েজ খালের মধ্যে দিয়ে চলেছি। জাহাজের গতি অতি মন্থর।

উজ্জ্বল উত্তপ্ত দিন। একরকম মধুর আলস্যে পূর্ণ আছি। য়ুরোপের ভাব সম্পূর্ণ কাটল। আমাদের সেই রৌদ্রতপ্ত শ্রান্ত দরিদ্র ভারতবর্ষ, আমাদের সেই ধরাপ্রান্তবর্তী পৃথিবীর অপরিচিত নিভৃত নদীকলধ্বনিত ছায়াসুপ্ত বাংলা দেশ, আমার সেই অকর্মণ্য গৃহপ্রিয় বাল্যকাল, কল্পনাবিষ্ট যৌবন, নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম চিন্তাপ্রিয় জীবনের স্মৃতি এই সূর্যকিরণে, এই তপ্ত বায়ুহিল্লোলে সুদূর মরীচিকার মতো আমার দৃষ্টির সম্মুখে জেগে উঠেছে।

ডেকের উপরে গল্পের বই পড়ছিলুম। মাঝে একবার উঠে দেখলুম দুধারে ধূসরবর্ণ বালুকাতীর—জলের ধারে ধারে একটু একটু বনঝাউ এবং অর্ধশুষ্ক তৃণ উঠেছে। আমাদের ডান দিকের বালুকারাশির মধ্যে দিয়ে একদল আরব শ্রেণীবন্ধ উট বোঝাই করে নিয়ে চলেছে। প্রখর সূর্যালোক এবং ধূসর মরুভূমির মধ্যে তাদের নীল কাপড় এবং সাদা পাগড়ি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেউ বা এক জায়গায় বালুকাগহ্বরের ছায়ায় পা ছড়িয়ে অলসভাবে শুয়ে আছে, কেউ বা নমাজ পড়ছে, কেউ বা নাসারজ্জু ধরে অনিচ্ছুক উটকে টানাটানি করছে। সমস্তটা মিলে খররৌদ্র আরব মরুভূমির এক খণ্ড ছবির মতো মনে হল।

২৪ অক্টোবর। আমাদের জাহাজের মিসেস —কে দেখে একটা নাট্যশালার ভগ্নাবশেষ বলে মনে হয়। সেখানে অভিনয়ও বন্ধ, বাসের পক্ষেও সুবিধা নয়। রমণীটি খুব তীক্ষ্ণধার—যৌবনকালে নিঃসন্দেহ সেই তীক্ষ্ণতা ছিল উজ্জ্বল। যদিও এখনো এর নাকে মুখে কথা, এবং অচিরজাত বিড়ালশাবকের মতো ক্রীড়াচাতুর্য, তবু কোনো যুবক এর সঙ্গে দুটো কথা বলবার ছুতো অন্বেষণ করে না, নাচের সময় আহ্বান করে না, আহারের সময় সযত্নে পরিবেশন করে না। তার চঞ্চলতার মধ্যে শ্রী নেই, প্রৌঢ়তার সঙ্গে রমণীর মুখে যে একটি স্নেহময় সুপ্রসন্ন সুগম্ভীর মাতৃভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তাও তার কিছুমাত্র দেখি নে।

২৫ অক্টোবর। আজ সকালবেলা স্নানের ঘর বন্ধ দেখে দরজার সামনে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছি। কিছুক্ষণ বাদে বিরলকেশ পৃথুকলেবর দ্বিতীয় ব্যক্তি তোয়ালে এবং স্পঞ্জ হস্তে উপস্থিত। ঘর খালাস হবামাত্র সেই জন-বুল অম্লানবদনে প্রথমাগত আমাকে অতিক্রম করে ঘরে প্রবেশ করলে। প্রথমেই মনে হল তাকে ঠেলেঠুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ি, কিন্তু শারীরিক দ্বন্দ্বটা অত্যন্ত হীন এবং রূঢ় বলে মনে হয়, বেশ স্বাভাবিকরূপে আসে না। সুতরাং অধিকার ছেড়ে দিয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলুম, নম্রতা গুণটা খুব ভালো হতে পারে কিন্তু খৃস্টজন্মের ঊনবিংশ শতাব্দী পরেও এই পৃথিবীর পক্ষে অনুপযোগী এবং দেখতে অনেকটা ভীরুতার মতো। এ ক্ষেত্রে নাবার ঘরে প্রবেশ করতে যতটা জেদের ততটা সংগ্রামের দরকার ছিল না। কিন্তু প্রাতঃকালেই একটা মাংসবহুল কপিশবর্ণ পিঙ্গলচক্ষু রূঢ় ব্যক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ-সম্ভাবনাটা কেমন সংকোচজনক মনে হল। স্বার্থোদ্যম জয়লাভ করে, বলিষ্ঠ ব'লে নয়, অতিমাংসগ্রস্ত কুৎসিত ব'লে।

২৬ অক্টোবর। জাহাজের একটা দিন বর্ণনা করা যাক।

সকালে ডেক ধুয়ে গেছে, এখনো ভিজে রয়েছে। দুই ধারে ডেকচেয়ার বিশৃঙ্খলভাবে পরস্পরের উপর রাশীকৃত। খালিপায়ে রাত-কাপড়-পরা পুরুষগণ কেউ বা বন্ধু-সঙ্গে কেউ বা একলা মধ্যপথ দিয়ে হুহু করে বেড়াচ্ছে। ক্রমে যখন আটটা বাজল এবং একটি-আধটি করে মেয়ে উপরে উঠতে লাগল তখন একে একে এই বিরলবেশ পুরুষদের অন্তর্ধান।

স্নানের ঘরের সম্মুখে বিষম ভিড়। তিনটি মাত্র স্নানাগার। আমরা অনেকগুলি দ্বারস্থ। তোয়ালে এবং স্পঞ্জ হাতে দ্বারমোচনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। দশ মিনিটের অধিক স্নানের ঘর অধিকার করবার নিয়ম নেই।

স্নান এবং বেশভূষা সমাপনের পর উপরে গিয়ে দেখা যায় ডেকের উপর পদচারণশীল প্রভাত-

বায়ুসেবী অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষের সমাগম হয়েছে। ঘন ঘন টুপি উদ্ঘাটন করে মহিলাদের এবং শিরঃকম্পে পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শুভপ্রভাত অভিবাদন করে গ্রীষ্মের তারতম্য সম্বন্ধে পরস্পরের মত ব্যক্ত করা গেল।

ন-টার ঘণ্টা বাজল। ব্রেক্‌ফাস্ট প্রস্তুত; বুভুক্ষু নরনারীগণ সোপান-পথ দিয়ে নিম্নকক্ষে ভোজনবিবরে প্রবেশ করলে। ডেকের উপরে আর জনপ্রাণী অবশিষ্ট নেই, কেবল সারি সারি শূন্য চৌকি ঊর্ধ্বমুখে প্রভুদের জন্য প্রতীক্ষমাণ।

ভোজনশালা প্রকাণ্ড ঘর। মাঝে দুই সার লম্বা টেবিল; এবং তার দুই পার্শ্বে খণ্ড খণ্ড ছোটো ছোটো টেবিল। আমরা দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র টেবিল অধিকার করে সাতটি প্রাণী দিনের মধ্যে তিনবার ক্ষুধা নিবৃত্ত করে থাকি। মাংস রুটি ফলমূল মিষ্টান্ন মদিরায় এবং হাস্যকৌতুক গল্পগুজবে এই অনতিউচ্চ সুপ্রশস্ত ঘর কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আহারের পর উপরে গিয়ে যে যার নিজ নিজ চৌকি অন্বেষণ এবং সেটা যথাস্থানে স্থাপনে ব্যস্ত। চৌকি খুঁজে পাওয়া দায়। ডেক ধোবার সময় কার চৌকি কোথায় ফেলেছে তার ঠিক নেই।

তার পর যেখানে একটু কোণ, যেখানে একটু বাতাস, যেখানে একটু রোদের তেজ কম, যেখানে যার অভ্যাস, সেইখানে ঠেলেঠুলে টেনেটুনে পাশ কাটিয়ে পথ করে আপনার চৌকিটি রাখতে পারলে সমস্ত দিনের মতো নিশ্চিন্ত।

দেখা যায় কোনো চৌকিহারা ম্লানমুখী রমণী কাতরভাবে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করছে, কিংবা কোনো বিপদগ্রস্ত অবলা এই চৌকি-অরণ্যের মধ্যে থেকে নিজেরটি বিশ্লিষ্ট করে নিয়ে অভিপ্রেত স্থানে স্থাপন করতে পারছে না—তখন পুরুষগণ নারীসহায়ব্রতে চৌকি-উদ্ধার কার্যে নিযুক্ত হয়ে সুশিষ্ট ও সুমিষ্ট ধন্যবাদ অর্জন করে থাকে।

তার পর যে যার চৌকি অধিকার করে বসে যাওয়া যায়। ধূমসেবীগণ, হয় ধূমসেবনকক্ষে নয় ডেকের পশ্চাদ্‌ভাগে সমবেত হয়ে পরিতৃপ্তমনে ধূমপান করছে। মেয়েরা অর্ধনিলীন অবস্থায় কেউ বা নবেল পড়ছে কেউ বা সেলাই করছে, মাঝে মাঝে দুই-একজন যুবক ক্ষণেকের জন্যে পাশে বসে মধুকরের মতো কানের কাছে গুন্‌ গুন্‌ করে আবার চলে যাচ্ছে।

আহার কিঞ্চিৎ পরিপাক হবামাত্র এক দলের মধ্যে ক্বয়ট্‌স্‌ খেলা আরম্ভ হল। দুই বালতি পরস্পর হতে হাত দশেক দূরে স্থাপিত হল। দুই জুড়ি স্ত্রীপুরুষ বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করে পালাক্রমে স্ব স্ব স্থান থেকে কলসীর বিড়ের মতো কতকগুলো রজ্জুচক্র বিপরীত বালতির মধ্যে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল। যে পক্ষ সর্বাগ্রে একুশ করতে পারবে তারই জিত। মেয়ে-খেলোয়াড়েরা কখনো জয়োচ্ছ্বাসে কখনো নৈরাশ্যে ঊর্ধ্বকণ্ঠে চীৎকার করে উঠছে। কেউ বা দাঁড়িয়ে দেখছে, কেউ বা গণনা করছে, কেউ বা খেলায় যোগ দিচ্ছে, কেউ বা আপন আপন পড়ায় কিংবা গল্পে নিবিষ্ট।

একটার সময় আবার ঘণ্টা। আবার আহার। আহারান্তে উপরে ফিরে এসে দুই স্তর খাদ্যের ভারে এবং মধ্যাহ্নের উত্তাপে আলস্য অত্যন্ত ঘনীভূত হয়ে আসে। সমুদ্র প্রশান্ত, আকাশ সুনীল মেঘমুক্ত, অল্প অল্প বাতাস দিচ্ছে। কেদারায় হেলান দিয়ে নীরবে নভেল পড়তে পড়তে অধিকাংশ আনীল নয়ন নিদ্রাবিষ্ট। কেবল দুই-একজন দাবা, ব্যাক্‌গ্যামন কিংবা ড্রাফ্‌ট্‌ খেলছে এবং দুই-একজন অশ্রান্ত অধ্যবসায়ী যুবক সমস্ত দিনই ক্বয়ট্‌স্‌ খেলায় নিযুক্ত। কোনো রমণী কোলের উপর কাগজ কলম নিয়ে একাগ্রমনে চিঠি লিখছে এবং কোনো শিল্পকুশলা কৌতুকপ্রিয়া যুবতী নিদ্রিত সহযাত্রীর ছবি আঁকতে চেষ্টা করছে।

ক্রমে রৌদ্রের প্রখরতা হ্রাস হয়ে এল। তাপক্লিষ্ট ক্লান্তকায়গণ নীচে নেমে গিয়ে রুটি মাখন মিষ্টান্ন-সহযোগে চা-রস পানে শরীরের জড়তা পরিহার করে পুনর্বার ডেকে উপস্থিত। পুনর্বার যুগলমূর্তির সোৎসাহ পদচারণা এবং মৃদুমন্দ হাস্যালাপ আরম্ভ হল। কেবল দু-চারজন পাঠিকা

উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ থেকে কিছুতেই আপনাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারছে না, দিবাবসানের ম্লান ক্ষীণালোকে একাগ্রনিবিষ্ট দৃষ্টিতে নায়ক-নায়িকার পরিণাম অনুসরণ করছে।

দক্ষিণ আকাশে তপ্ত স্বর্ণবর্ণের প্রলেপ, তরল অগ্নির মতো জলরাশির মধ্যে সূর্য অস্তমিত, এবং বামে সূর্যাস্তের কিছু পূর্ব হতেই চন্দ্রোদয়ের সূচনা। জাহাজ থেকে পূর্বদিগন্ত পর্যন্ত জ্যোৎস্নারেখা ঝিক্‌ঝিক্ করছে।

জাহাজের ডেকের উপরে এবং কক্ষে কক্ষে বিদ্যুদ্দীপ জ্বলে উঠল। ছটার সময় বাজল ডিনারের প্রথম ঘণ্টা। বেশপরিবর্তন উপলক্ষে সকলে স্ব স্ব কক্ষে প্রবেশ করলে। আধ ঘণ্টা পরে দ্বিতীয় ঘণ্টা। ভোজনগৃহে প্রবেশ করা গেল। সারি সারি নরনারী বসে গেছে। কারও বা কালো কাপড়, কারও রঙিন কাপড়, কারও বা শুভ্র বক্ষ অর্ধ-অনাবৃত। মাথার উপরে শ্রেণীবদ্ধ বিদ্যুৎ-আলোক। গুন্‌গুন্ আলাপের সঙ্গে কাঁটাচামচের টুংটাং ঠুংঠাং শব্দ মুখরিত, এবং বিচিত্র খাদ্যের পর্যায় পরিচারকদের হাতে হাতে নিঃশব্দ স্রোতের মতো যাতায়াত করছে।

আহারের পর ডেকে গিয়ে শীতল বায়ু-সেবন। কোথাও বা যুবকযুবতী অন্ধকার কোণের মধ্যে চৌকি টেনে নিয়ে গিয়ে গুন্‌গুন্ করছে, কোথাও বা দুজনে জাহাজের বারান্দা ধরে ঝুঁকে পড়ে রহস্যালাপে নিমগ্ন, কোনো কোনো জুড়ি গল্প করতে করতে ডেকের আলোক ও অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দ্রুতপদে একবার দেখা দিচ্ছে একবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, কোথাও বা পাঁচ-সাতজন স্ত্রীপুরুষ এবং জাহাজের কর্মচারী জটলা করে উচ্চহাস্যে প্রমোদকল্লোল উচ্ছ্বসিত করে তুলছে। অলস পুরুষেরা কেউ বা বসে কেউ বা দাঁড়িয়ে কেউ বা অর্ধশয়ান অবস্থায় চুরট টানছে, কেউ বা স্মোকিং সেলুনে কেউ বা নীচে খাবার ঘরে হুইস্কি সোডা পাশে রেখে চারজনে দল বেঁধে বাজি রেখে তাস খেলছে। ও দিকে সংগীতশালায় সংগীতপ্রিয় দু-চারজনের সমাবেশে গানবাজনা এবং মাঝে মাঝে করতালি শোনা যাচ্ছে।

ক্রমে সাড়ে দশটা বাজে, মেয়েরা নেবে যায়, ডেকের উপরে আলো হঠাৎ যায় নিবে, ডেক নিঃশব্দ নির্জন অন্ধকার হয়ে আসে। চারি দিকে নিশীথের নিস্তব্ধতা, চন্দ্রালোক, এবং অনন্ত সমুদ্রের অশ্রান্ত কলধ্বনি।

২৭ অক্টোবর। লোহিত সমুদ্রের গরম ক্রমেই বেড়ে উঠছে। ডেকের উপর মেয়েরা সমস্ত দিন তৃষাতুরা হরিণীর মতো ক্লিষ্ট কাতর। তারা কেবল অতি ক্লান্তভাবে পাখা নাড়ছে, স্মেলিং সল্ট শুঁকছে, এবং সকরুণ যুবকেরা যখন পাশে এসে কুশল জিজ্ঞাসা করছে তখন নিমীলিতপ্রায় নেত্র-পল্লব ঈষৎ উন্মীলন করে ম্লানহাস্যে কেবল গ্রীবাভঙ্গিদ্বারা আপন সুকুমার দেহলতার একান্ত অবসন্নতা ইঙ্গিতে জানাচ্ছে। যতই পরিপূর্ণ করে টিফিন এবং লেবুর শরবত খাচ্ছে, ততই জড়ত্ব এবং ক্লান্তি বাড়ছে, নেত্র নিদ্রানত ও সর্বশরীর শিথিল হয়ে আসছে।

২৮ অক্টোবর। আজ এডেনে পৌঁছনো গেল।

২৯ অক্টোবর। আমাদের জাহাজে একটি পার্সি সহযাত্রী আছে। তার ছুঁচলো ছাঁটা দাড়ি এবং বড়ো বড়ো চোখ সর্বপ্রথমেই চোখে পড়ে। অল্প বয়স। নয় মাস য়ুরোপে বেড়িয়ে বিলিতি পোশাক এবং চালচলন ধরেছে। বলে, ইন্ডিয়া লাইক করে না। বলে, তার য়ুরোপীয় বন্ধুদের (অধিকাংশই স্ত্রীবন্ধু) কাছ থেকে তিনশো চিঠি এসে তার কাছে জমেছে, তাই নিয়ে বেচারা মহা মুশকিলে পড়েছে, কখনই বা পড়বে কখনই বা জবাব দেবে। লোকটা আবার নিজে বন্ধুত্ব করতে বড়োই নারাজ, কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় বন্ধুত্ব তার মাথার উপরে অনাহূত অযাচিত বর্ষিত হতে থাকে। সে বলে, বন্ধুত্ব করে কোনো 'ফন্' নেই। উপরন্তু কেবল ল্যাঠা। এমন-কি, শত শত জর্মান ফরাসি ইটালিয়ান এবং ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে সে 'ফ্লর্ট' করে এসেছে, কিন্তু তাতে কোনো মজা পায় নি।

২ নবেম্বর। ভারতবর্ষের কাছাকাছি আসা গেছে। কাল বোম্বাই পৌঁছবার কথা।

আজ সুন্দর সকালবেলা। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, সমুদ্র সফেন তরঙ্গে নৃত্য করছে, উজ্জ্বল রৌদ্র

উঠেছে; কেউ ক্বয়ট্‌স্‌ খেলছে, কেউ নবেল পড়ছে, কেউ গল্প করছে; ম্যুজিক সেলুনে গান, স্মোকিং সেলুনে তাস, ডাইনিং সেলুনে খানার আয়োজন হচ্ছে এবং একটি সংকীর্ণ ক্যাবিনের মধ্যে আমাদের একটি বৃদ্ধ সহযাত্রী মরছে।

সন্ধ্যা আটটার সময় ডিলন সাহেবের মৃত্যু হল। আজ সন্ধ্যার সময় একটি নাটক অভিনয় হবার কথা ছিল।

৩ নবেম্বর। সকালে অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠানের পর ডিলনের মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হল। আজ আমাদের সমুদ্রযাত্রার শেষ দিন।

অনেক রাত্রে জাহাজ বোম্বাই বন্দরে পেঁছল।

৪ নবেম্বর। জাহাজ ত্যাগ করে ভারতবর্ষে নেমে এখন আমার অদৃষ্টের সঙ্গে আর কোনো মনান্তর নেই। সংসারটা মোটের উপরে বেশ আনন্দের স্থান বোধ হচ্ছে। কেবল একটা গোল বেধেছিল— টাকাকড়ি-সমেত আমার ব্যাগটি জাহাজের ক্যাবিনে ফেলে এসেছিলুম, তাতে করে সংসারের আবহাওয়ার হঠাৎ অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হোটেল থেকে অবিলম্বে জাহাজে ফিরে গিয়ে সেটি সংগ্রহ করে এনেছি। এই ব্যাগ ভুলে যাবার সম্ভাবনা কাল চকিতের মতো একবার মনে উদয় হয়েছিল। মনকে তখনই সাবধান করে দিলুম, ব্যাগটা যেন না ভোলা হয়। মন বললে, ক্ষেপেছ! আজ সকালে তাকে বৃথা ভর্ৎসনা করেছি। নষ্টোদ্ধার করে হোটেলে ফিরে এসে স্নানের পর আরাম বোধ হচ্ছে। এই ঘটনা নিয়ে আমার বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি কটাক্ষপাত করবেন সৌভাগ্যক্রমে এমন প্রিয়বন্ধু কেউ উপস্থিত নেই। সুতরাং রাত্রে যখন কলিকাতামুখী গাড়িতে চড়ে বসা গেল, তখন যদিও আমার বালিশটা ভ্রমক্রমে হোটেলে ফেলে এসেছিলুম তবু সুখনিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত হয় নি।

৮ আশ্বিন ১৩০০

সংযোজন

'পাশ্চাত্য ভ্রমণ' গ্রন্থে 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র দ্বিতীয় খণ্ডে এক-
দিনের ডায়ারি স্থান পায় নি। সেই অংশটি 'সংযোজন'-এ মুদ্রিত হল।

২ সেপ্টেম্বর। সকালে ডেকে বেড়াবার সময় একটি ইংরাজ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বহুক্ষণ আলাপ হল। ইনি ভারত-রাজ-মন্ত্রণার একটি প্রধান আসন অধিকার করেন। প্রথমে য়ুরোপের সমাজসমস্যা সম্বন্ধে আমি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলুম, তার কতক কতক আমার ভূমিকাতে ব্যক্ত করা গেছে। সাহেব জনসংখ্যাবৃদ্ধি-বশত বেহার প্রভৃতি দরিদ্র দেশের ভাবী আশঙ্কা এবং কুলি-চালান সম্বন্ধে বাঙালি কাগজের অনভিজ্ঞ চীৎকারের কথা বললেন; এবং দেশের ঐতিহাসিক প্রকৃতি আলোচনা করে ভারতবর্ষে প্রতিনিধিতন্ত্র-প্রচার সম্বন্ধে দৃঢ় আপত্তি প্রকাশ করলেন। আমি বললুম, 'দেখো সাহেব, প্রতিনিধিতন্ত্রের জন্য যে আমরা আন্তরিক লালায়িত এরূপ কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। আসল কথা, তোমরা সর্বদা আমাদের প্রতি প্রকাশ্য ঔদ্ধত্য এবং অবজ্ঞা দেখিয়ে থাক, সেইটেই আমাদের শিক্ষিত লোকদের পক্ষে অসহ্য। অন্তরের মধ্যে সেই অপমান অনুভব করি বলেই আমরা জাতীয় আত্মসম্মান রক্ষা করবার জন্যে আজ এত চেষ্টা করছি। নইলে, তোমাদের জাতের স্বভাবটা যদি একটু নরম হত—আমরা যদি তোমাদের কাছ থেকে যথার্থ ভদ্রতা, কথঞ্চিৎ সম্মান ও মনুষ্যোচিত সদয় ব্যবহার পেতুম—তা হলে আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে থেকে এরকম বেদনার স্বর শুনতে পেতে না। আমাদের দেশের বর্তমান প্রধান দুর্দশা হচ্ছে এই যে, যারা আমাদের আন্তরিক ঘৃণা করে তারাই আমাদের বলপূর্বক উপকার করতে আসে। যারা আমাদের মানুষ জ্ঞান করে না তারাই আমাদের শান্তি রক্ষা করে, লেখাপড়া শেখায়, সুবিচার করবার চেষ্টা করে। প্রতিদিন এরকম অবজ্ঞার দান গ্রহণ করতে বাধ্য হলে আমাদের আত্মসম্মান আর থাকে না। স্নেহের দানে হীনতা নেই। স্নেহের সম্পর্কে সহস্র অবিচার থাকতে পারে কিন্তু অপমান নেই। ধনীগৃহের একটি অনাদৃত উপেক্ষিত আশ্রিতের মতো আমরা পাকা কোঠায় থাকি, উদ্‌বৃত্ত পরমান্ন খাই, সুখ বিস্তর আছে কিন্তু হীনতার আর সীমা নেই—সে কেবলমাত্র আন্তরিক প্রীতি-বন্ধনের অভাবে।

পরিশিষ্ট

'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র দ্বিতীয় খণ্ডের মূল দিনলিপিতে বহু অপ্রকাশিত বিবরণ আছে। এই 'খসড়া' দিনলিপি প্রকাশিত গ্রন্থের বিবরণ অনুধাবনে সহায়তা করবে অনুমানে 'পরিশিষ্ট' অংশে সন্নিবিষ্ট হল।

সবুজ সমুদ্র, নীল তীর, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। ভারতবর্ষের প্রতি একান্ত আকর্ষণ। ভারতবর্ষ যেন বাহু বাড়িয়ে রয়েছে। জীবনের যত সুখ যত ভালোবাসা ঐখেনেই। বেচারা দরিদ্র অক্ষম স্নেহময় ভারতবর্ষ। ক্রমে সন্ধ্যা। ক্রমে তীর তিরোহিত। Lighthouse—সাগরে ভাসমান সন্তানদের জন্যে ভূমিমাতার জাগ্রত দৃষ্টি। মনে হল মিথ্যা সভ্যতা, মিথ্যা জীবনসংগ্রাম—মিথ্যা য়ুরোপীয় উন্নতি-চক্রের আকর্ষণ—নিষ্ফল দুরাশা—বাংলার এক প্রান্তে ভালোবাসার একটু সুরক্ষিত নীড়, এই আমাদের ঢের। এই মহা প্রবহমাণ মানবস্রোতের মধ্যে আমাদের পড়বার কী দরকার ছিল! আমরা চতুর্দিকে মানসিক বেড়া দিয়ে কালস্রোত বন্ধ করে দিয়ে বেশ আরামে গুছিয়ে বসেছিলুম। কোন্ ছিদ্র দিয়ে চির-অশান্ত মানবস্রোত এসে পড়ে আমাদের সমস্ত ছারখার [করে] গুলিয়ে দিয়ে গেল! আজ আমাদের এই মৃদু ক্ষীণ প্রাণের মধ্যে এত দুরাশার আক্ষেপ কেন এনে দিলে? কেন দুরাশা ঐ য়ুরোপীয় বহ্নিশিখার প্রতি আমাদের আকর্ষণ করছে? আমাদের মাথার উপরে হিমালয় এবং পদতলে সমুদ্রবাধা আরও দুর্গম হল না কেন? বেশ অজ্ঞাত নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে একদল মানুষ আটকে থাকত। সমুদ্রের এক অংশ কালক্রমে বন্ধ হয়ে, একটি নিভৃত শান্তিময় সুন্দর একটি হ্রদ যেমন নিস্তরঙ্গভাবে চিরদিন কেবল আকাশের প্রভাত-সন্ধ্যার ছায়া আপনার মধ্যে অঙ্কিত করে।

২২ অগস্ট। শুক্রবার। ১৮৯০। শ্যাম। মঙ্গলবার পর্যন্ত একটা দিন বলে ধরা যেতে পারে। Seasickness। রাত্তিরে পরের ক্যাবিনে ঢুকে পরের কম্বল অপহরণ। স্বপ্ন। লোকেনের প্রতি মানসিক অসদ্ভাব। মঙ্গলবারে ডেকে উঠে লোকেনের প্রতি অসাধারণ আসক্তি। বুধবারে প্রশান্ত সমুদ্র, উজ্জ্বল সূর্যালোক, কবিত্ব চিন্তা ও তজ্জাতীয় কথোপকথন। বৃহস্পতিবারে চমৎকার দিন—চিঠি লেখা। রাত্রে চন্দ্রালোকে একটা দেড়টা পর্যন্ত আলোচনা। ঘন বৃষ্টি। তার পরদিন সমস্ত দিন বৃষ্টি। সল্লিকে চিঠি। অতি ধীর গতি। দুই-একটা পাহাড়-পর্বতের রেখা। চমৎকার সন্ধ্যা। চন্দ্রালোকে এডেন। হঠাৎ জাহাজ-বদল। দীর্ঘ জাহাজ, সহস্র আলোকচক্ষু। জিনিসপত্র গোলমাল। দুই দল দুই দিকে। মার্সেলিয়া জাহাজ। নতুন লোকজন।

পুরোনো জাহাজের সহযাত্রী—মাতৃহীন কতকগুলি মেয়ের একটি রুগ্ণ বাপ—বেচারা! একটি চিরহাস্যময় বালক civilian। Gambling। নতুন জাহাজের সর্বোচ্চ ছাত। অনেক রাত্রে ছাড়লে। শান্ত সমুদ্র, জ্যোৎস্না রাত, বেশ বাতাস। ডেকে নিদ্রা। নতুন লোক। একটি মেয়ের প্রতি বহু পুরুষের দৃষ্টি। অনেক ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে। আজ শনিবার [৩০ অগস্ট]। ব্যান্ড বেশ লাগছে। সল্লি ও কুমুদের চিঠি—বেশ রৌদ্র—সবসুদ্ধ বেশ। লোকেন নীরব। দূর সমুদ্রতীরের আরবদেশের পাহাড়গুলো রৌদ্রে ক্লান্ত ও ঝাপসা দেখাচ্ছে—যেন তন্দ্রার ছায়া পড়ে অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে।

আমি লোকটা স্বভাবত একটু চুপচাপ এবং একটু কোণ ভালোবাসি। দুই-একজন যাদের ভালোবাসি তাদের কাছের গোড়ায় নিয়ে বেশ একটুখানি সন্ধ্যালোক এবং একটু মধুর চিন্তার মধ্যে থাকা আমার জীবনের একমাত্র সাধ। দুশ্চিন্তা, দুশ্চেষ্টা, প্রবল কর্মপ্রখর আমোদ—আমার নয়। কিন্তু আমি কাউকে পাই নে। কারও চুপ করে বসে থাকবার সময় নেই. পৃথিবীতে আমি এবং সন্ধ্যা এবং আকাশ এবং সৌন্দর্য ছাড়া আরও ঢের জিনিস আছে, কত কর্তব্য কত উদ্দেশ্য আছে, পৃথিবী খুব বেগে চলছে। কাজেই আমাকে কেবল একলা বসে থাকতে হয়। তাও পেরে উঠি নে—কাজেই যারা উদ্দাম বেগে কর্তব্যের দিকে এবং আমোদের দিকে যাচ্ছে তাদের সঙ্গ রাখবার জন্যে আমার চিন্তা ফেলে, সন্ধ্যা ফেলে, তাড়াতাড়ি ছুটতে হয়। সুতরাং আমার ভাবটা না তাদের মতো, না আমার মতো; না খাটতে পারি হাসতে পারি, না ভাবতে পারি উপভোগ করতে পারি—না আমি পৃথিবীর সেবক, না আমি পৃথিবীর নবাব।

আমরা পুরাতন ভারতবর্ষীয়, ভারি প্রাচীন, ভারি শ্রান্ত। আমি অনেক সময়ে নিজের মধ্যে

আমাদের জাতীয় প্রাচীনত্ব অনুভব করি— বিশ্রাম এবং চিন্তা এবং বৈরাগ্য। আমাদের যেন এখন ছুটির সময়। যা উপার্জন করা গেছে তারই উপরে নিশ্চিন্তে শেষ বেলাটা কাটাবার সময়। এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে— যে ব্রহ্মত্রটুকু পাওয়া গিয়েছিল তার ভালো দলিল দেখাতে পারি নি বলে নতুন রাজার রাজত্বে ক্রোক হয়ে গেছে। হঠাৎ আমরা গরিব। পৃথিবীর চাষারা যেরকম খাটছে এবং খাজনা দিচ্ছে আমাদেরও তাই করতে হবে। পুরাতন জাতকে নতুন চেষ্টা আরম্ভ করতে হয়েছে। চিন্তা রাখো, বিশ্রাম রাখো, গৃহকোণ ছাড়ো— কঠিন মাটির ঢেলা ভাঙো— পৃথিবীকে উর্বরা করো এবং নব মানব-রাজার রাজস্ব দেও। উঠেছি তো, চলেওছি— দেখাচ্ছি খুব কাজের লোক হয়েছি— কিন্তু ভিতরে ভিতরে কতটা নিরাশ্বাস কতটা নিরুদ্যম। থেকে থেকে মনে হয় আমরা কাজের লোকের সঙ্গে কিছুতেই তাল রেখে চলতে পারব না, অথচ আমাদের বিশ্রাম এবং শান্তির অবসর রইল না। হায়, ভারতবর্ষের বেড়া ভেঙে মনুষ্যস্রোত কেন আমাদের মধ্যে এসে পড়ল! কেন আমাদের লজ্জা দিচ্ছে, কেন আমাদের দায়ে ফেলে নিষ্ফল কাজে লাগাচ্ছে— পুরাতন বনেদী বংশের দারিদ্র্য কেন পৃথিবীর সামনে প্রচার করছে! তবে ওঠো— political agitation করো— joint stock company খোলো— শিথিল মাংসপেশী নিয়ে ম্যাঞ্চেস্টরের সহস্র লৌহবাহুর সঙ্গে লড়তে আরম্ভ করো— দেখো কী হয়। কিন্তু আমি যুবা বটে, তোমাদের বয়সী বটে, তবু সভায় যাই নে, চাঁদার খাতা নিয়ে ঘুরি নে, খবরের কাগজে লিখি নে— আমি নিতান্ত জীর্ণ ভারতবর্ষীয়— আমি ভাবি, কী হবে! শেষ রক্ষা করবে কে!

অথচ ইচ্ছা আছে। যখন দেখি মানবস্রোত চলেছে, বিচিত্র কল্লোল, প্রবল গতি, মহান বেগ, অবিশ্রাম কর্ম, তখন আমার মন নেচে ওঠে— তখন ইচ্ছা করে সহস্র বৎসরের গৃহপ্রাচীর ভেঙে ফেলে বেরিয়ে পড়ি। আবার তখনি মনে হয়, যখন পিছিয়ে পড়ব তখন ফিরব কোথায়! যখন সবাই ফেলে যাবে তখন দাঁড়াব কোথায়! তার চেয়ে পৃথিবীপ্রান্তে এই অজ্ঞাতবাস ভালো, এই ক্ষুদ্র সুখ এবং অগাধ শান্তি ভালো। তখন মনে হয়— আমরা কিছু অসভ্য বর্বর নই; আমরা যন্ত্র তৈরি করতে পারি নে, জগতের সমস্ত নিগূঢ় খবর বের করতে পারি নে, কিন্তু খুব ভালোবাসতে পারি, ক্ষমা করতে পারি, পরস্পরের জন্যে জায়গা ছেড়ে দিতে পারি। অপেক্ষা করে দেখা যাক পৃথিবীর এই নতুন সভ্যতা কবে আমাদের কোমলতা দেখে আমাদের ভালোবাসবে, কবে আমাদের দুর্বলতা দেখে অবজ্ঞা করবে না, কবে তাদের নূতন উন্নতি, যৌবনের বলাভিমান এবং জ্ঞানাভিমান কালক্রমে নরম হয়ে আসবে এবং আমাদের স্নেহশীলতা দেখে আমাদের প্রতি স্নেহ করবে— দুর্বল হয়েও, অনেকগুলো বিষয়ে নূতন সংবাদ না রেখেও, আমাদের কেবল কোমল হৃদয়টুকু নিয়ে মানবপরিবারের মধ্যে স্থান পাব। গোরাদের মোটা মোটা মুষ্টি, প্রচণ্ড দাপট এবং নিষ্ঠুর অসহিষ্ণুতা দেখে আপাতত সে দিন কল্পনা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। আচ্ছা, নাহয় তাই হল, আমরা নাহয় এক পাশেই পড়ে রইলুম, Times-এর স্তম্ভে আমাদের নাম নাহয় নাই উঠল— আপনা-আপনি ভালোবেসেই কি যথেষ্ট সুখ পাব না?

নিদেন আমি তো আপনাকে তাই বোঝাচ্ছি। তোমরা কাজ করছ বোধ হয় ভালোই করছ— আমি পারি নে, আমার বিশ্বাস এবং উৎসাহ জাগে না, আমি কাছাকাছির মধ্যে ভালোবেসে যতটা পারি সুখে থাকি এবং যতটা পারি সুখে রাখি।

কিন্তু দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে, ক্ষমতার অত্যাচার আছে, অসহায়ের অপমান আছে, কোণে বসে ভালোবেসে তার কী করবে! হায়, ভারতবর্ষের সেই তো দুঃসহ কষ্ট! আমরা কার সঙ্গে যুদ্ধ করব! রূঢ় মানবপ্রকৃতির চিরন্তন নিষ্ঠুরতার সঙ্গে! প্রবলতা চিরদিন দুর্বলতার প্রতি নির্মম, আমরা সেই আদিম পশুপ্রকৃতিকে কী করে জয় করব? সভা করে? দরখাস্ত করে? আজ একটু ভিক্ষে নিয়ে, কাল একটা লাঠি খেয়ে? তা কখনোই হবে না। প্রবলের সমান প্রবল হয়ে? তা হতে পারে বটে। কিন্তু যখন ভেবে দেখি য়ুরোপ কত দিকে প্রবল, কত কারণে প্রবল— যখন এই অসীম শক্তিকে একবার সর্বতোভাবে অনুভব করে দেখি— তখন কি আর আশা হয়? তখন মনে হয়,

এসো ভাই, সহিষ্ণু হয়ে থাকি, প্রবল হতে না পারি তবু ভালো হবার চেষ্টা করি এবং ভালোবাসি।

আমি যখন Matthew Arnold-এর কবিতা পড়ি তখন মনে হয় য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে যতটুকু প্রাচীন হয়ে পড়েছে তারই যেন আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি। হঠাৎ এই অবিশ্রাম কর্ম এবং জীবনসংগ্রামের মধ্যে একটা শ্রান্তি এবং সন্দেহ এসে ক্ষীণ স্বরে বলছে, ওগো, একটু রোসো, একটু থামো—এ-সব কী হচ্ছে একটু ভাবো, একটু ভাবতে সময় দাও। মানুষ কেবল হাঁস্‌ফাঁস্‌ করে খাটবার জন্যে হয় নি, মাঝে মাঝে চুপচাপ করে ভাবা আবশ্যক। যখনি একটা জাত আপনার কাজের হিসেব নিতে যায়, যখনি সে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে 'এতদিন যা করলে তার থেকে অবশেষে হল কী', তখনি বোঝা যায় তার পাক ধরতে আরম্ভ করেছে। যখন মানুষ কেবল কাজের প্রবাহে প্রাণের উৎসাহে আপনি কাজ করে যায় তখনি তার বল। য়ুরোপে এখন সকল বিষয়েরই নিকেশের খাতা বেরিয়েছে। ধর্ম বল, মানবহৃদয়ের সহস্র উচ্চ-আশা মহৎ-প্রবৃত্তি বল, সকলেরই খানাতল্লাসি চলছে। একটা বড়ো বিশ্বাসের জায়গায় ছোটো ছোটো সহস্র মত বাসা করছে। যেমন একটা বৃহৎ প্রাণীর মৃতদেহে সহস্র ক্ষুদ্র প্রাণী জন্মগ্রহণ করে—কিন্তু সেটা জীর্ণতারই লক্ষণ।

এমন নয় যে আমাদের কিছুই নেই, আমরা একেবারে বর্বর জাতি। এমন নয় যে বেদুয়িনদের মতো আমাদের মাথার উপরে কেবল শূন্য আকাশ এবং পায়ের নীচে উদাস মরুভূমি। আমরা একটি অত্যন্ত জীর্ণ প্রাচীন নগরে বাস করি—এত প্রাচীন যে এর ইতিহাস লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে, মানুষের হস্তলিখিত স্মরণচিহ্নগুলি শৈবালে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে—সেইজন্যে ভ্রম হচ্ছে এ নগর যেন মানব-ইতিহাসের অতীত, যেন প্রাচীন প্রকৃতির এক রাজধানী। মানবপুরাবৃত্তের রেখা লুপ্ত করে দিয়ে প্রকৃতি আপন শ্যামল অক্ষর এর সর্বাঙ্গে বিচিত্র আকারে লিখে রেখেছে—সহস্র বৎসরের বর্ষা আপন অশ্রুচিহ্ন রেখে গেছে এবং সহস্র বসন্ত এর প্রত্যেক ভিত্তিছিদ্রে আপন যাতায়াতের তারিখ চিরহরিৎ অঙ্কে অঙ্কিত করে গেছে। এক দিক থেকে একে নগর বলা যেতে পারে, এক দিক থেকে একে অরণ্য বলা যায়। এর মধ্যে কেবল ছায়া এবং বিশ্রাম, চিন্তা এবং বিষাদ বাস করতে পারে—এখানকার ঝিল্লিমুখরিত অরণ্যমর্মরের মধ্যে, এখানকার বিচিত্রভঙ্গি জটিল শাখা-প্রশাখা ও রহস্যময় পুরাতন অট্টালিকাভিত্তির মধ্যে সহস্র সহস্র ছায়াকে কায়াময়ী ও কায়াকে ছায়াময়ী বলে ভ্রম হয়—এখানকার এই প্রাচীন মহাছায়ার মধ্যে সত্য এবং কল্পনা ভাইবোনের মতো নির্বিরোধে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, অর্থাৎ প্রকৃতির বিশ্বকার্য এবং মানবের মানসিক সৃষ্টি পরস্পর জড়িত বিজড়িত হয়ে নানা আকারের ছায়াকুঞ্জ নির্মাণ করেছে, সেখানে ছেলেমেয়েরা সারাদিন খেলা করে এবং বয়স্ক লোকেরা স্বপ্ন দেখে, প্রখর সূর্যালোক ছিদ্রপথে সেখানে প্রবেশ করে ছোটো ছোটো মানিকের মতো দেখায়। প্রবল ঝড় শত শত সংকীর্ণ শাখাপথের জটিলতার মধ্যে প্রতিহত হয়ে সেখানে এসে মৃদু মর্মরের মধ্যে মিলিয়ে যায়। এখানে জীবনমৃত্যু সুখদুঃখ আশানৈরাশ্যের সীমাচিহ্ন মিলিয়ে এসেছে—অদৃষ্টবাদ এবং কর্মকাণ্ড, বৈরাগ্য এবং সংসারযাত্রা একসঙ্গে চলেছে। এখানে কি তোমাদের জগৎযুদ্ধের সৈন্যশিবির স্থাপন করবার জায়গা! এখানকার জীর্ণ ভিত্তি কি তোমাদের কলকারখানা, তোমাদের শৃঙ্খলিত অগ্নিগর্ভ দুরন্ত লৌহ-দৈত্যদের কারাগার-নির্মাণের যোগ্য! তোমাদের প্রবল উদ্যমের বেগে এর শিথিল ইষ্টকগুলিকে ভূমিসাৎ করতে পার বটে, কিন্তু তার পরে পৃথিবীর এই অতি প্রাচীন শ্রান্ত জাতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে! এরা বহুদিন স্বহস্তে গৃহনির্মাণ করে নি—সেই এদের মহৎ গর্ব যে প্রাচীন আদিপুরুষের বাস্তুভিত্তি এদের কখনো ছাড়তে হয় নি; কালক্রমে অনেক অবস্থাবৈসাদৃশ্য অনেক বংশবৃদ্ধি অনেক নূতন সুবিধে-অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু সবগুলিকে টেনে নিয়ে, নূতনকে এবং পুরাতনকে, সুবিধেকে এবং অসুবিধেকে সেই পিতামহপ্রতিষ্ঠিত এক ভিত্তির মধ্যে ভুক্ত করা হয়েছে; সামান্য অসুবিধের খাতিরে এরা কখনো স্পর্ধিতভাবে নূতন গৃহবৃদ্ধি বা পুরাতন গৃহসংস্কার করে নি; যেখানে গৃহছাদের মধ্যে ছিদ্র হয়েছে সেখানে বটের শাখা অথবা কালসঞ্চিত মৃত্তিকাস্তরে ছায়া দান করেছে। এই মহা নগরারণ্য ভেঙে গেলে একটি বৃহৎ প্রাচীন শ্রান্ত জাতি

একেবারে গৃহহীন— কেবল তাই নয়— একটি সহস্র বৎসরের প্রেতাত্মা এখানে যে চিরনিভৃত আশ্রয় গ্রহণ করেছিল সেও নিরাশ্রয়— তার আর-কোনো ইতিহাস নেই, তার জন্মমৃত্যুর তারিখ নেই, সে কেবল এই প্রাচীন অধিবাসীদের ভগ্ন গৃহের মধ্যে বহুকাল আপন প্রাণহীন প্রাণ বহন করে আসছে। তোমরা হঠাৎ এসে বলছ— ওঠো, তোমরা জেগে ওঠো— এ-সমস্ত ভেঙেচুরে বদলে ফেলো— ইতিমধ্যে পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে— এখন কর্মের যুগ পড়েছে, অমূলক চিন্তার সময় নেই। আমরা ভীত হয়ে তোমাদের বলছি এবং আপনাদের বোঝাবার চেষ্টা করছি— ঠিক কথা— মানবের উন্নতি-সাধনের জন্যে কর্ম আবশ্যক, কিন্তু এমন কর্মস্থান আব কোথায় আছে! দেখো, এইখানেই মানব-ইতিহাসের প্রথম যুগে আর্য-বর্বরের যুদ্ধ হয়ে গেছে— এইখানে কত রাজ্যপত্তন কত নীতিধর্মের অভ্যুদয় কত সভ্যতার সংগ্রাম হয়ে গেছে, এই সমস্ত ভগ্নস্তূপের মধ্যে অনুসন্ধান করলে তার সহস্র চিহ্ন পাওয়া যাবে। অতএব আমাদের সমস্ত প্রস্তুত আছে, কিছুই করবার আবশ্যক নেই। তোমরা শুনে হাসছ, মনে করছ অনেক দিন নিদ্রামগ্ন থেকে 'ছিল' এবং 'আছে'র মধ্যেকার প্রভেদ আমরা ভুলে গেছি— মধ্যে স্বহস্তে কিছু পরিবর্তন করি নি বলেই মনে করছি যা ছিল ঠিক তাই আছে। মনে করছ, এ একটা আলস্যের নির্বুদ্ধিতামাত্র। কিন্তু আমরা মুখে যাই বলি আমাদের আসল কথাটা বুঝে দেখো। আসল কথাটা হচ্ছে, আমরা কাজ করতে পারব না, কিন্তু তা বলে আমাদের অধিক লজ্জার বিষয় নেই— কেননা, আমরা আমাদের কাজ শেষ করেছি, আজকাল আমাদের কাজ ফুরিয়ে গেছে। আমরা মানবসভ্যতার খানিকটা ভিত্তি গেঁথে বিশ্রাম করতে বসেছি— এখন তোমাদের পালা, তোমরা কাজ করো। অবিশ্বাস কর যদি, অকর্মণ্য বলে যদি লজ্জা দাও, তবে আমরা বলব— তোমাদের ঐ তীক্ষ্ম ঐতিহাসিক কোদাল দিয়ে ভারতভূমি থেকে যুগসঞ্চিত বিস্মৃতির মৃত্তিকাস্তর উঠিয়ে দেখো মানবসভ্যতার ভিত্তিতে আমাদের হস্তচিহ্ন আছে কি না। তোমরা যে নতুন কাণ্ড করতে আরম্ভ করে দিয়েছ এখনো তার শেষ হয় নি, এখনো তার সমস্ত সত্য মিথ্যা স্থির হয় নি। মানব-অদৃষ্টের যা চিরন্তন সমস্যা এখনো তার কোনোটার মীমাংসা হয় নি। তোমরা অনেক জেনেছ, অনেক পেয়েছ, কিন্তু সুখ পেয়েছ কি? আমরা যে বিশ্বসংসারকে মায়া বলে বসে আছি এবং তোমরা যে একে ধ্রুব সত্য বলে খেটে মরছ, তোমরা কি আমাদের চেয়ে বেশি সুখী হয়েছ? তোমরা যে বর্তমান সভ্যতাকে পরম জটিল করে প্রচণ্ড জীবিকাসংগ্রাম বাধিয়ে দিয়েছ, এর শেষ ফল কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ? তোমরা যে অহর্নিশি নূতন নূতন অভাব আবিষ্কার করে দরিদ্রের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বাড়াচ্ছ, স্বাস্থ্যজনক গৃহের বিশ্রাম থেকে অবিশ্রাম কর্মের উত্তেজনায় টেনে নিয়ে যাচ্ছ, কর্মকে সমস্ত জীবনের কর্তা করে প্রবল উন্মাদনাকে বিশ্রামের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছ, এমন-কি স্ত্রীলোকদেরও গৃহকর্ম থেকে বের করে হয় আমোদের মত্ততা নয় জীবনের রণক্ষেত্রে টেনে নিয়ে যাচ্ছ, তোমরা কি জেনেছ তোমরা কী করছ? তোমরা কি জান তোমাদের উন্নতি তোমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? আমরা জানি আমরা কোথায় এসেছি, আমরা গৃহের মধ্যে অল্প অভাব এবং গাঢ় স্নেহ নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে নিত্যনৈমিত্তিক ক্ষুদ্র নিকটকর্তব্যসকল পালন করে যাচ্ছি। আমাদের যতটুকু সুখসমৃদ্ধি আছে ধনী-দরিদ্রে, দূর ও নিকট-সম্পর্কীয়ে, আত্মীয় অতিথি অনুচর ও ভিক্ষুকে মিলে ভাগ করে নিয়েছি; যথাসম্ভব লোক যথাসম্ভবমত সুখে কাটিয়ে দিচ্ছে— কেউ কাউকে ত্যাগ করতে চায় না। এবং জীবনঝঞ্ঝার তাড়নায় কেউ কাউকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয় না। এই সহস্র সহস্র বৎসরে ভারতবর্ষ জীবনের এই এক মহৎ তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে সুখের যথার্থ উপায় সন্তোষ— এবং সমস্ত সমাজনীতির দ্বারা ভারতের গৃহে গৃহে ও অন্তরে অন্তরে সেই সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। যেটা খুঁজেছে সেটা পেয়েছে এবং সেটা দৃঢ়বদ্ধমূল করে দিয়েছে। তার আর-কিছু করবার নেই। সে বরঞ্চ তার বিশ্রামকক্ষে বসে তোমাদের উন্মাদ জীবন-উপপ্লব দেখে তোমাদের সভ্যতার সফলতা সম্বন্ধে সংশয় অনুভব করতে পারে। মনে করতে পারে, কালক্রমে অবশেষে তোমরা যখন একদিন কাজ বন্ধ করবে তখন কি এমন ধীরে এমন সহজে এমন বিশ্রামের মধ্যে অবতরণ

করতে পারবে? আমাদের মতো এমন কোমল এমন সহৃদয় পরিণতি লাভ করতে পারবে কি? উদ্দেশ্য যেমন ক্রমে ক্রমে লক্ষ্যের মধ্যে নিঃশেষিত হয়, উত্তপ্ত দিন যেমন অবশেষে সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হয়ে অলক্ষ্যে সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে অবগাহন করে, সেইরকম মধুর সমাপ্তি লাভ করতে পারবে কি? না, কল যেরকম হঠাৎ বিগড়ে যায়, উত্তরোত্তর অতিরিক্ত বাষ্প ও তাপ সঞ্চয় করে এঞ্জিন যেরকম সহসা ফেটে যায়, একপথবর্তী দুই বিপরীতমুখী রেলগাড়ি পরস্পরের সংঘাতে যেমন অকস্মাৎ থেমে যায়, সেইরকম প্রবলবেগে একটা নিদারুণ অপঘাতসমাপ্তি লাভ করবে? যাই হোক, তোমরা এখন অপরিচিত সমুদ্রে অনাবিষ্কৃত তটের সন্ধানে চলেছ। অতএব তোমাদের পথে তোমরা যাও, আমাদের গৃহে আমরা থাকি—এই কথাই ভালো।

কিন্তু গৃহরক্ষা হয় কী করে! যদি বাইরের কোনো উৎপাত না থাকত তা হলে তো কোনো কথাই ছিল না। কিন্তু অজানা অচেনা লোক আমাদের এই নিভৃত নগরের মধ্যে প্রবেশ করেছে; আমাদের ইঁটগুলি খুলে, আমাদের গাছগুলো কেটে, তারা আপনাদের ঘর বানাতে চায়; বহু যত্নে আমাদের ছেলেদের মুখে যে অন্নের গ্রাসটি তুলে দিচ্ছি পরের ছেলের [জোয়ান গোঁয়ার] বাপগুলি এসে তা কেড়ে নিচ্ছে। এখন বিশ্রাম থাকে কোথায়? প্রাচীন হও আর শ্রান্ত হও আর নিজের প্রতি যেরকম স্তোকবাক্যই প্রয়োগ কর, আর প্রাচীন পুঁথি থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে নিজেকে যতই সম্মান ও সমাদর কর আহার তো চাই, অপমান এবং দারিদ্র্য থেকে সন্তানদের রক্ষা করা তো চাই, যখন চার দিকে অসংযত বলের খেলা এবং নিষ্ঠুর জীবিকাসংগ্রাম তখন আত্মরক্ষার জন্যে সক্ষমতা লাভ করা তো চাই। এ কথা তো বললে চলবে না—'আমরা প্রাচীন হয়েছি অতএব মরণ হলে দুঃখ নেই।'

আরও একটা কথা। সুখ বলে একটা জিনিস কিছুই নেই—সুখটিকে একটি দুর্লভ রত্নের মতো সংগ্রহ করে একটি কৌটোর মধ্যে পুরে ট্যাঁকের মধ্যে গুঁজে কেউ বলতে পারে না 'বাস্‌ হয়ে গেল—আমার আর কিছু করবার নেই।' বিচিত্র মানবপ্রবৃত্তির চর্চাই সুখ। জীবনের প্রবাহই সুখ। অভাব যত অধিক, জীবিকাসংগ্রাম যত দুরূহ, সভ্যতা যত জটিল, মানবমনের বিচিত্র বৃত্তির আলোড়ন ততই বেশি। সন্তোষ আর সুখ এক নয় সে কথা আমরাও জানি। আমরা যখন বলি সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো তখনই স্বীকার করি সুখ ও সন্তোষ দুই স্বতন্ত্র পদার্থ। কিন্তু সুখের চেয়ে সন্তোষ আমরা প্রার্থনীয় মনে করি। কেননা দুর্বলের জন্য সুখ নয়—সুখ বলসাধ্য, সুখ দুঃখসাধ্য। অক্সিজেন যেমন প্রতি মুহূর্তে আমাদিগকে দগ্ধ ক'রে জীবন দেয়, মানসিক জীবনে সুখ সেইরকম আমাদের দাহ করে। যৌবনে এই দাহ যেরকম প্রবল বার্ধক্যে সেরকম নয়—কিন্তু তাই বলে বৃদ্ধেরা বলতে পারে না যে, তাপহ্রাসই যথার্থ জীবন এবং সন্তোষই যথার্থ সুখ। এই পর্যন্ত বলতে পারে 'আমার পক্ষে আবশ্যক নেই'। অতএব, কোণে বসে য়ুরোপের সুখ য়ুরোপের প্রাণ অস্বীকার করবার কারণ দেখা যায় না।

কেবল বিচার্য বিষয় এই, এর একটা সীমা আছে কি না। যতই প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও আকাঙ্ক্ষার বিকাশ বাড়ছে ততই তার কিয়ৎপরিমাণ চরিতার্থতাও একান্ত দুর্লভ হয়ে উঠছে কি না। ততই জীবনের সফলতা-লাভের জন্যে গুরুতর ক্ষমতার আবশ্যক হচ্ছে কি না এবং সে ক্ষমতা স্বভাবতই অপেক্ষাকৃত অল্পতর ও সুযোগ্যতর লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হচ্ছে কি না। এইরকমে উত্তরোত্তর দুঃখী লোকের সংখ্যা বাড়ছে কি না। সমাজে সুখবিভাগের যত বৈষম্য হয় ততই তার পক্ষে বিপদ কি না। ভারতবর্ষে যেমন জ্ঞানসম্পদ কেবল ব্রাহ্মণদের মধ্যে বদ্ধ হয়ে পড়েছিল বলে জ্ঞানের অনেক বিভাগের আরম্ভ মাত্র হয়েছিল কিন্তু পরিণতি হয় নি, চতুর্দিক্‌বর্তী বিপুল ভ্রান্ত সংস্কারের স্রোত এসে তাকে প্লাবিত করে দিয়েছিল, তেমনি সৌভাগ্য যদি সমাজের এক অংশের মধ্যেই বদ্ধ হতে থাকে তা হলে ক্রমে দারিদ্র্যদুঃখের সংঘর্ষে তা বিপর্যস্ত হয়ে যাবে কি না।

দ্বিতীয় কথা—fittest-রাই survive করে, কিন্তু fitness অনেক রকমের আছে। কেউ বা কঠিন ব'লে বাঁচে, কেউ বা কোমল ব'লে বাঁচে। কেউ বা উন্নত হয়ে বাঁচে, কেউ বা নত হয়ে বাঁচে।

গাছ একরকম করে বাঁচে, লতা আর-এক রকম করে বাঁচে। আমরা যে মনে করছি বিরোধীপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচব, বাস্তবিক আমাদের সে যোগ্যতা আছে কি? জাতির মধ্যে কি বৈচিত্র্য নেই? সকলেরই কি টেঁকবার একরকম উপায়? খুব সম্ভবত সহিষ্ণুতা এবং নম্রতা ছাড়া আমাদের আর বাঁচবার কোনো উপায় নেই। অতএব আমরা যে য়ুরোপীয়দের সমকক্ষ হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছি সে কি বাঁচবার পথে যাচ্ছি না মরবার পথে যাচ্ছি? আমরা যদি আমাদের স্বাভাবিক মৃদু কোমলতা রক্ষা করি তা হলেই কি প্রবলের কঠিনতা সহজে সহ্য করতে পারব না? আমরা যদি কঠিন হই তা হলেই কি কঠিনতরের আঘাতে ভেঙে যাব না? কিন্তু প্রশ্ন উত্থাপন করা বৃথা। স্রোতে আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ইংরাজিশিক্ষা যখন স্বভাবতই আমাদের একমাত্র প্রধান শিক্ষা হচ্ছে, দুর্বলের প্রতিও যখন জীবনের প্রবলতার একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে, তখন বিজ্ঞ বিবেচনার কথা বলা বাহুল্য— এবং কে জানে সে কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কি না এবং কে জানে ভবিষ্যতে জাতীয় জীবন এবং বহির্ঘটনা পরস্পরে মিলে আপনাদের মধ্যে একটি চমৎকার সামঞ্জস্য স্থাপন করবে কি না।

শনিবারটা [৩০ অগস্ট] চলছে। খানিকটা ভাবছি খানিকটা লিখছি— খানিকটা ছেলেদের খেলা দেখছি— খানিকটা Band শোনা যাচ্ছে— মাঝে মাঝে জাহাজ, মাঝে মাঝে পাহাড় অনুর্বর কঠিন কালো দগ্ধ তপ্ত জনহীন, মাঝে মাঝে তীরশূন্য সমুদ্র— এইরকম করে সূর্যাস্তের সময় হল। Band বাজছে। Castle of Indolence যদি কোথাও থাকে তো সে হচ্ছে জাহাজ— বিশেষত গরম দিনে প্রশান্ত Red Sea-র উপরে— ইংরেজ-তনয়রাও সমস্ত দিন ডেকের উপর আরাম-কেদারায় পড়ে দিবাস্বপ্ন দেখছে— কেবল জাহাজ চলছে, এবং তার দুই পাশের আহত নীল জল নাড়া খেয়ে অলস আপত্তির ক্ষীণস্বরে পাশ কাটিয়ে একটুখানি সরে যাচ্ছে— আর বিকেলের দিকে বাতাসও একটু একটু বইতে আরম্ভ করেছে— জগতের আর-সমস্ত স্বপ্ন দেখছে— দুই-একটা সাদা লঘু মেঘখণ্ড তারাও নড়ছে না।

সূর্য অস্ত গেছে। আকাশের এবং জলের চমৎকার রঙ হয়েছে। সমুদ্রের জলে একটি রেখা মাত্র নেই। দিগন্তবিস্তৃত অটুট জলরাশি নিটোল সুডোল কোমল পরিপূর্ণ যৌবনের মতো স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। এমন একটা জায়গায় এসেছে যার ঊর্ধ্বে আর গতি নেই, পরিবর্তন নেই, যা অবিশ্রাম চাঞ্চল্যের পরম পরিণতি, চরম নির্বাণ। সন্ধের সময় চিল আকাশের যে-একটা সর্বোচ্চ নীলিমার সীমার কাছে গিয়ে সমস্ত পাখা সমতল রেখায় বিস্তার করে দিয়ে হঠাৎ গতি বন্ধ করে দেয়— চিরচঞ্চল সমুদ্র ঠিক যেন সহসা সেইরকম একটা চরম প্রশান্তির শেষ সীমায় এসে ক্ষণেকের জন্যে পশ্চিম অস্তাচলের দিকে মুখ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। জলের যে চমৎকার রঙ হয়েছে তাকে আকাশের ছায়া বললে যেন ঠিক বলা হয় না— যেন এই মাহেন্দ্রক্ষণে সন্ধ্যাকাশের স্পর্শ লাভ করে হঠাৎ সমুদ্রের অতলস্পর্শ অন্ধকার গভীরতার মধ্যে থেকে একটা আকস্মিক প্রতিভার দীপ্তি স্ফূর্তি পেয়েছে— সে কতটা তার কতটা আকাশের বলা যায় না। আমাদের কত কবিতা কত গান আর-এক জনের দুখানি নেত্রের ছায়া— এও সেইরকম। সমুদ্রের এবং আকাশের সেই আশ্চর্য রঙ দেখে কেবল মনে হচ্ছিল ঠিক এইটেকে ব্যক্ত করতে পারি এমন ভাষা কোথায়? আবার তখনই মনে হল দরকার কী? আমার মধ্যে এ চঞ্চলতা কেন? এই সমুদ্রের এবং আকাশেরই মতো আমার মনের সমুদয় চেষ্টা নির্বাণ লাভ করে না কেন? হৃদয়ের সমুদয় তরঙ্গকে একেবারে থামিয়ে দিয়ে কেন কেবল চেয়ে থাকি নে? এই বৃহৎকে ছোটোর মধ্যে বেঁধে আপন আয়ত্তের মধ্যে পেতে চাই কেন? সবই ধরতে হবে, রাখতে হবে— এই কেবল চেষ্টা! অনেক সময় এইরকম দুশ্চেষ্টার বশে, যতটুকু পাওয়া যেতে পারে তাও ভালো করে পাবার সময় থাকে না।

কিন্তু মনে হয় সমুদ্র এবং আকাশের মধ্যেকার এই দুর্লভ সন্ধ্যাটুকু যদি পারিজাতপুষ্পের মতো তুলে নিয়ে কারও হাতে না দিতে পারি তবে কিছুই হল না। এই আলো এই শান্তি কেবল চেয়ে দেখবার এবং মুগ্ধ হবার জন্যে নয়, কিন্তু মানুষের ভালোবাসার উপরে এই আলো ফেলবার

জন্যে। ঠিক এই উজ্জ্বল ম্লান নিভৃত উদার সন্ধ্যার ঠিক মর্মস্থলে যদি আমরা দুজনে দাঁড়াতে পারি তা হলে আমরা যেন আপনাদের আরও বেশি বুঝতে পারি, আরও বেশি ভালোবাসি। কারণ, ভালোবাসা বোঝাতে গেলে সৌন্দর্যের ভাষা চাই এবং চারি দিকের নিস্তব্ধতা চাই। এমন আলোক, এমন বর্ণ, এমন ভাষা আমরা নিজের মধ্যে কোথায় পাব! এই বৃহৎ প্রকৃতি যখন তার একটা চরম মুহূর্তে আমাদের আচ্ছন্ন করে আমাদেরই অন্তরের কথা ব্যক্ত করে বলে তখন আমাদের আর-কোনো চেষ্টার আবশ্যক করে না—কেবল ভালোবাসবার পূর্ণ অবসর পাওয়া যায়, ভালোবাসা প্রকাশ করবার আবশ্যকটুকুও থাকে না। এ কথা হয়তো সকলে বুঝতে পারবে না। কিন্তু এ কথা নিশ্চয় সত্যি যে, ঐ আকাশ আমারই অসীম দৃষ্টির মতো এবং এই সমুদ্র আমারই ভালোবাসামুগ্ধ হৃদয়ের মতো—এই মুহূর্তে এই সমুদ্রে আমার আপনাকে ব্যক্ত করবার জন্যে একটি কথা বলবার আবশ্যক থাকত না। যদি এর অনুরূপ একটি কথা থাকত তা হলে সেইটি লিখে নিয়ে যেতুম, যে শুনত সে সমস্ত বুঝতে পারত। থাক্ গে—কবিত্ব থাক্। রাত্তিরে ডিনার-টেবিলে Inspector-General of Police-এর সঙ্গে লোকেনের তর্ক, আরও দুই-একজন যোগ দিয়েছিল।

রবিবার [৩১ অগস্ট]। সকালে Evans-এর সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের বিষয় এবং ব্রাহ্মবিবাহ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হল, তাতে সে কতকটা আশ্বাস দিলে—কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখলে অনেক ব্যাঘাত দেখা যায়। আজ সকালে এখানে উপাসনা হল। একটা মেয়ে ভারি বিরক্ত করেছিল—একে তো সে যোগ দেয় নি, তার পরে হো হো করে হাসছিল—এমন খারাপ লাগছিল! যখন উপাসকরা সবাই মিলে গান গাচ্ছিল আমার বেশ লাগছিল। এর মধ্যে সমস্ত মানবের কণ্ঠধ্বনি শোনা যায়, চির-অজ্ঞাত চিররহস্যের দিকে ক্ষুদ্র মানবহৃদয়ের কী-একটা বিশ্বাসের গান উঠছে! আশ্চর্য! ঐ মেয়েটা মাঝে মাঝে যখন সেই গানে যোগ দিচ্ছিল তখন আমার নিতান্ত blasphemous বলে ঠেকছিল, তার অট্টহাস্যও তত খারাপ ঠেকে নি। বিশ্বাস না থাকলে কি হৃদয়ও থাকতে নেই? আজ breakfast-এর সময় একটা খবরের সৃষ্টি করা গেল। রুটি কাটতে গিয়ে ছুরিটা ছিটকে সবলে আমার দুটো আঙুলের উপর পড়ল, রক্ত ছিটকে উঠে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল—খানিকটা বরফ দিয়ে ন্যাপ্‌কিনে আঙুল জড়িয়ে ক্যাবিনে ছুট। গা বমি করতে লাগল। অনেকক্ষণ বাদে ডাক্তারের ঘরে গেলুম, সে আমার হাত বেঁধে দিলে—দিতে দিতে মাথা ঘুরে এল, অন্ধকার দেখতে লাগলুম, কানে শুনতে পেলুম না—এমনি লজ্জা করতে লাগল! অনর্থক অনেক রক্তব্যয় করেছি—না দেশের জন্যে, না ধর্মের জন্যে, না স্বার্থের জন্যে। সমস্ত দিন কিছু-না-কিছু লিখেছি। আমরা এদের সকলকে দূরে পরিহার করে যেরকম একটা কোণ ঘেঁষে আছি তাতে বেশ বোঝা যায় এরা একটু piqued হয়, আমার সেটা মন্দ লাগে না। ভাবে এরা কজন বিদ্রোহী নব্যবঙ্গবাসী।

এমন মধুর ক'রে তুমি ভাবিতে পার না মোরে—
এমন স্বপন এমন বেদন এমন সুখের ঘোরে।
এমন বাতাস জলের বিলাস এমন আকাশ-মাঝে,
শুনিতে পাও না কেমন করিয়া উদাস বাঁশরী বাজে!
এমন অলস বেলা, অলস মেঘের মেলা,
সারাদিন ধরে জলেতে আলোতে এমন অলস খেলা!
জীবনতরণী ভাসিয়া চলেছে মরণ-অকূল-বাগে,
দিবসে নিশীথে সুদূর হইতে তোমার বাতাস লাগে।
এমনি করিয়া ধীরে মিশাব সুদূর নীরে,
যেমন করিয়া সন্ধ্যানীরদ মিশায় নিশীথতীরে।
তখন বারেক চাহিয়া দেখিয়ো করুণ নয়ন তুলি—
বিদায়ের পথ আঁধারে ঢাকিবে, তার পরে যেয়ো ভুলি।

সন্ধ্যা আসিবে যবে তোমার মধুর ভবে
দিবসের শেষে শ্রান্ত হইবে জীবনের কলরবে—
তখন বারেক আসিয়ো আবার দাঁড়াইয়ো ওইখানে,
ক্ষণেকের তরে চেয়ে দেখো ওই অস্ত-অচল-পানে
যেখানেতে শেষ দেখা রাখিয়া গিয়াছে রেখা
জ্যোতির্ময় এক অমর অশ্রু তারা-আলোকেতে লেখা—
বাকি আর-সব স্তব্ধ নীরব তিমিরনিরাশ নিশি,
অজানা অপার অকূল আঁধার প্রসারিয়া দশদিশি।
cancelled ...

সোমবার [১ সেপ্টেম্বর]। সকালবেলাটা শরীর ভালো ছিল না, চুপচাপ কাটিয়ে দিয়েছি। দুই-একজন লোক আপনি আলাপ করে গেল। এরা কাল থেকে জানতে পেরেছে আমরা Tagores, তাই কাল থেকে কাছাকাছি ঘুর্ঘুর্ করছে। [কাল] একটা কবিতা লেখবার চেষ্টা করা গেছে, সেটাতে মনের ভাব ভালো ব্যক্ত হয় নি। বদলাতে হবে। টিফিনের পর সেলুনে বসে বাবিকে চিঠি লিখতে বসেছি— তরঙ্গ উঠে আমাকে এবং আমার চিঠিগুলোকে ভিজিয়ে দিলে, তাতে দুই-একজন এসে আহা-উহু করে গেল। সন্ধের পর আহারান্তে চুপচাপ করে ডেকের উপর জমিয়েছি, লোকেন একটা চৌকির উপরে অগাধ নিদ্রামগ্ন, মেজদাদা চুরট টানছেন— এমন সময়ে নীচেকার ডেকে নাচের বাজনা বেজে উঠল— সকলে মিলে নাচের ধুম পড়ে গেল। মহা-ঘুরপাক মহা-উত্তেজনা চলছে— তখন পূর্ব দিকে নবকৃষ্ণপক্ষের ঈষৎ ভাঙা চাঁদ ধীরে ধীরে উঠতে আরম্ভ করেছে— এই তীররেখা-শূন্য জলময় মহামরুর পূর্বসীমান্তে চাঁদের পাণ্ডুর আলোক পড়ে সে দিকটা ভারি একটা অসীম ঔদাস্য এবং নৈরাশ্যের ভাবে পূর্ণ দেখাচ্ছিল। চাঁদের উদয়পথের নীচে থেকে আমাদের জাহাজ পর্যন্ত একটা প্রশস্ত দীর্ঘ আলোকপথ ঝিক্‌ঝিক্ করছে— এই বিজন সমুদ্রের মাঝখানে প্রকৃতি চুপিচুপি আপন প্রশান্ত সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। সমস্তই ধীরে নীরবে সুন্দর হয়ে উঠছে, রাত্রির সুমধুর শান্তি একটি রজনীগন্ধা-কুঁড়ির শুভ্র পাপড়ির মতো অলক্ষিত নিঃশব্দে ক্রমশ প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে— আর মানুষগুলো পরস্পরকে জড়াজড়ি করে ধরে পাগলের মতো ঘুরপাক খাচ্ছে— ভারি আমোদ করছে— সর্বাঙ্গের রক্ত গরম হয়ে মাথায় ফেনিয়ে উঠছে, বিশ্বসংসার সমস্ত ঘুরছে, হাঁপাচ্ছে, তপ্ত হয়ে উঠছে— আশ্চর্য কাণ্ড! লোকলোকান্তরের নক্ষত্র স্থিরভাবে চেয়ে রয়েছে এবং দূরদূরান্তরের তরঙ্গ ম্লান চন্দ্রালোকে অনন্তকালের চিরপুরাতন গাথা সমস্বরে গান করছে— এই রজনীতে এই আকাশের নীচে এবং এই সমুদ্রের উপরে কতকগুলি পরিচিত-অপরিচিত লোক জুড়ি-জুড়ি জড়াজড়ি করে লাঠিমের মতো বোঁ বোঁ করে ঘুর খাওয়াকে খুব সুখ মনে করছে— একটু লজ্জা নেই, সংযম নেই, চিন্তা নেই, পরস্পরের মধ্যে একটা শোভন অন্তরাল নেই। আমি এটা কিছুতেই ভালো বুঝতে পারি নে। যাক গে, মরুক গে, যাদের ঘুরুনি পায় ঘুরুক গে— আমার যা আছে তাই আমার থাক্। আমার এই চন্দ্রলোককে নিয়ে কোনো ইংরেজের ছেলে polka নাচতে পারবে না। কিন্তু বাস্তবিক ভয় হয়, পাছে সর্বজয়ী ইংরেজ-তনয় আমার জীবনের কোনো-একটি অচল শান্তিসুখকে টেনে নিয়ে এমনি করে polka নাচায়।

মঙ্গলবার [২ সেপ্টেম্বর]। সকালে ডেকে বেড়াবার সময় Evans-এর সঙ্গে আমার বেশ দীর্ঘ আলাপ হয়, বেশ লাগে। আজ সকালে দেখলুম সে একটা নিতান্ত বেচারা ইংরেজ-বাচ্ছার কাছে modern thoughts and modern science-এর কথা পেড়েছে, সে ব্যক্তি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত উদ্‌বিগ্ন হয়ে খানিকটা ইতস্তত করে দে-ছুট দিলে। Evans হতাশ্বাস হয়ে চৌকিতে বসে পড়ল। আমি তার কাছে একটা কথা পাড়লুম। আমি বললুম আমি Ibsen-এর নাটক

পড়ছিলুম, তাতে একটা এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখলুম—যত-সব স্ত্রীলোকেরাই সমাজবিপ্লবের জন্যে ব্যাকুল এবং পুরুষেরাই সমাজের প্রাচীন সংস্কারসকলের উপর আকৃষ্ট হয়ে আছে। বরাবর জানি মেয়েরাই সমাজের বন্ধন। আমার বোধ হয় বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতা এমন আকার ধারণ করেছে যাতে স্ত্রীলোকেরা বিশেষ অসুখী হয়ে আছে। জীবিকাসংগ্রাম এতদূর প্রবল হয়েছে যে, সমস্ত শক্তি তাতেই প্রয়োগ করতে হচ্ছে, গৃহের জন্যে অতি অল্প অবশিষ্ট থাকে—লোকেরা চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে, পুরুষেরা বিয়ে করতে চাচ্ছে না—এরকম স্থলে স্ত্রীলোকের অবস্থা সেই অনুসারে পরিবর্তিত না হলে তারা সুখী হতে পারে না। এইজন্যে য়ুরোপীয় মেয়েদের মধ্যে একটা বিপ্লবের ভাব দেখা দিয়েছে। নিহিলিস্ট্ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক মেয়ে আছে, তারা পুরুষের চেয়ে প্রচণ্ড। ক্রমে ভারতবর্ষের কথা উঠল। শিক্ষিত অশিক্ষিত দুই জাত। জনসংখ্যাবৃদ্ধিবশত বেহার প্রভৃতি অঞ্চলের ভবিষ্যৎ-আশঙ্কা। কুলি-চালান নিয়ে বাংলা কাগজের পাগলামি। Elective Principle। আমি বললুম আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, তোমরা আমাদের অত্যন্ত নির্দয়ভাবে অবজ্ঞা কর, তোমরা আমাদের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার কর না বলেই আজকাল এই-সব গোলমাল উঠেছে—আমরা যদি তোমাদের কাছ থেকে ভদ্রতা, কথঞ্চিৎ সম্মান ও সদয় ব্যবহার পেতুম তা হলে আমরা বেশ সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করতুম—But the very small courtesy with which you nationally treat us hurts our selfrespect and we try to make up for it by striving to get a larger share in the administration, and by making ourselves thoroughly obnoxious to you। আমি বললুম, অ্যাংলোইন্ডীয় সমাজে তোমরা সচরাচর এমনভাবে আমাদের সম্বন্ধে কথাবার্তা কও যে, আমাদের প্রতি রূঢ় হওয়া তোমাদের স্বাভাবিক ও অভ্যস্ত হয়ে যায়। Evans এ কথা খুব মেনে নিলে। সে বললে, এখন যে-সব সিভিলিয়ান আসে তাদের অধিকাংশের কোনো বংশমর্যাদা নেই, তারা ভদ্রতা কাকে বলে একেবারে জানে না ইত্যাদি। আজ সমস্ত দিন প্রায় চিঠি লিখতে গেল।

বুধবার [৩ সেপ্টেম্বর]। আবার Evans-এর সঙ্গে পূর্বোক্ত বিষয়ে কথাবার্তা। Lord Ripon-এর policy-র নিন্দা, Lord Dufferin-এর প্রশংসা, ডফারিন সম্বন্ধে আমাদের পেট্রিয়টদের ব্যবহার নিতান্ত নির্বোধ ও আত্মঘাতী। দশটার সময় সুয়েজ খালের মুখে এসে জাহাজ থামল। চমৎকার রঙের খেলা—কতরকম নীল এবং কতরকম হলদে—পাহাড়ের উপর রৌদ্রছায়া এবং নীলবাষ্প, বালির তীররেখা ঘন হলদে, ঘন নীল সমুদ্রের ধারে চমৎকার দেখাচ্ছে। খালের মধ্যে দিয়ে সমস্ত দিন জাহাজ অতি ধীর গতিতে চলছে, দু ধারে তরুহীন বালি—কেবল মাঝে মাঝে এক-একটি ছোটো ছোটো কোটা বহুযত্নবর্ধিত গাছপালায় বেষ্টিত হয়ে বড়ো আরামজনক দেখাচ্ছে। আজও সমস্ত দিন চিঠি লেখা। অনেক রাত্তিরে অর্ধচন্দ্র উঠল—চন্দ্রালোকে দুই তীর অস্পষ্ট, ধুধু করছে—কাল অনেক রাত জেগেছি—কেবল বাড়ির জন্যে প্রাণ টানে—আমার মতো গৃহপোষ্য জীব পাওয়া যায় না। রাত ২।৩টের সময় পোর্ট্ সৈয়েদে পৌঁছনো গেল—সেখানে কয়লা তোলার ধুম। বিশেষ দ্রষ্টব্য শহর নয়।

বৃহস্পতিবার [৪ সেপ্টেম্বর]। Mediterranean। এই আসলে য়ুরোপে পড়লুম। ঈষৎ ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। সমস্ত দিন Spectator প্রভৃতি কাগজ পড়েই কেটে গেল। Mediterranean চমৎকার নীল।

শুক্রবার [৫ সেপ্টেম্বর]। দিনটা লিখতে লিখতেই কেটে গেল। আজ আর ডেকে শোয়া হল না। ঠাণ্ডা পড়ে আসছে। ক্যাবিনে শয়ন। আজ জাহাজের ডেকে stage বেঁধে একটা entertainment হবে তার উদ্যোগ। Baldwin-এর দল অভিনয় করবে। প্রথমে amateurদের কাণ্ড, কারও বা পিয়ানো টিং টিং, কারও বা ক্ষীণ কণ্ঠে গান। তার পরে Mrs Baldwin প্রথমে পুরুষ masher সেজে তার পরে midshipman-এর বেশ ধরে বেশ comic গান গেয়েছিল এবং বেশ নেচেছিল। তার পরে ব্যালে নাচ, নিগ্রোর গান, জাদু, একটা ছোটো প্রহসন প্রভৃতি বহুবিধ

কাণ্ড হয়েছিল। মাঝে Sailors' Home-এর জন্যে চাঁদা-আদায়ও হল। সকলে খুব আমোদ পেয়েছিল। আজ বিকেলে Crete দ্বীপের তীরপর্বত দেখা দিয়েছিল।

শনিবার [৬ সেপ্টেম্বর]। আজ ব্রেক্‌ফাস্ট্‌ খেয়ে অবধি বাড়িতে চিঠি লিখছি। শুনলুম ইতিমধ্যে একটা জলস্তম্ভ দেখা দিয়েছিল। গ্রীসের তীর আমাদের দক্ষিণে দেখা দিয়েছে। লোকেনের টানাটানিতে একবার চিঠি রেখে উঠে গিয়ে দেখে এলুম। এই সেই গ্রীস!—লিখতে লিখতে এক সময়ে বাঁয়ে চেয়ে দেখি Ionian Islands দেখা দিয়েছে। পাহাড়ের মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো সাদা বাড়ি—আরও একটু এসে পাহাড়ের কোলের মধ্যে সমুদ্রের ধারে একটি বড়ো শহর, মানুষের শ্বেত মৌচাক—সন্ধান করে জানলুম দ্বীপের নাম Zanthe, শহরের নামও তাই। উপরে গিয়ে দেখি আমরা দুই শৈলশ্রেণীর মাঝখান দিয়ে সংকীর্ণ সমুদ্রপথে চলেছি—আকাশে মেঘ করে এসেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ঝড়ের সম্ভাবনা। আমাদের দোতালা ডেকের চাঁদোয়া খুলে ফেললে। পর্বতের উপর ঘন মেঘ নেবে এসেছে—কেবল দূরে একটা পাহাড়ের উপর মেঘছিদ্রমুক্ত অস্পষ্ট সন্ধ্যালোক পড়েছে, আর সবগুলো আসন্ন ঝটিকার ছায়ায় আচ্ছন্ন। হঠাৎ একটু প্রবল বাতাস এবং খুব বৃষ্টি আরম্ভ হল—তাতেই কেটে গেল আর ঝড় এল না। ভূমধ্যসাগরে আকাশের অবস্থা অনেক সময়ে অনিশ্চিত। আমরা যেখান দিয়ে এলুম এ জায়গা দিয়ে সচরাচর জাহাজ আসে না। জায়গাটা নাকি ভারি ঝোড়ো। রাত্তিরে ডিনারে Woodroff কাপ্তেনের Health-প্রস্তাব ও সকলে মিলে তার গুণগান করলে। আজ রাত্তিরে জিনিসপত্র বাঁধতে হবে, কাল ব্রিন্দিসি পৌঁছব।

রবিবার [৭ সেপ্টেম্বর]। সকালে ব্রিন্দিসি পৌঁছনো গেল। লাগেজ-তদারক এক বিষম ল্যাঠা। এক প্রকাণ্ড omnibus—দুটি রোগা ঘোড়া। লোকে ও মালে পরিপূর্ণ। আস্তে আস্তে চলল। রাস্তা পাথরে বাঁধানো। এক জায়গায় লোকে পরিপূর্ণ—আজ হাট—ব্যান্ড বাজছে—খুব যেন একটা-কিছু ধুমধামের ব্যাপার আছে। বিবিধ রকমের ফলের ঝুড়ি—সারি সারি জুতো সাজানো দেখলুম। স্টেশনে এসে লোকেন আমাদের চিঠিগুলো এবং তার মাশুল একজন লোকের হাতে দিলে—কিন্তু সে ব্যক্তি যে রীতিমত মাশুল লাগিয়ে পোস্ট করবে আমার বিশ্বাস হল না। অবশেষে একটা গাড়ি নিয়ে আবার বেরোলুম। ডাকঘরে চিঠি দিয়ে বাঁচলুম। জ্যোৎস্নাকে meet করবার জন্যে সতুকে একটা এবং তারকবাবুকে একটা পৌঁছসংবাদ টেলিগ্রাফ করা গেল। দুই-এক থোলো আঙুর পথ থেকে কিনে আবার স্টেশনে ফিরলুম। এখন তো পুল্‌মান গাড়িতে চড়েছি। একটা মস্ত গাড়ি—ডাইনে বাঁয়ে সারি-সারি কতকগুলো মক্‌মল-মোড়া জোড়া জোড়া মুখোমুখি ছোটো seats—মাথার উপরে শোবার বন্দোবস্ত লট্‌কানো, বোধ হয় রাত্তিরে টেনে দিয়ে বিছানা করে দেবে। গাড়িতেই খাবার সেলুন। একটা মাত্র নাবার ঘর আছে বোধ হয়—এত লোকে মিলে হাত মুখ ধোয়া নাওয়া নিয়ে বোধ হয় কিঞ্চিৎ গোল বাধবে। যা হোক, ট্রেনে চড়ে বসে বেশ নিশ্চিন্ত বোধ হচ্ছে। মেঘ করে টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টি হচ্ছে। আহার করে এলুম। প্রথমে দুই দিকে কেবল আঙুরের খেত। তার পরে olive-বাগান। বামে দূরে পর্বত, দক্ষিণে সমুদ্র, মধ্যে কেবল অলিভ-বন। বাঁকাচোরা, গ্রন্থি ও ফাটল-বিশিষ্ট, বলি-অঙ্কিত গাছ—পাতাগুলো যেন ঊর্ধ্বমুখ—খুব যত্নে যেন চাষ করা—আমাদের দেশের মতো জঙ্গল নয়—ফাঁক ফাঁক পোঁতা—পাহাড়ে জায়গা—চষা জমির মধ্যে পাথরের কুচি—এক-এক জায়গায় গাছতলায় ভেড়া চরছে। মাঝে মাঝে সমুদ্রের ধারে এক-একটি ছোটো শহর আসছে—চর্চচূড়া-মুকুটিত সাদা ধব্‌ধবে নগরটি সমুদ্রের নীল চিত্রপটের উপর চমৎকার দেখাচ্ছে। (ব্রিন্দিসিতে নাববার সময় Evans আমাকে দেখালে ইটালীয় পুলিসম্যানেরা সৈনিকবেশে তলোয়ার নিয়ে বেড়ায়। বললে, এর থেকে বোঝো এখানকার গবর্মেন্ট কিরকম; এদের অনেক রকমের institutions আছে, কিন্তু freedom নেই। আমরা সাড়ে-এগারোটার সময় ব্রিন্দিসি ছাড়ি।) এক-একটা অলিভ গাছ এমন বেঁকে ঝুঁকে পড়েছে যে পাথর উঁচু করে করে তাকে ঠেকো দিয়ে রাখতে হয়েছে। শীত তেমন বেশি নয়। আমাদের পৌষের চেয়ে

কম বোধ হয়, তবে শীত গ্রীষ্ম সম্বন্ধে তুলনা ভারি শক্ত। প্রায়ই একটা-না-একটি সমুদ্রতীরের শহর। ঐ সামনের শহরটা মস্ত মনে হচ্ছে।— দু ধারে কেবল ফলের বন এবং আঙুরের খেত— মাঝে মাঝে এক-একটা পাথরের বাড়ি। ছোটোখাটো শহর, সাদা সোজা রাস্তা। খেতগুলো পাথরের টুকরো উঁচু উঁচু করে বেড়া-দেওয়া। এখনো ডাইনে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে— বামের পর্বত গেছে। খেতের মাঝে মাঝে পাথর উঁচু করে গোলাঘরের মতো করে রেখেছে বোধ হল। মাঝে মাঝে কূপ, চক্রযন্ত্রে জল তোলে। থোলো থোলো বেগুনি আঙুর ফলে রয়েছে। সমুদ্র আর দেখতে পাচ্ছি নে, ডাইনে বাঁয়ে তরুহীন অপার সমতল চষা মাঠ। ডাইনে খুব দূরদিগন্তে পাহাড়ের নীল রেখা। অবিচ্ছিন্ন অলিভের বন আঙুরের খেত আর দেখছি নে— চষা মাটি, এক-এক জায়গায় ঘাস। দূরে দূরে মাঠের মধ্যে মধ্যে এক-একটা সাদা বাড়ি। আবার আঙুর এবং অলিভ— বামে ঈষদ্দূরে এক শহর। এক-এক জায়গায় ভুট্টার চাষ। সূর্যাস্তের সময় হয়ে এল, ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। দু ধারে চষা মাঠ, সমভূমি, শূন্য— দক্ষিণ বাম দিগন্তে দুই পর্বতশ্রেণী।

আমাদের দু ধারে জমি উঁচুনিচু তরঙ্গিত হয়ে এসেছে। দূরে একটা নীল হ্রদ দেখা যাচ্ছে, তার এক ধারে একটি ছোটো শহর। আমি বসে বসে যে আঙুর খাচ্ছি তার গন্ধ অনেকটা গোলাব-জামের মতো। আঙুরের থোলো কী চমৎকার দেখতে। রেলোয়ে স্টেশনে একটি ইতালীয়া যুবতীকে দেখে আমার মনে হল ইতালিয়ানীরা এখানকার আঙুরের মতো নিটোল সুগোল টস্‌টসে, যৌবনের রসে যেন পরিপূর্ণ এবং ঐ আঙুরেরই মতো তাদের মুখের রঙ— খুব বেশি সাদা নয়। একটি মেয়ে দেখলুম প্রায় আমাদেরই মতো কালো, কিন্তু দেখতে মিষ্টি, এখানকার বেগনি আঙুরের মতো। আবার সমুদ্র দেখা দিয়েছে— বোধ হয় যাকে হ্রদ মনে করেছিলুম তা হ্রদ নয়, সমুদ্রের একটা বাহু। তীরে বালির উপর অযত্নজাত গুল্ম উঠে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমাদের ঠিক নীচেই সমুদ্র— আমরা তার একটা উঁচু তটের উপর দিয়ে চলেছি। গোটা চার-পাঁচ পাল-মোড়া নৌকো ডাঙার উপর তোলা রয়েছে, ভাঙা জমি ঢালু হয়ে সমুদ্রে গিয়ে প্রবেশ করেছে— সে জমিটুকু চাষ-করা— দুটো ছেলে খেলা করছে। নীচেকার তীরপথ দিয়ে গাধার উপর চড়ে লোক চলেছে। এক-একটা গাধার উপর দুটো লোক। আমাদের বাঁ দিকে পাহাড়। সূর্য অস্ত গেছে। এখনো সমুদ্র-তীরে কতকগুলো গোরু চরছে; কী খাচ্ছে তারাই জানে, মাঝে মাঝে শুক্‌নো খড়কের মতো দেখা যাচ্ছে মাত্র— একটা বাছুর রেলগাড়ির সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। এখানকার সমুদ্র তেমন নীল দেখাচ্ছে না, মেটে রকমের। ঢেউগুলো ফেনিয়ে ফেনিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে।

রাত্রে টঙের উপর চড়ে তো বেশ নিদ্রা দেওয়া গেল। আজ সোমবার [৮ সেপ্টেম্বর]। সকালে উঠে দেখা গেল চার দিকে সুন্দর শ্যামল— পরিপাটি রকম চাষ-করা ভুট্টার খেত— প্রত্যেকের খেত বড়ো অলিভ গাছ দিয়ে ঘেরা, তাই পাশাপাশি দুই খেতের মাঝখানের ব্যবধানটুকু বেশ সুন্দর ছায়াপথের মতো দেখাচ্ছে। কোথাও তিলমাত্র জঙ্গল নেই। কাল যেরকম আঙুরের খেত দেখে-ছিলুম আজ সেরকম দেখছি নে। সে আঙুরগুলো ছোটো ছোটো গুল্মের মতো— আজ দেখছি লম্বা লম্বা এক-একটা কাঠি পোঁতা, তার উপরে আঙুর লতিয়ে উঠেছে। উঁচুনিচু জায়গা, ছোটো ছোটো ভুট্টার খেত, তার চার দিকে আঙুরের বেড়া— এবং এক-এক জায়গা কেবলই আঙুর। মাঝে মাঝে দুটো-একটা বাড়ি, এক-আধটা চার্চ, বেশ দেখাচ্ছে। পাহাড়ের উপর থেকে নীচে পর্যন্ত দ্রাক্ষাদণ্ডে কণ্টকিত হয়ে উঠেছে, তারই মাঝখানে একটি শহর। তুঁতের খেত। ছোটো ছোটো চতুষ্কোণ তৃণক্ষেত্র এবং তাকে বেষ্টন করে বেঁটে বেঁটে পল্লবিত তুঁত গাছের শ্রেণী। কোথাও ভুট্টাখেতে তুঁতের বেড়া। কোথাও তুঁত এবং দ্রাক্ষা এক সার বেঁধে চলেছে। আমরা অ্যাড্রিয়াটিক তীরপ্রদেশ ছাড়িয়ে এখন লম্বার্ডির মধ্য দিয়ে চলেছি। এখানে রেশম ভুট্টা এবং আঙুরের চাষ। রেলের লাইনের ধারে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের পাশে একটি কুটীর; এক হাতে তারই একটি দুয়ার ধরে এক হাত কোমরে দিয়ে একটি ইটালিয়ান যুবতী সকৌতুক কৃষ্ণনেত্রে আমাদের গাড়ির গতি নিরীক্ষণ করছে।

একটি ছোটো বালিকা একটা প্রখরশৃঙ্গ প্রশস্তস্কন্ধ প্রকাণ্ড গোরুর গলার দড়িটি ধরে চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে— কী বল, এবং তার কী বন্ধন! তার থেকে আমাদের বাংলাদেশের নবদম্পতি মনে পড়ল। মস্ত একটা গ্রাজুয়েট্‌পুঙ্গব এবং ছোট্ট একটি বারো-তেরো বৎসরের নববধূ— দিব্যি পোষ মেনে চরে বেড়াচ্ছে এবং মাঝে মাঝে ড্যাবাড্যাবা নেত্রে তার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করছে। ট্যুরিন স্টেশনে আসা গেছে। এ দেশে পুলিসম্যানের আচ্ছা সাজ যা হোক! মস্ত-চূড়া-ওয়ালা টুপি, অনেক জরিজরাও, মস্ত তলোয়ার— খুব একটা সেনাপতির মতো। আমাদের দেশে এ রকম পাহারাওয়ালা থাকলে তাদের চেহারা দেখে আমরা ডরিয়ে ডরিয়ে আরও কাহিল হয়ে যেতুম। চোরে যত চুরি করে এদের কাপড়চোপড়ে তার চেয়ে ঢের বেশি যায়।— আমাদের বাঁয়ের পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরে একটু-একটু বরফের শ্বেত চিহ্ন পড়েছে। বেশ ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে, কিন্তু কিছুমাত্র শীত করছে না। (কাল রাত্তিরে আমরা যখন ডিনার খাচ্ছিলুম, এক দল লোক প্ল্যাট্‌ফর্মে দাঁড়িয়ে বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে আমাদের দেখছিল। তার মধ্যে দুটি-একটি বেড়ে সুন্দর মেয়ের মুখ দেখা যাচ্ছিল— তাতে করে ভোজনপাত্র থেকে আমাদের চিত্ত অনেকটা বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল। ট্রেন ছাড়বার সময় আমাদের সহযাত্রী পুরুষগণ তাদের প্রতি অনেক টুপি ও রুমাল-আন্দোলন, অনেক চুম্বনসংকেত-প্রেরণ, অনেক তারস্বরে উল্লাসধ্বনি-প্রয়োগ করলে; তারাও গ্রীবা-আন্দোলনে আমাদের অভিবাদন করতে লাগল।) আমাদের দক্ষিণে বামে তুষাররেখাঙ্কিত সুনীল পর্বতশ্রেণী। বামে অরণ্য এবং ডাইনে পাহাড়ের তলদেশে শহর ও শস্যক্ষেত্র। কী ঘন ছায়াস্নিগ্ধ অরণ্য! যেখানে অরণ্যের বিচ্ছেদ সেইখান থেকে অমনি একটা দৃশ্য খুলে যাচ্ছে— শস্যক্ষেত্র তরুশ্রেণী ও পর্বত। একটা পর্বতশৃঙ্গের উপরে একটা পুরোনো দুর্গ দেখা যাচ্ছে। এবং তলদেশে একটি ছোটো গ্রাম। যত এগোচ্ছি অরণ্যপর্বত খুব ঘন হয়ে আসছে। গাড়িতে আলো দিয়ে গেল। এইবার বোধ হয় পর্বতভেদী মন্ট্‌সেনিস গহ্বর আসবে। আজ রীতিমত পর্বতের জায়গায় এসে পড়েছি। এই অরণ্যপর্বতের মাঝে মাঝে যে গ্রামগুলি আসছে সেগুলো তেমন উদ্ধত শুভ্র পরিপাটি নয়— একটু যেন ম্লান, দরিদ্র, নিভৃত। একটি-আধটি চর্চের চূড়া আছে মাত্র, কিন্তু কারখানার ঊর্ধ্বমুখী ধূমোদ্গারী বৃংহিতশুণ্ড নেই। আর-একটা ভাঙা দুর্গ। সাদা উপলপথের মধ্যে দিয়ে একটি ছোটো অগভীর নদীস্রোত চলেছে। ক্রমে একটু একটু করে পাহাড়ের উপর ওঠা যাচ্ছে। সাপের মতো পর্বতপথ এঁকে বেঁকে চলেছে। চষা খেত ঢালু পাহাড়ের উপর সোপানের মতো থাকে থাকে উঠেছে। পর্বতস্রোত স্বচ্ছ সলিলরাশি নিয়ে সংকীর্ণ উপলপথ দিয়ে ঝরে পড়ছে। মাঝে মাঝে প্রায়ই একটা একটা রেলোয়ে গহ্বরে এসে প্রাণ হাঁপিয়ে দিচ্ছে। মন্ট্‌সেনিস টানেল এখনই আসবে— বোধ হয় দম আটকে মরব। দু ধারে fir গাছ দেখা দিয়েছে। আমাদের ডান পাশে বালি ও পাথরের সাদা প্রশস্ত জলপথ। তারই এক ধার দিয়ে জল নেবে আসছে— তার পরপারে দীর্ঘ fir গাছের অরণ্য, তারই পর থেকে পর্বত উঠেছে। এইবার টানেলে ঢুকছি। ১ বাজতে ১৮ মিনিট। ১ বেজে দশ মিনিটে বেরোলুম। ফ্রান্স। দক্ষিণে এক জলস্রোত ফেনিয়ে ফেনিয়ে চলেছে। ফরাসী জাতির মতো দ্রুত, চটুল, চঞ্চল, উচ্ছ্বসিত, হাস্যপ্রিয়, কলভাষী— কিন্তু তাদের চেয়ে অনেক বিমল এবং শিশুস্বভাব। মাশুল নিয়ে বেশি উপদ্রব করলে না। একবার একজন এসে আমাদের জিজ্ঞাসা করে গেল মাশুল দেবার মতো কিছু আছে কি না। আমরা তামাকের কৌটো দেখালুম, সে চলে গেল। ইটালিয়ান ডাকাতরা এইটুকু তামাকের জন্যে ৫ শিলিং এবং দুটো বাক্স ব্রেকে নিয়ে ৩১ ফ্রাঙ্ক্‌ নিয়েছে। এ জাতের মধ্যে যে ডাকাতের সংখ্যা বেশি হবে তার আর আশ্চর্য কী! সেই স্রোতটা এখনো আমাদের পাশ দিয়ে ছুটেছে— তার দক্ষিণেই fir-অরণ্য নিয়ে পাহাড় উঠেছে— বেঁকে-চুরে, ফেনিয়ে-ফুলে, নেচে, পাথরগুলোকে ঠেলে, রেলগাড়ির সঙ্গে race দিয়েছে। এক জায়গায় খুব সংকীর্ণ হয়ে এসেছে— তার দু ধারে সারি সারি সরল দীর্ঘ গাছ উঠেছে, মাথায় মাথায় ঠেকাঠেকি করে আছে। মাঝে মাঝে লোহার সাঁকো। উপর থেকে ঝর্‌না নেবে তার সঙ্গে মিশছে। ডান দিকে পাহাড়ের উপর দিয়ে একটা পার্বত্যপথ স্রোতের পাশ দিয়ে সমরেখায় এঁকে বেঁকে চলেছে। এতক্ষণ

পরে আমাদের নির্ঝরিণী সহচরীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হল। সে আমাদের বাঁ দিক দিয়ে কোন্-এক অজ্ঞাত সংকীর্ণ শৈলপথ দিয়ে অন্তর্হিত হল। শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন পর্বতের মধ্যে এক-একটা পাহাড় তৃণহীন রেখাঙ্কিত পাষাণচূড়া প্রকাশ করে নগ্নভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কেবল মাঝে মাঝে এক-এক জায়গা খানিকটা করে fir-অরণ্যের শ্যামল আবরণ রয়েছে। ঠিক মনে হচ্ছে, যেন একটা দৈত্য তার সহস্র নখ দিয়ে ওর শ্যামল ত্বক্ ছিঁড়ে নিয়েছে এবং সহস্র বিদারণরেখা রেখে দিয়ে গেছে। আবার হঠাৎ ডান দিকে আমাদের সেই পূর্বসঙ্গিনী মুহূর্তের জন্যে দেখা দিয়ে বাঁ দিকে চলে গেল। একবার দক্ষিণে একবার বামে একবার অন্তরালে—যেন ফরাসী ললনার মতো কৌতুকপ্রিয়া, বিবিধ বিলাসচাতুরী জানে। ঐ দু-তিন শাখায় বিভক্ত হয়ে সুদূর দক্ষিণে চলে গেল। আবার পর্বতের এক জায়গায় মোড় ফিরে ওর সঙ্গে দেখা হবে কি না কে জানে। সেই প্রত্যাশায় রইলুম।—ফ্রান্সের গাড়ি ইটালির চেয়ে অনেক বেগে চলে—আমার লেখা দায় হয়ে এসেছে। বহুকষ্টে লিখতে হচ্ছে।

আবার সে বাঁয়ে এসেছে। দক্ষিণে পর্বতগুলো একেবারে হঠাৎ উঁচু হয়ে উঠেছে। বিচিত্র শস্যক্ষেত্র। মাঝে মাঝে ক্ষেতের মধ্যে খড়ের গাদা, পাহাড়ের গায়ে বিরলসন্নিবিষ্ট বাড়ি। স্রোত এখনো বাঁ দিকে চলেছে। সেই অলিভ এবং দ্রাক্ষাকুঞ্জ অনেক কমে গেছে। বিচিত্র শস্যক্ষেত্র এবং সুদীর্ঘ poplar-শ্রেণী। ভুট্টা, তামাক, নানা শাক-সবজি। মনে হয় কেবলই বাগানের শ্রেণী। এই কঠিন পর্বতের মধ্যে মানুষ বহুদিন থেকে বহু যত্নে প্রকৃতিকে বশ করে তার উচ্ছৃঙ্খলতা হরণ করেছে। প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের উপরে মানুষের কত যত্ন ও ভালোবাসা প্রকাশ পাচ্ছে। প্রকৃতিও তার প্রচুর প্রতিদান দিচ্ছে। এখানকার লোকেরা যে আপনার দেশকে ভালোবাসবে তার আর কিছু আশ্চর্য নেই। কত যত্নে আপনার দেশকে তারা আপনার করছে, একটি বিঘাও যেন অনাদরে ফেলে রাখে নি। আপন বাসস্থানকে কানন করে তুলেছে। এর জন্যে যদি প্রাণ না দেবে তো কিসের জন্যে দেবে! আমাদের দেশ অযত্নে অনাদরে পড়ে আছে—কোথাও জঙ্গল হচ্ছে, কোথাও পাষাণস্তূপে কঠিন হয়ে আছে, কত ধনরত্ন গুপ্ত পড়ে রয়েছে। আমাদের কাছে আমাদের দেশের কোনো মূল্য নেই।—চমৎকার ব্যাপার! এ কেবলই বাগান। পর্বতের মধ্যে, নদীর ধারে, হ্রদের তীরে পপলার-উইলো-বেষ্টিত বাগান—সমস্ত ছবির মতো। এইমাত্র বামে পর্বতের পদতলে এক হ্রদ দেখা গেল। বিস্তীর্ণ, চলেছে। প্রকৃতি এবং মানুষে মিলে কেবল সাজাচ্ছে এবং উৎপন্ন করছে।—সেই হ্রদ চলেছে। দশ মাইল আয়ত। কিন্তু আর কী লিখব! কত অরণ্য, কত পর্বত, কত নদী, কত শহর।

আমাদের প্যারিসে নাববার কথা হচ্ছে। কিন্তু প্যারিসে আমাদের ট্রেন যায় না, একটু পাশ দিয়ে চলে যায়। যে স্টেশন দিয়ে প্যারিসে যায় সেইখানে একটা স্পেশ্যাল ট্রেন রাখবার জন্যে টেলিগ্রাফ করা হয়েছে। একবার শোনা যাচ্ছে রাত এগারোটার সময় ট্রেন বদলাতে হবে, একবার শুনছি একটা, একবার দুটো, একবার সাড়ে-তিন, একবার সাড়ে-চারটে। কাপড়-চোপড় পরেই শুয়ে রইলুম। রাত দুটোর সময় জাগিয়ে দিলে। জিনিস-পত্র বেঁধে উঠে পড়লুম। বিষম ঠাণ্ডা। দূরে একটা প্ল্যাট্‌ফর্মে একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে—কেবল একটি এঞ্জিন, একটি ফার্স্টক্লাস, এবং একটি ব্রেক-ভ্যান—আমরা তিনটি ভারতবর্ষীয় চললুম। রাত তিনটের সময় শূন্য প্ল্যাট্‌ফর্মে পোঁছনো গেল—সুপ্তোত্থিত দুটো-একটা মশিয়ো আলো নিয়ে উপস্থিত। অনেক হাঙ্গাম করে কাস্টম হৌস এড়িয়ে গাড়িতে উঠলুম। তখন প্যারিস দ্বার রুদ্ধ করে সহস্র দীপশ্রেণী জ্বালিয়ে দিয়ে নিদ্রিত। আমরা Hotel Terminus-এ হাজির হলুম। Lift-এ করে চতুর্থ তলায় শয়নকক্ষে প্রবেশ করা গেল। পরিপাটি পরিচ্ছন্ন বিদ্যুদ্দীপ্ত কার্পেটাবৃত দর্পণশোভিত নীলবর্ণ-যবনিকা-খচিত চিত্রিতভিত্তি নিভৃত কক্ষ, বিহঙ্গপক্ষসুকোমল শয্যা। জিনিস-পত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি, একটি পরের overcoat নিয়ে এসেছি। চিন্তা করে দেখা গেল সম্ভবত যার কম্বল আমি রাত্তিরে নিয়েছিলুম তারই overcoat—সে বেচারা বৃদ্ধ, শীতপীড়িত, বাতে পঙ্গু অ্যাংলোইন্ডীয় পুলিস-অধ্যক্ষ; পুলিসের কাজ করে যদি তার পৃথিবীর উপরে অবিশ্বাস জন্মে থাকে তা হলে আজ

প্রাতঃকালে উঠে আমাদের চরিত্র সম্বন্ধে তার বড়ো ভালো opinion হবে না। সে এতক্ষণে কত swear কত curse করছে।

মঙ্গলবার [৯ সেপ্টেম্বর]। লোকেনের পোর্ট্‌ম্যান্টো পাওয়া যাচ্ছে না। ভারি গোল বাধিয়ে দিয়েছে। আমার বিশ্বাস সেটা রেলগাড়ির বেঞ্চির নীচে রয়ে গেছে। সকালে আমরা তিন মূর্তি পদব্রজে বেরোলুম। প্যারিসের কী বর্ণনা করব! প্রকাণ্ড কাণ্ড। রাস্তা বাড়ি গাড়ি ঘোড়া দোকান বাগান প্রাসাদ প্রস্তরমূর্তি ফোয়ারা ইত্যাদি। অনেক ঘুরে ঘুরে এক বইয়ের দোকানে গেলুম। সেখানে গোটাকতক বই কিনে এক খাবারের জায়গায় যাওয়া গেল— সুসজ্জিত চিত্রিত স্বর্ণপত্রমণ্ডিত স্ফটিকখচিত প্রকাণ্ড ঘরের একটি প্রান্তটেবিলে আহারাদি করে এক গাড়ি নিয়ে ইফেল টাউয়ার দেখতে বেরোলুম। এক মস্ত দৈত্য তার সহস্র লৌহকঙ্কাল নিয়ে আকাশে মাথা তুলে চার পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। Lift-এ করে প্রথমে আমাদের এক তলায় চড়িয়ে দিলে— চতুর্দিকে প্যারিস উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। ক্রমে আমরা চতুর্থ তলায় উঠলুম, সমস্ত বিরাট প্যারিসের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলুম— আশ্চর্য ব্যাপার। টাউয়ারে চড়ে বাবি সল্লি আর ছোটোবউকে তিনটে পোস্ট-কার্ড্‌ পাঠিয়ে দিলুম। সন্ধের সময় hippodrome দেখতে গেলুম। তখন আরম্ভ হয়ে গেছে। বাদ্য বাজছে। প্রকাণ্ড জায়গা। চার দিকে গ্যালারি উঠেছে। রোমান নাট্যশালার মতো মনে হয়। লোক গিস্‌গিস্‌ করছে। নিদেন দশ হাজার লোক হয়েছিল— তবু এখন season নয়। দুটো মেয়ে tight পরে bar-এর উপর যে কাণ্ড করলে সে আশ্চর্য। তার পরে Jeanne d'arc বলে একটা pantomime হল। প্রথমে একটা গ্রামের দৃশ্য করেছিল, সেটা বেড়ে লেগেছিল— তার পরে বিদেশী সৈন্য লুটপাট করতে এল, তার পরে Jeanne দৈববাণী শুনলে, সব-শেষে তার চিতাশয্যা। তার পরে সমস্ত ফ্রান্সের সৈন্য এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মূর্তি-স্বরূপ মেয়েরা ত্রিবর্ণ ফ্ল্যাগ হাতে ঘোড়ায় চড়ে একটা মহাসমারোহ করে দাঁড়াল। আগাগোড়া সমস্ত বাজনা এবং গান চলছে। বেশ বুঝতে পারছিলুম ফরাসী দর্শকদের মনটা কিরকম হচ্ছিল।

বুধবার। লন্ডন-অভিমুখে চললুম। Charing Cross-এ পৌঁছে দেখি Mrs. Palit ও লিল অপেক্ষা করছেন। জিনিস-পত্র Custom House-এর মধ্য দিয়ে নিয়ে আসতে ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল। হোটেলে জায়গা নেই। Mrs. Mull-এর ওখানে Mrs. Palit থাকেন, সেইখানে এসে আড্ডা করা গেল। সুবিধেমত জায়গা নয়। Miss Mull-কে দেখা গেল। এই সেই বিখ্যাত Miss Mull! সন্ধের সময় লোকেন তার এক বন্ধুর বাড়ি নিয়ে গেল। বিপদ!

বৃহস্পতিবার। সকালে বেরোনো গেল— এক hansom-এ চড়ে প্রথমে সতুকে খুঁজতে বেরোলুম। তাদের বাড়ি গিয়ে শুনলুম তারা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। কেউ তাদের ঠিকানা জানে না। তার পরে Miss Sharpe-এর ওখানে গিয়ে শোনা গেল— তিনি engaged, visitors receive করবেন না। আমরা ম্লানমুখে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম, তার পরে সৌভাগ্যক্রমে আবার ডাক পড়ল। ঢুকে দেখি Miss Sharpe নিতান্ত বৃদ্ধা হয়ে গেছে। Engagement কিছুই বিশেষ নেই, একটি পীড়িত কুক্কুরশাবকের সেবা করছেন। জলবায়ু, স্বাস্থ্য, কালের পরিবর্তন প্রভৃতি সম্বন্ধে দু-চারটে কথা কয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। আমার প্রাচীন বন্ধু Scott-এর বাড়ি গিয়ে শুনলুম তারা সেখানে নেই, তারা New Maldin-এ গেছে। সেখেনে Gower Street Station-এ এক পাতাল-বাষ্পযান নিয়ে বাসায় ফেরবার চেষ্টা করা গেল— কিন্তু যা চেষ্টা করা যায় তা সব সময়ে সফল হয় না। Hammersmith স্টেশনে পৌঁছে চৈতন্য হল যে ক্রমেই গম্যস্থান থেকে দূরে যাচ্ছি। একজনকে জিজ্ঞাসা করা গেল; সে বললে, ভুল গাড়িতে উঠেছ, আবার ফিরে যেতে হবে। আবার ফিরলুম। অনেক হাঙ্গাম করে সাড়ে-তিনটের সময় বাড়ি পৌঁছলুম। তখন এখানকার আহারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আবার আমাদের জন্যে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে একটু-আধটু এনে দিলে। খেয়ে-দেয়ে আর-এক চোট রাস্তায় বেড়িয়ে আসা গেল। ডিনারের পর Miss Mull-এর সহযোগে খানিকটা গানবাজনা হল। Miss Mull মন্দ গায় না।

শুক্রবার। চিঠি লেখবার দিন। চিঠি লিখতে বসলুম। লোকেন ভারি উৎপাত বাধিয়ে দিলে। জোর করে চিঠি সংক্ষেপ করে দিয়ে বের করে নিয়ে গেল। 'bus-এ চড়ে প্রথমে Grindlay আফিসে যাওয়া গেল। সেখান থেকে মেজদাদা এক dentist-এর দোকানে দাঁত বাঁধাবার বন্দোবস্ত করতে গেলেন। সেখান থেকে এক প্রকাণ্ড জাঁকালো আহারস্থলে গিয়ে খাওয়া গেল। তার পরে National Gallery-তে ছবি দেখতে গেলুম। অনেক ছবি, অল্প সময় দেখে মনে বসে না। এক-একটা খুব ভালো লেগেছিল, কিন্তু সেগুলো হয়তো কোনো যথার্থ চিত্র-সমজদারের ভালো লাগে না—বোধ হয় অনেক বিখ্যাত ভালো ছবি আমার কিছুই ভালো লাগে নি। 'bus-এ চড়ে বাড়ি ফেরা গেল। Miss Mull আমার উপর কতকটা অভিমান প্রকাশ করলে। বললে—Mr. T, কেন তুমি সমস্ত দিন বাইরে কাটালে, ঘরে থাকলে আমরা বেশ গানবাজনা নিয়ে থাকতে পারতুম। আমি বললুম, বেশ, আজ সন্ধের সময় কোথাও বেরোব না। সে বললে, সন্ধের সময় বেশি সময় হাতে থাকে না। যা হোক, সন্ধের সময় আর-একবার গানবাজনা নিয়ে বসা গেল। Walter Mull বেশ piano বাজায়। Miss Mull-এ আমায় মিলে অনেকগুলো গান গেয়েছি। সে আমাকে নাচাবার চেষ্টায় ছিল, সেটা আমার পোষাল না। এরা আমার গলার অনেক তারিফ করছে। Mull বলছিল, আমি যদি গলার চর্চা করি তা হলে St. James Hall Concert-এ গাইতে পারি, আমার রীতিমত উচ্চ-শ্রেণীয় গলা আছে। তা আছে বোধ হয়।

শনিবার। আজ জ্যোৎস্না আসবে। কিন্তু কখন জাহাজ আসবে তার স্থিরতা নেই, তাই docks-এ যাওয়া হল না। তাকে সমস্ত directions দিয়ে এক মস্ত চিঠি লিখে দেওয়া গেছে।

বলতে বলতে জ্যোৎস্না উপস্থিত। খুব শক্ত, সমর্থ, সপ্রতিভ। নির্ভয়, নির্লজ্জ, নিরাপদ। যেখানে যা করা উচিত তা ঠিক করেছে। King Company-র উপর লাগেজের ভার দিয়ে special train নিয়ে Liverpool Street Station-এ পেঁছে underground রেলপথে ঠিক গাড়ি নিয়ে ঠিক জায়গায় পেঁছে এক hansom ভাড়া করে আমাদের বাড়ির দরজার কাছে এসে হাজির। এ ছেলের কোথাও হারাবার আশঙ্কা নেই। চুরি যাবার সম্ভাবনা নেই। আমাদের উপরে এর ভার দেওয়া নিতান্ত উপহাসের মতো দেখায়।—Coppe পড়া গেল।—একটা ভুলেছি—জ্যোৎস্না আসবার আগে আমরা সকলে মিলে গ্রুপ বেঁধে এক ছবি নিয়েছি। Mr. রাজনারায়ণ ছবি নিলেন। বিকেলের দিকে বেরিয়ে পড়া গেল। Holborn Restaurant-এ গিয়ে আহার। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সমস্ত শ্বেত প্রস্তরের—চার তলা, মস্ত প্রাঙ্গণ, ব্যান্ড বাজছে, নিদেন হাজার লোক খেতে বসে গেছে। সেখেন থেকে Oswaldদের ওখানে যাওয়া গেল। আমাদের ইংরিজি accent-এর অনেক তারিফ হল। সেখেন থেকে রাত্রি সাড়ে-এগারোটার সময় বাড়ি ফিরে দেখি তখনো Miss Mull জেগে। তার সঙ্গে একটু-আধটু গল্প হল। কথায় কথায় উঠল তার বোন নেই; সে বললে : I am glad of it. I hate having sisters, brothers are ever so much nicer। এ দেশে বোনে বোনে competition কিনা, উভয়ের মধ্যে বোধ হয় খিটিমিটি চলে। আমার বোধ হয় আমাদের দেশে যদি ভাইবোনদের বেশি দিন একসঙ্গে থাকবার সম্ভাবনা থাকত তা হলে দুই বোনের চেয়ে ভাইবোনের মধ্যে বেশি ভাব হত।

রবিবার। গান বাজনা। Miss M. একটুখানি flirt করেছিল : Don't you think of me Mr. T. when you sing 'Riez riez' &c.? I *did* laugh when I had my photo taken, didn't I?

তার Shelley-র কবিতা খুব ভালো লাগে ইত্যাদি। অনেক কবিতার কথা পাড়বার উদ্যোগ করেছিল, আমি তাতে বড়ো গা লাগালুম না। আমাকে পীড়াপীড়ি করছে তার confession book-এ লিখতে! তার মধ্যে দেখলুম একজন বাঙালি favourite poets-এর মধ্যে আমার নাম লিখেছে। আমার autograph বাংলা ও ইংরিজিতে লিখে নিয়েছে। সমস্তদিন প্রায় গানবাজনায় কেটেছে।

সোম। সল্লির জন্যে বেহালা কেনা গেল। ভয় হচ্ছে পাছে কাল আমার নামে বাড়ির চিঠি না আসে— তা হলে আমি এ দেশে টিঁকতে পারব না। আজ Savoy Theatre-এ *Gondoliers* দেখবার জন্য টিকিট কেনা গেল। সে চমৎকার কাণ্ড। স্বপ্নের মতো বোধ হল, এমন সুন্দর। এমন সুন্দর নাচ! মনে হল যেন আমার চার দিকে সৌন্দর্যের পুষ্পবৃষ্টি হয়ে গেল। Miss Oswald প্রভৃতি আর-এক দল আমাদের সঙ্গে ছিলেন। Supper খেয়ে রাত্তির একটার সময় ফেরা গেল।

মঙ্গল। আজ সকালে উঠে যখন কেবল একখানি ছোটবউয়ের চিঠি পাওয়া গেল তখন মনটা নিতান্ত দমে গেল। আর একদণ্ড এখানে টিঁকতে ইচ্ছে করছিল না। তার পরে যখন breakfast খেতে গেলুম তখন মেজদাদা বাবির একখানি খোলা চিঠি দিলেন। খোলা চিঠির চেয়ে লেফাফাবন্ধ চিঠি অনেক ভালো লাগে। Miss Mull-এর সঙ্গে আমাদের বেশ চলছে যা হোক। সে আমাকে Robin Adair বলে। কাল রাত্তিরে যখন আমি তাকে good night বললুম সে আপনার মনে মনে একটু আস্তে আস্তে বললে : Good night, good night Beloved! সে বলে রবিবারে church-এ যাওয়া সে sinful মনে করে— তার চেয়ে বাড়িতে থেকে কাজকর্ম করা ঢের উচিত, অধিকাংশ মেয়ে কেবল নতুন কাপড় দেখাতে যায় এবং যন্ত্রের মতো মন্ত্র আউড়ে আসে এবং মনে করে পরিত্রাণের পথ খোলসা হয়ে এল। জ্যোৎস্না এসরাজ বাজিয়েছিল। অনেকগুলো Chopin-র বাজনা হল। আমার বাবির বাজনা মনে পড়ে। আমার মনটা বড়ো খারাপ হয়ে আছে— কে জানে জীবনটা কেন ভারি শূন্য এবং নিষ্ফল মনে হচ্ছে। আসছে বৎসরে বাবিরা বিলেতে আসবে এই প্রস্তাবটা উত্তরোত্তর পাকা হয়ে আসছে।

বুধবার। দর্‌জির দোকানে গিয়ে দু সুট কাপড় হুকুম করে এলুম। ভয়ানক দাম। ফোটোগ্রাফের দোকানে গেলুম— বাবির একটা ছবি porcelain-এর উপর আঁকাবার ব্যবস্থা করা গেল, ৪ পাউন্ড ৪ শিলিং লাগবে। আমার একটা ছবি নেওয়া গেল। আজ মেঘ করে রয়েছে, সূর্যালোক নেই। কোথাও বেরোতে ইচ্ছে নেই। মেজদা বেরোবার প্রস্তাব করছেন। কী সুখে লন্ডনে আছি কে জানে। খুব খরচ হচ্ছে, বাড়ির জন্যে present কেনবার টাকা আর রইল না। মনে করছি কেবল সুরি-বাবির জন্যে কিছু নিয়ে যাব। ধার করতে হবে দেখছি।— 'Niagara Falls' দেখতে গিয়েছিলুম— চমৎকার কাণ্ড। রাত্তিরে গানবাজনা জমাচ্ছিলুম, এমন সময় এক প্রচণ্ড জ্যাঠা ছেলে এসে রাত এগারোটা পর্যন্ত বকাবকি করে গেল।

বৃহস্পতি। আজ সতুর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। অনেক রাস্তা ভুলে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে করতে Eastbourne সতুর ওখানে পৌঁছলুম। বেচারা একলা পড়েছে দেখে দুঃখু হল। সেখানে ডিনার খেয়ে রাত্তির সাড়ে দুপুরের সময় বাড়ি ফিরলুম। বাড়ির কাছাকাছি এসে অনেক ঘুরতে হয়েছিল।

শুক্রবার। সুরিকে চিঠি লিখে দিলুম। Confession album-এ লিখলুম। দর্‌জির দোকানে গেলুম। আজ Scott-এর ওখানে যাবার ইচ্ছে ছিল— লোকেন গেল না, তার অন্য স্ত্রীবন্ধুর সঙ্গে engagement আছে। Miss Mull গান শেখালে। তার সঙ্গে Kensington Park-এ বেড়াতে যাবার জন্যে অনুরোধ করেছিল, কিন্তু আমার ইচ্ছে হল না— তাই কিঞ্চিৎ অভিমান করেছে। একটুখানি একলা হবার জন্যে ভারি ইচ্ছে করছে। (এদের কাজকর্ম এদের আমোদ-প্রমোদের মধ্যে যখন ভালো করে চেয়ে দেখি তখন মানুষের ক্ষমতার অন্ত দেখা যায় না। এরাই রাজা বটে। এরা অল্পে সন্তুষ্ট হবার নয়; এদের সুবিধে করবার এবং এদের আমোদ দেবার জন্যে মানুষের চরম শক্তি অবিশ্রাম খেটে মরছে। এরা গান শুনবে তাই সহস্র যন্ত্রের সহস্র তাল আশ্চর্য সংগতি রক্ষা করে ধ্বনিত হচ্ছে। কোথাও তিলমাত্র অসম্পূর্ণতা নেই। অসীম যত্ন, অসীম অভ্যাস। নাট্যশালায় কী অদ্ভুত বিচিত্র ব্যাপার, কী আশ্চর্য সৌন্দর্যের মরীচিকা— কোনোখানে সামান্য ত্রুটি বা অশোভনতা নেই। দোকানে জিনিসপত্র কেবল সাজাতে ও সুন্দর করে রাখতে কত দুরূহ পরিশ্রম ও চেষ্টা করতে হয়েছে। জাহাজে যখন ছিলুম তখন ভাবতুম যে, এই জাহাজ চালানো কী বিপুল ব্যাপার!

আমরা তো ডেকের উপর বসে হাওয়া খাচ্ছি, সূর্যোদয় সূর্যাস্ত দেখছি, কিন্তু কতশত লোক দিনরাত্রি অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে কী অসহ্য পরিশ্রম করছে— এক তো অবিশ্রাম যন্ত্র চালনা করে দীর্ঘ পথকে সংক্ষিপ্ত করা সেই যথেষ্ট, তার উপরে আরাম এবং সুখের জন্যে কী তীব্র চেষ্টা! জাহাজ-যাত্রীর সেবার জন্যে শত শত ভৃত্য অবিরত নিযুক্ত— খাবার ঘর, music saloon সাদা পাথর দিয়ে মোড়া, সুন্দর করে সাজানো, শত শত বিদ্যুদ্দীপ জ্বলছে। চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের সীমা নেই। জাহাজ পরিষ্কার রাখবার জন্যে কত নিয়ম, কত বন্দোবস্ত! জাহাজে প্রত্যেক দড়িটুকু যথাস্থানে শোভনভাবে গুছিয়ে রাখবার জন্যে কত দৃষ্টি! আমাদের দেশের লোকের ধ্যানের অতীত— এরকম বিপুল-চেষ্টা-চালিত যন্ত্রকে আমাদের দেশের লোক failure মনে করত। কিন্তু ভেবে দেখলে এর একটা অন্ধকার দিক আছে— *Song of Shirt* পড়লে তা টের পাওয়া যায়। এই সুখসমৃদ্ধির অন্তরালে কী অসহ্য দারিদ্র্য আপনার জীবনপাত করছে সেটা আমাদের চোখে পড়ে না, কিন্তু প্রকৃতির খাতায় উত্তরোত্তর তার হিসেব জমা হচ্ছে। প্রকৃতিতে উপেক্ষিত ক্রমে আপনার প্রতিশোধ নেবেই। যদি টাকার প্রতি বহু যত্ন করে পয়সার প্রতি নিতান্ত অনাদর করা যায় তা হলে ক্রমে সেই অনাদৃত পয়সা বহু যত্নের ধন গৌরাঙ্গ টাকাকে বিনাশ করে। আমাদের ভারতবর্ষে অনাদৃত, দুর্বল, অজ্ঞান, বহুযত্নলব্ধ জ্ঞানকে বিনাশ করেছে। যদি সভ্যতা আপনাকে রক্ষা করতে চায় তো প্রতিবেশীকে আপনার সমান করে তুলুক। দুটো শক্তি যত একসঙ্গে সাম্য রক্ষা ক'রে কাজ করে ততই মঙ্গল— যেমন আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ, স্বার্থ এবং পরার্থ, আপনার উন্নতি ও চতুষ্পার্শ্বের উন্নতি। নইলে চতুষ্পার্শ্ব তার প্রতিশোধ তোলে, বর্বরতা সভ্যতাকে ধ্বংস করে। আমার তো সেইজন্যে মনে হয়— আশ্চর্য নেই যে ভবিষ্যতে কাফ্রিরা য়ুরোপ জয় করবে, কৃষ্ণ অমাবস্যা দিনের আলোকে গ্রাস করবে, আফ্রিকা থেকে রাত্রি এসে য়ুরোপের শুভ্র দিনকে আচ্ছন্ন করবে। য়ুরোপীয় সভ্যতার আদিজননী গ্রীসকে যে তুর্ক জাতি অভিভূত করবে এ কি পেরিক্লীসের সময়ে কেউ কল্পনা করতে পারত? আলোকের মধ্যে ভয় নেই, কেননা তার উপরে সহস্র চক্ষু পড়ে আছে— কিন্তু যেখানে অন্ধকার জমা হচ্ছে, বিপদ সেইখানেই গোপনে বল সঞ্চয় করছে, সেইখানেই প্রলয়ের গুপ্ত জন্মভূমি।)

সন্ধের সময় মেজদাদা হঠাৎ নাচের প্রস্তাব করলেন। Miss Mull তাঁর সঙ্গে খানিকটা নেচে আমাকে নাচবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগল, আমি কাটাবার অনেক চেষ্টা করলুম, কিন্তু ক্রমে দেখলুম অভদ্র হয়ে পড়ছে। দু-চার পা নেচে থেমে গেলুম— এমন দু-তিন বার নাচিয়েছে। আমি বাজনার মাঝখানে থেমে যাই, এরকম জড়াজড়ি নৃত্য আমার ভারি বর্বর মনে হয়।

শনিবার। সকালে দোকানে বেরোনো গেল। অনেক জিনিসপত্র কেনা এবং সুন্দর মুখ দেখা গেল। আজ আবার রাত্তিরে Drury Lane-এ *Million of Money* দেখতে যেতে হবে। M. Theatre দেখে আসা গেল। Scenery খুব আশ্চর্য্য। Race course, সত্যিকার ঘোড়দৌড়, চৌঘুড়ি, সমুদ্রের মধ্যে পর্বত।

রবিবার। Oswaldদের বাড়ি গিয়েছিলুম, এক ফরাসি মেয়ে দেখলুম— অদ্ভুত। সে আমার সঙ্গে খুব আলাপ করলে। বললে, Indianদের বড়ো ভালোবাসে। মেজদাদারা Kew Gardens দেখতে গেছেন। আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে Miss Mull অনেক পীড়াপীড়ি করলে। রাজনারায়ণ আমাদের নিয়ে বড়ো বাড়াবাড়ি রকম ঠাট্টাঠুট্টি আরম্ভ করেছে, সে কথঞ্চিৎ jealous হয়েছে।

সোমবার। ছোটোবউ সল্লি আর বাবির চিঠি পেলুম। মনটা একান্ত অস্থির হয়ে আছে— বেঁচে থাকতে ভালো লাগছে না। বাবিকে চিঠি লিখতে আরম্ভ করা গেল। Richmond-এ ইন্দুর মেয়েদের দেখতে যাবার জন্যে মেজদা টানাটানি করছেন। চিঠি কাল শেষ করা যাবে। নোয়েল বেশ মোটাসোটা শক্ত হয়ে উঠেছে। লীলাকে তেমন ভালো দেখতে নেই। রানী আমার সঙ্গে ভাব করে নিয়ে Zoological Gardens-এর গপ্প জুড়ে দিলে। ভারি মজা করে মিষ্টি করে ইংরিজি কথা

কয়। ফিরে এসে ভাবে বোধ হল Miss M আর রাজনারানে একটু ঝগড়া হয়ে গেছে। আমাকে নিয়ে এই পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে একটু খিটিমিটি বেধে গেছে। রাজনারায়ণ এমন স্পষ্ট করে তার jealousy প্রকাশ করে যে আমাকে ভারি অপ্রস্তুতে পড়তে হয়। রাত্তিরে অনেকগুলো বাংলা গান গাইলুম। 'অলি বারবার'টা Miss M-এর ভয়ানক ভালো লেগেছে : It is so sweetly pretty, so quaintly beautiful and it sounds so pathetic with its minor tones! ওর নীচেই 'দে লো সখী দে', তার পরে 'কী হল তোমার'।

মঙ্গল। আজ সকাল থেকে shopping। সল্লি আর ছোটোবউয়ের জন্যে দুটো আয়না কিনেছি। সুরির জন্যে একটা ইলেক্‌ট্রিক-আলো-জ্বালা ঘড়ি কেনা গেল। কাল বাবির জন্যে একটা কিনলেই আমার মন নিশ্চিন্ত হয়। সমস্ত দিন জিনিসপত্র কিনে একান্ত শ্রান্তভাবে সন্ধের সময় 'bus-এর মাথার উপরে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাড়ি আসা গেল। একজোড়া eye glasses কেনা গেল। আজকাল এখানে পথে-ঘাটে অগণ্য চশমাপরা মেয়ে দেখতে পাই। আমার বিশ্বাস তাদের ভালো দেখতে হবে বলে তারা চশমা পরে। Miss M একজোড়া চশমা কিনে রেখেছে, কিন্তু তার চোখ খুব ভালো। কতকগুলো নতুন গান কিনে এনেছি, সেগুলো গেয়ে দেখা গেল। Miss M আবার 'অলি বারবার'টা গাওয়ালে। সেটা তার অত্যন্ত ভালো লেগেছে। লোকেন Marya সঙ্গে দেখা করতে গেছে—রাত দুপুর বাজে, এখনো সে ফেরে নি। আমার বিশ্বাস, Maryকে লোকেন একটু বিশেষ ভালোবাসে। মনটা এমন শূন্য উদাস হয়ে আছে! ইচ্ছে করছে এই ঘুমোতে গিয়ে আর যদি ঘুম না ভাঙে তো বেশ হয়—ঠিক বেশ হয় না, সকলকে একবার দেখতে এবং সকলের কাছে একবার মাপ চাইতে ইচ্ছে করে। আজ বাবির ছবি যতটা এঁকেছে দেখে এলুম—বোধ হয় রঙ দিলে বেশ হবে। শুক্রবারে দেবে।...এখানে রাত দুপুর, কলকাতায় ছটা...

বুধবার। সকালে আবার দোকানে বেরোলুম। বাবির জন্যে একটি বেশ ভালো lamp পছন্দ করবামাত্র লোকেন সেটার জন্যে পীড়াপীড়ি করে দাবি করতে লাগল। তাকে ছেড়ে দিলুম, কিন্তু মনটা ভারি খারাপ হয়ে রইল। তখনই মনে মনে স্থির করলুম, কতকগুলো জিনিসপত্র কিনেই একেবারে পরের স্টীমার নিয়ে লন্ডন থেকে P & O জাহাজে চড়ে বসব—কিচ্ছু ভালো লাগছে না। Maple এবং Spriggs-এর দোকানে গিয়ে বাবির জন্যে কতকগুলো জিনিস কিনে নিলুম—আমার যা-কিছু সম্বল ছিল সমস্ত ফুরিয়ে গেল। Oswalds-এর ওখানে গেলুম, তারা আমাদের একটা tennis club-এর মতো জায়গায় নিয়ে গেল। পথে যেতে যেতে Miss O বলছিল, একজনের পক্ষে এক sisterই ঢের, কিন্তু আমার ইচ্ছে করে আমার আরও ভাই থাকত। Tennis খেলে Oswalds-এর ওখানে গান গেয়ে এবং গানবাজনা শুনে বাড়ি এসে খেয়ে পুনশ্চ গানবাজনা করে শোবার ঘরে এসেছি। Good night! Good night!...

বৃহস্পতি। আবার আমার সমস্ত plan ভেঙে গেল। মেজদার কিছুতে ইচ্ছে নয় যে আমি যাই, কাজেই থাকতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে এরকম আত্মসংবরণ করা আবশ্যক। অনেকবার তো দায়ে পড়ে করতে হয়েছে—কিন্তু অভ্যেস হল কই? Miss Mকে নিয়ে, Oswaldsদের ওখানে গিয়ে তাদের কুড়িয়ে নিয়ে, French Exhibition দেখতে গিয়েছিলুম। পথে আসতে আসতে Miss M আমাকে নিয়ে একটু এগিয়ে গেল। কথায় কথায় বলছিল : I am quick at everything। আমি ঈষৎ সহাস্যে বললুম : Quick to forget? সে সেই উপলক্ষে অনেক কথা বললে। কিন্তু বলেই তৎক্ষণাৎ আমার মনে মনে এমন ধিক্‌কার উপস্থিত হল! কথাটা এমনি আমার-মতন-নয় বলে মনে হল! মনে হল, আমি অজ্ঞাতসারে লোকেনকে নকল করছি—সে যেরকম মেয়েদের সঙ্গে ঠাট্টার সঙ্গে flirt করে আমিও সেই চাল অবলম্বন করছি। কিন্তু তার সেটা বেশ স্বভাবত আসে, তাকে বেশ মানায়। কিন্তু আমার মুখ থেকে আমার নিজের কানে ওটা এমন বিশ্রী শোনাল তার একটা কারণ বোধ হয়, Miss M আমার প্রতি কতকটা serious ভাব ধারণ করেছে। সে আমাকে আরও কিছুদিন থাকবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছিল, এবং ভবিষ্যতে ইংলন্ডে

এলে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অনুরোধ করছিল। একটু বিষণ্ণ নম্র বিগলিত ভাব। তাই আমার আরও তীব্র অনুতাপ উপস্থিত হল।...

French Exhibition-এ যাওয়া গেল। অনেক ক্রেতব্য জিনিস দেখলুম। ডিনারে আমাদের পাশের টেবিলে একটা পার্টি আমাদের দিকে ভারি rudely stare করছিল—আমার সহ্য হল না—যখন ভেঙে গেল আমি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে deliberately তাদের out-stare করলুম। British stare-এর মতো insolent জিনিস পৃথিবীতে অল্পই আছে।

আমার ধারণা ছিল ইংরেজ মেয়েদের ভ্রূ এবং চোখের পাতা বিরল, কিন্তু সেটা ভয়ানক ভুল—বরঞ্চ বিপরীত।

শুক্রবার। সকালে মেজদাদার সঙ্গে Regent Street-এ বেরিয়েছিলুম। বাবির ছবি চমৎকার হয়েছে। ফিরে এসে সল্লিকে চিঠি লিখলুম। Brand-এর বোনের ওখেনে সন্ধেবেলায় নিমন্ত্রণ ছিল। গেলুম। তাকে বেশ লাগল, বেশ refined। চমৎকার harp এবং পিয়ানো বাজায়। 'অলি বারবার' গানটা খুব তার ভালো লেগেছে। বলছিল, যদি আমাদের ঐরকম কতকগুলো দিশি গান Sullivanকে শোনাই তা হলে সে একটা Oriental Opera লিখতে পারে। আমার composition শুনে আশ্চর্য। আমি music-এর grammar কিছু না জেনে compose করতে পারি এতে সে অবাক।...

শনিবার। সকালে আবার Regent Street-এ যাওয়া গেল। সমস্ত দিন ঘুরে ভয়ানক শ্রান্ত হয়ে গাড়ি করে আমি ফিরে এলুম। আমার বাঁ পায়ের শিরায় বড্ড ব্যথা হয়েছে। লোকেন আমাকে সন্ধের সময় বললে, আমার বাংলা গান শুনতে আজকাল বড়ো ভালো লাগছে, তুমি কতকগুলো বাংলা গান গাও। জ্যোৎস্নার কাছে একটা 'মায়ার খেলা' ছিল, সেইটে নিয়ে প্রথম থেকে একটা একটা করে অনেকগুলো গাওয়া গেল। আমার বেশ লাগছিল, লোকেনেরও ভালো লাগল।... Lyceum Theatre-এ যাওয়া গেল। *Bride of Lammermoor* অভিনয় হল। চমৎকার লাগল। কী সুন্দর scene! অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বরাবর ধীর স্বরে বিচিত্র ভাবের concert বাজে, সেটাতে খুব জমিয়ে তোলে। Ellen Terry খুব ভালো অভিনয় করেছিল, Irving-এর অভিনয়ও খুব ভালো—কিন্তু এমন mannerism, এমন অস্পষ্ট উচ্চারণ, এমন অসুন্দর অঙ্গভঙ্গি! কিন্তু তবুও ভালো অভিনয়—সেই আশ্চর্য। একটি box-এ দুটি মেয়ে বসেছিল, তার মধ্যে একটিকে চমৎকার দেখতে। একেবারে নিখুঁত ছোটো সুন্দর মুখখানি, অল্প বয়স, দীর্ঘ বেণী পিঠে ঝুলছে, বেশভূষায় আড়ম্বর নেই, কিন্তু সবসুদ্ধ যাকে dainty বলে তাই। অভিনয়ের সময় রঙ্গভূমির সমস্ত আলো নিবিয়ে দিয়ে কেবল স্টেজে আলো জ্বলে—সে স্টেজের উপরকার বক্সে বসেছিল, তার মুখের উপর স্টেজের আলো পড়ছিল, কী সুন্দর দেখাচ্ছিল! সমস্ত backgroundটা অন্ধকার, কেবল তার আর্ধেক মুখ আলোকিত—কী সুকুমার সুন্দর মুখের রেখা! কী চমৎকার গ্রীবাভঙ্গি! আমি অভিনয়ের সময় প্রায় তার মুখের বিচিত্র ভাবের খেলা দেখছিলুম। সেও দুরবীন দিয়ে আমাদের অনেক ক্ষণ দেখেছে, কিন্তু নিঃসন্দেহ ততটা আনন্দ লাভ করে নি। কিন্তু নাট্যশালায় একান্ত নির্লজ্জ স্পর্ধার সঙ্গে পরস্পরের প্রতি দুরবীন কষা আমার নিতান্ত খারাপ লাগে। আমি তো কিছুতেই পারলুম না, ভারি অভদ্র মনে হয়। এদের মধ্যে অনেকগুলো প্রথা আছে যা প্রকৃতপক্ষে অভদ্র, সে আমাদের কিছুতেই অভ্যেস হয়ে যাওয়া উচিত না—যেমন নাচ—দুরবীন কষা—গান-বাজনার সময়ে গল্প জুড়ে দেওয়া।

সেদিন French Exhibition-এ একজন বিখ্যাত artist-রচিত একটি উলঙ্গ সুন্দরীর ছবি দেখলুম। কী আশ্চর্য সুন্দর! দেখে কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। সুন্দর শরীরের চেয়ে সৌন্দর্য পৃথিবীতে কিছু নেই—কিন্তু আমরা ফুল দেখি, লতা দেখি, পাখি দেখি, আর পৃথিবীর সর্বপ্রধান সৌন্দর্য থেকে একেবারে বঞ্চিত। মর্ত্যের চরম সৌন্দর্যের উপর মানুষ স্বহস্তে একটা চির অন্তরাল টেনে দিয়েছে। কিন্তু সেই উলঙ্গ ছবি দেখে যার তিলমাত্র লজ্জা বোধ হয় আমি তাকে সহস্র

ধিক্‌কার দিই। আমি তো সুতীব্র সৌন্দর্য-আনন্দে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম, আর ইচ্ছে করছিল আমার সকলকে নিয়ে দাঁড়িয়ে এই ছবি উপভোগ করি। বৌলি যদি বড়ো হত তাকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আমি এ ছবি দেখতে পারতুম। এরকম উলঙ্গতা কী সুন্দর! এই ছবি দেখলে সহসা চৈতন্য হয়— ঈশ্বরের নিজহস্তরচিত এক অপূর্ব সৌন্দর্য পশু-মানুষ একেবারে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং এই চিত্রকর মনুষ্যকৃত সেই অপবিত্র আবরণ উদ্ঘাটন করে সেই দিব্য সৌন্দর্যের একটা আভাস দিয়ে দিলে। এই দেহখানির শুভ্র কোমলতা এবং প্রত্যেক সুঠাম ভঙ্গিমার উপর বিশ্বকর্মার, সেই অসীমসুন্দরের, অঙ্গুলির স্পর্শ দেখা যায় যেন। এ কেবলমাত্র দেহের সৌন্দর্য নয়— একটি প্রেমপূর্ণ সুকোমল নারীহৃদয়, একটি অমর সুন্দর মানবাত্মা এরই মধ্যে বাস করে। তারই ভালোবাসা, তারই লাবণ্য এর সর্বত্র উদ্ভাসিত হয় উঠছে। এই উলঙ্গ চিত্রে রমণীর সেই হৃদয়ের কোমলতা এবং আত্মার শুভ্র জ্যোতি ব্যক্ত করছে, মানব-অন্তঃকরণের চিরপ্রচ্ছন্ন রহস্য কতকটা প্রকাশ করে দিচ্ছে।

রবিবার। আজ সতুর সঙ্গে church-এ যাবার কথা ছিল। খোঁড়া পা নিয়ে সমস্ত দিন পড়ে আছি। বাবির porcelain-এর ছবিটা পাঠিয়ে দিয়েছে, সুন্দর লাগছে। কিন্তু মেজদাদা সেটা দখল করে রেখেছেন, আমার ভয় হচ্ছে পাছে আমাকে না দেন। রাত্তিরে গান হল। Miss Oswald সতুর হাত দিয়ে আমাকে একটা ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সোমবার। পা অনেকটা ভালো বোধ হচ্ছে। বিকেলের দিকে লোকেনের সঙ্গে Walleryর ওখানে গিয়ে একটা cabinet ছবি নেওয়া গেল। তারা অনেক যত্ন করে নানা position-এ নিলে। বললে splendid head— বোধ হয় আমার মুখশ্রী প্রসন্ন করবার জন্যে। Miss Oswald-এর ওখানে যাওয়া গেল। সে আমার একটা ছবি চাইলে— দিলুম। কতকগুলো বাংলা গান গাওয়ালে —বিশেষ রকম ভালো লাগল, বিশেষত 'অলি বারবার'টা। ভরসা করি, এর মধ্যে চালাকি কিছু নেই। চাণক্য বলেছেন : বিশ্বাসং নৈব কর্তব্যং স্ত্রিষু রাজকুলেষু চ। এরা একে স্ত্রী তাতে রাজকুল। একজন musical পুরুষ বসে ছিল, সেও অনেক তারিফ করলে। birthday book এবং autograph book-এ নাম লিখে দিয়ে National Liberal Club-এ সিন্ধি বন্ধু আধবানির নিমন্ত্রণ উপলক্ষে dinner খেতে গেলুম। সেখানে Voysey-র সঙ্গে দেখা। তাকে বেশ লাগল, সে বাবামশায়ের প্রতি খুব ভক্তি প্রকাশ করলে। তার নিজের ইতিহাস অনেক শোনা গেল। Christianity ত্যাগ করার দরুন ঘরে বাইরে তাকে অনেক উপদ্রব সইতে হয়েছে। বললে, সব চেয়ে কষ্ট যখন নিজের ঘরের মধ্যে sympathy-র অভাব দেখা যায়। আমাকে দেখে দেখে বললে, তোমার বোধ হয় কথাটা খুব নতুন বোধ হবে, কিন্তু তোমাকে দেখবামাত্র আমার মনে হয়েছিল যিশুখৃস্টকে যেরকম আঁকে তোমাকে ঠিক সেইরকম দেখতে। আমি বললুম, এ কথা আমার পক্ষে নতুন নয়। clubটা একটা রাজপ্রাসাদ বললেই হয়— চমৎকার পাথরের সিঁড়ি, খুব জমকালো, এবং যতরকম আরাম কল্পনা করা যেতে পারে তার বন্দোবস্ত আছে।

মঙ্গলবার। চিঠি পাওয়া গেল। বাবি লিখেছে, আর চিঠি লিখবে না। মেজদাদার কাছে আমার একলার বাড়ি পালাবার প্রস্তাব করা গেল, কিছু ফল হল না। বাবিকে চিঠি লিখতে বসা গেল।

বুধবার। কাল সন্ধে থেকে লোকেন Margate-এ তার বন্ধুসন্দর্শনে। আমি বসে বসে চিঠি লিখছি। Miss Mull-এর কাছে একটু গান শিখলুম। 'যদি আসে' গানটা তার ভালো লাগল। লোকেন ফিরে এসেছে। আজ পয়লা অক্টোবর— এ মাসটা শেষ হয়ে গেলে বাঁচা যায়। কাল থেকে ঝোড়ো বাতাস বচ্ছে, মেঘ করে রয়েছে, শীতও বেড়েছে। বোধ হয় রীতিমত বিলিতী weather আরম্ভ হল। মেজদার কেন এ দেশ ভালো লাগে আমি তো কিছুই বুঝতে পারি নে— তিনি তো এখানকার হুড়োমুড়িতে তেমন যোগ দেন না। ইচ্ছে করলেই একটা-কিছু করা যেতে পারে, নিদেন রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে দোকানগুলো ঘুরে আসা যেতে পারে— এইটে মনে করেই মন অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকে বোধ হয়।

বৃহস্পতি। নারায়ণ হেমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা—আশ্চর্য অধ্যবসায়। বেচারার কাপড়-চোপড়ের অবস্থা দেখে আমি তাকে আমার একসুট গরম কাপড় দিলুম। India Office-এ হয়ে দোকান হয়ে শ্রান্তভাবে বাড়ি-প্রত্যাগমন। মেজদা কাল আমাকে Birmingham-এ নিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কাজেই এখনি বসে বসে সল্লিকে তাড়াতাড়ি এক চিঠি লিখে দেওয়া গেল। আদবে ভালো লাগছে না।

শুক্র। Birmingham-যাত্রা। ইংলন্ড দেখতে বড়ো সুন্দর। Lee station-এ উপস্থিত ছিল। শহর দেখতে আমার আদবে ভালো লাগে না। electric tram-এ চড়া গেল। electric tram-এর কলকারখানার মধ্যে নিয়ে গেল, নির্বোধের [মতো] ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে হাঁ করে দেখতে লাগলুম। কিছুই বুঝলুম না, কেবল একান্ত শ্রান্ত হয়ে Mrs. Lee-র ওখানে ডিনার খেয়ে হোটেলে এসে নিদ্রা।

শনিবার। সকালে আবার বিবিধ দ্রষ্টব্য বিষয়ের সন্ধানে বেরোনো গেল। এটা পোস্ট্ আপিস, ওটা ম্যুনিসিপাল আপিস, সেটা আদালত, এই করতে করতে একটা ছাপাখানায় যাওয়া গেল—সেখানে রঙিন ছবি ছাপা দেখা গেল। এটা দেখবার জিনিস বটে। সন্ধের সময় লন্ডনে ফিরে এসে Wallery-দের ওখেন থেকে আমার ছবির প্রুফ পাওয়া গেল।

রবিবার। Voysey-র church-এ গিয়েছিলুম। বেশ লাগল। মনটা অনেকটা ভালো বোধ হল। ফিরে এসে লোকেনের ঘরে বসে গল্প করছি—খানিক বাদে Mrs. Palit এসে বললেন, drawing room-এ রাজনারান আর Miss Mull-এ খুব scene হয়ে গেছে। Miss Mull বসে বাজাচ্ছিল—তার বোধ হয় ইচ্ছে ছিল তার বাজনা শুনে আমি drawing room-এ যাই, অনেকক্ষণ গেলুম না দেখে সে রাজনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করছিল : Is Mr. Tagore out I wonder? রাজনারান বললে : No. Evidently your signal has not attracted him। Mrs. Palit তাকে বললেন : Is that your signal Miss Mull? সে রাগ করে piano বন্ধ করে বললে : I don't understand what you say! বলে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। আমাকে নিয়ে রাজনারানের সঙ্গে তার ক্রমিক খিটিমিটি চলছে। Oswald-দের ওখেনে বিকেলে গিয়েছিলুম, বাংলা গান হল। Mrs. Oswald-এর ভালো লাগল। এখেনে ফিরে এসে সন্ধের সময় গান। Miss Mull 'অলি বারবার'টা আবার গাইতে বললে, সেটা তার ভারি ভালো লাগে। সে বললে : I don't know what is in it—it is so very pathetic! আজ বিকেলে লোকেনে আমাতে দুজনেই পাগড়ি পরে বেরিয়েছিলুম। রাস্তার লোকের খুব মজা লেগেছিল। আমরা কালো মানুষ ঠিক যদি ইংরেজের ছদ্মবেশ ধারণ করি তাতে এ দেশের লোকের অদ্ভুত মনে হয় না। যখন রাস্তার মেয়েরা আমাকে দেখে হাসে তখন আমার চেহারার গর্ব অনেকটা চলে যায়। আজ ৫ই। এখনো পাঁচ সপ্তাহ।

সোমবার। কাল সমস্ত রাত ধরে ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছি। ঠিক এইরকমের স্বপ্ন আমি কতবার দেখেছি তার ঠিক নেই, মনে হয় কোন্‌দিন সত্যি হয়ে দাঁড়াবে। এই এক রাত্তিরের মধ্যে ঠিক যেন মাসখানেক অসহ্য কষ্ট পেয়েছি এমনি মনে হচ্ছে। আজ চিঠি আসবার দিন। বাবির চিঠি পাওয়া যাবে না। আমি ঠিক করেছি বাড়ি ফিরব—আর নয়।

মঙ্গলবার। Savoy Hotel-এ মনোমোহনের ওখানে lunch খেয়ে P & O আফিসে Thames Steamer-এ passage engage করে নিশ্চিন্ত। বৃহস্পতিবারে ছাড়বে। কাল রাত্তিরে Carlyle Societyতে গিয়েছিলুম। চুরোটের ধোঁয়ার মধ্যে John Stirbing-এর life সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর। মেজদাদা Newman সম্বন্ধে একটুখানি বললেন, সকলের খুবই ভালো লেগেছে। রাত্তির দুটো পর্যন্ত আমার দেশে ফেরা সম্বন্ধে সমালোচনা করা গেছে। মঙ্গলবার রাত্তিরে লোকেন আমাকে Oswald-দের ওখানে নিয়ে গিয়েছিল।

বুধবার। সমস্ত দিন হিসেব করতে এবং জিনিস কিনতে গেল। মেজদাদার কাছে অনেক ধার

হয়ে গেছে— তিনি আমাকে অমনি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে আমার ইচ্ছে হল না। মেজদাদার টাকাতেই যদি বাবিদের জন্যে জিনিস কিনলুম তা হলে আমার আর দেওয়া হল কই? অল্পে অল্পে শুধে ফেলব। কেন মরতে বিলেতে এসেছিলুম কে জানে। বাড়িতে চিঠি লিখলুম। Miss Mull আমাকে সব গানগুলো গাওয়ালে। 'Remember me' বলে একটা গানের পর সে আস্তে আস্তে আমাকে বললে : Mr. T, I shall remember you। আমি অপ্রতিভ হয়ে নিরুত্তর বসে রইলুম।

বৃহস্পতি। আজ তো Thames জাহাজে উঠলুম। আমার cabin-এ একজন civilian-এর জিনিসপত্র দেখে মন বিগড়ে গিয়েছিল। তার পরে দেখলুম সে নেহাত কাঁচা, এই প্রথম ভারতবর্ষে যাচ্ছে। আমাকে দেখে ভারি খুশি। জাহাজে কখন কী করতে হয়, কোথায় কী, আমাকে সমস্ত জিজ্ঞাসা করে নিলে। আমি তার মুরুব্বি হয়ে দাঁড়িয়েছি। মল্লিক এবং বাঁড়ুজ্জের ভারি প্রশংসা করলে। Lord Ripon-এর দলের লোক। সেখেনে গেলে কী হয় কে জানে। বোধ হচ্ছে Irishman। জাহাজে ভয়ানক ভিড়। dinner table-এ আমার ঠিক সামনেই রাঙা টুক্‌টুকে ঠোঁট-জ্বল্‌জ্বলে চোখ এবং মিষ্টি হাসি-ওয়ালা একটি মুখ পাওয়া গেছে। আমাকে সকলেই পরম বিস্ময়ের সঙ্গে নিরীক্ষণ করছে।

শুক্রবার। চমৎকার সকাল হয়েছে। সমুদ্র স্থির, আকাশ পরিষ্কার, সূর্য উঠেছে। কন্‌কনে ঠাণ্ডা। আমাদের দক্ষিণে ভোরের বেলা অল্প অল্প তীরের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। অল্পে অল্পে কোয়াশার আবরণ উঠে গেল, Isle of Wight-এর পার্বত্য তীর এবং Ventnor শহর ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়ল। পর্বতের ঢালুর উপরে সমুদ্রের তীরে সাদা সাদা বাড়ি বিজ্‌বিজ্‌ করছে— লিলিপুট শহরের মতো। এ জাহাজে বিষম ভিড়— এক কোণে নিরিবিলি চৌকি নিয়ে বসে লেখবার জো নেই এবং জায়গাও নেই। Brindisi থেকে আরও অনেক লোক উঠবে। ভরসা করি আমাদের cabin-এ আর কেউ আসবে না। আমাদের Massilia জাহাজের purser-কে এ জাহাজে দেখলুম। সে আমাকে বললে, তোমার যখন যা আবশ্যক হবে আমাকে জানিয়ো। ডিনার-টেবিলে আমার পাশেই সে আসন গ্রহণ করেছে; ডেকের উপর আমাকে পাশে নিয়ে হট্‌ হট্‌ করে বেড়াতে চায় এবং বিস্তর গল্প বলে। লোক খুব ভালো সন্দেহ নেই, নইলে আমাকে বেছে নিলে কেন— সমজ্‌দার বটে। কিন্তু সর্বদা আমার প্রতি মনোযোগ দিলে আমার লেখাপড়া বন্ধ করতে হয়। Wallace-এর *Darwinism* পড়ছি, বেশ লাগছে— ইচ্ছে করছে বাংলায় তর্জমা করতে। কিন্তু আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।

আজ ডেকে বেড়াতে বেড়াতে একটি লোকের সঙ্গে আলাপ হল, সে কর্তাদাদামশায়কে জানত। একটা বড়ো সেনাপতি গোছের লোক, Egypt-এ যাচ্ছে। অনেক কথা হল। English Governmen-টের কথা হতেই আমি ইংরেজের ব্যবহার সম্বন্ধে দু-একটা কথা বললুম। সে আশ্চর্য হয়ে গেল। সে বললে, আমাদের সময়ে ঐরকম ছিল বটে, কিন্তু এখনো আছে না কি? শুনে স্বজাতির উপর ভারি চোট প্রকাশ করলে। বললে, লোকে বলে ভারতবর্ষের বাজারে ভারি ঠকায়, কিন্তু Bond Street-এর চেয়ে ঢের ভালো; নিম্নশ্রেণীয় ভারতবর্ষীয়েরা নিম্নশ্রেণীয় ইংরেজদের চেয়ে যে কত ভালো তা বলতে পারি নে। বললে, হিন্দুরাই যথার্থ Christian; তাদের ক্ষমাপরায়ণ সহিষ্ণু নম্রতা, তাদের আন্তরিক সহৃদয়তা, খৃস্টানদের অনুকরণীয়। লোকটা খুব ধার্মিক, আমাকে খৃস্টধর্মে লওয়াবার কতকটা চেষ্টা করলে। আমার ইংরিজি ভাষা শুনে খুব বিস্ময় প্রকাশ করলে। জিজ্ঞাসা করলে আমি Oxford-এ পড়েছি কি না। আমি বললুম, না। —কোনো দেশের কোনো কলেজে পড়েছি কি না? —না। শুনে অবাক। সে বললে, আমি India Office-এ থাকি— অনেকটা জানতে পারি— আমাদের সময়ের চেয়ে এখনকার ভারতবর্ষীয় ইংরেজরা ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষীয়ের প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ দেয়। আমি বললুম, আমার উল্টো বিশ্বাস। দৃষ্টান্তস্বরূপ কর্তাদাদামশায়ের সঙ্গে ইংরেজের মেশামিশির কথা বললুম। সে বললে : His

was the only solitary instance। আমাকে বললে, যদি কখনো পুনশ্চ ইংলন্ডে আসি তা হলে India Office-এ তাকে সন্ধান করে যেন look up করি।— সমুদ্র আশ্চর্য শান্ত এবং সমস্ত দিন রৌদ্রোজ্জ্বল পরিষ্কার। একটা নিরিবিলি কোণ পেলে কবিতা লিখতুম। জাহাজে ক্রমে আমার বন্ধুবৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখছি।

ইংরেজ মেয়েদের চোখ আমার ক্রমে ভালো লাগছে— মেঘমুক্ত নীলাকাশের মতো এমন পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল, প্রায়ই ঘন পল্লবে আচ্ছন্ন। আমাদের দেশের মেয়েদের চোখে একরকম আবেশের ভাব আছে, এদের তা মোটে নেই।

শনিবার। Bay of Biscay-তে পড়া গেছে। সমুদ্র কিঞ্চিৎ অশান্ত। সকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর-একজন সহযাত্রীর সঙ্গে পরিচয় হল, তাকে Archer-এর studio-তে দেখেছিলুম— টেরা। Turnbull— ভূতপূর্ব মুনিসিপাল সেক্রেটারি। সে বলছিল, আমাকে যদি কেউ দশ হাজার টাকা দেয় তা হলেও আমি কলকাতা ছেড়ে ইংলন্ডে বসতি করি নে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন? সে বললে, ইংরাজ জাত বড়ো উদ্ধত, স্বার্থপর, গর্বিত ইত্যাদি— ফরাসীরা ওদের চেয়ে ঢের ভালো। আজ কখনো রোদ্দুর কখনো মেঘ করছে, খুব ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। কাল চমৎকার সূর্যাস্ত দেখা গিয়েছিল, আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে এমন সুন্দর রঙ হয়েছিল। আজ মেঘের মধ্যে সূর্য অস্ত গেল। সমুদ্র মাঝে মাঝে ফুলে ফুলে উঠছে।

রবি। কাল রাত্তিরে আবার সেইরকমের স্বপ্ন দেখেছিলুম। স্বপ্নে বোধ হচ্ছিল মনের কষ্টে আমি যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে চীৎকার করে কোথায় ছুটে চলেছি। ঠিক এই ধরনের স্বপ্ন কতবার দেখেছি তার ঠিক নেই। সকালে আমার সহযাত্রী Connolly-র সঙ্গে ভারতবর্ষ নিয়ে কথা হচ্ছিল। সে বললে, আমি ভারতবর্ষে কখনো Anglo Indian দলে ভিড়ব না, আমি সেখানকার দেশের লোকের সহায় এবং বন্ধু হব। আসবার আগে Lord Ripon এবং তার private secretary-র সঙ্গে এ বিষয়ে তার অনেক কথা হয়ে গেছে। আজ সকালবেলা কুয়াশাচ্ছন্ন। কুয়াশা কেটে গিয়ে বেশ রোদ্দুর উঠেছে। ছাতের চাঁদোয়া খাটিয়ে দিয়েছে, তাই আজ অনেকটা snug বোধ হচ্ছে— আজ তেমন ঠাণ্ডা নেই। এ জাহাজে একটি মেয়ের সুন্দর নীল চোখ এবং চমৎকার ঠোঁট— হাসলে বেড়ে দেখায়। আমার ডিনার টেবিলের সঙ্গিনীর চেয়ে একে অনেক ভালো দেখতে। এর মুখের ভাবে বেশ একটু কোমল নম্রতা আছে, উগ্রতা কিছুমাত্র নেই। আজ আর-এক ব্যক্তি আমার সঙ্গে আলাপ করে নিলে : You belong to the great Tagore family of Calcutta? আমি গান গাইতে পারি কি না জিজ্ঞাসা করলে আমি বললুম, হাঁ। সে বললে Colonel Chatterton বলে এক মস্ত musician Brindisi থেকে আমাদের জাহাজে উঠবে, সে এলে আমাদের অনেক রকম আমোদ-প্রমোদ হবে; আমাকেও গাওয়াবে। *Darwinism* শেষ করা গেল। খুব ভালো লাগল, বিশেষত শেষ chapter। Spiritual Man-এর মধ্যেও survival of the fittest নিয়ম বোধ হয় চলছে— তবে তার জীবন মৃত্যু অন্য রকমের। যখন ঋষিরা প্রার্থনা করেছিলেন 'মৃত্যোর্মামৃতং গময়' তখন এই spiritual survival প্রার্থনা করেছিলেন। আমরা যে আত্মা পেয়েছি তারই সফলতা চেয়েছিলেন।— চমৎকার সূর্যাস্ত। সন্ধ্যার রঙে জল এবং আকাশে একরকম শারীরিক লাবণ্য প্রকাশ পায়, মনে হয় যেন তার মধ্যে জীবনের এবং যৌবনের পরিপূর্ণতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।— Wallace পড়ে আমার মনে এই একটা চিন্তার উদয় হয়েছে যে, আমাদের যে অংশ জন্তু সেই অংশই আমাদের জীবনধারণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক এবং natural selection-এর নিয়ম-অনুসারে সেই অংশ ক্রমশ উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু আমাদের অনেকগুলি মানবচিত্তবৃত্তি আছে যা আমাদের জীবনরক্ষার পক্ষে কিছুমাত্র আবশ্যক নয়। সুতরাং জীবনসংগ্রামের নিয়মানুসারে সেগুলো কী করে উদ্ভাবিত হল কিছু বোঝবার জো নেই। আমাদের ধর্মভাব জীবনরক্ষার পক্ষে অনাবশ্যক, এমন-কি অনেক স্থলে বাধাজনক। উদ্ভিদ এবং জন্তুদের যা-কিছু আছে সমস্তই তাদের আবশ্যক, অথবা অতীত আবশ্যকের অবশেষ, কিন্তু আমাদের প্রধান চিত্তবৃত্তিসকল আমাদের আবশ্যকের

অতিরিক্ত। এ পর্যন্ত প্রমাণ হয় নি সৌন্দর্য আমাদের জীবনের পক্ষে আবশ্যক, যে জাতির মধ্যে শিল্পচর্চা অধিক তারা অন্য জাতির চেয়ে বলিষ্ঠ বা তাদের জীবনীশক্তি অধিক। গ্রীকরা রোমের কাছে পরাভূত হয়েছিল। যারা সংগীতচর্চা করে জীবনসংগ্রামে তাদের বিশেষ কী সুবিধে বোঝা যায় না। অতএব এসকল মনোবৃত্তি আবশ্যকের নিয়মানুসারে আবির্ভূত হয় নি—সৌন্দর্যপ্রিয়তা মানবের অন্তঃকরণে স্বাভাবিক বলে ধরে নিতে হবে। এই-সকল আপাতত অনাবশ্যক চিত্তবৃত্তি আমাদিগকে কোন্ উচ্চতর আবশ্যকতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে কে বলতে পারে।

সোমবার। আজ চৌকিতে আরামে বসে *Modern Thoughts & Modern Science* পড়ছিলুম—এক দল লোক এসে আমাকে quoits খেলতে নিয়ে গেল। stupid খেলা। আজ রাত্তিরে বোধ হয় নৃত্য হবে। ইংরেজ-সমাজের একটা আমার চোখে খুব ঠেকে—এখানে মেয়েরা পুরুষদের প্রতি অনায়াসে rude হতে পারে, public opinion তাতে কোনো বাধা দেয় না। ভদ্রতার নিয়ম যে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদে বিশেষ তফাত হবে তার কারণ আমি বুঝতে পারি নে। হয়তো হতে পারে গোলাপের যে কারণে কাঁটা থাকা আবশ্যক, যেখানে স্ত্রীপুরুষে বেশি মেশামিশি সেখানে স্ত্রীলোকের সেই কারণে কতকটা প্রখরতা থাকা আবশ্যক। যাই হোক, তার চেয়ে আমাদের মেয়েদের সর্বাঙ্গীণ কোমলতা এবং মমতার ভাব আমার ঢের বেশি ভালো লাগে।—এরা সবাই মিলে আমার কোণ থেকে আমাকে উপ্ড়ে বের করবার চেষ্টায় আছে।

Concert-এ আমাকে গান গাওয়ালে। বিস্তর বাহবা পাওয়া গেল। অনেক মেয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করলে। পরিচিত-সংখ্যা ক্রমে বেড়ে উঠছে। গানের পর খুব এক-চোট নাচ হয়ে গেল। আমি নাচি কি না অনেকে সন্ধান নিলে। আমি বললুম : I used to dance— but I am out of it now— I am sure to come to grief if I attempt it। মিস্, ঠিক নামটা মনে পড়ছে না, বললে : Do try! আমি বললুম : Excuse me! I belong to the obscure genus of wall-flowers। নাচ দেখলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। একটি অত্যন্ত মোটা মেয়ে চমৎকার গান করলে। সেই আমার গানের accompaniment বাজিয়েছিল। Gounod-র *Serenade* এবং *If* গেয়েছিলুম। আজকাল আমি অনেকটা সাহসপূর্বক গলা ছেড়ে গান গাই—বাবি শুনলে বোধ হয় অনেক উৎসাহ দিত।

আজ দুপুরবেলা Portugal-এর একটুখানি রেখা দেখা গিয়েছিল।

মঙ্গল [১৪ অক্টোবর]। Gib-এ পৌঁছনো গেল। ভয়ানক বৃষ্টি হচ্ছে। Gibralter-এর পাহাড় মেঘে অনেকটা ঢেকে ফেলেছে। দুটি Sisters of Mercy 'alms for the poor' বলে সকলের কাছে কাছে ভিক্ষে চেয়ে চেয়ে বেড়াচ্ছিল। আমি তাদের একটি অর্ধ স্বর্ণমুদ্রা দিলুম, একটু আশ্চর্যভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে—অধিকাংশ ইংরেজসন্তান প্যান্ট্‌লুনের পকেটে হাত গুঁজে এমনভাবে দাঁড়িয়ে রইল যেন ক্রোশ-তিনেকের মধ্যে আর কোনো জনমানবের সম্পর্ক নেই।

মানুষের সবলতা দুর্বলতা সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে একটা দৃষ্টান্ত আমার মনে উদয় হল। নিম্নশ্রেণীয় জন্তুরা ভূমিষ্ঠকাল অবধি মানবশিশুর চেয়ে অধিকতর পরিণত ও বলিষ্ঠ। মানবশিশু একান্ত অসহায়। ছাগশিশুকে চলবার আগে পড়তে হয় না, মানুষকে সহস্রবার পড়তে হয়। জন্তুদের জীবনের প্রসারতা সংকীর্ণ, এইজন্যে আরম্ভকাল থেকেই তারা শক্ত সমর্থ। মানুষের জীবনের পরিধি বহুবিস্তীর্ণ, এইজন্যে সে বহুকাল পর্যন্ত অপরিণত দুর্বল। যে-সকল মানুষের অত্যন্ত অবিচলিত সংকল্প, প্রচণ্ড strong will, যারা কখনো ভ্রমে পড়ে না, চিরদিন শক্তভাবে চলে, তাদের জীবনের মধ্যে নিশ্চয়ই অনন্ত প্রসারতার ব্যাঘাতজনক কঠিন সংকীর্ণতা আছে—তাদের জীবনের পরিণতি অতি শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যায়। instinct ঠিক পথে চলে, কিন্তু বুদ্ধি ইতস্তত-পূর্বক ভ্রমের মধ্যে দিয়ে যায়। instinct পশুদের এবং বুদ্ধি মানুষের। instinct-এর গম্যস্থান

সামান্য সীমার মধ্যে, বুদ্ধির শেষ লক্ষ্য এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। আবশ্যকের আকর্ষণ অতি সাবধানে আমাদের সুবিধার রাস্তা দিয়ে নিয়ে যায়—স্বার্থপরতার মধ্যেই তার সীমা—সৌন্দর্য ও ভালোবাসার আকর্ষণ আমাদের সহস্রবার ধুলায় ফেলে দেয়, অশ্রুসাগরে নিমগ্ন করে, কিন্তু তার সীমা কোথায় কে জানে! অনন্তের দিকে যার স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে সেই আপনাকে পদে পদে দুর্বল বলে অনুভব করে—ক্ষুদ্র সীমা ও সংকীর্ণ সুখস্বচ্ছন্দতার মধ্যে যার জীবনের স্বাভাবিক বিলাস সে যতটুকু মতলব করে ততটুকু করে ওঠে, যতটুকু চায় ততটুকু আদায় করে নেয়। সেই সবল—তার সবলতা দেখে আমরা আপাতত হিংসা করি, কিন্তু চিরজীবনের race-এ একদিন হয়তো তাকে আমরা অবহেলে ছাড়িয়ে যাব। মানবসন্তান বলে বহুকাল আমাদের শারীরিক মানসিক দুর্বলতা, বহুকাল আমরা পড়ি, বহুকাল আমরা ভুলি, বহুকাল আমাদের শিখতে যায়। অনন্তের সন্তান বলে এতকাল ধরে আমাদের আধ্যাত্মিক দুর্বলতা, পদে পদে আমাদের দুঃখ কষ্ট পতন। কিন্তু সেই আমাদের সৌভাগ্য। সেই আমাদের চিরজীবনের লক্ষণ। তাতেই আমাদের বলে দিচ্ছে এখনো আমাদের বৃদ্ধি ও বিকাশের শেষ হয় নি। শৈশবই যদি মানুষের শেষ হত তা হলে মানুষের মতো অপরিস্ফুটতা প্রাণীসংসারে কোথাও পাওয়া যেত না, আমাদের এই অপরিণত পদস্খলিত ইহজীবনই যদি আমাদের শেষ হত তা হলেই আমরা একান্ত দুর্বল সন্দেহ নেই। কিন্তু শৈশবের দুর্বলতাই যেমন প্রকাশ করছে তার উন্নততর ভবিষ্যৎ আছে, তেমনি মানুষের এই দুর্বল ইহজীবনই তার ভবিষ্যৎ উন্নততর জীবনের সূচনা।

পৃথিবীর কত দুর্বল, কত পতিত, কত অপরাধী, পৃথিবীর কত বলিষ্ঠহৃদয় সাধুর চেয়ে প্রকৃতপক্ষে মহৎ এবং কুলীনবংশোদ্ভব তা চিরজীবনের হিসাবে ক্রমশ ব্যক্ত হবে।

natural selection-এর নিয়ম মানুষ পর্যন্ত এগিয়ে একরকম বন্ধ হয়ে গেছে—তার শেষ ফল কী ভালো করে বুঝে ওঠা যায় না। দেখা যাচ্ছে সৌন্দর্যপ্রেম অনেক স্থলে আমাদের প্রাকৃতিক জীবনের হানিজনক। শিল্পচর্চার ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায়—অনেক বড়ো বড়ো শিল্পী বিস্তর দারিদ্র্যকষ্ট এবং জীবনের ক্ষতি স্বীকার করে শিল্পচর্চা করেছে এবং এইরকম করেই অল্পে অল্পে শিল্পবিদ্যার উন্নতি হয়েছে, natural selection-এর নিয়মে এর কোনো কারণ পাওয়া যায় না। জীবনের ক্ষতির মধ্যে দিয়েই উন্নতি—এ কেবল মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জগতে দেখা যায়। বিজ্ঞান সম্প্রতি মানুষের কাজে লেগেছে, কিন্তু তার আরম্ভকালে কেবলমাত্র নিস্বার্থ জ্ঞানস্পৃহা থেকে যখন বিবিধ শারীরিক দুর্গতি এবং প্রাণপণ স্বীকার করে বহুকাল ধরে মানুষ বিজ্ঞানের চর্চা করে এসেছে তার কারণ কী? দুয়ের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে রহস্যের প্রতি মানবমনের অসীম আকর্ষণ—এমন-কি অনেক স্থলে তা জীবনাসক্তিকেও ছাড়িয়ে ওঠে। আমাদের যা প্রকৃত মনুষ্যত্ব তা এই 'natural selection' নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনাসক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আমরা প্রাণ সমর্পণ করে জ্ঞান পেয়েছি, ধর্ম পেয়েছি, শিল্প রচনা করেছি। সভ্যতার সংগে সংগে মানুষের মধ্যে ভালোবাসা যে ক্রমে বাড়ছে তা অনেক পরিমাণে তার অকারণদুঃখ-জনক এবং তার জীবনরক্ষার বিরোধী, কিন্তু তবু কোন্ নিয়মানুসারে আমরা উত্তরোত্তর তাকে এত উচ্চ আসন দিচ্ছি?

পৃথিবীতে কোনো-একটা সীমায় এসে নিশ্চিন্ত হয়ে থেমে থাকবার জো নেই—তা হলেই আবার হুহু করে পিছিয়ে পড়তে হয়। আপনাকে কোনো-এক স্থানে বজায় রাখতে হলেও অবিশ্রাম চেষ্টার আবশ্যক। আমরা ভারতবর্ষীয়েরা সেই চেষ্টার বাইরে এসে পড়ে যা পেয়েছিলুম তা উত্তরোত্তর হারাচ্ছি। Australia-র apteryx পাখির মতো আমাদের ডানা ক্রমশই সংকীর্ণ হয়ে এসেছে—কিন্তু এখনকার জীবনসংগ্রামের মধ্যে পড়ে আবার কি সেই ডানা আমরা ফিরে পাব? কিংবা আত্মরক্ষার উপযোগী আর কোনোরকম নতুন ইন্দ্রিয় উদ্ভূত হবে?

আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন বিদ্যা, প্রাচীন সভ্যতা, প্রাচীন প্রাণ, খনির ভিতরকার পাথুরে কয়লার মতো সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। তার মধ্যে বহুযুগের উত্তাপ এবং আলোক প্রচ্ছন্ন আছে— কিন্তু আমাদের কাছে তা ঘোর অন্ধকারময়, শীতল, নিবিড়কৃষ্ণবর্ণ অহংকারের স্তূপ। অগ্নিশিখা যদি না থাকে তা হলে গবেষণাদ্বারা পুরাকালের মধ্যে গহ্বর খনন করে যতই প্রাচীন খনিজপিণ্ড তুলে আনো-না কেন তা নিতান্ত অকর্মণ্য। বরঞ্চ য়ুরোপীয়েরা তাকে ব্যবহারের মধ্যে আনতে পারে, কারণ তাদের হাতে সেই অগ্নিশিখা আছে। আমরা তাকে নিয়ে কেবল খেলা করব, কিন্তু তার যথার্থ ব্যবহার করতে পারব না। বর্তমানকালে প্রাচীন আর্যশাস্ত্র নিয়ে আমরা যেরকম খেলা আরম্ভ করেছি তাই দেখে আমার মনে এই কথা উদয় হল। আমরা মনে করছি পুনর্বার মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে টিকি প্রচলিত করে এবং হবিষ্যান্ন খেয়ে আমরা প্রাচীন আর্যজাতি হব। এ দিকে য়ুরোপীয়েরা আমাদের শাস্ত্র থেকে প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস ও শব্দবিজ্ঞান উদ্ধার করছে, আমরা যে যার ঘরে বসে নবোদ্ভূত টিকি-আন্দোলন-পূর্বক তাদের পরম মূর্খ বলে বিদ্রূপ করছি।

আজ আর-একজন সহযাত্রীর সঙ্গে বহুক্ষণ আলাপ হল। সে নতুন ভারতবর্ষে যাচ্ছে। ভারতবর্ষীয় ইংরেজের আচরণ সম্বন্ধে তাকে অনেক কথা বললুম। সে বললে : English people are very selfish, they can be very nice and all that so long as their self-interest is untouched but. . . .

আজ ডিনার-টেবিলে একটা মস্ত জোয়ান, মোটা আঙুল এবং ফুলো গোঁফ-ওয়ালা, গোরা তার সুন্দরী পার্শ্ববর্তিনীর সঙ্গে ভারতবর্ষীয় পাখাওয়ালার গল্প করছিল। সুন্দরী উল্লেখ করলে, পাখাওয়ালারা পাখা টানতে টানতে ঘুমোয়। গোরাঙ্গ বললে, তার উপায় হচ্ছে লাথি কিংবা লাঠি। এবং তাই নিয়ে উভয়ে মিলে ঘোঁট চলতে লাগল। আমার এমন অন্তর্দাহ হচ্ছিল বলতে পারি নে। এদের এমন সভ্যতা যে, এদের মেয়েদের পর্যন্ত দয়ামায়া নেই। এইরকম-ভাবে যারা সর্বদা কথা কয় তারা যে অনায়াসে পরম ঘৃণার সঙ্গে আমাদের দেশের গরিব দুর্বল বেচারাদের খুন করে ফেলবে তার আর বিচিত্র কী? আমি তো সেই অপমানিত পদদলিত জাতির একজন। কোন্ লজ্জায় কোন্ মুখে আমি এদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাই এবং ভদ্রতার দন্তবিকাশ করি! আমার নবপরিচিত বন্ধু আমার পাশে বসেছিল তাকে আমি বললুম, আমার এই ভারি আশ্চর্য মনে হয়, তোমাদের মেয়েদের মনেও দয়া নেই? সে বললে : Our women are quite callous and indifferent. Where it is fashionable to show pity they perform their part beautifully well—where it is just the other way they show an amazing lack of the so-called womanly quality। এ দিকে সভা করে, সমিতি করে, চাঁদা তুলে মহা-সমারোহের সঙ্গে দয়া করে থাকেন, অথচ উপস্থিত ক্ষেত্রে যেখানে তাঁদের চোখের সামনে একান্ত অসহায় দুর্বলের প্রতি সবলের উৎপীড়ন চলছে সেখানে দয়ার উদ্রেক নেই এবং তাই নিয়ে এই-রকম নির্লজ্জ নিষ্ঠুর বর্বরভাবে আন্দোলন! ইংরিজি ভাষা আমার তাড়াতাড়ি আসে না, বিশেষত মন যখন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। আমি বসে বসে মনে মনে ইংরিজি বানাতে লাগলুম : A gentleman is a gentleman whatever inconveniences he may have to put up with. And I think it is a gross act of cowardice to hit a fellow who can't return you blow for blow. Yes, admittedly we are a weaker people and you are very strong with your brute strength. But muscular superiority is not a thing to be particularly proud of. Perhaps you will say, 'Aren't we your superior in any other respect?' Well, you may be for aught I know but certainly you don't show it when you strike a weak helpless poor man. And for what? Imagine a miserable creature who has been working all day with perhaps

only one meal in the early morning, gives up his night's rest for the chance of earning a few more pice, and can you wonder that he should doze off to sleep and couldn't keep himself awake even to save his life? And punkha-pulling is the sovran remedy for insomnia. If ever you are troubled with sleeplessness just take your punkhawalla's place and pull your own punkha. It will do you more good than any medicine in the world. If the author of Vice Versa could write a story reversing the positions of the punkhapuller and his master it could be made a source of infinite amusement and, I hope, of instruction to the Anglo-Indian.

You always try to set our social shortcomings against our political aspirations and say, 'The people who have early marriage is not fit for self-government.' We may with greater justice say, people who bully their weaker fellow-beings, who habitually ill-treat their servants who have not the power to retaliate, who indulge in barbarous exercise of brute power whenever they imagine themselves perfectly secure, are not fit to govern any nation. Of course, moral retribution comes very slowly, but surely—it very often has no immediate means of revenge like the cowardly kick that ruptures spleen, but it is all the more thorough and unrelenting in its action. Even if these repeated insults do not arouse our miserable people from their lethargy and goad them to take God's revenge in their own hands, this unbridled exercise of tyranny is sure to react on your national character; this growing habit of revelling in the wild display of gross physical power will be one of the potent sources of your national downfall. It will undermine the true love of freedom on which your greatness rests—and maltreated humanity will thus have its awful revenge by depriving you for ever of the only source of all real powers.

What I cannot understand is how that your ladies, who are ever ready with their noisy demonstrations of pity where their pity is very often superfluous and even harmful, do not feel for the wretches who are treated in such heartless manner by their husbands and brothers before their eyes. We thank God that our early marriages and myriad other social evils have not produced such utter heartlessness in our women.

যা হোক আমার বুদ্ধি যতই বাড়তে লাগল চোর ততই দূরবর্তী হতে লাগল। তারা অন্য নানা কথায় গিয়ে পড়ল, আমি আর কিছু বলবার সময় পেলুম না—কেবল নিষ্ফল আক্রোশে রক্ত গরম হয়ে উঠতে লাগল। আমার ইংরিজি শিক্ষার অভাব আর কখনো এমন অনুভব করি নি। কোনো কিছু শিক্ষা সম্বন্ধে আমার নিজেকে এমন stupid বলে মনে হয়! কিন্তু মজা দেখেছি এক-একজন লোকের সঙ্গে এবং এক-একটা বিষয়ে আমি বেশ বলে যেতে পারি। Evans-এর সঙ্গে যখন আমার আলোচনা চলত আমি নিজে আশ্চর্য হয়ে যেতুম, বেশ গুছিয়ে বলতে পারতুম। কিন্তু যখন excited হয়ে ওঠা যায় এবং যখন ভালো রকম করে বলা বিশেষ আবশ্যক হয় তখন অনেকগুলো কথা একসঙ্গে উঠে কণ্ঠরোধ করে দেয়—গুছিয়ে নেবার সময় পাওয়া যায় না। এই অবসরে কিছু বলে নিতে পারলুম না বলে আমার নিজের উপর এমন বিরক্ত বোধ হচ্ছে! আমি সত্যি সত্যি এমন stupid, অথচ আমার বুদ্ধি নেই এ কথা বলতে পারি নে। ঘরে বসে বসে

অনেক বুদ্ধি জোটে, কিন্তু ঠিক আবশ্যকের সময় কোনোটাকে ডেকে পাওয়া যায় না।—cabin-এ ফিরে এসে Connolly-র কাছে আমার মনের আক্ষেপ ব্যক্ত করতে লাগলুম। আমি বললুম : It makes me feel wild। সে বললে : I can quite understand your feeling। বলে অনেকক্ষণ দুজনে কথা হল। তার পরে ছাতে গিয়ে আমার বন্ধুর সঙ্গেও এই নিয়ে আন্দোলন করে মন কথঞ্চিৎ ঠান্ডা হল। এমন সময়ে একজন lady এসে আমাকে গান গাইতে ডেকে নিয়ে গেল। *Good Night—Chantez—Ave Maria* গাইলুম। আমার গলার জন্যে খুব প্রশংসা পেয়েছি। আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করলে কোথায় আমার শিক্ষা। আমি বললুম মস্ত professor আমার niece-এর কাছে। তার পরে 'অলি বারবার'টা গাইতে হল। খুব ভালো বললে।

বুধবার [১৫ অক্টোবর]। সেই সুন্দরী মেয়েটি যাকে আমার খুব ভালো লাগে আমি দেখছিলুম ক'দিন ধরে সেও আমার সঙ্গে আলাপ করবার অনেক চেষ্টা করছিল, কিন্তু আমার stupidity-বশত আমি ধরা দিই নি। সে কাল রাত্তিরে আপনি এসে বললে : Are'nt you going to sing? আমি কেবল বললুম : Yes। বলে গান গাইতে গেলুম। আজ সকালে তার সঙ্গে আলাপ করলুম। তার মুখে এমন একটি প্রশান্ত গম্ভীর সুমিষ্ট earnestness আছে—এমন সুন্দর চোখ নাক এবং ঠোঁট—আমার ভারি ভালো লাগে। আমার বোধ হয় আমাকেও তার মন্দ লাগে না। একজন Australian মেয়ে আজ আমার সঙ্গে আলাপ করলে। তার সঙ্গে প্রায় ঘণ্টাদুয়েক ধরে গল্প চলেছিল। ক্রমেই গরম পড়ছে। আজ পরিষ্কার দিন, যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে সেই বলছে : What a lovely morning! আমি বলছি : Isn't it! দক্ষিণে আফ্রিকার উপকূল একটু-একটু দেখা যাচ্ছে। আমাকে বার বার quoits খেলতে অনুরোধ করেছিল, আমি অনেক করে এড়ালুম। এরা সকল বিষয়েই gambling ধরেছে।

আমার নববন্ধুর সঙ্গে ইংরাজ-সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথা হল। Anglo-Indian মেয়েদের হৃদয়হীনতার প্রসঙ্গে বলছিল, এখানকার মেয়েরা বড়ো হৃদয়হীন হয়ে গেছে—মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই মনে একটা ideal আছে, কিন্তু উত্তরোত্তর ক্রমশই তাতে আঘাত লাগছে। বলছিল, 'ছোটো ছোটো বিষয়ে দেখা যায় একজন মেয়ে একটা গাড়ির ঘোড়াকে যত হয়রান করে ঘুরিয়ে বেড়াতে পারে একজন পুরুষ তেমন পারে না। তাদের সমস্ত হৃদয় অসীম কাপড়-চোপড় সাজসজ্জার মধ্যে অহর্নিশি এত ব্যস্ত থাকে যে বাস্তবিক কোনো রকম অসুবিধাজনক বা আরামের-ব্যাঘাতজনক দয়ার কাজ করা তাদের অনভ্যস্ত হয়ে আসছে। ভারতবর্ষীয়ের প্রতি দয়া প্রকাশ করার মানে অসুবিধে সহ্য করা, চক্ষুপীড়ক দারিদ্র্যের মধ্যে প্রবেশ করা, ফ্যাশানের বিরুদ্ধাচরণ করা—সুতরাং তা লেডির পক্ষে অসম্ভব। যাকে বলে luxury of sentiment, আরামসংগত অশ্রুবর্ষণ, সুশোভন দয়া, তাই তাদের স্বভাবসিদ্ধ।'—লোকটা বোধ হয় কোনো মেয়ের কাছে আঘাত সহ্য করেছে, খুব যেন অন্তর্বেদনার সঙ্গে কথা কচ্ছিল।—আর-এক সময়ে কথায় কথায় বলছিল তার এক ছোটো বোন boy-দের সঙ্গে বেশি মেশে, তার ভাইদের সঙ্গেই বেশি বন্ধুত্ব। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন বলো দেখি; আরও অনেকের কাছে ঐ কথা শুনেছি। সে বললে : I suppose girls find their brothers much nicer than their sisters. Sisters are so spiteful to each other। বলছিল মেয়েদের বিরুদ্ধে মেয়েরা যেমন তীব্র হতে পারে এমন আর কেউ নয় : However I have my ideal of a woman somewhere in my heart—a fellow must have something of that kind—but I have given up all hopes of meeting her in the region of Reality। লোকটাকে আমার বেশ লাগছে—খুব অল্প বয়স, পড়াশুনো ভালোবাসে, মন খুলে কথা কয়। আমার সঙ্গে খুব বনে গেছে। শেষটাই সব চেয়ে মহৎ গুণ। এ লোকটা কারও সঙ্গে মেশে না। একলা একলা বসে বসে বই পড়ে এবং ভয়ানক হাসে।

ডিনারের পর আজ আবার নাচ আরম্ভ হল। খানিকটা দেখে আমার মন বিগড়ে গেল। আমি একটা ঘোর অন্ধকার কোণে বেঞ্চির উপর বসে নানা কথা ভাবছিলুম, মন্দ লাগছিল না। সমুখে

অন্ধকার রাত্রি এবং অন্ধকার সমুদ্র, থেকে থেকে phosphorescence• ঢেউয়ের মাথার উপরে অগ্নিরেখা এঁকে যাচ্ছিল— এমন সময়ে ধীরে ধীরে সেই Australian মেয়েটি আমার পাশে এসে বসল এবং অল্পে অল্পে গল্প জুড়ে দিলে। ক্রমে নাচ বন্ধ হয়ে গেল। সে আমাকে বললে, চলো music saloon-এ গিয়ে আমরা গানবাজনা করি গে। সেখেনে গিয়ে গান আরম্ভ করে দেওয়া গেল। ক্রমে ক্রমে লোক জড়ো হতে লাগল। আজ আমাকে বার বার করে অনেক রাত্তির পর্যন্ত গাইয়েছে। *Ave Maria* এবং আর দুয়েকটা গান বেশ রীতিমত ভালো করে গেয়েছিলুম। বিস্তর অপরিচিত মেয়ে জানলার ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে আমাকে বহুল সাধুবাদ দিয়ে গেল। আজ ভাবে বোধ হল আমার গান এদের বাস্তবিক ভালো লেগেছে— Indian-এর গান বলে কেবলমাত্র বিস্ময় নয়। এইমাত্র Connolly এসে আমাকে বলে গেল : I say, Tagore, you sang awfully well this evening। আমি আগে যেরকম গলা চেপে গাইতুম এখন দেখছি সেটা ভারি ভুল। Then [you'll] remember me বলে একটা গান গাইলুম। আমার নববন্ধুর সেটা ভারি ভালো লেগেছে, বোধ হয় তার ইতিহাসের সঙ্গে এর কোনো যোগ আছে। Brindisi-তে শুনছি ৮৫জন লোক উঠছে— আমাদের cabin-এ আর দুটো berth আছে, সে দুটোতেও লোক আসছে। শুনে অবধি বিষম চিন্তিত হয়ে আছি। Connolly-র সঙ্গে যেমন বনে গেছে এমন বোধ হয় কারও সঙ্গে সম্ভাবনা নেই। একরকমে ভালো— এইরকম করে experience লাভ হয়। যে মেয়েকে আমার বেশ লাগে তার নাম Miss Long। সে India-তে বিয়ে করতে যাচ্ছে, একজন কার সঙ্গে engaged। তিন Australian বোনকে মন্দ লাগছে না— তার প্রধান কারণ, আমাকে তারা বিশেষ করে বেছে নিয়েছে, এবং মন্দ দেখতে না, এবং বেশ piano বাজায়। সেদিন একটা সুর বাজাচ্ছিল আমার খুব পরিচিত, যেটা নিয়ে Park St-এ থাকতে প্রায় parody করতুম— বোধ হয় কী-একটা *Cavatina* কিংবা *Estudiantina* কিংবা *Dames de Seville* কিংবা ঐরকম একটা বিদিগিচ্ছি ব্যাপার। কিন্তু পরিচিত বলেই আমার ভারি ভালো লাগল। Australian মেয়েদের নাম Misses Bayne।

আমি মজা দেখেছি, অধিকাংশ ইংরেজ পুরুষ তাদের স্বদেশী সুন্দরীদের ছেড়ে এই অস্ট্রেলিয়ান মেয়েদের সঙ্গলালসায় ব্যস্ত। সকলেই বলে : They are very nice। আমি জিজ্ঞাসা করলুম : কেন বলো দেখি। তারা বলে : They are so unaffected, childlike, they are not at all *smart*। বাস্তবিক ইংরেজ অল্পবয়সী মেয়েরা বড্ড বেশি smart। বড্ড চোখমুখ নাড়া, বড্ড নাকেমুখে কথা, বড্ড খরতর হাসি, বড্ড চোখাচোখা জবাব। কারও কারও হয়তো লাগে ভালো, কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে একান্ত শ্রান্তিজনক। মেয়েদের বেশ unaffected simplicity এবং earnestness দেখলে বেশ একটু আরাম পাওয়া যায়, যথার্থ স্থায়ী সুখ অনুভব করা যায়।

বৃহস্পতিবার [১৬ অক্টোবর]। মেজদাদা আর লোকেনকে চিঠি লিখলুম— চিঠির কাগজ সঙ্গে ছিল না, কর্নলির কাছে ধার করতে হল। লেখা শেষ করে টেবিল থেকে উঠবার সময় টেবিলের চাদরে টান পড়ে দোয়াত চিঠি সমস্ত নীচে পড়ে গেল— চিঠির উপরে এবং চতুর্দিকে কালি ছিটকে পড়ল— অস্থির কাণ্ড! আমার মতো যথার্থ clumsy লোক দুনিয়ায় নেই।

উপরে গিয়ে বেড়াচ্ছিলুম, একজন অস্ট্রেলিয়ান মেয়ে আমার সঙ্গ নিলে। আমি দেখেছি এরকম মেশামেশি বেশিক্ষণ আমি সইতে পারি নে। আজ সন্ধের সময় সুন্দরীর সঙ্গে দুদণ্ড কথাবার্তা কয়ে এমনি শ্রান্তি এবং বিরক্তি বোধ হতে লাগল, যে, কোনো ছুতোয় পালাতে পারলে বাঁচি এমনি মনে হল। সৌন্দর্য দেখতে এবং কল্পনা করতে বেশ লাগে, কিন্তু সৌন্দর্যের সঙ্গে পায়চারি করে small talk করতে আদবে ভালো লাগে না। আমি মনে মনে মেয়েদের এত ভালোবাসি, কিন্তু তাদের সঙ্গে ভাব করতে পারি নে— আশ্চয্যি! আমার আপনা-আপনি ছাড়া আর কারও সঙ্গে কখনো বন্ধুত্ব হবে না। আজ এদের অভিনয় হয়ে গেল। আমার সেই সুন্দরী বন্ধু চমৎকার অভিনয় করেছিল, তাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। সে আমার সঙ্গে এমন একরকম

করুণ মমতার সঙ্গে কথা কয়, এমন একরকম পূর্ণ ঊর্ধ্ব দৃষ্টিতে মুখের দিকে চায়, আমার বেশ লাগে—যদিও তার সঙ্গে যে বেশি মিশি তা নয়। আজ রাত্তিরেও আমাকে গান গাইতে হল। তার পরে নিরালায় অন্ধকারে জাহাজের কাঠরা ধরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে যখন গুন্‌ গুন্‌ করে একটা দিশি রাগিণী ভাঁজছিলুম ভারি মিষ্টি লাগল। ইংরিজি গান গেয়ে গেয়ে শ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলুম, হঠাৎ দিশি গানে প্রাণ আকুল হয়ে গেল। যত দিন যাচ্ছে ততই আবিষ্কার করছি আমি বাস্তবিক আন্তরিক দিশি, বাঙালি, ঘোরো, কুনো, সেকেলে, শ্রান্ত, অকর্মণ্য—এখনকার লোক অতি শীঘ্র আমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে চলে যাবে—আমি আমার জনশূন্য কোণে চিরকাল মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকব। অনেক রাত হয়ে গেছে।

যে দুটো নাটক অভিনয় হয়ে গেল তার মধ্যে একটার নাম হচ্ছে *Our Bitterest Foe*—দ্বিতীয়টা *Fast Friends*। প্রথমটা ভালো রকম দেখতে শুনতে পাই নি—একজন দূরস্থিত লেডিকে আমার চৌকি ছেড়ে দিয়েছিলুম। প্রথমটা নেহাত অসম্ভব-রকম sentimental, বিশেষ কিছু নয়। দ্বিতীয়টা ভারি মজার, আর বেশ অভিনয় হয়েছিল। ছবি-আঁকা programme-গুলো বেশ করেছিল।

আজ একজন সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সে Christianity-র অনেক প্রশংসা করে বলছিল, আশ্চর্য দেখেছি তোমাদের মধ্যে যদিও খৃস্টানধর্ম প্রচলিত নেই তবু তোমাদের নিম্ন-শ্রেণীয় লোকেরাও এমন gentle এবং refined! ইংরেজ ছোটোলোকেরা আস্ত brute। তার থেকে আমি Anglo-Indianদের কথা তুলে আমার মনের সাধ মিটিয়ে কতকগুলো কথা বলে নিলুম। আমার ইচ্ছে আছে আমাদের টেবিলের সুন্দরীকে এ সম্বন্ধে একবার ভালো করে বলব—আগে থেকে মিষ্টি দিয়ে সম্পূর্ণ বশ করে আনা যাক। কাল তাকে এক প্যাকেট butterscotch দিয়েছি। আমি যে ভালো রকম করে মেয়েদের সাহচর্য করতে পারি নে—সে আমাকে অনেক অবসর দিয়েছিল।

শুক্রবার [১৭ অক্টোবর]। আজ সকালে আর-একজন Anglo-Indian-এর সঙ্গে কথা হল, তাকেও মনের সাধে অনেক কথা বলেছি। সে Northwest-এর কোন্‌-এক জায়গার ম্যাজিস্ট্রেট। সে অনেক দুঃখ প্রকাশ করলে; সে বললে, ভারতবর্ষীয়দের প্রতি সদ্‌ব্যবহার করলে তারা ভারি বাধ্য হয়। আজ বিকেলে Malta-য় জাহাজ পৌঁছবে—নাবব না মনে করছি। জাহাজে একলা বসে আরামে পড়ব। হাতে টাকা থাকলে এখান থেকে বাড়ির জন্যে কিছু কিনে নিয়ে যেতুম। এখনো বম্বে পৌঁছতে দিন পনেরো-ষোলো লাগবে—এক-এক সময়ে মনের মধ্যে এমন ছেলেমানুষের মতো অধৈর্য উপস্থিত হয়! আমার নিজেকে আলোচনা করলে আমার নিজের হাসি পায়। আমার অস্ট্রেলিয়ান বন্ধু আজ প্রায় সমস্ত দিন আমার সঙ্গে আছে, আমাকে আজ পড়তে দিলে না। বিকেলের দিকে Malta দেখা দিলে—কঠিন দুর্গপ্রাকারে বেষ্টিত অট্টালিকাখচিত শহর, দূর থেকে দেখে নাবতে ইচ্ছে করে না। অস্ট্রেলিয়ান মেয়েদের এইখেনে নেবে যাবার কথা। অনেক লোক এইখেনে নাববে। তাই জিনিসপত্র তোলা নিয়ে বিষম হট্টগোল বেধে গেছে। আমি মাল্টা দেখতে যাব না শুনে আমার অস্ট্রেলিয়ান বান্ধবী ভারি পীড়াপীড়ি করছে। আমার নববন্ধু Gibbs-কে বলছিল : Do induce him to come on shore, then we shall meet again at the Grand Hotel। শেষকালে রাজি হলুম। Gibbs-এ আমাতে মিলে বেরোনো গেল। সমুদ্রের ধার থেকে সুড়ঙ্গপথের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ ঘাটের মতো উঠেছে—সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে শহরে উঠলুম। চার দিক থেকে guide-এর দল ছেঁকে ধরলে। Gibbs তাদের তাড়িয়ে দিলে। একজন কিছুতেই সঙ্গ ছাড়লে না—সে যত আমাদের এটা ওটা দেখায়, পথ বাতলে দেয়, Gibbs ততই বলতে থাকে : Don't want your service—Won't pay you। সে যে দিকে যেতে বলে তার উল্টো দিকে যায়। কিন্তু তবু সে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে লেগে ছিল—তার পরে যখন তাকে নিতান্ত তাড়িয়ে দিলে তখন সে চলে গেল। আমার ভারি মায়া করছিল, কিন্তু আমার সঙ্গে

পাউন্ড ছাড়া কিছুই ছিল না। Gibbs বললে, আমি ওকে এক ফার্দিংও দেব না—কোনো Englishman হলে প্রথমবার বললেই চলে যেত। Gibbs মহা চটে গেল—আমার ভারি মায়া করতে লাগল। ইংরেজে বাঙালিতে এমনি জাতীয় প্রভেদ। অথচ বুঝতে পারছি কেন সে চটছে। আমি দেখছি লোকটার আচরণ যেমনি হোক-না-কেন, বড্ড গরিব এবং বড়ো আশা করে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। Gibbs বলছে : He must be very hard up to follow us thus but no Englishman would do it। তার আচরণ এত খারাপ লাগল যে তার দারিদ্র্য দেখে দয়া হল না। বেশ বোঝা যায় একজন ইংরেজ ভারতবর্ষে গিয়ে আমাদের দিশি লোকের প্রতি ক্রমে ক্রমে কিরকম করে চটে যায়—বিলিতি নিয়মানুসারে যেগুলো ত্রুটি সেইগুলো এত দিক থেকে এত চোখে পড়ে যে, আমাদের জাতির যেগুলো বিশেষ গুণ সেগুলো তারা দেখতে পায় না। বিলিতি দোষ দেখলে তারা এত আপত্তি করত না, কিন্তু অপরিচিত দোষ তাদের অসহ্য বোধ হয়। শহরটা নতুন রকমের। পাথরে বাঁধানো সরু রাস্তা—একবার পাহাড়ের উপরে উঠছে একবার নীচে নাবছে—বিশ্রী গন্ধ—গোলমাল—কী এক রকমের। একটা Roman Catholic Church-এর মধ্যে প্রবেশ করে দেখলুম—প্রকাণ্ড ঘর, চারি দিকে খৃস্ট এবং সেন্ট্‌দের মূর্তি, বেদীর সামনে বাতি জ্বলছে; একরকম গাম্ভীর্যজনক অন্ধকার, ঘর গম্‌ গম্‌ করছে, বেদীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে মেয়ে পুরুষে গুন্‌ গুন্‌ স্বরে স্তব পাঠ করছে, সবসুদ্ধ জড়িয়ে মনকে যেন কী এক রকম oppress করতে থাকে। এখানকার মেয়েদের শিরোভূষা অদ্ভুত রকমের, গাড়ির hood-এর মতো একরকম overhanging ঘোমটা। খুব ছোটো ছোটো মেয়েদের বেশ দেখতে—জ্বল্‌জ্বলে কালো চোখ—দেখে বেলিকে মনে পড়ছিল—কিন্তু একটিও ভালো দেখতে বড়ো মেয়ে দেখলুম না। পথে যেতে যেতে Australian বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। বললে : Grand Hotel-এ এসে dinner কোরো, তা হলে আর-একবার দেখা হবে। একটা দোকানে গিয়ে পলার গয়না এবং রুপোর brooch কেনা গেল। Gibbs-এর চিঠি post করবার ছিল, তাই post office-এ যাওয়া গেল। একটি সুন্দর দেখতে ইংরেজ মেয়ে টিকিট বিক্রি করছে, Gibbs তার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্তা কইলে; বেরিয়ে এসে বলছে : Isn't she awfully nice looking? Grand Hotel-এ এসে তার মনে পড়ল একটা পার্সেল পোস্ট্‌ করবার আছে, মনে পড়তেই হুর্‌রে বলে নাচ আরম্ভ করে দিলে—আমরা তখন নাবার ঘরে : So I am going to have another chance of seeing her। কিন্তু বেচারার অদৃষ্টে সে chance জুটল না। ফিরে গিয়ে দেখা গেল post office বন্ধ। Hotel-এ গিয়ে দেখি আমাদের জাহাজের বিলকুল লোক সেখেনে জুটেছে, জাহাজের ডিনার-টেবিলের সঙ্গে কোনো তফাত নেই। কিন্তু অতি যাচ্ছেতাই খেতে দিলে—বদ গন্ধ, বদ জিনিস, অল্প পরিমাণ, বেশি দাম। আমি তো আধেক জিনিস মুখে দিয়ে ফেলে দিলুম। বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। Government House-এর সামনে একটা বড়ো বাঁধানো square আছে—সেইখানে সন্ধের সময় লোকসমাগম হয়, band বাজে। সেইখানে আমরা জুটলুম। পরিষ্কার রাত্রি, কিছুমাত্র শীত নেই, সুন্দর band বাজছে—বেশ লাগছিল। চার দিকে বাগান থাকত তো আরও ভালো হত। এ কেবল একটা প্রকাণ্ড বাঁধানো প্রাঙ্গণের মতো। এক দিকে Government House, এক দিকে Grand Hotel, এক দিকে রক্ষকশালা, আর-এক দিকে কী মনে পড়ছে না। রাত যখন দশটা বাজে তখন জাহাজ-অভিমুখে ফেরা গেল—দুই-এক জায়গায় সিঁড়ি দিয়ে নেমে, দুই-এক জায়গায় উঁচু রাস্তা দিয়ে উঠে, নিচু রাস্তা দিয়ে নেমে, সমুদ্রতীরে পৌঁছে নৌকো নিয়ে জাহাজে যাওয়া গেল। পথের মধ্যে একদল পথপ্রদর্শক আমাদের টানাটানি লাগিয়ে দিয়েছিল—Gibbs দুজন সৈন্য ডেকে তাদের তাড়িয়ে দিলে এবং সৈন্য দুজন আমাদের বরাবর পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। নৌকোওয়ালা বললে, ১৮ পেনির কমে যাব না। Gibbs নাছোড়বান্দা—P & O Office-এ গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে কত ভাড়া। তারা বললে, যদি P & O Passenger হও তা হলে ৪ পেনি দিতে হবে। বলে সে নিজে এসে আমাদের নৌকোয় তুলে দিলে। Gibbs ভারি রাগান্বিত যে

বিদেশী দেখে আমাদের ঠকাবার চেষ্টা। কাজেই আমাকে গল্প করতে হল একজন লন্ডন-গাড়িওয়ালা কী করে আমাদের কাছে পাঁচ শিলিঙের জায়গায় আঠারো শিলিং নিয়েছিল। সে সম্বন্ধে সে কোনো উত্তর করলে না। বোধ হয় বা বিশ্বাস করে নি।

শনিবার [১৮ অক্টোবর]। আজ সমস্ত সকাল Gibbs-এর সঙ্গে গল্প হচ্ছিল। সে একজন bank-এর কর্মচারী। সে বলছিল, তুমি কল্পনা করতে পারো না young clerk-রা কী জঘন্য কথাবার্তা এবং গল্প করে! বললে, ইংলন্ডে smutty talk সর্বত্র প্রচলিত। এমন-কি, মেয়েদের মধ্যেও। সে যা বললে শুনে অবাক হয়ে গেলুম। সে বললে sober এবং decent fellow-দের বিষম মুশকিল, সর্বদা এমন দলে মিশে থাকতে হয় যে সে অতি ভয়ানক। সে বলে, আমরা নিতান্ত hypocrite জাত—বাইরে ভারি respectable, ফরাসি নভেলের নিন্দে করে থাকি, কিন্তু সর্বদা যেরকম কথাবার্তা এবং আমোদপ্রমোদ চলে সে আর বলবার বিষয় নয়। আমি বেশ বুঝতে পারলুম আমাদের দিশি যারা বিলেতে যায় তারা কোথা থেকে বদ্‌ কথা এবং জঘন্য গল্প শিখে আসে। আমাদের lunch-এর পরে মেয়েরা উঠে গেলে টেবিলে Bayley-র সঙ্গে Gibbs-এর লন্ডনের city-অঞ্চলে কিরকম কাণ্ড চলে তাই গল্প চলছিল। Bayley বলছিল : I am sorry to say আমার young days-এ আমিও অনেক কাণ্ড করেছি। ইত্যাদি। Gibbs লোকটাকে বেড়ে লাগছে—মদ খায় না, gambling-এ যোগ দেয় না, মেয়েদের সঙ্গে সর্বদা রহস্যালাপ করে না, অথচ কড়া ধার্মিকতা বা গোঁড়া ক্রিশ্চানি কিছুমাত্র নেই। বেশ সচরাচর ভদ্রলোকের স্বভাবত যেমন হওয়া উচিত সেইরকম। তার একটা আচরণ আমার সব চেয়ে ভালো লেগেছিল—কাল post office-এর সেই মেয়ের সঙ্গে কেমন বেশ সহজ ভদ্র ভাবে কথাবার্তা কইলে। লোকেনরা যেমন দোকানদার সুন্দরীদের সঙ্গে ইয়ার্কি দেবার চেষ্টা করে Gibbs-এর আচরণে তার লেশমাত্র ছিল না। সৌন্দর্যের প্রতি এইরকম সসম্মান আনন্দের ভাব আমার ভারি ভালো লেগেছিল—এ লোকটার সঙ্গে আমার ঠিক মনের মিল হয়েছে। এর সঙ্গে সমস্ত ক্ষণ গল্প করতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হয় না। Connolly বোধ হয় ভারতবর্ষে গিয়ে দেখতে দেখতে বদলে যাবে। এরই মধ্যে সে একটা দলের মধ্যে পড়ে কেবল তাস খেলছে, চুরোট খাচ্ছে, gamble করছে—একটা আবর্তের মধ্যে ঘুরছে। Gibbs বলছিল সকলে মিলে Connolly-র মাথা খাচ্ছে।

আজ ডিনার-টেবিলে smuggling-এর গল্প হচ্ছিল। কে কখন কী কৌশলে কত smuggle করেছিল তাই নিয়ে জাঁক করছিল। Mrs. Smallwood একবার ইংলন্ডের custom house-কে ফাঁকি দিয়েছিল শুনে Bayley বলছিল : Don't you think that was wrong? Mrs. Smallwood বললে : No, I am proud of it। এরকম জুয়াচুরিতে এদের conscience কিংবা সত্যপ্রিয়তায় আঘাত লাগে না। এরা বুঝতে পারে না এক-এক জাতের এক-এক বিষয়ে নীতিজ্ঞানের জড়তা থাকে। কৌশলে মিথ্যাচরণপূর্বক smuggle করা সম্বন্ধে ইংরেজদের এখনো ধর্মবুদ্ধির উদ্রেক হয় নি; কিন্তু তার থেকে কেউ যদি মনে করে, তবে ইংরেজরা মিথ্যাচারী এবং জোচ্চোর, তা হলেই ভুল করা হয়। আমাদের জাতের দোষগুণ সম্বন্ধে যখন ইংরেজরা generalize করে তখন এইটে তারা ভুলে যায়।

Miss Hedisted-কে আজ সেদিনকার পাখাওয়ালা সম্বন্ধে বলেছি। সে বললে, ভারতবর্ষে অনেক cads যায় যারা এইরকম করে—ভারি অন্যায়—ইত্যাদি। যা হোক, বলে মন খোলসা হল। Miss Long যখন কথা হয়, হাসে, এমন চমৎকার দেখতে হয়—আমার দেখতে ভারি ভালো লাগে—যেমন সুন্দর দেখতে তেমনি intellectual মুখের ভাব।

রবিবার [১৯ অক্টোবর]। আজ ভোরে Brindisi-তে পৌঁছনো গেল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। এক-দল গাইয়ে বাজিয়ে হার্প্‌ বেয়ালা ম্যান্ডোলিন্‌ নিয়ে ছাতা মাথায় জাহাজের সামনে দাঁড়িয়ে বাজাচ্ছে এবং একটা ছোটো ছেলে গান গাচ্ছে—বেশ লাগছে। বৃষ্টির জন্যে নাবতে পারলুম না। আমার ডেক্‌চৌকি পিয়ানো আপিসে পড়ে আছে। আজ বিকেলে বোধ হয় চিঠি পাওয়া

যাবে।—বৃষ্টি থেমে গেছে। Gibbs আমাকে টানাটানি করে ডাঙায় নিয়ে গেল। রাস্তায় যেতে যেতে এক জায়গায় দেখলুম একটা উঁচু জমির উপর কতকগুলো ভাঙা পাথরের সিঁড়ি উঠেছে, উপরে উঠে একটা পুরোনো গির্জা পাওয়া গেল। ভিতরে গিয়ে দেখলুম নানা রকম টুকিটাকি দিয়ে সাজানো—খুব গরিব রকমের ব্যাপার। বেদীর এক জায়গা থেকে একটা পর্দা উঠিয়ে দেখালে ক্রাইস্টের মোমের প্রতিমূর্তি শয়ান অবস্থায় রয়েছে—সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, রক্ত ঝরে পড়ছে। অতি ভয়ানক—এমনতর realistic কাণ্ড কখনো দেখি নি। সেখেন থেকে বেরিয়ে একটা উঁচু রাস্তা ধরে শহরের বাইরে গিয়ে পড়লুম—দুই ধারে cactus-বেড়া-দেওয়া শস্যক্ষেত্র এবং ফলের বাগান। একটা ফলের বাগানে ঢুকে পড়া গেল। আঙুরের লতাকুঞ্জে থোলো থোলো আঙুর ফলে রয়েছে। একরকম গোলাপি আঙুর চমৎকার দেখতে—একরকম সরু সরু লম্বা আঙুর, ইতিপূর্বে কখনো দেখি নি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পাহাড়ে রাস্তা শুকিয়ে গেছে—কেবল দুই ধারে নালায় মাঝে মাঝে জল দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাস্তার ধারে fig গাছে দুটো ছোকরা ফিগ পেড়ে পেড়ে খাচ্ছিল—আমাদের চেঁচিয়ে ডেকে ইশারায় জিজ্ঞাসা করলে আমরা fig খাব কিনা। আমরা বললুম, না। খানিক বাদে দেখি, তারা ফলবিশিষ্ট একটা ছিন্ন অলিভ-শাখা নিয়ে এসে হাজির। জিজ্ঞাসা করলে, অলিভ খাবে? আমরা বললুম, না। তার পরে ইশারায় জানিয়ে দিলে যে, খানিকটা তামাক পেলে তারা বড়ো খুশি হয়। Gibbs তাদের খানিকটা তামাক দিলে। তার পরে বরাবর তারা আমাদের সঙ্গে চলল—প্রবল অঙ্গভঙ্গি-দ্বারা উভয়পক্ষ মনোভাব ব্যক্ত করতে লাগল। জনশূন্য রাস্তা পাহাড়ে জমির ও ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে বরাবর চলেছে—কেবল মাঝে মাঝে এক-একটা ছোটো ছোটো বাড়ি এবং এক-এক জায়গায় শাখাপথ নীচের দিকে নেবে বক্রগতিতে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ফেরবার মুখে একটা গোরস্থানে ঢুকলুম। এদের গোর নতুন রকমের। গোরের উপরে এক-একটা ঘরের মতো—পর্দা দিয়ে, রঙিন জিনিস দিয়ে নানা রকমে সাজানো—একটা বেদীর উপরে অনেকগুলো শামাদানের উপর বাতি লাগানো রয়েছে এবং সাধুদের অথবা কুমারীর প্রতিমূর্তি। কোনো কোনো ঘরে মৃত-ব্যক্তির প্রতিমূর্তি আছে। বোধ হয় আত্মীয়েরা এসে নানা রকম করে সাজিয়ে-গুজিয়ে যায়। এক জায়গায় সিঁড়ি দিয়ে নেবে মাটির নীচেকার একটা ঘরে গিয়ে দেখলুম স্তূপাকারে অসংখ্য মড়ার মাথা সাজানো রয়েছে, বোধ হয় পুরোনো গোর থেকে তুলে ঐরকম করে রেখে দিয়েছে—কত বৎসরের কত সুখদুঃখের এই একমাত্র অবশেষ। ঐ বাক্যহীন, দৃষ্টিহীন, চিন্তাহীন নিশ্চল ভীষণ স্তূপের মধ্যে হয়তো এমন অনেক মাথা আছে জীবিত অবস্থায় যার স্পর্শলাভ করলে অনেক হতভাগ্য কৃতার্থ হয়ে যেত। দৈবাৎ হয়তো তাদের দুটো মাথা পরস্পর পাশাপাশি স্থাপিত হয়েছে—এখন কি ঐ অন্ধকার নেত্রকোটর দিয়ে তারা পরস্পরকে চিনতে পারছে। হায়, যে স্পর্শসুখ এক কালে এক মুহূর্তের জন্যে বহুমূল্যবান ছিল এখন তা চিরদিনের জন্যে নিষ্ফল। উঃ—ঐ মাথা-গুলোর ভিতরে কত চিন্তা কত স্মৃতি সঞ্চিত ছিল, কত দুরাশা ওর মধ্যে দুর্গ নির্মাণ করেছিল—ওদের মধ্যে থেকে যে-সকল চেষ্টা যে-সকল কার্য উদ্ভূত হয়েছিল তারা এখনো এই পৃথিবীর কত দিকে কত আকারে প্রবাহিত হচ্ছে, তাদের চিরধাবিত বিচিত্র গতি কেউ বন্ধ করে দিতে পারে না—কেবল ওরাই চিররাত্রিদিনের মতো নিশ্চল নিশ্চেষ্ট নির্জীব সৌন্দর্যলেশবিহীন। জীবন এবং সৌন্দর্য এই অসীম মনুষ্যলোকের উপরে যেন একটা চিত্রিত পর্দা ফেলে রেখেছে—আস্তে আস্তে পর্দা তুলে দেখো, ভিতরে লাবণ্যবিহীন অস্থিকঙ্কাল, জ্যোতিহীন চক্ষুকোটর, এবং বুদ্ধিবিহীন কপালফলক। হঠাৎ যদি কোনো নিষ্ঠুর শক্তি নরসংসার থেকে এই যবনিকা উঠিয়ে ফেলে তা হলে সহসা দেখা যায় সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এই চুম্বনমধুর আরক্ত অধরপল্লবের অন্তরালে শুষ্ক শ্বেত দন্তপঙ্‌ক্তি কী বিকট বিদ্রূপের হাস্য করছে! পুরোনো বিষয়, পুরোনো কথা—ঐ নরকপাল অবলম্বন করে অনেক নীতিজ্ঞ পণ্ডিত অনেক বিভীষিকা প্রচার করেছে। কিন্তু আমি যখন দাঁড়িয়ে দেখলুম এবং ভালো করে ভাবলুম আজ আমার এই-যে মাথা ভাবছে এবং ভালোবাসছে কিছুদিন পরে সংসারের ঐ চিরবিস্মৃত অসীম স্তূপের মতো ভুক্ত হতে পারে, তখন মনের মধ্যে

একরকম বিষণ্ণ বৈরাগ্য উদয় হল বটে, কিন্তু কিছুমাত্র ভয় হল না। ভাবলুম আর যাই হোক, ঐ সহস্র সহস্র মাথা অনিদ্রা দুশ্চিন্তা দুশ্চেষ্টা দুরাশা থেকে চিরদিনের মতো আরোগ্য লাভ করেছে। তার সঙ্গে এও ভাবলুম, Rowland-এর ম্যাকাসার অয়েল পৃথিবীতে প্রতিদিন শিশি ভরে ভরে বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু কোনোকালে এদের তার এক ফোঁটা আবশ্যক হবে না—এবং দন্তমার্জন-ওয়ালারা যতই প্রচুর বিজ্ঞাপন প্রচার করুক-না কেন, এই অসংখ্য অসংখ্য দন্তশ্রেণী তার কোনো খোঁজ নেবে না।—শেষোক্ত চিন্তাটা প্রসঙ্গের উপযোগী গম্ভীর নয়, কিন্তু আমাদের চিন্তারাজ্যে জাতিভেদ এবং পৃথক আসনের প্রথা নেই। আমরা লেখবার সময়ে অনেক বিচার করে নির্বাচন করে লিখি, কিন্তু ভাববার সময় হযবরল করে ভাবি। আত্মা পরমাত্মা সম্বন্ধে তর্ক করতে করতে হঠাৎ মনে পড়ে অনেক ক্ষণ তামাক খাওয়া হয় নি, এবং যখন পিঠের ঠিক মাঝখানটা চুলকোচ্ছে এবং কিছুতেই নাগাল পাচ্ছি নে তখন প্রেয়সীর ভুবনমোহিনী মূর্তি মনে উদয় হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়।

যাই হোক গে, আপাতত আমার এই মাথার খুলিটার মধ্যে চিঠির প্রত্যাশা বিজ্‌বিজ্‌ করছে—যদি পাওয়া যায় তা হলে এই খুলির মধ্যে খুব খানিকটা খুশির উদয় হবে, যদি না পাওয়া যায় তা হলে ঐ অস্থিগহ্বরের মধ্যে আজকের দিনের মতো দুঃখ-নামক ভাবের সঞ্চার হবে, ঠিক মনে হবে আমি ভারি কষ্ট পাচ্ছি। এই মাথাটার পক্ষে গোটাকতক কথা-অঙ্কিত পত্রখণ্ডের কী এমন গুরুতর আবশ্যক কিছু বোঝবার জো নেই। আজ চিঠি না পাওয়ার দরুন সেদিনকার মহানিদ্রার কি কিছু ব্যাঘাত ঘটবে? সেদিন ইচ্ছানিরপেক্ষ যে চিরবিশ্রাম জুটবে আজ তার ছায়ামাত্র পেলে বেঁচে যাই। ‘মরণ হলে ঘুমিয়ে বাঁচি’ কথাটার মধ্যে মানবজীবনের অনেক বেদনা ব্যক্ত হয়েছে। এই fever of life-এ দীর্ঘ রাত্রিদিন কেবল এপাশ ওপাশ করা যাচ্ছে—ঘুম আর আসে না।

রাত্রি সাড়ে-দশটা পর্যন্ত চিঠির জন্যে অপেক্ষা করে জানতে পারলুম চিঠি পাওয়া যাবে না। চিঠি আমার পিছনে পিছনে কলকাতায় যাত্রা করবে। দূর হোক গে, শুতে যাওয়া যাক। ঘুম আসছে, এমন সময় লোকেন আর সল্লির চিঠি পেলুম। টফি লেগে সল্লির চিঠির আর্ধেক পড়া গেল না। লোকেন লিখছে ছোটো বউয়ের চিঠি পাঠিয়েছে, কিন্তু পেলুম না।

সোমবার [২০ অক্টোবর]। সমস্ত দিন seasick—অসহ্য যন্ত্রণা। কিচ্ছু খাই নি।

মঙ্গল [২১ অক্টোবর]। উঠে একটু breakfast করেছি, আজ ভালো বোধ হচ্ছে। আমি আমার কোণে চুপ করে বসে থাকি—Miss Long যতবার আমার সমুখ দিয়ে চলে যায় আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে যায়, আমিও হাসি; মনে হয় এর পরে উঠে গিয়ে তার সঙ্গে একটু আলাপ না করা rude হয়ে পড়ছে; কিন্তু কিছুতে হয়ে ওঠে না। আজ সন্ধের সময় পাশে দাঁড়িয়ে দু-একটা কথা বললুম। বললুম : It was unkind of you Miss Long to look so aggressively well yesterday while we were all so miserable। Miss Long বললে : I was awfully sorry for you, you looked so bad। তার পরে অনেক গল্প হল। আজ সন্ধের সময় আবার এক-চোট নৃত্য হয়ে গেল। Miss Vivian-এর সঙ্গে আমি গল্প করছিলুম; সে বলছিল : It always seemed to me something weird, this dancing on board a steamer। আমি বললুম : Yes, it is so out of harmony with the surroundings, with the beautiful, peaceful moonlight night yonder ইত্যাদি। Miss Vivian বেশ প্রশান্ত মৃদুস্বভাব মেয়ে—বেশ মেয়েলি রকমের পড়াশুনো ভালোবাসে, আমার সঙ্গে কবিতা নিয়ে অনেক কথা হল। সে দুই-একজন কবিমেয়েকে জানে : It is a great gift, but poets are not a happy lot। আমি বললুম : To be sure, they are not। সে জানে না আমি সেই হতভাগ্য gifted দলের একজন। Mrs. Goodchild আমাকে বলছিল : I have heard you have got a very clever sister। বোধ হয় বাবিকে মনে করে বলছিল। Gibbs নাচতে ভালোবাসে না, যদিও তার বয়স ২১ মাত্র—সেইজন্যে তাকে আমার আরও ভালো লাগে। আজ বেশ জ্যোৎস্না রাত্তির হয়েছে।

বুধ [২২ অক্টোবর]। ক্রমেই গরম বাড়ছে। আজ লোকেনকে চিঠি লিখলুম। মাঝে একবার Miss Long এসে তার birthday book-এ আমার নাম লিখিয়ে নিয়ে গেল। একজন লেডির প্রতি একজন যুবক যেরকম ব্যবহার করে Gibbs আমার প্রতি অনেকটা সেইরকম ব্যবহার করে। আমার গ্লাসে জল ঢেলে দেয়, ডিনার-টেবিলে আমাকে নানাবিধ খাবার জোগায়, ছোটোখাটো নানা বিষয়ে আমার সাহায্য করে—অনেক সময়ে আমি লজ্জিত হয়ে পড়ি। বোধ হয় আমার মধ্যে সে একরকম অকর্মণ্য অসহায় মৃদুভাব দেখতে পায়, যাতে করে তার স্বাভাবিক পৌরুষিক স্নেহ উদ্রেক করে।

Mrs Fraser আমাকে tea party-তে নিমন্ত্রণ করেছিল। আমি Browning পড়ছিলুম দেখে সে ভারি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় একজন বৃদ্ধ লোক এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে : Are you not one of the Tagores? আমি বললুম, হাঁ। সে বললে, তোমার sister-কে কোন্‌-এক পার্টিতে দেখেছিলুম, তোমার মুখ দেখেই তার সঙ্গে সাদৃশ্য টের পেয়েছিলুম—My name is Schiller। ইত্যাদি।

সমুদ্রে চন্দ্রোদয় দেখলে মনের মধ্যে এমন একটা বৈরাগ্য, এমন একটা ঔদাস্য এনে দেয়! এই অসীম সমুদ্র এই অনন্ত রাত্রির এক ধারে একটুখানি আলো, একটুখানি ঝিকিমিকি। মনে হয় আমাদের জীবন এইরকমের—অসীম সংশয়ের মধ্যে একটুখানি বিষণ্ণ দিশাহারা আলোকরেখা, বাঁচবে কি মরবে কিছু ঠিকানা নেই। ঐ সমুদ্রের পরপারে আস্তে আস্তে নিবে যাবে, অসীম জলরাশি গম্ভীর মৃত্যুর গান গাবে—তার পরে আবার আঁধার রাত্রি। মনে হয় আমাদের জীবন প্রকৃতির আভ্যন্তরিক কোন্‌-এক শক্তির ক্ষণিক চেষ্টা, ক্ষণিক উত্থান; থেকে থেকে অবিশ্রাম মাথা তুলে উঠছে, কিন্তু চার দিক থেকে অসীম জড় এবং অসীম মৃত্যু এসে তাকে আচ্ছন্ন করে নির্বাপিত করে দিচ্ছে। বহু চেষ্টায় প্রকৃতি যেমনি আপন অন্তর্নিহিত প্রতিভাকে পুষ্প-আকারে বিকশিত করে তুলছে অমনি দেখতে দেখতে মাটি তাকে টেনে মাটি করে দিচ্ছে। ইতস্ততর্বিক্ষিপ্ত বিন্দু বিন্দু জীবনের তুলনায় এই চিরস্থায়ী চিরনীরব মৃত্যু এই সর্বব্যাপী জড়ত্বের অবিশ্রাম অলক্ষ্য মাধ্যাকর্ষণ কী প্রবল! যেমনি জীবন শ্রান্ত হয়ে আসে, যেমনি চেষ্টা একটু শিথিল হয়ে আসে, অমনি ঝরে যেতে হয়, পড়ে যেতে হয়—অমনি হুহু করে ভেসে কোথায় মিলিয়ে যেতে হয় অনন্ত ইহজগতে তার আর কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। এইরকম করে মহারাক্ষস মৃত্যু জীবন গ্রাস করে করে চিরদিন বেঁচে রয়েছে। মিছে কেন তর্কবিতর্ক মতামত সন্দেহবিচার! এই ক্ষণিক সূর্যালোকে আমাদের দুদণ্ডের হাসিগল্প মেলামেশা, পরস্পরের প্রতি বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি এবং প্রেমপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা—চন্দ্রোদয়, ফুল-ফোটা বসন্তের বাতাস, দুদিনের মোহ সমাপন করে নেওয়া যাক—যবনিকার অন্তরালে মৃত্যু প্রতীক্ষা করে বসে আছে। কোন্‌ অসম্ভব সুখ কোন্‌ দুর্লভ ভালোবাসার জন্যে চিরদিন নির্বোধের মতো অপেক্ষা করে বসে আছি—আমাদের কি অপেক্ষা করবার সময় আছে! যা হাতের কাছে আসে তাই নিয়ে প্রসন্নচিত্তে কাটিয়ে দেওয়া যাক—তাড়াতাড়ি করে জীবনকে যথাসাধ্য সম্পূর্ণ করে তুলতে হবে। তুমি দৈবক্রমে আমার কাছে এসে পড়েছ, এসো—তুমি আমার ভালোবাসা চাও না, যাও, আপন পথে যাও—জিজ্ঞাসা করবার সময় নেই—বিলাপ করবার অবসর নেই—সুখ দুঃখ হিসাব করবার আবশ্যক নেই। যা পাব না প্রসন্নচিত্তে তার মঙ্গল কামনা করে তার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া যাক।

জাহাজের রেলিং ধরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে এইরকম করে আপনার জীবন সমালোচনা করছিলুম, এমন সময় একজন এসে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কেউ হও কি? আমি বললুম বিশেষ কেউ নয়, তাঁর ভাইমাত্র। এও সিভিলিয়ান। ৮৬ সালে তাঁর হয়ে সোলাপুরে এক্‌টিন ছিল, বাবিকে জানে। Brand-কে জানে—বেশ পিয়ানো বাজাতে পারে, ভারি কুনো। Mrs Moeller আমাকে গান গাইতে অনুরোধ করলে, সে আমার সঙ্গে পিয়ানো বাজালে। Mrs Moeller বললে :

It is a treat to hear you sing। Webb এসে বললে : What would we do without you Tagore— there's nobody on board who sings so well। যা হোক, জাহাজে এসে আমার গান বেশ appreciated হচ্ছে। আসল কথা হচ্ছে এর আগে আমি যে ইংরিজি গানগুলো গাইতুম কোনোটাই tenor pitch-এ ছিল না, তাই আমার গলা খুলত না। এবারে সমস্ত উঁচু pitch-এর music কিনেছি, তাই এত প্রশংসা পাওয়া যাচ্ছে।

কাল Miss Long-কে জিজ্ঞাসা করছিলুম, এই কি তোমার প্রথম ভারতযাত্রা? সে একটু হেসে আমার দিকে চেয়ে খুব জোর দিয়ে বললে : Do you know Mr Tagore, I am a born Anglo-Indian! আমি কিনা অনেক লোকের কাছে অনেকবার Anglo-Indian-দের সম্বন্ধে আক্রোশ প্রকাশ করেছি, বোধ হয় শুনেছে। Miss Long পুনায় যাচ্ছে।

রাত দুটোর সময় জাহাজ পোর্ট সৈয়েদে পেঁছল, Gibbs আমাকে নাববার জন্যে অনেক পীড়াপীড়ি করলে, আমি নাবলুম না। আমার ক্যাবিনের অন্য দুজন নেবেছিল।

বৃহস্পতিবার [২৩ অক্টোবর]। এখন সুয়েজ খালের মধ্যে দিয়ে চলেছি। আমাদের যাত্রার আরও এগারো দিন বাকি আছে। এগারোটা দিন আসলে কত অল্প, কিন্তু কী অসম্ভব দীর্ঘ মনে হচ্ছে!

চমৎকার লাগছে। উজ্জ্বল উত্তপ্ত দিন। একরকম মধুর আলস্যে পূর্ণ হয়ে আছি। য়ুরোপের ভাব একেবারে দূর হয়ে গেছে। আমাদের সেই রৌদ্রতপ্ত শ্রান্ত দরিদ্র ভারতবর্ষ, আমাদের সেই ধরাপ্রান্তবর্তী অপরিচিত বিস্মৃত নিভৃত ছায়াস্নিগ্ধ নদীকলধ্বনিসুপ্ত বাংলাদেশ, আমার সেই অকর্মণ্য গৃহপ্রিয় বাল্যকাল, আমার ভালোবাসা-লালায়িত কল্পনাক্লিষ্ট যৌবন, আমার নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম চিন্তাশীল অতিব্যথিত জীবনের স্মৃতি এই সূর্যকিরণে এই তপ্তবায়ুহিল্লোলে সুদূর মরীচিকার মতো আমার স্বপ্নভারনত দৃষ্টির সামনে জেগে উঠছে। আমি প্রাচ্য, আমি আসিয়াবাসী, আমি বাংলার সন্তান, আমার কাছে য়ুরোপীয় সভ্যতা সমস্ত মিথ্যে—আমাকে একটি নদীতীর, একটি দিগন্তবেষ্টিত কনকসূর্যাস্তরঞ্জিত শস্যক্ষেত্র, একটুখানি বিজনতা, খ্যাতিপ্রতিপত্তিহীন প্রচণ্ডচেষ্টাবিহীন নিরীহ জীবন এবং যথার্থ নির্জনতাপ্রিয় একাগ্রগভীর ভালোবাসাপূর্ণ একটি হৃদয় দাও—আমি জগদ্‌বিখ্যাত সভ্যতার গৌরব, উদ্দাম জীবনের উন্মাদ আবর্ত এবং অপর্যাপ্ত যৌবনের প্রবল উত্তেজনা চাই নে।

Schiller একজন জর্মান সহযাত্রী আমাকে বলছিল তুমি যদি তোমার গলার রীতিমত চর্চা কর তা হলে আশ্চর্য উন্নতি হতে পারে : You have a mine of wealth in your voice। প্রথম বারে যখন ইংলন্ডে ছিলুম তখন যদি এই কাজ করতুম তা হলে মন্দ হত না। আর কিছু না হোক নিদেন পক্ষে হয়তো একটা উপার্জনের পন্থা থাকত।

ডেকে বসে খানিকটা Alphonse Daudet পড়ছিলুম। মাঝে একবার উঠে দেখলুম—দু ধারে ধূসরবর্ণ বালুকাস্তূপ, জলের ধারে ধারে একটু একটু বনঝাউ এবং অর্ধশুষ্ক তৃণ উঠেছে—আমাদের দক্ষিণে সেই বালুকাস্তূপের মধ্য দিয়ে এক দল আরব শ্রেণীবন্ধ উট বোঝাই করে নিয়ে চলেছে—প্রখর সূর্যালোক এবং ধূসর মরুভূমির মধ্যে তাদের নীল কাপড় এবং সাদা পাগড়ি ছবির মতো দেখাচ্ছে। কেউ বা বালুকাগহ্বরের ছায়ায় পা ছড়িয়ে অলসভাবে শুয়ে আছে, কেউ বা নমাজ পড়ছে, কেউ বা নাসারজ্জু ধরে অনিচ্ছুক উটকে টানাটানি করছে। সমস্তটা মিলে খররৌদ্র আরব-মরুভূমির একটুখানি ছবির মতো মনে হল।

জাহাজ মাঝে একবার তলায় আটকে গিয়েছিল। অনেক হাঙ্গাম করে ঠেলে বের করেছে।

শুক্রবার [২৪ অক্টোবর]। Mrs. Smallwood-কে আমাদের ডিনার-টেবিলে দেখে অনেক সময় ভাবি—যে-সব মেয়ের বয়স হয়েছে, যাদের গৌরবের দিন চলে গেছে, তাদের মনের অবস্থা কি রকম? এই Smallwood খুব প্রখর মেয়ে—এক কালে বোধ হয় অনেকের উপর অনেক খরতর শরচালনা করেছে—অনেক পুরুষ এর রুমাল কুড়িয়ে দিয়েছে, মিষ্টিকথা বলেছে, নেচেছে, বিবিধ

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি
খসড়া-পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠা

উপায়ে সেবা এবং পূজা করেছে—এখন আর কেউ গল্প করবার জন্যে ছুতো অন্বেষণ করে না, নাচের সময় আহ্বান করে না, আহারের সময় পরিবেশন করে না—যদিও সে নাকে মুখে কথা কয় এবং অচিরজাত বিড়ালশাবকের মতো ক্রীড়াচাতুরীশালিনী এবং তার প্রখরতাও বড়ো সামান্য নয়। অবিশ্যি, বয়স অল্পে অল্পে এগোয় এবং অনাদর ক্রমে ক্রমে সয়ে আসে। কিন্তু তবু যে-সব মেয়ে চিত্তজয়োৎসাহে মত্ত হয়ে শরীরের প্রতি দৃক্‌পাত করে নি, গৃহকার্য অবহেলা করেছে, ছেলেদের দাসীর হাতে সমর্পণ করে রাত্রির পর রাত্রি নৃত্যসুখে কাটিয়েছে, উগ্র উত্তেজনায় মত্ত হয়ে জীবনের সমস্ত স্বাভাবিক সুখের প্রতি অনেক পরিমাণে বীতস্পৃহ হয়েছে, তাদের বয়স্ক অবস্থা কী শূন্য এবং শোভাহীন! আমাদের মেয়েরা এই উদগ্র আমোদমদিরার আস্বাদ জানে না—তারা অল্পে অল্পে স্ত্রী থেকে মা এবং মা থেকে দিদিমা হয়ে আসে, পূর্বাবস্থা থেকে পরের অবস্থার মধ্যে প্রচণ্ড বিপ্লব বা বিচ্ছেদ নেই। এক দিকে Mrs. Smallwood-কে এবং অন্য দিকে Miss Low এবং Miss Hedisted-কে দেখি—কী তফাত! তারা অবিশ্রাম পুরুষসমাজে কী খেলাই খেলাচ্ছে! আর কোনো কাজ নেই, আর কোনো ভাবনা নেই, আর কোনো সুখ নেই—সচেতন পুত্তলিকা—মন নেই, আত্মা নেই—কেবল চোখেমুখে হাসি এবং কথা এবং তীব্র উত্তর-প্রত্যুত্তর। এক-এক দিন সন্ধে-বেলা যখন সমস্ত পুরুষ আপন আপন চুরোট এবং তাস নিয়ে স্বজাতিসমাজে জটলা করে—তখন Miss Hedisted কী ম্লান বেকার ভাবে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, মনে হয় যেন আপন সঙ্গহীন অবস্থায় আপনি পরম লজ্জিত। এক-এক দিন সেইরকম অবস্থায় আমি গিয়ে তাকে কথঞ্চিৎ প্রফুল্ল করে তুলি। সেদিন নাচের সময় Miss Vivian-এর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সে বলছিল, তোমরা পুরুষ ball room-এর এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে কিছু মনে হয় না; কিন্তু মেয়েদের wall flower হয়ে থাকা দুরবস্থার একশেষ, ভারি লজ্জা এবং নৈরাশ্য উদয় হয়।—এই-সব দেখে আমার মনে হয় আমাদের পুরুষদের জীবনে যা-কিছু সুখ আছে তার স্থায়িত্ব এবং গভীরত্ব মেয়েদের চেয়ে বেশি। অবিশ্যি, দুঃখ এবং নিষ্ফলতাও বেশি। পুরুষদের মধ্যে যারা জীবনের সার্থকতা লাভ করেছে বয়োবৃদ্ধিকে তারা ডরায় না, বরং অনেক সময়ে প্রার্থনা করে। তাদের আপনার মধ্যে আপনার অনেক নির্ভরস্থল আছে। তাই জন্যে পুরুষরা স্বভাবত কুঁড়ে।—দেখেছি এত পুরুষ আছে, কিন্তু মেয়েরা নাচবার সঙ্গী পায় না। বাজনা বাজছে, সুসজ্জিত উদ্ঘাটিতবক্ষ মেয়েরা উৎসুকভাবে ইতস্তত নিরীক্ষণ করছে, আর পুরুষরা দল বেঁধে জাহাজের কাঠরা ধরে অলসভাবে চুরট খাচ্ছে এবং চেয়ে আছে। Gibbs-কে বললুম, তোমার নাচা উচিত। সে বললে : My dear fellow, my dancing days are over। তার বয়স ২১। শেষকালে Miss Long চটেমটে বললে : Oh, men are so lazy! বলে রাগ করে মুখ ভার করে বেঞ্চিতে বসে রইল। আজকাল তাই নাচ বন্ধ আছে।

Browning পড়তে পড়তে *The Englishman in Italy* বলে কবিতায় (১৫১ পৃ) দেখলুম—

> Oh these mountains, their infinite movement!
> still moving with you;
> for ever some new head and breast of them
> thrusts into view
> to observe the intruder.

আমার কবিতায় পর্বত সম্বন্ধে দুটো লাইন আছে তার সঙ্গে এর অনেকটা মিলছে—

> স্থির তারা নিশিদিন তবু যেন চলে,
> চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে।

আমার এ দুটো ছত্র অনেকে বুঝতে পারে না।

শনি [২৫ অক্টোবর]। অনেক দিন থেকে য়ুরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে তার বিদ্যুৎবেগ এবং প্রচণ্ড শক্তি অনুভব করবার ইচ্ছে ছিল। আমি চিরকাল কেবল স্বপ্ন দেখে এবং কথা কয়ে এসেছি, এইজন্যে যথার্থ কার্যের দিকে আমার ভারি আকর্ষণ আছে। শোনা যায় একজন বিখ্যাত ইংরাজ সেনাপতি বলেছিল, যুদ্ধে জয়লাভের চেয়ে যদি Gray's *Elegy* আমি লিখতে পারতুম তা হলে জীবন অধিক কৃতার্থ মনে করতুম। এর থেকে প্রমাণ হয়, প্রত্যেক মানুষেরই জীবন অসম্পূর্ণ— যে চিন্তা করে কার্যস্রোতে ঝাঁপ দেবার জন্যে তার মনের আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়, এবং যে কাজ করে চিন্তার শিখরে উঠে বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগতের অসীমত্ব অনুভব করবার জন্যে তার গোপন ব্যাকুলতা থাকে। এইজন্যে য়ুরোপে যেমন স্বপ্নের আদর এমন আর কোথাও নেই। সেই নিয়মের বশে আকৃষ্ট হয়ে দুই-একটি সঙ্গী আশ্রয় করে ঘর থেকে বেরিয়েছিলুম, কিন্তু এই কাজের কোলাহল এবং আমোদের মত্ততার মধ্যে কি আমি তিষ্ঠতে পারি? সমুদ্রের তরঙ্গ দেখতে বেশ এবং তার কলধ্বনি শুনতে ভালো লাগে, কিন্তু যে সাঁতার জানে না তীরে বসে উপভোগ করাই তার পক্ষে সুবুদ্ধির কাজ। দেখলুম বন্ধুবান্ধব অনেকেই ঝাঁপ দিচ্ছে এবং মহা আনন্দে চীৎকার করছে, তাই দেখে আমিও তাড়াতাড়ি ঝাঁপ দিয়েছিলুম— খানিকটা নাকানি-চোবানি এবং লোনা জল খেয়ে উঠে এসেছি। এখন কিছুদিন ডাঙার উপরে সর্বাঙ্গ বিস্তার-পূর্বক চক্ষু মুদ্রিত করে রোদ পোহাব মনে করছি।

ভাসল তরী সকালবেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা—
মধুর বহিবে বায়ু, ভেসে যাব রঙ্গে।

কিন্তু seasickness-এর কথা কে মনে করেছিল! আমার এই সভ্যতার তরঙ্গের মধ্যে সেই seasickness-এর উদয় হয়েছিল। আমার এই চিরবিশ্রামশীল অন্তরাত্মা যে একটুতেই এত নাড়া খাবে এবং প্রতি নিমেষে কণ্ঠাগত হয়ে উঠবে তা কে জানত!

আজ সকালবেলা স্নানের ঘর বন্ধ দেখে দরজার সামনে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছি। কিয়ৎক্ষণ বাদে বিরলকেশ স্থূলকলেবর দ্বিতীয় ব্যক্তি তোয়ালে এবং স্পঞ্জ হাতে উপস্থিত, স্নানের ঘর খালাস হবামাত্রই দেখি সে অম্লানবদনে ঢোকবার অভিপ্রায় করছে— কিছুমাত্র লজ্জা কিংবা দ্বিধা নেই। প্রথমেই মনে হল কোনো রকম করে তাকে ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ি, কিন্তু কোনো রকম শারীরিক দ্বন্দ্ব আমার এমন রূঢ় এবং অভদ্র মনে হয় এবং এত অনভ্যস্ত যে কিছুতেই পারলুম না— তাকে আমার অধিকার ছেড়ে দিলুম। মনে মনে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম— ভাবলুম খৃস্টীয় নম্রতা শুনতে খুব ভালো, কিন্তু আপাতত এই পশুপৃথিবীর পক্ষে অনুপযোগী এবং দেখতে অনেকটা ভীরুতার মতো। নাবার ঘরে প্রবেশ করতে যে খুব বেশি সাহসের আবশ্যক ছিল তা নয়, কিন্তু প্রাতঃকালেই একটা মাংসবহুল কপিশবর্ণ পিঙ্গলচক্ষু রূঢ় ব্যক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ আমার একান্ত সংকোচজনক বোধ হল। পৃথিবীতে স্বার্থপরতা অনেক সময়ে এইজন্যে জয়লাভ করে— প্রবল বলে নয়, অতিমাংসগ্রস্ত কুৎসিত বলে।

খুব গরম পড়েছে। ডেকের উপরে যে যার আপন আপন easychair-এর উপর পড়ে ধুঁকছে।

রবিবার [২৬ অক্টোবর]। সকাল থেকে একটু ঝোড়ো রকম হয়ে আছে। সকলেই আক্ষেপ করছে, জাহাজে রবিবার অত্যন্ত dull, সময় কাটে না। মেয়েদের মধ্যে একটা খুব excitement, চিত্রবিচিত্র বনেট মাথায় দিয়ে রাবিবারিক বেশ-পরিধান। ইংরেজ মেয়েদের বনেটের উপর ভারি ঝোঁক— বনেটে পরস্পরকে হারিয়ে দেওয়া একটা জীবনের লক্ষ্য। Miss Mull, Miss Oswald, সকলেই বনেট বনেট করে অস্থির। কিন্তু আমার চোখে অধিকাংশ বনেট অত্যন্ত কুৎসিত এবং বর্বর বলে ঠেকে।

আর-এক সপ্তাহ। নিশিদিন উল্টে পাল্টে কেবল কলকাতার ছবি মনে করছি।

জাহাজের দিন : সকালে ডেক ধুয়ে দিয়ে গেছে, এখনো ভিজে রয়েছে। দুই ধারে ডেকচেয়ার বিশৃঙ্খলভাবে রাশীকৃত; খালি পায়ে রাত-কামিজ-পরা পুরুষগণ কেউ বা বন্ধুসঙ্গে কেউ বা একলা মধ্যপথ দিয়ে হুহু করে বেড়াচ্ছে; ক্রমে যখন আটটা বাজল এবং একটি-আধটি করে মেয়ে উপরে উঠতে লাগল তখন একে একে এই বিরলবেশ পুরুষদের অন্তর্ধান। স্নানের ঘরের সম্মুখে ভয়ানক ভিড়—তিনটি মাত্র স্নানের ঘর, আমরা জন চল্লিশেক লোক। সকলেই হাতে একটি তোয়ালে এবং স্পঞ্জ নিয়ে দ্বারমোচনের অপেক্ষায় আছে—দশ মিনিটের বেশি স্নানের ঘর অধিকার করবার নিয়ম নেই। স্নান এবং বেশভূষা সমাপনের পর উপরে গিয়ে দেখা যায় ডেকের উপর পদচারণশীল প্রভাতবায়ুসেবী অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষের সমাগম হয়েছে। ঘনঘন টুপি-উদ্ঘাটন-পূর্বক মহিলাদের এবং পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শুভপ্রভাত-অভিবাদন-পূর্বক শীত-গ্রীষ্মের তারতম্য সম্বন্ধে পরস্পরের মতামত ব্যক্ত করা গেল। ক্ষণেক বাদে নটার সময় ঘণ্টা বেজে উঠল—breakfast প্রস্তুত, বুভুক্ষু নরনারীগণ সোপানপথ দিয়ে নিম্নকক্ষে ভোজনবিবরে প্রবেশ করলে, ডেকের উপরে আর জনপ্রাণী অবশিষ্ট রইল না, কেবল সারি সারি শূন্যহৃদয় চৌকি ঊর্ধ্বমুখে প্রভুদের জন্যে অপেক্ষা করে রইল। ভোজনশালা প্রকাণ্ড ঘর—মাঝে দুই সার লম্বা টেবিল এবং তার দুই পাশে খণ্ড খণ্ড ছোটো ছোটো টেবিল, আমরা দক্ষিণপার্শ্বের একটি ক্ষুদ্র টেবিল অবলম্বন করে সাতটি প্রাণী দিনের মধ্যে তিনবার ক্ষুধানিবৃত্তি করে থাকি। মাংস রুটি ফলমূল মিষ্টান্ন মদিরা এবং হাস্যকৌতুক গল্পগুজবে এই অনতিউচ্চ সুপ্রশস্ত ঘর কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আহারের পর উপরে গিয়ে যে যার নিজ-নিজ চৌকি অন্বেষণ এবং যথাস্থানে স্থাপনে ব্যস্ত। চৌকি খুঁজে পাওয়া দায়—ডেক ধোবার সময় কার চৌকি কোন্‌খানে টেনে নিয়ে রেখেছে তার ঠিক নেই। তার পরে চৌকি খুঁজে নিয়ে আপনার জায়গাটুকু গুছিয়ে নেওয়া বিষম দায়—যেখেনে একটু কোণ, যেখেনে একটু বাতাস, যেখেনে একটু রৌদ্রের তেজ কম, যেখেনে যার অভ্যেস, সেইখেনে ঠেলেঠুলে টেনেটুনে পাশ কাটিয়ে পথ করে আপনার চৌকিটি রাখতে পারলে তার পরে সমস্ত দিনের মতো নিশ্চিন্ত। তার পরে দেখা যায় কোনো চৌকিহারা ম্লানমুখী রমণী কাতরভাবে ইতস্তত দৃষ্টিক্ষেপ করছে, কিংবা কোনো বিপদগ্রস্ত অবলা এই চৌকি-অরণ্যের মধ্যে থেকে আপনার চৌকিটি বিশ্লিষ্ট করে অভিপ্রেত স্থানে স্থাপন করতে পারছে না, তখন আমরা পুরুষগণ নারীসহায়ব্রতে চৌকি-উদ্ধারকার্যে নিযুক্ত হয়ে সুমিষ্ট ধন্যবাদ উপার্জন করে থাকি। তার পরে যে-যার চৌকি অধিকার করে বসে যাওয়া যায়—ধূম্রসেবীগণ হয় ধূমকক্ষে নয় ডেকের পশ্চাদ্ভাগে সমবেত হয়ে পরিতৃপ্ত মনে ধূমপান করছে। মেয়েরা অর্ধনিলীন অবস্থায় কেউ বা নভেল পড়ছে, কেউ বা সেলাই করছে—মাঝে মাঝে দুই-একজন যুবক ক্ষণেকের জন্যে পাশে বসে মধুকরের মতো কানের কাছে সহাস্য গুন্‌গুন্‌ করে আবার চলে যাচ্ছে। আহার কিঞ্চিৎ পরিপাক হবামাত্রই quoit খেলা আরম্ভ হল। দুটি বালতি পরস্পর থেকে হাত-দশেক দূরে স্থাপিত হল, দুইজুড়ি স্ত্রীপুরুষ বিরোধীপক্ষ অবলম্বনপূর্বক স্ব স্ব স্থান থেকে কতকগুলি রজ্জুচক্র বিপরীত বালতির মধ্যে নিক্ষেপ করবার চেষ্টা করতে লাগল—যে পক্ষ সর্বাগ্রে একুশ করতে পারবে তারই জিত। কেউ বা দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, কেউ বা গণনা করতে লাগল, কেউ বা যোগ দিলে, কেউ বা আপন আপন পড়ায় কিংবা গল্পে নিবিষ্ট হয়ে রইল। একটার সময় lunch-এর ঘণ্টা বাজল। আবার এক-চোট আহার। তার পরে উপরে গিয়ে দুই স্তর খাদ্যের ভারে এবং মধ্যাহ্নের উত্তাপে আলস্য অত্যন্ত ঘনীভূত হয়ে আসে। সমুদ্র প্রশান্ত, আকাশ সুনীল মেঘমুক্ত, অল্প অল্প বাতাস দিচ্ছে, কেদারায় হেলান দিয়ে নীরবে নভেল পড়তে পড়তে অধিকাংশ নীলনয়নে নিদ্রাবেশ হয়ে আসছে। কেবল দুই-একজন পাশাপাশি বসে দাবা backgammon কিংবা draft খেলছে এবং দুই-একজন অশ্রান্ত অধ্যবসায়ী যুবক সমস্ত দিন quoit খেলছে—কোনো রমণী কোলের উপর কাগজ কলম নিয়ে একাগ্রমনে চিঠি লিখছে এবং কোনো শিল্পকুশলা কৌতুকপ্রিয়া যুবতী নিদ্রিত সহযাত্রীর ছবি আঁকবার চেষ্টা করছে। ক্রমে রৌদ্রের প্রখরতা হ্রাস হয়ে এল, তখন তাপক্লিষ্ট

কান্তকায়গণ নীচে নেমে এসে রুটিমাখন-মিষ্টান্ন-সংযোগে চা-রসপান করে শরীরের জড়তা পরিহার-পূর্বক পুনর্বার ডেকে উপস্থিত। পুনর্বার যুগলমূর্তির সোৎসাহ পদচারণা এবং হাস্যালাপ আরম্ভ হল। কেবল দু-চারজন পাঠিকা উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ থেকে কিছুতেই আপনাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারছে না, দিবাবসানের ক্ষীণালোকে একান্ত নিবিষ্ট দৃষ্টিতে নায়ক-নায়িকার পরিণাম অনুসরণ করছে। দক্ষিণে জ্বলন্ত কনকাকাশ এবং অগ্নিবর্ণ জলরাশির মধ্যে সূর্য অস্ত গেল, এবং বামে সূর্যাস্তের কিছু পূর্ব হতেই চন্দ্রোদয় হয়েছে—জাহাজ থেকে পূর্বদিগন্ত পর্যন্ত বরাবর জ্যোৎস্নারেখা ঝিক্‌ ঝিক্‌ করছে—পূর্ণিমার সন্ধ্যা যেন নীল সমুদ্রের উপর আপনার শুভ্র অঙ্গুলি স্থাপন করে আমাদের এই জ্যোৎস্নাপুলকিত পূর্বভারতবর্ষের পথ নির্দেশ করে দিচ্ছে। জাহাজের ডেকের উপর এবং কক্ষে কক্ষে বিদ্যুদ্দীপ জ্বলে উঠল। ছটার সময়ে ডিনারের প্রথম ঘণ্টা বাজল, বেশপরিবর্তনের জন্যে স্ব স্ব ক্যাবিনে প্রবেশ করলে—তার পরে আধ ঘণ্টা বাদে যখন দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজল ভোজনগৃহে প্রবেশ করা গেল। সারি সারি নরনারী বসে গেছে, কারও বা কালো কাপড়, কারও বা রঙিন কাপড়, কারও বা শুভ্রবক্ষ অর্ধ-অনাবৃত। মাথার উপরে শ্রেণীবদ্ধ বিদ্যুৎ-আলোক জ্বলছে, গুন্‌গুন্‌ আলাপের সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা-চামচের ঝন্‌ঝন্‌ টুংটাং শব্দ উঠছে—এবং বিচিত্র খাদ্যের পর্যায় পরিচারকদের হাতে হাতে স্রোতের মতো যাতায়াত করছে। আহারের পর ডেকে গিয়ে শীতল-বায়ু-সেবন—কোথাও বা যুবক যুবতী অন্ধকার একটি কোণের মধ্যে চৌকি টেনে নিয়ে গুন্‌গুন্‌ করছে, কোথাও বা দুজনে জাহাজের বারান্দা ধরে ঝুঁকে পড়ে রহস্যালাপে নিমগ্ন, কোনো কোনো যুগল সহাস্য গল্প করতে করতে আলোক এবং অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দ্রুতপদে চলে বেড়াচ্ছে, কোথাও বা এক ধারে পাঁচ-সাত-জন স্ত্রীপুরুষে জটলা করে উচ্চহাস্য এবং বিবিধ প্রমোদকল্লোল উচ্ছ্বসিত করে তুলছে। অলস পুরুষরা কেউ বা বসে কেউ বা দাঁড়িয়ে কেউ বা অর্ধশয়ান অবস্থায় চুরট খাচ্ছে, কেউ বা smoking saloon-এ কেউ বা নীচে খাবার ঘরে whisky soda পাশে নিয়ে চার-চার জনে দল বেঁধে whist খেলছে। এ দিকে music saloon-এ সংগীতপ্রিয় দু-চার জনের সমাবেশ হয়েছে, গানবাজনা এবং মধ্যে মধ্যে করতালি শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে নৃত্যের আয়োজন হয়, কিন্তু পুরুষ নর্তকদের স্বভাবসিদ্ধ আলস্য এবং অমনোযোগিতাবশত কিছুদিন থেকে নাচ তেমন জমছে না। ক্রমে সাড়ে-দশটা বাজে, মেয়েরা নেবে যায়, ডেকের উপরের আলো হঠাৎ নিবে যায়, ডেক নিঃশব্দ নির্জন অন্ধকার হয়ে আসে—এবং চারি দিকে নিশীথের নিস্তব্ধতা, চন্দ্রালোক এবং অনন্ত সমুদ্রের চিরকলধ্বনি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

সোমবার [২৭ অক্টোবর]। Red Sea-র গরম ক্রমেই বেড়ে উঠছে। ডেকের উপরে মেয়েরা সমস্ত দিন তৃষাতুর হরিণীর মতো pant করছে, রৌদ্রদগ্ধ ফুলের মতো তাদের তাপক্লিষ্ট ম্লানমুখ দেখে দুঃখ হয়। তারা কেবল অতি ক্লান্তভাবে ধীরে ধীরে পাখা নাড়ছে, স্মেলিং সল্ট্‌ শুঁকছে এবং যুবকেরা যখন পাশে এসে করুণ স্বরে কুশল জিজ্ঞাসা করছে তখন নিমীলিতপ্রায় নেত্রপল্লব অলসভাবে ঈষৎ উন্মীলন করে ম্লান সহাস্যে গ্রীবাভঙ্গিদ্বারা ইঙ্গিতে আপন দুরবস্থা ব্যক্ত করছে—কিন্তু যতই lemon squash এবং পরিপূর্ণ করে lunch খাচ্ছে ততই জড়ত্ব এবং ক্লান্তি বাড়ছে, ততই নেত্র নিদ্রালস এবং সর্বশরীর শিথিল হয়ে আসছে। আমাকে কেউ কেউ ঈষৎ ক্রোধের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করছে : I suppose *you* like this weather! আমি বিনীত দুঃখিত কাতর-ভাবে নতশিরে সসংকোচে অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি।

লোকেনকে চিঠি লেখা গেল। আজকের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনো খবর না থাকাতে উপরোক্ত প্যারেগ্রাফ লোকেনের চিঠি থেকে উদ্ধৃত করে রাখা গেল। কাল একটা কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলুম। লিখতে লিখতে ডিনারের ঘণ্টা বেজে গেল, আজ ক্যাবিনে পড়ে পড়ে সেটা শেষ করলুম। একটা সামান্য কবিতা লিখতে মনটাকে কী রকম করে নিংড়ে বের করতে হয় যারা পড়ে

তারা বোধ হয় তার কিছুই বুঝতে পারে না, তারা কেবল ভালোমন্দ সমালোচনা করে মাত্র। কাল সকালে এডেনে পেঁছব, তার পরে বম্বে, তার পরে কলকাতা।

মঙ্গল [২৮ অক্টোবর]। আজ সকালে Turnbull আমার কাছে স্বজাতির উপরে খুব আক্রোশ প্রকাশ করছিল। বলছিল : Selfish, stuck up, stiff, no manner in them। বলছিল, জাহাজে একদিন বসে ছিলুম, একজন মেয়ে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি ভদ্রতা করে তাকে চৌকি ছেড়ে দিলুম; সে একটি ঘণ্টা ধরে আমার চৌকি জুড়ে বসে রইল, উঠে যাবার সময় একটি thank দিয়ে গেল না। Gibb গল্প করছিল crowded 'bus-এ আমি ভদ্রতা করে একজন মেয়েকে যেমনি জায়গা ছেড়ে দিলুম অমনি অম্লানবদনে তিন-চারজন মেয়ে এসে আমার সমস্ত জায়গা জুড়ে বসল। তারা মনে করে তাদের এটা অধিকার, কিছুমাত্র ভদ্রতার সংকোচ নেই। Turnbull বলছিল, একদিন picture galleryতে lady friend নিয়ে গিয়েছিল, শ্রান্ত হয়ে এক জায়গায় বসেছিল, পাশে একজন মেয়েকে দাঁড়াতে দেখে তাকে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছিল, অমনি তার সহচরী কোর্তা ধরে টেনে বসিয়ে দিলে, বললে : Don't be a fool, you are not on the Continent! অর্থাৎ, এখানকার লোকেরা তো ভদ্রতার মর্যাদা বোঝে না।

এডেনে পেঁছনো গেছে। একরাশ আরব এসে ভয়ানক গোল বাধিয়ে দিয়েছে। মনে মনে একটুখানি চিঠির আশা ছিল। Steward একটা চিঠি এনে দিলে জ্যোতিদাদার হাতের অক্ষরে : S. Tagore Esq., Passenger P & O Mail Steamer, Aden। তার থেকে বোঝা যাচ্ছে, যে চিঠিতে আমি এডেনে উত্তর লিখতে অনুরোধ করেছিলুম সেটা বাবিরা পেয়েছে। যা হোক, আমার অদৃষ্টে কিছু নেই। শুনছি রবিবার রাত একটার সময় জাহাজ বম্বে বন্দরে পেঁছবে, তা হলে তার পরদিন সমস্ত দিন গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। এমন বিশ্রী লাগছে! একটা Messagerie জাহাজ এডেনের কাছে জলে ডুবে রয়েছে দেখলুম, Messagerie লাইনের আর-একটা জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল।

বিকেলটা কাটাবার জন্যে বসে বসে একটা কবিতা লেখা গেল। এক-এক সময়ে কবিতা লিখে মনটা বেশ প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। এক-এক সময়ে কবিতা রচনা মনের উপরে যেন একটা বেদনার রক্তরেখা রেখে দিয়ে যায়, এবং সেইখানটা বরাবর ব্যথা করতে থাকে। সমস্ত দিন কোনোক্রমে কেটে যায়, কিন্তু দীর্ঘ সন্ধেবেলা ভারি ছট্‌ফটানি ধরে। সাড়ে-ছটার সময় ডিনার, তার পরে কতক্ষণ চুপচাপ করে বসে থাকি। Gibbs hurricane deck-এ বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্যে টানাটানি করে, তখন ভারি বিরক্ত ধরে। এইসকল নানা কারণে আমার মতো moody লোকের পক্ষে বন্ধুত্ব ভারি দুঃসাধ্য।

বুধবার [২৯ অক্টোবর]। দালাল বলে একজন পার্শি আমাদের জাহাজে আছে। তাকে প্রায় অবিকল যোগেশের মতো দেখতে—সেইরকম মুখের বেড়, সেইরকম দাড়ির ছাঁট, সেইরকম ভ্রূ এবং কপাল, কেবল এর চোখ দুটো খুব বড়ো। অল্প বয়স। ন মাস য়ুরোপে বেড়িয়ে বিলিতি পোশাক এবং চালচলন ধরেছে। বলে, India like করে না। বলে, তার য়ুরোপীয় বন্ধুদের (অধিকাংশ মেয়ে) কাছ থেকে ইতিমধ্যে তিনশো চিঠি পেয়েছে—'কিন্তু আমি কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই নে, যখন আমার আলাপীরা মনে করে আমি তাদের বন্ধু তখন সে ভুল ভাঙিয়ে দিতে আমি বিলম্ব করি নে। There's no fun keeping friends—only lot of troubles।' তার পরে বললে : I don't care for flirting. There's *no fun* in it. I have flirted with great Italian German French English girls—I am tired of it. You tell lot of lies to a girl, and she hits you with her fan—not much fun in it—I don't like the Englishmen who come from India. Therefore I don't speak to the people in this boardship—of course if they come to me and speak to me I speak to them. I speak to some twelve thirteen people in this steamer—I

speak for about two hours to a gentleman every morning. (ভালো ইংরিজি বলে না এবং ঈষৎ নতুন রকমের উচ্চারণ— speak-কে spick বলে) বাঙালিদের বাবু বলে, আমাকে বলে : You speak very good English— where did you learn it? বলে : With my European dress people take me for an Italian or a French. I am not dark enough for an Indian। লোকটা আমারই মতো dark। লোকটা খুব লম্বা লম্বা কথা বলে— ভারি অদ্ভুত, ভারি stupid। বলে, আমি scientific বই ভালোবাসি। আমি বললুম, আমাকে দুই-একটা ধার দিতে পারো? বললে, তোরঙ্গের নীচে আছে, বের করা শক্ত।

বুধবার। একটা ইংরিজি কাগজ পড়ছিলুম, তাতে আমাদের দিশি মেয়েদের দুরবস্থা সম্বন্ধে খুব কাতরভাবে লিখেছে। আমাদের দিশি মেয়েদের ঠিক অবস্থা ইংরেজদের পক্ষে বোঝা ভারি শক্ত। আমার তো মনে হয় আমাদের মেয়েরা ইংরেজ মেয়েদের চেয়ে ঢের বেশি সুখী। ভালোবাসাতেই মেয়েদের জীবনের প্রকৃত সফলতা, তার থেকে আমাদের মেয়েরা বঞ্চিত নয়। নিজের ছেলেমেয়ে, নিজের স্বামী এবং বৃহৎ পরিবারের মধ্যে তাদের হৃদয়ের সমস্ত প্রবৃত্তি চরিতার্থতা লাভ করে— ভালোবাসার সমস্ত শাখা প্রশাখা চতুর্দিকে আপনাকে প্রসারিত করবার স্থান পায়। আর যাই হোক, কার্যাভাবে তাদের হৃদয় কঠিন ও শুষ্ক হবার অবসর পায় না। একজন ইংরেজ old maid-এর হৃদয় কী শূন্য, কী সংকীর্ণ এবং নীরস হয়ে আছে। আমাদের বালবিধবারা প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ old maid-এর সমতুল্য— কিন্তু বৃহৎ পরিবারের মধ্যে শিশুস্নেহ গুরুভক্তি সখিত্ব বিচিত্র প্রবাহে তাদের নারীহৃদয়কে সর্বদা কোমল ও সরস করে রাখে, সভা কিংবা কুকুরশাবকের দ্বারা সমস্ত শূন্য জীবনকে ব্যাপৃত রাখবার আবশ্যক হয় না। আমার মনে হয়, সভ্যতার আকর্ষণে য়ুরোপীয় মেয়েরা এতদূর বেরিয়ে এসেছে যে, তাদের কেন্দ্র থেকে ছিন্ন হয়ে কক্ষের বাহির হয়ে পড়েছে। তারা প্রমোদের পাকেই ঘূর্ণ্যমান হোক, কিংবা কার্যক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হোক, কিংবা বিজনে কৌমার্য বা বৈধব্য-যাপন করুক, তাদের স্ত্রীপ্রকৃতির মধ্যে শান্তি নেই। হয় তারা প্রমোদে উন্মত্ত, নয় তারা আন্তরিক অসন্তোষে আক্রান্ত। আর যাই হোক, আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নতির পক্ষে যতই ব্যাঘাতজনক হোক, আমাদের বৃহৎ পরিবার মেয়েদের পক্ষে একান্ত উপযোগী। কারণ, ভালোবাসাহীন শূন্য স্বাধীনতা নারীর পক্ষে অতি ভয়ানক, মরুভূমির স্বাধীনতা গৃহপ্রিয় লোকের পক্ষে যেমন নিদারুণ শূন্য। আমরা যাকে বন্ধন মনে করি মেয়েদের পক্ষে তা বন্ধন নয়। অবিশ্যি, সুখদুঃখ পুরুষদের মতো মেয়েদের জীবনেও আছে— পুরুষদের অগত্যাকাজ যেমন কঠিন, ভালোবাসার কর্তব্যও তেমনি সকল সময়ে লঘু নয়। ভালোবাসারও অনেক দায়, অনেক বালাই আছে। কিন্তু ভালোবাসার ত্যাগস্বীকার অনেক সহজ— আমার পক্ষে বন্ধুর নিমন্ত্রণ রক্ষা না করে চাপকান পরে আপিসে যাওয়া যত কঠিন, মায়ের পক্ষে সন্তানের অনুরোধে নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করা তত কঠিন নয়। এইজন্যে মেয়েদের জীবন পুরুষের চক্ষে যত কঠিন ঠেকে মেয়েদের পক্ষে ততটা নয়। তাদের নিভৃত সুখদুঃখের মধ্যে থেকে উৎপাটন করে তাদের বাইরে এনে দাও, তারা কখনোই সুখী হবে না। আমাদের মেয়েরা যে ইংরেজ মেয়েদের চেয়ে অসুখী বা নির্বোধ বা অশিক্ষিত তা নয়। আপন সীমানার বাইরে তারা নির্বোধ শঙ্কিত সংকুচিত— বাইরে নিয়ে গেলে তারা জানে না কী করতে হবে, কোথায় যেতে হবে, কিন্তু আমাদের ঘরের মধ্যে তারা সহৃদয়প্রতিভাশালিনী। তারা আমাদের সেবা করে, আমাদের সকলের খাওয়া হয়ে গেলে তবে খায়, তার থেকে যদি কেউ মনে করে আমাদের মেয়েদের আমরা অনাদর ও পীড়ন করি তবে সে মহা ভুল। অন্তঃপুরে তারা কর্ত্রী, আমরা তাদের অতিথি, তাই আমাদের এত আদর— আমরা কর্তা বলে নয়। এমন কথা কে কবে বলেছে আমাদের উপার্জনকার্যে মেয়েরা সাহায্য করে না, অতএব তারা স্বার্থপর ও হৃদয়হীন— কর্মক্ষেত্রে আমরা কর্তা— সেখানকার সমস্ত কষ্ট আমরা বহন করে মেয়েদের তার থেকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। (উদর এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের fable)

আমাদের মেয়েরা খুব বেশি লেখাপড়া শেখে নি তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশে ইংরাজি-শিক্ষার কী ফল কে জানে। নাহয় ঘরের মধ্যে একটা দিশি শিক্ষার দুর্গ রইল তাতে ক্ষতি কী? বাল্যকাল থেকে বিদেশী ভাষা-শিক্ষায় আমাদের মস্তিষ্ক অবসন্ন এবং চিন্তাশক্তি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। আমরা পুরুষরা তো ইংরিজি শিক্ষার তা লেগে লেগে অতি শীঘ্র অকালে পেকে যাচ্ছি, আমাদের অন্তঃপুরে নাহয় অন্তর থেকে বাংলা রসাকর্ষণ করে অল্পে অল্পে স্বাভাবিক পরিণতির একটা পরীক্ষাস্থল থাক্। ইংরিজি শিক্ষা বাংলার মধ্যে দিয়ে তাদের নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করুক এবং বর্তমান অবস্থাবিপর্যয়ের সংগে অল্পে অল্পে তাদের সামঞ্জস্যসাধন হোক। এই-যে বইগুলো লিখছি এবং ছাপাচ্ছি এবং বঙ্গবাসীতে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি, নিদেন মেয়েরা পড়ুক, না পড়ে তো কিনুক।

ইংরেজরা একটা বুঝতে পারে না যে, ইংরেজ স্ত্রীপুরুষ এবং দিশি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বৈলক্ষণ্য প্রায় সমান। ইংরাজ স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যদি শিক্ষা স্বাধীনতার সাম্য থাকত, তা হলে Mill-এর বই লেখবার এবং বর্তমান বিদুষীমণ্ডলীর বিদ্রোহ করবার কোনো কারণ থাকত না। আমরা মাটি কামড়ে কোনোমতে ঘরের প্রাঙ্গণটিতে পড়ে থাকি, আমাদের মেয়েরা সেই ঘরের অন্তঃপুরে বিরাজ করে। তোমরা পুচ্ছ-আস্ফালনে সমস্ত সংসার ঘোলা করে বেড়াও, তোমাদের মেয়েরা তোমাদের অনুবর্তী। কিন্তু এখনো তোমরা পুরুষরাই প্রধান, তোমরাই প্রভু—তোমাদের স্ত্রীরা অনুগত ছায়া। তোমাদের তুলনায় তোমাদের স্ত্রীরা অশিক্ষিত।

বিধবাবিবাহ না থাকাতে আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকদের অত্যন্ত কষ্ট? তোমাদের দেশে কুমারীবিবাহ বন্ধ হয়ে সমাজে যত অনাথা স্ত্রীলোকের আবির্ভাব হয়েছে আমাদের দেশে বিধবা-বিবাহ বন্ধ হয়ে তত হয় নি। সমাজের মঙ্গলের প্রতি যদি লক্ষ করা যায় তবে আমাদের দেশে বিধবাবিবাহ অসম্ভব, তোমাদের দেশে অবস্থাবিশেষে বিধবাবিবাহ আবশ্যক। সকল সমাজনিয়মই আপেক্ষিক। আমাদের সমাজ তোমরা কিছুমাত্র জান না, এইজন্য আমাদের সমাজ সম্বন্ধে তোমরা কিছুই বুঝতে পার না।

যেমন লোকভেদে তেমনি জাতিভেদে সুখদুঃখ বিভিন্ন। আমি যখন গাজিপুরে থাকতুম তখন ইংরেজরা মনে করত, আমোদ-প্রমোদ খেলা ও সঙ্গ-অভাবে আমি বুঝি ভারি ম্রিয়মাণ হয়ে আছি। তাই আমাকে ক্রমাগত নিমন্ত্রণ করত এবং ক্লাবের মেম্বর হবার জন্যে অনুরোধ করত। আমি যে আমার ঘরের কোণে সন্ধেবেলা আলোটি জেলে আমার আপনার লোক নিয়ে কত সুখে থাকতুম তা তারা বুঝতে পারত না। একজন Lady Dufferin-মেয়ে-ডাক্তার আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে যখন দেখে অপরিষ্কার ছোটো ঘর, ছোটো জানলা, ময়লা বিছানা, মাটির প্রদীপ, দড়িবাঁধা মশারি, আর্ট্ স্টুডিয়োর রঙ-লেপা ছবি, তখন সে মনে করে—কী সর্বনাশ! কী ভয়ানক কষ্টের জীবন! এদের পুরুষরা কী স্বার্থপর! স্ত্রীলোকদের জন্তুর মতো করে রেখেছে! জানে না আমাদের দশাই এই। আমরা মিল পড়ি, রস্কিন পড়ি, স্পেন্সর পড়ি, কেরানিগিরি করি, খবরের কাগজে লিখি, বই ছাপাই, ঐ মাটির প্রদীপ জ্বালি, ঐ মাদুরে বসি, অবস্থা সচ্ছল হলেই স্ত্রীর গয়না গড়িয়ে দিই, এবং ঐ দড়িবাঁধা মোটা মশারির মধ্যে আমি আমার স্ত্রী এবং মাঝখানে একটি কচি খোকা নিয়ে তালপাতার হাতপাখা খেয়ে রাত্রিযাপন করি। ওগো, তবু আমরা জন্তু নই। আমাদের কৌচ কার্পেট কেদারা নেই, কিন্তু তবুও আমাদের দয়ামায়া ভালোবাসা আছে। তক্তপোষের উপর তাকিয়া ঠেসান দিয়ে তোমাদের সাহিত্য পড়ি, তবুও অনেকটা বুঝতে পারি এবং সুখ পাই। ভাঙা প্রদীপে খোলা গায়ে তোমাদের ফিলজফি অধ্যয়ন করে তবুও আমাদের ছেলেরা তোমাদেরই মতো agnostic হয়ে আসছে। আমরা আবার তোমাদের ভাব বুঝতে পারি নে। তোমাদের সুখ স্বচ্ছন্দতা আর-এক রকমের। কৌচ কেদারা তোমরা এত ভালোবাস যে স্ত্রীপুত্র না হলেও চলে। আরামটি তোমাদের আগে, তার পরে তোমাদের ভালোবাসা। আমাদের ভালোবাসা নিতান্তই আবশ্যক, তার পরে আরাম থাক্ বা না থাক্।

কিন্তু তোমরা খুব সভ্য জাতি, তোমরা অনেক মহৎ কার্য করেছ, অতএব তোমাদের সমস্ত প্রথাকেই মানবের উন্নতির অনুকূল বলে মেনে নিতে হবে। কিন্তু আমরাও এক কালে উন্নত জাতি ছিলুম, এই বিপুল স্ত্রীপুত্রপরিবারের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে আমাদের পতন হয়েছে— এবং কে বলতে পারে ঐ উত্তরোত্তরবর্ধনশীল স্তূপাকৃত আরামের মধ্যেই তোমাদের সভ্যতার সমাধি হবে না? ভারতবর্ষে পারিবারিক প্রথা ক্রমে এত বিপুল এবং জটিল হয়ে পড়েছিল যে সমাজের সমস্ত শক্তি পরিবাররক্ষার মধ্যেই পর্যবসিত হয়েছিল, সংহত পরিবারের চাপে ব্যক্তিগত মহত্ত্বের স্ফূর্তি বন্ধ হয়ে সমস্ত একাকার হয়ে এসেছিল। তোমাদের আরাম ক্রমেই এত বেড়ে উঠছে যে, স্বাধীন গতিবিধির পথ বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। তোমাদের পরিবারপ্রতিষ্ঠার শক্তি বন্ধ হয়ে আসছে— পণ্ডিতগণ ভীতভাবে মন্ত্রণা দিচ্ছেন, এবং socialism মধ্যে মধ্যে নখদন্ত বিকাশের উপক্রম করছে।

মাঝের থেকে মেয়েদের আর মেয়ে থাকবার জো নেই, তাদের পুরুষ হওয়া বিশেষ আবশ্যক হয়েছে। য়ুরোপে ক্রমে গৃহ নষ্ট হয়ে হোটেল বৃদ্ধি হচ্ছে— যে যার নিজে নিজে উপার্জন করছে এবং আপনার ঘরটি, easychairটি, কুকুরটি, ঘোড়াটি, চুরটের পাইপটি এবং একটি ক্লাব নিয়ে নির্বিঘ্ন আরামের চেষ্টায় প্রবৃত্ত আছে। সুতরাং মেয়েদের মৌচাক ভেঙে যাচ্ছে। পূর্বে সেবক-মক্ষিকারা মধু অন্বেষণ করে চাকে সঞ্চয় করত এবং রাজ্ঞীমক্ষিকারা কর্তৃত্ব করত— এখন চাক বাঁধা বন্ধ করে যে যার আপনার একটি কক্ষ ভাড়া করে সকালে মধু উপার্জন করে সন্ধ্যা পর্যন্ত একাকী নিঃশেষে উপভোগ করছে। সুতরাং রানীমক্ষিকাদের এখন বেরোতে হচ্ছে, কেবলমাত্র মধু দান এবং মধু পান করবার সময় আর নাই। স্ত্রীপুরুষের এই স্বাভাবিক অবস্থাবিপর্যয়ের জন্য য়ুরোপীয় সমাজের কি কোনো ক্ষতি হবে না? একবার ভালো করে ভেবে দেখো, আমাদের স্ত্রীরা অসুখী না তোমাদের স্ত্রীরা অসুখী। আমাদের স্ত্রীরা গাড়ি চড়ে হাওয়া খায় না, কিন্তু তাদের কোমল স্নেহশীল হৃদয় সর্বদাই পরিপূর্ণ— কোনো অবস্থাতেই তারা গৃহহীন নয়।

কেউ যেন না মনে করে মেয়েদের গাড়ি চড়ে হাওয়া খাওয়াকে আমি দূষণীয় জ্ঞান করি। আমার বলবার অভিপ্রায় এই, গাড়ি চড়ে হাওয়া না খেয়েও তারা একরকম সুখে আছে, হাওয়া খেয়ে তারা আরও সুখী হয় আরও ভালো। অন্তঃপুরের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে থেকেও তাদের হৃদয়ের অভাব নেই, জ্ঞান ও স্বাধীনতা-বৃদ্ধির সঙ্গে তাদের হৃদয়ের প্রসারতা আরও বাড়ে তো আরও ভালো। আমার বলবার অভিপ্রায় এই যে, আমাদের মধ্যে মন্দ যেমন আছে তেমনি ভালোও আছে— তোমরা যতটা বিভীষিকা দেখ ততটা কিছু নয়। আমার ধর্ম যে মানে না সে চিরনরকে দগ্ধ হবে এ যেমন গোঁড়া খৃস্টানি, আমাদের মতো যাদের প্রথা নয় তারা অসুখী এও তেমনি গোঁড়া দ্বৈপায়নতা।

শুক্রবার [৩১ অক্টোবর]। কিন্তু সময়ের পরিবর্তন হয়ে আসছে। এখন আমাদের বাইরে বিক্ষিপ্ত হবার সময়, কেবলমাত্র পরিবার-প্রতিপালন আমাদের একমাত্র কাজ বলে ধরে নিলে চলবে না। ইংরেজের সংঘর্ষে এসে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আমাদের একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। চিরদিন অপমানিত এবং ধিক্‌কৃত হয়ে আর জীবনধারণ করা চলে না। শিক্ষা করতে এবং শিক্ষা দিতে হবে, আপনার শক্তি দেশে বিদেশে পরিচালিত করতে হবে— পৃথিবীতে আপনার উপযোগিতা প্রমাণ করতে হবে। সুতরাং মেয়েদের অবস্থারও পরিবর্তন আবশ্যক। এখন কেবল তাদের গৃহের সামগ্রী করলে চলবে না। তাদেরও জাগ্রত হয়ে আমাদের জাগ্রত করতে হবে। তাদের মধ্যেও এই নবজীবনের উন্মেষ আবশ্যক।

আজ সন্ধের সময় Hamilton-এর সঙ্গে গল্প হচ্ছিল। সে বলছিল : তোমরা আর যাই করো, য়ুরোপের নকল কোরো না— Then you are nowhere, you are lost! তোমাদের ধর্ম, তোমাদের সভ্যতা, সহস্র সহস্র বৎসর টিঁকে আছে। কিন্তু চার শো বৎসর আগে আমরা

কী ছিলুম? চার শো বৎসর পরে আমরা কী থাকব? আমাদের বড়ো বড়ো নগরের মধ্যে কী ভয়ানক পঙ্কিলতা প্রবেশ করেছে ভেবে দেখলে আশা থাকে না।

শনিবার [১ নবেম্বর]। Dillon মৃত্যুশয্যায় শয়ান। বম্বে পর্যন্ত পৌঁছবে কি না সন্দেহস্থল। বৃদ্ধ আমাদেরই সঙ্গে এক জাহাজে য়ুরোপে গিয়েছিল। কাল সন্ধেবেলায় যখন গানবাজনা নাচ হচ্ছিল, এবং আজ সকালে যখন খেলা চীৎকার হাসি চলছিল, তখন চতুর্দিকের এই জীবনের কলরব তার কানে প্রবেশ করে কিরকম লাগছিল! আজ সুন্দর সকালবেলা, ঠান্ডা বাতাস বচ্ছে, সমুদ্র সফেন তরঙ্গে নৃত্য করছে, উজ্জ্বল রোদ্দুর উঠেছে, কেউ বা quoit খেলছে, কেউ বা নবেল পড়ছে, কেউ গল্প করছে, music saloon-এ গান চলছে, smoking saloon-এ তাস চলছে, dining saloon-এ lunch খাবার আয়োজন হচ্ছে— আর Dillon মরছে।

আজ সন্ধে আটটার সময় Dillon-এর মৃত্যু হল। আজ সন্ধের সময় একটা অভিনয় হবার কথা ছিল, হল না।

Gibbs আজ আবার তাদের মেয়েদের কথা বলছিল। বলছিল, মেয়েরা ক্রমে ভারি নির্লজ্জ হয়ে আসছে, তারা অম্লানবদনে প্রকাশ্যে উলঙ্গপ্রায় পুরুষদের ব্যায়ামক্রীড়া ও swimming match দেখতে যায়— এবং picture saloon-এর কথা বললে। আমার কিন্তু এগুলো ততটা খারাপ লাগে না। এই উলঙ্গ দৃশ্যের মধ্যে একটা বেশ অসংকোচ healthiness আছে— আধেক ঢাকাঢাকি এবং suggestiveness-ই কুৎসিত, যেমন ball-room-এ মেয়েদের বুকখোলা কাপড় এবং নাচ। Waltz নাচ সম্বন্ধে Gibbs যেরকম করে বলছিল সে আমি লিখতে পারি নে— সে শুনে আমার ভারি লজ্জা এবং কষ্ট হচ্ছিল। Youngman-রা এ সম্বন্ধে যেরকম ভাবে কথা কয় মেয়েদের শোনা উচিত। ইতিপূর্বে একদিন আশু এবং লোকেনের কাছে এ বিষয়ে অনেক কথা শুনেছিলুম।

ডিনার-টেবিলে Third Officer গল্প করছিল— Hurricane ডেকের উপর তাদের ঘরের পাশে আজকাল সন্ধেবেলায় অন্ধকারে অনেক চুম্বনের শব্দ শোনা যাচ্ছে— জাহাজ গম্যস্থানের নিকটবর্তী হয়েছে, বিদায়ের সময় এসেছে, তারই আয়োজন। শুনে Miss Hedisted লজ্জায় লাল হয় উঠল। 3rd Off. গল্প করলে : আর-একবার সমুদ্রযাত্রায় সে চীনদেশ থেকে কাপড়ের পাড় কিনে নিয়ে যাচ্ছিল, তাই দেখাবার জন্যে একজন মা এবং মেয়ে যাত্রীকে তার ক্যাবিনে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। পাড় দেখা হয়ে গেলে মা এগিয়ে গেল, মেয়ে একটু পিছিয়ে রইল। Officer তার কারণ অনুসন্ধান করতে যাওয়াতে মেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল : Won't you kiss me? Off. : No. Why? মেয়ে : But other officers always kiss me when they take me to their cabin। শুনে আমরা এবং মেয়েরা সবাই অপ্রস্তুত। লোকটার মুখে কিছুই বাধে না।

রবি [২ নবেম্বর]। আজ সকাল আটটার সময় ডিলনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়ে গেল। আমি দেখতে গেলুম। একটা টেবিলের উপরে কফিন পড়ে আছে। Hamilton, Connolly, এক দল পর্টুগীজ ভৃত্য, এবং দু-তিনজন ক্যাথলিক মেয়ে হাঁটু গেড়ে কফিন ঘিরে রোমান ক্যাথলিক burial service পড়ছে। আর, সকলে কালো কাপড় পরে টুপি খুলে চারি দিকে নীরবে দাঁড়িয়ে। প্রার্থনা হয়ে গেলে পরে কফিন সমুদ্রের জলে ফেলে দিলে। তার পরে জাহাজ আবার চলতে লাগল। এই অন্ত্যেষ্টিসৎকারের সঙ্গে আমাদের সমুদ্রযাত্রার শেষ দিন আগত হল।

আজ রাত্তিরে জাহাজ বম্বে পৌঁছবে। স্পেশল ট্রেনে আমাকে যেতে দেবে কি না কে জানে— তা না হলে মেজদাদাদের চিঠি একদিন আগে গিয়ে পৌঁছবে, আমার হঠাৎ গিয়ে পড়বার কল্পনা একেবারে মাটি হয়ে যাবে। কূলে এসে তরী ডোবা একেই বলে।

আর ডায়ারি বন্ধ করা যাক।

২ মাস এগারো দিন কেটে গেল। মনে হচ্ছে কত যুগ। রাত দুপুরের সময় বম্বে পৌঁছনো গেল। স্পেশল ট্রেন ধরতে পারলুম না— তাই ভারতবর্ষে পৌঁছেও মন ভারি বিগড়ে আছে— হঠাৎ

গিয়ে পড়ব বলে কত কী কল্পনা করেছিলুম, একদিনের জন্যে সমস্ত ফস্কে গেল। বাড়ি যতই কাছে আসছে মন ততই যেন অস্থির হয়ে উঠছে। Gravitation-এর নিয়মানুসারে ভার পৃথিবীর যতই নিকটবর্তী হয় তার বেগ ততই বাড়ে— মনেরও সেই নিয়ম দেখছি। কাল সমস্ত রাত এক মুহূর্ত ঘুমোই নি। আজ সকালে তাড়াতাড়ি Watsons Hotel-এ বেরিয়ে পড়লুম। এখেনে এসে দেখি আমার টাকার ব্যাগটি জাহাজে ফেলে এসেছি। মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। তার মধ্যে আমার return ticket এবং টাকা। তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে আবার সেই জাহাজে চললুম। সেই পুরোনো ক্যাবিনের peg-এ ব্যাগটি ঝুলছে— ধড়ে প্রাণ এল। এরকম ফিরে পেলে হারিয়ে সুখ আছে। ব্যাগটি কাঁধের উপর ঝুলিয়ে সমস্ত পৃথিবী আনন্দময় বোধ হল। আমার মতো লোকের ঘর ছেড়ে এক পা বেরোনো উচিত নয়। যখন আমার biography বেরোবে তখন এই-সমস্ত অন্যমনস্কতার দৃষ্টান্তগুলো পাঠকদের কাছে ভারি আমোদজনক এবং কবির উপযুক্ত শোনাবে, কিন্তু আপাতত ভারি অসুবিধে। এই ব্যাগ ভুলে যাবার সম্ভাবনা কাল সন্ধেবেলায় একবার মনে উদয় হয়েছিল। তার পরে মনকে বিশেষ করে সাবধান করে দিলুম, ব্যাগটা যেন না ভোলা হয়। মন বললে ক্ষেপেছ! টাকার ব্যাগ আমি ভুলি! আজ সকালে তাকে আচ্ছা এক-চোট গাল দিয়ে নিয়েছি। সে নিরুত্তর হয়ে রইল। তার পরে যখন ব্যাগ ফিরে পাওয়া গেল তখন আবার তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে হোটেলে ফিরে এসে স্নান করে বড়ো আরাম বোধ হচ্ছে। ভরসা করি আজ সন্ধেবেলায় আবার ভুলব না। আজ সন্ধেবেলায় সমস্ত গুছিয়েগাছিয়ে নিয়ে যখন গাড়িতে চড়ে বসব তখন মনটা একবার নৃত্য করে উঠবে— তার পরে হুগলির কাছাকাছি গিয়ে যখন সকাল হবে— তখন—। ঐ breakfast-এর ঘণ্টা বাজল— খেয়ে আসি, ক্ষিধে পেয়েছে।

গাড়ির জন্যে একটা বালিশ কিনেছিলুম— সেটা হোটেলে ফেলে এসেছি।

আমাদের good morning প্রভৃতি কোনোরকম greeting নেই বলে Gibbs আমাদের নেহাত অসভ্য মনে করেছে।

Truth কাগজ থেকে একটা জায়গা উদ্ধৃত করে রাখি :

The expression of a fashionably-dressed woman is now emphatically one of nakedness. Her sleeveless bodice, cut halfway to her waist, betrays much and suggests more. Her large white arms, her uncovered shoulders crossed with an airy line, her bust displayed to the last inch permitted by the law which protects morality and forbids obscenity, her back bared in a wedge-shaped track to her band, the colour of her gown scarce distinguishable from her skin, and the 'fit' one which moulds the figure and makes no pretence at disguise—in this indecent nudity she offers herself to public admiration; and the bold looks of the men are the caresses which make her purr with pride and pleasure. Her dress is her note of invitation; and if but few honestly confess, no one is deceived.

Oriental-দের dishonesty সম্বন্ধে ইংরেজরা প্রায় আলোচনা করে থাকে, তাই নিম্নের খবরটা টুকে রাখা গেল : *Truth* : Oct. 16, 1890 :

The writer was yesterday in a city restaurant, when, in an adjoining box he overheard scraps of conversation which, at first, were meaningless to him; but, in the light of something he had heard earlier in the day, he was able to piece out one of those stories of trickery and fraud in connection with the Stock-Exchange which, as a rule, the public only hear of after the victims are

ruined. The party were very jubilant, and the copious champagne that they indulged in made them possibly more reckless than in their sober moments they would have been. Briefly, what was overheard made it clear that the party were members of a ring which had for its purpose the breaking down of the credit of some wellknown South African shares, and some important information was alluded to that was being kept in the background until the right moment— that is, when an immediate rise was to follow.. . The writer encloses his private card, and, in confidence, would be happy to answer any inquiries.

Editor remarks: My correspondent, who is highly respectable, and is unconnected with financial jobbery etc.

আসল কথা হচ্ছে, পরের জাত সম্বন্ধে আমরা যেটা দেখি এবং শুনি সেইটেই আমাদের কাছে মস্ত হয়ে ওঠে— তার সমস্তটা আমরা তদন্ত করতে পারি নে। এইজন্যে তাড়াতাড়ি generalize করে একটা মত খাড়া করি।

জাপানে রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৬

জাপান-যাত্রী

প্রকাশ : ১৯১৯

'জাপান-যাত্রী' গ্রন্থ ১৯১৯ সালে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হবার পর ১৯৩৬ সালে 'জাপানে-পারস্যে' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রথম প্রকাশের কালানুক্রমেই এস্থানে 'জাপান-যাত্রী' মুদ্রিত হল।

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু

১

বোম্বাই থেকে যতবার যাত্রা করেছি জাহাজ চলতে দেরি করে নি। কলকাতার জাহাজে যাত্রার আগের রাত্রে গিয়ে বসে থাকতে হয়। এটা ভালো লাগে না। কেননা, যাত্রা করবার মানেই মনের মধ্যে চলার বেগ সঞ্চয় করা। মন যখন চলবার মুখে তখন তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা, তার এক শক্তির সঙ্গে তার আর-এক শক্তির লড়াই বাধানো। মানুষ যখন ঘরের মধ্যে জমিয়ে বসে আছে তখন বিদায়ের আয়োজনটা এইজন্যেই কষ্টকর; কেননা, থাকার সঙ্গে যাওয়ার সন্ধিস্থলটা মনের পক্ষে মুশকিলের জায়গা—সেখানে তাকে দুই উল্টো দিক সামলাতে হয়, সে একরকমের কঠিন ব্যায়াম।

বাড়ির লোকেরা সকলেই জাহাজে চড়িয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে গেল, বন্ধুরা ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিয়ে বিদায় দিলে, কিন্তু জাহাজ চলল না। অর্থাৎ, যারা থাকবার তারাই গেল, আর যেটা চলবার সেটাই স্থির হয়ে রইল; বাড়ি গেল সরে, আর তরী রইল দাঁড়িয়ে।

বিদায়মাত্রেরই একটা ব্যথা আছে; সে ব্যথাটার প্রধান কারণ এই, জীবনে যা-কিছুকে সব চেয়ে নির্দিষ্ট করে পাওয়া গেছে তাকে অনির্দিষ্টের আড়ালে সমর্পণ করে যাওয়া। তার বদলে হাতে হাতে আর-একটা কিছুকে পাওয়া না গেলে এই শূন্যতাটাই মনের মধ্যে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সেই পাওনাটা হচ্ছে অনির্দিষ্টকে ক্রমে ক্রমে নির্দিষ্টের ভাণ্ডারের মধ্যে পেয়ে চলতে থাকা। অপরিচয়কে ক্রমে ক্রমে পরিচয়ের কোঠার মধ্যে ভুক্ত করে নিতে থাকা। সেইজন্যে যাত্রার মধ্যে যে দুঃখ আছে চলাটাই হচ্ছে তার ওষুধ। কিন্তু, যাত্রা করলুম অথচ চললুম না, এটা সহ্য করা শক্ত।

অচল জাহাজের ক্যাবিন হচ্ছে বন্ধনদশার দ্বিগুণ-চোলাই-করা কড়া আরক। জাহাজ চলে বলেই তার কামরার সংকীর্ণতাকে আমরা ক্ষমা করি। কিন্তু, জাহাজ যখন স্থির থাকে তখন ক্যাবিনে স্থির থাকা, মৃত্যুর ঢাকনাটার নীচে আবার গোরের ঢাকনার মতো।

ডেকের উপরেই শোবার ব্যবস্থা করা গেল। ইতিপূর্বে অনেকবার জাহাজে চড়েছি, অনেক কাপ্তেনের সঙ্গে ব্যবহার করেছি। আমাদের এই জাপানি কাপ্তেনের একটু বিশেষত্ব আছে। মেলা-মেশায় ভালোমানুষিতে হঠাৎ মনে হয় ঘোরো লোকের মতো। মনে হয়, এঁকে অনুরোধ করে যা-খুশি তাই করা যেতে পারে; কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যায় নিয়মের লেশমাত্র নড়চড় হবার জো নেই। আমাদের সহযাত্রী ইংরেজ বন্ধু ডেকের উপরে তাঁর ক্যাবিনের গদি আনবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের ঘাড় নড়ল, সে ঘটে উঠল না। সকালে ব্রেকফাস্টের সময় তিনি যে-টেবিলে বসেছিলেন সেখানে পাখা ছিল না; আমাদের টেবিলে জায়গা ছিল, সেই দেখে তিনি আমাদের টেবিলে বসবার ইচ্ছা জানালেন। অনুরোধটা সামান্য, কিন্তু কাপ্তেন বললেন, এ-বেলাকার মতো বন্দোবস্ত হয়ে গেছে, ডিনারের সময় দেখা যাবে। আমাদের টেবিলে চৌকি খালি রইল, কিন্তু তবু নিয়মের ব্যত্যয় হল না। বেশ বোঝা যাচ্ছে অতি অল্পমাত্রও ঢিলেঢালা কিছু হতে পারবে না।

রাত্রে বাইরে শোয়া গেল, কিন্তু এ কেমনতরো বাইরে? জাহাজের মাস্তুলে মাস্তুলে আকাশটা যেন ভীষ্মের মতো শরশয্যায় শুয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করছে। কোথাও শূন্যরাজ্যের ফাঁকা নেই। অথচ বস্তুরাজ্যের স্পষ্টতাও নেই। জাহাজের আলোগুলো মস্ত একটা আয়তনের সূচনা করেছে, কিন্তু কোনো আকারকে দেখতে দিচ্ছে না।

কোনো একটি কবিতায় প্রকাশ করেছিলুম যে আমি নিশীথরাত্রির সভাকবি। আমার বরাবর এ কথাই মনে হয় যে, দিনের বেলাটা মর্ত্যলোকের, আর রাত্রিবেলাটা সুরলোকের। মানুষ ভয় পায়, মানুষ কাজকর্ম করে, মানুষ তার পায়ের কাছের পথটা স্পষ্ট করে দেখতে চায়, এইজন্যে এতবড়ো একটা আলো জ্বালতে হয়েছে। দেবতার ভয় নেই, দেবতার কাজ নিঃশব্দে গোপনে, দেবতার চলার সঙ্গে স্তব্ধতার কোনো বিরোধ নেই, এইজন্যেই অসীম অন্ধকার দেবসভার আস্তরণ। দেবতা রাত্রেই আমাদের বাতায়নে এসে দেখা দেন।

কিন্তু, মানুষের কারখানা যখন আলো জ্বালিয়ে সেই রাত্রিকেও অধিকার করতে চায় তখন কেবল যে মানুষই ক্লিষ্ট হয় তা নয়, দেবতাকেও ক্লিষ্ট করে তোলে। আমরা যখন থেকে বাতি জেবলে রাত জেগে এগ্‌জামিন পাস করতে প্রবৃত্ত হয়েছি তখন থেকে সূর্যের আলোয় সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট নিজের সীমানা লঙ্ঘন করতে লেগেছি, তখন থেকেই সুর-মানবের যুদ্ধ বেধেছে। মানুষের কারখানা-ঘরের চিমনিগুলো ফুঁ দিয়ে দিয়ে নিজের অন্তরের কালিকে দ্যুলোকে বিস্তার করছে, সে অপরাধ তেমন গুরুতর নয়—কেননা, দিনটা মানুষের নিজের, তার মুখে সে কালি মাখালেও দেবতা তা নিয়ে নালিশ করবেন না। কিন্তু, রাত্রির অখণ্ড অন্ধকারকে মানুষ যখন নিজের আলো দিয়ে ফুটো করে দেয় তখন দেবতার অধিকারে সে হস্তক্ষেপ করে। সে যেন নিজের দখল অতিক্রম করে আলোকের খুঁটি গেড়ে দেবলোকে আপন সীমানা চিহ্নিত করতে চায়।

সেদিন রাত্রে গঙ্গার উপরে সেই দেববিদ্রোহের বিপুল আয়োজন দেখতে পেলুম। তাই মানুষের ক্লান্তির উপর সুরলোকের শান্তির আশীর্বাদ দেখা গেল না। মানুষ বলতে চাচ্ছে, আমিও দেবতার মতো, আমার ক্লান্তি নেই। কিন্তু সেটা মিথ্যা কথা, এইজন্যে সে চারি দিকের শান্তি নষ্ট করছে। এইজন্যে অন্ধকারকেও সে অশুচি করে তুলছে।

দিন আলোকের দ্বারা আবিল, অন্ধকারই পরম নির্মল। অন্ধকার রাত্রি সমুদ্রের মতো; তা অঞ্জনের মতো কালো, কিন্তু তবু নিরঞ্জন। আর দিন নদীর মতো; তা কালো নয়, কিন্তু পঙ্কিল। রাত্রির সেই অতলস্পর্শ অন্ধকারকেও সেদিন সেই খিদিরপুরের জেটির উপর মলিন দেখলুম। মনে হল, দেবতা স্বয়ং মুখ মলিন করে রয়েছেন।

এমনি খারাপ লেগেছিল এডেনের বন্দরে। সেখানে মানুষের হাতে বন্দী হয়ে সমুদ্রও কলুষিত। জলের উপরে তেল ভাসছে, মানুষের আবর্জনাকে স্বয়ং সমুদ্রও বিলুপ্ত করতে পারছে না। সেই রাত্রে জাহাজের ডেকের উপর শুয়ে অসীম রাত্রিকেও যখন কলঙ্কিত দেখলুম তখন মনে হল, একদিন ইন্দ্রলোক দানবের আক্রমণে পীড়িত হয়ে ব্রহ্মার কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন—আজ মানবের অত্যাচার থেকে দেবতাদের কোন্‌ রুদ্র রক্ষা করবেন।

২

জাহাজ ছেড়ে দিলে। মধুর বহিছে বায়ু, ভেসে চলি রঙ্গে।

কিন্তু এর রঙ্গটা কেবলমাত্র ভেসে চলার মধ্যেই নয়। ভেসে চলার একটি বিশেষ দৃষ্টি ও সেই বিশেষ দৃষ্টির বিশেষ রস আছে। যখন হেঁটে চলি তখন কোনো অখণ্ড ছবি চোখে পড়ে না। ভেসে চলার মধ্যে দুই বিরোধের পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়েছে—বসেও আছি, চলছিও। সেইজন্যে চলার কাজ হচ্ছে, অথচ চলার কাজে মনকে লাগাতে হচ্ছে না। তাই মন যা সামনে দেখছে তাকে পূর্ণ করে দেখছে। জল-স্থল-আকাশের সমস্তকে এক করে মিলিয়ে দেখতে পাচ্ছে।

ভেসে চলার মধ্যে দিয়ে দেখার আর-একটা গুণ হচ্ছে এই যে, তা মনোযোগকে জাগ্রত করে, কিন্তু মনোযোগকে বদ্ধ করে না। না দেখতে পেলেও চলত, কোনো অসুবিধে হত না, পথ ভুলতুম না, গর্তয় পড়তুম না। এইজন্যে ভেসে চলার দেখাটা হচ্ছে নিতান্তই দায়িত্ববিহীন দেখা; দেখাটাই তার চরম লক্ষ্য, এইজন্যেই এই দেখাটা এমন বৃহৎ, এমন আনন্দময়।

এতদিনে এইটুকু বোঝা গেছে যে, মানুষ নিজের দাসত্ব করতে বাধ্য, কিন্তু নিজের সম্বন্ধেও দায়ে-পড়া কাজে তার প্রীতি নেই। যখন চলাটাকেই লক্ষ্য করে পায়চারি করি তখন সেটা বেশ; কিন্তু যখন কোথাও পৌঁছবার দিকে লক্ষ করে চলতে হয় তখন সেই চলার বাধ্যতা থেকে মুক্তি পাওয়ার শক্তিতেই মানুষের সম্পদ প্রকাশ পায়। ধন জিনিসটার মানেই এই, তাতে মানুষের প্রয়োজন কমায় না কিন্তু নিজের প্রয়োজন সম্বন্ধে তার নিজের বাধ্যতা কমিয়ে দেয়। খাওয়া-পরা দেওয়া-নেওয়ার দরকার তাকে মেটাতেই হয়, কিন্তু তার বাইরে যেখানে তার উদ্‌বৃত্ত সেইখানেই মানুষ মুক্ত,

সেইখানেই সে বিশুদ্ধ নিজের পরিচয় পায়। সেইজন্যেই ঘটিবাটি প্রভৃতি দরকারি জিনিসকেও মানুষ সুন্দর করে গড়ে তুলতে চায়; কারণ, ঘটিবাটির উপযোগিতা মানুষের প্রয়োজনের পরিচয় মাত্র কিন্তু তার সৌন্দর্যে মানুষের নিজেরই রুচির, নিজেরই আনন্দের পরিচয়। ঘটিবাটির উপযোগিতা বলছে, মানুষের দায় আছে; ঘটিবাটির সৌন্দর্য বলছে, মানুষের আত্মা আছে।

আমার না হলেও চলত, কেবল আমি ইচ্ছা করে করছি এই যে মুক্ত কর্তৃত্বের ও মুক্ত ভোক্তৃত্বের অভিমান, যে অভিমান বিশ্বস্রষ্টার এবং বিশ্বরাজ্যেশ্বরের, সেই অভিমানই মানুষের সাহিত্যে এবং আর্টে। এই রাজ্যটি মুক্ত মানুষের রাজ্য, এখানে জীবনযাত্রার দায়িত্ব নেই।

আজ সকালে যে প্রকৃতি সবুজ পাড়-দেওয়া গেরুয়া নদীর শাড়ি পরে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে আমি তাকে দেখছি। এখানে আমি বিশুদ্ধ দ্রষ্টা। এই দ্রষ্টা আমিটি যদি নিজেকে ভাষায় বা রেখায় প্রকাশ করত তা হলে সেইটেই হত সাহিত্য, সেইটেই হত আর্ট। খামকা বিরক্ত হয়ে এমন কথা কেউ বলতে পারে, 'তুমি দেখছ তাতে আমার গরজ কী। তাতে আমার পেটও ভরবে না, আমার ম্যালেরিয়াও ঘুচবে না, তাতে আমার ফসল-খেতে বেশি করে ফসল ধরবার উপায় হবে না।' ঠিক কথা। আমি যে দেখছি এতে তোমার কোনো গরজ নেই। অথচ আমি যে শুদ্ধমাত্র দ্রষ্টা, এ সম্বন্ধে বস্তুতই যদি তুমি উদাসীন হও তা হলে জগতে আর্ট এবং সাহিত্য-সৃষ্টির কোনো মানে থাকে না।

আমাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পার, 'আজ এতক্ষণ ধরে তুমি যে লেখাটা লিখছ ওটাকে কী বলবে। সাহিত্য, না তত্ত্বালোচনা?'

নাই বললুম তত্ত্বালোচনা। তত্ত্বালোচনায় যে-ব্যক্তি আলোচনা করে সে প্রধান নয়, তত্ত্বটাই প্রধান। সাহিত্যে সেই ব্যক্তিটাই প্রধান, তত্ত্বটা উপলক্ষ। এই-যে সাদা মেঘের ছিটে-দেওয়া নীল আকাশের নীচে শ্যামল-ঐশ্বর্যময়ী ধরণীর আঙিনার সামনে দিয়ে সন্ন্যাসী জলের স্রোত উদাসী হয়ে চলেছে, তার মাঝখানে প্রধানত প্রকাশ পাচ্ছে দ্রষ্টা আমি। যদি ভূতত্ত্ব বা ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করতে হত তা হলে এই আমিকে সরে দাঁড়াতে হত। কিন্তু, এক আমির পক্ষে আর-এক আমির অহেতুক প্রয়োজন আছে, এইজন্য সময় পেলেই আমরা ভূতত্ত্বকে সরিয়ে রেখে সেই আমির সন্ধান করি।

তেমনি করেই কেবলমাত্র দৃশ্যের মধ্যে নয়, ভাবের মধ্যেও যে ভেসে চলেছে সেও সেই দ্রষ্টা আমি। সেখানে যা বলছে সেটা উপলক্ষ, যে বলছে সেই লক্ষ্য। বাহিরের বিশ্বের রূপধারার দিকেও আমি যেমন তাকাতে তাকাতে চলেছি, আমার অন্তরের চিন্তাধারা ভাবধারার দিকেও আমি তেমনি চিত্তদৃষ্টি দিয়ে তাকাতে তাকাতে চলেছি। এই ধারা কোনো বিশেষ কর্মের বিশেষ প্রয়োজনের সূত্রে বিধৃত নয়। এই ধারা প্রধানত লজিকের দ্বারাও গাঁথা নয়, এর গ্রন্থনসূত্র মুখ্যত আমি। সেইজন্যে আমি কেয়ারমাত্র করি নে, সাহিত্য সম্বন্ধে বক্ষ্যমাণ রচনাটিকে লোক পাকা কথা বলে গ্রহণ করবে কি না। বিশ্বলোকে এবং চিত্তলোকে 'আমি দেখছি' এই অনাবশ্যক আনন্দের কথাটা বলাই হচ্ছে আমার কাজ। এই কথাটা যদি ঠিক করে বলতে পারি তা হলে অন্য সকল আমির দলও বিনা প্রয়োজনে খুশি হয়ে উঠবে।

উপনিষদে লিখছে, এক ডালে দুই পাখি আছে, তার মধ্যে এক পাখি খায় আর-এক পাখি দেখে। যে-পাখি দেখছে তারই আনন্দ বড়ো আনন্দ; কেননা, তার সে বিশুদ্ধ আনন্দ, মুক্ত আনন্দ। মানুষের নিজের মধ্যেই এই দুই পাখি আছে। এক পাখির প্রয়োজন আছে, আর-এক পাখির প্রয়োজন নেই। এক পাখি ভোগ করে, আর-এক পাখি দেখে। যে-পাখি ভোগ করে সে নির্মাণ করে, যে-পাখি দেখে সে সৃষ্টি করে। নির্মাণ করা মানে মাপে তৈরি করা, অর্থাৎ যেটা তৈরি হচ্ছে সেইটেই চরম নয়, সেইটেকে অন্য কিছুর মাপে তৈরি করা—নিজের প্রয়োজনের মাপে বা অন্যের প্রয়োজনের মাপে। আর, সৃষ্টি করা অন্য কোনো-কিছুর মাপের অপেক্ষা করে না, সে হচ্ছে নিজেকে সর্জন করা, নিজেকেই প্রকাশ করা। এইজন্য ভোগী পাখি যে-সমস্ত উপকরণ নিয়ে কাজ করছে তা প্রধানত বাইরের উপকরণ, আর দ্রষ্টা পাখির উপকরণ হচ্ছে আমি-পদার্থ। এই আমির প্রকাশই সাহিত্য, আর্ট। তার মধ্যে কোনো দায়ই নেই, কর্তব্যের দায়ও না।

পৃথিবীতে সব চেয়ে বড়ো রহস্য—দেখবার বস্তুটি নয়, যে দেখে সেই মানুষটি। এই রহস্য আপনি আপনার ইয়ত্তা পাচ্ছে না; হাজার হাজার অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আপনাকে দেখতে চেষ্টা করছে। যা-কিছু ঘটছে এবং যা-কিছু ঘটতে পারে, সমস্তর ভিতর দিয়ে নিজেকে বাজিয়ে দেখছে।

এই-যে আমার এক-আমি, এ বহুর মধ্যে দিয়ে চলে চলে নিজেকে নিত্য উপলব্ধি করতে থাকে। বহুর সঙ্গে মানুষের সেই একের মিলনজাত রসের উপলব্ধিই হচ্ছে সাহিত্যের সামগ্রী। অর্থাৎ, দৃষ্ট বস্তু নয়, দ্রষ্টা আমিই তার লক্ষ্য।

তোসামারু জাহাজ
২০ বৈশাখ ১৩২৩

৩

বৃহস্পতিবার বিকেলে সমুদ্রের মোহানায় পাইলট নেবে গেল। এর কিছু আগে থাকতেই সমুদ্রের রূপ দেখা দিয়েছে। তার কূলের বেড়ি খসে গেছে। কিন্তু, এখনো তার মাটির রঙ ঘোচে নি। পৃথিবীর চেয়ে আকাশের সঙ্গেই যে তার আত্মীয়তা বেশি, সে কথা এখনো প্রকাশ হয় নি; কেবল দেখা গেল জলে আকাশে এক দিগন্তের মালা বদল করেছে। যে ঢেউ দিয়েছে, নদীর ঢেউয়ের ছন্দের মতো তার ছোটো ছোটো পদবিভাগ নয়; এ যেন মন্দাক্রান্তা, কিন্তু এখনো সমুদ্রের শার্দূলবিক্রীড়িত শুরু হয় নি।

আমাদের জাহাজের নীচের তলার ডেকে অনেকগুলি ডেক-প্যাসেঞ্জার; তাদের অধিকাংশ মাদ্রাজি, এবং তারা প্রায় সকলেই রেঙ্গুনে যাচ্ছে। তাদের 'পরে এই জাহাজের লোকের ব্যবহারে কিছুমাত্র কঠোরতা নেই, তারা বেশ স্বচ্ছন্দে আছে। জাহাজের ভাণ্ডার থেকে তারা প্রত্যেকে একখানি করে ছবি আঁকা কাগজের পাখা পেয়ে ভারি খুশি হয়েছে।

এরা অনেকেই হিন্দু, সুতরাং এদের পথের কষ্ট ঘোচানো কারও সাধ্য নয়। কোনোমতে আখ চিবিয়ে, চিঁড়ে খেয়ে এদের দিন যাচ্ছে। একটা জিনিস ভারি চোখে লাগে, সে হচ্ছে এই যে, এরা মোটের উপর পরিষ্কার—কিন্তু সেটা কেবল বিধানের গণ্ডির মধ্যে, বিধানের বাইরে এদের নোংরা হবার কোনো বাধা নেই। আখ চিবিয়ে তার ছিবড়ে অতি সহজেই সমুদ্রে ফেলে দেওয়া যায়, কিন্তু সেটুকু কষ্ট নেওয়া এদের বিধানে নেই—যেখানে বসে খাচ্ছে তার নেহাত কাছে ছিবড়ে ফেলছে, এমনি করে চারি দিকে কত আবর্জনা যে জমে উঠছে তাতে এদের ভ্রূক্ষেপ নেই; সব চেয়ে আমাকে পীড়া দেয় যখন দেখি থুথু ফেলা সম্বন্ধে এরা বিচার করে না। অথচ, বিধান অনুসারে শুচিতা রক্ষা করবার বেলায় নিতান্ত সামান্য বিষয়েও এরা অসামান্য রকম কষ্ট স্বীকার করে। আচারকে শক্ত করে তুললে বিচারকে ঢিলে করতেই হয়। বাইরে থেকে মানুষকে বাঁধলে মানুষ আপনাকে আপনি বাঁধবার শক্তি হারায়।

এদের মধ্যে কয়েকজন মুসলমান আছে; পরিষ্কার হওয়া সম্বন্ধে তারা যে বিশেষ সতর্ক তা নয়, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে তাদের ভারি সতর্কতা। ভালো কাপড়টি পরে টুপিটি বাগিয়ে তারা সর্বদা প্রস্তুত থাকতে চায়। একটুমাত্র পরিচয় হলেই অথবা না হলেও তারা দেখা হলেই প্রসন্নমুখে সেলাম করে। বোঝা যায়, তারা বাইরের সংসারটাকে মানে। কেবলমাত্র নিজের জাতের গণ্ডির মধ্যে যারা থাকে তাদের কাছে সেই গণ্ডির বাইরেকার লোকালয় নিতান্ত ফিকে। তাদের সমস্ত বাঁধাবাঁধি জাতরক্ষার বন্ধন। মুসলমান জাতে বাঁধা নয় বলে বাহিরের সংসারের সঙ্গে তার ব্যবহারের বাঁধাবাঁধি আছে। এইজন্যে আদবকায়দা মুসলমানের। আদবকায়দা হচ্ছে সমস্ত মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের সাধারণ নিয়ম। মনুতে পাওয়া যায়, মা মাসি মামা পিসের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতে হবে, গুরুজনের গুরুত্বের মাত্রা কার কতদূর, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের পরস্পরের ব্যবহার কী রকম হবে, কিন্তু সাধারণভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কী রকম হওয়া উচিত তার বিধান নেই।

এইজন্যে সম্পর্কবিচার ও জাতিবিচারের বাইরে মানুষের সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষার জন্যে, পশ্চিম-ভারত মুসলমানের কাছ থেকে সেলাম শিক্ষা করেছে। কেননা, প্রণাম-নমস্কারের সমস্ত বিধি কেবল জাতের মধ্যেই খাটে। বাহিরের সংসারটাকে ইতিপূর্বে আমরা অস্বীকার করে চলেছিলুম বলেই সাজসজ্জা সম্বন্ধে পরিচ্ছন্নতা, হয় আমরা মুসলমানের কাছ থেকে নিয়েছি নয় ইংরেজের কাছ থেকে নিচ্ছি; ওটাতে আমাদের আরাম নেই। সেইজন্যে ভদ্রতার সাজ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত আমাদের পাকাপাকি কিছুই ঠিক হল না। বাঙালি ভদ্রসভায় সাজসজ্জার যে এমন অদ্ভুত বৈচিত্র্য, তার কারণই এই। সব সাজই আমাদের সাজ। আমাদের নিজের সাজ, মণ্ডলীর ভিতরকার সাজ; সুতরাং বাহিরের সংসারের হিসাবে সেটা বিবসন বললেই হয়—অন্তঃপুরের মেয়েদের বসনটা যেরকম, অর্থাৎ দিগ্‌বসনের সুন্দর অনুকরণ। বাইরের লোকের সঙ্গে আমরা ভাই খুড়ো দিদি মাসি প্রভৃতি কোনো-একটা সম্পর্ক পাতাবার জন্যে ব্যস্ত থাকি; নইলে আমরা থই পাই নে। হয় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা নয় অত্যন্ত দূরত্ব, এর মাঝখানে যে একটা প্রকাণ্ড জায়গা আছে সেটা আজও আমাদের ভালো করে আয়ত্ত হয় নি। এমন-কি, সেখানকার বিধিবন্ধনকে আমরা হৃদ্যতার অভাব বলে নিন্দা করি। এ কথা ভুলে যাই, যে-সব মানুষকে হৃদয় দিতে পারি নে তাদেরও কিছু দেবার আছে। এই দানটাকে আমরা কৃত্রিম বলে গাল দিই, কিন্তু জাতের কৃত্রিম খাঁচার মধ্যে মানুষ বলেই এই সাধারণ আদবকায়দাকে আমাদের কৃত্রিম বলে ঠেকে। বস্তুত, ঘরের মানুষকে আত্মীয় বলে এবং তার বাইরের মানুষকে আপন সমাজের বলে এবং তারও বাইরের মানুষকে মানবসমাজের বলে স্বীকার করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। হৃদয়ের বন্ধন, শিষ্টাচারের বন্ধন, এবং আদবকায়দার বন্ধন—এই তিনই মানুষের প্রকৃতিগত।

কাপ্তেন বলে রেখেছেন, আজ সন্ধ্যাবেলায় ঝড় হবে, ব্যারোমিটার নাবছে। কিন্তু শান্ত আকাশে সূর্য অস্ত গেল। বাতাসে যে পরিমাণ বেগ থাকলে তাকে মন্দপবন বলে, অর্থাৎ যুবতীর মন্দ-গমনের সঙ্গে কবিরা তুলনা করতে পারে, এ তার চেয়ে বেশি; কিন্তু ঢেউগুলোকে নিয়ে রুদ্রতালের করতাল বাজাবার মতো আসর জমে নি, যেটুকু খোলের বোল দিচ্ছে তাতে ঝড়ের গৌরচন্দ্রিকা বলেও মনে হয় নি। মনে করলুম, মানুষের কুষ্ঠির মতো বাতাসের কুষ্ঠি গণনার সঙ্গে ঠিক মেলে না, এ যাত্রা ঝড়ের ফাঁড়া কেটে গেল। তাই পাইলটের হাতে আমাদের ডাঙার চিঠিপত্র সমর্পণ করে দিয়ে প্রসন্ন সমুদ্রকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে ডেক-চেয়ার টেনে নিয়ে পশ্চিমমুখো হয়ে বসলুম।

হোলির রাত্রে হিন্দুস্থানি দরোয়ানদের খচমচির মতো বাতাসের লয়টা ক্রমেই দ্রুত হয়ে উঠল। জলের উপর সূর্যাস্তের আলপনা-আঁকা আসনটি আচ্ছন্ন করে নীলাম্বরীর ঘোমটা-পরা সন্ধ্যা এসে বসল। আকাশে তখনো মেঘ নেই, আকাশ-সমুদ্রের ফেনার মতোই ছায়াপথ জ্বল্‌জ্বল্‌ করতে লাগল।

ডেকের উপর বিছানা করে যখন শুলুম তখন বাতাসে এবং জলে বেশ একটা কবির লড়াই চলছে; একদিকে সোঁ সোঁ শব্দে তান লাগিয়েছে, আর-একদিকে ছল্‌ছল্‌ শব্দে জবাব দিচ্ছে, কিন্তু ঝড়ের পালা বলে মনে হল না। আকাশের তারাদের সঙ্গে চোখোচোখি করে কখন এক সময়ে চোখ বুজে এল।

রাত্রে স্বপন দেখলুম, আমি যেন মৃত্যু সম্বন্ধে কোনো একটি বেদমন্ত্র আবৃত্তি করে সেইটে কাকে বুঝিয়ে বলছি। আশ্চর্য তার রচনা, যেন একটা বিপুল আর্তস্বরের মতো, অথচ তার মধ্যে মরণের একটা বিরাট বৈরাগ্য আছে। এই মন্ত্রের মাঝখানে জেগে উঠে দেখি, আকাশ এবং জল তখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সমুদ্র চামুণ্ডার মতো ফেনার জিব মেলে প্রচণ্ড অট্টহাস্যে নৃত্য করছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, মেঘগুলো মরিয়া হয়ে উঠেছে, যেন তাদের কাণ্ডজ্ঞান নেই—বলছে, যা থাকে কপালে। আর, জলে যে বিষম গর্জন উঠছে তাতে মনের ভাবনাও যেন শোনা যায় না, এমনি বোধ হতে লাগল। মাল্লারা ছোটো ছোটো লণ্ঠন হাতে ব্যস্ত হয়ে এদিকে ওদিকে চলাচল করছে, কিন্তু নিঃশব্দে। মাঝে মাঝে এঞ্জিনের প্রতি কর্ণধারের সংকেত-ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

এবার বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু, বাইরে জল-বাতাসের গর্জন আর আমার মনের মধ্যে সেই স্বপ্নলব্ধ মরণমন্ত্র ক্রমাগত বাজতে লাগল। আমার ঘুমের সঙ্গে জাগরণ ঠিক যেন ঐ ঝড় এবং ঢেউয়ের মতোই এলোমেলো মাতামাতি করতে থাকল, ঘুমোচ্ছি কি জেগে আছি বুঝতে পারছি নে।

রাগী মানুষ কথা কইতে না পারলে যেমন ফুলে ফুলে ওঠে, সকালবেলাকার মেঘগুলোকে তেমনি বোধ হল। বাতাস কেবলই শ ষ স, এবং জল কেবলই বাকি অন্তঃস্থ বর্ণ য র ল ব হ নিয়ে চণ্ডীপাঠ বাধিয়ে দিলে, আর মেঘগুলো জটা দুলিয়ে ভ্রূকুটি করে বেড়াতে লাগল। অবশেষে মেঘের বাণী জলধারায় নেবে পড়ল। নারদের বীণাধ্বনিতে বিষ্ণু গঙ্গাধারায় বিগলিত হয়েছিলেন একবার, আমার সেই পৌরাণিক কথা মনে এসেছিল। কিন্তু, এ কোন্ নারদ প্রলয়বীণা বাজাচ্ছে। এর সঙ্গে নন্দীভৃঙ্গীর যে মিল দেখি, আর ওদিকে বিষ্ণুর সঙ্গে রুদ্রের প্রভেদ ঘুচে গেছে।

এ-পর্যন্ত জাহাজের নিত্যক্রিয়া একরকম চলে যাচ্ছে, এমন-কি, আমাদের প্রাতরাশেরও ব্যাঘাত হল না। কাপ্তেনের মুখে কোনো উদ্‌বেগ নেই। তিনি বললেন, এই সময়টাতে এমন একটু-আধটু হয়ে থাকে; আমরা যেমন যৌবনের চাঞ্চল্য দেখে বলে থাকি, ওটা বয়সের ধর্ম।

ক্যাবিনের মধ্যে থাকলে ঝুমঝুমির ভিতরকার কড়াইগুলোর মতো নাড়া খেতে হবে, তার চেয়ে খোলাখুলি ঝড়ের সঙ্গে মোকাবিলা করাই ভালো। আমরা শাল কম্বল মুড়ি দিয়ে জাহাজের ডেকের উপর গিয়েই বসলুম। ঝড়ের ঝাপট পশ্চিম দিক থেকে আসছে, সেইজন্যে পূর্ব দিকের ডেকে বসা দুঃসাধ্য ছিল না।

ঝড় ক্রমেই বেড়ে চলল। মেঘের সঙ্গে ঢেউয়ের সঙ্গে কোনো ভেদ রইল না। সমুদ্রের সে নীল রঙ নেই, চারি দিক ঝাপসা বিবর্ণ। ছেলেবেলায় আরব্য-উপন্যাসে পড়েছিলুম, জেলের জালে যে ঘড়া উঠেছিল তার ঢাকনা খুলতেই তার ভিতর থেকে ধোঁয়ার মতো পাকিয়ে পাকিয়ে প্রকাণ্ড দৈত্য বেরিয়ে পড়ল। আমার মনে হল, সমুদ্রের নীল ঢাকনাটা কে খুলে ফেলেছে, আর ভিতর থেকে ধোঁয়ার মতো লাখো লাখো দৈত্য পরস্পর ঠেলাঠেলি করতে করতে আকাশে উঠে পড়েছে।

জাপানি মাল্লারা ছুটোছুটি করছে কিন্তু তাদের মুখে হাসি লেগেই আছে। তাদের ভাব দেখে মনে হয়, সমুদ্র যেন অট্টহাস্যে জাহাজটাকে ঠাট্টা করছে মাত্র; পশ্চিম দিকের ডেকের দরজা প্রভৃতি সমস্ত বন্ধ তবু সে-সব বাধা ভেদ করে এক-একবার জলের ঢেউ হুড়মুড় করে এসে পড়ছে, আর তাই দেখে ওরা হো হো করে উঠছে। কাপ্তেন আমাদের বার বার বললেন, ছোটো ঝড়, সামান্য ঝড়। একসময় আমাদের স্টুয়ার্ড এসে টেবিলের উপর আঙুল দিয়ে এঁকে ঝড়ের খাতিরে জাহাজের কী রকম পথ বদল হয়েছে, সেইটে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলে। ইতিমধ্যে বৃষ্টির ঝাপটা লেগে শাল কম্বল সমস্ত ভিজে শীতে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছে; আর কোথাও সুবিধা না দেখে কাপ্তেনের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। কাপ্তেনের যে কোনো উৎকণ্ঠা আছে, বাইরে থেকে তার কোনো লক্ষণ দেখতে পেলুম না।

ঘরে আর বসে থাকতে পারলুম না। ভিজে শাল মুড়ি দিয়ে আবার বাইরে এসে বসলুম। এত তুফানেও যে আমাদের ডেকের উপর আছড়ে আছড়ে ফেলছে না তার কারণ, জাহাজ আকণ্ঠ বোঝাই। ভিতরে যার পদার্থ নেই তার মতো দোলায়িত অবস্থা আমাদের জাহাজের নয়। মৃত্যুর কথা অনেকবার মনে হল। চারি দিকেই তো মৃত্যু, দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত মৃত্যু; আমার প্রাণ এর মধ্যে এতটুকু। এই অতি ছোটোটার উপরেই কি সমস্ত আস্থা রাখব, আর এই এত বড়োটাকে কিছু বিশ্বাস করব না? বড়োর উপরে ভরসা রাখাই ভালো।

ডেকে বসে থাকা আর চলছে না। নীচে নাবতে গিয়ে দেখি সিঁড়ি পর্যন্ত জুড়ে সমস্ত রাস্তা ঠেসে ভর্তি করে ডেক-প্যাসেঞ্জার বসে। বহু কষ্টে তাদের ভিতর দিয়ে পথ করে ক্যাবিনের মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। এইবার সমস্ত শরীর মন ঘুলিয়ে উঠল। মনে হল, দেহের সঙ্গে প্রাণের আর বনতি হচ্ছে না; দুধ মথন করলে মাখনটা যেরকম ছিন্ন হয়ে আসে প্রাণটা যেন তেমনি হয়ে

এসেছে। জাহাজের উপরকার দোলা সহ্য করা যায়, জাহাজের ভিতরকার দোলা সহ্য করা শক্ত। কাঁকরের উপর দিয়ে চলা আর জুতোর ভিতরে কাঁকর নিয়ে চলার যে তফাত, এ যেন তেমনি। একটাতে মার আছে বন্ধন নেই, আর-একটাতে বেঁধে মার।

ক্যাবিনে শুয়ে শুয়ে শুনতে পেলুম, ডেকের উপর কী যেন হুড়মুড় করে ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ক্যাবিনের মধ্যে হাওয়া আসবার জন্যে যে ফানেলগুলো ডেকের উপর হাঁ করে নিশ্বাস নেয়, ঢাকা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ঢেউয়ের প্রবল চোটে তার ভিতর দিয়েও ঝলকে ঝলকে ক্যাবিনের মধ্যে জল এসে পড়ছে। বাইরে উনপঞ্চাশ বায়ুর নৃত্য, অথচ ক্যাবিনের মধ্যে গুমট। একটা ইলেকট্রিক পাখা চলছে তাতে তাপটা যেন গায়ের উপর ঘুরে ঘুরে লেজের ঝাপটা দিতে লাগল।

হঠাৎ মনে হয়, এ একেবারে অসহ্য। কিন্তু, মানুষের মধ্যে শরীর-মন-প্রাণের চেয়েও বড়ো একটা সত্তা আছে। ঝড়ের আকাশের উপরেও যেমন শান্ত আকাশ, তুফানের সমুদ্রের নীচে যেমন শান্ত সমুদ্র, সেই আকাশ সেই সমুদ্রই যেমন বড়ো, মানুষের অন্তরের গভীরে এবং সমুচ্চে সেই-রকম একটি বিরাট শান্ত পুরুষ আছে— বিপদ এবং দুঃখের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখলে তাকে পাওয়া যায়— দুঃখ তার পায়ের তলায়, মৃত্যু তাকে স্পর্শ করে না।

সন্ধ্যার সময় ঝড় থেমে গেল। উপরে গিয়ে দেখি, জাহাজটা সমুদ্রের কাছে এতক্ষণ ধরে যে চড়চাপড় খেয়েছে তার অনেক চিহ্ন আছে। কাপ্তেনের ঘরের একটা প্রাচীর ভেঙে গিয়ে তাঁর আসবাব-পত্র সমস্ত ভিজে গেছে। একটা বাঁধা লাইফ-বোট জখম হয়েছে। ডেকে প্যাসেঞ্জারদের একটা ঘর এবং ভাণ্ডারের একটা অংশ ভেঙে পড়েছে। জাপানি মাল্লারা এমন-সকল কাজে প্রবৃত্ত ছিল যাতে প্রাণসংশয় ছিল। জাহাজ যে বরাবর আসন্ন সংকটের সঙ্গে লড়াই করেছে তার একটা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল— জাহাজের ডেকের উপর কর্কের তৈরি সাঁতার দেবার জামাগুলো সাজানো। এক-সময়ে এগুলো বের করবার কথা কাপ্তেনের মনে এসেছিল। কিন্তু, ঝড়ের পালার মধ্যে সব চেয়ে স্পষ্ট করে আমার মনে পড়ছে জাপানি মাল্লাদের হাসি।

শনিবার দিনে আকাশ প্রসন্ন কিন্তু সমুদ্রের আক্ষেপ এখনো ঘোচে নি। আশ্চর্য এই, ঝড়ের সময় জাহাজ এমন দোলে নি ঝড়ের পর যেমন তার দোলা। কালকেকার উৎপাতকে কিছুতেই যেন সে ক্ষমা করতে পারছে না, ক্রমাগতই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে। শরীরের অবস্থাটাও অনেকটা সেইরকম; ঝড়ের সময় সে একরকম শক্ত ছিল কিন্তু পরের দিন ভুলতে পারছে না, তার উপর দিয়ে ঝড় গিয়েছে।

আজ রবিবার। জলের রঙ ফিকে হয়ে উঠেছে। এতদিন পরে আকাশে একটি পাখি দেখতে পেলুম— এই পাখিগুলিই পৃথিবীর বাণী আকাশে বহন করে নিয়ে যায়; আকাশ দেয় তার আলো, পৃথিবী দেয় তার গান। সমুদ্রের যা-কিছু গান সে কেবল তার নিজের ঢেউয়ের— তার কোলে জীব আছে যথেষ্ট, পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু তাদের কারও কণ্ঠে সুর নেই; সেই অসংখ্য বোবা জীবের হয়ে সমুদ্র নিজেই কথা কচ্ছে। ডাঙার জীবেরা প্রধানত শব্দের দ্বারাই মনের ভাব প্রকাশ করে, জলচরদের ভাষা হচ্ছে গতি। সমুদ্র হচ্ছে নৃত্যলোক, আর পৃথিবী হচ্ছে শব্দলোক।

আজ বিকেলে চারটে-পাঁচটার সময় রেঙ্গুনে পৌঁছবার কথা। মঙ্গলবার থেকে শনিবার পর্যন্ত পৃথিবীতে নানা খবর চলাচল করছিল, আমাদের জন্যে সেগুলো সমস্ত জমে রয়েছে; বাণিজ্যের ধনের মতো নয় প্রতিদিন যার হিসাব চলছে, কোম্পানির কাগজের মতো অগোচরে যার সুদ জমছে।

২৪ বৈশাখ ১৩২৩

৪

২৪শে বৈশাখ অপরাহ্ণে রেঙ্গুনে পৌঁছনো গেল।

চোখের পিছনে চেয়ে দেখার একটা পাকযন্ত্র আছে, সেইখানে দেখাগুলো বেশ করে হজম হয়ে না গেলে সেটাকে নিজের করে দেখানো যায় না। তা নাই বা দেখানো গেল, এমন কথা কেউ বলতে পারেন। যেখানে যাওয়া গেছে সেখানকার মোটামুটি বিবরণ দিতে দোষ কী।

দোষ না থাকতে পারে, কিন্তু আমার অভ্যাস অন্যরকম। আমি টুকে যেতে টেঁকে যেতে পারি নে। কখনো কখনো নোট নিতে ও রিপোর্ট দিতে অনুরুদ্ধ হয়েছি, কিন্তু সে-সমস্ত টুকরো কথা আমার মনের মুঠোর ফাঁক দিয়ে গলে ছড়িয়ে পড়ে যায়। প্রত্যক্ষটা একবার আমার মনের নেপথ্যে অপ্রত্যক্ষ হয়ে গিয়ে তার পরে যখন প্রকাশের মঞ্চে এসে দাঁড়ায় তখনই তার সঙ্গে আমার ব্যবহার।

ছুটতে ছুটতে তাড়াতাড়ি দেখে দেখে বেড়ানো আমার পক্ষে ক্লান্তিকর এবং নিষ্ফল। অতএব আমার কাছ থেকে বেশ ভদ্ররকম ভ্রমণবৃত্তান্ত তোমরা পাবে না। আদালতে সত্যপাঠ করে আমি সাক্ষী দিতে পারি যে রেঙ্গুন-নামক এক শহরে আমি এসেছিলুম; কিন্তু যে আদালতে আরও বড়ো রকমের সত্যপাঠ করতে হয় সেখানে আমাকে বলতেই হবে, রেঙ্গুনে এসে পৌঁছই নি।

এমন হতেও পারে, রেঙ্গুন শহরটা খুব একটা সত্য বস্তু নয়। রাস্তাগুলি সোজা, চওড়া, পরিষ্কার; বাড়িগুলি তক্‌তক্‌ করছে; রাস্তায় ঘাটে মাদ্রাজি, পাঞ্জাবি, গুজরাটি ঘুরে বেড়াচ্ছে; তার মধ্যে হঠাৎ কোথাও যখন রঙিন রেশমের কাপড়-পরা ব্রহ্মদেশের পুরুষ বা মেয়ে দেখতে পাই তখন মনে হয়, এরাই বুঝি বিদেশী। আসল কথা, গঙ্গার পুলটা যেমন গঙ্গার নয় বরঞ্চ সেটা গঙ্গার গলার ফাঁসি, রেঙ্গুন শহরটা তেমনি ব্রহ্মদেশের শহর নয়, ওটা যেন সমস্ত দেশের প্রতিবাদের মতো।

প্রথমত, ইরাবতী নদী দিয়ে শহরের কাছাকাছি যখন আসছি, তখন ব্রহ্মদেশের প্রথম পরিচয়টা কী? দেখি, তীরে বড়ো বড়ো সব কেরোসিন তেলের কারখানা লম্বা লম্বা চিমনি আকাশে তুলে দিয়ে ঠিক যেন চিত হয়ে পড়ে বর্মা চুরুট খাচ্ছে। তার পরে যত এগোতে থাকি, দেশ-বিদেশের জাহাজের ভিড়। তার পর যখন ঘাটে এসে পৌঁছই তখন তট বলে পদার্থ দেখা যায় না—সারি সারি জেটিগুলো যেন বিকটাকার লোহার জোঁকের মতো ব্রহ্মদেশের গায়ে একেবারে ছেঁকে ধরেছে। তার পরে আপিস-আদালত দোকান-বাজারের মধ্যে দিয়ে আমার বাঙালি বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে উঠলুম; কোনো ফাঁক দিয়ে ব্রহ্মদেশের কোনো চেহারাই দেখতে পেলুম না। মনে হল, রেঙ্গুন ব্রহ্মদেশের ম্যাপে আছে কিন্তু দেশে নেই। অর্থাৎ, এ শহর দেশের মাটি থেকে গাছের মতো ওঠে নি, এ শহর কালের স্রোতে ফেনার মতো ভেসেছে, সুতরাং এর পক্ষে এ জায়গাও যেমন অন্য জায়গাও তেমনি।

আসল কথা, পৃথিবীতে যে-সব শহর সত্য তা মানুষের মমতার দ্বারা তৈরি হয়ে উঠেছে! দিল্লি বল, আগ্রা বল, কাশী বল, মানুষের আনন্দ তাকে সৃষ্টি করে তুলেছে। কিন্তু বাণিজ্যলক্ষ্মী নির্মম, তার পায়ের নীচে মানুষের মানস-সরোবরের সৌন্দর্যশতদল ফোটে না। মানুষের দিকে সে তাকায় না, সে কেবল দ্রব্যকে চায়; যন্ত্র তার বাহন। গঙ্গা দিয়ে যখন আমাদের জাহাজ আসছিল তখন বাণিজ্যশ্রীর নির্লজ্জ নির্দয়তা নদীর দুই ধারে দেখতে দেখতে এসেছি। ওর মনে প্রীতি নেই বলেই বাংলাদেশের এমন সুন্দর গঙ্গার ধারকে এত অনায়াসে নষ্ট করতে পেরেছে।

আমি মনে করি, আমার পরম সৌভাগ্য এই যে, কদর্যতার লৌহবন্যা যখন কলকাতার কাছাকাছি দুই তীরকে, মেটেবুরুজ থেকে হুগলি পর্যন্ত, গ্রাস করবার জন্যে ছুটে আসছিল আমি তার আগেই জন্মেছি। তখনো গঙ্গার ঘাটগুলি গ্রামের স্নিগ্ধ বাহুর মতো গঙ্গাকে বুকের কাছে আপন করে ধরে রেখেছিল, কুঠির নৌকাগুলি তখনো সন্ধ্যাবেলায় তীরে তীরে ঘাটে ঘাটে ঘরের লোক-

গুলিকে ঘরে ঘরে ফিরিয়ে আনত। একদিকে দেশের হৃদয়ের ধারা, আর-একদিকে দেশের এই নদীর ধারা, এর মাঝখানে কোনো কঠিন কুৎসিত বিচ্ছেদ দাঁড়ায় নি।

তখনো কলকাতার আশেপাশে বাংলাদেশের যথার্থ রূপটিকে দুই চোখ ভরে দেখবার কোনো বাধা ছিল না। সেইজন্যেই কলকাতা আধুনিক শহর হলেও কোকিলশিশুর মতো তার পালনকর্ত্রীর নীড়কে একবারে রিক্ত করে অধিকার করে নি। কিন্তু তার পরে বাণিজ্যসভ্যতা যতই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল ততই দেশের রূপ আচ্ছন্ন হতে চলল। এখন কলকাতা বাংলাদেশকে আপনার চারি দিক থেকে নির্বাসিত করে দিচ্ছে। দেশ ও কালের লড়াইয়ে দেশের শ্যামল শোভা পরাভূত হল, কালের করাল মূর্তিই লোহার দাঁত নখ মেলে কালো নিশ্বাস ছাড়তে লাগল।

এক সময়ে মানুষ বলেছিল, 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ'। তখন মানুষ লক্ষ্মীর যে-পরিচয় পেয়েছিল সে তো কেবল ঐশ্বর্যে নয়, তাঁর সৌন্দর্যে। তার কারণ, বাণিজ্যের সঙ্গে তখন মনুষ্যত্বের বিচ্ছেদ ঘটে নি। তাঁতের সঙ্গে তাঁতির, কামারের হাতুড়ির সঙ্গে কামারের হাতের, কারিগরের সঙ্গে তার কারুকার্যের মনের মিল ছিল। এইজন্য বাণিজ্যের ভিতর দিয়ে মানুষের হৃদয় আপনাকে ঐশ্বর্যে বিচিত্র করে সুন্দর করে ব্যক্ত করত। নইলে লক্ষ্মী তার পদ্মাসন পেতেন কোথা থেকে। যখন থেকে কল হল বাণিজ্যের বাহন তখন থেকে বাণিজ্য হল শ্রীহীন। প্রাচীন ভেনিসের সঙ্গে আধুনিক ম্যাঞ্চেস্টরের তুলনা করলেই তফাতটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে। ভেনিসে সৌন্দর্যে এবং ঐশ্বর্যে মানুষ আপনারই পরিচয় দিয়েছে, ম্যাঞ্চেস্টরে মানুষ সব দিকে আপনাকে খর্ব করে আপনার কলের পরিচয় দিয়েছে। এইজন্য কল-বাহন বাণিজ্য যেখানেই গেছে সেইখানেই আপনার কালিমায় কদর্যতায় নির্মমতায় একটা লোলুপতার মহামারী সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তীর্ণ করে দিচ্ছে। তাই নিয়ে কাটাকাটি-হানাহানির আর অন্ত নেই; তাই নিয়ে অসত্যে লোকালয় কলঙ্কিত এবং রক্তপাতে ধরাতল পঙ্কিল হয়ে উঠল। অন্নপূর্ণা আজ হয়েছেন কালী; তাঁর অন্নপরিবেশনের হাতা আজ হয়েছে রক্তপান করবার খর্পর। তাঁর স্মিতহাস্য আজ অট্টহাস্যে ভীষণ হল। যাই হোক, আমার বলবার কথা এই যে, বাণিজ্য মানুষকে প্রকাশ করে না, মানুষকে প্রচ্ছন্ন করে।

তাই বলছি, রেঙ্গুন তো দেখলুম কিন্তু সে কেবল চোখের দেখা, সে দেখার মধ্যে কোনো পরিচয় নেই; সেখান থেকে আমার বাঙালি বন্ধুদের আতিথ্যের স্মৃতি নিয়ে এসেছি, কিন্তু ব্রহ্মদেশের হাত থেকে কোনো দক্ষিণা আনতে পারি নি। কথাটা হয়তো একটু অত্যুক্তি হয়ে পড়ল। আধুনিকতার এই প্রাচীরের মধ্যে দেশের একটা গবাক্ষ হঠাৎ একটু খোলা পেয়েছিলুম। সোমবার দিনে সকালে আমার বন্ধুরা এখানকার বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দিরে নিয়ে গেলেন।

এতক্ষণে একটা-কিছু দেখতে পেলুম। এতক্ষণ যার মধ্যে ছিলুম সে একটা অ্যাব্‌স্‌ট্রাক্‌শন, সে একটা অবচ্ছিন্ন পদার্থ। সে একটা শহর, কিন্তু কোনো-একটা শহরই নয়। এখন যা দেখছি তার নিজেরই একটা বিশেষ চেহারা আছে। তাই সমস্ত মন খুশি হয়ে সজাগ হয়ে উঠল। আধুনিক বাঙালির ঘরে মাঝে মাঝে খুব ফ্যাশানওয়ালা মেয়ে দেখতে পাই; তারা খুব গট্‌গট্‌ করে চলে, খুব চট্‌পট্‌ করে ইংরেজি কয়; দেখে মস্ত একটা অভাব মনে বাজে; মনে হয় ফ্যাশানটাকেই বড়ো করে দেখছি, বাঙালির মেয়েটিকে নয়; এমন সময় হঠাৎ ফ্যাশানজালমুক্ত সরল সুন্দর স্নিগ্ধ বাঙালি-ঘরের কল্যাণীকে দেখলে তখনই বুঝতে পারি, এ তো মরীচিকা নয়, স্বচ্ছ গভীর সরোবরের মতো এর মধ্যে একটি তৃষাহরণ পূর্ণতা আপন পদ্মবনের পাপড়ি নিয়ে টল্‌মল্‌ করছে। মন্দিরের মধ্যে ঢুকতেই আমার মনে তেমনি একটি আনন্দের চমক লাগল; মনে হল, যাই হোক-না কেন, এটা ফাঁকা নয়, যেটুকু চোখে পড়ছে এ তার চেয়ে আরও অনেক বেশি। সমস্ত রেঙ্গুন শহরটা এর কাছে ছোটো হয়ে গেল; বহুকালের বৃহৎ ব্রহ্মদেশ এই মন্দিরটুকুর মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করলে।

প্রথমেই বাইরের প্রখর আলোর থেকে একটি পুরাতন কালের পরিণত ছায়ার মধ্যে এসে প্রবেশ করলুম। থাকে থাকে প্রশস্ত সিঁড়ি উঠে চলেছে; তার উপরে আচ্ছাদন। এই সিঁড়ির দুই ধারে ফল

ফুল বাতি, পুজোর অর্ঘ্য বিক্রি চলছে। যারা বেচছে তারা অধিকাংশই ব্রহ্মীয় মেয়ে। ফুলের রঙের সঙ্গে তাদের রেশমের কাপড়ের রঙের মিল হয়ে মন্দিরের ছায়াটি সূর্যাস্তের আকাশের মতো বিচিত্র হয়ে উঠেছে। কেনাবেচার কোনো নিষেধ নেই, মুসলমান দোকানদারেরা বিলাতি মনিহারির দোকান খুলে বসে গেছে। মাছমাংসেরও বিচার নেই, চারি দিকে খাওয়াদাওয়া ঘরকন্না চলছে। সংসারের সঙ্গে ভেদমাত্র নেই, একেবারে মাখামাখি। কেবল, হাটবাজারে যেরকম গোলমাল, এখানে তা দেখা গেল না। চারি দিক নিরালা নয়, অথচ নিভৃত; স্তব্ধ নয়, শান্ত। আমাদের সঙ্গে ব্রহ্মদেশীয় একজন ব্যারিস্টার ছিলেন, এই মন্দিরসোপানে মাছমাংস কেনাবেচা এবং খাওয়া চলছে, এর কারণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, 'বুদ্ধ আমাদের উপদেশ দিয়েছেন, তিনি বলে দিয়েছেন— কিসে মানুষের কল্যাণ, কিসে তার বন্ধন, তিনি তো জোর করে কারও ভালো করতে চান নি; বাহিরের শাসনে কল্যাণ নেই, অন্তরের ইচ্ছাতেই মুক্তি; এইজন্যে আমাদের সমাজে বা মন্দিরে আচার সম্বন্ধে জবরদস্তি নেই।'

সিঁড়ি বেয়ে উপরে যেখানে গেলুম সেখানে খোলা জায়গা, তারই নানা স্থানে নানা রকমের মন্দির। সে মন্দিরে গাম্ভীর্য নেই, কারুকার্যের ঠেসাঠেসি ভিড়, সমস্ত যেন ছেলেমানুষের খেলনার মতো। এমন অদ্ভুত পাঁচমিশালি ব্যাপার আর কোথাও দেখা যায় না—এ যেন ছেলে-ভুলানো ছড়ার মতো; তার ছন্দটা একটানা বটে, কিন্তু তার মধ্যে যা-খুশি-তাই এসে পড়েছে, ভাবের পরস্পর-সামঞ্জস্যের কোনো দরকার নেই। বহুকালের পুরাতন শিল্পের সঙ্গে এখনকার কালের নিতান্ত সস্তাদরের তুচ্ছতা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। ভাবের অসংগতি বলে যে কোনো পদার্থ আছে, এরা তা যেন একবারে জানেই না। আমাদের কলকাতায় বড়োমানুষের ছেলের বিবাহযাত্রায় রাস্তা দিয়ে যেমন সকল রকমের অদ্ভুত অসামঞ্জস্যের বন্যা বয়ে যায়, কেবলমাত্র পুঞ্জীকরণটাই তার লক্ষ্য, সজ্জীকরণ নয়, এও সেইরকম। এক ঘরে অনেকগুলো ছেলে থাকলে যেমন গোলমাল করে, সেই গোলমাল করাতেই তাদের আনন্দ—এই মন্দিরের সাজসজ্জা, প্রতিমা, নৈবেদ্য, সমস্ত যেন সেইরকম ছেলেমানুষের উৎসব; তার মধ্যে অর্থ নেই, শব্দ আছে। মন্দিরের ঐ সোনা-বাঁধানো পিতল-বাঁধানো চূড়াগুলি ব্রহ্মদেশের ছেলেমেয়েদের আনন্দের উচ্চহাস্যমিশ্রিত হো হো শব্দ— আকাশে ঢেউ খেলিয়ে উঠছে। এদের যেন বিচার করবার, গম্ভীর হবার বয়স হয় নি। এখানকার এই রঙিন মেয়েরাই সব চেয়ে চোখে পড়ে। এদেশের শাখাপ্রশাখা ভরে এরা যেন ফুল ফুটে রয়েছে। ভুঁইচাঁপার মতো এরাই দেশের সমস্ত— আর কিছু চোখে পড়ে না।

লোকের কাছে শুনতে পাই এখানকার পুরুষেরা অলস ও আরামপ্রিয়, অন্য দেশের পুরুষের কাজ প্রায় সমস্তই এখানে মেয়েরা করে থাকে। হঠাৎ মনে আসে, এটা বুঝি মেয়েদের উপরে জুলুম করা হয়েছে। কিন্তু, ফলে তো তার উল্টোই দেখতে পাচ্ছি—এই কাজকর্মের হিল্লোলে মেয়েরা আরও যেন বেশি করে বিকশিত হয়ে উঠেছে। কেবল বাইরে বেরতে পারাই যে মুক্তি তা নয়, অবাধে কাজ করতে পাওয়া মানুষের পক্ষে তার চেয়ে বড়ো মুক্তি। পরাধীনতাই সব চেয়ে বড়ো বন্ধন নয়, কাজের সংকীর্ণতাই হচ্ছে সব চেয়ে কঠোর খাঁচা।

এখানকার মেয়েরা সেই খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে এমন পূর্ণতা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তারা নিজের অস্তিত্ব নিয়ে নিজের কাজে সংকুচিত হয়ে নেই; রমণীর লাবণ্যে যেমন তারা প্রেয়সী, শক্তির মুক্তিগৌরবে তেমনি তারা মহীয়সী। কর্মতৎপরতাই যে মেয়েদের যথার্থ শ্রী দেয়, সাঁওতাল মেয়েদের দেখে তা আমি প্রথম বুঝতে পেরেছিলুম। তারা কঠিন পরিশ্রম করে, কিন্তু কারিগর যেমন কঠিন আঘাতে মূর্তিটিকে সুব্যক্ত করে তোলে তেমনি এই পরিশ্রমের আঘাতেই এই সাঁওতাল মেয়েদের দেহ এমন নিটোল, এমন সুব্যক্ত হয়ে ওঠে; তাদের সকল প্রকার গতিভঙ্গিতে এমন একটা মুক্তির মহিমা প্রকাশ পায়। কবি কীটস্‌ বলেছেন, সত্যই সুন্দর। অর্থাৎ, সত্যের বাধামুক্ত সুসম্পূর্ণতাতেই সৌন্দর্য। সত্য মুক্তি লাভ করলে আপনিই সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়। প্রকাশের পূর্ণতাই সৌন্দর্য, এই কথাটাই আমি উপনিষদের এই বাণীতে অনুভব করি—আনন্দরূপমমৃতং

যদ্‌বিভাতি; অনন্তস্বরূপ যেখানে প্রকাশ পাচ্ছেন, সেইখানেই তাঁর অমৃতরূপ, আনন্দরূপ। মানুষ ভয়ে লোভে ঈর্ষ্যায় মূঢ়তায় প্রয়োজনের সংকীর্ণতায় এই প্রকাশকে আচ্ছন্ন করে, বিকৃত করে; এবং সেই বিকৃতিকেই অনেকসময় বড়ো নাম দিয়ে বিশেষ ভাবে আদর করে থাকে।

তোসামারু জাহাজ
২৭ বৈশাখ ১৩২৩

৫

২৯ বৈশাখ। বিকেলের দিকে যখন পিনাঙের বন্দরে ঢুকছি, আমাদের সঙ্গে যে-বালকটি এসেছে, তার নাম মুকুল, সে বলে উঠল, 'ইস্কুলে একদিন পিনাঙ সিঙাপুর মুখস্থ করে মরেছি, এ সেই পিনাঙ।' তখন আমার মনে হল, ইস্কুলের ম্যাপে পিনাঙ দেখা যেমন সহজ ছিল, এ তার চেয়ে বেশি শক্ত নয়। তখন মাস্টার ম্যাপে আঙুল বুলিয়ে দেশ দেখাতেন, এ হচ্ছে জাহাজ বুলিয়ে দেখানো।

এরকম ভ্রমণের মধ্যে 'বস্তুতন্ত্রতা' খুব সামান্য। বসে বসে স্বপ্ন দেখবার মতো। না করছি চেষ্টা, না করছি চিন্তা, চোখের সামনে আপনা-আপনি সব জেগে উঠছে। এই-সব দেশ বের করতে, এর পথ ঠিক করে রাখতে, এর রাস্তাঘাট পাকা করে তুলতে, অনেক মানুষকে অনেক ভ্রমণ এবং অনেক দুঃসাহস করতে হয়েছে; আমরা সেই-সমস্ত ভ্রমণ ও দুঃসাহসের বোতলে-ভরা মোরব্বা উপভোগ করছি যেন। এতে কোনো কাঁটা নেই, খোসা নেই, আঁটি নেই; কেবল শাঁসটুকু আছে, আর তার সঙ্গে যতটা সম্ভব চিনি মেশানো। অকূল সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠছে, দিগন্তের উপর দিগন্তের পর্দা উঠে উঠে যাচ্ছে, দুর্গমতার একটা প্রকাণ্ড মূর্তি চোখে দেখতে পাচ্ছি; অথচ আলিপুরে খাঁচার সিংহটার মতো তাকে দেখে আমোদ বোধ করছি; ভীষণও মনোহর হয়ে দেখা দিচ্ছে।

আরব্য উপন্যাসে আলাদিনের প্রদীপের কথা যখন পড়েছিলুম তখন সেটাকে ভারি লোভনীয় মনে হয়েছিল। এ তো সেই প্রদীপেরই মায়া। জলের উপরে স্থলের উপরে সেই প্রদীপটা ঘষছে, আর অদৃশ্য দৃশ্য হচ্ছে, দূর নিকটে এসে পড়ছে। আমরা এক জায়গায় বসে আছি, আর জায়গা-গুলোই আমাদের সামনে এসে পড়ছে।

কিন্তু মানুষ ফলটাকেই যে মুখ্যভাবে চায় তা নয়, ফলিয়ে তোলানোটাই তার সব চেয়ে বড়ো জিনিস। সেইজন্যে, এই যে ভ্রমণ করছি এর মধ্যে মন একটা অভাব অনুভব করছে, সেটি হচ্ছে এই যে আমরা ভ্রমণ করছি নে। সমুদ্রপথে আসতে আসতে মাঝে মাঝে দূরে দূরে এক-একটা পাহাড় দেখা দিচ্ছিল, আগাগোড়া গাছে ঢাকা; ঠিক যেন কোন্‌ দানবলোকের প্রকাণ্ড জন্তু তার কোঁকড়া সবুজ রোঁয়া নিয়ে সমুদ্রের ধারে ঝিমোতে ঝিমোতে রোদ পোয়াচ্ছে; মুকুল তাই দেখে বললে, ঐখানে নেবে যেতে ইচ্ছা করে। ঐ ইচ্ছাটা হচ্ছে সত্যকার ভ্রমণ করবার ইচ্ছা। অন্য কর্তৃক দেখিয়ে দেওয়ার বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে নিজে দেখার ইচ্ছা। ঐ পাহাড়ওয়ালা ছোটো ছোটো দ্বীপ-গুলোর নাম জানি নে, ইস্কুলের ম্যাপে ওগুলোকে মুখস্থ করতে হয় নি; দূর থেকে দেখে মনে হয়, ওরা একেবারে তাজা রয়েছে, সারকুলেটিং লাইব্রেরির বইগুলোর মতো মানুষের হাতে হাতে ফিরে নানা চিহ্নে চিহ্নিত হয়ে যায় নি; সেইজন্যে মনকে টানে। অন্যের 'পরে মানুষের বড়ো ঈর্ষ্যা। যাকে আর কেউ পায় নি মানুষ তাকে পেতে চায়। তাতে যে পাওয়ার পরিমাণ বাড়ে তা নয়, কিন্তু পাওয়ার অভিমান বাড়ে।

সূর্য যখন অস্ত যাচ্ছে তখন পিনাঙের বন্দরে জাহাজ এসে পৌঁছল। মনে হল, বড়ো সুন্দর এই পৃথিবী। জলের সঙ্গে স্থলের যেন প্রেমের মিলন দেখলুম। ধরণী তার দুই বাহু মেলে সমুদ্রকে আলিঙ্গন করছে। মেঘের ভিতর দিয়ে নীলাভ পাহাড়গুলির উপরে যে একটি সুকোমল

আলো পড়ছে সে যেন অতি সূক্ষ্ম সোনালি রঙের ওড়নার মতো; তাতে বধূর মুখ ঢেকেছে না প্রকাশ করছে, তা বলা যায় না। জলে স্থলে আকাশে মিলে এখানে সন্ধ্যাবেলাকার স্বর্ণতোরণের থেকে স্বর্গীয় নহবত বাজতে লাগল।

পালতোলা সমুদ্রের নৌকাগুলির মতো মানুষের সুন্দর সৃষ্টি অতি অল্পই আছে। যেখানে প্রকৃতির ছন্দে লয়ে মানুষকে চলতে হয়েছে সেখানে মানুষের সৃষ্টি সুন্দর না হয়ে থাকতে পারে না। নৌকাকে জলবাতাসের সঙ্গে সন্ধি করতে হয়েছে, এইজন্যেই জলবাতাসের শ্রীটুকু সে পেয়েছে। কল যেখানে নিজের জোরে প্রকৃতিকে উপেক্ষা করতে পারে সেইখানেই সেই ঔদ্ধত্যে মানুষের রচনা কুশ্রী হয়ে উঠতে লজ্জামাত্র করে না। কলের জাহাজে পালের জাহাজের চেয়ে সুবিধা আছে, কিন্তু সৌন্দর্য নেই। জাহাজ যখন আস্তে আস্তে বন্দরের গা ঘেঁষে এল, যখন প্রকৃতির চেয়ে মানুষের দুশ্চেষ্টা বড়ো হয়ে দেখা দিল, কলের চিমনিগুলো প্রকৃতির বাঁকা ভঙ্গিমার উপর তার সোজা আঁচড় কাটতে লাগল, তখন দেখতে পেলুম মানুষের রিপু জগতে কী কুশ্রীতাই সৃষ্টি করছে। সমুদ্রের তীরে তীরে, বন্দরে বন্দরে, মানুষের লোভ কদর্য ভঙ্গিতে স্বর্গকে ব্যঙ্গ করছে— এমনি করেই নিজেকে স্বর্গ থেকে নির্বাসিত করে দিচ্ছে।

তোসামারু। পিনাঙ বন্দর

৬

২রা জ্যৈষ্ঠ। উপরে আকাশ, নীচে সমুদ্র। দিনে রাত্রে আমাদের দুই চক্ষুর বরাদ্দ এর বেশি নয়। আমাদের চোখদুটো মা-পৃথিবীর আদর পেয়ে পেটুক হয়ে গেছে। তার পাতে নানা রকমের জোগান দেওয়া চাই। তার অধিকাংশই সে স্পর্শও করে না, ফেলা যায়। কত যে নষ্ট হচ্ছে বলা যায় না, দেখবার জিনিস অতিরিক্ত পরিমাণে পাই বলেই দেখবার জিনিস সম্পূর্ণ করে দেখি নে। এইজন্যে মাঝে মাঝে আমাদের পেটুক চোখের পক্ষে এইরকমের উপবাস ভালো।

আমাদের সামনে মস্ত দুটো ভোজের থালা, আকাশ আর সাগর। অভ্যাসদোষে প্রথমটা মনে হয়, এ দুটো বুঝি একেবারে শূন্য থালা। তার পর দুই-এক দিন লঙ্ঘনের পর ক্ষুধা একটু বাড়লেই তখন দেখতে পাই, যা আছে তা নেহাত কম নয়। মেঘ ক্রমাগত নতুন নতুন রঙে সরস হয়ে আসছে, আলো ক্ষণে ক্ষণে নতুন নতুন স্বাদে আকাশকে এবং জলকে পূর্ণ করে তুলছে।

আমরা দিনরাত পৃথিবীর কোলে কাঁখে থাকি বলেই আকাশের দিকে তাকাই নে, আকাশের দিগ্‌বসনকে বলি উলঙ্গতা। যখন দীর্ঘকাল ঐ আকাশের সঙ্গে মুখোমুখি করে থাকতে হয়, তখন তার পরিচয়ের বিচিত্রতায় অবাক হয়ে থাকি। ওখানে মেঘে মেঘে রূপের এবং রঙের অহেতুক বিকাশ। এ যেন গানের আলাপের মতো, রূপ-রঙের রাগরাগিণীর আলাপ চলছে— তাল নেই, আকার-আয়তনের বাঁধাবাঁধি নেই, কোনো অর্থবিশিষ্ট বাণী নেই, কেবলমাত্র মুক্ত সুরের লীলা। সেইসঙ্গে সমুদ্রের অপ্সরনৃত্য ও মুক্ত ছন্দের নাচ। তার মৃদঙ্গে যে বোল বাজছে তার ছন্দ এমন বিপুল যে, তার লয় খুঁজে পাওয়া যায় না। তাতে নৃত্যের উল্লাস আছে, অথচ নৃত্যের নিয়ম নেই।

এই বিরাট রঙ্গশালায় আকাশ এবং সমুদ্রের যে-রঙ্গ সেইটি দেখবার শক্তি ক্রমে আমাদের বেড়ে ওঠে। জগতে যা-কিছু মহান, তার চারি দিকে একটা বিরলতা আছে, তার পটভূমিকা (background) সাদাসিধে। সে আপনাকে দেখাবার জন্যে আর কিছুর সাহায্য নিতে চায় না। নিশীথের নক্ষত্রসভা অসীম অন্ধকারের অবকাশের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে। এই সমুদ্র-আকাশের যে বৃহৎ প্রকাশ সেও বহু-উপকরণের দ্বারা আপন মর্যাদা নষ্ট করে না। এরা হল জগতের বড়ো ওস্তাদ, ছলাকলায় আমাদের মন ভোলাতে এরা অবজ্ঞা করে। মনকে শ্রদ্ধাপূর্বক আপন হতে অগ্রসর হয়ে এদের কাছে যেতে হয়। মন যখন নানা ভোগে জীর্ণ হয়ে অলস এবং 'অন্যথাবৃত্তি' হয়ে থাকে তখন এই ওস্তাদের আলাপ তার পক্ষে অত্যন্ত ফাঁকা।

আমাদের সুবিধে হয়েছে, সামনে আমাদের আর কিছু নেই। অন্যবারে যখন বিলিতি যাত্রী-জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছি তখন যাত্রীরাই ছিল এক দৃশ্য। তারা নাচে গানে খেলায় গোলেমালে অনন্তকে আচ্ছন্ন করে রাখত। এক মুহূর্তও তারা ফাঁকা ফেলে রাখতে চাইত না। তার উপরে সাজসজ্জা, কায়দাকানুনের উপসর্গ ছিল। এখানে জাহাজের ডেকের সঙ্গে সমুদ্র-আকাশের কোনো প্রতিযোগিতা নেই। যাত্রীর সংখ্যা অতি সামান্য, আমরাই চার জন; বাকি দু-তিন জন ধীর প্রকৃতির লোক। তার পরে, ঢিলাঢালা বেশেই ঘুমচ্ছি, জাগছি, খেতে যাচ্ছি, কারও কোনো আপত্তি নেই; তার প্রধান কারণ, এমন কোনো মহিলা নেই আমাদের অপরিচ্ছন্নতায় যাঁর অসম্ভ্রম হতে পারে।

এইজন্যেই প্রতিদিন আমরা বুঝতে পারছি, জগতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত সামান্য ব্যাপার নয়, তার অভ্যর্থনার জন্যে স্বর্গমর্ত্যে রাজকীয় সমারোহ। প্রভাতে পৃথিবী তার ঘোমটা খুলে দাঁড়ায়, তার বাণী নানা সুরে জেগে ওঠে; সন্ধ্যায় স্বর্গলোকের যবনিকা উঠে যায়, এবং দ্যুলোক আপন জ্যোতি-রোমাঞ্চিত নিঃশব্দতার দ্বারা পৃথিবীর সম্ভাষণের উত্তর দেয়। স্বর্গমর্ত্যের এই মুখোমুখি আলাপ যে কত গম্ভীর এবং কত মহীয়ান, এই আকাশ ও সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তা আমরা বুঝতে পারি।

দিগন্ত থেকে দেখতে পাই, মেঘগুলো নানা ভঙ্গিতে আকাশে উঠে চলেছে, যেন সৃষ্টিকর্তার আঙিনার আকার-ফোয়ারার মুখ খুলে গেছে। বস্তু প্রায় কিছুই নেই, কেবল আকৃতি, কোনোটার সঙ্গে কোনোটার মিল নেই। নানা রকমের আকার—কেবল সোজা লাইন নেই। সোজা লাইনটা মানুষের হাতের কাজের। তার ঘরের দেওয়ালে, তার কারখানা-ঘরের চিমনিতে মানুষের জয়স্তম্ভ একেবারে সোজা খাড়া। বাঁকা রেখা জীবনের রেখা, মানুষ সহজে তাকে আয়ত্ত করতে পারে না। সোজা রেখা জড় রেখা, সে সহজেই মানুষের শাসন মানে; সে মানুষের বোঝা বয়, মানুষের অত্যাচার সয়।

যেমন আকৃতির হরির লুঠ, তেমনি রঙের। রঙ যে কত রকম হতে পারে, তার সীমা নেই। রঙের তান উঠছে, তানের উপর তান; তাদের মিলও যেমন, তাদের অমিলও তেমনি; তারা বিরুদ্ধ নয়, অথচ বিচিত্র। রঙের সমারোহেও যেমন প্রকৃতির বিলাস, রঙের শান্তিতেও তেমনি। সূর্যাস্তের মুহূর্তে পশ্চিম আকাশ যেখানে রঙের ঐশ্বর্য পাগলের মতো দুই হাতে বিনা প্রয়োজনে ছড়িয়ে দিচ্ছে সেও যেমন আশ্চর্য, পূর্ব আকাশে যেখানে শান্তি এবং সংযম, সেখানেও রঙের পেলবতা, কোমলতা, অপরিমেয় গভীরতা তেমনি আশ্চর্য। প্রকৃতির হাতে অপর্যাপ্তও যেমন মহৎ হতে পারে, পর্যাপ্তও তেমনি। সূর্যাস্তে সূর্যোদয়ে প্রকৃতি আপনার ডাইনে বাঁয়ে একই কালে সেটা দেখিয়ে দেয়; তার খেয়াল আর ধ্রুপদ একই সঙ্গে বাজতে থাকে, অথচ কেউ কারও মহিমাকে আঘাত করে না।

তার পরে, রঙের আভায় আভায় জল যে কত বিচিত্র কথাই বলতে পারে তা কেমন করে বর্ণনা করব। সে তার জলতরঙ্গে রঙের যে গৎ বাজাতে থাকে, তাতে সুরের চেয়ে শ্রুতি অসংখ্য। আকাশ যে-সময়ে তার প্রশান্ত স্তব্ধতার উপর রঙের মহতোমহীয়ানকে দেখায় সমুদ্র সেই সময় তার ছোটো ছোটো লহরীর কম্পনে রঙের অণোরণীয়ানকে দেখাতে থাকে, তখন আশ্চর্যের অন্ত পাওয়া যায় না।

সমুদ্র-আকাশের গীতিনাট্যলীলায় রুদ্রের প্রকাশ কী রকম দেখা গেছে, সে পূর্বেই বলেছি। আবার কালও তিনি তাঁর ডমরু বাজিয়ে অট্টহাস্যে আর-এক ভঙ্গিতে দেখা দিয়ে গেলেন। সকালে আকাশ জুড়ে নীল মেঘ এবং ধোঁয়ালো মেঘ স্তরে স্তরে পাকিয়ে পাকিয়ে ফুলে ফুলে উঠল। মুষলধারে বৃষ্টি। বিদ্যুৎ আমাদের জাহাজের চারি দিকে তার তলোয়ার খেলিয়ে বেড়াতে লাগল। তার পিছনে পিছনে বজ্রের গর্জন। একটা বজ্র ঠিক আমাদের সামনে জলের উপর পড়ল, জল থেকে একটা বাষ্পরেখা সাপের মতো ফোঁস করে উঠল। আর-একটা বজ্র পড়ল আমাদের সামনেকার মাস্তুলে। রুদ্র যেন সুইট্‌জারল্যান্ডের ইতিহাসবিশ্রুত বীর উইলিয়ম টেলের মতো তাঁর অদ্ভুত

ধনুর্বিদ্যার পরিচয় দিয়ে গেলেন, মাস্তুলের ডগাটায় তাঁর বাণ লাগল, আমাদের স্পর্শ করল না। এই ঝড়ে আমাদের সঙ্গী আর-একটা জাহাজের প্রধান মাস্তুল বিদীর্ণ হয়েছে শুনলুম। মানুষ যে বাঁচে এই আশ্চর্য।

৭

এই কয়দিন আকাশ এবং সমুদ্রের দিকে চোখ ভরে দেখছি আর মনে হচ্ছে, অনন্তের রঙ তো শুভ্র নয়, তা কালো কিংবা নীল। এই আকাশ খানিক দূর পর্যন্ত আকাশ অর্থাৎ প্রকাশ, ততটা সে সাদা। তার পরে সে অব্যক্ত, সেইখান থেকে সে নীল। আলো যতদূর সীমার রাজ্য সেই পর্যন্ত; তার পরেই অসীম অন্ধকার। সেই অসীম অন্ধকারের বুকের উপরে এই পৃথিবীর আলোক-ময় দিনটুকু যেন কৌস্তুভমণির হার দুলছে।

এই প্রকাশের জগৎ, এই গৌরাঙ্গী, তার বিচিত্র রঙের সাজ পরে অভিসারে চলেছে—ঐ কালোর দিকে, ঐ অনির্বচনীয় অব্যক্তর দিকে। বাঁধা নিয়মের মধ্যে বাঁধা থাকাতেই তার মরণ—সে কুলকেই সর্বস্ব করে চুপ করে বসে থাকতে পারে না, সে কুল খুইয়ে বেরিয়ে পড়েছে। এই বেরিয়ে যাওয়া বিপদের যাত্রা; পথে কাঁটা, পথে সাপ, পথে ঝড় বৃষ্টি—সমস্ত অতিক্রম করে, বিপদকে উপেক্ষা করে সে যে চলেছে, সে কেবল ঐ অব্যক্ত অসীমের টানে। অব্যক্তর দিকে, 'আরও'র দিকে প্রকাশের এই কুল-খোয়ানো অভিসারযাত্রা—প্রলয়ের ভিতর দিয়ে, বিপ্লবের কাঁটাপথে পদে পদে রক্তের চিহ্ন এঁকে।

কিন্তু কেন চলে, কোন্ দিকে চলে, ওদিকে তো পথের চিহ্ন নেই, কিছু তো দেখতে পাওয়া যায় না? না, দেখা যায় না, সব অব্যক্ত কিন্তু শূন্য তো নয়; কেননা, ঐ দিক থেকেই বাঁশির সুর আসছে। আমাদের চলা, এ চোখে দেখে চলা নয়, এ সুরের টানে চলা। যেটুকু চোখে দেখে চলি সে তো বুদ্ধিমানের চলা, তার হিসাব আছে, তার প্রমাণ আছে; সে ঘুরে ঘুরে কুলের মধ্যেই চলা। সে চলায় কিছুই এগোয় না। আর যেটুকু বাঁশি শুনে পাগল হয়ে চলি, যে-চলায় মরা-বাঁচা জ্ঞান থাকে না, সেই পাগলের চলাতেই জগৎ এগিয়ে চলেছে। সেই চলাকে নিন্দার ভিতর দিয়ে, বাধার ভিতর দিয়ে চলতে হয়; কোনো নজির মানতে গেলেই তাকে থমকে দাঁড়াতে হয়। তার এই চলার বিরুদ্ধে হাজার রকম যুক্তি আছে, সে-যুক্তি তর্কের দ্বারা খণ্ডন করা যায় না। তার এই চলার কেবল একটিমাত্র কৈফিয়ত আছে—সে বলছে, ঐ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে বাঁশি আমাকে ডাকছে। নইলে কেউ কি সাধ করে আপনার সীমা ডিঙিয়ে যেতে পারে।

যে দিক থেকে ঐ মনোহরণ অন্ধকারের বাঁশি বাজছে ঐ দিকেই মানুষের সমস্ত আরাধনা, সমস্ত কাব্য, সমস্ত শিল্পকলা, সমস্ত বীরত্ব, সমস্ত আত্মত্যাগ মুখ ফিরিয়ে আছে; ঐ দিকে চেয়েই মানুষ রাজ্যসুখ জলাঞ্জলি দিয়ে বিবাগি হয়ে বেরিয়ে গেছে, মরণকে মাথায় করে নিয়েছে। ঐ কালোকে দেখে মানুষ ভুলেছে। ঐ কালোর বাঁশিতেই মানুষকে উত্তরমেরু দক্ষিণমেরুতে টানে, অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণের রাস্তা বেয়ে মানুষের মন দুর্গমের পথে ঘুরে বেড়ায়, বার বার মরতে মরতে সমুদ্রপারের পথ বের করে, বার বার মরতে মরতে আকাশপারের ডানা মেলতে থাকে।

মানুষের মধ্যে যে-সব মহাজাতি কুলত্যাগিনী তারাই এগচ্ছে, ভয়ের ভিতর থেকে অভয়ে, বিপদের ভিতর দিয়ে সম্পদে। যারা সর্বনাশা কালোর বাঁশি শুনতে পেলে না তারা কেবল পুঁথির নজির জড়ো করে কুল আঁকড়ে বসে রইল, তারা কেবল শাসন মানতেই আছে। তারা কেন বৃথা এই আনন্দলোকে জন্মেছে যেখানে সীমা কাটিয়ে অসীমের সঙ্গে নিত্যলীলাই হচ্ছে জীবনযাত্রা, যেখানে বিধানকে ভাসিয়ে দিতে থাকাই হচ্ছে বিধি।

আবার উল্টো দিক থেকে দেখলে দেখতে পাই, ঐ কালো অনন্ত আসছেন তাঁর আপনার শুভ্র জ্যোতির্ময়ী আনন্দমূর্তির দিকে। অসীমের সাধনা এই সুন্দরীর জন্যে, সেইজন্যেই তাঁর

বাঁশি বিরাট অন্ধকারের ভিতর দিয়ে এমন ব্যাকুল হয়ে বাজছে; অসীমের সাধনা এই সুন্দরীকে নূতন নূতন মালায় নূতন করে সাজাচ্ছে। ঐ কালো এই রূপসীকে এক মুহূর্ত বুকের থেকে নামিয়ে রাখতে পারেন না, কেননা, এ যে তাঁর পরমা সম্পদ। ছোটোর জন্যে বড়োর এই সাধনা যে কী অসীম, তা ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে, পাখির পাখায় পাখায়, মেঘের রঙে রঙে মানুষের হৃদয়ের অপরূপ লাবণ্যে মুহূর্তে মুহূর্তে ধরা পড়ছে। রেখায় রেখায়, রঙে রঙে, রসে রসে তৃপ্তির আর শেষ নেই। এই আনন্দ কিসের। অব্যক্ত যে ব্যক্তর মধ্যে কেবলই আপনাকে প্রকাশ করছেন, আপনাকে ত্যাগ করে করে ফিরে পাচ্ছেন।

এই অব্যক্ত কেবলই যদি না-মাত্র, শূন্যমাত্র হতেন তা হলে প্রকাশের কোনো অর্থই থাকত না, তা হলে বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি কেবল একটা শব্দমাত্র হত। ব্যক্ত যদি অব্যক্তেরই প্রকাশ না হত তা হলে যা-কিছু আছে তা নিশ্চল হয়ে থাকত, কেবলই আরও-কিছুর দিকে আপনাকে নূতন করে তুলত না। এই আরও-কিছুর দিকেই সমস্ত জগতের আনন্দ কেন। এই অজানা আরও-কিছুর বাঁশি শুনেই সে কুল ত্যাগ করে কেন? ঐ দিকে শূন্য নয় বলেই, ঐ দিকেই সে পূর্ণকে অনুভব করে বলেই। সেইজন্যই উপনিষদ বলেছেন— ভূমৈব সুখং, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। সেইজন্যই তো সৃষ্টির এই লীলা দেখছি, আলো এগিয়ে চলেছে অন্ধকারের অকূলে, অন্ধকার নেমে আসছে আলোর কূলে। আলোর মন ভুলছে কালোয়, কালোর মন ভুলেছে আলোয়।

মানুষ যখন জগৎকে না-এর দিক থেকে দেখে, তখন তার রূপক একেবারে উল্টে যায়। প্রকাশের একটা উল্টো পিঠ আছে, সে হচ্ছে প্রলয়। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে ছাড়া প্রাণের বিকাশ হতেই পারে না। হয়ে-ওঠার মধ্যে দুটো জিনিস থাকাই চাই—যাওয়া এবং হওয়া। হওয়াটাই হচ্ছে মুখ্য, যাওয়াটাই গৌণ।

কিন্তু মানুষ যদি উল্টো পিঠেই চোখ রাখে, বলে, সবই যাচ্ছে, কিছুই থাকছে না; বলে, জগৎ বিনাশেরই প্রতিরূপ, সমস্তই মায়া, যা-কিছু দেখছি এ-সমস্তই 'না'; তা হলে এই প্রকাশের রূপকেই সে কালো করে, ভয়ংকর করে দেখে; তখন সে দেখে, এই কালো কোথাও এগচ্ছে না, কেবল বিনাশের বেশে নৃত্য করছে। আর, অনন্ত রয়েছেন আপনাতে আপনি নির্লিপ্ত, এই কালিমা তাঁর বুকের উপর মৃত্যুর ছায়ার মতো চঞ্চল হয়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু স্তব্ধকে স্পর্শ করতে পারছে না। এই কালো দৃশ্যত আছে, কিন্তু বস্তুত নেই; আর যিনি কেবলমাত্র আছেন তিনি স্থির, ঐ প্রলয়রূপিণী না-থাকা তাঁকে লেশমাত্র বিক্ষুব্ধ করে না। এখানে আলোর সঙ্গে কালোর সেই সম্বন্ধ, থাকার সঙ্গে না-থাকার যে সম্বন্ধ। কালোর সঙ্গে আলোর আনন্দের লীলা নেই; এখানে যোগের অর্থ হচ্ছে প্রেমের যোগ নয়, জ্ঞানের যোগ। দুইয়ের যোগে এক নয়, একের মধ্যেই এক। মিলনে এক নয়, প্রলয়ে এক।

কথাটাকে আর-একটু পরিষ্কার করবার চেষ্টা করি।

একজন লোক ব্যাবসা করছে। সে লোক করছে কী। তার মূলধনকে অর্থাৎ পাওয়া-সম্পদকে সে মুনফা অর্থাৎ না-পাওয়া সম্পদের দিকে প্রেরণ করছে। পাওয়া-সম্পদটা সীমাবদ্ধ ও ব্যক্ত, না-পাওয়া সম্পদটা অসীম ও অব্যক্ত। পাওয়া-সম্পদ সমস্ত বিপদ স্বীকার করে না-পাওয়া সম্পদের অভিসারে চলেছে। না-পাওয়া সম্পদ অদৃশ্য ও অলব্ধ বটে কিন্তু তার বাঁশি বাজছে, সেই বাঁশি ভূমার বাঁশি। যে-বণিক সেই বাঁশি শোনে সে আপন ব্যাঙ্কে-জমানো কোম্পানি-কাগজের কুল ত্যাগ করে সাগর গিরি ডিঙিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এখানে কী দেখছি। না, পাওয়া-সম্পদের সঙ্গে না-পাওয়া সম্পদের একটি লাভের যোগ আছে। এই যোগে উভয়ত আনন্দ। কেননা, এই যোগে পাওয়া না-পাওয়াকে পাচ্ছে, এবং না-পাওয়া পাওয়ার মধ্যে ক্রমাগত আপনাকেই পাচ্ছে।

কিন্তু মনে করা যাক, একজন ভীতু লোক বণিকের খাতায় ঐ খরচের দিকের হিসাবটাই দেখছে। বণিক কেবলই আপনার পাওয়া টাকা খরচ করেই চলেছে, তার অন্ত নেই। তার গা শিউরে ওঠে। সে বলে, এই তো প্রলয়! খরচের হিসাবের কালো অঙ্কগুলো রক্তলোলুপ রসনা

দুলিয়ে কেবলই যে নৃত্য করছে। যা খরচ, অর্থাৎ বস্তুত যা নেই, তাই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অঙ্ক-বস্তুর আকার ধরে খাতা জুড়ে বেড়ে বেড়েই চলেছে। একেই তো বলে মায়া। বণিক মুগ্ধ হয়ে এই মায়া-অঙ্কটির চিরদীর্ঘায়মান শৃংখল কাটাতে পারছে না। এ স্থলে মুক্তিটা কী। না, ঐ সচল অঙ্কগুলোকে একেবারে লোপ করে দিয়ে খাতার নিশ্চল নির্বিকার শুভ্র কাগজের মধ্যে নিরাপদ ও নিরঞ্জন হয়ে স্থিরত্ব লাভ করা। দেওয়া ও পাওয়ার মধ্যে যে একটি আনন্দময় সম্বন্ধ আছে সে-সম্বন্ধ থাকার দরুন মানুষ দুঃসাহসের পথে যাত্রা ক'রে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জয়লাভ করে, ভীতু মানুষ তাকে দেখতে পায় না। তাই বলে—

মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।

চীন সমুদ্র। তোসামারু
৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

৮

শুনেছিলুম, পারস্যের রাজা যখন ইংলন্ডে গিয়েছিলেন তখন হাতে খাওয়ার প্রসঙ্গে তিনি ইংরেজকে বলেছিলেন, 'কাঁটাচামচ দিয়ে খেতে গিয়ে তোমরা খাওয়ার একটা আনন্দ থেকে বঞ্চিত হও।' যারা ঘটকের হাত দিয়ে বিয়ে করে তারা কোর্টশিপের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। হাত দিয়ে স্পর্শ করেই খাবারের সঙ্গে কোর্টশিপ আরম্ভ হয়। আঙুলের ডগা দিয়েই স্বাদগ্রহণের শুরু।

আমার তেমনি জাহাজ থেকেই জাপানের স্বাদ শুরু হয়েছে। যদি ফরাসি জাহাজে করে জাপানে যেতুম তা হলে আঙুলের ডগা দিয়ে পরিচয় আরম্ভ হত না।

এর আগে অনেকবার বিলিতি জাহাজে করে সমুদ্রযাত্রা করেছি, তার সঙ্গে এই জাহাজের বিস্তর তফাত। সে-সব জাহাজের কাপ্তেন ঘোরতর কাপ্তেন। যাত্রীদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া হাসি-তামাশা যে তার বন্ধ তা নয়; কিন্তু কাপ্তেনিটা খুব টক্‌টকে রাঙা। এত জাহাজে আমি ঘুরেছি, তার মধ্যে কোনো কাপ্তেনকেই আমার মনে পড়ে না। কেননা, তারা কেবলমাত্র জাহাজের অঙ্গ। জাহাজ-চালানোর মাঝখান দিয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ।

হতে পারে আমি যদি য়ুরোপীয় হতুম তা হলে তারা যে কাপ্তেন ছাড়াও আর কিছু, তারা যে মানুষ, এটা আমার অনুভব করতে বিশেষ বাধা হত না। কিন্তু, এ জাহাজেও আমি বিদেশী; একজন য়ুরোপীয়ের পক্ষেও আমি যা, একজন জাপানির পক্ষেও আমি তাই।

এ জাহাজে চড়ে অবধি দেখতে পাচ্ছি, আমাদের কাপ্তেনের কাপ্তেনিটা কিছুমাত্র লক্ষ্যগোচর নয়, একেবারেই সহজ মানুষ। যাঁরা তাঁর নিম্নতর কর্মচারী তাঁদের সঙ্গে তাঁর কর্মের সম্বন্ধ এবং দূরত্ব আছে, কিন্তু যাত্রীদের সঙ্গে কিছুমাত্র নেই। ঘোরতর ঝড়ঝাপটের মধ্যেও তাঁর ঘরে গেছি; দিব্যি সহজ ভাব। কথায় বার্তায় ব্যবহারে তাঁর সঙ্গে আমাদের যে জমে গিয়েছে, সে কাপ্তেন-হিসাবে নয়, মানুষ-হিসাবে। এ যাত্রা আমাদের শেষ হয়ে যাবে, তাঁর সঙ্গে জাহাজ-চলার সম্বন্ধ আমাদের ঘুচে যাবে, কিন্তু তাঁকে আমাদের মনে থাকবে।

আমাদের ক্যাবিনের যে স্টুয়ার্ড্‌ আছে সেও দেখি তার কাজকর্মের সীমাটুকুর মধ্যেই শক্ত হয়ে থাকে না। আমরা আপনাদের মধ্যে কথাবার্তা কচ্ছি তার মাঝখানে এসে সেও ভাঙা ইংরাজিতে যোগ দিতে বাধা বোধ করে না। মুকুল ছবি আঁকছে, সে এসে খাতা চেয়ে নিয়ে তার মধ্যে ছবি আঁকতে লেগে গেল।

আমাদের জাহাজের যিনি খাজাঞ্চি তিনি একদিন এসে আমাকে বললেন, 'আমার মনে অনেক বিষয়ে প্রশ্ন আসে, তোমার সঙ্গে তার বিচার করতে ইচ্ছে করি; কিন্তু আমি ইংরাজি এত কম জানি যে, মুখে মুখে আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি যদি কিছু না মনে কর

তবে আমি মাঝে মাঝে কাগজে আমার প্রশ্ন লিখে এনে দেব, তুমি অবসরমত সংক্ষেপে দু-চার কথায় তার উত্তর লিখে দিয়ো।' তার পর থেকে রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ কী, এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার প্রশ্নোত্তর চলেছে।

অন্য কোনো জাহাজের খাজাঞ্চি এই-সব প্রশ্ন নিয়ে যে মাথা বকায়, কিংবা নিজের কাজকর্মের মাঝখানে এরকম উপসর্গের সৃষ্টি করে, এরকম আমি মনে করতে পারি নে। এদের দেখে আমার মনে হয়, এরা নূতনজাগ্রত জাতি—এরা সমস্তই নূতন করে জানতে, নূতন করে ভাবতে উৎসুক। ছেলেরা নূতন জিনিস দেখলে যেমন ব্যগ্র হয়ে ওঠে, আইডিয়া সম্বন্ধে এদের যেন সেইরকম ভাব।

তা ছাড়া আর-একটা বিশেষত্ব এই যে, এক পক্ষে জাহাজের যাত্রী আর-এক পক্ষে জাহাজের কর্মচারী, এর মাঝখানকার গণ্ডিটা তেমন শক্ত নয়। আমি যে এই খাজাঞ্চির প্রশ্নের উত্তর লিখতে বসব, এ কথা মনে করতে তার কিছু বাধে নি—আমি দুটো কথা শুনতে চাই, তুমি দুটো কথা বলবে; এতে বিঘ্ন কী আছে? মানুষের উপর মানুষের যে একটি দাবি আছে সেই দাবিটা সরলভাবে উপস্থিত করলে মনের মধ্যে আপনি সাড়া দেয়, তাই আমি খুশি হয়ে আমার সাধ্যমত এই আলোচনায় যোগ দিয়েছি।

আর-একটা জিনিস আমার বিশেষ করে চোখে লাগছে। মুকুল বালকমাত্র, সে ডেকের প্যাসেঞ্জার। কিন্তু, জাহাজের কর্মচারীরা তার সঙ্গে অবাধে বন্ধুত্ব করছে। কী করে জাহাজ চালায়, কী করে সমুদ্রে পথ নির্ণয় করে, কী করে গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতে হয়, কাজ করতে করতে তারা এই-সমস্ত তাকে বোঝায়। তা ছাড়া নিজেদের কাজকর্ম আশাভরসার কথাও ওর সঙ্গে হয়। মুকুলের শখ গেল, জাহাজের এঞ্জিনের ব্যাপার দেখবে। ওকে কাল রাত্রি এগারোটার সময় জাহাজের পাতালপুরীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে এক ঘণ্টা ধরে সমস্ত দেখিয়ে আনলে।

কাজের সম্বন্ধের ভিতর দিয়েও মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ, এইটেই বোধ হয় আমাদের পূর্বদেশের জিনিস। পশ্চিমদেশ কাজকে খুব শক্ত করে খাড়া করে রাখে, সেখানে মানবসম্বন্ধের দাবি ঘেঁষতে পারে না। তাতে কাজ খুব পাকা হয় সন্দেহ নেই। আমি ভেবেছিলুম, জাপান তো য়ুরোপের কাছ থেকে কাজের দীক্ষা গ্রহণ করেছে, অতএব তার কাজের গণ্ডিও বোধ হয় পাকা। কিন্তু, এই জাপানি জাহাজে কাজ দেখতে পাচ্ছি, কাজের গণ্ডিগুলোকে দেখতে পাচ্ছি নে। মনে হচ্ছে, যেন আপনার বাড়িতে আছি, কোম্পানির জাহাজে নেই। অথচ, ধোয়া মাজা প্রভৃতি জাহাজের নিত্যকর্মের কোনো খুঁত নেই।

প্রাচ্যদেশে মানবসমাজের সম্বন্ধগুলি বিচিত্র এবং গভীর। পূর্বপুরুষ যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদের সঙ্গেও আমাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। আমাদের আত্মীয়তার জাল বহুবিস্তৃত। এই নানা সম্বন্ধের নানা দাবি মেটানো আমাদের চিরাভ্যস্ত, সেইজন্যে তাতে আমাদের আনন্দ। আমাদের ভৃত্যেরাও কেবল বেতনের নয়, আত্মীয়তার দাবি করে। সেইজন্যে যেখানে আমাদের কোনো দাবি চলে না, যেখানে কাজ অত্যন্ত খাড়া, সেখানে আমাদের প্রকৃতি কষ্ট পায়। অনেক সময়ে ইংরেজ মনিবের সঙ্গে বাঙালি কর্মচারীর যে বোঝাপড়ার অভাব ঘটে তার কারণ এই—ইংরেজ কর্তা বাঙালি কর্মচারীর দাবি বুঝতে পারে না, বাঙালি কর্মচারী ইংরেজ কর্তার কাজের কড়া শাসন বুঝতে পারে না। কর্মশালার কর্তা যে কেবলমাত্র কর্তা হবে তা নয়, মা-বাপ হবে, বাঙালি কর্মচারী চিরকালের অভ্যাসবশত এইটে প্রত্যাশা করে; যখন বাধা পায় তখন আশ্চর্য হয়, এবং মনে মনে মনিবকে দোষ না দিয়ে থাকতে পারে না। ইংরেজ কাজের দাবিকে মানতে অভ্যস্ত, বাঙালি মানুষের দাবিকে মানতে অভ্যস্ত; এইজন্যে উভয় পক্ষে ঠিকমত মিটমাট হতে চায় না।

কিন্তু, কাজের সম্বন্ধ এবং মানুষের সম্বন্ধ এ দুইয়ের বিচ্ছেদ না হয়ে সামঞ্জস্য হওয়াটাই দরকার, এ কথা না মনে করে থাকা যায় না। কেমন করে সামঞ্জস্য হতে পারে, বাইরে থেকে তার কোনো বাঁধা নিয়ম ঠিক করে দেওয়া যায় না। সত্যকার সামঞ্জস্য প্রকৃতির ভিতর থেকে ঘটে।

আমাদের দেশে প্রকৃতির এই ভিতরকার সামঞ্জস্য ঘটে ওঠা কঠিন, কেননা, যাঁরা আমাদের কাজের কর্তা তাঁদের নিয়ম অনুসারেই আমরা কাজ চালাতে বাধ্য।

জাপানে প্রাচ্যমন পাশ্চাত্যের কাছ থেকে কাজের শিক্ষালাভ করেছে, কিন্তু কাজের কর্তা তারা নিজেই। এইজন্যে মনের ভিতরে একটা আশা হয় যে, জাপানে হয়তো পাশ্চাত্য কাজের সঙ্গে প্রাচ্য ভাবের একটা সামঞ্জস্য ঘটে উঠতে পারে। যদি সেটা ঘটে, তবে সেইটেই পূর্ণতার আদর্শ হবে। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় অনুকরণের ঝাঁজটা যখন কড়া থাকে তখন বিধিবিধান সম্বন্ধে ছাত্র গুরুর চেয়ে আরও কড়া হয়; কিন্তু ভিতরকার প্রকৃতি আস্তে আস্তে আপনার কাজ করতে থাকে, এবং শিক্ষার কড়া অংশগুলোকে নিজের জারক রসে গলিয়ে আপন করে নেয়। এই জীর্ণ করে নেওয়ার কাজটা একটু সময়সাধ্য। এইজন্যেই পশ্চিমের শিক্ষা জাপানে কী আকার ধারণ করবে, সেটা স্পষ্ট করে দেখবার সময় এখনো হয় নি। সম্ভবত, এখন আমরা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিস্তর অসামঞ্জস্য দেখতে পাব, যেটা কুশ্রী। আমাদের দেশেও পদে পদে তা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু, প্রকৃতির কাজই হচ্ছে অসামঞ্জস্যগুলোকে মিটিয়ে দেওয়া। জাপানে সেই কাজ চলছে সন্দেহ নেই। অন্তত, এই জাহাজটুকুর মধ্যে আমি তো এই দুই ভাবের মিলনের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি।

৯

২রা জ্যৈষ্ঠে আমাদের জাহাজ সিঙাপুরে এসে পৌঁছল। অনতিকাল পরেই একজন জাপানি যুবক আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন; তিনি এখানকার একটি জাপানি কাগজের সম্পাদক; তিনি আমাকে বললেন, তাঁদের জাপানের সব চেয়ে বড়ো দৈনিকপত্রের সম্পাদকের কাছ থেকে তাঁরা তার পেয়েছেন যে আমি জাপানে যাচ্ছি; সেই সম্পাদক আমার কাছ থেকে একটি বক্তৃতা আদায় করবার জন্যে অনুরোধ করেছেন। আমি বললুম, জাপানে না পৌঁছে আমি এ বিষয়ে আমার সম্মতি জানাতে পারব না। তখনকার মতো এইটুকুতেই মিটে গেল। আমাদের যুবক ইংরেজ বন্ধু পিয়ার্সন এবং মুকুল শহর দেখতে বেরিয়ে গেলেন। জাহাজ একেবারে ঘাটে লেগেছে। এই জাহাজের ঘাটের চেয়ে কুশ্রী বিভীষিকা আর নেই—এরই মধ্যে ঘন মেঘ করে বাদলা দেখা দিলে। বিকট ঘড় ঘড় শব্দে জাহাজ থেকে মাল ওঠানো নাবানো চলতে লাগল। আমি কুঁড়ে মানুষ; কোমর বেঁধে শহর দেখতে বেরনো আমার ধাতে নেই। আমি সেই বিষম গোলমালের সাইক্লোনের মধ্যে ডেক-এ বসে মনকে কোনোমতে শান্ত করে রাখবার জন্যে লিখতে বসে গেলুম।

খানিক বাদে কাপ্তেন এসে খবর দিলেন যে, একজন জাপানি মহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি লেখা বন্ধ করে একটি ইংরাজি-বেশ পরা জাপানি মহিলার সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হলুম। তিনিও সেই জাপানি সম্পাদকের পক্ষ নিয়ে বক্তৃতা করবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করতে লাগলেন। আমি বহু কষ্টে সে অনুরোধ কাটালুম। তখন তিনি বললেন, 'আপনি যদি একটু শহর বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছা করেন তো আপনাকে সব দেখিয়ে আনতে পারি।' তখন সেই বস্তা তোলার নিরন্তর শব্দ আমার মনটাকে জাঁতার মতো পিষছিল, কোথাও পালাতে পারলে বাঁচি; সুতরাং আমাকে বেশি পীড়াপীড়ি করতে হল না। সেই মহিলাটির মোটর গাড়িতে করে শহর ছাড়িয়ে রবার গাছের আবাদের ভিতর দিয়ে, উঁচু-নিচু পাহাড়ের পথে অনেকটা দূর ঘুরে এলুম। জমি ঢেউ-খেলানো, ঘাস ঘন সবুজ, রাস্তার পাশ দিয়ে একটি ঘোলা জলের স্রোত কল্‌কল্‌ করে এঁকে বেঁকে ছুটে চলেছে, জলের মাঝে মাঝে আঁটিবাঁধা কাটা বেত ভিজছে। রাস্তার দুই ধারে সব বাগানবাড়ি। পথে ঘাটে চীনেই বেশি; এখানকার সকল কাজেই তারা আছে।

গাড়ি শহরের মধ্যে যখন এল, মহিলাটি তাঁর জাপানি জিনিসের দোকানে আমাকে নিয়ে গেলেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে; মনে মনে ভাবছি, জাহাজে আমাদের সন্ধ্যাবেলাকার খাবার সময় হয়ে এল; কিন্তু সেখানে সেই শব্দের ঝড়ে বস্তা তোলপাড় করছে কল্পনা করে কোনোমতেই ফিরতে

মন লাগছিল না। মহিলাটি একটি ছোটো ঘরের মধ্যে বসিয়ে, আমাকে ও আমার সঙ্গী ইংরেজটিকে থালায় ফল সাজিয়ে খেতে অনুরোধ করলেন। ফল খাওয়া হলে পর তিনি আস্তে আস্তে অনুরোধ করলেন, যদি আপত্তি না থাকে তিনি আমাদের হোটেলে খাইয়ে আনতে ইচ্ছা করেন। তাঁর এ অনুরোধও আমরা লঙ্ঘন করি নি। রাত্রি প্রায় দশটার সময় তিনি আমাদের জাহাজে পৌঁছিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়ে গেলেন।

এই রমণীর ইতিহাসে কিছু বিশেষত্ব আছে। এঁর স্বামী জাপানে আইনব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু সে ব্যবসায় যথেষ্ট লাভজনক ছিল না। তাই আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য হওয়া কঠিন হয়ে উঠছিল। স্ত্রীই স্বামীকে প্রস্তাব করলেন, 'এসো আমরা একটা কিছু ব্যাবসা করি।' স্বামী প্রথমে তাতে নারাজ ছিলেন। তিনি বললেন, 'আমাদের বংশে ব্যাবসা তো কেউ করে নি, ওটা আমাদের পক্ষে একটা হীন কাজ।' শেষকালে স্ত্রীর অনুরোধে রাজি হয়ে জাপান থেকে দুজনে মিলে সিঙাপুরে এসে দোকান খুললেন। সে আজ আঠারো বৎসর হল। আত্মীয়বন্ধু সকলেই একবাক্যে বললে, এইবার এরা মজল। এই স্ত্রীলোকটির পরিশ্রমে, নৈপুণ্যে এবং লোকের সঙ্গে ব্যবহারকুশলতায়, ক্রমশই ব্যবসায়ের উন্নতি হতে লাগল। গত বৎসরে এঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে; এখন এঁকে একলাই সমস্ত কাজ চালাতে হচ্ছে।

বস্তুত, এই ব্যাবসাটি এই স্ত্রীলোকেরই নিজের হাতে তৈরি। আমি যে কথা বলছিলুম এই ব্যবসায়ে তারই প্রমাণ দেখতে পাই। মানুষের মন বোঝা এবং মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করা স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ; এই মেয়েটির মধ্যে আমরা তারই পরিচয় পেয়েছি। তার পরে, কর্মকুশলতা মেয়েদের স্বাভাবিক। পুরুষ স্বভাবত কুঁড়ে, দায়ে পড়ে তাদের কাজ করতে হয়। মেয়েদের মধ্যে একটা প্রাণের প্রাচুর্য আছে যার স্বাভাবিক বিকাশ হচ্ছে কর্মপরতা। কর্মের সমস্ত খুঁটিনাটি যে কেবল ওরা সহ্য করতে পারে তা নয়, তাতে ওরা আনন্দ পায়। তা ছাড়া দেনাপাওনা সম্বন্ধে ওরা সাবধানী। এইজন্যে, যে-সব কাজে দৈহিক বা মানসিক সাহসিকতার দরকার হয় না সে-সব কাজ মেয়েরা পুরুষের চেয়ে ঢের ভালো করে করতে পারে, এই আমার বিশ্বাস। স্বামী যেখানে সংসার ছারখার করেছে সেখানে স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রীর হাতে সংসার পড়ে সমস্ত সুশৃঙ্খলায় রক্ষা পেয়েছে, আমাদের দেশে তার বিস্তর প্রমাণ আছে। শুনেছি, ফ্রান্সের মেয়েরাও ব্যবসায়ে আপনাদের কর্মনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। যে-সব কাজে উদ্ভাবনার দরকার নেই, যে-সব কাজে পটুতা পরিশ্রম ও লোকের সঙ্গে ব্যবহারই সব চেয়ে দরকার, সে-সব কাজ মেয়েদের।

৩রা জ্যৈষ্ঠ সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়লে। ঠিক এই ছাড়বার সময় একটি বিড়াল জলের মধ্যে পড়ে গেল। তখন সমস্ত ব্যস্ততা ঘুচে গিয়ে, ঐ বিড়ালকে বাঁচানোই প্রধান কাজ হয়ে উঠল। নানা উপায়ে নানা কৌশলে তাকে জল থেকে উঠিয়ে তবে জাহাজ ছাড়লে। এতে জাহাজ ছাড়ার নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেল। এইটিতে আমাকে বড়ো আনন্দ দিয়েছে।

চীন সমুদ্র
তোসামারু জাহাজ
৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

১০

সমুদ্রের উপর দিয়ে আমাদের দিনগুলি ভেসে চলেছে পালের নৌকার মতো। সে নৌকা কোনো ঘাটে যাবার নৌকা নয়, তাতে কোনো বোঝাই নেই। কেবলমাত্র ঢেউয়ের সঙ্গে, বাতাসের সঙ্গে, আকাশের সঙ্গে কোলাকুলি করতে তারা বেরিয়েছে। মানুষের লোকালয় মানুষের বিশ্বের প্রতিদ্বন্দ্বী। সেই লোকালয়ের দাবি মিটিয়ে সময় পাওয়া যায় না, বিশ্বের নিমন্ত্রণ আর রাখতে পারি নে। চাঁদ যেমন তার একটা মুখ সূর্যের দিকে ফিরিয়ে রেখেছে, তার আর-একটা মুখ অন্ধকার,

তেমনি লোকালয়ের প্রচণ্ড টানে মানুষের সেই দিকের পিঠটাতেই চেতনার সমস্ত আলো খেলছে, অন্য একটা দিক আমরা ভুলেই গেছি; বিশ্ব যে মানুষের কতখানি, সে আমাদের খেয়ালেই আসে না।

সত্যকে যেদিকে ভুলি কেবল যে সেই দিকেই লোকসান তা নয়, সে লোকসান সকল দিকেই। বিশ্বকে মানুষ যে পরিমাণে যতখানি বাদ দিয়ে চলে তার লোকসানের তাপ এবং কলুষ সেই পরিমাণে ততখানি বেড়ে ওঠে। সেইজন্যেই ক্ষণে ক্ষণে মানুষের একেবারে উল্টোদিকে টান আসে। সে বলে, 'বৈরাগ্যমেবাভয়ং'—বৈরাগ্যের কোনো বালাই নেই। সে বলে বসে, সংসার কারাগার; মুক্তি খুঁজতে, শান্তি খুঁজতে সে বনে পর্বতে সমুদ্রতীরে ছুটে যায়। মানুষ সংসারের সঙ্গে বিশ্বের বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে বলেই বড়ো করে প্রাণের নিশ্বাস নেবার জন্যে তাকে সংসার ছেড়ে বিশ্বের দিকে যেতে হয়। এত বড়ো অদ্ভুত কথা তাই মানুষকে বলতে হয়েছে—মানুষের মুক্তির রাস্তা মানুষের কাছ থেকে দূরে।

লোকালয়ের মধ্যে যখন থাকি অবকাশ জিনিসটাকে তখন ডরাই। কেননা, লোকালয় জিনিসটা একটা নিরেট জিনিস, তার মধ্যে ফাঁকমাত্রই ফাঁকা। সেই ফাঁকাটাকে কোনোমতে চাপা দেবার জন্যে আমাদের মদ চাই, তাস-পাশা চাই, রাজাউজির মারা চাই— নইলে সময় কাটে না। অর্থাৎ সময়টাকে আমরা চাই নে, সময়টাকে আমরা বাদ দিতে চাই।

কিন্তু, অবকাশ হচ্ছে বিরাটের সিংহাসন। অসীম অবকাশের মধ্যে বিশ্বের প্রতিষ্ঠা। বৃহৎ যেখানে আছে অবকাশ সেখানে ফাঁকা নয়, একেবারে পরিপূর্ণ। সংসারের মধ্যে যেখানে বৃহৎকে আমরা রাখি নি সেখানে অবকাশ এমন ফাঁকা; বিশ্বে যেখানে বৃহৎ বিরাজমান সেখানে অবকাশ এমন গভীরভাবে মনোহর। গায়ে কাপড় না থাকলে মানুষের যেমন লজ্জা সংসারে অবকাশ আমাদের তেমনি লজ্জা দেয়; কেননা, ওটা কিনা শূন্য তাই ওকে আমরা বলি জড়তা, আলস্য—কিন্তু, সত্যকার সন্ন্যাসীর পক্ষে অবকাশে লজ্জা নেই, কেননা, তার অবকাশ পূর্ণতা, সেখানে উলঙ্গতা নেই।

এ কেমনতরো? যেমন প্রবন্ধ এবং গান। প্রবন্ধে কথা যেখানে থামে সেখানে কেবলমাত্র ফাঁকা। গানে কথা যেখানে থামে সেখানে সুরে ভরাট। বস্তুত, সুর যতই বৃহৎ হয়, ততই কথার অবকাশ বেশি থাকা চাই। গায়কের সার্থকতা কথার ফাঁকে, লেখকের সার্থকতা কথার ঝাঁকে।

আমরা লোকালয়ের মানুষ এই যে জাহাজে করে চলছি, এইবার আমরা কিছুদিনের জন্যে বিশ্বের দিকে মুখ ফেরাতে পেরেছি। সৃষ্টির যে পিঠে অনেকের ঠেলাঠেলি ভিড় সেদিক থেকে যে-পিঠে একের আসন সেদিকে এসেছি। দেখতে পাচ্ছি, এই যে নীল আকাশ এবং নীল সমুদ্রের বিপুল অবকাশ এ যেন অমৃতের পূর্ণ ঘট।

অমৃত—সে যে শুভ্র আলোর মতো পরিপূর্ণ এক। শুভ্র আলোয় বহুবর্ণচ্ছটা একে মিলেছে, অমৃতরসের তেমনি বহুরস একে নিবিড়। জগতে এই এক আলো যেমন নানাবর্ণে বিচিত্র, সংসারে তেমনি এই এক রসই নানা রসে বিভক্ত। এইজন্যে, অনেককে সত্য করে জানতে হলে সেই এককে সঙ্গে সঙ্গে জানতে হয়। গাছ থেকে যে ডাল কাটা হয়েছে সে ডালের ভার মানুষকে বইতে হয়; গাছে যে ডাল আছে সে ডাল মানুষের ভার বইতে পারে। এক থেকে বিচ্ছিন্ন যে অনেক তারই ভার মানুষের পক্ষে বোঝা; একের মধ্যে বিধৃত যে অনেক সেই তো মানুষকে সম্পূর্ণ আশ্রয় দিতে পারে।

সংসারে একদিকে আবশ্যকের ভিড়, অন্য দিকে অনাবশ্যকের। আবশ্যকের দায় আমাদের বহন করতেই হবে, তাতে আপত্তি করলে চলবে না। যেমন ঘরে থাকতে হলে দেয়াল না হলে চলে না, এও তেমনি। কিন্তু সবটাই তো দেয়াল নয়। অন্তত খানিকটা করে জানালা থাকে, সেই ফাঁক দিয়ে আমরা আকাশের সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা করি। কিন্তু, সংসারে দেখতে পাই, লোকে ঐ জানালাটুকু সইতে পারে না। ঐ ফাঁকটুকু ভরিয়ে দেবার জন্যে যতরকম সাংসারিক অনাবশ্যকের সৃষ্টি। ঐ জানালাটার উপর বাজে কাজ, বাজে চিঠি, বাজে সভা, বাজে বক্তৃতা, বাজে হাঁসফাঁস মেরে দিয়ে

দশে মিলে ঐ ফাঁকটাকে একেবারে বুজিয়ে ফেলা হয়। নারকেলের ছিবড়ের মতো, এই অনাবশ্যকের পরিমাণটাই বেশি। ঘরে বাইরে, ধর্মে কর্মে, আমোদে আহ্লাদে, সকল বিষয়েই এরই অধিকার সব চেয়ে বড়ো; এর কাজই হচ্ছে ফাঁক বুজিয়ে বেড়ানো।

কিন্তু, কথা ছিল ফাঁক বোজাব না, কেননা, ফাঁকের ভিতর দিয়ে ছাড়া পূর্ণকে পাওয়া যায় না। ফাঁকের ভিতর দিয়েই আলো আসে, হাওয়া আসে। কিন্তু, আলো হাওয়া আকাশ যে মানুষের তৈরি জিনিস নয়, তাই লোকালয় পারতপক্ষে তাদের জন্যে জায়গা রাখতে চায় না— তাই আবশ্যক বাদে যেটুকু নিরালা থাকে সেটুকু অনাবশ্যক দিয়ে ঠেসে ভরতি করে দেয়। এমনি করে মানুষ আপনার দিনগুলোকে তো নিরেট করে তুলেইছে, রাত্রিটাকেও যতখানি পারে ভরাট করে দেয়। ঠিক যেন কলকাতার ম্যুনিসিপ্যালিটির আইন। যেখানে যত পুকুর আছে বুজিয়ে ফেলতে হবে, রাবিশ দিয়ে হোক, যেমন করে হোক। এমন-কি, গঙ্গাকেও যতখানি পারা যায় পুল-চাপা, জেটি-চাপা, জাহাজ-চাপা দিয়ে গলা টিপে মারবার চেষ্টা। ছেলেবেলাকার কলকাতা মনে পড়ে; ঐ পুকুর-গুলোই ছিল আকাশের স্যাঙাত, শহরের মধ্যে ঐখানটাতে দ্যুলোক এবং ভূলোকে একটুখানি পা ফেলবার জায়গা পেত, ঐখানেই আকাশের আলোকের আতিথ্য করবার জন্য পৃথিবী আপন জলের আসনগুলি পেতে রেখেছিল।

আবশ্যকের একটা সুবিধা এই যে তার একটা সীমা আছে। সে সম্পূর্ণ বেতালা হতে পারে না; সে দশটা-চারটেকে স্বীকার করে, তার পার্বণের ছুটি আছে, সে রবিবারকে মানে, পারতপক্ষে রাত্রিকে সে ইলেকট্রিক লাইট দিয়ে একেবারে হেসে উড়িয়ে দিতে চায় না। কেননা, সে যেটুকু সময় নেয় আয়ু দিয়ে, অর্থ দিয়ে তার দাম চুকিয়ে দিতে হয়; সহজে কেউ তার অপব্যয় করতে পারে না। কিন্তু, অনাবশ্যকের তালমানের বোধ নেই; সে সময়কে উড়িয়ে দেয়, অসময়কে টিঁকতে দেয় না। সে সদর রাস্তা দিয়ে ঢোকে, খিড়কির রাস্তা দিয়ে ঢোকে, আবার জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ে। সে কাজের সময় দরজায় ঘা মারে, ছুটির সময় হুড়্‌মুড়্‌ করে আসে, রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তার কাজ নেই বলেই তার ব্যস্ততা আরও বেশি।

আবশ্যক কাজের পরিমাণ আছে, অনাবশ্যক কাজের পরিমাণ নেই; এইজন্যে অপরিমেয়ের আসনটি ঐ লক্ষ্মীছাড়াই জুড়ে বসে, ওকে ঠেলে ওঠানো দায় হয়। তখনই মনে হয়, দেশ ছেড়ে পালাই, সন্ন্যাসী হয়ে বেরই, সংসারে আর টেঁকা যায় না!

যাক্‌, যেমনি বেরিয়ে পড়েছি অমনি বুঝতে পেরেছি, বিরাট বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যে আনন্দের সম্বন্ধ সেটাকে দিনরাত অস্বীকার করে কোনো বাহাদুরি নেই। এই যে ঠেলাঠেলি ঠেসাঠেসি নেই অথচ সমস্ত কানায় কানায় ভরা, এইখানকার দর্পণটিতে যেন নিজের মুখের ছায়া দেখতে পেলুম। 'আমি আছি' এই কথাটা গলির মধ্যে, ঘরবাড়ির মধ্যে ভারি ভেঙে চুরে বিকৃত হয়ে দেখা দেয়। এই কথাটাকে এই সমুদ্রের উপর আকাশের উপর সম্পূর্ণ ছড়িয়ে দিয়ে দেখলে তবে তার মানে বুঝতে পারি; তখন আবশ্যককে ছাড়িয়ে, অনাবশ্যককে পেরিয়ে আনন্দলোকে তার অভ্যর্থনা দেখতে পাই; তখন স্পষ্ট করে বুঝি, ঋষি কেন মানুষদের অমৃতস্য পুত্রাঃ বলে আহ্বান করেছিলেন।

১১

সেই খিদিরপুরের ঘাট থেকে আরম্ভ করে আর এই হংকং-এর ঘাট পর্যন্ত, বন্দরে বন্দরে বাণিজ্যের চেহারা দেখে আসছি। সে যে কী প্রকাণ্ড, এমন করে তাকে চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। শুধু প্রকাণ্ড নয়, সে একটা জবড়জঙ্গ ব্যাপার। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে ব্যাধের আহারের যে বর্ণনা আছে— সে এক-এক গ্রাসে এক-এক তাল গিলছে, তার ভোজন উৎকট, তার শব্দ উৎকট, এও সেইরকম; এই বাণিজ্যব্যাধটাও হাঁসফাঁস করতে করতে এক-এক পিণ্ড মুখে যা পুরছে, সে দেখে ভয় হয়।

তার বিরাম নেই, আর তার শব্দই বা কী। লোহার হাত দিয়ে মুখে তুলছে, লোহার দাঁত দিয়ে চিবচ্ছে, লোহার পাকযন্ত্রে চিরপ্রদীপ্ত জঠরানলে হজম করছে এবং লোহার শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়ে তার জগৎজোড়া কলেবরের সর্বত্র সোনার রক্তস্রোত চালান করে দিচ্ছে।

একে দেখে মনে হয় যে, এ একটা জন্তু, এ যেন পৃথিবীর প্রথম যুগের দানব-জন্তুগুলোর মতো। কেবলমাত্র তার লেজের আয়তন দেখলেই শরীর আঁৎকে ওঠে। তার পরে, সে জলচর হবে, কি স্থলচর হবে, কি পাখি হবে, এখনো তা স্পষ্ট ঠিক হয় নি; সে খানিকটা সরীসৃপের মতো, খানিকটা বাদুড়ের মতো, খানিকটা গণ্ডারের মতো। অঙ্গসৌষ্ঠব বলতে যা বোঝায় তা তার কোথাও কিছুমাত্র নেই। তার গায়ের চামড়া ভয়ংকর স্থূল; তার থাবা যেখানে পড়ে সেখানে পৃথিবীর গায়ের কোমল সবুজ চামড়া উঠে গিয়ে একেবারে তার হাড় বেরিয়ে পড়ে; চলবার সময় তার বৃহৎ বিরূপ লেজটা যখন নড়তে থাকে তখন তার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সংঘর্ষ হয়ে এমন আওয়াজ হতে থাকে যে, দিগঙ্গনারা মূর্ছিত হয়ে পড়ে। তার পরে, কেবলমাত্র তার এই বিপুল দেহটা রক্ষা করবার জন্যে এত রাশি রাশি খাদ্য তার দরকার হয় যে, ধরিত্রী ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে। সে যে কেবলমাত্র থাবা থাবা জিনিস খাচ্ছে তা নয়, সে মানুষ খাচ্ছে— স্ত্রী পুরুষ ছেলে কিছুই সে বিচার করে না।

কিন্তু, জগতের সেই প্রথম যুগের দানব-জন্তুগুলো টিঁকল না। তাদের অপরিমিত বিপুলতাই পদে পদে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষি দেওয়াতে, বিধাতার আদালতে তাদের প্রাণদণ্ডের বিধান হল। সৌষ্ঠব জিনিসটা কেবলমাত্র সৌন্দর্যের প্রমাণ দেয় না, উপযোগিতারও প্রমাণ দেয়। হাঁসফাঁসটা যখন অত্যন্ত বেশি চোখে পড়ে, আয়তনটার মধ্যে যখন কেবলমাত্র শক্তি দেখি, শ্রী দেখি নে, তখন বেশ বুঝতে পারা যায়, বিশ্বের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য নেই : বিশ্বশক্তির সঙ্গে তার শক্তির নিরন্তর সংঘর্ষ হতে হতে একদিন তাকে হার মেনে হাল ছেড়ে তলিয়ে যেতে হবেই। প্রকৃতির গৃহিণীপনা কখনোই কদর্য অমিতাচারকে অধিক দিন সইতে পারে না; তার ঝাঁটা এসে পড়ল বলে। বাণিজ্য-দানবটা নিজের বিরূপতায়, নিজের প্রকাণ্ড ভারের মধ্যে নিজের প্রাণদণ্ড বহন করছে। একদিন আসছে যখন তার লোহার কঙ্কালগুলোকে আমাদের যুগের স্তরের মধ্যে থেকে আবিষ্কার করে পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা এই সর্বভুক দানবটার অদ্ভুত বিষমতা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করবে।

প্রাণীজগতে মানুষের যে যোগ্যতা, সে তার দেহের প্রাচুর্য নিয়ে নয়। মানুষের চামড়া নরম, তার গায়ের জোর অল্প, তার ইন্দ্রিয়শক্তিও পশুদের চেয়ে কম বৈ বেশি নয়। কিন্তু, সে এমন একটি বল পেয়েছে যা চোখে দেখা যায় না, যা জায়গা জোড়ে না, যা কোনো স্থানের উপর ভর না করেও সমস্ত জগতে আপন অধিকার বিস্তার করছে। মানুষের মধ্যে দেহপরিধি দৃশ্যজগৎ থেকে সরে গিয়ে অদৃশ্যের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। বাইবেলে আছে, যে নম্র সেই পৃথিবীকে অধিকার করবে; তার মানেই হচ্ছে, নম্রতার শক্তি বাইরে নয়, ভিতরে— সে যত কম আঘাত দেয় ততই সে জয়ী হয়। সে রণক্ষেত্রে লড়াই করে না; অদৃশ্যলোকে বিশ্বশক্তির সঙ্গে সন্ধি করে সে জয়ী হয়।

বাণিজ্যদানবকেও একদিন তার দানবলীলা সংবরণ করে মানব হতে হবে। আজ এই বাণিজ্যের মস্তিষ্ক কম, ওর হৃদয় তো একেবারেই নেই; সেইজন্যে পৃথিবীতে ও কেবল আপনার ভার বাড়িয়ে চলেছে। কেবলমাত্র প্রাণপণ শক্তিতে আপনার আয়তনকে বিস্তীর্ণতর করে করেই ও জিততে চাচ্ছে। কিন্তু, একদিন যে জয়ী হবে তার আকার ছোটো, তার কর্মপ্রণালী সহজ; মানুষের হৃদয়কে, সৌন্দর্যবোধকে, ধর্মবুদ্ধিকে সে মানে; সে নম্র, সে সুশ্রী, সে কদর্যভাবে লুব্ধ নয়; তার প্রতিষ্ঠা অন্তরের সুব্যবস্থায়, বাইরের আয়তনে না; সে কাউকে বঞ্চিত করে বড়ো নয়, সে সকলের সঙ্গে সন্ধি করে বড়ো। আজকের দিনে পৃথিবীতে মানুষের সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে এই বাণিজ্যের অনুষ্ঠান সব চেয়ে কুশ্রী; আপন ভারের দ্বারা পৃথিবীকে সে ক্লান্ত করছে, আপন শব্দের দ্বারা পৃথিবীকে বধির করছে, আপন আবর্জনার দ্বারা পৃথিবীকে মলিন করছে, আপন লোভের দ্বারা পৃথিবীকে আহত করছে। এই যে পৃথিবীব্যাপী কুশ্রীতা, এই যে বিদ্রোহ— রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ এবং মানবহৃদয়ের বিরুদ্ধে— এই যে লোভকে বিশ্বের রাজসিংহাসনে বসিয়ে তার কাছে

দাসখত লিখে দেওয়া, এ প্রতিদিনই মানুষের শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বকে আঘাত করছেই, তার সন্দেহ নেই। মুনফার নেশায় উন্মত্ত হয়ে এই বিশ্বব্যাপী দ্যূতক্রীড়ায় মানুষ নিজেকে পণ রেখে কতদিন খেলা চালাবে? এ খেলা ভাঙতেই হবে। যে-খেলায় মানুষ লাভ করবার লোভে নিজেকে লোকসান করে চলেছে, সে কখনোই চলবে না।

৯ই জ্যৈষ্ঠ। মেঘ বৃষ্টি বাদল কুয়াশায় আকাশ ঝাপসা হয়ে আছে; হংকং বন্দরের পাহাড়গুলো দেখা দিয়েছে, তাদের গা বেয়ে বেয়ে ঝরনা ঝরে পড়ছে। মনে হচ্ছে, দৈত্যের দল সমুদ্রে ডুব দিয়ে তাদের ভিজে মাথা জলের উপর তুলছে, তাদের জটা বেয়ে দাড়ি বেয়ে জল ঝরছে। এন্ড্রুজ সাহেব বলছেন, দৃশ্যটা যেন পাহাড়-ঘেরা স্কটল্যান্ডের হ্রদের মতো; তেমনিতরো ঘন সবুজ বেঁটে বেঁটে পাহাড়, তেমনিতরো ভিজে কম্বলের মতো আকাশের মেঘ, তেমনিতরো কুয়াশার ন্যাতা বুলিয়ে অল্প অল্প মুছে ফেলা জলস্থলের মূর্তি। কাল সমস্ত রাত বৃষ্টি বাতাস গিয়েছে; কাল বিছানা আমার ভার বহন করে নি, আমিই বিছানাটাকে বহন করে ডেকের এধার থেকে ওধারে আশ্রয় খুঁজে খুঁজে ফিরেছি। রাত যখন সাড়ে দুপুর হবে, তখন এই বাদলের সঙ্গে মিথ্যা বিরোধ করবার চেষ্টা না করে তাকে প্রসন্ন মনে মেনে নেবার জন্যে প্রস্তুত হলুম। একধারে দাঁড়িয়ে ঐ বাদলার সঙ্গে তান মিলিয়েই গান ধরলুম—'শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে'। এমনি করে ফিরে ফিরে অনেকগুলো গান গাইলুম, বানিয়ে বানিয়ে একটা নতুন গানও তৈরি করলুম, কিন্তু বাদলের সঙ্গে কবির লড়াইয়ে এই মর্ত্যবাসীকেই হার মানতে হল। আমি অত দম পাব কোথায়, আর আমার কবিত্বের বাতিক যতই প্রবল হোক-না, বায়ুবলে আকাশের সঙ্গে পেরে উঠব কেন?

কাল রাত্রেই জাহাজের বন্দরে পেঁছবার কথা ছিল, কিন্তু এইখানটায় সমুদ্রবাহী জলের স্রোত প্রবল হয়ে উঠল এবং বাতাসও বিরুদ্ধ ছিল, তাই পদে পদে দেরি হতে লাগল। জায়গাটাও সংকীর্ণ ও সংকটময়। কাপ্তেন সমস্ত রাত জাহাজের উপরতলায় গিয়ে সাবধানে পথের হিসাব করে চলেছেন। আজ সকালেও মেঘবৃষ্টির বিরাম নেই। সূর্য দেখা দিল না, তাই পথ ঠিক করা কঠিন। মাঝে মাঝে ঘণ্টা বেজে উঠছে, এঞ্জিন থেমে যাচ্ছে, নাবিকের দ্বিধা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আজ সকালে আহারের টেবিলে কাপ্তেনকে দেখা গেল না। কাল রাত দুপুরের সময় কাপ্তেন একবার কেবল বর্ষাতি পরে নেমে এসে আমাকে বলে গেলেন, ডেকের কোনো দিকেই শোবার সুবিধা হবে না, কেননা, বাতাসের বদল হচ্ছে।

এর মধ্যে একটি ব্যাপার দেখে আমার মনে বড়ো আনন্দ হয়েছিল। জাহাজের উপর থেকে একটা দড়িবাঁধা চামড়ার চোঙে করে মাঝে মাঝে সমুদ্রের জল তোলা হয়। কাল বিকেলে একসময় মুকুলের হঠাৎ জানতে ইচ্ছা হল, এর কারণটা কী। সে তখনই উপরতলায় উঠে গেল। এই উপর-তলাতেই জাহাজের হালের চাকা, এবং এখানেই পথনির্ণয়ের সমস্ত যন্ত্র। এখানে যাত্রীদের যাওয়া নিষেধ। মুকুল যখন গেল তখন তৃতীয় অফিসার কাজে নিযুক্ত। মুকুল তাঁকে প্রশ্ন করতেই তিনি ওকে বোঝাতে শুরু করলেন। সমুদ্রের মধ্যে অনেকগুলি স্রোতের ধারা বইছে, তাদের উত্তাপের পরিমাণ স্বতন্ত্র। মাঝে মাঝে সমুদ্রের জল তুলে তাপমান দিয়ে পরীক্ষা করে সেই ধারাপথ নির্ণয় করা দরকার। সেই ধারার ম্যাপ বের করে তাদের গতিবেগের সঙ্গে জাহাজের গতিবেগের কী রকম কাটাকাটি হচ্ছে, তাই তিনি মুকুলকে বোঝাতে লাগলেন। তাতেও যখন সুবিধা হল না, তখন বোর্ডে খড়ি দিয়ে এঁকে ব্যাপারটাকে যথাসম্ভব সরল করে দিলেন।

বিলিতি জাহাজে মুকুলের মতো বালকের পক্ষে এটা কোনোমতেই সম্ভবপর হত না; সেখানে ওকে অত্যন্ত সোজা করেই বুঝিয়ে দিত যে, ও জায়গায় তার নিষেধ। মোটের উপর জাপানি অফিসারের সৌজন্য, কাজের নিয়ম-বিরুদ্ধ। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, এই জাপানি জাহাজে কাজের নিয়মের ফাঁক দিয়ে মানুষের গতিবিধি আছে। অথচ নিয়মটা চাপা পড়ে যায় নি, তাও বার বার দেখেছি। জাহাজ যখন বন্দরে স্থির ছিল, যখন উপরতলার কাজ বন্ধ, তখন সেখানে বসে কাজ করবার জন্যে আমি কাপ্তেনের সম্মতি পেয়েছিলুম। সেদিন পিয়ার্সন সাহেব দুজন ইংরেজ আলাপীকে

জাহাজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ডেকের উপর মাল তোলার শব্দে আমাদের প্রস্তাব উঠল, উপরের তলায় যাওয়া যাক। আমি সম্মতির জন্য প্রধান অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলুম; তিনি তখনই বললেন, 'না।' নিয়ে গেলে কাজের ক্ষতি হত না, কেননা, কাজ তখন বন্ধ ছিল। কিন্তু নিয়মভঙ্গের একটা সীমা আছে, সে সীমা বন্ধুর পক্ষে যেখানে অপরিচিতের পক্ষে সেখানে না। উপরের তলা ব্যবহারের সম্মতিতেও আমি যেমন খুশি হয়েছিলুম, তার বাধাতেও তেমনি খুশি হলুম। স্পষ্ট দেখতে পেলুম, এর মধ্যে দাক্ষিণ্য আছে, কিন্তু দুর্বলতা নেই।

বন্দরে পৌঁছবামাত্র জাপান থেকে কয়েকখানি অভ্যর্থনার টেলিগ্রাম ও পত্র পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে প্রধান অফিসার এসে আমাকে বললেন, এ-যাত্রায় আমাদের সাংঘাই যাওয়া হল না, একেবারে এখান থেকে জাপান যাওয়া হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন? তিনি বললেন, জাপান-বাসীরা আপনাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে, তাই আমাদের সদর আপিস থেকে টেলিগ্রামে আদেশ এসেছে, অন্য বন্দরে বিলম্ব না করে চলে যেতে। সাংঘাইয়ের সমস্ত মাল আমরা এইখানেই নামিয়ে দেব, অন্য জাহাজে করে সেখানে যাবে।

এই খবরটি আমার পক্ষে যতই গৌরবজনক হোক, এখানে লেখবার দরকার ছিল না। কিন্তু আমার লেখবার কারণ হচ্ছে এই যে, এই ব্যাপারের একটু বিশেষত্ব আছে; সেটা আলোচ্য। সেটা পুনশ্চ ঐ একই কথা। অর্থাৎ ব্যাবসার দাবি সচরাচর যে-পাথরের পাঁচিল খাড়া ক'রে আত্মরক্ষা করে, এখানে তার মধ্যে দিয়েও মানবসম্বন্ধের আনাগোনার পথ আছে। এবং সে পথ কম প্রশস্ত নয়।

জাহাজ এখানে দিন দুয়েক থাকবে। সেই দুদিনের জন্যে শহরে নেবে হোটেলে থাকবার প্রস্তাব আমার মনে নিলে না। আমার মতো কুঁড়ে মানুষের পক্ষে আরামের চেয়ে বিরাম ভালো; আমি বলি, সুখের ল্যাঠা অনেক, সোয়াস্তির বালাই নেই। আমি মাল তোলা-নামার উপদ্রব স্বীকার করেও জাহাজে রয়ে গেলুম। সেজন্যে আমার যে বকশিশ মেলে নি, তা নয়।

প্রথমেই চোখে পড়ল জাহাজের ঘাটে চীনা মজুরদের কাজ। তাদের একটা করে নীল পায়জামা পরা এবং গা খোলা। এমন শরীরও কোথাও দেখি নি, এমন কাজও না। একেবারে প্রাণসার দেহ, লেশমাত্র বাহুল্য নেই। কাজের তালে তালে সমস্ত শরীরের মাংসপেশী কেবলই ঢেউ খেলাচ্ছে। এরা বড়ো বড়ো বোঝাকে এমন সহজে এবং এমন দ্রুত আয়ত্ত করেছে যে সে দেখে আনন্দ হয়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও অনিচ্ছা, অবসাদ বা জড়ত্বের লেশমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না। বাইরে থেকে তাড়া দেবার কোনো দরকার নেই। তাদের দেহের বীণাযন্ত্র থেকে কাজ যেন সংগীতের মতো বেজে উঠছে। জাহাজের ঘাটে মাল তোলা-নামার কাজ দেখতে যে আমার এত আনন্দ হবে, এ কথা আমি পূর্বে মনে করতে পারতুম না। পূর্ণ শক্তির কাজ বড়ো সুন্দর, তার প্রত্যেক আঘাতে আঘাতে শরীরকে সুন্দর করতে থাকে, এবং সেই শরীরও কাজকে সুন্দর করে তোলে। এইখানে কাজের কাব্য এবং মানুষের শরীরের ছন্দ আমার সামনে বিস্তীর্ণ হয়ে দেখা দিলে। এ কথা জোর করে বলতে পারি, ওদের দেহের চেয়ে কোনো স্ত্রীলোকের দেহ সুন্দর হতে পারে না, কেননা, শক্তির সঙ্গে সুষমার এমন নিখুঁত সংগতি মেয়েদের শরীরে নিশ্চয়ই দুর্লভ। আমাদের জাহাজের ঠিক সামনেই আর-একটা জাহাজে বিকেল বেলায় কাজকর্মের পর সমস্ত চীনা মাল্লা জাহাজের ডেকের উপর কাপড় খুলে ফেলে স্নান করছিল; মানুষের শরীরে যে কী স্বর্গীয় শোভা তা আমি এমন করে আর কোনোদিন দেখতে পাই নি।

কাজের শক্তি, কাজের নৈপুণ্য এবং কাজের আনন্দকে এমন পুঞ্জীভূতভাবে একত্র দেখতে পেয়ে আমি মনে মনে বুঝতে পারলুম, এই বৃহৎ জাতির মধ্যে কতখানি ক্ষমতা সমস্ত দেশ জুড়ে সঞ্চিত হচ্ছে। এখানে মানুষ পূর্ণপরিমাণে নিজেকে প্রয়োগ করবার জন্যে বহুকাল থেকে প্রস্তুত হচ্ছে। যে সাধনায় মানুষ আপনাকে আপনি ষোলো-আনা ব্যবহার করবার শক্তি পায়, তার কৃপণতা ঘুচে যায়, নিজেকে নিজে কোনো অংশে ফাঁকি দেয় না, সে যে মস্ত সাধনা। চীন সুদীর্ঘকাল সেই

সাধনায় পূর্ণভাবে কাজ করতে শিখেছে, সেই কাজের মধ্যেই তার নিজের শক্তি উদারভাবে আপনার মুক্তি এবং আনন্দ পাচ্ছে—এ একটি পরিপূর্ণতার ছবি। চীনের এই শক্তি আছে বলেই আমেরিকা চীনকে ভয় করেছে, কাজের উদ্যমে চীনকে সে জিততে পারে না, গায়ের জোরে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়।

এই এত বড়ো একটা শক্তি যখন আমাদের আধুনিক কালের বাহনকে পাবে, অর্থাৎ যখন বিজ্ঞান তার আয়ত্ত হবে, তখন পৃথিবীতে তাকে বাধা দিতে পারে এমন কোন্ শক্তি আছে। তখন তার কর্মের প্রতিভার সঙ্গে তার উপকরণের যোগসাধন হবে। এখন যে-সব জাতি পৃথিবীর সম্পদ ভোগ করছে তারা চীনের সেই অভ্যুত্থানকে ভয় করে, সেই দিনকে তারা ঠেকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু, যে জাতির যেদিকে যতখানি বড়ো হবার শক্তি আছে, সেদিকে তাকে ততখানি বড়ো হয়ে উঠতে দিতে বাধা দেওয়া যে-স্বজাতিপূজা থেকে জন্মেছে তার মতো এমন সর্বনেশে পূজা জগতে আর কিছুই নেই। এমন বর্বর জাতির কথা শোনা যায় যারা নিজের দেশের দেবতার কাছে পরদেশের মানুষকে বলি দেয়; আধুনিক কালের স্বজাতীয়তা তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ানক জিনিস, সে নিজের ক্ষুধার জন্যে এক-একটা জাতিকে-জাতি দেশকে-দেশ দাবি করে।

আমাদের জাহাজের বাঁ পাশে চীনের নৌকার দল। সেই নৌকাগুলিতে স্বামী স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে সকলে মিলে বাস করছে এবং কাজ করছে। কাজের এই ছবিই আমার কাছে সকলের চেয়ে সুন্দর লাগল। কাজের এই মূর্তিই চরম মূর্তি, একদিন এরই জয় হবে। না যদি হয়, বাণিজ্যদানব যদি মানুষের ঘরকরনা স্বাধীনতা সমস্তই গ্রাস করে চলতে থাকে, এবং বৃহৎ এক দাসসম্প্রদায়কে সৃষ্টি করে তোলে তারই সাহায্যে অল্প কয়জনের আরাম এবং স্বার্থ সাধন করতে থাকে, তা হলে পৃথিবী রসাতলে যাবে। এদের মেয়ে পুরুষ ছেলে সকলে মিলে কাজ করবার এই ছবি দেখে আমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। ভারতবর্ষে এই ছবি কবে দেখতে পাব? সেখানে মানুষ আপনার বারো-আনাকে ফাঁকি দিয়ে কাটাচ্ছে। এমন সব নিয়মের জাল, যাতে মানুষ কেবলই বেধে-বেধে গিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে পড়েই নিজের অধিকাংশ শক্তির বাজে খরচ করে এবং বাকি অধিকাংশকে কাজে খাটাতে পারে না—এমন বিপুল জটিলতা এবং জড়তার সমাবেশ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। চারি দিকে কেবলই জাতির সঙ্গে জাতির বিচ্ছেদ, নিয়মের সঙ্গে কাজের বিরোধ, আচারধর্মের সঙ্গে কালধর্মের দ্বন্দ্ব।

চীন সমুদ্র
তোসামারু জাহাজ

১২

১৬ই জ্যৈষ্ঠ। আজ জাহাজ জাপানের 'কোবে' বন্দরে পৌঁছবে। কয়দিন বৃষ্টিবাদলের বিরাম নেই। মাঝে মাঝে জাপানের ছোটো ছোটো দ্বীপ আকাশের দিকে পাহাড় তুলে সমুদ্রযাত্রীদের ইশারা করছে, কিন্তু বৃষ্টিতে কুয়াশাতে সমস্ত ঝাপসা; বাদলার হাওয়ায় সর্দিকাশি হয়ে গলা ভেঙে গেলে তার আওয়াজ যেরকম হয়ে থাকে, ঐ দ্বীপগুলোর সেইরকম ঘোরতর সর্দির আওয়াজের চেহারা। বৃষ্টির ছাঁট এবং ভিজে হাওয়ার তাড়া এড়াবার জন্যে ডেকের এধার থেকে ওধারে চৌকি টেনে নিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি।

আমাদের সঙ্গে যে জাপানি যাত্রী দেশে ফিরছেন তিনি আজ ভোরেই তাঁর ক্যাবিন ছেড়ে একবার ডেকের উপর উঠে এসেছেন, জাপানের প্রথম অভ্যর্থনা গ্রহণ করবার জন্যে। তখন কেবল একটি মাত্র ছোটো নীলাভ পাহাড় মানসসরোবরের মস্ত একটি নীল পদ্মের কুঁড়িটির মতো জলের উপরে জেগে রয়েছে। তিনি স্থির নেত্রে এইটুকু কেবল দেখে নীচে নেবে গেলেন; তাঁর সেই চোখে ঐ পাহাড়টুকুকে দেখা আমাদের শক্তিতে নেই—আমরা দেখছি নূতনকে, তিনি দেখছেন

তাঁর চিরন্তনকে; আমরা অনেক তুচ্ছকে বাদ দিয়ে দিয়ে দেখছি, তিনি ছোটো বড়ো সমস্তকেই তাঁর এক বিরাটের অঙ্গ করে দেখছেন; এইজন্যেই ছোটোও তাঁর কাছে বড়ো, ভাঙাও তাঁর কাছে জোড়া, অনেক তাঁর কাছে এক। এই দৃষ্টিই সত্য দৃষ্টি।

জাহাজ যখন একেবারে বন্দরে এসে পৌঁছল তখন মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য উঠেছে। বড়ো বড়ো জাপানি অপ্সরা নৌকা আকাশে পাল উড়িয়ে দিয়ে, যেখানে বরুণদেবের সভাপ্রাঙ্গণে সূর্যদেবের নিমন্ত্রণ হয়েছে, সেইখানে নৃত্য করছে। প্রকৃতির নাট্যমঞ্চে বাদলার যবনিকা উঠে গিয়েছে; ভাবলুম, এইবার ডেকের উপরে রাজার হালে বসে সমুদ্রের তীরে জাপানের প্রথম প্রবেশটা ভালো করে দেখে নিই।

কিন্তু, সে কি হবার জো আছে? নিজের নামের উপমা গ্রহণ করতে যদি কোনো অপরাধ না থাকে তা হলে বলি, আমার আকাশের মিতা যখন খালাস পেয়েছেন তখন আমার পালা আরম্ভ হল। আমার চারি দিকে একটু কোথাও ফাঁক দেখতে পেলুম না। খবরের কাগজের চর তাদের প্রশ্ন এবং তাদের ক্যামেরা নিয়ে আমাকে আচ্ছন্ন করে দিলে।

কোবে শহরে অনেকগুলি ভারতবর্ষীয় বণিক আছেন, তার মধ্যে বাঙালির ছিটেফোঁটাও কিছু পাওয়া যায়। আমি হংকং শহরে পৌঁছেই এই ভারতবাসীদের টেলিগ্রাম পেয়েছিলুম, তাঁরাই আমার আতিথ্যের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁরা জাহাজে গিয়ে আমাকে ধরলেন। ওদিকে জাপানের বিখ্যাত চিত্রকর টাইক্কন এসে উপস্থিত। ইনি যখন ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন, আমাদের বাড়িতে ছিলেন। কাট্‌স্‌টাকেও দেখা গেল, ইনিও আমাদের চিত্রকর বন্ধু। সেইসঙ্গে সানো এসে উপস্থিত, ইনি এককালে আমাদের শান্তিনিকেতন আশ্রমে জুজুৎসু ব্যায়ামের শিক্ষক ছিলেন। এর মধ্যে কাওয়া-গুচিরও দর্শন পাওয়া গেল। এটা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, আমাদের নিজের ভাবনা আর ভাবতে হবে না। কিন্তু দেখতে পেলুম, সেই ভাবনার ভার অনেকে মিলে যখন গ্রহণ করেন তখন ভাবনার আর অন্ত থাকে না। আমাদের প্রয়োজন অল্প, কিন্তু আয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি হয়ে উঠল। জাপানি পক্ষ থেকে তাঁদের ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে টানাটানি করতে লাগলেন, কিন্তু ভারতবাসীর আমন্ত্রণ আমি পূর্বেই গ্রহণ করেছি। এই নিয়ে বিষম একটা সংকট উপস্থিত হল। কোনো পক্ষই হার মানতে চান না। বাদ-বিতণ্ডা বচসা চলতে লাগল। আবার, এরই সঙ্গে সঙ্গে সেই খবরের কাগজের চরের দল আমার চারি দিকে পাক খেয়ে বেড়াতে লাগল। দেশ ছাড়বার মুখে বঙ্গসাগরে পেয়েছিলুম বাতাসের সাইক্লোন, এখানে জাপানের ঘাটে এসে পৌঁছেই পেলুম মানুষের সাইক্লোন। দুটোর মধ্যে যদি বাছাই করতেই হয়, আমি প্রথমটাই পছন্দ করি। খ্যাতি জিনিসের বিপদ এই যে, তার মধ্যে যতটুকু আমার দরকার কেবলমাত্র সেইটুকু গ্রহণ করেই নিষ্কৃতি নেই, তার চেয়ে অনেক বেশি নিতে হয়, সেই বেশিটুকুর বোঝা বিষম বোঝা। অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টির মধ্যে কোন্‌টা যে ফসলের পক্ষে বেশি মুশকিল জানি নে।

এখানকার একজন প্রধান গুজরাটি বণিক মোরারজি, তাঁরই বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছি। সেই-সব খবরের কাগজের অনুচররা এখানে এসেও উপস্থিত। বহুকষ্টে ব্যূহ ভেদ করে বেরোতে পেরেছি।

এই উৎপাতটা আশা করি নি। জাপান যে নতুন মদ পান করেছে এই খবরের কাগজের ফেনিলতা তারই একটা অঙ্গ। এত ফেনা আমেরিকাতেও দেখি নি। এই জিনিসটা কেবলমাত্র কথার হাওয়ার বুদ্‌বুদপুঞ্জ—এতে কারও সত্যকার প্রয়োজনও দেখি নে, আমোদও বুঝি নে; এতে কেবলমাত্র পাত্রটার মাথা শূন্যতায় ভরতি করে দেয়, মাদকতার ছবিটাকে কেবল চোখের সামনে প্রকাশ করে। এই মাতলামিটাই আমাকে সব চেয়ে পীড়া দেয়। যাক গে।

মোরারজির বাড়িতে আহারে আলাপে অভ্যর্থনায় কাল রাত্তিরটা কেটেছে। এখানকার ঘরকন্নার মধ্যে প্রবেশ করে সব চেয়ে চোখে পড়ে জাপানি দাসী! মাথায় একখানা ফুলে-ওঠা খোঁপা, গালদুটো ফুলো ফুলো, চোখদুটো ছোটো, নাকের একটুখানি অপ্রতুলতা, কাপড় বেশ সুন্দর, পায়ে খড়ের চটি—কবিরা সৌন্দর্যের যে-রকম বর্ণনা করে থাকেন তার সঙ্গে অনৈক্য ঢের, অথচ মোটের

উপর দেখতে ভালো লাগে; যেন মানুষের সঙ্গে পুতুলের সঙ্গে, মাংসের সঙ্গে মোমের সঙ্গে মিশিয়ে একটা পদার্থ; আর সমস্ত শরীরে ক্ষিপ্রতা, নৈপুণ্য, বলিষ্ঠতা। গৃহস্বামী বলেন, এরা যেমন কাজের, তেমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমি আমার অভ্যাসবশত ভোরে উঠে জানালার বাইরে চেয়ে দেখলুম, প্রতিবেশীদের বাড়িতে ঘরকন্নার হিল্লোল তখন জাগতে আরম্ভ করেছে—সেই হিল্লোল মেয়েদের হিল্লোল। ঘরে ঘরে এই মেয়েদের কাজের ঢেউ এমন বিচিত্র বৃহৎ এবং প্রবল করে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু, এটা দেখলেই বোঝা যায়, এমন স্বাভাবিক আর কিছু নেই। দেহযাত্রা জিনিসটার ভার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মেয়েদেরই হাতে; এই দেহযাত্রার আয়োজন উদ্যোগ মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সুন্দর। কাজের এই নিয়ত তৎপরতায় মেয়েদের স্বভাব যথার্থ মুক্তি পায় বলে শ্রী লাভ করে। বিলাসের জড়তায় কিংবা যে-কারণেই হোক, মেয়েরা যেখানে এই কর্মপরতা থেকে বঞ্চিত সেখানে তাদের বিকার উপস্থিত হয়, তাদের দেহমনের সৌন্দর্যহানি হতে থাকে, এবং তাদের যথার্থ আনন্দের ব্যাঘাত ঘটে। এই যে এখানে সমস্তক্ষণ ঘরে ঘরে ক্ষিপ্রবেগে মেয়েদের হাতের কাজের স্রোত অবিরত বইছে, এ আমার দেখতে ভারি সুন্দর লাগছে। মাঝে মাঝে পাশের ঘর থেকে এদের গলার আওয়াজ এবং হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছি, আর মনে মনে ভাবছি, মেয়েদের কথা ও হাসি সকল দেশেই সমান। অর্থাৎ সে যেন স্রোতের জলের উপরকার আলোর মতো একটা ঝিকিমিকি ব্যাপার, জীবনচাঞ্চল্যের অহেতুক লীলা।

কোবে

১৩

নতুনকে দেখতে হলে, মনকে একটু বিশেষ করে বাতি জ্বালাতে হয়। পুরোনোকে দেখতে হলে, ভালো করে চোখ মেলতেই হয় না। সেইজন্যে নূতনকে যত শীঘ্র পারে দেখে নিয়ে, মন আপনার অতিরিক্ত বাতিগুলো নিবিয়ে ফেলে। খরচ বাঁচাতে চায়, মনোযোগকে উসকে রাখতে চায় না।

মুকুল আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, 'দেশে থাকতে বই পড়ে, ছবি দেখে জাপানকে যেরকম বিশেষভাবে নতুন বলে মনে হত, এখানে কেন তা হচ্ছে না।' তার কারণই এই। রেঙ্গুন থেকে আরম্ভ করে সিঙাপুর, হংকং দিয়ে আসতে আসতে মনের নতুন দেখার বিশেষ আয়োজনটুকু ক্রমে ক্রমে ফুরিয়ে আসে। যখন বিদেশী সমুদ্রের এ কোণে ও কোণে ন্যাড়া ন্যাড়া পাহাড়গুলো উঁকি মারতে থাকে তখন বলতে থাকি, বাঃ! তখন মুকুল বলে, ঐখানে নেবে গিয়ে থাকতে বেশ মজা! ও মনে করে, এই নতুনকে প্রথম দেখার উত্তেজনা বুঝি চিরদিনই থাকবে; ওখানে ঐ ছোটো ছোটো পাহাড়গুলোর সঙ্গে গলা-ধরাধরি করে সমুদ্র বুঝি চিরদিনই এই নতুন ভাষায় কানাকানি করে; যেন ঐখানে পৌঁছলে পরে সমুদ্রের চঞ্চলনীল, আকাশের শান্তনীল আর ঐ পাহাড়গুলোর ঝাপসানীল ছাড়া আর কিছুর দরকারই হয় না। তার পরে, বিরল ক্রমে অবিরল হতে লাগল, ক্ষণে ক্ষণে আমাদের জাহাজ এক-একটা দ্বীপের গা ঘেঁষে চলল; তখন দেখি দূরবীন টেবিলের উপরে অনাদরে পড়ে থাকে, মন আর সাড়া দেয় না। যখন দেখবার সামগ্রী বেড়ে ওঠে তখন দেখাটাই কমে যায়। নূতনকে ভোগ করে নতুনের খিদে ক্রমে কমে যায়।

হপ্তাখানেক জাপানে আছি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অনেক দিন আছি। তার মানে, পথঘাট, গাছপালা, লোকজনের যেটুকু নূতন সেইটুকু তেমন গভীর নয়, তাদের মধ্যে যেটা পুরোনো সেইটেই পরিমাণে বেশি। অফুরান নতুন কোথাও নেই; অর্থাৎ, যার সঙ্গে আমাদের চিরপরিচিত খাপ খায় না, জগতে এমন অসংগত কিছুই নেই। প্রথমে ধাঁ করে চোখে পড়ে, যেগুলো হঠাৎ আমাদের মনের অভ্যাসের সঙ্গে মেলে না। তার পরে পুরোনোর সঙ্গে নতুনের যে যে অংশের রঙে মেলে, চেহারায়

কাছাকাছি আসে, মন তাড়াতাড়ি সেইগুলোকে পাশাপাশি সাজিয়ে নিয়ে তাদের সঙ্গে ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। তাস খেলতে বসে আমরা হাতে কাগজ পেলে রঙ এবং মূল্য-অনুসারে তাদের পরে পরে সাজিয়ে নিই; এও সেইরকম। শুধু তো নতুনকে দেখে যাওয়া নয়, তার সঙ্গে যে ব্যবহার করতে হবে; কাজেই মন তাকে নিজের পুরোনো কাঠামোর মধ্যে যত শীঘ্র পারে গুছিয়ে নেয়। যেই গোছানো হয় তখন দেখতে পাই, তত বেশি নতুন নয় যতটা গোড়ায় মনে হয়েছিল; আসলে পুরোনো, ভঙ্গিটাই নতুন।

তার পরে আর-এক মুশকিল হয়েছে এই যে, দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীর সকল সভ্য জাতই বর্তমান কালের ছাঁচে ঢালাই হয়ে একই রকম চেহারা অথবা চেহারার অভাব ধারণ করেছে। আমার এই জানালায় বসে কোবে শহরের দিকে তাকিয়ে এই যা দেখছি এ তো লোহার জাপান, এ তো রক্তমাংসের নয়। এক দিকে আমার জানালা, আর-এক দিকে সমুদ্র, এর মাঝখানে শহর। চীনেরা যেরকম বিকটমূর্তি ড্র্যাগন আঁকে—সেইরকম। আঁকাবাঁকা বিপুল দেহ নিয়ে সে যেন সবুজ পৃথিবীটিকে খেয়ে ফেলেছে। গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি লোহার চালগুলো ঠিক যেন তারই পিঠের আঁশের মতো রৌদ্রে ঝক্‌ঝক্ করছে। বড়ো কঠিন, বড়ো কুৎসিত—এই দরকার-নামক দৈত্যটা। প্রকৃতির মধ্যে মানুষের যে অন্ন আছে তা ফলে শস্যে বিচিত্র এবং সুন্দর; কিন্তু সেই অন্নকে যখন গ্রাস করতে যাই তখন তাকে তাল পাকিয়ে একটা পিণ্ড করে তুলি, তখন বিশেষত্বকে দরকারের চাপে পিষে ফেলি। কোবে শহরের পিঠের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি, মানুষের দরকার পদার্থটা স্বভাবের বিচিত্রতাকে একাকার করে দিয়েছে। মানুষের দরকার আছে, এই কথাটাই ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে, হাঁ করতে করতে, পৃথিবীর অধিকাংশকে গ্রাস করে ফেলছে। প্রকৃতিও কেবল দরকারের সামগ্রী, মানুষও কেবল দরকারের মানুষ হয়ে আসছে।

যেদিন থেকে কলকাতা ছেড়ে বেরিয়েছি, ঘাটে ঘাটে দেশে দেশে এইটেই খুব বড়ো করে দেখতে পাচ্ছি। মানুষের দরকার মানুষের পূর্ণতাকে যে কতখানি ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এর আগে কোনো দিন আমি সেটা এমন স্পষ্ট করে দেখতে পাই নি। এক সময়ে মানুষ এই দরকারকে ছোটো করে দেখেছিল। ব্যাবসাকে তারা নীচের জায়গা দিয়েছিল; টাকা রোজগার করাটাকে সম্মান করে নি। দেবপূজা করে, বিদ্যাদান করে, আনন্দ দান করে যারা টাকা নিয়েছে মানুষ তাদের ঘৃণা করেছে। কিন্তু আজকাল জীবনযাত্রা এতই বেশি দুঃসাধ্য, এবং টাকার আয়তন ও শক্তি এতই বেশি বড়ো হয়ে উঠেছে যে, দরকার এবং দরকারের বাহনগুলোকে মানুষ আর ঘৃণা করতে সাহস করে না। এখন মানুষ আপনার সকল জিনিসেরই মূল্যের পরিমাণ টাকা দিয়ে বিচার করতে লজ্জা করে না। এতে করে সমস্ত মানুষের প্রকৃতি বদল হয়ে আসছে—জীবনের লক্ষ্য এবং গৌরব, অন্তর থেকে বাইরের দিকে, আনন্দ থেকে প্রয়োজনের দিকে অত্যন্ত ঝুঁকে পড়ছে। মানুষ ক্রমাগত নিজেকে বিক্রি করতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করছে না। ক্রমশই সমাজের এমন একটা বদল হয়ে আসছে যে, টাকাই মানুষের যোগ্যতারূপে প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ, এটা কেবল দায়ে পড়ে ঘটছে, প্রকৃতপক্ষে এটা সত্য নয়। তাই, একসময়ে যে-মানুষ মনুষ্যত্বের খাতিরে টাকাকে অবজ্ঞা করতে জানত এখন সে টাকার খাতিরে মনুষ্যত্বকে অবজ্ঞা করছে। রাজ্যতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে, ঘরে বাইরে, সর্বত্রই তার পরিচয় কুৎসিত হয়ে উঠছে। কিন্তু, বীভৎসতাকে দেখতে পাচ্ছি নে, কেননা, লোভে দুই চোখ আচ্ছন্ন।

জাপানে শহরের চেহারায় জাপানিত্ব বিশেষ নেই, মানুষের সাজসজ্জা থেকেও জাপান ক্রমশ বিদায় নিচ্ছে। অর্থাৎ, জাপান ঘরের পোশাক ছেড়ে আপিসের পোশাক ধরেছে। আজকাল পৃথিবী-জোড়া একটা আপিস-রাজ্য বিস্তীর্ণ হয়েছে, সেটা কোনো বিশেষ দেশ নয়। যেহেতু আপিসের সৃষ্টি আধুনিক য়ুরোপ থেকে, সেইজন্যে এর বেশ আধুনিক য়ুরোপের। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এই বেশে মানুষের বা দেশের পরিচয় দেয় না, আপিস-রাজ্যের পরিচয় দেয়। আমাদের দেশেও ডাক্তার বলছে, 'আমার ঐ হ্যাট-কোটের দরকার আছে।' আইনজীবীও তাই বলছে, বণিকও তাই বলছে।

এদের দুটো বিখ্যাত পুরোনো কবিতার নমুনা দেখলে আমার কথাটা স্পষ্ট হবে:—

পুরোনো পুকুর,
ব্যাঙের লাফ,
জলের শব্দ।

বস্ আর দরকার নেই। জাপানী পাঠকের মনটা চোখে ভরা। পুরোনো পুকুর মানুষের পরিত্যক্ত, নিস্তব্ধ, অন্ধকার। তার মধ্যে একটা ব্যাং লাফিয়ে পড়তেই শব্দটা শোনা গেল। শোনা গেল — এতে বোঝা যাবে পুকুরটা কিরকম স্তব্ধ। এই পুরোনো পুকুরের ছবিটা কিভাবে মনের মধ্যে এঁকে নিতে হবে সেইটুকু কেবল কবি ইসারা করে দিলে — তার বেশি একেবারে অনাবশ্যক।

আর একটা কবিতা:—

পচা ডাল,
একটা কাক,
শরৎকাল।

আর বেশি না। শরৎকালে গাছের ডালে পাতা নেই, দুই একটা ডাল পচে গেছে, তার উপরে কাক বসে। শীতের দেশে শরৎকালটা হচ্ছে গাছের পাতা ঝরে যাবার, ফুল পড়ে যাবার, কুয়াশায় আকাশ ম্লান হবার কাল — এই কালটা মৃত্যুর ভাব মনে আনে। পচা ডালে কালো কাক বসে আছে, এইটুকুতেই পাঠক শরৎকালের সমস্ত রিক্ততা ও ম্লানতার ছবি মনের সামনে দেখতে পায়। কবি কেবল সূত্রপাত করে দিয়েই সরে দাঁড়ায়। তাকে যে অত অল্পের মধ্যেই সরে যেতে হয় তার কারণই এই যে, জাপানী পাঠকের মনের দৃষ্টিশক্তিটা প্রবল।

এইখানে একটা কবিতার নমুনা দিই যেটা চোখে দেখার চেয়ে বড়:—

স্বর্গ এবং মর্ত্য হচ্ছে ফুল, দেবতারা এবং বুদ্ধ হচ্ছেন ফুল,—
মানুষের হৃদয় হচ্ছে ফুলের অন্তরাত্মা।

আমার মনে হয় এই কবিতাটিতে জাপানের সঙ্গে ভারতবর্ষের মিল হয়েছে। জাপান স্বর্গমর্ত্যকে বিকশিত ফুলের মত সুন্দর করে দেখছে — ভারতবর্ষ বলছে, এই যে এক বৃন্তে দুই ফুল স্বর্গ এবং মর্ত্য, দেবতা এবং বুদ্ধ, মানুষের হৃদয় যদি না থাকত তবে এ ফুল কেবলমাত্র বাইরের জিনিস হত — এই সুন্দরের সৌন্দর্যটিই হচ্ছে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে।

যাই হোক, এই কবিতাগুলির মধ্যে কেবল যে বাক্‌সংযম তা নয়, এর মধ্যে ভাবের সংযম। এই ভাবের সংযমকে হৃদয়ের চাঞ্চল্য কোথাও ক্ষুব্ধ করছে না। আমাদের মনে হয় এইটেতে জাপানের একটা গভীর পরিচয় আছে।

'জাপান-যাত্রী' পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠা

এমনি করেই দরকার জিনিসটা বেড়ে চলতে চলতে সমস্ত পৃথিবীকে কুৎসিতভাবে একাকার করে দিচ্ছে।

এইজন্যে জাপানের শহরের রাস্তায় বেরলেই প্রধানভাবে চোখে পড়ে জাপানের মেয়েরা। তখন বুঝতে পারি, এরাই জাপানের ঘর, জাপানের দেশ। এরা আপিসের নয়। কারও কারও কাছে শুনতে পাই, জাপানের মেয়েরা এখানকার পুরুষের কাছ থেকে সম্মান পায় না। সে কথা সত্য কি মিথ্যা জানি নে, কিন্তু একটা সম্মান আছে সেটা বাইরে থেকে দেওয়া নয়, সেটা নিজের ভিতরকার। এখানকার মেয়েরাই জাপানের বেশে জাপানের সম্মানরক্ষার ভার নিয়েছে। ওরা দরকারকেই সকলের চেয়ে বড়ো করে খাতির করে নি, সেইজন্যেই ওরা নয়নমনের আনন্দ।

একটা জিনিস এখানে পথে ঘাটে চোখে পড়ে। রাস্তায় লোকের ভিড় আছে, কিন্তু গোলমাল একেবারেই নেই। এরা যেন চেঁচাতে জানে না, লোকে বলে জাপানের ছেলেরা সুদ্ধ কাঁদে না। আমি এ পর্যন্ত একটি ছেলেকেও কাঁদতে দেখি নি। পথে মোটরে করে যাবার সময়ে মাঝে মাঝে যেখানে ঠেলাগাড়ি প্রভৃতি বাধা এসে পড়ে, সেখানে মোটরের চালক শান্তভাবে অপেক্ষা করে; গাল দেয় না, হাঁকাহাঁকি করে না। পথের মধ্যে হঠাৎ একটা বাইসিক্‌ল্‌ মোটরের উপরে এসে পড়বার উপক্রম করলে, আমাদের দেশের চালক এ অবস্থায় বাইসিক্‌ল্‌ আরোহীকে অনাবশ্যক গাল না দিয়ে থাকতে পারত না। এ লোকটা ভ্রূক্ষেপমাত্র করলে না। এখানকার বাঙালিদের কাছে শুনতে পেলেম যে, রাস্তায় দুই বাইসিক্‌লে, কিংবা গাড়ির সঙ্গে বাইসিক্‌লের ঠোকাঠুকি হয়ে যখন রক্তপাত হয়ে যায়, তখনো উভয় পক্ষ চেঁচামেচি গালমন্দ না করে গায়ের ধুলো ঝেড়ে চলে যায়।

আমার কাছে মনে হয়, এইটেই জাপানের শক্তির মূল কারণ। জাপানি বাজে চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি ক'রে নিজের বলক্ষয় করে না। প্রাণশক্তির বাজে খরচ নেই বলে প্রয়োজনের সময় টানাটানি পড়ে না। শরীর মনের এই শান্তি ও সহিষ্ণুতা ওদের স্বজাতীয় সাধনার একটা অঙ্গ। শোকে দুঃখে, আঘাতে উত্তেজনায়, ওরা নিজেকে সংযত করতে জানে। সেইজন্যেই বিদেশের লোকেরা প্রায় বলে, জাপানিকে বোঝা যায় না, ওরা অত্যন্ত বেশি গূঢ়। এর কারণই হচ্ছে, এরা নিজেকে সর্বদা ফুটো দিয়ে ফাঁক দিয়ে গলে পড়তে দেয় না।

এই যে নিজের প্রকাশকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করতে থাকা, এ ওদের কবিতাতেও দেখা যায়। তিন লাইনের কাব্য জগতের আর কোথাও নেই। এই তিন লাইনই ওদের কবি, পাঠক, উভয়ের পক্ষেই যথেষ্ট। সেইজন্যেই এখানে এসে অবধি, রাস্তায় কেউ গান গাচ্ছে, এ আমি শুনি নি। এদের হৃদয় ঝরনার জলের মতো শব্দ করে না, সরোবরের জলের মতো স্তব্ধ। এ পর্যন্ত ওদের যত কবিতা শুনেছি সবগুলিই হচ্ছে ছবি দেখার কবিতা, গান গাওয়ার কবিতা নয়। হৃদয়ের দাহ ক্ষোভ প্রাণকে খরচ করে, এদের সেই খরচ কম। এদের অন্তরের সমস্ত প্রকাশ সৌন্দর্যবোধে। সৌন্দর্যবোধ জিনিসটা স্বার্থনিরপেক্ষ। ফুল, পাখি, চাঁদ, এদের নিয়ে আমাদের কাঁদাকাটা নেই। এদের সঙ্গে আমাদের নিছক সৌন্দর্যভোগের সম্বন্ধ—এরা আমাদের কোথাও মারে না, কিছু কাড়ে না, এদের দ্বারা আমাদের জীবনে কোথাও ক্ষয় ঘটে না। সেইজন্যেই তিন লাইনেই এদের কুলোয়, এবং কল্পনাটাতেও এরা শান্তির ব্যাঘাত করে না।

এদের দুটো বিখ্যাত পুরোনো কবিতার নমুনা দেখলে আমার কথাটা স্পষ্ট হবে :

পুরোনো পুকুর,
ব্যাঙের লাফ,
জলের শব্দ।

বাস্‌! আর দরকার নেই। জাপানি পাঠকের মনটা চোখে ভরা। পুরোনো পুকুর মানুষের পরিত্যক্ত, নিস্তব্ধ, অন্ধকার। তার মধ্যে একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়তেই শব্দটা শোনা গেল। শোনা গেল—এতে বোঝা যাবে পুকুরটা কী রকম স্তব্ধ। এই পুরোনো পুকুরের ছবিটা কী ভাবে মনের মধ্যে এঁকে নিতে হবে সেইটুকু কেবল কবি ইশারা করে দিলে; তার বেশি একেবারে অনাবশ্যক।

আর-একটা কবিতা :

পচা ডাল,
একটা কাক,
শরৎকাল।

আর বেশি না! শরৎকালে গাছের ডালে পাতা নেই, দুই-একটা ডাল পচে গেছে, তার উপরে কাক ব'সে। শীতের দেশে শরৎকালটা হচ্ছে গাছের পাতা ঝরে যাবার, ফুল পড়ে যাবার, কুয়াশায় আকাশ ম্লান হবার কাল— এই কালটা মৃত্যুর ভাব মনে আনে। পচা ডালে কালো কাক বসে আছে, এইটুকুতেই পাঠক শরৎকালের সমস্ত রিক্ততা ও ম্লানতার ছবি মনের সামনে দেখতে পায়। কবি কেবল সূত্রপাত করে দিয়েই সরে দাঁড়ায়। তাকে যে অত অল্পের মধ্যেই সরে যেতে হয় তার কারণ এই যে, জাপানি পাঠকের চেহারা দেখার মানসিক শক্তিটা প্রবল।

এইখানে একটা কবিতার নমুনা দিই, যেটা চোখে দেখার চেয়ে বড়ো :

স্বর্গ এবং মর্ত্য হচ্ছে ফুল
দেবতারা এবং বুদ্ধ হচ্ছেন ফুল—
মানুষের হৃদয় হচ্ছে ফুলের অন্তরাত্মা।

আমার মনে হয়, এই কবিতাটিতে জাপানের সঙ্গে ভারতবর্ষের মিল হয়েছে। জাপান স্বর্গ-মর্ত্যকে বিকশিত ফুলের মতো সুন্দর করে দেখছে; ভারতবর্ষ বলছে, এই যে এক বৃন্তে দুই ফুল, স্বর্গ এবং মর্ত্য, দেবতা এবং বুদ্ধ— মানুষের হৃদয় যদি না থাকত তবে এ ফুল কেবলমাত্র বাইরের জিনিস হত— এই সুন্দরের সৌন্দর্যটিই হচ্ছে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে।

যাই হোক, এই কবিতাগুলির মধ্যে কেবল যে বাক্‌সংযম তা নয়, এর মধ্যে ভাবের সংযম। এই ভাবের সংযমকে হৃদয়ের চাঞ্চল্য কোথাও ক্ষুব্ধ করছে না। আমাদের মনে হয়, এইটেতে জাপানের একটা গভীর পরিচয় আছে। এক কথায় বলতে গেলে, একে বলা যেতে পারে হৃদয়ের মিতব্যয়িতা।

মানুষের একটা ইন্দ্রিয়শক্তিকে খর্ব করে আর-একটাকে বাড়ানো চলে, এ আমরা দেখেছি। সৌন্দর্যবোধ এবং হৃদয়াবেগ, এ দুটোই হৃদয়বৃত্তি। আবেগের বোধ এবং প্রকাশকে খর্ব করে সৌন্দর্যের বোধ এবং প্রকাশকে প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়ে তোলা যেতে পারে— এখানে এসে অবধি এই কথাটা আমার মনে হয়েছে। হৃদয়োচ্ছ্বাস আমাদের দেশে এবং অন্যত্র বিস্তর দেখেছি, সেইটে এখানে চোখে পড়ে না। সৌন্দর্যের অনুভূতি এখানে এত বেশি ক'রে এবং এমন সর্বত্র দেখতে পাই যে, স্পষ্টই বুঝতে পারি যে, এটা এমন একটা বিশেষ বোধ যা আমরা ঠিক বুঝতে পারি নে। এ যেন কুকুরের ঘ্রাণশক্তি ও মৌমাছির দিক্‌বোধের মতো, আমাদের উপলব্ধির অতীত। এখানে যে-লোক অত্যন্ত গরিব সেও প্রতিদিন নিজের পেটের ক্ষুধাকে বঞ্চনা করেও এক-আধ পয়সার ফুল না কিনে বাঁচে না। এদের চোখের ক্ষুধা এদের পেটের ক্ষুধার চেয়ে কম নয়।

কাল দুজন জাপানি মেয়ে এসে আমাকে এ দেশের ফুল সাজানোর বিদ্যা দেখিয়ে গেল। এর মধ্যে কত আয়োজন, কত চিন্তা, কত নৈপুণ্য আছে, তার ঠিকানা নেই। প্রত্যেক পাতা এবং প্রত্যেক ডালটির উপর মন দিতে হয়। চোখে দেখার ছন্দ এবং সংগীত যে এদের কাছে কত প্রবলভাবে সুগোচর, কাল আমি ঐ দুজন জাপানি মেয়ের কাজ দেখে বুঝতে পারছিলুম।

একটা বইয়ে পড়ছিলুম, প্রাচীনকালে বিখ্যাত যোদ্ধা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অবকাশকালে এই ফুল সাজাবার বিদ্যার আলোচনা করতেন। তাঁদের ধারণা ছিল, এতে তাঁদের রণদক্ষতা ও বীরত্বের উন্নতি হয়। এর থেকেই বুঝতে পারবে, জাপানি নিজের এই সৌন্দর্য-অনুভূতিকে শৌখিন জিনিস বলে মনে করে না; ওরা জানে, গভীরভাবে এতে মানুষের শক্তিবৃদ্ধি হয়। এই শক্তিবৃদ্ধির মূল কারণটা হচ্ছে শান্তি; যে-সৌন্দর্যের আনন্দ নিরাসক্ত আনন্দ তাতে জীবনের ক্ষয় নিবারণ করে, এবং যে-উত্তেজনা-প্রবণতায় মানুষের মনোবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তিকে মেঘাচ্ছন্ন করে তোলে এই সৌন্দর্যবোধ তাকে পরিশ্রান্ত করে।

সেদিন একজন ধনী জাপানি তাঁর বাড়িতে চা-পান-অনুষ্ঠানে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তোমরা ওকাকুরার *Book of Tea* পড়েছ, তাতে এই অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে। সেদিন এই অনুষ্ঠান দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, জাপানির পক্ষে এটা ধর্মানুষ্ঠানের তুল্য। এ ওদের একটা জাতীয় সাধনা। ওরা কোন্ আইডিয়ালকে লক্ষ্য করছে, এর থেকে তা বেশ বোঝা যায়।

কোবে থেকে দীর্ঘ পথ মোটরযানে করে গিয়ে প্রথমেই একটি বাগানে প্রবেশ করলুম— সে বাগান ছায়াতে, সৌন্দর্যে এবং শান্তিতে একেবারে নিবিড়ভাবে পূর্ণ। বাগান জিনিসটা যে কী, তা এরা জানে; কতকগুলো কাঁকর ফেলে আর গাছ পুঁতে মাটির উপরে জিয়োমেট্রি কষাকেই যে বাগান করা বলে না, তা জাপানি-বাগানে ঢুকলেই বোঝা যায়; জাপানি চোখ এবং হাত দুই-ই প্রকৃতির কাছ থেকে সৌন্দর্যের দীক্ষালাভ করেছে, যেমন ওরা দেখতে জানে তেমনি ওরা গড়তে জানে। ছায়াপথ দিয়ে গিয়ে এক জায়গায় গাছের তলায় গর্ত-করা একটা পাথরের মধ্যে স্বচ্ছ জল আছে, সেই জলে আমরা প্রত্যেকে হাত মুখ ধুলুম। তার পরে, একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বেঞ্চির উপরে ছোটো ছোটো গোল গোল খড়ের আসন পেতে দিলে, তার উপরে আমরা বসলুম। নিয়ম হচ্ছে এইখানে কিছুকাল নীরব হয়ে বসে থাকতে হয়। গৃহস্বামীর সঙ্গে যাবামাত্রই দেখা হয় না। মনকে শান্ত করে স্থির করবার জন্যে ক্রমে ক্রমে নিমন্ত্রণ ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। আস্তে আস্তে দুটো-তিনটে ঘরের মধ্যে বিশ্রাম করতে করতে, শেষে আসল জায়গায় যাওয়া গেল। সমস্ত ঘরই নিস্তব্ধ, যেন চিরপ্রদোষের ছায়াবৃত; কারও মুখে কথা নেই। মনের উপর এই ছায়াঘন নিঃশব্দ নিস্তব্ধতার সম্মোহন ঘনিয়ে উঠতে থাকে। অবশেষে ধীরে ধীরে গৃহস্বামী এসে নমস্কারের দ্বারা আমাদের অভ্যর্থনা করলেন।

ঘরগুলিতে আসবাব নেই বললেই হয়, অথচ মনে হয় যেন এ-সমস্ত ঘর কী একটাতে পূর্ণ, গম্‌গম্ করছে। একটিমাত্র ছবি কিংবা একটিমাত্র পাত্র কোথাও আছে। নিমন্ত্রিতেরা সেইটি বহুযত্নে দেখে দেখে নীরবে তৃপ্তিলাভ করেন। যে-জিনিস যথার্থ সুন্দর তার চারি দিকে মস্ত একটি বিরলতার অবকাশ থাকা চাই। ভালো জিনিসগুলিকে ঘেঁষাঘেঁষি করে রাখা তাদের অপমান করা— সে যেন সতী স্ত্রীকে সতীনের ঘর করতে দেওয়ার মতো। ক্রমে ক্রমে অপেক্ষা করে করে, স্তব্ধতা ও নিঃশব্দতার দ্বারা মনের ক্ষুধাকে জাগ্রত করে তুলে, তার পরে এইরকম দুটি-একটি ভালো জিনিস দেখালে সে যে কী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এখানে এসে তা স্পষ্ট বুঝতে পারলুম। আমার মনে পড়ল, শান্তিনিকেতন আশ্রমে যখন আমি এক-একদিন এক-একটি গান তৈরি করে সকলকে শোনাতুম, তখন সকলেরই কাছে সেই গান তার হৃদয় সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করে দিত। অথচ সেই-সব গানকেই তোড়া বেঁধে কলকাতায় এনে যখন বান্ধবসভায় ধরেছি, তখন তারা আপনার যথার্থ শ্রীকে আবৃত করে রেখেছে। তার মানেই কলকাতার বাড়িতে গানের চারি দিকে ফাঁকা নেই— সমস্ত লোকজন, ঘরবাড়ি, কাজকর্ম, গোলমাল, তার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়েছে। যে-আকাশের মধ্যে তার ঠিক অর্থটি বোঝা যায়, সেই আকাশ নেই।

তার পরে গৃহস্বামী এসে বললেন, চা তৈরি এবং পরিবেশনের ভার বিশেষ কারণে তিনি তাঁর মেয়ের উপরে দিয়েছেন। তাঁর মেয়ে এসে নমস্কার করে চা তৈরিতে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর প্রবেশ থেকে আরম্ভ করে চা তৈরির প্রত্যেক অঙ্গ যেন কবিতার ছন্দের মতো। ধোয়া মোছা, আগুনজ্বালা, চা-দানির ঢাকা খোলা, গরম জলের পাত্র নামানো, পেয়ালায় চা ঢালা, অতিথির সম্মুখে এগিয়ে দেওয়া, সমস্ত এমন সংযম এবং সৌন্দর্যে মণ্ডিত যে, সে না দেখলে বোঝা যায় না। এই চা-পানের প্রত্যেক আসবাবটি দুর্লভ ও সুন্দর। অতিথির কর্তব্য হচ্ছে, এই পাত্রগুলিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একান্ত মনোযোগ দিয়ে দেখা। প্রত্যেক পাত্রের স্বতন্ত্র নাম এবং ইতিহাস। কত যে তার যত্ন, সে বলা যায় না।

সমস্ত ব্যাপারটা এই। শরীরকে মনকে একান্ত সংযত করে নিরাসক্ত প্রশান্ত মনে সৌন্দর্যকে নিজের প্রকৃতির মধ্যে গ্রহণ করা। ভোগীর ভোগোন্মাদ নয়; কোথাও লেশমাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা বা অমিতাচার নেই; মনের উপরতলায় সর্বদা যেখানে নানা স্বার্থের আঘাতে, নানা প্রয়োজনের হাওয়ায়,

কেবলই ঢেউ উঠছে, তা থেকে দূরে সৌন্দর্যের গভীরতার মধ্যে নিজেকে সমাহিত করে দেওয়াই হচ্ছে এই চা-পান অনুষ্ঠানের তাৎপর্য।

এর থেকে বোঝা যায়, জাপানের যে সৌন্দর্যবোধ সে তার একটা সাধনা, একটা প্রবল শক্তি। বিলাস জিনিসটা অন্তরে বাহিরে কেবল খরচ করায়, তাতেই দুর্বল করে। কিন্তু, বিশুদ্ধ সৌন্দর্য-বোধ মানুষের মনকে স্বার্থ এবং বস্তুর সংঘাত থেকে রক্ষা করে। সেইজন্যেই জাপানির মনে এই সৌন্দর্যরসবোধ পৌরুষের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছে।

এই উপলক্ষে আর-একটি কথা বলবার আছে। এখানে মেয়ে-পুরুষের সামীপ্যের মধ্যে কোনো গ্লানি দেখতে পাই নে; অন্যত্র মেয়ে-পুরুষের মাঝখানে যে একটা লজ্জা-সংকোচের আবিলতা আছে, এখানে তা নেই। মনে হয়, এদের মধ্যে মোহের একটা আবরণ যেন কম। তার প্রধান কারণ, জাপানে স্ত্রী-পুরুষের একত্র বিবস্ত্র হয়ে স্নান করার প্রথা আছে। এই প্রথার মধ্যে যে লেশমাত্র কলুষ নেই তার প্রমাণ এই— নিকটতম আত্মীয়েরাও এতে মনে কোনো বাধা অনুভব করে না। এমনি করে এখানে স্ত্রী-পুরুষের দেহ পরস্পরের দৃষ্টিতে কোনো মায়াকে পালন করে না। দেহ সম্বন্ধে উভয় পক্ষের মন খুব স্বাভাবিক। অন্য দেশের কলুষদৃষ্টি ও দুষ্টবুদ্ধির খাতিরে আজকাল শহরে এই নিয়ম উঠে যাচ্ছে। কিন্তু, পাড়াগাঁয়ে এখনো এই নিয়ম চলিত আছে। পৃথিবীতে যত সভ্য দেশ আছে তার মধ্যে কেবল জাপান মানুষের দেহ সম্বন্ধে যে মোহমুক্ত, এটা আমার কাছে খুব একটা বড়ো জিনিস বলে মনে হয়।

অথচ আশ্চর্য এই যে, জাপানের ছবিতে উলঙ্গ স্ত্রীমূর্তি কোথাও দেখা যায় না। উলঙ্গতার গোপনীয়তা ওদের মনে রহস্যজাল বিস্তার করে নি বলেই এটা সম্ভবপর হয়েছে। আরও একটা জিনিস দেখতে পাই। এখানে মেয়েদের কাপড়ের মধ্যে নিজেকে স্ত্রীলোক বলে বিজ্ঞাপন দেবার কিছুমাত্র চেষ্টা নেই। প্রায় সর্বত্রই মেয়েদের বেশের মধ্যে এমন কিছু ভঙ্গি থাকে যাতে বোঝা যায়, তারা বিশেষভাবে পুরুষের মোহদৃষ্টির প্রতি দাবি রেখেছে। এখানকার মেয়েদের কাপড় সুন্দর, কিন্তু সে কাপড়ে দেহের পরিচয়কে ইঙ্গিতের দ্বারা দেখাবার কোনো চেষ্টা নেই। জাপানিদের মধ্যে চরিত্রদৌর্বল্য যে কোথাও নেই তা আমি বলছি নে, কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধকে ঘিরে তুলে প্রায় সকল সভ্যদেশেই মানুষ যে একটা কৃত্রিম মোহপরিবেষ্টন রচনা করেছে, জাপানির মধ্যে অন্তত তার একটা আয়োজন কম বলে মনে হল এবং অন্তত সেই পরিমাণে এখানে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ স্বাভাবিক এবং মোহমুক্ত।

আর-একটি জিনিস আমাকে বড়ো আনন্দ দেয়, সে হচ্ছে জাপানের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে। রাস্তায় ঘাটে সর্বদা এত বেশি পরিমাণে এত ছোটো ছেলেমেয়ে আমি আর কোথাও দেখি নি। আমার মনে হল, যে-কারণে জাপানিরা ফুল ভালোবাসে সেই কারণেই ওরা শিশু ভালোবাসে। শিশুর ভালোবাসায় কোনো কৃত্রিম মোহ নেই— আমরা ওদের ফুলের মতোই নিঃস্বার্থ নিরাসক্তভাবে ভালোবাসতে পারি।

কাল সকালেই ভারতবর্ষের ডাক যাবে, এবং আমরাও টোকিও যাত্রা করব। একটি কথা তোমরা মনে রেখো— আমি যেমন যেমন দেখছি তেমনি তেমনি লিখে চলেছি। এ কেবল একটা নতুন দেশের উপর চোখ বুলিয়ে যাবার ইতিহাস মাত্র। এর মধ্যে থেকে তোমরা কেউ যদি অধিক পরিমাণে, এমন-কি, অল্প পরিমাণেও 'বস্তুতন্ত্রতা' দাবি কর তো নিরাশ হবে। আমার এই চিঠিগুলি জাপানের ভূবৃত্তান্তরূপে পাঠ্যসমিতি নির্বাচন করবেন না, নিশ্চয় জানি। জাপান সম্বন্ধে আমি যা-কিছু মতামত প্রকাশ করে চলেছি তার মধ্যে জাপান কিছু পরিমাণে আছে, আমিও কিছু পরিমাণে আছি, এইটে তোমরা যদি মনে নিয়ে পড় তা হলেই ঠকবে না। ভুল বলব না, এমন আমার প্রতিজ্ঞা নয়; যা মনে হচ্ছে তাই বলব, এই আমার মতলব।

কোবে,
২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

১৪

যেমন যেমন দেখছি তেমনি তেমনি লিখে যাওয়া আর সম্ভব নয়। পূর্বেই লিখেছি, জাপানিরা বেশি ছবি দেয়ালে টাঙায় না, গৃহসজ্জায় ঘর ভরে ফেলে না। যা তাদের কাছে রমণীয় তা তারা অল্প করে দেখে; দেখা সম্বন্ধে এরা যথার্থ ভোগী বলেই দেখা সম্বন্ধে এদের পেটুকতা নেই। এরা জানে, অল্প করে না দেখলে পূর্ণ পরিমাণে দেখা হয় না। জাপান-দেখা সম্বন্ধেও আমার তাই ঘটছে; দেখবার জিনিস একেবারে হুড়মুড় করে চার দিক থেকে চোখের উপর চেপে পড়ছে, তাই প্রত্যেকটিকে সুস্পষ্ট করে সম্পূর্ণ করে দেখা এখন আর সম্ভব হয় না। এখন, কিছু রেখে কিছু বাদ দিয়ে চলতে হবে।

এখানে এসেই আদর-অভ্যর্থনার সাইক্লোনের মধ্যে পড়ে গেছি; সেইসঙ্গে খবরের কাগজের চরেরা চারি দিকে তুফান লাগিয়ে দিয়েছে। এদের ফাঁক দিয়ে যে জাপানের আর-কিছু দেখব, এমন আশা ছিল না। জাহাজে এরা ছেঁকে ধরে, রাস্তায় এরা সঙ্গে সঙ্গে চলে, ঘরের মধ্যে এরা ঢুকে পড়তে সংকোচ করে না।

এই কৌতূহলীর ভিড় ঠেলতে ঠেলতে, অবশেষে টোকিও শহরে এসে পৌঁছনো গেল। এখানে আমাদের চিত্রকর বন্ধু য়োকোয়ামা টাইক্কানের বাড়িতে এসে আশ্রয় পেলুম। এখন থেকে ক্রমে জাপানের অন্তরের পরিচয় পেতে আরম্ভ করা গেল।

প্রথমেই জুতো জোড়াটাকে বাড়ির দরজার কাছে ত্যাগ করতে হল। বুঝলুম, জুতো জোড়াটা রাস্তার, পা জিনিসটাই ঘরের। ধুলো জিনিসটাও দেখলুম এদের ঘরের নয়, সেটা বাইরের পৃথিবীর। বাড়ির ভিতরকার সমস্ত ঘর এবং পথ মাদুর দিয়ে মোড়া, সেই মাদুরের নীচে শক্ত খড়ের গদি; তাই এদের ঘরের মধ্যে যেমন পায়ের ধুলো পড়ে না তেমনি পায়ের শব্দও হয় না। দরজাগুলো ঠেলা দরজা, বাতাসে যে ধড়াধ্বড় পড়বে এমন সম্ভাবনা নেই।

আর-একটা ব্যাপার এই—এদের বাড়ি জিনিসটা অত্যন্ত অধিক নয়। দেয়াল, কড়ি, বরগা, জানলা, দরজা, যতদূর পরিমিত হতে পারে তাই। অর্থাৎ, বাড়িটা মানুষকে ছাড়িয়ে যায় নি, সম্পূর্ণ তার আয়ত্তের মধ্যে। একে মাজা-ঘষা ধোয়া-মোছা দুঃসাধ্য নয়।

তার পরে, ঘরে যেটুকু দরকার তা ছাড়া আর কিছু নেই। ঘরের দেয়াল-মেঝে সমস্ত যেমন পরিষ্কার তেমনি ঘরের ফাঁকটুকুও যেন তক্‌তক্‌ করছে; তার মধ্যে বাজে জিনিসের চিহ্নমাত্র পড়ে নি। মস্ত সুবিধে এই যে, এদের মধ্যে যাদের সাবেক চাল আছে তারা চৌকি-টেবিল একেবারে ব্যবহার করে না। সকলেই জানে, চৌকি-টেবিলগুলো জীব নয় বটে কিন্তু তারা হাত-পা-ওয়ালা। যখন তাদের কোনো দরকার নেই তখনো তারা দরকারের অপেক্ষায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। অতিথিরা আসছে যাচ্ছে, কিন্তু অতিথিদের এই খাপগুলি জায়গা জুড়েই আছে। এখানে ঘরের মেঝের উপরে মানুষ বসে, সুতরাং যখন তারা চলে যায় তখন ঘরের আকাশে তারা কোনো বাধা রেখে যায় না। ঘরের একধারে মাদুর নেই, সেখানে পালিশ-করা কাষ্ঠখণ্ড ঝক্‌ঝক্‌ করছে, সেইদিকের দেয়ালে একটি ছবি ঝুলছে, এবং সেই ছবির সামনে সেই তক্তাটির উপর একটি ফুলদানির উপরে ফুল সাজানো। ঐ যে ছবিটি আছে এটা আড়ম্বরের জন্যে নয়, এটা দেখবার জন্যে। সেইজন্যে যাতে ওর গা ঘেঁষে কেউ না বসতে পারে, যাতে ওর সামনে যথেষ্ট পরিমাণে অব্যাহত অবকাশ থাকে, তারই ব্যবস্থা রয়েছে। সুন্দর জিনিসকে যে তারা কত শ্রদ্ধা করে, এর থেকেই তা বোঝা যায়। ফুল-সাজানোও তেমনি। অন্যত্র নানা ফুল ও পাতাকে ঠেসে একটা তোড়ার মধ্যে বেঁধে ফেলে—ঠিক যেমন করে বারুণীযোগের সময় তৃতীয়শ্রেণীর যাত্রীদের এক গাড়িতে ভরতি করে দেওয়া হয়, তেমনি—কিন্তু এখানে ফুলের প্রতি সে অত্যাচার হবার জো নেই; ওদের জন্যে থার্ডক্লাসের গাড়ি নয়, ওদের জন্যে রিজার্ভ-করা সেলুন। ফুলের সঙ্গে ব্যবহারে এদের না আছে দড়াদড়ি, না আছে ঠেলাঠেলি, না আছে হট্টগোল।

ভোরের বেলা উঠে জানালার কাছে আসন পেতে যখন বসলুম তখন বুঝলুম, জাপানিরা কেবল যে শিল্পকলায় ওস্তাদ তা নয়, মানুষের জীবনযাত্রাকে এরা একটি কলাবিদ্যার মতো আয়ত্ত করেছে। এরা এটুকু জানে যে-জিনিসের মূল্য আছে, গৌরব আছে, তার জন্যে যথেষ্ট জায়গা ছেড়ে দেওয়া চাই। পূর্ণতার জন্যে রিক্ততা সব চেয়ে দরকারি। বস্তুবাহুল্য জীবনবিকাশের প্রধান বাধা। এই-সমস্ত বাড়িটির মধ্যে কোথাও একটি কোণেও একটু অনাদর নেই, অনাবশ্যকতা নেই। চোখকে মিছিমিছি কোনো জিনিস আঘাত করছে না, কানকে বাজে কোনো শব্দ বিরক্ত করছে না। মানুষের মন নিজেকে যতখানি ছড়াতে চায় ততখানি ছড়াতে পারে, পদে পদে জিনিসপত্রের উপরে ঠোকর খেয়ে পড়ে না।

যেখানে চারি দিকে এলোমেলো, ছড়াছড়ি, নানা জঞ্জাল, নানা আওয়াজ, সেখানে যে প্রতি মুহূর্তেই আমাদের জীবনের এবং মনের শক্তিক্ষয় হচ্ছে সে আমরা অভ্যাসবশত বুঝতে পারি নে। আমাদের চারি দিকে যা-কিছু আছে সমস্তই আমাদের প্রাণমনের কাছে কিছু-না-কিছু আদায় করছেই। যে-সব জিনিস অদরকারি এবং অসুন্দর তারা আমাদের কিছুই দেয় না, কেবল আমাদের কাছ থেকে নিতে থাকে। এমনি করে নিশিদিন আমাদের যা ক্ষয় হচ্ছে, সেটাতে আমাদের শক্তির কম অপব্যয় হচ্ছে না।

সেদিন সকালবেলায় মনে হল, আমার মন যেন কানায় কানায় ভরে উঠেছে। এতদিন যেরকম করে মনের শক্তি বহন করেছি সে যেন চালুনিতে জল ধরা, কেবল গোলমালের ছিদ্র দিয়ে সমস্ত বেরিয়ে গেছে; আর, এখানে এ যেন ঘটের ব্যবস্থা। আমাদের দেশের ক্রিয়াকর্মের কথা মনে হল। কী প্রচুর অপব্যয়। কেবলমাত্র জিনিসপত্রের গণ্ডগোল নয়—মানুষের কী চেঁচামেচি, ছুটোছুটি, গলা-ভাঙাভাঙি। আমাদের নিজের বাড়ির কথা মনে হল। বাঁকাচোরা উঁচুনিচু রাস্তার উপর দিয়ে গোরুর গাড়ি চলার মতো সেখানকার জীবনযাত্রা। যতটা চলছে তার চেয়ে আওয়াজ হচ্ছে ঢের বেশি। দরোয়ান হাঁক দিচ্ছে, বেহারাদের ছেলেরা চেঁচামেচি করছে, মেথরদের মহলে ঘোরতর ঝগড়া বেধে গেছে, মারোয়াড়ি প্রতিবেশিনীরা চীৎকার শব্দে একঘেয়ে গান ধরেছে, তার আর অন্তই নেই। আর, ঘরের ভিতরে নানা জিনিসপত্রের ব্যবস্থা এবং অব্যবস্থা—তার বোঝা কি কম! সেই বোঝা কি কেবল ঘরের মেঝে বহন করছে। তা নয়, প্রতিক্ষণেই আমাদের মন বহন করছে। যা গোছালো তার বোঝা কম, যা অগোছালো তার বোঝা আরও বেশি, এই যা তফাত। যেখানে একটা দেশের সমস্ত লোকই কম চেঁচায়, কম জিনিস ব্যবহার করে, ব্যবস্থাপূর্বক কাজ করতে যাদের আশ্চর্য দক্ষতা, সমস্ত দেশ জুড়ে তাদের যে কতখানি শক্তি জমে উঠছে তার কি হিসেব আছে।

জাপানিরা যে রাগ করে না তা নয়, কিন্তু সকলের কাছেই একবাক্যে শুনেছি, এরা ঝগড়া করে না। এদের গালাগালির অভিধানে একটিমাত্র কথা আছে—বোকা—তার ঊর্ধ্বে এদের ভাষা পৌঁছয় না! ঘোরতর রাগারাগি মনান্তর হয়ে গেল, পাশের ঘরে তার টুঁ শব্দ পৌঁছল না, এইটি হচ্ছে জাপানি রীতি। শোকদুঃখ সম্বন্ধেও এইরকম স্তব্ধতা।

এদের জীবনযাত্রায় এই রিক্ততা, বিরলতা, মিতাচার কেবলমাত্র যদি অভাবাত্মক হত তা হলে সেটাকে প্রশংসা করবার কোনো হেতু থাকত না। কিন্তু, এই তো দেখছি—এরা ঝগড়া করে না বটে অথচ প্রয়োজনের সময় প্রাণ দিতে, প্রাণ নিতে এরা পিছপাও হয় না। জিনিসপত্রের ব্যবহারে এদের সংযম, কিন্তু জিনিসপত্রের প্রতি প্রভুত্ব এদের তো কম নয়। সকল বিষয়েই এদের যেমন শক্তি তেমনি নৈপুণ্য, তেমনি সৌন্দর্যবোধ।

এ সম্বন্ধে যখন আমি এদের প্রশংসা করেছি, তখন এদের অনেকের কাছেই শুনেছি যে, 'এটা আমরা বৌদ্ধধর্মের প্রসাদে পেয়েছি। অর্থাৎ, বৌদ্ধধর্মের এক দিকে সংযম আর-এক দিকে মৈত্রী, এই যে সামঞ্জস্যের সাধনা আছে এতেই আমরা মিতাচারের দ্বারাই অমিত শক্তির অধিকার পাই। বৌদ্ধধর্ম যে মধ্যপথের ধর্ম।'

শুনে আমার লজ্জা বোধ হয়। বৌদ্ধধর্ম তো আমাদের দেশেও ছিল, কিন্তু আমাদের জীবন-

যাত্রাকে তো এমন আশ্চর্য ও সুন্দর সামঞ্জস্যে বেঁধে তুলতে পারে নি। আমাদের কল্পনায় ও কাজে এমনতরো প্রভূত আতিশয্য, ঔদাসীন্য, উচ্ছৃঙ্খলতা কোথা থেকে এল।

একদিন জাপানি নাচ দেখে এলুম। মনে হল, এ যেন দেহভঙ্গির সংগীত। এই সংগীত আমাদের দেশের বীণার আলাপ। অর্থাৎ, পদে পদে মীড়। ভঙ্গিবৈচিত্র্যের পরস্পরের মাঝখানে কোনো ফাঁক নেই কিংবা কোথাও জোড়ের চিহ্ন দেখা যায় না; সমস্ত দেহ পুষ্পিত লতার মতো একসঙ্গে দুলতে দুলতে সৌন্দর্যের পুষ্পবৃষ্টি করছে। খাঁটি য়ুরোপীয় নাচ অর্ধনারীশ্বরের মতো, আধখানা ব্যায়াম, আধখানা নাচ; তার মধ্যে লম্ফঝম্প, ঘুরপাক, আকাশকে লক্ষ্য করে লাথি-ছোঁড়াছুঁড়ি আছে। জাপানি নাচ একেবারে পরিপূর্ণ নাচ। তার সজ্জার মধ্যেও লেশমাত্র উলঙ্গতা নেই। অন্য দেশের নাচে দেহের সৌন্দর্যলীলার সঙ্গে দেহের লালসা মিশ্রিত। এখানে নাচের কোনো ভঙ্গির মধ্যে লালসার ইশারামাত্র দেখা গেল না। আমার কাছে তার প্রধান কারণ এই বোধ হয় যে, সৌন্দর্যপ্রিয়তা জাপানির মনে এমন সত্য যে তার মধ্যে কোনোরকমের মিশল তাদের দরকার হয় না এবং সহ্য হয় না।

কিন্তু, এদের সংগীতটা আমার মনে হল বড়ো বেশি দূর এগোয় নি। বোধ হয় চোখ আর কান, এই দুইয়ের উৎকর্ষ একসঙ্গে ঘটে না। মনের শক্তিস্রোত যদি এর কোনো একটা রাস্তা দিয়ে অত্যন্ত বেশি আনাগোনা করে তা হলে অন্য রাস্তাটায় তার ধারা অগভীর হয়। ছবি জিনিসটা হচ্ছে অবনীর, গান জিনিসটা গগনের। অসীম যেখানে সীমার মধ্যে সেখানে ছবি; অসীম যেখানে সীমাহীনতায় সেখানে গান। রূপ-রাজ্যের কলা ছবি, অপরূপ রাজ্যের কলা গান। কবিতা উভচর, ছবির মধ্যেও চলে, গানের মধ্যেও ওড়ে। কেননা, কবিতার উপকরণ হচ্ছে ভাষা। ভাষার একটা দিকে অর্থ, আর-একটা দিকে সুর; এই অর্থের যোগে ছবি গড়ে ওঠে, সুরের যোগে গান।

জাপানি রূপরাজ্যের সমস্ত দখল করেছে। যা-কিছু চোখে পড়ে তার কোথাও জাপানির আলস্য নেই, অনাদর নেই; তার সর্বত্রই সে একেবারে পরিপূর্ণতার সাধনা করেছে। অন্য দেশে গুণী এবং রসিকের মধ্যেই রূপরসের যে-বোধ দেখতে পাওয়া যায় এ দেশে সমস্ত জাতের মধ্যে তাই ছড়িয়ে পড়েছে। য়ুরোপে সর্বজনীন বিদ্যাশিক্ষা আছে, সর্বজনীন সৈনিকতার চর্চাও সেখানে অনেক জায়গায় প্রচলিত, কিন্তু এমনতরো সর্বজনীন রসবোধের সাধনা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এখানে দেশের সমস্ত লোক সুন্দরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

তাতে কি এরা বিলাসী হয়েছে। অকর্মণ্য হয়েছে? জীবনের কঠিন সমস্যা ভেদ করতে এরা কি উদাসীন কিংবা অক্ষম হয়েছে।— ঠিক তার উল্টো; এরা এই সৌন্দর্যসাধনা থেকেই মিতাচার শিখেছে, এই সৌন্দর্যসাধনা থেকেই এরা বীর্য এবং কর্মনৈপুণ্য লাভ করেছে। আমাদের দেশে একদল লোক আছে তারা মনে করে, শুষ্কতাই বুঝি পৌরুষ, এবং কর্তব্যের পথে চলবার সদুপায় হচ্ছে রসের উপবাস— তারা জগতের আনন্দকে মুড়িয়ে ফেলাকেই জগতের ভালো করা মনে করে।

য়ুরোপে যখন গেছি তখন তাদের কলকারখানা, তাদের কাজের ভিড়, তাদের ঐশ্বর্য এবং প্রতাপ খুব করে চোখে পড়েছে এবং মনকে অভিভূত করেছে। তবু, 'এহ বাহ্য'। কিন্তু, জাপানে আধুনিকতার ছদ্মবেশ ভেদ করে যা চোখে পড়ে, সে হচ্ছে মানুষের হৃদয়ের সৃষ্টি। সে অহংকার নয়, আড়ম্বর নয়, সে পূজা। প্রতাপ নিজেকে প্রচার করে; এইজন্যে যতদূর পারে বস্তুর আয়তনকে বাড়িয়ে তুলে আর-সমস্তকে তার কাছে নত করতে চায়। কিন্তু, পূজা আপনার চেয়ে বড়োকে প্রচার করে, এইজন্যে তার আয়োজন সুন্দর এবং খাঁটি, কেবলমাত্র মস্ত এবং অনেক নয়। জাপান আপনার ঘরে বাইরে সর্বত্র সুন্দরের কাছে আপন অর্ঘ্য নিবেদন করে দিচ্ছে। এ দেশে আসবামাত্র সকলের চেয়ে বড়ো বাণী যা কানে এসে পৌঁছয় সে হচ্ছে, 'আমার ভালো লাগল, আমি ভালো বাসলুম।' এই কথাটি দেশসুদ্ধ সকলের মনে উদয় হওয়া সহজ নয়, এবং সকলের বাণীতে প্রকাশ হওয়া আরও শক্ত। এখানে কিন্তু প্রকাশ হয়েছে। প্রত্যেক ছোটো জিনিসে, ছোটো ব্যবহারে সেই আনন্দের পরিচয় পাই। সেই আনন্দ ভোগের আনন্দ নয়, পূজার আনন্দ। সুন্দরের প্রতি এমন আন্তরিক

সম্ভ্রম অন্য কোথাও দেখি নি। এমন সাবধানে, যত্নে, এমন শুচিতা রক্ষা করে সৌন্দর্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে অন্য কোনো জাতি শেখে নি। যা এদের ভালো লাগে তার সামনে এরা শব্দ করে না। সংযমই প্রচুরতার পরিচয় এবং স্তব্ধতাই গভীরতাকে প্রকাশ করে, এরা সেটা অন্তরের ভিতর থেকে বুঝেছে। এবং এরা বলে, সেই আন্তরিক বোধশক্তি এরা বৌদ্ধধর্মের সাধনা থেকে পেয়েছে। এরা স্থির হয়ে শক্তিকে নিরোধ করতে পেরেছে বলেই সেই অক্ষুণ্ণ শক্তি এদের দৃষ্টিকে বিশুদ্ধ এবং বোধকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

পূর্বেই বলেছি, প্রতাপের পরিচয়ে মন অভিভূত হয়, কিন্তু এখানে যে পূজার পরিচয় দেখি তাতে মন অভিভবের অপমান অনুভব করে না। মন আনন্দিত হয়, ঈর্ষ্যান্বিত হয় না। কেননা, পূজা যে আপনার চেয়ে বড়োকে প্রকাশ করে, সেই বড়োর কাছে সকলেই আনন্দমনে নত হতে পারে, মনে কোথাও বাজে না। দিল্লিতে যেখানে প্রাচীন হিন্দুরাজার কীর্তিকলার বুকের মাঝখানে কুতুবমিনার অহংকারের মুষলের মতো খাড়া হয়ে আছে সেখানে সেই ঔদ্ধত্য মানুষের মনকে পীড়া দেয়, কিংবা কাশীতে যেখানে হিন্দুর পূজাকে অপমানিত করবার জন্যে আরঙজীব মসজিদ স্থাপন করেছে সেখানে না দেখি শ্রীকে, না দেখি কল্যাণকে। কিন্তু, যখন তাজমহলের সামনে গিয়ে দাঁড়াই তখন এ তর্ক মনে আসে না যে, এটা হিন্দুর কীর্তি না মুসলমানের কীর্তি। তখন একে মানুষের কীর্তি বলেই হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি।

জাপানের যেটা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সেটা অহংকারের প্রকাশ নয়, আত্মনিবেদনের প্রকাশ, সেইজন্যে এই প্রকাশ মানুষকে আহ্বান করে, আঘাত করে না। এইজন্যে জাপানে যেখানে এই ভাবের বিরোধ দেখি সেখানে মনের মধ্যে বিশেষ পীড়া বোধ করি। চীনের সঙ্গে নৌযুদ্ধে জাপান জয়লাভ করেছিল—সেই জয়ের চিহ্নগুলিকে কাঁটার মতো দেশের চার দিকে পুঁতে রাখা যে বর্বরতা, সেটা যে অসুন্দর, সে কথা জাপানের বোঝা উচিত ছিল। প্রয়োজনের খাতিরে অনেক ক্রূর কর্ম মানুষকে করতে হয়, কিন্তু সেগুলোকে ভুলতে পারাই মনুষ্যত্ব। মানুষের যা চিরস্মরণীয়, যার জন্যে মানুষ মন্দির করে, মঠ করে, সে তো হিংসা নয়।

আমরা অনেক আচার, অনেক আসবাব য়ুরোপের কাছ থেকে নিয়েছি—সব সময়ে প্রয়োজনের খাতিরে নয়, কেবলমাত্র সেগুলো য়ুরোপীয় বলেই। য়ুরোপের কাছে আমাদের মনের এই যে পরাভব ঘটেছে অভ্যাসবশত সেজন্যে আমরা লজ্জা করতেও ভুলে গেছি। য়ুরোপের যত বিদ্যা আছে সবই আমাদের শেখবার, এ কথা মানি; কিন্তু যত ব্যবহার আছে সবই যে আমাদের নেবার, এ কথা আমি মানি নে। তবু, যা নেবার যোগ্য জিনিস তা সব দেশ থেকেই নিতে হবে, এ কথা বলতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সেইজন্যেই, জাপানে যে-সব ভারতবাসী এসেছে তাদের সম্বন্ধে একটা কথা আমি বুঝতে পারি নে। দেখতে পাই, তারা তো য়ুরোপের নানা অনাবশ্যক নানা কুশ্রী জিনিসও নকল করেছে, কিন্তু তারা কি জাপানের কোনো জিনিসই চোখে দেখতে পায় না। তারা এখান থেকে যে-সব বিদ্যা শেখে সেও য়ুরোপের বিদ্যা, এবং যাদের কিছুমাত্র আর্থিক বা অন্যরকম সুবিধা আছে তারা কোনোমতে এখান থেকে আমেরিকায় দৌড় দিতে চায়। কিন্তু যে-সব বিদ্যা এবং আচার ও আসবাব জাপানের সম্পূর্ণ নিজের, তার মধ্যে কি আমরা গ্রহণ করবার জিনিস কিছুই দেখি নে।

আমি নিজের কথা বলতে পারি, আমাদের জীবনযাত্রার উপযোগী জিনিস আমরা এখান থেকে যত নিতে পারি এমন য়ুরোপ থেকে নয়। তা ছাড়া জীবনযাত্রার রীতি যদি আমরা অসংকোচে জাপানের কাছ থেকে শিখে নিতে পারতুম, তা হলে আমাদের ঘরদুয়ার এবং ব্যবহার শুচি হত, সুন্দর হত, সংযত হত। জাপান ভারতবর্ষ থেকে যা পেয়েছে তাতে আজ ভারতবর্ষকে লজ্জা দিচ্ছে, কিন্তু দুঃখ এই যে, সেই লজ্জা অনুভব করবার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের যত লজ্জা সমস্ত কেবল য়ুরোপের কাছে, তাই য়ুরোপের ছেঁড়া কাপড় কুড়িয়ে কুড়িয়ে তালি-দেওয়া অদ্ভুত আবরণে আমরা লজ্জা রক্ষা করতে চাই। এদিকে জাপান-প্রবাসী ভারতবাসীরা বলে, জাপান আমাদের এশিয়া-বাসী বলে অবজ্ঞা করে, অথচ আমরাও জাপানকে এমনি অবজ্ঞা করি যে, তার আতিথ্য গ্রহণ করেও

শিমোমুরার আঁকা একটি প্রকাণ্ড ছবি।...
একটি অন্ধ হাতজোড় করে সূর্যের বন্দনায় রত।'

তান্‌জান্‌ শিমোমুরা-অঙ্কিত

প্রকৃত জাপানকে চক্ষেও দেখি নে, জাপানের ভিতর দিয়ে বিকৃত য়ুরোপকেই কেবল দেখি। জাপানকে যদি দেখতে পেতুম তা হলে আমাদের ঘর থেকে অনেক কুশ্রীতা, অশুচিতা, অব্যবস্থা, অসংযম আজ দূরে চলে যেত।

বাংলাদেশে আজ শিল্পকলার নূতন অভ্যুদয় হয়েছে, আমি সেই শিল্পীদের জাপানে আহ্বান করছি। নকল করবার জন্যে নয়, শিক্ষা করবার জন্যে। শিল্প জিনিসটা যে কত বড়ো জিনিস, সমস্ত জাতির সেটা যে কত বড়ো সম্পদ, কেবলমাত্র শৌখিনতাকে সে যে কতদূর পর্যন্ত ছাড়িয়ে গেছে— তার মধ্যে জ্ঞানীর জ্ঞান, ভক্তের ভক্তি, রসিকের রসবোধ যে কত গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছে, তা এখানে এলে তবে স্পষ্ট বোঝা যায়।

টোকিওতে আমি যে-শিল্পীবন্ধুর বাড়িতে ছিলুম সেই টাইক্কানের নাম পূর্বেই বলেছি; ছেলে-মানুষের মতো তাঁর সরলতা, তাঁর হাসি তাঁর চারি দিককে হাসিয়ে রেখে দিয়েছে। প্রসন্ন তাঁর মুখ, উদার তাঁর হৃদয়, মধুর তাঁর স্বভাব। যতদিন তাঁর বাড়িতে ছিলুম, আমি জানতেই পারি নি তিনি কত বড়ো শিল্পী। ইতিমধ্যে য়োকোহামায় একজন ধনী এবং রসজ্ঞ ব্যক্তির আমরা আতিথ্য লাভ করেছি। তাঁর এই বাগানটি নন্দনবনের মতো এবং তিনিও সকল বিষয়ে এখানকারই যোগ্য। তাঁর নাম হারা। তাঁর কাছে শুনলুম, য়োকোহামা টাইক্কান এবং তানজান শিমোমুরা আধুনিক জাপানের দুই সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁরা আধুনিক য়ুরোপের নকল করেন না, প্রাচীন জাপানেরও না। তাঁরা প্রথার বন্ধন থেকে জাপানের শিল্পকে মুক্তি দিয়েছেন। হারার বাড়িতে টাইক্কানের ছবি যখন প্রথম দেখলুম, আশ্চর্য হয়ে গেলুম। তাতে না আছে বাহুল্য, না আছে শৌখিনতা। তাতে যেমন একটা জোর আছে তেমনি সংযম। বিষয়টা এই—চীনের একজন প্রাচীন কালের কবি ভাবে ভোর হয়ে চলেছে; তার পিছনে একজন বালক একটি বীণাযন্ত্র বহু যত্নে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে তার নেই; তার পিছনে একটি বাঁকা উইলো গাছ। জাপানে তিনভাগওয়ালা যে খাড়া পর্দার প্রচলন আছে সেই রেশমের পর্দার উপর আঁকা; মস্ত পর্দা এবং প্রকাণ্ড ছবি। প্রত্যেক রেখা প্রাণে ভরা। এর মধ্যে ছোটোখাটো কিংবা জবড়জঙ্গ কিছুই নেই; যেমন উদার তেমনি গভীর, তেমনি আয়াসহীন। নৈপুণ্যের কথা একেবারে মনেই হয় না; নানা রঙ নানা রেখার সমাবেশ নেই; দেখবামাত্র মনে হয় খুব বড়ো এবং খুব সত্য। তার পরে তাঁর ভূদৃশ্যচিত্র দেখলুম। একটি ছবি—পটের উচ্চপ্রান্তে একখানি পূর্ণ চাঁদ, মাঝখানে একটি নৌকা, নীচের প্রান্তে দুটো দেওদার গাছের ডাল দেখা যাচ্ছে; আর কিছু না, জলের কোনো রেখা পর্যন্ত নেই। জ্যোৎস্নার আলোয় স্থির জল কেবলমাত্র বিস্তীর্ণ শুভ্রতা—এটা যে জল সে কেবলমাত্র ঐ নৌকো আছে বলেই বোঝা যাচ্ছে; আর, এই সর্বব্যাপী বিপুল জ্যোৎস্নাকে ফলিয়ে তোলবার জন্যে যত-কিছু কালিমা সে কেবলই ঐ দুটো পাইন গাছের ডালে। ওস্তাদ এমন একটা জিনিসকে আঁকতে চেয়েছেন যার রূপ নেই, যা বৃহৎ এবং নিস্তব্ধ— জ্যোৎস্নারাত্রি—অতলস্পর্শ তার নিঃশব্দতা। কিন্তু, আমি যদি তাঁর সব ছবির বিস্তারিত বর্ণনা করতে যাই তা হলে আমার কাগজও ফুরোবে, সময়েও কুলোবে না। হারা সান সবশেষে নিয়ে গেলেন একটি লম্বা সংকীর্ণ ঘরে; সেখানে এক দিকের প্রায় সমস্ত দেয়াল জুড়ে একটি খাড়া পর্দা দাঁড়িয়ে। এই পর্দায় শিমোমুরার আঁকা একটি প্রকাণ্ড ছবি। শীতের পরে প্রথম বসন্ত এসেছে; প্লাম গাছের ডালে একটাও পাতা নেই, সাদা সাদা ফুল ধরেছে, ফুলের পাপড়ি ঝরে ঝরে পড়ছে; বৃহৎ পর্দার এক প্রান্তে দিগন্তের কাছে রক্তবর্ণ সূর্য দেখা দিয়েছে, পর্দার অপর প্রান্তে প্লাম গাছের রিক্ত ডালের আড়ালে দেখা যাচ্ছে একটি অন্ধ হাতজোড় করে সূর্যের বন্দনায় রত। একটি অন্ধ, এক গাছ, এক সূর্য, আর সোনায়-ঢালা এক সুবৃহৎ আকাশ; এমন ছবি আমি কখনো দেখি নি। উপনিষদের সেই প্রার্থনাবাণী যেন রূপ ধরে আমার কাছে দেখা দিলে—তমসো মা জ্যোতির্গময়। কেবল অন্ধ মানুষের নয় অন্ধ প্রকৃতির এই প্রার্থনা, তমসো মা জ্যোতির্গময়—সেই প্লাম গাছের একাগ্র প্রসারিত শাখাপ্রশাখার ভিতর দিয়ে জ্যোতির্লোকের দিকে উঠছে। অথচ, আলোয় আলোময়—তারই মাঝখানে অন্ধের প্রার্থনা।

কাল শিমোমুরার আর-একটা ছবি দেখলুম। পটের আয়তন তো ছোটো, অথচ ছবির বিষয় বিচিত্র। সাধক তার ঘরের মধ্যে বসে ধ্যান করছে; তার সমস্ত রিপুগুলি তাকে চারি দিকে আক্রমণ করেছে। অর্ধেক মানুষ অর্ধেক জন্তুর মতো তাদের আকার, অত্যন্ত কুৎসিত, তাদের কেউ বা খুব সমারোহ করে আসছে, কেউ বা আড়ালে আবডালে উঁকিঝুঁকি মারছে। কিন্তু, তবু এরা সবাই বাইরেই আছে; ঘরের ভিতরে তার সামনে সকলের চেয়ে তার বড়ো রিপু বসে আছে; তার মূর্তি ঠিক বুদ্ধের মতো। কিন্তু, লক্ষ করে দেখলেই দেখা যায়, সে সাঁচ্চা বুদ্ধ নয়—স্থূল তার দেহ, মুখে তার বাঁকা হাসি। সে কপট আত্মম্ভরিতা, পবিত্র রূপ ধরে এই সাধককে বঞ্চিত করছে। এ হচ্ছে আধ্যাত্মিক অহমিকা, শুচি এবং সুগম্ভীর মুক্তস্বরূপ বুদ্ধের ছদ্মবেশ ধরে আছে; একেই চেনা শক্ত, এই হচ্ছে অন্তরতম রিপু, অন্য কদর্য রিপুরা বাইরের। এইখানে দেবতাকে উপলক্ষ করে মানুষ আপনার প্রবৃত্তিকে পুজো করছে।

আমরা যাঁর আশ্রয়ে আছি, সেই হারা সান গুণী এবং গুণজ্ঞ। তিনি রসে হাস্যে ঔদার্যে পরিপূর্ণ। সমুদ্রের ধারে, পাহাড়ের গায়ে, তাঁর এই পরম সুন্দর বাগানটি সর্বসাধারণের জন্যে নিত্যই উদ্ঘাটিত। মাঝে মাঝে বিশ্রামগৃহ আছে, যে-খুশি সেখানে এসে চা খেতে পারে। একটা খুব লম্বা ঘর আছে, সেখানে যারা বনভোজন করতে চায় তাদের জন্যে ব্যবস্থা আছে। হারা সানের মধ্যে কৃপণতাও নেই, আড়ম্বরও নেই, অথচ তাঁর চার দিকে সমারোহ আছে। মূঢ় ধনাভিমানীর মতো তিনি মূল্যবান জিনিসকে কেবলমাত্র সংগ্রহ করে রাখেন না; তার মূল্য তিনি বোঝেন, তার মূল্য তিনি দেন, এবং তার কাছে তিনি সম্ভ্রমে আপনাকে নত করতে জানেন।

১৫

এশিয়ার মধ্যে জাপানই এই কথাটি একদিন হঠাৎ অনুভব করলে যে, য়ুরোপ যে-শক্তিতে পৃথিবীতে সর্বজয়ী হয়ে উঠেছে একমাত্র সেই শক্তির দ্বারাই তাকে ঠেকানো যায়। নইলে তার চাকার নীচে পড়তেই হবে এবং একবার পড়লে কোনোকালে আর ওঠবার উপায় থাকে না।

এই কথাটি যেমনি তার মাথায় ঢুকল অমনি সে আর এক মুহূর্ত দেরি করলে না। কয়েক বৎসরের মধ্যেই য়ুরোপের শক্তিকে আত্মসাৎ করে নিলে। য়ুরোপের কামান বন্দুক, কুচ-কাওয়াজ, কল-কারখানা, আপিস-আদালত, আইন-কানুন যেন কোন্ আলাদিনের প্রদীপের জাদুতে পশ্চিম-লোক থেকে পূর্বলোকে একেবারে আস্ত উপড়ে এনে বসিয়ে দিলে। নতুন শিক্ষাকে ক্রমে ক্রমে সইয়ে নেওয়া, বাড়িয়ে তোলা নয়; তাকে ছেলের মতো শৈশব থেকে যৌবনে মানুষ করে তোলা নয়—তাকে জামাইয়ের মতো একেবারে পূর্ণ যৌবনে ঘরের মধ্যে বরণ করে নেওয়া। বৃদ্ধ বনস্পতিকে এক জায়গা থেকে তুলে আর-এক জায়গায় রোপণ করবার বিদ্যা জাপানের মালীরা জানে; য়ুরোপের শিক্ষাকেও তারা তেমনি করেই তার সমস্ত জটিল শিকড় এবং বিপুল ডালপালা সমেত নিজের দেশের মাটিতে এক রাত্রির মধ্যেই খাড়া করে দিলে। শুধু যে তার পাতা ঝরে পড়ল না তা নয়, পরদিন থেকেই তার ফল ধরতে লাগল। প্রথম কিছুদিন ওরা য়ুরোপ থেকে শিক্ষকের দল ভাড়া করে এনেছিল। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাদের প্রায় সমস্ত সরিয়ে দিয়ে, হালে এবং দাঁড়ে নিজেরাই বসে গেছে—কেবল পালটা এমন আড় করে ধরেছে যাতে পশ্চিমের হাওয়াটা তার উপরে পুরো এসে লাগে।

ইতিহাসে এতবড়ো আশ্চর্য ঘটনা আর কখনো হয় নি। কারণ, ইতিহাস তো যাত্রার পালা গান করা নয় যে, ষোলো বছরের ছোকরাকে পাকা গোঁপদাড়ি পরিয়ে দিলেই সেই মুহূর্তে তাকে নারদমুনি করে তোলা যেতে পারে। শুধু য়ুরোপের অস্ত্র ধার করলেই যদি য়ুরোপ হওয়া যেত, তা হলে আফগানিস্থানেরও ভাবনা ছিল না। কিন্তু, য়ুরোপের আসবাবগুলো ঠিকমত ব্যবহার করবার মতো মনোবৃত্তি জাপান এক নিমেষেই কেমন করে গড়ে তুললে, সেইটেই বোঝা শক্ত।

সুতরাং এ কথা মানতেই হবে, এ জিনিস তাকে গোড়া থেকে গড়তে হয় নি, ওটা তার একরকম

গড়াই ছিল। সেইজন্যেই যেমনি তার চৈতন্য হল অমনি তার প্রস্তুত হতে বিলম্ব হল না। তার যা-কিছু বাধা ছিল সেটা বাইরের; অর্থাৎ, একটা নতুন জিনিসকে বুঝে পড়ে আয়ত্ত করে নিতে যেটুকু বাধা সেইটুকু মাত্র; তার নিজের অন্তরে কোনো বিরোধের বাধা ছিল না।

পৃথিবীতে মোটামুটি দুরকম জাতের মন আছে— এক স্থাবর, আর-এক জঙ্গম। এই মানসিক স্থাবর-জঙ্গমতার মধ্যে একটা ঐকান্তিক ভেদ আছে, এমন কথা বলতে চাই নে। স্থাবরকেও দায়ে পড়ে চলতে হয়, জঙ্গমকেও দায়ে পড়ে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু স্থাবরের লয় বিলম্বিত, আর জঙ্গমের লয় দ্রুত।

জাপানের মনটাই ছিল স্বভাবত জঙ্গম; লম্বা লম্বা দশকুশি তালের গাম্ভারি চাল তার নয়। এইজন্যে সে এক দৌড়ে দু-তিন শো বছর হু হু করে পেরিয়ে গেল। আমাদের মতো যারা দুর্ভাগ্যের বোঝা নিয়ে হাজার বছর পথের ধারে বটতলায় শুয়ে গড়িয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে, তারা অভিমান করে বলে, 'ওরা ভারি হালকা, আমাদের মতো গাম্ভীর্য থাকলে ওরা এমন বিশ্রীরকম দৌড়ধাপ করতে পারত না। সাঁচ্চা জিনিস কখনো এত শীঘ্র গড়ে উঠতে পারে না।'

আমরা যাই বলি-না কেন, চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এশিয়ার এই প্রান্তবাসী জাত য়ুরোপীয় সভ্যতার সমস্ত জটিল ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ জোরের সঙ্গে এবং নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারছে। এর একমাত্র কারণ, এরা যে কেবল ব্যবস্থাটাকে নিয়েছে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে মনটাকেও পেয়েছে। নইলে পদে পদে অস্ত্রের সঙ্গে অস্ত্রীর বিষম ঠোকাঠুকি বেধে যেত; নইলে ওদের শিক্ষার সঙ্গে দীক্ষার লড়াই কিছুতেই মিটত না, এবং বর্ম ওদের দেহটাকে পিষে দিত।

মনের যে-জঙ্গমতার জোরে ওরা আধুনিক কালের প্রবল প্রবাহের সঙ্গে নিজের গতিকে এত সহজে মিলিয়ে দিতে পেরেছে সেটা জাপানি পেয়েছে কোথা থেকে।

জাপানিদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে যে, ওরা মিশ্র জাতি। ওরা একেবারে খাস মঙ্গোলীয় নয়। এমন-কি, ওদের বিশ্বাস ওদের সঙ্গে আর্যরক্তেরও মিশ্রণ ঘটেছে। জাপানিদের মধ্যে মঙ্গোলীয় এবং ভারতীয় দুই ছাঁদেরই মুখ দেখতে পাই, এবং ওদের মধ্যে বর্ণেরও বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে। আমার চিত্রকর বন্ধু টাইক্কানকে বাঙালি কাপড় পরিয়ে দিলে, তাঁকে কেউ জাপানি বলে সন্দেহ করবে না। এমন আরও অনেককে দেখেছি।

যে-জাতির মধ্যে বর্ণসংকরতা খুব বেশি ঘটেছে তার মনটা এক ছাঁচে ঢালাই হয়ে যায় না। প্রকৃতি-বৈচিত্র্যের সংঘাতে তার মনটা চলনশীল হয়ে থাকে। এই চলনশীলতায় মানুষকে অগ্রসর করে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

রক্তের অবিমিশ্রতা কোথাও যদি দেখতে চাই, তা হলে বর্বর জাতির মধ্যে যেতে হয়। তারা পরকে ভয় করেছে, তারা অল্পপরিসর আশ্রয়ের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের জাতকে স্বতন্ত্র রেখেছে। তাই, আদিম অস্ট্রেলীয় জাতির আদিমতা আর ঘুচল না; আফ্রিকার মধ্যদেশে কালের গতি বন্ধ বললেই হয়।

কিন্তু, গ্রীস পৃথিবীর এমন একটা জায়গায় ছিল যেখানে এক দিকে এশিয়া, এক দিকে ইজিপ্ট, এক দিকে য়ুরোপের মহাদেশ তার সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে তাকে আলোড়িত করেছে। গ্রীকেরা অবিমিশ্র জাতি ছিল না, রোমকেরাও না। ভারতবর্ষেও অনার্যে আর্যে যে মিশ্রণ ঘটেছিল সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

জাপানিকেও দেখলে মনে হয়, তারা এক ধাতুতে গড়া নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ জাতিই মিথ্যা করেও আপনার রক্তের অবিমিশ্রতা নিয়ে গর্ব করে; জাপানের মনে এই অভিমান কিছুমাত্র নেই। জাপানিদের সঙ্গে ভারতীয় জাতির মিশ্রণ হয়েছে, এ কথার আলোচনা তাদের কাগজে দেখেছি এবং তা নিয়ে কোনো পাঠক কিছুমাত্র বিচলিত হয় নি। শুধু তাই নয়, চিত্রকলা প্রভৃতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের কাছে তারা যে ঋণী সে কথা আমরা একেবারেই ভুলে গেছি, কিন্তু জাপানিরা এই ঋণ স্বীকার করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

বস্তুত, ঋণ তারাই গোপন করতে চেষ্টা করে—ঋণ যাদের হাতে ঋণই রয়ে গেছে, ধন হয়ে ওঠে নি। ভারতের কাছ থেকে জাপান যদি কিছু নিয়ে থাকে সেটা সম্পূর্ণ তার আপন সম্পত্তি হয়েছে। যে-জাতির মনের মধ্যে চলন-ধর্ম প্রবল সেই জাতিই পরের সম্পদকে নিজের সম্পদ করে নিতে পারে। যার মন স্থাবর, বাইরের জিনিস তার পক্ষে বিষম ভার হয়ে ওঠে; কারণ, তার নিজের অচল অস্তিত্বই তার পক্ষে প্রকাণ্ড একটা বোঝা।

কেবলমাত্র জাতিসংকরতা নয়, স্থানসংকীর্ণতা জাপানের পক্ষে একটা মস্ত সুবিধা হয়েছে। ছোটো জায়গাটি সমস্ত জাতির মিলনের পক্ষে পুটপাকের কাজ করেছে। বিচিত্র এই উপকরণ ভালো-রকম করে গলে মিশে বেশ নিবিড় হয়ে উঠেছে। চীন বা ভারতবর্ষের মতো বিস্তীর্ণ জায়গায় বৈচিত্র্য কেবল বিভক্ত হয়ে উঠতে চেষ্টা করে, সংহত হতে চায় না।

প্রাচীনকালে গ্রীস রোম এবং আধুনিক কালে ইংলন্ড সংকীর্ণ স্থানের মধ্যে সম্মিলিত হয়ে বিস্তীর্ণ স্থানকে অধিকার করতে পেরেছে। আজকের দিনে এশিয়ার মধ্যে জাপানের সেই সুবিধা। এক দিকে তার মানসপ্রকৃতির মধ্যে চিরকালই চলন-ধর্ম আছে, যেজন্য চীন কোরিয়া প্রভৃতি প্রতিবেশীর কাছ থেকে জাপান তার সভ্যতার সমস্ত উপকরণ অনায়াসে আত্মসাৎ করতে পেরেছে; আর-এক দিকে অল্পপরিসর জায়গায় সমস্ত জাতি অতি সহজেই এক ভাবে ভাবতে, এক প্রাণে অনুপ্রাণিত হতে পেরেছে। তাই যে-মুহূর্তে জাপানের মস্তিষ্কের মধ্যে এই চিন্তা স্থান পেলে যে আত্মরক্ষার জন্যে য়ুরোপের কাছ থেকে তাকে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে সেই মুহূর্তে জাপানের সমস্ত কলেবরের মধ্যে অনুকূল চেষ্টা জাগ্রত হয়ে উঠল।

য়ুরোপের সভ্যতা একান্তভাবে জঙ্গম মনের সভ্যতা, তা স্থাবর মনের সভ্যতা নয়। এই সভ্যতা ক্রমাগতই নূতন চিন্তা, নূতন চেষ্টা, নূতন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বিপ্লব-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় পক্ষবিস্তার করে উড়ে চলেছে। এশিয়ার মধ্যে একমাত্র জাপানের মনে সেই স্বাভাবিক চলন-ধর্ম থাকাতেই জাপান সহজেই য়ুরোপের ক্ষিপ্রতালে চলতে পেরেছে এবং তাতে করে তাকে প্রলয়ের আঘাত সইতে হয় নি। কারণ, উপকরণ সে যা-কিছু পাচ্ছে তার দ্বারা সে সৃষ্টি করেছে; সুতরাং নিজের বর্ধিষ্ণু জীবনের সঙ্গে এ-সমস্তকে সে মিলিয়ে নিতে পারছে। এই সমস্ত নতুন জিনিস যে তার মধ্যে কোথাও কিছু বাধা পাচ্ছে না, তা নয়, কিন্তু সচলতার বেগেই সেই বাধা ক্ষয় হয়ে চলেছে। প্রথম প্রথম যা অসংগত অদ্ভুত হয়ে দেখা দিচ্ছে, ক্রমে ক্রমে তার পরিবর্তন ঘটে সুসংগতি জেগে উঠছে। একদিন যে-অনাবশ্যককে সে গ্রহণ করেছে আর-একদিন সেটাকে ত্যাগ করেছে; একদিন যে আপন জিনিসটাকে পরের হাটে সে খুইয়েছে আর-একদিন সেটাকে আবার ফিরে নিচ্ছে। এই তার সংশোধনের প্রক্রিয়া এখনো নিত্য তার মধ্যে চলছে। যে-বিকৃতি মৃত্যুর তাকেই ভয় করতে হয়; যে-বিকৃতি প্রাণের লীলাবৈচিত্র্যে হঠাৎ এক-এক সময়ে দেখা দেয় প্রাণ আপনি তাকে সামলে নিয়ে নিজের শমে এসে দাঁড়াতে পারে।

আমি যখন জাপানে ছিলুম তখন একটা কথা বার বার আমার মনে এসেছে। আমি অনুভব করছিলুম, ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালির সঙ্গে জাপানির এক জায়গায় যেন মিল আছে। আমাদের এই বৃহৎ দেশের মধ্যে বাঙালিই সব প্রথমে নতুনকে গ্রহণ করেছে, এবং এখনো নতুনকে গ্রহণ ও উদ্ভাবন করবার মতো তার চিত্তের নমনীয়তা আছে।

তার একটা কারণ, বাঙালির মধ্যে রক্তের অনেক মিশল ঘটেছে; এমন মিশ্রণ ভারতের আর কোথাও হয়েছে কিনা সন্দেহ। তার পরে, বাঙালি ভারতের যে প্রান্তে বাস করে সেখানে বহুকাল ভারতের অন্য প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। বাংলা ছিল পাণ্ডববর্জিত দেশ। বাংলা একদিন দীর্ঘকাল বৌদ্ধপ্রভাবে অথবা অন্য যে কারণেই হোক আচারভ্রষ্ট হয়ে নিতান্ত একঘরে হয়ে ছিল, তাতে করে তার একটা সংকীর্ণ স্বাতন্ত্র্য ঘটেছিল; এই কারণেই বাঙালির চিত্ত অপেক্ষাকৃত বন্ধন-মুক্ত, এবং নূতন শিক্ষা গ্রহণ করা বাঙালির পক্ষে যত সহজ হয়েছিল এমন ভারতবর্ষের অন্য কোনো দেশের পক্ষে হয় নি। য়ুরোপীয় সভ্যতার পূর্ণ দীক্ষা জাপানের মতো আমাদের পক্ষে

অবাধ নয়; পরের কৃপণ হস্ত থেকে আমরা যেটুকু পাই তার বেশি আমাদের পক্ষে দুর্লভ। কিন্তু, য়ুরোপীয় শিক্ষা আমাদের দেশে যদি সম্পূর্ণ সুগম হত তা হলে কোনো সন্দেহ নেই, বাঙালি সকল দিক থেকেই তা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করত। আজ নানা দিক থেকে বিদ্যাশিক্ষা আমাদের পক্ষে ক্রমশই দুর্মূল্য হয়ে উঠছে, তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকীর্ণ প্রবেশদ্বারে বাঙালির ছেলে প্রতিদিন মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে মরছে। বস্তুত, ভারতের অন্য সকল প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশে যে-একটা অসন্তোষের লক্ষণ অত্যন্ত প্রবল দেখা যায় তার একমাত্র কারণ, আমাদের প্রতিহত গতি। যা-কিছু ইংরেজি তার দিকে বাঙালির উদ্‌বোধিত চিত্ত একান্ত প্রবলবেগে ছুটেছিল; ইংরেজের অত্যন্ত কাছে যাবার জন্যে আমরা প্রস্তুত হয়েছিলুম—এ সম্বন্ধে সকল রকম সংস্কারের বাধা লঙ্ঘন করবার জন্য বাঙালিই সর্বপ্রথমে উদ্যত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু, এইখানে ইংরেজের কাছেই যখন বাধা পেল তখন বাঙালির মনে যে প্রচণ্ড অভিমান জেগে উঠল সেটা হচ্ছে তার অনুরাগেরই বিকার।

এই অভিমানই আজ নবযুগের শিক্ষাকে গ্রহণ করবার পক্ষে বাঙালির মনে সকলের চেয়ে বড়ো অন্তরায় হয়ে উঠেছে। আজ আমরা যে-সকল কূটতর্ক ও মিথ্যা যুক্তি দ্বারা পশ্চিমের প্রভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করবার চেষ্টা করছি সেটা আমাদের স্বাভাবিক নয়! এইজন্যই সেটা এমন সুতীব্র, সেটা ব্যাধির প্রকোপের মতো পীড়ার দ্বারা এমন করে আমাদের সচেতন করে তুলেছে।

বাঙালির মনের এই প্রবল বিরোধের মধ্যেও তার চলন-ধর্মই প্রকাশ পায়। কিন্তু, বিরোধ কখনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। বিরোধে দৃষ্টি কলুষিত ও শক্তি বিকৃত হয়ে যায়। যত বড়ো বেদনাই আমাদের মনে থাক্, এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের সিংহদ্বার উদ্ঘাটনের ভার বাঙালির উপরেই পড়েছে। এইজন্যেই বাংলার নবযুগের প্রথম পথপ্রবর্তক রামমোহন রায়। পশ্চিমকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে তিনি ভীরুতা করেন নি, কেননা, পূর্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অটল ছিল। তিনি যে-পশ্চিমকে দেখতে পেয়েছিলেন সে তো শস্ত্রধারী পশ্চিম নয়, বাণিজ্যজীবী পশ্চিম নয়, সে হচ্ছে জ্ঞানে-প্রাণে-উদ্ভাসিত পশ্চিম।

জাপান য়ুরোপের কাছ থেকে কর্মের দীক্ষা আর অস্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেছে। তার কাছ থেকে বিজ্ঞানের শিক্ষাও সে লাভ করতে বসেছে। কিন্তু, আমি যতটা দেখেছি তাতে আমার মনে হয়, য়ুরোপের সঙ্গে জাপানের একটা অন্তরতর জায়গায় অনৈক্য আছে। যে গূঢ় ভিত্তির উপরে য়ুরোপের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত সেটা আধ্যাত্মিক। সেটা কেবলমাত্র কর্মনৈপুণ্য নয়, সেটা তার নৈতিক আদর্শ। এইখানে জাপানের সঙ্গে য়ুরোপের মূলগত প্রভেদ। মনুষ্যত্বের যে-সাধনা অমৃতলোককে মানে এবং সেই অভিমুখে চলতে থাকে, যে-সাধনা কেবলমাত্র সামাজিক ব্যবস্থার অঙ্গ নয়, যে-সাধনা সাংসারিক প্রয়োজন বা স্বজাতিগত স্বার্থকেও অতিক্রম করে আপনার লক্ষ্য স্থাপন করেছে, সেই সাধনার ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে য়ুরোপের মিল যত সহজ জাপানের সঙ্গে তার মিল তত সহজ নয়। জাপানি সভ্যতার সৌধ এক-মহলা—সেই হচ্ছে তার সমস্ত শক্তি এবং দক্ষতার নিকেতন। সেখানকার ভাণ্ডারের সব চেয়ে বড়ো জিনিস যা সঞ্চিত হয় সে হচ্ছে কৃতকর্মতা; সেখানকার মন্দিরে সব চেয়ে বড়ো দেবতা স্বাদেশিক স্বার্থ। জাপান তাই সমস্ত য়ুরোপের মধ্যে সহজেই আধুনিক জর্মনির শক্তি-উপাসক নবীন দার্শনিকদের কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করতে পেরেছে; নীট্‌ঝের গ্রন্থ তাদের কাছে সব চেয়ে সমাদৃত। তাই আজ পর্যন্ত জাপান ভালো করে স্থির করতেই পারলে না—কোনো ধর্মে তার প্রয়োজন আছে কিনা, এবং ধর্মটা কী। কিছুদিন এমনও তার সংকল্প ছিল যে, সে খৃস্টানধর্ম গ্রহণ করবে। তখন তার বিশ্বাস ছিল যে, য়ুরোপ যে ধর্মকে আশ্রয় করেছে সেই ধর্ম হয়তো তাকে শক্তি দিয়েছে, অতএব খৃস্টানিকে কামান-বন্দুকের সঙ্গে সঙ্গেই সংগ্রহ করা দরকার হবে। কিন্তু, আধুনিক য়ুরোপে শক্তি-উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে কিছুকাল থেকে এই কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে যে, খৃস্টানধর্ম স্বভাবদুর্বলের ধর্ম, তা বীরের ধর্ম নয়। য়ুরোপ বলতে শুরু করেছিল, যে-মানুষ ক্ষীণ তারই স্বার্থে নম্রতা ক্ষমা ও ত্যাগধর্ম প্রচার করা। সংসারে যারা পরাজিত সে-ধর্মে তাদেরই সুবিধা; সংসারে যারা জয়শীল সে-ধর্মে তাদের বাধা। এই কথাটা

জাপানের মনে সহজেই লেগেছে। এইজন্যে জাপানের রাজশক্তি আজ মানুষের ধর্মবুদ্ধিকে অবজ্ঞা করছে। এই অবজ্ঞা আর-কোনো দেশে চলতে পারত না; কিন্তু জাপানে চলতে পারছে তার কারণ জাপানে এই বোধের বিকাশ ছিল না এবং সেই বোধের অভাব নিয়েই জাপান আজ গর্ব বোধ করছে—সে জানছে, পরকালের দাবি থেকে সে মুক্ত, এইজন্যই ইহকালে সে জয়ী হবে।

জাপানের কর্তৃপক্ষরা যে ধর্মকে বিশেষরূপে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন সে হচ্ছে শিন্তো ধর্ম। তার কারণ, এই ধর্ম কেবলমাত্র সংস্কারমূলক, আধ্যাত্মিকতামূলক নয়। এই ধর্ম রাজাকে এবং পূর্বপুরুষদের দেবতা বলে মানে। সুতরাং স্বদেশাসক্তিকে সুতীব্র করে তোলবার উপায়-রূপে এই সংস্কারকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কিন্তু, য়ুরোপীয় সভ্যতা মঙ্গোলীয় সভ্যতার মতো এক-মহাল নয়। তার একটি অন্তরমহল আছে। সে অনেক দিন থেকেই Kingdom of Heavenকে স্বীকার করে আসছে। সেখানে নম্র যে সে জয়ী হয়; পর যে সে আপনার চেয়ে বেশি হয়ে ওঠে। কৃতকর্মতা নয়, পরমার্থই সেখানে চরম সম্পদ। অনন্তের ক্ষেত্রে সংসার সেখানে আপনার সত্য মূল্য লাভ করে।

য়ুরোপীয় সভ্যতার এই অন্তরমহলের দ্বার কখনো কখনো বন্ধ হয়ে যায়, কখনো কখনো সেখানকার দীপ জ্বলে না। তা হোক, কিন্তু এ মহলের পাকা ভিত; বাইরের কামান গোলা এর দেয়াল ভাঙতে পারবে না; শেষ পর্যন্তই এ টিঁকে থাকবে এবং এইখানেই সভ্যতার সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে।

আমাদের সঙ্গে য়ুরোপের আর-কোথাও মিল যদি না থাকে, এই বড়ো জায়গায় মিল আছে। আমরা অন্তরতর মানুষকে মানি—তাকে বাইরের মানুষের চেয়ে বেশি মানি। যে জন্ম মানুষের দ্বিতীয় জন্ম, তার জন্যে আমরা বেদনা অনুভব করি। এই জায়গায়, মানুষের এই অন্তরমহলে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের যাতায়াতের একটা পদচিহ্ন দেখতে পাই। এই অন্তরমহলে মানুষের যে-মিলন সেই মিলনই সত্য মিলন। এই মিলনের দ্বার উদ্ঘাটন করবার কাজে বাঙালির আহ্বান আছে, তার অনেক চিহ্ন অনেকদিন থেকেই দেখা যাচ্ছে।

সংযোজন

'জাপান-যাত্রী' প্রকাশের (১৯১৯) পর রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ সালে যখন পুনর্বার জাপানে যান তখন যে-সকল বক্তৃতা দেন তার মধ্যে দুটি ইংরেজি বক্তৃতা 'সংযোজন' অংশে সংকলিত হল। অপর বাংলা প্রবন্ধ 'ধ্যানী জাপান'-এ ১৯২৯ সালে জাপান-ভ্রমণের প্রসঙ্গ আছে।

ধ্যানী জাপান

কোরিয়ায় আমার নিমন্ত্রণ ছিল, যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম। কথা ছিল সেখান থেকে রেলপথে রাশিয়ায় যাব। সেখানে জনসাধারণকে কী ভাবে ও কী পরিমাণে অশিক্ষা থেকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা হয়েছে সেইটি জানবার জন্যে আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল। কিন্তু আমার আয়ু চার কুড়ি বছরের মধ্যঘাটে এসে পৌঁচেছে, এ কথাটা যদিও আমি প্রায় ভুলি এবং অন্য যাদের গরজ তারাও মনে রাখতে চায় না, তবু মহাকালের হিসাবরক্ষক সতর্ক আছেন। তাই বয়সের বোঝার উপর কর্মের বোঝা বেড়ে উঠে ক্লান্তিতে আমাকে অভিভূত করে দিলে। জাপানের একজন বড়ো ডাক্তার এসে আমার দেহটাকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে বাজিয়ে নিয়ে অন্তত দশ দিনের জন্যে শয়নকক্ষে আমাকে অশ্রম কারাবাসের আদেশ করে দিলেন। সেইসঙ্গে আমার সমস্ত কর্তব্যের নিমন্ত্রণ বাজেয়াপ্ত হল। আগামী শরৎকাল পর্যন্ত জাপানে আমার আতিথ্যের প্রস্তাব ও আয়োজন ছিল। প্রতিকূল স্বাস্থ্য বাধা দেওয়াতে দেশে ফেরবার পথে যাত্রার উদ্যোগ করলেম।

তখন আমি তোকিয়োতে একটি জাপানি সুহৃদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তাঁর কাগজের কারবার, তিনি ধনী। জাপানের সঙ্গে সর্বদেশের হৃদ্যতার সম্বন্ধ ঘটে এই তাঁর ইচ্ছা। এইজন্য তিনি বিস্তর অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠিত নন। এ ছাড়া জনসাধারণকে ধর্ম কর্ম ও জ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্যে তিনি বাড়ির কাছে বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। এ কথা শুনে অনেকে বিস্মিত হবেন যে, ধ্যানচর্চাও তাঁর শিক্ষা-ব্যাপারের একটি অঙ্গ। ধ্যান অভ্যাসের জন্যে মস্ত একটি নিভৃত ঘর তিনি তৈরি করে রেখেছেন। একদা বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে জাপানে ধ্যানের প্রচার হয়েছিল। দেবপূজার সঙ্গে এই ধ্যানের যোগ নেই; মনকে স্তব্ধ করা, অবহিত করা, ধৈর্য ও বুদ্ধিশক্তিকে দৃঢ় করার পক্ষে ধ্যানের উপযোগিতা সেখানে সকলে স্বীকার করে। সাধারণত জীবনযাত্রায় নৈপুণ্য ও সৌষ্ঠব-সাধনের জন্যে ধ্যান একটা প্রধান উপায় এ কথা জাপানের সাধারণ লোকেও বোঝে। সেখানে চা-পানের একটি অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। তাকে ধর্মানুষ্ঠান বলা যায় না, অথচ তার ক্রিয়াপদ্ধতি ধর্মানুষ্ঠানের মতোই একটি শ্রদ্ধাপূর্ণ গাম্ভীর্য-দ্বারা পরিবৃত। চা-প্রস্তুত ও চা-পানের সমস্ত প্রণালীর ভিতর দিয়ে দেহমনের ধ্যানসিদ্ধ সংযমকে অস্খলিতভাবে প্রকাশ করাই এর উদ্দেশ্য বলে আমার মনে হয়েছিল। গতবারে জাপানে থাকতে এক জায়গায় শরপ্রয়োগ-অনুশীলনের সুযোগ দেখেছিলাম। ব্যাপারটা কেবলমাত্র হাতের কৌশল বা দৈহিক ব্যায়াম নয়, এটাকে তারা আধ্যাত্মিক সাধনা বলেই জানে। এটা শরচালনার যোগে ধ্যানেরই অভ্যাস—মনকে একাগ্র করবার চর্চাই এর মূলে। কেবল দৃষ্টিশক্তি নয় ধ্যানশক্তিতেই আন্তরিক বাহ্যিক সকলপ্রকার লক্ষ্যসিদ্ধি হয়, ধনুর্বিদ্যাচর্চায় এই তত্ত্বকেই তারা স্বীকার করে। দ্বিতীয় বারে যখন জাপানে যাই আমার সঙ্গে পিয়র্সন ছিলেন। জাপানের একজন ডাক্তার তাঁকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে যান। আরোগ্যলাভের পক্ষে ধ্যানের শক্তি যে একটি প্রধান উপায় এই তাঁর মত; পিয়র্সনকে তিনি তাঁর নিভৃত আশ্রমে ধ্যানের দীক্ষা দিয়েছিলেন। এ কথা সকলেই জানেন, জাপানে একটি বৌদ্ধ সম্প্রদায় আছে যে সম্প্রদায়ের লোক মুক্তিসাধনার জন্য ধ্যানের প্রতিই বিশেষ আস্থা রাখেন। আমি গতবারে সেই 'জেন' (ধ্যান) সম্প্রদায়ের এক মঠে গিয়ে সেখানকার প্রধান সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। ধ্যানের দ্বারা আত্মশক্তি লাভ ও আত্মশক্তির দ্বারা মুক্তির বাধা দূর করা সম্বন্ধে তিনি যা বলেছিলেন তার মধ্যে আমাদের ভারতীয় সাধনারই একটি বিশেষ তত্ত্ব অনুভব করলুম। সেবারে তোকিয়ো নারী-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা আমাকে কারাইজাওয়া পাহাড়ের উপর নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে গ্রীষ্মাবকাশের সময় একদল ছাত্রী প্রতিবৎসর কোনো একজন উপদেষ্টার কাছে কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করে থাকেন। আমার কাছে শুনতে চাইলেন ধ্যানতত্ত্ব সম্বন্ধে। আমি তাঁদের অনুরোধ শুনে বিস্মিত হয়েছিলেম। তখনো আমি জানতাম না যে, ধ্যানের সাধনা সেখানে সকলেরই জানা।

বস্তুত ক্রমশই বুঝতে পারলেম— জাপানের সমস্ত লোকের মধ্যেই গোচরে ও অগোচরে ধ্যানের প্রভাব কাজ করছে। এই জাতের সর্বপ্রধান শক্তি যেটা দেখতে পেয়েছি, সেটা হচ্ছে সংযম। তাদের দেহচালনার মধ্যে আশ্চর্য একটি ধৈর্য আছে, মনের মধ্যেও তাই। বহু শতাব্দীর অভ্যাসক্রমে এরা কোনো কাজই যেমন-তেমন ক'রে করে না, একান্ত নিবিষ্ট হয়ে ও শোভনভাবে করে, দেখে কেবলই মনে হয় কাজের সমস্ত প্রণালীর মধ্যে আগাগোড়া এরা সমস্ত মনকে স্থাপিত করতে শিখেছে। এটাই হচ্ছে কর্মের মধ্যে ধ্যান। একটি সাধারণ মেয়েকে খাবার সময় লক্ষ করে দেখেছি— পাত্র হাতে তুলে ধরা, গ্রাস মুখে তুলে নেওয়া, সমস্তই সুবিহিত যত্নে ও সংযতভাবে করে— আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে আহার ব্যাপারে যে অসংযম ও অশোভনতা আছে এ তার একেবারেই বিপরীত। এই মেয়েটিকেই পুষ্পপাত্রে ফুল সাজাতে দেখলেম— সে যেন কার আরাধনা, তাতে কত নৈপুণ্য, কত নিষ্ঠা! যথারীতি ফুল সাজাবার বিদ্যা শিখতে এদের দু-তিন বৎসর লাগে। কোবেতে একজন শিক্ষয়িত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম, এত অভিনিবেশের সঙ্গে এই-যে ফুল সাজানো তোমরা সম্পন্ন কর, এর সম্বন্ধে তোমাদের এত যে বেশি সতর্কতা, এর অর্থটা কী? তিনি আমাকে বললেন, ইতিহাসবিখ্যাত তাঁদের একজন যোদ্ধা একদা বলেছিলেন যে, এই ফুল সাজানোর অনুষ্ঠানে তাঁকে তাঁর যুদ্ধ ব্যাপারে শিক্ষা ও উৎসাহ দেয়। আমি বুঝলুম, এই-যে অবিচলিত মনের ধ্যানের দ্বারা পুষ্পপাত্রে ফুলের প্রসাধন সুসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, সেই ধ্যানের একাগ্রতাই যুদ্ধজয়ের প্রধান শক্তি। একদিন য়োকোহামায় একজন সুবিখ্যাত আধুনিক চিত্রকরের বাড়িতে গিয়ে দেখি তাঁর একটি ঘরের পাশে বেদীতে বুদ্ধদেবের মূর্তি। শোনা গেল সেই বুদ্ধের সামনে বসে ধ্যান করে তবে ছবি আঁকেন। এমন নয় যে বুদ্ধেরই ছবি— কিন্তু ধ্যানের দ্বারা চিত্রকরের রচনাশক্তির জড়তা ঘোচে, চিত্তের উদ্যম সম্পূর্ণ জাগ্রত হয়ে ওঠে।

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে যে ধ্যানের সাধনা চীন ও চীন থেকে জাপানে প্রবর্তিত হয়েছিল চীনের চিত্রকলায় তারই প্রভাব যে কত প্রবল সে সম্বন্ধে Pilgrimage of Buddhism-নামক গ্রন্থে যে আলোচনা হয়েছে তার থেকে একটা অংশ আমি অনুবাদ করে দিই।

'চা'ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রভাব চৈন চিত্রকরদের মনকে যখন অধিকার করলে তখন তাঁরা ফোটো-গ্রাফের মতো নকল করার দিকে গেলেন না। যে-কোনো ভূদৃশ্য বা মানুষ বা জন্তুর রূপ তাঁরা প্রকাশ করতে চেয়েছেন প্রথমে তার মর্মটুকু অন্তরের মধ্যে শোষণ করে নিয়ে তার পরে ভিতরের দিক থেকে বাইরে সেটাকে প্রকাশ করতেন। যদি একটা ঝর্না আঁকবার ইচ্ছা করতেন তা হলে প্রহরের পর প্রহর তার সামনে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে থাকতেন, হয়তো একটি নকশা মাত্র করতেন না, তার পরে সেই দৃশ্যটির উপলব্ধি হৃদয়ের মধ্যে নিয়ে ঘরে ফিরতেন, অবশেষে সেই উপলব্ধিটিকে তুলি দিয়ে প্রকাশ করতেন।'

প্রাচীন চৈন চিত্রকলা সব প্রথমে সকলের চেয়ে বড়ো প্রেরণা পেয়েছে বৌদ্ধধর্মের কাছ থেকে। ফেনেলোসা বলেন, বিশেষ শাস্ত্রের এবং বিশেষ অনুশাসনের বন্ধন থেকে চা'ন বৌদ্ধ সম্প্রদায় মুক্তি ঘোষণা করলেন। তাঁরা দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বললেন যে, বুদ্ধের প্রকৃতির দ্বারা বিশ্বের সমস্তই ওতপ্রোত—

It was these suggestions that led the greatest painters of the Tang and Sung into those mystical and masterly interpretations of life and landscape that mark the acme of Chinese and have given to Chinese (and Japanese) painting that peculiar inwardness which marks it off from all the art of the West.

বিশ্বব্যাপী বুদ্ধের প্রকৃতিকে ধ্যানের দ্বারা অন্তরে আকর্ষণ করে নিয়ে চিত্রকর তবেই তাঁর চিত্রকে মহত্ত্ব দিয়েছেন। বিশ্বের অন্তরগত সেই সত্যের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হতে পারলে, শুধু ছবি আঁকা কেন, জীবনের সকল কার্যই বিশুদ্ধ ও সুসম্পূর্ণ হতে পারে এই বিশ্বাসটি একদা

চীনে জাপানে কাজ করেছে, এবং স্পষ্ট দেখতে পাই জাপানে আজও তার প্রভাব জ্ঞাত-বা-অজ্ঞাত-সারে প্রচলিত আছে। আমাকে কৃষি-অনুরাগী একজন জাপানি ভদ্রলোক বলেছিলেন যে, মৈত্রী পদার্থটি বিশ্বের মূলগত সত্য, তাই তিনি বিশ্বাস করেন যে, মাটিকে ভালোবাসার সঙ্গে চাষ করলে তবেই মাটির কাছ থেকে পূর্ণ প্রতিদান পাওয়া যায়।—এর থেকে বোঝা যায় সত্যের সঙ্গে ধ্যানের যোগ শুধু কেবল আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নয়, আধিভৌতিক সাধনাতেও তার প্রধান স্থান আছে, এই তত্ত্বটি জাপান যেন নানা আকারে গ্রহণ করেছে।

আমি জাপানে বক্তৃতাসভায় ও মেয়েদের বিদ্যালয়ে অনেকবার অনেক জনতা দেখেছি, তাদের থিয়েটারে মেয়ে পুরুষ দর্শক-সমাগমের মধ্যে বসেছি—তাদের ধৈর্য ও স্তব্ধতা দেখে বিস্ময় জন্মেছে। প্রথমবারে জাপানে যখন গিয়েছিলাম য়োকোহামার একটি বাগানবাড়িতে আমার বাসা ছিল। শনি-রবিবারে ছুটি উপলক্ষে সেই বাগানে বিস্তর লোক বেড়াতে আসত। আশ্চর্য সংযম। গোলমাল শুনতে পাই নি। দেখি নি যে কেউ ফুল ছিঁড়ছে বা লেশমাত্র আবর্জনায় বনপথ আকীর্ণ করছে, অচঞ্চল শান্তির সঙ্গে সকলে প্রকৃতির সৌন্দর্যভোগে নিবিষ্ট। কলহের কারণ ঘটতে অনেকবার দেখেছি, কিন্তু কলহ ঘটতে দেখি নি। চীৎকারশব্দে কর্কশ ভাষায় কেউ কাউকে গালি-গালাজ করছে এ একবারও আমার চোখে পড়ল না। অথচ জাপানের এই ধৈর্য এই শান্তি একেবারেই কাপুরুষের নয় এ কথা বলা বাহুল্য। স্বভাবকে বশে রেখে চাঞ্চল্যকে নিরোধ করে জাপান যে শক্তির বিকার বা খর্বতা ঘটিয়েছে, এ কথা বলা চলবে না।

ধ্যানের যুগ, সংযমের সাধনা, সমস্ত পৃথিবী থেকেই আজ তিরস্কৃত হচ্ছে। অন্তরগূঢ় শক্তি-সঞ্চয়ের দ্বারা জীবনের যে পরিণতি ও কর্মের যে উৎকর্ষ ঘটে তার উপর থেকে মানুষের বিশ্বাস পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। উদ্দামভাবে চাঞ্চল্যপ্রকাশের জয়কীর্তন জাপানকেও অধিকার ও অভিভূত করবে কি না এ কথা আমি সেখানে অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি। তাতে অনেকেই উত্তর দিয়েছে যে, জাপানের বহুযুগব্যাপী চরিত্রসাধনাকে কোনো-কিছুতে একেবারে পরাভূত করতে পারবে এ কখনোই সম্ভবপর নয়।

ধ্যানের শক্তি আলোচনা করবার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধ লিখতে বসি নি। কোরিয়া দেশের একজন যুবকের সঙ্গে একদিন আমার কী কথা হয়েছিল সেইটি জানাবার জন্যে কলম ধরেছিলুম। সে কথা পরে হবে।

ভাদ্র ১৩৩৬

TO THE INDIAN COMMUNITY IN JAPAN

Though I uphold the fundamental unity of the Asiatic mind, I must confess I do not believe in any characteristic which is exclusively Oriental, bearing no intimate relation to the western mind. All great human ideals are universal —only in their grouping, emphasis and expression do they differ from one another. It is therefore necessary, while developing our individual character, to come into close contact with other races which may view from their own standpoint that truth which is also truth for us, but which has with us a special interpretation due to our special experience.

It is the mission of all great countries to complete their view of truth, not by merging their characteristics in those of another people, but by revealing their own personality. There can only be a co-ordination of truth, when the differences in the human world are cultivated and respected.

It is a momentous fact that you, my countrymen, for whatever purpose you may have come, have formed a community in this land. Through you, India must speak to Japan; and if possible the fact of your coming must be a glorious fact. Therefore, you must have a bond of unity among yourselves to give you a personality through which you will be able to communicate with Japan. If that is neglected, then you may return home with a full purse, but leave a gaping emptiness behind.

For myself, I have come to discover something very great in the character of Japan. I am not blind to their faults. You may remember that when I first came to this part of the world I wrote a number of lectures upon Nationalism, which I read in the United States of America. The reason why these thoughts came to me in Japan was because it was here that I first saw the Nation, in all its naked ugliness, whose spirit we Orientals have borrowed from the West.

It came vividly before my eyes, because on the one hand, there were the real people of Japan, producing wonderful works of art, and in the details of their life giving expression to inherited codes of social behaviour and honour, the spirit of *Bushido* : on the other hand, in contrast to the living side of the people, was the spirit of the Nation, arrogantly proud, suffering from the one obsession that it was different from all other Asiatic peoples.

Japan was faced with the most difficult trial of suddenly being startled into power and prosperity and had begun to show all the teeth and claws of the Nation, which have been demoralising the civilised world, spreading far and wide an appalling amount of cruelty and deception. I could not specially blame Japan for this, but I heartily deplored the fact that she, with her code

of honour, her ideal of perfection and her belief in the need for grace in everyday life, could yet become infected with this epidemic of selfishness and with the boastfulness of egotism.

I frankly confess that I was then deeply mortified. For, though the people of Japan, on this first occasion, accepted me with enthusiastic welcome in the beginning, yet directly they came to know the ideas that I had, they felt nervous. They thought that idealism would weaken their morale; that ideals were not for those nations who must be unscrupulously strong; that the Nation must never have any feelings of disgust from the handling of diplomatic filth, or of shrinking from the use of weapons of brutal power. Human victims had to be sought, and the nation had to be enriched with plunder.

Nevertheless, I did not blame Japan for considering me to be dangerous. Though I felt the hurt of this evil, yet at the same time I knew that beneath the iron mail-coat of the Nation the living spirit of the People had been working in secret. To-day I feel sure that these people have the promise of a great future, though that may not be evident in the facts of the present. Truth is often hidden behind the obstacle of facts. Let me give you an instance from history.

Nobody can doubt that Europe has always had her great intellectual strength of mind. She shuns exaggeration, and seeks accuracy in dealing with the material world. She has dominated the whole of mankind to-day with a marvellous vigour and clearness of thought. But you will remember a time when her people believed in witchcraft and tortured inoffensive women. They burnt Giordano Bruno for his greatness of genius, made it impossible for Galileo to speak out the truths of astronomy, and caused men to suffer unspeakable bodily pain when suspected of holding opinions a little more rational than the religious creed which it was held right and proper for them to believe. If you had built your theory of the European mind upon the facts of those days, Europe would have appeared the darkest place in the world, where freedom of thought was considered dangerous, and freedom of conscience impious. Yet even through these facts the vigorous intellect of Europe was all the time at work, silently and secretly.

I warn you never to rely on facts, to beware of keeping a superstitious faith in them. The truth which works in the obscure depth of facts is not obvious. It is like the underground stream of water, the fact of whose existence is contradicted by the rude rocks on the surface. One needs a power of vision and sympathy in order to discover the truth which is the innermost creative force of a people. I feel it strongly that we in India have many things to learn from Japan, if only we can be humble. Even those things in their civilisation which we cannot accept and admire, we ought to be able to under-

stand, by viewing them in their proper place and perspective, and not by fixing them against the background of our own tradition and sentiment.

. . .

I deem myself fortunate in having noted this time certain characteristic truths in the Japanese race, which I believe will work through their subconscious mind and one day produce great results in a luminous revelation of their soul. Let me offer a few sketches from the notebook of my memory which may give you a picture of their spirit.

Nine years ago, when I was living at Mr. Hara's house in Yokohama, it struck me every day, in his beautiful garden, how working-men would be coming out of the factories at midday and walking for a considerable distance to sit under the shade of his pine forest, silently to watch the meeting of the great sea and the sky for some five minutes, as though it were food and drink to them, and then walking all the way back to their work. This is a great achievement, that the whole people of the land should come to have a hunger for the beauty that is serene and great, that has no appeal to their sensual excitement; a beauty with which, in the busiest time of the day, they could steep their mind, and thus realise their freedom in the Infinite.

On every Saturday and Sunday, men, women and children would crowd through the different alleys and avenues of pines and oaks, threading their way to some open space in the mellow light of the afternoon. There was no sign of rowdyism, no trampling of grass or plucking of flowers, no strewing of the forest path with the peel of bananas, skins of oranges, or torn pieces of newspaper. There was no unseemly scene, no brawling drunkenness, no shrieking laughter, no menacing pugnacity.

These people belonged to the working classes. In other countries, we know what is the foundation of the enjoyment of such people, what strong sensations they need,—sensations which shew the insensitiveness of a mind which has to be roused by all kinds of rude jerks and shocks. But here, their holiday time seemed to me like the perfect flower of the lotus open to the pure light of the sky, to which they came like a joyous swarm of bees to sip the hidden honey in silence. This meant something great in the people and it won my heart.

...It is this profound feeling for beauty, this calm sense of perfection, that is expressed in various ways in their daily conduct. The constant exercise of patience in their daily life is the patience of a strength, which revels in the fashioning of exquisite behaviour with a self-control that is almost spiritual in its outward expression.

One day I was travelling in a motor car through the country, when we came upon a lumbering market cart which obstructed the way. What struck

me specially was the patience of the motor driver. He uttered not a single rude word, but waited for a long while in perfect composure of mind and expression, until the cart could give him right of way. Each driver then saluted and we passed on. On another occasion, our motor car, by a mistake of the driver, knocked against a bicycle, and threw down the rider. In spite of his bruises he spoke not a word of recrimination, nor did he even refer to our driver's mistake. He simply got up, wiped the blood from his cheek, and rode away as if nothing had happened. This little incident represented a great fact.

In a variety of ways, I have seen in the conduct of the Japanese their wonderful self-control, and what seems to be a sense of forgiveness, or at least of mutual understanding. In the cases I have mentioned, both parties made silent allowance for each other's mistakes. This is not easy. It has required strenuous discipline and centuries of civilisation. I have travelled all over the world, and yet if I compare this with what prevails elsewhere, or in India, I shall have to confess that the Japanese possess a monopoly of certain elements of heroism—a heroism which is one with their artistic genius. In its essence, it has a strong energy of movement; in its form, it has that perfect proportion which comes of self-mastery. It is a creation of two opposing forces, that of expression and that of repression.

I have often asked myself, how these special qualities of the Japanese originated.

Nature in Japan offers many contradictions in her physical aspect, which balance one another. On the one hand, there is an exuberance of vegetation, but not being in a tropical country this is under control. In our country, the forest has a dense undergrowth, in which weeds find the same indulgence as the great fruit-bearing trees. In a tropical climate, extravagant nature finds no check in her exaggeration. In Japan, hard rocks and well-irrigated soil, the rich earth and the cold climate that does not tolerate utter intemperance of life, are found together; and they keep a balance between the different impulses of nature.

Improvident wealth becomes vulgar in its display of profusion. Only there, where wealth of strength and material combines with modesty of manifestation, does richness of truth find beauteous form. Nature in Japan has such cadence born of contradiction. Everywhere there is the contrast—on the one hand of her hills, silent and motionless, and on the other, of her dancing streams, full of laughter. Surrounding her slim figure is the sea with its perpetual lure of adventure for men; while the rich fertility of her lowlands, tended by the rain from the sky and the rivers from her hill-sides, has its message of the settled life of agriculture, maintained by a complex code of moral obligation, mutual understanding and forbearance.

Out of all this, has been built a society contrary to the predatory civilisation

which for its food and materials depends upon exploitation, forcible or cunning. Her sea gives her children courage and curiosity for new experiences; it has made them familiar with the mutability of life. Not having the idea of stability in her earth, which has its seat upon the restless shoulders of the demon Earthquake, the close neighbourhood of life and death has constantly been made evident to her children. The play of sudden changes, terrible in might, against the background of a unique world of beauty, tender and yet majestic, has made her mind easily adaptable to new ideas, all the while keeping her own personality pure and firm, imparting to new thoughts her own meaning, and to new forms her own magic of beauty.

There is a further contrast in the field of the mind. Buddhism is a religion which calls to meditation and introspection, to self-control and self-emancipation, repression of passion and cultivation of sympathy. In opposition to this, owing to their cold climate and hilly country, to their need of intensive effort for producing the necessities of life within the narrow boundaries of her islands, a vigorous mentality has been developed in her children, and their character has been moulded into a greatness in which are mingled self-confidence with self-mastery, force of decision with grace of skill, love of existence with forgetfulness of death, active courage with patient considerateness.

These people have thus come to believe in a heroism which is not in self-exaggeration, but in a resigned spirit that can quietly accept either action or inaction as honour or duty might dictate. Therein lies the beauty of their strength; it is in that detachment of mind, which does not forget the ideal of excellence in its greed and hurry for result. When I first saw their flower decoration, on my former visit to Japan, they told me how a great hero in their history had said that the contemplation of it helped him in his fighting. That is to say, perfect heroism finds its inspiration in the music of truth which is in beauty.

The convulsive and artificial cult of self-mutilation Japan has never accepted as a means of attaining virility or spiritual excellence; for she has received her lesson from nature's own teaching. She knows that in the tenderest of life's manifestations there is not only more strength, but also more heroism, than in the rugged asceticism of the rocks. The real strength is not in the vast desert, but in the green grass, whose triumphant life survives the trampling march of time in an endless resurrection of beauty. Our character shows its weakness when it confuses rudeness with strength; when it is self-assertive in its stark asceticism...

Japan must prove to the world that the present utilitarian spirit may be wedded to beauty. If Science and Art, necessity and joy, the machine and life, are once united, that will be a great day...

...it is Rhythm itself which is in the heart of Reality...every atom is

a ring-dance of lights round a luminous centre. Only a difference in their dance measure is responsible for the difference in the elements. It is through the chain of these varied dances, which are the cadence of beauty, that this universe of Reality has its play in the courtyard of time and space...

...

Great periods of history are periods of eruption, unlooked for and seemingly against the times, but they have all along been cradled in the dark chamber of the people's inner nature. The ugly spirit of the market has come from across the sea into the beautiful land of Japan. It may, for the time, find its lodging in the guest-house of the people; but their home will ultimately banish it. For it is a menace to the genius of her race, a sacrilege to the best that she has attained and must keep safe, not only for her own salvation, but for the glory of all humanity.

April 1925

THE SOUL OF THE EAST

My friends, it is unfortunate that the medium of language between us is a foggy medium, which makes it difficult for me to give you a clear idea of what I have in my mind about your country, which I have just visited...

You must first of all consider, that a man who comes to a foreign land is bound to carry with him his own traditional habits of thinking and his prejudices, of whatever kind they may be. We none of us bring a clean slate. We already have some opinions from our reading books that are far from accurate, and from our own bias and personal habits; and, therefore, you cannot accept such opinions as final, and have to make allowances for personal temperament.

...But we should not exaggerate this side of the matter over-much; for, being human, all of us, in whatever country we may live, we can understand one another in spite of barriers; and I truly believe that I have been able to understand Japan. When I say this, I simply mean that I have been able to love your people. That proves conclusively that I have found something positive, not accidental; something universal, not merely ephemeral. Love itself is perfect understanding.

I have often noticed that European visitors try to see in you something similar to themselves, and when they observe how well you have managed to handle things borrowed from the West—railways, telegraphs, post offices, and the like—they express their satisfaction. I have read a remark made by an English traveller, that Japan according to him does not belong to the 'East', nor China; they are almost 'Western'. Only India, it would appear, is truly in the Orient. This traveller came with his own bias and critical intellect; and through that he saw all that he saw.

Well, I must confess that I have brought with me, to the Far East, my Eastern mind with its own vision. It is not scientific, it is not analytical. I could not help judging you with that mind of mine, which belongs to Asia. I tried to find out what you are, and not what you have, nor what you could borrow from the West. What difference did I find between the Western point of view and that of the East? That is the question I had to put before myself; and I would like to give you the answer which I found.

I think that we, in the East, have more faith in personality, in human relationship. All our attachments are keenly personal, human. Science deals with the impersonal, the non-human, the mechanical, the things that can be weighed and measured and tabulated. These are useful things, no doubt. Through them we can organise our forces better in certain respects than through mere personal ways, producing accurate, standardised articles by the

million, every one of them monotonously the same. That makes you think you have got the exact thing and feel that you are not cheated.

It may be that, in our Eastern countries, people have not such sense of accuracy in external things, of which we, therefore, often make a mess and thereupon win laughter from the West, which concludes that we are not worthy of any great responsibility because we cannot master their machine. But one fact we must remember and try to find out its significance, namely, that all the oldest and longest civilisations have been Eastern.

Great Greece only lived a very short time. Great Rome is now nowhere. We find immense vicissitudes among modern Western nations, which, even now, are in such a condition that we cannot be satisfied as to their permanence.

But on the other hand, look at China. It is easy to say that her central government is fearfully mismanaged, but we must acknowledge that the people are living, are civilisd, are peaceful in their relations to one another, and acknowledge their obligations to their surrounding neighbours with a high code of social ethics, handed down from the past. China is the oldest civilisation. There must be some meaning in this. It cannot be accidental. Truth only survives. Anything that is untrue dies. When we find a people with a long and continuous history, we must know that it has found some elixir of life. Even their drawbacks prove their vitality; for they show that China was able to survive in spite of them all. Could you imagine any other nation suffering from such political mistakes, corruption and maladministration, and not being broken into pieces? But China shows no sign of final dissolution. Deep in the heart, she has the living human personality; and to this, chiefly, she owes her wonderful vitality.

'Well', I said to myself when I saw all this, 'here is the secret of the East. The mystery of Everlasting Life the East did solve and here is the solution.' I tried, when I came to Japan, to find out if you also had found this solution.

It is tautology to speak of 'man' as 'human', but it contains a profound truth. For it is 'man' that is all-important, it is 'man' who lives, not the machine. If any nation has this gift of conserving its human relations, then that is life, eternal life; for that is man's truth, man's ideal, man's goal—not railways factories and machinery, but humanity. So I asked myself concerning the Japanese, when I came to your country,—'Are they human; or are they merely efficient? Are they mere organisers, efficient organisers like the West, or are there beneath all these borrowed feathers human hearts?'

...I found your soul. That which is external,—your science, your organisation—that you got from your schoolmasters. But that is not you. It is the 'human' element, that is you. It is the 'human' touch that gives life.

In China, foreigners fix their tentacles round this huge unwieldy people. They are all ready to suck out its lifeblood. Some, on the other hand, are

trying their spells—their fascination of benevolence. Poor China is in a sorry plight. But I felt that China was really living in those of her people, who had never been to Harvard; had never seen skyscrapers; had never used the word Democracy. How close to nature they are, and so how living! This closeness to nature is their life. It accounts for their permanence.

Wonderful words I listened to in China. Wonderful words they were which ancient China taught. And side by side with them, I listened also to those who had their western education. I cannot describe to you my surprise at the words of one of them who wished to empty a beautiful lake, in the midst of the College grounds, and turn it into a 'campus'. Fancy! This from a Chinese, who had inherited the gift of life, not from any machine, not from the West, but from the perfect rhythm of nature which his forefathers had mastered. This speech about turning the lake into a campus, coming from a Chinese, was tragic.

As I watched the Chinese, I found that everything they produced, with their marvellous fingers, was a marvel of beauty. I said : Oh, what a great civilisation this must be, not what the West has called 'progress', but the true civilisation. I had the same feeling about Japan. I saw the shadow of the West lengthening. I saw beauty being swallowed up by western ideas. You are also using these words about 'progress' which the West has taught you. But, when I came closer, I found the same deeply human touch. It is a creative spirit that you have. For it is in this human element that creation lies. The machine is not creative.

Japan can never forget her creative gift, which she has received from of old. I do not mean merely your artistic gift; most certainly I do not mean at all those things you borrow and imitate. There you make awful blunders. Whenever I have seen those imitations, I have wondered how your feeling of beauty could so desert you that your choice in such things should always go astray and the result be so often ludicrous, third-rate, wrong in every way.

But when you handle your own things, there is ever that efficiency which is graceful, which is living. For you have the peculiar proficiency which has grace in it as well as utility. To take one example only—when you offer a gift to anyone, the care you take about it, and the way you offer it, make it beautiful. This shows that you are not in haste. You have leisure for the little gracious acts that are human.

Men in haste want to multiply profit. Profit is good in its place. But man is man, and not merely a profit-making automation. The man who goes on making profits, until he drops down dead in the counting-house—what beauty, what humanity, is there in his life? Such persons are more like dolls, having one movement only which they repeat, never coming to any final meaning at all.

This ludicrous 'efficiency', which the West has cultivated to the utmost pitch, is doing such enormous mischief that it is going to be the death of Man some day. If the machine is at last triumphant, man will be crushed. But I have felt in Japan, in spite of this superficial aspect, a deep human touch in your relationship. You acknowledge personal relationships everywhere. Your government is not a mere Government, but a Person; because your whole civilisation is personal.

....It is the wonderfully complicated and delicate nervous system which makes the human body one. So with the Eastern civilisation. It is this nervous system of the body-politic based on mutual obligation, which makes for its unity. All classes are bound in the East not by contract, but by this inner living bond of unity.

This has given the Eastern Civilisation its humanity; and because of this it has produced great ideals. We are grateful to the West for its Science, but all the great religious Ideals, which save our human nature from wreckage, have sprung from the East, because in the East we believe in the person, not in the machine. We therefore only make ourselves a laughing stock when we copy the West. But our Eastern hearts are touched at once, when we meet with human kindness.

...

Be gentle, be patient; for that will save you; that will make you live; that will give you life everlasting—not machine-guns, not poison gas, not bomb-throwing aeroplanes; in the end, man will only survive where he is human, and not where he is demoniacally making profits. No. Let us, at least, have respect for humanity, and let us not follow in the wake of those who are not so much concerned in nourishing and protecting the truth of Man, as in the so-called interests of what they call their Nordic Race.

Let them rule. But we shall gain our rights of sovereignty in a higher world than theirs—in the spiritual world. There the East has ruled the West in the past, through its great spiritual leaders. Now, even in that there is a downfall in the West, and the spiritual leadership of the East is acknowledged no longer.

But let us accept our moral responsibility as Asiatics. Say with pride that you are not of the West; that you believe in Dharma more than in profit-making. I have seen that you in Japan have this greatness. If I did not see it I should hold my head down. You have your loyalty to man, your love for man, you have infinite patience in little things. All these, and many others, are human traits. They will make you great—not scientific toys and dressed-up dolls from the West.

I do not belittle the West. Truth is very valuable, and the West has

given to us new intellectual truth. But a Devil may make use of it; and Science has lost its divinity through the handling that the West has given it...

Therefore the East must stand firm. The East must exercise her own judgment and reject the encroachment of the inhuman, keeping firm her faith and waiting patiently for a great future. Let again, once more, the Sun arise on the Eastern horizon; and, when the morning does come, it will not be ushered in by the rumbling of market carts, and the clatter of commodities, but by the music of faith.

April 1925

যাত্রী

প্রকাশ : ১৯২৯

১৯২৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আমেরিকায় যাত্রা করে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' এই সময়কার রচনা।

১৯২৭ সালের ১৪ জুলাই পূর্বদ্বীপপুঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করে সেই বছর অক্টোবরের শেষে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 'জাভা-যাত্রীর পত্র' এই সময়কার রচনা।

সাময়িক পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের পর উভয় অংশ ১৯২৯ সালে 'যাত্রী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে দুই অংশ 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' এবং 'জাভা-যাত্রীর পত্র' দুই স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়।

পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি

'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' 'প্রবাসী' পত্রিকায় (১৩৩১-৩২) প্রকাশের পর এই ডায়ারির নতুন কিছু অংশ 'উদ্‌বৃত্ত' নামে 'প্রবাসী'তেই (১৩৩৩) রবীন্দ্রনাথের মুখবন্ধসহ মুদ্রিত হয়; 'যাত্রী'-গ্রন্থভুক্তিকালে (১৩৩৬) এই অংশটি 'পরিশিষ্ট'রূপে স্থান পায়।

যদিও যাত্রীর দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৪২) 'পরিশিষ্ট' অংশোদ্ধৃত রচনাগুলি তারিখ অনুসারে সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়, বর্তমান সংস্করণে যাত্রী (প্রথম সংস্করণ) ও প্রবাসীতে প্রকাশিত রূপেই মুদ্রিত হল।

রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'র মুখবন্ধে লেখেন :

> গাছতলায় শুকনো পাতার নীচে ঝড়ে-পড়া কাঁচাপাকা ফল কিছু-না-কিছু পাওয়া যায়। আমার আবর্জিত ছিন্ন পাতার মধ্য থেকে যে লেখার টুকরোগুলি আমার তরুণ বন্ধু কুড়িয়ে পেয়েছেন, মনে হচ্ছে, সেগুলি সাহিত্যের ভোজে ব্যবহার করার বাধা নেই। তাই তিনি যখন ভাণ্ডারে তোলবার প্রস্তাব করলেন আমি সম্মতি দিলাম।

উল্লিখিত তরুণ বন্ধু অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী।

হারুনা-মারু জাহাজ
২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪

সকাল আটটা। আকাশে ঘন মেঘ, দিগন্ত বৃষ্টিতে ঝাপসা, বাদলার হাওয়া খুঁতখুঁতে ছেলের মতো কিছুতেই শান্ত হতে চাচ্ছে না। বন্দরের শানবাঁধানো বাঁধের ওপারে দুরন্ত সমুদ্র লাফিয়ে লাফিয়ে গর্জে উঠছে, কাকে যেন ঝুঁটি ধরে পেড়ে ফেলতে চায়, নাগাল পায় না। স্বপ্নের আক্রোশে সমস্ত মনটা যেমন বুকের কাছে গুমরে ঠেলে ঠেলে উঠতে থাকে, আর রুদ্ধকণ্ঠের বদ্ধবাণী কান্না হয়ে হা হা করে ফেটে পড়তে চায়, ঐ ফেনিয়ে-ওঠা বোবার গর্জন শুনে বৃষ্টিধারায়-পাণ্ডুবর্ণ সমুদ্রকে তেমনি বোধ হচ্ছে একটা অতলস্পর্শ অক্ষম ক্ষোভের দুঃস্বপ্ন।

যাত্রার মুখে এইরকম দুর্যোগকে কুলক্ষণ বলে মনটা ম্লান হয়ে যায়। আমাদের বুদ্ধিটা পাকা, সে একেলে, লক্ষণ-অলক্ষণ মানে না; আমাদের রক্তটা কাঁচা, সে আদিমকালের—তার ভয়ভাবনাগুলো তর্কবিচারকে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ঝেঁকে ওঠে, ঐ পাথরের বেড়ার ওপারের অবুঝ ঢেউগুলোরই মতো। বুদ্ধি আপন যুক্তির কেল্লার মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির যতরকম ভাষাহীন আভাস-ইঙ্গিতের স্পর্শ থেকে সরে বসে থাকে। রক্ত থাকে আপন বুদ্ধির বেড়ার বাইরে; তার উপর মেঘের ছায়া পড়ে, ঢেউয়ের দোলা লাগে; বাতাসের বাঁশিতে তাকে নাচায়, আলো-আঁধারের ইশারা থেকে সে কত কী মানে বের করে; আকাশে যখন অপ্রসন্নতা তখন তার আর শান্তি নেই।

অনেকবার দূরদেশে যাত্রা করেছি, মনের নোঙরটা তুলতে খুব বেশি টানাটানি করতে হয় নি। এবার সে কিছু যেন জোরে ডাঙা আঁকড়ে আছে। তার থেকে বোধ হচ্ছে, এতদিন পরে আমার বয়স হয়েছে। না-চলতে চাওয়া প্রাণের কৃপণতা, সঞ্চয় কম হলে খরচ করতে সংকোচ হয়।

তবু মনে জানি, ঘাটের থেকে কিছু দূরে গেলেই এই পিছুটানের বাঁধন খসে যাবে। তরুণ পথিক বেরিয়ে আসবে রাজপথে। এই তরুণ একদিন গান গেয়েছিল, 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।' আজই সেই গান কি উজান হাওয়ায় ফিরে গেল। সাগরপারে যে-অপরিচিতা আছে তার অবগুণ্ঠন মোচন করবার জন্যে কি কোনো উৎকণ্ঠা নেই।

কিছুদিন আগে চীন থেকে আমার কাছে নিমন্ত্রণ এসেছিল। সেখানকার লোকে আমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চেয়েছিল—কোনো পাকা কথা। অর্থাৎ, সে নিমন্ত্রণ প্রবীণকে নিমন্ত্রণ।

দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এবার আমার নিমন্ত্রণ এল, তাদের শতবার্ষিক উৎসবে যোগ দেবার জন্যে। তাই হালকা হয়ে চলেছি, আমাকে প্রবীণ সাজতে হবে না। বক্তৃতা যত করি তার কুয়াশার মধ্যে আমি আপনি ঢাকা পড়ে যাই। সে তো আমার কবির পরিচয় নয়।

গুটির থেকে প্রজাপতি বেরয় তার নিজের স্বভাবে। গুটির থেকে রেশমের সুতো বেরতে থাকে বস্তুতত্ত্ববিদের টানাটানিতে। তখন থেকে প্রজাপতির অবস্থা শোকাবহ। আমার মাঝবয়স পেরিয়ে গেলে পর আমি আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গেলুম; সেখানে আমাকে ধরে-বেঁধে বক্তৃতা করালে, তবে ছাড়লে। তার পর থেকে হিতকথার আসরে আমার আনাগোনার আর অন্ত নেই। আমার কবির পরিচয়টা গৌণ হয়ে গেল। পঞ্চাশ বছর কাটিয়েছিলুম সংসারের বেদরকারি মহলে বেসরকারি ভাবে; মনুর মতে যখন বনে যাবার সময় তখন হাজির হতে হল দরকারের দরবারে। সভা সমিতি আমার কাছে সরকারি কাজ আদায় করতে লেগে গেল। এতেই বোধ হচ্ছে, আমার শনির দশা।

কবি হন বা কলাবিৎ হন তাঁরা লোকের ফরমাশ টেনে আনেন—রাজার ফরমাশ, প্রভুর ফরমাশ, বহুপ্রভুর সমাবেশরূপী সাধারণের ফরমাশ। ফরমাশের আক্রমণ থেকে তাঁদের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি নেই। তার একটা কারণ, অন্দরে তাঁরা মানেন সরস্বতীকে, সদরে তাঁদের মেনে চলতে হয় লক্ষ্মীকে। সরস্বতী ডাক দেন অমৃতভাণ্ডারে, লক্ষ্মী ডাক দেন অন্নের ভাণ্ডারে। শ্বেতপদ্মের অমরাবতী আর সোনার পদ্মের অলকাপুরী ঠিক পাশাপাশি নেই। উভয়ত্রই যাদের ট্যাক্সো দিতে হয়, এক

জায়গায় খুশি হয়ে, আরেক জায়গায় দায়ে পড়ে, তাদের বড়ো মুশকিল। জীবিকা অর্জনের দিকে সময় দিলে ভিতরমহলের কাজ চলে না। যেখানে ট্রামের লাইন বসাতে হবে সেখানে ফুলের বাগানের আশা করা মিথ্যে। এই কারণে ফুলবাগানের সঙ্গে আপিসের রাস্তার একটি আপস হয়েছে এই যে, মালি জোগাবে ফুল আর ট্রামলাইনের মালেক জোগাবে অন্ন। দুর্ভাগ্যক্রমে যে-মানুষ অন্ন জোগায় মর্ত্যলোকে তার প্রতাপ বেশি। কারণ, ফুলের শখ পেটের জ্বালার সঙ্গে জবরদস্তিতে সমকক্ষ নয়।

শুধু কেবল অন্ন-বস্ত্র আশ্রয়ের সুযোগটাই বড়ো কথা নয়। ধনীদের যে-টাকা তার জন্যে তাদের নিজের ঘরেই লোহার সিন্দুক আছে, কিন্তু গুণীদের যে-কীর্তি তার খনি যেখানেই থাক্ তার আধার তো তাদের নিজের মনের মধ্যেই নয়। সে-কীর্তি সকল কালের, সকল মানুষের। এইজন্য তার এমন একটি জায়গা পাওয়া চাই যেখান থেকে সকল দেশকালের সে গোচর হতে পারে। বিক্রমাদিত্যের রাজসভার মঞ্চের উপর যে-কবি ছিলেন সেদিনকার ভারতবর্ষে তিনি সকল রসিক-মণ্ডলীর সামনে দাঁড়াতে পেরেছিলেন; গোড়াতেই তাঁর প্রকাশ আচ্ছন্ন হয় নি। প্রাচীনকালে অনেক ভালো কবির ভালো কাব্যও দৈবক্রমে এইরকম উঁচু ডাঙাতে আশ্রয় পায় নি বলে কালের বন্যাস্রোতে ভেসে গেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এ কথা মনে রাখতে হবে, যাঁরা যথার্থ গুণী তাঁরা একটি সহজ কবচ নিয়ে পৃথিবীতে আসেন। ফরমাশ তাঁদের গায়ে এসে পড়ে, কিন্তু মর্মে এসে বিদ্ধ হয় না। এইজন্যেই তাঁরা মারা যান না, ভাবীকালের জন্যে টিঁকে থাকেন। লোভে পড়ে ফরমাশ যারা সম্পূর্ণ স্বীকার করে নেয় তারা তখনই বাঁচে, পরে মরে। আজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অনেকগুলিকেই কালের ভাঙাকুলো থেকে খুঁটে বের করবার জো নেই। তাঁরা রাজার ফরমাশ পুরোপুরি খেটেছিলেন, এইজন্যে তখন হাতে হাতে তাঁদের নগদ পাওনা নিশ্চয়ই আর-সকলের চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু, কালিদাস ফরমাশ খাটতে অপটু ছিলেন বলে দিঙ্‌নাগের স্থূল হস্তের মার তাঁকে বিস্তর খেতে হয়েছিল। তাঁকেও দায়ে পড়ে মাঝে মাঝে ফরমাশ খাটতে হয়েছে, তার প্রমাণ পাই মালবিকাগ্নিমিত্রে। যে দুই-তিনটি কাব্যে কালিদাস রাজাকে মুখে বলেছিলেন 'যে আদেশ, মহারাজ। যা বলছেন তা-ই করব' অথচ সম্পূর্ণ আরেকটা কিছু করেছেন, সেইগুলির জোরেই সেদিনকার রাজসভার অবসানে তাঁর কীর্তিকলাপের অন্ত্যেষ্টি-সৎকার হয়ে যায় নি— চিরদিনের রসিকসভায় তাঁর প্রবেশ অবারিত হয়েছে।

মানুষের কাজের দুটো ক্ষেত্র আছে— একটা প্রয়োজনের, আর-একটা লীলার। প্রয়োজনের তাগিদ সমস্তই বাইরের থেকে, অভাবের থেকে; লীলার তাগিদ ভিতর থেকে, ভাবের থেকে। বাইরের ফরমাশে এই প্রয়োজনের আসর সরগরম হয়ে ওঠে, ভিতরের ফরমাশে লীলার আসর জমে। আজকের দিনে জনসাধারণ জেগে উঠেছে; তার ক্ষুধা বিরাট, তার দাবি বিস্তর। সেই বহুরসনাধারী জীব তার বহুতর ফরমাশে মানবসংসারকে রাত্রিদিন উদ্যত করে রেখেছে; কত তার আসবাব আয়োজন, পাইক বরকন্দাজ, কাড়া-নাকাড়া-ঢাকঢোলের তুমুল কলরব— তার 'চাই চাই' শব্দের গর্জনে স্বর্গ-মর্ত্য বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। এই গর্জনটা লীলার আসরেও প্রবেশ করে দাবি প্রচার করতে থাকে যে, 'তোমাদের বীণা, তোমাদের মৃদঙ্গও আমাদের জয়যাত্রার ব্যান্ডের সঙ্গে মিলে আমাদের কল্লোলকে ঘনীভূত করে তুলুক।' সেজন্যে সে খুব বড়ো মজুরি আর জাঁকালো শিরোপা দিতেও রাজি আছে। আগেকার রাজসভার চেয়ে সে হাঁকও দেয় বেশি দামও দেয় বেশি। সেইজন্যে ঢাকির পক্ষে এ সময়টা সুসময়, কিন্তু বীনকারের পক্ষে নয়। ওস্তাদ হাত জোড় করে বলে, 'তোমাদের হট্টগোলের কাজে আমার স্থান নেই; অতএব বরঞ্চ আমি চুপ করে থাকতে রাজি আছি, বীণাটা গলায় বেঁধে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মরতেও রাজি আছি, কিন্তু আমাকে তোমাদের সদররাস্তায় গড়ের বাদ্যের দলে ডেকো না। কেননা, আমার উপরওয়ালার কাছ থেকে তাঁর গানের আসরের জন্যে পূর্ব হতেই বায়না পেয়ে বসে আছি।' এতে জনসাধারণ নানাপ্রকার কটু সম্ভাষণ করে, সে বলে, 'তুমি লোকহিত মান না, দেশহিত মান না, কেবল আপন খেয়ালকেই মান।' বীনকার বলতে চেষ্টা করে, 'আমি

আমার খেয়ালকেও মানি নে, তোমার গরজকেও মানি নে, আমার উপরওয়ালাকে মানি।' সহস্র-রসনাধারী গর্জন করে বলে ওঠে, 'চুপ!'

জনসাধারণ বলতে যে প্রকাণ্ড জীবকে বোঝায় স্বভাবতই তার প্রয়োজন প্রবল এবং প্রভূত। এইজন্যে স্বভাবতই প্রয়োজনসাধনের দাম তার কাছে অনেক বেশি, লীলাকে সে অবজ্ঞা করে। ক্ষুধার সময়ে বকুলের চেয়ে বার্তাকুর দাম বেশি হয়। সেজন্যে ক্ষুধাতুরকে দোষ দিই নে; কিন্তু বকুলকে যখন বার্তাকুর পদ গ্রহণ করবার জন্যে ফরমাশ আসে তখন সেই ফরমাশকেই দোষ দিই। বিধাতা ক্ষুধাতুরের দেশেও বকুল ফুটিয়েছেন, এতে বকুলের কোনো হাত নেই। তার একটিমাত্র দায়িত্ব আছে এই যে, যেখানে যা-ই ঘটুক, তাকে কারও দরকার থাক্ বা না থাক্, তাকে বকুল হয়ে উঠতেই হবে; ঝরে পড়ে তো পড়বে, মালায় গাঁথা হয় তো তা-ই সই। এই কথাটাকেই গীতা বলেছেন, 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।' দেখা গেছে, স্বধর্মে জগতে খুব মহৎ লোকেরও নিধন হয়েছে, কিন্তু সে নিধন বাইরের, স্বধর্ম ভিতরের দিক থেকে তাঁকে বাঁচিয়েছে। আর এও দেখা গেছে, পরধর্মে খুব ক্ষুদ্র লোকেও হঠাৎ বড়ো হয়ে উঠেছে, কিন্তু তার নিধন ভিতরের থেকে, যাকে উপনিষদ্ বলেন, 'মহতী বিনষ্টিঃ'।

যে-ব্যক্তি ছোটো তারও স্বধর্ম বলে একটি সম্পদ আছে। তার সেই ছোটো কৌটোটির মধ্যেই সেই স্বধর্মের সম্পদটিকে রক্ষা করে সে পরিত্রাণ পায়। ইতিহাসে তার নাম থাকে না, হয়তো তার বদনাম থাকতেও পারে, কিন্তু তার অন্তর্যামীর খাস-দরবারে তার নাম থেকে যায়। লোভে পড়ে স্বধর্ম বিকিয়ে দিয়ে সে যদি পরধর্মের ডঙ্কা বাজাতে যায় তবে হাটে বাজারে তার নাম হবে। কিন্তু, তার প্রভুর দরবার থেকে তার নাম খোয়া যাবে।

এই ভূমিকার মধ্যে আমার নিজের কৈফিয়ত আছে। কখনো অপরাধ করি নি তা নয়। সেই অপরাধের লোকসান ও পরিতাপ তীব্র বেদনায় অনুভব করেছি বলেই সাবধান হই। ঝড়ের সময় ধ্রুবতারাকে দেখা যায় না বলে দিক্‌ভ্রম হয়। এক-এক সময়ে বাহিরের কল্লোলে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে স্বধর্মের বাণী স্পষ্ট করে শোনা যায় না। তখন 'কর্তব্য' নামক দশমুখ-উচ্চারিত একটা শব্দের হুংকারে মন অভিভূত হয়ে যায়; ভুলে যাই যে, কর্তব্য বলে একটা অবচ্ছিন্ন পদার্থ নেই, আমার 'কর্তব্য'ই হচ্ছে আমার পক্ষে কর্তব্য। গাড়ির চলাটা হচ্ছে একটা সাধারণ কর্তব্য, কিন্তু ঘোরতর প্রয়োজনের সময়েও ঘোড়া যদি বলে 'আমি সারথির কর্তব্য করব', বা চাকা বলে 'ঘোড়ার কর্তব্য করব', তবে সেই কর্তব্যই ভয়াবহ হয়ে ওঠে। ডিমক্রেসির যুগে এই উড়ে-পড়া পড়ে-পাওয়া কর্তব্যের ভয়াবহতা চারি দিকে দেখতে পাই। মানবসংসার চলবে, তার চলাই চাই; কিন্তু তার চলার রথের নানা অঙ্গ—কর্মীরাও একরকম করে তাকে চালাচ্ছে, গুণীরাও একরকম করে তাকে চালাচ্ছে, উভয়ের স্বানুবর্তিতাতেই পরস্পরের সহায়তা এবং সমগ্র রথের গতিবেগ; উভয়ের কর্ম একাকার হয়ে গেলেই মোট কর্মটাই পঙ্গু হয়ে যায়।

এই উপলক্ষে একটি কথা আমার মনে পড়ছে। তখন লোকমান্য টিলক বেঁচে ছিলেন। তিনি তাঁর কোনো এক দূতের যোগে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন, আমাকে য়ুরোপে যেতে হবে। সে সময়ে নন্-কো-অপারেশন আরম্ভ হয় নি বটে কিন্তু পলিটিক্যাল আন্দোলনের তুফান বইছে। আমি বললুম, 'রাষ্ট্রিক আন্দোলনের কাজে যোগ দিয়ে আমি য়ুরোপে যেতে পারব না।' তিনি বলে পাঠালেন, আমি রাষ্ট্রিক চর্চায় থাকি, এ তাঁর অভিপ্রায়বিরুদ্ধ। ভারতবর্ষের যে-বাণী আমি প্রচার করতে পারি সেই বাণী বহন করাই আমার পক্ষে সত্য কাজ, এবং সেই সত্য কাজের দ্বারাই আমি ভারতের সত্য সেবা করতে পারি। আমি জানতুম, জনসাধারণ টিলককে পোলিটিক্যাল নেতারূপেই বরণ করেছিল এবং সেই কাজেই তাঁকে টাকা দিয়েছিল। এইজন্য আমি তাঁর পঞ্চাশ হাজার টাকা গ্রহণ করতে পারি নি। তার পরে, বোম্বাই-শহরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে পুনশ্চ বললেন, 'রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপার থেকে নিজেকে পৃথক রাখলে তবেই আপনি নিজের কাজ সুতরাং দেশের কাজ করতে পারবেন; এর চেয়ে বড়ো আর কিছু আপনার

কাছে প্রত্যাশাই করি নি।' আমি বুঝতে পারলুম, টিলক যে গীতার ভাষ্য করেছিলেন সে কাজের অধিকার তাঁর ছিল; সেই অধিকার মহৎ অধিকার।

অনেক ধনী আছে যারা নিজের ভোগেই নিজের অর্থের ব্যয় ও অপব্যয় করে থাকে। সাধারণের দাবি তাদের ভোগের তহবিলে যদি ভাঙন ধরাতে পারে তাতে দুঃখের কথা কিছুই নেই। অবকাশ পদার্থটা হচ্ছে সময়ধন— সংসারী এই ধনটাকে নিজের ঘরসংসারের চিন্তায় ও কাজে লাগায়, আর কুঁড়ে যে সে কোনো কাজেই লাগায় না। এই সংসারী বা কুঁড়ের অবকাশের উপর লোকহিতের দোহাই দিয়ে উপদ্রব করলে দোষের হয় না। আমার অবকাশের অনেকটা অংশ আমি কুঁড়েমিতেই খাটাই, বাইরে থেকে কেউ কেউ এমন সন্দেহ করে। এ কথাটা জানে না যে, কুঁড়েমিটাই আমার কাজের প্রধান অঙ্গ। পেয়ালার যতটা চীনেমাটি দিয়ে গড়া ততটাই তার প্রধান অংশ নয়, বস্তুত সেটাই তার গৌণ; যতটা তার ফাঁক ততটাই তার মুখ্য অংশ। ঐ ফাঁকটাই রসে ভর্তি হয়, পোড়া চীনেমাটি উপলক্ষ মাত্র। ঘরের খুঁটিটা যেমন, গাছ ঠিক তেমন জিনিস নয়। অর্থাৎ, সে কেবলমাত্র নিজের তলাটার মাটিতেই দাঁড়িয়ে থাকে না। তার দৃশ্যমান গুঁড়ি যতটুকু মাটি জুড়ে থাকে তার অদৃশ্য শিকড় তার চেয়ে অনেক বেশি মাটি অধিকার করে বলেই গাছটা রসের জোগান পায়। আমাদের কাজও সেই গাছের মতো; ফাঁকা অবকাশের তলা থেকে গোপনে সে রস আদায় করে নেয়। দশে মিলে তার সেই বিধিদত্ত অবকাশের লাখেরাজের উপর যদি খাজনা বসায় তা হলে তার সেই কাজটাকেই নিঃস্ব করা হতে থাকে। এইজন্যেই দেশের সমস্ত সাময়িক পত্রে হরির লুঠের জোগান দেবার জন্যে অন্য কোনো দেশেই কবিকে নিয়ে এমনতরো টানাহেঁচড়া করে না।

আমাদের দেশের গার্হস্থ্য ব্যাকরণে যাঁরা কর্তা তাঁদের প্রধান পরিচয় ক্রিয়াকর্মে। লোকে তাঁদের দশকর্মা বলে। সেই গার্হস্থ্যে আবার এমন সব লোক আছে যারা অকর্মা; তারা কেবল ফাইফরমাশ খাটে। কাজের চেয়ে অকাজে তাদের বেশি দরকার। অর্থাৎ, তাস খেলবার যখন জুড়ি না জোটে তখন তাদের ডাক পড়ে, আর দূর-সম্পর্কের জ্যাঠাইমার গঙ্গাযাত্রার সময় তারাই প্রধান সহায়।

আমাদের শাস্ত্রে গৃহস্থ-আশ্রমের উপর আরণ্য-আশ্রমের বিধি। বর্তমানকালে এই শেষের আশ্রম বাদ পড়েছে; আরণ্য-আশ্রম নেই, কিন্তু তার জায়গা জুড়েছে সাধারণ্য-আশ্রম। এখন দেশে আরণ্যক পাওয়া যায় না, কিন্তু সাধারণ্যকের সংখ্যা কম নয়। তাঁরা পাবলিক-নামক বৃহৎ সংসারের ঘোরতর সংসারী।

শেষোক্ত সংসারেও দুই দলের লোক আছেন। একদল দশকর্মা, আর-একদল অকর্মা; যাঁদের ইংরেজিতে লীডার বলে আমি তাঁদের বলতে চাই কর্তাব্যক্তি। কেউ বা বড়ো-কর্তা, কেউ বা মেজো-কর্তা, কেউ বা ছোটো-কর্তা। এই কর্তারা নিত্য-সভা, নৈমিত্তিক-সভা, যুদ্ধ-সভা, শ্রাদ্ধ-সভা প্রভৃতিতে সর্বদাই ব্যস্ত; তা ছাড়া আছে সাময়িক পত্র, অসাময়িক পত্র, চাঁদার খাতা, বার্ষিক বিবরণী। আর, যাঁরা এই সাধারণ্য আশ্রমের কর্তাব্যক্তি নন, ক্রিয়াকর্ম তাঁদের অধীন নয়, তাঁরা থাকেন চ-বৈ-তু-হি নিয়ে; যত রকম জোড়াতাড়া দেওয়ার কাজে তাঁদের ডাক; হঠাৎ ফাঁক পড়লে সেই ফাঁক উপস্থিতমতো তাঁরা পূরণ করে থাকেন। তাঁরা ভলান্টিয়ারি করেন, চৌকি সাজান, চাঁদা সাধেন, করতালিঘাতে সভার উৎসাহবৃদ্ধি করেন, কখনো বা অপঘাতে সভার অকাল-সমাপ্তি-সাধনেও যোগ দেন।

পাবলিক শহরে কর্তৃপদ হাটে ঘাটে মেলে না, আর সাবধানে তাদের ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু অব্যয় পদের ছড়াছড়ি— এইজন্যে অব্যয়ের অপব্যয় সর্বদাই ঘটে। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ ছন্দ-পূরণের কাজে তাদের অস্থানে তলব পড়ে; তাতে মাত্রা রক্ষা হয় এই মাত্র, তার বেশি কিছু না; যেন কুলীনকন্যার কলাগাছের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া।

বর্তমান বয়সে আমার জীবনের প্রধান সংকট এই যে, যদিচ স্বভাবত আমি আরণ্যক তবু আমার কর্মস্থানের কুগ্রহ সকৌতুকে আমাকে সাধারণ্যক করে দাঁড় করিয়েছেন। দীর্ঘকাল আমার জীবন কেটেছে কোণে, কাব্যরচনায়; কখন একসময় বিধাতার খেয়ালের খেয়া আমাকে পেঁচিছে দিয়েছে জনতার

ঘাটে—এখন অকাব্যসাধনে আমার দিন কাটছে। এখন আমি পাবলিকের কর্মক্ষেত্রে। কিন্তু হাঁস যখন চলে তখন তার নড়বড়ে চলন দেখেই বোঝা যায় তার পায়ের তেলো ডাঙায় চলবার জন্যে নয়, জলে সাঁতার দেবার জন্যেই। তেমনি পাবলিক ক্ষেত্রে আমার পদচারণভঙ্গি আমার অভ্যাসদোষে অথবা বিধাতার রচনা-গুণে আজ পর্যন্ত বেশ সুসংগত হয় নি।

এখানে কর্তৃপদে আমার যোগ্যতা নেই, যাকে অব্যয়পদ বলেছি তার কাজেও পদে পদে বিপদ ঘটে। ভলান্টিয়ারি করবার বয়স গেছে; দুর্দিনের তাড়নায় চাঁদার খাতা নিয়ে ধনপতিদের অর্গলবন্ধ দ্বারে অনর্গল ঘুরে বেড়াতে হয়, তাতে অঙ্কপাত যা হয় তার চেয়ে অশ্রুপাত হয় অনেক বেশি। তার পরে, গ্রন্থের ভূমিকা লেখবার জন্যে অনুরোধ আসে; গ্রন্থকার অভিমতের দাবি করে গ্রন্থ পাঠান; কেউ বা অনাবশ্যক পত্র লেখেন, ভিতরে মাশুল দিয়ে দেন জবাব লেখবার জন্যে আমাকে দায়ী করবার উদ্দেশ্যে; নবপ্রসূত কুমারকুমারীদের পিতামাতারা তাঁদের সন্তানদের জন্যে অভূতপূর্ব নূতন নাম চেয়ে পাঠান; সম্পাদকের তাগিদ আছে; পরিণয়োৎসুক যুবকদের জন্যে নূতন-রচিত গান চাই; কী উপায়ে নোবেলপ্রাইজ অর্জন করতে হয় সে সম্বন্ধে পরামর্শের আবেদন আসে; দেশের হিতচেষ্টায় পত্রলেখকের সঙ্গে কেন আমার মতের কিছুমাত্র পার্থক্য ঘটে তার জবাবদিহির জন্যে সাক্রোশ তলব পড়ে। এই-সমস্ত উত্তেজনায় প্রতিনিয়ত যে-সকল কর্ম জমিয়ে তুলছি আবর্জনা-মোচনে কালের সম্মার্জনী সুপটু বলেই বিধাতার কাছে সেজন্যে মার্জনা আশা করি। সভাকর্তৃত্বের কাজেও মাঝে মাঝে আমার ডাক পড়ে। যখন একান্ত কাব্যরসে নিমগ্ন ছিলুম তখন এ বিপদ আমার ছিল না। রাখালকে কেউ ভুলেও রাজসিংহাসনে আমন্ত্রণ করে না, এইজন্যেই বটতলায় সে বাঁশি বাজাবার সময় পায়। কিন্তু, যদি দৈবাৎ কেউ ক'রে বসে, তা হলে পাঁচনিকে রাজদণ্ডের কাজে লাগাতে গিয়ে রাখালি এবং রাজত্ব দুয়েরই বিঘ্ন ঘটে। কাব্যসরস্বতীর সেবক হয়ে গোলেমালে আজ গণপতির দরবারের তকমা পরে বসেছি; তার ফলে কাব্যসরস্বতী আমাকে প্রায় জবাব দিয়েছেন, আর গণপতির বাহনটি আমার সকল কাজেরই ছিদ্র অন্বেষণ করছেন।

ফরমাশের শরশয্যাশায়ী হবার ইচ্ছা আমার কেন নেই, সেই কথাটা এই উপলক্ষে জানালুম। যেখানে দশে মিলে কাজ সেখানে আমার অবকাশের সব গোরু বাছুর বেচে খাজনা জোগাবার তলবে কেন আমি সিভিল অথবা আন্‌সিভিল ডিস্‌-ওবিডিয়েন্সের নীতি অবলম্বন করতে চেষ্টা করি তার একটা কৈফিয়ত দেওয়া গেল। সব সময়ে অনুরোধ উপরোধ এড়িয়ে উঠতে পারি নি, তার কারণ আমার স্বভাব দুর্বল। পৃথিবীতে যাঁরা বড়োলোক তাঁরা রাশভারী শক্তলোক; মহৎ সম্পদ অর্জন করবার লক্ষ্যপথে যথাযোগ্য স্থানে যথোচিত দৃঢ়তার সঙ্গে 'না' বলবার ক্ষমতাই তাঁদের পাথেয়। মহৎ সম্পদকে রক্ষা করবার উপলক্ষে রাশভারী লোকেরা 'না'-মন্ত্রের গণ্ডিটা নিজের চারি দিকে ঠিক জায়গায় মোটা করে টেনে দিতে পারেন। আমার সে মহত্ত্ব নেই, পেরে উঠি নে; হাঁ-না দুই নৌকার উপর পা দিয়ে দুলতে দুলতে হঠাৎ অগাধ জলের মধ্যে গিয়ে পড়ি। তাই একান্ত মনে আজ প্রার্থনা করি, 'ওগো না-নৌকোর নাবিক, আমাকে জোরের সঙ্গে তোমার নৌকোয় টেনে নিয়ে একেবারে মাঝদরিয়ায় পাড়ি দাও—অকাজের ঘাটে আমার তলব আছে, দোটানায় পড়ে যেন বেলা ব'য়ে না যায়!'

২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪

কাল সমস্ত দিন জাহাজ মাল বোঝাই করছিল। রাত্রে যখন ছাড়ল তখন বাতাসের আক্ষেপ কিছু শান্ত। কিন্তু, তখনও মেঘগুলো দল পাকিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। আজ সকালে একখানা ভিজে অন্ধকারে আকাশ ঢাকা। এবার আলোকের অভিনন্দন পেলুম না। শরীরমনও ক্লান্ত।

জাহাজটা তীর থেকে যেন একটুকরো সংসার ছিন্ন করে নিয়ে ভেসে চলেছে। ডাঙায় মানুষে মানুষে ফাঁক থাকবার অবকাশ আছে; এখানে জায়গা অল্প, ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে হয়। কিন্তু, তবু পরস্পর পরিচয় কত কঠিন। প্রত্যেকবার জাহাজে ওঠবার আগে এই চিন্তাটি মনকে পীড়া দেয়, এই নৈকট্যের দূরত্ব, এই সঙ্গবিহীন সাহচর্য।

আদিম অবস্থায় মনুষ যে-বাসা বাঁধে তার দেয়াল পাতলা; তার ছিটে বেড়ায় যথেষ্ট ফাঁক, ঝাঁপটা ঠেলে ফেলে ঘরে ঢোকা সহজ। কালক্রমে বাসা বাঁধবার নৈপুণ্য তার যতই বেড়ে ওঠে, ততই ইঁটকাঠ-লোহাপাথরে ঘরের দেয়াল পাকা হয়ে ওঠে, দরজা হয় মজবুত। তার মধ্যে মনের অভ্যেসগুলো হয়ে যায় পাঁচিলে ঘেরা। খাওয়া-পরা শোয়া-বসা সব-কিছুর জন্যই আড়ালের দরকার হয়। এই আড়ালটা সভ্যতার সর্বপ্রধান অঙ্গ। এইটেকে রচনা ও রক্ষা করতে বিস্তর খরচ লাগছে। ঘর-বাহিরের মাঝখানে মানুষের সহজ-চলাচলের রাস্তায় পদে-পদে নিষেধ।

প্রত্যেক মানুষের একটা সহজ বেড়ার দরকার আছে, নইলে ভিড়ের টানে দশের সঙ্গে মিশে গেলে নিজের বিশেষত্বের সম্পদ ব্যর্থ হয়ে যায়। নিজেকে বিচ্ছিন্ন না করলে নিজেকে প্রকাশ করাই যায় না। বীজ আপনাকে প্রকাশ করবার জন্যই মাটির ভিতরে আড়াল খোঁজে; ফল আপনাকে পরিণত করবার জন্যেই বাহিরের দিকে একটা খোসার পর্দা টেনে দেয়। বর্বর অবস্থায় মানুষের ব্যক্তিগত বিশেষত্বের জোর থাকে না, তার কাজও থাকে কম। এইজন্যেই ব্যক্তিবিশেষের গোপনতার পরিবেষ্টন সৃষ্ট হয়ে ওঠে তার সভ্যতার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু, এই বেড়া জিনিসটার আত্মপ্রাধান্যবোধ ক্রমেই অতিমাত্র বাড়তে থাকে। তখন মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে যে একান্ত প্রয়োজন আছে, সেটা বাধাগ্রস্ত হয়ে অনভ্যস্ত হয়ে ওঠে। সেই আতিশয্যটাই হল বিপদ।

এই মারাত্মক বিপদটা কোন্ অবস্থায় ঘটে। ভোগের আদর্শ অপরিমিত বেড়ে উঠে মানুষের যখন বিস্তর উপকরণের প্রয়োজন, যখন অন্যের জন্যে তার সময় ও সম্বল খরচ করবার বেলায় বিস্তর হিসেব করা অনিবার্য, যখন তার জীবিকার উপাদান উৎপাদন করবার জন্যে প্রভূত আয়োজন চাই, তখন তার সভ্যতার বাহন-বাহিনীর বিপুলতায় তার লোকালয় অতি প্রকাণ্ড হয়ে ওঠে। জনতার পরিমিত আয়তনেই মানুষের মধ্যে আত্মীয়তার ঐক্য সম্ভবপর। তাই পল্লীর অধিবাসীরা কেবল যে একত্র হয় তা নয়, তারা এক হয়। শহরের অতিবৃহৎ জনসমাবেশ আপন অতিবিস্তীর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এক-আত্মীয়তার রক্তস্রোত সঞ্চারিত করবার উপযুক্ত হৃৎপিণ্ড তৈরি করে উঠতে পারে না। প্রকাণ্ড জনসংঘ কাজ চালাবারই যোগ্য, আত্মীয়তা চালাবার নয়। কারখানা-ঘরে হাজার লোকের মজুরি দরকার, পরিবারের মধ্যে হাজার লোকের জটলা হলে তাকে আর গৃহ বলে না। যন্ত্রের মিলন যেখানে সেখানে অনেক লোক, আর অন্তরের মিলন যেখানে সেখানে লোকসংখ্যা কম। তাই শহর মানুষকে বাহিরের দিকে কাছে টানে, অন্তরের দিকে ফাঁক ফাঁক করে রাখে।

আমরা আজন্মকাল সেই দেয়াল-কোটরে ভাগে ভাগে বিভক্ত সভ্য মানুষ। হঠাৎ এসে ঠেসাঠেসি করে মিলেছি এক জাহাজে। মেলবার অভ্যেস মনের মধ্যে নেই। তীর্থে যারা দল বেঁধে রাস্তায় চলে মিলতে তাদের সময় লাগে না; তারা গাঁয়ের লোক, মেলাই তাদের অভ্যেস। সার্থবাহ যারা মরুর মধ্য দিয়ে উটে চড়ে চলে তারাও মনকে নীরব আড়ালের বুরখা দিয়ে ঢেকে চলে না; তাদের সভ্যতা ইঁট-পাথরে অমিলকে পাকা করে গেঁথে তোলে নি। কিন্তু, স্টীমারের যাত্রী, রেলগাড়ির প্যাসেঞ্জার বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে আসে তাদের দেয়ালগুলোর সূক্ষ্ম শরীর তাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলতে থাকে।

তাই দেখি, শহরের কলেজে-পড়া ছেলে হঠাৎ দেশাত্মবোধের তাড়ায় যখন খামকা পল্লীর উপকার করতে ছোটে তখন তারা পল্লীবাসীর পাশে এসেও কাছে আসতে পারে না। তারা বেড়ার ভিতর দিয়ে কথা কয়, পল্লীর কানে বাজে যেন আরবি আওড়াচ্ছে।

যা হোক, যদিও শহুরে সভ্যতার পাকে আমাদেরকেও খুব কষে টান দিয়েছে, তবু মনের গ্রাম্য অভ্যেস এখনো যায় নি। সময়কে বলতে আরম্ভ করেছি, মূল্যবান, কিন্তু কেউ যদি সে-মূল্য গ্রাহ্য না করে তাকে ঠেকিয়ে রাখবার কোনো ব্যবস্থা আজও তৈরি হয় নি। আমাদের আগন্তুকবর্গ অভিমন্যুর মতো অতি সহজেই ঘরে প্রবেশ করতে জানেন, কিন্তু নির্গমনের পথ যে তাঁরা জানেন সে তাঁদের ব্যবহারে বোঝা যায় না। অত্যন্ত বেগার লোককেও যদি বলা যায়, 'কাজ আছে,' সে বলে

'ঈস! লোকটা ভারি অহংকারী'। অর্থাৎ, তোমার কাজটা আমাকে দেখা দেওয়ার চেয়েও মহার্ঘ, এ কথা মনে করা স্পর্ধা।

অসুস্থ শরীরে একদিন আমার তিন-তলার ঘরে অর্ধশয়ান অবস্থায় একটা লেখায় নিযুক্ত আছি। আমি নিতান্তই মৃদুস্বভাবের মানুষ বলেই আমার সেই অন্দরের ঘরটাকেও আমার বন্ধু, অনতি-বন্ধু ও অবন্ধুরা দুর্গম বলে গণ্য করেন না। এইটুকুমাত্র সুবিধা যে, পথটা পুরবাসীদের সকলেরই জানা নেই। খবর এল, একটি ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। অস্বাস্থ্য বা ব্যস্ততার ওজরকে আমাদের ভদ্রলোকেরা শ্রদ্ধা করেন না, তাই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে লেখা বন্ধ করে নীচে গেলুম। দেখি, একজন কাঁচা-বয়সের যুবক; হঠাৎ তার চাদরের অজ্ঞাতবাস থেকে একটা মোটা-গোছের খাতা বেরল। বুঝলুম, আমারই আপন সম্প্রদায়ের লোক। কবিকিশোর একটুখানি হেসে আমাকে বললে, 'একটা অপেরা লিখেছি।' আমার মুখে বোধ হয় একটা পাংশুবর্ণ ছায়া পড়ে থাকবে, তাই হয়তো আশ্বাস দেবার জন্যে বলে উঠল, 'আপনাকে আর কিছুই করতে হবে না, কেবল গানের কথাগুলোতে সুর বসিয়ে দেবেন, সবসুদ্ধ পঁচিশটা গান।' কাতর হয়ে বললুম, 'সময় কই!' কবি বললে, 'আপনার কতটুকুই বা সময় লাগবে। গান-পিছু বড়ো-জোর আধ ঘণ্টাই হোক।' সময় সম্বন্ধে এর মনের ঔদার্য দেখে হতাশ হয়ে বললুম, 'আমার শরীর অসুস্থ।' অপেরা-রচয়িতা বললে, 'আপনার শরীর অসুস্থ, এর উপরে আর কী বলব! কিন্তু যদি—।' বুঝলুম প্রবীণ ডাক্তারের সার্টিফিকেট আনলেও নবীন কবি বিচলিত হবে না। কোনো-একজন ইংরেজ গ্রন্থকারের ঘরে এই নাট্যের অবতারণা হলে কোন্ ফৌজদারিতে তার যবনিকাপতন হত, সে-কথা মনে করলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

মানুষের ঘরে 'দরওয়াজা বন্ধ্' এ কথাটিও কটু, আর তার ঘরে কোথাও পর্দা নেই এটাও বর্বরতা। মধ্যম পন্থাটাই দেখি সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। দুই বিরুদ্ধ শক্তির সমন্বয়েই সৃষ্টি, তাদের একান্ত বিচ্ছেদেই প্রলয়, মানুষ নিজের ব্যবহারক্ষেত্রে এইটেই কেবলই ভোলে আর মার খেয়ে মরে।

সূর্যের উদয়াস্ত আজও বাদলার ছায়ায় ঢাকা পড়ে রইল। মেঘের থলিটার মধ্যে কৃপণ আকাশ তার সমস্ত সোনার আলো এঁটে বন্ধ করে রেখেছে।

২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪

আজ ক্ষণে ক্ষণে রৌদ্র উঁকি মারছে, কিন্তু সে যেন তার গারদের গরাদের ভিতর থেকে। তার সংকোচ এখনো ঘুচল না। বাদল-রাজের কালো-উর্দি-পরা মেঘগুলো দিকে দিকে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

আচ্ছন্ন সূর্যের আলোয় আমার চৈতন্যের স্রোতস্বিনীতে যেন ভাঁটা পড়ে গেছে। জোয়ার আসবে রৌদ্রের সঙ্গে সঙ্গে।

পশ্চিমে, বিশেষত আমেরিকায় দেখেছি, বাপ-মায়ের সঙ্গে অধিকাংশ বয়স্ক ছেলে-মেয়ের নাড়ীর টান ঘুচে গেছে। আমাদের দেশে শেষ পর্যন্তই সেটা থাকে। তেমনিই দেখেছি, সূর্যের সঙ্গে মানুষের প্রাণের যোগ সে-দেশে তেমন যেন অন্তরঙ্গভাবে অনুভব করে না। সেই বিরলরৌদ্রের দেশে তারা ঘরে সূর্যের আলো ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে যখন পর্দা, কখনো বা অর্ধেক কখনো বা সম্পূর্ণ নামিয়ে দেয় তখন সেটাকে আমি ঔদ্ধত্য বলে মনে করি।

প্রাণের যোগ নয়তো কী। সূর্যের আলোর ধারা তো আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে বইছে। আমাদের প্রাণমন, আমাদের রূপরস, সবই তো উৎসরূপে রয়েছে ঐ মহাজ্যোতিষ্কের মধ্যে। সৌরজগতের সমস্ত ভাবীকাল একদিন তো পরিকীর্ণ হয়ে ছিল ওরই বহ্নিবাষ্পের মধ্যে। আমার দেহের কোষে কোষে ঐ তেজই তো শরীরী, আমার ভাবনার তরঙ্গে তরঙ্গে ঐ আলোই তো প্রবহমান। বাহিরে ঐ আলোরই বর্ণচ্ছটায় মেঘে মেঘে পত্রে পুষ্পে পৃথিবীর রূপ বিচিত্র; অন্তরে ঐ তেজই মানসভাব

ধারণ করে আমাদের চিন্তায় ভাবনায় বেদনায় রাগে অনুরাগে রঞ্জিত। সেই এক জ্যোতিরই এত রঙ, এত রূপ, এত ভাব, এত রস। ঐ যে-জ্যোতি আঙুরের গুচ্ছে গুচ্ছে এক-এক চুমুক মদ হয়ে সঞ্চিত সেই জ্যোতিই তো আমার গানে গানে সুর হয়ে পুঞ্জিত হল। এখনই আমার চিত্ত হতে এই যে চিন্তা ভাষার ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সে কি সেই জ্যোতিরই একটি চঞ্চল চিন্ময়স্বরূপ নয় যে-জ্যোতি বনস্পতির শাখায় শাখায় স্তব্ধ ওংকারধ্বনির মতো সংহত হয়ে আছে।

হে সূর্য, তোমারই তেজের উৎসের কাছে পৃথিবীর অন্তর্গূঢ় প্রার্থনা ঘাস হয়ে, গাছ হয়ে আকাশে উঠছে, বলছে, জয় হোক! বলছে, অপাবৃণু, ঢাকা খুলে দাও! এই ঢাকা-খোলাই তার প্রাণের লীলা, এই ঢাকা-খোলাই তার ফুলফলের বিকাশ। অপাবৃণু, এই প্রার্থনারই নির্ঝরধারা আদিম জীবাণু থেকে যাত্রা করে আজ মানুষের মধ্যে এসে উপস্থিত, প্রাণের ঘাট পেরিয়ে চিত্তের ঘাটে পাড়ি দিয়ে চলল। আমি তোমার দিকে বাহু তুলে বলছি, হে পূষন্‌, হে পরিপূর্ণ, অপাবৃণু, তোমার হিরন্ময় পাত্রের আবরণ খোলো, আমার মধ্যে যে গুহাহিত সত্য তোমার মধ্যে তার অবারিত জ্যোতিঃস্বরূপ দেখে নিই। আমার পরিচয় আলোকে আলোকে উদ্ঘাটিত হোক।

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪

আজ মেঘ সম্পূর্ণ কেটে গেছে। আলোকের দাক্ষিণ্য আজ আকাশে বিস্তীর্ণ, রৌদ্রচকিত সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে আজ আমন্ত্রণের ইঙ্গিত। সুরলোকের আতিথ্য থেকে আজ একটুও বঞ্চিত হতে ইচ্ছা করছে না।

আজকের দিনে কি ডায়ারি লিখতে একটুও মন সরে। ডায়ারি লেখাটা কৃপণের কাজ। প্রতিদিন থেকে ছোটোবড়ো কিছুই নষ্ট না হোক, সমস্তই কুড়িয়ে-কুড়িয়ে রাখি, এই ইচ্ছে ওতে প্রকাশ পায়। কৃপণ এগতে চায় না। আগলাতে চায়।

বিধাতা আমাকে মস্ত একটি বর দিয়েছেন, সে হচ্ছে আমার অসামান্য বিস্মরণশক্তি। সংবাদের ভাণ্ডারঘরের জিম্মে তিনি আমার হাতে দেন নি। প্রহরীর কাজ আমার নয়; আমাকে আমার মনিব প্রহরে প্রহরে ভুলে যাবার অধিকার দিয়েছেন।

ভুলে যেতে দেওয়া যদি হারিয়ে যেতে দেওয়া হত তা হলে তিনি তেমন বিষম ভুল করতেন না। বসন্ত বারে বারেই তার ফুলের সমারোহ ভুলে গিয়ে শূন্যসাজি হাতে অন্যমনস্ক হয়ে উত্তরের দিকে চলে যায়; সেই ভুলের ফাঁকা রাস্তা দিয়েই ফুলের দল তাদের নবজন্মের সিংহদ্বার খোলা পায়। আমার চৈতন্যের উপরের তলায় আমি এত বেশি ভুলি যে, তাতে আমার প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় ভারি অসুবিধা হয়। কিন্তু, আমার ভোলা সামগ্রীগুলো চৈতন্যের রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে নীচের তলায় নেপথ্যে এসে জড়ো হয়; সেখানে নতুন-নতুন বেশপরিবর্তনের সুযোগ ঘটে। আমার মনটাকে বিধাতা নাট্যশালা করতে ইচ্ছা করেছেন, তাকে তিনি জাদুঘর বানাতে চান না। তাই, জমা করে পাওয়া আমার লোকসান, হারিয়ে হারিয়ে পাওয়াই আমার লাভ। এই হারিয়ে-যাওয়ার ভিতর দিয়ে এক যখন আর সেজে এসে হাজির হয় তখন তীক্ষ্ম স্মরণশক্তিওয়ালা বৈজ্ঞানিক যদি সওয়ালজবাব করতে শুরু করে, তা হলে মুশকিল। তখন বিশ্লেষণের চোটে বেরিয়ে পড়তে পারে, যেটাকে নতুন বলছি সেটা পুরোনো, যেটাকে আমার বলছি সেটা আর-কারও। কিন্তু, সৃষ্টির তো এই লীলা, এইজন্যেই তো তাকে মায়া বলে। কড়া পাহারা বসিয়ে শিশিরবিন্দুর যদি আঁচল ঝাড়া দেওয়া যায় তা হলে বেরিয়ে পড়বে দুটো অদ্ভুত বাষ্প, তাদের নাম যেমন কর্কশ তাদের মেজাজও তেমনি রাগী। কিন্তু, শিশির তবুও স্নিগ্ধ শিশির, তবুও সে মিলনের অশ্রুজলের মতোই মধুর।

কথায় কথায় কথা বেড়ে যায়। বলতে যাচ্ছিলুম, ডায়ারি লেখাটা আমার স্বভাবসংগত নয়। আমি ভোলানাথের চেলা, ঝুলি বোঝাই করে আমি তথ্য সংগ্রহ করি নে। আমার জলাশয়ের যে-জলটাকে অন্যমনস্ক হয়ে উবে যেতে দিই সেইটেই অদৃশ্য শূন্যপথে মেঘ হয়ে আকাশে জমে, নইলে আমার বর্ষণ বন্ধ।

তা ছাড়া, আমার ব্যক্তিগত জীবনের সব সত্যকেই আমি একটিমাত্র সরকারি বাটখারা দিয়ে ওজন করতে চাই নে। কিন্তু, বিশেষ ঘটনার বিশেষ তুলাদণ্ড তৈরি হয়ে উঠতে সময় লাগে। ঘটনা যখনই ঘটে তখনই সেটাকে পাওয়া যায় না। তখন সরকারি পরিমাপের আদর্শ যেটাকে দেখায় ভারী সেটাই হয়তো হালকা, যেটাকে বুঝি হালকা সেটাই হয়তো ভারী। দীর্ঘকালে আনুষঙ্গিক অনেক বাজে জিনিস ভুলে যাওয়ার ভিতর দিয়েই বিশেষ জিনিসের বিশেষ ওজন পাওয়া যায়।

যারা জীবনচরিত লেখে তারা সমসাময়িক খাতাপত্র থেকে অতিবিশ্বাসযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে লেখে; সেই অচল সংবাদগুলো নিজেকে না কমাতে না বাড়াতে পারে। অথচ, আমাদের প্রাণপুরুষ তার তথ্যগুলোকে পদে পদে বাড়িয়ে-কমিয়েই এগিয়ে চলেছে। অতিবিশ্বাসযোগ্য তথ্য স্তূপাকার করে তা দিয়ে স্মরণস্তম্ভ হতে পারে, কিন্তু জীবনচরিত হবে কী করে। জীবনচরিত থেকে যদি বিস্মরণধর্মী জীবনটাই বাদ পড়ে তা হলে মৃতচরিতের কবরটাকে নিয়ে হবে কী। আমি যদি বোকামি করে প্রতিদিনের ডায়ারি লিখে যেতুম তা হলে তাতে করে হত আমার নিজের স্বাক্ষরে আমার নিজের জীবনের প্রতিবাদ। তা হলে আমার দৈনিক জীবনের সাক্ষ্য আমার সমগ্র-জীবনের সত্যকে মাটি করে দিত।

যে-যুগে রিপোর্টার ছিল না, মানুষ খবরের কাগজ বের করে নি, তখন মানুষের ভুলে যাবার স্বাভাবিক শক্তি কোনো কৃত্রিম বাধা পেত না। তাই তখনকার কালের মধ্যে থেকেই মানুষ আপন চিরস্মরণীয় মহাপুরুষদের পেয়েছে। এখন হতে আমরা তথ্য কুড়ুনে তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিচারকদের হাত থেকে প্রতিদিনের মানুষকে পাব, চিরদিনের মানুষকে সহজে পাব না। বিস্মরণের বৃহৎ ভিতের উপর স্থাপিত মহাসিংহাসনেই কেবল যাঁদের ধরে, সর্বসাধারণের ঠাসাঠাসি ভিড়ে তাঁদের জন্যে জায়গা হবে না। এখন ক্যামেরাওয়ালা, ডায়ারিওয়ালা, নোট-টুক্‌নেওয়ালা অত্যন্ত সতর্ক হয়ে চারি দিকেই মাচা বেঁধে বসে।

ছেলেবেলায় আমাদের অন্তঃপুরের যে-বাগানে বিশ্বপ্রকৃতি প্রত্যহই এক-একটি সূর্যোদয়কে তার নীল থালায় সাজিয়ে এক-একটি বিশেষ উপহারের মতো আমার পুলকিত হৃদয়ের মাঝখানে রেখে দিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসত, ভয় আছে, একদিন আমার কোনো ভাবী চরিতকার ক্যামেরা হাতে সেই বাগানের ফোটোগ্রাফ নিতে আসবে। সে অরসিক জানবেই না, সে-বাগান সেইখানেই যেখানে আছে ইদেনের আদিম স্বর্গোদ্যান। বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের প্রতি উদাসীন আর্টিস্ট সেই স্বর্গে যেতেও পারে, কিন্তু কোনো ক্যামেরাওয়ালার সাধ্য নেই সেখানে প্রবেশ করে— দ্বারে দেবদূত দাঁড়িয়ে আছে জ্যোতির্ময় খড়্গ হাতে।

এত বুদ্ধি যদি আমার, আর এত ভয়, তবে কেন ডায়ারি লিখতে বসেছি। সে-কথা কাল বলব।

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪

যখন কলম্বোতে এসে পৌঁছলুম বৃষ্টিতে দিগ্‌দিগন্তর ভেসে যাচ্ছে। গৃহস্থের ঘরে যেদিন শোকের কান্না, যেদিন লোকসানের আলোড়ন, সেদিন তার বাড়িতে আগন্তুকদের অধিকার থাকে না। কলম্বোর অশান্ত আকাশের আতিথ্য সেদিন আমার কাছে তেমনি সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল; মনটা নিজেকে বেশ মেলে দিয়ে বসবার জায়গা পাচ্ছিল না। বাহির জগতের প্রথম গেটটার কাছেই অভ্যর্থনার ঔদার্যের অভাব দেখে মনে হল, আমার নিমন্ত্রণের ভূমিকাতেই কোন্ কুগ্রহ এমন করে কালি ঢেলে দিলে। দরজাটা খোলা থাকলে হবে কী, নিমন্ত্রণকর্তার মুখে যে হাসি নেই।

এমন সময়ে এই বিমর্ষ দিনের বিমুখতার মধ্যে একটি বাঙালি ঘরের বালিকার একখানি চিঠি পাওয়া গেল। এই বালিকাই কিছুকাল পূর্বে আমার শিলঙবাসের একটি পদ্যময় বর্ণনার জরুরি দাবি করে তাড়া দিয়েছিল। সে দাবি আমি অগ্রাহ্য করি নি। এবার সে আমার এই প্রবাসযাত্রায় মঙ্গলকামনা জানিয়েছে। মনে হল, বাঙালি মেয়ের এই শুভ-ইচ্ছা আমার আজকের দিনের এই বদ্‌মেজাজি ভাগ্যটাকে অনুকূল করে তুলবে।

পুরুষের আছে বীর্য আর মেয়েদের আছে মাধুর্য, এ কথাটা সব দেশেই প্রচলিত। আমরা তার সঙ্গে আরও একটা কথা যোগ করেছি, আমরা বলি মেয়েদের মধ্যে মঙ্গল। অনুষ্ঠানের যে-সকল আয়োজন, যে-সকল চিহ্ন শুভ সূচনা করে, আমাদের দেশে তার ভার মেয়েদের উপর। নারীশক্তিতে আমরা মধুরের সঙ্গে মঙ্গলের মিলন অনুভব করি। প্রবাসে যাত্রায় বাপের চেয়ে মায়ের আশীর্বাদের জোর বেশি বলে জানি। মনে হয়, যেন ঘরের ভিতর থেকে মেয়েদের প্রার্থনা নিয়ত উঠছে দেবতার কাছে, ধূপপাত্র থেকে সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়ার মতো। সে-প্রার্থনা তাদের সিঁদুরের ফোঁটায়, তাদের কঙ্কণে, তাদের উলুধ্বনি-শঙ্খধ্বনিতে, তাদের ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ইচ্ছায়। ভাইয়ের কপালে মেয়েরাই দেয় ভাইফোঁটা। আমরা জানি, সাবিত্রীই মৃত্যুর হাত থেকে স্বামীকে ফিরিয়েছিল। নারীর প্রেমে পুরুষের কেবল যে আনন্দ তা নয়, তার কল্যাণ।

তার মানে, আমরা একরকম করে এই বুঝেছি, প্রেম জিনিসটা কেবল যে একটা হৃদয়ের ভাব তা নয়, সে একটা শক্তি, যেমন শক্তি বিশ্বের ভারাকর্ষণ। সর্বত্রই সে আছে। মেয়েদের প্রেম সেই বিশ্বশক্তিকে সহজে নাড়া দিতে পারে। বিষ্ণুর প্রকৃতিতে যে প্রেমের শক্তি বিশ্বকে পালন করছে সেই শক্তিই তো লক্ষ্মী, বিষ্ণুর প্রেয়সী। লক্ষ্মী সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ভাবকল্পনা আছে তাকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখি নারীর আদর্শে।

লক্ষ্মীতে সৌন্দর্য হচ্ছে পরিপূর্ণতার লক্ষণ। সৃষ্টিতে যতক্ষণ দ্বিধা থাকে ততক্ষণ সুন্দর দেখা দেয় না। সামঞ্জস্য যখন সম্পূর্ণ হয় তখনই সুন্দরের আবির্ভাব।

পুরুষের কর্মপথে এখনো তার সন্ধানচেষ্টার শেষ হয় নি। কোনো কালেই হবে না। অজানার মধ্যে কেবলই সে পথ খনন করছে, কোনো পরিণামের প্রান্তে এসে আজও সে অবকাশ পেলে না। পুরুষের প্রকৃতিতে সৃষ্টিকর্তার তুলি আপন শেষ রেখাটা টানে নি। পুরুষকে অসম্পূর্ণই থাকতে হবে।

নারীপ্রকৃতি আপনার স্থিতিতে প্রতিষ্ঠ। সার্থকতার সন্ধানে তাকে দুর্গম পথে ছুটতে হয় না। জীবপ্রকৃতির একটা বিশেষ অভিপ্রায় তার মধ্যে চরম পরিণতি পেয়েছে। সে জীবধাত্রী, জীবপালিনী; তার সম্বন্ধে প্রকৃতির কোনো দ্বিধা নেই। প্রাণসৃষ্টি প্রাণপালন ও প্রাণতোষণের বিচিত্র ঐশ্বর্য তার দেহে মনে পর্যাপ্ত। এই প্রাণসৃষ্টি-বিভাগে পুরুষের প্রয়োজন অত্যল্প, এইজন্যে প্রকৃতির একটা প্রবল তাগিদ থেকে পুরুষ মুক্ত। প্রাণের ক্ষেত্রে ছুটি পেয়েছে বলেই চিত্তক্ষেত্রে সে আপন সৃষ্টি-কার্যের পত্তন করতে পারলে। সাহিত্যে কলায় বিজ্ঞানে দর্শনে ধর্মে বিধিব্যবস্থায় মিলিয়ে যাকে আমরা সভ্যতা বলি সে হল প্রাণপ্রকৃতির পলাতক ছেলে পুরুষের সৃষ্টি।

তানের বেগে চঞ্চল গান তার সুরসংঘের প্রবাহ বহন করে ছোটবার সময় যেমন নিজের কল্যাণের জন্যেই একটা মূল লয়ের মূল সুরের স্থিতির দিকে সর্বদাই ভিতরে ভিতরে লক্ষ রাখে, তেমনি গতিবেগমত্ত পুরুষের চলমান সৃষ্টি সর্বদাই স্থিতির একটা মূল সুরকে কানে রাখতে চায়; পুরুষের শক্তি তার অসমাপ্ত সাধনার ভার বহন করে চলবার সময় সুন্দরের প্রবর্তনার অপেক্ষা রাখে। সেই স্থিতির ফুলই হচ্ছে নারীর মাধুর্য, সেই স্থিতির ফলই হচ্ছে নারীর মাঙ্গল্য, সেই স্থিতির সুরই হচ্ছে নারীর শ্রীসৌন্দর্য।

নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায় তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।

এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি; ভুলেছে, প্রতাপের

মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে।

এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল; প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর; প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।

যে কথাটা বলতে শুরু করেছিলুম সে হচ্ছে এই যে পুরুষের অধ্যবসায়ের কোথাও সমাপ্তি নেই, এইজন্যেই সুসমাপ্তির সুধারসের জন্যে তার অধ্যবসায়ের মধ্যে একটা প্রবল তৃষ্ণা আছে। মেয়েদের হৃদয়ের মাধুর্য এই রসই তাকে পান করায়। পুরুষের সংসারে কেবলই চিন্তার দ্বন্দ্ব, সংশয়ের দোলা, তর্কের সংঘাত, ভাঙাগড়ার আবর্তন—এই নিরন্তর প্রয়াসে তার ক্ষুব্ধ দোলায়িত চিত্ত প্রাণলোকের সরল পরিপূর্ণতার জন্যে ভিতরে ভিতরে উৎসুক হয়ে থাকে। মেয়েদের মধ্যে সেই প্রাণের লীলা। বাতাসে লতার আন্দোলনের মতো, বসন্তের নিকুঞ্জে ফুল ফোটাবার মতোই এই লীলা সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত; চিন্তাক্লিষ্ট চিত্তের পক্ষে পূর্ণতার এই প্রাণময়ী মূর্তি নিরতিশয় রমণীয়। এই সুসমাপ্তির সৌন্দর্য, এই প্রাণের সহজ বিকাশ পুরুষের মনে কেবল যে তৃপ্তি আনে তা নয়, তাকে বল দেয়, তার সৃষ্টিকে অভাবনীয় রূপে উদ্ঘাটিত করে দিতে থাকে। আমাদের দেশে এইজন্যে পুরুষের সাধনায় মেয়েকে শক্তি বলে স্বীকার করে। কর্মের প্রকাশ্য ক্ষেত্রে এই শক্তিকে দেখি নে; ফুলকে দেখি প্রত্যক্ষ কিন্তু যে গূঢ় শক্তিতে সেই ফুল ফোটায় তাকে কোথাও ধরা-ছোঁয়া যায় না। পুরুষের কীর্তিতে মেয়ের শক্তি তেমনি নিগূঢ়।

২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪

যে মেয়েটি আমাকে শুভ-ইচ্ছা জানিয়ে চিঠি লিখেছিল তার চিঠিতে একটি অনুরোধ ছিল, 'আপনি ডায়ারি লিখবেন।' তখনই জবাব দিলুম, 'না, ডায়ারি লিখব না।' কিন্তু, মুখ দিয়ে একটা কথা বেরিয়ে গেছে বলেই যে সেই কথাটা অটল সত্যের গৌরব লাভ করবে এত বড়ো অহংকার আমার নেই।

তার পর চব্বিশে তারিখে জাহাজে উঠলুম। বাদলার হাওয়া আরও যেন রেগে উঠল; সে যেন একটা অদৃশ্য প্রকাণ্ড সাপের মতো জাহাজটার উপর ক্ষণে-ক্ষণে ছোবল মেরে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। যখন দেখলুম দুর্দৈবের ধাক্কায় মনটা হার মানবার উপক্রম করছে তখন তেড়ে উঠে বললুম, 'না, ডায়ারি লিখবই।' কিন্তু, লেখবার আছে কী। কিছুই না, যা-তা লিখতে হবে। সকল লেখার সেরা হচ্ছে যা-তা লেখা। যথেচ্ছাচারের অধিকার রাজার অধিকার।

বিশেষ কোনো-একজনকে চিঠি লেখবার একটা প্রচ্ছন্ন বীথিকা যদি সামনে পাওয়া যেত তা হলে তারই নিভৃতছায়ার ভিতর দিয়ে আমার নিরুদ্দেশ বাণীকে অভিসারে পাঠাতুম। কিন্তু সে বীথিকা আজ নেই। তাই অপরিচিত ক্যাবিনে আলো জেলে নিজের কাছেই নিজে বকতে বসলুম। আলাপের এই অদ্বৈতরূপ আমার পছন্দসই নয়। সংসারে যখন মনের মতো দ্বৈত দুর্লভ হয়ে ওঠে তখনই মানুষ অদ্বৈতসাধনায় মনকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। কারণ, সকলের চেয়ে দুর্বিপাক হচ্ছে অ-মনের মতো দ্বৈত।

হারুনা-মারু জাহাজ
৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪

আমার ডায়ারিতে মেয়ে-পুরুষের কথা নিয়ে যে-আলোচনা ছিল সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে এই যে, 'আচ্ছা বোঝা গেল যে, প্রাণের টানে মেয়ে আটকা পড়েছে আর পুরুষ ছুটেছে মনের তাড়ায়। তার পরে, তারা যে-প্রেমে মেলে সেটা কি ঠিক একজাতের।'

গোড়াতেই বলে রাখা ভালো যে, প্রাণই বল আর মনই বল, মেয়ে কিংবা পুরুষের একেবারে নিজস্ব দখলে নেই। অবস্থাগতিকে পক্ষভেদে একটা মুখ্য, অন্যটা গৌণ।

মন জিনিসটা প্রাণের ঘরেই মানুষ, প্রাণের অন্ন খেয়ে; সেইজন্যেই অন্তরে অন্তরে তার একটা অকৃতজ্ঞতা আছে। প্রাণের আনুগত্য ছাড়িয়ে একাধিপত্য করবার জন্যে সে প্রায় মাঝে মাঝে আস্ফালন করে। এই বিদ্রোহটা ভিতরে ভিতরে কম-বেশি পরিমাণে প্রায় সব পুরুষের মধ্যেই আছে। প্রাণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে তার কিছু-না-কিছু কসরত এবং কুচকাওয়াজ চলছেই। খামকা প্রাণটাকে ক্লিষ্ট করবার, বিপন্ন করবার লোভ পুরুষের। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার শখটা পুরুষের; তার একমাত্র কারণ ঘরের খাওয়াতে তাকে প্রাণের শাসন মানতে হয় কিন্তু বনের মোষ তাড়ানোতে, প্রাণের প্রতি তার যে রাজভক্তি নেই, এইটে প্রচার করবার একটা উপলক্ষ জোটে— সেটাকে সে পৌরুষ মনে করে। পুরুষ যুদ্ধ করে এসেছে সব সময়ে যে প্রয়োজন আছে বলে তা নয়, কেবল স্পর্ধা করে এইটে দেখাবার জন্যে যে, প্রাণের তাগিদকে সে গ্রাহ্যই করে না। এইজন্যে যুদ্ধ করার মতো এত বড়ো একটা গোঁয়ারের কাজকে পুরুষ চিরকালই অত্যন্ত বেশি সমাদর করেছে; তার কারণ এ নয় যে, হিংসা করাটাকে সে ভালো মনে করে; তার কারণ এই যে নানাপ্রকার লোভের ও ভয়ের বন্ধনে প্রাণ তাকে বেঁধে রাখবার যে বিস্তৃত আয়োজন করে রেখেছে সেইটেকে সে বিনা প্রয়োজনেও অস্বীকার করতে পারলে গর্ব বোধ করে। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের একটি শিশু বালক আছে, তাকে দেখি, আমাদের বাড়িতে যে জায়গাটা স্থিতির পক্ষে সবচেয়ে অযোগ্য, পৃথিবীর ভারাকর্ষণশক্তিটাকে অশ্রদ্ধা জানানো ছাড়া যেখানে ওঠবার আর কোনো হেতুই নেই, সেইখানেই সে চড়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে ভারাকর্ষণশক্তিও তাকে ছেড়ে কথা কয় নি, কিন্তু তবু তাকে দমিয়ে দিতে পারলে না। এমনি করে বিদ্রোহে সে হাত পাকাচ্ছে আর-কি।

মনে আছে, ছেলেবেলায় আমাদের তেতালার ছাদের সংকীর্ণ কার্নিসটার উপর দিয়ে চলে যাওয়াটাকে উঁচুদরের খেলা বলে মনে করতুম। ভয় করত না বলে নয়, ভয় করত বলেই। ভয় নামক প্রাণের পাহারাওয়ালাটা ঠিক সেই মোড়ের মাথায় দেখা দিত বলেই তাকে ব্যঙ্গ করাটা মজা বলে মনে হত।

পুরুষের মধ্যে এই যে কাণ্ডটা হয়, এ সমস্তই মনের চক্রান্তে। সে বলে, 'প্রাণের সঙ্গে আমার নন্-কো-অপারেশন যতই পাকা হবে ততই আমার মুক্তি হবে সহজ।' কেন রে বাপু, প্রাণ তোমার কী অপরাধটা করেছে, আর এই মুক্তি নিয়েই বা করবে কী। মন বলে, 'আমি অশেষের রাজ্যে সন্ধান করতে বেরব, আমি দুঃসাধ্যের সাধনা করব, দুর্গমের বাধা কাটিয়ে দিয়ে দুর্লভকে উদ্ধার করে আনব। আমি একটু নড়ে বসতে গেলেই যে-দুঃশাসন নানারকম ভয় দেখিয়ে আমাকে পিছ-মোড়া করে বাঁধতে আসে তাকে আমি সম্পূর্ণ হার মানাব তবে ছাড়ব।' তাই পুরুষ তপস্বী বলে বসে, 'না খেয়েই বা বাঁচা যাবে না কেন। নিশ্বাস বন্ধ করলেই যে মরতে হবে, এমন কী কথা আছে।' শুধু তাই নয়, এর চেয়েও শক্ত কথা বলে; বলে, 'মেয়েদের মুখ দেখব না। তারা প্রকৃতির গুপ্তচর, প্রাণরাজত্বের যত-সব দাস সংগ্রহ করবার তারাই আড়কাঠি।' যে-সব পুরুষ তপস্বী নয় শুনে তারাও বলে, 'বাহবা!'

প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সাধারণত কোনো মেয়ের দল বলে না, পুরুষকে সম্পূর্ণ বর্জন করাটাই তাদের জীবনের চরম এবং মহোচ্চ লক্ষ্য। সম্প্রতি কোথাও কোথাও কখনো এমন কথার আভাস শোনা যায়, কিন্তু সেটা হল আস্ফালন। প্রাণের রাজ্যে মেয়েদের যে চিরকেলে স্থান আছে সেখানকার বন্দরের নোঙর ছিঁড়ে মনটাকে নিয়ে তারা নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, এমন কথা দুই-একজন মেয়ে বলতেও পারে; কারণ, যাত্রারম্ভে ভাগ্যদেবতা যখন জীবনের সম্বল স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দেয় তখন প্যাক করবার সময় কিছু যে উল্টোপাল্টা হয় না, তা নয়।

আসল কথা হচ্ছে, প্রকৃতির ব্যবস্থায় মেয়েরা একটা জায়গা পাকা করে পেয়েছে, পুরুষরা তা

পায় নি। পুরুষকে চিরদিন জায়গা খুঁজতে হবে। খুঁজতে খুঁজতে সে কত নতুনেরই সন্ধান পাচ্ছে কিন্তু চরমের আহ্বান তাকে থামতে দিচ্ছে না, বলছে, 'আরও এগিয়ে এসো।'

একজায়গায় এসে যে পেঁচেছে তার একরকমের আয়োজন, আর যাকে চলতে হবে তার আর-একরকমের। এ তো হওয়াই চাই। স্থিতি যে পেয়েছে বসে বসে ক্রমে ক্রমে চারি দিকের সঙ্গে আপন সম্বন্ধকে সে সত্য করতে, পূর্ণ করতে চেষ্টা করে। কেননা, সম্বন্ধ সত্য হলে তবেই তার মধ্যে মুক্তি পাওয়া যায়। যার সঙ্গে ঘর করতে হচ্ছে তার সঙ্গে যদি কেবলই খিটিমিটি বাধতে থাকে তা হলে তার মতো জীবনের বাধা আর কিছু নেই। যদি ভালোবাসা হয় তা হলেই তার সঙ্গে সম্বন্ধের মধ্যে মুক্তি ঘটে। সে মুক্তি বাইরের সমস্ত দুঃখ-অভাবের উপর জয়ী হয়। এইজন্যেই মেয়ের জীবনে সকলের চেয়ে বড়ো সার্থকতা হচ্ছে প্রেমে। এই প্রেমে সে স্থিতির বন্ধনরূপ ঘুচিয়ে দেয়; বাইরের অবস্থার সমস্ত শাসনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।

মুক্তি না হলে কর্ম হতে পারে কিন্তু সৃষ্টি হতে পারে না। মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে চরমশক্তি হচ্ছে সৃষ্টিশক্তি। মানুষের সত্যকার আশ্রয় হচ্ছে আপনার সৃষ্টির মধ্যে; তার থেকে দৈন্যবশত যে বঞ্চিত সে 'পরাবসথশায়ী'। মেয়েকেও সৃষ্টি করতে হবে, তবে সে আপনার বাসা পাবে। তার পক্ষে এই সৃষ্টি প্রেমের দ্বারাই সম্ভব। যে-পুরুষসন্ন্যাসী নিজের কৃচ্ছ্রসাধনের প্রবল দম্ভে মনে করে যে, যেহেতু মেয়েরা সংসারে থাকে এইজন্যে তাদের মুক্তি নেই, সে সত্যকে জানে না। যে-মেয়ের মধ্যে সত্য আছে সে আপন বন্ধনকে স্বীকার করেই প্রেমের দ্বারা তাকে অতিক্রম করে; বন্ধনকে ত্যাগ করার চেয়ে এই মুক্তি বড়ো। সব মেয়েই যে তার জীবনের সার্থকতা পায় তা নয়; সব পুরুষই কি পায়। অনুরাগের সত্যশক্তি সব মেয়ের নেই, বৈরাগ্যের সত্যশক্তি সব পুরুষে মেলে না।

কিন্তু, অন্তত আমাদের দেশে দেখা যায়, পুরুষ সাধক সংসারকে বন্ধনশালা বলেই জানে; তার থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে বহুদূরে পালিয়ে যাওয়াকেই মুক্তির উপায় মনে করে। তার মানে, আমরা যাকে সংসার বলি স্বভাবত সেটা পুরুষের সৃষ্টিক্ষেত্র নয়। এইজন্যে সেখানে পুরুষের মন ছাড়া পায় না। মেয়েরা যখনই মাতৃত্বের অধিকার পেয়েছে তখনই এমন-সকল হৃদয়বৃত্তি পেয়েছে যাতে করে সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপন তাদের পক্ষে সহজ হতে পারে। এইজন্যে যে-মেয়ের মধ্যে সেই হৃদয়বৃত্তির উৎকর্ষ আছে সে আপনার ঘরসংসারকে সৃষ্টি করে তোলে। এ সৃষ্টি তেমনই যেমন সৃষ্টি কাব্য, যেমন সৃষ্টি সংগীত, যেমন সৃষ্টি রাজ্যসাম্রাজ্য। এতে কত সুবুদ্ধি, কত নৈপুণ্য, কত ত্যাগ, কত আত্মসংযম পরিপূর্ণভাবে সম্মিলিত হয়ে অপরূপ সুসংগতি লাভ করেছে। বিচিত্রের এই সম্মিলন একটি অখণ্ডরূপের ঐক্য পেয়েছে; তাকেই বলে সৃষ্টি। এই কারণেই ঘর-কন্নায় মেয়েদের এত একান্ত প্রয়োজন; নির্ভরের জন্যে নয়, আরামের জন্যে নয়, ভোগের জন্যে নয়—মুক্তির জন্যে। কেননা, আত্মপ্রকাশের পূর্ণতাতেই মুক্তি।

পূর্বেই বলেছি, মেয়েদের এই সৃষ্টির কেন্দ্রগত জ্যোতির উৎস হচ্ছে প্রেম। এই প্রেম নিজের স্ফূর্তির জন্যে, সার্থকতার জন্যে, যাকে চায় সেই জিনিসটি হচ্ছে মানুষের সঙ্গ। প্রেমের সৃষ্টিক্ষেত্র নিঃসঙ্গ নির্জনে হতেই পারে না, সে ক্ষেত্র সংসারে। ব্রহ্মার সৃষ্টিক্ষেত্র হতে পারে শূন্যে, কিন্তু বিষ্ণুর শক্তি খাটে লোকজগতে। নারী সেই বিষ্ণুর শক্তি, তার সৃষ্টিতে ব্যক্তিবিশেষের প্রাধান্য; ব্যক্তিবিশেষের তুচ্ছতাও প্রেমের কাছে মূল্যবান। ব্যক্তিবিশেষের ছোটোবড়ো বিচিত্র দাবির সমস্ত খুঁটিনাটিতে সেই প্রেমের আত্মদানশক্তি নিজেকে বহুধারায় উন্মুক্ত করে। ব্যক্তিবিশেষের সেই নানা ক্ষুধার নানা চাওয়া মেয়ের প্রেমের উদ্যমকে কেবলই জাগিয়ে রেখে দেয়। যে-পুরুষ আপন দাবিকে ছোটো করে সে খুব ভালো লোক হতে পারে, কিন্তু মেয়েকে সে পীড়া দেয়, অপূর্ণ করে রাখে। এইজন্যে দেখা যায়, যে-পুরুষ দৌরাত্ম্য করে বেশি মেয়ের ভালোবাসা সেই পায় বেশি।

নারীর প্রেম যে-পুরুষকে চায় তাকে প্রত্যক্ষ চায়, তাকে নিরন্তর নানা আকারে বেষ্টন করবার জন্যে সে ব্যাকুল। মাঝখানে ব্যবধানের শূন্যতাকে সে সইতে পারে না। মেয়েরাই যথার্থ

অভিসারিকা। যেমন করেই হোক, যত দুর্গমই হোক, বিচ্ছেদ পার হবার জন্য তাদের সমস্ত প্রাণ ছটফট করতে থাকে। এইজন্যেই সাধনারত পুরুষ মেয়ের এই নিবিড় সংগবন্ধনের টান এড়িয়ে অতি নিরাপদ দূরত্বের মধ্যে পালাতে ইচ্ছা করে।

পূর্বেই বলেছি, আপন পূর্ণতার জন্যে প্রেম ব্যক্তিবিশেষকে চায়। এই ব্যক্তিবিশেষ জিনিসটি অত্যন্ত বাস্তব জিনিস। তাকে পেতে গেলে তার সমস্ত তুচ্ছ খুঁটিনাটির কোনোটাকে বাদ দেওয়া চলে না, তার দোষ-ত্রুটিকেও মেনে নিতে হয়। ব্যক্তিরূপের উপর ভাবের আবরণ টেনে দিয়ে তাকে অপরূপ করে তোলা প্রেমের পক্ষে অনাবশ্যক। অভাবকে অসম্পূর্ণতাকে প্রেম কামনা করে, নইলে তার নিজের সম্পূর্ণতা সফল হবে কিসে।

দেবতার মনের ভাব ঠিকমত জানি বলে অভিমান রাখি নে কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কার্তিকের চেয়ে গণেশের 'পরে দুর্গার স্নেহ বেশি। এমন-কি, লম্বোদরের অতি অযোগ্য ক্ষুদ্র বাহনটার 'পরে কার্তিকের খোশপোশাকি ময়ূর লোভদৃষ্টি দেয় বলে তার পেখমের অপরূপ সৌন্দর্য সত্ত্বেও তার উপরে তিনি বিরক্ত; ঐ দীনাত্মা ইঁদুরটা যখন তাঁর ভাণ্ডারে ঢুকে তাঁর ভাঁড়গুলোর গায়ে সিঁধ কাটতে থাকে তখন হেসে তিনি তাকে ক্ষমা করেন। শাস্ত্রনীতিজ্ঞ পুরুষবর নন্দী বলে, 'মা, তুমি ওকে শাসন কর না, ও বড়ো প্রশ্রয় পাচ্ছে।' দেবী স্নিগ্ধকণ্ঠে বলেন, 'আহা, চুরি করে খাওয়াই যে ওর স্বধর্ম, তা ওর দোষ কী! ও যে চোরের দাঁত নিয়েই জন্মেছে, সে কি বৃথা হবে।'

বাক্যের অপূর্ণতাকে সংগীত যেমন আপন রসে পূর্ণ করে তোলে, প্রেম তেমনি সুযোগ্যতার অপেক্ষা করে না, অযোগ্যতার ফাঁকের মধ্যে সে নিজেকে ঢেলে দেবার সুযোগ পায়।

মেয়েদের সৃষ্টির আলো যেমন এই প্রেম তেমনি পুরুষের সৃষ্টির আলো কল্পনাবৃত্তি। পুরুষের চিত্ত আপন ধ্যানের দৃষ্টি দিয়ে দেখে, আপন ধ্যানের শক্তি দিয়ে গড়ে তোলে। We are the dreamers of dreams—এ কথা পুরুষের কথা। পুরুষের ধ্যানই মানুষের ইতিহাসে নানা কীর্তির মধ্যে নিরন্তর রূপপরিগ্রহ করছে। এই ধ্যান সমগ্রকে দেখতে চায় বলেই বিশেষের অতিবাহুল্যকে বর্জন করে; যে-সমস্ত বাজে খুঁটিনাটি নিয়ে বিশেষ, সেইগুলো সমগ্রতার পথে বাধার মতো জমে ওঠে। নারীর সৃষ্টি ঘরে, এইজন্যে সব-কিছুকেই সে যত্ন করে জমিয়ে রাখতে পারে; তার ধৈর্য বেশি কেননা, তার ধারণার জায়গাটা বড়ো। পুরুষের সৃষ্টি পথে পথে, এইজন্যে সব-কিছুর ভার লাঘব করে দিয়ে সমগ্রকে সে পেতে ও রাখতে চায়। এই সমগ্রের তৃষ্ণা, এই সমগ্রের দৃষ্টি, নির্মম পুরুষের কত শত কীর্তিকে বহুব্যয়, বহুত্যাগ, বহু-পীড়নের উপর স্থাপিত করেছে। পুরুষ অমিতব্যয়ী, সে দুঃসাহসিক লোকসানের ভিতর দিয়ে লাভ করতে কুণ্ঠিত হয় না। কারণ, তার ধ্যান সমস্ত লোকসানকে পেরিয়ে সমগ্র লাভটাকে সুস্পষ্ট দেখে; ছোটো ছোটো ক্ষতি তার কাছে নগণ্য হয়ে যায়। পুরুষের কল্পনাবৃত্তির সাহস এত অত্যন্ত বেশি তার কারণ, স্থিতির ক্ষেত্রে স্থির হয়ে বসে বিচিত্রের সহস্র খুঁটিনাটিকে মমত্বের আঁকড়ি দিয়ে জড়িয়ে ধরবার দীর্ঘ সময় তার কখনো ছিল না। এইজন্যে সৃষ্টির প্রয়োজনে প্রলয় করতে তার দ্বিধা নেই।

মোট কথা বাস্তবের মধ্যে যে-সব বিশেষের বাহুল্য আছে তাকে বাদ দিয়ে পুরুষ একের সম্পূর্ণতা খোঁজে। এইজন্যেই অধ্যাত্মরাজ্যে পুরুষেরই তপস্যা; এইজন্যে সন্ন্যাসের সাধনায় এত পুরুষের এত আগ্রহ। এবং এইজন্যেই ভাবরাজ্যে পুরুষের সৃষ্টি এত বেশি উৎকর্ষ এবং জ্ঞান-রাজ্যে এত বেশি সম্পদ লাভ করেছে।

পুরুষের এই সমগ্রতার পিপাসা তার প্রেমেও প্রকাশ পায়। সে যখন কোনো মেয়েকে ভালবাসে তখন তাকে একটি সম্পূর্ণ অখণ্ডতায় দেখতে চায় আপনার চিত্তের দৃষ্টি দিয়ে, ভাবের দৃষ্টি দিয়ে। পুরুষের কাব্যে বার বার তার পরিচয় পাওয়া যায়। শেলির এপিসিকীডিয়ন্‌ পড়ে দেখো। মেয়েরা এ কথা জানে। পুরুষের এই প্রার্থনা মেয়েদের বিশেষ করে সৃষ্টি করতে থাকে। কেননা, প্রার্থনার বেগ, প্রার্থনার তাপ, মানুষের সংসারে সৃষ্টির একটা প্রধান শক্তি। আমরা কী চাইব সেটা যদি ঠিকমত ধরতে পারি তা হলে আমরা কী পাব সেটা নিয়ে ভাবতে হয় না।

পুরুষেরা একরকম করে চেয়ে চেয়ে মেয়েদের একরকম করে গড়ে তুলেছে। মেয়েরা আপনার জীবনে এত জায়গায় এত পর্দা খাটায় এইজন্যে; আপনার থেকে সে কত কী বাদ দিয়ে চলে। আমরা বলি লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ। তার মানে, লজ্জা হচ্ছে সেই বৃত্তি যাতে করে মেয়েরা আপনার বাস্তবের বাহুল্যকে সরিয়ে রাখে; মেয়ের রাজ্যে এইজন্যে মস্ত একটা অগোচরতার ব্যবস্থা আছে। সে আপনার এতখানি বাকি রেখেছে যা পুরুষ আপনার মন দিয়ে পুরিয়ে নিতে পারে। সে আপনার খাওয়া-শোয়া, চাল-চলন, বাসনা-সাধনা, সমস্ত থেকেই অতিবাস্তবের প্রত্যক্ষতা এতটা পরিমাণে ঢাকা দেয় যাতে পুরুষের ভাবের মধ্যে তার ছবি সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে বাধা না পায়।

মেয়েদের সঙ্গে পুরুষের ব্যবহারে সম্পূর্ণ এর উল্টো দিকটাও দেখা যায়। পুরুষ কখনো কখনো এমন কাণ্ড করে যেন নারীর মধ্যে অনির্বচনীয়তার কোনো আভাস নেই, যেন তার মাটির প্রদীপে কোনো আলোই জ্বলে নি; তখন লুব্ধ দাঁত দিয়ে তাকে সে আখের মতো চিবিয়ে আবর্জনার মধ্যে ফেলে দেয়। সাত্ত্বিকের ঠিক উল্টোপিঠেই থাকে তামসিক, পূর্ণিমারই অন্য পারে অমাবস্যা। রাস্তার এ দিকটাতে যে সত্য থাকে ঠিক তার সামনের দিকেই তার বিপরীতের বাসা। ফেউ সাক্ষ্য দেয় বাঘেরই অস্তিত্বের। সেই একই কারণে মেয়ে সংসারস্থিতির লক্ষ্মী, আবার সংসার ছারখার করবার প্রলয়ংকরীও তার মতো কেউ নেই।

যা হোক, এটা দেখা যাচ্ছে, সর্বত্রই সর্বকালেই মেয়ে নিজের চার দিকেই একটা বিচিত্র চিত্র-খচিত বেড়ার দূরত্ব তৈরি করে রেখেছে। দুর্গমকে পার হবার জন্যে পুরুষের যে স্বাভাবিক অধ্যবসায় আছে সেইটেকে যতটা পারে সে জাগরূক করে রাখে। পড়ে-পাওয়া জিনিস মূল্যবান হলেও তাতে পুরুষের তৃপ্তি নেই; যাকে সে জয় করে পায় তাকেই সে যথার্থ পায় বলে জানে; কেননা, জয় করে পাওয়া হচ্ছে মন দিয়ে পাওয়া। এইজন্যে অনেক ছল-যুদ্ধের আয়োজনে মেয়েদের সময় কাটে।

নীতিনিপুণ বলে বসবে, এই মায়া তো ভালো নয়। পুরুষ নিজেই চিরকাল ধরে দাবি করলে এই মায়াকে; এই মায়াসৃষ্টির বড়ো বড়ো উপকরণ সে জুগিয়ে দিলে নিজের কল্পরাজ্য থেকে; কবিরা চিত্রীরা মিলে নারীর চার দিকে রঙবেরঙের মায়ামণ্ডল আপন ইচ্ছায় বানিয়ে দিলে— অবশেষে এই মায়ার কাছে পরাভবশঙ্কায় গ্রস্ত সাধুসজ্জন মেয়েজাতকে মায়াবিনী বলে গাল দিতে লেগেছে; তার মায়াদুর্গের উপরে বহুকাল থেকে তারা নীরস শ্লোকের শতঘ্নী বর্ষণ করছে, কোথাও দাগ পড়ছে না।

যারা বাস্তবের উপাসক তারা অনেকে বলে, মেয়েরা অবাস্তবের কুয়াশা দিয়ে নিজেকে ঢেকে ফেলেছে—এ-সমস্তর ভিতর থেকে একেবারে খাঁটি সত্য-মেয়েটিকে উদ্ধার করা চাই। তাদের মতে, সাহিত্যে শিল্পে সব জায়গাতেই এই অবাস্তব মেয়ের ভূতের উপদ্রব অত্যন্ত বেশি। এরা মনে করে, মায়া থেকে ছাড়িয়ে নিলেই বাস্তব সত্যকে পাওয়া যাবে।

কিন্তু, বাস্তব সত্য বলে কোনো জিনিস কি সৃষ্টিতে আছে। সে সত্য যদি-বা থাকে তবে এমন সম্পূর্ণ নির্বিকার মন কোথায় পাওয়া যাবে যার মধ্যে তার বিশুদ্ধ প্রতিবিম্ব পড়তে পারে! মায়াই তো সৃষ্টি; সেই সৃষ্টিকেই যদি অবাস্তব বল তা হলে অনাসৃষ্টি আছে কোন্ চুলোয়? তার নাগাল পাবে কোন্ পণ্ডিত?

নানা ছলাকলায় হাবে-ভাবে সাজে-সজ্জায় নারী নিজের চার দিকে যে-একটি রঙিন রহস্য সৃষ্টি করে তুলেছে সেই আবরণটা ছাড়িয়ে নিয়ে দেখাই তাকে সত্য দেখা, এ কথা মানি নে। গোলাপ ফুলের মায়ার পর্দাটা তুলে ফেলে তাকে কার্বন নাইট্রোজেন বলে দেখা যেমন সত্য দেখা নয়, এও তেমনি। তুমি বাস্তববাদী বলবে, গোলাপ ফুলের মায়া অকৃত্রিম, মেয়ের মায়া কৃত্রিম। একে-বারেই বাজে কথা। মেয়ে নিজের হাতে রঙ বেঁটে যখন তার কাপড় রাঙায় তখন তার হাতের গোপনে সেই প্রকৃতিই থাকে যে প্রকৃতি সকলের অগোচরে প্রজাপতির পাখায় নিজের অদৃশ্য তুলি বুলিয়ে দেয়। প্রাণের রাজ্যে মায়ার খেলা কত বর্ণে গন্ধে রসে, কত লুকোচুরিতে, আভাসে ইশারায়

দিনরাত প্রকাশ পাচ্ছে। প্রকৃতির সেই-সকল নিত্য অথচ অনিত্য চঞ্চলতায়, সেই-সব নিরর্থক হাব-ভাবেই তো বিশ্বের সৌন্দর্য। চিরপলাতকের এই চিরপরিবর্তনশীল লীলা থেকে বাদ দিয়ে যে অতি সারবান ভারবান নিশ্চল ধুলোমাটি-লোহাপাথরের পিণ্ডটা বাকি থাকে তাকেই তুমি বাস্তব-সত্য বল না কি। বসনে ভূষণে, আড়ালে আবডালে, দ্বিধায় দ্বন্দ্বে, ভাবে ভঙ্গিতে মেয়ে তো মায়াবিনীই বটে। তার মায়ার জগতে সে ইন্দ্রজাল বিস্তার করেছে— যেমন মায়া যেমন ইন্দ্রজাল জলে স্থলে, ফুলে ফলে, সমুদ্র পর্বতে, ঝড়ে বন্যায়।

যাই হোক, এই মায়াবিনীই চাঁদের সঙ্গে, ফুলের সঙ্গে, নববর্ষার মেঘের সঙ্গে, কলনৃত্য-ভঙ্গিনী নদীর সঙ্গে মিলে পুরুষের সামনে এসে দাঁড়াল। এই নারী একটা বাস্তবের পিণ্ডমাত্র নয়; এর মধ্যে কলাসৃষ্টির একটা তত্ত্ব আছে; অগোচর একটি নিয়মের বাঁধনে ছন্দের ভঙ্গিতে সে রচিত; সে একটি অনির্বচনীয় সুসমাপ্তির মূর্তি। নানা বাজে খুঁটিনাটিকে সে মধুর নৈপুণ্যে সরিয়ে দিয়েছে; সাজে-সজ্জায় চালে-চলনে নানা ব্যঞ্জনা দিয়ে নিজেকে সে বস্তুলোকের প্রত্যন্তদেশে রসলোকের অধিবাসিনী করে দাঁড় করিয়েছে। 'কাজ করে থাকি' এই কথাটা জানিয়ে পুরুষ হাত খালি রেখেছে; মেয়ে সেই হাতে কাঁকন পরে জানিয়েছে, 'আমি তো কাজ করি নে, আমি সেবা করি।' সেবা হল হৃদয়ের সৃষ্টি, শক্তির চালনা নয়। যে রাস্তায় চলবে সেই রাস্তাটাকে খুব স্পষ্ট করে নিরীক্ষণ করবার জন্যে পুরুষ তার চোখদুটো খুলে রেখেছে, ওটাকে সে গম্ভীর ভাষায় বলে দর্শনেন্দ্রিয়। মেয়ে সেই চোখে একটু কাজলের রেখা টেনে দিয়ে বলেছে, চোখ দিয়ে বাইরের জিনিস দেখা যায় এইটেই চরম কথা নয়— চোখের ভিতরেও দেখবার জিনিস আছে, হৃদয়ের বিচিত্র মায়া।

অন্তরে বাহিরে হৃদয়ের রাগরঞ্জিত লীলা নিয়ে পুরুষের জগতে নারী মূর্তিমতী কলালক্ষ্মী হয়ে এল। রস যেখানে রূপ গ্রহণ করে সেই কলামূর্তির গুণ হচ্ছে এই যে, তার রূপ তাকে অচল বাঁধনে বাঁধে না। খবরের কাগজের সংবাদ-লেখা প্যারাগ্রাফে ছন্দ নেই, রস নেই, সেইজন্যে সে একেবারে নিরেট, সে যা সে তাই মাত্র। মন তার মধ্যে ছুটি পায় না। ভালো কবিতা যে রূপ গ্রহণ করে সে রূপ নির্দিষ্ট হয়েও অনির্দিষ্ট, পাঠকের স্বাতন্ত্র্যকে সে হাঁকিয়ে দেয় না। মনে আছে, বহুকাল হল, রোগশয্যায় কালিদাসের কাব্য আগাগোড়া সমস্ত পড়েছিলুম। যে আনন্দ পেলুম সে তো আবৃত্তির আনন্দ নয়, সৃষ্টির আনন্দ। সেই কাব্যে আমার মন আপন বিশেষ স্বত্ব উপলব্ধি করবার বাধা পেল না। বেশ বুঝলুম, এ-সব কাব্য আমি যেরকম করে পড়লুম দ্বিতীয় আর-কেউ তেমন করে পড়ে নি।

মেয়ের মধ্যেও পুরুষের কল্পনা তেমনি করেই আপন মুক্তি পায়। নারীর চারি দিকে যে-পরিমণ্ডল আছে তা অনির্বচনীয়তার ব্যঞ্জনা দিয়ে তৈরি; পুরুষের কল্পনা সেখানে আপনার রসের রঙ, আপনার ভাবের রূপ মিলিয়ে দিতে কঠিন বাধা পায় না। অর্থাৎ, সেখানে তার নিজের সৃষ্টি চলে, এইজন্যে তার বিশেষ আনন্দ। মোহমুক্ত মানুষ তাই দেখে হাসে; কিন্তু মোহমুক্ত মানুষের কাছে সৃষ্টি বলে কোনো বালাই নেই, সে প্রলয়ের মধ্যে বাস করে।

পূর্বেই বলেছি, মেয়ের প্রেম পুরুষের সমস্ত খুঁটিনাটি দোষত্রুটি সমেত বিশেষত্বকে প্রত্যক্ষ করে পেতে চায়। সঙ্গ তার নিতান্তই চাই। পুরুষও আপনাকে লুকিয়ে রাখে নি, ঢেকে রাখে নি; সে অত্যন্ত অসজ্জিত এলোমেলো আটপৌরে ভাবেই মেয়ের ভালোবাসার কাছে আগাগোড়া নিজেকে ফেলে রেখে দিয়েছে; এতেই মেয়ে যথার্থ সঙ্গ পায়, আনন্দ পায়।

কিন্তু, পুরুষের পক্ষে মেয়ে আপনার সঙ্গে সঙ্গেই একটা দূরত্ব নিয়ে আসে; তার মধ্যে খানিকটা পরিমাণে নিষেধ আছে, ঢাকা আছে। ফোটোগ্রাফের মধ্যে সব আছে, কিন্তু আর্টিস্টের ছবির মধ্যে সব নেই; এইজন্যে তাতে যে ফাঁকা থাকে সেইখানে রসজ্ঞের মন কাজ করতে পারে। সেইরকমের ফাঁকাটুকু মেয়েদের একটা সম্পদ, সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত করতে নেই। বিয়াত্রিচে দান্তের কল্পনাকে যেখানে তরঙ্গিত করে তুলেছে সেখানে বস্তুত একটি অসীম বিরহ। দান্তের হৃদয়

আপনার পূর্ণচন্দ্রকে পেয়েছিল বিচ্ছেদের দূর আকাশে। চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজকিনী রামীর হয়তো বাইরের বিচ্ছেদ ছিল না, কিন্তু কবি যেখানে তাকে ডেকে বলছে,

তুমি বেদবাদিনী, হরের ঘরনী,
তুমি সে নয়নের তারা—

সেখানে রজকিনী রামী কোন্ দূরে চলে গেছে তার ঠিক নেই। হোক-না সে নয়নের তারা, তবুও যে নারী বেদবাদিনী, হরের ঘরনী, সে আছে বিরহলোকে। সেখানে তার সঙ্গ নেই, ভাব আছে। নারীর প্রেমে মিলনের গান বাজে, পুরুষের প্রেমে বিচ্ছেদের বেদনা।

২রা অক্টোবর ১৯২৪

আমি বলছিলুম, মেয়েরা পর্দানশিন। যে কৃত্রিম পর্দা দিয়ে কৃপণ পুরুষ তাদের অদৃশ্য করে লুকিয়ে রাখে আমি সেই বর্বর পর্দাটার কথা বলছি নে; নিজেকে সুসমাপ্তভাবে প্রকাশ করবার জন্যেই তারা যে-সব আবরণকে সহজপটুত্বে আভরণ করে তুলেছে আমি তার কথাই বলছি। এই যে নিজের দেহকে, গৃহকে, আচরণকে, মনকে নানা বর্ণ দিয়ে, ভঙ্গি দিয়ে, সংযম দিয়ে, অনুষ্ঠান দিয়ে, নিজের বিচিত্র একটি বেষ্টনকে তারা সুসজ্জিত করতে পেরেছে, এর কারণ, তারা স্থিতির অবকাশ পেয়েছে। স্থিতির মূল্যই হচ্ছে তার আবরণের ঐশ্বর্যে, তার চারি দিকের দাক্ষিণ্যে, তার আভাসে, ব্যঞ্জনায়, তার হাতে যে সময় আছে সেই সময়টার মনোহর বৈচিত্র্যে। সবুরে মেওয়া ফলে, কেননা, মেওয়া যে প্রাণের জিনিস, কলের ফরমাশে তাকে তাড়াহুড়ো করে গড়ে তোলা যায় না। সেই বহুমূল্য সবুরটা হচ্ছে স্থিতির ঘরের জিনিস। এই সবুরটাকে যদি সরস এবং সফল করতে না পারা গেল তবে তার মতো আপদ আর নেই। মরুভূমি অনাবৃত, তার অবকাশের অভাব নেই অথচ সেই অবকাশ রিক্ত; এই কঠিন নগ্নতা পীড়া দেয়। কিন্তু, যেখানে পোড়ো জমি পোড়ো হয়ে নেই সেখানে সে ফসলে ঢাকা, ফুলে বিচিত্র; সেখানে তার সবুজ ওড়না বাতাসে দুলে উঠছে। যে পথিক পথে চলে সেখানেই সে পায় তার তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার অন্ন, তার আরামের ছায়া ক্লান্তির শুশ্রূষা। সেখানকার স্থিতির পূর্ণতাই তার গতির সহায়; অবারিত মরুভূমি সবচেয়ে বাধা। নারী স্বভাবতই যে স্থিতি পেয়েছে বসে বসে ধীরে ধীরে সে স্থিতিকে রাঙিয়ে তুলে আপন হৃদয়রসে রসিয়ে নিয়ে তাই দিয়ে আপন বুকের কাঁচলি আপন মুখের ঘোমটা বানিয়েছে। এই ঢাকাতেই সে আপনার ঐশ্বর্য প্রকাশ করেছে পুষ্পপল্লবের আবরণেই যেমন লতার ঐশ্বর্য।

কিন্তু হঠাৎ আজকাল পাশ্চাত্যসমাজে শুনতে পাচ্ছি, নারী বলছে, 'আমি মায়ার আবরণ রাখব না, পুরুষের সঙ্গে ব্যবধান ঘুচিয়ে দেব। আমি হব বিজ্ঞানের চাঁদ; তার চারি দিকে বায়ুমণ্ডল নেই, মেঘ নেই, রঙ নেই, কোমল শ্যামলের চঞ্চল বিচিত্রতা নেই, তার কালো কালো ক্ষতগুলোর উপরে পর্দা নেই, আমিও হব তেমনি। এতদিন যাকে বলে এসেছি লজ্জা, যাকে বলে এসেছি শ্রী, আজ তাতে আমার পরাভব ঘটছে; সে-সব বাধা বর্জন করব। পুরুষের চালে তার সমান তালে পা ফেলে তার সমান রাস্তায় চলব।' এমন কথা যে একদল স্ত্রীলোকের মুখ দিয়ে বের হল, এটা সম্ভব হল কী করে। এতে বোঝা যায়, পুরুষের প্রকৃতির মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। মেয়েকে সে চাচ্ছে না। এমন নয় যে সে হঠাৎ সন্ন্যাসী হয়ে উঠেছে; ঠিক তার উলটো—সে হয়েছে বিষয়ী; মেয়েকে সে কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিতে চায়; কড়ায় গণ্ডায় যার হিসাব মেলে না তাকে সে মনে করে বাজে জিনিস, তাকে সে মনে করে ঠকা। সে বলে, 'আমি চোখ খুলে তন্ন তন্ন করে দেখব।' অর্থাৎ, ধ্যানের দেখায় যা মনকে ভরিয়ে তোলে সেটাকে সে জানে ফাঁকি। কিন্তু, পুরুষের সংসারে সত্যকার মেয়ে তো কেবলমাত্র চোখের দেখার নয়, সে তো ধ্যানের জিনিসও বটে। সে যে শরীরী অশরীরী দুয়ে মিলিয়ে, পৃথিবী যেমন নিজের মাটি ধুলো এবং নিজের চার দিকের অসীম আকাশ ও বায়ুমণ্ডল মিলিয়ে। মেয়ের যা অশরীরী তা যে শরীরী

মেয়েকে ঘিরে আছে; তার ওজন নেই, কিন্তু তার বর্ণ আছে, ভঙ্গি আছে; তা ঢাকে অথচ তা প্রকাশ করে।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় যারা উন্নতির বড়াই করে, তারা বলবে, এই মেয়েলির প্রতি অসহিষ্ণুতায় চলার উৎসাহ প্রকাশ পায়। আমার মনে হয়, এটাই থামবার পূর্বলক্ষণ। চলার ছন্দই থাকে না যদি স্থিতির সঙ্গে তার সমস্ত আপস একেবারে মিটে যায়। গাড়িটার ঘোড়াও চলছে, সারথিও চলছে, যাত্রীরাও চলছে, গাড়ির জোড় খুলে গিয়ে তার অংশপ্রত্যংশগুলোও চলছে, একে তো চলা বলে না; এ হচ্ছে মরণোন্মুখ চলার উন্মত্ত প্রলাপ, সাংঘাতিক থামার ভূমিকা। মেয়েরা সমাজের চলাকেই স্থিতির ছন্দ দেয়—সে ছন্দ সুন্দর।

একদল মেয়ে বলতে শুরু করেছে যে, 'মেয়ে হওয়াতে আমাদের অগৌরব, আমাদের ক্ষতি। অর্থাৎ, আমাদের আত্মপ্রকাশের ধারায় পুরুষের সঙ্গে প্রভেদটাতে পীড়া পাচ্ছি।' এর থেকে বোধ হচ্ছে, একদিন যে পুরুষ সাধক ছিল এখন সে হয়েছে বণিক। বণিক বাইরের দিকে যদি-বা চলে, অন্তরের দিকে আপনার সঞ্চয়ের বোঝার কাছে সতর্ক হয়ে পড়ে আছে। তার স্থিতি সারবান কিন্তু সুন্দর নয়। তার কারণ, মানুষের সম্বন্ধকে হৃদয়মাধুর্যে সত্য করে পূর্ণ করে তোলা তার স্থিতির ধর্ম নয়; ধনসঞ্চয়ের তলায় মানুষের সম্বন্ধকে চাপা দিয়ে চ্যাপটা করে দেওয়াই হয়েছে তার কাজ। সুতরাং, সে যে কেবল চলে না তা নয়, আপন স্থিতিকে ভারগ্রস্ত নীরস নির্মম অসুন্দর করে। অঙ্কের কোঠার মধ্যে যাকে ধরে না তাকে সে আবর্জনার মধ্যে ফেলে দেয়।

পুরুষ একদিন ছিল মিস্টিক্, ছিল অতল রসের ডুবারি, ছিল ধ্যানী। এখন সে হয়েছে মেয়েদের মতোই সংসারী। কেবল প্রভেদ এই যে, তার সংসারে আলো নেই, বাতাস নেই, আকাশ নেই; বস্তুপিণ্ডে সমস্ত নিরেট। সে ভারি ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার মধ্যে সেই আকাশ সে পায় না যে আকাশে আপন কল্পনাকে রূপে রসে মুক্তি দিতে পারে।

আজকালকার কবি আপন কাব্যে, শিল্পী আপন কারুতে, অনির্বচনীয়কে সুন্দরকে অবজ্ঞা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। এটা কি পৌরুষের উল্টো নয়। পুরুষই তো চিরদিন সুন্দরের কাছ থেকে আপন শক্তির জয়মাল্য কামনা করেছে। মিস্টিক্ পুরুষ তার ধ্যানশক্তিতে, তার ফলাসক্তি-বিহীন সাধনায়, বাস্তবের আবরণ একটার পর একটা যতই মোচন করেছে ততই রসের লোকে, অধ্যাত্মলোকে সে ভূমার পরিচয় পেয়েছে। আজ কেবলই সে থলির পর থলির মুখ বাঁধছে, সিন্দুকের পর সিন্দুকে তালা লাগাচ্ছে; আজ তার সে মুক্তি নেই যে মুক্তির মধ্যে সুন্দর আপন সিংহাসন রচনা করে। তাই তার মেয়েরা বলছে, 'আমরা পুরুষ সাজব।' তাই তার কাব্যসরস্বতী বলছে, বীণার তারগুলোকে যত্ন করে না বাঁধলে যে-সুরটা ঝন্‌ঝন্ করতে থাকে সেইটেই খাঁটি বাস্তবের সুর, উপেক্ষার উচ্ছৃঙ্খল দুরন্তপনায় রূপের মধ্যে যে বিপর্যয় যে ছিন্নভিন্নতা ঘটে সেইটেই আর্ট।

দিন চলে গেল। ভুলে ছিলুম যে, সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে চলেছি। মন চলেছিল আপন রাস্তায়, এক ভাবনা থেকে আর-এক ভাবনায়। চলেছিল বললে বেশি বলা হয়। উট যেমন বোঝা পিঠে নিয়ে মরুর মধ্যে পথ আন্দাজ করে চলে এ তেমন চলা নয়; এ যেন পথের খেয়াল না রেখে ভেসে যাওয়া, কোনো বিশেষ ঘাটের কাছে বায়না না নিয়ে শুধু শুধু বেরিয়ে পড়া, কথাগুলোকে নিজের চেষ্টায় চালনা না করে দিকের হিসেব না রেখে তাদের আপনার ঝোঁকে চলতে দেওয়া। তার সুবিধা হচ্ছে এই যে, কথাগুলো নিজেরাই হয় বক্তা, আর মনটা হয় শ্রোতা। মন তখন অন্যকে কিছু দেবার কথা ভাবে না, নিজের কাছ থেকে নিজে পায়। মনের ভূগোলে অনাবিষ্কৃতের আর অন্ত নেই। সে-সব জায়গায় পৌঁছে দেবার পথগুলো সবই নদীর মতো, অর্থাৎ সে পথ নিজে চলে বলেই চালায়; তারই স্রোতে মন আপনাকে ভাসিয়ে দিতে পারলে নিজের মধ্যে অপরিচিতের পরিচয় পেতে থাকে। আর্যাবর্তের বুকের উপর দিয়ে যে গঙ্গা চলে গেছে সেই তো ভারতবর্ষের অপরিচিত পূর্বের সঙ্গে অপরিচিত পশ্চিমকে সহজেই মুখোমুখি করে দিয়েছিল। তেমনি যে মানুষের

মনের মাঝখান দিয়ে চলতি নদী থাকে সে মানুষ আপনার কাছ থেকে আপনি শিক্ষা করবার সুযোগ পায়। আমার মনে সেই নদীটা আছে। তারই ডাকে ছেলেবেলায় আমি ইস্কুল পালিয়েছিলুম। যে-সব জ্ঞান শিখে শিখতে হয় তার বিস্তর অভাব রয়ে গেল কিন্তু অন্য দিকে ক্ষতিপূরণ হয়েছে। সেজন্যে আমার মনের ভিতরকার ভাগীরথীকে আমি প্রণাম করি।

বাইরে ডেকে এসে দাঁড়ালুম। তখন সূর্য অল্পক্ষণ আগেই অস্ত গেছে। শান্ত সমুদ্র, মৃদু বাতাসটা যেন মুখচোরা। জল ঝিল্‌মিল্‌ করছে। পশ্চিমদিক্‌প্রান্তে দু-একটা মেঘের টুকরো সোনার ধারায় অভিষিক্ত হয়ে স্থির হয়ে পড়ে আছে। আর-একটু উপরে তৃতীয়ার চাঁদের কণা। সেখানকার আকাশে তখনো সন্ধ্যার ঘোর লাগে নি; দিনের সভা যদিও ভেঙে গেছে, তবু সেখানে তার সাদা জাজিমখানা পাতা। চাঁদটাকে দেখে মনে হচ্ছে, যেন অসময়ে অজায়গায় এসে পড়েছে। যেন একদেশের রাজপুত্র আর-এক রাজার দেশে হঠাৎ উপস্থিত, যথোচিত অভ্যর্থনার আয়োজন হয় নি, তার নিজের অনুচর তারাগুলো পিছিয়ে পড়েছে। এদিকে ঠিক সেই সময়ে পশ্চিম আকাশের সমস্ত সোনার মশাল, সমস্ত সমারোহ, সূর্যের অস্তযাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত; ঐ চাঁদটুকুকে কেউ দেখতেই পাচ্ছে না।

এই জনশূন্য সমুদ্র ও আকাশের সঙ্গমস্থলে পশ্চিমদিগন্তে একখানি ছবি দেখলুম। অল্প কয়েকটি রেখা, অল্প কিছু উপকরণ; আকাশ এবং সমুদ্রের নীলের ভিতর দিয়ে অবসানদিনের শেষ আলো যেন তার শেষ কথাটি কোনো-একটা জায়গায় রেখে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে বেরিয়ে আসতে চায়, কিন্তু উদাস শূন্যের মধ্যে ধরে রাখবার জায়গা কোথাও না পেয়ে ম্লান হয়ে পড়েছে— এই ভাবটিই যেন সেই ছবিটির ভাব।

ডেকের ওপর স্তব্ধ দাঁড়িয়ে শান্ত একটি গভীরতার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে আমি যা দেখলুম তাকে আমি বিশেষ অর্থেই ছবি বলছি, যাকে বলে দৃশ্য এ তা নয়। অর্থাৎ, এর মধ্যে যা-কিছুর সমাবেশ হয়েছে কেউ যেন সেগুলিকে বিশেষভাবে বেছে নিয়ে পরস্পরকে মিলিয়ে, একটি সম্পূর্ণতার মধ্যে সাজিয়ে ধরেছে। এমন একটি সরল গভীর মহৎ সম্পূর্ণতার ছবি কলকাতার আকাশে এক-মুহূর্তে এমন সমগ্র হয়ে আমার কাছে হয়তো দেখা দিত না। এখানে চারি দিকের এই বিপুল রিক্ততার মাঝখানে এই ছবিটি এমন একান্ত এক হয়ে উঠে আমার কাছে প্রকাশ পেলে। একে সম্পূর্ণ করে দেখবার জন্যে এত বড়ো আকাশ এবং এত গভীর স্তব্ধতার দরকার ছিল।

জাপানের কথা আমার মনে পড়ে। ঘরের মধ্যে একেবারে কোনো আসবাব নেই। একটি দেয়ালে একখানি ছবি ঝুলছে। ঐ ছবি আমার সমস্ত চোখ একা অধিকার করে; চারি পাশে কোথাও চিত্তবিক্ষেপ করবার মতো কিছুই নেই। রিক্ততার আকাশে তার সমস্ত অর্থটি জ্যোতির্ময় হয়ে প্রকাশ পায়। ঘরে যদি নানা জিনিস ভিড় করত তবে তাদের মধ্যে এই ছবি থাকত একটি আসবাবমাত্র হয়ে, তার ছবির মাহাত্ম্য ম্লান হত, সে আপনার সব কথা বলতে পারত না।

কাব্য সংগীত প্রভৃতি অন্য-সমস্ত রসসৃষ্টিও এইরকম বস্তুবাহুল্যবিরল রিক্ততার অপেক্ষা রাখে। তাদের চারি দিকে যদি অবকাশ না থাকে তা হলে সম্পূর্ণ মূর্তিতে তাদের দেখা যায় না। আজকালকার দিনে সেই অবকাশ নেই, তাই এখনকার লোকে সাহিত্য বা কলাসৃষ্টির সম্পূর্ণতা থেকে বঞ্চিত। তারা রস চায় না, মদ চায়; আনন্দ চায় না, আমোদ চায়। চিত্তের জাগরণটা তাদের কাছে শূন্য, তারা চায় চমকলাগা। ভিড়ের ঠেলাঠেলির মধ্যে অন্যমনস্কের মন যদি কাব্যকে গানকে পেতে হয় তা হলে তার খুব আড়ম্বরের ঘটা করা দরকার। কিন্তু, সে আড়ম্বরে শ্রোতার কানটাকেই পাওয়া যায় মাত্র, ভিতরের রসের কথাটা আরও বেশি করে ঢাকাই পড়ে। কারণ, সরলতা স্বচ্ছতা আর্টের যথার্থ আভরণ। যেখানে কোলাহল বেশি, ভিড় বৃহৎ, মন নানা-কিছুতে বিক্ষিপ্ত, আর্ট সেখানে কসরত দেখাবার প্রলোভনে মজে, আপনাকে দেখাতে ভুলে যায়। আড়ম্বর জিনিসটা একটা চীৎকার; যেখানে গোলমালের অন্ত নেই সেখানে তাকে গোচর হয়ে ওঠবার জন্যে চীৎকার করতে হয়; সেই চীৎকারটাকেই ভিড়ের লোক শক্তির লক্ষণ জেনে পুলকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু, আর্ট তো

চীৎকার নয়, তার গভীরতম পরিচয় হচ্ছে তার আত্মসংবরণে। আর্ট বরঞ্চ ঠেলা খেয়ে চুপ করে যেতে রাজি আছে, কিন্তু ঠেলা মেরে পালোয়ানি করার মতো লজ্জা তার আর নেই। হায় রে লোকের মন, তোমাকে খুশি করবার জন্যে রামচন্দ্র একদিন সীতাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন তোমাকে ভোলাবার জন্যেই আর্ট আজ আপনার শ্রী ও হ্রী বিসর্জন দিয়ে নৃত্য ভুলে পাঁয়তারা মেরে বেড়াচ্ছে।

হারুনা-মারু জাহাজ
৩রা অক্টোবর ১৯২৪

এখনো সূর্য ওঠে নি। আলোকের অবতরণিকা পূর্ব আকাশে। জল স্থির হয়ে আছে সিংহবাহিনীর পায়ের তলাকার সিংহের মতো। সূর্যোদয়ের এই আগমনীর মধ্যে মজে গিয়ে আমার মুখে হঠাৎ ছন্দে-গাঁথা এই কথাটা আপনিই ভেসে উঠল—

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড় বারে বারে।

বুঝতে পারলুম আমার কোনো-একটি আগন্তুক কবিতা মনের মধ্যে এসে পৌঁছবার আগেই তার ধুয়োটা এসে পৌঁচেছে। এইরকমের ধুয়ো অনেক সময়ে উড়ো বীজের মতো মনে এসে পড়ে, কিন্তু সব সময়ে তাকে এমন স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায় না।

সমুদ্রের দূর তীরে যে ধরণী আপনার নানা-রঙ আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়ে পূবের দিকে মুখ করে একলা বসে আছে, ছবির মতো দেখতে পেলুম, তার কোলের উপর একখানি চিঠি পড়ল খসে কোন্ উপরের থেকে। সেই চিঠিখানি বুকের কাছে তুলে ধরে সে একমনে পড়তে বসে গেল; তালতমালের নিবিড় বনচ্ছায়া পিছনে রইল এলিয়ে, নুয়ে-পড়া মাথার থেকে ছড়িয়ে-পড়া এলোচুল।

আমার কবিতার ধুয়ো বলছে, প্রতিদিন সেই একই চিঠি। সেই একখানির বেশি আর দরকার নেই; সেই ওর যথেষ্ট। সে এত বড়ো, তাই সে এত সরল। সেই একখানিতেই সব আকাশ এমন সহজে ভরে গেছে।

ধরণী পাঠ করছে কত যুগ থেকে। সেই পাঠ-করাটা আমি মনে মনে চেয়ে দেখছি। সুরলোকের বাণী পৃথিবীর বুকের ভিতর দিয়ে, কণ্ঠের ভিতর দিয়ে, রূপে রূপে বিচিত্র হয়ে উঠল। বনে বনে হল গাছ, ফুলে ফুলে হল গন্ধ, প্রাণে প্রাণে হল নিশ্বসিত। একটি চিঠির সেই একটি মাত্র কথা, সেই আলো। সেই সুন্দর, সেই ভীষণ; সেই হাসির ঝিলিকে ঝিকিমিকি, সেই কান্নার কাঁপনে ছলছল।

এই চিঠি-পড়াটাই সৃষ্টির স্রোত; যে দিচ্ছে আর যে পাচ্ছে সেই দুজনের কথা এতে মিলেছে, সেই মিলনেই রূপের ঢেউ। সেই মিলনের জায়গাটা হচ্ছে বিচ্ছেদ। কেননা, দূর-নিকটের ভেদ না ঘটলে স্রোত বয় না, চিঠি চলে না। সৃষ্টি-উৎসের মুখে কী-একটা কাণ্ড আছে, সে এক ধারাকে দুই-ধারায় ভাগ করে। বীজ ছিল নিতান্ত এক, তাকে দ্বিধা করে দিয়ে দুখানি কচি পাতা বেরল, তখনই সেই বীজ পেল তার বাণী; নইলে সে বোবা, নইলে সে কৃপণ, আপন ঐশ্বর্য আপনি ভোগ করতে জানে না। জীব ছিল একা, বিদীর্ণ হয়ে স্ত্রী-পুরুষে সে দুই হয়ে গেল। তখনই তার সেই বিভাগের ফাঁকের মধ্যে বসল তার ডাকবিভাগ। ডাকের পর ডাক, তার অন্ত নেই। বিচ্ছেদের এই ফাঁক একটা বড়ো সম্পদ; এ নইলে সব চুপ, সব বন্ধ। এই ফাঁকটার বুকের ভিতর দিয়ে একটা অপেক্ষার ব্যথা, একটা আকাঙ্ক্ষার টান, টন্‌টন্ করে উঠল; দিতে-চাওয়ার আর পেতে-চাওয়ার উত্তর-প্রত্যুত্তর এ-পারে ও-পারে চালাচালি হতে লাগল। এতেই দুলে উঠল সৃষ্টিতরঙ্গ, বিচলিত হল ঋতুপর্যায়, কখনো বা গ্রীষ্মের তপস্যা, কখনো বর্ষার প্লাবন, কখনো বা শীতের সংকোচ, কখনো বা বসন্তের দাক্ষিণ্য। একে যদি মায়া বল তো দোষ নেই, কেননা, এই চিঠিলিখনের

অক্ষরে আবছায়া, ভাষায় ইশারা; এর আবির্ভাব-তিরোভাবের পুরো মানে সব সময়ে বোঝা যায় না যাকে চোখে দেখা যায় না সেই উত্তাপ কখন আকাশপথ থেকে মাটির আড়ালে চলে যায়; মনে ভাবি, একেবারেই গেল বুঝি। কিছু কাল যায়, একদিন দেখি, মাটির পর্দা ফাঁক করে দিয়ে একটি অঙ্কুর উপরের দিকে কোন্-এক আর-জন্মের চেনা-মুখ খুঁজছে। যে উত্তাপটা ফেরার হয়েছে বলে সেদিন রব উঠল সেই তো মাটির তলার অন্ধকারে সেঁধিয়ে কোন্ ঘুমিয়ে-পড়া বীজের দরজায় বসে বসে ঘা দিচ্ছিল। এমনি করেই কত অদৃশ্য ইশারার উত্তাপ এক-হৃদয়ের থেকে আর-এক হৃদয়ের ফাঁকে ফাঁকে কোন্ চোরকোঠায় গিয়ে ঢোকে, সেখানে কার সঙ্গে কী কানাকানি করে জানি নে, তার পরে কিছুদিন বাদে একটি নবীন বাণী পর্দার বাইরে এসে বলে 'এসেছি'।

আমার সহযাত্রী বন্ধু আমার ডায়ারি পড়ে বললেন, 'তুমি ধরণীর চিঠি-পড়ায় আর মানুষের চিঠি-পড়ায় মিশিয়ে দিয়ে একটা যেন কী গোল পাকিয়েছ। কালিদাসের মেঘদূতে বিরহী-বিরহিণীর বেদনাটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তোমার এই লেখায় কোন্‌খানে রূপক কোন্‌খানে সাদা কথা বোঝা শক্ত হয়ে উঠেছে।' আমি বললুম, কালিদাস যে মেঘদূত কাব্য লিখেছেন সেটাও বিশ্বের কথা। নইলে তার একপ্রান্তে নির্বাসিত যক্ষ রামগিরিতে, আর-একপ্রান্তে বিরহিণী কেন অলকা-পুরীতে। স্বর্গমর্তের এই বিরহই তো সকল সৃষ্টিতে। এই মন্দাক্রান্তাছন্দেই তো বিশ্বের গান বেজে উঠছে। বিচ্ছেদের ফাঁকের ভিতর দিয়ে অণু-পরমাণু নিত্যই যে অদৃশ্য চিঠি চালাচালি করে সেই চিঠিই সৃষ্টির বাণী। স্ত্রীপুরুষের মাঝখানেও, চোখে চোখেই হোক, কানে কানেই হোক, মনে মনেই হোক, আর কাগজে-পত্রেই হোক, যে চিঠি চলে সেও ঐ বিশ্বচিঠিরই একটি বিশেষ রূপ।

৫ই অক্টোবর ১৯২৪

মানুষের আয়ুতে ষাটের কোঠা অস্তদিগন্তের দিকে হেলে-পড়া। অর্থাৎ, উদয়ের দিগন্তটা এই সময়ে সামনে এসে পড়ে, পূর্বে পশ্চিমে মুখোমুখি হয়।

জীবনের মাঝমহলে, যে কালটাকে বলে পরিণত বয়স, সেইসময়ে অনেক বড়ো বড়ো সংকল্প, অনেক কঠিন সাধনা অনেক মস্ত লাভ, অনেক মস্ত লোকসান এসে জমেছিল। সব জড়িয়ে ভেবেছি, এইবার আসা গেল পাকা-পরিচয়ের কিনারাটাতে। সেইসময়ে কেউ যদি হঠাৎ এসে জিজ্ঞাসা করত 'তোমার বয়স কত'। তা হলে আমার গোড়ার দিকের ছত্রিশটা বছর সরিয়ে রেখে বলতুম, আমি হচ্ছি বাকিটুকু। অর্থাৎ, আমার বয়স হচ্ছে কুষ্ঠির শেষদিকের সাতাশ। এই পাকা সাতাশের রকম-সকম দেখে গম্ভীর লোকে খুশি হল। তারা কেউ বললে 'নেতা হও', কেউ বললে 'সভাপতি হও', কেউ বললে 'উপদেশ দাও'। আবার কেউ বললে, 'দেশটাকে মাটি করতে বসেছ'। অর্থাৎ, স্বীকার করলে দেশটাকে মাটি করে দেবার মতো অসামান্য ক্ষমতা আমার আছে।

এমন সময়ে ষাটে পড়লুম। একদিন বিকেলবেলায় সামনের বাড়ির ছাতে দেখি, দশ-বারো বছরের একটি ছেলে খালি-গায়ে যা-খুশি করে বেড়াচ্ছে। ঠিক সেইসময়ে চা খেতে-খেতে একটা জরুরি কথা ভাবছি।

ভাবনাটা একদমে এক-লাইন থেকে আর-এক লাইনে চলে গেল। হঠাৎ নিতান্ত এই একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা মনে উঠল যে, ঐ ছেলেটা এই অপরাহ্নের আকাশের সঙ্গে একেবারে সম্পূর্ণ মিশ খেয়ে গেছে; কোনো একটা অন্যমনস্কতার ঠেলায় বিশ্বপৃথিবীর সঙ্গে ওর জোড় ভেঙে যায় নি। সমস্ত দিগ্‌দিগন্তরকে ঐ ছেলে তার সর্বাঙ্গ দিয়ে পেয়েছে, দিগম্বর শিবের মতো। কিসে যেন একটা ধাক্কা দিয়ে আমাকে মনে করিয়ে দিলে যে, অমনি করেই নগ্ন হয়ে সমস্তর মধ্যে মগ্ন হয়ে নিখিলের আঙিনায় আমিও একদিন এসে দাঁড়িয়েছিলুম। মনে হল, সেটা কম কথা নয়। অর্থাৎ, আজও যদি বিশ্বের স্পর্শ প্রত্যক্ষ প্রাণের মধ্যে তেমনি করে এসে লাগত তা হলে ঠকতুম না। তা হলে আমার জীবন-ইতিহাসের মধ্যযুগে অকালে যুগান্তর-অবতারণার যে-সব আয়োজন করা গেছে তার ভার আমার চেয়ে যোগ্যতর লোকের হাতেই পড়ত, আর বাদশাই কুঁড়ের সিংহাসনটা আমি

স্থায়ীরূপে দখল করে বসবার সময় পেতুম। সেই কুঁড়েমির ঐশ্বর্য আমি যে একলা ভোগ করতুম তা নয়, এই রসের রসিক যারা তাদের জন্যে ভাণ্ডারের দ্বার খুলে দিয়ে বলা যেত, পীয়তাং ভুজ্যতাম্।

চায়ের পাত্রটা ভুলে গিয়ে ভাবতে লাগলুম, যে পুলকটাতে আজ মন আবিষ্ট হয়েছে সেটার কথা সবাইকে বুঝিয়ে বলি কী করে। বয়স যখন ছত্রিশের নীচে ছিল তখন বলা-ই আমার কাজ ছিল, বুঝিয়ে বলার ধার ধারতুম না। কেননা, তখন তেপান্তর মাঠের মাঝখানটাতে আমার ঘোড়া ছুটছে, যারা না বুঝে কিছুতেই ছাড়ে না তারা আমার ঠিকানা পায় নি। আজ পনেরো-ষোলো বিশ-পঁচিশ আশি-পঁচাশি প্রভৃতি নানা-বয়সের প্রাচীন লোকের ঠেসাঠেসি ভিড়ের মধ্যে এসে পড়েছি। ওদের বোঝাব কী করে, এই দুর্ভাবনা এখন ভুলে থাকাই শক্ত। মুশকিল এই যে, পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ আছে, মশা আছে, পুলিস আছে, স্বরাজ পররাজ দৈবরাজ নৈরাজের ভাবনা আছে, এরই মধ্যে ঐ গা-খোলা ছেলেটা দিনের শেষ প্রহরের বেকার বেলাতে ছাদের উপরে ঘুরে বেড়ায়। আকাশের আলিঙ্গনে-বাঁধা ঐ ভোলা মন ছেলেটিতে একটি নিত্যকালের কথা আছে, সে আমি শুনেছি, কিন্তু সে আমি ভাষায় কেমন করে স্পষ্ট করে তুলব।

আজ মনে হচ্ছে, ঐ ছেলেটার কথা আমারই খুব ভিতরের কথা, গোলেমালে অনেক কাল তার দিকে চোখ পড়ে নি। বারো বছরের সেই নিত্য-ভোলা ইস্কুল-পালানো লক্ষ্মীছাড়াটা গাম্ভীর্যের নিবিড় ছায়ায় কোথায় লুকিয়ে লুকিয়ে খেলা করছিল। এখন ভাবনা ধরিয়ে দিলে, আমার আসল পরিচয় কোন্ দিকটায়। সেই আরম্ভ-বেলাকার সাতাশের দিকে, না, শেষ-বেলাকার?

দায়িত্বের বোঝা মাথায় করে ষাটের আরম্ভে একবার আমেরিকায় গিয়েছিলুম। তখন য়ুরোপের যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে, কিন্তু তারই নেশায় তখনো আমেরিকার চোখ যেরকম রক্তবর্ণ য়ুরোপেরও এমন নয়। তার উপর তখন ইংরেজ নানা উপায়ে আমেরিকার শ্রবণেন্দ্রিয়ের পথ জুড়ে নিজের ভেঁপুটা বাজাচ্ছে। ডিমক্রাসির গুণ এই যে, নিজে ভাববার না আছে তার উদ্যম, না আছে তার শক্তি। যে চতুর লোক কানে মন্ত্র দেবার ব্যবস্থা আয়ত্ত করেছে সে নিজের ভাবনা তাকে ভাবায়। ঠিক এখনকার খবর জানি নে, তখন ইংরেজ আমেরিকার বিপুলকায় ডিমক্রাসিকে কানে ধরে নিজের ভাবনা ভাবাচ্ছিল। সেই কানে মন্ত্র দেবার যন্ত্রটা আমার বিরুদ্ধে তার চাকা চালিয়ে দিলে। ভয় ছিল পাছে আমি ইংরেজের অপযশ রটাই। তার আগেই জালিয়ানওয়ালাবাগের ব্যাপার ঘটেছিল।

যাই হোক, যে কয়টা মাস আমেরিকায় কাটিয়েছি, হাওয়ার মধ্যে যেন একটা বিরোধের ঠেলা ছিল। ভাবুক যেখানেই আছে সেখানেই মানুষের আপনার দেশ, কোনো দেশে সেই ভাবুকতার স্রোতে যখন কমতি পড়ে তখন পদে পদে পাঁকের বাধায় বিদেশী পথিককে গ্লানি দেয়। যেদিন ভাবুকতার ঔদার্য থেকে রিক্ত আমেরিকাকে দেখলুম সেদিন দেখি সে ভয়ংকর ধনী, ভয়ংকর কেজো, সিদ্ধির নেশায় তার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ। তারই পাশে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে চেয়ে দেখি, আমি নিতান্ত কাঁচা, জন্ম-গরিব, একেবারে অস্থিতে-মজ্জাতে বেহিসাবি। এও বুঝলুম, এ জগতে কাঁচা মানুষের খুব একটা পাকা জায়গা আছে, চিরকেলে জায়গা। ষাট বছরে পেঁছে হঠাৎ দেখলুম, সেই জায়গাটা দূরে ফেলে এসেছি।

যতই বুঝতে পারি ততই দেখতে পাই, পাকা দেয়ালগুলোই মায়া, পাথরের কেল্লাই কয়েদখানা। মন কাঁদছে, মরবার আগে গা-খোলা ছেলের জগতে আর-একবার শেষ ছেলেখেলা খেলে নিতে, দায়িত্ব-বিহীন খেলা। আর, কিশোর বয়সে যারা আমাকে কাঁদিয়েছিল, হাসিয়েছিল, আমার কাছ থেকে আমার গান লুঠ করে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলেছিল, আমার মনের কৃতজ্ঞতা তাদের দিকে ছুটল। তারা মস্ত বড়ো কিছুই নয়; তারা দেখা দিয়েছে কেউ বা বনের ছায়ায়, কেউ বা নদীর ধারে, কেউ বা ঘরের কোণে, কেউ বা পথের বাঁকে। তারা স্থায়ী কীর্তি রাখবার দল নয়, ক্ষমতার ক্ষয়বৃদ্ধি নিয়ে তাদের ভাবনাই নেই; তারা চলতে চলতে দুটো কথা বলেছে, সব কথা বলবার সময় পায় নি; তারা কালস্রোতের মাঝখানে বাঁধ বাঁধবার চেষ্টা করে নি, তারই ঢেউয়ের উপর নৃত্য করে চলে গেছে, তারই কলস্বরে সুর মিলিয়ে; হেসে চলে গেছে, তারই আলোর ঝিলিমিলির মতো। তাদের দিকে মুখ

ফিরিয়ে বললুম, 'আমার জীবনে যাতে সত্যিকার ফসল ফলিয়েছে সেই আলোর, সেই উত্তাপের দূত তোমরাই। প্রণাম তোমাদের। তোমাদের অনেকেই এসেছিল ক্ষণকালের জন্য, আধো-স্বপ্ন আধো-জাগার ভোরবেলায় শুকতারার মতো। প্রভাত না হতেই অস্ত গেল।' মধ্যাহ্নে মনে হল তারা তুচ্ছ; বোধ হল, তাদের ভুলেই গেছি। তার পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন নক্ষত্রলোক সমস্ত আকাশ জুড়ে আমার মুখের দিকে চাইল তখন জানলুম সেই ক্ষণিকা তো ক্ষণিকা নয়, তারাই চিরকালের; ভোরের স্বপ্নে বা সন্ধ্যাবেলার স্বপ্নাবেশে জানতে না-জানতে তারা যার কপালে একটুখানি আলোর টিপ পরিয়ে দিয়ে যায় তাদের সৌভাগ্যের সীমা নেই। তাই মন বলছে, একদিন যারা ছোটো হয়ে এসেছিল আজ আমি যেন ছোটো হয়ে তাদের কাছে, আর-একবার যাবার অধিকার পাই; যারা ক্ষণকালের ভান করে এসেছিল, বিদায় নেবার দিনে আর-একবার যেন তারা আমাকে বলে, 'তোমাকে চিনেছি', আমি যেন বলি 'তোমাদের চিনলুম'।

৭ই অক্টোবর ১৯২৪

একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে একদিন এক-মোটরে নিমন্ত্রণসভায় যাচ্ছিলুম। তিনি আমাকে কথাপ্রসঙ্গে খবর দিলেন যে, আজকাল পদ্য আকারে যে-সব রচনা করছি সেগুলি লোকে তেমন পছন্দ করছে না। যারা পছন্দ করছে না তাদের সুযোগ্য প্রতিনিধিস্বরূপে তিনি উল্লেখ করলেন তাঁর কোনো কোনো আত্মীয়ের কথা, সেই আত্মীয়েরা কবি; আর, যে-সব পদ্যরচনা লোকে পছন্দ করে না তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন আমার গানগুলো আর আমার 'শিশু ভোলানাথ' নামক আধুনিক কাব্যগ্রন্থ। তিনি বললেন, আমার বন্ধুরাও আশঙ্কা করছেন আমার কাব্য লেখবার শক্তি ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছে।

কালের ধর্ম এই। মর্ত্যলোকে বসন্তঋতু চিরকাল থাকে না। মানুষের ক্ষমতার ক্ষয় আছে, অবসান আছে। যদি কখনো কিছু দিয়ে থাকি, তবে মূল্য দেবার সময় তারই হিসাবটা স্মরণ করা ভালো। রাত্রিশেষে দীপের আলো নেববার সময় যখন সে তার শিখার পাখাতে বার-কতক শেষ ঝাপটা দিয়ে লীলা সাঙ্গ করে, তখন আশা দিয়ে নিরাশ করবার দাবিতে প্রদীপের নামে নালিশ করাটা বৈধ নয়। দাবিটাই যার বেহিসাবি দাবি অপূরণ হবার হিসাবটাতেও তার ভুল থাকবেই। পঁচানব্বই বছর বয়সে একটা মানুষ ফস্‌ করে মারা গেল বলে চিকিৎসাশাস্ত্রটাকে ধিক্‌কার দেওয়া বৃথা বাক্যব্যয়। অতএব, কেউ যদি বলে আমার বয়স যতই বাড়ছে আমার আয়ু ততই কমে যাচ্ছে, তা হলে তাকে আমি নিন্দুক বলি নে, বড়ো জোর এই বলি যে, লোকটা বাজে কথা এমনভাবে বলে যেন সেটা দৈববাণী। কালক্রমে আমার ক্ষমতা হ্রাস হয়ে যাচ্ছে, এই বিধিলিপি নিয়ে যুবক হোক, বৃদ্ধ হোক, কবি হোক, অকবি হোক, কারও সঙ্গে তকরার করার চেয়ে ততক্ষণ একটা গান লেখা ভালো মনে করি, তা সেটা পছন্দসই হোক আর না হোক। এমন-কি, সেই অবসরে 'শিশু ভোলানাথ'-এর জাতের কবিতা যদি লিখতে পারি, তা হলেও মনটা খুশি থাকে। কারণটা কী বলে রাখি।

আজ-নাগাদ প্রায় পনেরো-ষোলো বছর ধরে খুব কষে গানই লিখছি। লোকরঞ্জনের জন্যে নয়, কেননা, পাঠকেরা লেখায় ক্ষমতার পরিচয় খোঁজে। ছোটো ছোটো একটু একটু গানে ক্ষমতার কায়দা দেখাবার মতো জায়গাই নেই। কবিত্বকে যদি রীতিমত তাল ঠুকে বেড়াতেই হয় তা হলে অন্তত একটা বড়ো আখড়া চাই। তা ছাড়া গান জিনিসে বেশি বোঝাই সয় না; যারা মালের ওজন ক'রে দরের যাচাই করে, তারা এরকম দশ-বারো লাইনের হালকা কবিতার বাজার মাড়াতে চায় না। তবু আমি এই কয় বছরে এত গান লিখেছি যে, অন্তত সংখ্যা হিসাবে লম্বা দৌড়ের বাজিতে আমি বোধ হয় পয়লা নম্বরের পুরস্কার পেতে পারি।

আর-একটা কথা বলে রাখি, গান লিখতে যেমন আমার নিবিড় আনন্দ হয় এমন আর কিছুতে হয় না। এমন নেশায় ধরে যে, তখন গুরুতর কাজের গুরুত্ব একেবারে চলে যায়, বড়ো বড়ো দায়িত্বের ভারাকর্ষণটা হঠাৎ লোপ পায়, কর্তব্যের দাবিগুলোকে মন এক-ধার থেকে নামঞ্জুর করে দেয়।

এর কারণ হচ্ছে, বিশ্বকর্মার লীলাখেলার স্রোতটার মধ্যে হঠাৎ পড়ে গেলে শুকনো ডাঙার

কথাটা একেবারেই মনে থাকে না। শরতের গাছতলা শিউলি ফুলের অপব্যয়ে ছেয়ে গেল, নিকেশ নেবার কোনো কথাই কেউ বলে না। যা হল কেবল তাই দেখেই বলি, যথেষ্ট হয়েছে। ঘোর গরমে ঘাসগুলো শুকিয়ে সব হলদে হয়ে গেল; বর্ষার প্রথম পসলা বৃষ্টি হয়ে যাবার পরেই হঠাৎ দেখি, ঘাসে ঘাসে অতি ছোটো ছোটো বেগনি ফুলে হলদে ফুলে মাতামাতি। কে দেখে কে না দেখে তার খেয়াল নেই। এটা হল রূপের লীলা, কেবলমাত্র হয়ে-ওঠাতেই আনন্দ। এই মেঠো ফুলের একটি মঞ্জরী তুলে ধরে আমি বলি, বাহবা। কেন বলি। ও তো খাবার জিনিস নয়, বেচবার জিনিস নয়, লোহার সিন্দুকে তালা বন্ধ করে রাখবার জিনিস নয়। তবে ওতে আমি কী দেখলুম যাতে আমার মন বললে 'সাবাস'। বস্তু দেখলুম? বস্তু তো একটা মাটির ঢেলার মধ্যে ওর চেয়ে অনেক বেশি আছে। তবে? আমি দেখলুম, রূপ। সে কথাটার অর্থ কী। রূপ ছাড়া আর কোনোই অর্থ নেই। রূপ শুধু বলে, 'এই দেখো, আমি হয়ে উঠেছি।' যদি আমার মন সায় দিয়ে বলে 'তাই তো বটে, তুমি হয়েছ, তুমি আছ' আর এই বলেই যদি সে চুপ করে যায়, তা হলেই সে রূপ দেখলে; হয়ে-ওঠাকেই চরম বলে জানলে। কিন্তু, সজনে ফুল যখন অরূপসমুদ্রে রূপের ঢেউ তুলে দিয়ে বলে 'এই দেখো আমি আছি', তখন তার কথাটা না বুঝে আমি যদি গোঁয়ারের মতো বলে বসি 'কেন আছ'—তার মুখ থেকে যদি অত্যন্ত মিথ্যে জবাব আদায় করে নিই, যদি তাকে দিয়ে বলাই 'তুমি খাবে বলেই আছি', তা হলে রূপের চরম রহস্যটা দেখা হল না। একটি ছোট্ট মেয়ে কোথা থেকে আমার যাত্রা-পথে জুটে গেছে। তার বয়স আড়াই বছর। তার মধ্যে প্রাণের আনন্দ টলমল করে ওঠে, কত মধুর প্রলাপে, কত মন-ভোলানো ভঙ্গিতে; আমার মন বলে, 'মস্ত একটা পাওনা আমি পেলুম।' কী যে পেলুম তাকে হিসাবের অঙ্কে ছঁকে নেবার জো নেই। আর-কিছু নয়, একটি বিশেষ হয়ে-ওঠাকেই আমি চরম করে দেখলুম। ঐ ছোট্ট মেয়ের হয়ে-ওঠাই আমার পরম লাভ। ও আমার ঘর ঝাঁট দেয় না, রান্না করে না, তাতে ওর ঐ হয়ে-ওঠার হিসাবটাতে কিছুই কম পড়ছে না। বৈজ্ঞানিক এর হয়তো একটা মোটা কৈফিয়ত দেবে, বলবে, 'জীবজগতে বংশরক্ষাটাই সব চেয়ে বড়ো দরকার; ছোটো মেয়েকে সুন্দর না লাগলে সেই দরকারটাতে বাধা পড়ে।' মোটা কৈফিয়তটাকে আমি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করি নে, কিন্তু তার উপরেও একটা সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে যার কোনো কৈফিয়ত নেই। একটা ফলের ডালি দেখলে মন খুশি হয়ে ওঠে, আর মাছের ঝোলের পাত্র দেখলে যারা নিরামিষাশী নয় তাদের মন খুশি হতে পারে; আহারের প্রয়োজনটা উভয়তই আছে; সুতরাং খুশির একটা মোটা কৈফিয়ত উভয়তই পাওয়া যায়। তৎসত্ত্বেও ফলের ডালিতে এমন একটি বিশেষ খুশি আছে যা কোনো কৈফিয়ত তলবই করে না। সেইখানে ঐ একটি মাত্র কথা, ফলগুলি বলছে 'আমি আছি'—আর আমার মন বলে, সেইটেই আমার লাভ। আমার জীবনযাত্রার এই আড়াই বছরের ক্ষুদ্রতমা সহচরীটিও মানবের বংশরক্ষার কৈফিয়ত দাখিল করেও এমন কিছু বাকি রাখে যেটা বিশ্বের মর্মকুহর হতে উত্থিত ওংকারধ্বনিরই সুর। বিশ্ব বলছে ওঁ; বলছে, হাঁ; বলছে, অয়মহং ভোঃ, এই-যে আমি। ঐ মেয়েটিও সেই ওঁ, সেই হাঁ, সেই এই-যে আমি। সত্তাকে সত্তা বলেই যেখানে মানি সেখানে তার মধ্যে আমি সেই খুশিকেই দেখি যে খুশি আমার নিজের মধ্যে চরমরূপে রয়েছে। দাসের মধ্যে সেই খুশিকে দেখি নে বলেই দাসত্ব এত ভয়ংকর মিথ্যে, আর মিথ্যে বলেই এত ভয়ংকর তার পীড়া।

সৃষ্টির মূলে এই লীলা, নিরন্তর এই রূপের প্রকাশ। সেই প্রকাশের অহৈতুক আনন্দে যখন যোগ দিতে পারি তখন সৃষ্টির মূল আনন্দে গিয়ে মন পৌঁছয়। সেই মূল আনন্দ আপনাতেই আপনি পর্যাপ্ত, কারো কাছে তার কোনো জবাবদিহি নেই।

ছোটো ছেলে ধুলোমাটি কাটিকুটো নিয়ে সারাবেলা বসে বসে একটা কিছু গড়ছে। বৈজ্ঞানিকের মোটা কৈফিয়ত হচ্ছে এই যে, গড়বার শক্তি তার জীবনযাত্রার সহায়, সেই শক্তির চালনা চাই। এ কৈফিয়ত স্বীকার করে নিলুম; তবুও কথাটার মূলের দিকে অনেকখানি বাকি থাকে। গোড়াকার কথা হচ্ছে এই যে, তার সৃষ্টিকর্তা মন বলে 'হোক', 'Let there be'—সেই বাণীকে বহন করে ধুলোমাটি কুটোকাটি সকলেই বলে ওঠে, 'এই দেখো, হয়েছে।'

এই হওয়ার অনেকখানিই আছে শিশুর কল্পনায়। সামনে যখন তার একটা ঢিবি তখন কল্পনা বলছে, 'এই তো আমার রূপকথার রাজপুত্রের কেল্লা।' তার ঐ ধুলোর স্তূপের ইশারার ভিতর দিয়ে শিশু সেই কেল্লার সত্তা মনে স্পষ্ট অনুভব করছে; এই অনুভূতিতেই তার আনন্দ। গড়বার শক্তিকে প্রকাশ করছি বলে আনন্দ নয়, কেননা, সে শক্তি এ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রকাশ পাচ্ছে না। একটি রূপবিশেষকে চিত্তে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বলে আনন্দ। সেই রূপটাকে শেষলক্ষ্য করে দেখাই হচ্ছে সৃষ্টিকে দেখা; তার আনন্দই সৃষ্টির মূল আনন্দ।

গান জিনিসটা নিছক সৃষ্টিলীলা। ইন্দ্রধনু যেমন বৃষ্টি আর রৌদ্রের জাদু, আকাশের দুটো খামখেয়ালি মেজাজ দিয়ে গড়া তোরণ, একটি অপূর্ব মুহূর্তকাল সেই তোরণের নীচে দিয়ে জয়যাত্রা করবে। হয়ে গেল এই খেলা, মুহূর্তটি তার রঙিন উত্তরীয় উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল—তার বেশি আর কিছু নয়। মেজাজের এই রঙিন খেলাই হচ্ছে গীতিকাব্য। ঐ ইন্দ্রধনুর কবিটিকে পাকড়াও করে যদি জিজ্ঞাসা করা যেত 'এটার মানে কী হল' সাফ জবাব পাওয়া যেত 'কিছুই না'। 'তবে?' 'আমার খুশি।' রূপেতেই খুশি—সৃষ্টির সব প্রশ্নের এই হল শেষ উত্তর।

এই খুশির খেলাঘরে রূপের খেলা দেখে আমাদের মন ছুটি পায় বস্তুর মোহ থেকে; একেবারে পৌঁছয় আনন্দে, এমন কিছুতে যার ভার নেই, যার মাপ নেই, যা অনির্বচনীয়।

সেদিন সমুদ্রের মাঝে পশ্চিম আকাশে, 'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতে' গড়া সূর্যাস্তের একখানি রূপসৃষ্টি দেখলুম। আমার যে পাকাবুদ্ধি সোনার খনির মুনফা গোনে সে বোকার মতো চুপ করে রইল, আর আমার যে কাঁচা মনটা বললে 'দেখেছি' সে স্পষ্ট বুঝতে পারলে সোনার খনির মুনফাটাই মরীচিকা আর যার আবির্ভাবকে ক্ষণকালের জন্যে ঐ চিহ্নহীন সমুদ্রে নামহীন আকাশে দেখা গেল তারই মধ্যে চিরকালের অফুরান ঐশ্বর্য, সেই হচ্ছে অরূপের মহাপ্রাঙ্গণে রূপের নিত্যলীলা।

সৃষ্টির অন্তরতম এই অহৈতুক লীলার রসটিকে যখন মন পেতে চায় তখনই বাদশাহি বেকারের মতো সে গান লিখতে বসে। চারখানি পাপড়ি নিয়ে একটি ছোটো জুঁইফুলের মতো একটুখানি গান যখন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে তখন সেই মহা-খেলাঘরের মেজের উপরেই তার জন্যে জায়গা করা হয় যেখানে যুগ যুগ ধরে গ্রহনক্ষত্রের খেলা হচ্ছে। সেখানে যুগ আর মুহূর্ত একই, সেখানে সূর্য আর সূর্যমণি ফুলে অভেদাত্মা, সেখানে সাঁঝসকালে মেঘে মেঘে যে রাগরাগিণী আমার গানের সঙ্গে তার অন্তরের মিল আছে।

আজ পনেরো-ষোলো বছর ধরে কর্তব্যবুদ্ধি আমাকে নানা ভাবনা নানা ব্যস্ততার মধ্যে জোরে টেনে নিয়ে ফেলে আমার কাছ থেকে কষে কাজ আদায় করে নিচ্ছে। এখানকার সকল কাজই মোটা কৈফিয়তের অপেক্ষা রাখে। খোঁচা দিয়ে দিয়ে কেবলই জিজ্ঞাসা করে, 'ফল হবে কি।' সেইজন্যে যার ফরমাশ কৈফিয়তের সীমানা পেরিয়ে আপন বেদরকারি পাওনা দাবি করে ভিতরে-ভিতরে সে আমাকে কেবলই প্রশ্ন করতে থাকে, 'তুমি কবি, চির-ছুটির পরোয়ানা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছ, তার করলে কী। কাজের ভিড়ের টানাটানিতে পড়ে একেবারেই জাত খুইয়ে বোসো না।' নিশ্চয় ওরই এই তাগিদেই আমাকে গান লেখায়; হট্টগোলের মধ্যেও নিজের পরিচয়টা বজায় রাখবার জন্যে, লোকরঞ্জনের জন্যে নয়। কর্তব্যবুদ্ধি তার কীর্তি ফেঁদে গম্ভীরকণ্ঠে বলে, 'পৃথিবীতে আমি সব চেয়ে গুরুতর।' তাই আমার ভিতরকার বিধিদত্ত ছুটির খেয়াল বাঁশি বাজিয়ে বলে, 'পৃথিবীতে আমিই সব চেয়ে লঘুতম।' লঘু নয় তো কী! সেইজন্যে সব জায়গাতেই হাওয়ায় হাওয়ায় তার পাখা চলে, তার রঙ-বেরঙের পাখা। ইমারতের মোটা ভিত ফেঁদে সময়ের সদ্‌ব্যয় করা তার জাত-ব্যাবসা নয়; সে লক্ষ্মীছাড়া ঘুরে বেড়ায় ফাঁকির পথে, যে পথে রঙের ঝরনা রসের ধারা ঝরে ঝরে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে বিপুল একটা বাজেখরচের মতো।

আমার কেজো পরিচয়টার প্রতি ঈর্ষা করে অবজ্ঞা করে আমার অকেজো পরিচয়টা আমাকে যখন-তখন গান লিখিয়ে লিখিয়ে নিজের দলিল ঠিক করে রাখছে। যখন বিরুদ্ধপক্ষে মাতব্বর সাক্ষী এসে জোটে, তখনই নিজের দাবির দলিল খুব বড়ো করে তুলতে হয়। যতদিন ধরে এক পক্ষে আমার

কাজের রোকড় খুব মোটা হয়ে উঠছে ততদিন ধরেই অন্যপক্ষে আমার ছুটির নথিও অসম্ভব-রকম ভারী হয়ে উঠল। এই যে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছে, এটা আমার অন্তরের খাস-কামরায়। আমি আসলে কোন্ পক্ষের, সেইটের বিচার নিয়ে আমারই কাছে নালিশ।

তার পরে কথাটা এই যে, ঐ 'শিশু ভোলানাথ'-এর কবিতাগুলো খামকা কেন লিখতে বসেছিলুম। সেও লোকরঞ্জনের জন্যে নয়, নিতান্ত নিজের গরজে।

পূর্বেই বলেছি, কিছুকাল আমেরিকার প্রৌঢ়তার মরুপারে ঘোরতর কার্যপটুতার পাথরের দুর্গে আটকা পড়েছিলুম। সেদিন খুব স্পষ্ট বুঝেছিলুম, জমিয়ে তোলবার মতো এত বড়ো মিথ্যে ব্যাপার জগতে আর কিছুই নেই। এই জমাবার জমাদারটা বিশ্বের চিরচঞ্চলতাকে বাধা দেবার স্পর্ধা করে; কিন্তু কিছুই থাকবে না, আজ বাদে কাল সব সাফ হয়ে যাবে। যে স্রোতের ঘূর্ণিপাকে এক-এক জায়গায় এই-সব বস্তুর পিণ্ডগুলোকে স্তূপাকার করে দিয়ে গেছে সেই স্রোতেরই অবিরত বেগে ঠেলে ঠেলে সমস্ত ভাসিয়ে নীল সমুদ্রে নিয়ে যাবে— পৃথিবীর বক্ষ সুস্থ হবে। পৃথিবীতে সৃষ্টির যে লীলাশক্তি আছে সে যে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত, সে অকৃপণ; সে কিছু জমতে দেয় না, কেননা, জমার জঞ্জালে তার সৃষ্টির পথ আটকায়; সে যে নিত্যনূতনের নিরন্তর প্রকাশের জন্যে তার অবকাশকে নির্মল করে রেখে দিতে চায়। লোভী মানুষ কোথা থেকে জঞ্জাল জড়ো করে সেইগুলোকে আগলে রাখবার জন্যে নিগড়বদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাসকে দিয়ে প্রকাণ্ড সব ভাণ্ডার তৈরি করে তুলছে। সেই ধ্বংসশাপগ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড়বস্তুপুঞ্জের অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চয়-গর্বের ঔদ্ধত্যে মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ করছে; এ বিদ্রূপ মহাকাল কখনোই সইবে না। আকাশের উপর দিয়ে যেমন ধূলানিবিড় আঁধি ক্ষণকালের জন্য সূর্যকে পরাভূত করে দিয়ে তার পরে নিজের দৌরাত্ম্যের কোনো চিহ্ন না রেখে চলে যায়, এ-সব তেমনি করেই শূন্যের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

কিছুকালের জন্যে আমি এই বস্তু-উদ্গারের অন্ধযন্ত্রের মুখে এই বস্তুসঞ্চয়ের অন্ধ-ভাণ্ডারে বদ্ধ হয়ে আতিথ্যহীন সন্দেহের বিষবাষ্পে শ্বাসরুদ্ধপ্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলুম। তখন আমি এই ঘন দেয়ালের বাইরের রাস্তা থেকে চিরপথিকের পায়ের শব্দ শুনতে পেতুম। সেই শব্দের ছন্দই যে আমার রক্তের মধ্যে বাজে, আমার ধ্যানের মধ্যে ধ্বনিত হয়। আমি সেদিন স্পষ্ট বুঝেছিলুম, আমি ঐ পথিকের সহচর।

আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই 'শিশু ভোলানাথ' লিখতে বসেছিলুম। বন্দী যেমন ফাঁক পেলেই ছুটে আসে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে, তেমনি করে। দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট ক'রে আবিষ্কার করে, তার চিত্তের জন্যে এত বড়ো আকাশেরই ফাঁকাটা দরকার। প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে-লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।

এ কথাটার এতক্ষণ ধরে আলোচনা করছি এইজন্যে যে, যে লীলালোকে জীবনযাত্রা শুরু করে-ছিলুম, যে লীলাক্ষেত্রে জীবনের প্রথম অংশ অনেকটা কেটে গেল, সেইখানেই জীবনটার উপসংহার করবার উদ্‌বেগে কিছুকাল থেকেই মনের মধ্যে একটা মন-কেমন-করার হাওয়া বইছে। একদা পদ্মার ধারে আকাশের পারে সংসারের পথে যারা আমার সঙ্গী ছিল তারা বলছে, সেদিনকার পালা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায় নি, বিদায়ের গোধূলিবেলায় সেই আরম্ভের কথাগুলো সাঙ্গ করে যেতে হবে। সেইজন্যেই সকালবেলাকার মল্লিকা সন্ধ্যাবেলাকার রজনীগন্ধা হয়ে তার গন্ধের দূত পাঠাচ্ছে। বলছে, 'তোমার খ্যাতি তোমাকে না টানুক, তোমার কীর্তি তোমাকে না বাঁধুক, তোমার গান তোমাকে পথের পথিক করে তোমাকে শেষযাত্রায় রওনা করে দিক। প্রথম বয়সের বাতায়নে বসে তুমি তোমার দূরের বঁধুর উত্তরীয়ের সুগন্ধি হাওয়া পেয়েছিলে। শেষবয়সের পথে বেরিয়ে গোধূলিরাগের রাঙা আলোতে তোমার সেই দূরের বঁধুর সন্ধানে নির্ভয়ে চলে যাও। লোকের ডাকাডাকি শুনো না। সুর

যে দিক থেকে আসছে সেই দিকে কান পাতো— আর সেই দিকেই ডানা মেলে’দাও সাগরপারের লীলা-লোকের আকাশপথে। যাবার বেলায় কবুল করে যাও যে, তুমি কোনো কাজের নও, তুমি অস্থায়ীদের দলে।’

ক্রাকোভিয়া জাহাজ
৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

মার্সেল্‌স্‌ বন্দরে নেমে রেলে চড়লেম। পশ্চিমদেশের একটা পরিচয় পেলেম ভোজন-কামরায়। আকাশে গ্রহমালার আবর্তনের মতো থালার পর থালা ঘুরে ঘুরে আসছে, আর ভোজ্যের পর ভোজ্য।

ঘরের দাবি পথের উপর চলে না। ঘরে আছে সময়ের অবসর, ঘরে আছে স্থানের অবকাশ। সেখানে জীবনযাত্রার আয়োজনের ভার বেশি করে জমে ওঠবার বাধা নেই। কিন্তু, চলতি পথে উপকরণভার যথাসম্ভব হালকা করাই সাধারণ লোকের পক্ষে সংগত। হরিণের শিঙ বটগাছের ডাল-আবডালের মতো অত অধিক, অত বড়ো, অত ভারী হলে সেটা জঙ্গম প্রাণীর পক্ষে বেহিসাবি হয়।

চিরকাল, বিশেষত পূর্বকালে, রাজা-রাজড়া আমীর-ওমরাওরা ভোগের ও ঐশ্বর্যের বোঝাকে সর্বত্র সকল অবস্থাতেই ভরপুরভাবে টেনে বেড়িয়েছে। সংসারের উপর তাদের আবদার অত্যন্ত বেশি। সে আবদার সংসার মেনে নিয়েছে, কেননা, এদের সংখ্যা তেমন বেশি নয়। রেলগাড়ির ভোজনশালায় থালার সংখ্যা, ভোজের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য, পরিচর্যার ব্যবস্থা, এত বাহুল্যময় যে, পূর্বকালের রাজকীয় সম্প্রদায়ই পথিক-অবস্থাতেও তা দাবি করতে পারত। এখন জনসাধারণের সকলের জন্যে এই আয়োজন।

ভোগের এত বড়ো বাহুল্যে সকল মানুষেরই অধিকার আছে, এই কথাটার আকর্ষণ অতি ভয়ানক। এই আকর্ষণে দেশজোড়া মানুষের সিঁধকাঠি বিশ্বভাণ্ডারের দেয়াল ফুটো করতে উদ্যত হয়। লুব্ধ সভ্যতার এই উপদ্রব সর্বনেশে।

যেটা বাহুল্য তাতে ছোটো বড়ো কোনো মানুষের কোনো অধিকার নেই, এই কথাটা গত যুদ্ধের সময় ইংলন্ড ফ্রান্স জর্মানি প্রভৃতি যুদ্ধরত দেশকে অনেকদিন ধরেই স্বীকার করতে হল। তখন তারা আপনার সহজ আয়োজনের অনুপাতে নিজের ভোগকে সংযত করেছিল। তখন তারা বুঝেছিল, মানুষের আসল প্রয়োজনের ভার খুব বেশি নয়। যুদ্ধ-অবসানে সে কথাটা ভুলতে দেরি হয় নি।

অনতিপ্রয়োজনীয়কে প্রয়োজনীয় করে তোলা যখন দেশসুদ্ধ সকল লোকেরই নিত্য সাধনা হয় তখন বিশ্বব্যাপী দস্যুবৃত্তি অপরিহার্য হয়ে ওঠে। লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যা নিয়ে পাশ্চাত্যেরা অনেকেই উদ্‌বেগ প্রকাশ করে থাকেন। সমস্যাটি কঠিন হবার প্রধান কারণ হচ্ছে, সর্বসাধারণেরই ভোগবাহুল্যের প্রতি দাবি। এত বড়ো ব্যাপক দাবি মেটাতে গেলে ধর্মরক্ষা করা চলে না, মানুষকে মানুষপীড়ক হতেই হয়। সেই পীড়নকার্যে ভালো করে হাত পাকানো হয় দূরস্থ অনাত্মীয় জাতির উপর দিয়ে। এর বিপদ এই যে, জীবনক্ষেত্রের যে কিনারাতেই ধর্মবুদ্ধিতে আগুন লাগানো হোক-না, সে আগুন সেইখানেই থেমে থাকে না। ভোগী স্বভাবতই যে নিষ্ঠুরতার সাধনা করে তার সীমা নেই, কারণ, আত্মম্ভরিতা কোথাও এসে বলতে জানে না, ‘এইবার বস্‌ হয়েছে।’ বস্তুগত আয়োজনের অসংগত বাহুল্যকেই যে সভ্যতার প্রধান লক্ষণ বলে মানা হয় সে সভ্যতা অগত্যাই নরভুক্‌। নররক্ত-শোষণের বিশ্বব্যাপী চর্চা একদিন আত্মহত্যায় ঠেকবেই, এতে আর সন্দেহ করা চলে না।

রেলগাড়ির ভোজনশালায় এক দিকে যেমন দেখা গেল ভোগের বাহুল্য, আর-এক দিকে তেমনি দেখলেম কর্মের গতিবেগ। সময় অল্প, আরোহী অনেক, ভোজ্যের বৈচিত্র্য প্রচুর, ভোজের উপকরণ বিস্তর— তাই পরিবেশনকর্মের অভ্যাস অতি আশ্চর্য দ্রুত হয়ে উঠেছে। পরিবেশনের যন্ত্রটাতে খুবই প্রবল জোরে দম দেওয়া হয়েছে। যেটা এই পরিবেশনে দেখা গেল পাশ্চাত্যের সমস্ত কর্ম-চালনার মধ্যেই সেই ক্ষিপ্রবেগ।

যে যন্ত্র বাহিরের ব্যবহারের জন্য তার গতির ছন্দ দম দিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত বাড়িয়ে তোলা চলে। কিন্তু আমাদের প্রাণের, আমাদের হৃদয়ের ছন্দের একটা স্বাভাবিক লয় আছে; তার উপরে দ্রুত প্রয়োজনের জবরদস্তি খাটে না। দ্রুত-চলাই যে দ্রুত-এগোনো সে কথা সত্য হতে পারে কলের গাড়ির পক্ষে, মানুষের পক্ষে না। মানুষের চলার সঙ্গে হওয়া আছে; সেই চলাতে হওয়াতে মিল করে চলাই মানুষের চলা, কলের গাড়ির সে উপসর্গ নেই। আপিসের তাগিদে মুহূর্তের মধ্যে এক গ্রাসের জায়গায় চার গ্রাস-খাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু, সেই চার গ্রাস ঘড়ি ধরে হজম করা কলের মনিবের হুকুমে হতে পারে না। গ্রামোফোনের কান যদি মলে দেওয়া যায় তবে যে গান গাইতে চার মিনিট লেগেছিল তাকে শুনতে আধ মিনিটের বেশি না লাগতে পারে, কিন্তু সংগীত হয়ে ওঠে চীৎকার। রসভোগ করবার জন্যে রসনার নিজের একটা নির্ধারিত সময় আছে; সন্দেশকে যদি কুইনিনের বড়ির মতো টপ্ করে গেলা যায় তা হলে বস্তুটাকে পাওয়া যায়, বস্তুর রস পাওয়া যায় না। তীরবেগে বাইসিক্ল্ ছুটিয়ে যদি পদাতিক বন্ধুর চাদর ধরি তা হলে বাইসিক্লের জয়পতাকা হাতে আসবে, কিন্তু বন্ধুকে বুকে পাবার উপায় সেটা নয়; কলের বেগ বাইরের দরকারে কাজে লাগে, অন্তরের দাবি মেটাবার বেলায় অন্তরের ছন্দ না মানলে চলে না।

বাইরের বেগ অন্তরের ছন্দকে অত্যন্ত বেশি পেরোয় কখন। যখন বাহ্য প্রয়োজনের বড়ো বাড় বাড়ে। তখন মানুষ পড়ে পিছিয়ে, কলের সঙ্গে সে তাল রাখতে পারে না। য়ুরোপে সেই মানুষ-ব্যক্তিটি দিনে দিনে বহু দূরে পড়ে গেল; কল গেল এগিয়ে; তাকেই সেখানকার লোকে বলে অগ্রসরতা, প্রোগ্রেস্।

সিদ্ধি, যাকে ইংরেজিতে বলে সাক্‌সেস্, তার বাহন যত দৌড়ে চলে ততই ফল পায়। য়ুরোপের দেশে দেশে রাষ্ট্রনীতির যুদ্ধনীতির বাণিজ্যনীতির তুমুল ঘোড়দৌড় চলছে জলে স্থলে আকাশে। সেখানে বাহ্য প্রয়োজনের গরজ অত্যন্ত বেশি হয়ে উঠল, তাই মনুষ্যত্বের ডাক শুনে কেউ সবুর করতে পারছে না। বীভৎস সর্বভুক্ পেটুকতার উদ্যোগে পলিটিক্স্ নিয়ত ব্যস্ত। তার গাঁট-কাটা ব্যবসায়ের পরিধি পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে। পূর্বকালে যুদ্ধবিগ্রহের পদ্ধতিতে ধর্মবুদ্ধি যেখানে মাঝে মাঝে বাধা খাড়া করে রেখেছিল, ডিপ্লমাসি সেখানে আজ লাফ-মারা হার্ড্‌ল্ রেস্ খেলে চলেছে। সবুর সয় না যে। বিষবায়ুবাণ যুদ্ধের অস্ত্ররূপে যখন এক পক্ষ ব্যবহার করলে তখন অন্য পক্ষ ধর্মবুদ্ধির দোহাই পাড়লে। আজ সকল পক্ষই বিষের সন্ধানে উঠে পড়ে লেগেছে; যুদ্ধকালে নিরস্ত্র পুরবাসীদের প্রতি আকাশ থেকে অগ্নিবাণ বর্ষণ নিয়ে প্রথমে শোনা গেল ধর্মবুদ্ধির নিন্দাবাণী। আজ দেখি, ধার্মিকেরা স্বয়ং সামান্য কারণে পল্লীবাসীদের প্রতি কথায় কথায় পাপবজ্র সন্ধান করছে। গত যুদ্ধের সময় শত্রুর সম্বন্ধে নানা উপায়ে সজ্ঞানে সচেষ্টভাবে সত্যগোপন ও মিথ্যা-প্রচারের শয়তানি অস্ত্র ব্যবহার প্রকাণ্ডভাবে চলল। যুদ্ধ থেমেছে কিন্তু সেই শয়তানি আজও থামে নি। এমন-কি, অক্ষম ভারতবর্ষকেও প্রবলের প্রপাগান্ডা রেয়াত করে না। এই-সব নীতি হচ্ছে সবুর-না-করা নীতি; এরা হল পাপের দ্রুত চাল; এরা প্রতি পদেই বাহিরে জিতছে বটে কিন্তু সে জিত অন্তরের মানুষকে হারিয়ে দিয়ে। মানুষ আজ নিজের মাথা থেকে জয়মাল্য খুলে নিয়ে কলের গলায় পরিয়ে দিলে। রসাতল থেকে দানব বলছে, 'বাহবা!'—

রথীরে কহিল গৃহী উৎকণ্ঠায় ঊর্ধ্বস্বরে ডাকি,
'থামো, থামো, কোথা তুমি রুদ্রবেগে রথ যাও হাঁকি,
সম্মুখে আমার গৃহ।'
রথী কহে, 'ওই মোর পথ,
ঘুরে গেলে দেরি হবে, বাধা ভেঙে সিধা যাবে রথ।'
গৃহী কহে, 'নিদারুণ ত্বরা দেখে মোর ডর লাগে—
কোথা যেতে হবে বলো।'

রথী কহে, 'যেতে হবে আগে।'
'কোন্‌খানে' শুধাইল।
রথী বলে, 'কোনোখানে নহে,
শুধু আগে।'
'কোন্ তীর্থে, কোন্ সে মন্দিরে' গৃহী কহে।
'কোথাও না, শুধু আগে।'
'কোন্ বন্ধু সাথে হবে দেখা।'
'কারো সাথে নহে, যাব সব-আগে আমি মাত্র একা।'
ঘর্ঘরিত রথবেগ গৃহভিত্তি করি দিল গ্রাস;
হাহাকারে, অভিশাপে, ধূলিজালে ক্ষুভিল বাতাস
সন্ধ্যার আকাশে! আঁধারের দীপ্ত সিংহদ্বার-বাগে
রক্তবর্ণ অস্তপথে ছোটে রথ লক্ষ্যশূন্যে আগে।

ক

ক্রাকোভিয়া জাহাজ
৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

বিষয়ী লোক শতদলের পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে একটি একটি করে জমা করে আর বলে, 'পেয়েছি!' তার সঞ্চয় মিথ্যে। সংশয়ী লোক শতদলের পাপড়ি একটি একটি করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে তাকে কেটে কুটে নিঙড়ে মুচড়ে বলে, 'পাই নি!' অর্থাৎ, সে উল্টো দিকে চেয়ে বলে, 'নেই।' রসিক লোক সেই শতদলের দিকে 'আশ্চর্যবৎ পশ্যতি'। এই আশ্চর্যের মানে হল পেয়েছি পাই-নি দুই-ই সত্য। প্রেমিক বললে, 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।' অর্থাৎ, বললে লক্ষযুগের পাওয়া অল্পকালের মধ্যেই পেয়েছি আবার সেইসঙ্গেই লক্ষযুগের না-পাওয়াও লেগেই রইল। সময়টা যে আপেক্ষিক, রসের ভাষায় সে কথাটা অনেকদিন থেকে বলা চলছে, বিজ্ঞানের ভাষায় আজ বলা হল।

যখন ছোটো ছিলেম, মনে পড়ে, বিশ্বজগৎ আমার কাছে প্রতিদিন অন্ধকার রাত্রির গর্ভ থেকে নূতন দেহ ধরে জন্ম নিত। পরিচয় আর অপরিচয় আমার মনের মধ্যে এক হয়ে মিলেছিল। আমার সেই শিশুকাল পথিকের কাল। তখন পথের শেষের দিকে লক্ষ্য খুঁজি নি, পথের আশেপাশে চেয়ে চেয়ে চলছি, যেন কোন্ আবছায়ার ভিতর থেকে আচমকা দেখা দেবে একটা 'কী জানি', একটা 'হয়তো'। বারান্দার কোণে খানিকটা ধুলো জড়ো করে আতার বিচি পুঁতে রোজ জল দিয়েছি। আজ যেটা আছে বীজ কাল সেটা হবে গাছ, ছেলেবেলায় সে একটা মস্ত 'কী জানি'র দলে ছিল। সেই কী-জানিকে দেখাই সত্য দেখা। সত্যের দিকে চেয়ে যে বলে 'জানি' সেও তাকে হারায়, যে বলে 'জানি নে' সেও করে ভুল, আমাদের ঋষিরা এই বলেন। যে বলে 'খুব জানি' সেই অবোধ সোনা ফেলে চাদরের গ্রন্থিকে পাওয়া মনে করে, যে বলে 'কিছুই জানি নে' সে তো চাদরটাকে সুদ্ধ খুইয়ে বসে। আমি ঈশোপনিষদের এই মানেই বুঝি। 'জানি না' যখন 'জানি'র আঁচলে গাঁঠছড়া বেঁধে দেখা দেয় তখন মন বলে, 'ধন্য হলেম।' পেয়েছি মনে করার মতো হারানো আর নেই।

খ

এইজন্যেই ভারতবর্ষকে ইংরেজ যেমন করে হারিয়েছে এমন আর য়ুরোপের কোনো জাত নয়। ভারতবর্ষের মধ্যে যে একটা চিরকেলে রহস্য আছে সেটা তার কাছ থেকে সরে গেল৷ তার ফৌজের

গাঁঠের মধ্যে যে বস্তুটাকে কষে বাঁধতে পারলে সেইটেকেই সে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ বলে বুক ফুলিয়ে গদীয়ান হয়ে বসে রইল। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তার বিস্ময় নেই, অবজ্ঞা যথেষ্ট আছে। রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বাইরে ইংরেজ ভারত সম্বন্ধে যত অল্প আলোচনা করেছে এমন ফ্রান্স করে নি, জর্মনি করে নি। পোলিটিশনের চশমার বাইরে ভারতবর্ষ ইংরেজজাতির গোচরে আছে, এ কথাটা তার দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক কাগজ পড়ে দেখলে বোঝা যায় না।

এর একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। প্রয়োজনসাধনের দেখা নিছক পাওয়ারই দেখা, তার মধ্যে না-পাওয়ার আমেজ নেই। এইজন্যেই একে সত্যের দেখা বলা যায় না। এই দেখায় সত্য নেই বলেই তাতে বিস্ময় নেই, শ্রদ্ধা নেই।

প্রয়োজনের সম্বন্ধ হচ্ছে কেবলই গ্রহণের সম্বন্ধ; তাতে লোভ আছে, আনন্দ নেই। সত্যের সম্বন্ধ হচ্ছে পাওয়া এবং দেওয়ার মিলিত সম্বন্ধ; কেননা, আনন্দই মন খুলে দিতে জানে। এই কারণেই দেখতে পাই, ভারতবর্ষের প্রতি ইংরেজের ব্যক্তিগত বদান্যতার অদ্ভুত অভাব। এ কথা নিয়ে নালিশ করা বৃথা, এইটেই স্বাভাবিক। ইংরেজের লোভ যে ভারতবর্ষকে পেয়েছে ইংরেজের আত্মা সেই ভারতবর্ষকে হারিয়েছে। এইজন্যেই ভারতবর্ষে ইংরেজের লাভ, ভারতবর্ষে ইংরেজের গর্ব, ভারতবর্ষে ইংরেজের ক্লেশ। এইজন্যে ভারতবর্ষকে স্বাস্থ্য দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া, মুক্তি দেওয়া সম্বন্ধে ইংরেজের ত্যাগ দুঃসাধ্য কিন্তু শাস্তি দেওয়া সম্বন্ধে ইংরেজের ক্রোধ অত্যন্ত সহজ। ইংরেজ-ধনী বাংলাদেশের রক্ত-নেংড়ানো পাটের বাজারে শতকরা চার-পাঁচশো টাকা মুনফা শুষে নিয়েও যে দেশের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে এক পয়সাও ফিরিয়ে দেয় না, তার দুর্ভিক্ষে বন্যায় মারী-মড়কে যার কড়ে আঙুলের প্রান্তও বিচলিত হয় না, যখন সেই শিক্ষাহীন স্বাস্থ্যহীন উপবাসক্লিষ্ট বাংলাদেশের বুকের উপর পুলিসের জাঁতা বসিয়ে রক্তচক্ষু কর্তৃপক্ষ কড়া আইন পাস করেন তখন সেই বিলাসী ধনী স্ফীত মুনফার উপর আরামের আসন পেতে বাহবা দিতে থাকে; বলে, 'এই তো পাকা চালে ভারতশাসন।'

এইটেই স্বাভাবিক। কেননা, ঐ ধনী বাংলাদেশকে একেবারেই দেখতে পায় নি, তার মোটা মুনফার ওপারে বাংলাদেশ আড়ালে পড়ে গেছে। বাংলাদেশের প্রাণের নিকেতনে যেখানে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কান্না, বাংলাদেশের হৃদয়ের মাঝখানে যেখানে তার সুখদুঃখের বাসা, সেখানে মানুষের প্রতি মানুষের মৈত্রীর একটা বড়ো রাস্তা আছে, সেখানে ধর্মবুদ্ধির বড়ো দাবি বিষয়বুদ্ধির গরজের চেয়ে বেশি, এ কথা জানবার ও ভাববার মতো তার সময়ও নেই শ্রদ্ধাও নেই। তাই যখনই দেখে দরোয়ানির ব্যবস্থা কঠোরতর করা হচ্ছে তখনই মুনফা-বৎসলেরা পুলকিত হয়ে ওঠে। ল অ্যান্ড অর্ডার রক্ষা হচ্ছে দরোয়ানিতন্ত্র, পালোয়ানের পালা; সিম্‌প্যাথি অ্যান্ড রেস্‌পেক্‌ট্‌ হচ্ছে ধর্মতন্ত্র, মানুষের নীতি।

অবিচার করতে চাই নে, রাজ্যশাসন মাত্রেই ল অ্যান্ড অর্ডার চাই। নিতান্ত স্নেহপ্রেমের এলাকাতেও কানমলার বরাদ্দ থাকে। রাজ্যে ছট্‌ফটানি বৃদ্ধি হলে সাধারণ দণ্ডবিধি অসাধারণ অবৈধ হয়ে উঠলেও দোষ দিই নে। এক পক্ষে দুরন্তপনা ঘটলে অন্য পক্ষে দৌরাত্ম্য ঘটা শক্তিমানের পক্ষে গৌরবের বিষয় না হলেও সেটাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। আসল কথা, কোনো শাসনতন্ত্রকে বিচার করতে হলে সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি বিচার করা চাই। যদি দেখা যায়, দেশের সকল মহলেই দরোয়ানের ঠেসাঠেসি ভিড়, অথচ তৃষ্ণায় যখন ছাতি ফাটছে, ম্যালেরিয়ায় যখন নাড়ী ছেড়ে যায়, তখন জনপ্রাণীর সাড়া নেই— যখন দেখি দরোয়ানের তকমা শিরোপা বকশিশ বাহবা সম্বন্ধে দাক্ষিণ্যের অজস্রতা, কোতোয়ালি থেকে শুরু করে দেওয়ানি ফৌজদারি কোনো বিভাগের কারও দুঃখ গায়ে সয় না, কারও আবদার ব্যর্থ হতে চায় না অথচ ঘরের ছেলের প্রাণ যখন কণ্ঠাগত তখন আত্মনির্ভর সম্বন্ধে সৎপরামর্শ ছাড়া আর কোনো কথা নেই— অর্থাৎ গলায় যখন ফাঁস তখন দুর্গানাম স্মরণ করা ছাড়া আর কোনো উপদেশ যেখান থেকে মেলে না সেখানে পরিমাণের অসংগতিতেই দরোয়ানটাকে যমদূত বলে সহজেই মনে হয়। যে পাকা বাড়িটাতে সুহৃদ্‌

সহায় আত্মীয়ের চেয়ে পাহারাওয়ালার প্রভাবই বেশি সেই জায়গাটাকেই তো চলতি ভাষায় জেলখানা বলে থাকে। বাগানে তো ইচ্ছে করেই লোকে কাঁটাগাছের বেড়া দেয়, সে কি আমরা জানি নে। কিন্তু, যেখানে কাঁটাগাছেরই যত আদর, ফুলগাছ শুকিয়ে মরে গেল, সে-বাগানে আমাদের মনে যদি উৎসাহ না হয় তা হলে মালী সেটাকে আমাদের অবিবেচনা মনে করে কেন। যদি শাসনকর্তা জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কি চাও না দেশে ল অ্যান্ড অর্ডার থাকে,' আমি বলি, 'খুবই চাই, কিন্তু লাইফ অ্যান্ড মাইন্ড তার চেয়ে কম মূল্যবান নয়।' মানদণ্ডের একটা পাল্লায় বিশ পঁচিশ মণ বাটখারা চাপানো দোষের নয়, অন্য পাল্লাটাতে যে-মাল চাপানো হয় তাতে যদি আমাদের নিজের স্বত্ব কিছু থাকে। কিন্তু যখন দেখি এ-পক্ষের দিকটাতেই যত রাজ্যের ইঁটপাথর, আর মালের পনেরো আনাই হল অন্য পক্ষের দিকে, তখন ফৌজে-পুলিসে-গড়া মানদণ্ডটা অপমানদণ্ড বলেই ঠেকে। নালিশ আমাদের পুলিসের বিরুদ্ধে নয়, নালিশ আমাদের এই ওজনের বিরুদ্ধে; নালিশ— আগুন জ্বলে বলে নয়, রান্না চড়ানো হয় না বলে। বিশেষত, সেই আগুনের বিল যখন আমাদেরই চোকাতে হয়। চুলিতে কাঠের খরচটাই এত সর্বনেশে হয়ে ওঠে যে হাঁড়িতে চাল ডাল জোগাবার কড়ি বাকি থাকে না। সেই অবস্থায় যখন পেটের জ্বালায় চোখে জল আসে তখন যদি কর্তা রাগ করে বলেন, 'তবে কি চুলোতে আগুন জ্বালব না,' ভয়ে ভয়ে বলি, 'জ্বালবে বৈকি, কিন্তু ওটা-যে চিতার আগুন হয়ে উঠল।'

যে-দুঃখের কথাটা বলছি এটা জগৎ জুড়ে আজ ছড়িয়ে পড়েছে; আজ মুনফার আড়ালে মানুষের জ্যোতির্ময় সত্য রাহুগ্রস্ত। এইজন্যই মানুষের প্রতি কঠিন ব্যবহার করা, তাকে বঞ্চনা করা, এত সহজ হল। তাই পাশ্চাত্যে পলিটিক্‌স্‌ই মানুষের সকল চেষ্টার সর্বোচ্চ চূড়া দখল করে বসেছে। অর্থাৎ, মানুষের ফুলে-ওঠা পকেটের তলায় মানুষের চুপসে-যাওয়া হৃদয় পড়েছে চাপা। সর্বভুক্‌ পেটুকতার এমন বিস্তৃত আয়োজন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনোদিন এমন কুৎসিত আকারে দেখা দেয় নি।

গ

আমাদের রিপু সত্যের সম্পূর্ণ মূর্তিকে আচ্ছন্ন করে। কামে আমরা মাংসই দেখি, আত্মাকে দেখি নে; লোভে আমরা বস্তুই দেখি, মানুষকে দেখি নে; অহংকারে আমরা আপনাকেই দেখি, অন্যকে দেখি নে। একটা রিপু আছে যা এদের মতো উগ্র নয়, যা ফাঁকা। তাকে বলে মোহ; সে হচ্ছে জড়তা, অসাড়তা। আমাদের চৈতন্যের আলো ম্লান করে দিয়ে সে সত্যকে আবৃত করে। সে বিঘ্ন নয়, সে আবরণ। অভ্যাস অনেক সময় সেই মোহরূপে আমাদের মনকে আবিষ্ট করে।

কুয়াশায় পৃথিবীর বস্তুকে নষ্ট করে না, তার আকাশকে লুপ্ত করে। অসীমকে অগোচর করে দেয়। অভ্যাসের মোহ মনের সেই কুয়াশা। অনির্বচনীয়কে সে আড়াল করে, বিস্ময়রসকে সে শুকিয়ে ফেলে। তাতে সত্য পদার্থের গুরুত্ব কমে না, তার গৌরব কমে যায়। আমাদের মন তখন সত্যের অভ্যর্থনা করতে পারে না। বিস্ময় হচ্ছে সত্যের অভ্যর্থনা।

ডাক্তার বলে, প্রতিদিন একই অভ্যস্ত খাওয়া পরিপাকের পক্ষে অনুকূল নয়। ভোজ্য সম্বন্ধে রসনার বিস্ময় না থাকলে দেহ তাকে গ্রহণ করতে আলস্য করে। শিশু-ছাত্রদের একই ক্লাসে একই সময়ে একই বিষয় শিক্ষার পুনরাবৃত্তি করানোতেই তাদের শিক্ষার আগ্রহ ঘুচিয়ে দেওয়া হয়।

প্রাণের স্বভাবই চির-উৎসুক। প্রকৃতি তাকে ক্ষণে ক্ষণে আকস্মিকের স্পর্শে চঞ্চল করে রাখে। এমন-কি, এই আকস্মিক যদি দুঃখ আকারেও আসে তাতেও চিত্তের বড়ো রকমের উদ্‌বোধন ঘটে। সীমার অতীত যা, আকস্মিক হচ্ছে তারই দূত; অভাবনীয়ের বার্তা নিয়ে সে আসে, চেতনাকে জড়ত্ব থেকে মুক্তি দেয়।

আমাদের দেশে তীর্থযাত্রা ধর্মসাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। দেবতাকে যখন অভ্যাসের পর্দায়

ঘিরে রাখে তখন আমরা সেই পর্দাকেই পূজা করি। যাদের মন স্বভাবতই বিষয়ী, ধর্মচর্চাতেও যারা বস্তুকে বেশি দাম দেয়, তারা দেবতার চেয়ে পর্দাকেই বেশি শ্রদ্ধা করে।

তীর্থযাত্রায় সেই পর্দা ঠেলে দিয়ে মন পথে বেরিয়ে পড়ে। তখন প্রতিদিনের সীমাবদ্ধ জানাকে চিরদিনের অসীম অজানার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা সহজ হয়। প্রতিদিন ও চিরদিনের সংগমস্থলেই সত্যের মন্দির।

এবারে তাই পথের দুই পাশে চাইতে চাইতে বেরিয়েছিলুম। অভ্যাসের জগতে যাকে দেখেও দেখি নে, মন জেগে উঠে বললে, সেই চির-অপরিচিত হয়তো কোথায় অজানা ফুলের মালা পরে অজানা তারার রাত্রে দেখা দেবে। অভ্যাস বলে ওঠে, 'সে নেই গো নেই, সে মরীচিকা।' গণ্ডির বাইরেকার বিশ্ব বলে, 'আছে বৈকি, তাকিয়ে দেখো। দেখা হয়ে চুকেছে মনে করে দেখা বন্ধ কর, তাই তো দেখা হয় না।' তখন ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, 'দেখা হল বুঝি।' পথিকের প্রাণের উদ্‌বোধন সেই কী-জানি। সেই কী-জানির উদ্দেশে গান লিখেছি। জীবনের সকল নৈরাশ্য, সকল বিড়ম্বনা, সকল তুচ্ছতার অবসাদ অতিক্রম করেও সেই কী-জানির আভাস আলোতে-ছায়াতে ঝল্‌মল্‌ করে উঠছে, পথিক তারই চমক নেবার জন্যে তার জানা ঘরের কোণ ফেলে পথে বেরিয়েছে।

ক্রাকোভিয়া জাহাজ
১১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

বৈষ্ণবী আমাকে বলেছিল, 'কার বাড়িতে বৈরাগীর কখন অন্ন জোটে তার ঠিকানা নেই; সে-অন্নে নিজের জোর দাবি খাটে না, তাই তো বুঝি এ অন্ন তিনিই জুগিয়ে দিলেন।' এই কথাই কাল বলেছিলেম, বাঁধা পাওয়ায় পাওয়ার সত্য ম্লান হয়ে যায়। না-পাওয়ার রসটা তাকে ঘিরে থাকে না। ভোগের মধ্যে কেবলমাত্রই পাওয়া, পশুর পাওয়া; আর সম্ভোগের মধ্যে পাওয়া না-পাওয়া দুই-ই মিলেছে, সে হল মানুষের।

ছেলেবেলা হতেই বিদ্যার পাকা বাসা থেকে বিধাতা আমাকে পথে বের করে দিয়েছেন। অকিঞ্চন বৈরাগীর মতো অন্তরের রাস্তায় একা চলতে চলতে মনের অন্ন যখন-তখন হঠাৎ পেয়েছি। আপন-মনে কেবলই কথা বলে গেছি, সেই হল লক্ষ্মীছাড়ার চাল। বলতে বলতে এমন কিছু শুনতে পাওয়া যায় যা পূর্বে শুনি নি। বলার স্রোতে যখন জোয়ার আসে তখন কোন্‌ গুহার ভিতরকার অজানা সামগ্রী ভেসে ভেসে ঘাটে এসে লাগে। মনে হয় না, তাতে আমার বাঁধা বরাদ্দের জোর আছে। সেই আচমকা পাওয়ার বিস্ময়ই তাকে উজ্জ্বল করে তোলে, উল্কা যেমন হঠাৎ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে আগুন হয়ে ওঠে।

পৃথিবীতে আমার প্রেয়সীদের মধ্যে যিনি সর্বকনিষ্ঠ তাঁর বয়স তিন। ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলে যেতে তাঁর এক মুহূর্ত বিরাম নেই। শ্রোতা যারা, তারা উপলক্ষ; বস্তুত কথাগুলো নিজেকেই নিজে শোনানো; যেমন বাষ্পরাশি ঘুরতে ঘুরতে গ্রহতারারূপে দানা বেঁধে ওঠে তেমনি কথাবলার বেগে আপনিই তার সজাগ মনে চিন্তার সৃষ্টি হতে থাকে। বাইরে থেকে মাস্টারের বাচালতা যদি এই স্রোতকে ঠেকায় তা হলে তার আপন চিন্তাধারার সহজ পথ বন্ধ হয়ে যায়। শিশুর পক্ষে অতিমাত্রায় পুঁথিগত বিদ্যাটা ভাবনার স্বাভাবিক গতিকে আটকিয়ে দেওয়া। বিশ্ব-প্রকৃতি দিনরাত্রি কথা কইছে, সেই কথা যখন শিশুর মনকে কথা কওয়ায় তখন তার সেই আপন কথাই তার সব চেয়ে ভালো শিক্ষাপ্রণালী। মাস্টার নিজে কথা বলে, আর ছেলেকে বলে 'চুপ'। শিশুর চুপ-করা মনের উপর বাইরের কথা বোঝার মতো এসে পড়ে, খাদ্যের মতো নয়। যে-শিশুশিক্ষা-বিভাগে মাস্টারের গলাই শোনা যায়, শিশুরা থাকে নীরব, সেখানে আমি বুঝি মরুভূমির উপর শিলাবৃষ্টি হচ্ছে।

যাই হোক, মাস্টারের হাতে বেশি দিন ছিলেম না বলে আমি যা-কিছু শিখেছি সে কেবল বলতে-বলতে। বাইরে থেকেও কথা শুনেছি, বই পড়েছি; সে কোনোদিনই সঞ্চয় করবার মতো

শোনা নয়, মুখস্থ করবার মতো পড়া নয়। কিছু-একটা বিশেষ করে শেখবার জন্যে আমার মনের ধারার মধ্যে কোথাও বাঁধ বাঁধি নি। তাই সেই ধারার মধ্যে যা এসে পড়ে তা কেবলই চলাচল করে, ঠাঁই বদল করতে করতে বিচিত্র আকারে তারা মেলে মেশে। এই মনোধারার মধ্যে রচনার ঘূর্ণি যখন জাগে তখন কোথা হতে কোন্ সব ভাসা কথা কোন্ প্রসঙ্গমূর্তি ধরে এসে পড়ে তা কি আমি জানি?

অনেকে হয়তো ভাবেন, ইচ্ছা করলেই বিশেষ বিষয় অবলম্বন করে আমি বিশেষভাবে বলতে বা লিখতে পারি। যাঁরা পাকা বক্তা বা পাকা লেখক তাঁরা পারেন; আমি পারি নে। যার আছে গোয়াল, ফরমাশ করলেই বিশেষ বাঁধা গোরুটাকে বেছে এনে সে দুইতে পারে। আর যার আছে অরণ্য, যে-গোরুটা যখন এসে পড়ে তাকে নিয়েই তার উপস্থিতমত কারবার। আশু মুখুজ্জে মশায় বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করতে হবে। তখন তো ভয়ে ভয়ে বললেম, আচ্ছা। তার পরে যখন জিজ্ঞাসা করলেন বিষয়টা কী, তখন চোখ বুজে বলে দিলেম, সাহিত্য সম্বন্ধে। সাহিত্য সম্বন্ধে কী যে বলব আগেভাগে তা জানবার শক্তিই ছিল না। একটা অন্ধ ভরসা ছিল যে, বলতে বলতেই বিষয় গড়ে উঠবে। তিনদিন ধরে বকেছিলেম। শুনেছি অনেক অধ্যাপকের পছন্দ হল না। বিষয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় দুইয়েরই মর্যাদা রাখতে পারি নি। তাঁদের দোষ নেই, সভাস্থলে যখন এসে দাঁড়ালেম তখন মনের মধ্যে বিষয় বলে কোনো বালাই ছিল না। বিষয় নিয়েই যাঁদের প্রতিদিনের কারবার বিষয়হীনের অকিঞ্চনতা তাঁদের কাছে ফস্ করে ধরা পড়ে গেল।

এবার ইটালিতে মিলান শহরে আমাকে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। অধ্যাপক ফর্মিকি বার বার জিজ্ঞাসা করলেন, বিষয়টা কী? কী করে তাঁকে বলি যে, যে-অন্তর্যামী তা জানেন তাঁকে প্রশ্ন করলে জবাব দেন না। তাঁর ইচ্ছা ছিল, যদি একটা চুম্বক পাওয়া যায় তবে আগেই সেটা তর্জমা করে ছাপিয়ে রাখবেন। আমি বলি, সর্বনাশ! বিষয় যখন দেখা দেবে চুম্বক তার পরেই সম্ভব। ফল ধরবার আগেই তার আঁঠি খুঁজে পাই কী উপায়ে। বক্তৃতা সম্বন্ধে আমার ভদ্র অভ্যাস নেই, আমার অভ্যাস লক্ষ্মীছাড়া। ভেবে বলতে পারি নে, বলতে বলতে ভাবি, মৌমাছির পাখা যেমন উড়তে গিয়ে গুন্‌গুন্ করে। সুতরাং, অধ্যাপক হবার আশা আমার নেই, এমন-কি, ছাত্র হবারও ক্ষমতার অভাব।

এমনি করে দৈবক্রমে বৈরাগীর তত্ত্বকথাটা বুঝে নিয়েছি। যারা বিষয়ী তারা বিশ্বকে বাদ দিয়ে বিশেষকে খোঁজে। যারা বৈরাগী তারা পথে চলতে চলতেই বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে বিশেষকে চিনে নেয়। উপরি-পাওনা ছাড়া তাদের কোনো বাঁধা পাওনাই নেই। বিশ্বপ্রকৃতি স্বয়ং যে এই লক্ষ্যহীন বৈরাগী—চলতে চলতেই তার যা-কিছু পাওয়া। জড়ের রাস্তায় চলতে চলতে সে হঠাৎ পেয়েছে প্রাণকে, প্রাণের রাস্তায় চলতে চলতে সে হঠাৎ পেয়েছে মানুষকে। চলা বন্ধ করে যদি সে জমাতে থাকে তা হলেই সৃষ্টি হয়ে ওঠে জঞ্জাল। তখনই প্রলয়ের ঝাঁটার তলব পড়ে।

বিশ্বের মধ্যে একটা দিক আছে যেটা তার স্থাবর বস্তুর অর্থাৎ বিষয়সম্পত্তির দিক নয়; যেটা তার চলচ্চিত্তের নিত্য প্রকাশের দিক। যেখানে আলো ছায়া সুর, যেখানে নৃত্য গীত বর্ণ গন্ধ, যেখানে আভাস ইঙ্গিত। যেখানে বিশ্ববাউলের একতারার ঝংকার পথের বাঁকে বাঁকে বেজে বেজে ওঠে, যেখানে সেই বৈরাগীর উত্তরীয়ের গেরুয়া রঙ বাতাসে বাতাসে ঢেউ খেলিয়ে উড়ে যায়। মানুষের ভিতরকার বৈরাগীও আপন কাব্যে গানে ছবিতে তারই জবাব দিতে দিতে পথে চলে, তেমনিতরোই গানের নাচের রূপের রসের ভঙ্গিতে। বিষয়ী লোক আপন খাতাঞ্চিখানায় বসে যখন তা শোনে তখন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'বিষয়টা কী। এতে মুনফা কী আছে। এতে কী প্রমাণ করে।' অধরকে ধরার জায়গা সে খোঁজে তার মুখবাঁধা থলিতে, তার চামড়াবাঁধানো খাতায়। নিজের মনটা যখন বৈরাগী হয় নি তখন বিশ্ববৈরাগীর বাণী কোনো কাজে লাগে না। তাই দেখেছি, খোলা রাস্তার বাঁশিতে হঠাৎ-হাওয়ায় যে-গান বনের মর্মরে নদীর কল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে বেজেছে, যে-গান ভোরের শুকতারার পিছে পিছে অরুণ-আলোর পথ দিয়ে চলে গেল, শহরের দরবারে ঝাড়লণ্ঠনের

আলোতে তারা ঠাঁই পেল না; ওস্তাদেরা বললে, 'এ কিছুই না', প্রবীণেরা বললে, 'এর মানে নেই!' কিছু নয়ই তো বটে; কোনো মানে নেই, সে-কথা খাঁটি; সোনার মতো নিকষে কষা যায় না, পাটের বস্তার মতো দাঁড়িপাল্লায় ওজন চলে না। কিন্তু, বৈরাগী জানে, অধর রসেই ওর রস। কতবার ভাবি গান তো এসেছে গলায় কিন্তু শোনাবার লগ্ন রচনা করতে তো পারি নে; কান যদি-বা খোলা থাকে আন্‌মনার মন পাওয়া যাবে কোথায়। সে-মন যদি তার গদি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে পারে তবেই-তো যা বলা যায় না তাই সে শুনবে, যা জানা যায় না তাই সে বুঝবে।

ক্রাকোভিয়া জাহাজ
১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

জন্মকাল থেকে আমাকে একখানা নির্জন নিঃসঙ্গতার ভেলার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তীরে দেখতে পাচ্ছি লোকালয়ের আলো, জনতার কোলাহল; ক্ষণে ক্ষণে ঘাটেও নামতে হয়েছে, কিন্তু কোনোখানে জমিয়ে বসতে পারি নি। বন্ধুরা ভাবে তাদের এড়িয়ে গেলুম; শত্রুরা ভাবে, অহংকারেই দূরে দূরে থাকি। যে-ভাগ্যদেবতা বরাবর আমাকে সরিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেল, পাল গোটাতে সময় দিলে না, রশি যতবার ডাঙার খোঁটায় বেঁধেছি টান মেরে ছিঁড়ে দিয়েছে, সে কোনো কৈফিয়ত দিলে না।

সুখদুঃখের হিসাবনিকাশ নিয়ে ভাগ্যের সঙ্গে তকরার করে লাভ নেই। যা হয়েছে তার একটা হেতু আছে, সেই হেতুর উপর রাগ করলে হওয়ার উপরেই রাগতে হয়। ঘড়া রাগ করে ঠং ঠং শব্দে যদি বলে 'আমাকে শূন্য করে গড়েছে কেন', তার জবাব হচ্ছে, 'তোমাকে শূন্য করবে বলেই ঘড়া করে নি, ঘড়া করবে বলেই শূন্য করেছে।' ঘড়ার শূন্যতা পূর্ণতারই অপেক্ষায়। আমার একলা-আকাশের ফাঁকটাকে ভরতি করতে হবে, সেই প্রত্যাশাটা আমার সঙ্গে সঙ্গে লেগে আছে। দৈবের এই দাবিটিই আমার সম্মান; একে রক্ষা করতে হলে পুরাপুরি দাম দিতে হবে।

তাই শূন্য আকাশে একলা বসে ভাগ্যনির্দিষ্ট কাজ করে থাকি। তাতেই আমার হওয়ার অর্থটা বুঝি, কাজেই আনন্দও পাই। বাঁশির ফাঁকটা যখন সুরে ভরে ওঠে তখন তার আর-কোনো নালিশ থাকে না।

শরীরে মনে প্রাণের দক্ষিণ হাওয়া যখন জোরে বয় তখন আত্মপ্রকাশের দাক্ষিণ্যেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার মেলে। কিন্তু যখন ক্লান্তি আসে, যখন পথ ও পাথেয় দুই-ই যায় কমে অথচ সামনে পথটা দেখতে পাই সুদীর্ঘ, তখন ছেলেবেলা থেকে যে-ঘর বাঁধবার সময় পাই নি সেই ঘরের কথা মন জিজ্ঞাসা করতে থাকে। তখনই আকাশের তারা ছেড়ে দীপের আলোর দিকে চোখ পড়ে। জীবলোকে ছোটো ছোটো মাধুরীর দৃশ্য যা তীরের থেকে দেখা দিয়ে সরে সরে গিয়েছে, চোখের উপরকার আলো ম্লান হয়ে এলে সেই অন্ধকারে তাদের ছবি ফুটে ওঠে; তখন বুঝতে পারি, সেই-সব ক্ষণিকের দেখা প্রত্যেকেই মনের মধ্যে কিছু-না-কিছু ডাক দিয়ে গেছে। তখন মনে হয়, বড়ো বড়ো কীর্তি গড়ে তোলাই-যে বড়ো কথা তা নয়, পৃথিবীতে যে-প্রাণের যজ্ঞ সম্পন্ন করবার জন্যে নিমন্ত্রণ পেয়েছি তাতে উৎসবের ছোটো পেয়ালাগুলি রসে ভরে তোলা শুনতে সহজ, আসলে দুঃসাধ্য।

এবারে ক্লান্ত দুর্বল শরীর নিয়ে বেরিয়েছিলুম। তাই, অন্তরে যে-নারীপ্রকৃতি অন্তঃপুর-চারিণী হয়ে বাস করে ক্ষণে ক্ষণে সে আপন ঘরের দাবি জানাবার সময় পেয়েছিল। এই দাবির মধ্যে আমার পক্ষে কেবল যে আরামের লোভ তা নয়, সার্থকতার আশাও রয়েছে। জীবনপথের শেষদিকে বিশ্বলক্ষ্মীর আতিথ্যের জন্যে শ্রান্ত চিত্তের যে ঔৎসুক্য সে কেবল শক্তির অপচয় নিবারণের আগ্রহে, পাথেয় পূর্ণ করে নেবার জন্যে। কাজের হুকুম এখনো মাথার উপর অথচ উদ্যম এখন নিস্তেজ, মন তাই প্রাণশক্তির ভাণ্ডারীর খোঁজ করে। শুষ্ক তপস্যার পিছনে কোথায় আছে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার।

দিনের আলো যখন নিবে আসছে, সামনের অন্ধকারে যখন সন্ধ্যার তারা দেখা দিল, যখন জীবন-

যাত্রার বোঝা খালাস করে অনেকখানি বাদ দিয়ে অল্প-কিছু বেছে নেবার জন্যে মনকে তৈরি হতে হচ্ছে, তখন কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা নেবার জন্যে মনের ব্যগ্রতা আমি তাই লক্ষ করে দেখছি। সমস্ত দিন প্রাণপণ চেষ্টায় যা-কিছু সে জমিয়েছিল, গড়ে তুলেছিল, সংসারের হাটে যদি তার কিছু দাম থাকে তবে তা সেইখানেই থাক্‌, যারা আগলে রাখতে চায় তারাই তার খবরদারি করুক; রইল টাকা, রইল খ্যাতি, রইল কীর্তি, রইল পড়ে বাইরে; গোধূলির আঁধার যতই নিবিড় হয়ে আসছে ততই তারা ছায়া হয়ে এল; তারা মিলিয়ে গেল মেঘের গায়ে সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটার সঙ্গে। কিন্তু, যে-অনাদি অন্ধকারের বুকের ভিতর থেকে একদিন এই পৃথিবীতে বেরিয়ে এসেছি সেখানকার প্রচ্ছন্ন উৎসব থেকে উৎসারিত জলধারা ক্ষণে ক্ষণে আমার যাত্রাপথের পাশে পাশে মধুর কলস্বরে দেখা দিয়ে আমার তৃষ্ণা মিটিয়েছে, আমার তাপ জুড়িয়েছে, আমার ধুলো ধুয়ে দিয়েছে, সেই তীর্থের জল ভরে রইল আমার স্মৃতির পাত্রখানি। সেই অন্ধকার অপরিসীমের হৃদয়কন্দর থেকে বারবার যে-বাঁশির ধ্বনি আমার প্রাণে এসে পৌঁচেছিল, কত মিলনে, কত বিরহে, কত কান্নায়, কত হাসিতে; শরতের ভোরবেলায়, বসন্তের সায়াহ্নে, বর্ষার নিশীথরাত্রে; কত ধ্যানের শান্তিতে, পূজার আত্মনিবেদনে, দুঃখের গভীরতায়; কত দানে, কত গ্রহণে, কত ত্যাগে, কত সেবায়—তারা আমার দিনের পথে সুর হয়ে বেজেছিল, আজ তারাই আমার রাত্রের পথে দীপ হয়ে জ্বলে উঠছে। সেই অন্ধকারের ঝরনা থেকেই আমার জীবনের অভিষেক, সেই অন্ধকারের নিস্তব্ধতার মধ্যে আমার মৃত্যুর আমন্ত্রণ; আজ আমি তাকে বলতে পারব, হে চিরপ্রচ্ছন্ন, আমার মধ্যে যা-কিছু তুমি তোমার গভীরের ভিতর থেকে তারার মতো প্রকাশ করেছ রূপে ও বাণীতে, তাতেই নিত্যকালের অমৃত; আমি খুঁজে খুঁজে পাথর কুড়িয়ে কুড়িয়ে কীর্তির যে-জয়স্তম্ভ গেঁথেছি, কালস্রোতের ভাঙনের উপরে তার ভিত। সেইজন্যেই আজ গোধূলির ধূসর আলোয় একলা বসে ভাবছিলুম, রঙিন রসের অক্ষরে লেখা যে-লিপি তোমার কাছ থেকে ক্ষণে ক্ষণে এসেছিল ভালো করে তা পড়া হয় নি, ব্যস্ত ছিলুম। তার মধ্যে নিমন্ত্রণ ছিল। কোথায়। কারখানাঘরে নয়, খাতাঞ্চিখানায় নয়, ছোটো ছোটো কোণে যেখানে ধরণীর ছোটো সুখগুলি লুকানো। তাই আজ পিছন ফিরে তাকিয়ে মনে মনে ভেবে দেখছি, কতবার বঞ্চিত হলুম। জনতার জয়ধ্বনির ডাকে কতবার অন্যমনে গভীর নিভৃতের পাশ দিয়ে চলে এসেছি; মায়ামৃগের অনুসরণে কতবার সরল সুন্দরের দিকে চোখ পড়ল না। জীবনপথে আশে পাশে সুধার-কণা-ভরা যে বিনা-মূল্যের ফলগুলি পাতার আড়ালে ঢাকা ছিল, তাদের এড়িয়ে উপবাসী হয়ে চলে এসেছি বলেই এত শ্রান্তি, এত অবসাদ। প্রভাত যেখান থেকে আপন পেয়ালা আলোতে ভরে নেয়, রাত্রি যার আঙিনায় বসে প্রাণের ছিন্ন সূত্রগুলি বারে বারে জুড়ে তোলে, ঐ লুকিয়ে-থাকা ছোটো ফলগুলি সেই মহান্ধকারেরই রহস্য-গর্ভ থেকে রস পেয়ে ফলে উঠছে, সেই অন্ধকার—যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ।

ক্রাকোভিয়া জাহাজ
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

বাংলা ভাষায় প্রেম অর্থে দুটো শব্দের চল আছে; ভালোলাগা আর ভালোবাসা। এই দুটো শব্দে আছে প্রেমসমুদ্রের দুই উল্টোপারের ঠিকানা। যেখানে ভালোলাগা সেখানে ভালো আমাকে লাগে, যেখানে ভালোবাসা সেখানে ভালো অন্যকে বাসি। আবেগের মুখটা যখন নিজের দিকে তখন ভালোলাগা, যখন অন্যের দিকে তখন ভালোবাসা। ভালোলাগায় ভোগের তৃপ্তি, ভালোবাসায় ত্যাগের সাধন।

সংস্কৃত ভাষায় অনুভব বলতে যা বুঝি তার খাঁটি বাংলা প্রতিশব্দ একদিন ছিল। এতবড়ো একটা চলতি ব্যবহারের কথা হারাল কোন্‌ ভাগ্যদোষে বলতে পারি নে। এমন দিন ছিল যখন লাজবাসা ভয়বাসা বলতে বোঝাত লজ্জা অনুভব করা, ভয় অনুভব করা। এখন, বলি, লজ্জা

পাওয়া, ভয় পাওয়া। কিল খাওয়া, গাল খাওয়া, যেমন ভাষার বিকার— লজ্জা পাওয়া, ভয় পাওয়াও তেমনি।

কারও 'পরে আমাদের অনুভব যখন সম্পূর্ণ ভালো হয়ে ওঠে, ভালো-ভাবায় ভালো-ইচ্ছায় মন কানায় কানায় ভরতি হয় তখন তাকেই বলি ভালোবাসা। পূর্ণ উৎকর্ষের ভাবকেই বলা যায় ভালো। স্বাস্থ্য যেমন প্রাণের পূর্ণতা, সৌন্দর্য যেমন রূপের পূর্ণতা, সত্য যেমন জ্ঞানের পূর্ণতা, ভালোবাসা তেমনি অনুভূতির পূর্ণতা। ইংরেজিতে গুড্ ফীলিং বলে এ তা নয়, একে বলা যেতে পারে পারফেক্ট্ ফীলিং।

শুভ-ইচ্ছার পূর্ণতা হচ্ছে নৈতিক, তার ক্রিয়া ব্যবহারের উপর; ভালোবাসার পূর্ণতা আত্মিক, সে হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের (personality-র) পরম প্রকাশ; শুভ-ইচ্ছা অন্ধকারে যষ্টি, প্রেম অন্ধকারে চাঁদ। মায়ের স্নেহ মায়ের শুভ-ইচ্ছা মাত্র নয়, তা তাঁর পূর্ণতার ঐশ্বর্য। তা অন্নের মতো নয়, তা অমৃতের মতো। এই অনুভূতির পূর্ণতা একটি শক্তি। ভালোবাসার বিষয়ের মধ্যে অসীমকে বোধ করবার শক্তি; ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে অপরিমেয়কে দেখতে পাওয়া এবং স্বীকার করাই অপরিমেয়কে সীমার মন্দিরে জাগিয়ে তোলবার শক্তি।

নিজের অস্তিত্বের মূল্য যে-মানুষ ছোটো করে দেখে আত্ম-অবিশ্বাসের অবসাদেই সে নিজের সম্পদ উদ্ঘাটিত করতে ভরসা পায় না। বিশ্ব আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রত্যেক মানুষকে গ্রহণ ও ধারণ করে, মানুষের অন্তরে এই মস্ত সত্যটির অনুভব হচ্ছে প্রেম। ব্যক্তিবিশেষকে সে ডাক দিয়ে বলে, 'তুমি কারোর চেয়ে কম নও, তোমার মধ্যে এমন মূল্য আছে যার জন্যে প্রাণ দেওয়া চলে।' মানুষ যেখানে আপন সীমা টেনে দিয়ে নিজেকে সাধারণের সামিল করে অলস হয়ে বসে থাকে প্রেম ব্যক্তিবিশেষের সেই সাধারণ সীমাকে মানে না, তাকে অর্ঘ্য দিয়ে বলে, 'তোমার কপালে আমি তিলক দিয়েছি, তুমি অসাধারণ।' সূর্যের আলো বৃষ্টির জল যেমন নির্বিচারে সর্বত্রই মাটির জড়তা ও দৈন্য অস্বীকার করে, মরুকে বার বার স্পর্শ করে, তাকে শ্যামলতায় পুলকিত করে তোলে, যে-ভূমি রিক্ত তারও সফলতার জন্যে যেমন তাদের নিরন্তর প্রতীক্ষা, তার কাছেও যেমন পূর্ণতার দাবি, মানুষের সমাজে প্রেম তেমনি সব জায়গাতেই অসীম প্রত্যাশা জাগিয়ে রাখে। ব্যক্তিকে সে যে মূল্য দেয় সে মূল্য মহিমার মূল্য। অন্তর্নিহিত এই মহিমার আশ্বাসে মানুষের সৃষ্টিশক্তি নানাদিকে পূর্ণ হয়ে ওঠে; তার কর্মের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

এই ব্যক্তিগত প্রেমের বাহন নারী। ইতিহাসের অপ্রকাশিত লিখন যদি বের করা যেত তা হলে দেখতে পেতেম নারীর প্রেমের প্রেরণা মানুষের সমাজে কী কাজ করেছে। শক্তির যে-ক্রিয়া উদ্যত চেষ্টারূপে চঞ্চল আমরা তাকেই শক্তির প্রকাশরূপে দেখি, কিন্তু যে-ক্রিয়া গূঢ় উদ্দীপনারূপে পরিব্যাপ্ত তার কথা মনেই আনি নে। বিস্ময়ের কথা এই যে বিশ্বের স্ত্রীপ্রকৃতিকেই ভারতবর্ষ শক্তি বলে জেনেছে।

সকলেই জানে, এই শক্তিরই বিকারের মতো এমন সর্বনেশে বিপদ আর কিছুই নেই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীমের হৃদয়ের মধ্যে অদৃশ্য থেকে দ্রৌপদী তাঁকে বল জুগিয়েছেন। বীর আণ্টনির হৃদয় অধিকার করে ক্লিওপাত্রা তাঁর বল হরণ করে নিল। সত্যবানকে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করেন সাবিত্রী, কিন্তু কত নারী পুরুষের সত্য নষ্ট করে তাকে মৃত্যুর মুখে নিয়ে গেছে তার সংখ্যা নেই।

তাই তো গোড়ায় বলেছি, প্রেমের দুই বিরুদ্ধ পার আছে। এক পারে চোরাবালি, আর-এক পারে ফসলের খেত। এক পারে ভালোলাগার দৌরাত্ম্য, অন্য পারে ভালোবাসার আমন্ত্রণ। মাতৃস্নেহের মধ্যেও এই দুই জাতের প্রেম। একটাতে প্রধানত আসক্তি নিজের পরিতৃপ্তি খোঁজে; সেই অন্ধ মাতৃস্নেহ আমাদের দেশে বিস্তর দেখতে পাই। তাতে সন্তানকে বড়ো করে না তুলে তাকে অভিভূত করে। তাতে কোনো পক্ষেরই কল্যাণ নেই। যে-প্রেম ত্যাগের দ্বারা মানুষকে মুক্তি দিতে জানে না পরন্তু ত্যাগের বিনিময়ে মানুষকে আত্মসাৎ করতে চায় সে-প্রেম তো রিপু। এক পক্ষকে ক্ষুধার দাহে সে দগ্ধ করে, অন্য পক্ষকে লালায়িত আসক্তি দ্বারা লেহন করে জীর্ণ করে দেয়।

এই মাতৃলালনপাশের পরিবেষ্টনের মধ্যে যারা চির-অবরুদ্ধ আমাদের দেশে তাদের সংখ্যা বিস্তর; তাদের শৈশব আর ছাড়তে চায় না। আসক্তি-পরায়ণ মাতার মূঢ় আদেশপালনের অনর্থ বহন করে অপমানের মধ্যে অভাবের মধ্যে চিরজীবনের মতো মাথা হেঁট হয়ে গেছে, এমন-সকল বয়স্ক নাবালকের দল আমাদের দেশে ঘরে ঘরে। আমাদের দেশে মাতার ক্রোড়রাজত্ববিস্তারে পৌরুষের যত হানি হয়েছে এমন বিদেশি শাসনের হাতকড়ির নির্মমতার দ্বারাও হয় নি।

স্ত্রীপুরুষের প্রেমেও সেই একই কথা। নারীর প্রেম পুরুষকে পূর্ণশক্তিতে জাগ্রত করতে পারে; কিন্তু সে-প্রেম যদি শুক্লপক্ষের না হয়ে কৃষ্ণপক্ষের হয় তবে তার মালিন্যের আর তুলনা নেই। পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ তপস্যায়; নারীর প্রেমে ত্যাগধর্ম সেবাধর্ম সেই তপস্যারই সুরে সুর-মেলানো; এই দুয়ের যোগে পরস্পরের দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নারীর প্রেমে আর-এক সুরও বাজতে পারে, মদনধনুর জ্যায়ের টংকার—সে মুক্তির সুর না, সে বন্ধনের সংগীত। তাতে তপস্যা ভাঙে, শিবের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হয়।

কেন বলি, পুরুষের ধর্ম তপস্যা। কারণ, জীবলোকের কাজে প্রকৃতি তাকে নারীর তুলনায় অনেক পরিমাণে অবকাশ দিয়েছে। সেই অবকাশটাকে নষ্ট করলেই তার সবচেয়ে ফাঁকি। পুরুষ সেই অবকাশকে আপন সাধনার ক্ষেত্র করেছে বলেই মানুষের উৎকর্ষ জৈব প্রকৃতির সীমানা অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেল। প্রকৃতির দাবি থেকে মুক্তি নিয়েই পুরুষ জ্ঞানকে ধ্যানকে শক্তিকে অসীমের মধ্যে অনুসরণ করে চলছে। সেইজন্যে পুরুষের সাধনায় চিরকালই প্রকৃতির সঙ্গে বিরুদ্ধতা আছে। নারীর প্রেম যেখানে এই বিরোধের সমন্বয় করে দেয়, কঠোর জ্ঞানের বেদিপ্রাঙ্গণে সে যখন পূজো-মাধুর্যের আসন রচনা করে—পুরুষের মুক্তিকে যখন সে লুপ্ত করে না, তাকে সুন্দর করে তোলে—তার পথকে অবরুদ্ধ করে না, পথের পাথেয় জুগিয়ে দেয়—ভোগবতীর জলে ডুবিয়ে দেয় না, সুরধুনীর জলে স্নান করায়—তখন বৈরাগ্যের সঙ্গে অনুরাগের, হরের সঙ্গে পার্বতীর, শুভ-পরিণয় সার্থক হয়।

বিচ্ছেদের ভিতর দিয়েই শক্তি কাজ করবার ক্ষেত্র পায়। চাঁদ ও পৃথিবীর মাঝখানে যে-বিরহ আছে তারই অবকাশে পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রকে চাঁদ কথা কওয়ায়। স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের মাঝে বিধাতা একটি দূরত্ব রেখে দিয়েছেন। এই দূরত্বের ফাঁকটাই কেবলই সেবায় ক্ষমায় বীর্যে সৌন্দর্যে কল্যাণে ভরে ওঠে; এইখানেই সীমায় অসীমে শুভদৃষ্টি। জৈবক্ষেত্রে প্রকৃতির অধিকারের মধ্যে মানুষের অনেক সৃষ্টি আছে, কিন্তু চিত্তক্ষেত্রে তার সৃষ্টির অন্ত নেই। চিত্তের মহাকাশ স্থূল আসক্তির দ্বারা জমাট হয়ে না গেলে তবেই সেই সৃষ্টির কাজ সহজ হয়। দীপশিখাকে দুই হাতে আঁকড়ে ধরে যে-মাতাল বেশি করে পেতে চায়, সে নিজেও পোড়ে, আলোটিকেও নিবিয়ে দেয়।

মুক্ত অবকাশের মধ্যে পুরুষ মুক্তিসাধনার যে-মন্দির বহুদিনের তপস্যায় গেঁথে তুলেছে পূজারিণী নারী সেইখানে প্রেমের প্রদীপ জ্বালবার ভার পেল। সে-কথা যদি সে ভুলে যায়, দেবতার নৈবেদ্যকে যদি সে মাংসের হাটে বেচতে কুণ্ঠিত না হয়, তা হলে মর্ত্যের মর্মস্থানে যে-অমরাবতী আছে তার পরাভব ঘটে; পুরুষ যায় প্রমত্ততার রসাতলে, আর নারীর হৃদয়ে যে রসের পাত্র আছে তা ভেঙে গিয়ে সে-রস ধুলাকে পঙ্কিল করে।

ক্রাকোভিয়া
১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

ফুলের মধ্যে যে-আনন্দ সে প্রধানত ফলের প্রত্যাশার আনন্দ, এটা অত্যন্ত মোটা কথা। বিশ্বসৃষ্টিতে দেখতে পাই সৃষ্টিতেই আনন্দ, হওয়াটাই চরম কথা। তার ফুলেও আছে হওয়া, ফলেও আছে হওয়া। ফুলটা হল উপায় আর ফলটা হল উদ্দেশ্য, তাই বলে উভয়ের মধ্যে মূল্যের কোনো ভেদ দেখতে পাই নে।

আমার তিন বছরের প্রিয়সখী, যাকে নাম দিয়েছি নন্দিনী, তার হওয়ার উদ্দেশ্য কী এ প্রশ্নের কোনো জবাব-তলবের কথা মনে আসে না। সে-যে কুলরক্ষার সেতু, সে-যে পিণ্ড-জোগানের হেতু, সে-যে কোনো এক ভাবীকালে প্রজনার্থং মহাভাগা, এ-সব হল শাস্ত্রসংগত বিজ্ঞানসম্মত মূল্যের কথা। ফলের দরে ফুলের বিচার ব্যাবসাদারের। কিন্তু, ভগবান তো সৃষ্টির ব্যাবসা ফাঁদেন নি। তাঁর সৃষ্টি একেবারেই বাজে খরচ; অর্থাৎ, আয় করবার জন্যে খরচ করা নয়, এইজন্যই আয়োজনে প্রয়োজনে সমান হয়ে মিশে গেছে। এইজন্য যে-শিশু জীবলোকের প্রয়োজনসাধনের পক্ষে অপূর্ণ, সেই তিন বছরের শিশুর অপূর্ণতাই সৃষ্টির আনন্দগৌরবে পূর্ণ। আমি তো দেখি বিশ্ব-রচনায় মুখ্যের চেয়ে গৌণটাই বড়ো। ফুলের রঙের মুখ্য কথাটা হতে পারে পতঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা; গৌণ কথাটা হচ্ছে সৌন্দর্য। মানুষ যখন ফুলের বাগান করে তখন সেই গৌণের সম্পদই সে খোঁজে। বস্তুত, গৌণ নিয়েই মানুষের সভ্যতা। মানুষ কবি যখন প্রেয়সীর মুখের একটি তিলের জন্য সমরখন্দ বোখারা পণ করতে বসে তখন সে প্রজনার্থং মহাভাগার কথা মনেই রাখে না। এই বে-হিসাবি সৃষ্টিতে বে-হিসাবি আনন্দরূপকেই সে সৃষ্টির ঐশ্বর্য বলে জানে।

প্রাণীসংসারে জৈবপ্রকৃতিই সকলের গোড়ায় আপন ভিত ফেঁদে, জাজিম পেতে, আলো জেলে, পৃথিবীর ভাণ্ডার থেকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র মালমসলা নিজের ব্যবহারের জন্যে সংগ্রহ করে নিয়ে সংসার পেতে বসেছিল। ভোরের বেলায় সে মুখ্য জায়গাটা দখল করে বসল। তারই বচন হচ্ছে, সা ভার্যা যা প্রজাবতী। অর্থাৎ, যদি কাজে লাগল তবেই তার দাম।

চিৎপ্রকৃতি এসে জুটলেন কিছু দেরিতে। তাই, জৈবপ্রকৃতির আশ্রয়ে তাঁকে পরাভূত হতে হল। পুরানো পথে পুরানো ঘাটে পুরানো কালের মালমসলা নিয়েই সে ফাঁদলে তার নিজের ব্যাবসা। তখন সে সাবেক আমলের মুখ্য থেকে হাল আমলের গৌণ ফলিয়ে তুলতে বসল। আহারকে করে তুললে ভোজ, শব্দকে করে তুললে বাণী, কান্নাকে করে তুললে কাব্য। মুখ্যভাবে যেটা ছিল আঘাত গৌণভাবে সেটা হল আবেদন; যেটা ছিল বন্দিনীর শৃঙ্খল, সেটা হল বধূর কঙ্কণ; যেটা ছিল ভয় সেটা হল ভক্তি; যেটা ছিল দাসত্ব সেটা হল আত্মনিবেদন। যারা উপরের স্তরের চেয়ে নীচের স্তরকে বিশ্বাস করে বেশি তারা মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করতে গেলেই পুরাতন তাম্রশাসন বেরিয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিকের চশমায় ধরা পড়ে যে, খেতের মালিক জৈবপ্রকৃতি; অতএব ফসলের অধিকার নির্ণয় করতে গেলে বৈজ্ঞানিকের কাছে চিৎপ্রকৃতির দাবি অগ্রাহ্য হয়ে আসে। আপিলে সে যতই বলে 'প্রণালী আমার, প্ল্যান আমার, হাললাঙল আমার, চাষ আমার' কিছুতেই অপ্রমাণ করতে পারে না যে, মাটির তলাকার তাম্রশাসনে মোটা অক্ষরে খোদা আছে 'জৈবপ্রকৃতি'। মোটা অক্ষরের উপরে বিচারকের নজরও পড়ে বেশি। কাজেই রায় যখন বেরয় তখন পাকা প্রমাণসহ প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, সাবেক আমলের ভূতই বর্তমান আমলের ভগবান সেজে এসেছে।

জৈবপ্রকৃতিতে শিশুর একটা অর্থ আছে। সেই অর্থটাকেই যদি সম্পূর্ণ বলে স্বীকার করে নিই তা হলে বলতে হয়, মাছের ছানার সঙ্গে মানুষের শিশুর কোনো প্রভেদ নেই। অর্থাৎ, তার একমাত্র অর্থ বংশবৃদ্ধি।

কিন্তু, চিৎপ্রকৃতি সেই অর্থটাকে নিয়ে যখন আপনার চিন্ময় জিনিস করে তুললে, তখন তাকে চোর বদনাম দিয়ে মূলকেই মালেক স্বীকার করি যদি তা হলে শেক্সপিয়রেরও মাল থানায় আটক করতে হয়। মসলা আর মাল তো একই জিনিস নয়; মাটির মালেক যদি হয় ভূপতি ভাঁড়ের মালেক তো কুমোর।

আমাদের চিত্ত শিশুর মধ্যে সৃষ্টির অহৈতুক আনন্দটি দেখতে পায়। বয়স্ক মানুষের মধ্যে উদ্দেশ্য-উপায়-ঘটিত নানা তর্ক আছে; কেউ-বা কাজের কেউ-বা অকাজের, কারও-বা অর্থ আছে কারও-বা নেই। কিন্তু শিশুকে যখন দেখি তখন কোনো প্রত্যাশার দ্বারা আচ্ছন্ন করে দেখি নে। সে-যে আছে, এই সত্যটাই বিশুদ্ধ ভাবে আমাদের মনকে টানে। সেই অপরিণত মানুষটির মধ্যে

একটি পূর্ণতার ছবি দেখা দেয়। শিশুর মধ্যে মানুষের প্রাণময় রূপটি স্বচ্ছ অনাবিল আকাশে সুপ্রত্যক্ষ। নানা কৃত্রিম সংস্কারের ষড়যন্ত্রে তার সহজ আত্মপ্রকাশে একটুও দ্বিধা ঘটিয়ে দেয় না। প্রাণের বেগে নন্দিনী যে-রকম সহজে নেচেকুঁদে গোলমাল করে বেড়ায় আমি যদি তা করতে যাই, তা হলে যে-প্রভূত সংস্কারের পরিমণ্ডল আমাকে নিবিড় করে ঘিরে আছে সে-সুদ্ধ নড়্‌চড়্‌ করতে থাকে, সেটা একটা অসংগত ব্যাপার হয়ে ওঠে। শিশু যা-তা নিয়ে যেমন-তেমন করে খেলে, তাতেই খেলার বিশুদ্ধ রূপটি দেখি। খেলার উপকরণের কৃত্রিম মূল্য, খেলার লক্ষ্যের কৃত্রিম উত্তেজনা, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে না। নন্দিনী যখন লুব্ধভাবে কমলালেবু খায় তখন সেই অসংকোচ লোভটিকে সুন্দর ঠেকে। সহজ প্রাণের রসবোধের সঙ্গে কমলালেবুর যে মধুর সম্বন্ধ, ভদ্রতার কোনো বিধানের দ্বারা সেটা ক্ষুণ্ণ হয় নি। ঝগড়ু-বেহারাটার প্রতি নন্দিনীর যে বন্ধুত্বের টান সেটা দেখতে ভালো লাগে, কেননা, যে-কোনো দুই মানুষের মধ্যে এই সম্বন্ধটি সত্য হওয়ার কোনো বাধা থাকা উচিত না। কিন্তু, সামাজিক ভেদবুদ্ধির নানা অভ্যস্ত সংস্কারকে যেমনি আমি স্বীকার করেছি অমনি ঝগড়ু-বেহারার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়েছে; অথচ এমন ভদ্রবেশধারীকে আমি সমকক্ষভাবে অনায়াসে গ্রহণ করতে পারি যার মনুষ্যত্বের আন্তরিক মূল্য ঝগড়ুর চেয়ে অনেক কম। জাহাজে তার সমবয়স্ক য়ুরোপীয় বালিকার সঙ্গে নন্দিনীর ঝগড়াও হয়, ভাবও হয়, পরস্পরের মধ্যে সম্পত্তির বিনিময়ও চলছে। য়ুরোপীয় পুরুষযাত্রীর সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার মাথা-নাড়ানাড়ি হয়ে থাকে, শরীরের স্বাস্থ্য ও আবহাওয়া নিয়ে বাজে কথা বলাবলিও হয়; সংস্কারের বেড়া ডিঙিয়ে তার বেশি আর সহজে এগোতে পারি নে। সহজ মানুষের সত্যটি সামাজিক মানুষের কুয়াশায় ঢেকে রেখে দেয়। অর্থাৎ আমরা নানা অবান্তর তথ্যের অস্বচ্ছতার মধ্যে বাস করি। শিশুর জীবনের যে সত্য তার সঙ্গে অবান্তরের মিশোল নেই। তাই, তার দিকে যখন চেয়ে দেখবার অবকাশ পাই তখন প্রাণলীলার প্রত্যক্ষ স্বরূপটি দেখি; তাতে সংস্কারভারে পীড়িত চিন্তাক্লিষ্ট মন গভীর তৃপ্তি পায়।

শিশুর মধ্যে আমরা মুক্তির সহজ ছবি দেখতে পাই। মুক্তি বলতে কী বোঝায়। প্রকাশের পূর্ণতা। ভগবান সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরছলে ঋষি একটি চরম কথা বলেছেন : স ভগবঃ কস্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিত ইতি। স্বে মহিম্নি। সেই ভগবান কিসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। তার উত্তর, নিজের মহিমাতেই। অর্থাৎ, তিনি স্বপ্রকাশ। শিশুরও সেই কথা। সে আপনাতে আপনি পরিব্যক্ত। তাকে দেখে আমাদের যে-আনন্দ সে তার বাধামুক্ত সহজ প্রকাশে। য়ুরোপে আজকাল চিত্রকলার ইতিহাসে একটা বিপ্লব এসেছে দেখতে পাই। এতকাল ধরে এই ছবি-আঁকার চার দিকে— হিন্দুস্থানি গানের তানকর্তবের মতো— যে-সমস্ত প্রভূত ওস্তাদি জমে উঠেছিল আজ সকলে বুঝেছে, তার বারো-আনাই অবান্তর। তা সুঠাম হতে পারে, কোনো-না-কোনো কারণে মনোহর হতেও পারে, তার আড়ম্বর-বাহুল্যে বিশেষ-একটা শক্তিসম্পদও প্রকাশ করতে পারে, অর্থাৎ ঝড়ের মেঘের মতো তার আশ্চর্য রঙের ঘটা থাকতে পারে, কিন্তু আসল যে জিনিসটি পড়েছে ঢাকা সে হচ্ছে সরল সত্যের সূর্য, যাকে স্বচ্ছ আকাশে তার আপন নির্মল মহিমায় দেখে বিশ্ব আনন্দিত হয়।

গান বল, চিত্র বল, কাব্য বল, ওস্তাদি প্রথমে নম্রশিরে, মোগল দরবারে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো, তাদের পিছনে থাকে। কিন্তু, যেহেতু প্রভুর চেয়ে সেবকের পাগড়ির রঙ কড়া, তার তকমার চোখ-ধাঁধানি বেশি, এই কারণে তারা ভিড়ের উৎসাহ যতই পায় ততই পিছন ছেড়ে সামনে এসে জমে যায়। যথার্থ আর্ট তখন হার মানে, তার স্বাধীনতা চলে যায়। যথার্থ আর্টের মধ্যে সহজ প্রাণ আছে বলেই তার বৃদ্ধি আছে, গতি আছে; কিন্তু, যেহেতু কারুনৈপুণ্যটা অলংকার, যেহেতু তাতে প্রাণের ধর্ম নেই, তাই তাকে প্রবল হতে দিলেই আভরণ হয়ে ওঠে শৃঙ্খল; তখন সে আর্টের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে বন্ধ করে দেয়, তার গতি রোধ করে। তখন যেটা বাহাদুরি করতে থাকে সেটা আত্মিক নয়, সেটা বৈষয়িক; অর্থাৎ, তার মধ্যে প্রাণগত বৃদ্ধি নেই, বস্তুগত সঞ্চয় আছে। তাই আমাদের হিন্দুস্থানি গানে বৃদ্ধি দেখতে পাই নে। তানসেন প্রভৃতির অক্ষয় কমণ্ডলু থেকে

যে-ধারা প্রবাহিত হয়েছিল ওস্তাদ প্রভৃতি জহ্নুমুনি কারদানি দিয়ে সেটি গিলে খেয়ে বসে আছে। মোট কথা, সত্যের রসরূপটি সুন্দর ও সরল করে প্রকাশ করা যে-কলাবিদ্যার কাজ অবান্তরের জঞ্জাল তার সব চেয়ে শত্রু। মহারণ্যের শ্বাস রুদ্ধ করে দেয় মহাজঙ্গল।

আধুনিক কলারসজ্ঞ বলছেন, আদিকালের মানুষ তার অশিক্ষিতপটুত্বে বিরলরেখায় যেরকম সাদাসিধে ছবি আঁকত, ছবির সেই গোড়াকার ছাঁদের মধ্যে ফিরে না গেলে এই অবান্তরভারপীড়িত আর্টের উদ্ধার নেই। মানুষ বার বার শিশু হয়ে জন্মায় বলেই সত্যের সংস্কারবর্জিত সরলরূপের আদর্শ চিরন্তন হয়ে আছে; আর্টকেও তেমনি শিশুজন্ম নিয়ে অতি-অলংকারের বন্ধনপাশ থেকে বারে বারে মুক্তি পেতে হবে।

এই অবান্তরবর্জন কি শুধু আর্টেরই পরিত্রাণ। আজকের দিনের ভারজর্জর সভ্যতারও এই পথে মুক্তি। মুক্তি যে সংগ্রহের বাহুল্যে নয়, ভোগের প্রাচুর্যে নয়, মুক্তি যে আত্মপ্রকাশের সত্যতায়, আজকের দিনে এই কথাই মানুষকে বার বার স্মরণ করাতে হবে। কেননা, আজ মানুষ যে-রকম বন্ধনজালে জড়িত, এমন কোনো দিনই ছিল না।

লোভমোহের বন্ধন থেকে মানুষ কবেই বা মুক্ত ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির সাধনা ছিল সজাগ। বৈষয়িকতার বেড়ায় তখন ফাঁক ছিল; সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে সত্যের আলো আসত বলে সেই আলোর প্রতি কোনো দিন বিশ্বাস যায় নি। আজ জটিল অবান্তরকে অতিক্রম করে সরল চিরন্তনকে অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করবার সাহস মানুষের চলে গেছে।

আজ কত পণ্ডিত তথ্যের গভীর অন্ধকূপে ঢুকে টুকরো-টুকরো সংবাদের কণা খুঁটে খুঁটে জমাচ্ছেন। য়ুরোপে যখন বিদ্বেষের কলুষে আকাশ আবিল তখন এই-সকল পণ্ডিতদেরও মন দেখি বিষাক্ত। সত্যসাধনার যে-উদার বৈরাগ্য ক্ষুদ্রতা থেকে ভেদবুদ্ধি থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, তাঁরা তার আহ্বান শুনতে পান নি। তার প্রধান কারণ, জ্ঞানসাধনায় উপরের দিকে খাড়া হয়ে মানুষের যে-মাথা একদিন বিশ্ব-দেখা দেখত আজ সেই মাথা নীচে ঝুঁকে পড়ে দিনরাত টুকরো-দেখা দেখছে।

ভারতের মধ্যযুগে যখন কবীর দাদু প্রভৃতি সাধুদের আবির্ভাব হয়েছিল তখন ভারতের সুখের দিন না। তখন রাষ্ট্রনৈতিক ভাঙাগড়ায় দেশের অবস্থার কেবলই উলটপালট চলছিল। তখন শুধু অর্থবিরোধ নয়, ধর্মবিরোধের তীব্রতাও খুব প্রবল। যখন অন্তরে বাহিরে নানা বেদনা সেই অস্থিরতার কালে স্বভাবত মানুষের মন ছোটো হয়, তখন রিপুর সংঘাতে রিপু জেগে ওঠে। তখন বর্তমানের ছায়াটাই কালো হয়ে নিত্যকালের আলো আচ্ছন্ন করে, কাছের কান্নাই বিশ্বের সকল বাণী ছাপিয়ে কানে বাজে। কিন্তু, সেই বড়ো কৃপণ সময়েই তাঁরা মানুষের ভেদের চেয়ে ঐক্যকে সত্য করে দেখেছিলেন। কেননা, তাঁরা সকলেই ছিলেন কবি, কেউ পণ্ডিত ছিলেন না। শব্দের জালে তাঁদের মন জড়িয়ে যায় নি, তথ্যের খুঁটিনাটির মধ্যে উঞ্ছবৃত্তি করতে তাঁরা বিরত ছিলেন। তাই, হিন্দুমুসলমানের অতিপ্রত্যক্ষ বিরোধ ও বিদ্বেষবুদ্ধির মধ্যে থেকেও তাদের মনুষ্যত্বের অন্তরে একের আবির্ভাব তাঁরা বিনা বাধায় স্পষ্ট করে দেখেছিলেন। সেই দেখাতেই দেখার মুক্তি।

এর থেকেই বুঝতে পারি, তখনো মানুষ শিশুর নবজন্ম নিয়ে সত্যের মুক্তিরাজ্যে সহজে সঞ্চরণ করবার অবকাশ ও অধিকার হারায় নি। এইজন্যেই আকবরের মতো সম্রাটের আবির্ভাব তখন সম্ভবপর হয়েছিল, এইজন্যেই যখন ভ্রাতৃরক্তপঙ্কিল পথে অওরংজেব গোঁড়ামির কঠোর শাসন বিস্তার করেছিলেন তখন তাঁরই ভাই দারাশিকো সংস্কারবর্জিত অসাম্প্রদায়িক সত্যসাধনায় সিদ্ধিলাভ করছিলেন। তখন বড়ো দুঃখের দিনেও মানুষের পথ ছিল সহজ। আজ সে-পথ বড়ো দুর্গম। এখনকার দিনে প্রবীণেরা পথের প্রত্যেক কাঁকর গুনে বাধারই হিসাবকে প্রকাণ্ড করে তোলে; মৃত্যুঞ্জয় মানবাত্মার অপরাহত শক্তিকে তারা উপস্থিতের ছোটো ছোটো বিরুদ্ধসাক্ষ্যের জোরে অবজ্ঞা করে। তাই, তারা এত কৃপণ, এত সন্দিগ্ধ, এত নিষ্ঠুর, এত আত্মম্ভরি। বিশ্বাস

যার নেই সে কখনো সৃষ্টি করতে পারে না, সে কেবল সংগ্রহ করতে পারে; অবশেষে এই সংগ্রহ নিয়েই যত মারামারি কাটাকাটি।

আজকের এই বিশ্বাসহীন আনন্দহীন অন্ধযুগ কবির বাণীকে প্রার্থনা করছে এই কথা শোনাবার জন্যে যে, আত্মম্ভরিতায় বন্ধন, আত্মপ্রকাশেই মুক্তি; আত্মম্ভরিতায় জড় বস্তুরাশির জটিলতা, আত্মপ্রকাশে বিরলভূষণ সত্যের সরল রূপ।

হারুনা-মারু জাহাজ থেকে নেমে প্যারিসে কয়েক দিন মাত্র ভূমিমাতার শুশ্রূষা ভোগ করতে পেরেছিলাম। হঠাৎ খবর এল, যথাসময়ে পেরুতে পৌঁছতে হলে অবিলম্বে জাহাজ ধরা চাই। তাড়াতাড়ি শেরবুর্গ-বন্দর থেকে আন্ডেস্ জাহাজে উঠে পড়লুম। লম্বায় চওড়ায় জাহাজটা খুব মস্ত কিন্তু আমার শরীরের বর্তমান অবস্থায় আরামের পক্ষে যে-সব সুবিধার প্রয়োজন ছিল, তা পাওয়া গেল না। জাপানি জাহাজে আতিথ্যের প্রচুর দাক্ষিণ্যে আমার অভ্যাসটাও কিছু খারাপ করে দিয়েছিল। সেইজন্যে এখানে ক্যাবিনে প্রবেশ করেই মনটা অপ্রসন্ন হল। কিন্তু, যেটা অনিবার্য নিজের গরজেই মন তার সঙ্গে যত শীঘ্র পারে রফা করে নিতে চায়। অত্যন্ত দুষ্পাচ্য জিনিসও পেটে পড়লে পাকযন্ত্র হাল ছেড়ে দিয়ে জারকরস প্রয়োগ বন্ধ করে না। মনেরও জারকরস আছে অনভ্যস্ত কোনো দুঃখকে হজম করে নিয়ে তাকে সে আপনার অভ্যস্ত বিশ্বের শামিল করে নিশ্চিন্ত হতে চায়। অসুবিধাগুলো একরকম সহ্য হয়ে এল, আর দিনের-পর-দিন চরকার একঘেয়ে সুতো কাটার মতো একটানে চলতে লাগল।

বিষুবরেখা পার হয়ে চলেছি, এমন সময় হঠাৎ কখন শরীর গেল বিগড়ে; বিছানা ছাড়া গতি রইল না। ক্যাবিন জিনিসটাই একটা স্থায়ী ব্যাধি, ইন্দ্রিয়গুলো যদি তার সঙ্গে যোগ দিয়ে জুলুম শুরু করে তা হলে পুলিসের আকস্মিক বন্ধনের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে পর্যন্ত আপিল বন্ধ হয়, কোথাও কিছুই সান্ত্বনা থাকে না। শান্তিহীন দিন আর নিদ্রাহীন রাত আমাকে পিঠমোড়া করে শিকল কষতে লাগল। বিদ্রোহের চেষ্টা করতে গেলে শাসনের পরিমাণ বাড়তেই থাকে। রোগ-গারদের দারোগা আমার বুকের উপর দুর্বলতার বিষম একটা বোঝা চাপিয়ে রেখে দিলে; মাঝে মাঝে মনে হত, এটা স্বয়ং যমরাজের পায়ের চাপ। দুঃখের অত্যাচার যখন অতিমাত্রায় চড়ে ওঠে তখন তাকে পরাভূত করতে পারি নে; কিন্তু, তাকে অবজ্ঞা করবার অধিকার তো কেউ কাড়তে পারে না—আমার হাতে তার একটা উপায় আছে, সে হচ্ছে কবিতা-লেখা। তার বিষয়টা যা-ই হোক-না কেন, লেখাটাই দুঃখের বিরুদ্ধে সিডিশন-বিশেষ। সিডিশনের দ্বারা প্রতাপশালীর বিশেষ অনিষ্ট হয় না, তাতে পীড়িত চিত্তের আত্মসম্ভ্রম রক্ষা হয়।

আমি সেই কাজে লাগলুম, বিছানায় পড়ে পড়ে কবিতা লেখা চলল। ব্যাধিটা-যে ঠিক কী তা নিশ্চিত বলতে পারি নে, কেবল এই জানি, সে একটা অনির্বচনীয় পীড়া। সে-পীড়া শুধু আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নয়, ক্যাবিনের সমস্ত আসবাবপত্রের মধ্যে সর্বত্র সঞ্চারিত—আমি আর আমার ক্যাবিন সমস্তটা মিলে যেন একটা অখণ্ড রুগ্‌ণতা।

এমনতরো অসুখের সময় স্বভাবতই দেশের জন্যে ব্যাকুলতা জন্মে। ক্যাবিনের জঠরের মধ্যে দিবারাত্রি জীর্ণ হতে হতে আমারও মন ভারতবর্ষের আকাশের উদ্দেশে উৎসুক হয়ে উঠল। কিন্তু, অন্ধ উত্তাপের পরিমাণ বেড়ে বেড়ে ক্রমে যেমন তা আলোকিত হয়, দুঃখেরও তেমনি পরিমাণভেদে প্রকাশভেদ হয়ে থাকে। যে-দুঃখ প্রথমে কারাগারের মতো বিশ্ব থেকে পৃথক করে মনকে কেবলমাত্র নিজের ব্যথার মধ্যেই বদ্ধ করে, সেই দুঃখেরই বেগ বাড়তে বাড়তে অবশেষে অবরোধ ভেঙে পড়ে এবং বিশ্বের দুঃখসমুদ্রের কোটালের বানকে অন্তরে প্রবেশ করবার পথ ছেড়ে দেয়। তখন নিজের ক্ষণিক ছোটো দুঃখটা মানুষের চিরকালীন বড়ো দুঃখের সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়; তার ছট্‌ফটানি চলে যায়। তখন দুঃখের দণ্ডটা একটা দীপ্ত আনন্দের মশাল হয়ে জ্বলে ওঠে। প্রলয়কে ভয় যেই না-করা যায় অমনি দুঃখবীণার সুর বাঁধা সাঙ্গ হয়। গোড়ায় ঐ সুর-বাঁধবার সময়টাই হচ্ছে বড়ো কর্কশ, কেননা, তখনো যে দ্বন্দ্ব ঘোচে নি। এই অভিজ্ঞতার সাহায্যে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের

অবস্থা কল্পনা করতে পারি। বোধ হয়, প্রথম অবস্থায় ভয়ে ভরসায় যতক্ষণ টানাটানি চলতে থাকে ততক্ষণ ভারি কষ্ট। যতক্ষণ ভীষণকেই একমাত্র করে দেখি নে, যতক্ষণ তাকে অতিক্রম করেও জীবনের চিরপরিচিত ক্ষেত্রটা দেখা যায়, ততক্ষণ সেই দ্বন্দ্বের টানে ভয় কিছুতেই ছাড়তে চায় না। অবশেষে তাপের তীব্রতা বাড়তে বাড়তে রুদ্র যখন অদ্বিতীয় হয়ে দেখা দেন, প্রলয়ের গর্জন তখন সংগীত হয়ে ওঠে; তখন তার সঙ্গে নির্বিচারে সম্পূর্ণভাবে যোগ দেবার নিরতিশয় আগ্রহে মরিয়া করে তোলে। মৃত্যুকে তখন সত্য বলে জেনে গ্রহণ করি: তার একটা পূর্ণাত্মক রূপ দেখতে পাই বলে তার শূন্যাত্মকতার ভয় চলে যায়।

কয়দিন রুদ্ধকক্ষে সংকীর্ণ শয্যায় পড়ে পড়ে মৃত্যুকে খুব কাছে দেখতে পেয়েছিলাম, মনে হয়েছিল প্রাণকে বহন করবার যোগ্য শক্তি আমার শেষ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় প্রথম ইচ্ছার ধাক্কাটা ছিল দেশের আকাশে প্রাণটাকে মুক্ত করে দেওয়া। ক্রমে সেই ইচ্ছার বন্ধন শিথিল হয়ে এল। তখন মৃত্যুর পূর্বেই ঘরের বাইরে নিয়ে যাবার যে-প্রথা আমাদের দেশে আছে, তার অর্থটা মনে জেগে উঠল। ঘরের ভিতরকার সমস্ত অভ্যস্ত জিনিস হচ্ছে প্রাণের বন্ধনজাল। তারা সকলে মিলে মৃত্যুকে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করতে থাকে। জীবনের শেষ ক্ষণে মনের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের কোলাহল যদি জেগে ওঠে তবে তাতেই বেসুর কর্কশ হয়; মৃত্যুর সম্পূর্ণ সংগীত শুনতে পাই নে, মৃত্যুকে সত্য বলে স্বীকার করে নেবার আনন্দ চলে যায়।

বহুকাল হল আমি যখন প্রথম কাশীতে গিয়েছিলাম তখন মৃত্যুকালের যে-একটি মনোহর দৃশ্য চোখে পড়েছিল, তা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। ঠিক মনে নেই, বোধ করি তখন শরৎকাল; নির্মল আকাশ থেকে প্রভাতসূর্য জীবধাত্রী বসুন্ধরাকে আলোকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে। এপারের লোকালয়ের বিচিত্র চাঞ্চল্য, ওপারের প্রান্তরের সুদূরবিস্তীর্ণ নিস্তব্ধতা, মাঝখানে জলধারা—সমস্তকে দেবতার পরশমণি ছোঁয়ানো হল। নদীর ঠিক মাঝখানে দেখি একটি ডিঙি নৌকা খরস্রোতে ছুটে চলেছে। আকাশের দিকে মুখ করে মুমূর্ষু স্তব্ধ হয়ে শুয়ে আছে, তারই মাথার কাছে করতাল বাজিয়ে উচ্চস্বরে কীর্তন চলছে। নিখিল বিশ্বের বক্ষের মাঝে মৃত্যুর যে-পরম আহ্বান, আমার কাছে তারই সুগম্ভীর সুরে আকাশ পূর্ণ হয়ে উঠল। যেখানে তার আসন সেখানে তার শান্তরূপ দেখতে পেলে মৃত্যু যে কত সুন্দর, তা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়। ঘরের মধ্যে সমস্তই তাকে উচ্চৈঃস্বরে অস্বীকার করে; সেইজন্য সেখানকার খাটপালঙ সিন্দুক চৌকি দেওয়াল কড়ি বরগা, সেখানকার প্রাত্যহিক ক্ষুধা তৃষ্ণা কর্ম ও বিশ্রামের ছোটোখাটো সমস্ত দাবিতে মুখর চঞ্চল ঘরকরনার ব্যস্ততার মাঝখানে সমস্ত ভিড় ঠেলে, সমস্ত আপত্তি অতিক্রম করে, মৃত্যু যখন চিরন্তনের লিপি হাতে নিয়ে প্রবেশ করে তখন তাকে দস্যু বলে ভ্রম হয়; তখন তার হাতে মানুষ আত্মসমর্পণ করবার আনন্দ পায় না। মৃত্যু বাঁধন ছিন্ন করে দেবে, এইটেই কুৎসিত। আপনি বাঁধন আলগা করে দিয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে তার হাত ধরব, এইটেই সুন্দর।

হিন্দু কাশীকে পৃথিবীর বাহিরের স্থান বলেই বিশ্বাস করে। তার কাছে কাশীর ভৌগোলিক সীমানা একটা মায়া, পরমার্থত সেখানে নিখিল বিশ্বের পরিচয়, সেখানে বিশ্বেশ্বরের আসন। অতএব, বিশেষ দেশবাসীর কাছে বিশেষ দেশের যে আকর্ষণবেগ তার প্রাণকে সেখানকার মাটি জল আকাশের সঙ্গে নানা বিশেষ সূত্রে বাঁধে, কাশীর মধ্যে যেন পৃথিবীর সেই বিশেষ দেশগত বন্ধনও নেই। অতএব, যথার্থ হিন্দুর কানে মৃত্যুর মুক্তিবাণী কাশীতে বিশুদ্ধ সুরে প্রবেশ করে।

বর্তমান যুগে ন্যাশনাল বৈষয়িকতা বিশ্বব্যাপী হয়ে স্বদেশগত অহমিকাকে সুতীব্রভাবে প্রবল করে তুলেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই সংঘ-আশ্রিত অতি প্রকাণ্ডকায় রিপুই বর্তমান যুগের সমস্ত দুঃখ ও বন্ধনের কারণ। তাই, সেদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার মনে হল, আমিও যেন মুক্তির তীর্থক্ষেত্রে মরতে পারি; শেষ মুহূর্তে যেন বলতে পারি, সকল দেশই আমার এক দেশ, সর্বত্রই এক বিশ্বেশ্বরের মন্দির, সকল দেশের মধ্য দিয়েই এক মানবপ্রাণের পবিত্র জাহ্নবীধারা এক মহা-সমুদ্রের অভিমুখে নিত্যকাল প্রবাহিত।

ক্লাকোভিয়া স্টিমার
১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

পূর্বেই বলেছি, নন্দিনী তার নাম, তিন বছর তার বয়স, সে তৃতীয়ার চাঁদটুকুর মতো। আধুনিক নবেল পড়বার সময় তার এখনো হয় নি। ঘুম-পাড়াবার আগে তাকে গল্প শোনাবার লোক চাই। তাই, যে-আমি এতকাল জনসাধারণকে ঘুম পাড়াবার বায়না নিয়েছিলুম, দায়ে পড়ে সেই-আমার পদবৃদ্ধি হল। আজকাল এই ক্ষুদ্র মহারানীর শয্যাপার্শ্বে আমার তলব হচ্ছে।

কাল রাত্রে আহার সেরে জাহাজের কামরায় এসে বসেছি। হুকুম হল, 'দাদামশায়, বাঘের গল্প বলো।' আমি কবি ভবভূতির মতো বিনয় করে বললুম, 'আমার সমযোগ্য লোক হয়তো জাহাজে এক-আধজন মিলতেও পারে, কারণ, যাত্রী অনেক এবং বিপুলা চ তরণী।' কিন্তু, নিষ্কৃতি পেলুম না। তখন শুরু করে দিলুম—

এক যে ছিল বাঘ,
তার সর্ব অঙ্গে দাগ।
আয়নাতে তাই হঠাৎ দেখে
হল বিষম রাগ।
ঝগড়ুকে সেই বললে ডেকে,
'এখ্‌খুনি তুই ভাগ,
যা চলে তুই প্রাগ্,
সাবান যদি না মেলে তো
যাস হাজারিবাগ।'

বীণাপাণির কৃপা এইখানে এসে থেমে গেল, ছড়া আর এগোল না। তখন ছন্দের বেড়া ডিঙিয়ে গদ্যের মধ্যে নেমে পড়লুম। পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পারছেন গল্পের মূল ধারাটা হচ্ছে, বাঘের সর্বাঙ্গীণ কলঙ্কমোচনের জন্যে সাবান-অন্বেষণের দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে ঝগড়ু-নামধারী বেহারার যাত্রা।

কথা উঠবে, ঝগড়ুর তাগিদটা কিসের। দয়ারও নয়, মৈত্রীরও নয়, ভয়ের তাগিদ। বাঘ শাসিয়েছিল, সাবান না আনতে পারলে তার কান ছিঁড়ে নেবে। এতে বাস্তববিলাসীরা আশ্বস্ত হবেন, বুঝবেন, তা হলে গল্পটা নেহাত আজগুবি নয়।

প্রথমে দেখাতে হল, পাথেয় এবং সাবানের মূল্যের জন্যে কী অসম্ভব উপায়ে ঝগড়ু একেবারে পাঁচ তিন নয় সাত দশ পয়সা সংগ্রহ করলে। টেঁকে গুঁজে গোরুর গাড়ি করে সে বৃহস্পতিবারের বারবেলায় চেকোস্লোভাকিয়ায় রওনা হল। বোলপুরের কাছে ধোবাপাড়ার রাস্তায় আসতেই খামকা একটা ব্রাউনরঙের গাধা সাদারঙের গোরুটার গা চেটে দিলে। বর্ণভেদে শ্রদ্ধাবান গোরুটা জাতিচ্যুতির ক্ষোভে গাড়িটা উল্টিয়ে দিয়ে বন্ধনমুক্তভাবে চার পা তুলে সংসার ত্যাগ করে যাওয়াতে, সেই অপঘাতে ঝগড়ুর পা ভেঙে তাকে রাস্তায় পড়ে থাকতে হল। বেলা বয়ে যায়, দূর থেকে ক্ষণে-ক্ষণে বাঘের ডাকও শোনা যাচ্ছে। এখন হতভাগার কান বাঁচে কী করে। এমন সময় ঝুড়িকাঁখে জোড়াসাঁকোর মোক্ষদা চলেছে হাটে লাউশাক কিনতে। ঝগড়ু বললে, 'মোক্ষদা, ও মোক্ষদা, তোমার ঝুড়িতে করে আমাকে ইস্টিশনে পৌঁছিয়ে দাও।' মোক্ষদা যদি তখনই দয়া করে সহজে রাজি হত, তা হলে বাস্তবওয়ালার মতে সেটা বিশ্বাসযোগ্য হত না। তাই দেখাতে হল, ঝগড়ু যখন টেঁকের থেকে দু-পয়সা নগদ দেবে কবুল করলে তখনই মোক্ষদা তাকে ঝুড়িতে তুলে নিলে। আশা করেছিলুম, গল্পের এই সন্ধিস্থলে এসে পৌঁছোবার পূর্বেই শ্রোত্রীর ঘুম আসবে। তার পরে, কাল আবার যদি আমাকে ধরে তা হলে উপসংহারে দেখাতে হবে, ভালোমানুষ ঝগড়ুর কানের তো

কোনো অপচয় হলই না, বরঞ্চ পূর্বের চেয়ে এই প্রত্যঙ্গটা দীর্ঘতর হয়ে উঠে কানের বানানে দন্ত্য 'ন'কে মাত্রাছাড়া মূর্ধন্য 'ণ'য়ে খাড়া করে তোলবার পক্ষে সাক্ষ্য দিলে। কেবল কাটা গেল ঐ দুষ্ট বাঘের লেজটা। সংসারে ধর্মের পুরস্কার ও অধর্মের তিরস্কার-মূলক উপদেশের সাহায্যে কলুষিত বঙ্গসাহিত্যে স্বাস্থ্যকর হাওয়া বইয়ে দেবার ইচ্ছাটাও আমার মনে ছিল।

কিন্তু, গল্পের গোড়ায় নন্দিনীর চোখে যে-একটু ঘুমের আবেশ ছিল সেটা কেটে গিয়ে তার দৃষ্টি শরৎকালের আকাশের মতো জ্বল্‌জ্বল্‌ করতে লাগল। ভয়ে হোক, ভক্তিতে হোক, বাঘ যদি বা ঝগড়ুর কানটা ছেড়ে দিতে রাজি হয়, নন্দিনী গল্পটাকে ছাড়তে কিছুতেই রাজি হল না। অবশেষে দুই-চার জন আত্মীয়স্বজনের মধ্যস্থতায় কাল রাত্রির মতো ছুটি পেয়েছি।

আর্টিস্ট বললেন, গল্পের প্রবাহে নানারকম ভেসে-আসা ছবি ওর মনকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে রাখছিল। তা হলেই তর্ক ওঠে, ছবির এমন কী গুণ আছে যাতে ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখে। কোনো দৃশ্য যখন বিশেষ করে আমাদের চোখ ভোলায় তখন কেন আমরা বলি, যেন ছবিটি।

মুখ্যত ছবির গুণ হচ্ছে দৃশ্যতা। তাকে আহার করা নয়, ব্যবহার করা নয়, তাকে দেখা ছাড়া আর কোনো লক্ষ্যই নেই। তা হলেই বলতে হবে, যাকে আমরা পুরোপুরি দেখতে পাই তাকে আমাদের ভালো লাগে। যাকে উদাসীনভাবে দেখি তাকে পুরো দেখি নে; যাকে প্রয়োজনের প্রসঙ্গে দেখি তাকেও না; যাকে দেখার জন্যেই দেখি তাকেই দেখতে পাই। বোলপুরের রাস্তায় গোরু, গাধা, গাড়ি উল্টে ঝগড়ুর পা-ভাঙা প্রভৃতি দৃশ্যের দাম কিসেরই বা। চলতি ভাষায় যাকে মনোহর বলে এ তো তা নয়। কিন্তু, গল্পের বেগে তারা মনের সামনে এসে হাজির হচ্ছিল; শিশুর মন তাদের প্রত্যেককেই স্বীকার করে নিয়ে বললে, 'হাঁ, এরা আছে।' এই বলে স্বহস্তে এদের কপালে অস্তিত্বগৌরবের টিকা পরিয়ে দিলে। এই দৃশ্যগুলি গল্প-বলার বেষ্টনীর মধ্যে একটি বিশেষ ঐক্য লাভ করেছিল। বিশ্বের ছাড়া-ছাড়া সমস্ত ছড়ানো তথ্যের অস্পষ্টতা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে তারা সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই জোরে তারা কেবলই দাবি করতে লাগল, 'আমাকে দেখো!' সুতরাং, নন্দিনীর চোখের ঘুম আর টিঁকল না।

কবি বল, চিত্রী বল, আপনার রচনার মধ্যে সে কী চায়। সে বিশেষকে চায়। বাতাসে যে-অঙ্গারবাষ্প সাধারণভাবে আছে গাছ তাকে আত্মসাৎ করে আপন ডালে-পালায় ফলে ফুলে আপন ছন্দে রঙে অত্যন্ত বিশেষ করে যখন তোলে, তখনই তাতে সৃষ্টিলীলা প্রকাশ পায়। নীহারিকায় জ্যোতির্বাষ্প একটা একাকার ব্যাপার, নক্ষত্র-আকারে বিশেষত্ব লাভ করায় তার সার্থকতা। মানুষের সৃষ্টিচেষ্টাও সেইরকম অনির্দিষ্ট সাধারণ থেকে সুনির্দিষ্ট বিশেষকে জাগাবার চেষ্টা। আমাদের মনের মধ্যে নানা হৃদয়াবেগ ঘুরে বেড়ায়। ছন্দে সুরে কথায় যখন সে বিশেষ হয়ে ওঠে তখন সে হয় কাব্য, সে হয় গান। হৃদয়াবেগকে প্রকাশ করা হল বলেই-যে আনন্দ তা নয়। তাকে বিশিষ্টতা দেওয়া হল বলেই আনন্দ। সেই বিশিষ্টতার উৎকর্ষেই তার উৎকর্ষ। মানুষের যে-কোনো রচনা সেই উৎকর্ষ পেয়েছে তাকেই আর্ট-সৃষ্টিরূপে দেখি; সেই একান্ত দেখাতেই আনন্দ।

ইংরেজি ভাষায় ক্যারেক্‌টার শব্দের একটা অর্থ, স্বভাব, নৈতিক চরিত্র; আর-একটা অর্থ, চরিত্র-রূপ। অর্থাৎ, এমন কতকগুলি গুণের এমন সমাবেশ যাতে এই সমাবেশটি বিশেষভাবে লক্ষ্যগোচর হয়। পূর্বেই বলেছি, এইরকম বিশেষ গোচরতাই আর্টের ধর্ম। নাট্যে কাব্যে চিত্রে নৈতিক সদ্‌গুণের চেয়ে এই ক্যারেক্‌টারের মূল্য বেশি।

সৃষ্টির দিকে বিশেষত্ব এই তো আছে ক্যারেক্‌টার, সৃষ্টিকর্তার দিকে বিশেষত্ব প্রতিভায়। সেটা হচ্ছে দৃষ্টির বিশেষত্ব, অনুভূতির বিশেষত্ব, রচনার বিশেষত্ব নিয়ে। ভক্ত সমুদ্র-পর্বত-অরণ্যে সৃষ্টি-কর্তার একটি স্বরূপ দেখতে পান, তাতেই সে-দৃশ্যগুলি বিশেষভাবে তাঁর অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। রূপকারের রচনাতেও তেমনি করেই স্রষ্টাব্যক্তিটি আপন প্রতিভার স্বরূপ দিয়ে আপন সৃষ্টির রূপটিকে দ্রষ্টাব্যক্তিটির কাছে সুনির্দিষ্ট করে দেয়। তাতে যে-আনন্দ পাই সে সৌন্দর্যের বা স্বার্থ-বুদ্ধির বা শুভবুদ্ধির আনন্দ নয়, বিশেষকে ব্যক্ত দেখার আনন্দ। আমার ভিতরকার ব্যক্তি সেই

পরিব্যক্তিতে নিজেরই বিস্তার দেখে। বস্তুতত্ত্ব (physics) সমস্ত বস্তুর মধ্যে সাধারণ, সেটা হল বিজ্ঞানের; আর, চেহারা পদার্থটা বিশেষের, সেটা হল আর্টের। বিশেষের বেড়া ভাঙতে ভাঙতে বিজ্ঞান যখন ব্যাপককে পায় তখন তার সার্থকতা; আর, ব্যাপকের পর্দাটা তুলে ধরে আর্ট যখন বিশেষকে পায় তখন সে হয় খুশি।

সুন্দর সেই বিশেষের কোঠায় এসে পড়ে তো ভালো, নইলে সুন্দর বলেই তার গুমোর নেই। আর্টের এলেকায় সাহেবপাড়ার সরকারি বাগানের স্থান নেই, আছে চিৎপুর রোডের। সরকারি বাগানের অনেক সদ্‌গুণ আছে, তাকে সুন্দর বললে লক্ষণে মেলে; সে-বাগানে সাধারণ উপকার আছে, কিন্তু বিশেষ স্বাদ নেই। চিৎপুর রোডের স্বাদ আছে, উপকার নেই বললেই হয়। কলকাতার ইর্ডেন-গার্ডেন ফোটোগ্রাফের অন্ত্যজ পঙ্‌ক্তিতে স্থান পেতে পারে, কিন্তু চিৎপুর রোডের পঙ্‌ক্তি আর্টের অভিজাতবর্গের কোঠায়। কুলীনের মেয়ের মতোই চিৎপুর রোড আর্টিস্টের তুলিতে আপন পর্যায় পাবার জন্যে আজ পর্যন্ত অপেক্ষা করে আছে। কোনো কালে না-ও যদি পায় তবু তার কৌলীন্য ঘুচবে না!

হেডমাস্টার তাঁর ইস্কুলের সব চেয়ে শিষ্টশান্ত অধ্যয়নরত ভালো ছেলেটির প্রতি তর্জনী নির্দেশ করে তাকে আমাদের দৃষ্টান্তগোচর করে রাখবার চেষ্টা করেন। কিন্তু, তর্জনীর জোরেও আমরা তাকে স্পষ্ট দেখতে পাই নে। যাকে খুবই দেখতে পাওয়া যায় সে হেডমাস্টারের আদর্শ ছেলে নয়, ছাত্রবৃত্তি তার কপালে প্রায়ই জোটে না। সেটা ডানপিটে ইস্কুলপালানো ছেলে, আপন প্রাণপূর্ণ বিশেষত্ব দ্বারা সে খুবই স্বপ্রকাশ। ব্যবহারের দিক থেকে তাকে অবজ্ঞা করা চলে, কিন্তু প্রয়োজন-নিরপেক্ষ প্রকাশের দিক থেকে সে-ছেলে সেরা ছেলে। সে হেডমাস্টারের বর্জনীয়, কিন্তু আর্টিস্ট-বিধাতার বরণীয়। চরিত্রনীতিবিলাসী ঐতিহাসিক তাঁর মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে ধর্মরাজ নাম দিয়ে সদ্‌গুণের উচ্চ পীঠের উপর দাঁড় করিয়ে সর্বদা আমাদের চোখের উপর ধরে রেখেছেন, কিন্তু তবু যুধিষ্ঠির স্পষ্ট করে চোখে পড়েন না; আর চরিত্রচিত্রবিলাসী কবি তাঁর ভীমসেনকে নানা অবিবেচনা ও অসংযমের অপবাদে লাঞ্ছিত করেও আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। যারা সত্য কথা বলতে ভয় করে না তারা স্বীকার করবেই যে, সর্বগুণের যুধিষ্ঠিরকে ফেলে দোষগুণে-জড়িত ভীমসেনকেই তারা ভালোবাসে। তার একমাত্র কারণ, ভীমসেন সুস্পষ্ট। শেক্‌স্‌পিয়রের ফল্‌স্‌টাফ্‌ও স্বাস্থ্যকর দৃষ্টান্ত বলে সমাজে আদরণীয় নয়, স্পষ্ট প্রত্যক্ষ বলেই সাহিত্যে আদরণীয়। রামচন্দ্রের ভক্তদের আমি ভয় করি; তাই খুব চুপিচুপি বলছি, সাহিত্যে রামের চেয়ে লক্ষ্মণ বড়ো। বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি নিশ্চয়ই মানবেন যে, রামকে তিনি ভালো বলেন, কিন্তু লক্ষ্মণকে তিনি ভালোবাসেন।

আমরা হাজার প্রমাণ দেখাতে পারি যে, আর্টে আমরা গুণবানকে চাই নে, রূপবানকে চাই। এখানে রূপবান বলতে সুন্দরকে বলছি নে। রূপের স্পষ্টতায় যে সুপ্রত্যক্ষ সেই রূপবান। শ্রীমন্ত সদাগরের চেয়ে রূপবান ভাঁড়ুদত্ত; বিষবৃক্ষে অনেক নামজাদা নায়কনায়িকা আছেন, অনেক সাধু লেখক তাঁদের চরিত্র বিচার করেছেন, তার উপরে আমি আর কিছু বলতে চাই নে, কেবল এইটুকু বলে রাখি, বিষবৃক্ষে হীরা রূপবান। হীরা আমাদের ঘুমোতে দেয় না, সে সুন্দর বলে নয়, গুণবান বলে নয়, রূপবান বলে; সাধারণ অস্পষ্টতার মাঝখানে সে বিশেষ বলে সুপ্রত্যক্ষ বলে।

এ কথা মানতে হবে, চলতি ভাষায় যাকে সুন্দর বলে তাকে নিয়ে কবি কিংবা রূপকার আপনাদের রচনায় খুব ব্যবহার করে থাকেন। তার প্রধান কারণ, সৌন্দর্য হচ্ছে একটা বিশিষ্টতা। জীবনের পথে চলতে চলতে অগণ্য বস্তুর ভিড়কে আমরা পাশ কাটিয়েই যাই। সুন্দর হঠাৎ বলে ওঠে, 'চেয়ে দেখো।' প্রতিদিন হাজার হাজার জিনিসকে যা না বলি তাকে তাই বলি; বলি, 'তুমি আছ।' ঐটেই হল আসল কথা। সে-যে নিশ্চিত আছে, এই বার্তাটাই তার সৌন্দর্য আমার কাছে উপস্থিত করলে। সে-যে সৎ, এইটে একান্ত উপলব্ধি করতে পারলুম বলেই সে এত আনন্দ দিলে। শিশুর কাছে তার খেলার জিনিস মহার্ঘ্য বলেই দামি নয়, সুন্দর বলেই প্রিয় নয়। আপন

কল্পনাশক্তি দিয়ে তাকে স্পষ্ট উপলব্ধি করে বলেই ছেঁড়া নেকড়ায় তৈরি হলেও সে তার কাছে সত্য, এবং সত্য বলেই আনন্দময়; কারণ, সত্যের রসই হচ্ছে আনন্দ।

এক রকমের গায়ে-পড়া সৌন্দর্য আছে যা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সঙ্গে যোগ দিয়ে অতিলালিত্যগুণে সহজে আমাদের মন ভোলায়। চোর যেমন দ্বারীকে ঘুষ দিয়ে চুরি করতে ঘরে ঢোকে। সেইজন্যে যে-আর্ট আভিজাত্যের গৌরব করে সে-আর্ট এই সৌন্দর্যকে আমল দিতেই চায় না। একজাতের বাইজিমহলে চলতি খেলো সংগীত তার হালকা চালের সুরতালের উত্তেজনায় সাধারণ লোকের মনে নেশা ধরিয়ে দেয়। বড়ো ওস্তাদেরা এই নেশাধরানো কানভোলানো ফাঁকিকে অত্যন্ত অবজ্ঞা করেন। তাতে তাঁরা সাধারণ লোকের সস্তা বকশিশ থেকে বঞ্চিত হওয়াকেই পুরস্কার বলে মেনে নেন। তাঁরা যে বিশিষ্টতাকে আর্টের সম্পদ বলে জানেন সে-বিশিষ্টতা প্রলোভননিরপেক্ষ উৎকর্ষ। তাকে দেখাতে গেলে যেমন সাধনা, তাকে পেতে গেলেও তেমনি সাধনা চাই। এইজন্যেই তার মূল্য। নিরলংকার হতে তার ভয় নেই। সরলতার অভাবকে, আড়ম্বরকে সে ইতর বলে ঘৃণা করে। সুললিত বলে নিজের পরিচয় দিতে সে লজ্জা বোধ করে, সুসংগত বলেই তার গৌরব।

গীতায় আছে, কর্মের বিশুদ্ধ মুক্তরূপ হচ্ছে তার নিষ্কামরূপ। অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা নয়, বৈরাগ্যের দ্বারাই কর্মের বন্ধন চলে যায়। তেমনি ভোগেরও বিশুদ্ধরূপ আছে, সেই রূপটি পেতে গেলে বৈরাগ্য চাই। বলতে হয়, 'মা গৃধঃ', লোভ কোরো না। সৌন্দর্যভোগ মনকে জাগাবে, এইটেই তার স্বধর্ম; তা না করে মনকে যখন সে ভোলাতে বসে তখন সে আপনার জাত খোয়ায়, তখন সে হয়ে যায় নীচ। উচ্চ-অঙ্গের আর্ট এই নীচতা থেকে বহু যত্নে আপনাকে বাঁচাতে চায়। লোভীর ভিড় তাড়াবার জন্যে সে অনেক সময়ে কঠোরকে দ্বারের কাছে বসিয়ে রাখে, এমন-কি, অনেক সময় কিছু বিশ্রী, কিছু বেসুর তার রচনার সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। কেননা, তার সাহস আছে। সে জানে, যে-বিশিষ্টতা আর্টের প্রাণ তার সঙ্গে গায়ে পড়ে মিষ্টি মিশোল করবার কোনো দরকার নেই। উমার হৃদয় পাবার জন্যে শিবকে কন্দর্প সাজতে হয় নি।

বিশেষকে দেখবার আর-একটা কৌশল আছে, সে হচ্ছে নূতনত্ব। অতিপরিচয়ের আবরণে বিশেষ ঢাকা পড়ে, এইজন্যে অনভ্যস্তকেই বিশেষ বলে খাড়া করবার দিকে দুর্বল আর্টিস্টের প্রলোভন আসতে পারে। এই প্রলোভন আর্টিস্টের তপোভঙ্গের কারণ। অতিপরিচয়ের ম্লানতার মধ্যেই চির-বিশেষের উজ্জ্বলরূপ দেখাতে পারে যে-গুণী সেই তো গুণী। যেখানটা সর্বদা আমাদের চোখে পড়ে অথচ দেখতে পাই নে, সেইখানেই দেখবার জিনিসকে দেখানো হচ্ছে আর্টিস্টের কাজ। সেইজন্যেই তো বড়ো বড়ো আর্টিস্টের রচনার বিষয় চিরকালের জিনিস। আর্ট পুরাতনকে বারে বারে নূতন করে। বিশেষকে সে দেখতে পায় হাতের কাছে, ঘরের কাছে। সৃষ্টি তো খনির জিনিস নয় যে খুঁড়তে খুঁড়তে তার পুঁজি ফুরিয়ে যাবে। সে-যে ঝরনা; তার প্রাচীন ধারা যে চিরদিনই নবীন হয়ে বইছে, এইটে প্রমাণ করবার জন্যে তাকে কোনো অদ্ভুত ভঙ্গী করতে হয় না। অশোকের মঞ্জরীর কালিদাসের আমলেও যে-রঙে বসন্তের শ্যামল বক্ষ রাঙিয়ে দিয়েছে আজও নূতনত্বের ভান করে সেই রঙ বদল করবার তার দরকার হয় নি। নির্ভয়ে সে বর্ষে বর্ষে পুরাতনের বাসরঘরেই নবীনের ঘোমটা খুলে দিচ্ছে। বারে বারেই চোখের উপর থেকে জড়তার মোহ কেটে যাচ্ছে, আর চিরবিশেষকে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু, ইঁটের ঢেলার চেয়ে অশোকমঞ্জরীকেই বিশেষ করে দেখি কেন, এইটেই দাঁড়ায় প্রশ্ন। এর উত্তর এই যে, আপন অংশ-প্রত্যংশের সমাবেশ নিয়ে অশোক আপনার মধ্যে একটি সুসংগত বিশেষ ঐক্যকে প্রকাশ করে বলেই তার মধ্যে আমাদের মন একটি পুরো দেখাকে দেখে। ইঁটের ঢেলায় আমাদের কাছে সত্তার সেই চরমতা নেই। একটা স্টিম ইঞ্জিনের মধ্যে প্রয়োজনঘটিত সুষমার ঐক্য আছে। কিন্তু, সেই ঐক্য প্রয়োজনেরই অনুগত। সে নিজেকেই চরম বলে প্রকাশ করে না, আর-কিছুকে প্রকাশ করে। সেই ইঞ্জিনের মধ্যে ব্যবহারের আনন্দ, তার মধ্যে কৌতূহলের বিষয় থাকতে পারে। কিন্তু তাতে বিশুদ্ধ দেখার অহৈতুক বিষয় নেই।

সত্তাকে সকলের চেয়ে অব্যবহিত করে অনুভব করি নিজের মধ্যে। আমার মধ্যে একটি এক

নিয়ত বলছে 'আছি'। গানের মধ্যে, ছবির মধ্যে, এক যদি তেমনি জোরে বলে উঠতে পারে 'এ-যে আমি', তা হলেই তাতে-আমাতে মিলনের সুর পূর্ণ হয়ে বাজল। একেই বলে শুভদৃষ্টি; ঐক্যের উপলব্ধিতে দেখবার বিষয় চোখে-পড়া।

আর্টিস্ট প্রশ্ন করছে, আর্টের সাধনা কী। আমি বলি 'দেখো', তবেই দেখাতে পারবে। সত্তার প্রবাহিণী ঝরে পড়ছে; তারই স্রোতের জলে মনের অভিষেক হোক; ছোটো-বড়ো সুন্দর-অসুন্দর সব নিয়ে তার নৃত্য। সেই প্রকাশধারার বেগ চিত্তকে স্পর্শ করলে চিত্তের মধ্যেও প্রকাশের বেগ প্রবল হয়ে ওঠে। সৃষ্টির লীলা চার দিকেই আছে, এই সহজ সত্যটি যদি আর্টিস্ট আজও আবিষ্কার করতে না পেরে থাকে, পুরাণকাহিনীর পুঁথির মধ্যে, প্রাচীন রাজপুতানার পটের মধ্যে, যদি সে দেখার জিনিস খুঁজে বেড়ায় তা হলে বুঝব, কলাসরস্বতীর পদ্মাসন তার মনের মধ্যে বিকশিত হয় নি। তাই সে সেকেন্ড-হ্যান্ড আসবাবের দোকানে নির্জীব কাঠের চৌকি খুঁজতে বেরিয়েছে।

পরিশিষ্ট

মানুষ যে মানুষের পক্ষে কত সুদূরের জীব তা য়ুরোপে আমেরিকায় গেলে বুঝতে পারা যায়। সেখানকার সমাজ হচ্ছে দ্বীপশ্রেণী—ছোটো এক এক দল জ্ঞাতির চারি দিকে বৃহৎ অজ্ঞাতির লবণসমুদ্র; পরস্পরসংলগ্ন মহাদেশের মতো নয়। জ্ঞাতি শব্দটা তার ধাতুগত বিশেষ অর্থে আমি ব্যবহার করছি; অর্থাৎ, যে-কয়জনের মধ্যে জানাশোনা আছে, আনাগোনা চলে; আমাদের দেশে পরস্পর আনাগোনার জন্য জানাশোনার দরকার হয় না। আমরা তো খোলা জায়গায় রাস্তার চৌমাথায় বাস করি। একে আমাদের আয়ু কম, তার উপরে অবাধ সামাজিকতায় পরস্পরের সময় নষ্ট ও কাজ নষ্ট করতে আমাদের সংকোচমাত্র নেই।

আবার অন্যপক্ষে, ভোগের আদর্শ যেখানে অত্যন্ত বেশি ব্যয়সাধ্য, সুতরাং যেখানে সময়-জিনিসটাকে মানুষ টাকার দরে যাচাই করতে বাধ্য, সেখানে মানুষে মানুষে মিল কেবলই বাধাগ্রস্ত হবেই, আর সেই মিল যতই প্রতিহত ও অনভ্যস্ত হতে থাকবে ততই মানুষের সর্বনাশের দিন ঘনিয়ে আসবেই। একদিন দেখা যাবে, মানুষ বিস্তর জিনিস সংগ্রহ করেছে, বিস্তর বই লিখেছে, বিস্তর দেয়াল গেঁথে তুলেছে, কেবল নিজে গেছে হারিয়ে। মানুষ আর মানুষের কীর্তির মধ্যে সামঞ্জস্য ভেঙে গিয়েছে বলেই আজ মানুষ খুব সমারোহ করে আপন গোরস্থান তৈরি করতে বসেছে।

২৬ সেপ্টেম্বর

একজন আধুনিক জাপানি রূপদক্ষের রচিত একটি ছবি আমার কাছে আছে। সেটি যতবার দেখি আমার গভীর বিস্ময় লাগে। দিগন্তে রক্তবর্ণ সূর্য—শীতের বরফচাপা শাসন সবে-মাত্র ভেঙে গেছে, প্লাম গাছের পত্রহীন শাখাগুলি জয়ধ্বনির বাহুভঙ্গির মতো সূর্যের দিকে প্রসারিত, সাদা সাদা ফুলের মঞ্জরীতে গাছ ভরা। সেই প্লাম গাছের তলায় একটি অন্ধ দাঁড়িয়ে তার আলোকপিপাসু দুই চক্ষু সূর্যের দিকে তুলে প্রার্থনা করছে।

আমাদের ঋষি প্রার্থনা করেছেন : তমসো মা জ্যোতির্গময়, অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও। চৈতন্যের পরিপূর্ণতাকে তাঁরা জ্যোতি বলেছেন। তাঁদের ধ্যানমন্ত্রে সূর্যকে তাঁরা বলেছেন : ধিয়োয়োনং প্রচোদয়াৎ, আমাদের চিত্তে ধীশক্তির ধারাগুলি প্রেরণ করছেন।

ঈশোপনিষদে বলেছেন, হে পূষন্, তোমার ঢাকা খুলে ফেলো, সত্যের মুখ দেখি; আমার মধ্যে যিনি সেই পুরুষ তোমার মধ্যে।

এই বাদলার অন্ধকারে আজ আমার মধ্যে যে ছায়াচ্ছন্ন বিষাদ সে ঐ ব্যাকুলতারই একটি রূপ। সেও বলছে, হে পূষন্, তোমার ঐ ঢাকা খুলে ফেলো, তোমার জ্যোতির মধ্যে আমার আত্মাকে উজ্জ্বল দেখি। অবসাদ দূর হোক। আমার চিত্তের বাঁশিতে তোমার আলোকের নিশ্বাস পূর্ণ করো—সমস্ত আকাশ আনন্দের গানে জাগ্রত হয়ে উঠুক। আমার প্রাণ-যে তোমার আলোকেরই একটি প্রকাশ, আমার দেহও তাই। আমার চিত্তকে তোমার জ্যোতিরঙ্গুলি যখনই স্পর্শ করে তখনই তো ভূর্ভুবস্বঃ দীপ্যমান হয়ে ওঠে। মেঘে মেঘে তোমার যেমন নানা রঙ আমার ভাবনায় ভাবনায় তোমার তেজ তেমনি সুখদুঃখের কত রঙ লাগিয়ে দিচ্ছে। একই জ্যোতি বাইরের পুষ্পপল্লবের বর্ণে গন্ধে এবং অন্তরের রাগে অনুরাগে বিচিত্র হয়ে ঠিকরে পড়ছে। প্রভাতে সন্ধ্যায় তোমার গান দিকে দিগন্তে বেজে ওঠে; তেমনি তোমারই গান আমার কবির চিত্ত গলিয়ে দিয়ে ভাষার স্রোতে ছন্দের নাচে বয়ে চলল। এক জ্যোতির এত রঙ, এত রূপ, এত ভাব, এত রস! অন্ধকারের সঙ্গে নিত্য ঘাতে প্রতিঘাতে তার এত নৃত্য, এত গান, তার এত ভাঙা, এত গড়া—তারই সারথ্যে যুগযুগান্তরের এমন রথযাত্রা! তোমার তেজের উৎসের কাছে পৃথিবীর অন্তর্গূঢ় প্রার্থনাই তো

গাছ হয়ে, ঘাস হয়ে আকাশে উঠছে, বলছে, অপাবৃণু— ঢাকা খুলে দাও। এই ঢাকা খোলাই তার প্রাণের লীলা, এই ঢাকা খোলা থেকেই তার ফুল ফল। এই প্রার্থনাই আদিম জীবাণুর মধ্যে দিয়ে আজ মানুষের মধ্যে এসে উপস্থিত। মানুষের প্রাণের ঘাট পেরিয়ে মানুষের চিত্তের ঘাটে পাড়ি দিয়ে চলল। মানুষের ইতিহাস বলছে, অপাবৃণু, ঢাকা খোলো। জীব বলছে, আমার মধ্যে যে-সত্য আছে তার জ্যোতির্ময় পূর্ণস্বরূপ দেখি। হে পূষন্, হে পরিপূর্ণ, তোমার হিরণ্ময় পাত্রের মুখের আবরণ ঘুচুক, তার অন্তরের রহস্য প্রকাশিত হোক— সেই রহস্য আমার মধ্যে তোমার মধ্যে একই।

প্রাণ যখন ক্লান্ত হয় তখন বলি, সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যাক, সৃষ্টির লীলাতরঙ্গে আর উঠতে নামতে পারি নে; পাত্রের ঢাকা কেবল খুলে যাক তা নয় পাত্রটাই যাক ভেঙে, একের বক্ষে বিরাজ না করে একের মধ্যে বিলুপ্ত হই। ভারতবর্ষে এই প্রার্থনা ক্ষণে ক্ষণে শুনতে পাই।

কিন্তু আমি বলি, অপাবৃণু; সত্যের মুখ খুলে দাও— এককে অন্তরে বাহিরে ভালো করে দেখি, তা হলেই অনেককে ভালো করে বুঝতে পারব। গানের মধ্যে আগাগোড়া যে একটি আনন্দময় এক আছে তাকে যতক্ষণ বুঝতে না পারি ততক্ষণ সুরের সঙ্গে সুরের দ্বন্দ্ব আমাকে সুখ দেয় না, আমাকে পীড়া দেয়। তাই বলে আমি বলব না, গান যাক লুপ্ত হয়ে; আমি বলব, পূর্ণ গানটাকে অন্তরে যেন জানি, তা হলেই খণ্ড সুরের দ্বন্দ্বটা বাহিরে আমাকে আর বাজবে না, সেটাকেও অখণ্ড আনন্দের মধ্যে বিধৃত করে দেখব।

২৭ সেপ্টেম্বর

বয়স যখন অল্প ছিল তখন অনেক ঘটনা ঘটেছে যা মনকে খুব নাড়া দিয়েছে। এই ঘটনাগুলোর সত্যের গৌরব যদি যাচাই করতে চাই তবে দেখতে পাব, দুই বড়ো বড়ো সাক্ষী দুই-রকমের বাটখারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে ওজনের মিল নেই। বৈজ্ঞানিক পুরাতাত্ত্বিক যে-প্রমাণকে সব চেয়ে খাঁটি বলে মানে সে হচ্ছে, যাকে বলা যেতে পারে সাধারণ প্রমাণ, সে হচ্ছে নির্বিশেষ। কিন্তু, মানুষ যেহেতু একান্ত বৈজ্ঞানিক নয়, সেইজন্যে মানুষের জগতে যে-সকল ঘটনা ঘটে সেগুলি যদি নিতান্ত তুচ্ছ না হয় তা হলে তাদের ওজন সাধারণ বাটখারার ওজন মানে না। তাদের বেলায় বিজ্ঞানকে হুট্ করে দিয়ে কোথা থেকে একটা অসাধারণ তুলাদণ্ড এসে খাড়া হয়। বৈজ্ঞানিক সেই ওজনটাকে সাধারণ ওজনের সঙ্গে মিল করতে গিয়ে ভারি গোলমাল করতে থাকে। একটা খুব বড়ো দৃষ্টান্ত দেখা যাক, বুদ্ধদেব। যদি তাঁর সময়ে সিনেমাওয়ালা এবং খবরের কাগজের রিপোর্টারের চলন থাকত তা হলে তাঁর খুব একটা সাধারণ ছবি পাওয়া যেত। তাঁর চেহারা, চালচলন, তাঁর মেজাজ, তাঁর ছোটোখাটো ব্যক্তিগত অভ্যাস, তাঁর রোগ তাপ ক্লান্তি ভ্রান্তি সব নিয়ে আমাদের অনেকের সঙ্গে মিল দেখতুম। কিন্তু, বুদ্ধদেব সম্বন্ধে এই সাধারণ প্রমাণটাকেই যদি প্রামাণিক বলে গণ্য করা যায় তা হলে একটা মস্ত ভুল করি। সে ভুল হচ্ছে পরিপ্রেক্ষিতের— ইংরেজিতে যাকে বলে পার্স্পেক্টিভ্। যে-জনতাকে আমরা সর্বসাধারণ বলি, সে কেবল ক্ষণকালের জন্যে মানুষের মনে ছায়া ফেলে মুহূর্তে মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। অথচ, এমন সব মানুষ আছেন যাঁরা শত শত শতাব্দী ধরে মানুষের চিত্তকে অধিকার করে থাকেন। যে-গুণে অধিকার করেন সেই গুণটাকে ক্ষণকালের জাল দিয়ে ধরাই যায় না। ক্ষণকালের জাল দিয়ে যেটা ধরা পড়ে সেই হল সাধারণ মানুষ; তাকে ডাঙায় তুলে মাছ কোটার মতো কুটে বৈজ্ঞানিক যখন তার সাধারণত্ব প্রমাণ করে আনন্দ করতে থাকেন তখন দামি জিনিসের বিশেষ দামটা থেকেই তাঁরা মানুষকে বঞ্চিত করতে চান। সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষ অসামান্য মানুষকে এই বিশেষ দামটা দিয়ে এসেছে! সাধারণ সত্য মত্ত হস্তীর মতো এসে এই বিশেষ সত্যের পদ্মবনটাকে দলন করলে সেটা কি সহ্য করা যাবে। সিনেমাছবিতে গ্রামোফোনের ধ্বনিতে যে-বুদ্ধকে পাওয়া যেতে পারে সে তো

ক্ষণকালের বুদ্ধ; সুদীর্ঘকাল মানুষের সজীব চিত্তের সিংহাসনে বসে যিনি অসংখ্য নরনারীর ভক্তিপ্রেমের অর্ঘ্যে অলংকৃত হয়েছেন তিনি চিরকালের বুদ্ধ। তাঁর ছবি সুদীর্ঘ যুগযুগান্তরের পটে আঁকা হয়েই চলেছে। তাঁর সত্য কেবলমাত্র তাঁকে নিয়ে নয়, তাঁর সত্য বহু দেশকালপাত্রের বিপুলতাকে নিয়ে; সেই বৃহৎ পরিমণ্ডলের মধ্যে তাঁর দৈনিক ঘটনা, তাঁর সাময়িক মানসিক অবস্থার চঞ্চল ছায়ালোকপাত চোখে দেখতেই পাওয়া যাবে না। যদি কোনো অণুবীক্ষণ নিয়ে সেইগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি তা হলে তাঁর বৃহৎ রূপটাকে দেখা অসম্ভব হবে। যে-মানুষ আপন সাধারণ ব্যক্তিগত পরিধির মধ্যে বিশেষ দিনে জন্মলাভ করে বিশেষ দিনে মরে গেছেন তিনি বুদ্ধই নন। মানুষের ইতিহাস সেই আপন বিস্মরণশক্তির গুণেই সেই ছোটো বুদ্ধের প্রতিদিনের ছোটো ছোটো ব্যাপার ভুলে যেতে পেরেছে, তবেই একটি বড়ো বুদ্ধকে পেয়েছে। মানুষের স্মরণশক্তি যদি ফোটোগ্রাফের প্লেটের মতো সম্পূর্ণ নির্বিকার হত তা হলে সে আপন ইতিহাস থেকে উঞ্ছবৃত্তি করে মরত, বড়ো জিনিস থেকে বঞ্চিত হত।

বড়ো জিনিস যেহেতু দীর্ঘকাল থাকে এইজন্যে তাকে নিয়ে মানুষ অকর্মকভাবে থাকতেই পারে না। তাকে নিজের সৃষ্টিশক্তি নিজের কল্পনাশক্তি দিয়ে নিয়তই প্রাণ জুগিয়ে চলতে হয়। কেননা, বড়ো জিনিসের সঙ্গে তার-যে প্রাণের যোগ, কেবলমাত্র জ্ঞানের যোগ নয়। এই যোগের পথ দিয়ে মানুষ আপন প্রাণের মানুষদের কাছ থেকে যেমন প্রাণ পায় তেমনি তাদের প্রাণ দেয়।

এই প্রসঙ্গে একটি অপেক্ষাকৃত ছোটো দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়ছে। ম্যাক্সিম গোর্কি টলস্টয়ের একটি জীবনচরিত লিখেছেন। বর্তমানকালের প্রখরবুদ্ধি পাঠকেরা বাহবা দিয়ে বলছেন, এ-লেখাটা আর্টিস্টের যোগ্য লেখা বটে। অর্থাৎ, টলস্টয় দোষে গুণে ঠিক যেমনটি সেই ছবিতে তীক্ষ্ণ রেখায় তেমনটি আঁকা হয়েছে; এর মধ্যে দয়ামায়া ভক্তি-শ্রদ্ধার কোনো কুয়াশা নেই। পড়লে মনে হয়, টলস্টয় যে সর্বসাধারণের চেয়ে বিশেষ কিছু বড়ো তা নয়, এমন-কি, অনেক বিষয়ে হেয়। এখানে আবার সেই কথাটাই আসছে। টলস্টয়ের কিছুই মন্দ ছিল না, এ কথা বলাই চলে না; খুঁটিনাটি বিচার করলে তিনি-যে নানা বিষয়ে সাধারণ মানুষের মতোই এবং অনেক বিষয়ে তাদের চেয়েও দুর্বল, এ কথা স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু, যে-সত্যের গুণে টলস্টয় বহুলোকের এবং বহুকালের, তাঁর ক্ষণিক-মূর্তি যদি সেই সত্যকে আমাদের কাছ থেকে আচ্ছন্ন করে থাকে তা হলে এই আর্টিস্টের আশ্চর্য ছবি নিয়ে আমার লাভ হবে কী। প্রথম যখন আমি দার্জিলিং দেখতে গিয়েছিলুম দিনের পর দিন কেবলই দেখেছিলুম মেঘ আর কুয়াশা। কিন্তু জানা ছিল, এগুলো সাময়িক এবং যদিও হিমালয়কে আচ্ছন্ন করবার এদের শক্তি আছে তবুও এরা কালো বাষ্পমাত্র, কাঞ্চনজঙ্ঘার ধ্রুব শুভ্র মহত্ত্বকে এরা অতিক্রম করতে পারে না। আর যাই হোক, হিমালয়কে এই কুয়াশার দ্বারা তিরস্কৃত দেখে ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে মূঢ়তা হত। ক্ষণকালের মায়ার দ্বারা চিরকালের স্বরূপকে প্রচ্ছন্ন করে দেখাই আর্টিস্টের দেখা, এ কথা মানতে পারি নে। তা ছাড়া, গোর্কির আর্টিস্ট-চিত্ত তো বৈজ্ঞানিক হিসাবে নির্বিকার নয়। তাঁর চিত্তে টলস্টয়ের যে-ছায়া পড়েছে সেটা একটা ছবি হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবেও সেটা-যে সত্য তা কেমন করে বলব। গোর্কির টলস্টয়ই কি টলস্টয়? বহুকালের ও বহুলোকের চিত্তকে যদি গোর্কি নিজের চিত্তের মধ্যে সংহত করতে পারতেন তা হলেই তাঁর দ্বারা বহুকালের ও বহুলোকের টলস্টয়ের ছবি আঁকা সম্ভবপর হত। তার মধ্যে অনেক ভোলবার সামগ্রী ভুলে যাওয়া হত; আর তবেই যা না-ভোলবার তা বড়ো হয়ে, সম্পূর্ণ হয়ে, দেখা দিত।

জাহাজ ক্রাকোভিয়া। ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

মানুষের মধ্যে মন প্রাণ দেহ এই তিনে মিলে কাজ চালায়, এই তিনের আপসে আমাদের কর্মবেগের একটা ছন্দ তৈরি করে। শীতের দেশে দেহ সহজেই ছুটে চলতে চায়; তারই সঙ্গে তাল রাখবার জন্যে মনেরও তাড়াতাড়ি ভাবা দরকার। গরম দেশে আমরা ধীরে সুস্থে চলি, ধীরে সুস্থে ভাবি, কোনো বিষয়ে মন স্থির করতে বিলম্ব ঘটে। শীতের দেশে যে-তেজকে দেহের মধ্যেই জাগিয়ে

তুলতে হয় গরম দেশে সেই তেজ দেহের বাইরে; সেই আকাশব্যাপী তেজ শরীরের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি; সেইজন্যে আভ্যন্তরিক উত্তেজনা যাতে বেড়ে না ওঠে আমাদের শরীরের সেই অভিপ্রায়। চলাফেরার দম সর্বদাই তাকে কমিয়ে রাখতে হয়; তাই আমাদের মনের মধ্যে কর্মচিন্তার ছন্দ মন্দাক্রান্তা।

মনের ভাবনা ও হুকুমের অপেক্ষায় যখন দেহকে কাজ চালাবার জন্যে পথ চেয়ে থাকতে হয় না 'তখন তাকেই বলে অভ্যাস, সেই অভ্যাসেই নৈপুণ্য। কর্মের তাল যতই দ্রুত হয়, দেহের পক্ষে ততই দ্বিধাবিহীন হওয়া দরকার। ভাবতে মনের যে-সময় লাগে তার জন্যে সবুর করতে গেলেই দ্বিধা ঘটে। বাহিরে কর্মের ফল সেই সবুরের জন্যে যদি অপেক্ষা করতে না পারে তা হলেই বিভ্রাট। মোটরগাড়ির একটা বিশেষ বেগ আছে, কখন তার হাল বাঁয়ে ফেরাব, কখন ডাইনে, তা ঠিক করতে হলে সেই কলের বেগের দ্রুত ছন্দেই ঠিক করতে হয়, নইলে বিপদ ঘটে। সেই দ্রুততা বার বার অভ্যাসের জোরেই সহজ হয়। অভ্যাসের বাহিরে কোনো নূতন অবস্থা এসে পড়লে অপঘাত ঘটায়, অর্থাৎ যেখানে মনের দরকার সেখানে মনকে প্রস্তুত না পেলেই মুশকিল।

দম দিয়ে কলের তাল দুন চৌদুন করা শক্ত নয়, সেইসঙ্গে অভ্যাসের বেগও অনেক পরিমাণে বাড়ানো চলে। কিন্তু এই দ্রুত অভ্যাসের নৈপুণ্যে সেই-সব কাজই সম্ভবপর হয় যা 'বস্তুগত'। অর্থাৎ, এক বস্তা বাঁধবার জায়গায় দুই বস্তা বাঁধা যায়। কিন্তু, যা কিছু প্রাণগত ভাবগত তা কলের ছন্দের অনুবর্তী হতে চায় না।

যারা পালোয়ান প্রকৃতির লোক সংগীতে তারা দুন চৌদুনের বেগ দেখে পুলকিত হয়ে ওঠে; কিন্তু পদ্মবনের তরঙ্গদোলায় যারা বীণাপাণির মাধুর্যে মুগ্ধ, ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে তাঁর মোটর-রথযাত্রার প্রস্তাবে তাদের মন হায়-হায় করতে থাকে।

পশ্চিম মহাদেশে মানুষের জীবনযাত্রার তাল কেবলই দুন থেকে চৌদুনের অভিমুখে চলেছে। কেননা, জীবনের সার্থকতার চেয়ে বস্তুর প্রয়োজন অত্যন্ত বেড়ে উঠেছে। ঘর ভেঙে হাট তৈরি হল, রব উঠল : Time is Money। এই বেগের পরিমাপ সহজ। সেইজন্যে সেখানে একটা জিনিস সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে, যেটা সকলেরই কাছে সুস্পষ্ট, যেটা বুঝতে কারও মুহূর্তকাল দেরি হয় না, সে হচ্ছে পাখোয়াজির হাত দুটোর দুড় দাড় তাণ্ডবনৃত্য। গান বুঝতে যে সবুর করা অত্যাবশ্যক, সেটা সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও রক্ত গরম হয়ে ওঠে, ভিড়ের লোকে বলে, 'সাবাস! এ একটা কাণ্ড বটে!'

এবার জাহাজে সিনেমা অভিনয় দেখা আমার ভাগ্যে ঘটেছিল। দেখলুম, তার প্রধান জিনিসটাই হচ্ছে দ্রুত লয়। ঘটনার দ্রুততা বারে বারে চমক লাগিয়ে দিচ্ছে। এই সিনেমা আজকালকার দিনে সর্বসাধারণের একটা প্রকাণ্ড নেশা। ছেলে বুড়ো সকলকেই প্রতিদিন এতে মাতিয়ে রেখেছে। তার মানে হচ্ছে সকল বিভাগেই বর্তমান যুগে কলার চেয়ে কারদানি বড়ো হয়ে উঠেছে। প্রয়োজনসাধনের মুগ্ধদৃষ্টি কারদানিকেই পছন্দ করে। সিদ্ধি, ইংরেজিতে যাকে সাক্‌সেস্‌ বলে, তার প্রধান বাহন হচ্ছে দ্রুত নৈপুণ্য। পাপকর্মের মধ্য দিয়েও সেই নৈপুণ্যের লীলাদৃশ্য আজ সকলের কাছে উপাদেয়। সুষমাকে কল্যাণকে উপলব্ধি করবার মতো শান্তি ও অবকাশ প্রতিদিন প্রতিহত হতে চলল; সিদ্ধির ঘোড়দৌড়ে জুয়োখেলার উত্তেজনা পশ্চিমদিগন্তে কেবলই ঘূর্ণি হাওয়া বইয়ে দিচ্ছে।

পশ্চিম মহাদেশের অন্ধকার পটের উপর আবর্তমান পলিটিক্সের দৃশ্যটাকে একটা সিনেমার বিপুলাকার চলচ্ছবির মতো দেখতে হয়েছে। ব্যাপারটা হচ্ছে, দ্রুতলয়ের প্রতিযোগিতা। জলে স্থলে আকাশে কে একটুমাত্র এগিয়ে যেতে পারে তারই উপর হারজিত নির্ভর করছে। গতি কেবলই বাড়ছে, তার সঙ্গে শান্তির কোনো সমন্বয় নেই। ধর্মের পথে ধৈর্য চাই, আত্মসংবরণ চাই; সিদ্ধির পথে চাতুরীর ধৈর্য নেই, সংযম নেই, তার হস্তপদচালনা যতই দ্রুত হবে ততই তার ভেলকি বিস্ময়কর হয়ে উঠবে— তাই জাদুকরের সভ্যতায় বেগের পরিমাণ সকল দিকেই এত বেশি ত্বরান্বিত যে, মানুষের মন অসত্যে লজ্জিত ও অপঘাতসম্ভাবনায় শঙ্কিত হবার সময় পাচ্ছে না।

ক্রাকোভিয়া। এডেন বন্দর
১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

ঘর বলে, পেয়েছি; পথ বলে, পাই নি। মানুষের কাছে 'পেয়েছি' তারও একটা ডাক আছে, আর 'পাই নি' তারও ডাক প্রবল। ঘর আর পথ নিয়েই মানুষ। শুধু ঘর আছে পথ নেই সেও যেমন মানুষের বন্ধন, শুধু পথ আছে ঘর নেই সেও তেমনি মানুষের শাস্তি। শুধু 'পেয়েছি' বদ্ধ গুহা, শুধু 'পাই নি' অসীম মরুভূমি।

যাকে আমরা ভালোবাসি তারই মধ্যে সত্যকে আমরা নিবিড় করে উপলব্ধি করি। কিন্তু, সেই সত্য-উপলব্ধির লক্ষণ হচ্ছে পাওয়ার সঙ্গে না-পাওয়াকে অনুভব করা। সত্যের মধ্যে এই একান্ত বিরুদ্ধতার সমন্বয় আছে বলেই সত্য-উপলব্ধির জবানবন্দি এমন হয় যে, আদালতে তা গ্রাহ্যই হতে পারে না। সুন্দরকে দেখে আমাদের ভাষায় যখন বলি 'আ মরি', তখন বাহিরের দাঁড়িপাল্লার ওজনে তাকে অত্যুক্তি বলা চলে, কিন্তু অন্তর্যামী তাকে বিশ্বাস করেন। সুন্দরের মধ্যে অনন্তের স্পর্শ যখন পাই তখন আমার মধ্যে যে-অন্ত আছে সে বলে, 'আমি নেই। কেবল ঐ আছে।' অর্থাৎ যাকে আমি অত্যন্ত পেয়েছি সে নেই, আর যাকে আমি পেয়েও পাই নে সেই অত্যন্ত আছে।

ঘড়ি-ধরা অবিশ্বাসী, সময়কে আপেক্ষিক অর্থাৎ মায়া বলে মানতে চায় না, সে জানে না— নিমেষই বল আর লক্ষ যুগই বল, দুয়ের মধ্যেই অসীম সমানভাবেই আছেন, শুধু কেবল উপলব্ধির অপেক্ষা। এইজন্যই কবি প্রেমের ভাষায় অর্থাৎ নিবিড় সত্য উপলব্ধির ভাষায় বলেছেন, 'নিমিষে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি।' যারা আয়তনকে ঐকান্তিক সত্য বলে মনে করে তারাই অসীমের সীমা শুনলে কানে হাত দেয়। কিন্তু, দেশই বল, আর কালই বল, যাতে করে সৃষ্টির সীমা নির্দেশ করে দেয়, দুইই আপেক্ষিক, দুইই মায়া। সিনেমাতে কালের পরিমাণ বদল করে দিয়ে যে ব্যায়াম-ক্রীড়া দেখানো হয় তাতে দেখি যে ঘড়ি-ধরা কালে যা একভাবে প্রত্যক্ষ, কালকে বিলম্বিত করে দিলে তাকেই অন্যভাবে দেখা যায়, অর্থাৎ স্বল্প কালের সংহতিতে যা চঞ্চল, বৃহৎ কালের ব্যাপ্তিতে তাই স্থির। শুধু কাল কেন, আকাশ সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। আমাদের দৃষ্টির আকাশে গোলাপফুলকে যে-আয়তনে দেখছি অণুবীক্ষণের আকাশে তাকে সে-আয়তনে দেখি নে। আকাশকে আরও অনেক বেশি আণুবীক্ষণিক করে দেখতে পারলে গোলাপের পরমাণুপুঞ্জকে বৈদ্যুতিক যুগলমিলনের নৃত্যলীলারূপে দেখতে পারি, সে-আকাশে গোলাপ একেবারে গোলাপই থাকে না। অথচ, সে-আকাশ দূরস্থ নয়, স্বতন্ত্র নয়, এই আকাশেই। তাই পরম সত্যকে উপনিষৎ বলেছেন : তদেজতি তন্নৈজতি। একই কালে তিনি চলেনও, তিনি চলেনও না।

সংস্কৃত ভাষায় ছন্দ শব্দের একটা অর্থ হচ্ছে কাব্যের মাত্রা, আর-একটা অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা। মাত্রা আকারে কবির সৃষ্টি-ইচ্ছা কাব্যকে বিচিত্র রূপ দিতে থাকে। বিশ্বসৃষ্টির বৈচিত্র্যও দেশকালের মাত্রা-অনুসারে। কালের বা দেশের মাত্রা বদল করবামাত্রই সৃষ্টির রূপ এবং ভাব বদল হয়ে যায়। এই বিশ্বছন্দের মাত্রাকে আমরা আরও গভীর করে দেখতে পারি; তা হলে চরম বিশ্বকবির ইচ্ছা-শক্তির মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে হবে। মাত্রা সেখানে মাত্রার অতীতের মধ্যে; সীমার বৈচিত্র্য সেখানে অসীমের লীলা অর্থে প্রকাশ পায়।

দেশকালের মধ্যেই দেশকালের অতীতকে উপলব্ধি করে তবেই আমরা বলতে পারি 'মরি-মরি'। সেই আনন্দ না হলে মরা সহজ হবে কেমন করে। তাল আর সা-রে-গ-ম যখন কেবলমাত্র বাহিরের তথ্যরূপে কানের উপর মনের উপর পড়তে থাকে তখন তার থেকে মুক্তি পাবার জন্যে চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে, কিন্তু যখন সেই তাল আর সা-রে-গ-মের ভিতর থেকেই সংগীতকে দেখতে পাই তখন মাত্রায় অমাত্রকে, সীমায় অসীমকে, পাওয়ায় অপাওয়াকে জানি; তখন সেই আনন্দে মনে হয় এর জন্যে সব দিতে পারি। কার জন্যে। ঐ সা-রে-গ-মের জন্যে? ঐ ঝাঁপতাল-চৌতালের জন্যে, দুন-চৌদুনের কসরতের জন্যে? না; এমন-কিছুর জন্যে যা অনির্বচনীয়, যা পাওয়া না-পাওয়ায়

এক হয়ে মেশা; যা সুর নয়, তাল নয়, সুরতালে ব্যাপ্ত হয়ে থেকে সুরতালের অতীত যা, সেই সংগীত।

প্রয়োজনের জানা নিতান্তই জানার সীমানার মধ্যে বন্ধ, তার চার দিকে না-জানার আকাশমণ্ডলটা চাপা; সেইজন্যে তাকে সত্যরূপে দেখা হয় না, সেইজন্যে তার মধ্যে যথার্থ আনন্দ নেই, বিস্ময় নেই, শ্রদ্ধা নেই। সেইজন্যে তার উদ্দেশ্যে যথার্থ ত্যাগ স্বীকার সম্ভব হতে পারে না। এই কারণেই ভারতবর্ষের প্রতি ইংরেজের ব্যক্তিগত বদান্যতার অদ্ভুত অভাব। অথচ, এ সম্বন্ধে তার সংগতির বোধ এতই অল্প যে, ভারতবর্ষের জন্যে তার ত্যাগের তালিকা হিসাব করবার বেলায় সর্বদাই সে অহংকার করে বলে যে, তার সিভিল সার্ভিস, তার ফৌজের দল ভারতবর্ষের সেবায় গরমে দগ্ধ হয়ে, লিভার বিকৃত করে, প্রবাসের দুঃখ মাথায় নিয়ে কী কষ্টই না পাচ্ছে। বিষয়কর্মের আনুষঙ্গিক দুঃখকে ত্যাগের দুঃখ নাম দেওয়া, রাষ্ট্রনীতির আইন ও ব্যবস্থা-রক্ষার উপলক্ষে যে-কৃচ্ছ্রসাধন তাকে সত্যের তপস্যা, ধর্মের সাধনা, বলাটা হয় গুপ্ত পরিহাস নয় মিথ্যা অহংকার।

বাসনার চোখে বা বিদ্বেষের চোখে বা অহংকারের চোখে যাকে দেখি তাকে সীমায় বেঁধে দেখি; তার প্রতি পূর্ণ সত্যের ব্যবহার কোনোমতেই হতে পারে না বলে তার থেকে এত দুঃখের উৎপত্তি হয়। মুনফার লোভে, ক্ষমতার অত্যাকাঙ্ক্ষায়, মানুষের সত্য আজ সর্বত্র যেমন আচ্ছন্ন হয়েছে এমন আর কখনোই হয় নি। মানুষের মধ্যে সত্যকে না দেখতে পাওয়ার নিরানন্দ এবং অন্যায়, বিশ্বের পূর্ণ অধিকার থেকে বিশ্ববিজিগীষু কুস্তিগিরদের আজ যেমন বঞ্চিত করেছে এমন কোনোদিন করে নি। সেইজন্যেই বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে মানুষ এ কথা বলতে লজ্জাও করছে না যে, মানুষকে শাসন করবার অধিকারই শ্রেষ্ঠ অধিকার; অর্থাৎ, তাকে পৃথক করে রাখবার নীতিই বড়ো নীতি।...

বহু অল্পসংখ্যক য়ুরোপীয় বালকবালিকার শিক্ষার জন্য তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ গবর্নমেন্ট ব্যয় করতে সম্মত হয়েছেন বলে দেশি লোকেরা যে নালিশ করে থাকে, শুনলুম, তার জবাবে আমাদের শাসনকর্তা বলেছেন, যেহেতু অনেক মিশনারি বিদ্যালয় ভারতের জন্য আত্মসমর্পণ করেছে সেই কারণে এই নালিশ অসংগত। আমি নিজে এই নালিশ করি নে, যে-কোনো সমাজের লোকের জন্য যত অধিক পরিমাণ অর্থব্যয় করা হোক আমার তাতে আপত্তি নেই। য়ুরোপীয় বালকবালিকারা যদি অশিক্ষিতভাবে মানুষ হয় তাতে আমাদেরও মন্দ ছাড়া ভালো হবার আশা নেই। কিন্তু, মিশনারি বিদ্যালয়ের ওজর দিয়ে আত্মগ্লানি দূর করবার চেষ্টা ঠিক নয়। এ কথা স্বীকৃত যে, এই পঁয়ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর শতকরা দশ অংশও শিক্ষিত নয়; আজ প্রায় শতাব্দী-কাল ইংরেজশাসনে শিক্ষার ব্যবস্থা হয় নি বলেই এটা ঘটেছে। সেটার প্রধান কারণ, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব। কিন্তু য়ুরোপীয় বালকবালিকার প্রতি সে-অভাব নেই। আমাদের পক্ষে শতকরা পাঁচভাগ শিক্ষাই যথেষ্ট, কিন্তু য়ুরোপীয় ছাত্রদের জন্য শতকরা নিরানব্বই ভাগ শিক্ষার ব্যবস্থা হলেও ঐ একভাগের জন্য খুঁতখুঁত থেকে যায়। জাপান তো জাপানি ছেলেদের জন্যে এমন কথা বলে নি, সেখানেও তো মিশনারি বিদ্যালয় আছে। যে-কারণে ভারতের অর্থে পুষ্ট ইংরেজধনীর মধ্যে প্রায়ই কেউ ভারতের দৈন্যদুঃখলাঘবের জন্য মুনফার সামান্য অংশও দিতে পারে নি, সেই কারণেই ভারত-গবর্নমেন্ট ভারতের অজ্ঞতাঅপমান-লাঘবের জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ শিক্ষার ব্যয় বহন করতে পারে নি, সহজ বদান্যতার অভাবে। ভারতের সঙ্গে ইংলন্ডের অস্বাভাবিক সম্বন্ধ— এই কারণেই ইংলন্ডের কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় রাজামহারাজার দান দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইংলন্ডের কোনো ধনী ভারতের কোনো অনুষ্ঠানে দানের মতো কোনো দান করেছে শুনতে পাই নি। অথচ, ভারত নিঃস্ব, ইংরেজ ধনী।

মিশনারি বিদ্যালয়ে ইংরেজের অর্থ আছে এমন কথা উঠবে। কিন্তু, সে কি ইংরেজের অর্থ। সে-যে খৃস্টিয়ানের অর্থ। সে-যে ধর্মফলকামী সমস্ত ইউরোপের অর্থ। ধার্মিকের দান, আত্মীয়তার

দান নয়, অধিকাংশ সময়েই তা পারলৌকিক বৈষয়িকতার দান। ভারতীয় খৃস্টিয়ানের সঙ্গে ইংরেজ-খৃস্টিয়ানের যে কী সম্বন্ধ তা সকলেই জানে। ভারতের কোনো-একটি পাহাড়ের শহরে চার্চ্ অফ ইংলন্ডের সম্প্রদায়গত একজন ভারতীয় ভক্ত খৃস্টিয়ান ছিলেন। তাঁর অন্ত্যেষ্টিসংকারের অনুষ্ঠান নির্বাহের জন্য তাঁর বিধবা স্ত্রী সেখানকার একমাত্র স্বসাম্প্রদায়িক পাদ্রিকে অনুরোধ করেন। পাদ্রি আপন মর্যাদাহানি করতে সম্মত হলেন না; বোধ করি এতে পোলিটিকাল প্রেস্টিজেরও খর্বতাসম্ভাবনা আছে। অগত্যা বিধবা প্রেস্‌বিটেরিয়ান পাদ্রির শরণাপন্ন হলেন; তিনি ভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেওয়া অকর্তব্য বোধ করলেন। ভারতে কোনো যথার্থ ভক্ত ইংরেজ মিশনারি নেই, এ কথা আমি বলি নে। কিন্তু মিশনারি অনুষ্ঠানের যে-অংশে সাধারণ ইংরেজ ধার্মিকের অর্থ আছে সেখানে শ্রদ্ধা আছে এ কথা মানব না। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। আমরা তো এই জানি, ভারতীয় চরিত্র ও ভারতীয় ধর্ম ও সমাজনীতির প্রতি সত্য মিথ্যা নানা উপায়ে অশ্রদ্ধা জাগিয়ে দিয়ে এই অর্থ সংগ্রহ হয়ে থাকে। অর্থাৎ, ভারতের প্রতি ইংরেজের যে-অবজ্ঞা ইংরেজ ধর্মব্যবসায়ীরা সর্বদাই তার ভূমিকা পত্তন ও ভিত্তি দৃঢ় করে এসেছে, সেখানকার শিশুদের মনে তারা খৃস্টের নাম করে ভারতীয়ের প্রতি অপ্রীতির বীজ বপন করেছে। সেই বড়ো হয়ে যখন শাসনকর্তা হয় তখন জালিয়ানওয়ালাবাগের অমানুষিক হত্যাকাণ্ডকেও ন্যায়-সংগত বলে বিচারকের আসন থেকে ঘোষণা করতে লজ্জা বোধ করে না। যেমন অশ্রদ্ধা তেমনি কার্পণ্য।...

আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে প্রধান ও সাধারণ আবরণ হচ্ছে অভ্যাসের মোহ। এই অভ্যাসে চেতনায় যে-জড়তা আসে তাতে সত্যের অনন্তরূপ আনন্দরূপ দেখতে দেয় না। শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে এই তত্ত্বটাকে আমরা একেবারেই অগ্রাহ্য করেছি। ছাত্রদের প্রতিদিন একই ক্লাসে একই সময়ে একই বিষয়ে শিক্ষার পুনরাবৃত্তি করানোর চেয়ে মনের জড়ত্বের কারণ আর কিছুই হতে পারে না। শিক্ষা সম্বন্ধে ছাত্রদের প্রধানত যে-বিতৃষ্ণা জন্মে শিক্ষার বিষয় কঠিন বলেই যে তা ঘটে তা সম্পূর্ণ সত্য নয়; শিক্ষাবিধি অত্যন্ত একঘেয়ে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। মানুষের প্রাণ যন্ত্রকে ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু যন্ত্রকে আত্মীয় করতে পারে না; শিক্ষাকে যন্ত্র করে তুললে তার থেকে কোনো বাহ্য ফলই হয় না তা নয়, কিন্তু সে শিক্ষা আত্মগত হতে গুরুতর বাধা পায়।

আকস্মিক হচ্ছে সীমার বাইরেকার দূত, অভাবনীয়ের বার্তা নিয়ে সে আসে। তাতেই আমাদের চেতনা জড়তা থেকে মুক্তির আনন্দ পায়। অভাবনীয়কে অনুভব করাতেই তার মুক্তি। বিশ্বের সর্বত্রই সেই অভাবনীয়। এই অভাবনীয়কে বোধের মধ্যে আনতে গেলে চিত্তকে প্রাণবান করে রাখা চাই, অর্থাৎ তাকে উৎসুক করে তুলতে হয়। এই ঔৎসুক্যই তাকে বদ্ধতার সীমার দিক থেকে বুদ্ধির অসীমতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। অথচ, প্রাণের এই ঔৎসুক্য নষ্ট করে দিয়ে পুনরাবৃত্তির অন্ধ প্রদক্ষিণের জোয়ালে জোর করে চিত্তকে জুড়ে দেওয়াকেই অনেকে ডিসিপ্লিন বলে গৌরব করেন। অর্থাৎ, বিধাতা যে-মানুষকে প্রাণী করেছে সেই মানুষকেই তাঁরা যন্ত্র করতে চান। সেটা হয় সিদ্ধির লোভে। যন্ত্র হচ্ছে সিদ্ধিদেবীর বাহন, প্রাণকে পিষে সে প্রবল হয়। বিশেষ নির্দিষ্ট কোনো-একটা সংকীর্ণ ফল দেওয়াই তার কাজ। বিশ্বসত্যে নির্দিষ্টের চারি দিকে যে অসীম অনির্দিষ্ট আছে তাকে সে দেখতে পারে না, কেননা, প্রাণকে সে কেবলই গণ্ডির বাহিরে আহ্বান করে। গণ্ডির বাহিরে বিধাতার বাঁশি বাজে, ফলকামী সেই ধ্বনি রুদ্ধ করে প্রাচীর তোলে।

আমার মতে শিক্ষার প্রণালী হচ্ছে বৈরাগীর রাস্তায়। ছাত্রদের নিয়ে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। চলতে চলতে নিয়ত নব নব বিস্ময়ে অজানার ভিতর দিয়ে জেনে চলাই হচ্ছে প্রাণবান শিক্ষা। প্রাণের ছন্দের সঙ্গে এই শিক্ষাপ্রবাহের তাল মেলে। বদ্ধ ক্লাস হচ্ছে প্রাণধর্মী চিত্তের সহজজ্ঞানের পথে কঠিন বাধা। খাঁচার মধ্যে পাখিকে বাঁধা খোরাক খাওয়ানো যায়, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ পাখি হতে শেখানো যায় না। বনের পাখি ওড়ার সঙ্গে খাওয়ার মিল করে আনন্দিত হয়।

প্রকৃতির অভিপ্রায় ছিল চলার সঙ্গে পাওয়ার মিল করে মানুষকে শেখানো। কিন্তু, হতভাগ্য মানবসন্তানের পক্ষে চলা বন্ধ করে দিয়ে শেখানোই শিক্ষাপ্রণালী বলে গণ্য হয়েছে। তাতে কত ব্যর্থতা, কত দুঃখ তার হিসেব কে রাখে। আমি তো পথ-চলা শিক্ষাব্যবস্থার কথা অনেকবার প্রস্তাব করেছি, কিন্তু কারও মন পাই নে। কারণ, যারা ভদ্রশিক্ষা পেয়েছে তারা বাঁধনের শিক্ষাকেই বিশ্বাস করতে শিখেছে। আমার ভাগ্য আমাকে শিক্ষায় বিবাগী করেছে বলেই খোলা পথের শিক্ষার ধারাকেই আমি সব চেয়ে সম্মান দিই।

ক্রাকোভিয়া। ভারতসাগর
১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

শিশু যে-জগতে সঞ্চরণ করে তার প্রায় সমস্তই সে প্রবল করে দেখে। জীবনে নানা অবান্তর বিষয় জমে উঠে তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে নি। যখন আমি শিশু ছিলুম তখন আমাদের ছাদের উপর দিয়ে গয়লাপাড়ার দৃশ্য প্রতিদিনই দেখেছি; প্রতিদিনই তা সম্পূর্ণ চোখে পড়েছে, প্রতিদিনই তা ছবি ছিল। আমার দৃষ্টি আর আমার দৃষ্টির বিষয়ের মাঝখানে কোনো ভাবনা, অভ্যাসের কোনো জীর্ণতা আড়াল করে নি। আজ সেই গোয়ালপাড়া কতকটা তেমনি করে দেখতে হলে সুইজর্ল্যান্ডে যেতে হয়। সেখানে মন ভালো করে স্বীকার করে, হাঁ, আছে।

শিশুর কাছে বিশ্ব খুব করে আছে, আমরা বয়স্কেরা সে কথা ভুলে যাই। এইজন্যে, শিশুকে কোনো ডিসিপ্লিনের ছাঁচে ঢালবার জন্যে যখন তাকে জগৎ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের নিজের বানানো কলের মধ্যে বন্ধ করি তখন তাকে যে কতখানি বঞ্চিত করি তা নিজের অভ্যাসদোষেই বুঝতে পারি নে। বিশ্বের প্রতি তার এই একান্ত স্বাভাবিক ঔৎসুক্যের ভিতর দিয়েই যে তাকে শিক্ষা দিতে হবে, নিতান্ত গোঁয়ারের মতো সে কথা আমরা মানি নে। তার ঔৎসুক্যের আলো নিবিয়ে তার মনটা অন্ধকার করে দিয়ে শিক্ষার জন্যে তাকে এডুকেশন-জেলখানার দারোগার হাতে সমর্পণ করে দেওয়াই আমরা পন্থা বলে জেনেছি। বিশ্বের সঙ্গে মানুষের মনের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ এই উপায়ে সেটাকে কঠোর শাসনে শিশুকাল থেকেই নষ্ট ও বিকৃত করে দিই।...

ছবি বলতে আমি কী বুঝি সেই কথাটাই আর্টিস্টকে খোলসা করে বলতে চাই।

মোহের কুয়াশায়, অভ্যাসের আবরণে, সমস্ত মন দিয়ে জগৎটাকে 'আছে' বলে অভ্যর্থনা করে নেবার আমরা না পাই অবকাশ, না পাই শক্তি। সেইজন্য জীবনের অধিকাংশ সময়ই আমরা নিখিলকে পাশ কাটিয়েই চলেছি। সত্তার বিশুদ্ধ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েই মারা গেলুম।

ছবি, পাশ কাটিয়ে যেতে আমাদের নিষেধ করে। যদি সে জোর গলায় বলতে পারে 'চেয়ে দেখো', তা হলেই মন স্বপ্ন থেকে সত্যের মধ্যে জেগে ওঠে। কেননা, যা আছে তাই সৎ; যেখানেই সমস্ত মন দিয়ে তাকে অনুভব করি সেখানেই সত্যের স্পর্শ পাই।

কেউ না ভেবে বসেন, যা চোখে ধরা পড়ে তাই সত্য। সত্যের ব্যাপ্তি অতীতে ভবিষ্যতে, দৃশ্যে অদৃশ্যে, বাহিরে অন্তরে। আর্টিস্ট সত্যের সেই পূর্ণতা যে-পরিমাণে সামনে ধরতে পারে 'আছে' বলে মনের সায় সেই পরিমাণে প্রবল, সেই পরিমাণে স্থায়ী হয়; তাতে আমাদের ঔৎসুক্য সেই পরিমাণে অক্লান্ত, আনন্দ সেই পরিমাণে গভীর হয়ে ওঠে।

আসল কথা, সত্যকে উপলব্ধির পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে একটা অনুভূতি আছে, সেই অনুভূতিকেই আমরা সুন্দরের অনুভূতি বলি। গোলাপফুলকে সুন্দর বলি এইজন্যেই যে, গোলাপ ফুলের দিকে আমার মন যেমন করে চেয়ে দেখে ইঁটের ঢেলার দিকে তেমন করে চায় না। গোলাপফুল আমার কাছে তার ছন্দের রূপে সহজেই সত্তারহস্যের কী একটা নিবিড় পরিচয় দেয়। সে কোনো বাধা দেয় না। প্রতিদিন হাজার জিনিসকে যা না বলি, তাকে তাই বলি; বলি, 'তুমি আছ।'

একদিন আমার মালী ফুলদানি থেকে বাসি ফুল ফেলে দেবার জন্যে যখন হাত বাড়াল, বৈষ্ণবী তখন ব্যথিত হয়ে বলে উঠল, 'লিখতে পড়তেই তোমার সমস্ত মন লেগে আছে, তুমি তো দেখতে

পাও না।' তখনই চমকে উঠে আমার মনে পড়ে গেল, হাঁ, তাই তো বটে। ঐ 'বাসি' বলে একটা অভ্যস্ত কথার আড়ালে ফুলের সত্যকে আর আমি সম্পূর্ণ দেখতে পাই নে। যে আছে সেও আমার কাছে নেই; নিতান্তই অকারণে, সত্য থেকে, সুতরাং আনন্দ থেকে বঞ্চিত হলুম। বৈষ্ণবী সেই বাসি ফুলগুলিকে অঞ্চলের মধ্যে সংগ্রহ করে তাদের চুম্বন করে নিয়ে চলে গেল।

আর্টিস্ট তেমনি করে আমাদের চমক লাগিয়ে দিক। তার ছবি বিশ্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দিয়ে বলুক, 'ঐ দেখো, আছে।' সুন্দর বলেই আছে তা নয়, আছে বলেই সুন্দর।

সত্তাকে সকলের চেয়ে অব্যবহিত ও সুস্পষ্ট করে অনুভব করি আমার নিজের মধ্যে। 'আছি' এই ধ্বনিটি নিয়তই আমার মধ্যে বাজছে। তেমনি স্পষ্ট করে যেখানেই আমরা বলতে পারি 'আছে' সেখানেই তার সঙ্গে, কেবল আমার ব্যবহারের অগভীর মিল নয়, আত্মার গভীরতম মিল হয়। 'আছি' অনুভূমিতে আমার যে-আনন্দ, তার মানে এ নয় যে, আমি মাসে হাজার টাকা রোজগার করি বা হাজার লোকে আমাকে বাহবা দেয়। তার মানে হচ্ছে এই যে, আমি যে সত্য এটা আমার কাছে নিঃসংশয়, তর্ক করা সিদ্ধান্তের দ্বারা নয়, নির্বিচার একান্ত উপলব্ধির দ্বারা। বিশ্বে যেখানে তেমনি একান্তভাবে 'আছে' এই উপলব্ধি করি সেখানে আমার সত্তার আনন্দ বিস্তীর্ণ হয়। সত্যের ঐক্যকে সেখানে ব্যাপক করে জানি।

কোনো ফরাসি দার্শনিক অসীমের তিনটি ভাব নির্ণয় করেছেন—the True, the Good, the Beautiful। ব্রাহ্মসমাজে তারই একটি সংস্কৃত তর্জমা খুব চলতি হয়েছে—সত্যং শিবং সুন্দরম্। এমন-কি, অনেকে মনে করেন, এটি উপনিষদের বাণী। উপনিষৎ সত্যের স্বরূপ যে ব্যাখ্যা করেছেন সে হচ্ছে, শান্তং শিবং অদ্বৈতম্। শান্তং হচ্ছে সেই সামঞ্জস্য যার যোগে সমস্ত গ্রহতারা নিয়ে বিশ্ব শান্তিতে বিধৃত, যার যোগে কালের গতি চিরন্তন ধৃতির মধ্যে নিয়মিত: নিমেষা মুহূর্তাণ্যর্ধমাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি।—শিবং হচ্ছে মানবসমাজের মধ্যে সেই সামঞ্জস্য যা নিয়তই কল্যাণের মধ্যে বিকাশ লাভ করছে, যার অভিমুখে মানুষের চিত্তের এই প্রার্থনা যুগে যুগে সমস্ত বিরোধের মধ্য দিয়েও গূঢ়ভাবে ও প্রকাশ্যে ধাবিত হচ্ছে; অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়। আর, অদ্বৈতং হচ্ছে আত্মার মধ্যে সেই ঐক্যের উপলব্ধি যা বিচ্ছেদের ও বিদ্বেষের মধ্য দিয়েও আনন্দে প্রেমে নিয়ত আত্মীয়তাকে ব্যাপ্ত করছে।

যাঁদের মন খৃস্টিয়ানতত্ত্বের আবহাওয়াতে অত্যন্ত অভ্যস্ত তাঁরা উপনিষৎ সম্বন্ধে ভয়ে ভয়ে থাকেন, খৃস্টিয়ান দার্শনিকদের নমুনার সঙ্গে মিলিয়ে উপনিষদের বাণীকে কিছু-না-কিছু বদল করে চালিয়ে দেওয়া তাঁদের ভিতরকার ইচ্ছা। কিন্তু, শান্তং শিবং অদ্বৈতম্ এই মন্ত্রটিকে চিন্তা করে দেখলেই তাঁরা এই আশ্বাস পাবেন যে, অসীমের মধ্যে দ্বন্দ্বের অভাবের কথা বলা হচ্ছে না, অসীমের মধ্যে দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য এইটেই তাৎপর্য। কারণ, বিপ্লব না থাকলে শান্তির কোনো মানেই নেই, মন্দ না থাকলে ভালো একটা শব্দমাত্র, আর বিচ্ছেদ না থাকলে অদ্বৈত নিরর্থক। তাঁরা যখন সত্যের ত্রিগুণাত্মক ধ্যানের মন্ত্রস্বরূপে 'সত্যং শিবং সুন্দরম্' বাক্যটি ব্যবহার করেন তখন তাঁদের বোঝা উচিত যে, সত্যকে সত্য বলাই বাহুল্য এবং সুন্দর সত্যের একটা তত্ত্ব নয়, আমাদের অনুভূতি-গত বিশেষণমাত্র, সত্যের তত্ত্ব হচ্ছে অদ্বৈত। যে-সত্য বিশ্বপ্রকৃতি লোকসমাজ ও মানবাত্মা পূর্ণ করে আছেন তাঁর স্বরূপকে ধ্যান করবার সহায়তাকল্পে 'শান্তং শিবং অদ্বৈতম্' মন্ত্রটি যেমন সম্পূর্ণ উপযোগী এমন আমি তো আর কিছুই জানি নে। মানবসমাজে যখন শিবকে পাবার সাধনা করি তখন কল্যাণের উপলব্ধিকে শান্তং আর অদ্বৈতং এই দুই-এর মাঝখানে রেখে দেখি, অর্থাৎ ইংরেজিতে বলতে গেলে, ল এবং লভ্-এর পূর্ণতাই হচ্ছে সমাজের ওয়েল্‌ফেয়ার্।

আমাদের চিত্তের মধ্যে তামসিকতা আছে, সেইজন্য বিশ্বকে দেখার বাধা হচ্ছে। কিন্তু, মানুষের মন তো বাধাকে মেনে বসে থাকবে না। এই বাধার ভিতর দিয়ে কেবলই দেখার পথ করতে হবে। মানুষ যতদিন আছে ততদিনই এই পথ-খোদা চলে আসছে। মানুষ অন্ন বস্ত্র সংগ্রহ করছে, মানুষ

বাসা বাঁধছে, তার সঙ্গে সঙ্গেই কেবলমাত্র সত্তার গভীর টানে আত্মা দিয়ে দেখার দ্বারা বিশ্বকে আপন করে চলছে। তাকে জানার দ্বারা নয়, ব্যবহারের দ্বারা নয়, সম্পূর্ণ করে দেখার দ্বারা; ভোগের দ্বারা নয়, যোগের দ্বারা।

আর্টিস্ট আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আর্টের সাধনা কী। আর্টের একটা বাইরের দিক আছে সেটা হচ্ছে আঙ্গিক, টেক্‌নিক্‌, তার কথা বলতে পারি নে। কিন্তু ভিতরের কথা জানি। সেখানে জায়গা পেতে চাও যদি তা হলে সমস্ত চিত্ত দিয়ে দেখো, দেখো, দেখো।

অর্থাৎ, বিশ্বের যেখানে প্রকাশের ধারা, প্রকাশের লীলা, সেখানে যদি মনটাকে সম্পূর্ণ করে ধরা দিতে পার তা হলেই অন্তরের মধ্যে প্রকাশের বেগ সঞ্চারিত হয়— আলো থেকেই আলো জ্বলে। দেখতে-পাওয়া মানে হচ্ছে প্রকাশকে পাওয়া। সংবাদ গ্রহণ করা এক জিনিস আর প্রকাশকে গ্রহণ করা আর-এক জিনিস। বিশ্বের প্রকাশকে মন দিয়ে গ্রহণ করাই হচ্ছে আর্টিস্টের সাধনা; তাতেই প্রকাশের শক্তি সচেষ্ট হয়ে ওঠে, প্রকাশের আঙ্গিকপদ্ধতি তার সঙ্গে সঙ্গেই অনেকটা আপনি এসে পড়ে, কতকটা শিক্ষা ও চর্চার দ্বারা নৈপুণ্যকে পাকিয়ে তোলা যায়। এইটুকু সাধনা করতে হবে, হাতিয়ারের বোঝা যেন হাতটার উপর দৌরাত্ম্য না করে, সহজ-স্রোতকে আটক করে রেখে কণ্টকল্পিত পন্থাটাই যেন বাহবা নেবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে না ওঠে। বিশ্বপ্রবাহের প্রবাহিণীর মধ্যে গলা ডুবিয়ে তারই কলধ্বনি থেকে প্রকাশের মন্ত্র অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করো, তারই ধারার ছন্দ তোমার রক্তের স্রোতে আপন তাল বেঁধে দেবে— এই হল গোড়াকার কথা; এই হল বর্ষণ, তার পরে তোমার যদি আধার থাকে তো ভরে উঠবে; এই হল আগুন, প্রদীপ বের করতে পার যদি তো শিখা জ্বলবার জন্যে ভাবনা থাকবে না।

জাভাযাত্রীর পত্র

'যাত্রী' -গ্রন্থভুক্তিকালে 'জাভা-যাত্রীর পত্র'-এর ৮, ১৮ এবং ২০-সংখ্যক পত্রের শেষে যথাক্রমে "শ্রীবিজয়লক্ষ্মী", "বোরোবুদুর" এবং "সিয়াম" (প্রথম দর্শনে এবং বিদায়কালে) কবিতাগুলি মুদ্রিত হয়েছিল। পরে 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত হয়ে প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলি বর্তমান সংস্করণ রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে 'পরিশেষ'-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় 'জাভাযাত্রীর পত্র' থেকে বর্জিত হল।

৯-সংখ্যক পত্রের সঙ্গে মুদ্রিত কবিতাটি ("নতুন কাল") 'পরিশেষ'-এর সংযোজন-ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রাসঙ্গিকতাবশত পত্রের সঙ্গেই যুক্ত রইল।

একই কারণে 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'-র ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫-এর ডায়ারির কবিতাটিও ("লক্ষ্যশূন্য" : পরিশেষ/সংযোজন) যথাস্থানে রক্ষিত।

১

কল্যাণীয়াসু

যাত্রা যখন আরম্ভ করা গেল আকাশ থেকে বর্ষার পর্দা তখন সরিয়ে দিয়েছে; সূর্য আমাকে অভিনন্দন করলেন। কলকাতা থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত যতদূর গেলুম রেলগাড়ির জানলা দিয়ে চেয়ে চেয়ে মনে হল, পৃথিবীতে সবুজের বান ডেকেছে; শ্যামলের বাঁশিতে তানের পর তান লাগছে, তার আর বিরাম নেই। খেতে খেতে নতুন ধানের অংকুরে কাঁচা রঙ, বনে বনে রসপরিপুষ্ট প্রচুর পল্লবের ঘন সবুজ। ধরণীর বুকের থেকে অহল্যা জেগে উঠেছেন; নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের পায়ের স্পর্শ লাগল।

প্রকৃতির এই নব জীবনের উৎসবে রূপের উত্তরে রসের গান গাবার জন্যেই আমি এসেছিলুম; এই কথাই কেবল মনে পড়ে। কাজের লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, তার দরকার কী। বলে, ওটা শৌখিনতা। অর্থাৎ, এই প্রয়োজনের সংসারে আমরা বাহুল্যের দলে। তাতে লজ্জা পাব না। কেননা, এই বাহুল্যের দ্বারাই আত্মপরিচয়।

হিসাবি লোকেরা একটা কথা বার বার ভুলে যায় যে, প্রচুরের সাধনাতেই প্রয়োজনের সিদ্ধি; এই আষাঢ়ের পৃথিবীতে সেই কথাটাই জানালো। আমি চাই ফসল, যেটুকুতে আমার পেট ভরবে। সেই স্বল্প প্রত্যাশাকে মূর্তিমান দেখি তখনই যখন বর্ষণে অভিষিক্ত মাটির ভাণ্ডারে শ্যামল ঐশ্বর্য আমার প্রয়োজনকে অনেক বেশি ছাপিয়ে পড়ে। মুষ্টিভিক্ষাও জোটে না যখন ধনের সংকীর্ণতা সেই মুষ্টিকে না ছাড়িয়ে যায়। প্রাণের কারবারে প্রাণের মুনফাটাই লক্ষ্য, এই মুনফাটাই বাহুল্য। আমাদের সন্ন্যাসী মানুষেরা এই বাহুল্যটাকে নিন্দা করে; এই বাহুল্যকেই নিয়ে কবিদের উৎসব। খরচপত্র বাদেও যথেষ্ট উদ্‌বৃত্ত যদি থাকে তবেই সাহস করে খরচপত্র চলে, এই কথাটা মানি বলে আমরা মুনফা চাই। সেটা ভোগের বাহুল্যের জন্যে নয়, সেটা সাহসের আনন্দের জন্যে। মানুষের বুকের পাটা যাতে বাড়ে তাতেই মানুষকে কৃতার্থ করে।

বর্তমান যুগে য়ুরোপেই মানুষকে দেখি যার প্রাণের মুনফা নানা খাতায় কেবলই বেড়ে চলেছে। এইজন্যেই পৃথিবীতে এত ঘটা করে সে আলো জ্বালল। সেই আলোতে সে সকল দিকে প্রকাশমান। অল্প তেলে কেবল একটি মাত্র প্রদীপে ঘরের কাজ চলে যায়। কিন্তু পুরো মানুষটা তাতে অপ্রকাশিত থাকে। এই অপ্রকাশ অস্তিত্বের কার্পণ্য, কম করে থাকা। এটা মানবসত্যের অবসাদ। জীবলোকে মানুষেরা জ্যোতিষ্কজাতীয়; জন্তুরা কেবলমাত্র বেঁচে থাকে, তাদের অস্তিত্ব দীপ্ত হয়ে ওঠে নি। কিন্তু, মানুষ কেবল-যে আত্মরক্ষা করবে তা নয়, সে আত্মপ্রকাশ করবে। এই প্রকাশের জন্যে আত্মার দীপ্তি চাই। অস্তিত্বের প্রাচুর্য থেকে, অস্তিত্বের ঐশ্বর্য থেকেই এই দীপ্তি। বর্তমান যুগে য়ুরোপই সকল দিকে আপনার রশ্মি বিকীর্ণ করেছে; তাই মানুষ সেখানে কেবল-যে টিঁকে আছে তা নয়, টিঁকে থাকার চেয়ে আরও অনেক বেশি করে আছে। পর্যাপ্তে চলে আত্মরক্ষা, অপর্যাপ্তে আত্মপ্রকাশ। য়ুরোপে জীবন অপর্যাপ্ত।

এটাতে আমি মনে দুঃখ করি নে। কারণ, যে-দেশেই যে-কালেই মানুষ কৃতার্থ হোক-না কেন, সকল দেশের সকল কালের মানুষকেই সে কৃতার্থ করে। য়ুরোপ আজ প্রাণপ্রাচুর্যে সমস্ত পৃথিবীকেই স্পর্শ করেছে। সর্বত্রই মানুষের সুপ্ত শক্তির দ্বারে তার আঘাত এসে পড়ল। প্রভূতের দ্বারাই তার প্রভাব।

য়ুরোপ সর্বদেশ সর্বকালকে যে স্পর্শ করেছে সে তার কোন্‌ সত্য দ্বারা। তার বিজ্ঞান সেই সত্য। তার যে-বিজ্ঞান মানুষের সমস্ত জ্ঞানের ক্ষেত্রকে অধিকার করে কর্মের ক্ষেত্রে জয়ী হয়েছে সে একটা বিপুল শক্তি। এইখানে তার চাওয়ার অন্ত নেই, তার পাওয়াও সেই পরিমাণে। গত বছর

য়ুরোপ থেকে আসবার সময় একটি জর্মন যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি তাঁর অল্প-বয়সের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষে আসছিলেন। মধ্যভারতের আরণ্য প্রদেশে যে-সব জাতি প্রায় অজ্ঞাতভাবে আছে দুবৎসর তাদের মধ্যে বাস করে তাদের রীতিনীতি তন্ন তন্ন করে জানতে চান। এরই জন্যে তাঁরা দুজনে প্রাণপণ করতে কুণ্ঠিত হন নি। মানুষসম্বন্ধে মানুষকে আরও জানতে হবে, সেই আরও জানা বর্বর জাতির সীমার কাছে এসেও থামে না। সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়কে এইরকম সংঘবদ্ধ করে জানা, ব্যূহবদ্ধ করে সংগ্রহ করা, জানবার সাধনায় মনকে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত করা, এতে করে মানুষ যে কত প্রকাণ্ড বড়ো হয়েছে য়ুরোপে গেলে তা বুঝতে পারা যায়। এই শক্তি দ্বারা পৃথিবীকে য়ুরোপ মানুষের পৃথিবী করে সৃষ্টি করে তুলছে। যেখানে মানুষের পক্ষে যা-কিছু বাধা আছে তা দূর করবার জন্যে সে যে-শক্তি প্রয়োগ করছে তাকে যদি আমরা সামনে মূর্তিমান করে দেখতে পেতুম তা হলে তার বিরাট রূপে অভিভূত হতে হত।

এইখানে য়ুরোপের প্রকাশ যেমন বড়ো, যাকে নিয়ে সকল মানুষ গর্ব করতে পারে, তেমনি তার এমন একটা দিক আছে যেখানে তার প্রকাশ আচ্ছন্ন। উপনিষদে আছে, যে-সাধকেরা সিদ্ধিলাভ করেছেন— তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি : তাঁরা সর্বগামী সত্যকে সকল দিক থেকে লাভ করে যুক্তাত্মভাবে সমস্তের মধ্যে প্রবেশ করেন। সত্য সর্বগামী বলেই মানুষকে সকলের মধ্যে প্রবেশাধিকার দেয়। বিজ্ঞান বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মানুষের প্রবেশপথ খুলে দিচ্ছে; কিন্তু আজ সেই য়ুরোপে এমন একটি সত্যের অভাব ঘটেছে যাতে মানুষের মধ্যে মানুষের প্রবেশ অবরুদ্ধ করে। অন্তরের দিকে য়ুরোপ মানুষের পক্ষে একটা বিশ্বব্যাপী বিপদ হয়ে উঠল। এইখানে বিপদ তার নিজেরও।

এই জাহাজেই একজন ফরাসি লেখকের সঙ্গে আমার আলাপ হল। তিনি আমাকে বলছিলেন, যুদ্ধের পর থেকে য়ুরোপের নবীন যুবকদের মধ্যে বড়ো করে একটা ভাবনা ঢুকেছে। এই কথা তারা বুঝেছে, তাদের আইডিয়ালে একটা ছিদ্র দেখা দিয়েছিল যে-ছিদ্র দিয়ে বিনাশ ঢুকতে পারলে। অর্থাৎ কোথাও তারা সত্যভ্রষ্ট হল এতদিনে সেটা ধরা পড়েছে।

মানুষের জগৎ অমরাবতী, তার যা সত্য-ঐশ্বর্য তা দেশে কালে পরিমিত নয়। নিজের জন্য নিয়ত মানুষ এই-যে অমরলোক সৃষ্টি করছে তার মূলে আছে মানুষের আকাঙ্ক্ষা করবার অসীম সাহস। কিন্তু, বড়োকে গড়বার উপকরণ মানুষের ছোটো যেই চুরি করতে শুরু করে অমনি বিপদ ঘটায়। মানুষের চাইবার অন্তহীন শক্তি যখন সংকীর্ণ পথে আপন ধারাকে প্রবাহিত করতে থাকে তখনই কূল ভাঙে, তখনই বিনাশের বন্যা দুর্দাম হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, মানুষের বিপুল চাওয়া ক্ষুদ্র-নিজের জন্যে হলে তাতেই যত অশান্তির সৃষ্টি। যেখানে তার সাধনা সকলের জন্যে সেইখানেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা কৃতার্থ হয়। এই সাধনাকেই গীতা যজ্ঞ বলেছেন; এই যজ্ঞের দ্বারাই লোকরক্ষা। এই যজ্ঞের পন্থা হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম। সে-কর্ম দুর্বল হবে না, সে-কর্ম ছোটো হবে না, কিন্তু সে-কর্মের ফলকামনা যেন নিজের জন্যে না হয়।

বিজ্ঞান যে বিশুদ্ধ তপস্যার প্রবর্তন করেছে সে সকল দেশের, সকল কালের, সকল মানুষের— এইজন্যেই মানুষকে তাতে দেবতার শক্তি দিয়েছে, সকলরকম দুঃখ দৈন্য পীড়াকে মানবলোক থেকে দূর করবার জন্যে সে অস্ত্র গড়ছে; মানুষের অমরাবতী নির্মাণের বিশ্বকর্মা এই বিজ্ঞান। কিন্তু, এই বিজ্ঞানই কর্মের রূপে যেখানে মানুষের ফল-কামনাকে অতিকায় করে তুললে সেইখানেই সে হল যমের বাহন। এই পৃথিবীতে মানুষ যদি একেবারে মরে তবে সে এইজন্যেই মরবে— সে সত্যকে জেনেছিল কিন্তু সত্যের ব্যবহার জানে নি। সে দেবতার শক্তি পেয়েছিল, দেবত্ব পায় নি। বর্তমান যুগে মানুষের মধ্যে সেই দেবতার শক্তি দেখা দিয়েছে য়ুরোপে। কিন্তু সেই শক্তি কি মানুষকে মারবার জন্যেই দেখা দিল। গত য়ুরোপের যুদ্ধে এই প্রশ্নটাই ভয়ংকর মূর্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। য়ুরোপের বাইরে সর্বত্রই য়ুরোপ বিভীষিকা হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ আজ এশিয়া আফ্রিকা জুড়ে। য়ুরোপ আপন বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের মধ্যে আসে নি, এসেছে আপন কামনা নিয়ে। তাই এশিয়ার হৃদয়ের

মধ্যে য়ুরোপের প্রকাশ অবরুদ্ধ। বিজ্ঞানের স্পর্ধায়, শক্তির গর্বে, অর্থের লোভে, পৃথিবী জুড়ে মানুষকে লাঞ্ছিত করবার এই-যে চর্চা বহুকাল থেকে য়ুরোপ করছে, নিজের ঘরের মধ্যে এর ফল যখন ফলল তখন আজ সে উদ্‌বিগ্ন। তৃণে আগুন লাগাচ্ছিল, আজ তার নিজের বনস্পতিতে সেই আগুন লাগল। সে ভাবছে, থামব কোথায়। সে থামা কি যন্ত্রকে থামিয়ে দিয়ে। আমি তা বলি নে। থামাতে হবে লোভ। সে কি ধর্ম-উপদেশ দিয়ে হবে। তাও সম্পূর্ণ হবে না। তার সঙ্গে বিজ্ঞানেরও যোগ চাই। যে-সাধনায় লোভকে ভিতরের দিক থেকে দমন করে সে-সাধনা ধর্মের, কিন্তু যে-সাধনায় লোভের কারণকে বাইরের দিক থেকে দূর করে সে-সাধনা বিজ্ঞানের। দুইয়ের সম্মিলনে সাধনা সিদ্ধ হয়, বিজ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে ধর্মবুদ্ধির আজ মিলনের অপেক্ষা আছে।

জাভায় যাত্রাকালে এই-সমস্ত তর্ক আমার মাথায় কেন এল জিজ্ঞাসা করতে পার। এর কারণ হচ্ছে এই যে, ভারতবর্ষের বিদ্যা একদিন ভারতবর্ষের বাইরে গিয়েছিল। কিন্তু সেই বাইরের লোক তাকে স্বীকার করেছে। তিব্বত মঙ্গোলিয়া মালয়দ্বীপসকলে ভারতবর্ষ জ্ঞানধর্ম বিস্তার করেছিল, মানুষের সঙ্গে মানুষের আন্তরিক সত্যসম্বন্ধের পথ দিয়ে। ভারতবর্ষের সেই সর্বত্র-প্রবেশের ইতিহাসের চিহ্ন দেখবার জন্যে আজ আমরা তীর্থযাত্রা করেছি। সেইসঙ্গে এই কথাও দেখবার আছে, সেদিনকার ভারতবর্ষের বাণী শুষ্কতা প্রচার করে নি। মানুষের ভিতরকার ঐশ্বর্যকে সকল দিকে উদ্‌বোধিত করেছিল, স্থাপত্যে ভাস্কর্যে চিত্রে সংগীতে সাহিত্যে; তারই চিহ্ন মরুভূমে অরণ্যে পর্বতে দ্বীপে দ্বীপান্তরে, দুর্গম স্থানে দুঃসাধ্য কল্পনায়। সন্ন্যাসীর যে-মন্ত্র মানুষকে রিক্ত করে নগ্ন করে, মানুষের যৌবনকে পঙ্গু করে, মানবচিত্তবৃত্তিকে নানাদিকে খর্ব করে, এ সে-মন্ত্র নয়। এ জরাজীর্ণ কৃশপ্রাণ বৃদ্ধের বাণী নয়, এর মধ্যে পরিপূর্ণপ্রাণ বীর্যবান যৌবনের প্রভাব। ১ শ্রাবণ ১৩৩৪[১]

২

কল্যাণীয়াসু

দেশ থেকে বেরবার মুখে আমার উপর ফরমাশ এল কিছু-কিছু লেখা পাঠাতে হবে। কাকে পাঠাব লেখা, কে পড়বে। সর্বসাধারণ? সর্বসাধারণকে বিশেষ করে চিনি নে, এইজন্যে তার ফরমাশে যখন লিখি তখন শক্ত করে বাঁধানো খুব একটা সাধারণ খাতা খুলে লিখতে হয়; সে-লেখার দাম খতিয়ে হিসেব কষা চলে।

কিন্তু, মানুষের একটা বিশেষ খাতা আছে; তার আলগা পাতা, সেটা যা-তা লেখবার জন্যে, সে লেখার দামের কথা কেউ ভাবেও না। লেখাটাই তার লক্ষ্য, কথাটা উপলক্ষ। সেরকম লেখা চিঠিতে ভালো চলে; আটপৌরে লেখা— তার না আছে মাথায় পাগড়ি, না আছে পায়ে জুতো। পরের কাছে পরের বা নিজের কোনো দরকার নিয়ে সে যায় না— সে যায় যেখানে বিনা-দরকারে গেলেও জবাবদিহি নেই, যেখানে কেবলমাত্র বকে যাওয়ার জন্যেই যাওয়া-আসা।

স্রোতের জলের যে-ধ্বনি সেটা তার চলারই ধ্বনি, উড়ে-চলা মৌমাছির পাখার যেমন গুঞ্জন। আমরা যেটাকে বকুনি বলি সেটাও সেই মানসিক চলে যাওয়ারই শব্দ। চিঠি হচ্ছে লেখার অক্ষরে বকে যাওয়া।

এই বকে-যাওয়াটা মনের জীবনের লীলা। দেহটা কেবলমাত্র চলবার জন্যেই বিনা-প্রয়োজনে মাঝে মাঝে এক-একবার ধাঁ করে চলে ফিরে আসে। বাজার করবার জন্যেও নয়, সভা করবার জন্যেও নয়, নিজের চলাতেই সে নিজে আনন্দ পায় বলে। তেমনি নিজের বকুনিতেই মন জীবনধর্মের তৃপ্তি পায়। তাই বকবার অবকাশ চাই, লোক চাই। বক্তৃতার জন্যে লোক চাই অনেক, বকার জন্যে এক-আধজন।

---

[১] নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত।

দেশে অভ্যস্ত জায়গায় থাকি নিত্যনৈমিত্তিক কাজের মধ্যে, জানা অজানা লোকের ভিড়ে। নিজের সঙ্গে নিজের আলাপ করবার সময় থাকে না। সেখানে নানা লোকের সঙ্গে নানা কেজো কথা নিয়ে কারবার। সেটা কেমনতরো। যেন বাঁধা পুকুরের ঘাটে দশজনে জটলা করে জল ব্যবহার। কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা চাতকের ধর্ম আছে; হাওয়ায় উড়ে-আসা মেঘের বর্ষণের জন্যে সে চেয়ে থাকে একা একা। মনের আকাশে উড়ো ভাবনাগুলো সেই মেঘ—সেটা খামখেয়ালের ঝাপটা লেগে; তার আবির্ভাব তিরোভাব সবই আকস্মিক। প্রয়োজনের তাগিদমত তাকে বাঁধা-নিয়মে পাওয়া যায় না বলেই তার বিশেষ দাম; পৃথিবী আপনারই বাঁধা জলকে আকাশে উড়ো জল করে দেয়; নিজের ফসলখেতকে সরস করবার জন্যে সেই জলের দরকার। বিনা প্রয়োজনে নিজের মনকে কথা বলাবার সেই প্রয়োজন, সেটাতে মন আপন ধারাতেই আপনাকে অভিষিক্ত করে।

জীবনযাত্রার পরিচিত ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে মন আজ যা-তা ভাববার সময় পেল। তাই ভেবেছি, কোনো সম্পাদকি বৈঠক স্মরণ করে প্রবন্ধ আওড়াব না, চিঠি লিখব তোমাকে। অর্থাৎ, পাত পেড়ে ভোজ দেওয়া তাকে বলা চলবে না; সে হবে গাছতলায় দাঁড়িয়ে হাওয়ায় পড়ে-যাওয়া ফল আঁচলে ভরে দেওয়া। তার কিছু পাকা, কিছু কাঁচা; তার কোনোটাতে রঙ ধরেছে, কোনোটাতে ধরে নি। তার কিছু রাখলেও চলে, কিছু ফেলে দিলেও নালিশ চলবে না।

সেই ভাবেই চিঠি লিখতে শুরু করেছিলুম। কিন্তু, আকাশের আলো দিলে মুখ-ঢাকা। বৈঠকখানার আসর বন্ধ হয়ে গেলে ফরাশ বাতি নিবিয়ে দিয়ে যেমন ঝাড়লণ্ঠনে ময়লা রঙের ঘেরাটোপ পরিয়ে দেয়, দ্যুলোকের ফরাশ সেই কাণ্ডটা করলে, একটা ফিকে ধোঁয়াটে রঙের আবরণ দিয়ে আকাশসভার তৈজসপত্র দিলে মুড়ে। এই অবস্থায় আমার মন তার হালকা কলমের খেলা আপনিই বন্ধ করে দেয়। বকুনির কূলহারা ঝরনা বাক্যের নদী হয়ে কখন একসময় গভীর খাদে চলতে আরম্ভ করে; তখন তার চলাটা কেবলমাত্র সূর্যের আলোয় কলধ্বনির নূপুর বাজানোর জন্যে নয়, একটা কোনো লক্ষ্যে পৌঁছবার সাধনায়। আনমনা সাহিত্য তখন লোকালয়ের মাঝখানে এসে পড়ে সমনস্ক হয়ে ওঠে। তখন বাণীকে অনেক বেশি অতিক্রম করে ভাবনাগুলো মাথা তুলে দাঁড়ায়।

উপনিষদে আছে : স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা; তিনি ভালোবাসেন, তিনি সৃষ্টি করেন, আবার তিনিই বিধান করেন। সৃষ্টি-করাটা সহজ আনন্দের খেয়ালে, বিধান-করায় চিন্তা আছে। যাকে খাস সাহিত্য বলে সেটা হল সেই সৃষ্টিকর্তার এলেকায়, সেটা কেবল আপন মনে। যদি কোনো হিসাবি লোক স্রষ্টাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে 'কেন সৃষ্টি করা হল' তিনি জবাব দেন, 'আমার খুশি!' সেই খুশিটাই নানা রঙে নানা রসে আপনাতেই আপনি পর্যাপ্ত হয়ে ওঠে। পদ্ম-ফুলকে যদি জিজ্ঞাসা কর 'তুমি কেন হলে' সে বলে, 'আমি হবার জন্যেই হলুম।' খাঁটি সাহিত্যেরও সেই একটিমাত্র জবাব।

অর্থাৎ, সৃষ্টির একটা দিক আছে যেটা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার বিশুদ্ধ বকুনি। সেদিক থেকে এমনও বলা যেতে পারে, তিনি আমাকে চিঠি লিখছেন। আমার কোনো চিঠির জবাবে নয়, তাঁর আপনার বলতে ইচ্ছে হয়েছে বলে; কাউকে তো বলা চাই। অনেকেই মন দিয়ে শোনে না, অনেকে বলে, 'এ তো সারবান নয়; এ তো বন্ধুর আলাপ, এ তো সম্পত্তির দলিল নয়।' সারবান থাকে মাটির গর্ভে, সোনার খনিতে; সে নেই ফুলের বাগানে, নেই সে উদয়দিগন্তে মেঘের মেলায়। আমি একটা গর্ব করে থাকি, ঐ চিঠিলিখিয়ের চিঠি পড়তে পারতপক্ষে কখনো ভুলি নে। বিশ্ব-বকুনি যখন-তখন আমি শুনে থাকি। তাতে বিষয়কাজের ক্ষতি হয়েছে, আর যারা আমাকে দলে ভিড়িয়ে কাজে লাগাতে চায় তাদের কাছ থেকে নিন্দাও শুনেছি; কিন্তু আমার এই দশা।

অথচ, মুশকিল হয়েছে এই যে, বিধাতাও আমাকে ছাড়েন নি। সৃষ্টিকর্তার লীলাঘর থেকে বিধাতার কারখানাঘর পর্যন্ত যে-রাস্তাটা গেছে সে-রাস্তায় দুই প্রান্তেই আমার আনাগোনার কামাই নেই।

এই দোটানায় পড়ে আমি একটা কথা শিখেছি। যিনি সৃষ্টিকর্তা স এব বিধাতা; সেইজন্যেই তাঁর সৃষ্টি ও বিধান এক হয়ে মিশেছে, তাঁর লীলা ও কাজ এই দুয়ের মধ্যে একান্ত বিভাগ পাওয়া যায় না। তাঁর সকল কর্মই কারুকর্ম; ছুটিতে খাটুনিতে গড়া; কর্মের রূঢ় রূপের উপর সৌন্দর্যের আব্‌রু টেনে দিতে তাঁর আলস্য নেই। কর্মকে তিনি লজ্জা দেন নি। দেহের মধ্যে যন্ত্রের ব্যবস্থাকৌশল আছে কিন্তু তাকে আবৃত করে আছে তার সুষমাসৌষ্ঠব, বস্তুত সেইটেই প্রকাশমান।

মানুষকেও তিনি সৃষ্টি করবার অধিকার দিয়েছেন; এইটেই তার সব চেয়ে বড়ো অধিকার। মানুষ যেখানেই আপনার কর্মের গৌরব বোধ করেছে সেখানেই কর্মকে সুন্দর করবার চেষ্টা করেছে। তার ঘরকে বানাতে চায় সুন্দর করে; তার পানপাত্র অন্নপাত্র সুন্দর; তার কাপড়ে থাকে শোভার চেষ্টা। তার জীবনে প্রয়োজনের চেয়ে সজ্জার অংশ কম থাকে না। যেখানে মানুষের মধ্যে স্বভাবের সামঞ্জস্য আছে সেখানে এইরকমই ঘটে।

এই সামঞ্জস্য নষ্ট হয়, যেখানে কোনো একটা রিপু, বিশেষত লোভ অতি প্রবল হয়ে ওঠে। লোভ জিনিসটা মানুষের দৈন্য থেকে, তার লজ্জা নেই; সে আপন অসম্ভ্রমকে নিয়েই বড়াই করে। বড়ো বড়ো মুনফাওয়ালা পাটকল চটকল গঙ্গার ধারের লাবণ্যকে দলন করে ফেলেছে দম্ভভরেই। মানুষের রুচিকে সে একেবারেই স্বীকার করে নি; একমাত্র স্বীকার করেছে তার পাওনার ফুলে-ওঠা থলিটাকে।

বর্তমান যুগের বাহ্যরূপ তাই নির্লজ্জতায় ভরা। ঠিক যেন পাকযন্ত্রটা দেহের পর্দা থেকে সর্বসম্মুখে বেরিয়ে এসে আপন জটিল অন্ত্রতন্ত্র নিয়ে সর্বদা দোলায়মান। তার ক্ষুধার দাবি ও সুনিপুণ পাকপ্রণালীর বড়াইটাই সর্বাঙ্গীণ দেহের সম্পূর্ণ সৌষ্ঠবের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। দেহ যখন আপন স্বরূপকে প্রকাশ করতে চায় তখন সুসংযত সুষমার দ্বারাই করে; যখন সে আপন ক্ষুধাকেই সব ছাড়িয়ে একান্ত করে তোলে তখন বীভৎস হতে তার কিছুমাত্র লজ্জা নেই। লালায়িত রিপুর নির্লজ্জতাই বর্বরতার প্রধান লক্ষণ, তা সে সভ্যতার গিলটি-করা তকমাই পরুক কিংবা অসভ্যতার পশুচর্মেই সেজে বেড়াক— devil dance-ই নাচুক কিংবা jazz dance।

বর্তমান সভ্যতায় রুচির সঙ্গে কৌশলের যে বিচ্ছেদ চার দিক থেকেই দেখতে পাই তার একমাত্র কারণ, লোভটাই তার অন্য-সকল সাধনাকে ছাড়িয়ে লম্বোদর হয়ে উঠেছে। বস্তুর সংখ্যাধিক্য-বিস্তারের প্রচণ্ড উন্মত্ততায় সুন্দরকে সে জায়গা ছেড়ে দিতে চায় না। সৃষ্টিপ্রেমের সঙ্গে পণ্যলোভের এই বিরোধে মানবধর্মের মধ্যে যে-আত্মবিপ্লব ঘটে তাতে দাসেরই যদি জয় হয়, পেটুকতারই যদি আধিপত্য বাড়ে, তা হলে যম আপন সশস্ত্র দূত পাঠাতে দেরি করবে না; দলবল নিয়ে নেমে আসবে দ্বেষ হিংসা মোহ মদ মাৎসর্য, লক্ষ্মীকে দেবে বিদায় করে।

পূর্বেই বলেছি, দীনতা থেকে লোভের জন্ম; সেই লোভের একটি স্থূলতনু সহোদরা আছে তার নাম জড়তা। লোভের মধ্যে অসংযত উদ্যম; সেই উদ্যমেই তাকে অশোভন করে। জড়তায় তার উল্টো, সে নড়ে বসতে পারে না; সে না পারে সজ্জাকে গড়তে, না পারে আবর্জনাকে দূর করতে; তার অশোভনতা নিরুদ্যমের। সেই জড়তার অশোভনতায় আমাদের দেশের মানবসম্ভ্রম নষ্ট করেছে। তাই আমাদের ব্যবহারে আমাদের জীবনের অনুষ্ঠানে সৌন্দর্য বিদায় নিতে বসল; আমাদের ঘরে-দ্বারে বেশে-ভূষায় ব্যবহারসামগ্রীতে রুচির স্বাধীন প্রকাশ রইল না; তার জায়গায় এসে পড়েছে চিত্তহীন আড়ম্বর—এতদূর পর্যন্ত শক্তির অসাড়তা এবং আপন রুচি সম্বন্ধেও নির্লজ্জ আত্ম-অবিশ্বাস যে, আমাদের সেই আড়ম্বরের সহায় হয়েছে চৌরঙ্গির বিলিতি দোকানগুলো।

বার বার মনে করি, লেখাগুলোকে করব বঙ্কিমবাবু যাকে বলেছেন 'সাধের তরণী'। কিন্তু, কোথা থেকে বোঝা এসে জমে, দেখতে দেখতে সাধের তরী হয়ে ওঠে বোঝাই-তরী। ভিতরে রয়েছে নানাপ্রকারের ক্ষোভ, লেখনীর আওয়াজ শুনেই তারা স্থানে অস্থানে বেরিয়ে পড়ে; কোনো বিশেষ

প্রসঙ্গ যার মালেক নয় এমন একটা রচনা পেলেই সেটাকে অম্নিবাস গাড়ি করে তোলে। কেউ-বা ভিতরেই ঢুকে বেঞ্চির উপর পা তুলে বসে যায়, কেউ-বা পায়দানে চড়ে চলতে থাকে; তার পরে যেখানে-খুশি অকস্মাৎ লাফ দিয়ে নেমে পড়ে।

আজ শ্রাবণমাসের পয়লা। কিন্তু ঝাঁকড়া-ঝুঁটিওয়ালা শ্রাবণ এক ভবঘুরে বেদের মতো তার কালো মেঘের তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে কোথায় যে চলে গেছে তার ঠিকানা নেই। আজ যেন আকাশ-সরস্বতী নীলপদ্মের দোলায় দাঁড়িয়ে। আমার মন ঐ সঙ্গে সঙ্গে দুলছে সমস্ত পৃথিবীটাকে ঘিরে। আমি যেন আলোতে তৈরি, বাণীতে গড়া, বিশ্বরাগিণীতে ঝংকৃত, জলে স্থলে আকাশে ছড়িয়ে যাওয়া। আমি শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রটা কোন্ কাল থেকে কেবলই ভেরী বাজাচ্ছে, আর পৃথিবীতে তারই উত্থান-পতনের ছন্দে জীবের ইতিহাসযাত্রা চলেছে আবির্ভাবের অস্পষ্টতা থেকে তিরোভাবের অদৃশ্যের মধ্যে। একদল বিপুলকায় বিকটাকার প্রাণী যেন সৃষ্টিকর্তার দুঃস্বপ্নের মতো দলে দলে এল, আবার মিলিয়ে গেল। তার পরে মানুষের ইতিহাস কবে শুরু হল প্রদোষের ক্ষীণ আলোতে, গুহাগহ্বর-অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায়। দুই পায়ের উপর খাড়া-দাঁড়ানো ছোটো ছোটো চটুল জীব, লাফ দিয়ে চড়ে চড়ে বসল মহাকায় বিপদবিভীষিকার পিঠের উপর, বিষ্ণু যেমন চড়েছেন গরুড়ের পিঠে। অসাধ্যের সাধনায় চলল তারা জীর্ণ যুগান্তরের ভগ্নাংশবিকীর্ণ দুর্গম পথে। তারই সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীকে ঘিরে ঘিরে বরুণের মৃদঙ্গ বাজতে লাগল দিনে রাত্রে, তরঙ্গে তরঙ্গে। আজ তাই শুনছি, আর এমন-কোনো একটা কথা ছন্দে আবৃত্তি করতে ইচ্ছা করছে যা অনাদিকালের। আজকের দিনের মতোই এইরকম আলো-ঝল্‌মলানো কলকল্লোলিত নীলজলের দিকে তাকিয়ে ইংরেজ কবি শেলি একটি কবিতা লিখেছেন—

The sun is warm, the sky is clear,
The waves are dancing fast and bright.

কিন্তু, এ তাঁর ক্লান্ত জীবনের অবসাদের বিলাপ। এর সঙ্গে আজ ভিতরে বাইরে মিল পাচ্ছি নে। একটা জগৎজোড়া কলক্রন্দন শুনতে পাচ্ছি বটে, সেই ক্রন্দন ভরিয়ে তুলছে অন্তরীক্ষকে, যে-অন্তরীক্ষের উপর বিশ্বরচনার ভূমিকা, যে-অন্তরীক্ষকে বৈদিক ভারত নাম দিয়েছে ক্রন্দসী। এ কিন্তু শ্রান্তিভারাতুর পরাভবের ক্রন্দন নয়। এ নবজাত শিশুর ক্রন্দন, যে-শিশু ঊর্ধ্বস্বরে বিশ্বদ্বারে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করে তার প্রথমক্রন্দিত নিশ্বাসেই জানায়, 'অয়মহং ভোঃ।' অসীম ভাবীকালের দ্বারে সে অতিথি। অস্তিত্বের ঘোষণায় একটা বিপুল কান্না আছে। কেননা, বারে বারে তাকে ছিন্ন করতে হয় আবরণ, চূর্ণ করতে হয় বাধা। অস্তিত্বের অধিকার পড়ে-পাওয়া জিনিস নয়, প্রতি মুহূর্তেই সেটা লড়াই-করে-নেওয়া জিনিস। তাই তার কান্না এত তীব্র, আর জীবলোকে সকলের চেয়ে তীব্র মানবসত্তার নবজীবনের কান্না। সে যেন অন্ধকারের গর্ভ বিদারণ-করা নবজাত আলোকের ক্রন্দনধ্বনি। তারই সঙ্গে সঙ্গে নব নব জন্মে নব নব যুগে দেবলোকে বাজে মঙ্গলশঙ্খ, উচ্চারিত হয় বিশ্বপিতামহের অভিনন্দন মন্ত্র।

আজকের দিনে এই আমার শেষ উপলব্ধি নয়। সকালে দেখলুম, সমুদ্রের প্রান্তরেখায় আকাশ তার জ্যোতির্ময়ী চিরন্তনী বাণীটি লিখে দিলে; সেটি পরম শান্তির বাণী, তা মর্ত্যলোকের বহু যুগের বহু দুঃখের আর্তকোলাহলের আবর্তকে ছাড়িয়ে ওঠে, যেন অশ্রুর ঢেউয়ের উপরে শ্বেতপদ্মের মতো। তার পরে দিনশেষের দিকে দেখলুম একটি অখ্যাত ব্যক্তিকে, যার মধ্যে মনুষ্যত্ব অপমানিত—যদি সময় পাই তার কথা পরে বলব। তখন মানব-ইতিহাসের দিগন্তে দিগন্তে দেখতে পেলুম বিরোধের কালো মেঘ, অশান্তির প্রচ্ছন্ন বজ্রগর্জন, আর লোকালয়ের উপর রুদ্রের ভ্রূকুটিচ্ছায়া। ইতি ২ শ্রাবণ ১৩৩৪[১]

[১] নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত।

৩

বুনো হাতি মূর্তিমান উৎপাত, বজ্রবৃংহিত ঝড়ের মেঘের মতো। এতটুকু মানুষ, হাতির একটা পায়ের সঙ্গেও যার তুলনা হয় না, সে ওকে দেখে খামখা বলে উঠল, 'আমি এর পিঠে চড়ে বেড়াব।' এই প্রকাণ্ড দুর্দাম প্রাণপিণ্ডটাকে গাঁ গাঁ করে শুঁড় তুলে আসতে দেখেও এমন অসম্ভবপ্রায় কথা কোনো একজন ক্ষীণকায় মানুষ কোনো এককালে ভাবতেও পেরেছে, এইটেই আশ্চর্য। তার পরে 'পিঠে চড়ব' বলা থেকে আরম্ভ করে পিঠে চড়ে-বসা পর্যন্ত যে-ইতিহাস সেটাও অতি অদ্ভুত। অনেকদিন পর্যন্তই সেই অসম্ভবের চেহারা সম্ভবের কাছ দিয়েও আসে নি—পরম্পরাক্রমে কত বিফলতা কত অপঘাত মানুষের সংকল্পকে বিদ্রূপ করেছে তার সংখ্যা নেই; সেটা গণনা করে করে মানুষ বলতে পারত, এটা হবার নয়। কিন্তু তা বলে নি। অবশেষে একদিন সে হাতির মতো জন্তুরও পিঠে চড়ে ফসলখেতের ধারে লোকালয়ের রাস্তায়-ঘাটে ঘুরে বেড়াল। এটা সাংঘাতিক অধ্যবসায়, সেইজন্যেই গণেশের হাতির মুণ্ডে মানুষের সিদ্ধির মূর্তি। এই সিদ্ধির দুই দিকে দুই জন্তুর চেহারা, এক দিকে রহস্যসন্ধানকারী সূক্ষ্মঘ্রাণ তীক্ষ্নদৃষ্টি খরদন্ত চঞ্চল কৌতূহল, সেটা ইঁদুর, সেইটেই বাহন; আর-একদিকে বন্ধনে বশীভূত বন্যশক্তি যা দুর্গমের উপর দিয়ে বাধা ডিঙিয়ে চলে, সেই হল যান—সিদ্ধির যানবাহনযোগে মানুষ কেবলই এগিয়ে চলছে। তার ল্যাবরেটরিতে ছিল ইঁদুর, আর তার এরোপ্লেনের মোটরে আছে হাতি। ইঁদুরটা চুপিচুপি সন্ধান বাতলিয়ে দেয়, কিন্তু ঐ হাতিটাকে কায়দা করে নিতে মানুষের অনেক দুঃখ। তা হোক, মানুষ দুঃখকে দেখে হার মানে না, তাই সে আজ দ্যুলোকের রাস্তায় যাত্রা আরম্ভ করলে। কালিদাস রাঘবদের কথায় বলেছেন, তাঁরা 'আনাকরথবর্ত্মনাম্'—স্বর্গ পর্যন্ত তাঁদের রথের রাস্তা। যখন এ কথা কবি বলেছেন তখন মাটির মানুষের মাথায় এই অদ্ভুত চিন্তা ছিল যে, আকাশে না চললে মানুষের সার্থকতা নেই। সেই চিন্তা ক্রমে আজ রূপ ধরে বাইরের আকাশে পাখা ছড়িয়ে দিলে। কিন্তু, রূপ যে ধরল সে মৃত্যুজয়কারী ভীষণ তপস্যায়। মানুষের বিজ্ঞানবুদ্ধি সন্ধান করতে জানে, এই যথেষ্ট নয়; মানুষের কীর্তিবুদ্ধি সাহস করতে জানে, এইটে তার সঙ্গে যখন মিলেছে তখনই সাধকদের তপঃসিদ্ধির পথে পথে ইন্দ্রদেব যে-সব বাধা রেখে দেন সেগুলো ধূলিসাৎ হয়।

তীরে দাঁড়িয়ে মানুষ সামনে দেখলে সমুদ্র। এত বড়ো বাধা কল্পনা করাই যায় না। চোখে দেখতে পায় না এর পার, তলিয়ে পায় না এর তল। যমের মোষের মতো কালো, দিগন্তপ্রসারিত বিরাট একটা নিষেধ কেবলই তরঙ্গতর্জনী তুলছে। চিরবিদ্রোহী মানুষ বললে, 'নিষেধ মানব না।' বজ্রগর্জনে জবাব এল, 'না মান তো মরবে।' মানুষ তার এতটুকুমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলে বললে, 'মরি তো মরব!' এই হল জাত-বিদ্রোহীদের উপযুক্ত কথা। জাত-বিদ্রোহীরাই চিরদিন জিতে এসেছে। একেবারে গোড়া থেকেই প্রকৃতির শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষ নানা ভাবেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিলে। আজ পর্যন্ত তাই চলছে। মানুষদের মধ্যে যারা যত খাঁটি বিদ্রোহী, যারা বাহ্য শাসনের সীমাগণ্ডি যতই মানতে চায় না, তাদের অধিকার ততই বেড়ে চলতে থাকে।

যেদিন সাড়ে তিনহাত মানুষ স্পর্ধা করে বললে, 'এই সমুদ্রের পিঠে চড়ব' সেদিন দেবতারা হাসলেন না; তাঁরা এই বিদ্রোহীর কানে জয়মন্ত্র পড়িয়ে দিয়ে অপেক্ষা করে রইলেন। সমুদ্রের পিঠ আজ আয়ত্ত হয়েছে, সমুদ্রের তলটাকেও কায়দা করা শুরু হল। সাধনার পথে ভয় বার বার ব্যঙ্গ করে উঠছে; বিদ্রোহীর অন্তরের মধ্যে উত্তরসাধক অবিচলিত বসে প্রহরে প্রহরে হাঁক দিচ্ছে, 'মা ভৈঃ।'

কালকের চিঠিতে ক্রন্দসীর কথা বলেছি, অন্তরীক্ষে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে সত্তার ক্রন্দন গ্রহে নক্ষত্রে। এই সত্তা বিদ্রোহী, অসীম অব্যক্তের সঙ্গে তার নিরন্তর লড়াই। বিরাট অপ্রকাশের তুলনায় সে অতি সামান্য, কিন্তু অন্ধকারের অন্তহীন পারাবারের উপর দিয়ে ছোটো ছোটো কোটি কোটি

আলোর তরী সে ভাসিয়ে দিয়েছে— দেশকালের বুক চিরে অতলস্পর্শের উপর দিয়ে তার অভিযান। কিছু ডুবছে, কিছু ভাসছে, তবু যাত্রার শেষ নেই।

প্রাণ তার বিদ্রোহের ধ্বজা নিয়ে পৃথিবীতে অতি দুর্বলরূপে একদিন দেখা দিয়েছিল। অতি প্রকাণ্ড, অতি কঠিন, অতি গুরুভার অপ্রাণ চারি দিকে গদা উদ্যত করে দাঁড়িয়ে, আপন ধুলোর কয়েদখানায় তাকে দ্বার জানলা বন্ধ করে প্রচণ্ড শাসনে রাখতে চায়। কিন্তু, বিদ্রোহী প্রাণ কিছুতেই দমে না; দেয়ালে দেয়ালে কত জায়গায় কত ফুটোই করছে তার সংখ্যা নেই, কেবলই আলোর পথ নানা দিক দিয়েই খুলে দিচ্ছে।

সত্তার এই বিদ্রোহমন্ত্রের সাধনায় মানুষ যতদূর এগিয়েছে এমন আর-কোনো জীব না। মানুষের মধ্যে যার বিদ্রোহশক্তি যত প্রবল, যত দুর্দমনীয়, ইতিহাসকে ততই সে যুগ হতে যুগান্তরে অধিকার করছে, শুধু সত্তার ব্যাপ্তি দ্বারা নয়, সত্তার ঐশ্বর্য দ্বারা।

এই বিদ্রোহের সাধনা দুঃখের সাধনা; দুঃখই হচ্ছে হাতি, দুঃখই হচ্ছে সমুদ্র। বীর্যের দর্পে এর পিঠে যারা চড়ল তারাই বাঁচল; ভয়ে অভিভূত হয়ে এর তলায় যারা পড়েছে তারা মরেছে। আর, যারা একে এড়িয়ে সস্তায় ফল লাভ করতে চায় তারা নকল ফলের ছদ্মবেশে ফাঁকির বোঝার ভারে মাথা হেঁট করে বেড়ায়। আমাদের ঘরের কাছে সেই জাতের মানুষ অনেক দেখা যায়। বীরত্বের হাঁকডাক করতে তারা শিখেছে, কিন্তু সেটা যথাসম্ভব নিরাপদে করতে চায়। যখন মার আসে তখন নালিশ করে বলে, বড়ো লাগছে। এরা পৌরুষের পরীক্ষাশালায় বসে বিলিতি বই থেকে তার বুলি চুরি করে, কিন্তু কাগজের পরীক্ষা থেকে যখন হাতের পরীক্ষার সময় আসে তখন প্রতিপক্ষের অনৌদার্য নিয়ে মামলা তুলে বলে, 'ওদের স্বভাব ভালো নয়, ওরা বাধা দেয়।'

মানুষকে নারায়ণ সখা বলে তখনই সম্মান করেছেন যখন তাকে দেখিয়েছেন তাঁর উগ্ররূপ, তাকে দিয়ে যখন বলিয়েছেন : দৃষ্ট্বাদ্ভুতংরূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্— যখন মানুষ প্রাণমন দিয়ে এই স্তব করতে পেরেছে :

অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ।

তুমিই অনন্তবীর্য, তুমিই অমিতবিক্রম, তুমিই সমস্তকে গ্রহণ করো, তুমিই সমস্ত। ইতি ৩ শ্রাবণ ১৩৩৪[১]

৪

কাল সকালেই পৌঁছব সিঙাপুরে। তার পর থেকে আমার ডাঙার পালা। এই-যে চলছে আমার মনে মনে বকুনি, এটাতে খুবই বাধা হবে। অবকাশের অভাব হবে বলে নয়, মন এই কদিন যে-কক্ষে চলছিল সে-কক্ষ থেকে ভ্রষ্ট হবে বলে। কিসের জন্যে। সর্বসাধারণ বলে যে একটি মনুষ্যসমষ্টি আছে তারই আকর্ষণে।

লেখবার সময় তার কোনো আকর্ষণ যে একটুও মনের মধ্যে থাকবে না, তা হতেই পারে না। কিন্তু, তার নিকটের আকর্ষণটা লেখার পক্ষে বড়ো ব্যাঘাত। কাছে যখন সে থাকে তখন সে কেবলই ঠেলা দিয়ে দিয়ে দাবি করতে থাকে। দাবি করে তারই নিজের মনের কথাটাকে। প্রকাণ্ড একটা বাইরের ফরমাশ কলমটাকে ভিতরে ভিতরে টান মারে। বলতে চাই বটে 'তোমাকে গ্রাহ্য করি নে', কিন্তু হেঁকে উঠে বলার মধ্যেই গ্রাহ্য করাটা প্রমাণ হয়।

---

[১] নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত।

আসল কথা সাহিত্যের শ্রোতৃসভায় আজ সর্বসাধারণই রাজাসনে। এ সত্যটাকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে লিখতে বসা অসম্ভব। প্রশ্ন উঠতে পারে উড়িয়ে দেবেই বা কেন। এমন সময় কবে ছিল যখন সাহিত্য সমস্ত মানবসাধারণের জন্যেই ছিল না?

কথাটা একটু ভেবে-দেখবার। কালিদাসের মেঘদূত মানবসাধারণের জন্যেই লেখা, আজ তার প্রমাণ হয়ে গেছে। যদি কোনো বিশিষ্ট দলের জন্যে লেখা হত তা হলে সে দলও থাকত না আর মেঘদূতও যেত তারই সঙ্গে অনুমরণে। কিন্তু, এখন যাকে পাবলিক বলছি কালিদাসের সময় সেই পাবলিক অত্যন্ত গা-ঘেঁষা হয়ে শ্রোতারূপে ছিল না। যদি থাকত তা হলে যে-মানবসাধারণ শত শত বৎসরের মহাক্ষেত্রে সমাগত তাদের পথ তারা অনেকটা পরিমাণে আটকে দিত।

এখনকার পাবলিক একটা বিশেষ কালের দানাবাঁধা সর্বসাধারণ। তার মধ্যে খুব নিরেট হয়ে তাল-পাকিয়ে আছে এখনকার কালের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, এখনকার কালের বিশেষ রুচি প্রবৃত্তি এবং আরও কত কী। এই সর্বসাধারণ যে মানবসাধারণের প্রতিরূপ, তা বলা চলবে না। এর ফরমাশ যে একশো বছর পরের ফরমাশের সঙ্গে মিলবে না, সে কথা জোর করেই বলতে পারি। কিন্তু, এই উপস্থিতকালের সর্বসাধারণ কানের খুব কাছে এসে জোর গলায় দুয়ো দিচ্ছে, বাহবা দিচ্ছে।

উপস্থিতকালের সংকীর্ণ পরিধির তুলনাতেও এই দুয়ো-বাহবার স্থায়িত্ব অকিঞ্চিৎকর। পাবলিক-মহারাজ আজ দুই চোখ লাল করে যে-কথাটাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আসছে-কাল সেইটেকেই এমনি চড়া গলায় ব্যবহার করে যেন সেটা তার নিজেরই চিরকালের চিন্তিত কথা। আজ যে কথা শুনে তার দুই গাল বেয়ে চোখের জল বয়ে গেল, আসছে-কাল সেটাকে নিয়ে হাসাহাসি করবার সময় নিজের গদ্‌গদচিত্তের পূর্ব ইতিহাসটি সম্পূর্ণ বে-কবুল যায়।

ইংরেজ বেনের আপিসঘর-গুদামঘরের আশেপাশে হঠাৎ যখন কলকাতা শহরটা মাথাঝাড়া দিয়ে উঠল তখন সেখানে এই নূতন-গড়া দোকানপাড়ার এক পাবলিক দেখা দিলে। অন্তত, তার এক ভাগের চেহারা হুতুম পেঁচার নকশায় উঠেছে। তারই ফরমাশের ছাপ পড়েছে দাশুরায়ের পাঁচালিতে। ঘন ঘন অনুপ্রাস তপ্ত-খোলার উপরকার খইয়ের মতো পট্‌পট্‌ শব্দে ফুটে ফুটে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল—

> ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে,
> নিতান্ত কৃতান্ত-ভয়ান্ত হবে ভবে।

চারি দিকে হায়-হায় শব্দে সভা তোলপাড়। দুই কানে হাত-চাপা, তারস্বরে দ্রুত লয়ে গান উঠল—

> ওরে রে লক্ষ্মণ, এ কী অলক্ষণ,
> বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ।
> অতি নগণ্য কাজে, অতি জঘন্য সাজে
> ঘোর অরণ্য-মাঝে কত কাঁদিলাম। ইত্যাদি।

দোকানপাড়ার জনসাধারণ খুশি হয়ে নগদ বিদায় করলে। অবকাশের সম্পদকে অবকাশের শিক্ষাযোগে ভোগ করবার শক্তি যার ছিল না সেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাটের পাবলিককে মাথা-গুনতির জোরে মানবসাধারণের প্রতিনিধি বলে মেনে নিতে হবে নাকি। বস্তুত, এই জনসাধারণই দাশুরায়ের প্রতিভাকে বিশ্বসাধারণের মহাসভায় উত্তীর্ণ হতে বাধা দিয়েছিল।

অথচ, মৈমনসিং থেকে যে-সব গাথা সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে সহজেই বেজে উঠছে বিশ্ব-সাহিত্যের সুর। কোনো শহুরে পাবলিকের দ্রুত ফরমাশের ছাঁচে ঢালা সাহিত্য তো সে নয়। মানুষের চিরকালের সুখদুঃখের প্রেরণায় লেখা সেই গাথা। যদি-বা ভিড়ের মধ্যে গাওয়া হয়েও

থাকে, তবু এ ভিড় বিশেষ কালের বিশেষ ভিড় নয়। তাই এ সাহিত্য সেই ফসলের মতো যা গ্রামের লোক আপন মাটির বাসনে ভোগ করে থাকে বটে তবুও তা বিশ্বেরই ফসল—তা ধানের মঞ্জরী।

যে-কবিকে আমরা কবি বলে সম্মান করে থাকি তার প্রতি সম্মানের মধ্যে এই সাধুবাদটুকু থাকে যে, তার একলার কথাই আমাদের সকলের কথা। এইজন্যেই কবিকে একলা বলতে দিলেই সে সকলের কথা সহজে বলতে পারে। হাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেইদিনকার হাটের লোকের মনের কথা যেমন-তেমন করে মিলিয়ে দিয়ে তাদের সেইদিনকার বহু-মুণ্ডের মাথা-নাড়া-গুনতির জোরে আমরা যেন আপন রচনাকে কৃতার্থ মনে না করি, যেন আমাদের এই কথা মনে করবার সাহস থাকে যে, সাহিত্যের গণনাতত্ত্বে এক অনেক সময়েই হাজারের চেয়ে সংখ্যায় বেশি হয়ে থাকে।

এইবার আমার জাহাজের চিঠি তার অন্তিম পঙ্‌ক্তির দিকে হেলে পড়ল। বিদায় নেবার পূর্বে তোমার কাছে মাপ চাওয়া দরকার মনে করছি। তার কারণ, চিঠি লিখব বলে বসলুম কিন্তু কোনোমতেই চিঠি লেখা হয়ে উঠল না। এর থেকে আশঙ্কা হচ্ছে, আমার চিঠি লেখবার বয়স পেরিয়ে গেছে। প্রতিদিনের স্রোতের থেকে প্রতিদিনের ভেসে-আসা কথা ছেঁকে তোলবার শক্তি এখন আমার নেই। চলতে চলতে চার দিকের পরিচয় দিয়ে যাওয়া এখন আমার দ্বারা আর সহজ হয় না। অথচ, একসময়ে এ শক্তি আমার ছিল। তখন অনেককে অনেক চিঠিই লিখেছি। সেই চিঠিগুলি ছিল চলতি কালের সিনেমা ছবি। তখন ছিল মনের পটটা বাইরের সমস্ত আলোছায়ার দিকে মেলে দেওয়া। সেই-সব ছাপের ধারায় চলত চিঠি। এখন বুঝি-বা বাইরের ছবির ফোটো-গ্রাফটা বন্ধ হয়ে গিয়ে মনের ধ্বনির ফোনোগ্রাফটাই সজাগ হয়ে উঠেছে। এখন হয়তো দেখি কম শুনি বেশি।

মানুষ তো কোনো-একটা জায়গায় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। এইজন্যেই চলচ্চিত্র ছাড়া তার যথার্থ চিত্র হতেই পারে না। প্রবহমান ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে চলমান আপনার পরিচয় মানুষ দিতে থাকে। যারা আপনলোক, নিয়ত তারা সেই পরিচয়টা পেতে ইচ্ছে করে। বিদেশে নূতন নূতন ধাবমান অবস্থা ও ঘটনার চঞ্চল ভূমিকার উপরে প্রকাশিত আত্মীয়-লোকের ধারাবাহিক পরিচয়ের ইচ্ছা স্বাভাবিক। চিঠি সেই ইচ্ছা পূরণ করবার জন্যেই।

কিন্তু, সকলপ্রকার রচনাই স্বাভাবিক শক্তির অপেক্ষা করে। চিঠি-রচনাও তাই। আমাদের দলের মধ্যে আছেন সুনীতি। আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত বলেই জানতুম। অর্থাৎ, আস্ত জিনিসকে টুকরো করা ও টুকরো জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজেই তিনি হাত পাকিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবার দেখলুম, বিশ্ব বলতে যে-ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় করে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তালভঙ্গ না করে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন আর কাগজে-কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে বিশ্বব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ। তাঁর নিজের কাছে তুচ্ছ বলে কিছুই নেই, তাই তাঁর কলমে তুচ্ছও এমন একটি স্থান পায় যাতে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। সাধারণত, এ কথা বলা চলে যে শব্দতত্ত্বের মধ্যে যারা তলিয়ে গেছে শব্দচিত্র তাদের এলেকার সম্পূর্ণ বাইরে, কেননা চিত্রটা একেবারে উপরের তলায়। কিন্তু, সুনীতির মনে সুগভীর তত্ত্ব ভাসমান চিত্রকে ডুবিয়ে মারে নি এই বড়ো অপূর্ব। সুনীতির নীরন্ধ্র চিঠিগুলি তোমরা যথাসময়ে পড়তে পাবে—দেখবে এগুলো একেবারে বাদশাই চিঠি। এতে চিঠির ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্; বর্ণনাসাম্রাজ্য সর্বগ্রাহী, ছোটো বড়ো কিছুই তার থেকে বাদ পড়ে নি। সুনীতিকে উপাধি দেওয়া উচিত, লিপিবাচস্পতি কিংবা লিপিসার্বভৌম কিংবা লিপিচক্রবর্তী। ইতি ৩ শ্রাবণ ১৩৩৪। নাগপঞ্চমী[১]

---

[১] নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত।

৫

সামনে সমুদ্রের অর্ধচন্দ্রাকার তটসীমা। অনেক দূর পর্যন্ত জল অগভীর, জলের রঙে মাটির আভাস, সে যেন ধরণীর গেরুয়া আঁচল এলিয়ে পড়েছে। ঢেউ নেই, সমস্ত দিন জলরাশি এগোয় আর পিছোয় অতি ধীর গমনে। অপ্সরী আসছে চুপি চুপি পিছন থেকে পৃথিবীর চোখ টিপে ধরবে বলে— সোনার রেখায় রেখায় কৌতুকের মুচকে-হাসি।

সামনে বাঁ-দিকে একদল নারকেলগাছ, সুদীর্ঘ গুঁড়ির উপর সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারে নি, পরস্পরের দিকে তাদের হেলাহেলি। নিত্যদোলায়িত শাখায় শাখায় সূর্যের আলো ওরা ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে, চঞ্চল ছেলেরা যেমন নদীর ঘাটে জল-ছোঁড়াছুঁড়ি করে। সকালের আকাশে ওদের এই অবগাহন স্নান।

এটা একজন চীনীয় ধনীর বাড়ি। আমরা তাঁর অতিথি। প্রশস্ত বারান্দায় বেতের কেদারায় বসে আছি। সমুদ্রের দিক থেকে বুক ভরে বইছে পশ্চিমে হাওয়া। চেয়ে দেখছি, আকাশের কোণে কোণে দলভাঙা মেঘগুলি শ্রাবণের কালো উর্দি ছেড়ে ফেলেছে, এখন কিছুদিনের জন্যে সূর্যের আলোর সঙ্গে ওদের সন্ধি। আমার অস্পষ্ট ভাবনাগুলোর উপর ঝরে পড়ছে কম্পমান নারকেল-পাতার ঝরঝর শব্দের বৃষ্টি, বালির উপর দিয়ে ভাঁটার সমুদ্রের পিছু-হটার শব্দ ওরই সঙ্গে একই মৃদুস্বরে মেলানো। ওদিকে পাশের ঘরে ধীরেন এসরাজ নিয়ে আপন মনে বাজিয়ে চলেছে— ভৈরোঁ থেকে রামকেলি, রামকেলি থেকে ভৈরবী; আস্তে আস্তে অকেজো মেঘের মতো খেয়ালের হাওয়ায় বদল হচ্ছে রাগিণীর আকৃতি।

আজ সকালে মনটা যেন ভাঁটার সমুদ্র, তীরের দিক টানছে তাকে কোন্ দিকে তার ঠিকানা নেই। আপনাকে আপন সর্বাঙ্গে সর্বান্তঃকরণে ভরপুর মেলে দিয়ে বসে আছি, নিবিড় তরুপল্লবের শ্যামলতায় আবিষ্ট রোদ-পোয়ানো ঐ ছোটো দ্বীপটির মতো।

আমার মধ্যে এই ঘনীভূত অনুভবটিকে বলা যেতে পারে হওয়ার আনন্দ। রূপে রঙে আলোয় ধ্বনিতে আকাশে অবকাশে ভরে-ওঠা একটি মূর্তিমান সমগ্রতা আমার চিত্তের উপরে ঘা দিয়ে বলছে 'আছি'; তারই জগতে আমার চৈতন্য উছলে উঠছে; সমুদ্রকল্লোলেরই মতো একতান শব্দ জাগছে, ওম্, অর্থাৎ এই-যে আমি। বিরাট একটা 'না', হাঁ-করা তার মুখগহ্বর, প্রকাণ্ড তার শূন্য— তারই সামনে ঐ নারকেলগাছ দাঁড়িয়ে, পাতা নেড়ে নেড়ে বলছে, এই-যে আমি। দুঃসাহসিক সত্তার এই স্পর্ধা গভীর বিস্ময়ে বাজছে আমার মনে, আর ধীরেন ঐ-যে ভৈরবীতে মীড় লাগিয়েছে সেও যেন বিশ্বসত্তার আত্মঘোষণা, আপন কম্পমান সুরের ধ্বজাটিকে অসীম শূন্যের মাঝখানে তুলে ধরেছে।

এই তো হল 'হওয়া'। এইখানেই শেষ নেই। এর সঙ্গে আছে করা। সমুদ্র আছে অন্তরে অন্তরে নিস্তব্ধ, কিন্তু তার উপরে উপরে উঠছে ঢেউ, চলছে জোয়ার ভাঁটা। জীবনে করার বিরাম নেই। এই করার দিকে কত প্রয়াস, কত উপকরণ, কত আবর্জনা। এরা সব জমে জমে কেবলই গণ্ডি হয়ে ওঠে, দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। এরা বাহিরে সমগ্রতার ক্ষেত্রকে, অন্তরে পরিপূর্ণতার উপলব্ধিকে, টুকরো টুকরো করতে থাকে। অহমিকার উত্তেজনায় কর্ম উদ্ধত হয়ে, একান্ত হয়ে, আপনাকে সকলের আগে ঠেলে তোলে; হওয়ার চেয়ে করা বড়ো হয়ে উঠতে চায়। এতে ক্লান্তি, এতে অশান্তি, এতে মিথ্যা। বিশ্বকর্মার বাঁশিতে নিয়তই যে ছুটির সুর বাজে এই কারণেই সেটা শুনতে পাই নে; সেই ছুটির সুরেই বিশ্বকাজের ছন্দ বাঁধা।

সেই সুরটি আজ সকালের আলোতে ঐ নারকেলগাছের তানপুরায় বাজছে। ওখানে দেখতে পাচ্ছি, শক্তির রূপ আর মুক্তির রূপ অনবচ্ছিন্ন এক। এতেই শান্তি, এতেই সৌন্দর্য। জীবনের মধ্যে এই মিলনটিই তো খুঁজি— করার চিরবহমান নদীধারায় আর হওয়ার চিরগম্ভীর মহাসমুদ্রে মিলন। এই আত্মপরিতৃপ্ত মিলনটিকে লক্ষ করেই গীতা বলেছেন 'কর্ম করো, ফল চেয়ো না।'

এই চাওয়ার রাহুটাই কর্মের পাত্র থেকে তার অমৃত ঢেলে নেবার জন্যে লালায়িত। ভিতরকার সহজ হওয়াটি সার্থক হয় বাইরেকার সহজ কর্মে। অন্তরের সেই সার্থকতার চেয়ে বাইরের স্বার্থ প্রবল হয়ে উঠলেই কর্ম হয় বন্ধন; সেই বন্ধনেই জড়িত যত হিংসা দ্বেষ ঈর্ষ্যা, নিজেকে ও অন্যকে প্রবঞ্চনা। এই কর্মের দুঃখ, কর্মের অগৌরব, যখন অসহ্য হয়ে ওঠে তখন মানুষ বলে বসে 'দূর হোক গে, কর্ম ছেড়ে দিয়ে চলে যাই'। তখন আবার আহ্বান আসে, কর্ম ছেড়ে দিয়ে কর্ম থেকে নিষ্কৃতি নেই; করাতেই হওয়ার আত্মপ্রকাশ। বাহ্য ফলের দ্বারা নয়, আপন অন্তর্নিহিত সত্যের দ্বারাই কর্ম সার্থক হোক, তাতেই হোক মুক্তি।

ফল-চাওয়া কর্মের নাম চাকরি, সেই চাকরির মনিব আমি নিজেই হই বা অন্যেই হোক। চাকরিতে মাইনের জন্যেই কাজ, কাজের জন্যে কাজ নয়। কাজ তার নিজের ভিতর থেকে নিজে যখন কিছুই রস জোগায় না, সম্পূর্ণ বাইরে থেকেই যখন আপন দাম নেয়, তখনই মানুষকে সে অপমান করে। মর্ত্যলোকে প্রয়োজন বলে জিনিসটাকে একেবারেই অস্বীকার করতে পারি নে। বেঁচে থাকবার জন্যে আহার করতেই হবে। বলতে পারব না, 'নেই বা করলেম।' সেই আবশ্যকের তাড়াতেই পরের দ্বারে মানুষ উমেদারি করে, আর সেইসঙ্গেই তত্ত্বজ্ঞানী ভাবতে থাকে কী করলে এই কর্মের জড় মারা যায়। বিদ্রোহী মানুষ বলে বসে, বৈরাগ্যমেবাভয়ম্। অর্থাৎ, এতই কম খাব, কম পরব, রৌদ্রবৃষ্টি এমন করে সহ্য করতে শিখব, দাসত্বে প্রবৃত্ত করবার জন্যে প্রকৃতি আমাদের জন্যে যতরকম কানমলার ব্যবস্থা করেছে সেগুলোকে এতটা এড়িয়ে চলব যে, কর্মের দায় অত্যন্ত হালকা হয়ে যাবে। কিন্তু, প্রকৃতির কাজে শুধু কানমলার তাড়া নেই, সেইসঙ্গে রসের জোগান আছে। এক দিকে ক্ষুধায় দেয় দুঃখ, আর-এক দিকে রসনায় দেয় সুখ—প্রকৃতি একই সঙ্গে ভয় দেখিয়ে আর লোভ দেখিয়ে আমাদের কাজ করায়। সেই লোভের দিক থেকে আমাদের মনে জন্মায় ভোগের ইচ্ছা। বিদ্রোহী মানুষ বলে, ঐ ভোগের ইচ্ছাটা প্রকৃতির চাতুরী, ঐটেই মোহ, ওটাকে তাড়াও, বলো, বৈরাগ্যমেবাভয়ম্—মানব না দুঃখ, চাইব না সুখ।

দু-চারজন মানুষ এমনতরো স্পর্ধা করে ঘরবাড়ি ছেড়ে বনে জঙ্গলে ফলমূল খেয়ে কাটাতে পারে, কিন্তু সব মানুষই যদি এই পন্থা নেয় তা হলে বৈরাগ্য নিয়েই পরস্পর লড়াই বেধে যাবে—তখন বল্কলে কুলোবে না, গিরিগহ্বরে ঠেলাঠেলি ভিড় হবে, ফলমূল যাবে উজাড় হয়ে। তখন কপ্‌নিপরা ফৌজ মেশিন-গান বের করবে।

সাধারণ মানুষের সমস্যা এই যে, কর্ম করতেই হবে। জীবনধারণের গোড়াতেই প্রয়োজনের তাড়া আছেই। তবুও কী করলে কর্ম থেকে প্রয়োজনের চাপ যথাসম্ভব হালকা করা যেতে পারে। অর্থাৎ, কী করলে কর্মে পরের দাসত্বের চেয়ে নিজের কর্তৃত্বটা বড়ো হয়ে দেখা দেয়। কর্ম থেকে কর্তৃত্বকে যতই দূরে পাঠানো যাবে কর্ম ততই মজুরির বোঝা হয়ে মানুষকে চেপে মারবে; এই শূদ্রত্ব থেকে মানুষকে উদ্ধার করা চাই।

একটা কথা মনে পড়ে গেল। সেদিন যখন শিলঙে ছিলেম, নন্দলাল কার্সিয়ঙ থেকে পোস্ট-কার্ডে একটি ছবি পাঠিয়েছিলেন। স্যাকরা চার দিকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে চোখে চশমা এঁটে গয়না গড়ছে। ছবির মধ্যে এই কথাটি পরিস্ফুট যে, এই স্যাকরার কাজের বাইরের দিকে আছে তার দর, ভিতরের দিকে আছে তার আদর। এই কাজের দ্বারা স্যাকরা নিছক নিজের অভাব প্রকাশ করছে না, নিজের ভাবকে প্রকাশ করছে; আপন দক্ষতার গুণে আপন মনের ধ্যানকে মূর্তি দিচ্ছে। মুখ্যত এ-কাজটি তার আপনারই, গৌণত যে-মানুষ পয়সা দিয়ে কিনে নেবে তার। এতে করে ফলকামনাটা হয়ে গেল লঘু, মূল্যের সঙ্গে অমূল্যতার সামঞ্জস্য হল, কর্মের শূদ্রত্ব গেল ঘুচে। একালে বণিককে সমাজ অবজ্ঞা করত, কেননা, বণিক কেবল বিক্রি করে, দান করে না। কিন্তু, এই স্যাকরা এই-যে গয়নাটি গড়লে তার মধ্যে তার দান এবং বিক্রি একই কালে মিলে গেছে। সে ভিতর থেকে দিয়েছে, বাইরে থেকে জোগায় নি।

ভৃত্যকে রেখেছি তাকে দিয়ে ঘরের কাজ করাতে। মনিবের সঙ্গে তার মনুষ্যত্বের বিচ্ছেদ

একান্ত হলে সেটা হয় ষোলো-আনা দাসত্ব। যে-সমাজ লোভে বা দাম্ভিকতায় মানুষের প্রতি দরদ হারায় নি সে-সমাজ ভৃত্য আর আত্মীয়ের সীমারেখাটাকে যতদূর সম্ভব ফিকে করে দেয়। ভৃত্য সেখানে দাদা খুড়ো জেঠার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছয়। তখন তার কাজটা পরের কাজ না হয়ে আপনারই কাজ হয়ে ওঠে। তখন তার কাজের ফলকামনাটা যায় যথাসম্ভব ঘুচে। সে দাম পায় বটে, তবুও আপনার কাজ সে দান করে, বিক্রি করে না।

গুজরাটে কাঠিয়াবাড়ে দেখেছি, গোয়ালা গোরুকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। সেখানে তার দুধের ব্যবসায়ে ফলকামনাকে তুচ্ছ করে দিয়েছে তার ভালোবাসায়; কর্ম করেও কর্ম থেকে তার নিত্য মুক্তি। এ গোয়ালা শূদ্র নয়। যে-গোয়ালা দুধের দিকে দৃষ্টি রেখেই গোরু পোষে, কসাইকে গোরু বেচতে যার বাধে না, সেই হল শূদ্র; কর্মে তার অগৌরব, কর্ম তার বন্ধন। যে-কর্মের অন্তরে মুক্তি নেই, যেহেতু তাতে কেবল লোভ, তাতে প্রেমের অভাব, সেই কর্মেই শূদ্রত্ব। জাত-শূদ্রেরা পৃথিবীতে অনেক উঁচু উঁচু আসন অধিকার করে বসে আছে। তারা কেউ-বা শিক্ষক, কেউ-বা বিচারক, কেউ-বা শাসনকর্তা, কেউ-বা ধর্মযাজক। কত ঝি, দাই, চাকর, মালী, কুমোর, চাষি আছে যারা ওদের মতো শূদ্র নয়— আজকের এই রৌদ্রে-উজ্জ্বল সমুদ্রতীরের নারকেলগাছের মর্মরে তাদের জীবনসংগীতের মূল সুরটি বাজছে।

মলাক্কা
২৮ জুলাই ১৯২৭

৬

কল্যাণীয়াসু

এখনই দুশো মাইল দূরে এক জায়গায় যেতে হবে। সকলেই সাজসজ্জা করে জিনিসপত্র বেঁধে প্রস্তুত; কেবল আমিই তৈরি হয়ে নিতে পারি নি। এখনই রেলগাড়ির উদ্দেশে মোটরগাড়িতে চড়তে হবে। দ্বারের কাছে মোটরগাড়ি উদ্যত তারস্বরে মাঝে মাঝে শৃঙ্গধ্বনি করছে— আমাদের সঙ্গীদের কণ্ঠে তেমন জোর নেই, কিন্তু তাদের উৎকণ্ঠা কম প্রবল নয়। অতএব, এইখানেই উঠতে হল। দিনটি চমৎকার। নারকেলগাছের পাতা ঝিল্‌মিল্‌ করছে, ঝর্‌ঝর্‌ করছে, দুলে দুলে উঠছে, আর সামনেই সমুদ্র স্বগত-উক্তিতে অবিশ্রাম কলধ্বনিমুখরিত।[১]

মলাক্কা
৩০ জুলাই ১৯২৭

৭

কল্যাণীয়াসু

রানী, এসেছি গিয়ানয়ার রাজবাড়িতে। মধ্যাহ্নভোজনের পূর্বে সুনীতি রাজবাড়ির ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের নিয়ে খুব আসর জমিয়ে তুলেছিলেন। খেতে বসে রাজা আমাকে বললেন একটু সংস্কৃত আওড়াতে। দু-চার রকমের শ্লোক আওড়ানো গেল। সুনীতি একটি শ্লোকের পরিচয় দিতে গিয়ে যেমনি বললেন 'শার্দূলবিক্রীড়িত' অমনি রাজা সেটা উচ্চারণ করে জানালেন, তিনিও জানেন। এখানকার রাজার মুখে অত বড়ো একটা কড়া সংস্কৃত শব্দ শুনে আমি তো আশ্চর্য। তার পরে রাজা বলে গেলেন, শিখরিণী, স্রগ্ধরা, মালিনী, বসন্ততিলক, আরও কতকগুলো নাম যা আমাদের অলংকারশাস্ত্রে কখনো পাই নি। বললেন, তাঁদের ভাষায় এ-সব ছন্দ প্রচলিত। অথচ, মন্দাক্রান্তা বা অনুষ্টুভ এঁরা জানেন না। এখানে ভারতীয় বিদ্যার এই-সব ভাঙাচোরা মূর্তি

[১] নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত।

দেখে মনে হয় যেন ভূমিকম্প হয়ে একটা প্রাচীন মহানগরী ধ্বসে গিয়েছে, মাটির নীচে বসে গিয়েছে—সেই-সব জায়গায় উঠেছে পরবর্তী কালের ঘরবাড়ি চাষ-আবাদ; আবার অনেক জায়গায় সেই পুরোনো কীর্তির অবশেষ উপরে জেগে, এই দুইয়ে মিলে জোড়া-তাড়া দিয়ে এখানকার লোকালয়।

সেকালের ভারতবর্ষের যা-কিছু বাকি আছে তার থেকে ভারতের তখনকার কালের বিবরণ অনেকটা আন্দাজ করা যায়। এখানে হিন্দুধর্ম প্রধানতই শৈব। দুর্গা আছেন কিন্তু কপালমালিনী লোলরসনা উলঙ্গিনী কালী নেই। কোনো দেবতার কাছে পশুবলি এরা জানে না। কিছুকাল আগে অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ উপলক্ষে পশুবধ হত, কিন্তু দেবীর কাছে জীবরক্ত নৈবেদ্য দেওয়া হত না। এর থেকে বোঝা যায়, তখনকার ভারতবর্ষে ব্যাধ-শবরদের উপাস্য দেবতা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুমন্দিরে প্রবেশ করে রক্তাভিষিক্ত দেবপুজো প্রচার করেন নি।

তার পরে রামায়ণ-মহাভারতের যে-সকল পাঠ এ দেশে প্রচলিত আমাদের দেশের সঙ্গে তার অনেক প্রভেদ। যে যে স্থানে এদের পাঠান্তর তার সমস্তই যে অশুদ্ধ, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। এখানকার রামায়ণে রাম সীতা ভাই-বোন; সেই ভাই-বোনে বিবাহ হয়েছিল। একজন ওলন্দাজ পণ্ডিতের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল; তিনি বললেন, তাঁর মতে এই কাহিনীটাই প্রাচীন, পরবর্তীকাল এই কথাটাকে চাপা দিয়েছে।

এই মতটাকে যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় তা হলে রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে মস্ত কয়েকটি মিল দেখতে পাই। দুটি কাহিনীরই মূলে দুটি বিবাহ। দুটি বিবাহই আর্যরীতি অনুসারে অসংগত। ভাই-বোনে বিবাহ বৌদ্ধ ইতিহাসে কোনো কোনো জায়গায় শোনা যায়, কিন্তু সেটা আমাদের সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ। অন্য দিকে এক স্ত্রীকে পাঁচ ভাইয়ে মিলে বিবাহও তেমনি অদ্ভুত ও অশাস্ত্রীয়। দ্বিতীয় মিল হচ্ছে দুই বিবাহেরই গোড়ায় অস্ত্রপরীক্ষা, অথচ সেই পরীক্ষা বিবাহযোগ্যতা প্রসঙ্গে নিরর্থক। তৃতীয় মিল হচ্ছে, দুটি কন্যাই মানবীগর্ভজাত নয়; সীতা পৃথিবীর কন্যা, হলরেখার মুখে কুড়িয়ে-পাওয়া; কৃষ্ণা যজ্ঞসম্ভবা। চতুর্থ মিল হচ্ছে, উভয়ত্রই প্রধান নায়কদের রাজ্যচ্যুতি ও স্ত্রীকে নিয়ে বনগমন। পঞ্চম মিল হচ্ছে, দুই কাহিনীতেই শত্রুর হাতে স্ত্রীর অবমাননা ও সেই অবমাননার প্রতিশোধ।

সেইজন্যে আমি পূর্বেই অন্যত্র এই মত প্রকাশ করেছি যে, দুটি বিবাহই রূপকমূলক। রামায়ণের রূপকটি খুবই স্পষ্ট। কৃষির হলবিদারণরেখাকে যদি কোনো রূপ দিতেই হয় তবে তাকে পৃথিবীর কন্যা বলা যেতে পারে। শস্যকে যদি নবদূর্বাদলশ্যাম রাম বলে কল্পনা করা যায় তবে সেই শস্যও তো পৃথিবীর পুত্র। এই রূপক অনুসারে উভয়ে ভাই-বোন, আর পরস্পর পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ।

হরধনুভঙ্গের মধ্যেই রামায়ণের মূল অর্থ। বস্তুত সমস্তটাই হরধনুভঙ্গের ব্যাপার—সীতাকে গ্রহণ রক্ষণ ও উদ্ধারের জন্যে। আর্যাবর্তের পূর্ব অংশ থেকে ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত কৃষিকে বহন করে ক্ষত্রিয়দের যে-অভিযান হয়েছিল সে সহজ হয় নি; তার পিছনে ঘরে-বাইরে মস্ত একটা দ্বন্দ্ব ছিল। সেই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস রামায়ণের মধ্যে নিহিত, অরণ্যের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের দ্বন্দ্ব।

মহাভারতে খাণ্ডববন-দাহনের মধ্যেও এই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের আভাস পাই। সেও বনের গাছপালা পোড়ানো নয়, সেদিন বন যে প্রতিকূল মানবশক্তির আশ্রয় ছিল তাকে ধ্বংস করা। এর বিরুদ্ধে কেবল-যে অনার্য তা নয়, ইন্দ্র যাঁদের দেবতা তাঁরাও ছিলেন। ইন্দ্র বৃষ্টিবর্ষণে খাণ্ডবের আগুন নেবাবার চেষ্টা করেছিলেন।

মহাভারতেরও অর্থ পাওয়া যায় লক্ষ্যবেধের মধ্যে। এই শূন্যস্থিত লক্ষ্যবেধের মধ্যে এমন একটি সাধনার সংকেত আছে যে, একাগ্রসাধনার দ্বারা কৃষ্ণাকে পাওয়া যায়; আর এই যজ্ঞসম্ভবা কৃষ্ণা এমন একটি তত্ত্ব যাকে নিয়ে একদিন ভারতবর্ষে বিষম দ্বন্দ্ব বেধে গিয়েছিল। একে একদল

স্বীকার করেছিল, একদল স্বীকার করে নি। কৃষ্ণাকে পঞ্চ পাণ্ডব গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কৌরবেরা তাঁকে অপমান করতে ত্রুটি করেন নি। এই যুদ্ধে কুরুসেনাপতি ছিলেন ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য, আর পাণ্ডববীর অর্জুনের সারথি ছিলেন কৃষ্ণ। রামের অস্ত্রদীক্ষা যেমন বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে, অর্জুনের যুদ্ধদীক্ষা তেমনি কৃষ্ণের কাছ থেকে। বিশ্বামিত্র স্বয়ং লড়াই করেন নি, কিন্তু লড়াইয়ের প্রেরণা তাঁর কাছ থেকে; কৃষ্ণও স্বয়ং লড়াই করেন নি কিন্তু কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রবর্তন করেছিলেন তিনি; ভগবদ্গীতাতেই এই যুদ্ধের সত্য, এই যুদ্ধের ধর্ম, ঘোষিত হয়েছে—সেই ধর্মের সঙ্গে কৃষ্ণ একাত্মক, যে-কৃষ্ণ কৃষ্ণার সখা, অপমানকালে কৃষ্ণা যাঁকে স্মরণ করেছিলেন বলে তাঁর লজ্জা রক্ষা হয়েছিল, যে-কৃষ্ণের সম্মাননার জন্যেই পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞ। রাম দীর্ঘকাল সীতাকে নিয়ে যে-বনে ভ্রমণ করেছিলেন সে ছিল অনার্যদের বন, আর কৃষ্ণাকে নিয়ে পাণ্ডবেরা ফিরেছিলেন যে-বনে সে হচ্ছে ব্রাহ্মণ ঋষিদের বন। পাণ্ডবদের সাহচর্যে এই বনে কৃষ্ণার প্রবেশ ঘটেছিল। সেখানে কৃষ্ণা তাঁর অক্ষয় অন্নপাত্র থেকে অতিথিদের অন্নদান করেছিলেন। ভারতবর্ষে একটা দ্বন্দ্ব ছিল অরণ্যের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের, আর-একটা দ্বন্দ্ব বেদের ধর্মের সঙ্গে কৃষ্ণের ধর্মের। লঙ্কা ছিল অনার্যশক্তির পুরী, সেইখানে আর্যের হল জয়; কুরুক্ষেত্র ছিল কৃষ্ণাবিরোধী কৌরবের ক্ষেত্র, সেইখানে কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডব জয়ী হলেন। সব ইতিহাসেই বাইরের দিকে অন্ন নিয়ে যুদ্ধ, আর ভিতরের দিকে তত্ত্ব নিয়ে যুদ্ধ। প্রজা বেড়ে যায়, তখন খাদ্য নিয়ে স্থান নিয়ে টানাটানি পড়ে, তখন নব নব ক্ষেত্রে কৃষিকে প্রসারিত করতে হয়। চিত্তের প্রসার বেড়ে যায়, তখন যারা সংকীর্ণ প্রথাকে আঁকড়ে থাকে তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধে যারা সত্যকে প্রশস্ত ও গভীর ভাবে গ্রহণ করতে চায়। একসময়ে ভারতবর্ষে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ প্রবল হয়েছিল; এক পক্ষ বেদমন্ত্রকেই ব্রহ্ম বলতেন, অন্য পক্ষ ব্রহ্মকে পরমাত্মা বলে জেনেছিলেন। বুদ্ধদেব যখন তাঁর ধর্মপ্রচার শুরু করেন তার পূর্বেই ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে মতের দ্বন্দ্ব তাঁর পথ অনেকটা পরিষ্কার করে দিয়েছে।

রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে ভারতবর্ষের যে মূল ইতিহাস নানা কাহিনীতে বিজড়িত, তাকে স্পষ্টতর করে দেখতে পাব যখন এখানকার পাঠগুলি মিলিয়ে দেখবার সুযোগ হবে। কথায় কথায় এখানকার একজনের কাছে শোনা গেল যে, দ্রোণাচার্য ভীমকে কৌশলে বধ করবার জন্যে কোনো-এক অসাধ্য কর্মে পাঠিয়েছিলেন। দ্রুপদ-বিদ্বেষী দ্রোণ যে পাণ্ডবদের অনুকূল ছিলেন না, তার হয়তো প্রমাণ এখানকার মহাভারতে আছে।

রামায়ণের কাহিনী সম্বন্ধে আর-একটি কথা আমার মনে আসছে, সেটা এখানে বলে রাখি। কৃষির ক্ষেত্র দুরকম করে নষ্ট হতে পারে—এক বাইরের দৌরাত্ম্যে, আর-এক নিজের অযত্নে। যখন রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গেল তখন রামের সঙ্গে সীতার আবার মিলন হতে পেরেছিল। কিন্তু, যখন অযত্নে অনাদরে রাম-সীতার বিচ্ছেদ ঘটল তখন পৃথিবীর কন্যা সীতা পৃথিবীতেই মিলিয়ে গেলেন। অযত্নে নির্বাসিতা সীতার গর্ভে যে-যমজ সন্তান জন্মেছিল তাদের নাম লব কুশ। লবের মূল ধাতুগত অর্থ ছেদন, কুশের জানাই আছে। কুশ ঘাস একবার জন্মালে ফসলের খেতকে-যে কিরকম নষ্ট করে সেও জানা কথা। আমি যে-মানেটা আন্দাজ করছি সেটা যদি একেবারেই অগ্রাহ্য না হয় তা হলে লবের সঙ্গে কুশের একত্র জন্মানোর ঠিক তাৎপর্য কী হতে পারে, এ কথা আমি পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করি।

অন্যদের চিঠি থেকে খবর পেয়ে থাকবে যে, এখানে আমরা প্রকাণ্ড একটা অন্ত্যেষ্টিসংকারের অনুষ্ঠান দেখতে এসেছি। মোটের উপরে এটা কতকটা চীনেদের মতো—তারাও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এইরকম ধুমধাম সাজসজ্জা বাজনাবাদ্য করে থাকে। কেবল মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতির ভঙ্গিটা হিন্দুদের মতো। দাহক্রিয়াটা এরা হিন্দুদের কাছ থেকে নিয়েছে। কিন্তু, কেমন মনে হয়, ওটা যেন অন্তরের সঙ্গে নেয় নি। হিন্দুরা আত্মাকে দেহের অতীত করে দেখতে চায়, তাই মৃত্যুর পরেই পুড়িয়ে ফেলে দেহের মমতা থেকে একেবারে মুক্তি পাবার চেষ্টা করে। এখানে মৃতদেহকে অনেক সময়েই বহু বৎসর ধরে রেখে দেয়। এই রেখে দেবার ইচ্ছেটা কবর দেবার ইচ্ছেরই শামিল। এদের রীতির মধ্যে

এরা দেহটাকে রেখে দেওয়া আর দেহটাকে পোড়ানো, এই দুই উল্টো প্রথার মধ্যে যেন রফানিষ্পত্তি করে নিয়েছে। মানুষের মনঃপ্রকৃতির বিভিন্নতা স্বীকার করে নিয়ে হিন্দুধর্ম রফানিষ্পত্তি-সূত্রে কত বিপরীত রকম রাজিনামা লিখে দিয়েছে তার ঠিকানা নেই। ভেদ নষ্ট করে ফেলে হিন্দুধর্ম ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা করে নি, ভেদ রক্ষা করেও সে একটা ঐক্য আনতে চেয়েছে।

কিন্তু, এমন ঐক্য সহজ নয় বলেই এর মধ্যে দৃঢ় ঐক্যের শক্তি থাকে না। বিভিন্ন বহুকে এক বলে স্বীকার করেও তার মাঝে মাঝে অলংঘনীয় দেয়াল তুলে দিতে হয়। একে অবিচ্ছিন্ন এক বলা যায় না, একে বলতে হয় বিভক্ত এক। ঐক্য এতে ভারগ্রস্ত হয়, ঐক্য এতে শক্তিমান হয় না। আমাদের দেশের স্বধর্মানুরাগী অনেকেই বালিদ্বীপের অধিবাসীদের আপন বলে স্বীকার করে নিতে উৎসুক হবেন, কিন্তু সেই মুহূর্তেই নিজের সমাজ থেকে ওদের দূরে ঠেকিয়ে রাখবেন। এইখানে প্রতিযোগিতায় মুসলমানের সংগে আমাদের হারতেই হয়। মুসলমানে মুসলমানে এক মুহূর্তেই সম্পূর্ণ জোড় লেগে যায়, হিন্দুতে হিন্দুতে তা লাগে না। এইজন্যেই হিন্দুর ঐক্য আপন বিপুল অংশ-প্রত্যংশ নিয়ে কেবলই নড়্‌নড়্‌ করছে। মুসলমান যেখানে আসে সেখানে সে-যে কেবলমাত্র আপন বল দেখিয়ে বা যুক্তি দেখিয়ে বা চরিত্র দেখিয়ে সেখানকার লোককে আপন সম্প্রদায়ভুক্ত করে তা নয়, সে আপন সন্ততিবিস্তার দ্বারা সজীব ও ধারাবাহিক ভাবে আপন ধর্মের বিস্তার করে। জাতির এমন-কি, পরজাতির লোকের সংগে বিবাহে তার কোনো বাধা নেই। এই অবাধ বিবাহের দ্বারা সে আপন সামাজিক অধিকার সর্বত্র প্রসারিত করতে পারে। কেবলমাত্র রক্তপাতের রাস্তা দিয়ে নয়, রক্তমিশ্রণের রাস্তা দিয়ে সে দূরে দূরান্তরে প্রবেশ করতে পেরেছে। হিন্দু যদি তা পারত তা হলে বালিদ্বীপে হিন্দুধর্ম স্থায়ী বিশুদ্ধ ও পরিব্যাপ্ত হতে দেরি হত না।[১]

গিয়ানয়ার
১ আগস্ট ১৯২৭

৮

গোলমাল ঘোরাফেরা দেখাশোনা বলাকওয়া নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণের ফাঁকে ফাঁকে যখন-তখন দু-চার লাইন করে লিখি, ভাবের স্রোত আটকে আটকে যায়, তার সহজ গতিটা থাকে না। একে চিঠি বলা চলে না। কেননা, এর ভিতরে ভিতরে কর্তব্যপরায়ণতার ঠেলা চলছে— সেটাতে কাজকে এগিয়ে দেয়, ভাবকে হয়রান করে। পাখি-ওড়ায় আর ঘুড়ি-ওড়ায় তফাত আছে। আমি ওড়াচ্ছি চিঠির ছলে লেখার ঘুড়ি, কর্তব্যের লাঠাইয়ে বাঁধা, কেবলই হেঁচকে হেঁচকে ওড়াতে হয়।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। দিনের মধ্যে দু-তিনরকমের প্রোগ্রাম। নতুন নতুন জায়গায় বক্তৃতা নিমন্ত্রণ ইত্যাদি। গীতার উপদেশ যদি মানতুম, ফললাভের প্রত্যাশা যদি না থাকত, তা হলে পাল-তোলা নৌকার মতো জীবনতরণী তীর থেকে তীরান্তরে নেচে নেচে যেতে পারত। চলেছি উজান বেয়ে, গুণ টেনে, লগি ঠেলে দাঁড় বেয়ে; পদে পদে জিব বেরিয়ে পড়ছে। আমৃত্যুকাল কোনোদিন কোথাও-যে সহজে ভ্রমণ করতে পারব সে আশা বিড়ম্বনা। পথ সুদীর্ঘ, পাথেয় স্বল্প; অর্জন করতে করতে গর্জন করতে করতে, হোটেলে হোটেলে ডলার বর্জন করতে করতে, আমার ভ্রমণ— গলা চালিয়ে আমার পা চালানো। পথে বিপথে যেখানে-সেখানে আচমকা আমাকে বক্তৃতা করতে বলে, আমিও উঠে দাঁড়িয়ে বকে যাই— আমেরিকায় মুড়ি তৈরি করবার কলের মুখ থেকে যেমন মুড়ি বেরোতে থাকে সেইরকম। হাসিও পায় দুঃখও ধরে। পৃথিবীর পনেরো-আনা লোক কবিকে নিয়ে সর্বসমক্ষে এইরকম অপদস্থ করতেই ভালোবাসে; বলে, 'মেসেজ দাও।' মেসেজ বলতে কী

[১] নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত।

বুঝায় সেটা ভেবে দেখো। সর্বসাধারণ-নামক নির্বিশেষ পদার্থের উদাসীন কানের কাছে অত্যন্ত নির্বিশেষ ভাবের উপদেশ দেওয়া, যা কোনো বাস্তব মানুষের কোনো বাস্তব কাজেই লাগে না। পরলোকগত বহুসংখ্যক পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে পাইকেরি প্রথায় পিন্ডি দেওয়ার মতো—যেহেতু সে-পিণ্ড কেউ খায় না সেইজন্যে তাতে না আছে স্বাদ, না আছে শোভা। যেহেতু সেটা রসনাহীন ও ক্ষুধাহীন নামমাত্রের জন্য উৎসর্গ-করা সেইজন্যে সেটাকে যথার্থ খাদ্য করে তোলার জন্যে কারও গরজ নেই। মেসেজ-রচনা সেইরকম রচনা।

আজ বিকেলের গাড়িতে পিনাঙ যেতে হবে। তার আগে, যদি সুসাধ্য হয় তবে নাওয়া আছে, খাওয়া আছে; যদি দুঃসাধ্য হয় তবু একটা মিটিঙে গিয়ে বক্তৃতা আছে; ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, শান্তি নেই, অবকাশ নেই—তার পরে সুদীর্ঘ রেলযাত্রা; তার পরে স্টেশনে মাল্যগ্রহণ, অ্যাড্রেস-শ্রবণ, তদুত্তরে বিনতিপ্রকাশ; তার পরে নতুন বাসায় নতুন জনতার মধ্যে জীবনযাত্রার নতুন ব্যবস্থা, তার পরে ষোলোই তারিখে জাহাজে চড়ে জাভায় যাত্রা; তার পরে নতুন অধ্যায়। ইতি

টাইপিঙ
১৩ আগস্ট ১৯২৭

৯

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, মালয় উপদ্বীপের বিবরণ আমাদের দলের লোকের চিঠিপত্র থেকে নিশ্চয় পেয়েছ। ভালো করে দেখবার মতো, ভাববার মতো, লেখবার মতো সময় পাই নি। কেবল ঘুরেছি আর বকেছি। পিনাঙ থেকে জাহাজে চড়ে প্রথমে জাভার রাজধানী বাটাভিয়ায় এসে পৌঁছনো গেল। আজকাল পৃথিবীর সর্বত্রই বড়ো শহর মাত্রই দেশের শহর নয়, কালের শহর। সবাই আধুনিক। সবাই মুখের চেহারায় একই, কেবল বেশভূষায় কিছু তফাত। অর্থাৎ, কারও-বা পাগড়িটা ঝক্‌ঝকে কিন্তু জামায় বোতাম নেই, ধুতিখানা হাঁটু পর্যন্ত, ছেঁড়া চাদরখানায় ধোপ পড়ে না, যেমন কলকাতা; কারও-বা আগাগোড়াই ফিট্‌ফাট্‌ ধোয়া-মাজা; উজ্জ্বল বসনভূষণ, যেমন বাটাভিয়া। শহরগুলোর মুখের চেহারা একই বলেছি, কথাটা ঠিক নয়। মুখ দেখা যায় না, মুখোশ দেখি। সেই মুখোশগুলো এক কারখানায় একই ছাঁচে ঢালাই করা। কেউ-বা সেই মুখোশ পরিষ্কার পালিশ করে রাখে, কারও বা হেলায়-ফেলায় মলিন। কলকাতা আর বাটাভিয়া উভয়েই এক আধুনিক কালের কন্যা; কেবল জামাতারা স্বতন্ত্র, তাই আদরযত্নে অনেক তফাত। শ্রীমতী বাটাভিয়ার সিঁথি থেকে চরণচক্র পর্যন্ত গয়নার অভাব নেই। তার উপরে সাবান দিয়ে গা মাজা-ঘষা ও অঙ্গলেপ দিয়ে ঔজ্জ্বল্যসাধন চলছেই। কলকাতার হাতে নোয়া আছে, কিন্তু বাজুবন্দ দেখি নে। তার পরে যে-জলে তার স্নান সে-জলও যেমন, আর যে-গামছায় গা-মোছা তারও সেই দশা। আমরা চিৎপুরবিভাগের পুরবাসী, বাটাভিয়ায় এসে মনে হয় কৃষ্ণপক্ষ থেকে শুক্লপক্ষে এলুম।

হোটেলের খাঁচায় ছিলেম দিন-তিনেক; অভ্যর্থনার ত্রুটি হয় নি। সমস্ত বিবরণ বোধ হয় সুনীতি কোনো-একসময়ে লিখবেন। কেননা, সুনীতির যেমন দর্শনশক্তি তেমনি ধারণাশক্তি। যত বড়ো তাঁর আগ্রহ তত বড়োই তাঁর সংগ্রহ। যা-কিছু তাঁর চোখে পড়ে সমস্তই তাঁর মনে জমা হয়। কণামাত্র নষ্ট হয় না। নষ্ট-যে হয় না সে দু দিক থেকেই, রক্ষণে এবং দানে। তন্নষ্টং যন্নদীয়তে। বুঝতে পারছি, তাঁর হাতে আমাদের ভ্রমণের ইতিবৃত্ত লেশমাত্র ব্যর্থ হবে না, লুপ্ত হবে না।

বাটাভিয়া থেকে জাহাজে করে বালিদ্বীপের দিকে রওনা হলুম। ঘণ্টা-কয়েকের জন্যে সুরবায়া শহরে আমাদের নামিয়ে নিলে। এও একটা আধুনিক শহর; জাভার আঙ্গিক নয়, জাভার

আনুষঙ্গিক। আলাদিনের প্রদীপের মন্ত্রে শহরটাকে নিউজীলন্ডে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেও খাপছাড়া হয় না।

পার হয়ে এলেম বালিদ্বীপে; দেখলেম ধরণীর চিরযৌবনা মূর্তি। এখানে প্রাচীন শতাব্দী নবীন হয়ে আছে। এখানে মাটির উপর অন্নপূর্ণার পাদপীঠ শ্যামল আস্তরণে দিগন্ত থেকে দিগন্তে বিস্তীর্ণ; বনচ্ছায়ার অংকলালিত লোকালয়গুলিতে সচ্ছল অবকাশ। সেই অবকাশ উৎসবে অনুষ্ঠানে নিত্যই পরিপূর্ণ।

এই দ্বীপটুকুতে রেলগাড়ি নেই। রেলগাড়ি আধুনিক কালের বাহন। আধুনিক কালটি অত্যন্ত কৃপণ কাল, কোনো দিকে একটুমাত্র বাহুল্যের বরাদ্দ রাখতে চায় না। এই কালের মানুষ বলে : Time is money। তাই কালের বাজেখরচ বন্ধ করবার জন্যে রেলের এঞ্জিন হাঁফাতে হাঁফাতে, ধোঁয়া ওগরাতে ওগরাতে, মেদিনী কম্পমান করে দেশদেশান্তরে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু, এই বালিদ্বীপে বর্তমান কাল শত শত অতীত শতাব্দী জুড়ে এক হয়ে আছে। এখানে কালসংক্ষেপ করবার কোনো দরকার নেই। এখানে যা-কিছু আছে তা চিরদিনের; যেমন একালের তেমনি সেকালের। ঋতুগুলি যেমন চলেছে নানা রঙের ফুল ফোটাতে ফোটাতে, নানা রসের ফল ফলাতে ফলাতে, এখানকার মানুষ বংশপরম্পরায় তেমনি চলেছে নানা রূপে বর্ণে গীতে নৃত্যে অনুষ্ঠানের ধারা বহন করে।

রেলগাড়ি এখানে নেই কিন্তু আধুনিক কালের ভবঘুরে যারা এখানে আসে তাদের জন্যে আছে মোটরগাড়ি। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাদের দেখাশুনো ভোগ-করা শেষ করা চাই। তারা আঁট-কালের মানুষ এসে পড়েছে অপর্যাপ্ত-কালের দেশে। এখানকার অরণ্য পর্বত লোকালয়ের মাঝখান দিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলেছি আর কেবলই মনে হচ্ছে, এখানে পায়ে হেঁটে চলা উচিত। যেখানে পথের দুই ধারে ইমারত সেখানে মোটরের সঙ্গে সঙ্গে দুই চক্ষুকে দৌড় করালে খুব বেশি লোকসান হয় না; কিন্তু পথের দুধারে যেখানে রূপের মেলা সেখানকার নিমন্ত্রণ সারতে গেলে গরজের মোটরটাকে গারাজেই রেখে আসতে হয়। মনে নেই কি, শিকার করতে দুষ্যন্ত যখন রথ ছুটিয়েছিলেন তখন তার বেগ কত; এই হচ্ছে যাকে বলে প্রোগ্রেস, লক্ষ্যভেদ করবার জন্যে তাড়াহুড়ো। কিন্তু, তপোবনের সামনে এসে তাঁকে রথ ফেলে নামতে হল, লক্ষ্যসাধনের লোভে নয়, তৃপ্তিসাধনের আশায়। সিদ্ধির পথে চলা দৌড়ে, সুন্দরের পথে চলা ধীরে। আধুনিক কালে সিদ্ধির লোভ প্রকাণ্ড, প্রবল; তাই আধুনিক কালের বাহনের বেগ কেবলই বেড়ে যাচ্ছে। যা-কিছু গভীরভাবে নেবার যোগ্য, দৃষ্টি তাকে গ্রহণ না করে স্পর্শ করেই চলে যায়। এখন হ্যামলেটের অভিনয় অসম্ভব হল, হ্যামলেটের সিনেমার হল জিত।

আমাদের মোটর যেখানে এসে থামল সেখানে এক বিপুল উৎসব। জায়গাটার নাম বাংলি। কোনো-এক রাজবংশের কার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। এর মধ্যে শোকের চিহ্ন নেই। না থাকবারই কথা— রাজার মৃত্যু হয়েছে অনেকদিন আগে, এতদিনে তাঁর আত্মা দেবসভায় উত্তীর্ণ, উৎসব তাই নিয়ে। বহু দূর থেকে গ্রামের পথে পথে মেয়ে পুরুষেরা ভারে ভারে বিচিত্ররকমের নৈবেদ্য নিয়ে আসছে; যেন কোন্ পুরাণে-বর্ণিত যুগ হঠাৎ আমাদের চোখের সামনে বেঁচে উঠল; যেন অজন্তার শিল্পকলা চিত্রলোক থেকে প্রাণলোকে সূর্যের আলো ভোগ করতে এসেছে। মেয়েদের বেশভূষা অজন্তার ছবিরই মতো। এখানে আবরণবিরলতার স্বাভাবিক আবরু সুন্দর হয়ে দেখা দিল, সেটা চারি দিকের সঙ্গে সুসংগত; এমন-কি, যে-কয়েকজন আমেরিকান মিশনরি দর্শকরূপে এখানে এসেছে, আশা করি, তারাও এই দৃশ্যের সুশোভন সুরুচি সহজ-মনে অনুভব করতে পেরেছে।

যজ্ঞক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য। এই উপলক্ষে সেখানে অনেকগুলি বাঁশের উঁচু মাচা-বাঁধা ঘরে এখানকার ব্রাহ্মণেরা সুসজ্জিত হয়ে, শিখা বেঁধে, ভূরি ভূরি খাদ্যবস্ত্র ফলপুষ্পপত্রের নৈবেদ্যের মধ্যে নানারকম মুদ্রা সহযোগে মন্ত্র পড়ছে; তারা কেউ-বা কতরকম অর্ঘ্য-উপকরণ তৈরি করছে। কোথাও-বা এখানকার বহুযন্ত্রমিলিত সংগীত; একজায়গায় তাঁবুর মধ্যে পৌরাণিক যাত্রার অভিনয়।

উৎসবের এত অতিবৃহৎ আনুষ্ঠানিক বৈচিত্র্য আর কোথাও দেখি নি; অথচ কোথাও অসুন্দর বা বিশৃঙ্খল কিছু নেই; বিপুল সমারোহে দৃশ্যরূপটি বস্তুরাশির অসংলগ্নতায় বা জনতার ঠেলাঠেলিতে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায় নি। এতগুলি মানুষের সমাবেশ, অথচ গোলমাল বা নোংরামি বা অব্যবস্থা নেই। উৎসবের অন্তর্নিহিত সুন্দর ঐক্যবন্ধনেই সমস্ত ভিড়ের লোককে আপনিই সংযত করে বেঁধেছে। সমস্ত ব্যাপারটি এত বৃহৎ, এত বিচিত্র, আর আমাদের পক্ষে এত অপূর্ব যে, এর বিস্তারিত বর্ণনা করা অসম্ভব। হিন্দু অনুষ্ঠানবিধির সঙ্গে এ দেশের লোকের চিত্তবৃত্তির মিল হয়ে এই যে সৃষ্টি, এর রূপের প্রাচুর্যটিই বিশেষ করে দেখবার ও ভাববার জিনিস। অপরিমিত উপকরণের দ্বারা নিজেকে অশেষভাবে প্রকাশ করবার চেষ্টা, সেই প্রকাশ কেবলমাত্র বস্তুকে পুঞ্জিত করে নয়, তাকে নানা নিপুণ রীতিতে সজ্জিত করে।

জাপানের সঙ্গে এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থার মিল আছে। জাপানের মতোই এখানে দ্বীপটি আয়তনে ছোটো, অথচ এখানে প্রকৃতির রূপটি বিচিত্র, এবং তার সৃষ্টিশক্তি প্রচুরভাবে উর্বরা। পদে পদেই পাহাড় ঝরনা নদী প্রান্তর অরণ্য অগ্নিগিরি সরোবর। অথচ, দেশটি চলাফেরার পক্ষে সুগম, নদীপর্বতের পরিমাণ ছোটো; প্রজাসংখ্যা বেশি, ভূমির পরিমাণ কম, এইজন্যে কৃষির উৎকর্ষ দ্বারা চাষের-যোগ্য সমস্ত জমি সম্পূর্ণরূপে এরা চষে ফেলেছে; খেতে খেতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল সেঁচ দেবার ব্যাপক ব্যবস্থা এ দেশে দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত। এখানে দারিদ্র্য নেই, রোগ নেই, জলবায়ু সুখকর। দেবদেবীবহুল, কাহিনীবহুল, অনুষ্ঠানবহুল পৌরাণিক হিন্দুধর্ম এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সংগত; সেই প্রকৃতি এখানকার শিল্পকলায়, সামাজিক অনুষ্ঠানে, বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যের প্রবর্তনা করেছে।

জাপানের সঙ্গে এর মস্ত একটা তফাত। জাপান শীতের দেশ; জাভা বালি গরমের দেশ। জাপান অন্য শীতের দেশের লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনাকে রক্ষা করতে পারলে, জাভা বালি তা পারে নি। আত্মরক্ষার জন্যে যে দৃঢ়নিষ্ঠ অধ্যবসায় দরকার এদের তা ছিল না। গরম হাওয়া প্রাণের প্রকাশকে যেমন তাড়াতাড়ি পরিণত করে তেমনি তাড়াতাড়ি ক্ষয় করতে থাকে। মুহূর্তে মুহূর্তে শক্তিকে সে শিথিল করে, জীবনের অধ্যবসায়কে ক্লান্ত করে দেয়। বাটাভিয়া শহরটি-যে এমন নিখুঁত ভাবে পরিপাটি পরিচ্ছন্ন তার কারণ, শীতের দেশের মানুষ এর ভার নিয়েছে; তাদের শীতের দেশের দেহে শক্তি অনেক কাল থেকে বংশানুক্রমে অস্থিতে মজ্জাতে পেশীতে স্নায়ুতে পুঞ্জীভূত; তাই তাদের অক্লান্ত মন সর্বত্র ও প্রতিমুহূর্তে আপনাকে প্রয়োগ করতে পারে। আমরা কেবলই বলি, 'যথেষ্ট হয়েছে, তুমিও যেমন, চলে যাবে।' যত্ন জিনিসটা কেবল হৃদয়ের জিনিস নয়, শক্তির জিনিস। অনুরাগের আগুনকে জ্বালিয়ে রাখতে শক্তির প্রাচুর্য চাই। শক্তিসঞ্চয় যেখানে অল্প সেখানে আপনিই বৈরাগ্য এসে পড়ে। বৈরাগ্য নিজের উপর থেকে সমস্ত দাবি কমিয়ে দেয়। বাইরের অসুবিধা, অস্বাস্থ্য, অব্যবস্থা, সমস্তই মেনে নেয়। নিজেকে ভোলাবার জন্যে বলতে চেষ্টা করে যে, ওগুলো সহ্য করার মধ্যে যেন মহত্ত্ব আছে। যার শক্তি অজস্র সে সমস্ত দাবি মেনে নিতে আনন্দ পায়; এইজন্যেই সে জোরের সঙ্গে বেঁচে থাকে, ধ্বংসের কাছে সহজে ধরা দিতে চায় না। য়ুরোপে গেলে সব চেয়ে আমার চোখে পড়ে মানুষের এই সদাজাগ্রত যত্ন। যাকে বলি বিজ্ঞান, সায়ান্স, তার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে জ্ঞানের জন্যে অপরাজিত যত্ন। কোথাও আন্দাজ খাটবে না, খেয়ালকে মানবে না, বলবে না 'ধরে নেওয়া যাক', বলবে না 'সর্বজ্ঞ ঋষি এই কথা বলে গেছেন'। জ্ঞানের ক্ষেত্রে, নীতির ক্ষেত্রে, যখন আত্মশক্তির ক্লান্তি আসে তখন বৈরাগ্য দেখা দেয়; সেই বৈরাগ্যের অযত্নের ক্ষেত্রেই ঋষিবাক্য, বেদবাক্য, গুরুবাক্য, মহাত্মাদের অনুশাসন, আগাছার জঙ্গলের মতো জেগে ওঠে—নিত্যপ্রয়াসসাধ্য জ্ঞান-সাধনার পথ রুদ্ধ করে ফেলে। বৈরাগ্যের অযত্নে দিনে দিনে চারি দিকে যে প্রভূত আবর্জনায় অবরোধ জমে ওঠে তাতেই মানুষের পরাভব ঘটায়। বৈরাগ্যের দেশে শিল্পকলাতেও মানুষ অন্ধ পুনরাবৃত্তির প্রদক্ষিণপথে চলে, এগোয় না, কেবলই ঘোরে। মাদ্রাজের শ্রেষ্ঠী পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ করে, হাজার বছর আগে যে মন্দির তৈরি হয়েছে ঠিক তারই নকল করবার জন্যে। তার বেশি তার সাহস নেই,

ক্লান্ত মনের শক্তি নেই; পাখির অসাড় ডানা খাঁচার বাইরে নিজেকে মেলে দিতে আনন্দ পায় না। খাঁচার কাছে হার মেনে যে-পাখি চিরকালের মতো ধরা দিয়েছে সমস্ত বিশ্বের কাছে তাকে হার মানতে হল।

এ দেশে এসে প্রথমে আনন্দ হয় এখানকার সব অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যে ও সৌন্দর্যে। তার পরে ক্রমে মনে সন্দেহ হতে থাকে, এ হয়তো খাঁচার সৌন্দর্য, নীড়ের সৌন্দর্য নয়—এর মধ্যে হয়তো চিত্তের স্বাধীনতা নেই। অভ্যাসের যন্ত্রে নিখুঁত নকল শত শত বৎসর ধরে ধারাবাহিক ভাবে চলেছে। আমরা যারা এখানে বাহির থেকে এসেছি আমাদের একটা দুর্লভ সুবিধা ঘটেছে এই যে, আমরা অতীত কালকে বর্তমানভাবে দেখতে পাচ্ছি। সেই অতীত মহৎ, সেই অতীতের ছিল প্রতিভা, যাকে বলে নব-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি; তার প্রাণশক্তির বিপুল উদ্যম আপন শিল্পসৃষ্টির মধ্যে প্রচুরভাবে আপন পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু তবুও সে অতীত, তার উচিত ছিল বর্তমানের পিছনে পড়া; সামনে এসে দাঁড়িয়ে বর্তমানকে সে ঠেকিয়ে রাখল কেন। বর্তমান সেই অতীতের বাহনমাত্র হয়ে বলছে, 'আমি হার মানলুম।' সে দীনভাবে বলছে, 'এই অতীতকে প্রকাশ করে রাখাই আমার কাজ, নিজেকে লুপ্ত করে দিয়ে।' নিজের 'পরে বিশ্বাস করবার সাহস নেই। এই হচ্ছে নিজের শক্তি সম্বন্ধে বৈরাগ্য, নিজের 'পরে দাবি যতদূর সম্ভব কমিয়ে দেওয়া। দাবি স্বীকার করায় দুঃখ আছে, বিপদ আছে, অতএব—বৈরাগ্যমেবাভয়ম্, অর্থাৎ, বৈনাশ্যমেবাভয়ম্।

সেদিন বাংলিতে আমরা যে অনুষ্ঠান দেখেছি সেটা প্রেতাত্মার স্বর্গারোহণপর্ব। মৃত্যু হয়েছে বহু পূর্বে; এতদিনে আত্মা দেবসভায় স্থান পেয়েছে বলে এই বিশেষ উৎসব। সুখবতী-নামক জেলায় উবুদ-নামক শহরে হবে দাহক্রিয়া, আগামী পাঁচই সেপ্টেম্বরে। ব্যাপারটার মধ্যে আরও অনেক বেশি সমারোহ থাকবে—কিন্তু তবু সেই মাদ্রাজি চেটির পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার মন্দির। এ বহু বহু শতাব্দীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, সেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াই চলেছে, এর আর অন্ত নেই। এখানে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় এত অসম্ভবরকম ব্যয় হয় যে সুদীর্ঘকাল লাগে তার আয়োজনে—যম আপন কাজ সংক্ষেপে ও সস্তায় সারেন কিন্তু নিয়ম চলে অতি লম্বা ও দুর্মূল্য চালে। এখানে অতীত কালের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া চলেছে বহুকাল ধরে, বর্তমান কালকে আপন সর্বস্ব দিতে হচ্ছে তার ব্যয় বহন করবার জন্যে।

এখানে এসে বার বার আমার এই কথা মনে হয়েছে যে, অতীত কাল যত বড়ো কালই হোক, নিজের সম্বন্ধে বর্তমান কালের একটা স্পর্ধা থাকা উচিত; মনে থাকা উচিত, তার মধ্যে জয় করবার শক্তি আছে। এই ভাবটাকে আমি একটি ছোটো কবিতায় লিখেছি, সেটা এইখানে তুলে দিয়ে এই দীর্ঘ পত্র শেষ করি।

নন্দগোপাল বুক ফুলিয়ে এসে
বললে আমায় হেসে,
'আমার সঙ্গে লড়াই করে কখ্‌খনো কি পার।
বারে বারেই হার।'
আমি বললেম, 'তাই বৈকি! মিথ্যে তোমার বড়াই,
হোক দেখি তো লড়াই।'
'আচ্ছা, তবে দেখাই তোমায়' এই বলে সে যেমনি টানলে হাত
দাদামশায় তখ্‌খনি চিৎপাত।
সবাইকে সে আনলে ডেকে, চেঁচিয়ে নন্দ করলে বাড়ি মাত॥

বারে বারে শুধায় আমায়, 'বলো তোমার হার হয়েছে না কি।'
আমি কইলেম, 'বলতে হবে তা কি।
ধুলোর যখন নিলেম শরণ প্রমাণ তখন রইল কি আর বাকি।

এই কথা কি জান—
আমার কাছে, নন্দগোপাল, যখনই হার মান,
আমারই সেই হার,
লজ্জা সে আমার।
ধুলোয় যেদিন পড়ব, যেন এই জানি নিশ্চিত,
তোমারই শেষ জিত।[১]

ইতি ৩০ আগস্ট ১৯২৭

কারেম আসন। বালি

১০

কল্যাণীয়াসু

মীরা, যেখানে বসে লিখছি এ একটা ডাকবাঙলা; পাহাড়ের উপরে সকালবেলা শীতের বাতাস দিচ্ছে। আকাশে মেঘগুলো দল বেঁধে আনাগোনা করছে, সূর্যকে একবার দিচ্ছে ঢাকা, একবার দিচ্ছে খুলে। পাহাড় বললে যে-ছবি মনে জাগে এ একেবারেই সেরকম নয়। শৈলশিখরশ্রেণী কোথাও দেখা যাচ্ছে না—বারান্দা থেকে অনতিদূরেই সামনে ঢালু উপত্যকা নেমে গিয়েছে, তলায় একটি ক্ষীণ জলের ধারা এঁকে বেঁকে চলছে; সামনে অন্য পারের পাড়ি অর্ধচন্দ্রের মতো, তার উপরে নারকেলবন আকাশের গায়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে।

উপর থেকে নীচে পর্যন্ত থাকে-থাকে শস্যের খেত। পাহাড়ের বুক বেয়ে একটা ভাঙাচোরা পথ জল পর্যন্ত নেমে গেছে। জলধারার কাছেই একটা উৎস। এই উৎসকে এ দেশের লোকে পবিত্র বলে জানে; সমস্ত দিন দেখি, মেয়েরা স্নান করে, জল তুলে নিয়ে যায়। এরা বলে, এই জলে স্নান করলে সর্ব পাপ মোচন হয়। বিশেষ বিশেষ পার্বণ আছে যখন বিস্তর লোক এখানে পুণ্যস্নান করতে আসে। এই জায়গাটার নাম 'তীর্ত আম্পুল'। তীর্ত অর্থাৎ তীর্থ, আম্পুল মানে উৎস—উৎসতীর্থ।

এই উৎস সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। বহুকাল পূর্বে এক রাজার এক সুন্দরী মেয়ে ছিল। সেই মেয়েটি রাজার এক পারিষদকে ভালোবেসেছিল। পারিষদের মনেও যে ভালোবাসা ছিল না তা নয়, কিন্তু রাজকন্যাকে বিয়ে করবার যোগ্য তার জাতিমর্যাদা নয় জেনে রাজার সম্মানের প্রতি লক্ষ করে রাজকন্যার ভালোবাসা কর্তব্যবোধে প্রত্যাখ্যান করে। রাজকন্যা রাগ করে তার পানীয় দ্রব্যে বিষ মিশিয়ে দেয়। যুবক একটুখানি পান করেই ব্যাপারখানা বুঝতে পারে, কিন্তু পাছে রাজকন্যার নামে অপবাদ আসে তাই পালিয়ে এই জায়গাকার বনে এসে গোপনে মরবার জন্যে প্রস্তুত হয়। দেবতারা দয়া করে এই পুণ্য উৎসের জল খাইয়ে তাকে বাঁচিয়ে দেন।

হিন্দু ভাবের ও রীতির সঙ্গে এদের জীবন কিরকম জড়িয়ে গেছে ক্ষণে ক্ষণে তার পরিচয় পেয়ে বিস্ময় বোধ হয়। অথচ হিন্দুধর্ম এখানে কোথাও অমিশ্র ভাবে নেই; এখানকার লোকের প্রকৃতির সঙ্গে মিলে গিয়ে সে একটা বিশেষ রূপ ধরেছে; তার ভঙ্গিটা হিন্দু, অঙ্গটা এদের। প্রথম দিন এসেই এক জায়গায় কোন্-এক রাজার অন্ত্যেষ্টিসৎকার দেখতে গিয়েছিলুম। সাজসজ্জা-আয়োজনের উপকরণ আমাদের সঙ্গে মেলে না; উৎসবের ভাবটা ঠিক আমাদের শ্রাদ্ধের ভাব নয়; সমারোহের বাহ্য দৃশ্যটা ভারতবর্ষের কোনো-কিছুর অনুরূপ নয়; তবুও এর রকমটা আমাদের মতোই; মাচার উপরে এখানকার চূড়া-বাঁধা ব্রাহ্মণেরা ঘণ্টা নেড়ে ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে হাতের আঙুলে মুদ্রার ভঙ্গি করে বিড়বিড় শব্দে মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে। আবৃত্তিতে ও অনুষ্ঠানে কিছুমাত্র স্খলন হলেই সমস্ত অশুদ্ধ ও ব্যর্থ হয়ে যায়। ব্রাহ্মণের গলায় পৈতে নেই। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, এরা 'গায়ত্রী'

---

[১] প্রতিমা দেবীকে লিখিত।

শব্দটা জানে কিন্তু মন্ত্রটা ঠিক জানে না। কেউ-বা কিছু কিছু টুকরো জানে। মনে হয়, একসময়ে এরা সর্বাঙ্গীণ হিন্দুধর্ম পেয়েছিল, তার দেবদেবী রীতিনীতি উৎসব-অনুষ্ঠান পুরাণস্মৃতি সমস্তই ছিল। তার পরে মূলের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, ভারতবর্ষ চলে গেল দূরে— হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা হল নিষিদ্ধ, হিন্দু আপন গণ্ডির মধ্যে নিজেকে কষে বাঁধলে, ঘরের বাইরে তার যে এক প্রশস্ত আঙিনা ছিল এ কথা সে ভুললে। কিন্তু, সমুদ্রপারের আত্মীয়-বাড়িতে তার অনেক বাণী, অনেক মূর্তি, অনেক চিহ্ন, অনেক উপকরণ পড়ে আছে বলে সেই আত্মীয় তাকে সম্পূর্ণ ভুলতে পারলে না। পথে ঘাটে পদে পদে মিলনের নানা অভিজ্ঞান চোখে পড়ে। কিন্তু সেগুলির সংস্কার হতে পায় নি বলে কালের হাতে সেই-সব অভিজ্ঞান কিছু গেছে ক্ষয়ে, কিছু বেঁকেচুরে, কিছু গেছে লুপ্ত হয়ে।

সেই-সব অভিজ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন সংগতি আর পাওয়া যায় না। তার অর্থ কিছু গেছে ঝাপসা হয়ে, কিছু গেছে টুকরো হয়ে। তার ফল হয়েছে এই, যেখানে-যেখানে ফাঁক পড়েছে সেই ফাঁকটা এখানকার মানুষের মন আপন সৃষ্টি দিয়ে ভরিয়েছে। হিন্দুধর্মের ভাঙাচোরা কাঠামো নিয়ে এখানকার মানুষ আপনার একটা ধর্ম, একটা সমাজ, গড়ে তুলছে। এখানকার একসময়ের শিল্প-কলায় দেখা যায় পুরোপুরি হিন্দুর প্রভাব; তার পরে দেখা যায় সে-প্রভাব ক্ষীণ ও বিচ্ছিন্ন। তবু যে-ক্ষেত্রকে হিন্দু উর্বর করে দিয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে এখানকার স্বস্থানীয় প্রতিভা প্রচুরভাবে আপনার ফসল ফলিয়েছে। এখানে একটা বহুছিদ্র পুরোনো ইতিহাসের ভূমিকা দেখি; সেই আধ-ভোলা ইতিহাসের ছেদগুলো দিয়ে এ দেশের স্বকীয় চিত্ত নিজেকে প্রকাশ করেছে।

বালিতে সব-প্রথমে কারেম-আসন বলে একজায়গার রাজবাড়িতে আমার থাকবার কথা। সেখানকার রাজা ছিলেন বাংলির শ্রাদ্ধ-উৎসবে। পারিষদসহ বালির ওলন্দাজ গবর্নর সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজন করলেন, সেই ভোজে আমরাও ছিলেম। ভোজ শেষ করে যখন উঠলেম তখন বেলা তিনটে। সকালে সাড়ে ছটার সময় জাহাজ থেকে নেমেছি; ঘাটের থেকে মোটরে আড়াই ঘণ্টা ঝাঁকানি ও ধুলো খেয়ে যজ্ঞস্থলে আগমন। এখানে ঘোরাঘুরি দেখাশুনা সেরে বিনা স্নানেই অত্যন্ত ক্লান্ত ও ধূলিম্লান অবস্থায় নিতান্ত বিতৃষ্ণার সঙ্গে খেতে বসেছি; দীর্ঘকালপ্রসারিত সেই ভোজে আহার ও আলাপ-আপ্যায়ন সেরে আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা রাজার সঙ্গে তাঁর মোটরগাড়িতে চড়ে আবার সুদীর্ঘপথ ভেঙে চললুম তাঁর প্রাসাদে। প্রাসাদকে এরা পুরী বলে। রাজার ভাষা আমি জানি নে, আমার ভাষা রাজা বোঝেন না— বোঝাবার লোকও কেউ সঙ্গে নেই। চুপ করে গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলুম।

মস্ত সুবিধে এই, এখানকার প্রকৃতি বালিনি ভাষায় কথা কয় না; সেই শ্যামার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি আর অরসিক মোটরগাড়িটাকে মনে মনে অভিশাপ দিই। মনে পড়ল, কখনো কখনো শুষ্কচিত্ত গাইয়ের মুখে গান শুনেছি; রাগিণীর যেটা বিশেষ দরদের জায়গা, যেখানে মন প্রত্যাশা করছে, গাইয়ের কণ্ঠ অত্যুচ্চ আকাশের চিলের মতো পাখাটা ছড়িয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ স্থির থাকবে কিংবা দুই-একটা মাত্র মীড়ের ঝাপটা দেবে, গানের সেই মর্মস্থানের উপর দিয়ে যখন সেই সংগীতের পালোয়ান তার তানগুলোকে লোটন-পায়রার মতো পাল্টিয়ে পাল্টিয়ে উড়িয়ে চলেছে, তখন কিরকম বিরক্ত হয়েছি। পথের দুই ধারে গিরি অরণ্য সমুদ্র, আর সুন্দর সব ছায়াবেষ্টিত লোকালয়, কিন্তু মোটরগাড়িটা দুন-চৌদুন মাত্রায় চালিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলেছে, কোনো-কিছুর 'পরে তার কিছুমাত্র দরদ নেই; মনটা ক্ষণে ক্ষণে বলে উঠছে, 'আরে, রোসো রোসো, দেখে নিই।' কিন্তু, এই কল-দৈত্য মনটাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়; তার একমাত্র ধুয়ো, 'সময় নেই, সময় নেই।' এক জায়গায় যেখানে বনের ফাঁকের ভিতর দিয়ে নীল সমুদ্র দেখা গেল রাজা আমাদের ভাষাতেই বলে উঠলেন 'সমুদ্র'; আমাকে বিস্মিত ও আনন্দিত হতে দেখে আউড়ে গেলেন, 'সমুদ্র, সাগর, অব্ধি, জলাঢ্য।' তার পরে বললেন, 'সপ্তসমুদ্র, সপ্তপর্বত, সপ্তবন, সপ্তআকাশ।' তার পরে পর্বতের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন 'অদ্রি'; তার পরে বলে গেলেন, 'সুমেরু, হিমালয়, বিন্ধ্য, মলয়, ঋষ্যমূক।' এক জায়গায়

পাহাড়ের তলায় ছোটো নদী বয়ে যাচ্ছিল, রাজা আউড়িয়ে গেলেন, 'গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, গোদাবরী, কাবেরী, সরস্বতী।' আমাদের ইতিহাসে একদিন ভারতবর্ষ আপন ভৌগোলিক সত্তাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিল; তখন সে আপনার নদীপর্বতের ধ্যানের দ্বারা আপন ভূমূর্তিকে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল। তার তীর্থগুলি এমন করে বাঁধা হয়েছে—দক্ষিণে কন্যাকুমারী, উত্তরে মানসসরোবর, পশ্চিমসমুদ্রতীরে দ্বারকা, পূর্বসমুদ্রে গঙ্গাসংগম—যাতে করে তীর্থভ্রমণের দ্বারা ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ রূপটিকে ভক্তির সঙ্গে মনের মধ্যে গভীরভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। ভারতবর্ষকে চেনবার এমন উপায় আর কিছু হতে পারে না। তখন পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করতে হত সুতরাং তীর্থভ্রমণের দ্বারা কেবল যে শুধু ভারতবর্ষের ভূগোল জানা যেত তা নয়, তার নানাজাতীয় অধিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আপনিই হত; সেদিন ভারতবর্ষের আত্মোপলব্ধি একটা সত্য-সাধনা ছিল বলেই তার আত্মপরিচয়ের পদ্ধতিও আপনিই এমন সত্য হয়ে উঠেছিল। যথার্থ শ্রদ্ধা কখনো ফাঁকি দিয়ে কাজ সারতে চায় না। অর্থাৎ রাষ্ট্রসভার রঙ্গমঞ্চের উপর ক্ষণিক মিলনের অভিনয়কেই সে মিলন বলে নিজেকে ভোলাতে চায় না। সেদিন মিলনের সাধনা ছিল অকৃত্রিম নিষ্ঠার সাধনা।

সেদিনকার ভারতবর্ষের সেই আত্মমূর্তিধ্যান সমুদ্র পার হয়ে পূর্বমহাসাগরের এই সুদূর দ্বীপপ্রান্তে এমন করে স্থান পেয়েছিল যে, আজ হাজার বছর পরেও সেই ধ্যানমন্ত্রের আবৃত্তি এই রাজার মুখে ভক্তির সুরে বেজে উঠল, এতে আমার মনে ভারি বিস্ময় লাগল। এই-সব ভৌগোলিক নামমালা এদের মনে আছে ব'লে নয়, কিন্তু যে-প্রাচীন যুগে এই নামমালা এখানে উচ্চারিত হয়েছিল সেই যুগে এই উচ্চারণের কী গভীর অর্থ ছিল সেই কথা মনে ক'রে। সেদিনকার ভারতবর্ষ আপনার ঐক্যটিকে কত বড়ো আগ্রহের সঙ্গে জানছিল আর সেই জানাটিকে স্থায়ী করবার জন্যে, ব্যাপ্ত করবার জন্যে, কিরকম সহজ উপায় উদ্ভাবন করেছিল তা স্পষ্ট বোঝা গেল আজ এই দূর দ্বীপে এসে—যে-দ্বীপকে ভারতবর্ষ ভুলে গিয়েছে।

রাজা কিরকম উৎসাহের সঙ্গে হিমালয় বিন্ধ্যাচল গঙ্গা যমুনার নাম করলেন, তাতে কিরকম তাঁর গর্ব বোধ হল! অথচ, এ ভূগোল বস্তুত তাঁদের নয়; রাজা য়ুরোপীয় ভাষা জানেন না, ইনি আধুনিক স্কুলে-পড়া মানুষ নন, সুতরাং পৃথিবীতে ভারতবর্ষ জায়গাটি যে কোথায় এবং কিরকম, সে-সম্বন্ধে সম্ভবত তাঁর অস্পষ্ট ধারণা, অন্তত বাহ্যত এ ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁদের কোনো ব্যবহার নেই; তবুও হাজার বছর আগে এই নামগুলির সঙ্গে যে-সুর মনে বাঁধা হয়েছিল সেই সুর আজও এ দেশের মনে বাজছে। সেই সুরটি কত বড়ো খাঁটি সুর ছিল তাই আমি ভাবছি। আমি কয়েক বছর আগে ভারতবিধাতার যে-জয়গান রচনা করেছি তাতে ভারতের প্রদেশগুলির নাম গেঁথেছি—বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গার নামও আছে। কিন্তু, আজ আমার মনে হচ্ছে, ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের ও সমুদ্রপর্বতের নামগুলি ছন্দে গেঁথে কেবলমাত্র একটি দেশপরিচয় গান আমাদের লোকের মনে গেঁথে দেওয়া ভালো। দেশাত্মবোধ বলে একটা শব্দ আজকাল আমরা কথায় কথায় ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু দেশাত্মজ্ঞান নেই যার তার দেশাত্মবোধ হবে কেমন করে।

তার পরে রাজা আউড়ে গেলেন সপ্তসমুদ্র, সপ্তপর্বত, সপ্তবন, সপ্তআকাশ—অর্থাৎ, তখনকার দিনে ভারতবর্ষ বিশ্বভূবৃত্তান্ত যেরকম কল্পনা করেছিল তারই স্মৃতি। আজ নূতন জ্ঞানের প্রভাবে সেই স্মৃতি নির্বাসিত, কেবল তা পুরাণের জীর্ণ পাতায় আটকে রয়েছে, কিন্তু এখানকার কণ্ঠে এখনো তা শ্রদ্ধার সঙ্গে ধ্বনিত। তার পরে রাজা চার বেদের নাম, যম বরুণ প্রভৃতি চার লোকপালের নাম, মহাদেবের নামাষ্টক বলে গেলেন; ভেবে ভেবে মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের নাম বলতে লাগলেন, সবগুলি মনে এল না।

রাজপুরীতে প্রবেশ করেই দেখি, প্রাঙ্গণে একটি বেদীর উপর বিচিত্র উপকরণ সাজানো; এখানকার চার জন ব্রাহ্মণ—একজন বুদ্ধের, একজন শিবের, একজন ব্রহ্মার, একজন বিষ্ণুর পূজারি; মাথায় মস্ত উঁচু কারুখচিত টুপি, টুপির উপরিভাগে কাঁচের তৈরি এক-একটা চূড়া। এঁরা

চার জন পাশাপাশি বসে আপন-আপন দেবতার স্তবমন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন। একজন প্রাচীনা এবং একজন বালিকা অর্ঘ্যের থালি হাতে করে দাঁড়িয়ে। সবসুদ্ধ সাজসজ্জা খুব বিচিত্র ও সমারোহবিশিষ্ট। পরে শোনা গেল, এই মাঙ্গল্যমন্ত্রপাঠ চলছিল রাজবাড়িতে আমারই আগমন উপলক্ষে। রাজা বললেন, আমার আগমনের পুণ্যে প্রজাদের মঙ্গল হবে, ভূমি সফলা হবে, এই কামনায় স্তবমন্ত্রের আবৃত্তি। রাজা বিষ্ণুবংশীয় বলে নিজের পরিচয় দিলেন।

বেলা সাড়ে চারটের সময় স্নান করে নিয়ে বারান্দায় এসে বসলুম। কারও মুখে কথা নেই। ঘণ্টা-দুয়েক এইভাবে যখন গেল তখন রাজা স্থানীয় বাজার থেকে বোম্বাই প্রদেশের এক খোজা মুসলমান দোকানদারকে তলব দিয়ে আনালেন। কী আমার প্রয়োজন, কিরকম আহারাদির ব্যবস্থা আমার জন্যে করতে হবে ইত্যাদি প্রশ্ন। আমি রাজাকে জানাতে বললুম, তিনি যদি আমাকে ত্যাগ করে বিশ্রাম করতে যান তা হলেই আমি সব চেয়ে খুশি হব।

তার পরদিনে রাজবাড়ির কয়েকজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত তালপাতার পুঁথিপত্র নিয়ে উপস্থিত। একটি পুঁথি মহাভারতের ভীষ্মপর্ব। এইখানকার অক্ষরেই লেখা; উপরের পঙ্‌ক্তি সংস্কৃত ভাষায়, নীচের পঙ্‌ক্তিতে দেশী ভাষায় তারই অর্থব্যাখ্যা। কাগজের একটি পুঁথিতে সংস্কৃত শ্লোক লেখা। সেই শ্লোক রাজা পড়ে যেতে লাগলেন; উচ্চারণের বিকৃতি থেকে বহু কষ্টে তাদের উদ্ধার করবার চেষ্টা করা গেল। সমস্তটা যোগতত্ত্বের উপদেশ। চিত্তবুদ্ধি, ত্রি-অক্ষরাত্মক ওঁ, চন্দ্রবিন্দু এবং অন্য সমস্ত শব্দ ও ভাবনা বর্জন করে শুদ্ধ চৈতন্যযোগে সুখমাপ্নুয়াৎ—এই হচ্ছে সাধনা। আমি রাজাকে আশ্বাস দিলেম যে, আমরা এখানে যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত পাঠিয়ে দেব, তিনি এখানকার গ্রন্থগুলি থেকে বিকৃত ও বিস্মৃত পাঠ উদ্ধার করে তার অর্থব্যাখ্যা করে দিতে পারবেন।

এদিকে আমার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হতে চলল। প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারলুম, আমার শক্তিতে কুলোবে না। সৌভাগ্যক্রমে সুনীতি আমাদের সঙ্গে আছেন; তাঁর অশ্রান্ত উদ্যম, অদম্য উৎসাহ। তিনি ধুতি প'রে, কোমরে পট্টবস্ত্র জড়িয়ে, 'পেদণ্ড' অর্থাৎ এখানকার ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বসে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের দেশের পূজোপকরণ ছিল; পূজাপদ্ধতি তাদের দেখিয়ে দিলেন। আলাপ-আলোচনায় সকলকেই তিনি আগ্রহান্বিত করে তুলেছেন।

যখন দেখা গেল, আমার শরীর আর সইতে পারছে না, তখন আমি রাজপুরী থেকে পালিয়ে এই আম্পুল-তীর্থাশ্রমেষু নির্বাসন গ্রহণ করলুম। এখানে লোকের ভিড় নেই, অভ্যর্থনা-পরিচর্যার উপদ্রব নেই। চার দিকে সুন্দর গিরিব্রজ, শস্যশ্যামলা উপত্যকা, জনপদবধূদের স্নান-সেবায় চঞ্চল উৎসজলসঞ্চয়ের অবিরত কলপ্রবাহ, শৈলতটে নির্মল নীলাকাশে নারিকেলশাখার নিত্য আন্দোলন; আমি বসে আছি বারান্দায়, কখনো লিখছি, কখনো সামনে চেয়ে দেখছি। এমন সময়ে হঠাৎ এসে থামল এক মোটরগাড়ি। গিয়ানয়ারের রাজা ও এই প্রদেশের একজন ওলন্দাজ রাজপুরুষ নেমে এলেন। এঁর বাড়িতে আমার নিমন্ত্রণ। অন্তত এক রাত্রি যাপন করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে আপনিই মহাভারতের কথা উঠল। মহাভারতের যে-কয়টা পর্ব এখনো এখানে পাওয়া যায় তাই তিনি অনেক ভেবে ভেবে আউড়িয়ে গেলেন। বাকি পর্ব কী তাই তিনি জানতে চান। এখানে কেবল আছে, আদিপর্ব, বিরাটপর্ব, উদ্যোগপর্ব, ভীষ্মপর্ব, আশ্রমবাসপর্ব, মুষলপর্ব, প্রস্থানিকপর্ব, স্বর্গারোহণপর্ব।

মহাভারতের কাহিনীগুলির উপরে এ দেশের লোকের চিত্ত বাসা বেঁধে আছে। তাদের আমোদে আহ্লাদে কাব্যে গানে অভিনয়ে জীবনযাত্রায় মহাভারতের সমস্ত চরিত্রগুলি বিচিত্রভাবে বর্তমান। অর্জুন এদের আদর্শ পুরুষ। এখানে মহাভারতের গল্পগুলি কিরকম বদলে গেছে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। সংস্কৃত মহাভারতের শিখণ্ডী এখানে শ্রীকান্তি নাম ধরেছে। শ্রীকান্তি অর্জুনের স্ত্রী। তিনি যুদ্ধের রথে অর্জুনের সামনে থেকে ভীষ্মবধে সহায়তা করেছিলেন। এই শ্রীকান্তি এখানে সতী স্ত্রীর আদর্শ।

গিয়ানয়ারের রাজা আমাকে অনুরোধ করে গেলেন, আজ রাত্রে মহাভারতের হারানো পর্ব প্রভৃতি পৌরাণিক বিষয় নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান। আমি তাঁকে সুনীতির কথা বলেছি; সুনীতি তাঁকে শাস্ত্র বিষয়ে যথাজ্ঞান সংবাদ দিতে পারবেন।

ভারতের ভূগোলস্মৃতি সম্বন্ধে একটা কথা আমার মনে আন্দোলিত হচ্ছে। নদীর নামমালার মধ্যে সিন্ধু ও শতদ্রু প্রভৃতির নাম নেই, ব্রহ্মপুত্রের নামও বাদ পড়েছে। অথচ, দক্ষিণের প্রধান নদীগুলির নাম দেখছি। এর থেকে বোঝা যায়, সেই যুগে পঞ্জাবপ্রদেশ শক হূন যবন পারসিকদের দ্বারা বার বার বিধ্বস্ত ও অধিকৃত হয়ে ভারতবর্ষ থেকে যেন বিদ্যায় সভ্যতায় স্খলিত হয়ে পড়েছিল; অপর পক্ষে ব্রহ্মপুত্র নদের দ্বারা অভিষিক্ত ভারতের পূর্বতম দেশ তখনো যথার্থরূপে হিন্দুভারতের অঙ্গীভূত হয় নি।

এই তো গেল এখানকার বিবরণ। আমার নিজের অবস্থাটা যেরকম দেখছি তাতে এখানে আমার ভ্রমণ সংক্ষেপ করতে হবে।[১]

৩১ আগস্ট ১৯২৭
কারেম আসন। বালি

১১

কল্যাণীয়েষু

রথী, বালিদ্বীপটি ছোটো, সেইজন্যেই এর মধ্যে এমন একটি সুসাম্ভিজত সম্পূর্ণতা। গাছে-পালায় পাহাড়ে-ঝরনায় মন্দিরে-মূর্তিতে কুটীরে-ধানখেতে হাটে-বাজারে সমস্তটা মিলিয়ে যেন এক। বেখাপ কিছু চোখে ঠেকে না। ওলন্দাজ গবর্মেন্ট বাইরে থেকে কারখানাওয়ালাদের এই দ্বীপে আসতে বাধা দিয়েছে; মিশনরিদেরও এখানে আনাগোনা নেই। এখানে বিদেশীদের জমি কেনা সহজ নয়, এমন-কি, চাষবাসের জন্যেও কিনতে পারে না। আরবি-মুসলমান, গুজরাটের খোজা মুসলমান, চীনদেশের ব্যাপারীরা এখানে কেনা-বেচা করে—চার দিকের সঙ্গে সেটা বেমিল হয় না। গঙ্গার ধার জুড়ে দ্বাদশ দেউলগুলিকে লজ্জিত করে বাংলাদেশের বুকের উপর জুটমিল যে নিদারুণ অমিল ঘটিয়েছে এ সেরকম নয়। গ্রামের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ গ্রামের লোকেরই হাতে। এখানে খেতে জলসেকের আর চাষবাসের যে রীতিপদ্ধতি সে খুব উৎকৃষ্ট। এরা ফসল যা ফলায় পরিমাণে তা অন্য দেশের চেয়ে অনেক বেশি।

কাপড় বোনে নানা রঙচঙ ও কারুকৌশলে। অর্থাৎ, এরা কোনো মতে ময়লা ট্যানা কোমরে জড়িয়ে শরীরটাকে অনাদৃত করে রাখে না। তাই, যেখানে কোনো কারণে ভিড় জমে, বর্ণচ্ছটার সমাবেশে সেখানটা মনোরম হয়ে ওঠে। মেয়েদের উত্তর অঙ্গ অনাবৃত। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠলে তারা বলে, 'আমরা কি নষ্ট মেয়ে যে বুক ঢাকব।' শোনা গেল, বালিতে বেশ্যারাই বুকে কাপড় দেয়। মোটের উপর এখানকার মেয়েপুরুষের দেহসৌষ্ঠব ও মুখের চেহারা ভালোই। বেঢপ মোটা বা রোগা আমি তো এ-পর্যন্ত দেখি নি। এখানকার পরিপুষ্ট শ্যামল প্রকৃতির সঙ্গে এখানকার পাটল রঙের নধরদেহ গোরু, এখানকার সুস্থ সবল পরিতৃপ্ত প্রসন্ন ভাবের মানুষগুলি, মিলে গেছে। ছবির দিক থেকে দেখতে গেলে এমন জায়গা পৃথিবীতে খুব কমই আছে।

নন্দলাল এখানে এলেন না বলে আমার মনে অত্যন্ত আক্ষেপ বোধ হয়; এমন সুযোগ তিনি আর-কোথাও কখনো পাবেন না; মনে আছে, কয়েকবৎসর আগে একজন নামজাদা আমেরিকান আর্টিস্ট আমাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, এমন দেশ তিনি আর-কোথাও দেখেন নি। আর্টিস্টের চোখে পড়বার মতো জিনিস এখানে চার দিকেই। অন্নসচ্ছলতা আছে বলেই স্বভাবত গ্রামের লোকের পক্ষে ঘরদুয়ার আচার-অনুষ্ঠান আসবাবপত্রকে শিল্পকলায় সজ্জিত করবার চেষ্টা সফল

[১] মীরা দেবীকে লিখিত।

হতে পেরেছে। কোথাও হেলাফেলার দৃশ্য দেখা গেল না। গ্রামে গ্রামে সর্বত্র চলছে নাচ, গান, অভিনয়; অভিনয়ের বিষয় প্রায়ই মহাভারত থেকে। এর থেকে বোঝা যাবে, গ্রামের লোকের পেটের খাদ্য ও মনের খাদ্যের বরাদ্দ অপর্যাপ্ত। পথে আশেপাশে প্রায়ই নানাপ্রকার মূর্তি ও মন্দির। দারিদ্র্যের চিহ্ন নেই, ভিক্ষুক এ-পর্যন্ত চোখে পড়ল না। এখানকার গ্রামগুলি দেখে মনে হল, এই তো যথার্থ শ্রীনিকেতন। গ্রামের সমগ্র প্রাণটি সকল দিকে পরিপূর্ণ।

এ দেশে উৎসবের প্রধান অঙ্গ নাচ। এখানকার নারকেলবন যেমন সমুদ্র-হাওয়ায় দুলছে তেমনি সমস্ত দেশের মেয়ে পুরুষ নাচের হাওয়ায় আন্দোলিত। এক-একটি জাতির আত্ম-প্রকাশের এক-একটি বিশেষ পথ থাকে। বাংলাদেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল সেদিন সহজেই কীর্তনগানে সে আপন আবেগসঞ্চারের পথ পেয়েছে; এখনো সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি। এখানে এদের প্রাণ যখন কথা কইতে চায় তখন সে নাচিয়ে তোলে। মেয়ে নাচে, পুরুষ নাচে। এখানকার যাত্রা অভিনয় দেখেছি, তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চলায়-ফেরায়, যুদ্ধে-বিগ্রহে, ভালোবাসার প্রকাশে, এমন-কি ভাঁড়ামিতে, সমস্তটাই নাচ। সেই নাচের ভাষা যারা ঠিকমত জানে তারা বোধ হয় গল্পের ধারাটা ঠিকমত অনুসরণ করতে পারে। সেদিন এখানকার এক রাজবাড়িতে আমরা নাচ দেখছিলুম। খানিক বাদে শোনা গেল, এই নাচ-অভিনয়ের বিষয়টা হচ্ছে শাল্ব-সত্যবতীর আখ্যান। এর থেকে বোঝা যায়, কেবল ভাবের আবেগ নয়, ঘটনা-বর্ণনাকেও এরা নাচের আকারে গড়ে তোলে। মানুষের সকল ঘটনারই বাহ্যরূপ চলাফেরায়। কোনো একটা অসামান্য ঘটনাকে পরিদৃশ্যমান করতে চাইলে তার চলাফেরাকে ছন্দের সুষমাযোগে রূপের সম্পূর্ণতা দেওয়া সংগত। বাণীর দিকটাকে বাদ দিয়ে কিংবা খাটো করে কেবলমাত্র গতিরূপটিকে ছন্দের উৎকর্ষ দেওয়া এখানকার নাচ। পৌরাণিক যে-আখ্যায়িকা কাব্যে কেবলমাত্র কানে শোনার বিষয়, এরা সেইটেকেই কেবলমাত্র চোখে দেখার বিষয় করে নিয়েছে। কাব্যের বাহন বাক্য, সেই বাক্যের ছন্দ-অংশ সংগীতের বিশ্বজনীন নিয়মে চালিত; কিন্তু তার অর্থ-অংশ কৃত্রিম, সেটা সমাজে পরস্পরের আপসে তৈরি-করা সংকেতমাত্র। এই দুইয়ের যোগে কাব্য। গাছ শব্দটা শুনলে গাছ তারাই দেখে যাদের মধ্যে এ সম্বন্ধে একটা আপসে বোঝাপড়া আছে। তেমনি এদের নাচের মধ্যে শুধু ছন্দ থাকলে তাতে আখ্যানবর্ণনা চলে না, সংকেতও আছে; এই দুইয়ের যোগে এদের নাচ। এই নাচে রসনা বন্ধ করে এরা সমস্ত দেহ দিয়ে কথা কইছে ইঙ্গিতে এবং ভঙ্গিসংগীতে। এদের নাচে যুদ্ধের যে-রূপ দেখি কোনো রণক্ষেত্রে সেরকম যুদ্ধ দূরতঃও সম্ভব নয়। কিন্তু যদি কোনো স্বর্গে এমন বিধি থাকে যে, ছন্দে যুদ্ধ করতে হবে, এমন যুদ্ধ যাতে ছন্দ-ভঙ্গ হলে সেটা পরা-ভবেরই শামিল হয়, তবে সেটা এইরকম যুদ্ধই হত। বাস্তবের সঙ্গে এই অনৈক্য নিয়ে যাদের মনে অশ্রদ্ধা বা কৌতুক জন্মায় শেক্‌স্‌পিয়রের নাটক পড়েও তাদের হাসা উচিত—কেননা, তাতে লড়তে লড়তেও ছন্দ, মরতে মরতেও তাই। সিনেমাতে আছে রূপের সঙ্গে গতি, সেই সুযোগটিকে যথার্থ আর্টে পরিণত করতে গেলে আখ্যানকে নাচে দাঁড়-করানো চলে। বলা বাহুল্য, বাইনাচ প্রভৃতি যে-সব পদার্থকে আমরা নাচ বলি তার আদর্শ এ নাচের নয়। জাপানে কিয়োটোতে ঐতিহাসিক নাট্যের অভিনয় দেখেছি; তাতে কথা আছে বটে; কিন্তু তার ভাবভঙ্গি চলাফেরা সমস্ত নাচের ধরনে; বড়ো আশ্চর্য তার শক্তি। নাটকে আমরা যখন ছন্দোময় বাক্য ব্যবহার করি তখন সেইসঙ্গে চলাফেরা হাবভাব যদি সহজ রকমেরই রেখে দেওয়া হয় তা হলে সেটা অসংগত হয়ে ওঠে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। নামেতেই প্রকাশ পায়, আমাদের দেশে একদিন নাট্য অভিনয়ে সর্বপ্রধান অঙ্গই ছিল নাচ। নাটক দেখতে যারা আসে, পশ্চিম মহাদেশে তাদের বলে অডিয়েন্‌স্‌, অর্থাৎ শ্রোতা। কিন্তু, ভারতবর্ষে নাটককে বলেছে দৃশ্যকাব্য; অর্থাৎ তাতে কাব্যকে আশ্রয় করে চোখে দেখার রস দেবার জন্যেই অভিনয়।

এই তো গেল নাচের দ্বারা অভিনয়। কিন্তু বিশুদ্ধ নাচও আছে। পরশু রাত্রে সেটা গিয়ানয়ারের রাজবাড়িতে দেখা গেল। সুন্দর-সাজ-করা দুটি ছোটো মেয়ে—মাথায় মুকুটের উপর

ফুলের দণ্ডগুলি একটু নড়াতেই দুলে ওঠে। গামেলান বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে দুজনে মিলে নাচতে লাগল। এই বাদ্যসংগীত আমাদের সঙ্গে ঠিক মেলে না। আমাদের দেশের জলতরঙ্গ বাজনা আমার কাছে সংগীতের ছেলেখেলা বলে ঠেকে। কিন্তু, সেই জিনিসটিকে গম্ভীর, প্রশস্ত, সুনিপুণ বহুযন্ত্রমিশ্রিত বিচিত্র আকারে এদের বাদ্যসংগীতে যেন পাওয়া যায়। রাগরাগিণীতে আমাদের সঙ্গে কিছুই মেলে না; যে-অংশে মেলে সে হচ্ছে এদের মৃদঙ্গের ধ্বনি, সঙ্গে করতালও আছে। ছোটো বড়ো ঘণ্টা এদের এই সংগীতের প্রধান অংশ। আমাদের দেশের নাট্যশালায় কন্সর্ট বাজনার যে নূতন রীতি হয়েছে এ সেরকম নয়; অথচ, য়ুরোপীয় সংগীতে বহুযন্ত্রের যে-হার্মনি এ তাও নয়। ঘণ্টার মতো শব্দে একটা মূল স্বরসমাবেশ কানে আসছে; তার সঙ্গে নানাপ্রকার যন্ত্রের নানারকম আওয়াজ যেন একটা কারুশিল্পে গাঁথা হয়ে উঠছে। সমস্তটাই যদিও আমাদের থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র, তবু শুনতে ভারি মিষ্টি লাগে। এই সংগীত পছন্দ করতে য়ুরোপীয়-দেরও বাধে না।

গামেলান বাজনার সঙ্গে ছোটো মেয়ে দুটি নাচলে; তার শ্রী অত্যন্ত মনোহর। অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে সমস্ত শরীরে ছন্দের যে-আলোড়ন তার কী চারুতা, কী বৈচিত্র্য, কী সৌকুমার্য, কী সহজ লীলা। অন্য নাচে দেখা যায়, নটী তার দেহকে চালনা করছে; এদের দেখে মনে হতে লাগল, দুটি দেহ যেন স্বত-উৎসারিত নাচের ফোয়ারা। বারো বছরের পরে এই মেয়েদের আর নাচতে দেওয়া হয় না; বারো বছরের পরে শরীরের এমন সহজ সুকুমার হিল্লোল থাকা সম্ভব নয়।

সেই সন্ধ্যাবেলাতেই রাজবাড়িতে আর-একটি ব্যাপার দেখলুম, মুখোশপরা নটেদের অভিনয়। আমরা জাপান থেকে যে-সব মুখোশ এনেছিলুম তার থেকে বেশ বোঝা যায় মুখোশ তৈরি এক-প্রকারের বিশেষ কলাবিদ্যা। এতে যথেষ্ট গুণপনা চাই। আমাদের সকলেরই মুখে যেমন ব্যক্তিগত তেমনি শ্রেণীগত বিশেষত্ব আছে। বিশেষ ছাঁচ ও ভাব-প্রকাশ অনুসারে আমাদের মুখের ছাঁদ এক-একরকম শ্রেণী নির্দেশ করে। মুখোশ তৈরি যে-গুণী করে সে সেই শ্রেণীপ্রকৃতিকে মুখোশে বেঁধে দেয়। সেই বিশেষশ্রেণীর মুখের ভাববৈচিত্র্যকে একটি বিশেষ ছাঁদে সে সংহত করে। নট সেই মুখোশ পরে এলে আমরা তখনই দেখতে পাই, একটা বিশেষ মানুষকে কেবল নয়, বিশেষ ভাবের এক শ্রেণীর মানুষকে। সাধারণত, অভিনেতা ভাব অনুসারে অঙ্গভঙ্গি করে। কিন্তু, মুখোশে মুখের ভঙ্গি স্থির করে বেঁধে দিয়েছে। এইজন্যে অভিনেতার কাজ হচ্ছে মুখোশেরই সামঞ্জস্য রেখে অঙ্গভঙ্গি করা। মূল ধুয়োটা তার বাঁধা; এমন করে তাল দিতে হবে যাতে প্রত্যেক সুরে সেই ধুয়োটার ব্যাখ্যা হয়, কিচ্ছু অসংগত না হয়। এই অভিনয়ে তাই দেখলুম।

অভিনয়ের সঙ্গে এদের কণ্ঠসংগীত যা শুনছি তাকে সংগীত বলাই চলে না। আমাদের কানে অত্যন্ত বেসুরো এবং উৎকট ঠেকে। এখানে আমরা তো গ্রামের কাছেই আছি; এরা কেউ একলা কিংবা দল বেঁধে গান গাচ্ছে, এ তো শুনি নি। আমাদের পাড়াগাঁয়ে চাঁদ উঠেছে অথচ কোথাও গান ওঠে নি, এ সম্ভব হয় না। এখানে সন্ধ্যার আকাশে নারকেলগাছগুলির মাথার উপর শুক্লপক্ষের চাঁদ দেখা দিচ্ছে, গ্রামে কুঁকড়ো ডাকছে, কুকুর ডাকছে, কিন্তু কোথাও মানুষের গান নেই।

এখানকার একটা জিনিস বার বার লক্ষ করে দেখেছি, ভিড়ের লোকের আত্মসংযম। সেদিন গিয়ানয়ারের রাজবাড়িতে যখন অভিনয় হচ্ছিল চার দিকে অবারিত লোকের সমাগম। সুনীতিকে ডেকে বললুম, মেয়েদের কোলে শিশুদের আর্তরব শুনি নে কেন। নারীকণ্ঠই বা এমন সম্পূর্ণ নীরব থাকে কোন্ আশ্চর্য শাসনে। মনে পড়ে, কলকাতার থিয়েটারে মেয়েদের কলালাপ ও শিশুদের কান্না বন্যার মতো কমেডি ও ট্র্যাজেডি ছাপিয়ে দিয়ে কিরকম অসংযত অসভ্যতার হিল্লোল তোলে। সেদিন এখানে দুই-একটি মেয়ের কোলে শিশুও দেখেছি কিন্তু তারা কাঁদল না কেন।

একটা জিনিস এখানে দেখা গেল যা আর কোথাও দেখি নি। এখানকার মেয়েদের গায়ে গহনা

নেই। কখনো কখনো কারও এক হাতে একটা চুড়ি দেখেছি, সেও সোনার নয়। কানে ছিদ্র করে শুকনো তালপাতার একটি গুটি পরেছে। বোধ হচ্ছে, যেন অজন্তার ছবিতেও এরকম কর্ণভূষণ দেখেছি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এদের আর-সকল কাজেই অলংকারের বাহুল্য ছাড়া বিরলতা নেই। যেখানে-সেখানে পাথরে কাঠে কাপড়ে নানা ধাতুদ্রব্যে এরা বিচিত্র অলংকার সমস্ত দেশে ছড়িয়ে রেখেছে, কেবল এদের মেয়েদের গায়েই অলংকার নেই।

আমাদের দেশে সাধারণত দেখা যায়, অলংকৃত জিনিসের প্রধান রচনাস্থান পুরোনো শহরগুলি যেখানে মুসলমান বা হিন্দু প্রভাব সংহত ছিল, যেমন দিল্লি, আগ্রা, ঢাকা, কাশী, মাদুরা প্রভৃতি জায়গা। এখানে সেরকম বোধ হল না। এখানে শিল্পকাজ কম-বেশি সর্বত্র ও সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়ানো। তার মানে, এখানকার লোক ধনীর ফরমাশে নয়, নিজের আনন্দেই নিজের চার দিককে সজ্জিত করে। কতকটা জাপানের মতো। তার কারণ, অল্প-পরিসর দ্বীপের মধ্যে আইডিয়া এবং বিদ্যা ছড়িয়ে যেতে বিলম্ব হয় না। তা ছাড়া এদের মধ্যে জাতিগত ঐক্য। সেই সমজাতীয় মনোবৃত্তিতে শক্তির সাম্য দেখা যায়। দ্বীপ মাত্রের একটি স্বাভাবিক বিশেষত্ব এই যে, সেখানকার মানুষ সমুদ্রবেষ্টিত হয়ে বহুকাল নিজের বিশেষ নৈপুণ্যকে অব্যাঘাতে ঘনীভূত করতে ও তাকে রক্ষা করতে পারে। আমাদের অতিবিস্তৃত ভারতবর্ষে এক কালে যা প্রচুর হয়ে উৎপন্ন হয় অন্য কালে তা ছড়িয়ে নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমাদের দেশে অজন্তা আছে অজন্তার কালকেই আঁকড়ে; কনারক আছে কনারকেরই যুগে; তারা আর একাল পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পারলে না। শুধু তাই নয়, তত্ত্বজ্ঞান ভারতীয় মনের প্রধান সম্পদ, কিন্তু বহু দূরে দূরে উপনিষদের বা শংকরাচার্যের কালে তা ভাগে ভাগে লগ্ন হয়ে রইল। একালে আমরা শুধু তাই নিয়ে আবৃত্তি করি কিন্তু তার সৃষ্টিধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়েও এত শতাব্দী পরেও ভারতবর্ষের এত জিনিস যে এখানে এখনো এমন করে আছে, তার কারণ, এটা দ্বীপ; এখানে সহজে কোনো জিনিস ভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে না। অর্থ নষ্ট হতে পারে, একটার দ্বারা আর-একটা চাপা পড়তে পারে, কিন্তু বস্তুটা তবু থেকে যায়। এই কারণেই প্রাচীন ভারতের অনেক জিনিসই এখানে আমরা বিশুদ্ধভাবে পাব বলে আশা করি। হয়তো এখানকার নাচ এবং নৃত্যমূলক অভিনয়টা সেই জাতের হতেও পারে। এখানকার রাজাদের বলে 'আর্য'। আমার বিশ্বাস, তার অর্থ, রাজবংশ নিজেদের আর্যবংশীয় বলেই জানে, তারা স্থানীয় অধিবাসীদের স্বজাতীয় ছিল না। তাই, এখানকার রাজাদের ঘরে যে-সকল কলা ও অনুষ্ঠান আজও চলে আসছে সেগুলি সন্ধান করলে এমন অনেক জিনিস পাওয়া যাবে যা আমাদের দেশে লুপ্ত ও বিস্মৃত।

এই ছোটো দ্বীপে এককালে অনেক রাজা ছিল, তাদের কেউ-কেউ ওলন্দাজ-আক্রমণে আসন্ন-পরাভবের আশংকায় দলে দলে হাজার হাজার লোক নিঃশেষে আত্মহত্যা করে মরেছে। এখনো রাজোপাধিধারী যে কয়েকজন আছে তারা পুরোনো দামি শামাদানের মতো, যাতে বাতি আর জ্বলে না। তাদের প্রাসাদ ও সাজসজ্জা আছে, তা ছাড়া তারা যেখানে আছে তাকে নগর বলা চলে। কিন্তু, এই নগরে আর গ্রামে যে পার্থক্য সে যেন ভাইবোনের পার্থক্যের মতো— তারা এক বাড়িতেই থাকে, তাদের মাঝে প্রাচীর নেই। আধুনিক ভারতে শিল্পচর্চা প্রভৃতি নানা বিষয়ে নগরে গ্রামে ছাড়াছাড়ি। শহরগুলি যে দীপ জ্বালে তার আলো গ্রামে গিয়ে পড়েই না। দেশের সম্পত্তি যেন ভাগ হয়ে গেছে, গ্রামের অংশে যেটুকু পড়েছে তাতে আবার অনুষ্ঠান বজায় রাখা সম্ভব নয়। এই কারণে সমস্ত দেশ এক হয়ে কোনো শিল্প, কোনো বিদ্যাকে, রক্ষণ ও পোষণ করতে পারে না। তাই শহরের লোক যখন দেশের কথা ভাবে তখন শহরকেই দেশ বলে জানে; গ্রামের লোক দেশের কথা ভাবতেই জানে না। এই বালিতে আমরা মোটরে মোটরে দূরে দূরান্তরে যতই ভ্রমণ করি— নদী, গিরি, বন, শস্যক্ষেত্র ও পল্লীতে-শহরে মিলে খুব একটা ঘনিষ্ঠতা দেখতে পাই; এখানকার সকল মানুষের মধ্যেই যেন এদের সকল সম্পদ ছড়ানো।

গামেলান-সংগীতের কথা পূর্বেই বলেছি। ইতিমধ্যে এ সম্বন্ধে আমাকে চিন্তা করতে হয়েছে।

এরা-যে আপনমনে সহজ আনন্দে গান গায় না, তার কারণ এদের কণ্ঠসংগীতের অভাব। এরা টিং টিং টুং টাং করে যে-বাজনা বাজায় বস্তুত তাতে গান নেই, আছে তাল। নানা যন্ত্রে এরা তালেরই বোল দিয়ে চলে। এই বোল দেবার কোনো কোনো যন্ত্র ঢাক-ঢোলের মতোই, তাতে স্বর অল্প, শব্দই বেশি; কোনো কোনো যন্ত্র ধাতুতে তৈরি, সেগুলি স্বরবান। এই ধাতুযন্ত্রে টানা সুর থাকা সম্ভব নয়, থাকবার দরকার নেই, কেননা টানা সুর গানেরই জন্যে, বিচ্ছিন্ন সুরগুলিতে তালেরই বোল দেয়। আসলে এরা গান গায় গলা দিয়ে নয়, সর্বাঙ্গ দিয়ে; এদের নাচই যেন পদে পদে টানা সুরের মীড় দেওয়া— বিলিতি নাচের মতো ঝম্পবহুল নয়। এদের নাচ বর্ষার ঝমাঝম জলবিন্দুবৃষ্টির মতো নয়, ঝরনার তরঙ্গিত ধারার মতো। তাল যে-ঐক্যকে দেখায় সে হচ্ছে কালের অংশগুলিকে যোজনা ক'রে, গান যে-ঐক্যকে দেখায় সে হচ্ছে রসের অখণ্ডতাকে সম্পূর্ণ ক'রে। তাই বলছি, এদের সংগীতই তাল, এদের নৃত্যই গান। আমাদের দেশে এবং য়ুরোপে গীতাভিনয় আছে, এদের দেশে নৃত্যাভিনয়।

ইতিমধ্যে এখানকার ওলন্দাজ রাজপুরুষ অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। এদের একটা বিশেষত্ব আমার চোখে লাগল। অধীনস্থ জাতের উপর এদের প্রভুত্ব যথেষ্ট নেই, তা নয়, কিন্তু এদের ব্যক্তিগত ব্যবহারে কর্তৃত্বের ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করি নি। এখানকার লোকদের সঙ্গে এরা সহজে মেলামেশা করতে পারে। দুই জাতির পরস্পরের মধ্যে বিবাহ সর্বদাই হয় এবং সেই বিবাহের সন্তানেরা পিতৃকুল থেকে ভ্রষ্ট হয় না। এখানে অনেক উচ্চপদের ওলন্দাজ আছে যারা সংকরবর্ণ; তারা অবজ্ঞাভাজন নয়। এখানকার মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে এমন সহজ ব্যবহার কেমন করে সম্ভব হল, এই প্রশ্ন করাতে একজন ওলন্দাজ আমাকে বলেছিলেন, 'যাদের অনেক সৈন্য, অনেক যুদ্ধজাহাজ, অনেক সম্পদ, অনেক সাম্রাজ্য, ভিতরে ভিতরে সর্বদাই তাদের মনে থাকে যে তারা একটা মস্ত-কিছু; এইজন্য ছোটো দরজা দিয়ে ঢুকতে তাদের অত্যন্ত বেশি সংকুচিত হতে হয়। নিজেদের সর্বদা তত প্রকাণ্ড বড়ো বলে জানবার অবসর আমাদের হয় নি। এইজন্যে সহজে সর্বত্র আমরা ঢুকতে পারি; এইজন্যে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করা আমাদের পক্ষে সহজ। ইতি ৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৭[১]

১২

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, আজ বালিদ্বীপে আমাদের শেষ দিন। মুণ্ডুক বলে একটি পাহাড়ের উপর ডাক-বাঙলায় আশ্রয় নিয়েছি। এতদিন বালির যে-অংশে ঘুরেছি সমস্তই চাষ-করা বাস-করা জায়গা; লোকালয়গুলি নারকেল, সুপারি, আম, তেঁতুল, শজনে গাছের ঘনশ্যামল বেষ্টনে ছায়াবিষ্ট। এখানে এসে পাহাড়ের গা জুড়ে প্রাচীন অরণ্য দেখা গেল। কতকটা শিলঙ পাহাড়ের মতো। নীচে স্তরবিন্যস্ত ধানের খেত; পাহাড়ের একটা ফাঁকের ভিতর দিয়ে দূরে সমুদ্রের আভাস পাওয়া যায়। এখানে দূরের দৃশ্যগুলি প্রায়ই বাষ্পে অবগুণ্ঠিত। আকাশে অল্প একটু অস্পষ্টতার আবরণ, এখানকার পুরানো ইতিহাসের মতো। এখন শুক্লপক্ষের রাত্রি, কিন্তু এমন রাত্রে আমাদের দেশের চাঁদ দিগঙ্গনাদের কাছে যেমন সম্পূর্ণ ধরা দেয় এখানে তা নয়; যে-ভাষা খুব ভালো করে জানি নে যেন সেইরকম তার জ্যোৎস্নাটি।

এতদিন এ দেশটা একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। আহূত রবাহূত বহু লোকের ভিড়। কত ফোটোগ্রাফওয়ালা, সিনেমাওয়ালা, কত ক্ষণিক-পরিব্রাজকের দল। পান্থশালা নিঃশেষে পরিপূর্ণ। মোটরের ধুলোয় এবং ধমকে আকাশ ম্লান। খেয়া-জাহাজ কাল জাভা অভিমুখে

[১] রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত।

ফিরবে, তাই প্রতিবর্তী যাত্রীর দল আজ নানা পথ বিপথ দিয়ে চঞ্চল হয়ে ধাবমান। এত সমারোহ কেন, সে কথা জিজ্ঞাসা করতে পারো।

বালির লোকেরা যারা হিন্দু, যারা নিজের ধর্মকে আগম বলে, শ্রাদ্ধক্রিয়া তাদের কাছে একটা খুব বড়ো উৎসব। কেননা, যথানিয়মে মৃতের সৎকার হলে তার আত্মা কুয়াশা হয়ে পৃথিবীতে এসে পুনর্জন্ম নেয়; তার পর বারে বারে সংস্কার পেতে পেতে শেষকালে শিবলোকে চরম মোক্ষে তার উদ্ধার।

এবারে আমরা যাঁদের শ্রাদ্ধে এসেছি তাঁরা দেবত্ব পেয়েছেন বলে আত্মীয়েরা স্থির করেছে, তাই এত বেশি ঘটা। এত ঘটা অনেক বৎসর হয় নি, আর কখনো হবে কি না সকলে সন্দেহ করছে। কেননা, আধুনিক কাল তার কাটারি হাতে পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে অনুষ্ঠানের বাহুল্যকে খর্ব করবার জন্যে; তার একমাত্র উৎসাহ উপকরণ-বাহুল্যের দিকে।

এখানকার লোকে বলছে, সমারোহে খরচ হবে এখানকার টাকায় প্রায় চল্লিশ হাজার, আমাদের টাকায় পঞ্চাশ হাজার। ব্যয়ের এই পরিমাণটা সকলেরই কাছে অত্যন্ত বেশি বলেই ঠেকছে। আমাদের দেশের বড়ো লোকের শ্রাদ্ধে পঞ্চাশ হাজার টাকা বেশি কিছুই নয়। কিন্তু প্রভেদ হচ্ছে, আমাদের শ্রাদ্ধের খরচ ঘটা করবার জন্যে তেমন নয় যেমন পুণ্য করবার জন্যে। তার প্রধান অঙ্গই দান, পরলোকগত আত্মার কল্যাণকামনায়। এখানকার শ্রাদ্ধেও স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে অর্ঘ্য ও আহার্য দান যে নেই তা নয়, কিন্তু এর সব চেয়ে ব্যয়সাধ্য অংশ সাজসজ্জা। সে-সমস্তই চিতায় পুড়ে ছাই হয়। এই দেহকে নষ্ট করে ফেলতে এদের আন্তরিক অনুমোদন নেই, সেটা সেদিনকার অনুষ্ঠানের একটা ব্যাপারে বোঝা যায়। কালো গোরুর মূর্তি, তার পেটের মধ্যে মৃতদেহ, রাস্তা দিয়ে এটাকে যখন বহন করে নিয়ে যায় তখন শোভাযাত্রার ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে ঠেলাঠেলি পড়ে যায়। যেন ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা, যেন অনিচ্ছা। বাহকেরা তাড়া খায়, ঘুরপাক দেয়। এইখানেই আগম অর্থাৎ যে-ধর্ম বাইরে থেকে এসেছে তার সঙ্গে এদের নিজের হৃদয়বৃত্তির বিরোধ। আগমেরই হল জিত, দেহ হল ছাই।

উবুদ বলে জায়গার রাজার ঘরে এই অনুষ্ঠান। তিনি যখন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলে সুনীতির পরিচয় পেলেন সুনীতিকে জানালেন, শ্রাদ্ধক্রিয়া এমন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণভাবে এ দেশে পুনর্বার হবার সম্ভাবনা খুব বিরল; অতএব, এই অনুষ্ঠানে সুনীতি যদি যথারীতি শ্রাদ্ধের বেদমন্ত্র পাঠ করেন তবে তিনি তৃপ্ত হবেন। সুনীতি ব্রাহ্মণসজ্জায় ধূপধুনো জ্বালিয়ে 'মধুবাতা ঋতায়ন্তে' এবং কঠোপনিষদের শ্লোক প্রভৃতি উচ্চারণ করে শুভকর্ম সম্পন্ন করেন। বহুশত বৎসর পূর্বে একদিন বেদমন্ত্রগানের সঙ্গে এই দ্বীপে শ্রাদ্ধক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল, বহুশত বৎসর পরে এখানকার শ্রাদ্ধে সেই মন্ত্র হয়তো বা শেষবার ধ্বনিত হল। মাঝখানে কত বিস্মৃতি, কত বিকৃতি। রাজা সুনীতিকে পৌরোহিত্যের সম্মানের জন্যে কী দিতে হবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সুনীতি বলেছিলেন, এই কাজের জন্যে অর্থগ্রহণ তাঁর ব্রাহ্মণবংশের রীতিবিরুদ্ধ। রাজা তাঁকে কর্ম-অন্তে বালির তৈরি মহার্ঘ বস্ত্র ও আসন দান করেছিলেন।

এখানে একটা নিয়ম আছে যে, গৃহস্থের ঘরে এমন কারও যদি মৃত্যু হয় যার জ্যেষ্ঠরা বর্তমান তা হলে সেই গুরুজনদের মৃত্যু না হলে এর আর সৎকার হবার জো নেই। এইজন্যে বড়োদের মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত মৃতদেহকে রেখে দিতে হয়। তাই অনেকগুলি দেহের দাহক্রিয়া এখানে একসঙ্গে ঘটে। মৃতকে বহুকাল অপেক্ষা করে থাকতে হয়।

সৎকারের দীর্ঘকাল অপেক্ষার আরও একটা কারণ, সৎকারের উপকরণ ও ব্যয়বাহুল্য। তার জন্যে প্রস্তুত হতে দেরি হয়ে যায়। তাই শুনেছি, এখানে কয়েক বৎসর অন্তর বিশেষ বৎসর আসে, তখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়।

শবাধার বহন করে নিয়ে যাবার জন্যে রথের মতো যে একটা মস্ত উঁচু যান তৈরি হয়, অনেকসংখ্যক বাহকে মিলে সেটাকে চিতার কাছে নিয়ে যায়। এই বাহনকে বলে ওয়াদা। আমাদের

দেশে ময়ূরপংখি যেমন ময়ূরের মূর্তি দিয়ে সজ্জিত, তেমনি এদের এই ওয়াদার গায়ে প্রকাণ্ড বড়ো একটি গরুড়ের মুখ; তার দুই-ধারে বিস্তীর্ণ মস্ত দুই পাখা, সুন্দর করে তৈরি। শিল্প-নৈপুণ্যে বিস্মিত হতে হয়। শ্রাদ্ধের এই নানাবিধ উপকরণের আয়োজন মনের ভিতরে সবটা গ্রহণ করা বড়ো কঠিন; যেটা সব চেয়ে দৃষ্টি ও মনকে আকর্ষণ করে সে হচ্ছে জনতার অবিশ্রাম ধারা। বহু দূর ও নানা দিক থেকে মেয়েরা মাথায় কতরকমের অর্ঘ্য বহন করে সার বেঁধে রাস্তা দিয়ে চলেছে। দূরে দূরে, গ্রামে গ্রামে, যেখানে অর্ঘ্য-মাথায় বাহকেরা যাত্রা করতে প্রস্তুত, সেখানে গ্রামের তরুচ্ছায়ায় গামেলান বাজিয়ে এক-একটি স্বতন্ত্র উৎসব চলছে। সর্বসাধারণে মিলে দলে দলে এই অনুষ্ঠানের জন্যে আপন আপন উপহার নিয়ে এসে যজ্ঞক্ষেত্রে জমা করে দিচ্ছে। অর্ঘ্যগুলি যেমন-তেমন করে আনা নয়, সমস্ত বহু যত্নে সুসজ্জিত। সেদিন দেখলুম, ইয়াং-ইয়াং বলে এক শহরের রাজা বহু বাহনের মাথায় তাঁর উপহার পাঠালেন। সকলের পিছনে এলেন তাঁর প্রাসাদের পুরনারীরা। কী শোভা, কী সজ্জা, কী আভিজাত্যের বিনয়সৌন্দর্য! এমনি করে নানা পথ বেয়ে বেয়ে বহুবর্ণবিচিত্র তরঙ্গিত উৎসবের অবিরাম প্রবাহ। দেখে দেখে চোখের তৃপ্তির শেষ হয় না।

সব চেয়ে এই কথাটি মনে হয়, এইরকম বহুদূরব্যাপী উৎসবের টানে বহু মানুষের আনন্দ-মিলনটি কী কল্যাণময়। এই মিলন কেবলমাত্র একটা মেলা বসিয়ে বহু লোক জড়ো হওয়া নয়। এই মিলনটির বিচিত্র সুন্দর অবয়ব। নানা গ্রামে, নানা ঘরে, এই উৎসবমূর্তিকে অনেক দিন থেকে নানা মানুষে বসে বসে নিজের হাতে সুসম্পূর্ণ করে তুলেছে। এ হচ্ছে বহুজনের তেমনি সম্মিলিত সৃষ্টি যেমন করে এরা নানা লোক বসে, নানা যন্ত্রে তাল মিলিয়ে, সুর মিলিয়ে, একটা সচল ধ্বনিমূর্তি তৈরি করে তুলতে থাকে। কোথাও অনাদর নেই, কুশ্রীতা নেই। এত নিবিড় লোকের ভিড়, কোথাও একটুও কলহের আভাস মাত্র দেখা গেল না। জনতার মধ্যে মেয়েদের সমাবেশ খুবই বেশি, তাতে একটুও আপদের সৃষ্টি হয় নি। বহুলোকের মিলন যেখানে গ্লানিহীন সৌন্দর্যে বিকশিত, যথার্থ সভ্যতার লক্ষ্মীকে সেইখানেই তো আসীন দেখি; যেখানে বিরোধ ঠেকাবার জন্যে পুলিসবিভাগের লাল পাগড়ি সেখানে নয়; যেখানে অন্তরের আনন্দে মানুষের মিলন কেবল-যে নিরাময় নিরাপদ তা নয়, আপনা-আপনি ভিতরের থেকে সৌন্দর্যে ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ, সেইখানেই সভ্যতার উৎকর্ষ। এই জিনিসটিকে এমনই সুসম্পূর্ণভাবে ইচ্ছা করি নিজের দেশে। কিন্তু, এই ছোটো দ্বীপের রাস্তার ধারে যে-ব্যাপারটিকে দেখা গেল সে কি সহজ কথা। কত কালের সাধনায়, ভিতরের কত গ্রন্থি মোচন করে তবে এইটুকু জিনিস সহজ হয়। জড়ো হওয়া শক্ত নয়, এক হওয়াই শক্ত। সেই ঐক্যকে সকলের সৃষ্টিশক্তি দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, সুন্দর করে তোলা কতই শক্তিসাধ্য। আমাদের মিলিত কাজকে সকলে এক হয়ে উৎসবের রূপ দেওয়া আবশ্যক। আনন্দকে সুন্দরকে নানা মূর্তিতে নানা উপলক্ষে প্রকাশ করা চাই। সেই প্রকাশে সকলেই আপন-আপন ইচ্ছার, আপন-আপন শক্তির, যোগদান করতে থাকলে তবেই আমাদের ভিতরকার খোঁচাগুলো ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হয়ে যায়, ঝরনার জল ক্রমাগত বইতে থাকলে তলার নুড়িগুলি যেমন সুডোল হয়ে আসে। আমাদের অনেক তপস্বী মনে করেন, সাধনায় জ্ঞান ও কর্মই যথেষ্ট। কিন্তু, বিধাতার রচনায় তিনি দেখিয়েছেন শুধু স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া নয়, রসেই সৃষ্টির চরম সম্পূর্ণতা। মরুর মধ্যে যা-কিছু শক্তি সমস্তই বিরোধের শক্তি, বিনাশের শক্তি। রস যখন সেখানে আসে তখনই প্রাণ আসে; তখন সব শক্তি সেই রসের টানে ফুল ফোটায়, ফল ধরায়; সৌন্দর্যে কল্যাণে সে উৎসবের রূপ ধারণ করে।

বেলা আটটা বাজল। বারান্দার সামনে গোটা-দুই-তিন মোটরগাড়ি জমা হয়েছে। সুরেনে সুনীতিতে মিলে নানা আয়তনের বাক্সে ব্যাগে ঝুলিতে থলিতে গাড়ি বোঝাই করছেন। তাঁরা একদল আগে থাকতেই খেয়াঘাটের দিকে রওনা হবার অভিমুখী। নিকটের পাহাড়ের ঘনসবুজ অরণ্যের 'পরে রৌদ্র পড়েছে; দূরের পাহাড় নীলাভ বাষ্পে আবৃত। দক্ষিণ শৈলতটের সমুদ্রখণ্ডটি নিশ্বাসের-ভাপ-লাগা আয়নার মতো ম্লান। ঐ কাছেই গিরিবক্ষসংলগ্ন পল্লীটির বনবেষ্টনের মধ্যে সুপুরি গাছের শাখাগুলি শীতের বাতাসে দুলছে। ঝরনা থেকে মেয়েরা জলপাত্রে জল বয়ে আনছে। নীচে

উপত্যকায় শস্যক্ষেত্রের ওপারে, সামনের পাহাড়ের গায়ে ঘন গাছের অবকাশে লোকালয়ের আভাস দেখা যায়। নারকেলগাছগুলি মেঘমুক্ত আকাশের দিকে পাতার অঞ্জলি তুলে ধরে সূর্যালোক পান করছে।

এখান থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে মনে মনে ভাবছি, দ্বীপটি সুন্দর, এখানকার লোকগুলিও ভালো, তবুও মন এখানে বাসা বাঁধতে চায় না। সাগর পার হয়ে ভারতবর্ষের আহ্বান মনে এসে পৌঁচচ্ছে। শিশুকাল থেকে ভারতবর্ষের ভিতর দিয়েই বিশ্বের পরিচয় পেয়েছি বলেই যে এমন হয় তা নয়; ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে আলোতে, নদীতে প্রান্তরে, প্রকৃতির একটি উদারতা দেখেছি; চিরদিনের মতো আমার মন তাতে ভুলেছে। সেখানে বেদনা অনেক পাই, লোকালয়ে দুর্গতির মূর্তি চারি দিকে; তবুও সমস্তকে অতিক্রম করে সেখানকার আকাশে অনাদি কালের যে-কণ্ঠধ্বনি শুনতে পাই তাতে একটি বৃহৎ মুক্তির আস্বাদ আছে। ভারতবর্ষের নীচের দিকে ক্ষুদ্রতার বন্ধন, তুচ্ছতার কোলাহল, হীনতার বিড়ম্বনা, যত বেশি এমন আর কোথাও দেখি নি; তেমনি উপরের দিকে সেখানে বিরাটের আসনবেদী, অপরিসীমের অবারিত আমন্ত্রণ। অতি দূরকালের তপোবনের ওংকারধ্বনি এখনো সেখানকার আকাশে যেন নিত্য-নিশ্বসিত। তাই, আমার মনের কাছে আজকের এই প্রশান্ত প্রভাত সেই দিকেই তার আলোকের ইঙ্গিত প্রসারিত করে রয়েছে। ইতি ৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

পুনশ্চ : দ্রুত চলতে চলতে উপরে উপরে যে-ছবি চোখে জাগল, যে-ভাব মনের উপর দিয়ে ভেসে গেল, তাই লিখে দিয়েছি, কিন্তু তাই বলে এটাকে বালির প্রকৃত বিবরণ বলে গণ্য করা চলবে না। এই ছবিটিকে হয়তো উপরকার আবরণের জরি বলাও চলে। কিন্তু উপরের আবরণে ভিতরের ভাবের ছাপ নিত্যই পড়ে তো। অতএব, আবরণটিকে মানুষের পরিচয় নয় বলে উপেক্ষা করা যায় না। যে-আবরণ কৃত্রিম ছদ্মবেশের মতো সত্যকে উপর থেকে চাপা দেয় সেইটেতেই প্রতারণা করে, কিন্তু যে-আবরণ চঞ্চল জীবনের প্রতি মুহূর্তের ওঠায়-পড়ায়, বাঁকায়-চোরায়, দোলায়-কাঁপনে, আপনা-আপনি একটা চেহারা পায় মোটের উপর তাকে বিশ্বাস করা চলে। এখানকার ঘরে মন্দিরে, বেশে ভূষায়, উৎসবে অনুষ্ঠানে, সব-প্রথমেই যেটা খুব করে মনে আসে সেটা হচ্ছে সমস্ত জাতটার মনে শিল্পরচনার স্বাভাবিক উদ্যম। একজন পাশ্চাত্য আর্টিস্ট এখানে তিন বৎসর আছেন; তিনি বলেন, এদের শিল্পকলা থেমে নেই, সে আপন বেগে আপন পথ করে নিয়ে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু শিল্পী স্বয়ং সে-সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃত। তিনি বলেন, কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত এখানে চীনেদের প্রভাব ছিল, দেখতে দেখতে সেটা আপনি ক্ষয়ে আসছে, বালির চিত্ত আপন ভাষাতেই আত্মপ্রকাশ করতে বসেছে। তার কাজে এমন অনায়াস প্রতিভা আছে যে, আধুনিক যে দুই-একটি মূর্তি তিনি দেখেছেন সেগুলি য়ুরোপের শিল্পপ্রদর্শনীতে পাঠালে সেখানকার লোক চমকে উঠবে এই তাঁর বিশ্বাস। এই তো গেল রূপ-উদ্ভাবন করবার এদের স্বাভাবিক শক্তি। তার পরে, এই শক্তিটিই এদের সমাজকে মূর্তি দিচ্ছে। এরা উৎসবে অনুষ্ঠানে নানা প্রণালীতে সেই রূপ সৃষ্টি করবার ইচ্ছাকেই সুন্দর করে প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত। যেখানে এই সৃষ্টির উদ্যম নিয়ত সচেষ্ট সেখানে সমস্ত দেশের মুখে একটি শ্রী ও আনন্দ ব্যক্ত হয়। অথচ, জীবনযাত্রার সকল অংশই যে শোভন তা বলা যায় না। এর মধ্যে অনেক জিনিস আছে যা আনন্দকে মারে, অন্ধ সংস্কারের কত কদাচার, কত নিষ্ঠুরতা। যে-মেয়ে বন্ধ্যা প্রেতলোকে গলায় দড়ি বেঁধে তাকে অফলা গাছের ডালে চিরদিনের মতো ঝুলিয়ে রাখা হয়, এখানকার লোকের এই বিশ্বাস। কোনো মেয়ে যদি যমজ সন্তান প্রসব করে, এক পুত্র, এক কন্যা, তা হলে প্রসবের পরেই বিছানা নিজে বহন করে সে শ্মশানে যায়; পরিবারের লোক যমজ সন্তান তার পিছন-পিছন বহন করে নিয়ে চলে। সেখানে ডালপালা দিয়ে কোনোরকম করে একটা কুঁড়ে বেঁধে তিন চান্দ্রমাস তাকে কাটাতে হয়। দুই মাস ধরে গ্রামের মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়, পাপক্ষালনের উদ্দেশে নানাবিধ পূজার্চনা চলে। প্রসূতিকে মাঝে মাঝে কেবল খাবার পাঠানো হয়,

সেই কয়দিন তার সঙ্গে সকলরকম ব্যবহার বন্ধ। এই সুন্দর দ্বীপের চিরবসন্ত ও নিত্য উৎসবের ভিতরে ভিতরে অন্ধ বুদ্ধির মায়া সহস্র বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে, যেমন সে ভারতবর্ষেও ঘরে ঘরে করে থাকে। এর ভয় ও নিষ্ঠুরতা থেকে যে মোহমুক্ত জ্ঞানের দ্বারা মানুষকে বাঁচায় যেখানে তার চর্চা নেই, তার প্রতি বিশ্বাস নেই, সেখানে মানুষের আত্মাবমাননা আত্মপীড়ন থেকে তাকে কে বাঁচাবে। তবুও এইগুলোকেই প্রধান করে দেখবার নয়। জ্যোতির্বিদের কাছে সূর্যের কলঙ্ক ঢাকা পড়ে না, তবু সাধারণ লোকের কাছে তার আলোটাই যথেষ্ট। সূর্যকে কলঙ্কী বললে মিথ্যা বলা হয় না, তবুও সূর্যকে জ্যোতির্ময় বললেই সত্য বলা হয়। তথ্যের ফর্দ লম্বা করা যে-সব বৈজ্ঞানিকের কাজ তাঁরা পশুসংসারে হিংস্র দাঁতনখের ভীষণতার উপর কলমের ঝোঁক দেবামাত্র কল্পনায় মনে হয়, পশুদের জীবনযাত্রা কেবল ভয়েরই বাহন। কিন্তু, এই-সব অত্যাচারের চেয়ে বড়ো হচ্ছে সেই প্রাণ যা আপনার সদাসক্রিয় উদ্যমে আপনাতেই আনন্দিত, এমন-কি, শ্বাপদের হাত থেকে আত্মরক্ষার কৌশল ও চেষ্টা সেও এই আনন্দিত প্রাণক্রিয়ারই অংশ। ইন্টার্-ওসেন্ নামক যে মাসিকপত্রে একজন লেখকের বর্ণনা থেকে বালির মেয়েদের দুঃখের বৃত্তান্ত পাওয়া গেল, সেই কাগজেই আর-একজন লেখক সেখানকার শিল্পকুশল উৎসববিলাসী সৌন্দর্যপ্রিয়তাকে আনন্দের সঙ্গে দেখেছেন। তাঁর সেই দেখার আলোতে বোঝা যায়, গ্লানির কলঙ্কটা অসত্য না হলেও সত্যও নয়। এই দ্বীপে আমরা অনেক ঘুরেছি; গ্রামে পথে বাজারে শস্যক্ষেত্রে মন্দিরদ্বারে উৎসবভূমিতে ঝরনাতলায় বালির মেয়েদের অনেক দেখেছি; সব জায়গাতেই তাদের দেখলুম সুস্থ, সুপরিপুষ্ট, সুবিনীত, সুপ্রসন্ন— তাদের মধ্যে পীড়া অপমান অত্যাচারের কোনো চেহারা তো দেখলুম না। খুঁটিয়ে খবর নিলে নিশ্চয় কলঙ্কের কথা অনেক পাওয়া যাবে; কিন্তু খুঁটিয়ে-পাওয়া ময়লা কথাগুলো সুতো দিয়ে একসঙ্গে গাঁথলেই সত্যকে স্পষ্ট করা হবে, এ কথা বিশ্বাস করবার নয়। ইতি ৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৭[১]

সুরবায়া, জাভা

১৩

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, বালি থেকে পার হয়ে জাভা দ্বীপে সুরবায়া শহরে এসে নামা গেল। এই জায়গাটা হচ্ছে বিদেশী সওদাগরদের প্রধান আখড়া। জাভার সব চেয়ে বড়ো উৎপন্ন জিনিস চিনি, এই ছোটো দ্বীপটি থেকে দেশবিদেশে চালান যাচ্ছে। এমন এক কাল ছিল, পৃথিবীতে চিনি বিতরণের ভার ছিল ভারতবর্ষের। আজ এই জাভার হাট থেকে চিনি কিনে বৌবাজারের ভীমচন্দ্র নাগের সন্দেশ তৈরি হয়। ধরণী স্বভাবত কী দান করেন আজকাল তারই উপরে ভরসা রাখতে গেলে ঠকতে হয়, মানুষ কী আদায় করে নিতে পারে এইটেই হল আসল কথা। গোরু আপনা-আপনি যে-দুধটুকু দেয় তাতে যজ্ঞের আয়োজন চলে না, গৃহস্থের শিশুদের পেট ভরিয়ে বৌবাজারের দোকানে গিয়ে পৌঁছবার পূর্বেই কেঁড়ে শূন্য হয়ে যায়। যারা ওস্তাদ গোয়ালা তারা জানে কিরকম খোরাকি ও প্রজননবিধির দ্বারা গোরুর দুধ বাড়ানো চলে। এই শ্যামল দ্বীপটি ওলন্দাজদের পক্ষে ধরণী-কামধেনুর দুধভরা বাঁটের মতো। তারা জানে, কোন্ প্রণালীতে এই বাঁট কোনোদিন একফোঁটা শুকিয়ে না যায়, নিয়ত দুধে ভরে থাকে; সম্পূর্ণ দুইয়ে-নেবার কৌশলটাও তাদের আয়ত্ত। আমাদের কর্তৃপক্ষও তাঁদের গোয়ালবাড়ি ভারতবর্ষে বসিয়েছেন, চা আর পাট নিয়ে এতকাল তাঁদের হাট গুলজার হল; কিন্তু, এদিকে আমাদের চাষের খেত নির্জীব হয়ে এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে জিব বেরিয়ে পড়ল চাষীদের। এতকাল পরে আজ হঠাৎ তাঁদের নজর পড়েছে আমাদের ফসলহীন দুর্ভাগ্যের প্রতি। কমিশন বসেছে, তার রিপোর্টও বেরোবে। দরিদ্রের চাকাভাঙা মনোরথ রিপোর্টের টানে নড়ে

[১] অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত।

উঠবে কি না জানি নে, কিন্তু রাস্তা বানাবার কাজে যে-সব রাজমজুর লাগবে মজুরি মিলতে তাদের অসুবিধে হবে না। মোট কথা, ওলন্দাজরা এখানে কৃষিক্ষেত্রে খুব ওস্তাদি দেখিয়েছে; তাতে এখানকার লোকের অন্নের সংস্থান হয়েছে, কর্তৃপক্ষেরও ব্যাবসা চলেছে ভালো। এর মধ্যে তত্ত্বটা হচ্ছে এই যে, দেশের প্রতি প্রেম জানাবার জন্যে দেশের জিনিস ব্যবহার করব, এটা ভালো কথা; কিন্তু দেশের প্রতি প্রেম জানাবার জন্যে দেশের জিনিস-উৎপাদনের শক্তি বাড়াতে হবে, এটা হল পাকা কথা। এইখানে বিদ্যার দরকার; সেই বিদ্যা বিদেশ থেকে এলেও তাকে গ্রহণ করলে আমাদের জাত যাবে না, পরন্তু জান রক্ষা হবে।

সুরবায়াতে তিন দিন আমরা যাঁর বাড়িতে অতিথি ছিলেম তিনি সুরকর্তার রাজবংশের একজন প্রধান ব্যক্তি, কিন্তু তিনি আপন অধিকার ইচ্ছাপূর্বক পরিত্যাগ করে এই শহরে এসে বাণিজ্য করছেন। চিনি রপ্তানির কারবার; তাতে তাঁর প্রভূত মুনফা। চমৎকার মানুষটি, প্রাচীন অভিজাতকুল-যোগ্য মর্যাদা ও সৌজন্যের অবতার। তাঁর ছেলে আধুনিক কালের শিক্ষা পেয়েছেন; বিনীত, নম্র, প্রিয়দর্শন—তাঁরই উপরে আমাদের আতিথিপরিচর্যার ভার। বড়ো ভয় ছিল, পাছে অবিশ্রাম অভ্যর্থনার পীড়নে আরাম-অবকাশ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু, সেই অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়েছিলেম। তাঁদের প্রাসাদের এক অংশ সম্পূর্ণ আমাদের ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন। নিরালায় ছিলেম, ত্রুটিবিহীন আতিথ্যের পনেরো-আনা অংশ ছিল নেপথ্যে। কেবল আহারের সময়েই আমাদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ। মনে হত, আমিই গৃহকর্তা, তাঁরা উপলক্ষ মাত্র। সমাদরের অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস ছিল স্বাধীনতা ও অবকাশ।

এখানে একটি কলাসভা আছে। সেটা মুখ্যত য়ুরোপীয়। এখানকার সওদাগরদের ক্লাবের মতো। কলকাতার যেমন সংগীতসভা এও তেমনি। কলকাতার সভায় সংগীতের অধিকার যতখানি এখানে কলাবিদ্যার অধিকার তার চেয়ে বেশি নয়। এইখানে আর্ট সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্যে আমার প্রতি অনুরোধ ছিল; যথাসাধ্য বুঝিয়ে বলেছি। একদিন আমাদের গৃহকর্তার বাড়িতে অনেকগুলি এদেশীয় প্রধান ব্যক্তির সমাগম হয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছিল আমার কাজ। সুনীতিও একদিন তাঁদের সভায় বক্তৃতা করে এসেছেন; সকলের ভালো লেগেছে।

এখানকার ভারতীয়েরাও একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাকে অভ্যর্থনা উপলক্ষে এখানকার রাজপুরুষ ও অন্য অনেককে নিমন্ত্রণ করে চা খাইয়েছিলেন। সেদিন আমি কিছু দক্ষিণাও পেয়েছি। এইভাবে এখানে কেটে গেল, একেবারে এঁদের বাড়ির ভিতরেই। আঙিনায় অনেকগুলি গাছ ও লতাবিতান। আমগাছ, সপেটা, আতা। যে-জাতের আম তাকে এরা বলে মধু, এদের মতে বিশেষভাবে স্বাদু। এবার যথেষ্ট বৃষ্টি হয় নি বলে আমগুলো কাঁচা অবস্থাতেই ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে। এখানে ভোজন-কালে যে-আম খেতে পেয়েছি দেশে থাকলে সে-আম কেনার পয়সাকে অপব্যয় আর কেটে খাওয়ার পরিশ্রমটাকে বৃথা ক্লান্তিকর বলে স্থির করতুম, কিন্তু এখানে তার আদরের ত্রুটি হয় নি।

এই আঙিনায় লতামণ্ডপের ছায়ায় আমাদের গৃহকর্ত্রী প্রায়ই বেলা কাটান। চার দিকে শিশুরা গোলমাল করছে, খেলা করছে—সঙ্গে তাদের বুড়ি ধাত্রীরা। মেয়েরা যেখানে-সেখানে বসে কাপড়ের উপর এদেশে-প্রচলিত সুন্দর বাতির ছাপ-দেওয়া কাজে নিযুক্ত। গৃহকর্মের নানা প্রবাহ এই ছায়াস্নিগ্ধ নিভৃত প্রাঙ্গণের চারি দিকে আবর্তিত।

পরশু সুরবায়া থেকে দীর্ঘ রেলপথ ও রৌদ্রতাপক্লিষ্ট অপরাহ্নের দুটি ঘণ্টা কাটিয়ে তিনটের সময় সুরকর্তায় পৌঁচেছি। জাভার সব চেয়ে বড়ো রাজপরিবারের এইখানেই অবস্থান। ওলন্দাজেরা এঁদের রাজপ্রতাপ কেড়ে নিয়েছে কিন্তু প্রতিপত্তি কাড়তে পারে নি। এই বংশেরই একটি পরিবারের বাড়িতে আছি। তাঁদের উপাধি মংকুনগরো; এঁদেরই এক শাখা সুরবায়ায় আশ্রয় নিয়েছে।

প্রাসাদের একটি নিভৃত অংশ আমরাই অধিকার করে আছি। এখানে স্থান প্রচুর, আরামের উপকরণ যথেষ্ট, আতিথ্যের উপদ্রব নেই। রাজবাড়ি বহুবিস্তীর্ণ, বহুবিভক্ত। আমরা যেখানে আছি তার প্রকাণ্ড একটি অলিন্দ, সাদা মার্বল পাথরে বাঁধানো, সারি সারি কাঠের থামের উপরে ঢালু

কাঠের ছাদ। এই রাজপরিবারের বর্ণলাঞ্ছন হচ্ছে সবুজ ও হলদে, তাই এই অলিন্দের থাম ও ছাদ সবুজে সোনালিতে বিচিত্রিত। অলিন্দের এক ধারে গামেলান-সংগীতের যন্ত্র সাজানো। বৈচিত্র্যও কম নয়, সংখ্যাতেও অনেক। সাত সুরের ও পাঁচ সুরের ধাতুফলকের যন্ত্র অনেক রকমের, অনেক আয়তনের, হাতুড়ি দিয়ে বাজাতে হয়। ঢোলের আকার ঠিক আমাদের দেশেরই মতো, বাজাবার বোল ও কায়দা অনেকটা সেই ধরনের। এ ছাড়া বাঁশি, আর ধনু দিয়ে বাজাবার তাঁতের যন্ত্র।

রাজা স্টেশনে গিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করে এনেছিলেন। সন্ধ্যাবেলায় একত্র আহারের সময় তাঁর সঙ্গে ভালো করে আলাপ হল। অল্প বয়স, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল মুখশ্রী। ডাচ্‌ ভাষায় আধুনিক কালের শিক্ষা পেয়েছেন; ইংরেজি অল্প অল্প বলতে ও বুঝতে পারেন। খেতে বসবার আগে বারান্দার প্রান্তে বাজনা বেজে উঠল, সেইসঙ্গে এখানকার গানও শোনা গেল। সে-গানে আমাদের মতো আস্থায়ী-অন্তরার বিভাগ নেই। একই ধুয়ো বার বার আবৃত্তি করা হয়, বৈচিত্র্য যা-কিছু তা যন্ত্র বাজনায়। পূর্বের চিঠিতেই বলেছি, এদের যন্ত্রবাজনাটা তাল দেবার উদ্দেশ্যে। আমাদের দেশে বাঁয়া তবলা প্রভৃতি তালের যন্ত্র যে-সপ্তকে গান ধরা হয় তারই সা সুরে বাঁধা; এখানকার তালের যন্ত্রে গানের সব সুরগুলিই আছে। মনে করো, 'তুমি যেয়ো না এখনি, এখনো আছে রজনী' ভৈরবীর এই এক ছত্র মাত্র কেউ যদি ফিরে ফিরে গাইতে থাকে আর নানাবিধ যন্ত্রে ভৈরবীর সুরেই যদি তালের বোল দেওয়া হয়, আর সেই বোল-যোগেই যদি ভৈরবী রাগিণীর ব্যাখ্যা চলে তা হলে যেমন হয় এও সেইরকম। পরীক্ষা করে দেখলে দেখা যাবে, শুনতে ভালোই লাগে, নানা আওয়াজের ধাতুবাদ্যে সুরের নৃত্যে আসর খুব জমে ওঠে।

খেয়ে এসে আবার আমরা বারান্দায় বসলুম। নাচের তালে দুটি অল্প বয়সের মেয়ে এসে মেজের উপর পাশাপাশি বসল। বড়ো সুন্দর ছবি। সাজে সজ্জায় চমৎকার সুছন্দ। সোনায়-খচিত মুকুট মাথায়, গলায় সোনার হারে অর্ধচন্দ্রাকার হাঁসুলি, মণিবন্ধে সোনার সর্পকুণ্ডলী বালা, বাহুতে একরকম সোনার বাজুবন্দ— তাকে এরা বলে কীলকবাহু। কাঁধ ও দুই বাহু অনাবৃত, বুক থেকে কোমর পর্যন্ত সোনায়-সবুজে-মেলানো আঁট কাঁচুলি; কোমরবন্দ থেকে দুই ধারার বস্ত্রাঞ্চল কোঁচার মতো সামনে দুলছে। কোমর থেকে পা পর্যন্ত শাড়ির মতোই বস্ত্রবেষ্টনী, সুন্দর বর্তিকশিল্পে বিচিত্র; দেখবামাত্রই মনে হয়, অজন্তার ছবিটি। এমনতরো বাহুল্যবর্জিত সুপরিচ্ছন্নতার সামঞ্জস্য আমি কখনো দেখি নি। আমাদের নর্তকী বাইজিদের আঁট পায়জামার উপর অত্যন্ত জবড়জঙ্গ কাপড়ের অসৌষ্ঠবতা চিরদিন আমাকে ভারি কুশ্রী লেগেছে! তাদের প্রচুর গয়না ঘাগরা ওড়না ও অত্যন্ত ভারী দেহ মিলিয়ে প্রথমেই মনে হয়, সাজানো একটা মস্ত বোঝা। তার পরে মাঝে মাঝে বাটা থেকে পান খাওয়া, অনুবর্তীদের সঙ্গে কথা কওয়া, ভুরু ও চোখের নানাপ্রকার ভঙ্গিমা ধিক্‌কারজনক বলে বোধ হয়— নীতির দিক থেকে নয়, রীতির দিক থেকে। জাপানে ও জাভাতে যে-নাচ দেখলুম তার সৌন্দর্য যেমন তার শালীনতাও তেমনি নিখুঁত। আমরা দেখলুম, এই দুটি বালিকার তনু দেহকে সম্পূর্ণ অধিকার করে অশরীরী নাচেরই আবির্ভাব। বাক্যকে অধিকার করেছে কাব্য, বচনকে পেয়ে বসেছে বচনাতীত।

শুনেছি, অনেক য়ুরোপীয় দর্শক এই নাচের অতিমৃদুতা ও সৌকুমার্য ভালোই বাসে না। তারা উগ্র মাদকতায় অভ্যস্ত বলে এই নাচকে একঘেয়ে মনে করে। আমি তো এ নাচে বৈচিত্র্যের একটু অভাব দেখলুম না; সেটা অতি প্রকট নয় বলেই যদি চোখে না পড়ে তবে চোখেরই অভ্যাসদোষ। কেবলই আমার এই মনে হচ্ছিল যে, এ হচ্ছে কলাসৌন্দর্যের একটি পরিপূর্ণ সৃষ্টি, উপাদানরূপে মানুষ দুটি তার মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেছে। নাচ হয়ে গেলে এরা যখন বাজিয়েদের মধ্যে এসে বসল তখন তারা নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তখন দেখতে পাওয়া যায়, তারা গায়ে রঙ করেছে, কপালে চিত্র করেছে, শরীরের অতিস্ফূর্তিকে নিরস্ত করে দিয়ে একটি নিবিড় সৌষ্ঠব প্রকাশের জন্যে অত্যন্ত আঁট করে কাপড় পরেছে— সাধারণ মানুষের পক্ষে এ সমস্তই অসংগত, এতে চোখকে পীড়া দেয়। কিন্তু, সাধারণ মানুষের এই রূপান্তর নৃত্যকলায় অপরূপই হয়ে ওঠে।

পরদিন সকালে আমরা প্রাসাদের অন্যান্য বিভাগে ও অন্তঃপুরে আহূত হয়েছিলেম। সেখানে স্তম্ভশ্রেণী-বিধৃত অতি বৃহৎ একটি সভামণ্ডপ দেখা গেল; তার প্রকাণ্ড ব্যাপ্তি অথচ সুপরিমিত বাস্তুকলার সৌন্দর্য দেখে ভারি আনন্দ পেলুম। এ-সমস্তর উপযুক্ত বিবরণ তোমরা নিশ্চয় সুরেন্দ্রের চিঠি ও চিত্র থেকে পাবে। অন্তঃপুরে অপেক্ষাকৃত ছোটো একটি মণ্ডপে গিয়ে দেখি সেখানে আমাদের গৃহকর্তা ও গৃহস্বামিনী বসে আছেন। রানীকে ঠিক যেন একজন সুন্দরী বাঙালি মেয়ের মতো দেখতে; বড়ো বড়ো চোখ, স্নিগ্ধ হাসি, সংযত সৌষম্যের মর্যাদা ভারি তৃপ্তিকর। মণ্ডপের বাইরে গাছপালা, আর নানারকম খাঁচায় নানা পাখি। মণ্ডপের ভিতরে গান-বাজনার, ছায়াভিনয়ের, মুখোশের অভিনয়ের, পুতুলনাচের নানা সরঞ্জাম। একটা টেবিলে বাতিক শিল্পের অনেকগুলি কাপড় সাজানো। তার মধ্যে থেকে আমাকে তিনটি কাপড় পছন্দ করে নিতে অনুরোধ করলেন। সেইসঙ্গে আমার দলের প্রত্যেককে একটি একটি করে এই মূল্যবান কাপড় দান করলেন। কাপড়ের উপর এইরকম শিল্পকাজ করতে দু-তিন মাস করে লাগে। রাজবাড়ির পরিচারিকারাই এই কাজে সুনিপুণ।

এই রাজবংশীয়দের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পরিবারের যাঁরা, কাল রাত্রে তাঁদের ওখানে নিমন্ত্রণ ছিল। তাঁর ওখানে রাজকায়দার যতরকমের উপসর্গ। যেমন, দুই সারস পাখি পরস্পরকে ঘিরে ঘিরে নানা গম্ভীর ভঙ্গিতে নাচে দেখেছি, এখানকার রেসিডেন্ট আর এই রাজা পরস্পরকে নিয়ে সেইরকম রাজকীয় চাল বিস্তার করতে লাগলেন। রাজা কিংবা রাজপুরুষদের একটা পদোচিত মর্যাদা বাইরের দিক থেকে রক্ষা করে চলতে হয় মানি; তাতে সেই-সব মানুষের সামান্যতা কিছু ঢাকাও পড়ে, কিন্তু বাড়াবাড়ি করলে তাতে তাদের সাধারণতাকেই হাস্যকরভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হয়।

কাল রাত্রে যে-নাচ হল সে ন-জন মেয়েতে মিলে। তাতে যেমন নৈপুণ্য তেমনি সৌন্দর্য, কিন্তু দেখে মনে হল, কাল রাত্রের সেই নাচে স্বত-উচ্ছ্বসিত প্রাণের উৎসাহ ছিল না; যেন এরা ক্লান্ত, কেবল অভ্যাসের জোরে নেচে যাচ্ছে। কালকের নাচে গুণপনা যথেষ্ট ছিল কিন্তু তেমন করে মনকে স্পর্শ করতে পারে নি। রাজার একটি ছেলে পাশে বসে আমার সঙ্গে আলাপ করছিলেন, তাঁকে আমার বড়ো ভালো লাগল। অল্প বয়স, দুই বছর হল্যান্ডে শিক্ষা পেয়েছেন, ওলন্দাজ গবর্নমেন্টের সৈনিকবিভাগে প্রধান পদে নিযুক্ত। তাঁর চেহারায় ও ব্যবহারে স্বাভাবিক আকর্ষণীশক্তি আছে।

কাল রাত্রে আমাদের এখানেও একটা নাচ হয়ে গেল। পূর্বরাত্রে যে-দুজন বালিকা নেচেছিল তাদের মধ্যে একজন আজ পুরুষ-সঙের মুখোশ পরে সঙের নাচ নাচলে। আশ্চর্য ব্যাপারটা হচ্ছে, এর মধ্যে নাচের শ্রী সম্পূর্ণ রক্ষা করেও ভাবে-ভঙ্গিতে গলার আওয়াজে পুরোমাত্রায় বিদূষকতা করে গেল। পুরুষের মুখোশের সঙ্গে তার অভিনয়ের কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য হল না। বেশভূষার সৌন্দর্যেও একটুমাত্র ব্যত্যয় হয় নি। নাচের শোভনতাকে বিকৃত না করেও যে তার মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের রস এমন করে আনা যেতে পারে, এ আমার কাছে আশ্চর্য ঠেকল। এরা প্রধানত নাচের ভিতর দিয়েই সমস্ত হৃদয়ভাব ব্যক্ত করতে চায়, সুতরাং বিদ্রূপের মধ্যেও এরা ছন্দ রাখতে বাধ্য। এরা বিদ্রূপকেও বিরূপ করতে পারে না; এদের রাক্ষসেরাও নাচে। ইতি ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৭[১]

সুরকর্তা। জাভা

১৪

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, শেষ চিঠিতে তোমাকে এখানকার নাচের কথা লিখেছিলুম, ভেবেছিলুম, নাচ সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হয়ে গেল। এমন সময়ে সেই রাত্রে আর-এক নাচের বৈঠকে ডাক পড়ল। সেই অতি-

[১] প্রতিমা দেবীকে লিখিত।

প্রকাণ্ড মণ্ডপে আসর; বহুবিস্তীর্ণ শ্বেত পাথরের ভিত্তিতলে বিদ্যুদ্দীপের আলো ঝলমল করছে। আহারে বসবার আগে নাচের একটা পালা আরম্ভ হল—পুরুষের নাচ, বিষয়টা হচ্ছে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে হনুমানের লড়াই। এখানকার রাজার ভাই ইন্দ্রজিৎ সেজেছেন; ইনি নৃত্যবিদ্যায় ওস্তাদ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় ইনি নাচ শিখতে আরম্ভ করেছেন। অল্প বয়সে সমস্ত শরীরটা যখন নম্র থাকে, হাড় যখন পাকে নি, সেই সময়ে এই নাচ শিক্ষা করা দরকার; দেহের প্রত্যেক গ্রন্থি যাতে অতি সহজে সরে, প্রত্যেক মাংসপেশিতে যাতে অনায়াসে জোর পোঁছয়, এমনু অভ্যাস করা চাই। কিন্তু, নাচ সম্বন্ধে রাজার ভাইয়ের স্বাভাবিক প্রতিভা থাকাতে তাঁকে বেশি চেষ্টা করতে হয় নি।

হনুমান বনের জন্তু, ইন্দ্রজিৎ সুশিক্ষিত রাক্ষস, দুইজনের নাচের ভঙ্গিতে সেই ভাবের পার্থক্যটি বুঝিয়ে দেওয়া চাই, নইলে রসভঙ্গ হয়। প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সে হচ্ছে এদের সাজ। সাধারণত আমাদের যাত্রায় নাটকে হনুমানের হনুমানত্ব খুব বেশি করে ফুটিয়ে তুলে দর্শকদের কৌতুক উদ্রেক করবার চেষ্টা হয়। এখানে হনুমানের আভাসটুকু দেওয়াতে তার মনুষ্যত্ব আরও বেশি উজ্জ্বল হয়েছে। হনুমানের নাচে লম্ফঝম্ফ দ্বারা তার বানরস্বভাব প্রকাশ করা কিছুই কঠিন হত না, আর সেই উপায়ে সমস্ত সভা অনায়াসেই অট্টহাস্যে মুখরিত হয়ে উঠত, কিন্তু কঠিন কাজ হচ্ছে হনুমানকে মহত্ত্ব দেওয়া। বাংলাদেশের অভিনয় প্রভৃতি দেখলে বোঝা যায় যে, হনুমানের বীরত্ব, তার একনিষ্ঠ ভক্তি ও আত্মত্যাগের চেয়ে—তার লেজের দৈর্ঘ্য, তার পোড়ামুখের ভঙ্গিমা, তার বানরত্বই বাঙালির মনকে বেশি করে অধিকার করেছে। আমাদের পশ্চিমাঞ্চলে তার উল্টো। এমন-কি, হনুমানপ্রসাদ নাম রাখতে বাপমায়ের দ্বিধা বোধ হয় না। বাংলায় হনুমানচন্দ্র বা হনুমানেন্দ্র আমরা কল্পনা করতে পারি নে। এ দেশের লোকেরাও রামায়ণের হনুমানের বড়ো দিকটাই দেখে। নাচে হনুমানের রূপ দেখলুম—পিঠ বেয়ে মাথা পর্যন্ত লেজ, কিন্তু এমন একটা শোভনভঙ্গি যে দেখে হাসি পাবার জো নেই। আর-সমস্তই মানুষের মতো। মুকুট থেকে পা পর্যন্ত ইন্দ্রজিতের সাজসজ্জা একটি সুন্দর ছবি। তার পরে দুইজনে নাচতে নাচতে লড়াই; সঙ্গে সঙ্গে ঢাকে-ঢোলে কাঁসরে-ঘণ্টায় নানাবিধ যন্ত্রে ও মাঝে মাঝে বহু মানুষের কণ্ঠের গর্জনে সংগীত খুব গম্ভীর প্রবল ও প্রমত্ত হয়ে উঠছে। অথচ, সে সংগীত শ্রুতিকটু একটুও নয়; বহুযন্ত্র-সম্মিলনের সুশ্রাব্য নৈপুণ্যে তার উদ্দামতার সঙ্গে চমৎকার সম্মিলিত।

নাচ, সে বড়ো আশ্চর্য। তাতে যেমন পৌরুষ সৌন্দর্যও তেমনি। লড়াইয়ের দ্বন্দ্ব-অভিনয়ে নাচের প্রকৃতি একটুমাত্র এলোমেলো হয়ে যায় নি। আমাদের দেশের স্টেজে রাজপুত বীরপুরুষের বীরত্ব যেরকম নিতান্ত খেলো এ তা একেবারেই নয়। প্রত্যেক ভঙ্গিতে ভারি একটা মর্যাদা আছে। গদাযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, মুষলের আঘাত, সমস্তই ত্রুটিমাত্রবিহীন নাচে ফুটে উঠেছে। সমস্তর মধ্যে অপূর্ব একটি শ্রী অথচ দৃপ্ত পৌরুষের আলোড়ন। এর আগে এখানে মেয়েদের নাচ দেখেছি, দেখে মুগ্ধও হয়েছি, কিন্তু এই পুরুষের নাচের তুলনায় তাকে ক্ষীণ বোধ হল। এর স্বাদ তার চেয়ে অনেক বেশি প্রবল। যখন ধ্রুপদের নেশায় পেয়ে বসে তখন টপ্পার নিছক মিষ্টতা হালকা বোধ হয়, এও সেইরকম।

আজ সকালে দশটার সময়ে আমাদের এখানেই গৃহকর্তা আর-একটি নাচের ব্যবস্থা করেছিলেন। মেয়ে দুজনে পুরুষের ভূমিকা নিয়েছিল। অর্জুন আর সুবলের যুদ্ধ। গল্পটা হয়তো মহাভারতে আছে কিন্তু আমার তো মনে পড়ল না। ব্যাপারটা হচ্ছে—কোন্-এক বাগানে অর্জুনের অস্ত্র ছিল, সেই অস্ত্র চুরি করেছে সুবল, সে খুঁজে বেড়াচ্ছে অর্জুনকে মারবার জন্যে। অর্জুন ছিল বাগানের মালী-বেশে। খানিকটা কথাবার্তার পরে দুজনের লড়াই। সুবলের কাছে বলরামের লাঙল অস্ত্রটা ছিল। যুদ্ধ করতে করতে অর্জুন সেটা কেড়ে নিয়ে তবে সুবলকে মারতে পারলে।

নটীরা যে মেয়ে সেটা বুঝতে কিছুই বাধে না, অতিরিক্ত যত্নে সেটা লুকোবার চেষ্টাও করে নি। তার কারণ, যারা নাচছে তারা মেয়ে কি পুরুষ সেটা গৌণ, নাচটা কী সেইটেই দেখবার বিষয়।

দেহটা মেয়ের কিন্তু লড়াইটা পুরুষের, এর মধ্যে একটা বিরুদ্ধতা আছে বলেই এই অদ্ভুত সমাবেশে বিষয়টা আরও যেন তীব্র হয়ে ওঠে। কমনীয়তার আধারে বীররসের উচ্ছলতা। মনে করো-না— বাঘ নয়, সিংহ নয়, জবাফুলে ধুতরাফুলে সাংঘাতিক হানাহানি, ডাঁটায় ডাঁটায় সংঘর্ষ, পাপড়িগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন; এদিকে বনসভা কাঁপিয়ে বৈশাখী ঝড়ের গামেলান বাজছে, গুরুগুরু মেঘের মৃদঙ্গ, গাছের ডালে ডালে ঠকাঠকি, আর সোঁ সোঁ শব্দে বাতাসের বাঁশি।

সব-শেষে এলেন রাজার ভাই। এবার তিনি একলা নাচলেন। তিনি ঘটোৎকচ। হাস্যরসিক বাঙালি হয়তো ঘটোৎকচকে নিয়ে বরাবর হাসাহাসি করে এসেছে। এখানকার লোকচিত্তে ঘটোৎকচের খুব আদর। সেইজন্যেই মহাভারতের গল্প এদের হাতে আরও অনেকখানি বেড়ে গেল। এরা ঘটোৎকচের সঙ্গে ভার্গিবা (ভার্গবী) বলে এক মেয়ের ঘটালে বিয়ে। সে মেয়েটি আবার অর্জুনের কন্যা। বিবাহ সম্বন্ধে এদের প্রথা য়ুরোপের কাছাকাছি যায়। খুড়তোত জাঠতোত ভাইবোনে বাধা নেই। ভার্গিবার গর্ভে ঘটোৎকচের একটি ছেলেও আছে, তার নাম শশিকিরণ। যা হোক, আজকের নাচের বিষয়টা হচ্ছে, প্রিয়তমাকে স্মরণ করে বিরহী ঘটোৎকচের ঔৎসুক্য। এমন-কি, মাঝে মাঝে মূর্ছার ভাবে সে মাটিতে বসে পড়ছে, কল্পনায় আকাশে তার ছবি দেখে সে ব্যাকুল। অবশেষে আর থাকতে না পেরে প্রেয়সীকে খুঁজতে সে উড়ে চলে গেল। এর মধ্যে একটি ভাববার জিনিস আছে। য়ুরোপীয় শিল্পীর এঞ্জেলদের মতো এরা ঘটোৎকচের পিঠে নকল পাখা বসিয়ে দেয় নি। চাদরখানা নিয়ে নাচের ভঙ্গিতে ওড়ার ভাব দেখিয়েছে। এর থেকে মনে পড়ে গেল শকুন্তলা নাটকে কবির নির্দেশবাক্য—'রথবেগং নাটয়তি'। বোঝা যাচ্ছে, রথবেগটা নাচের দ্বারাই প্রকাশ হত, রথের দ্বারা নয়।

রামায়ণের মহাভারতের গল্প এ দেশের লোকের মনকে জীবনকে যে কিরকম গভীরভাবে অধিকার করেছে তা এই কদিনেই স্পষ্ট বোঝা গেল। ভূগোলের বইয়ে পড়া গেছে, বিদেশ থেকে অনুকূল ক্ষেত্রে কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের নতুন আমদানি হবার অনতিকাল পরেই দেখতে দেখতে তারা সমস্ত দেশকে ছেয়ে ফেলেছে; এমন-কি, যেখান থেকে তাদের আনা হয়েছে সেখানেও তাদের এমন অপরিমিত প্রভাব নেই। রামায়ণ-মহাভারতের গল্প এদের চিত্তক্ষেত্রে তেমনি করে এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। চিত্তের এমন প্রবল উদ্‌বোধন কলারচনায় নিজেকে প্রকাশ না করে থাকতে পারে না। সেই প্রকাশের অপর্যাপ্ত আনন্দ দেখা দিয়েছিল বরোবুদরের মূর্তিকল্পনায়। আজ এখানকার মেয়েপুরুষ নিজেদের দেহের মধ্যেই যেন মহাকাব্যের পাত্রদের চরিতকথাকে নৃত্যমূর্তিতে প্রকাশ করছে; ছন্দে ছন্দে এদের রক্তপ্রবাহে সেই-সকল কাহিনী ভাবের বেগে আন্দোলিত।

এ ছাড়া কত রকম-বেরকমের অভিনয়, তার অধিকাংশই এই-সকল বিষয় নিয়ে। বাইরের দিকে ভারতবর্ষের থেকে এরা বহু শতাব্দী সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; তবু এতকাল এই রামায়ণ মহাভারত নিবিড়ভাবে ভারতবর্ষের মধ্যেই এদের রক্ষা করে এসেছে। ওলন্দাজরা এই দ্বীপগুলিকে বলে 'ডাচ ইন্ডীস', বস্তুত এদের বলা যেতে পারে 'ব্যাস ইন্ডীস'।

পূর্বেই বলেছি, এরা ঘটোৎকচের ছেলের নাম রেখেছে শশিকিরণ। সংস্কৃত ভাষা থেকে নাম রচনা এদের আজও চলেছে। মাঝে মাঝে নামকরণ অদ্ভুতরকম হয়। এখানকার রাজবৈদ্যের উপাধি ক্রীড়নির্মল। আমরা যাকে নিরাময় বা নীরোগ বলে থাকি এরা নির্মল শব্দকে সেই অর্থ দিয়েছে। এদিকে ক্রীড় শব্দ আমাদের অভিধানে খেলা, কিন্তু ক্রীড় বলতে এখানে বোঝাচ্ছে উদ্যোগ। রোগ দূর করাতেই যার উদ্যোগ সেই হল ক্রীড়নির্মল। ফসলের খেতে যে সেচ দেওয়া হয় তাকে এরা বলে সিন্ধু-অমৃত। এখানে জল অর্থেই সিন্ধু কথার ব্যবহার, ক্ষেত্রকে যে-জলসেচ মৃত্যু থেকে বাঁচায় সেই হল সিন্ধু-অমৃত। আমাদের গৃহস্বামীর একটি ছেলের নাম সরোষ, আর একটির নাম সন্তোষ। বলা বাহুল্য, সরোষ বলতে এখানে রাগী মেজাজের লোক বোঝায় না, বুঝতে হবে সতেজ। রাজার মেয়ের নাম কুসুমবর্ধিনী। অনন্তকুসুম, জাতিকুসুম, কুসুমায়ুধ, কুসুমব্রত, এমন সব নামও শোনা যায়। এদের নামে যেমন বিশুদ্ধ ও সুগম্ভীর সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার এমনতরো

আমাদের দেশে দেখা যায় না। যেমন আত্মসুবিজ্ঞ, শাস্ত্রাত্ম, বীরপুস্তক, বীর্যসুশাস্ত্র, সহস্রপ্রবীর, বীর্যসুব্রত, পদ্মসুশাস্ত্র, কৃতাধিরাজ, সহস্রসুগন্ধ, পূর্ণপ্রণত, যশোবিদগ্ধ, চক্রাধিরাজ, মৃতসঞ্জয়, আর্যসুতীর্থ, কৃতস্মর, চক্রাধিব্রত, সূর্যপ্রণত, কৃতবিভব।

সেদিন যে-রাজার বাড়িতে গিয়েছিলেম তাঁর নাম সুসুহুনন পাকু-ভুবন। তাঁরই এক ছেলের বাড়িতে কাল আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল, তাঁর নাম অভিমন্যু। এঁদের সকলেরই সৌজন্য স্বাভাবিক, নম্রতা সুন্দর। সেখানে মহাভারতের বিরাটপর্ব থেকে ছায়াভিনয়ের পালা চলছিল। ছায়াভিনয় এ দেশ ছাড়া আর কোথাও দেখি নি, অতএব বুঝিয়ে বলা দরকার। একটা সাদা কাপড়ের পট টাঙানো, তার সামনে একটা মস্ত প্রদীপ উজ্জ্বল শিখা নিয়ে জ্বলছে; তার দুই ধারে পাতলা চামড়ায় আঁকা মহাভারতের নানা চরিত্রের ছবি সাজানো, তাদের হাতপাগুলো দড়ির টানে নড়ানো যায় এমনভাবে গাঁথা। এই ছবিগুলি এক-একটা লম্বা কাঠিতে বাঁধা। একজন সুর করে গল্পটা আউড়ে যায়, আর সেই গল্প-অনুসারে ছবিগুলিকে পটের উপরে নানা ভঙ্গিতে নাড়াতে দোলাতে চালাতে থাকে। ভাবের সঙ্গে সংগতি রেখে গামেলান বাজে। এ যেন মহাভারতশিক্ষার একটা ক্লাসে পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ছবির অভিনয়-যোগে বিষয়টা মনে মুদ্রিত করে দেওয়া। মনে করো, এমনি করে যদি স্কুলে ইতিহাস শেখানো যায়, মাস্টারমশায় গল্পটা বলে যান আর একজন পুতুল-খেলাওয়ালা প্রধান প্রধান ব্যাপারগুলো পুতুলের অভিনয় দিয়ে দেখিয়ে যেতে থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভাব-অনুসারে নানা সুরে তালে বাজনা বাজে, ইতিহাস শেখবার এমন সুন্দর উপায় কী আর হতে পারে।

মানুষের জীবন বিপদসম্পদ-সুখদুঃখের আবেগে নানাপ্রকার রূপে ধ্বনিতে স্পর্শে লীলায়িত হয়ে চলছে; তার সমস্তটা যদি কেবল ধ্বনিতে প্রকাশ করতে হয় তা হলে সে একটা বিচিত্র সংগীত হয়ে ওঠে; তেমনি আর-সমস্ত ছেড়ে দিয়ে সেটাকে কেবলমাত্র যদি গতি দিয়ে প্রকাশ করতে হয় তা হলে সেটা হয় নাচ। ছন্দোময় সুরই হোক আর নৃত্যই হোক, তার একটা গতিবেগ আছে, সেই বেগ আমাদের চৈতন্যে রসচাঞ্চল্য সঞ্চার করে তাকে প্রবলভাবে জাগিয়ে রাখে। কোনো ব্যাপারকে নিবিড় করে উপলব্ধি করাতে হলে আমাদের চৈতন্যকে এইরকম বেগবান করে তুলতে হয়। এই দেশের লোক ক্রমাগতই সুর ও নাচের সাহায্যে রামায়ণ-মহাভারতের গল্পগুলিকে নিজের চৈতন্যের মধ্যে সর্বদাই দোলায়িত করে রেখেছে। এই কাহিনীগুলি রসের ঝরনাধারায় কেবলই এদের জীবনের উপর দিয়ে প্রবাহিত। রামায়ণ-মহাভারতকে এমনি নানাবিধ প্রাণবান উপায়ে সর্বতোভাবে আত্মসাৎ করবার চেষ্টা। শিক্ষার বিষয়কে একান্ত করে গ্রহণ ও ধারণ করবার প্রকৃষ্ট প্রণালী কী তা যেন সমস্ত দেশের লোকে মিলে উদ্ভাবন করেছে; রামায়ণ-মহাভারতকে গভীর করে পাবার আগ্রহে ও আনন্দেই এই উদ্ভাবনা স্বাভাবিক হল।

কাল যে ছবির অভিনয় দেখা গেল তাও প্রধানতই নাচ, অর্থাৎ ছন্দোময় গতির ভাষা দিয়ে গল্প-বলা। এর থেকে একটা কথা বোঝা যাবে এ দেশে নাচের মনোহারিতা ভোগ করবার জন্যেই নাচ নয়; নাচটা এদের ভাষা। এদের পুরাণ ইতিহাস নাচের ভাষাতেই কথা কইতে থাকে। এদের গামেলানের সংগীতটাও সুরের নাচ। কখনো দ্রুত, কখনো বিলম্বিত, কখনো প্রবল, কখনো মৃদু, এই সংগীতটাও সংগীতের জন্যে নয়, কোনো-একটা কাহিনীকে নৃত্যচ্ছন্দের অনুষঙ্গ দেবার জন্যে।

দীপালোকিত সভায় এসে যখন প্রথম বসলুম ব্যাপারখানা দেখে কিছুই বুঝতে পারা গেল না। বিরক্তি বোধ হতে লাগল। খানিক বাদে আমাকে পটের পশ্চাৎভাগে নিয়ে গেল। সেদিকে আলো নেই, সেই অন্ধকার ঘরে মেয়েরা বসে দেখছে। এদিকটাতে ছবিগুলি অদৃশ্য, ছবিগুলিকে যে-মানুষ নাচাচ্ছে তাকেও দেখা যায় না, কেবল আলোকিত পটের উপর অন্য পিঠের ছবির ছায়াগুলি নেচে বেড়াচ্ছে। যেন উত্তানশায়ী শিবের বুকের উপরে মহামায়ার নাচ। জ্যোতির্লোকে যে-সৃষ্টিকর্তা আছেন তিনি যখন নিজের সৃষ্টিপটের আড়ালে নিজেকে গোপন রাখেন তখন আমরা সৃষ্টিকে দেখতে পাই। সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সৃষ্টির অবিশ্রাম যোগ আছে বলে যে জানে

সে-ই তাকে সত্য বলে জানে। সেই যোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে এই চঞ্চল ছায়াগুলোকে নিতান্তই মায়া বলে বোধ হয়। কোনো কোনো সাধক পটটাকে ছিঁড়ে ফেলে ওপারে গিয়ে দেখতে চায়, অর্থাৎ, সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে দেখবার চেষ্টা— কিন্তু তার মতো মায়া আর কিছুই হতে পারে না। ছায়ার খেলা দেখতে দেখতে এই কথাটাই কেবল আমার মনে হচ্ছিল।

আমি যখন চলে আসছি আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা আমাকে খুব একটি মূল্যবান উপহার দিলেন। বড়ো একটি বাটিক শিল্পের কাপড়। বললেন, এইরকমের বিশেষ কাপড় রাজবংশের ছেলেরা ছাড়া কেউ পরতে পায় না। সুতরাং, এ জাতের কাপড় আমি কোথাও কিনতে পেতুম না।

আমাদের এখানকার পালা আজ শেষ হল। কাল যাব যোগ্যকর্তায়। সেখানকার রাজবাড়িতেও নাচগান প্রভৃতির রীতিপদ্ধতি বিশুদ্ধ প্রাচীনকালের, অথচ এখানকার সঙ্গে পার্থক্য আছে। যোগ্য-কর্তা থেকে বোরোবদুর কাছেই; মোটরে ঘণ্টাখানেকের পথ। আরও দিন পাঁচ-ছয় লাগবে এই-সমস্ত দেখে শুনে নিতে, তার পরে ছুটি। ইতি ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৭[১]

১৫

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, এখানকার দেখাশুনো প্রায় শেষ হয়ে এল। ভারতবর্ষের সঙ্গে জোড়াতাড়া-দেওয়া এদের লোকযাত্রা দেখে পদে পদে বিস্ময় বোধ হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারত এখানকার লোকের প্রাণের মধ্যে যে কিরকম প্রাণবান হয়ে রয়েছে সে-কথা পূর্বেই লিখেছি। প্রাণবান বলেই এ জিনিসটা কোনো লিখিত সাহিত্যের সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি নয়। এখানকার মানুষের বহুকালের ভাবনা ও কল্পনার ভিতর দিয়ে তার অনেক বদল হয়ে গেছে। তার প্রধান কারণ, মহাভারতকে এরা নিজেদের জীবন-যাত্রার প্রয়োজনে প্রতিদিন ব্যবহার করেছে। সংসারের কর্তব্যনীতিকে এরা কোনো শাস্ত্রগত উপদেশের মধ্যে সঞ্চিত পায় নি, এই দুই মহাকাব্যের নানা চরিত্রের মধ্যে তারা যেন মূর্তিমান। ভালোমন্দ নানা শ্রেণীর মানুষকে বিচার করবার মাপকাঠি এই-সব চরিত্রে। এইজন্যেই জীবনের গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের এই জীবনের সামগ্রীর অনেকরকম বদল হয়েছে। কালে কালে বাঙালি গায়কের মুখে মুখে বিদ্যাপতি-চণ্ডিদাসের পদগুলি যেমন রূপান্তরিত হয়েছে এও তেমনি। কাল আমরা যে-ছায়াভিনয় দেখতে গিয়েছিলেম তার গল্পটাকে টাইপ করে আমাদের হাতে দিয়েছিল। সেটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, পড়ে দেখো। মূল মহাভারতের সঙ্গে মিলিয়ে এটা বাংলায় তর্জমা করে নিয়ো। এ গল্পের বিশেষত্ব এই যে, এর মধ্যে দ্রৌপদী নেই। মূল মহাভারতের ক্লীব বৃহন্নলা এই গল্পে নারীরূপে 'কেন-বর্দি' নাম গ্রহণ করেছে। কীচক একে দেখেই মুগ্ধ হয় ও ভীমের হাতে মারা পড়ে। এই কীচক জাভানি মহাভারতে মৎস্যপতির শত্রু, পাণ্ডবেরা একে বধ করে বিরাটের রাজার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিল।

আমি মঙ্কুনগরো-উপাধিধারী যে-রাজার বাড়ির অলিন্দে বসে লিখছি চারি দিকে তার ভিত্তি-গাত্রে রামায়ণের চিত্র রেশমের কাপড়ের উপর অতি সুন্দর করে অঙ্কিত। অথচ ধর্মে এঁরা মুসলমান। কিন্তু, হিন্দুশাস্ত্রের দেবদেবীদের বিবরণ এঁরা তন্ন তন্ন করে জানেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূ-বিবরণের গিরিনদীকে এঁরা নিজেদের দেশের মধ্যেই গ্রহণ করেছেন। বস্তুত, সেটাতে কোনো অপরাধ নেই, কেননা রামায়ণ-মহাভারতের নরনারীরা ভাবমূর্তিতে এদের দেশেই বিচরণ করছেন; আমাদের দেশে তাঁদের এমন সর্বজনব্যাপী পরিচয় নেই, সেখানে ক্রিয়াকর্মে উৎসবে আমোদে ঘরে ঘরে তাঁরা এমন করে বিরাজ করেন না।

১ প্রতিমা দেবীকে লিখিত।

আজ রাত্রে রাজসভার জাভানি শ্রোতাদের কাছে আমার 'কথা ও কাহিনী' থেকে কয়েকটি কথা আবৃত্তি করে শোনাব। একজন জাভানি সেগুলি নিজের ভাষায় তর্জমা করে ব্যাখ্যা করবেন। কাল সুনীতি ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে দীপচিত্র সহযোগে বক্তৃতা করেছিলেন। আজ আবার তাঁকে সেইটে বলতে রাজা অনুরোধ করেছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সব কথা জানতে এঁদের বিশেষ আগ্রহ। ইতি ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৭[১]

১৬

কল্যাণীয়েষু

রথী, শুরকর্তার মঙ্কুনগরোর ওখান থেকে বিদায় নিয়ে যোগ্যকর্তায় পাকোয়ালাম-উপাধিধারী রাজার প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছি। শুরকর্তা শহরে একটি নতুন সাঁকো ও রাস্তা তৈরি শেষ হয়েছে, সেই রাস্তা পথিকদের ব্যবহারের জন্যে মুক্ত করে দেবার ভার আমার উপরে ছিল। সাঁকোর সামনে রাস্তা আটকে একটা কাগজের ফিতে টাঙানো ছিল, কাঁচি দিয়ে সেটা কেটে দিয়ে পথ খোলসা করা গেল। কাজটা আমার লাগল ভালো; মনে হল, পথের বাধা দূর করাই আমার ব্রত। আমার নামে এই রাস্তার নামকরণ হয়েছে।

পথে আসতে পেরাম্বান বলে এক জায়গায় পুরোনো ভাঙা মন্দির দেখতে নামলুম। এ জায়গাটা ভুবনেশ্বরের মতো, মন্দিরের ভগ্নস্তূপে পরিকীর্ণ। ভাঙা পাথরগুলি জোড়া দিয়ে দিয়ে ওলন্দাজ গবর্মেন্ট মন্দিরগুলিকে তার সাবেক মূর্তিতে গড়ে তুলছেন। কাজটা খুব কঠিন, অল্প অল্প করে এগোচ্ছে; দুই-একজন বিচক্ষণ য়ুরোপীয় পণ্ডিত এই কাজে নিযুক্ত। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে বিশেষ আনন্দ পেলুম। এই কাজ সুসম্পূর্ণ করবার জন্যে আমাদের পুরাণগুলি নিয়ে এঁরা যথেষ্ট আলোচনা করছেন। অনেক জিনিস মেলে না, অথচ সেগুলি যে জাভানি লোকের স্মৃতিবিকার থেকে ঘটেছে তা নয়, তখনকার কালের ভারতবর্ষের লোকব্যবহারের মধ্যে এর ইতিহাস নিহিত। শিবমন্দিরই এখানে প্রধান। শিবের নানাবিধ নাট্যমুদ্রা এখানকার মূর্তিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে তার বিস্তারিত সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। একটা জিনিস ভেবে দেখবার বিষয়। শিবকে এ দেশে গুরু, মহাগুরু বলে অভিহিত করেছে। আমার বিশ্বাস, বুদ্ধের গুরুপদ শিবই অধিকার করেছিলেন; মানুষকে তিনি মুক্তির শিক্ষা দেন। এখানকার শিব নটরাজ, তিনি মহাকাল অর্থাৎ সংসারে যে চলার প্রবাহ, জন্মমৃত্যুর যে ওঠাপড়া, সে তাঁরই নাচের ছন্দে; তিনি ভৈরব, কেননা, তাঁর লীলার অঙ্গই হচ্ছে মৃত্যু। আমাদের দেশে একসময়ে শিবকে দুই ভাগ করে দেখেছিল। এক দিকে তিনি অনন্ত, তিনি সম্পূর্ণ, সুতরাং তিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি প্রশান্ত; আর-এক দিকে তাঁরই মধ্যে কালের ধারা তার পরিবর্তন-পরম্পরা নিয়ে চলেছে, কিছুই চিরদিন থাকছে না, এইখানে মহাদেবের তাণ্ডব লীলা কালীর মধ্যে রূপ নিয়েছে। কিন্তু, জাভায় কালীর কোনো পরিচয় নেই। কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলারও কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। পুতনাবধ প্রভৃতি অংশ আছে কিন্তু গোপীদের দেখতে পাই নে। এর থেকে সেই সময়কার ভারতের ইতিহাসের কিছু ছবি পাওয়া যায়। এখানে রামায়ণ-মহাভারতের নানাবিধ গল্প আছে যা অন্তত সংস্কৃত মহাকাব্যে ও বাংলাদেশে অপ্রচলিত। এখানকার পণ্ডিতদের মত এই যে, জাভানিরা ভারতবর্ষে গিয়ে অথবা জাভায় সমাগত ভারতীয়দের কাছ থেকে লোকমুখে-প্রচলিত নানা গল্প শুনেছিল, সেইগুলোই এখানে রয়ে গেছে। অর্থাৎ, সে সময়ে ভারতবর্ষেই নানা স্থানে নানা গল্পের বৈচিত্র্য ছিল। আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোনো পণ্ডিতই রামায়ণ-মহাভারতের তুলনামূলক আলোচনা করেন নি। করতে

[১] অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত।

গেলে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে স্থানীয় ভাষায় যে-সব কাব্য আছে মূলের সঙ্গে সেইগুলি মিলিয়ে দেখা দরকার হয়। কোনো-এক সময়ে কোনো এক জার্মান পণ্ডিত এই কাজ করবেন বলে অপেক্ষা করে আছি। তার পরে তাঁর লেখার কিছু প্রতিবাদ কিছু সমর্থন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ডাক্তার উপাধি পাব।

এখানে পাকোয়ালাম লোকটিকে বড়ো ভালো লাগল। শান্ত, গম্ভীর, শিক্ষিত, চিন্তাশীল। জাভার প্রাচীন কলাবিদ্যা প্রভৃতিকে রক্ষা করবার জন্যে উৎসুক। যোগ্যকর্তার প্রধান ব্যক্তি হচ্ছেন এখানকার সুলতান। তাঁর বাড়িতে রাত্রে নাচ দেখবার নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে একজন ওলন্দাজ পণ্ডিতের কাছে শোনা গেল যে, এই জায়গাটির নাম ছিল অযোধ্যা; ক্রমে তারই অপভ্রংশ হয়ে এখন যোগ্যা নামে এসে ঠেকেছে।

এখানে যে নাচ দেখলুম সে চার জন মেয়ের নাচ। রাজবংশের মেয়েরাই নাচেন। চার জনের মধ্যে দুজন ছিলেন সুলতানেরই মেয়ে। এখানে এসে যত নাচ দেখেছি সব চেয়ে এইটেই সুন্দর লেগেছে। বর্ণনা-দ্বারা এ বোঝানো অসম্ভব। এমন অনিন্দ্যসম্পূর্ণ রূপসৃষ্টি দেখা যায় না। এই-সব নাচের একটা দিক আছে যেটা এর বাইরের সৌন্দর্য, আর-একটা হচ্ছে বিশেষ বিশেষ ভঙ্গির বিশেষ অর্থ আছে। যারা সেগুলি জানে তারাই এর শোভার সঙ্গে এর ভাষাকে মিলিয়ে সম্পূর্ণ আনন্দ পেতে পারে। এখানে নাচশিক্ষার বিদ্যালয় আছে, সেখানে নিমন্ত্রণ পাওয়া গেছে। সেখানে গেলে এদের নাচের তত্ত্ব আরও কিছু বুঝতে পারব আশা করছি।

আজ রাত্রে রামায়ণ থেকে যে অভিনয় হবে তার একটি সূচীপত্র পাঠাই। এটা পড়লে বোঝা যায়, এখানকার রামায়ণকথার ভাবখানা কী।

বৌমা পয়লা অগস্টে যে-চিঠি পাঠিয়েছিলেন আজ দেড় মাস পরে সেটি আমার হাতে এল। আমার চিঠির কোন্‌গুলো তোমাদের কাছে পেঁচল কোন্‌গুলো পেঁছল না, তা কেমন করে জানব। ইতি ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৭[১]

১৭

কল্যাণীয়াসু

রানী, এখানকার পালা শেষ হয়ে এল, শরীরটাও ক্লান্ত। এখানে যে-রাজার বাড়িতে আছি কাল রাত্রে তিনি ছায়াভিনয়ের একটি পালা দেখাবেন; তার পরে আমরা যাব বরোবুদরে। সেখানে দুদিন কাটিয়ে ফেরবার পথে বাটাভিয়াতে গিয়ে জাহাজে চড়ে বসব।

কাল রাত্রে এক জায়গায় গিয়েছিলুম জটায়ুবধের অভিনয় দেখতে। দেখে এ দেশের লোকের মনের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা যাকে অভিনয় বলি তার প্রধান অংশ কথা, বাকি অংশ হচ্ছে নানাপ্রকার হৃদয়ভাবের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলীর প্রতিরূপ দেখানো। এখানে তা নয়। এখানে প্রধান জিনিস হচ্ছে ছবি এবং গতিছন্দ। কিন্তু, সেই ছবি বলতে প্রতিরূপ নয়, মনোহর রূপ। আমরা সংসারে যে দৃশ্য সর্বদা দেখি তার সঙ্গে খুব বেশি অনৈক্য হলেও এদের বাধে না। পৃথিবীতে মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে চলাফেরা করে থাকে। এই অভিনয়ে সবাইকে বসে বসে চলতে ফিরতে হয়। সেও সহজ চলাফেরা নয়, প্রত্যেক নড়াচড়া নাচের ভঙ্গিতে। মনে মনে এরা এমন একটা কল্পলোক সৃষ্টি করেছে যেখানে সবাই বসার অবস্থায় নেচে বেড়ায়। এই পঙ্গু মানুষের দেশ যদি প্রহসনের দেশ হত তা হলেও বুঝতুম। একেবারেই তা নয়, এ মহাকাব্যের দেশ। এরা স্বভাবকে খাতির করতে চায় না। স্বভাব তার প্রতিশোধস্বরূপে যে এদের বিদ্রূপ করবে, এদের

১ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত।

হাস্যকর করে তুলবে, তাও ঘটল না। স্বভাবের বিকারকেও এরা সুদৃশ্য করবে, এই এদের পণ। ছবিটাই এদের লক্ষ্য, স্বভাবের অনুকরণ এদের লক্ষ্য নয়, এই কথাটা এরা যেন স্পর্ধার সঙ্গে বলতে চায়। মনে করো-না কেন, প্রথম দৃশ্যটা রাজসভায় দশরথ ও তাঁর অমাত্যবর্গ। রঙ্গভূমিতে এরা সবাই গুঁড়ি মেরে প্রবেশ করল। মনে হয়, এর চেয়ে অদ্ভুত কিছুই হতে পারে না। ব্যাপারটাকে হাস্যকরতা থেকে বাঁচানো কত কঠিন ভেবে দেখো। কিন্তু, এতে আমরা বিরূপ কিছুই দেখলুম না, এরা দশরথ কিংবা রাজামাত্য সে কথাটা সম্পূর্ণ গৌণ হয়ে গেল। পরের দৃশ্যে কৈকেয়ী প্রভৃতি রানী আর সখীরা তেমনি করেই বসা-অবস্থায় হেলে দুলে নেচে নেচে প্রবেশ করলে। আট-নয় বছরের ছেলেরা সব কৌশল্যা প্রভৃতি রানী সেজেছে। এদিকে কৌশল্যার ছেলে রাম যে সেজেছে তার বয়স অন্তত পঁচিশ হবে; এটা যে কত বড়ো অসংগত সে প্রশ্ন কারও মনেই আসে না, কেননা, এরা দেখছে ছবির নাচ। যতক্ষণ সেটাতে কোনো দোষ ঘটবে না ততক্ষণ নালিশ করবার কোনো হেতু নেই। অন্য দেশের লোকেরা যখন জিজ্ঞাসা করে, এর মানে কী হল, এরা বলে, 'তা আমরা জানি নে, কিন্তু আমাদের 'রসম্' তৃপ্ত হচ্ছে।' অর্থাৎ, মানে না পাই রস পাচ্ছি। আমাকে একজন ওলন্দাজ পণ্ডিত বলেছিলেন, বালির লোকেরা অভ্যাসমত যে-সব পূজানুষ্ঠান করে তার মানে তারা কিছুই বোঝে না কিন্তু তারাও 'রসম্'-তৃপ্তির দোহাই দিয়ে থাকে। অর্থাৎ, সৌন্দর্যের, সম্পূর্ণতার একটা আইডিয়া তাদের মনের ভিতরে আছে, অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সেইটিতে যখন সাড়া পায় তখন তাদের যে আনন্দ তাকে তো আধ্যাত্মিক বলা যেতে পারে।

কাল রাত্রে এই রঙ্গক্ষেত্রের বহিরঙ্গনে কত যে লোক জমেছে তার সংখ্যা নেই। নিঃশব্দে তারা দেখছে; শুধু কেবল দেখারই সুখ। তাদের মনের মধ্যে রামায়ণের গল্প আছে, সেই গল্পের ধারার সঙ্গে ছবির ধারা মিলে কল্পনা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এর মধ্যে আশ্চর্যের বিষয়টা হচ্ছে এই যে, যে-ছবিটা দেখছে সেটাতে গল্পকে ফুটিয়ে তোলবার কোনো চেষ্টা নেই। রামের যৌবরাজ্যে কৈকেয়ী রাগ করেছে; কিন্তু যেরকম ভাবভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরে আমাদের চোখে কানে রাগের ভাবটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই ছবির মধ্যে তার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। আট-দশ বছরের ছেলে স্ত্রীবেশে কৈকেয়ী সাজলে তার মধ্যে কৈকেয়ীত্ব লেশমাত্র থাকা অসম্ভব। তবু এরা তাতে কোনো অভাব বোধ করে না। জিনিসটা যদি আগাগোড়া ছেলেমানুষি ও গ্রাম্য বর্বর-গোছের কিছু হত তা হলে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই থাকত না—কিন্তু, যেখানে নৈপুণ্য ও সৌষম্যের সীমা নেই, অতি সামান্য ভঙ্গিটুকুমাত্র যেখানে নিরর্থক নয়, বহু যত্ন ও বহু শক্তির দ্বারা যেখানে এই ললিতকলাটি একেবারে সুপরিণত হয়ে উঠেছে, সেখানে একে অবজ্ঞা করা চলে না। এই কথাই বলতে হয় যে, রূপের ও গতির ছন্দবোধ এদের মনে অত্যন্ত বেশি প্রবল; সেই রূপের ও গতির ভাষা এদের মনে যতখানি কথা কয় আমাদের মনে ততখানি কয় না। এদের গামেলান-সংগীতেও সেটা দেখতে পাই। প্রথমত যন্ত্রগুলি বহুসংখ্যক, বহু যত্নে সুশোভিত, এবং তাদের সমাবেশ সুসজ্জিত, যারা বাজাচ্ছে তাদের মধ্যে সংযত শোভনতা। এই রম্যদর্শন এদের কাছে অত্যাবশ্যক। চোখের দেখার সুখটুকু রক্ষা করে এদের যে সংগীতের আলোচনা সে হচ্ছে সুরের নাচ। ছন্দের লীলা এদের কাছে গীতের ধারার চেয়ে বেশি। কিন্তু, ছন্দের লীলা আমাদের দেশের ভোজপুরিয়াদের খচ্‌মচ্‌ বাদ্যের দুঃসহ অত্যাচার নয়। এদের নাচ যেমন সুন্দর সজ্জিত অঙ্গের নাচ, এদের সংগীতে যে ছন্দের নাচ সেও খোল করতাল মৃদঙ্গের কোলাহল নয়—সুশ্রাব্য সুর দিয়ে সেই নাচ মণ্ডিত। এদের সংগীতকে বলা যেতে পারে স্বরনৃত্য, এদের অভিনয়কে বলা যায় রূপনাট্য। ভারতবর্ষ থেকে নটরাজ এসে একদিন এখানে মন্দিরে পূজা পেয়েছিলেন, তিনি এদের যে-বর দিয়েছেন সে হচ্ছে তাঁর নাচটি—আর, আমাদের জন্যে কি কেবল তাঁর শ্মশানভস্মই রইল। ইতি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৭[১]

যোগ্যকর্তা। জাভা

[১] নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত।

১৮

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমরা একটি সুন্দর জায়গায় এসেছি। পাহাড়ের উপরে— শোনা গেল পাঁচ হাজার ফুট উঁচু। হাওয়াটা বেশ ঠান্ডা। কিন্তু, হিমালয়ের এতটা উঁচু কোনো পাহাড়ে যতটা শীত এখানে তার কাছ দিয়েও যায় না। আমরা আছি ডীমলট বলে এক ভদ্রলোকের আতিথ্যে। এঁর স্ত্রী অস্ট্রীয়, ভিয়েনার মেয়ে। বাগান দিয়ে বেষ্টিত সুন্দর বাড়িটি পাহাড়ের উপর। এখান থেকে ঠিক সামনেই দেখতে পাই নীল গিরিমণ্ডলীর কোলে বান্ডুঙ শহর। পাহাড়ের যে অঞ্জলির মধ্যে এই শহর, অনতি-কাল আগে সেখানে সরোবর ছিল। কখন একসময় পাড়ি ধসে গিয়ে তার সমস্ত জল বেরিয়ে চলে গেছে। এতদিন ঘোরাঘুরির পরে এই সুন্দর নির্জন জায়গায় নিভৃত বাড়িতে এসে বড়ো আরাম বোধ হচ্ছে।

জাভাতে নামার পর থেকেই যিনি সমস্তক্ষণ অশ্রান্ত যত্নে আমাদের সাহচর্য করে আসছেন তাঁর নাম সামুয়েল কোপের্‌বর্‌গ্‌। নামের মূল অর্থ হচ্ছে তামার পাহাড়। সুনীতি সেই মানেটা নিয়ে তাঁর নামের সংস্কৃত অনুবাদ করে দিয়েছেন তাম্রচূড়। আমাদের মহলে তাঁর এই নামটিই চলে গিয়েছে, তিনি এতে আনন্দিত। লোকটির নাম বদলে তাঁকে স্বর্ণচূড় বলতে ইচ্ছে করে। কিসে আমাদের লেশমাত্র আরাম সুবিধা বা দাবি পূর্ণ হতে পারে সেজন্যে তিনি অসাধারণ চিন্তা ও পরিশ্রম করেছেন। অকৃত্রিম সৌহার্দ্য তাঁর। দৈহিক পরিমাণে মানুষটি সংকীর্ণ, কিন্তু হৃদয়ের পরিমাণে প্রশস্ত। এতকাল আমরা তাঁকে নানা সময়ে নানা উপলক্ষে দিনরাত ধরে দেখেছি— কখনো তাঁর মধ্যে ঔদ্ধত্য বা ক্ষুদ্রতা বা অহমিকা দেখি নি। সব সময়েই দেখেছি, নিজেকে তিনি সকলের শেষে রেখেছেন। তাঁর শরীর রুগ্‌ণ ও দুর্বল, অথচ সেই রুগ্‌ণ শরীরের জন্যে কোনোদিন কোনো বিশেষ সুবিধা দাবি করেন নি। সকলের সব হয়ে গিয়ে যেটুকু উদ্‌বৃত্ত সেইটুকুতেই তাঁর অধিকার। অনেকের কাছে তিনি তর্জন সহ্য করেছেন কিন্তু তা নিয়ে কোনোদিন তাঁর কাছ থেকে নালিশ বা কারও নিন্দে শুনি নি। ইংরিজি ভালো বলতে পারেন না, বুঝতেও বাধে। কিন্তু, কথায় যা না কুলোয় কাজে তার চতুর্গুণ পুষিয়ে দেন। কোথাও যাতায়াতের সময় মোটরগাড়িতে প্রথম প্রথম তিনি আমাদের সঙ্গ নিতেন, কিন্তু যেই দেখলেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ করা আমাদের পক্ষে কঠিন, অমনি অকুণ্ঠিত মনে নিজেকে সরিয়ে দিয়ে ইংরেজি-জানা সঙ্গীদের জন্যে স্থান করে দিলেন। কিন্তু, এখন এমন হয়েছে, তিনি সঙ্গে না থাকলে কেবল যে অসুবিধা হয় তা নয়, আমার তো ভালোই লাগে না। আমাদের মানসম্মান-সুখ-স্বচ্ছন্দতার চিন্তায় তিনি নিজেকে এমন সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েছেন যে, তিনি একটু সরে গেলেই আমাদের বড়ো বেশি ফাঁক পড়ে। তাঁর স্নিগ্ধ হৃদয়ের একটি লক্ষণ দেখে আমার ভারি ভালো লাগে— সর্বত্রই দেখি, শিশুদের তিনি বন্ধু। তারা ওঁকে নিজেদের সমবয়সী বলেই জানে। তাঁর হৃদয়ের আর-একটি প্রমাণ, জাভার লোকদের তিনি সম্পূর্ণ আপন করে নিয়েছেন। জাভানিদের নাচ গান শিল্প ইতিহাস প্রভৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে তাঁর একান্ত যত্ন। এই-সমস্ত আলোচনার জন্যে 'জাভা সোসাইটি' বলে একটি সভা স্থাপিত হয়েছে, তারই পরিচালনার জন্যে এঁর সমস্ত সময় ও চেষ্টা নিযুক্ত। আমার বর্ণনা থেকে বুঝবে, এই সরল আত্মত্যাগী মানুষটিকে আমরা ভালোবেসেছি।

বোরোবুদুরের উদ্দেশে যে কবিতা লিখেছি সেটি অন্য পাতায় তোমাদের জন্যে কপি করে পাঠানো গেল। ইতি ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৭[১]

ডাগো
বান্ডুঙ। যবদ্বীপ

[১] প্রতিমা দেবীকে লিখিত।

১৯

কল্যাণীয়াসু

মীরা, এখানকার যা-কিছু দেখবার তা শেষ করেছি। যোগ্য থেকে গিয়েছিলুম বোরোবুদুরে; সেখানে একরাত্রি কাটিয়ে এলুম।

প্রথমে দেখলুম, মনুডুঙ বলে এক জায়গায় একটি ছোটো মন্দির। ভেঙেচুরে পড়ছিল, সেটাকে এখানকার গবর্মেন্ট সারিয়ে দিয়েছে। গড়নটি বেশ লাগল দেখতে। ভিতরে বুদ্ধের তিন ভাবের তিন বিরাট মূর্তি। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেম। মনের ভিতরে কেমন একটা বেদনা বোধ হয়। একদিন অনেক মানুষে মিলে এই মন্দির, এই মূর্তি, তৈরি করে তুলছিল। সে কত কোলাহল, কত আয়োজন, তার সঙ্গে সঙ্গে ছিল মানুষের প্রাণ। এই প্রকাণ্ড পাথরের প্রতিমা যেদিন পাহাড়ের উপর তোলা হচ্ছিল সেদিন এই গাছপালার মধ্যে এই সূর্যালোকে উজ্জ্বল আকাশের নীচে মানুষের বিপুল একটা প্রয়াস সজীবভাবে এইখানে তরঙ্গিত। পৃথিবীতে সেদিন খবর-চালাচালি ছিল না; এই ছোটো দ্বীপটির মধ্যে যে প্রবল ইচ্ছা আপন কীর্তিরচনায় প্রবৃত্ত, সমুদ্র পার হয়ে তার সংবাদ আর কোথাও পৌঁছয় নি। কলকাতার ময়দানের ধারে যখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তৈরি হচ্ছিল তার কোলাহল পৃথিবীর সকল সমুদ্রের কূলে কূলে বিস্তীর্ণ হয়েছিল।

নিশ্চয় দীর্ঘকাল লেগেছিল এই মন্দির তৈরি হতে; কোনো-একজন মানুষের আয়ুর মধ্যে এর সৃষ্টির সীমা ছিল না। এই মন্দিরকে তৈরি করে তোলবার জন্যে যে প্রবল শ্রদ্ধা সেটা তখনকার সমস্ত কাল জুড়ে সত্য ছিল। এই মন্দির নির্মাণ নিয়ে কত বিস্ময়, কত বিতর্ক, সত্যমিথ্যা কত কাহিনী তখনকার এই দ্বীপের সুখদুঃখবিক্ষুব্ধ প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত হয়েছে। একদিন মন্দির তৈরি শেষ হল; তার পরে দিনের পর দিন এখানে পূজার দীপ জ্বলেছে, দলে দলে পূজার অর্ঘ্য এনেছে, বৎসরের বিশেষ বিশেষ দিনে পার্বণ হয়েছে, এর প্রাঙ্গণে তীর্থযাত্রী মেয়ে পুরুষ এসে ভিড় করেছে।

তার পরে সেদিনের ভাষার উপর, ভাবের উপর, ধুলো চাপা পড়ল; সেদিন যা অত্যন্ত সত্য ছিল তার অর্থ গেল হারিয়ে। ঝরনা শুকিয়ে গেলে যেমন কেবল পাথরগুলো বেরিয়ে পড়ে, এই-সব মন্দির আজ তেমনি। একে ঘিরে যে প্রাণের ধারা নিরন্তর বয়ে যেত সে যেমনি দূরে সরে গেল, অমনি এর পাথর আর কথা কয় না, এর উপর সেদিনের প্রাণস্রোতের কেবল চিহ্নগুলি আছে, কিন্তু তার গতি নেই, তার বাণী নেই। মোটরগাড়ি চড়ে আমরা একদল এলুম দেখতে, কিন্তু দেখবার আলো কোথায়। মানুষের এই কীর্তি আপন প্রকাশের জন্যে মানুষের যে-দৃষ্টির অপেক্ষা করে, কতকাল হল, সে লুপ্ত হয়ে গেছে।

এর আগে বোরোবুদুরের ছবি অনেকবার দেখেছি। তার গড়ন আমার চোখে কখনোই ভালো লাগে নি। আশা করেছিলুম হয়তো প্রত্যক্ষ দেখলে এর রস পাওয়া যাবে। কিন্তু, মন প্রসন্ন হল না। থাকে-থাকে একে এমন ভাগ করেছে, এর মাথার উপরকার চূড়াটুকু এর আয়তনের পক্ষে এমন ছোটো যে, যত বড়োই এর আকার হোক এর মহিমা নেই। মনে হয়, যেন পাহাড়ের মাথার উপরে একটা পাথরের ঢাকনা চাপা দিয়েছে। এটা যেন কেবলমাত্র একটা আধারের মতো, বহুশত বুদ্ধমূর্তি ও বুদ্ধের জাতককথার ছবিগুলি বহন করবার জন্যে মস্ত একটি ডালি। সেই ডালি থেকে তুলে তুলে দেখলে অনেক ভালো জিনিস পাওয়া যায়। পাথরে-খোদা জাতকমূর্তিগুলি আমার ভারি ভালো লাগল—প্রতিদিনের প্রাণলীলার অজস্র প্রতিরূপ, অথচ তার মধ্যে ইতর অশোভন বা অশ্লীল কিছুমাত্র নেই। অন্য মন্দিরে দেখেছি সব দেবদেবীর মূর্তি, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীও খোদাই হয়েছে। এই মন্দিরে দেখতে পাই সর্বজনকে—রাজা থেকে আরম্ভ করে ভিখারি পর্যন্ত। বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাবে জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রবল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে; এর মধ্যে শুদ্ধ মানুষের নয়,

অন্য জীবেরও যথেষ্ট স্থান আছে। জাতককাহিনীর মধ্যে খুব একটা মস্ত কথা আছে, তাতে বলেছে, যুগ যুগ ধরে বুদ্ধ সর্বসাধারণের মধ্য দিয়েই ক্রমশ প্রকাশিত। প্রাণীজগতে নিত্যকাল ভালোমন্দর যে দ্বন্দ্ব চলেছে সেই দ্বন্দ্বের প্রবাহ ধরেই ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বুদ্ধের মধ্যে অভিব্যক্ত। অতি সামান্য জন্তুর ভিতরেও অতি সামান্য রূপেই এই ভালোর শক্তি মন্দর ভিতর দিয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তুলছে; তার চরম বিকাশ হচ্ছে অপরিমেয় মৈত্রীর শক্তিতে আত্মত্যাগ। জীবে জীবে লোকে লোকে সেই অসীম মৈত্রী অল্প অল্প করে নানা দিক থেকে আপন গ্রন্থি মোচন করছে, সেই দিকেই মোক্ষের গতি। জীব মুক্ত নয় কেননা, আপনার দিকেই তার টান; সমস্ত প্রাণীকে নিয়ে ধর্মের যে অভিব্যক্তি তার প্রণালীপরম্পরায় সেই আপনার দিকে টানের 'পরে আঘাত লাগছে। সেই আঘাত যে-পরিমাণে যেখানেই দেখা যায় সেই পরিমাণে সেখানেই বুদ্ধের প্রকাশ। মনে আছে, ছেলেবেলায় দেখেছিলুম, দড়িতে বাঁধা ধোপার বাড়ির গাধার কাছে এসে একটি গাভী স্নিগ্ধচক্ষে তার গা চেটে দিচ্ছে; দেখে আমার বড়ো বিস্ময় লেগেছিল। বুদ্ধই-যে তাঁর কোনো এক জন্মে সেই গাভী হতে পারেন, এ কথা বলতে জাতককথা-লেখকের একটুও বাধত না কেননা, গাভীর এই স্নেহেরই শেষ গিয়ে পেঁচেছে মুক্তির মধ্যে। জাতককথায় অসংখ্য সামান্যের মধ্যে দিয়েই চরম অসামান্যকে স্বীকার করেছে। এতেই সামান্য এত বড়ো হয়ে উঠল। সেইজন্যেই এতবড়ো মন্দিরভিত্তির গায়ে গায়ে তুচ্ছ জীবনের বিবরণ এমন সরল ও নির্মল শ্রদ্ধার সঙ্গে চিত্রিত। ধর্মেরই প্রকাশচেষ্টার আলোতে সমস্ত প্রাণীর ইতিহাস বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে মহিমান্বিত।

দুজন ওলন্দাজ পণ্ডিত সমস্ত ভালো করে ব্যাখ্যা করবার জন্যে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁদের চরিত্রে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সরল হৃদ্যতার সম্মিলন আমার কাছে বড়ো ভালো লাগল। সব চেয়ে শ্রদ্ধা হয় এঁদের নিষ্ঠা দেখে। বোবা পাথরগুলোর মুখ থেকে কথা বের করবার জন্যে সমস্ত আয়ু দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে পাণ্ডিত্যের কৃপণতা লেশমাত্র নেই— অজস্র দাক্ষিণ্য। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ করে জেনে নেবার জন্যে এঁদেরই গুরু বলে মেনে নিতে হবে। জ্ঞানের প্রতি বিশুদ্ধ নিষ্ঠা থেকেই এঁদের এই অধ্যবসায়। ভারতের বিদ্যা, ভারতের ইতিহাস, এঁদের নিকটের জিনিস নয়, অথচ এইটেই এঁদের সমস্ত জীবনের সাধনার জিনিস। আরও কয়েকজন পণ্ডিতকে দেখেছি; তাঁদের মধ্যেও সহজ নম্রতা দেখে আমার মন আকৃষ্ট হয়েছে। ইতি ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৭[১]

বান্দুঙ। জাভা

২০

বিলিটন

কল্যাণীয়াসু

রানী, জাভার পালা সাঙ্গ করে যখন বাটাভিয়াতে এসে পেঁছলুম, মনে হল খেয়াঘাটে এসে দাঁড়িয়েছি, এবার পাড়ি দিলেই ওপারে গিয়ে পেঁছব নিজের দেশে। মনটা যখন ঠিক সেই ভাবে ডানা মেলেছে এমন সময় ব্যাংকক্ থেকে আরিয়ামের টেলিগ্রাম এল যে, সেখানে আমার ডাক পড়েছে, আমার জন্যে অভ্যর্থনা প্রস্তুত। আবার হাল ফেরাতে হল। সারাদিন খাটুনির পর আস্তাবলের রাস্তায় এসে গাড়োয়ান যখন নতুন আরোহীর ফরমাশে ঘোড়াটাকে অন্য রাস্তায় বাঁক ফেরায় তখন তার অন্তঃকরণে যে-ভাবের উদয় হয় আমার ঠিক সেইরকম হল। ক্লান্ত হয়েছি, এ কথা মানতেই হবে। এমন লোক দেখেছি (নাম করতে চাই নে) ভাগ্য অনুকূল হলে যারা টুরিস্টব্রত গ্রহণ করে চিরজীবন অসাধ্য সাধন করতে পারত, কিন্তু তারা হয়তো পটলডাঙার কোন্-এক ঠিকানায় ধ্রুব হয়ে

[১] মীরা দেবীকে লিখিত।

গৃহকর্মে নিযুক্ত। আর, আমি দেহটাকে কোণে বেঁধে মনটাকে গগনপথে ওড়াতে পারলে আরাম পাই অথচ সাত ঘাটের জল আমাকে খাওয়াচ্ছে। অতএব, চললুম শ্যামের পথে, ঘরের পথে নয়।

এখানকার যে-সরকারি জাহাজে সিঙাপুরে যাবার কথা সে-জাহাজে অত্যন্ত ভিড়, তাই একটি ছোটো জাহাজে আমি আর সুরেন স্থান করে নিয়েছি। কাল শুক্রবার সকালে রওনা হওয়া গেছে। সুনীতি ও ধীরেন একদিনের জন্য পিছিয়ে রয়ে গেল; কেননা, কাল রাত্রে ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে সুনীতির একটা বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। জাভার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সুনীতি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তার কারণ, তাঁর পাণ্ডিত্যে কোনো ফাঁকি নেই, যা-কিছু বলেন তা তিনি ভালো করেই জানেন।

আমাদের জাহাজ দুটি দ্বীপ ঘুরে যাবে, তাই দুদিনের পথে তিন দিন লাগবে। এই জায়গাটাতে বিশ্বকর্মার মাটির ব্যাগ ছিঁড়ে অনেকগুলো ছোটো ছোটো দ্বীপ সমুদ্রের মধ্যে ছিটকে পড়েছে। সেগুলো ওলন্দাজদের দখলে। এখন যে-দ্বীপে জাহাজ নোঙর ফেলেছে তার নাম বিলিটন। মানুষ বেশি নেই; আছে টিনের খনি, আর আছে সেই-সব খনির ম্যানেজার ও মজুর। আশ্চর্য হয়ে বসে বসে ভাবছি, এরা সমস্ত পৃথিবীটাকে কিরকম দোহন করে নিচ্ছে। একদিন এরা সব ঝাঁকে ঝাঁকে পালের জাহাজে চড়ে অজানা সমুদ্রে বেরিয়ে পড়েছিল। পৃথিবীটাকে ঘুরে ঘুরে দেখে নিলে, চিনে নিলে, মেপে নিলে। সেই জেনে নেওয়ার সুদীর্ঘ ইতিহাস কত সাংঘাতিক সংকটে আকীর্ণ। মনে মনে ভাবি, ওদের স্বদেশ থেকে অতি দূর সমুদ্রকূলে এই-সব দ্বীপে যেদিন ওরা প্রথম এসে পাল নামালে, সে কত আশঙ্কায় অথচ কত প্রত্যাশায় ভরা দিন। গাছপালা জীবজন্তু মানুষজন সেদিন সমস্তই নতুন। আর আজ! সমস্তই সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত, সম্পূর্ণ অধিকৃত।

এদের কাছে আমাদের হার মানতে হয়েছে। কেন, সেই কথা ভাবি। তার প্রধান কারণ, আমরা স্থিতিবান জাত, আর ওরা গতিবান। অন্যোন্যতন্ত্র সমাজবন্ধনে আমরা আবদ্ধ, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যে ওরা বেগবান। সেইজন্যেই এত সহজে ওরা ঘুরতে পারল। ঘুরছে বলেই জেনেছে আর পেয়েছে। সেই কারণেই জানবার ও পাবার আকাঙ্ক্ষা ওদের এত প্রবল। স্থির হয়ে বসে বসে থেকে আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষাটাই ক্ষীণ হয়ে গেছে। ঘরের কাছেই কে আছে, কী হচ্ছে, ভালো করে তা জানি নে, জানবার ইচ্ছাও হয় না। কেননা, ঘর দিয়ে আমরা অত্যন্ত ঘেরা। জানবার জোর নেই যাদের, পৃথিবীতে বাঁচবার জোর তাদের কম। এই ওলন্দাজরা যে-শক্তিতে জাভাদ্বীপ সকলরকমে অধিকার করে নিয়েছে, সেই শক্তিতেই জাভাদ্বীপের পুরাতত্ত্ব অধিকার করবার জন্যে তাদের এত পণ্ডিতের এত একাগ্রমনে তপস্যা। অথচ, এ পুরাতত্ত্ব অজানা নতুন দ্বীপেরই মতো তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্বন্ধশূন্য। নিকট-সম্পর্কীয় জ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধেও আমরা উদাসীন, দূরসম্পর্কীয় জ্ঞান সম্বন্ধেও এঁদের আগ্রহের অন্ত নেই। কেবল বাহুবলে নয়, এই জিজ্ঞাসার প্রবলতায় এরা জগৎটাকে অন্তরে বাহিরে জিতে নিচ্ছে। আমরা একান্তভাবে গৃহস্থ। তার মানে, আমরা প্রত্যেকে আপন গার্হস্থ্যের অংশমাত্র, দায়িত্বের হাজার বন্ধনে বাঁধা। জীবিকাগত দায়িত্বের সঙ্গে অনুষ্ঠানগত দায়িত্ব বিজড়িত। ক্রিয়াকর্মের নিরর্থক বোঝা এত অসহ্য বেশি যে, অন্য সকল যথার্থ কর্ম তারই ভারে অচলপ্রায়। জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত যে-সমস্ত কৃত্য ইহলোক পরলোক জুড়ে আমাদের স্কন্ধে চেপেছে তাদের নিয়ে নড়াচড়া অসম্ভব, আর তারা আমাদের শক্তিকে কেবলই শোষণ করে নিচ্ছে। এই-সমস্ত ঘরের ছেলেরা পরের হাতে মার খেতে বাধ্য। এ কথাটা আমরা ভিতরে ভিতরে বুঝতে পারছি। এইজন্যে আমাদের নেতারা সন্ন্যাসের দিকে এতটা ঝোঁক দিয়েছেন। অথচ, তাঁরা সনাতনধর্মকেও ধ্রুব সত্য বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু, আমাদের সনাতনধর্ম গার্হস্থ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সস্ত্রীকং ধর্মমাচরেৎ। আমাদের দেশে বিস্ত্রীক ধর্মের কোনো মানে নেই।

যাঁরা সনাতনধর্মের দোহাই দেন না, তাঁরা বলেন, ক্ষতি কী। কিন্তু, বহু যুগের সমাজব্যবস্থার পুরাতন ভিত্তি যদি-বা ভাঙা সহজ হয় তার জায়গায় নতুন ভিত্তি গড়বে কতদিনে। কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে প্রত্যেক সমাজ কতকগুলি নীতিকে সংস্কারগত করে নিয়েছে। তর্ক করে বিচার করে, অল্প

লোক সিধে থাকতে পারে—সংস্কারের জোরেই তারা সংসারের পথে চলে। এক সংস্কারের জায়গায় আর-এক সংস্কার গড়া তো সোজা কথা নয়। আমাদের সমাজের সমস্ত সংস্কারই আমাদের বহুদায়-গ্রন্থিল গার্হস্থ্যকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ রাখবার জন্যে। য়ুরোপীয়দের কাছ থেকে বিজ্ঞান শেখা সহজ কিন্তু তাদের সমাজের সংস্কারকে আপন করা সহজ নয়।

আমাদের জাহাজে ছিলেন টিনখনির এক কর্তা; বললেন, ষোলো বৎসর এইখানেই লেগে আছেন। টিন ছাড়া এখানে আর কিছুই নেই। তবু এইখানেই তাঁর বাসা বাঁধা। বাটাভিয়াতে সিন্ধি বণিকেরা দোকান করেছেন। দু বছর অন্তর বাড়ি যাবার নিয়ম। জিজ্ঞাসা করলুম, স্ত্রীপুত্র নিয়ে এখানে বাসা বাঁধতে দোষ কী। বললেন, স্ত্রীকে নিয়ে এলে চলবে কেন, স্ত্রী-যে সমস্ত পরিবারের সঙ্গে বাঁধা, তাঁকে সরিয়ে আনতে গেলে সেখানে ভাঙন ধরে। বোধ করি রামায়ণের যুগে এত তর্ক ছিল না। টিনের কর্তা বালককাল কাটিয়েছেন সাশ্রম বিদ্যালয়ে, বয়ঃপ্রাপ্ত হতেই কাজের সন্ধানে ফিরেছেন, বিবাহ করবামাত্র নিজের শক্তির 'পরেই সম্পূর্ণ ভর দিয়ে বসেছেন। বাপের তবিলের উপরে তাগিদ নেই, মা-মাসি-পিসেমশায়ের জন্যেও মন খারাপ হয় না। সেইজন্যেই এই জনবিরল নির্বাসনেও টিনের খনি চলছে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এরা ঘর বাঁধতে পারল তার কারণ, এরা ঘরছাড়া। তার পরে মঙ্গলগ্রহের দিকে দূরবীন তুলে-যে এরা রাতের পর রাত কাটিয়ে দিচ্ছে তারও কারণ, এদের জিজ্ঞাসাবৃত্তি ঘরছাড়া। সনাতন গৃহস্থেরা এদের সঙ্গে কেমন করে পারবে। তাদের প্রচণ্ড গতিবেগে এদের ঘরের খুঁটিগুলো পড়ছে ভেঙে; কিছুতে বাধা দিতে পারছে না। যতক্ষণ চুপ করে আছি ততক্ষণ যত রাজ্যের অহেতুক বোঝা জমে জমে পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠলেও তেমন দুঃখ বোধ হয় না, এমন-কি, ঠেস দিয়ে আরাম পাওয়া যায়। কিন্তু, ঘাড়ে তুলে নিয়ে চলতে গেলেই মেরুদণ্ড বাঁকে। যারা সচল জাত, বোঝাই সম্বন্ধে তাদের কেবলই সূক্ষ্ম বিচার করতে হয়। কোন্‌টা রাখবার, কোন্‌টা ফেলবার, এ তর্ক তাদের প্রতি মুহূর্তের; এতেই আবর্জনা দূর করবার বুদ্ধি পাকা হয়। কিন্তু, সনাতন গৃহস্থ চণ্ডীমণ্ডপে আসন পেতে বসে আছেন; তাই তাঁর পঞ্জিকা থেকে তিনশোপঁয়ষট্টি-দিন-ভরা মূঢ়তায় আজ পর্যন্ত কিছুই বাদ পড়ল না। এই-সমস্ত রাবিশ যাদের অন্তরে বাইরে কানায় কানায় ভরপুর, হঠাৎ কংগ্রেসের মাচার উপর থেকে তাদের 'পরে হুকুম এল, লঘুভার মানুষের সঙ্গে সমান পা ফেলে চলতে হবে, কেননা, দু-চার দিনের মধ্যেই স্বরাজ চাই। জবাব দেবার ভাষা তাদের মুখে নেই, কিন্তু তাদের পাঁজর-ভাঙা বুকের ব্যথায় এই মূক মিনতি থেকে যায়, 'তাই চলবার চেষ্টা করব, কিন্তু কর্তারা আমাদের বোঝা নামিয়ে দেন।' তখন কর্তারা শিউরে উঠে বলেন, 'সর্বনাশ, ও-যে সনাতন বোঝা।' ইতি ১ অক্টোবর ১৯২৭[১]

মায়র জাহাজ

২১

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, অক্টোবর শুরু হল, বোধ হচ্ছে এখন তোমাদের পুজোর ছুটি; আন্দাজ করছি, ছুটি ভোগ করবার জন্যে আশ্রম ত্যাগ করা তুমি প্রয়োজন বোধ কর নি। নিশ্চয়ই তোমার ছুটির জোগান দেবার ভার দিয়েছ শান্তিনিকেতনের প্রফুল্লকাশগুচ্ছবীজিত শরৎপ্রকৃতির উপরে। পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে অন্তত এই বুদ্ধি আমার মাথায় এসেছে যে, ঘুরে বেড়িয়ে বেশি কিছু লাভ নেই, এ যেন চালুনিতে জল আনবার চেষ্টা, পথে-পথেই প্রায় সমস্তটা নিকেশ হয়ে যায়। আধুনিক কালের ভ্রমণ জিনিসটা উঞ্ছবৃত্তির মতো, যা ছড়িয়ে আছে তাকে খুঁটে খুঁটে কুড়িয়ে কুড়িয়ে চলা। নিজের সুদূর ভরা খেতে আঁটিবাঁধা ফসলের স্মৃতিটা মনে কেবলই জেগে ওঠে।

[১] নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত।

এবারকার যাত্রায় দেশের চিঠিপত্র ও খবরবার্তা প্রায় কিছু পাই নি বলে মনে হচ্ছে যেন জন্মান্তর গ্রহণ করেছি। এ জন্মের প্রত্যেক দিনের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি সাবেক-জন্মের অন্তত সাতদিনের তুল্য। নতুন জায়গা, নতুন মানুষ, নতুন ঘটনার চলমান যূথপ্রবাহ একেবারে ঠাসাঠাসি হয়ে হুহু করে চলেছে। এই চলার মাপেই মন তোমাদেরও সময়ের বিচার করছে। রেলগাড়ির আরোহী যেমন মনে করে, তার গাড়ির বাইরে নদীগিরিবন হঠাৎ কালের তাড়া খেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিয়েছে, তেমনি এই দ্রুত বেগবান সময়ের কাঁধে চড়ে আমারও মনে হচ্ছে, তোমাদের ওখানেও সময়ের বেগ বুঝি এই পরিমাণেই—সেখানে আজ-গুলো বুঝি কাল-গুলোকে ডিঙিয়ে একেবারে পরশুর ঘাড়ে গিয়ে পড়ছে, মুকুলের সঙ্গে ফলের বয়সের ভেদ সেখানে বুঝি ঘুচল। দূরে বসে যখন বোরোবুদুর বালি প্রভৃতির কথা ভেবেছি তখন সেই ভাবনাকে একটা বিস্তৃত কালের উপর মেলে দিয়ে কল্পনা করেছি, নইলে অতখানি পদার্থ ধরাবার জায়গা পাওয়া যায় না। এই কয়দিনেই সে-সমস্ত তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করা গেল; যা স্বপ্নের মধ্যে আকীর্ণ হয়ে ছিল তা প্রত্যক্ষের মধ্যে সংকীর্ণ হয়ে এল। দূরে সময়ের যে-মাপ অস্ফুটতার মধ্যে মস্ত হয়ে ছিল, কাছে সেই সময়টাই ঘন হয়ে উঠল। হিসেব করে দেখলে, আমার এই কয়দিনের আয়ুতে অল্পকালের মধ্যে অনেকখানি কালকে ঠেসে দেওয়া হয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপে মন্দগমনে যার দিন চলে তার বয়সটার অনেকখানি বাদ দিলে তবে খাঁটি আয়ুটুকুর মধ্যে পৌঁছনো যায়; অর্থাৎ কেবলমাত্র কালের পরিমাণে তার আয়ুর দাম দিতে গেলে ঠকতে হয়, অনেক দর-কষাকষি করেও দুধে পৌঁছনো শক্ত হয়ে ওঠে। তাই বলে এ কথা বলাও চলে না যে, দ্রুতবেগে দেশবিদেশে অনেকগুলো ব্যাপার-পরম্পরার মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে চললেই আয়ু সেই অনুসারে কালকে ব্যাপ্ত করে। আমাদের শাস্ত্রীমশায়কে দেখো-না। তিনি কোণেই বসে আছেন। কিন্তু, সেইটুকুর মধ্যে স্থির হয়ে থেকে কালকে তিনি কিরকম ব্যাপকভাবে অধিকার করতে করতে চলেছেন; সাধারণ লোকের বয়সের বাটখারায় মাপলে তাঁর বয়স নব্বই ছাড়িয়ে যায়। এই তো সেদিন এলেন আশ্রমে মিত্রগোষ্ঠীর সম্পাদকপদ থেকে নেমে। এসেই তাঁর মন দৌড় দিল পালিশাস্ত্রের মহারণ্যের মধ্যে। দ্রুতবেগে পার হয়ে চলেছেন—কোথায় তিব্বতী, কোথায় চৈনিক। নাগাল পাবার জো নেই।

তাই বলছি, আমাদের এই ভ্রমণের কালটা ব্যাপ্তির দিকে যেরকম প্রাপ্তির দিকে সেরকম নয়। আমাদের ভ্রমণের তালটা চৌদুন লয়ে। এই লয় তো আমাদের জীবনের অভ্যস্ত লয় নয়, তাই বাইরের দ্রুতগতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তরকে চালাতে গিয়ে হয়রান হয়ে পড়তে হয়। যেমন চিবিয়ে না খেলে খাদ্যটাকে খাদ্য বলেই মনে হয় না তেমনি হুড়মুড় করে কাজ করাকে কর্তব্য বলে উপলব্ধি করা যায় না। বিশ্বের উপর দিয়ে ভাসা-ভাসা ভাবে মন বুলিয়ে চলেছি; অভিজ্ঞতার পেয়ালা ধরে ফেনাটাতে মুখ ঠেকাবার জন্যে এক সেকেন্ড মেয়াদ পাওয়া যায়, পানীয় পর্যন্ত পৌঁছবার সময় নেই। মৌমাছিকে ঝোড়ো হাওয়ার তাড়া খেয়ে কেবল যদি উড়তেই হয়, ফুলের উপর একটুমাত্র পা ছুঁইয়েই তখনই যদি সে ছিটকে পড়ে, তা হলে তার ঘুরে-বেড়ানোটা যেমন ব্যর্থ হয়, আমার মনও তেমনি ব্যর্থতার দমকা হাওয়ায় ভন্ ভন্ করেই মোলো—তার চলার সঙ্গে পৌঁছনোর যোগ হারিয়ে গেছে। এর থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারি, কোনো জন্মে আমেরিকান ছিলুম না। পাওয়া কাকে বলে যে-মানুষ জানে না ছোঁয়াকেই সে পাওয়া মনে করে। আমার মন স্ন্যাপ্-শট্‌বিলাসী মন নয়, সে চিত্রবিলাসী।

এইমাত্র সুনীতি এসে তাড়া লাগাচ্ছে—বেরতে হবে, সময় নেই। যেমন কোল্‌রিজ বলে গেছেন—সমুদ্রে জল সর্বত্রই, কিন্তু এক ফোঁটা জল নেই যে, পান করি। সময়ের সমুদ্রে আছি কিন্তু একমুহূর্ত সময় নেই। ইতি ২ অক্টোবর ১৯২৭[১]

[১] অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত।

ভানুসিংহের পত্রাবলী

প্রকাশ : ১৯৩০

উৎসর্গ

এই পত্রগুলি দিয়ে যে পত্রপুট গাঁথা হয়েছে
তার মধ্যে রানুর প্রতি ভানুদাদার
আশীর্বাদ পূর্ণ রইল

১

শান্তিনিকেতন

তোমার চিঠির জবাব দেব বলে চিঠিখানি যত্নসহকারে রেখেছিলুম, কিন্তু কোথায় রেখেছিলুম সে কথা ভুলে যাওয়াতে এতদিন দেরি হয়ে গেল। আজ হঠাৎ খুঁজতেই ডেস্কের ভিতর হতে আপনিই বেরিয়ে পড়ল।

কবিশেখরের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ। রাজকন্যার সঙ্গে নিশ্চয় তার বিয়ে হত, কিন্তু তার পূর্বেই সে মরে গিয়েছিল। মরাটা তার অত্যন্ত ভুল হয়েছিল, কিন্তু সে আর এখন শোধরাবার উপায় নেই। যে-খরচে রাজা তার বিয়ে দিত সেই খরচে খুব ধুম করে তার অন্ত্যেষ্টি সৎকার হয়েছিল।

ক্ষুধিত পাষাণে ইরানী বাঁদির কথা জানবার জন্যে আমারও খুব ইচ্ছে আছে কিন্তু যে-লোকটা বলতে পারত আজ পর্যন্ত তার ঠিকানা পাওয়া গেল না।

তোমার নিমন্ত্রণ আমি ভুলব না—হয়তো তোমাদের বাড়িতে একদিন যাব, কিন্তু তার আগে তুমি যদি আর-কোনো বাড়িতে চলে যাও? সংসারে এইরকম করেই গল্প ঠিক জায়গায় সম্পূর্ণ হয় না।

এই দেখো-না কেন, খুব শীঘ্রই তোমার চিঠির জবাব দেব বলে ইচ্ছা করেছিলুম, কিন্তু এমন হতে পারত তোমার চিঠি আমার ডেস্কের কোণেই লুকিয়ে থাকত, এবং কোনোদিনই তোমার ঠিকানা খুঁজে পেতুম না।

যেদিন বড়ো হয়ে তুমি আমার সব বই পড়ে বুঝতে পারবে তার আগেই তোমার নিমন্ত্রণ সেরে আসতে চাই। কেননা যখন সব বুঝবে তখন হয়তো সব ভালো লাগবে না—তখন যে-ঘরে তোমার ভাঙা পুতুল থাকে সেই ঘরে রবিবাবুকে স্থান দেবে।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ৩ ভাদ্র ১৩২৪

২

কলিকাতা

আমার একদিন ছিল যখন আমি ছোটো ছিলুম—তখন আমি ঘন ঘন এবং বড়ো বড়ো চিঠি লিখতুম। তুমি যদি তার আগে জন্মাতে, যদি অনর্থক এত দেরি না করতে, তা হলে আমার চিঠির উত্তরের জন্য একদিনও সবুর করতে হত না। আজ আর চিঠি লেখবার সময় পাই নে। তোমার বয়স আমার যখন ছিল তখন নিজের ইচ্ছেয় চিঠি লিখতুম, এখন অন্যের ইচ্ছেয় এত বেশি লিখতে হয় যে, নিজের ইচ্ছেটা মারাই গেল। তার পরে আবার ভয়ানক কুঁড়ে হয়ে গেছি। যত বেশি কাজ করতে হচ্ছে ততই কুঁড়েমি আরও বেড়ে যাচ্ছে। এখন লিখে যাওয়ার চেয়ে বকে যাওয়া ঢের বেশি সহজ মনে হয়। যদি তেমন সুবিধে হত তো দেখিয়ে দিতুম বকুনিতে তুমি কখনো আমার সঙ্গে পেরে উঠতে না। সেটা তোমার ভালো লাগত কি না বলতে পারি নে। কেননা তোমার যতগুলি পুতুল আছে তারা কেউ তোমার কথার জবাব করে না। তুমি যা বল তাই তারা চুপ করে শুনে যায়। আমার দ্বারা কিন্তু সেটা হবার জো নেই—অন্যের কথা শোনার চেয়ে অন্যকে কথা শোনানো আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। আমার বড়ো মেয়ে যখন ছোটো ছিল তখন বকুনিতে তার সঙ্গে পারতুম না, কিন্তু এখন সে বড়ো হয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। তার পর থেকে আমার সমকক্ষ কাউকে পাই নি। তোমাকে পরীক্ষা করে দেখতে আমার খুব ইচ্ছে রইল। একদিন হয়তো তোমাদের শহরে যাব। তুমি লিখেছ আমাকে

গাড়িতে করে নিয়ে যাবে। কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখি আমাকে দেখতে নারদ মুনির মতো— মস্ত বড়ো পাকা দাড়ি। ভয় কোরো না, আমি তার মতোই ঝগড়াটেও বটে, কিন্তু ছোটো মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করা আমার স্বভাব নয়। তোমার কাছে খুব ভালোমানুষটির মতো থাকবার আমি খুব চেষ্টা করব— এমন-কি কবিশেখরের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়েতে যদি তোমার মত থাকে আমি স্বয়ং তার ঘটকালি করে দিতে রাজি আছি। ইতি ২১ ভাদ্র ১৩২৪

৩

কলিকাতা

তোমার সঙ্গে চিঠি লিখে জিততে পারব না এ আমি আগে থাকতে বলে রাখছি। তোমার মতো বাসন্তী রঙের কাগজ আমি খুঁজে পেলুম না। সামান্য সাদা কাগজই সব সময়ে খুঁজে পাই নে। তোমাকে তো আগেই বলেছি, আমি কুঁড়ে। তার পরে, আমি ভারি এলোমেলো— কোথায় কী রাখি তার কোনো ঠিকানা পাই নে। এমন আমার আরও অনেক দোষ আছে। এই তো চিঠির কাগজের কথা। তার পরে ভেবেছিলুম ছবি এঁকে তোমার সচিত্র চিঠির উপযুক্ত জবাব দেব— চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলুম অহংকার বজায় থাকবে না। এ বয়সে নতুন করে হাঁস আঁকতে বসা আমার পক্ষে চলবে না। গ-অক্ষরের পেটের নীচে খণ্ড ত জুড়েও সুবিধে করতে পারলুম না— সেটা এইরকম বিশ্রী দেখতে হল। অনেক সময় পদ্মার চরে কাটিয়েছি; সেখানে হাঁসের দল ছাড়া আমার আর সঙ্গী ছিল না। তাদের প্রতি আমার মনের কৃতজ্ঞতা থাকাতেই আমাকে আজ থেমে যেতে হল— এবারকার মতো তোমার হাঁসেরই জিত রইল। এই তো গেল ছবি, তার পরে সময়। তাতেও তোমার সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না। তাই ভয় হচ্ছে, শেষকালে তুমি রাগ করে আর-কোনো গল্প-লিখিয়ে গ্রন্থকারের সঙ্গে ভাব করবে— কিন্তু নিমন্ত্রণ আমার পাকা রইল।

৪

কলিকাতা

তুমি দেরি করে আমার চিঠির উত্তর দিয়েছিলে এতে আমার রাগ করাই উচিত ছিল, কিন্তু রাগ করতে সাহস হয় না— কেননা আমার স্বভাবে অনেক দোষ আছে— দেরি করে উত্তর দেওয়া তার মধ্যে একটি। আমি জানি তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি অনেক সহ্য করতে পার; আমার কুঁড়েমি, আমার ভোলাস্বভাব, আমার এই সাতান্ন বছর বয়সের যত রকম শৈথিল্য সব তোমাকে সহ্য করতে হবে। আমার মতো অন্যমনস্ক অকেজো মানুষের সঙ্গে ভাব রাখতে হলে খুব সহিষ্ণুতা থাকা চাই— চিঠির উত্তর যত পাবে তার চেয়ে বেশি চিঠি লেখবার মতো শক্তি যদি তোমার না থাকে, দেনাপাওনা সম্বন্ধে তোমার হিসাব যদি খুব বেশি কড়াক্কড় হয় তা হলে একদিন আমার সঙ্গে হয়তো ঝগড়া হতেও পারে, এই কথা মনে করে ভয়ে ভয়ে আছি। কিন্তু এ কথা আমি জোর করে বলছি যে, ঝগড়া যদি কোনো দিন বাধে তার অপরাধটা আমার দিকে ঘটতে পারে, কিন্তু রাগটা তোমার দিকেই হবে। আর যা হোক আমি রাগী নই। তার কারণ এ নয় যে, আমি খুব ভালোমানুষ, তার কারণ এই যে, আমার স্মরণশক্তি ভারি কম। রাগ করবার কারণ কী ঘটেছে সে আমি কিছুতেই মনে রাখতে পারি নে। তুমি মনে কোরো না কেবল পরের সম্বন্ধেই আমার এই দশা, নিজের দোষের কথা আমি আরও বেশি ভুলি। চিঠির জবাব দিতে যখন ভুলে যাই তখন মনেও থাকে না যে ভুলে গেছি; কর্তব্য করতে ভুলি, ভুল সংশোধন করতেও ভুলি, সংশোধন করতে ভুলেছি তাও ভুলি। এমন অদ্ভুত মানুষের

সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব কর এবং সে বন্ধুত্ব যদি স্থায়ী রাখতে চাও তা হলে তোমাকেও অনেক ভুলতে হবে, বিশেষত চিঠির হিসাবটা।

পদ্মার ধারের হাঁসেদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হল কী করে জিজ্ঞাসা করেছ। বোধ হয় তার কারণ এই যে, বোবার শত্রু নেই। ওরা যখন খুব দল বেঁধে চেঁচামেচি করে আমি চুপ করে শুনি, একটিও জবাব দিই নে। আমি এত বেশি শান্ত হয়ে থাকি যে, ওরা আমাকে মানুষ বলেই গণ্যই করে না—আমাকে বোধ হয় পাখির অধম বলেই জানে—কেননা আমার দুই পা আছে বটে কিন্তু ডানা নেই। আর যাই হোক ওদের সঙ্গে আমার চিঠিপত্র চলে না—যদি চলত তা হলে আমাকেই হার মানতে হত—কেননা ওদের ডানা-ভরা কলম আছে, আর ওদের সময়ের টানাটানি খুব কম।

তোমাকে যে এত বড়ো চিঠি লিখলুম আমার ভয় হচ্ছে পাছে বিশ্বাস না কর যে আমার সময় কম। অনেক কাজ পড়ে আছে—কাজ ফাঁকি দিয়েই তোমাকে চিঠি লিখছি—কাজ যদি না থাকত তা হলে কাজ ফাঁকি দেওয়াও চলত না।

বেলা অনেক হয়ে গেছে—অনেক আগে স্নান করতে যাওয়া উচিত ছিল—হাঁসেদের কথায় হঠাৎ স্নানের কথাটা মনে পড়ে গেল—তা হলে আজ চললুম। আজ রাত্রে বোলপুর যেতে হবে। ইতি
৬ কার্তিক ১৩২৪

৫

শান্তিনিকেতন

তোমাদের বইয়ে বোধ হয় পড়ে থাকবে, পাখিরা মাঝে মাঝে বাসা ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের ওপারে চলে যায়। আমি হচ্ছি সেই-জাতের পাখি। মাঝে মাঝে দূর পার থেকে ডাক আসে, আমার পাখা ধড়ফড় করে ওঠে। আমি এই বৈশাখ মাসের শেষ দিকে জাহাজে চড়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দেব বলে আয়োজন করছি। যদি কোনো বাধা না ঘটে তা হলে বেরিয়ে পড়ব। পশ্চিম দিকের সমুদ্রপথ আজকাল যুদ্ধের দিনে সকল সময়ে পারের দিকে পৌঁছিয়ে দেয় না, তলার দিকেই টানে। পূর্ব দিকের সমুদ্রপথ এখনো খোলা আছে—কোন্‌দিন হয়তো দেখব সেখানেও যুদ্ধের ঝড় এসে পৌঁচেছে। যাই হোক তোমার কাশীর নিমন্ত্রণ যে ভুলেছি তা মনে কোরো না; তুমি আয়োজন ঠিক করে রেখো, আমি কেবল একবার পথের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দুটো-চারটে জায়গায় নিমন্ত্রণ চট্‌ করে সেরে নিয়ে তার পরে তোমার ওখানে গিয়ে বেশ আরাম করে বসব—আমার জন্যে কিন্তু ছাতু কিংবা রুটি, অড়রের ডাল এবং চাটনির বন্দোবস্ত করলে চলবে না; তোমাদের মহারাজ নিশ্চয়ই খুব ভালো রাঁধে, কিন্তু তুমি যদি নিজে স্বহস্তে শুকতোনি থেকে আরম্ভ করে পায়স পর্যন্ত রেঁধে না খাওয়াও তা হলে সেই মুহূর্তেই আমি—কী করব এখনো তা ঠিক করি নি—ভাবছিলুম না খেয়েই সেই মুহূর্তেই আবার অস্ট্রেলিয়া চলে যাব—কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখতে পারব কি না একটু সন্দেহ আছে সেইজন্যেই এখন কিছু বললুম না। কিন্তু রান্না অভ্যাস হয় নি বুঝি? তাই বল। কেবলই পড়া মুখস্থ করেছ? আচ্ছা, অন্তত এক বছর সময় দিলুম—এর মধ্যেই মার কাছে শিখে নিয়ো। তা হলে সেই কথা রইল, আপাতত আমাকে কলকাতায় যেতে হবে, বাক্সগুলো গুছিয়ে ফেলা চাই। আমি খুব ভালো গোছাতে পারি। কেবল আমার একটু যৎসামান্য দোষ আছে—প্রধান-প্রধান দরকারি জিনিসগুলো প্যাক করতে প্রায়ই ভুলে যাই—যখন তাদের দরকার হয় ঠিক সেই সময় দেখি তাদের আনা হয় নি। এতে বিষম অসুবিধা হয় বটে কিন্তু গোছাবার ভারি সুবিধে—কেননা বাক্সের মধ্যে যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যায়, আর বোঝা কম হওয়াতে রেলভাড়া জাহাজভাড়া অনেক কম লাগে। দরকারি জিনিস না নিয়ে অদরকারি জিনিস সঙ্গে নেবার আর-একটা মস্ত সুবিধে হচ্ছে এই যে—সেগুলো বারবার বের-করাকরির দরকার হয় না, বেশ গোছানোই থেকে যায়; আর

যদি হারিয়ে যায় কিংবা চুরি যায় তা হলেও কাজের বিশেষ ব্যাঘাত কিংবা মনের অশান্তি ঘটে না। আজ আর বেশি লেখবার সময় নেই, কেননা আজ তিনটের গাড়িতেই রওনা হতে হবে। গাড়ি ফেল করবার আশ্চর্য ক্ষমতা আমার আছে, কিন্তু সে ক্ষমতাটা আজকে আমার পক্ষে সুবিধার হবে না; অতএব তোমাকে নববর্ষের আশীর্বাদ জানিয়ে আমি টিকিট কিনতে দৌড়লুম। ইতি ২ বৈশাখ ১৩২৫

৬

শান্তিনিকেতন

কাল সন্ধ্যাবেলায় স্তরে স্তরে গাঢ় নীল মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল— তখন নীচের সেই পুব দিকের বারান্দায় সাহেবে আমাতে মিলে খাচ্ছিলুম— আমার আর-সব খাওয়া হয়ে গিয়ে যখন চিঁড়ে-ভাজা খেতে আরম্ভ করেছি এমন সময় পশ্চিম দিক থেকে সোঁ সোঁ করে হাওয়া এসে সমস্ত কালো মেঘ আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত বিছিয়ে দিলে। কতদিন পরে ঐ সজল মেঘ দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। যদি আমি তোমাদের কাশীর হিন্দুস্থানী মেয়ে হতুম তা হলে কাজ্‌রি গাইতে গাইতে শিরীষগাছের দোলাটাতে দুলতে যেতুম। কিন্তু অ্যান্ডরুজ্‌ কিংবা আমি আমাদের দুজনের কারও হিন্দুস্থানী মেয়ের মতো আকৃতি-প্রকৃতি কিংবা চালচলন নয়, তা ছাড়া সে কাজ্‌রি গান জানে না, আমিও যা জানতুম ভুলে গেছি। তাই দুজনে মিলে উপরে আমার ছাদের সামনেকার বারান্দায় এসে বসলুম। দেখতে দেখতে ঘনবৃষ্টি নেমে এল— জলে বাতাসে মিলে আকাশময় তোলপাড় করে বেড়াতে লাগল। আমার ছাদের সামনেকার পেঁপে গাছটার লম্বা পাতাগুলোকে ধরে ঠিক যেন কানমলা দিতে লাগল। শেষকালে বৃষ্টি প্রবল হয়ে গায়ে যখন ছাঁট লাগতে আরম্ভ হল, তখন আমার সেই কোণটাতে এসে আশ্রয় নিলুম। এমন সময় চোখ ধাঁদিয়ে কড়কড় শব্দে প্রকাণ্ড একটা বাজ পড়ল। আমাদের মনে হল বাগানের মধ্যেই কোথাও পড়েছে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে দেখি হরিচরণ পণ্ডিতের বাসার দিকে ছেলেরা ছুটছে। সেই বাড়িতেই বাজ পড়েছিল। তখন তাঁর বড়ো মেয়ে উনানে দুধ জ্বাল দিচ্ছিলেন, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। ছেলেরা দূর থেকে দেখতে পেলে চালের উপর থেকে ধোঁয়া উঠতে আরম্ভ হয়েছে। তারা তো সব চালের উপর চড়ে 'জল জল' করে চীৎকার করতে লাগল। ছেলেরা কুয়ো থেকে জল ভরে এনে চালের উপর আগুন নিবিয়ে ফেললে। ভাগ্যে, হরিচরণের বাড়ির কাউকে আঘাত লাগে নি। কেবল হরিচরণের মেয়ের হাত একটু পুড়ে ফোস্কা পড়েছিল। কিন্তু সব চেয়ে ভালো লেগেছিল আমার ছেলেদের উদ্যোগ দেখে। তাদের না আছে ভয়, না আছে ক্লান্তি। নির্ভয়ে হাতে করে করে চালের খড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিতে লাগল। আর দূরের কুয়ো থেকে দৌড়ে দৌড়ে সার বেঁধে জলভরা ঘড়া এনে উপস্থিত করতে লাগল। ওরা যদি না দেখত এবং না এসে জুটত তা হলে মস্ত একটা অগ্নিকাণ্ড হত। এমনি করে কাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঝড়-বাদল হয়ে আজ অনেকটা ঠান্ডা আছে। আকাশ এখনো মেঘে লেপে আছে, হয়তো আজও বিকেলে একচোট বৃষ্টি শুরু হবে। ইতি ৫ শ্রাবণ ১৩২৫

৭

শান্তিনিকেতন

তুমি আজকাল খুব পড়ায় লেগে গেছ, কিন্তু আমি যে চুপচাপ করে বসে থাকি তা মনে কোরো না। আমার কাজ চলছে। সকালে তুমি তো জান সেই আমার তিন ক্লাসের পড়ানো আছে। তার পরে স্নান করে খেয়ে, যেদিন চিঠি লেখবার থাকে চিঠি লিখি। তার পরে বিকেলে খাবার খবর

দেবার আগে পর্যন্ত ছেলেদের যা পড়াতে হয় তাই তৈরি করে রাখি। তার পরে সন্ধ্যার সময় ছাতে চুপচাপ বসে থাকি—কিন্তু এক-একদিন ছেলেরা আমার কাছে কবিতা শুনতে আসে। তার পরে অন্ধকার হয়ে আসে—তারাগুলিতে আকাশ ছেয়ে যায়—দিনুর ঘর থেকে ছেলেদের গলা শুনতে পাই—তারা গান শেখে—তার পরে গান বন্ধ হয়ে যায়। তখন আদ্যবিভাগের ছেলেদের ঘর থেকে হারমোনিয়ম এবং বাঁশির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গানের ধ্বনি উঠতে থাকে। ক্রমে রাত্রি আরও গভীর হয়, তখন ছেলেদের ঘরের গানও বন্ধ হয়ে যায়, আর দূরে গ্রামের রাস্তার ভিতর দিয়ে দুই-একটা আলো চলছে দেখতে পাই। তার পরে সে আলোও থাকে না, কেবলমাত্র আকাশ-জোড়া তারার আলো। তার পরে বসে থাকতে থাকতে ঘুম পেয়ে আসে, তখন আস্তে আস্তে উঠে শুতে যাই। তার পরে কখন একসময়ে আমার পূর্বদিকের দরজার সম্মুখে আকাশের অন্ধকার অল্প অল্প ফিকে হয়ে আসে, দুটো একটা শালিকপাখি উসখুস করে ওঠে, মেঘের গায়ে গায়ে সোনালি আভা ফোটে, খানিক বাদেই সাড়ে চারটার সময় আদ্যবিভাগে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতে থাকে, অমনি আমি উঠে পড়ি। মুখ ধুয়ে এসে আমার সেই পূর্বদিকের বারান্দায় পাথরের চৌকির উপর আসন পেতে উপাসনায় বসি। সূর্য ধীরে ধীরে উঠে তার আলোকের স্পর্শে আমাকে আশীর্বাদ করে। আজকাল সকাল সকাল খেতে যেতে হয়, কেননা সাড়ে ছটার সময় আশ্রমের সকল বালকবৃদ্ধ আমরা বিদ্যালয়ের সামনের মাঠে একত্র হই, একটি কোনো গান হয়ে তার পরে আমাদের স্কুলের কাজ আরম্ভ হয়। ঠিক প্রথম ঘণ্টায় আমার ক্লাস নেই। কিন্তু সেই সময়ে আমি আমার কোণটাতে এসে একবার আমার পড়াবার বই ও খাতাপত্র দেখে শুনে ঠিক করে নিই—তার পরে আমার কাজ। এই আমার দিনরাতের হিসাব তোমার কাছে দিলুম। কেমন শান্তিতে দিন চলে যায়। ঐ ছেলেদের কাজ করতে আমার খুব ভালো লাগে। কেননা ওরা জানে না যে, আমরা ওদের জন্য যে কাজ করি তার কোনো মূল্য আছে। ওরা যেমন অনায়াসে সূর্যের কাছ থেকে তার আলো নেয় আমাদের হাত থেকে তেমনি অনায়াসে সেবা নেয়। হাটে দোকানদারদের কাছ থেকে যেমন দরদস্তুর করে জিনিস কিনতে হয় তেমন করে নয়। এরা যখন বড়ো হবে, যখন সংসারের কাজে প্রবেশ করবে, তখন হয়তো মনে পড়বে—এই আশ্রমের প্রান্তর, এখানকার শালের বীথিকা, এখানকার আকাশের উদার আলো এবং উন্মুক্ত সমীরণ এবং প্রতিদিন সকালে বিকালে এখানে আকাশতলে নীরবে বসে ঠাকুরকে প্রণাম। ইতি ১২ শ্রাবণ ১৩২৫

৮

শান্তিনিকেতন

দিনগুলো আজকাল শরৎকালের মতো সুন্দর হয়ে উঠেছে। আকাশের ছিন্ন মেঘগুলো উদাসীন সন্ন্যাসীর মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমলকীগাছের পাতাগুলিকে ঝরঝরিয়ে দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে একটা আলস্যের সুর বাজছে আর বৃষ্টিতে-ধোয়া রোদ্দুরটি যেন সরস্বতীর বীণার তারগুলো থেকে বেজে-ওঠা গানের মতো সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। আমার ঠিক চোখের উপরেই সন্তোষবাবুর বাড়ির সামনেকার সবুজ খেত রৌদ্রে ঝলমল করে উঠেছে; আর তারই একপাশ দিয়ে বোলপুর যাবার রাঙা রাস্তাটা চলে গেছে—ঠিক যেন একটি সোনালি সবুজ শাড়ির রাঙা পাড়ের মতো। খুব ছেলেবেলা থেকেই এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার গলাগলি ভাব—তাই আমার জীবনের কত কালই নদীর নির্জন চরে কাটিয়েছি। তার পরে কতদিন গেছে এখানকার নির্জন প্রান্তরে। তখন এখানে বিদ্যালয় ছিল না, তখন শান্তিনিকেতনের বাড়ির গাড়ি-বারান্দায় বসে খুব বৃহৎ একটি নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবে যেতে পারতুম; রাত্রে ঐ বারান্দায় যখন শুয়ে থাকতুম তখন আকাশের সমস্ত তারা যেন আমার পাড়াপড়শির মতো তাদের জানালা থেকে আমার মুখের দিকে চেয়ে কী বলত, তাদের কথা শোনা যেত না, কিন্তু তাদের মুখ-চোখের হাসি আমাকে

এসে স্পর্শ করত। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ভাব করার একটা মস্ত সুবিধা এই যে, সে আনন্দ দেয়, কিন্তু কিছু দাবি করে না; সে তার বন্ধুত্বকে ফাঁসের মতো বেঁধে ফেলতে চেষ্টা করে না, সে মানুষকে মুক্তি দেয়, তাকে দখল করে নিতে চায় না। ১৮ শ্রাবণ ১৩২৫

৯

শান্তিনিকেতন

আজ সকাল থেকে ঘন ঘোর মেঘ করে প্রবল বেগে বর্ষণ চলছে, সকালে কোনো মাস্টার তাই ক্লাস নেন নি। কিন্তু থার্ড ক্লাসের ছেলেদের আমি ছুটি দিতে পারলুম না—তাদের পড়া খুব শক্ত, মাঝে মাঝে ফাঁক পড়লে সমস্ত আলগা হয়ে যাবে, তাই সেই বৃষ্টির মধ্যেও তাদের সংগ্রহ করে আনা গেল। পড়াতে পড়াতে বৃষ্টির বেগ বেড়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়। আমার শোবার ঘরে ক্লাস হয়—ঘরে ছাঁট আসতে লাগল। শার্সি বন্ধ করে দিলুম—পাঠ্য শেষ হয়ে গেল, কিন্তু বৃষ্টি শেষ হয় না—এই বৃষ্টিতে তাদের তো ছেড়ে দিতে পারি নে। শেষকালে ওরা আমাকে ধরে পড়ল, মুখে মুখে একটা গল্প বানিয়ে ওদের শোনাতে। কিন্তু ভেবে দেখো আমার বয়স এখন সাতান্ন বছর হয়েছে, এখন কি ইচ্ছা করলেই অনর্গল গল্প বলতে পারি? শেষকালে আমি করলুম কী, একটা গল্পের কেবল গোড়া ধরিয়ে দিয়ে ওদের বললুম সেইটে এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ করে লিখে আনতে। ওরা তো উৎসাহের সঙ্গে রাজি হল, কিন্তু ওদের গল্প যে কী রকম হবে তা কল্পনা করে আমার মনে কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ হচ্ছে না। যাক গে ওরা তো সেই গল্প মাথায় নিয়ে ভিজতে ভিজতে চেঁচাতে চেঁচাতে ওদের ঘরে চলে গেল—আমি গেলুম স্নান করতে। স্নান করে খেয়ে এসে আজ তাকিয়ায় একটু হেলান দিয়ে পড়েছিলুম। কিন্তু সমস্ত দিন তো কুঁড়েমি করে কাটাতে পারি নে। অন্য দিন হলে উঠে আমার তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ক্লাসের জন্য পড়ার বই লিখতে বসতুম, কিন্তু আজ বাদলার দিনে সেটা ভালো লাগল না, তাই 'বিদায়-অভিশাপ'টা ইংরেজিতে তর্জমা করতে বসে গিয়েছিলুম। বেশ ভালোই লাগছিল; পাতা-দুয়েক যখন শেষ হয়ে গেছে, এমন সময় চিঠি হাতে করে এক হরকরার প্রবেশ। কাজেই এখন কিছুক্ষণের জন্য দেবযানীকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। বৃষ্টি থেমে গেছে কিন্তু জলভারাবনত মেঘে আকাশ ভরা। এতদিন শ্রাবণের দেখা ছিল না, যেই বিশে একুশে হয়েছে অমনি যেন কোনোমতে ছুটতে ছুটতে শেষ ট্রেনটা ধরে হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির। কম হাঁপাচ্ছে না—তার হাঁপানির বেগে আমাদের শালবন বিচলিত, আমলকীবন কম্পান্বিত, তালবন মর্মরিত, বাঁধের জল কল্লোলিত, কচি ধানের খেত হিল্লোলিত, আর আমার এই জানলার খড়খড়িগুলো ক্ষণে ক্ষণে খড়খড়ায়িত। ইতি ২১ শ্রাবণ ১৩২৫

১০

শান্তিনিকেতন

তোমার চিঠি আজ এইমাত্র পেলুম। এইমাত্র বলতে কী বোঝায় বলি। দুপুর বেলাকার খাওয়া হয়ে গেছে। সেই কোণটাতে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসেছিলেম। আকাশ ঘন মেঘে অন্ধকার হয়ে গেছে—পশ্চিম দিক থেকে মাঝে মাঝে সোঁ সোঁ করে ঝোড়ো বাতাস বইছে। ইন্দ্রের ঐরাবতের বাচ্চাগুলোর মতো মোটা মোটা কালো মেঘ আকাশময় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে গুরু গুরু গর্জন শোনা যায়। সামনে সবুজ মাঠের উপরে মেঘলা দিনের ছায়া, নিবিড় স্নিগ্ধতার মধ্যে চোখ ডুবে গেছে। তোমাকে লিখতে লিখতে বৃষ্টি নেমে এল—বৃষ্টি একটুমাত্র দেখা দিলেই আমার এই বারান্দায় তার পায়ের শব্দ তখনি শোনা যায়। দূরে ভুবনডাঙার দিকে বাঁধের কাছে যে ঘন বনশ্রেণী দেখা যায়,

বৃষ্টির ধারায় সেটা একটু ঝাপসা হয়ে এসেছে—বনলক্ষ্মী যেন তার পাতলা ওড়নাটাকে মুখের উপর ঘোমটা টেনে দিয়েছে। ক-টা বেজেছে, ঠিক বলতে পারি নে। আমার সামনের দেয়ালে যে-ঘড়িটা ছিল তাকে নির্বাসিত করে দিয়েছি। ইদানীং তার ব্যবহারে এমন হয়ে এসেছিল যে, তাকে বিশ্বাস করার জো ছিল না; সে চলতও ভুল বলতও ভুল, তার পরামর্শমত খেতে শুতে গিয়ে আমি অনেকবার ঠকেছি। তবু উপযুক্ত উপায়ে তাকে যে সংশোধন করা যেত না তা বলতে পারি নে—কিন্তু সময়ের জন্যই ঘড়ি, ঘড়ির জন্য সময় নষ্ট করা আমার পোষায় না। যাই হোক আন্দাজে মনে হচ্ছে একটা-দেড়টা হয়ে গেছে। আর একটু বাদেই আমাকে একটা ক্লাস পড়াতে হবে। আজকাল প্রায় জন পনেরো গুজরাটি ছেলে এসেছে, কী করে তাদের বাংলা পড়াতে হবে সেইটে আজ আমি দেখিয়ে দেব—বৌমা আর শৈল ওদের দুপুর বেলায় একঘণ্টা করে বাংলা পড়াতে রাজি হয়েছেন।

ইতিমধ্যে অ্যান্ডরুজ্ সাহেবের খুব অসুখ করেছিল। আমাদের ভাবনা হয়েছিল। একদিন তো রাত্রে তাঁর নিজের মনে হল তাঁর ওলাউঠা হয়েছে। সেই রাত্রি একটার সময় বর্ধমানে ডাক্তার ডাকতে লোক পাঠিয়ে দিলুম। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার ওষুধ খেয়ে এতটা ভালো হয়ে উঠলেন যে, ভোরের বেলায় আবার টেলিগ্রাফ করে ডাক্তার আনা বন্ধ করে দিলুম। তুমি তো জানই আমার হাতের রেখায় লেখা আছে—আমি ডাক্তারি করতে পারি। যাই হোক, এখন সাহেব আবার সেরে উঠে পূর্বের মতোই চারি দিকে দৌড়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু তিনি সেই-যে জাপানি ঝোলা কাপড়টা পরতেন সেটা আজকাল আর দেখতে পাই নে।

বৃষ্টি একটুখানি হয়েই থেমে গেল। বাতাসটাও বন্ধ হয়েছে। কিন্তু পুবের দিকে খুব একটা ঘন নীল মেঘ ভ্রূকুটি করে থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে—এখনি বোধ হয় বরুণ-বাণ বর্ষণ করতে লেগে যাবে। আমরা আশ্রমে অনেক নতুন গাছ লাগিয়েছি, ভালো করে বৃষ্টি হলে ভালোই হয়। কিন্তু আজকাল শরৎকালের মতো হয়েছে—রৌদ্রে বৃষ্টিতে মিলে ক্ষণে ক্ষণে খেলা শুরু হয়ে গেছে। তোমরা গান-বাজনা শিখতে শুরু করেছ শুনে খুব সুখী হলুম। আজ আমার আর সময়ও নেই, কাগজও ফুরল, পাড়া জুড়ল বার্গি এল ক্লাসে।

১১

শান্তিনিকেতন

আজ বুধবার। কদিন খুব বৃষ্টি-বাদলের পর আজ সকালের আকাশে সূর্যের আলো নির্মল হয়ে ফুটে উঠেছে। শিশু যেমন দোলায় শুয়ে শুয়ে অকারণ আনন্দে হাত-পা ছুঁড়ে চিৎ হয়ে শুয়ে কলহাস্য করতে থাকে, তেমনি করে আশ্রমের গাছপালাগুলি আজ তাদের ডালপালা দুলিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবলই ঝিলমিল করে উঠছে। এখন সকাল বেলা—স্নিগ্ধ বাতাস বইছে, পাখির ডাকে এখানকার শালবন এবং আমবাগান মুখরিত। আমাদের মন্দিরের উপাসনা হয়ে গেছে। তার পরে এতক্ষণ আমার জানালার ধারে সেই কোণটিতে শুয়েছিলুম। প্রতি বুধবারে উপাসনার পরে এন্ডরুজ্ একবার এসে, আমি কী বলেছি, আমার কাছে ইংরেজিতে তাই বুঝিয়ে নেন। বুঝিয়ে নিয়ে খুশি হয়ে তিনি চলে গেছেন। আমি কী বলেছিলুম জান? এই সৃষ্টির দিকে প্রথম তাকালে কী দেখতে পাই? এর আগাগোড়া সমস্ত নিয়মে বাঁধা, এর সমস্ত অণুপরমাণুর মধ্যে নিয়মের ফাঁক এতটুকুও নেই। কেমন জান? যেমন একটি সহস্র-তারবাঁধা বীণাযন্ত্র। এই বীণার প্রত্যেক তারটি খুব খাঁটি হিসাব করে বাঁধা অর্থাৎ এই বীণাটির তুম্বী থেকে আরম্ভ করে এর সূক্ষ্মতম তারটি পর্যন্ত সমস্তই সত্য। কিন্তু না-হয় সত্যই হল, তাতে আমার কী? বীণার তার বাঁধার খাঁটি নিয়ম নিয়ে আমি কী করব? তেমনি এই জগতে সূর্যচন্দ্রগ্রহ অণুপরমাণু সমস্তই ঠিক সময় রেখে ঠিক নিয়ম রেখে চলছে—এই কথাটা যত বড়ো কথাই হোক-না, কেবল তাতে আমাদের মন ভরে না।

আমরা এই কথা বলি, শুধু বীণার নিয়ম চাই নে, বীণার সংগীত চাই। সংগীতটি যখন শুনতে পাই, তখনই ঐ বীণাযন্ত্রের শেষ অর্থটি পাই— তা নইলে ও কেবল খানিকটা কাঠ এবং পিতল। জগতের এই বীণাযন্ত্রে আমরা সংগীতও শুনেছি; শুধু কেবল নিয়ম নয়। সকাল বেলার আলোতে আমরা শুধু কেবল মাটিজল, শুধু কেবল কতকগুলো জিনিস দেখতে পাই, তা নয়। সকাল বেলার শান্তি, স্নিগ্ধতা, সৌন্দর্য, পবিত্রতা সে তো কেবল বস্তু নয় সেই হচ্ছে সকালের বীণাযন্ত্রের সংগীত। তারই সুরে আমাদের হৃদয় পাখির সঙ্গে মিলে গান গাইতে চায়। যেখানে বীণা শুধু বীণা সেখানে সে বস্তুমাত্র— কিন্তু যেখানে বীণায় সংগীত ওঠে, সেখানে বীণার পিছনে আমাদের ওস্তাদজি আছেন। সেই ওস্তাদজির আনন্দই গানের ভিতর দিয়ে আমাদের আনন্দ দেয়। সৃষ্টির বীণা তো ওস্তাদজি বাজিয়ে চলেছেন, কিন্তু আমাদের নিজের চিত্তের বীণাও যদি সুরে না বাজে তা হলে আমাদের হৃদয়বীণার ওস্তাদজিকে চিনব কী করে? তাঁর আনন্দরূপ দেখব কী করে? না যদি দেখি তা হলে কেবল বেসুর, কেবল ঝগড়া-বিবাদ, কেবল ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ, কেবল কৃপণতা, স্বার্থপরতা, কেবল লোভ এবং ভোগের লালসা। আমাদের জীবনের মধ্যে যখন সংগীত বাজে তখন নিজেকে ভুলে যাই। আমাদের জীবনযন্ত্রের ওস্তাদজিকেই দেখতে পাই। তখন দুঃখ আমাদের অভিভূত করে না, ক্ষতি আমাদের দরিদ্র করে দেয় না, তখন ওস্তাদজির আনন্দের মধ্যে আমাদের জীবনের শেষ অর্থটি দেখতে পাই। সেইটি দেখতে পাওয়াই মুক্তি। সেইজন্যই তো চিত্তবীণায় সত্য সুরে তার বাঁধতে চাই, সেইজন্যে কঠিন চেষ্টায় মনকে বশ করতে চাই, চৈতন্যকে নির্মল করে তুলতে চাই— সেইজন্যে নিজের স্বার্থ নিজের ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা ভুলে হৃদয়কে স্তব্ধ করতে চাই— তা হলেই আমার সুরবাঁধা যন্ত্র ওস্তাদের হাতে বেজে উঠবে; আমাদের প্রার্থনা হচ্ছে এই : 'তব অমল পরশ রস অন্তরে দাও।' তাঁর সেই স্পর্শের রসই হচ্ছে আমাদের অন্তরের সংগীত। তুমিও জান, আমি সন্ধ্যাবেলায় প্রায়ই গান করি—

বীণা বাজাও হে, মম অন্তরে।
সজনে বিজনে, বন্ধু, সুখে দুঃখে বিপদে
আনন্দিত তান শুনাও হে, মম অন্তরে।

দুপুর বেলা খেতে গিয়ে দেখি খাবার টেবিলে তোমার চিঠি আর সেই হিন্দি খবরের কাগজ রয়েছে। তোমরা আলমোড়ায় যাচ্ছ। ওখানে আমি অনেকদিন ছিলুম। তোমাদের ঠিকানা পেলে সেই ঠিকানায় লিখব। আমি ভেবেছিলুম, তোমাদের স্কুলের ছুটির আগে তোমরা কোথাও যাবে না। কিন্তু দেখছি আমার ছেলেবেলাকার হাওয়া তোমাদের লেগেছে— তখন আমি কেবলই ইস্কুল পালিয়েছি। কিন্তু সাবধান আমার মতো মূর্খ হলে চলবে না— নামতা মনে থাকা চাই, আর সাইবীরিয়ার রাস্তা ভুললে কষ্ট পাবে।

১২

শান্তিনিকেতন

তুমি বোধ হয় এই প্রথম হিমালয়ে যাচ্ছ। আমিও প্রায় তোমার বয়সে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয়ে গিয়েছিলুম। তার আগে ভূগোলে পড়েছিলুম, পৃথিবীতে হিমালয়ের চেয়ে উঁচু জিনিস আর কিছু নেই, তাই হিমালয় সম্বন্ধে মনে মনে কত কী-যে কল্পনা করেছিলুম তার ঠিক নেই। বাড়ি থেকে বেরবার সময় মনটা একেবারে তোলপাড় করেছিল। অমৃতসর হয়ে ডাকের গাড়ি চড়ে প্রথমে পাঠানকোটে গিয়ে পড়লুম। সেখানে পাহাড়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ। তুমি কাঠগোদাম দিয়ে উপরে উঠেছ— পাঠানকোট সেই রকম কাঠগোদামের মতো। সেখানকার ছোটো ছোটো পাহাড়-

গুলো, 'কর, খল' 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'—এর বেশি আর নয়। তার পরে ক্রমে ক্রমে যখন উপরে উঠতে লাগলুম, তখন কেবল এই কথাই মনে হতে লাগল, হিমালয় যত বড়োই হোক-না, আমার কল্পনা তার চেয়ে তাকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছে; মানুষের প্রত্যাশার কাছে হিমালয় পাহাড়ই বা লাগে কোথায়। আসল কথা, পাহাড়টা থাকে-থাকে উপরে উঠেছে বলে, ডাণ্ডি করে চড়তে চড়তে, পর্বতরাজের রাজমহিমা ক্রমে ক্রমে মনের মধ্যে সয়ে আসে। যে-জিনিসটা খুব বড়ো, আমরা একেবারে তার সমস্তটা তো দেখতে পাই নে—পর্বত ক্রমে ক্রমে দেখি, সমুদ্র ক্রমে ক্রমে দেখি—. এমন-কি, যে-মানুষ আমার চেয়ে বয়সে অনেক বেশি তার সেই বড়ো বয়সের সুদীর্ঘ বিস্তারটা একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় না। এইজন্যে তফাত জিনিসটা কল্পনায় যত বড়ো, প্রত্যক্ষে তত বড়ো নয়। অর্থাৎ বড়ো হলেও বড়ো দেখা যায় না। আমাদের যে-ঠাকুরকে আমরা প্রণাম করি, তিনি যত বড়ো তার সমস্তটা যদি সম্পূর্ণ আমাদের সামনে আসত, তা হলে সে আমরা সইতেই পারতুম না। কিন্তু হিমালয় পাহাড়ের মতো আমরা তাঁর বুকের উপর দিয়ে ক্রমে ক্রমে উঠি। যতই উঠি-না কেন, তিনি আমাদের একেবারে ছাড়িয়ে যান না—বরাবর আমাদের সঙ্গী হয়ে তিনি আমাদের আপনি উঠিয়ে নিতে থাকেন; বুদ্ধিতে বুঝতে পারি তিনি আমাদের ছাড়িয়ে আছেন, কিন্তু ব্যবহারে বরাবর তাঁর সঙ্গে আমাদের সহজ আনাগোনা চলতে থাকে। তাই তো তাঁকে বন্ধু বলতে আমাদের কিছু ঠেকে না—তিনিও তাঁর উপরের থেকে হেসে আমাদের বন্ধু বলেন। এত উপরে চড়ে যান না যে, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া দায় হয়ে ওঠে। তুমি যত জোরের সঙ্গে আমাকে সাতাশ বছরের করে নিয়েছ, আমরা তার চেয়ে ঢের বেশি জোরে তাঁকে সাতও করতে পারি সাতাশও করতে পারি—আবার সাতাশ কোটি করলেও চলে; তিনি যে আমাদের জন্য সবই হতে পারেন, তা নইলে তাঁকে দিয়ে আমাদের চলতই না। তোমার পাহাড় কেমন লাগল, আমাকে লিখো। হিমালয়ে আলমোড়া-পাহাড়ের চেয়ে ভালো পাহাড় ঢের আছে, আলমোড়া ভারি নেড়া পাহাড়; ওর গাছপালা নেই আর ওখানে থেকে হিমালয়ের তুষার-দৃশ্য তেমন ভালো করে দেখা যায় না। ইতি
১ ভাদ্র ১৩২৫

১৩

শান্তিনিকেতন

আজ সকালে তোমার চিঠি পেলুম। তখন তো আমার সময় থাকে না, তাই এখন খাওয়ার পরে লিখতে বসেছি। আর খানিক পরে ম্যাট্রিক-ক্লাসের ছেলেরা দল বেঁধে খাতাপত্র নিয়ে হাজির হবে। তুমি যে নিয়ম করে দিয়ে গিয়েছিলে, আজকাল সে আর পালন করা হয়ে ওঠে না; খাওয়ার পরে দুপুর বেলায় শোয়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছি—সেই ডেস্কের সামনে সেই চৌকি নিয়ে আমার দিন কাটে। সেজন্যে আমার নালিশ নেই, কাজের দরকার পড়লেই কাজ করতে হবে। পৃথিবীতে ঢের লোক আমার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করে—সেও আবার অফিসের কাজ—অর্থাৎ সে-কাজ পেটের দায়ে, মনের আনন্দে নয়। আমি-যে ছেলেদের পড়াই, সে তো দায়ে পড়ে নয়, সে নিজের ইচ্ছায়—অতএব এ-রকম কাজ করতে পারা তো সৌভাগ্য। কিন্তু তবু এক-একবার দরজার ফাঁকের ভিতর দিয়ে এই সবুজ পৃথিবীর একটা আভাস যখন দেখতে পাই তখন মনটা উতলা হয়ে ওঠে। আমি-যে জন্মকুঁড়ে। যেমন বাঁশির ফাঁকের ভিতর দিয়ে সুর বেরয়, তেমনি আমার কুঁড়েমির ভিতর থেকেই আমার যেটি আসল কাজ সেইটি জেগে ওঠে। আমার সেই আসল কাজই হচ্ছে বাণীর কাজ। সময়টাকে কর্তব্য দিয়ে ভরাট করে একেবারে নিরেট করে দিলে বাণী চাপা পড়ে যায়। সেইজন্যই আমাকে কেবল কাজ থেকে নয়, সংসারের নানা জটিল বন্ধন থেকে যথাসম্ভব মুক্ত থাকতে হয়। কাজই হোক, আর মানুষই হোক, আমাকে একেবারে চাপা দিলে বা বেঁধে ফেললে

আমার জীবন ব্যর্থ হতে থাকে। আমার মন ওড়বার জন্যে শূন্যকে চায়। তাকে খাঁচায় বাঁধবার আয়োজন যতবার হয়েছে, সেই আয়োজনের শিকল ছিন্ন হয়ে পড়ে গেছে। হঠাৎ একদিন দেখতে পাবে আমার কাজকর্মের দাঁড়খানা তার শিকল নিয়ে কোথায় পড়ে আছে, আর আমি অত্যুচ্চ অবকাশের আগডালের উপর অসীম ফাঁকার মধ্যে একলা বসে গান জুড়ে দিয়েছি। তাই বলছি— দরজা-জানলার আড়াল থেকে ঐ নীলে-সবুজে-সোনালিতে মেশানো ফাঁকার একটা অংশ যেমনি দেখতে পাই, অমনি আমার মন ডেস্কের ধার থেকে বলে ওঠে—ঐখানেই তো আমার জায়গা, ঐ ফাঁকটাকে যে আমার আনন্দ দিয়ে, গান দিয়ে ভরে তুলতে হবে। পুকুর আছে মাটির বাঁধ দিয়ে ঘেরা—সেইখানেই তার কাজ, কেউবা স্নান করছে, কেউবা জল তুলছে, কেউবা বাসন মাজছে। কিন্তু আমি হচ্ছি মেঘের মতো; আমাকে তো তটের ঘের দিলে চলবে না, আমাকে বাঁধতে গেলে তো বাঁধা পড়ব না—আমাকে যে ঐ শূন্যের ভিতর দিয়ে বর্ষণ করতে হবে। সব সময়েই যে বৃষ্টি ভরে আসে তা নয়, অনেক সময়ে অলস-স্বপ্নের মতো সূর্যের আলোতে রঙিয়ে উঠে কিছুই না করে ঘুরে বেড়াই, কিন্তু এই কুঁড়েমিটুকু উপর থেকে আমার জন্যে বরাদ্দ হয়ে গেছে, এজন্যে আমি কারও কাছে দায়িক নই। সবই তো বুঝলুম, কিন্তু কুঁড়েমি করি কখন বলো তো? তুমি তো দেখেই গেছ কাজের আর অন্ত নেই। ঘোড়াকে বিধাতা বাতাসের মতো দ্রুতগামী এবং মুক্ত করে সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু সেই ঘোড়াকেই মানুষ জিনে লাগামে আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে ফেলে। আমারও সেই দশা। বিধাতার ইচ্ছা ছিল—আমি ভরপুর কুঁড়েমি করে কাটাই, কিন্তু যে-গ্রহের হাতে পড়েছি, সে আমাকে কষে খাটিয়ে নিচ্ছে। বয়স যখন অল্প ছিল, তখন খাটুনি এড়িয়ে, ইস্কুল পালিয়ে পদ্মার নির্জন চরে বোটের মধ্যে লুকিয়ে বেশ চালাচ্ছিলুম—কিন্তু যখন থেকে তোমার পঞ্জিকা অনুসারে আমার 'সাতাশ' বছর হয়েছে, তখন থেকেই কাজের টানে আপনি ধরা দিয়ে কেটে বেরবার আর পথ পাই নে। নইলে আগেকার মতো হলে আমার পক্ষে আলমোড়ায় যেতে কতক্ষণ লাগত বলো? তবু তোমরা সেই পাহাড়ের উপরে মুক্ত হাওয়ায় স্বাস্থ্য এবং আনন্দ ভোগ করছ এ-কথা মনে করে ভালো লাগছে; তোমার চিঠি সেখানকার লাল ফুলের পাপড়িতে রাগ-রক্ত হয়ে আমার হাতে এসে পেঁচচ্ছে। সেখানকার ফুলে যে-রক্তিমা দেখতে পাচ্ছি, তোমার গালে সেই রক্তিমা সংগ্রহ করে আনবে—এই আশা করে আছি। আজ আর সময় নেই—অতএব ইতি।

১১ ভাদ্র ১৩২৫

১৪

শান্তিনিকেতন

আমাদের এখানে প্রায়ই খুব বৃষ্টি হচ্ছে। এক-একদিন বিষম জোরে বাতাস দেয় আর বৃষ্টির ধারাগুলো বেঁকে একেবারে তীরের মতো সিধে ঘরের মধ্যে চলে আসে। এখানে গরম নেই বললেই হয়—আর চারি দিকের মাঠ একেবারে ঘন সবুজ হয়ে উঠেছে। বোলপুরকে এত সবুজ আমি আর কখনোই দেখি নি। গাছগুলো নিবিড় পাতার ভারে থাকে-থাকে ফুলে উঠেছে—ঠিক যেন সবুজ মেঘের ঘটার মতো। আমাদের বিদ্যালয়ের কুয়োগুলো প্রায় কানায় কানায় ভরা। এবারে চারি দিকে অনেক গাছ পুঁতে দিয়েছি। সেগুলো যখন বড়ো হয়ে উঠবে, তখন আমাদের আশ্রম আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। কিন্তু এখানকার শুকনো বেলেমাটিতে গাছপালা ভারি দেরিতে বেড়ে ওঠে—আমি আটাশ বছরে পড়বার আগে এ-সব গাছে ফুলধরা দেখতে পাব না। তুমি যদি নবেম্বরে আমাদের আশ্রমে আস, তা হলে ততদিনে এখানে অনেক বদল দেখতে পাবে। এ-বৎসরটা আমাদের আশ্রমের পক্ষে খুব তেজের বৎসর; যেমন ঘন ঘন বৃষ্টিতে গাছপালা দেখতে দেখতে পূর্ণ হয়ে উঠছে, তেমনি এখানকার কাজের দিকেও খুব একটা উৎসাহ পড়ে গেছে। পড়াশুনো কাজকর্ম

যেন নতুন জোর পেয়েছে; সেইজন্যে ছেলেদের মধ্যেও খুব একটা আনন্দ জেগে উঠেছে। আমি-যে আমেরিকায় যাবার টিকিট কিনেও গেলুম না, এখানে থেকে গেলুম, তার পুরস্কার পেয়েছি। আমাদের আশ্রম-লক্ষ্মী বোধ হয় আমার অদৃষ্টের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমার বিদেশে-যাওয়া কাটিয়ে দিয়েছেন। খুব ভালোই হয়েছে। আমি 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ইংরেজিতে তর্জমা করেছি, তা জানো; অ্যান্ডরুজ্ সেটা পড়ে খুব হেসেছেন, আর খুব লাফালাফি করেছেন। ইতি ১৬ ভাদ্র ১৩২৫

১৫

শান্তিনিকেতন

কাল রাত্রি থেকে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন— মাঝে মাঝে প্রবল জোরে বর্ষণ নেমে আসছে— অমনি দেখতে দেখতে সমস্ত মাঠ জলে ছল ছল করে উঠছে— থেকে থেকে অশান্ত বাতাস সোঁ সোঁ করে হুহু করে আমাদের শালবনের ডালপালাগুলোর মধ্যে আছড়ে আছড়ে লুটিয়ে পড়ছে— ঠিক যেন আকাশের অনেক দিনের একটা চাপা বেদনা কিছুতেই আর চাপা থাকছে না। ও দিকে দিগন্তের কোণে কোণে রাগী-রকমের ভ্রূকুটি দেখা দিয়েছে— আর তার মধ্য দিয়ে একটা ফ্যাকাশে আলো দারুণ হাসির মতো। সবসুদ্ধ জলে-স্থলে একটা খ্যাপাটে রকমের ভাব। মনে হচ্ছে যেন ছুটন্ত উচ্চৈঃশ্রবার উপরে চড়ে ইন্দ্রদেব একটা ঘূর্ণাঝড়ের চক্র পৃথিবীর দিকে ছুঁড়ে মেরেছেন। বাতাসের আর্তনাদ আর তার বেগ ক্রমেই বেড়ে উঠছে— একটা রীতিমত ঝড়ের আয়োজন বলেই বোধ হচ্ছে। আমার এই দোতালার কোণটি ঝড়ের পক্ষে খুব-যে ভালো আশ্রয়— তা নয়। আধুনিক কালের যুদ্ধক্ষেত্রের trench-এর মতো যথেষ্ট প্রকাশ্যও নয়, যথেষ্ট প্রচ্ছন্নও নয়— ভালো করে ঝড়টা দেখতে পাচ্ছি নে, অথচ ঝড়ের ঝাপট থেকে ভালো করে রক্ষাও পাচ্ছি নে। সিঁড়ির সামনের দরজাটা বন্ধ করতে হয়েছে, ঘরের দরজাও সব বন্ধ— অন্ধকার, কোথা থেকে বেঁকেচুরে একটু বৃষ্টির ঝাপটও আসছে। রুদ্রদেবের তাণ্ডবনৃত্যের এই ডমরুধ্বনির মধ্যে বসে তোমাকে চিঠি লিখছি।

সেদিন তুমি আমাকে লিখেছিলে যে, তুমি আমার অনেক নতুন নতুন নাম ঠিক করে রেখেছ। ক্রমে একে একে বোধ হয় শুনতে পাব, কিন্তু আমার আসল নামটা যেন একেবারে চাপা না পড়ে যায়— কেননা ঐ নামটা নিয়ে এতদিন একরকম কাজ চালিয়ে এসেছি। তা ছাড়া ওর একটা মস্ত সুবিধা এই যে, কবির সঙ্গে রবির একটা মিল আছে; এর পরে যারা আমার নামে কবিতা লিখবে তাদের অনেকটা কষ্ট বাঁচবে। ইতি ২০ ভাদ্র ১৩২৫

১৬

শান্তিনিকেতন

আজ সকালে তোমার চিঠি এইমাত্র পেলুম। আজ আমার চতুর্থ এবং পঞ্চম বর্গের পুরাতন পড়ার দিন, আজ সন্তোষের হাতে তাদের ভার; এইজন্যে আমার সকালের কাজের প্রথম দুই ভাগ আমার ছুটি, তাই এখনি তোমার চিঠির জবাব দিতে বসবার সময় পেলুম। সেদিন যখন তোমাকে লিখছিলুম তখন আকাশ জুড়ে মেঘের হাঁকডাক এবং মাঠে-বনে পাগলা হাওয়ার দৌরাত্ম্য চলছিল; আজ সকালে তার আর কোনো চিহ্ন নেই, আজ শরৎকালের প্রসন্ন মূর্তি প্রকাশ পেয়েছে— শিবের জটা ছাপিয়ে যেন গঙ্গা ঝরে পড়ছে— আকাশে তেমনি আজ আলোকের নির্মল ধারা ঢেলে দিয়েছে, পৃথিবী আজ মাথা নত করে তার অশ্রু-আর্দ্র হৃদয়খানি মেলে দিয়েছে, আর আকাশের কোন্ তরুণ দেবতা হাসি-মুখে তার উপরে এসে দাঁড়িয়েছেন। জলস্থল শূন্যতল আজ একটি জ্যোতির্ময় মহিমায় পূর্ণ হয়ে

উঠেছে। সেই পরিপূর্ণতায় চারি দিক শান্ত স্তব্ধ, অথচ গোলমাল যে কিছু নেই, তা নয়। জাগ্রত প্রভাতের কাজকর্মের কলধ্বনি উঠেছে। আমার ঠিক সামনেই 'দিনুবাবুর' ঘরের দোতালায় রাজমিস্ত্রী ও মজুরের দল নানারকম ডাকহাঁক এবং ঠুকঠাক লাগিয়ে দিয়েছে। দূরে থেকে ছেলেদের কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছে, পূর্বদিকের সদর রাস্তা দিয়ে সার-বাঁধা গোরুর গাড়ি ইটের বোঝা নিয়ে আসছে, তারই অনিচ্ছুক চাকার আর্তনাদ এবং গাড়োয়ানের তর্জন-ধ্বনির বিরাম নেই, তার উপরে ঠিক আমার পিছনের জানালার বাইরে সুধাকান্তর ঘরের চালের উপরে বসে একদল চড়ুইপাখি কিচিমিচি করে কী-যে বিষম তর্ক বাধিয়ে দিয়েছে, তার একবর্ণ বোঝবার জো নেই—প্রায় ন্যায়শাস্ত্রেরই তর্কের মতো। কিন্তু তবু আজ আলোকে-অভিষিক্ত আকাশের এই অন্তরতর স্তব্ধতা কিছুতেই যেন ভাঙতে পারছে না। গায়ের উপর দিয়ে হাজার হাজার যে-সব ঝরনা ঝরে পড়ছে, তাতে যেমন হিমালয়ের অভ্রভেদী স্তব্ধতাকে বিচলিত করে না, এও ঠিক সেইরকম। একটি তপঃ-প্রদীপ্ত অপরিমেয় মৌনকে বেষ্টন করে এই-সমস্ত ছোটো ছোটো শব্দের দল খেলা করে চলেছে—তাতে তপস্যার গভীরতা আরও বড়ো হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে না। শরতের বনতল যেমন নিঃশব্দে-ঝরে-পড়া শিউলিফুলে আকীর্ণ হয়ে ওঠে, তেমনি করেই আমার মনের মধ্যে আজ শরৎ-আকাশের এই আলো শুভ্র শান্তি বর্ষণ করছে। ইতি ২৪ ভাদ্র ১৩২৫

১৭

শান্তিনিকেতন

গেল বুধবারে সকালে আমি মন্দিরে কী বলেছিলুম শুনবে? আমি বলেছিলুম, মানুষের ছোটো আর বড়ো—দুই-ই আছে। সেই ছোটো মানুষটি জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে কয়দিনের জন্যে আপনার একটি ছোটো সংসার পেতেছে—সেইখানে তার যত খেলার পুতুল সাজানো—সেইখানে তার প্রতিদিনের আহরণ জমা হচ্ছে আর ক্ষয় হচ্ছে। কিন্তু মানুষের ভিতরকার বড়োটি জন্ম-মৃত্যুর বেড়া ডিঙিয়ে চিরদিনের পথে চলেছে, এই চলবার পথে তার কত সুখ-দুঃখ, কত লাভ-ক্ষতি ঝরে পড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর দুটি আবর্তন আছে—একটি আহ্নিক, একটি বার্ষিক। একটি আবর্তনে সে আপনাকেই ঘুরছে, আর একটিতে সে নিজের চিরপথের কেন্দ্রস্থিত আলোকের উৎসকে প্রদক্ষিণ করছে। নিজেকে ঘোরবার সময় সূর্যের দিকে পিঠ ফেরাতেই দেখতে পায় যে, তার নিজের কোনো আলো নেই, তার নিজের দিকে অন্ধতা, ভয়, জড়তা—কিন্তু নিজের সেই অন্ধকারটুকুকে না জানলে সূর্যের সঙ্গে তার সম্বন্ধের পূর্ণ পরিচয় সে পেত না। আমরাও আমাদের ছোটো আবর্তনে নিজেকে ঘুরি; এ ঘোরাতেই জানতে পারি, আমার দিকে অন্ধকার, বিভীষিকা, মোহ, আমার দিকে ক্ষুদ্রতা; কিন্তু সেই জানার সঙ্গে সঙ্গেই যখন সেই অমৃতের উৎসকে জানি, তখন অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে আমরা যেতে থাকি। এইজন্যে আপনাকে আর তাঁকে দুইকেই একসঙ্গে জানতে থাকলে তবেই আমরা আমাদের বন্ধনকে নিয়ত অতিক্রম করতে করতে, মুক্তির স্বাদ পেতে পেতে, অমৃতের পাথেয় সংগ্রহ করতে করতে চিরদিনের পথে চলতে পারি। আমাদের ক্ষুদ্র-প্রতিদিন আমাদের বৃহৎ-চিরদিনকে প্রণাম করতে করতে চলতে থাকবে, আমাদের ক্ষুদ্র-প্রতিদিন তার সমস্ত আহরণগুলিকে বৃহৎ-চিরদিনের চরণে সমর্পণ করতে করতে চলবে। কিন্তু ক্ষুদ্র-প্রতিদিন যদি এমন কথা বলে বসে যে, আমি যা পাই, যা আনি, সব আমি নিজে জমাব, তা হলেই বিপদ বাধে—কেননা, তার জমাবার জায়গা কোথায়? তার মধ্যে এত ধরে কোথায়? তার এমন অক্ষয় পাত্র আছে কোন্‌খানে? পৃথিবী যেমন তার সোনায়-ভরা সকালটিকে এবং সোনায়-ভরা সন্ধ্যাটিকে নিজে জমিয়ে রেখে দেয় না, পূজার স্বর্ণকমলের মতো আপন সূর্য-প্রদক্ষিণের পথে প্রত্যহ প্রণাম করে উৎসর্গ করতে করতে চলেছে, আমাদেরও তেমনি এই ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত সুখ-

দুঃখ ভালোবাসাকে চিরদিনের চলবার পথে চিরদিনের দেবতাকে উৎসর্গ করতে করতে যেতে হবে—তা হলেই ছোটো-আমির সঙ্গে বড়ো-আমির মিল হবে, তা হলেই আমাদের ক্ষুদ্র জীবন সার্থক হবে; আপনার দিকে সমস্ত টানতে গেলেই সে-টান টেঁকে না, সেই বিদ্রোহে ছোটো-আমিকে একদিন পরাস্ত হতেই হয়। এইজন্য ছোটো-আমি জোড়হাতে প্রার্থনা করছে নমস্তেঽস্তু—বড়োকে আমার নমস্কার সত্য হোক্, নিজের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি পাই। ইতি ২৯ ভাদ্র ১৩২৫

১৮

শান্তিনিকেতন

আজ সকালে তোমার চিঠি পেয়েছিলুম, কিন্তু তখনি তার জবাব দেবার সময় পাই নি। দুপুর বেলাতেও খাবার পরে কিছু কাজ ছিল, তাই এখন বিকেলে তোমাকে তাড়াতাড়ি লিখতে বসেছি—ডাক যাবার আগে শেষ করে ফেলতে হবে। আজকাল আর বৃষ্টির কোনো লক্ষণ নেই—আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমার সেই লেখবার কোণটা তো তুমি জান—সেটা হচ্ছে পশ্চিমের বারান্দা; সেখানে বিকেলের দিকে হেলে-পড়া সূর্যের সমস্ত কিরণ বন্ধ-দরজার উপরে ঘা দিতে থাকে—সশরীরে ঢুকতে পায় না বটে, কিন্তু তার প্রতাপ অনুভব করতে পারি। তুমি এখন যেখানে আছ, সেখান থেকে আমার পিঠের দিকের বর্তমান অবস্থা ঠিক আন্দাজ করতে পারবে না। কিন্তু আমার আকাশের মিতাটি আমার সঙ্গে যেমনি ব্যবহার করুন, তাঁর সঙ্গে আমার কখনোই বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ হয় নি। আমি চিরদিন আলো ভালোবাসি। গাজিপুরে, পশ্চিমের গরমেও, আমি দুপুর বেলায় আমার ঘরের দরজা বন্ধ করি নি। অনেক দিন বর্ষার আচ্ছাদনের পর সেই আলো পেয়েছি—সেই আলো আজ আমার দেহের মধ্যে, মগজের মধ্যে, মনের মধ্যে প্রবেশ করছে। আমার সামনে পূর্বদিকের ঐ খোলা দরজা দিয়ে ঐ আলো নীল আকাশ থেকে আমার ললাটে এসে পড়েছে, আর সবুজ খেতের উপর দিয়ে এসে আমার দুই চোখের সঙ্গে সঙ্গে যেন কানে-কানে কথা বলছে। পৃথিবীর ইতিহাসে কত হানাহানি কাটাকাটি হয়ে গেল, মানুষের ঘরে ঘরে কত সুখ-দুঃখ, কত মিলন-বিচ্ছেদ, কত যাওয়া-আসার বিচিত্র লীলা প্রতিদিন বিস্মৃতির মধ্যে মিলিয়ে গেল, কিন্তু এই শরতের সবুজটি পৃথিবীর প্রসারিত অঞ্চলের উপরে যুগে যুগে বর্ষে বর্ষে আপন আসন অধিকার করেছে—কিছুতেই এই সুগভীর শান্তি সৌন্দর্যের 'পরে, এই রসপরিপূর্ণ নির্মলতার উপরে, কোনো আঘাত করতে পারে নি। সেই কথা যখন মনে করি, তখন সামনের ঐ আকাশের দিকে চেয়ে যুগ-যুগান্তরের সেই শান্তি আমার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত ক্ষোভকে আপন অসীমতার মধ্যে মিশিয়ে নেয়।

আমি বুধবারে কী বলি তাই তুমি শুনতে চেয়েছ। যা বলি তা আমার ভালো মনে থাকে না। অ্যান্ডরুজ্ উপাসনার পরেই আমার কাছে এসে একবার ইংরেজিতে তার ভাবখানা শুনে নেন, তাই খানিকটা মনে পড়ে। এবারে বলেছিলুম, জগতে একটা খুব বড়ো শক্তি হচ্ছে প্রাণ, অথচ সেই শক্তি বাইরের দিক থেকে কত ছোটো, কত সুকুমার, একটু আঘাতেই ম্লান হয়ে যায়। এমন জিনিসটা প্রতি মুহূর্তে বিপুল জড়-বিশ্বের ভারাকর্ষণের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে লড়াই করে দাঁড়িয়ে আছে, বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

বালক অভিমন্যু যেমন সপ্তরথীর ব্যূহে ঢুকে লড়াই করেছিল, আমাদের সুকুমার প্রাণ তেমনি অসংখ্য মৃত্যুর সৈন্যদলের মধ্যে দিয়ে অহর্নিশি লড়াই করে চলেছে। বস্তুর দিক থেকে দেখলে দেখা যায়, এই প্রাণের উপকরণ অতি তুচ্ছ—খানিকটা জল, খানিকটা কয়লা, খানিকটা ছাই, খানিকটা ঐ রকম সামান্য কিছু; অথচ প্রাণ আপনার ঐ বস্তুর পরিমাণকে বহু পরিমাণে অতিক্রম করে আছে। মৃত-দেহে সজীব দেহে বস্তুপিণ্ডের পরিমাণের তফাত নেই, অথচ উভয়ের মধ্যকার তফাত অপরিসীম। শুধু তাই নয়, সজীব বীজের বর্তমান আবরণের মধ্যে মহারণ্য লুকিয়ে আছে। ছোটোর মধ্যে এই-যে

বড়োর প্রকাশ, এই হচ্ছে আশ্চর্য। আরেক শক্তি হচ্ছে, মনের শক্তি। এই মনটি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় নিয়ে এই অসীম জগতের রহস্য আবিষ্কার করতে বেরিয়েছে। সেই ইন্দ্রিয়গুলি নিতান্ত দুর্বল। চোখ কতটুকুই দেখে, কান কতটুকুই শোনে, স্পর্শ কতটুকুই বোধ করে! কিন্তু মন এই আপন ক্ষুদ্রতাকে কেবলই ছাড়িয়ে যাচ্ছে— অর্থাৎ সে যা, সে তার চেয়ে অনেক বড়ো। তার উপকরণ সামান্য হলেও সে অতি-ক্ষুদ্র এবং অতি-বৃহৎ অতি-নিকট এবং অতি-দূরকে কেবলই অধিকার করছে। তা ছাড়া, তার মধ্যে যে-ভবিষ্যৎ প্রচ্ছন্ন, সেও অপরিমেয়। একটি ছোটো শিশুর মনের মধ্যেই নিউটনের, শেক্‌স্‌পীয়ারের মন লুকিয়ে ছিল। বর্বরতার যে-মন পাঁচের বেশি গণনা করতে পারত না, তারই মধ্যে আজকের সভ্যতার মন জ্ঞানের সাধনায় অভাবনীয় সিদ্ধিলাভ করেছে। শুধু তাই নয়, আরও ভবিষ্যতে সে-যে আরও কী আশ্চর্য চরিতার্থতা লাভ করবে, আজ আমরা তা কোনোমতেই কল্পনা করতে পারি নে। তা হলেই দেখা যাচ্ছে আমাদের এই-যে মন, যা এক দিকে খুব ছোটো, খুব দুর্বল দেখতে, আর-এক দিকে তার মধ্যে যে ভূমা আছে, হিমালয়-পর্বতের প্রকাণ্ড আয়তনের মধ্যে তা নেই। তেমনি আমাদের আত্মা ছোটো-দেহ, ছোটো-মন, ছোটো-সব প্রবৃত্তি দিয়ে ঘেরা, অনেক সময় তাকে যেন দেখতেই পাওয়া যায় না। কিন্তু তবু তার মধ্যেই সেই ভূমা আছেন। সেইজন্যেই তো এক দিকে আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আমাদের রাগ-বিরাগ যখন আমাদের কাছে অন্ন-বস্ত্র ও অন্য হাজার-রকম বাসনার জিনিসের জন্যে দরবার করছে, সেই মুহূর্তেই এই প্রবৃত্তির দাস, এই বাসনার বন্দী, বিশ্বের সমস্ত সম্পদ পায়ের নীচে ফেলে, উঠে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেছে— অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও, যা অসীম একেবারে তাকেই চাই। এত বড়ো চাওয়ার জোর এতটুকুর মধ্যে আছে কোথায়? সে-জোর যদি না থাকত, তবে এত বড়ো কথা তার মুখ দিয়ে বেরোত কেমন করে? এ কথার কোনো মানে সে বুঝত কী করে? আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মানবের আত্মা যা নিয়ে দেখছে, শুনছে, ছুঁচ্ছে, খাওয়া-পরা করছে, তাকেই চরম সত্য বলতে চাচ্ছে না; যাকে চোখে দেখল না, হাতে পেল না, তাকেই বলছে সত্য। তার একটি মাত্র কারণ, ছোটোর মধ্যেই বড়ো আছেন, সেই বড়োই ছোটোর ভিতর থেকে মানুষের আত্মাকে কেবলই মুক্তির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন— তাই মানুষের আশার অন্ত নেই। এখন প্রত্যেক মানুষের কাজ হচ্ছে কী। নিজের কথায়, চিন্তায়, ব্যবহারে এইটেই যেন প্রকাশ করি যে, আমাদের মধ্যে সেই বড়োই সত্য। তা না করে যদি মানুষের ছোটোটার উপরেই ঝোঁক দিই— যে-সব বাসনা তার শিকল, তার গণ্ডি, যাতে তাকে খর্ব করে, আচ্ছন্ন করে, তাকেই যদি কেবল প্রশ্রয় দিই তা হলে মানুষকে তার সত্য পরিচয় থেকে ভোলাই। আত্মা যে অমর, আত্মা যে অভয়, আত্মা যে সমস্ত সুখ-দুঃখ, ক্ষতি-লাভের চেয়ে বড়ো, অসীমের মধ্যেই যে আত্মার আনন্দনিকেতন, এই কথাটি প্রকাশ করাই হচ্ছে মানুষের সমস্ত জীবনের অর্থ; এইজন্যেই আমরা এত শক্তি নিয়ে এত বড়ো জগতে জন্মেছি— আমরা ছোটো-খাটো এটা-ওটা-সেটা নিয়ে ভেবে কেঁদে মরতে আসি নি। ইতি ৪ আশ্বিন ১৩২৫

১৯

শান্তিনিকেতন

তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ 'রবিদাদা' না বলে আমাকে আর একটা কোনো নামে সম্ভাষণ করতে পার কি না। মহাভারতের সময়ে মানুষের এক-একজনের দশ-বিশটা করে নাম থাকত, যার যেটা পছন্দ বেছে নিতে পারত। কিংবা যে-ছন্দে যেটা মেলাবার সুবিধে, লাগিয়ে দিত। অর্জুনের কত নাম যে ছিল, তা অর্জুনকে রোজ বোধ হয় নামতা মুখস্থ করার মতো মুখস্থ করতে হত। আমার যে আকাশের মিতাটি আছেন, তাঁরও নামের অভাব নেই। যদি তাঁর দুটো-একটা নাম ধার করে নিতে চাও, তা হলে বোধ হয় তাঁর বিশেষ কিছু লোকসান হবে না। কিন্তু যখন নামকরণ করবে, তখন

আমার সম্মতি নিলে ভালো হয়। প্রথম যখন আমার নামকরণ হয়, তখন কেউ আমার সম্মতি নেয় নি, তবু দেখতে পাচ্ছি নামটা মন্দ হয় নি—কিন্তু হঠাৎ যদি তোমার মার্তণ্ড নামটাই পছন্দ হয়, তা হলে কিন্তু আমি আপত্তি করব। 'ভানু' নামটা যদিচ খুব সুশ্রাব্য নয়, তবু ওটা আমি একবার নিজেই গ্রহণ করেছিলুম। আর এক হতে পারে, যদি 'কবিদাদা' বল। নামটা ঠিক সংগত হোক বা না হোক ওটা আমার নিজের কাজের সঙ্গে মেলে—

এক-যে ছিল রবি,
সে গুণের মধ্যে কবি।

কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, 'প্রিয় কবিদাদা' বললে চলবে না। প্রথম কারণ হচ্ছে এই যে, তোমার প্রিয় কবি-যে কে, তা আমি ঠিক জানি নে। খুব সম্ভব যে-লোকটা সেই আশ্চর্য হিন্দী দোঁহা লিখেছিল সেই হবে। তার সঙ্গে ছ-অক্ষরের অনুপ্রাসে আমি যে কোনো দিন পাল্লা দিতে পারব, এমন শক্তি বা আশা আমার নেই। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, ইংরেজিতে 'প্রিয়' বলে না এমন মানুষই নেই; সে অমানুষ হলেও তাকে বলে—এমন-কি সে যদি দোঁহা না লিখতে পারে তবুও। আমার মত হচ্ছে এই যে, রাস্তাঘাটের সবাইকেই যদি 'প্রিয়' বলতে হবে এমন নিয়ম থাকে, তবে দুই-এক জায়গায় সে নিয়মটা বাদ দেওয়া দরকার। অতএব আমাকে যদি শুধু 'রবিদাদা' বল, তা হলে আমি বারণ করব না। এমন-কি, যদি তোমার মার্তণ্ড নামটাই পছন্দ হয় তা হলে 'প্রিয় মার্তণ্ড দাদা' লিখো না। তা হলে বরঞ্চ লিখো, 'মার্তণ্ডদাদা, প্রচণ্ড প্রতাপেষু।' যদি কোনো দিন তোমার সঙ্গে রাগারাগি করি তা হলে ঐ নামে ডাকলেই হবে।

আমাদের আশ্রমের আকাশে শারদোৎসব আরম্ভ হয়েছে—শিউলিবন সাড়া দিয়েছে, মালতী-লতার পাতায় পাতায় শুভ্রফুলের অসংখ্য অনুপ্রাস, কিন্তু রাত্রে চাঁদের আলোয় আকাশ-জোড়া একখানি মাত্র শুভ্রতা। আমাদের লাল রাস্তার দুই ধারে কাশের গুচ্ছ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে বাতাসে মাথা নত করে করে পথিকদের শারদ-সংগীত শুনিয়ে দিচ্ছে। সমস্ত সবুজ মাঠে, সমস্ত শিশির-সিক্ত বাতাসে উৎসবের আনন্দ-হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। অন্তরে বাইরে ছুটি ছুটি ছুটি—এই রব উঠেছে। ছুটিরও আর কেবল দুই সপ্তাহ বাকি আছে। আমাদের যখন ছুটি আরম্ভ, তখন তোমাদের শৈল-প্রবাস বোধ হয় সাঙ্গ হবে। পার্বতী যখন হিমালয়ে তাঁর পিতৃভবনে যাবেন তখন তোমরা তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সেখানে থাকবে না। কিন্তু হিমালয়ের খবর আমরা রাখি নে, কৈলাসের তো নয়ই; আমরা তো এই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, স্বর্ণকিরণচ্ছটায় শারদা আমাদেরই ঘর উজ্জ্বল করে দাঁড়িয়েছেন। গোটাকতক মেঘ দিগন্তের কোণে মাঝে মাঝে জটলা করে; কিন্তু তাদের নন্দী-ভৃঙ্গীর মতো কালো চেহারা নয়, তারাও শ্বেতকিরণের মালা পরেছে, শ্বেত চন্দনের ছাপ লাগিয়েছে—ললাটে ভ্রূকুটির লেশ নেই। ইতি ৬ আশ্বিন ১৩২৫

২০

শান্তিনিকেতন

প্রথম যখন তোমার চিঠি পেয়েছিলুম, তোমার চিঠিতে 'প্রিয় রবিবাবু' পড়ে ভারি মজা লেগেছিল। ভাবলুম রবিবাবু আবার 'প্রিয়' হবে কেমন করে? যদি হত 'প্রিয় মিস্টার ট্যাগোর' তা হলে তেমন বেমানান হত না; কেননা রবিবাবু প্রিয়ও হতে পারে, অপ্রিয়ও হতে পারে। এবং প্রিয় অপ্রিয় দুইয়ের বাহিরও হতে পারে। তুমি যখন চিঠি লিখেছিলে, তখন রবিবাবু প্রিয়ও ছিল না, অপ্রিয়ও ছিল না, নিতান্ত কেবলমাত্র রবিবাবুই ছিল। কিন্তু চিঠির ভাষায় মিস্টার ট্যাগোরের 'প্রিয়' ছাড়া আর কিছু হবার জো নেই, তা আমার সঙ্গে তোমার ঝগড়াই থাক্ আর ভাবই থাক্। আজকাল

রবিবাবু পরীক্ষায় একেবারে দু-তিন ক্লাস উঠে 'রবিদাদা' হয়েছে কিন্তু যদি 'প্রিয় রবিদাদা' লেখ, তবে তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হবে। আর যদি বিশুদ্ধ বাংলা মতে 'প্রিয়' লেখা হয়, তা হলে আপত্তি নেই বটে, তবু যখন আমি 'রবিদাদা' তখন ওটা বাদ দিলেও চলে—ও যেন সকালবেলায় বাতি জ্বালানো—যেন যার ফাঁসি হয়েছে, তাকে কুড়ি বৎসর দ্বীপান্তর দেওয়া। অতএব আমি যেন থানধুতি-পরা ঠাকুরদাদা, আমার কোনো পাড় নেই, আমি নিতান্তই যেন সাদা 'রবিদাদা', কী বলো।

তোমরা মুক্তেশ্বরে গেছ শুনে সুখী হলুম। আমি ভ্রমণ করতে ভালোবাসি, কিন্তু ভ্রমণের কল্পনা করতে আমার আরও ভালো লাগে। কেননা, কল্পনার বেলায় রেলগাড়ি ঘটর ঘটর করে না, বেরেলিতে তিন-চার ঘণ্টা বসে থাকতে হয় না, ডাণ্ডি অতি অনায়াসে এবং ঠিক সময়েই মেলে। তুমি তোমার নবীন দৃষ্টি নিয়ে নতুন নতুন দৃশ্য দেখছ, তোমার সেই আনন্দ আমি মনে মনে অনুভব করছি। আমি আমার এই খোলা ছাদে লম্বা কেদারায় শুয়ে শুয়ে, গিরিতটে তোমার দেবদারুবনে ভ্রমণের সুখ মনে মনে সঞ্চয় করি। আমিও প্রায় তোমার বয়সেই হিমালয়ে গিয়েছিলুম—ড্যাল্‌হৌসিতে বক্রোটা শিখরের উপরে থাকতুম। এক-একদিন আমাদের বাড়ির খানিক নীচে এক দেবদারুবনে সকালে একলা বেড়াতে যেতুম। আমি ছিলুম ছোট্ট (তখন লম্বায় ছ-ফুট ছিলাম না), তাই গাছগুলোকে এত প্রকাণ্ড বড়ো মনে হত—সে আর কী বলব। সেই-সব গাছের সুদীর্ঘ ছায়ার মধ্যে নিজেকে দৈত্যলোকের অতি ক্ষুদ্র এক অতিথি বলে মনে হত। কিন্তু সেই আমার ছেলেবেলাকার পর্বত, ছেলেবেলাকার বন এখন আর পাব কোথায়? এখন আমার মনটা এই জগতের পথে এত নিজের সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে চলে যে, নিজের চলার ধুলোয় এবং নিজের রথের ছায়ায় জগৎটা বারো-আনা ঢাকা পড়ে যায়—বাজে ভাবনার ঝোঁকের মধ্য দিয়ে জগৎটাকে আর তেমন করে দেখা যায় না। তাই আজ তুমি যে-পাহাড়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ, মনে হচ্ছে সে আমার সেই অল্প বয়সের পৃথিবীর পাহাড়, আমার সেই ৪৫/৪৬ বৎসরের আগেকার। আমরা পুরানো হয়ে উঠে নিজের হাজার রকম চিন্তায় এই পৃথিবীটাকে যতই জীর্ণ করে দিই-না কেন, মানুষ আবার ছেলেমানুষ হয়ে, নূতন হয়ে, চিরনূতন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। শুধু একদল মানুষ যদি চিরকালই বৃদ্ধ হতে হতে পৃথিবীতে বাস করত, তা হলে বিধাতার এই পৃথিবী তাদের নস্যে, তামাকের ধোঁয়ায়, তাদের পাকা বুদ্ধির আওতায়, একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যেত, স্বয়ং বিধাতা তাঁর নিজের সৃষ্টি ঐ পৃথিবীকে চিনতে পারতেন না। কিন্তু জগতে শিশুর ধারা কেবলই আসছে। নবীন চোখ, নবীন স্পর্শ, নবীন আনন্দ ফিরে ফিরে মানুষের ঘরে অবতীর্ণ হচ্ছে। তাই প্রাচীনদের অসাড়তার আবর্জনা দিনে-দিনে, বারে-বারে, ধুয়ে-মুছে পৃথিবীর চিররহস্যময় নবীন রূপকে উজ্জ্বল করে রাখছে। অন্য মানুষের সঙ্গে কবিদের তফাত কী জান? বিধাতার নিজের হাতে তৈরি শৈশব কবিদের মন থেকে কিছুতে ঘোচে না। কোনোদিন তাদের চোখ বুড়ো হয় না, মন বুড়ো হয় না। তাই চিরনবীন এই পৃথিবীর সঙ্গে তাদের চিরদিনের বন্ধুত্ব থেকে যায়, তাই চিরদিনই তারা ছোটোদের সমবয়সী হয়ে থাকে। সংসারে বিষয়ের মধ্যে যারা বুড়ো হয়ে গেছে, তারা চন্দ্রসূর্যগ্রহ-তারার চেয়ে বয়সে বড়ো হয়ে ওঠে, তারা হিমালয়ের চেয়ে বড়োবয়সের। কিন্তু কবিরা সূর্য, চন্দ্র, তারার ন্যায় চিরদিনই কাঁচাবয়সী—হিমালয়ের মতোই তারা সবুজ থাকে, ছেলে-মানুষির ঝরনাধারা কোনোদিনই তাদের শুকোয় না; লোকালয়ে বিশ্বজগতের নবীনতার বার্তা এবং সংগীত চিরদিন তাজা রাখবার জন্যেই কবিদের দরকার—নইলে তারা আর সকল বিষয়েই অদরকারি।

উচ্চ-হাসে সকৌতুকে চির-প্রাচীন গিরির বুকে
ঝরে পড়ে চির-নূতন ঝরনা;
নৃত্য করে তালে তালে প্রাচীন বটের ডালে ডালে
নবীন পাতা ঘন-শ্যামল-বর্ণা।

পুরানো সেই শিবের প্রেমে নূতন হয়ে এল নেমে
দক্ষসুতা ধরি' উমার অঙ্গ,
এম্‌নি করে সারাবেলা চল্‌ছে লুকোচুরি খেলা
নূতন-পুরাতনের চিররঙ্গ।

ইতি ১৪ আশ্বিন ১৩২৫

২১

শান্তিনিকেতন

আচ্ছা বেশ, রাজি। ভানুদাদা নামই বহাল হল। এ নামে আজ পর্যন্ত আমাকে কেউ ডাকে নি, আর কেউ যদি ডাকে তবে তার উত্তর দেব না। সিন্ডারেলার গল্প জান তো? তার একপাটি জুতো নিয়ে রাজার ছেলে পা মেপে বেড়াতে লাগল। আমার ভানু নামটা সেইরকম একপাটি; যদি কেউ ব্যবহার করতে যায়, আমি তখন বলতে পারব— আচ্ছা, আগে নিজের নামের পাটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। যার নাম সুরবালা, সে বলবে সুরো সুরু সুরি— কিছুতেই ভানুর সঙ্গে মিলবে না; যার নাম মার্তঙ্গিনী সে বলবে মাতু, মাতি, মাতো— কিছুতেই মিলবে না; তিনকড়িরও সেই দশা, কাত্যায়নীরও তাই; জগদম্বা, পীতাম্বরী, গুরুদাসী, শঙ্খেশ্বরী, নগেন্দ্রমোহিনী, কারওই কাছে ঘেঁষবার জো নেই। ভারি সুবিধে হয়েছে। কেবল আমার মনে ভারি ভয় রয়ে গেল, পাছে কারও নাম থাকে 'কানু বিলাসিনী'। তবে তাকে কী বলে ঠেকাব? তুমি ভেবে রেখে দিয়ো।

ছুটির দিন এল— পরশু ছুটি, তার পরে কী করব? তখন কেবল শিউলিবন, শিশির-ভেজা ঘাস, আর দিগন্ত-প্রসারিত মাঠ আমার মুখ তাকিয়ে থাকবে। তারা তো আমার কাছে ইংরেজি শিখতে চায় না— তারা চায় আমার মনের মধ্যে যে আনন্দের সোনার কাঠি আছে সেইটে ছুঁইয়ে দিয়ে তাদের জাগিয়ে তুলব এবং আমার চেতনার সঙ্গে তাদের সৌন্দর্যকে মিলিয়ে দেব। আমার জাগরণের ছোঁয়াচ না লাগলে পরে প্রকৃতি জাগবে কী করে? নীলাকাশের কিরণ-কমলের উপরে শারদলক্ষ্মী আসন গ্রহণ করেন, কিন্তু আমার আনন্দ-দৃষ্টি না পড়লে পরে সে-পদ্মই ফোটে না।

আজ বুধবার। আজ মন্দিরে ছুটির ঠাকুরের কথা বলেছি। যখন আমরা কাজ করতে থাকি, তখন শক্তির সমুদ্র থেকে আমাদের মধ্যে জোয়ার আসে, তখন আমরা মনে করি এ শক্তি আমারই এবং এই শক্তির জোরেই আমরা বিশ্বজয় করব। কিন্তু শক্তিকে বরাবর খাটাতে তো পারি নে— সন্ধ্যা যখন আসে তখন তো কাজ বন্ধ হয়, তখন তো আর গাণ্ডীব তুলতে পারি নে। তাই জোয়ার-ভাঁটার ছন্দকে জীবের মেনে চলা চাই। একবার আমি, একবার তুমি। সেই তুমিকে বাদ দিয়ে যখন মনে করি আমিই কর্তা, তখনই জগতে মারামারি বেধে যায়— রক্তে ধরণী পঙ্কিল হয়ে ওঠে। মা তাঁর মেয়েকে ডেকে বলেন, সংসারের কাজে তুমি আমার সঙ্গে লেগে যাও, মেয়ে তখন কোমর বেঁধে লাগে, কিন্তু সে যখন ভুলে যায় যে, এই কাজ তার মায়ের সংসারেরই কাজ, যখন অহংকার করে ভাবে 'আমি যেমন ইচ্ছা তাই করব' তখন সে সংসারের ব্যবস্থাকে উলট্‌পালট্‌ করে জঞ্জাল জমিয়ে তোলে— অবশেষে এমন হয় যে, মা ঝাঁটা হাতে নিয়ে সমস্ত আবর্জনা ঝেঁটিয়ে ফেলেন। মেয়ের সেই কাজটুকুর উপরে ঝাঁটা পড়ে না— যখন সে কাজ মায়ের সংসার-ব্যবস্থার সঙ্গে মেলে। সংসার-স্থিতির সঙ্গে এই যে মিলিয়ে কাজ করা, এতে আমাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে— অর্থাৎ মিল রেখেও আমরা তার মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্য রাখতে পারি— তাতেই সৃষ্টির বৈচিত্র্য। মেয়ের হাতের কাজটুকু মায়ের অভিপ্রায়কে প্রকাশ করেও নিজেকে বিশিষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারে। যখন তাই সে করে তখন তার সেই সৃষ্টি মায়ের সৃষ্টির সঙ্গে মিলে স্থিতি লাভ করে। বিশ্বকর্মার

কাজে আমরা যখন যোগ দিই তখন যে-পরিমাণে তাঁর সঙ্গে মিল রেখে, ছন্দ রেখে চলি সেই পরিমাণে আমাদের কাজ অক্ষয়কীর্তি হয়ে ওঠে, যে-পরিমাণে বাধা দিই সেই পরিমাণে আমরা প্রলয়কে ডেকে আনি। নিজের জীবনকে এই প্রলয় থেকে যদি বাঁচাতে চাই তা হলে প্রতিদিনই আমি-তুমির ছন্দ মিলিয়ে চলতে হবে—সেই ছন্দেই মানুষের সৃষ্টি, মানুষের ইতিহাস অমরতা লাভ করে। দেখছ তো, মা আজ পশ্চিমের ঘরে কী রকম প্রলয়ের সম্মার্জনী নিয়ে বেরিয়েছেন। পশ্চিমের সভ্যতা মনে করছিল, তার শক্তি তার নিজেরই ভোগ নিজেরই সমৃদ্ধির জন্যে। সে আমি-তুমির ছন্দকে একেবারে মানে নি। কিছু দূর পর্যন্ত সে বেড়ে উঠল। মনে করল সে বেড়েই চলবে—এমন সময়ে ছন্দের অমিল ঘোচাবার জন্যে হঠাৎ এক মুহূর্তেই মায়ের প্রলয় অনুচর এসে হাজির। এখন কান্না, আর বক্ষে করাঘাত। ইতি ১৬ আশ্বিন ১৩২৫

২২

শান্তিনিকেতন

মাদ্রাজের দিকে যেদিন যাত্রা করেছিলুম সেদিন শনিবার এবং সপ্তমী, অন্যান্য অধিকাংশ বিদ্যারই মতো দিনক্ষণের বিদ্যা আমার জানা নেই। বলতে পারি নে আমার যাত্রার সময় লক্ষকোটি যোজন দূরে গ্রহনক্ষত্রের বিরাট সভায় আমার এই ক্ষুদ্র মাদ্রাজ ভ্রমণ সম্বন্ধে কী রকম আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু তার ফলের থেকে বোঝা যাচ্ছে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে ঘোরতর মতভেদ হয়েছিল। সেইজন্যে আমার ভ্রমণ-পথের হাজার মাইলের মধ্যে ছশো মাইল পর্যন্ত আমি সবেগে সগর্বে এগোতে পেরেছিলুম। কিন্তু বিরুদ্ধ জ্যোতিষ্কের দল কোমর বেঁধে এমনি অ্যাজিটেশন করতে লাগল যে, বাকি চারশো মাইলটুকু আর পেরোতে পারা গেল না। জ্যোতিষ্ক-সভায় কেবলমাত্র আমারই যাত্রা সম্বন্ধেই যে বিচার হয়েছিল তা নয়—বেঙ্গল-নাগপুর রেলোয়ে লাইনের যে এঞ্জিনটা আমার গাড়ি টেনে নিয়ে যাবে—মঙ্গল শনি এবং অন্যান্য ঝগড়াটে গ্রহেরা তার সম্বন্ধেও প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করেছিল—যদি বল সে সভায় তো আমাদের খবরের কাগজের কোনো রিপোর্টার উপস্থিত ছিল না তবে আমি খবর পেলুম কোথা থেকে, তবে তার উত্তর হচ্ছে এই যে, আইন-কর্তারা তাঁদের মন্ত্রণা-সভায় কী আইন পাস করেছেন তা তাঁদের পেয়াদার গুঁতো খেলেই সব চেয়ে পরিষ্কার বোঝা যায়। যে মুহূর্তে হাওড়া স্টেশনে আমার রেলের এঞ্জিন বাঁশি বাজালে, সে-বাঁশির আওয়াজে কত তেজ, কত দর্প! আর রবীন্দ্রনাথ ওরফে ভানুদাদা নামক যে ব্যক্তি তোরঙ্গ বাক্স ব্যাগ বিছানা গাড়িতে বোঝাই করে তার তক্তর উপরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে ইলেকট্রিক পাখার চলচ্চক্র-গুঞ্জন-মুখর রথকক্ষে একাধিপত্য বিস্তার করলেন, তারই বা কত আশ্বস্ততা! তার পরে কত গড় গড়, খড় খড়, ঝর ঝর, ভোঁ ভোঁ, ঢং ঢং; স্টেশনে স্টেশনে কত হাঁকডাক, হাঁসফাঁস, হন্ হন্, হট্ হট্; আমাদের গাড়ির দক্ষিণে বামে কত মাঠ বাট বন জঙ্গল নদী নালা গ্রাম শহর মন্দির মসজিদ কুটীর ইমারত—যেন বাঘে-তাড়া-করা গোরুর পালের মতো ঊর্ধ্বশ্বাসে আমাদের বিপরীত দিকে ছুটে পালাতে লাগল। এমনিভাবে চলতে চলতে যখন পিঠাপুরমে পৌঁছতে মাঝে কেবল একটা স্টেশন মাত্র আছে, এমন সময় এঞ্জিনটার উপরে নক্ষত্র-সভার অদৃশ্য পেয়াদা তার অদৃশ্য পরোয়ানা হাতে নিয়ে নেবে পড়ল, আর অমনি কোথায় গেল তার চাকার ঘুরনি, তার বাঁশির ডাক, তার ধূমোদ্গার, তার পাথুরে কয়লার ভোজ! পাঁচ মিনিট যায়, দশ মিনিট যায়, বিশ মিনিট যায়, এক ঘণ্টা যায়, স্টেশন থেকে গাড়ি আর নড়েই না। সাড়ে পাঁচটায় পিঠাপুরমে পৌঁছবার কথা কিন্তু সাড়ে ছটা, সাড়ে সাতটা বাজে তবু এমনি সমস্ত স্থির হয়ে রইল যে, 'চরাচরমিদং সর্বং' যে চঞ্চল, এ কথাটা মিথ্যা বলে বোধ হল। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ধক্ ধক্

ধক্ ধক্ করতে করতে আর একটা এঞ্জিন এসে হাজির। তার পরে রাত্রি সাড়ে আটটার সময় আমি যখন পিঠাপুরমে রাজবাড়িতে গিয়ে উঠলুম তখন আমার মনের অবস্থাটা দেখি ঠিক সেই এঞ্জিনেরই মতো। মনকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কেমন হে, মাদ্রাজে যাচ্ছ তো? সেখান থেকে কাঞ্চি মদ্র অন্ধ্র পৌণ্ড্র প্রভৃতি কত দেশ দেশান্তর দেখবার আছে; কত মন্দির, কত গুহা, কত তীর্থ ইত্যাদি ইত্যাদি'—আমার মন সেই এঞ্জিনটার মতো চুপ করে গম্ভীর হয়ে রইল, সাড়াই দেয় না। স্পষ্ট বোঝা গেল, দক্ষিণের দিকে সে আর এক পাও বাড়াবে না। মনের সঙ্গে বেঙ্গল-নাগপুরের এঞ্জিনের একটা মস্ত প্রভেদ এই যে, এঞ্জিন বিগড়ে গেলে আর একটা এঞ্জিন টেলিফোন করে আনিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু মন বিগড়োলে সুবিধামত আর একটা মন পাই কোথা থেকে। সুতরাং মাদ্রাজ চারশো মাইল দূরে পড়ে রইল আর আমি গতকল্য শনিবার মধ্যাহ্নে সেই হাবড়ায় ফিরে এলুম। যে শনিবার একদা তার কৌতুকহাস্য গোপন করে আমাকে মাদ্রাজের গাড়িতে চড়িয়ে দিয়েছিল সেই শনিবারই আর একদিন আমাকে হাওড়ায় নামিয়ে দিয়ে তার নিঃশব্দ অট্টহাস্যে মধ্যাহ্ন আকাশ প্রতপ্ত করে তুললে। এই তো গেল আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। কিন্তু তুমি যখন হিমালয়-যাত্রায় বেরিয়েছিলে তখন নক্ষত্র-সভায় তোমার সম্বন্ধেও তো ভালো রেজোল্যুশন্ পাস হয় নি। আমরা সবাই স্থির করলুম, গিরিরাজের শুশ্রূষায় তুমি সেরে আসবে। কিন্তু তারাগুলো কেন কুমন্ত্রণা করতে লাগল। আমার বিশ্বাস কী জান, অনেকগুলো ঈর্ষ্যাপরায়ণ তারা আছে, তা'রা তোমার ভানুদাদাকে একেবারেই পছন্দ করে না। প্রথমত, আমার নামটাই তাদের অসহ্য বোধ হয় এইজন্যে বদনাম করবার সুবিধা পেলে ছাড়ে না। তার পরে দেখেছে আমার সঙ্গে আকাশের মিতার খুব ভাব আছে সেইজন্যে নক্ষত্রগুলো আমাকে তাদের শত্রুপক্ষ বলে ঠিক করেছে। যাই হোক, আমি ওদের কাছে হার মানবার ছেলে নই। ওরা যা করবার করুক, আমি দিনের আলোর দলে রইলুম। তোমাকে কিন্তু কুচক্রী নক্ষত্রগুলোর উপরে টেক্কা দিতে হবে। বেশ শরীরটাকে সেরে নিয়ে, মনটাকে প্রফুল্ল করে হৃদয়টাকে শান্ত করো, জীবনটাকে পূর্ণ করো। তার পরে লক্ষ্যকে ঊর্ধ্বে রেখে অপরাজিত চিত্তে সংসারের সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে চলে যাও—কল্যাণ লাভ করো এবং কল্যাণ দান করো। নিজের বাসনাকে উদ্দাম করে না তুলে মঙ্গলময়ের শুভ ইচ্ছাকে নিজের অন্তরে বাহিরে সার্থক করো। ইতি ২০ অক্টোবর ১৯১৮

২৩

শান্তিনিকেতন

আমার ভ্রমণ শেষ হল। যেখান থেকে যাত্রা আরম্ভ করেছিলুম সেইখানেই আবার এসে ফিরেছি। সকলেই পরামর্শ দিয়ে থাকে, ছুটি পেলেই স্থান এবং বায়ু পরিবর্তন করা দরকার কিন্তু দেখা গেল সেটা যে অনাবশ্যক এবং ক্লেশকর—সেইটে ভালো করে বুঝে দেখবার জন্যেই কেবল পরিবর্তনের দরকার। আসল দরকার, যেখানে আছি সেইখানেই মনটাকে সম্পূর্ণ এবং সচেতন ভাবে ঢেলে দেওয়া। এই যে মাঠ আমার চোখে পড়ছে এর কি দেখবার যোগ্য রস ফুরিয়ে গেছে। আর এই যে শিশিরার্দ্র সকালবেলাটি তার কিরণদলের মাঝখানে আমার মনকে মধুপানরত স্তব্ধ ভ্রমরের মতো স্থান দিয়েছে, এ কি কোনোকালে এর বৃন্ত থেকে ঝরে পড়বে। আসল কথা, মনটা অসাড় হলেই তাকে সাড়া দেবার জন্যে নাড়া দিতে হয়। তাই আমাদের সাধনা হওয়া উচিত, কী করলে আমাদের মন অসাড় না হয় তা হলেই নিজের মধ্যে নিজের সম্পদ লাভ করতে পারি, কেবলই বাইরের জন্যে ছটফট করতে হয় না। আমাদের যা-কিছু সব চেয়ে বড়ো সম্পদ, সব চেয়ে বড়ো আনন্দ—তার ভাণ্ডার যদি বাইরে থাকে তা হলে আমাদের ভারি মুশকিল, কেননা বাইরের পথে বাধা ঘটবেই, বাইরের দরজা মাঝে মাঝে বন্ধ হবেই। বাইরের কাছে থেকে ভিক্ষা চাওয়ার

অভ্যাস আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের ইচ্ছা বাইরের দিকে বাধা পেলেও আমরা যেন অন্তরের মধ্যে পূর্ণতা অনুভব করে শান্তি পেতে পারি। নইলে, নিজেও অশান্ত হই— চারি দিককেও অশান্ত করে তুলি। এই সংসার থেকে যে-প্রীতি যে-কল্যাণ আমরা অন্তরের মধ্যে পেয়েছি সেই আমাদের অন্তরতম লাভের জন্যে যেন আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ হই। বাইরের দিকে যে-কিছু জিনিস পাই নি, সেদিক থেকে যা-কিছু বাধা আসছে, তারই ফর্দটাকে লম্বা করে তুলে যদি খুঁতখুঁত করি, ছটফট করতে থাকি তা হলে অকৃতজ্ঞতা হয় এবং সেই চঞ্চলতা নিতান্তই বৃথা নিজের অন্তর-বাহিরকে আবৃত করে মাত্র। স্থির হব, প্রশান্ত হব, মনকে প্রসন্ন রাখব তা হলেই আমাদের মন এমন একটি স্বচ্ছ আকাশে বাস করবে যাতে করে অমৃতলোক থেকে আনন্দ-জ্যোতি আমাদের মনকে স্পর্শ করতে বাধা পাবে না। তোমার প্রতি তোমার ভানুদাদার এই আশীর্বাদ যে, তুমি আপনার ইচ্ছাকে একান্ত তীব্র করে চিত্তকে কাঙালবৃত্তিতে দীক্ষিত কোরো না— বিধাতার কাছ থেকে যা-কিছু দান পেয়েছ তাকে অন্তরের মধ্যে নম্রভাবে গ্রহণ এবং অবিচলিতভাবে রক্ষা কোরো। শান্তি হচ্ছে সত্য উপলব্ধি করবার সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা— সংসারের অনিবার্য আঘাতে ব্যাঘাতে, ইচ্ছার অনিবার্য নিষ্ফলতায় সেই সুস্নিগ্ধ শান্তি যেন তোমার মধ্যে বিক্ষুব্ধ না হয়। ইতি ১০ কার্তিক ১৩২৫

২৪

শান্তিনিকেতন

এতক্ষণ তুমি রেলগাড়িতে ধক্ ধক্ করতে করতে চলেছ, কত স্টেশন পার হয়ে চলে গিয়েছ— আমাদের এই লাল মাটির, এই তালগাছের দেশ হয়তো ছাড়িয়ে গেছ বা। আমার পূবদিকের দরজার সামনে সেই মাঠে রৌদ্র ধু ধু করছে এবং সেই রৌদ্রে নানা রঙের গোরুর পাল চরে বেড়াচ্ছে। এক-একটা তালগাছ তাদের ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে পাগলার মতো দাঁড়িয়ে আছে। আজ দিনে আমার সেই বড়ো চৌকিতে বসা হল না— খাওয়ার পর অ্যান্ডরুজ্ সাহেব এসে আমার সঙ্গে বিদ্যালয়ের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনা করলেন তাতে অনেকটা সময় চলে গেল। তার পরে নগেনবাবু-নামক এখানকার একজন মাস্টার তাঁর এক মস্ত তর্জমা নিয়ে আমার কাছে সংশোধন করবার জন্যে আনলেন, তাতেও অনেকটা সময় চলে গেল। সুতরাং বেলা তিনটে বেজে গেছে তবু আমি আমার সেই ডেস্কে বসে আছি। বই কাগজ খাতা দোয়াত কলম ওষুধের শিশি এবং অন্য হাজার রকম জবড়জং জিনিসে আমার ডেস্ক পরিপূর্ণ। তার মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা আছে, যা এখনই টেনে ফেলে দিলেই চলে; কিন্তু কুঁড়ে মানুষের মুশকিল এই যে, আবশ্যকের জিনিস সে খুঁজে পায় না আর অনাবশ্যক জিনিস না খুঁজলেও তার সঙ্গে লেগেই থাকে। এমন অনেক ছেঁড়া লেফাফা কাগজ চাপা দিয়ে জমানো রয়েছে যার ভিতরকার চিঠিরই কোনো উদ্দেশ পাওয়া যায় না। মনে আছে, আমাকে তোমার রূপকথা পাঠিয়ে দিতে হবে সেই অলাবুনন্দিনীর 'কাহিনী' আর সেই 'চম্‌কিলা' 'সোনেকিতরহ' চুলওয়ালী রাজকুমারীর কথা। তা ছাড়া, আর একটি কথা মনে রাখতে হবে, মন খারাপ কোরো না— লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে প্রসন্ন হাসি হেসে ঘর উজ্জ্বল করে থাকবে। সকলেই বলবে, তুমি এমন সোনেকিতরহ হাসি পেয়েছ কোন্ পারিজাতের গন্ধ থেকে, কোন্ নন্দন-বীণার ঝংকার থেকে, কোন্ প্রভাত-তারার আলোক থেকে, কোন্ সুর-সুন্দরীর সুখস্বপ্ন থেকে, কোন্ মন্দাকিনীর চলোর্মিকল্লোল থেকে, কোন্— কিন্তু আর দরকার নেই, এখনকার মতো এই ক-টাতেই চলে যাবে— কেননা কাগজ ফুরিয়ে এসেছে, দিনও অবসন্ন-প্রায়, অপরাহ্নের ক্লান্ত রবির আলোক ম্লান হয়ে এসেছে। ২ অগ্রহায়ণ ১৩২৫

২৫

শান্তিনিকেতন

কাল তোমার চিঠি পেয়েছি, আমার চিঠিও নিশ্চয় তুমি পেয়েছ। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বেশ হাসিমুখে সেই বাংলা মহাভারত এবং চারুপাঠ পড়ছ। যে তোমাকে দেখছে, সেই মনে করছে—চারুপাঠের মধ্যে খুব মনোহর গল্প এবং তোমার শিশু-মহাভারতের মধ্যে খুব মজার কথা কিছু বুঝি আছে। কিন্তু তারা জানে না, প্রায় দুশো ক্রোশ তফাত থেকে ভানুদাদা তোমাকে খুশি পাঠিয়ে দিচ্ছে—এত খুশি যে কার সাধ্য তোমাকে বিরক্ত করে বা রাগায় বা দুঃখ দেয়। আমি প্রায় সন্ধ্যাবেলায় সেই যে গান গাই—'বীণা বাজাও মম অন্তরে' সেই গানটি তোমার মনের মধ্যে বরাবরকার মতো স্বরলিপি করে লিখে রেখে দেবার ইচ্ছা আছে—মনটি গানের সুরে এম্নি বোঝাই হয়ে থাকবে যে, বাহিরের তুফানে তোমাকে নাড়া দিতে পারবে না। শুধু তোমাকে বলছি নে, আমারও ভারি ইচ্ছে, নিজের ভরা মনটির মাঝখানে বেশ নিবিষ্ট হয়ে বসে বাইরের সমস্ত যাওয়া-আসা কাঁদা-হাসার অনেক উপরে স্থির হয়ে থাকতে পারি। আপনার ভিতরে আপনার চেয়ে বড়ো কাউকে যদি ধরে রাখা যায় তা হলেই সেই ভিতরের গৌরবে বাহিরের ধাক্কাকে একটুও কেয়ার না করবার শক্তি আপনিই আসে। সেই ভিতরের ধনকে ভিতরে পেয়ে ভিতরে ধরে রাখবার জন্যেই আকাঙ্ক্ষা করছি। বাইরের কাছে যখনই কাঙালপনা করতে যাই তখনই সে পেয়ে বসে, তার আর দৌরাত্ম্যের অন্ত থাকে না—সে যতটুকু দেয় তার চেয়ে দাবি ঢের বেশি করে—সে এমন মহাজন যে, শতকরা পাঁচশো টাকা সুদ আদায় করতে চায়। সে শাইলক্, সামান্য টাকা দেয় কিন্তু ছুরি বসিয়ে রক্তে মাংসে তার শোধ নেবার দাবি করে। তাই ইচ্ছে করি, বাহিরটাকে ধার দেব কিন্তু ওর কাছ থেকে সিকি পয়সা ধার নেব না। এই আমার মতলবের কথাটা তোমার কাছে বলে রাখলুম। তোমার গণনামতে আমার যখন আটাশ বৎসর বয়স হবে ততদিনে যদি মতলব সিদ্ধি হয় তা হলে বেশ মজা হবে। এখানকার খবর সব ভালো, সাহেব গেছে বাঁকিপুরে; দিনু কমল এসেছে আমার ঘরের একতলায়, আমি সেই অনুবাদের কাজে ভূতের মতো খাটছি। কিন্তু ভূত যে খুব বেশি খাটে—এ অখ্যাতি তার কেন হল বলো দেখি। কথাটা সত্য হলে তো মরেও শান্তি নেই।

২৬

শান্তিনিকেতন

এখনও আমার কাজের ভিড় কিছুই কমে নি। সবাই মনে করে—আমি কবি মানুষ, দিনরাত্রি আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘের খেলা দেখি, হাওয়ার গান শুনি, চাঁদের আলোয় ডুব দিই, ফুলের গন্ধে মাতাল হই, পল্লব-মর্মরে থর থর করে কাঁপি, ভ্রমর-গুঞ্জনে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে যাই ইত্যাদি ইত্যাদি। এ-সব হল হিংসের কথা। তারা জাঁক করে বলতে চায় যে, তারা কবিতা লেখে না বটে কিন্তু হপ্তায় সাত দিন করে আফিসে যায়, আদালত করে, খবরের কাগজ চালায়, বক্তৃতা দেয়, ব্যাবসা করে, তারা এত বড়ো ভয়ংকর কাজের লোক! আফিসের ছুটি নিয়ে তারা একবার এসে দেখে যাক—আমি কাজ করি কি না। আচ্ছা, তারা খুব কাজ করতে পারে—আমি না হয় মেনে নিলুম, কিন্তু খুব কাজ না করতে পারে এমন শক্তি কি তাদের আছে। যেই তাদের হাতে কাজ না থাকে অমনি তারা হয় ঘুমোয়, নয় তাস খেলে, নয় মদ খায়, নয় পরের নিন্দে করে, কী করে যে সময় কাটাবে ভেবেই পায় না। আমার সুবিধা এই যে, যখন কাজ থাকে তখন রীতিমত কাজ করি, আবার যখন কাজ না থাকে তখন খুব কষে কাজ না করতে পারি—তার কাছে কোথায় লাগে

তোমার বাবার কমিটিমিটিং। যখন কাজ না-করার ভিড় পড়ে তখন তার চাপে আমাকে একেবারে রোগা করে দেয়। সম্প্রতি কিন্তু কাজ করাটাই আমার ঘাড়ে চেপেছে, তাই সেই নাটকটা আর এক অক্ষরও লিখতে পারি নি। এই গোলমালের মধ্যে যদি লিখতে যাই আর যদি তাতে গান বসাই তবে তার ছন্দ আর মিল অনেকটা তোমার শিশু-মহাভারতেরই মতো হয়ে উঠবে। চিঠিতে যে ছবি এঁকেছ—খুব ভালো হয়েছে। মেয়েটিকে দেখে বোধ হচ্ছে—ওর ইস্কুলে যাবার তাড়া নেই, ঘর-কন্নার কাজের ভিড়ও বেশি আছে বলে মনে হচ্ছে না; ওর চুলের সমস্ত কাঁটা রাস্তায় পড়ে গেছে, আর 'গহনা ওয়ছনা' 'চুনারি উনারি'র কোনো ঠিকানা নেই। 'কদু'র ভিতর থেকে যে 'দুলহীন' বেরিয়ে এসেছিল এ মেয়ে বোধ হয় সে নয়, এর নাম কী লিখে পাঠিয়ো। ইতি ৯ অগ্রহায়ণ ১৩২৫

২৭

শান্তিনিকেতন

আজকের তোমাকে সব খবরগুলি দেওয়া যাক। অনেক দিন পরে আজ আমার ইস্কুল খুলেছে, আজ থেকে ইস্কুলমাস্টারি ফের শুরু হল। আজ সকালে তিনটে ক্লাস নিয়েছি। কিন্তু ছেলেরা সব আসে নি, খুব কম এসেছে। বোধ হয়, ব্যামোর ভয়ে আসছে না। আমার বৌমা হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেছেন, জিজ্ঞাসা করেছ। তিনি পাড়াতেই আছেন। আমি যে ঘরে থাকি—তার সামনে এক লাল রাস্তা আছে, তার ঠিক ওধারেই এক দোতলা ইমারত তৈরি হচ্ছে—তারই একতলা ঘরে তিনি বাস করেন। শ্রীমতী তুলসীমঞ্জরী তাঁকে অচ্ছী অচ্ছী কাহিনী শুনাতী হৈ, কিন্তু আমি সেটা আন্দাজে বলছি। কিছুকাল থেকে তার কণ্ঠস্বরও শুনি নি, তাকে দেখতেও পাই নি—তাই আশঙ্কা হচ্ছে সে হয়তো তার সেই রূপকথার 'কদু'র মধ্যে ঢুকে পড়েছে। যাই হোক, পাড়ার সমস্ত খবর রাখবার সময় আমি পাই নে, আমি কখনও বা আমার সেই কোণের ডেস্কে, কখনও বা সেই লাইব্রেরি ঘরের টেবিলে ঘাড় হেঁট করে কলম চালিয়ে দিনযাপন করছি। সামনেকার খাতা-পত্রের বাইরে যে-একটি প্রকাণ্ড জগৎ আছে, তার প্রতি ভালো করে চোখ তুলে যে দেখা, সে আর দিনের আলো থাকতে ঘটে উঠছে না। সন্ধ্যার পরে সেই নীচের বারান্দায় খাবার টেবিলটা ঘিরেই বৈঠক হয়, সেখানে তর্ক হয় বিতর্ক হয় এবং মাঝে মাঝে গানও হয়ে থাকে। কারণ—আজকাল ফের আবার দুটি-একটি করে গান জমছে। সন্ধ্যার পরে সেই আমার কোণের বিছানায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে কেরোসিনের আলোয় মৃদুমন্দস্বরে খাতা-পেনসিল হাতে গান করি আর পশ্চিমের উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে—তুমি ভাবছ সেই বাতায়ন থেকে স্বর্গের অপ্সরীরা আমার গান শুনতে আসেন—ঠিক তা নয়—সেই উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে কীট-পতঙ্গ আসতে থাকে—তাও যদি তারা আমার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে আসত তা হলেও আমি মনে মনে একটু অহংকার করতে পারতুম—তারা আসে ঐ ডীট্জ্ লণ্ঠনের কেরোসিন আলোটা লক্ষ্য করে। উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে হঠাৎ এক-একবার—আন্দাজ করে বলো দেখি কী শুনতে পাই। তুমি ভাবছ, নক্ষত্রলোক থেকে অনাহত বীণার অশ্রুত গীত-ধ্বনি? তা নয়; এক সঙ্গে ভোঁদা, দানু, টম, রঞ্জু এবং এ মুল্লুকের যত দিশি কুকুরের তুমুল চীৎকার-শব্দ। যদি এরা আমার গান শুনে বাহবা দেবার জন্যে এই আওয়াজ করত তা হলেও বুঝতুম—কবির গানে চতুষ্পদ জন্তুরা পর্যন্ত মুগ্ধ—কিন্তু তা নয়, তারা স্বজাতি আগন্তুকের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে স্বর্গ-মর্ত্যকে চঞ্চল করে তোলে—কবির গানে তারা কর্ণপাতও করে না। যাই হোক, ভূতলের কুকুর থেকে আকাশের তারা পর্যন্ত সবাই যদিচ উদাসীন তবুও দুটো একটা করে গান জমছে। ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩২৫

২৮

শান্তিনিকেতন

আজ দুপুরবেলায় যখন খেতে বসেছি, এমন সময়—রোসো, আগে বলে নি কী খাচ্ছিলুম—খুব প্রকাণ্ড মোটা একটা রুটি—কিন্তু মনে কোরো না তার সবটাই আমি খাচ্ছিলুম। রুটিটাকে যদি পূর্ণিমার চাঁদ বলে ধরে নেও তা হলে আমার টুকরোটি দ্বিতীয়ার চাঁদের চেয়ে বড়ো হবে না। সেই রুটির সঙ্গে কিছু ডাল ছিল, আর ছিল চাটনি আর একটা তরকারিও ছিল। যা-হোক, বসে বসে রুটি চিবোচ্ছি, এমন সময়—রোসো, আগে বলে নিই রুটি, ডাল, চাটনি এল কোথা থেকে।—তুমি বোধ হয় জান, আমার এখানে প্রায় পঁচিশজন গুজরাটি ছেলে আছে—আমাকে খাওয়াবে বলে তাদের হঠাৎ ইচ্ছা হয়েছিল। তাই আজ সকালে আমার লেখা সেরে স্নানের ঘরের দিকে যখন চলেছি, এমন সময় দেখি, একটি গুজরাটি ছেলে থালা হাতে করে আমার দ্বারে এসে হাজির। যা হোক, নীচের ঘরে টেবিলে বসে বসে রুটির টুকরো ভাঙছি আর খাচ্ছি, আর তার সঙ্গে একটু একটু চাটনিও মুখে দিচ্ছি, এমন সময়—রোসো, আগে বলে নিই, খাবার কী রকম হয়েছিল। রুটিটা বেশ শক্ত-গোছের ছিল; যদি আমাকে সম্পূর্ণ চিবিয়ে সবটা খেতে হত তা হলে আমার একলার শক্তিতে কুলিয়ে উঠত না, মজুর ডাকতে হত। কিন্তু ছিঁড়তে যত শক্ত মুখের মধ্যে ততটা নয়। আবার রুটিটা মিষ্টি ছিল; ডাল তরকারি দিয়ে মিষ্টি রুটি খাওয়া আমাদের আইনে লেখে না, কিন্তু খেয়ে দেখা গেল যে, খেলে যে বিশেষ অপরাধ হয় তা নয়। সেই রুটি খাচ্ছি, এমন সময়—রোসো, ওর মধ্যে একটা কথা বলতে একেবারেই ভুলে গেছি, দুটো পাঁপড়-ভাজাও ছিল; সে-দুটো, আমি যাকে বলে থাকি সুশ্রাব্য—অর্থাৎ খেতে বেশ ভালো লাগে। শুনে তুমি হয়তো আশ্চর্য হবে এবং আমাকে হয়তো মনে মনে পেটুক ঠাউরে রেখে দেবে—এবং যখন আমি কাশীতে যাব তখন হয়তো সকালে বিকালে আমাকে চাটনি দিয়ে কেবলই পাঁপড়-ভাজা খাওয়াবে। তবু সত্য গোপন করব না, দুখানা পাঁপড়-ভাজা সম্পূর্ণই খেয়েছিলুম। যা হোক সেই পাঁপড় মচ মচ শব্দে খাচ্ছি, এমন সময়—রোসো, মনে করে দেখি সে সময়ে কে উপস্থিত ছিল। তুমি ভাবছ, তোমার বউমা তোমার ভানুদাদার পাঁপড়-ভাজা খাওয়া দেখে অবাক হয়ে হতবুদ্ধি হয়ে টেবিলের এক কোণে বসে মনে মনে ঠাকুর-দেবতার নাম করছিলেন, তা নয়—তিনি তখন কোথায় আমি জানি নে। আর কমল? সেও-যে তখন কোথায় বসে রোদ পোয়াচ্ছিল তা আমি জানি নে। তা হলে দেখছি টেবিলে আমি একলা ছাড়া কেউই ছিল না। যাই হোক দুখানা পাঁপড়-ভাজা পরে প্রায় সিকিটুকরো রুটির পৌনে চার-আনা যখন শেষ করেছি, এমন সময়—হাঁ, হাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি—আমি লিখেছি খাবার সময়ে কেউ ছিল না, কথাটা সত্য নয়। ভোঁদা কুকুরটা একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে লালায়িত জিহ্বায় চিন্তা করছিল যে, আমি যদি মানুষ হতুম তা হলে সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত ঐ রকম মুচ মুচ মুচ মুচ মুচ মুচ করে কেবলই পাঁপড়-ভাজা খেতুম; ইতিহাসও পড়তুম না, ভূগোলও পড়তুম না—শিশু-মহাভারত, চারুপাঠের কোনো ধার ধারতুম না। যা হোক যখন দুখানা পাঁপড়-ভাজা এবং কিছু রুটি ও চাটনি খেয়েছি, এমন সময়—কিন্তু ডালটা খাই নি, সেটা নারকোল দিয়ে এবং অনেকখানি কুয়োর জল দিয়ে তৈরি করেছিল তাতে ডালের চেয়ে কুয়োর জলের স্বাদটাই বেশি ছিল, আর তরকারিটাও খাই নি—কেননা, আমি মোটের উপর তরকারি প্রভৃতি বড়ো বেশি খাই নে। যাই হোক, যখন রুটি এবং পাঁপড়-ভাজা খাওয়া প্রায় শেষ হয়েছে, এমন সময়ে ডাক-হরকরা আমার হাতে কাশীর ছাপমারা একখানা চিঠি দিয়ে গেল।

২৯

শান্তিনিকেতন

দেরি করে তোমার চিঠির উত্তর দিয়েছি— তুমি আমাকে এতবড়ো অপবাদ দেবে আর আমি তাই যে নীরবে সহ্য করে যাব, এতবড়ো কাপুরুষ আমাকে পাও নি। কখ্খনো দেরি করি নি— এ আমি তোমার মুখের সামনে বলছি। এতে তুমি রাগই কর আর যাই কর। দেরি করি নি, দেরি করি নি, দেরি করি নি— এই তিনবার খুব চেঁচিয়েই বলে রাখলুম— দেখি, তুমি এর জবাব কী দাও। যত দোষ সব আমার, আর তোমার অগস্ত্যকুণ্ডের পোস্টমাস্টারটি বুঝি আটত্রিশটি গুণের আধার? ভালো কথা মনে পড়ল, তোমাকে শেষবারে চিঠি লেখার পর আমি খোঁজ নিয়ে শুনলুম— শ্রীমতী তুলসীমঞ্জরীকে বৌমা বিদায় করে দিয়েছেন। কী অন্যায় দেখো দেখি। তার অপরাধটা কী?— না, সে যতটা কাজ করে তার চেয়ে কথা কয় বেশি। তাই যদি হয়, তা হলে তোমার ভানুদাদার কী হবে বলো তো। আমি তো জন্মকাল থেকে কেবল কথাই কয়ে আসছি, তুলসীমঞ্জরী যেটুকু কাজ করেছে— আমি তাও করি নি। বৌমা তাই রেগেমেগে হঠাৎ যদি আমার খোরাকি বন্ধ করে দেন তা হলে আমার কী দশা হবে? যাই হোক, এই কথাটা নিয়ে এখন থেকে ভাবনা করে কোনোও লাভ নেই— সময় যখন উপস্থিত হবে তখন তোমাকে খবর দেওয়া যাবে, আমার যা কপালে থাকে তাই হবে। কিন্তু তোমার গুরুমা তোমাকে যে-ছাঁদে বাংলা-চিঠি লেখাতে চান, আমাকে সেই ছাঁদে লিখলে চলবে না— তা আমার নামের আগে শুধু না-হয় একটা মাত্র 'শ্রী'-ই দেবে কিংবা 'শ্রী' নাই বা দিলে। আমার বিলেত যাবার একটা কথা উঠছে কিন্তু শুধু কথায় যদি বিলেত যাওয়া যেত তা হলে আমার ভাবনা ছিল না; কথা একলা যদি না জোটাতে পারতুম তা হলে তুলসীমঞ্জরীকে ডেকে পাঠাতুম। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, বিলেত যেতে জাহাজের দরকার করে, যুদ্ধের উৎপাতে সেই জাহাজের সংখ্যা কমে গেছে অথচ যাবার লোকের সংখ্যা বেড়ে গেছে— তাই এখন—

ঘাটে বসে আছি আনমনা,
যেতেছে বহিয়া সুসময়।

এ দিকে রোজ আমার একটা করে নতুন গান বেড়েই চলেছে। গানের সুবিধা এই যে, তার জন্যে জাহাজের দরকার হয় না, কথাতেই অনেকটা কাজ হয়। প্রায় পনেরোটা গান শেষ হয়ে গেল। তুমি দেরি করে যদি আস তা হলে ততদিনে এত গান জমে উঠবে যে, শুনতে শুনতে তোমার চারুপাঠ তৃতীয়ভাগ আর পড়া হবে না— তোমার শিশু-মহাভারত বৃদ্ধ-মহাভারত হয়ে উঠবে। তুমি হয়তো এম.এ. পাস করার সময় পাবে না। ইতি ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩২৫

৩০

শান্তিনিকেতন

তুমি ভাবছ— মজা কেবল তোমাদেরই হয়েছে তাই তোমাদের ইস্কুলের প্রাইজের মজার ফর্দ আমাকে লিখে পাঠিয়েছ, কিন্তু এত সহজে আমাকে হার মানাতে পারছ না। মজা আমাদের এখানেও হয় এবং যথেষ্ট বেশি করেই হয়। আচ্ছা, তোমাদের প্রাইজে কত লোক জমেছিল? পঞ্চাশ জন? কিন্তু আমাদের এখানে মেলায় অন্তত দশ হাজার লোক তো হয়েইছিল। তুমি লিখেছ, একটি ছোটো মেয়ে তার দিদির কাছে গিয়ে খুব চীৎকার করে তোমাদের সভা খুব জমিয়ে তুলেছিল— আমাদের এখানকার মাঠে যা চীৎকার হয়েছিল তাতে কত রকমেরই আওয়াজ মিলেছিল, তার কি সংখ্যা ছিল। ছোটো ছেলের কান্না, বড়োদের হাঁকডাক, ডুগডুগির বাদ্য, গোরুর গাড়ির ক্যাঁচকোঁচ, যাত্রার দলের চীৎকার, তুবড়িঁবাজির সোঁ সোঁ, পটকার ফুটফাট, পুলিস-চৌকিদারের হৈ হৈ— হাসি, কান্না, গান,

চেঁচামেচি, ঝগড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। ৭ই পৌষে মাঠে খুব বড়ো হাট বসেছিল, তাতে গালার খেলনা, ফলের মোরব্বা, মাটির পুতুল, তেলে-ভাজা ফুলুরি, চিনেবাদাম ভাজা প্রভৃতি আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস বিক্রি হল। এক-এক পয়সা দিয়ে ছেলেমেয়েরা সব নাগরদোলায় দুলল; চাঁদোয়ার নীচে নীলকণ্ঠ মুখুজ্যের কংসবধ যাত্রার পালা গান হচ্ছিল— সেইখানে একেবারে ঠেলাঠেলি ভিড়। তার পরে ৯ই পৌষে আমাদের মেয়েরা আবার এক মেলা করেছিলেন— তাতে সিঙারা, আলুর-দমের দোকান বসিয়েছিলেন— এক-একটা আলুর-দম এক-এক পয়সায় বিক্রি হল। সুকেশী বউমা চিনে-বাদামের পুতুল গড়েছিলেন, তার এক-একটা ছ-আনা দামে বিক্রি হয়ে গেল। কমল কাদা দিয়ে একটা ঘর বানিয়েছিল— তার খড়ের চাল, চারি দিকে মাটির পাঁচিল, আঙিনায় শিব-স্থাপন করা আছে— সেটা কেউ কিনতে চায় না, তাই কমল আমাকে সেটা জোর করে তিন টাকায় বিক্রি করেছে। ভেবে দেখো— কী রকম ভয়ানক মজা। ছোটো মেয়েরা একটুকরো নেকড়া ছিঁড়ে তার চারি দিকে পাড় সেলাই করে আমার কাছে এনে বললে, 'এটা রুমাল, এর দাম আট আনা, আপনাকে নিতেই হবে' বলে সেটা আমার পকেটে পুরে দিলে— এমন ভয়ানক মজা! ওঁদের বাজারে এইরকম শ্রেণীর সব ভয়ানক মজা হয়ে গেছে— তোমরা যে-সব প্রাইজ পেয়েছ, সে এর কাছে কোথায় লাগে। তার পরে মজা— মেলা যখন ভেঙে গেল, সমস্ত রাত ধরে চেঁচাতে চেঁচাতে বেসুরো গান গাইতে গাইতে দলে দলে লোক ঠিক আমার শোবার ঘরের সামনের রাস্তা দিয়েই যেতে লাগল— মজায় একটুও ঘুম হল না— নীচে যতগুলো কুকুর ছিল, সবাই মিলে ঊর্ধ্বশ্বাসে চেঁচাতে লাগল, এমন মজা। তার পরে কলকাতার অনেক মেয়ে তাঁদের ছোটো ছেলেমেয়ে নিয়ে এসেছিলেন— তাঁদের কারও কাশি, কারও জ্বর। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রাইজে এমন ধুমধাম, গোলমাল, কাশি-সর্দি, অসুখ-বিসুখ, আট আনায় রুমাল বেচা প্রভৃতি হয় নি— অতএব আমারই জিত রইল।

৩১

শান্তিনিকেতন

নাঃ, তোমার সংগে পারলুম না— হার মানলুম। তুমি যে ইস্কুলে যেতে যেতে একেবারে রাস্তার মাঝখানে গাড়ি সুদ্ধ, একগাড়ি মেয়ে সুদ্ধ, তোমাদের মোটা দিদিমণি সুদ্ধ একেবারে উল্টে কাত হয়ে পড়বে— এত বড়ো ভয়ংকর মজা করবে, এ কী করে জানব বলো। তার পরে আর-এক ভদ্রলোককে বেচারার এক্কা-গাড়ি থেকে নামিয়ে তার গাড়িতে চড়ে বসবে, এত মজাতেও সন্তুষ্ট নও, আবার এক-পাটি জুতো রাস্তার মাঝখানে ফেলে আসবে আর সেই জুতোর পিছনে কাশীবাসী ভদ্রলোকটিকে দৌড় করাবে— তারও উপরে আবার ইস্কুলে পেঁছে কান্না— কী মজা। যদি সেই জুতো-শিকারী বেচারা ভদ্রলোকটি কাঁদত তা হলেও বুঝতুম— কিন্তু তুমি! বিনা ভাড়ায় পরের এক্কাগাড়িতে চড়ে, বিনা আয়াসে পরকে দিয়ে হারানো চটিজুতো খুঁজিয়ে নিয়ে— তার পরে কিনা কান্না! একেই না বলে লঙ্কাকাণ্ডের পরেও আবার উত্তরকাণ্ড। তুমি লিখেছ, আমিও যদি তোমাদের গাড়ির মধ্যে থাকতুম আর হাত, পা, মাথা, বুদ্ধি-সুদ্ধি সমস্ত একেবারে উল্টে পাল্টে যেত তা হলে তোমাদের মতোই বাবা রে মরলুম রে করে চীৎকার করতুম। এ কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করব না— নিশ্চয়ই পা দুটো উপরে আর মাথাটা নীচে করে আমি তানা-নানা শব্দে কানাড়া রাগিণীতে গান ধরতুম।

হায়রে হায়, সারে গামা পাধা নিসা।
আমার গাড়ির হল উল্টো মতি,
কোথায় হবে আমার গতি—
খুঁজে আমি না পাই দিশা।
সারে গামা পাধা নিসা।

যখন কাশীতে যাব আমার গাড়িটা উল্টে দিয়ে বরঞ্চ পরীক্ষা করে দেখো। ইস্কুলে গিয়ে কাঁদব না, তোমার মাথার সামনে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে তান লাগিয়ে দেব—

যদিও আঘাত গায়ে লাগে নি।
তবুও করুণ সুরে
দেব আমি গান জুড়ে
ঝাঁপতালে ভৈরবী রাগিণী।
শোনো সবে দিদিমণি, মামা,
সারে সারে সারে গারে গামা।

এই তো গেল মজার কথা। এইবার কাজের কথা। পরশু চললুম মৈসুরে, মাদ্রাজে, মাদুরায় এবং মদনা-পল্লীতে। ফিরতে বোধ হয় জানুয়ারি কাবার হয়ে ফেব্রুয়ারি শুরু হবে—ইতিমধ্যে ঐ দুটো গানের সুর বসিয়ে এস্‌রাজে অভ্যাস করে নিয়ো। আবার যদি বিশ্বেশ্বরের গোরু, গাড়ি উল্টে দিয়ে নন্দী-ভৃঙ্গীর গোয়ালের দিকে দৌড় মারে তা হলে পথের মাঝখানে কাজে লাগাতে পারবে। আর যে-ব্যক্তি তোমার একপাটি চটি জুতো নিয়ে আসবে তাকে উচ্চৈঃস্বরে তানে, মানে, লয়ে চমৎকৃত করে দিতে পারবে। ততদিন কিন্তু ডাকঘরের পালা বন্ধ। আমার চিঠি ফুরল, নটে শাকটি মুড়ল ইত্যাদি। ১৯ পৌষ ১৩২৫

৩২

শান্তিনিকেতন

তোমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এইমাত্র পাওয়া গেল। আমি ভাবছি, তোমার এমন চিঠির বেশ সমান ওজনের জবাবটি দিই কী করে। তুমি চলিষ্ণু, আমি স্তব্ধ; তুমি আকাশের পাখি, আমি বনান্তের অশথগাছ; কাজেই তোমার গানে আর আমার মর্মরে ঠিক সমকক্ষ হতে পারে না। এক জায়গায় তোমার সঙ্গে আমার মিলেছে; তুমিও গেছ হাওয়া বদল করতে, আমিও এসেছি হাওয়া বদল করতে। তুমি গেছ কাশী থেকে সোলনে, আমি এসেছি আমার লেখবার ডেস্ক থেকে আমার জানলার ধারের লম্বা কেদারায়। খুব বদল—তোমাদের বিশ্বেশ্বরের মন্দির থেকে আর তাঁর শ্বশুরবাড়ি যত বদল তার চেয়ে অনেক বেশি। আমি যে-হাওয়ায় ছিলুম, এ হাওয়া তার থেকে সম্পূর্ণ তফাত। তবে কিনা, তোমার ভ্রমণে আমার ভ্রমণে একটি মূলগত প্রভেদ আছে, তুমি নিজে চলে চলে ভ্রমণ করছ কিন্তু আমি নিজে থাকি স্থির আর আমার সামনে যা-কিছু চলছে, তাদের চলায় আমার চলা। এই হচ্ছে রাজার উপযুক্ত ভ্রমণ—অর্থাৎ আমার হয়ে অন্যে ভ্রমণ করছে, চলবার জন্যে আমার নিজেকে চলতে হচ্ছে না। ঐ দেখো-না, আজ রবিবার হাটবার, সামনে দিয়ে গোরুর গাড়ি চলেছে—আমার দুই চক্ষু সেই গোরুর গাড়িতে সওয়ার হয়ে বসল। ঐ চলেছে সাঁওতালের মেয়েরা মাথায় খড়ের আঁটি, ঐ চলেছে মোষের দল তাড়িয়ে সন্তোষবাবুর গোষ্ঠের রাখাল। ঐ চলেছে ইস্টেশনের দিক থেকে গোয়ালপাড়ার দিকে কারা এবং কিসের জন্যে—তা কিছুই জানি নে; একজনের হাতে ঝুলছে এক থেলোহুঁকো, একজনের মাথায় ছেঁড়া ছাতি, একজনের কাঁধে চড়ে বসেছে একটা উলঙ্গ ছেলে। ঐ আসছে ভুবনডাঙার গ্রাম থেকে কলসীকাঁখে মেয়ের দল, তারা শান্তিনিকেতনের কুয়ো থেকে জল নিয়ে যাবে। ঐ-সব চলার স্রোতের মধ্যে আমার মনটাকে ভাসিয়ে দিয়ে আমি চুপ করে বসে আছি। আকাশ দিয়ে মেঘ চলেছে, কাল রাত্রিবেলাকার ঝড়-বৃষ্টির ভগ্ন-পাইকের দল—অত্যন্ত ছেঁড়া-খোঁড়া রকমের চেহারা।

এরাই দেখব আজ সন্ধ্যাবেলায় নীল, লাল, সোনালি, বেগনি উর্দি পরে কালবৈশাখীর নকিবের

মতো গুরু গুরু দামামা বাজাতে বাজাতে উত্তর-পশ্চিম থেকে কুচ-কাওয়াজ করে আসতে থাকবে— তখন আর এমনতরো ভালোমানুষি চেহারা থাকবে না।

আমাদের বিদ্যালয় বন্ধ, এখন আশ্রমে যা-কিছু আসর জমিয়ে রেখেছে শালিখ-পাখির দল, আরও অনেক রকমের পাখি জুটেছে—বটের ফল পেকেছে তাই সব অনাহূতের দল জমেছে। বনলক্ষ্মী হাসিমুখে সবার জন্যেই পাত পেড়ে দিয়েছেন। ইতি ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

৩৩

শান্তিনিকেতন

তোমার চিঠিতে যে-রকম ঠাণ্ডা এবং মেঘলা দিনের বর্ণনা করেছ তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তুমি তোমার ভানুদাদার এলাকার অনেক তফাতে চলে গেছ। বেশি না হোক, অন্তত দু-তিন ডিগ্রির মতোও ঠাণ্ডা যদি ডাকযোগে এখানে পাঠাতে পার তা হলে তোমাদেরও আরাম, আমাদেরও আরাম। বেয়ারিং পোস্টে পাঠালেও আপত্তি করব না, এমন-কি ভ্যালু-পেবলেও রাজি আছি। আসল কথা ক'দিন থেকে এখানে রীতিমত খোট্টাই ফ্যাশানের গরম পড়েছে। সমস্ত আকাশটা যেন তৃষ্ণার্ত কুকুরের মতো জিব বের করে হাঃ-হাঃ করে হাঁপাচ্ছে। আর এই যে দুপুরবেলাকার হাওয়া, এ যে কী রকম—সে তোমাকে বেশি বোঝাতে হবে না—এই বললেই বুঝবে যে, এ প্রায় বেনারসি হাওয়া, আগুনের লকলকে জরির সুতো দিয়ে আগাগোড়া ঠাস বুনোনি; দিক-লক্ষ্মীরা পরেছেন, তাঁরা দেবতার মেয়ে বলেই সইতে পারেন, কিন্তু ওর আঁচলা যখন মাঝে মাঝে উড়ে আমাদের গায়ে এসে পড়ে তখন নিজেকে মর্ত্যের ছেলে বলেই খুব বুঝতে পারি। আমি কিন্তু আমার ঐ আকাশের ভানুদাদার দূতগুলিকে ভয় করি নে; এই দুপুরে দেখবে, ঘরে ঘরে দুয়ার বন্ধ কিন্তু আমার ঘরের সব দরজা-জানলা খোলা। তপ্ত হাওয়া হুহু করে ঘরে ঢুকে আমাকে আগাগোড়া ঘ্রাণ করে যাচ্ছে,—এমনি তার ঘ্রাণ যে, ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং। গরমের ঝাঁজে আকাশ ঝাপসা হয়ে আছে—কেমন যেন ঘোলা নীল—ঠিক যেন মূর্ছিত মানুষের ঘোলা চোখটার মতো। সকলেই থেকে থেকে বলে বলে উঠছে, 'উঃ, আঃ,—কী গরম।' আমি তাতে আপত্তি করে বলছি, গরম তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তার সঙ্গে আবার ঐ তোমার উঃ আঃ জুড়ে দিলে কেন। যাই হোক, আকাশের এই প্রতাপ আমি একরকম করে সইতে পারি কিন্তু মর্ত্যের প্রতাপ আর সহ্য হয় না। তোমরা তো পাঞ্জাবে আছ, পাঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধ হয় পাও। এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে। ভারতবর্ষে অনেক পাপ জমেছিল তাই অনেক মার খেতে হচ্ছে। মানুষের অপমান ভারতবর্ষে অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে। তাই কতশত বৎসর ধরে মানুষের কাছ থেকে ভারতবর্ষ এত অপমান সইছে, কিন্তু আজও শিক্ষা শেষ হয় নি। ইতি ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

৩৪

কলিকাতা

মাঝে তোমার একটা চিঠির জবাব দিতে পারি নি, কলকাতায় এসেছি। কেন এসেছি, হয়তো খবরের কাগজ থেকে ইতিমধ্যে কতকটা জানতে পারবে। তবু একটু খোলসা করে বলি। তোমার লেফাফায় তুমি যখন আমার ঠিকানা লেখ, আমি ভাবলুম ঐ পদবীটা তোমার পছন্দ নয়। তাই কলকাতায় এসে বড়োলাটকে চিঠি লিখেছি—আমার ঐ ছার পদবীটা ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু চিঠিতে আসল কারণটা দিই নি—তোমার নামের একটুও উল্লেখ করি নি। বানিয়ে বানিয়ে অন্য নানা

কথা লিখেছি। আমি বলেছি, বুকের মধ্যে অনেক ব্যথা জমে উঠেছিল, তারই ভার আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে—তাই ভারের উপরে আমার ঐ উপাধির ভার আর বহন করতে পারছি নে; তাই ওটা মাথার উপর থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। যাক, এ-সব কথা আর বলতে ইচ্ছা করে না—আবার অন্য কথাও ভাবতে পারি নে। ১লা জুন ১৯১৯

৩৫

শান্তিনিকেতন

কাল ছিলুম কলকাতায়, আজ বোলপুরে। এসে দেখি, তোমার একখানি চিঠি আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। আর দেখি, আকাশে ঘন ঘোর মেঘ—বর্ষার আয়োজন সমস্তই রয়েছে কেবল আমি আসি নি বলেই বৃষ্টি আরম্ভ হয় নি। বর্ষার মেঘের ইচ্ছা ছিল, আমাকে তার কাজরী গান শুনিয়ে দেবে—তার পরে আমিও তাকে আমার গানে জবাব দেব। তাই এতক্ষণ পরে আমি দুপুর-বেলায় যখন খেয়ে এসে বসলুম তখন বৃষ্টি শুরু করে দিয়েছে এক মাঠ থেকে আর-এক মাঠে। আর তার কলসংগীতে আকাশে কোথাও যেন ফাঁক রইল না। নববর্ষার জলস্থলের আনন্দ-উৎসব দেখতে চাও তা হলে এসো আমাদের মাঠের ধারে, বোসো এই জানলাটিতে চুপ করে। পাহাড়ে বর্ষার চেহারা স্পষ্ট দেখবার জো নেই, সেখানে পাহাড়েতে মেঘেতে ঘেঁষাঘেঁষি মেশামেশি একাকার কাণ্ড। সমস্ত আকাশটা বুজে যায়; সৃষ্টিটা যেন সর্দিতে, কাশিতে জবুস্থবু হয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকে। পাহাড় আমার কেন ভালো লাগে না বলি—সেখানে গেলে মনে হয় আকাশটাকে যেন আড়কোলা করে ধরে একদল পাহারাওয়ালার হাতে জিম্মা করে দেওয়া হয়েছে, সে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। আমরা মর্ত্যবাসী মানুষ—সীমাহীন আকাশে আমরা মুক্তির রূপটি দেখতে পাই—সেই আকাশটাকেই যদি তোমার হিমালয় পাহাড় একপাল মহিষের মতো শিং গুঁতিয়ে মারতে চায় তা হলে সেটা আমি সইতে পারি নে। আমি খোলা আকাশের ভক্ত—সেইজন্যে বাংলাদেশের বড়ো বড়ো দিল্-দরাজ নদীর ধারে অবারিত আকাশকে ওস্তাদ মেনে তার কাছে আমার গানের গলা সেধে এসেছি, এই কারণেই দূর হতে তোমাদের সোলন পর্বতকে নমস্কার করি। যা হোক, বর্ষা বিদায় হবার পূর্বেই তোমরা আমার প্রান্তরে আতিথ্য নেবে শুনে আমি খুশি হয়েছি। তোমাদের জন্যে কিছু গান সংগ্রহ করে রাখব—আর পাকা জাম, আর কেয়াফুল, আর পদ্মবন থেকে শ্বেতপদ্ম, আর যদি পারি গোটাকতক আষাঢ়ে গল্প। অতএব খুব বেশি দেরি কোরো না, পর্বত থেকে ঝরনা যেমন নেমে আসে তেমনি দ্রুতপদে নেমে এসো। ইতি আষাঢ়স্য তৃতীয় দিবসে, ১৩২৬

৩৬

শান্তিনিকেতন

তোমার আজকের চিঠি পেয়ে বড়ো লজ্জা পেলুম। কেন বলব? এর আগে তোমার একখানি চিঠি পেয়েছিলুম—তার জবাব দেব দেব করছি, এমন সময় তোমার এই চিঠি, আজ তোমার কাছে আমার হার মানতে হল। আমি এত বড়ো লেখক, বড়ো বড়ো পাঁচ ভলুম কাব্যগ্রন্থ লিখেছি—এহেন যে আমি— যার উপাধিসমেত নাম হওয়া উচিত শ্রীরবীন্দ্রনাথ শর্মা রচনা-লবণাম্বুধি কিংবা সাহিত্য-অজগর কিংবা বাগক্ষৌহিণীনায়ক কিংবা রচনা-মহামহোপদ্রব কিংবা কাব্যকলাকল্পদ্রুম কিংবা—ফস্ করে এখন মনে পড়ছে না, পরে ভেবে বলব—একরত্তি মেয়ে, 'সাতাশ' বছর বয়স লাভ করতে যাকে অন্তত পঁয়ত্রিশ বছর সাধনা করতে হবে, তারই কাছে পরাভব—Two goals

to nil! তার পরে আবার তুমি যে-সব বিপজ্জনক ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখছ, আমার এই ডেস্কে বসে তার সঙ্গে পাল্লা দিই কী করে। আজ সকালে তাই ভাবছিলুম, পারুলবনের সামনে দিয়ে যে রেলের রাস্তা আছে সেখানে গিয়ে রাত্রে দাঁড়িয়ে থাকব—তার পরে বুকের উপর দিয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা চলে গেলে পর যদি তখনও হাত চলে তা হলে সেই মুহূর্তে সেইখানে বসে তোমাকে যদি চিঠি লিখতে পারি তবে তোমাকে টেক্কা দিতে পারব। এ সম্বন্ধে এখনো বউমার সঙ্গে পরামর্শ করি নি, অ্যান্ডরুজ সাহেবকেও জানাই নি। আমার কেমন মনে মনে সন্দেহ হচ্ছে, ওঁরা হয়তো কেউ সম্মতি দেবেন না, তা ছাড়া আমার নিজের মনেও একটা কেমন ধোঁকা লাগছে; মনে হচ্ছে যদি গাড়িটার চাপে বুড়ো আঙুলটা কিছু জখম করে তা হলে হয়তো লেখা ঘটেই উঠবে না। আর যদি না ঘটে তা হলে অনন্তকালের মতো ঐ দুখানা চিঠির জিত তোমার রয়েই যাবে, অতএব থাক্।

অল্পদিনের মধ্যে আমাদের এখানে ভয়ংকর ব্যাপার একটাও ঘটে নি। ঝড়-বৃষ্টি অল্প-স্বল্প হয়েছে কিন্তু তাতে আমাদের বাড়ির ছাদ ভাঙে নি, আমাদের কারও মাথায় যে সামান্য একটা বজ্র পড়বে তাও পড়ল না। বন্দুক নিয়ে ছোরাছুরি নিয়ে দেশের নানা জায়গায় ডাকাতি হচ্ছে; কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট এমনি মন্দ যে, আজ পর্যন্ত অবজ্ঞা করে আমাদের আশ্রমে তারা কিংবা তাদের দূর-সম্পর্কের কেউ পদার্পণ করলে না। না, না, ভুল বলছি। একটা রোমহর্ষণ ঘটনা অল্পদিন হল ঘটেছে। সেটা বলি। আমাদের আশ্রমের সামনে দিয়ে নির্জন প্রান্তরের প্রান্ত বেয়ে একটি দীর্ঘ পথ বোলপুর-স্টেশন পর্যন্ত চলে গেছে। সেই পথের পশ্চিমে একটি দোতলা ইমারত। সেই ইমারতের একতলায় একটি বঙ্গ-রমণী একাকিনী বাস করেন। সঙ্গে কেবল কয়েকটি দাস-দাসী, বেহারা, গোয়ালা, পাচক-ব্রাহ্মণ এবং উপরের তলায় অ্যান্ডরুজ সাহেব নামক একটি ইংরেজ থাকেন। সমস্ত বাড়িটাতে এ ছাড়া আর জন-প্রাণী নেই। সেদিন মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি, মেঘের আড়াল থেকে চন্দ্র ম্লান কিরণ বিকীর্ণ করছেন। এমন সময় রাত্রি যখন সাড়ে এগারোটা, যখন কেবলমাত্র দশ-বারো জন লোক নিয়ে একাকিনী রমণী বিশ্রাম করছেন, এমন সময়ে ঘরের মধ্যে কে ঐ পুরুষ প্রবেশ করলে? কোন্ অপরিচিত যুবক? কোথায় ওর বাড়ি, কী ওর অভিসন্ধি? হঠাৎ সেই নিস্তব্ধ নিদ্রিত ঘরের নিঃশব্দতা সচকিত করে তুলে সে জিজ্ঞাসা করলে—'ইস্কুল কোথায়?' অকস্মাৎ জাগরণে উক্ত রমণীর ঘন ঘন হৃৎকম্প হতে লাগল; রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বললেন, 'ইস্কুল ঐ পশ্চিম দিকে।' তখন যুবক জিজ্ঞাসা করলে, 'হেডমাস্টারের ঘর কোথায়?' রমণী বললেন, 'জানি নে।'

তার পরে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ঐ যুবক সেই ম্লান জ্যোৎস্নালোকে সেই ঝিল্লিমুখরিত মধ্যরাত্রে আবার আশ্রমের কঙ্করবিকীর্ণ পথে আশ্রম-কুক্কুরবৃন্দের তার-তিরস্কার শব্দ উপেক্ষা করে দ্বিতীয় একটি নিঃসহায়া অবলার গৃহের মধ্যে প্রবেশ করলে। সেই ঘরে তৎকালে উক্ত রমণীর পূর্ণবয়স্ক একটি স্বামীমাত্র ছিল, আর জন-প্রাণীও না। সেখানেও পূর্ববৎ সেই দুটি মাত্র প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের শব্দে স্তিমিত-দীপালোকিত সেই নির্জনপ্রায় কক্ষটি আতঙ্কে নিস্তব্ধ হয়ে রইল। লোকটা বহু দূর দেশ থেকে হেডমাস্টারকে খুঁজতে খুঁজতে কেন এখানে এল। তার সঙ্গে কিসের শত্রুতা। সেই রাত্রে স্বামীসনাথা ঐ একটি রমণী এবং স্বামীদূরগতা অন্য অবলা না জানি তাদের সরল কোমল হৃদয়ে কী আশঙ্কা বহন করে ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন প্রভাতে হেডমাস্টারের মাস্টার বাদ দিয়ে বাকি ছিন্ন অংশ কি কোথাও পাওয়া যাবে—তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন?

তার পরে তৃতীয় পরিচ্ছেদ। পরদিন প্রথমা নারীটি আমাকে বললেন, 'তাত, মধ্যরাত্রে একটি যুবক—ইত্যাদি।' শুনে আমার পাঠিকা বিস্মিতা হবেন না যে, আমি আশ্রম ছেড়ে পালাই নি; এমন-কি, আমি তরবারিও কোষোন্মুক্ত করলুম না। করবার ইচ্ছে থাকলেও তরবারি ছিল না, থাকবার মধ্যে একটা কাগজ-কাটা ছুরি ছিল। সঙ্গে কোনো পদাতিক বা অশ্বারোহী না নিয়েই আমি সন্ধান করতে বেরলুম, কোন্ অপরিচিত যুবা কাল নিশীথে 'হেডমাস্টার কোথায়' বলে অবলা রমণীর নিদ্রা ভঙ্গ করেছে?

তার পরে উপসংহার। যুবককে দেখা গেল, তাকে প্রশ্ন করা গেল। উত্তরে জানা গেল— এখানে তার কোনো একটি আত্মীয়-বালককে সে ভর্তি করে দিতে চায়। ইতি সমাপ্ত। ২৬ আষাঢ় ১৩২৬

৩৭

আমার জ্যোতিষ্ক-মিতাটি আকাশ নইলে বিচরণ করতে পারেন না—তাঁরই নামধারী আমি অবকাশ নইলে টিঁকতে পারি নে। আমার যদি কোনো আলো থাকে তবে সেই আলো প্রচুর অবকাশের মধ্যেই প্রকাশ পায়; সেইজন্যেই আমি ছুটির দরবার করি—কেননা, ছুটিতেই আমার যথার্থ কাজ। তাই লোক-সমাগম দেখে আমি আশ্রম ছেড়ে দৌড় দিয়েছি। অথচ এই সময়ই উজ্জ্বল সূর্যের আলোয়, রঙিন মেঘের ঘটায়, ঘাসে ঘাসে মেঠো ফুলের প্রাচুর্যে, হাওয়ায় হাওয়ায় দিকে দিকে কাশমঞ্জরীর উল্লাস-হাস্য-হিল্লোলে আশ্রম খুব রমণীয় হয়ে উঠেছিল। স্টেশনের দিকে যখন গাড়ি চলেছিল তখন পিছনের দিকে মন টানছিল। কিন্তু স্টেশনে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল আর রেলগাড়িটা আমাদের আশ্রমকে যেন টিট্‌কারি দিয়ে পোঁ করে বাঁশি বাজিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে চলে এল। রাত এগারোটায় হাওড়ায় উপস্থিত। এসে শুনি, হাওড়ার ব্রিজ খুলে দিয়েছে। নৌকায় গঙ্গা পার হতে হবে। মালপত্র ঘাড়ে নিয়ে ঘাটে গেলেম। সবে জোয়ার এসেছে—ডিঙি নৌকো ঘাট থেকে একটু তফাতে। একটা মাল্লা এসে আমাকে আড়কোলা করে তুলে নিয়ে চলল। নৌকোর কাছাকাছি এসে আমাকে সুদ্ধ ঝপাস করে পড়ে গেল। আমার সেই ঝোলা-কাপড় নিয়ে সেইখানে জলে কাদায় লুটোপুটি ব্যাপার। গঙ্গামৃত্তিকায় লিপ্ত এবং গঙ্গাজলে অভিষিক্ত হয়ে নিশীথ রাত্রে বাড়ি এসে পৌঁছানো গেল। গঙ্গাতীরে বাস তবু ইচ্ছে করে বহুকাল গঙ্গাস্নান করি নি—ভীষ্ম-জননী ভাগীরথী সেই রাত্রে তার শোধ তুললেন। আজ বিকেলের গাড়িতে শিলং-পাহাড় যাত্রা করব; আশা করি এবারকার যাত্রাটা গতবারের গঙ্গাযাত্রার মতো হবে না। কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে আর ঘন মেঘের আবরণে দিগঙ্গনার মুখ অবগুণ্ঠিত। পূর্ণিমা, আশ্বিন, ১৩২৬

৩৮

ব্রুকসাইড
শিলং

কাল এসে পৌঁচেছি শিলং-পর্বতে, পথে কত-যে বিঘ্ন ঘটল তার ঠিক নেই। মনে আছে—বোলপুর থেকে আসবার সময় মা-গঙ্গা আমাকে জল-কাদার মধ্যে হিঁচড়ে এনে সাবধান করে দিয়েছিলেন? কিন্তু মানলুম না, বৃহস্পতিবারের বারবেলায় কৃষ্ণপ্রতিপদ তিথিতে রেলে চড়ে বসলুম। দু দিন আগে রথী আমাদের একখানা মোটরগাড়ি গৌহাটি-স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ইচ্ছা ছিল—সেই গাড়িতে করে পাহাড়ে চড়ব। সঙ্গে আমাদের আছেন দিনুবাবু এবং কমলবোঠান, এবং আছেন সাধুচরণ, এবং আছে বাক্স তোরঙ্গ নানা আকার ও আয়তনের এবং সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন আমাদের ভাগ্যদেবতা; তাঁকে টিকিট কিনতে হয় নি। সান্তাহার স্টেশনে আসাম মেলে চড়লুম, এমনি কষে ঝাঁকানি দিতে লাগল যে, দেহের রস-রক্ত যদি হত দই, তা হলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রাণটা তার থেকে মাখন হয়ে ছেড়ে বেরিয়ে আসত। অর্ধেক রাত্রে বজ্রনাদ সহকারে মুষলধারে বৃষ্টি হতে লাগল। গৌহাটির নিকটবর্তী স্টেশনে যখন খেয়া-জাহাজে ব্রহ্মপুত্রে ওঠা গেল তখন আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন কিন্তু বৃষ্টি নেই। ওপারে গিয়েই মোটরগাড়িতে চড়ব বলে খেয়ে-দেয়ে সেজে-গুজে গুছিয়ে-গাছিয়ে বসে আছি—গিয়ে শুনি, ব্রহ্মপুত্রে বন্যা এসেছে বলে এখনো ঘাটে মোটর নামাতে পারে নি। এ দিকে বলে, দুটোর পরে মোটর ছাড়তে দেয় না। অনেক বকাবকি দাপাদাপি ছুটোছুটি

হাঁকডাক করে বেলা আড়াইটের সময় গাড়ি এল। কিন্তু সময় গেল। তীরের কাছে একটা শূন্য জাহাজ বাঁধা ছিল, সেইটেতে উঠে মুটের সাহায্যে কয়েক বালতি ব্রহ্মপুত্রের জল তুলিয়ে আনা গেল—স্নান করবার ইচ্ছা। ভূগোলে পড়া গেছে—পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল, কিন্তু বন্যার ব্রহ্মপুত্রের ঘোলা স্রোতে সেদিন তিন ভাগ স্থল এক ভাগ জল। তাতে দেহ স্নিগ্ধ হল বটে কিন্তু নির্মল হল বলতে পারি নে। বোলপুর থেকে রাত্রি এগারোটার সময় হাওড়ার তীরে কাদার মধ্যে পড়ে যেমন গঙ্গাস্নান হয়েছিল, সেদিন ব্রহ্মপুত্রের জলে স্নানটাও তেমনি পঙ্কিল। তা হোক, এবার আমার ভাগ্য আমাকে ঘাড়ে ধরে পুণ্যতীর্থোদকে স্নান করিয়ে দিলেন। কোথায় রাত্রি যাপন করতে হবে তারই সন্ধানে আমাদের মোটরে চড়ে গৌহাটি শহরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া গেল। কিছু দূরে গিয়ে দেখি, আমাদের গাড়িটা হঠাৎ ন যযৌ ন তস্থৌ। বোঝা গেল, আমাদের ভাগ্যদেবতা বিনা অনুমতিতে আমাদের এ গাড়িতেও চড়ে বসেছেন, তিনিই আমাদের কলের প্রতি কটাক্ষপাত করতেই সে বিকল হয়েছে। অনেক যত্নে যখন তাকে একটা মোটরগাড়ির কারখানায় নিয়ে যাওয়া গেল তখন সূর্যদেব অস্তমিত। কারখানার লোকেরা বললে, 'আজ কিছু করা অসম্ভব, কাল চেষ্টা দেখা যাবে।' আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, 'রাত্রে আশ্রয় পাই কোথায়।' তারা বললে, 'ডাকবাংলায়।'

ডাকবাংলায় গিয়ে দেখি, সেখানে লোকের ভিড়—একটিমাত্র ছোটো ঘর খালি, তাতে আমাদের পাঁচজনকে পুরলে পঞ্চত্ব সুনিশ্চিত। সেখান থেকে সন্ধান করে অবশেষে গোয়ালন্দগামী স্টীমার-ঘাটে একটা জাহাজে আশ্রয় নেওয়া গেল। সেখানে প্রায় সমস্ত রাত বৌমা এবং কমলের ঘোরতর কাশি আর হাঁপানি। রাতটা এইরকম দুঃখে কাটল। পরদিনে প্রভাতে আকাশে ঘন মেঘ করে বৃষ্টি হতে লাগল। কথা আছে সকাল সাড়ে সাতটার সময় মোটর-কোম্পানির একটি মোটরগাড়ি এসে আমাদের বহন করে পাহাড়ে নিয়ে যাবে; সে-গাড়িখানা আর-একজন আর-এক জায়গায় নিয়ে যাবে বলে ঠিক করে রেখেছিল। সেখানা না পেলে দুঃখ আরও নিবিড়তর হবে—তাই রথী গিয়ে নানা লোকের কাছে নানা কাকুতি মিনতি করে সেটা ঠিক করে এসেছেন। ভাড়া লাগবে একশো পঁচিশ টাকা—আমাদের সেই হাতি কেনার চেয়ে বেশি। যা হোক, পৌনে আটটার সময় গাড়ি এল—তখন বৃষ্টি থেমেছে। গাড়ি তো বায়ুবেগে চলল, কিছুদূর গিয়ে দেখি, একখানা বড়ো মোটরের মালগাড়ি ভগ্ন অবস্থায় পথপার্শ্বে নিশ্চল হয়ে আছে। পূর্বদিনে আমাদের জিনিসপত্র এবং সাধুচরণকে নিয়ে এই গাড়ি রওনা হয়েছিল; এই পর্যন্ত এসে তিনি স্তব্ধ হয়েছেন। জিনিস তার মধ্যেই আছে, সাধু ভাগ্যক্রমে একটা প্যাসেঞ্জার গাড়ি পেয়ে চলে গেছে। জিনিস রইল পড়ে, আমরা এগিয়ে চললুম। বিদেশে, বিশেষত শীতের দেশে, জিনিসে-মানুষে বিচ্ছেদ সুখকর নয়। সইতে হল। যা হোক, শিলং-পাহাড়ে এসে দেখি, পাহাড়টা ঠিক আছে; আমাদের গ্রহ-বৈগুণ্যে বাঁকে নি, চোরে নি, নড়ে যায় নি; আমাদের জিওগ্রাফিতে তার যেখানে স্থান ঠিক সেই জায়গাটিতে সে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। দেখে আশ্চর্য বোধ হল, এখনো পাহাড়টা ঠিক আছে; তাই তোমাকে চিঠি লিখছি কিন্তু আর বেশি লিখলে ডাক পাওয়া যাবে না। অতএব ইতি—কৃষ্ণাতৃতীয়া, ১৩২৬

৩৯

ব্রুকসাইড
শিলং

আমি যেদিন এখানে এসে পৌঁছলুম সেদিন থেকেই বৃষ্টি-বাদলা কেটে গিয়েছে। আজ এই সকালে উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে চারি দিক প্রসন্ন; মোটা মোটা গোটাকতক মেঘ পাহাড়ের গা আঁকড়ে ধরে চুপচাপ রোদ পোয়াচ্ছে; তাদের এমনি বেজায় কুঁড়ে রকমের চেহারা যে, শীঘ্র তারা বৃষ্টি বর্ষণে লাগবে এমন মনেই হয় না।

আমার এখানকার লেখবার ঘরের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সেই কোণটার কোনো তুলনাই হয় না। বেশ বড়ো ঘর— নানা রকমের চৌকি, টেবিল, সোফা, আরামকেদারায় আকীর্ণ। জানালাগুলো সমস্তই শার্সির, তার ভিতর থেকে দেখতে পাচ্ছি, দেওদার গাছগুলো লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বাতাসে মাথা নেড়ে নেড়ে আকাশের মেঘের সঙ্গে ইশারায় কথা বলবার চেষ্টা করছে। বাগানের ফুলগাছের চানকায় কত রঙ-বেরঙের ফুল যে ফুটেছে তার ঠিক নেই— কত চামেলি, কত চন্দ্রমল্লিকা, কত গোলাপ— আরও কত অজ্ঞাত-কুলশীল ফুল। আমি ভোরে সূর্য ওঠবার আগেই রাস্তার দুই ধারের সেই-সব ফোটা ফুলের মাঝখান দিয়ে পায়চারি করে বেড়াই— তারা আমার পাকা দাড়ি আর লম্বা জোব্বা দেখে একটুও ভয় পায় না— হাসাহাসি করে।

এই পর্যন্ত লিখেছি, এমন সময়ে সাধু এসে খবর দিলে, স্নানের জল তৈরি। অমনি কলম রেখে চৌকি ছেড়ে রবিঠাকুর দ্রুতপদবিক্ষেপে স্নানযাত্রায় গমন করলেন। স্নান করে বেরিয়ে এসে খবর পাওয়া গেল— কী খবর বলো দেখি। আন্দাজ করে দেখো। খবর পাওয়া গেল যে, রবিঠাকুরের ভোগ প্রস্তুত— শ্রীযুক্ত তুলসী নামক উৎকলবাসী পাচকের স্বহস্তে পাক-করা। আহার সমাধা করে এই আসছি— সুতরাং চিঠির ও ভাগে পূর্বাহ্ণ ছিল, এ ভাগে অপরাহ্ণ পড়েছে— এখন ঘড়ির কাঁটা বেলা একটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। সেই মোটা মেঘগুলো সাদা-কালো রঙের কাবুলি বেড়ালের মতো এখনও অলসভাবে স্তব্ধ হয়ে রৌদ্রে পিঠ লাগিয়ে পড়ে আছে। পাখি ডাকছে আর জানালার ভিতর দিয়ে চামেলি ফুলের গন্ধ আসছে।

ঐ মেঘগুলোর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে একটা লম্বা কেদারা আশ্রয় করে নিস্তব্ধভাবে জানালার কাছে যদি বসতে পারতুম তা হলে সুখী হতুম কিন্তু অনেক চিঠি লিখতে বাকি আছে। অতএব গিরি-শিখরে এই শরতের অপরাহ্ণ আমার চিঠি লিখেই কাটবে। তুমি ছবি আঁকছ কি না লিখো; আর সেই এসরাজের উপর তোমার ছড়ি চলবে কি না তাও জানতে চাই। ইতি ২৮ আশ্বিন, ১৩২৬। (তারিখ ভুল করি নি— পাঁজি দেখে লিখেছি)।

৪০

শান্তিনিকেতন

তুমি এত দেরিতে কেন আমার চিঠি পেয়েছ, ঠিক বুঝতে পারলুম না। আজ তোমার চিঠি পেতে দেরি হল দেখে ভাবলুম, হয় তো অমৃতসর কংগ্রেসে তোমাকে ডেলিগেট করেছে কিংবা হাওয়া জাহাজে কাপ্তেন রসের সঙ্গে তুমি অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দিয়েছ। কিংবা হিমালয়ের পর্বত-শৃঙ্গে কোনো পওহারী বাবার শিষ্য হয়ে মাটির নীচে বসে একমনে নিজের নাকের ডগা নিরীক্ষণ করছ কিংবা লয়েড জর্জের প্রাইভেট সেক্রেটারির সর্দি হয়েছে খবর পেয়েই তুমি সেই পদের জন্য দরখাস্ত করতে ইংলন্ডে চলে গিয়েছ। আমি পার্লামেন্টে লয়েড জর্জকে টেলিগ্রাফ করতে যাচ্ছি ঠিক এমন সময়ে তোমার চিঠি পেলুম। পড়ে দেখি, তুমি ঝরনার ধারে কোথায় বেড়াতে গিয়ে আর একটু হলেই কুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছিলে। আশ্চর্য— দেখো, কাল সন্ধ্যাবেলায় আমারও প্রায় সেইরকম দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তখন রাত্তির ন'টা। মুখ ধুয়ে বিছানায় শুতে যাচ্ছি, এমন সময় কী বলো দেখি। কুয়ো? সেইরকমই বটে। এক কপি নৌকাডুবি বলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এক গল্পের বই— হঠাৎ তারই মধ্যে একবার হুঁচট খেয়ে পড়ে গেলুম। একেবারে শেষ পাতা পর্যন্ত তলিয়ে গেলুম। এত বড়ো বিপদ ঘটবার কারণ হচ্ছে, বিলাত থেকে একজন ইংরেজ ঐ বইটা তর্জমা করবার অনুমতি নিয়েছিলেন। আবার সেদিন আর-একজন ইংরেজ ঐটে তর্জমা করতে চেয়ে আমাকে চিঠি লিখেছেন। তাতেই আমার দেখবার ইচ্ছা হল, ওটার মধ্যে কী আছে। কিন্তু সেই ইচ্ছেটা রাত্‌ ন'টার সময় হঠাৎ উদয় হওয়া কোনো শুভগ্রহের প্রভাবে নয়। কারণ এই কুয়োটা থেকে উদ্ধার হতে রাত তিনটা বেজে গেল। তার মানে আমার পরমায়ু থেকে একটা রাতের বারো

আনার ঘুম গেল অনন্তকালের মতো হারিয়ে। আজ সকালবেলা আমার মুখ-চোখ দেখে সি.আই.ডি. পুলিস সন্দেহ করছে কাল রাত্রে আমি কোথায় সিঁধ কাটতে গিয়েছিলুম।

ঐ-যে ডাক-হরকরা আসছে। একরাশ চিঠি দিয়ে গেল। তোমার বাবার হাতের লেখা এক লেফাফা দেখতে পাচ্ছি—তার মধ্যে তোমাদের আধুনিক ইতিহাস কিছু পাওয়া যাবে। ও দিকে আবার কাল রাত্রে এক ইংরেজ অতিথি এসেছেন—আজ সমস্ত দিন তিনি বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ করবেন, সেই সঙ্গে আমাকেও পর্যবেক্ষণ করবেন বলে বোধ হচ্ছে। যখন করবেন তখন হয়তো ঢুলব—আর তিনি তাঁর নোটবুকে লিখে নিয়ে যাবেন যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমস্ত দিন ধরে কেবল ঢোলেন। এমনি করেই জীবন-চরিত লেখা হয়। সাহেব যখন আমার জীবন-চরিতে এই কথা লিখবেন তখন তুমি খুব জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ কোরো—বোলো, আমার অনেক দোষ থাকতে পারে, দিনে ঢোলা অভ্যাস একেবারেই নেই। যাই হোক, তুমি লয়েড জর্জের প্রাইভেট সেক্রেটারির পদ গ্রহণ কর নি, এইটাতে আমার মন অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছে। ইতি ২৮শে পৌষ ১৩২৬

৪১

সামনে তোমার পরীক্ষা—এখন দিনরাত তোমার মাথায় সেই ভাবনা লেগে আছে। অ্যালজেব্রা নিয়ে পড়ে থাকবে, তোমার ভয় হবে—আমার কাছে থাকলে পাছে তোমার নামতা ভুল হয়ে যায়, আর পাছে Animal বানান করতে গিয়ে Annie mull লিখে বস। এই কথা মনে করেই আমি উদাস হয়ে একেবারে অজন্তা-গুহার মধ্যে চলে যাচ্ছিলুম। তুমি যদি আমাকে আটকে রাখতে চাও, তা হলে কিন্তু অ্যালজেব্রার বইখানা তোমার ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে হবে।

দেখো, এবারকার চিঠিতে তোমাকে একটুও ঠাট্টা করি নি—ভয়ংকর গম্ভীর ভাষায় তোমাকে লিখলুম। তুমি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ, আমি কোনো দিন পরীক্ষা দিই নি—এইজন্যে ভয়ে সম্ভ্রমে ভক্তিতে শ্রদ্ধায় আমার মুখ থেকে একটিও ঠাট্টার কথা বেরোতে চাচ্ছে না—আমি নতশিরে এই কথাই কেবল আবৃত্তি করছি—

যা দেবী পাঠ্যগ্রন্থেষু ছাত্রীরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

ইতি ১লা আশ্বিন ১৩২৮

৪২

একটা বিষয়ে আমার মনে বড়ো খটকা লেগেছে, তুমি চিঠিতে লিখেছ—আমি নিশ্চয়ই তোমার দিদির চেয়ে বেশি ইংরেজি জানি। এটা কি উচিত। তোমার জ্যেষ্ঠা সহোদরা কলেজে পড়ে, তার ইংরেজি-জ্ঞানের প্রতি এত বড়ো অবজ্ঞা প্রকাশ কি ভালো হয়েছে। সে যদি জানতে পারে তা হলে তার মনে কত বড়ো আঘাত লাগবে—একবার ভেবে দেখো দেখি। আমার চিঠি পেয়েই তার কাছে তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কোরো।

তার মতো আমি যদি ইংরেজিতে পরীক্ষা পাস করতে পারতুম তা হলে কি এমন বেকার বসে থাকতুম। তা হলে অন্তত পুলিসের দারোগাগিরি জোগাড় করতে পারতুম। চিরদিন স্কুল পালিয়ে কাটালুম, কুঁড়েমি করেই এমন মানবজন্মের সাতাশটা বছর[১] বৃথা নষ্ট করলুম—এইজন্যে পাছে

[১] ভানুসিংহের বয়স যে সাতাশ বছরে এসে চিরকালের মতো ঠেকে গেছে, বালিকার এই একটি স্বরচিত বয়ঃপঞ্জীর বিধান ছিল।

আমার কুদৃষ্টিতে তোমাদের হঠাৎ বানান-ভুলে পেয়ে বসে তাই তো শহর ছেড়ে তোমাদের কাছে থেকে দূরে দূরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। এবারকার মতো যা হবার তা হল, আর-জন্মে ম্যাট্রিকুলেশন যদি বা না পারি তো অন্তত মাইনর ইস্কুলের ছাত্রবৃত্তি নিয়ে তবে ছাড়ব। কিছু না হোক, অন্তত ত্রৈরাশিক পর্যন্ত অংক কষবই, আর ফার্স্ট সেকেন্ড দুটো রীডার যদি শেষ করতে পারি তা হলে গাঁয়ের প্রাইমারি ইস্কুলের হেডমাস্টারি করতে পারব; আর তারই সঙ্গে সঙ্গে মাসিক সাড়ে আট টাকা বেতনে ব্রাঞ্চ পোস্ট-আফিসের পোস্টমাস্টারি-পদটাও জোগাড় করে নেবার চেষ্টা করব। নেহাত না পাই যদি, তবে জমিদারবাবুর কনিষ্ঠ ছেলেটির প্রাইভেট টিউটরের কাজটা নিশ্চয় জুটবে। ইতি ৭ই আশ্বিন ১৩২৮

৪৩

আজ বুধবার— আজ ছুটির দিনে আমার বারান্দার সেই কোণটায় বসে তোমাকে লিখছি। মাঘের দুপুরবেলাকার রৌদ্রে আমার ঐ আমলকী-বীথিকার মধ্যে দিনটি রমণীয় লাগছে। এইরকম দিনে কাজ করতে ইচ্ছে করে না— আমার সমস্ত মনটি ঐ ডালের উপরে বসা ফিঙে পাখিটির মতো চুপ করে রোদ পোহায়। আজ উত্তরে হাওয়া থেকে থেকে উতলা হয়ে উঠছে— শালবনের পাতায় পাতায় কাঁপুনি ধরেছে— একটা মস্ত কালো ভ্রমর মাঝে মাঝে অকারণ আমার কাছে এসে গুনগুনিয়ে আবার বেরিয়ে চলে যাচ্ছে— একটা কাঠবিড়ালি এই বারান্দার কাঠের খুঁটি বেয়ে চালের কাছে উঠে কিসের ব্যর্থ-সন্ধানে চঞ্চল চক্ষে এ দিক ও দিক তাকিয়ে আবার তখনি পিঠের ওপর ল্যাজ তুলে দুড় দুড় করে নেমে যাচ্ছে। এই শীতের মধ্যাহ্নে যেন আজ কারও কিছু কাজ নেই।

আমি সমস্ত সপ্তাহ ধরে একটা নাটক লিখছিলুম— শেষ হয়ে গেছে, তাই আজ আমার ছুটি। এ নাটকটা 'প্রায়শ্চিত্ত' নয়, এর নাম 'পথ'। এতে কেবল প্রায়শ্চিত্ত-নাটকের সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে, আর কেউ নেই— সে গল্পের কিছু এতে নেই, সুরমাকে এতে পাবে না।

তুমি পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত আছ— আমার এই কুঁড়েমির চিঠিতে পাছে তোমার জিওমেট্রির ধ্যান ভঙ্গ করে, এই ভয় আছে। ৪ঠা মাঘ ১৩২৮

৪৪

তুমি রোজ দুটো করে ডিম খেয়ে একটিমাত্র ক্লাসে পড়ছ খবর পেয়েই খুশি হয়ে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি। আমিও ঠিক দুটি করে ডিম খাই আর একটি মাত্র ক্লাসেও পড়ি নে। সেইটেতে আমার মুশকিল বেধেছে, কেননা, যদি আমার ক্লাস থাকত, যদি আমাকে নামতা মুখস্থ করতে হত তা হলে সব সময়ই আমার কাছে লোক আনাগোনা করতে পারত না; আমি বলতে পারতুম, আমার সময় নেই, আমাকে এক্‌জামিন দিতে হবে। তোমার ভারি সুবিধে— তোমার কাছে কইম্বাটুর থেকে ত্রিম্বাকটু থেকে কাঞ্জিভ্যারাম থেকে কামস্কাটকা থেকে মক্কা থেকে মদিনা মস্কট থেকে যখন-তখন নানালোক মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে আসেন না— তাঁরা জানেন যে, মার্চ মাসে তোমাকে ম্যাট্রিকুলেশন দিতে হবে। আমি তাই এক-একবার মনে করি— আমি ম্যাট্রিকুলেশন দেব— দিলে নিশ্চয়ই ফেল করব— ফেল করার সুবিধে এই যে, ফি-বৎসরেই ম্যাট্রিকুলেশন দেওয়া যায় আর তা হলে ত্রিম্বাকটু থেকে নিজনি-নবগরড থেকে বেচুয়ানাল্যান্ড থেকে সদাসর্বদা লোক-আসা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

লেভি সাহেব আমার বন্ধু হয়েও তোমার কাছে হেমনলিনীর কথাটা ফাঁস করে দিয়েছেন, এতে আমি মনে বড়ো দুঃখ পেয়েছি— এ কথা সত্য যে, আমি তারই সাধনায় প্রবৃত্ত আছি। কিন্তু সেই

স্বর্ণ-শতদলের পাপড়িগুলি হচ্ছে bank notes। সাধনায় বিশেষ যে সিদ্ধিলাভ করতে পেরেছি— তা মনেও কোরো না, তোমরা কামনা কোরো এই হেমনলিনী যেন আমার পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু কপালক্রমে আমার পঞ্জিকায় অকাল পড়েছে—শুভলগ্ন আর আসেই না, তাই গান গাচ্ছি—

ওগো হেমনলিনী
আমার দুঃখের কথা কারও কাছে বলি নি।
লক্ষ্মীর চরণতলে ফুটে আছ শত দলে
সে পথ করিয়া লক্ষ্য কেন আমি চলি নি।

ইতি ১০ ফাল্গুন ১৩২৮

৪৫

আমি নদী-পথে কয়েকদিন কাটিয়ে এলুম—কাল রাত্রে ফিরে এসেছি। আজ সকালে দেখি, এখানে তোমার চিঠি আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তুমি জান, আমি নদী ভালোবাসি। কেন, বলব? আমরা যে-ডাঙার উপরে বাস করি, সে-ডাঙা তো নড়ে না, স্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকে, কিন্তু নদীর জল দিনরাত্রি চলে, তার একটা বাণী আছে। তার ছন্দের সঙ্গে আমাদের রক্ত-চলাচলের ছন্দ মেলে, আমাদের মনে নিরন্তর যে চিন্তাস্রোত বয়ে যাচ্ছে সেই স্রোতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে—এইজন্যে নদীর সঙ্গে আমার এত ভাব। বয়স যখন আরও কম ছিল, তখন কতকাল নৌকায় কাটিয়েছি, কোনো জনমানব আমার কাছেও থাকত না, পদ্মার চরের উপরকার আকাশে সন্ধ্যাতারা আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকত; প্রতিবেশী ছিল চক্রবাকের দল; তাদের কলালাপ থেকে আর কিছু বুঝি বা না বুঝি, এটুকু জানতুম আমার সম্বন্ধে কোনো জনরব তারা রটাত না—এমন-কি, আমার জয়-পরাজয় নামক গল্পের নায়ক-নায়িকার পরিণাম সম্বন্ধে তারা লেশমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করত না।

যা হোক, তে হি নো দিবসা গতাঃ—এখন বোলপুরের শুষ্ক ধূসর মাঠের মধ্যে বসে ইস্কুল-মাস্টারি করছি; ছেলেগুলোর কলরব চক্রবাকের কল-কোলাহলকে ছাড়িয়ে গেছে। তুমি মনে কোরো না, এখানে কোনো স্রোত নেই; এখানে অনেকগুলি জীবনের ধারা মিলে একটি সৃষ্টির স্রোত চলেছে; তার ঢেউ প্রতি মুহূর্তে উঠছে, তার বাণীর অন্ত নেই। সেই স্রোতের দোলায় আমার জীবন আন্দোলিত হচ্ছে, আপনার পথ সে কাটছে, দুই তটকে গড়ে তুলছে। সে কোন্ এক অলক্ষ্য মহা-সমুদ্রের দিকে চলেছে, দূর থেকে আমরা তার বার্তার আভাস পাই মাত্র। ইতি ২২শে পৌষ ১৩২৮

৪৬

শিলাইদা

তুমি আমাকে চিঠি লিখেছ শান্তিনিকেতনে, আমি সেটি পেলুম এখানে অর্থাৎ শিলাইদহে।

তুমি কখনো এখানে আস নি, সুতরাং জানতে পারবে না—জায়গাটা কী রকম। বোলপুরের সঙ্গে এখানকার চেহারার কিছু মাত্র মিল নেই। সেখানকার রৌদ্র বিরহীর মতো, মাঠের মধ্যে একা বসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে, সেই তপ্ত নিশ্বাসে সেখানকার ঘাসগুলো শুকিয়ে হলদে হয়ে উঠেছে। এখানে সেই রৌদ্র তার সহচরী ছায়ার সঙ্গে মিলেছে; তাই চারি দিকে এত সরসতা। আমাদের বাড়ির সামনে শিসু-বীথিকায় তাই দিনরাত মর্মরধ্বনি শুনছি, আর কনকচাঁপার গন্ধে বাতাস বিহ্বল, কয়েতবেলের শাখায়-প্রশাখায় নতুন চিকন পাতাগুলি ঝিলমিল করছে, আর ঐ বেণুবনের মধ্যে চঞ্চলতার বিরাম নেই। সন্ধ্যার সময় টুকরো চাঁদ যখন ধীরে ধীরে আকাশে উঠতে থাকে তখন

সুপুরিগাছের শাখাগুলি ঠিক যেন ছোটো ছেলের হাত-নাড়ার মতো চাঁদমামাকে টী দিয়ে যাবার জন্যে ইশারা করে ডাকতে থাকে। এখন চৈত্রমাসের ফসল সমস্ত উঠে গিয়েছে, ছাদের থেকে দেখতে পাচ্ছি, চষা মাঠ দিক-প্রান্ত ছড়িয়ে পড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে কিছু বৃষ্টির জন্যে। মাঠের যে অংশে বাবলাবনের নীচে চাষ পড়ে নি সেখানে ঘাসে ঘাসে একটুখানি স্নিগ্ধ সবুজের প্রলেপ, আর সেইখানে গ্রামের গোরুগুলো চরছে। এই উদার-বিস্তৃত চষা মাঠের মাঝে মাঝে ছায়াবগুণ্ঠিত 'এক-একটি পল্লী— সেইখান থেকে আঁকাবাঁকা পায়ে-চলা পথ বেয়ে গ্রামের মেয়েরা ঝকঝকে পিতলের কলসী নিয়ে দুটি তিনটি করে সার বেঁধে প্রায় সমস্ত বেলাই জলাশয় থেকে জল নিতে চলেছে। আগে পদ্মা কাছে ছিল—এখন নদী বহুদূরে সরে গেছে— আমার তেতালা ঘরের জানালা দিয়ে তার একটুখানি আভাস যেন আন্দাজ করে বুঝতে পারি, অথচ একদিন এই নদীর সঙ্গে আমার কত ভাব ছিল। শিলাইদহে যখনই আসতুম তখন দিনরাত্তির ঐ নদীর সঙ্গেই আমার আলাপ চলত; রাত্রে আমার স্বপ্নের সঙ্গে ঐ নদীর কলধ্বনি মিশে যেত আর নদীর কলস্বরে আমার জাগরণের প্রথম অভ্যর্থনা শুনতে পেতেম। তার পরে কত বৎসর বোলপুরের মাঠে মাঠে কাটল, কতকাল সমুদ্রের এ পারে ও পারে পাড়ি দিলুম—এখন এসে দেখি সে-নদী যেন আমাকে চেনে না। ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে দেখি, মাঝখানে কত মাঠ, কত গ্রামের আড়াল, সবশেষে উত্তর-দিগন্তে আকাশের নীলাঞ্চলের নীলতর পাড়ের মতো একটি বনরেখা দেখা যায়। সেই নীল রেখাটির কাছে ঐ যে একটি ঝাপসা বাষ্পলেখাটির মতো দেখতে পাচ্ছি, জানি ঐ আমার সেই পদ্মা। আজ সে আমার কাছে অনুমানের বিষয় হয়েছে। এই তো মানুষের জীবন। ক্রমাগতই কাছের জিনিস দূরে চলে যায়, জানা জিনিস ঝাপসা হয়ে আসে, আর যে স্রোত বন্যার মতো প্রাণমনকে প্লাবিত করেছে, সেই স্রোত একদিন অশ্রুবাষ্পের একটি রেখার মতো জীবনের একান্তে অবশিষ্ট থাকে।

এখন বেলা ফুরিয়ে এসেছে, অল্প একটুখানি মেঘেতে আকাশ ঢাকা, দিনাবসানেও বাগানে পাখির ডাকে একটুও ক্লান্তি দেখছি নে। দুই কোকিলে কেবলই জবাব চলেছে, কেউ হার মানতে চাচ্ছে না— তা ছাড়া আরও অনেক পাখি ডাকছে, তাদের ডাক স্পষ্ট করে চেনা যায় না। সকলের ডাক মিশিয়ে জড়িয়ে গেছে, অন্য দিনের মতো বাতাস আজ দুরন্ত নয়, ঝাউগাছগুলি স্তব্ধ এবং নিঃশব্দ হয়ে গেছে। আজ অষ্টমীর চাঁদ দেখছি মেঘের পর্দার আড়ালে রাত্রি যাপন করবে।

আমার ঘরের দক্ষিণদিকে ঐ ছাদে একটি কেদারা পাতা আছে— ঐখানে সন্ধ্যার সময় আমি গিয়ে বসি। এ কয়দিন দ্বিতীয়ার চাঁদ থেকে আরম্ভ করে অষ্টমীর চাঁদ পর্যন্ত প্রত্যেকেই উদয়কালে এই কবির সঙ্গে মুকাবিলা করেছে। ঐ চাঁদ হচ্ছে আমার জন্মদিনের অধিপতি। আমি যখন ছাদে বসি তখন আমার বামে পূর্ব আকাশ থেকে বৃহস্পতি আমার মুখের দিকে তাকায় আর পশ্চিম আকাশ থেকে চন্দ্রমা।— এইবার ক্রমে একটু অন্ধকার হয়ে আসছে— ঘরের মধ্যকার এই ঘোলা আলোয় আর দৃষ্টি চলছে না, বাইরে গিয়ে বসবার সময় হল।

তুমি আমার কাছে বড়ো চিঠি চেয়েছিলে, বড়ো চিঠিই লিখলুম। লিখতে পারলুম, তার কারণ এখানে অবকাশ আছে। কিন্তু এই চিঠি যখন ডাকে দেব, অর্থাৎ কাল বৃহস্পতিবারে— কলকাতায় রওনা হব। সেখানে ট্রাম আছে, মোটর আছে; ইলেকট্রিক-পাখা আছে, সময় নেই। তার পরে বোলপুরে যাব— সেখানে শালের বনে ফুল ফুটেছে, আমবাগানে ফল ধরেছে; সেখানে মাঠ আছে বিস্তীর্ণ, আকাশ আছে অবারিত, কিন্তু সেখানেও অবকাশ নেই।

চিঠি জিনিসটা ছোট্ট, মালতী-ফুলের মতো, কিন্তু সেই চিঠি যে-আকাশের মধ্যে ফুটে ওঠে সেই আকাশ মালতী-লতারই মতো বড়ো। আমাদের যত কেজো লোকের অবকাশ টবের গাছ, তার থেকে যে-সব পত্রোদ্গম হয় সে তো পোস্টকার্ডের চেয়ে বড়ো হতে চায় না। ইতি ২২ চৈত্র ১৩২৮

৪৭

শান্তিনিকেতন

এতদিনে তুমি কাশী পৌঁচেছ, পথের মধ্যে ভিড় পাও নি তো? এখন কেমন আছ—লিখো। তোমার যাবার পরদিন থেকেই বিদ্যালয়ের কাজ রীতিমত আরম্ভ হয়ে গেছে, রোজই কমিটি, মিটিং এবং ক্লাসের কাজও চলছে। ছেলেরা অনাবৃষ্টির পরে আষাঢ়ের ধারার মতো কলরব করতে করতে এখানকার শূন্য ঘর সব পূর্ণ করে দিয়েছে। এখন আমার কাজের আর অন্ত নেই।

মেয়েরা সকলেই পরশুরাম হয়ে উঠেছে—কুড়ুল দিয়ে ঠকাঠক্ গাছ কাটতে লেগে গেছে। তারা আছে ভালো। এ দিকে আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি শুরু হয়েছে, আর বৃষ্টিস্নাত স্নিগ্ধ উজ্জ্বল রোদ্দুর তার পরশপাথর ঠেকিয়ে সমস্ত আকাশকে সোনা করে তুলেছে। আমি আমার সামনের খোলা জানলা দিয়ে ঐ শাল তাল শিরীষ মহুয়া ছাতিমের দল-বাঁধা বনের দিকে প্রায় তাকিয়ে থাকি। এখন আমার ঘড়িতে সাড়ে দুপুর, অর্থাৎ সাধারণ ঘড়িতে দুপুর। ছেলেরা তাদের মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করে দলে দলে কুয়োতলায় মুখ ধুতে আসছে—দীর্ঘ ছুটির দুঃখ-দিনের পরে কাকগুলো এঁটো শালপাতার উপর শ্রাদ্ধবাড়ির ভিখিরির পালের মতো এসে পড়েছে। বাতাসটি মধুর হয়ে বইছে, জাম গাছের চিকন পাতার ঘনিমার উপর রৌদ্র ঝিলমিল করে উঠছে, পাটল রঙের দুটো গোরু ল্যাজ দিয়ে পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে ধীর মন্দ গমনে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে—আমি চেয়ে চেয়ে দেখছি আর ভাবছি। ইতি ১ জুলাই ১৩২৯

৪৮

কলকাতা

কলকাতা শহরটা আমি মোটেই পছন্দ করি নে—মনে হয় যেন ইঁট-কাঠের একটা মস্ত জন্তু আমাকে একেবারে গিলে ফেলেছে। তার উপরে আবার আকাশ মেঘে লেপা, রাত্তির থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। শান্তিনিকেতনের মাঠে যখন বৃষ্টি নামে তখন তার ছায়ায় আকাশের আলো করুণ হয়ে আসে, ঘাসে ঘাসে পুলক লাগে, গাছগুলি যেন কথা কইতে চায়, আমার মনের মধ্যে গান জেগে ওঠে আর তার সুর গিয়ে পৌঁছয় দিনুর ঘরে। আর এখানে নববর্ষা বাড়ির ছাদে ঠোকর খেতে খেতে খোঁড়া হয়ে পড়ে—কোথায় তার নৃত্য, কোথায় তার গান, কোথায় তার সবুজ রঙের উত্তরীয়, কোথায় তার পুবে বাতাসে উড়ে-পড়া জটাজাল।

কথা হচ্ছে, এবার শ্রাবণ মাসে আর বছরের মতো কলকাতায় বর্ষামঙ্গল গান হবে। কিন্তু যে গান শান্তিনিকেতনের মাঠে তৈরি সে গান কি কলকাতা শহরের হাটে জমবে। এখানে অনুরোধে পড়ে কখনো কখনো আমার নতুন বর্ষার গান গাইতে হয়েছে। কিন্তু এখানকার বৈঠকখানায় সেই গানের সুর ঠিক মতো বাজে না। তোমাদের ওখানে এতদিনে বোধ হয় বর্ষা নেমেছে, অতএব তোমার নতুন শেখা বর্ষার গান কখনো কখনো গুন্‌গুন্ স্বরে গাইতে পারবে, কখনো-বা এসরাজে বাজিয়ে তুলবে। তুমি যাওয়ার পর আরও কিছু কিছু নতুন গান আমার সেই খাতায় জমে উঠেছে, কলকাতায় না এলে আরও জমত। এ দিকে দিনুবাবুও দাঁত তোলাবার জন্যে দু তিন দিন হল কলকাতায় এসেছেন; আষাঢ় মাসের বর্ষাকে এ শহরে যেমন মানায় না, দিনুবাবুকেও তেমনি। আজ সকালেই সে পালাবে স্থির করেছে। ইতি ২৯ আষাঢ় ১৩২৯

৪৯

আত্রাই নামক একটি নদীর উপর বোটে করে ভেসে চলেছি। বর্ষার মেঘ ঘন হয়ে আকাশ আচ্ছন্ন করেছে, একটু ঝোড়ো বাতাসের মতো বইছে, পাল তুলে দিয়েছে। নদী কূলে কূলে পরিপূর্ণ, স্রোত খরতর, দলে দলে শৈবাল ভেসে আসছে। পল্লীর আঙিনার কাছ পর্যন্ত জল উঠেছে; ঘন বাঁশের ঝাড়; আম কাঁঠাল তেঁতুল কুল শিমুল নিবিড় হয়ে উঠে গ্রামগুলিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে; মাঝে মাঝে নদীর তীরে তীরে কাঁচা ধানের খেতে জল উঠেছে, কচি ধানের মাথা জলের উপর জেগে আছে। দুই তটে স্তরে স্তরে সবুজ রঙের ঘনিমা ফুলে ফুলে উঠেছে, তারই মাঝখান দিয়ে বর্ষার খোলা নদীটি তার গেরুয়া রঙের ধারা বহন করে ব্যস্ত হয়ে চলেছে, সমস্তটার উপর বাদল-সায়াহ্নের ছায়া। বৃষ্টি নেমে এল— দূরে মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যাস্তের একটা ম্লান আভা এই বৃষ্টিধারার আবেগের উপর যেন সান্ত্বনার ক্ষীণ প্রয়াসের মতো এসে পড়েছে।

আমার এই বোট ছাড়া নদীতে আর নৌকা নেই। এই জলস্থল-আকাশের ছায়াবিষ্ট নিভৃত শ্যামলতার সঙ্গে মিল করে একটি গান তৈরি করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু হয়তো হয়ে উঠবে না। আমার দুই চক্ষু এখন বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে চায়— খাতার দিকে চোখ রাখবার এখন সময় নয়। অনেক দিন বোলপুরে শুকনো ডাঙায় কাটিয়ে এসেছি, এখন এই নদীর উপর এসে মনে হচ্ছে— পৃথিবীর যেন মনের কথাটি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। নদী আমি ভারি ভালোবাসি; আর ভালোবাসি আকাশ। নদীতে আকাশে চমৎকার মিলন, রঙে রঙে, আলোয় ছায়ায়— ঠিক যেন আকাশের প্রতিধ্বনির মতো। আকাশ পৃথিবীতে আর কোথাও আপনার সাড়া পায় না এই জলের উপর ছাড়া।

আজ রাত্রের গাড়িতেই কলকাতায় যাব মনে করে ভালো লাগছে না। ইতি ২ শ্রাবণ ১৩২৯

৫০

আজ বুধবারে সকালে মন্দিরের কাজ শেষ করে যেই আমার কুটীরের সামনে উত্তরদিকের বারান্দায় বসেছি অমনি নানাবিধ চিঠি ও খবরের কাগজের সঙ্গে তোমার চিঠি এসে পৌঁছল। এর আগে দু-এক দিন খুব ঘন বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, আজও স্তূপাকার কালো মেঘ আকাশক্ষেত্রের এ দিকে ও দিকে ভ্রূকুটি করে বসে আছে; এখনি তারা বৃষ্টিবাণ বর্ষণ করবে বলে ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু আজ প্রথম সকালের মেঘের ফাঁক দিয়ে অরুণোদয় খুব সুন্দর হয়ে দেখা দিয়েছিল। আমি তখন পূর্বদিকের বারান্দায় বসেছিলুম, আমার মনের সঙ্গে যেন তার মুখোমুখি কথা চলছিল। মন যেদিন তার চোখ মেলে, সেদিন প্রত্যেক সকালবেলাটিই তার কাছে অপূর্ব হয়ে দেখা দেয়। বিশ্বলক্ষ্মী তাঁর অন্দরের দ্বারের কাছে রোজই দাঁড়িয়ে থাকেন, যেদিন আমরা প্রস্তুত হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাত পাতি, সেদিন তাঁর দান মুঠো ভরে পেয়ে থাকি। পৃথিবী থেকে যাবার সময় আমি এই কথা বলে যেতে পারব যে, এমন দান আমি অনেক পেয়েছি।

সেপ্টেম্বরের আরম্ভে আমার বোম্বাই যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। কেননা, সেপ্টেম্বরের ১৫ই তারিখে কলকাতায় আমাদের শারদোৎসবের পালা বসবে— আমাকে সাজতে হবে সন্ন্যাসী। আমার এই সন্ন্যাসী সাজবার আর কোনো অর্থ নেই— অর্থ-সংগ্রহ ছাড়া। শুনে তোমরা বিস্মিত হোয়ো না, তোমাদের বারাণসী-ধামে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা সন্ন্যাসী সেজেছেন অর্থের প্রত্যাশায়, আর যাঁদের প্রত্যাশা নিরর্থক হয় নি।

এলম্‌হার্স্ট সাহেব এসেছেন। তাঁর কাছে শুনলুম তুমিও নাকি আসক্তি-বন্ধন ছেদন করে সন্ন্যাসিনী হবার চেষ্টায় আছ। সেইজন্যেই কি লজিক-পড়া শুরু করেছ। কিন্তু লজিক জিনিসটা

হচ্ছে কাঁটা-গাছের বেড়া, তাতে করে মানসক্ষেত্রের ফসলকে নির্বোধ গোরু-বাছুরের উৎপাত থেকে রক্ষা করা চলে; কিন্তু আকাশ থেকে যে-সব বর্ষণ হয়—রৌদ্রই বল, বৃষ্টিই বল, তার থেকে নিরাপদ হবার উপায় তোমার ঐ ন্যায়শাস্ত্রের বেড়া নয়। তুমি আমাকে ভয় দেখিয়েছ যে, এবার আমার সঙ্গে দেখা হলে তুমি আমার লজিকের পরীক্ষা নেবে। আমি আগে থাকতেই হার মেনে রাখছি। পৃথিবীতে দুই জাতের মানুষ আছে। একদলকে লজিকের নিয়ম পদে পদে মিলিয়ে চলতে হয়, কেননা তারা পায়ে হেঁটে চলে—আর একদল ন্যায়শাস্ত্রের উপর দিয়ে চলে যায়, উনপঞ্চাশ বায়ু তাদের বাহন, তারা এ পক্ষ ও পক্ষের বিরোধ খণ্ডন করতে করতে নিজের পথ খুঁজে মরে না—তারা এককালে নিজেরই দুই পক্ষ বিস্তার করে সেই পথ দিয়ে চলে যায়, যে পথ হচ্ছে রবি-কিরণের পথ।

এই প্রসঙ্গে, এই পত্র-লেখক কোন্ জাতের লোক তার একটু আভাসমাত্র যদি দিই তা-হলে তুমি বলে বসবে—তিনি ভারি অহংকারী। যারা লজিকের অহংকার করে তাল ঠুকে বেড়ায়, তারাই নন্‌লজিক্যাল্‌দের ব্যোমপথ-যাত্রার পক্ষ-বিধুননের মাহাত্ম্য খর্ব করবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে মহিমা তো যুক্তির দ্বারা আত্মসমর্থনের অপেক্ষা করে না; সে আপন অচিহ্নিত পথে আপন গতিবেগের দ্বারাই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

আজ এখানেই ইতি। ১৩ই ভাদ্র ১৩২৯

৫১

তুমি যে তোমার লজিকের খাতার পাতা ছিঁড়ে আমাকে চিঠি লিখেছ তাতে বুঝতে পারছি, লজিক সম্বন্ধে আলোচনা পড়ে তোমার উপকার হয়েছে। লজিক যেমনি পড়া হয়ে যায় অমনি তার আর কোনো প্রয়োজন থাকে না। যে-কলাপাতায় খাওয়া হয়ে যায় সে-কলাপাতা ফেলে দিলে ক্ষতি হয় না; কিন্তু যে-তালপাতার উপর মেঘদূত লেখা হয়েছে সেটা ফেলবার জিনিস নয়।

আমরা এবার দু-তিন দিন ধরে বর্ষামঙ্গল করেছি। তার ফল কী হয়েছে, একবার দেখো। আজ ভাদ্রমাসের আঠারই তারিখ অর্থাৎ শরৎকালের আরম্ভ, কিন্তু বর্ষার আয়োজন এখনো ভরপুর রয়েছে। আকাশ ঘন মেঘে কালো হয়ে আছে, থেকে থেকে ঝমাঝম বৃষ্টি হচ্ছে। আমার কবিত্বের এই আশ্চর্য প্রভাব দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেছি। এমন-কি শুনতে পাই, আমার এই বর্ষামঙ্গলের জোর কাশী পর্যন্ত পৌঁচেছে। সেখানেও বৃষ্টি চলছে। বোধ হচ্ছে, আমরা যখন শারদোৎসব করব তার পর থেকেই শরতের আরম্ভ হবে। শারদোৎসবের রিহার্সালে আমাকে অস্থির করেছে। রোজ দুপুরবেলায় বিভূতি এসে একবার করে আমার কাছ থেকে আগাগোড়া পাঠ নিয়ে যায়; ছোটো ছেলেরা যে-রকম পড়া মুখস্থ করে আমাকে তাই করতে হয়। কিন্তু এমনি আমার বুদ্ধি, তবু রিহার্সালের সময় কেবল ভুলি—ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত হাসে—এত অপমান সে আর কী বলব।

যাই হোক, যদি তুমি আমার শারদোৎসব দেখতে আস তা হলে বোধ হয় দেখবে, ঠিক ঠিক মুখস্থ বলে যাচ্ছি। তোমার বাবাকে শারদোৎসব দেখবার জন্যে আসতে বলে দিয়েছি। কিন্তু যে-রকম ব্যস্ত মানুষ, তাঁর মনে থাকলে হয়। ঐ বিভূতি এল—এইবার আমার পড়া দিই গে যাই। ১৮ই ভাদ্র ১৩২৯

৫২

কলিকাতা

কলকাতায় সব দলবল নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ি একতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত কলরবে মুখরিত হয়ে উঠেছে; পা ফেলতে সাবধান হতে হয়, পাছে একটা-না-একটা ছেলেকে মাড়িয়ে দিই, এমনি ভিড়। আমি অন্যমনস্ক মানুষ, কোন্‌ দিকে তাকিয়ে চলি তার ঠিক নেই। ওরা যখন-তখন কোনো খবর না দিয়ে আমার পায়ের কাছে এসে পড়ে প্রণাম করে। কখন তাদের মাটির সঙ্গে চ্যাপ্টা করে দিয়ে তাদের উপর দিয়ে চলে যাব এই ভয়ে এই ক'দিন ধুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে চলছি।

মেয়ের দলও এবার নেহাত কম নয়। নুটু থেকে আরম্ভ করে অতিসূক্ষ্ম অতিক্ষুদ্র লতিকা পর্যন্ত। ননীবালা তাদের দিনরাত সামলাতে সামলাতে হয়রান হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমাকে দেখবার লোক কেউ নেই; স্বয়ং অ্যান্ডরুজ সাহেব পাঞ্জাবে আকালীদের নাকাল সম্বন্ধে তদন্ত করতে অমৃতসরে চলে গেছেন। লেভি সাহেবেরা গেছেন বোম্বাই; বৌমা আছেন শান্তিনিকেতনে। সুতরাং আমাকে ঠিকমত শাসনে রাখতে পারে এমন অভিভাবক কেউ না থাকাতে আমি হয়তো উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যেতে পারি এমন আশঙ্কা আছে। আপাতত যা-তা বই পড়তে আরম্ভ করেছি, কেউ নেই আমাকে ঠেকায়। তার মধ্যে লজিকের বই একখানাও নেই। এমনি করে পড়া ফাঁকি দিয়ে বাজে পড়া পড়ে সাতাশ বছর কেটে গেল, এখন চেতনা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তার কোনো লক্ষণ নেই।

আমি ভেবেছিলুম— সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি তোমাদের ছুটি; তা যখন নেই তখন শারদোৎসব দেখা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব; কারণ ওটা হচ্ছে ছুটির নাটক। ওর সময়ও ছুটির, ওর বিষয়ও ছুটির। রাজা ছুটি নিয়েছে রাজত্ব থেকে, ছেলেরা ছুটি নিয়েছে পাঠশালা থেকে। তাদের আর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই কেবল একমাত্র হচ্ছে— 'বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা'। ওর মধ্যে একটা উপনন্দ কাজ করছে, কিন্তু সেও তার ঋণ থেকে ছুটি পাবার কাজ।

তোমরা যখন ছুটি পাবে, আমরা তখন বোম্বাই অভিমুখে রেলপথে ছুটছি। কিন্তু সে-পথ মোগলসরাই দিয়ে যায় না, সে হচ্ছে বেঙ্গল নাগপুর লাইন। তার পরে বোম্বাই হয়ে মাদ্রাজ, মাদ্রাজ হয়ে মালাবার, মালাবার হয়ে সিংহল, সিংহল হয়ে পুনশ্চ বোম্বাই। এমনি বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরপাক খেতে খেতে অবশেষে একদিন নভেম্বর মাসের কোন্‌ তারিখে শান্তিনিকেতনে এসে একখানা লম্বা কেদারার উপর চিত হয়ে পড়ব। তার পরেই আবার শুরু হবে সাতই পৌষের পালা। তার পরে আরও কত কী আছে তার ঠিক নেই। ছুটির নাটক লিখলেই কি ছুটি পাওয়া যায়। আমি ইস্কুল পালিয়েও ছুটি পেলুম না, ইস্কুলের আবর্তের মধ্যে লাটিমের মতো ঘুরতে লাগলুম। অংক কষতে ঢিলেমি করলুম, আজ চাঁদার অঙ্কের ধ্যান করতে করতে আহার-নিদ্রা বন্ধ। ইংরেজি প্রবাদে এই রকম ব্যাপারকেই বলে থাকে ভাগ্যের বিদ্রূপ।

এতদিন পরে আমাদের এখানে রৌদ্রোজ্জ্বল চেহারা দেখা দিয়েছে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু সে শরতের ক্ষণিক বৃষ্টি। দিন সুন্দর, রাত্রি নির্মল, মেঘ রঙিন, বাতাস শিশির-স্নিগ্ধ। এ হেন কালে অতলস্পর্শ অকর্মণ্যতার মধ্যে ডুবে থাকাই ছিল বিধির বিধি, কিন্তু ভাগ্যের লিখন বিধির বিধিকেও অতিক্রম করে, এই কথা স্মরণ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এই পত্র সমাপন করি। ইতি ২৪ ভাদ্র ১৩২৯

৫৩

শান্তিনিকেতন

ইতিমধ্যে আমার দৈনিক কার্যকলাপের একটুখানি scene বদলে গেছে। সেই বড়ো ঘরটা ছেড়ে দিয়েছি, সেটা রাস্তার ধারে থাকাতে যখন-তখন যে-সে এসে উৎপাত করত। এখন এসেছি দক্ষিণের বারান্দার পূর্ব কোণে না'বার ঘরটার ঠিক বিপরীত প্রান্তে—একটি ছোটো ঘরে। এ ঘরটার গোড়া-পত্তন তুমি বোধ হয় দেখেছিলে। আমার সেই কালো স্লেট-বাঁধানো লেখবার টেবিলে ঘরের প্রায় সমস্ত জায়গা জুড়ে গিয়েছে, কেবল আর-একটিমাত্র চৌকি আছে। ঘরের মধ্যে লোকের ভিড় হবার জায়গা রাখি নি।

এখন মধ্যাহ্ন, ক'টা বেজেছে ঠিক বলতে পারি নে, কারণ আমার ঘড়ি বন্ধ। বন্ধ না থাকলেও যে ঠিক সময় পাওয়া যেত তা নয়; তুমি আমার সেই ঘড়ির পরিচয় জান। এইটুকু বলতে পারি, কিছু পূর্বেই একখানা পরোটা ডাল ও তরকারি-সংযোগে আহার করে লিখতে বসেছি।

রৌদ্র প্রখর, শরতের সাদা মেঘ স্তরে স্তরে আকাশের যেখানে-সেখানে স্ফীত হয়ে পড়ে আছে, বাইরে থেকে শালিখ পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছি, বামের রাস্তা দিয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করতে করতে মন্দ-গমনে গোরুর গাড়ি চলেছে, আমার ডানদিকের দক্ষিণের জানালা দিয়ে কাঁচ ধানের খেতের প্রান্তে সুদূর তালগাছের সার দেখা যাচ্ছে, তন্দ্রালস ধরণীর দীর্ঘনিশ্বাসটি নিয়ে আতপ্ত হাওয়া ধীরে ধীরে আমার পিঠে এসে লাগছে।

এরকম দিনে কাজ করতে ইচ্ছে করে না, এই মেঘগুলোর মতোই অকেজো হাওয়ায় মনটা বিনা কারণে দিগন্ত পার হয়ে ভেসে যেতে চায়। জানলার বাইরে মাঝে মাঝে যখন চোখ ফেরাই তখন মনে হয় যেন সুর-বালকেরা স্বর্গের পাঠশালা থেকে গুরুমহাশয়কে না বলে পালিয়ে এসেছে। আকাশের এ কোণ ও কোণ থেকে সবুজ পৃথিবীর দিকে তারা উঁকি মারছে। হাওয়ায় হাওয়ায় তাদের কানাকানি শুনে আমার মনটাও উতলা হয়ে দৌড় মারবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু আমরা যে পৃথিবীর ভারাকর্ষণের টানে বাঁধা; মাটি আমাদের পা জড়িয়ে থাকে, কিছুতেই ছাড়তে চায় না। অতএব মনের একটা ভাগ জানালার বাইরে দিয়ে যতই উড়তে থাক্, আর-একটা ভাগ ডেস্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পত্ররচনায় ব্যস্ত। দূরে কোথাও যদি যাবার ব্যবস্থা হয়, মনটাকে রেলভাড়ার কথা ভাবতে হয়; দেবতার মতো শরতের মেঘের উপর চড়ে মালতী-সুগন্ধী হাওয়ার হিল্লোলে বেণু-বনের পাতায় পাতায় দোল খেয়ে খেয়ে বিনা ব্যয়ে ভ্রমণ করে বেড়াতে পারে না। ইতি ৩১ ভাদ্র ১৩৩০

৫৪

মাদ্রাজ

এইমাত্র মাদ্রাজে এসে পৌঁচেছি। আজ রাত্রে কলম্বো রওয়ানা হব। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ও নানা ঘূর্ণিপাকের আঘাতে দেহ মন ভেঙে ছিঁড়ে বেঁকে চুরে গিয়েছিল, ক্লান্তি ও অবসাদের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এসে বেরিয়েছিলুম।

গাড়ি যখন সবুজ প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে চলছিল তখন মনে হচ্ছিল যেন নিজের কাছ থেকে নিজে দৌড়ে ছুটে পালাচ্ছি। একদিন আমার বয়স অল্প ছিল; আমি ছিলুম বিশ্বপ্রকৃতির বুকের মাঝখানে; নীল আকাশ আর শ্যামল পৃথিবী আমার জীবন-পাত্রে প্রতিদিন নানা রঙের অমৃত রস ঢেলে দিত; কল্পলোকের অমরাবতীতে আমি দেবশিশুর মতোই আমার বাঁশি হাতে বিহার করতুম। সেই শিশু সেই কবি আজ ক্লিষ্ট হয়েছে, লোকালয়ের কোলাহলে তার মন উদ্‌ভ্রান্ত, তারই পথের ধুলায় তার চিত্ত ম্লান। সে আপন ক্লান্ত বিক্ষত চরণ নিয়ে তার সেই সৌন্দর্যের স্বপ্নরাজ্যে

ফিরে যেতে চাচ্ছে। তার জীবনের মধ্যাহ্নে কাজও সে অনেক করেছে, ভুলও কম করে নি; আজ তার কাজ করবার শক্তি নেই, ভুল করবার সাহস নেই। আজ জীবনের সন্ধ্যাবেলায় সে আর-একবার বিশ্ব-প্রকৃতির আঙিনায় দাঁড়িয়ে আকাশের তারার সঙ্গে সুর মিলিয়ে শেষ বাঁশি বাজিয়ে যেতে চায়। যে-রহস্যলোক থেকে এই মর্ত্যলোকে একদিন সে এসেছিল সেখানে ফিরে যাবার আগে শান্তি-সরোবরে ডুব দিয়ে স্নান করতে চায়। তেমন করে ডুব দিতে যদি পারে তা হলে তার জীর্ণতা তার ম্লানতা সমস্ত ঘুচে যাবে; আবার তার মধ্য থেকে সেই চিরশিশু বাহির হয়ে আসবে।

সংসারের জটিলতায় ঘিরে ঘিরে আমাদের চিত্তের উপর যে জীর্ণতার আবরণ সৃষ্টি করে সেটা তো ধ্রুব সত্য নয়, সেটা মায়া। সেটা যে মুহূর্তে কুহেলিকার মতো মিলিয়ে যায় অমনি নবীন নির্মল প্রাণ আপনাকে ফিরে পায়। এমনি করে বারে বারে আমরা নূতন জীবনে নূতন শিশুর রূপ ধরি। সেই নূতন জীবনের সরল বাল্যমাধুর্যের জন্যে আমার সমস্ত মন আগ্রহে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে।

আজ আমি চলেছি সমুদ্র পারে কাজের ক্ষেত্রে; যখন সেই কাজের ভিড়ে থাকব তখন হয়তো আমার ভিতরকার কর্মী আর-সকল কথা ভুলিয়ে দেবে। কিন্তু তবু সেই সুদূর গানের ঝরনাতলায় বাঁশির বেদনা ভিতরে ভিতরে আমাকে নিশ্চয়ই ডাকবে; ডাকবে সেই নির্জন নির্মল নিভৃত ঝরনা-তলার দিকেই। সেই ডাক আমার সমস্ত ক্লান্তি ও অবসাদের ভিতর দিয়ে আমার বুকের মধ্যে আজ এসে কুহরিত হচ্ছে। বলছে, সেখানে ফিরে যাবার পথ এখনো সম্পূর্ণ হয় নি, এখনো আমার সুরের পাথেয় সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায় নি, এখনো সেই নব নব বিস্ময়ে দিশাহারা বালককে কোনো এক ভিতরমহলে খুঁজে পাওয়া যায়।

তাই, যদিও আজ চলেছি পশ্চিম-সমুদ্রের তীরে, আমার মন খুঁজে বেড়াচ্ছে আর-এক তীরে সকল-কাজভোলা সেই বালকটাকে। পূরবী গানে সে আপন লীলা শেষ করতে না পারলে সন্ধ্যা ব্যর্থ হবে, এখন সে কোথায় ঘুরে মরছে। ফিরে আয়, ফিরে আয়, বলে ডাক পড়েছে। একজন কে তার গান শুনতে ভালোবাসে। আকাশের মাঝখানে তার আসন পাতা, সেই তো শিশুকালে তাকে বাঁশির দীক্ষা দিয়েছিল, নিশীথরাতের শেষ রাগিণী বাজানো হলে তার পরে তার বাঁশি ফিরে নেবে। আজ কেবলই সেই কথাই আমার মনে পড়ছে। ইতি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৪

৫৫

কলিকাতা

আজ সন্ধ্যাবেলায় ঘন মেঘ করে খুব একচোট বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন বৃষ্টি নেই কিন্তু আকাশে মেঘ কালো হয়ে জমে আছে। প্রশান্ত আর রানী কোথায় চলে গেছে— বাড়িতে কেউ কোথাও নেই— আমি টেবিলের উপর ইলেকট্রিক আলো জ্বালিয়ে দিয়ে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি। সমস্ত দিন নানা কাজে, নানা লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতে, নানা লেখায় কেটে গিয়েছে। এক মুহূর্ত বিশ্রাম করতে পাই নি— লেখার মাঝে মাঝে খুব ঘুম পেয়েছিল, কিন্তু কষে ঝাঁকানি দিয়ে ঘুম তাড়িয়ে কাজ করে গেছি। নিজেকে একরকম করে খুঁচিয়ে কাজ করানো একেবারেই ভালো নয় জানি। তাতে কাজও যে ভালো হয় তা নয় আর বিশ্রামও মাটি হয়ে যায়। কিন্তু আমার কুষ্ঠিতে কর্ম-স্থানে শনি আছে, সে আমাকে দয়ামায়া একটুও করে না— কষে খাটিয়ে নেয়, মজুরিও যথেষ্ট দেয় না। কাল দিনের বেলায় আবার নানারকম কাজের পালা আরম্ভ হবে— তাই এখন চিঠি লিখতে বসেছি। এখন সন্ধে সাড়ে আটটা— তোমার ওখানে হয়তো তুমি এখন পড়ার বই নিয়ে বসে গেছ। আজকাল আমাকে যেরকম দায়ে পড়ে খাটতে হয়, যদি তোমাদের বয়সে সেইরকম পরীক্ষার পড়ায় খাটতুম তা হলে এতদিনে হয়তো আই.এ. পরীক্ষা পাসের তকমা পরে কন্যাকর্তাদের মহলে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে পারতুম। তা হলে পণের টাকায় বিশ্বভারতীর ঝুলি ভর্তি করে দিনে-দুপুরে নাকে তেল

দিয়ে নিদ্রা দিতে একটুও দ্বিধা বোধ হত না। আমার কলকাতার কাজ শেষ হয়ে এল, পর্শু কিংবা শনিবার শান্তিনিকেতনে ফিরে যাব, সেখানে এতদিনে শরৎকালের রৌদ্দুরে আকাশে সোনার রঙ ধরেছে আর শিউলি ফুলের গন্ধে বাতাস ভোর হয়ে আছে। আজ বুধবার; আজ থেকে ছেলেরা সব হো হো করতে করতে বাড়িমুখো দৌড়েছে—কাল-পর্শুর মধ্যে আশ্রম প্রায় শূন্য হয়ে যাবে। এ দিকে শুক্লপক্ষ এসে পড়ল, দিনে দিনে সন্ধ্যার পেয়ালাটি চাঁদের আলোয় ভর্তি হয়ে উঠতে থাকবে। আমি বারান্দায় আরাম কেদারার উপর পা তুলে দিয়ে একলা চুপ করে বসব—চাঁদ আমার মনের ভাবনাগুলির 'পরে আপন রুপোর কাঠি ছুঁইয়ে তাদের স্বপ্নময় করে তুলবে, ছাতিমতলায় ঝরে-পড়া মালতী ফুলের গন্ধ জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশে যাবে। সেই সুগন্ধি শুক্লরাত আমার মনের একোণ-ওকোণে উঁকি দিয়ে কোনো নতুন গানের সুর খুঁজে বেড়াবে—বেহাগ কিংবা সিন্ধু কিংবা কানাড়া। থাক্—সে-সব কথা পরে হবে, আপাতত চিঠি বন্ধ করে এখানকার বারান্দায় মেঘাবৃত রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে মনটাকে ডুবিয়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম করতে যাই। যদি ক্লান্তির ঘুমে চোখ বুজে আসে তা হলে তাকে তাড়া দিয়ে দেশছাড়া করব না।

৫৬

বোম্বাই

তুমি লিখেছ, তোমার সব কথার জবাব দিতে; অতএব তোমার চিঠি সামনে রেখে জবাব দিতে বসেছি—এবারে বোধ হয় পুরো মার্ক পাব। তোমার প্রথম প্রশ্ন—আমি এখন কোথায় আছি। ছিলুম নানা জায়গায়, প্রধানত কাঠিয়াবাড়ে, তার পরে আমেদাবাদে, তার পরে বরোদায়, আজ সকালে এসেছি বোম্বাইয়ে। এতকাল ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম বলে সমস্ত চিঠি এখানে জমা হচ্ছিল, তার মধ্যে তোমার দু-খানা চিঠি। লেফাফার সর্বাঙ্গে নানা প্রদেশের নানা ডাকঘরের কালো কালো চাকা চাকা ছাপ। এখানে বেশিদিন থাকা হবে বলে বোধ হচ্ছে না, কারণ ৭ই পৌষ নিকটবর্তী। অতএব দু-চার দিনের মধ্যে সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং বঙ্গভূমিকে প্রণাম করতে যাত্রা করব। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, যাই হোক খৃস্টমাসের পূর্বেই ফিরব। তোমার বাবাকে লিখে দিয়েছি, তোমাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসতে। এই পর্যন্ত তোমার উত্তর দিয়ে তোমার চিঠি খুঁজে দেখলুম, আর কোনো প্রশ্ন নেই।

এলম্‌হার্স্ট আমার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে বরোদায় এসে জ্বরে পড়েছিল। সেখানে তিন দিন বিছানায় পড়েছিল, এখানে এসে সেরে উঠেছে। আর আমার সঙ্গে আছে গোরা। এবারে সাধুচরণের সঙ্গ ও সেবা থেকে বঞ্চিত আছি। বনমালী নামধারী উৎকলবাসী সেবক বৌমার আদেশক্রমে এসেছে। সে সর্বদাই ভয়ে ভয়ে আছে। সব চেয়ে ভয় আমাকে, অথচ আমি বিশেষ ভয়ংকর নই। দ্বিতীয় ভয়, পাছে রাজবাড়ির অন্নপানে বিদেশে গঙ্গাতীর হতে দূরবর্তী দেশে অকালমৃত্যু ঘটে। তৃতীয় ভয়, রেলগাড়িতে বিদেশীয় জনতাকে—তারা ওর সঙ্গে হিন্দী বলে, ও বলে বাংলা—তাতে কথোপকথন উভয় পক্ষেই দুর্বোধ হয়ে ওঠে। ওর বিশ্বাস, এজন্য বিদেশীরাই দায়িক। ওর আর-একটা বিশেষ গুণ এই যে, ওকে যদি কোনো কাপড় বের করে দিতে বলি তা হলে সিন্দুক থেকে একে-একে সব কাপড় বের করে তবে সেটা নির্বাচন করতে পারে, আবার সবগুলো তাকে একে একে ফিরে গোছাতে হয়। মানুষের আয়ু যখন অল্প, সময় যখন সীমাবন্ধ, তখন এরকম চাকর নিয়ে মর্ত্যলোকে অসুবিধায় পড়তে হয়। ওর একটা মস্ত গুণ এই যে, ও ঠাট্টা করলে বুঝতে পারে, ঠিক সময়ে হাসতে জানে; আমার late lamented সাধুচরণের সে বালাই ছিল না। আমার আবার স্বভাব এমন যে, ঠাট্টা না করে বাঁচি নে, তাই ও যতক্ষণ কাপড় বের করছে আর গোছাচ্ছে আমি ততক্ষণ সেই সুদীর্ঘ সময় ঠাট্টা করে অতিবাহন করি। যাই হোক, ওকে বিদেশী হাওয়া, বিদেশী খাওয়া, বিদেশী ভিড় থেকে ফিরে নিয়ে গিয়ে কোনোমতে বৌমার হাতে আস্তটি

ফিরে দিতে পারলে নিরুদ্‌বিগ্ন হই। আমার যে কতবড়ো দায়িত্ব, সে ওকে না দেখলে ভালো করে অনুধাবন করতেই পারবে না। একে আমার বিশ্বভারতী, তার উপর বনমালী। ভাবনার আর অন্ত নাই।

আমি বোধ হয় দুই-তিন দিনের মধ্যেই রওনা হব, অতএব যদি চিঠি লেখ তো শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় লিখো। ইতি বোধ হচ্ছে ১০ই ডিসেম্বর

৫৭

জাহাজ প্রায় ন-টার সময় ছাড়ল। সেই আমাদের পুরোনো গঙ্গাতীর— এই তীর ছেলেবেলায় আমাকে কতদিন কী গভীর আনন্দ দিয়েছে। ধীরে ধীরে যখন সেই শান্ত সুন্দর নিভৃত শ্যামল শোভা দেখি আর এই উদার গঙ্গার কলধ্বনি শুনি তখন আমার সমস্ত মন একে আঁকড়ে ধরে— ছোটো শিশু যেমন করে মাকে ধরে। আমি জীবনের কতকাল যে এই নদীর বাণী থেকেই আমার বাণী পেয়েছি, মনে হয় সে যেন আমি আমার আগামী জন্মেও ভুলব না। বস্তুত এই জীবনেই আমার সেই জন্ম কেটে গিয়েছে।

ছেলেবেলায় যখন সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে এই জলস্থল আকাশের মহাপ্রাঙ্গণে আমার খেলা আরম্ভ করেছিলুম, সেই খেলার দিন আজ ফুরিয়ে গেছে। আজ এই বিপুল বিচিত্র মাতৃ-অঙ্গন থেকে বহুদূরে এসেছি। সকালবেলাকার ফুলের সব শিশির শুকিয়ে গেছে— আজ প্রখর মধ্যাহ্নের কর্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশ করছি। আমার কর্মের সঙ্গে পাখির গান, নদীর কল্লোল, পাতার মর্মর আপনার সুর যোগ করে দিতে পারছে না— অন্যমনস্ক হয়ে আছি। নীলাকাশের অনিমেষ দৃষ্টি আমার দৃষ্টিতে এসে তেমন অবারিত আত্মীয়তায় মিলছে না, কর্মশালার জানলা-দরজার ফাঁক দিয়ে এই বিশ্বের হৃদয় আগেকার মতো তেমন সম্পূর্ণ করে আমার বুকের উপর এসে পড়ে না, মাঝখানে কত রকমের চিন্তার, কত রকমের চেষ্টার ব্যবধান। এই তো দেখছি সেদিনকার লীলা-লোক থেকে আজকের দিনের কর্মলোকে জন্মান্তর গ্রহণ করেছি, তবু সেদিনকার ভোরবেলায় সানাইয়ের সুরে ভৈরবী আলাপ এখনো ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে মনকে উতলা করে দেয়।

কাল গঙ্গার উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলুম। তখন কেবলই জলের থেকে আকাশ থেকে তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলি থেকে এই প্রশ্ন আমার কানে আসছিল, 'মনে পড়ে কি।' এবারকার এই দেহের ক্ষেত্র থেকে যখন বেরিয়ে চলে যাব, তখনো কি এই প্রশ্ন ক্ষণে ক্ষণে আমার হৃদয়ের উপর হাওয়ায় ভেসে আসবে। এবারকার এই জীবনের এই ধরণীর সমস্ত 'জন্মান্তর-সৌহৃদানি'।

কাল দোল-পূর্ণিমা গঙ্গার উপরেই দেখা দিল। জাহাজ বালির চরে জোয়ারের অপেক্ষায় রাত্রি সাতটা পর্যন্ত আটকে পড়েছিল। সমুদ্রে যদি দোল-পূর্ণিমার আবির্ভাব হত তা হলেই তার নাম সার্থক হত— তা হলে দোলনও থাকত, আর নীলের সঙ্গে শুভ্রের, সাগরের সঙ্গে জ্যোৎস্নার মিলনও দেখতুম।

আজ ভোরে উঠে দেখলুম, জাহাজ কূলরেখাহীন জলরাশির উপরে ভেসে চলেছে— 'মধুর বহিছে বায়ু।' আজ শনিবার; সোমবারে শুনছি রেঙুনে পৌঁছব। সেখানে দিন-দুয়েক সভা-সমিতি, অভ্যর্থনা, মাল্যচন্দন, বক্তৃতা, জনতার করতালিতে আমাকে চেপে মারবার চেষ্টা। তার পরে বোধ হয় বুধবারে কোনো এক সময়ে মুক্তি। ইতি চৈত্র ১৩৩০

৫৮

কলম্বো

ভারতবর্ষ ছেড়ে এই খানিকক্ষণ হল সিংহলে এসেছি। কাল সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়বে। আকাশ অন্ধকার। ঘন বাদলার মেঘ সকালবেলার সোনার আলো গণ্ডূষ ভরে পান করেছে, কেবল তার তলানি ছায়াটুকু বাকি। দেশে থাকলে সকালবেলায় দিনের এই ছায়াবগুণ্ঠন ভালোই লাগত। ইচ্ছে করত, কাজকর্ম বন্ধ করে মাঠের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নরাজ্যে মনটাকে পথহারা করে ছেড়ে দিই, কিংবা হয়তো গুন-গুন সুরে নতুন একটা গান ধরে মেঘদূতের কবির সঙ্গে যথাসাধ্য পাল্লা দিতে বসতুম।

কিন্তু এখানে মনটা বিরাগী, তার একতারাটা কোথায় হারিয়ে গেছে। 'গানহারা মোর হৃদয়তলে' এই অন্ধকার যেন একটা স্তূপাকার মূর্ছার মতো উপুড় হয়ে পড়ে আছে। সুদূর এবং সুদীর্ঘ যাত্রার দিনের মুখে আকাশ থেকে সূর্যের আলো দেবতার অভিনন্দনের মতো বোধ হয়। আজ মনে হচ্ছে যেন আমার সেই জয়যাত্রার অধিদেবতা নীরব। গগন-বীণার থেকে যে বাণী পাথেয় স্বরূপ সংগ্রহ করে সমুদ্রে পাড়ি দিতুম, সেই আকাশভরা বাণী আজ কোথায়।

কালস্রোতে যে বাড়িতে এসে আছি, এ একজন লক্ষপতির বাড়ি। প্রকাণ্ড প্রাসাদ। আরামে বাস করবার পক্ষে অত্যন্ত বেশি ঢিলে, ঘরগুলোর প্রকাণ্ড হাঁ মানুষকে গিলে ফেলে। যে ঘরে বসে আছি, তার জিনিসগুলো এত বেশি ফিটফাট যে, মনে হয় সেগুলো ব্যবহার করবার জন্যে নয়, সাজিয়ে রাখবার জন্যে। বসবার শোবার আসবাবগুলো শুচিবায়ুগ্রস্ত গৃহিণীর মতো; সন্তর্পণে থাকে, কাছে গেলে যেন মনে মনে সরে যায়। এই ধনী-ঘরের অতিপারিপাট্য এও যেন একটা আবরণের মতো।

আমার সেই তেতালা ঘরের চেহারা মনে পড়ে তো? সমস্ত এলোমেলো। সেখানে শোবার বসবার জন্যে একটুও সাবধান হবার দরকার হয় না—তার অপরিচ্ছন্নতাই যেন তার প্রসারিত বাহু, তার অভ্যর্থনা। সে ঘর ছোটো, কিন্তু সেখানে সবাইকেই ধরে। মানুষকে ঠিকমত ধরবার পক্ষে হয় ছোট্ট একটি কোণ, নয় অসীম বিস্তৃত আকাশ। ছেলেবেলায় যখন আমি পদ্মার কোলে বাস করতুম, তখন পাশাপাশি আমার দুই রকম বাসাই ছিল। এক দিকে ছিল আমার নৌকোর ছোটো ঘরটি, আর-এক দিকে ছিল দিগন্ত প্রসারিত বালুর চর। ঘরের মধ্যে আমার অন্তরাত্মার নিশ্বাস, আর চরের মধ্যে তার প্রশ্বাস। এক দিকে তার অন্দরের দরজা, আর-এক দিকে তার সদর দরজা।

৫৯

শান্তিনিকেতন

পৃথিবীতে অধিকাংশ বড়ো বড়ো জ্ঞানীলোকেরা এই গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন যে, রাত্রিটা নিদ্রা দেবার জন্যে। নিজেদের এই মত সমর্থন করবার জন্যে তাঁরা স্বয়ং সূর্যের দোহাই দেন। তাঁরা আশ্চর্য গবেষণা এবং যুক্তি-নৈপুণ্য প্রয়োগ করে বলেছেন, রাত্রে নিদ্রাই যদি প্রকৃতির অভিপ্রায় না হবে তবে রাত্রে অন্ধকার হয় কেন, অন্ধকারে দর্শন মনন শক্তির হ্রাস হয় কেন, উক্ত শক্তির হ্রাস হলে কেনই বা আমাদের দেহ তন্দ্রালস হয়ে আসে।

গভীর অভিজ্ঞতা-প্রসূত এই-সকল অকাট্য যুক্তির কোনো উত্তর দেওয়া যায় না, কাজেই পরাস্ত হয়ে ঘুমোতে হয়। তাঁরা সব শাস্ত্র ও তার সব ভাষ্য ঘেঁটে বলেছেন যে, রাত্রে ঘুম না হওয়াকেই বলে অনিদ্রা, ঘুম হলে অনিদ্রা ব'লে জগতে কোনো পদার্থ থাকতই না। এতবড়ো কথার সমস্ত তাৎপর্য বুঝতেই পারি না, আমাদের তো দিব্যদৃষ্টি নেই, আমরা যথোচিত পরিমাণে ধ্যান-ধারণা-নিদিধ্যাসন

করি নি, সেইজন্যে সংশয়-কলুষিত চিত্তে আমরা তর্ক করে থাকি যে, রাত্রে কয়েক ঘণ্টা না ঘুমোলেই সেটাকে লোকে অনিদ্রা বলে নিন্দা করে, অথচ দিনে অন্তত বারো ঘণ্টাই যে কেউ ঘুমোই নে সেটাকে ডাক্তারিশাস্ত্রে বা কোনো শাস্ত্রেই তো অনিদ্রা'বলে না। শুনে প্রবীণ লোকেরা আমাদের অর্বাচীন বলে হাস্য করেন; বলেন আজকালকার ছেলেরা দু-চার পাতা ইংরেজি পড়ে তর্ক করতে আসে, জানে না যে, 'বিশ্বাসে মিলয়ে নিদ্রা, তর্কে বহু দূর।'

কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ বার বার পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তর্ক যতই করতে থাকি নিদ্রা ততই চড়ে যায়, বিনা তর্কে তার হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়। অতএব আজকের মতো চিঠি বন্ধ করে শুতে যাই। যদি সম্ভবপর হয় তা হলে কাল সকালে চিঠি লিখব।

চিঠি বন্ধ করা যাক, কেরোসিন প্রদীপটা নিবিয়ে দেওয়া যাক, ঝপ করে বিছানাটার মধ্যে গিয়ে পড়া যাক। শীত—বেশ একটু রীতিমত শীত, উত্তর-পশ্চিমের দিক থেকে হিমের হাওয়া বইছে। দেহটা বলে উঠছে, 'ওহে কবি, আর বাড়াবাড়ি ভালো নয়, তোমার বাজে কথার কারবার বন্ধ করে মোটা কম্বলটা মুড়ি দিয়ে একবার চক্ষু বোজো, অনন্যগতি আমি তোমার আজন্মকালের অনুগত, আর আমরণ কালের সহচর, তাই বলেই কি আমাকে এত দুঃখ দিতে হবে। দেখছ না, পা দুটো কী রকম ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, আর মাথাটা হয়েছে গরম? বুঝছ না কি, এটা তোমার রাত্রিকালের উপযোগী মন্দাক্রান্তা ছন্দের যতি-ভঙ্গের লক্ষণ—এ সময়ে মস্তিষ্কের মধ্যে শার্দূলবিক্রীড়িতের অবতারণা করা কি প্রকৃতিস্থ লোকের কর্ম।'—কায়ার এই অভিযোগ শুনে তার প্রতি অনুরক্ত আমার মন বলে উঠছে, 'ঠিক ঠিক। একটুও অত্যুক্তি নেই।' ক্লান্ত দেহ এবং উদ্‌ভ্রান্ত মন উভয়ের সম্মিলিত এই বেদনাপূর্ণ আবেদনকে আর উপেক্ষা করতে পারি নে, অতএব চললুম শুতে।

প্রভাত হয়েছে। তুমি আমাকে বড়ো চিঠি লিখতে অনুরোধ করেছ। সে অনুরোধ পালন করা আমার সহজ-স্বভাব-সংগত নয়, পল্লবিত করে পত্র লেখার উৎসাহ আমার একটুও নেই। আমি কখনো মহাকাব্য লিখি নি বলে আমার স্বদেশী অনেক পাঠক আমাকে অবজ্ঞা করে থাকেন—মহাচিঠিও আমি সচরাচর লিখতে পারি নে। কিন্তু যেহেতু আমার চীনপ্রয়াণের সময় নিকটবর্তী, এবং তখন আমার চিঠিও অগত্যা যথেষ্ট বিরল হয়ে আসবে, সেইজন্যে আগামী অভাব পূরণ করবার উদ্দেশ্যে বড়ো চিঠি লিখছি। সে অভাব যে অত্যন্ত গুরুতর অভাব এবং সেটা পূরণ করবার আর কোনো উপায় নেই, এটা কল্পনা করছি নিছক অহংকারের জোরে। আসল কথাটা এই যে, এবার তুমি যে চিঠিটা লিখেছ সেটা তোমার সাধারণ চিঠির আদর্শ অনুসারে কিছু বড়ো, সেইজন্যে তোমার সঙ্গে পাল্লা দেবার গর্বে বড়ো চিঠি লিখছি। তুমি নামতায় আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, লজিকেও তোমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা আমার কর্ম নয়, কিন্তু বাগ্‌বিস্তার বিদ্যায় কিছুতেই আমাকে পেরে উঠবে না। এই একটি মাত্র জায়গায় যেখানে আমার জিত আছে, সেইখানে তোমার অহংকার খর্ব করবার ইচ্ছা আমার মনে এল। ইতি ৫ই ফাল্গুন ১৩৩০

রাশিয়ার চিঠি

প্রকাশ : ১৯৩১

কল্যাণীয় শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ করকে
আশীর্বাদ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
২৫ বৈশাখ ১৩৩৮

কল্যাণীয়েষু

রথী, রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল। যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোনো দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলছে। চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে কম পরে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা রোগে মরে, উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে— জীবনযাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ সুবিধে সব কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে— উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে। আমি অনেকদিন এদের কথা ভেবেছি, মনে হয়েছে এর কোনো উপায় নেই। একদল তলায় না থাকলে আর একদল উপরে থাকতেই পারে না, অথচ উপরে থাকার দরকার আছে। উপরে না থাকলে নিতান্ত কাছের সীমার বাইরে কিছু দেখা যায় না— কেবলমাত্র জীবিকা নির্বাহ করার জন্যে তো মানুষের মনুষ্যত্ব নয়। একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম করে তবেই তার সভ্যতা। সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফলেছে। মানুষের সভ্যতায় এক অংশে অবকাশ রক্ষা করার দরকার আছে। তাই ভাবতুম, যে সব মানুষ, শুধু অবস্থার গতিকে নয়, শরীর মনের গতিকে নীচের তলায় কাজ করতে বাধ্য এবং সেই কাজেরই যোগ্য, যথাসম্ভব তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য সুখ সুবিধার জন্যে চেষ্টা করা উচিত। মুশকিল এই, দয়া করে কোনো স্থায়ী জিনিস করা চলে না; বাইরে থেকে উপকার করতে গেলে পদে পদে তার বিকার ঘটে। সমান হতে পারলে তবেই সত্যকার সহায়তা সম্ভব। যাই হোক আমি ভালো করে কিছুই ভেবে পাই নি— অথচ অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে অমানুষ করে রেখে তবেই সভ্যতা সমুচ্চ থাকবে এ কথা অনিবার্য বলে মেনে নিতে গেলে মনে ধিক্কার আসে। ভেবে দেখো না, নিরন্ন ভারতবর্ষের অন্নে ইংলণ্ড পরিপুষ্ট হয়েছে। ইংলণ্ডের অনেক লোকেরই মনের ভাব এই যে, ইংলণ্ডকে চিরদিন পোষণ করাই ভারতের সার্থকতা। ইংলণ্ড বড়ো হয়ে উঠে মানবসমাজে বড়ো কাজ করবে, অতএব এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চিরকালের মতো একটা জাতিকে দাসত্বে বদ্ধ করে রাখলে দোষ নেই। এরা যদি কম খায়, কম পরে, ...

রাশিয়ার চিঠি
রথীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রের এক পৃষ্ঠা

১

মস্কৌ

রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল। যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোনো দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলছে।

চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে, কম প'রে, কম শিখে, বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা রোগে মরে, উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে—জীবনযাত্রার জন্য যত-কিছু সুযোগ-সুবিধে সব-কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।

আমি অনেক দিন এদের কথা ভেবেছি, মনে হয়েছে এর কোনো উপায় নেই। এক দল তলায় না থাকলে আর-এক দল উপরে থাকতেই পারে না, অথচ উপরে থাকার দরকার আছে। উপরে না থাকলে নিতান্ত কাছের সীমার বাইরে কিছু দেখা যায় না। কেবলমাত্র জীবিকানির্বাহ করার জন্যে তো মানুষের মনুষ্যত্ব নয়। একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম করে তবেই তার সভ্যতা। সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফলেছে। মানুষের সভ্যতায় এক অংশে অবকাশ রক্ষা করার দরকার আছে। তাই ভাবতুম, যে-সব মানুষ শুধু অবস্থার গতিকে নয়, শরীরমনের গতিকে নীচের তলায় কাজ করতে বাধ্য এবং সেই কাজেরই যোগ্য, যথাসম্ভব তাদের শিক্ষাস্বাস্থ্য-সুখসুবিধার জন্যে চেষ্টা করা উচিত।

মুশকিল এই, দয়া করে কোনো স্থায়ী জিনিস করা চলে না; বাইরে থেকে উপকার করতে গেলে পদে পদে তার বিকার ঘটে। সমান হতে পারলে তবেই সত্যকার সহায়তা সম্ভব হয়। যাই হোক, আমি ভালো করে কিছুই ভেবে পাই নি, অথচ অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে, তবেই সভ্যতা সমুচ্চে থাকবে এ কথা অনিবার্য বলে মেনে নিতে গেলে মনে ধিক্‌কার আসে।

ভেবে দেখো-না, নিরন্ন ভারতবর্ষের অন্নে ইংলন্ড পরিপুষ্ট হয়েছে। ইংলন্ডের অনেক লোকেরই মনের ভাব এই যে, ইংলন্ডকে চিরদিন পোষণ করাই ভারতবর্ষের সার্থকতা। ইংলন্ড বড়ো হয়ে উঠে মানবসমাজে বড়ো কাজ করছে, অতএব এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে চিরকালের মতো একটা জাতিকে দাসত্বে বন্ধ করে রেখে দিলে দোষ নেই। এই জাতি যদি কম খায়, কম পরে, তাতে কী যায় আসে—তবুও দয়া করে তাদের অবস্থার কিছু উন্নতি করা উচিত, এমন কথা তাদের মনে জাগে। কিন্তু একশো বছর হয়ে গেল; না পেলুম শিক্ষা, না পেলুম স্বাস্থ্য, না পেলুম সম্পদ।

প্রত্যেক সমাজের নিজের ভিতরেও এই একই কথা। যে মানুষকে মানুষ সম্মান করতে পারে না সে মানুষকে মানুষ উপকার করতে অক্ষম। অন্তত যখনই নিজের স্বার্থে এসে ঠেকে তখনই মারামারি কাটাকাটি বেধে যায়। রাশিয়ায় একেবারে গোড়া ঘেঁষে এই সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা চলছে। তার শেষ ফলের কথা এখনো বিচার করবার সময় হয় নি, কিন্তু আপাতত যা চোখে পড়ছে তা দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। আমাদের সকল সমস্যার সব চেয়ে বড়ো রাস্তা হচ্ছে শিক্ষা। এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত—ভারতবর্ষ তো প্রায় সম্পূর্ণই বঞ্চিত। এখানে সেই শিক্ষা যে কী আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়। কোনো মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্মা হয়ে না থাকে এজন্যে কী প্রচুর আয়োজন ও কী বিপুল উদ্যম। শুধু শ্বেত-রাশিয়ার জন্যে নয়—মধ্য-এশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মতো বেগে শিক্ষা বিস্তার করে

চলেছে; সায়েন্সের শেষ-ফসল পর্যন্ত যাতে তারা পায় এইজন্যে প্রয়াসের অন্ত নেই। এখানে থিয়েটারে ভালো ভালো অপেরা ও বড়ো নাটকের অভিনয়ে বিষম ভিড়, কিন্তু যারা দেখছে তারা কৃষি ও কর্মীদের দলের। কোথাও এদের অপমান নেই। ইতিমধ্যে এদের যে দুই-একটা প্রতিষ্ঠান দেখলুম সর্বত্রই লক্ষ করেছি এদের চিত্তের জাগরণ এবং আত্মমর্যাদার আনন্দ। আমাদের দেশের জনসাধারণের তো কথাই নেই, ইংলন্ডের মজুর-শ্রেণীর সঙ্গে তুলনা করলে আকাশপাতাল তফাত দেখা যায়। আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েছি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই করছে। আমাদের কর্মীরা যদি কিছুদিন এখানে এসে শিক্ষা করে যেতে পারত তা হলে ভারি উপকার হত। প্রতিদিনই আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার তুলনা করে দেখি আর ভাবি, কী হয়েছে আর কী হতে পারত। আমার আমেরিকান সঙ্গী ডাক্তার হ্যারি টিম্বর্‌স্‌ এখানকার স্বাস্থ্যবিধানের ব্যবস্থা আলোচনা করছে— তার প্রকৃষ্টতা দেখলে চমক লাগে— আর কোথায় পড়ে আছে রোগতপ্ত অভুক্ত হতভাগ্য নিরুপায় ভারতবর্ষ! কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে এদের জনসাধারণের অবস্থার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল— এই অল্পকালের মধ্যে দ্রুত বেগে বদলে গেছে— আমরা পড়ে আছি জড়তার পাঁকের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন।

এর মধ্যে যে গলদ কিছুই নেই তা বলি নে; গুরুতর গলদ আছে। সেজন্যে একদিন এদের বিপদ ঘটবে। সংক্ষেপে সে গলদ হচ্ছে, শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে— কিন্তু ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেঁকে না— সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তা হলে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার, নয় মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে, কিংবা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।

এখানকার ছেলেদের মধ্যে বিভাগ করে কর্মের ভার দেওয়া হয়েছে দেখলুম, ওদের আবাসের ব্যবস্থা সম্বন্ধে একদল স্বাস্থ্য, একদল ভাণ্ডার ইত্যাদি নানারকম তদারকের দায়িত্ব নেয়; কর্তৃত্ব সবই ওদের হাতে, কেবল একজন পরিদর্শক থাকে। শান্তিনিকেতনে আমি চিরকাল এই-সমস্ত নিয়ম প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছি— কেবলই নিয়মাবলী রচনা হয়েছে, কোনো কাজ হয় নি। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে, স্বভাবতই পাঠবিভাগের চরম লক্ষ্য হয়েছে পরীক্ষায় পাস করা, আর সব-কিছুই উপলক্ষ; অর্থাৎ হলে ভালোই, না হলেও ক্ষতি নেই। আমাদের অলস মন জবরদস্ত দায়িত্বের বাইরে কাজ বাড়াতে অনিচ্ছুক। তা ছাড়া শিশুকাল থেকেই আমরা পুঁথিমুখস্থ বিদ্যাতেই অভ্যস্ত।

নিয়মাবলী রচনা করে কোনো লাভ নেই; নিয়ামকদের পক্ষে যেটা আন্তরিক নয় সেটা উপেক্ষিত না হয়ে থাকতে পারে না। গ্রামের কাজ ও শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে আমি যে-সব কথা এতকাল ভেবেছি এখানে তার বেশি কিছু নেই— কেবল আছে শক্তি, আছে উদ্যম, আর কার্যকর্তাদের ব্যবস্থাবুদ্ধি। আমার মনে হয়, অনেকটাই নির্ভর করে গায়ের জোরের উপর— ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ অপরিপুষ্ট দেহ নিয়ে সম্পূর্ণ বেগে কাজ করা দুঃসাধ্য; এখানকার শীতের দেশের লোকের হাড় শক্ত বলেই কাজ এমন করে সহজে এগোয়। মাথা গুনতি করে আমাদের দেশের কর্মীদের সংখ্যা নির্ণয় করা ঠিক নয়, তারা পুরো একখানা মানুষ নয়।

ইতি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

২

মস্কৌ

স্থান রাশিয়া। দৃশ্য, মস্কৌয়ের উপনগরীতে একটি প্রাসাদভবন। জানলার ভিতর দিয়ে চেয়ে দেখি, দিক্‌প্রান্ত পর্যন্ত অরণ্যভূমি, সবুজ রঙের ঢেউ উঠেছে— ঘন সবুজ, ফিকে সবুজ, বেগনির সঙ্গে মেশামেশি সবুজ, হলদের-আমেজ-দেওয়া সবুজ। বনের শেষসীমায় বহু দূরে গ্রামের কুটীরশ্রেণী। বেলা প্রায় দশটা, আকাশে স্তরে স্তরে মেঘ করেছে, অবৃষ্টিসংরম্ভ সমারোহ, বাতাসে ঋজুকায়া পপ্‌লার গাছের শিখরগুলি দোদুল্যমান।

[১] রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত।

মস্কৌয়েতে কয়দিন যে হোটেলে ছিলুম তার নাম গ্র্যান্ড হোটেল। বাড়িটা মস্ত, কিন্তু অবস্থা অতি দরিদ্র। যেন ধনীর ছেলে দেউলে হয়ে গেছে। সাবেক কালের সাজসজ্জা কতক গেছে বিকিয়ে, কতক গেছে ছিঁড়ে; তালি দেওয়ারও সংগতি নেই; ময়লা হয়ে আছে, ধোবার বাড়ির সম্পর্ক বন্ধ। সমস্ত শহরেরই অবস্থা এইরকম—একান্ত অপরিচ্ছন্নতার ভিতর দিয়েও নবাবী আমলের চেহারা দেখা যাচ্ছে, যেন ছেঁড়া জামাতেও সোনার বোতাম লাগানো, যেন ঢাকাই ধুতি রিফু-করা। আহারে ব্যবহারে এমন সর্বব্যাপী নির্ধনতা য়ুরোপের আর কোথাও দেখা যায় না। তার প্রধান কারণ; আর-আর সব জায়গায় ধনীদরিদ্রের প্রভেদ থাকাতে ধনের পুঞ্জীভূত রূপ সব চেয়ে বড়ো করে চোখে পড়ে—সেখানে দারিদ্র্য থাকে যবনিকার আড়ালে নেপথ্যে; সেই নেপথ্যে সব এলোমেলো, নোংরা অস্বাস্থ্যকর, দুঃখে দুর্দশায় দুষ্কর্মে নিবিড় অন্ধকার। কিন্তু বাইরে থেকে গিয়ে আমরা যেখানে বাসা পাই সেখানকার জানলা দিয়ে যা-কিছু দেখতে পাই সমস্তই সুভদ্র, শোভন, সুপরিপুষ্ট। এই সমৃদ্ধি যদি সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যেত তা হলে তখনই ধরা পড়ত, দেশের ধন এত কিছু বেশি নয় যাতে সকলেরই ভাত কাপড় যথেষ্ট পরিমাণে জোটে। এখানে ভেদ নেই বলেই ধনের চেহারা গেছে ঘুচে; দৈন্যেরও কুশ্রীতা নেই, আছে অকিঞ্চনতা। দেশ-জোড়া এই অধন আর কোথাও দেখি নে বলেই প্রথমেই এটা আমাদের খুব চোখে পড়ে। অন্য দেশে যাদের আমরা জনসাধারণ বলি এখানে তারাই একমাত্র।

মস্কৌয়ের রাস্তা দিয়ে নানা লোক চলেছে। কেউ ফিটফাট নয়, দেখলেই বোঝা যায় অবকাশ-ভোগীর দল একেবারে অন্তর্ধান করেছে। সকলকেই স্বহস্তে কাজকর্ম করে দিনপাত করতে হয়, বাবুগিরির পালিশ কোনো জায়গাতেই নেই। ডাক্তার পেট্রোভ বলে এক ভদ্রলোকের বাড়ি যেতে হয়েছিল, তিনি এখানকার একজন সম্মানী লোক, উচ্চপদস্থ কর্মচারী। যে বাড়িতে তাঁর আপিস সেটা সেকালের একজন বড়োলোকের বাড়ি। কিন্তু ঘরে আসবাব অতি সামান্য, পারিপাট্যের কোনো লক্ষণ নেই; নিষ্কার্পেট মেঝের এক কোণে যেমন-তেমন একখানা টেবিল; সবসুদ্ধ, পিতৃবিয়োগে ধোবা-নাপিত-বর্জিত অশৌচদশার মতো শয্যাসনশূন্য ভাব, যেন বাইরের লোকের কাছে সামাজিকতা রক্ষার কোনো দায় নেই। আমার বাসায় আহারাদির যে ব্যবস্থা তা গ্র্যান্ড হোটেল নামধারী পান্থাবাসের পক্ষে নিতান্তই অসংগত। কিন্তু এজন্যে কোনো কুণ্ঠা নেই, কেননা সকলেরই এক দশা।

আমাদের বাল্যকালের কথা মনে পড়ে। তখনকার জীবনযাত্রা ও তার আয়োজন এখনকার তুলনায় কতই অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু সেজন্যে আমাদের কারও মনে কিছুমাত্র সংকোচ ছিল না। তার কারণ, তখনকার সংসারযাত্রার আদর্শে অত্যন্ত বেশি উঁচুনিচু ছিল না। সকলেরই ঘরে একটা মোটামুটি রকমের চালচলন ছিল; তফাত যা ছিল তা বৈদগ্ধ্যের, অর্থাৎ গানবাজনা পড়াশুনো ইত্যাদি নিয়ে। তা ছাড়া ছিল কৌলিক রীতির পার্থক্য, অর্থাৎ ভাষাভাবভঙ্গি আচারবিচার-গত বিশেষত্ব। কিন্তু তখন আমাদের আহারবিহার ও সকল-প্রকার উপকরণ যা ছিল তা দেখলে এখনকার সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকদের মনেও অবজ্ঞা জাগতে পারত।

ধনগত বৈষম্যের বড়াই আমাদের দেশে এসেছে পশ্চিম মহাদেশ থেকে। একসময়ে আমাদের দেশে যখন হাল আমলের আপিসবিহারী ও ব্যাবসাদারদের ঘরে নতুন টাকার আমদানি হল তখন তারা বিলিতি বাবুগিরির চলন শুরু করে দিলে। তখন থেকে আসবাবের মাপেই ভদ্রতার পরিমাপ আরম্ভ হয়েছে। তাই আমাদের দেশেও আজকাল কুলশীল রীতিনীতি বুদ্ধিবিদ্যা সমস্ত ছাপিয়ে চোখে পড়ে ধনের বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতার গৌরবই মানুষের পক্ষে সব চেয়ে অগৌরব। এরই ইতরতা যাতে মজ্জার মধ্যে প্রবেশ না করে সেজন্যে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

এখানে এসে যেটা সব চেয়ে আমার চোখে ভালো লেগেছে সে হচ্ছে, এই ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব। কেবলমাত্র এই কারণেই এ দেশে জনসাধারণের আত্মমর্যাদা এক মুহূর্তে অবারিত হয়েছে। চাষাভুষো সকলেই আজ অসম্মানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে, এইটে দেখে আমি যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হয়েছি। মানুষে মানুষে ব্যবহার কী আশ্চর্য সহজ

হয়ে গেছে। অনেক কথা বলবার আছে, বলবার চেষ্টা করব; কিন্তু এই মুহূর্তে আপাতত বিশ্রাম করবার দরকার হয়েছে। অতএব জানলার সামনে লম্বা কেদারার উপর হেলান দিয়ে বসব, পায়ের উপর একটা কম্বল টেনে দেব— তার পরে চোখ যদি বুজে আসতে চায় জোর করে টেনে রাখতে চেষ্টা করব না। ইতি ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩০[১]

৩

মস্কৌ

বহুকাল গত হল তোমাদের উভয়কে পত্র লিখেছিলুম। তোমাদের সম্মিলিত নৈঃশব্দ্য থেকে অনুমান করি সেই যুগলপত্র কৈবল্য লাভ করেছে। এমনতরো মহতী বিনষ্টি ভারতীয় ডাকঘরে আজকাল মাঝে মাঝে ঘটছে বলে শঙ্কা করি। এই কারণেই আজকাল চিঠি লিখতে উৎসাহ বোধ করি নে। অন্তত তোমাদের দিক থেকে সাড়া না পেলে চুপ করে যাই। নিঃশব্দ রাত্রির প্রহরগুলোকে দীর্ঘ বলে মনে হয়; তেমনিতরোই নিশ্চিঠি কাল কল্পনায় অত্যন্ত লম্বা হয়ে ওঠে। তাই থেকে থেকে মনে হয় যেন লোকান্তরপ্রাপ্তি হয়েছে। তাই পাঁজি গেছে বদল হয়ে, ঘড়ি বাজছে লম্বা তালে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মতো আমার দেশে যাবার সময়কে যতই টান মারছে ততই অফুরান হয়ে বেড়ে চলেছে। যেদিন ফিরব সেদিন নিশ্চিতই ফিরব— আজকের দিন যেমন অব্যবহিত নিকটে সেদিনও তেমনিই নিকটে আসবে, এই মনে করে সান্ত্বনার চেষ্টা করি।

তা হোক, আপাতত রাশিয়ায় এসেছি— না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। এখানে এরা যা কাণ্ড করছে তার ভালোমন্দ বিচার করবার পূর্বে সর্বপ্রথমেই মনে হয়, কী অসম্ভব সাহস। সনাতন বলে পদার্থটা মানুষের অস্থিমজ্জায় মনে-প্রাণে হাজারখানা হয়ে আঁকড়ে আছে; তার কত দিকে কত মহল, কত দরজায় কত পাহারা, কত যুগ থেকে কত ট্যাক্‌সো আদায় করে তার তহবিল হয়ে উঠেছে পর্বতপ্রমাণ। এরা তাকে একেবারে জটে ধরে টান মেরেছে; ভয় ভাবনা সংশয় কিছুই মনে নেই। সনাতনের গদি দিয়েছে ঝাঁটিয়ে, নূতনের জন্যে একেবারে নূতন আসন বানিয়ে দিলে। পশ্চিম মহাদেশ বিজ্ঞানের জাদুবলে দুঃসাধ্য সাধন করে, দেখে মনে মনে তারিফ করি। কিন্তু এখানে যে প্রকাণ্ড ব্যাপার চলছে সেটা দেখে আমি সব চেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েছি। শুধু যদি একটা ভীষণ ভাঙচুরের কাণ্ড হত তাতে তেমন আশ্চর্য হতুম না— কেননা নাস্তানাবুদ করবার শক্তি এদের যথেষ্ট আছে— কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, বহুদূরব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা নূতন জগৎ গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগে গেছে। দেরি সইছে না; কেননা জগৎ জুড়ে এদের প্রতিকূলতা, সবাই এদের বিরোধী— যত শীঘ্র পারে এদের খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে— হাতে হাতে প্রমাণ করে দিতে হবে, এরা যেটা চাচ্ছে সেটা ভুল নয়, ফাঁকি নয়। হাজার বছরের বিরুদ্ধে দশ-পনেরো বছর জিতবে বলে পণ করেছে। অন্য দেশের তুলনায় এদের অর্থের জোর অতি সামান্য, প্রতিজ্ঞার জোর দুর্ধর্ষ।

এই-যে বিপ্লবটা ঘটল এটা রাশিয়াতে ঘটবে বলেই অনেক কাল থেকে অপেক্ষা করছিল। আয়োজন কত দিন থেকেই চলছে। খ্যাত-অখ্যাত কত লোক কত কাল থেকেই প্রাণ দিয়েছে, অসহ্য দুঃখ স্বীকার করেছে। পৃথিবীতে বিপ্লবের কারণ বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপক হয়ে থাকে, কিন্তু এক-একটা জায়গায় ঘনীভূত হয়ে ওঠে। সমস্ত শরীরের রক্ত দূষিত হয়ে উঠলেও এক-একটা দুর্বল জায়গায় ফোড়া হয়ে লাল হয়ে ওঠে। যাদের হাতে ধন, যাদের হাতে ক্ষমতা, তাদের হাত থেকে নির্ধন ও অক্ষমেরা এই রাশিয়াতেই অসহ্য যন্ত্রণা বহন করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে একান্ত অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে এই রাশিয়াতেই প্রতিকারসাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত।

[১] নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত।

একদিন ফরাসী-বিদ্রোহ ঘটেছিল এই অসাম্যের তাড়নায়। সেদিন সেখানকার পীড়িতেরা বুঝেছিল এই অসাম্যের অপমান ও দুঃখ বিশ্বব্যাপী। তাই সেদিনকার বিপ্লবে সাম্য সৌভ্রাত্র ও স্বাতন্ত্র্যের বাণী স্বদেশের গণ্ডি পেরিয়ে উঠে ধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু টিঁকল না। এদের এখানকার বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাণী। আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটা দেশের লোক স্বাজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে। এ বাণী চিরদিন টিঁকবে কি না কেউ বলতে পারে না। কিন্তু স্বজাতির সমস্যা সমস্ত মানুষের সমস্যার অন্তর্গত, এই কথাটা বর্তমান যুগের অন্তর্নিহিত কথা। একে স্বীকার করতেই হবে।

এই যুগে বিশ্ব-ইতিহাসের রঙ্গভূমির পর্দা উঠে গেছে। এতকাল যেন আড়ালে আড়ালে রিহার্স্যাল চলছিল, টুকরো টুকরো ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন কামরায়। প্রত্যেক দেশের চারি দিকে বেড়া ছিল। বাহির থেকে আনাগোনা করবার পথ একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু বিভাগের মধ্যে মানবসংসারের যে চেহারা দেখেছি আজ তা দেখি নে। সেদিন দেখা যাচ্ছিল একটি-একটি গাছ, আজ দেখছি অরণ্য। মানবসমাজের মধ্যে যদি ভারসামঞ্জস্যের অভাব ঘটে থাকে সেটা আজ দেখা দিচ্ছে পৃথিবীর এক দিক থেকে আর-এক দিক পর্যন্ত। এমন বিরাট করে দেখতে পাওয়া কম কথা নয়।

টোকিয়োতে যখন কোরীয় যুবককে জিজ্ঞাসা করেছিলুম 'তোমাদের দুঃখটা কী' সে বললে, 'আমাদের কাঁধে চেপেছে মহাজনের রাজত্ব, আমরা তাদের মুনফার বাহন।' আমি প্রশ্ন করলুম, 'যে কারণেই হোক, তোমরা যখন দুর্বল তখন এই বোঝা নিজের জোরে ঝেড়ে ফেলবে কী উপায়ে।' সে বললে, নিরুপায়ের দল আজ পৃথিবী জুড়ে, দুঃখে তাদের মেলাবে— যারা ধনী, যারা শক্তিমান, তারা নিজের নিজের লোহার সিন্ধুক ও সিংহাসনের চার দিকে পৃথক হয়ে থাকবে, তারা কখনো মিলতে পারবে না। কোরিয়ার জোর হচ্ছে তার দুঃখের জোর।[১]

দুঃখী আজ সমস্ত মানুষের রঙ্গভূমিতে নিজেকে বিরাট করে দেখতে পাচ্ছে, এইটে মস্ত কথা। আগেকার দিনে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে দেখেছে বলেই কোনোমতে নিজের শক্তিরূপ দেখতে পায় নি— অদৃষ্টের উপর ভর করে সব সহ্য করেছে। আজ অত্যন্ত নিরুপায় ও অন্তত সেই স্বর্গরাজ্য কল্পনা করতে পারছে যে রাজ্যে পীড়িতের পীড়া যায়, অপমানিতের অপমান ঘোচে। এই কারণেই সমস্ত পৃথিবীতেই আজ দুঃখজীবীরা নড়ে উঠেছে।

যারা শক্তিমান তারা উদ্ধত। দুঃখীদের মধ্যে আজ যে শক্তির প্রেরণা সঞ্চারিত হয়ে তাদের অস্থির করে তুলেছে তাকে বলশালীরা বাইরে থেকে ঠেকাবার চেষ্টা করছে— তার দূতদের ঘরে ঢুকতে দিচ্ছে না, তাদের কণ্ঠ দিচ্ছে রুদ্ধ করে। কিন্তু আসল যাকে সব চেয়ে ওদের ভয় করা উচিত ছিল সে হচ্ছে দুঃখীর দুঃখ— কিন্তু তাকেই এরা চিরকাল সব চেয়ে অবজ্ঞা করতে অভ্যস্ত। নিজের মুনফার খাতিরে সেই দুঃখকে এরা বাড়িয়ে চলতে ভয় পায় না, হতভাগ্য চাষীকে দুর্ভিক্ষের কবলের মধ্যে ঠেসে ধরে শতকরা দুশো তিনশো হারে মুনফা ভোগ করতে এদের হৃৎকম্প হয় না। কেননা সেই মুনফাকেই এরা শক্তি বলে জানে। কিন্তু মানুষের সমাজে সমস্ত আতিশয্যের মধ্যেই বিপদ, সে বিপদকে কখনোই বাইরে থেকে ঠেকানো যায় না। অতিশয় শক্তি অতিশয় অশক্তির বিরুদ্ধে চিরদিন নিজেকে বাড়িয়ে চলতেই পারে না। ক্ষমতাশালী যদি আপন শক্তিমদে উন্মত্ত হয়ে না থাকত তা হলে সব চেয়ে ভয় করত এই অসাম্যের বাড়াবাড়িকে— কারণ অসামঞ্জস্য মাত্রই বিশ্ববিধির বিরুদ্ধে।

মস্কৌ থেকে যখন নিমন্ত্রণ এল তখনো বলশেভিকদের সম্বন্ধে আমার মনে স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। তাদের সম্বন্ধে ক্রমাগতই উল্টো উল্টো কথা শুনেছি। আমার মনে তাদের বিরুদ্ধে একটা খটকা ছিল। কেননা গোড়ায় ওদের সাধনা ছিল জবরদস্তির সাধনা। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ করে

---

[১] দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট · কোরীয় যুবকের রাষ্ট্রিক মত।

দেখলুম, ওদের প্রতি বিরুদ্ধতা য়ুরোপে যেন অনেকটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আমি রাশিয়াতে আসছি শুনে অনেক লোকেই আমাকে উৎসাহ দিয়েছে। এমন-কি, অনেক ইংরেজের মুখেও ওদের প্রশংসা শুনেছি। অনেকে বলেছে, ওরা অতি আশ্চর্য একটা পরীক্ষায় প্রবৃত্ত।

আবার অনেকে আমাকে ভয় দেখিয়েছে; কিন্তু প্রধান ভয়ের বিষয়, আরামের অভাব; বলেছে, আহারাদি সমস্তই এমন মোটারকম যে আমি তা সহ্য করতে পারব না। তা ছাড়া এমন কথাও অনেকে বলেছে, আমাকে যা এরা দেখাবে তার অধিকাংশই বানানো। এ কথা মানতেই হবে, আমার বয়সে আমার মতো শরীর নিয়ে রাশিয়ায় ভ্রমণ দুঃসাহসিকতা। কিন্তু পৃথিবীতে যেখানে সব চেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান সেখানে নিমন্ত্রণ পেয়েও না আসা আমার পক্ষে অমার্জনীয় হত।

তা ছাড়া আমার কানে সেই কোরীয় যুবকের কথাটা বাজছিল। মনে মনে ভাবছিলুম, ধনশক্তিতে দুর্জয় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাঙ্গণদ্বারে ঐ রাশিয়া আজ নির্ধনের শক্তিসাধনার আসন পেতেছে সমস্ত পশ্চিম মহাদেশের ভ্রূকুটিকুটিল কটাক্ষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, এটা দেখবার জন্যে আমি যাব না তো কে যাবে। ওরা শক্তিশালীর শক্তিকে, ধনশালীর ধনকে বিপর্যস্ত করে দিতে চায়, তাতে আমরা ভয় করব কিসের, রাগই করব বা কেন। আমাদের শক্তিই বা কী, ধনই বা কত। আমরা তো জগতের নিরন্ন নিঃসহায়দের দলের।

যদি কেউ বলে, দুর্বলের শক্তিকে উদ্‌বোধিত করবার জন্যেই তারা পণ করেছে, তা হলে আমরা কোন্‌ মুখে বলব যে, তোমাদের ছায়া মাড়াতে নেই। তারা হয়তো ভুল করতে পারে—তাদের প্রতি-পক্ষেরাও যে ভুল করবে না তা নয়। কিন্তু আমাদের বলবার আজ সময় এসেছে যে, অশক্তের শক্তি এখনই যদি না জাগে তা হলে মানুষের পরিত্রাণ নেই, কারণ শক্তিমানের শক্তিশেল অতিমাত্র প্রবল হয়ে উঠেছে—এতদিন ভূলোক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, আজ আকাশকে পর্যন্ত পাপে কলুষিত করে তুললে; নিরুপায় আজ অতিমাত্র নিরুপায়—সমস্ত সুযোগ-সুবিধা আজ কেবল মানবসমাজের এক পাশে পুঞ্জীভূত, অন্য পাশে নিঃসহায়তা অন্তহীন।

এরই কিছুদিন পূর্বে থেকে ঢাকার অত্যাচারের কাহিনী আমার মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল। কী সব অমানুষিক নিষ্ঠুরতা, অথচ ইংলন্ডের খবরের কাগজে তার খবরই নেই—এখানকার মোটর-গাড়ির দুর্যোগে দুটো-একটা মানুষ ম'লে তার খবর এ দেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এর প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু আমাদের ধন প্রাণ মান কী অসম্ভব সস্তা হয়ে গেছে। যারা এত সস্তা তাদের সম্বন্ধে কখনো সুবিচার হতেই পারে না।

আমাদের নালিশ পৃথিবীর কানে ওঠবার জো নেই, সমস্ত রাস্তা বন্ধ। অথচ আমাদের বিরুদ্ধ বচন জগতে ব্যাপ্ত করবার সকলপ্রকার উপায় এদের হাতে। আজকের দিনে দুর্বল জাতির পক্ষে এও একটি প্রবলতম গ্লানির বিষয়। কেননা আজকের দিনের জনশ্রুতি সমস্ত জগতের কাছে ঘোষিত হয়, বাক্যচালনার যন্ত্রগুলো যে-সব শক্তিমান জাতির হাতে তারা অখ্যাতির এবং অপযশের আড়ালে অশক্তজাতীয়দের বিলুপ্ত করে রাখতে পারে। পৃথিবীর লোকের কাছে এ কথা প্রচারিত যে, আমরা হিন্দু-মুসলমানে কাটাকাটি মারামারি করি, অতএব ইত্যাদি। কিন্তু য়ুরোপেও একদা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কাটাকাটি মারামারি চলত—গেল কী উপায়ে। কেবলমাত্র শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা। আমাদের দেশেও সেই উপায়েই যেত। কিন্তু শতাধিক বৎসরের ইংরেজ-শাসনের পরে দেশে শতকরা পাঁচজনের কপালে শিক্ষা জুটেছে, সে শিক্ষাও শিক্ষার বিড়ম্বনা।

অবজ্ঞার কারণকে দূর করবার চেষ্টা না করে লোকের কাছে প্রমাণ করা যে, আমরা অবজ্ঞার যোগ্য, এইটে হচ্ছে আমাদের অশক্তির সব চেয়ে বড়ো ট্যাক্‌সো। মানুষের সকল সমস্যা সমাধানের মূলে হচ্ছে তার সুশিক্ষা। আমাদের দেশে তার রাস্তা বন্ধ, কারণ 'ল অ্যান্ড অর্ডার' আর কোনো উপকারের জন্যে জায়গা রাখলে না, তহবিল একেবারে ফাঁকা। আমি দেশের কাজের মধ্যে একটি কাজকেই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়েছিলুম; জনসাধারণকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা দেবার শিক্ষা দেব বলে এতকাল ধরে আমার সমস্ত সামর্থ্য দিয়েছি। এজন্যে কর্তৃপক্ষের আনুকূল্যও আমি প্রত্যাখ্যান

করতে চাই নি, প্রত্যাশাও করেছি, কিন্তু তুমি জান কতটা ফল পেয়েছি। বুঝতে পেরেছি, হবার নয়। মস্ত আমাদের পাপ, আমরা অশক্ত।

তাই যখন শুনলুম, রাশিয়াতে জনসাধারণের শিক্ষা প্রায় শূন্য অঙ্ক থেকে প্রভূতপরিমাণে বেড়ে গেছে, তখন মনে মনে ঠিক করলুম, ভাঙা শরীর আরও যদি ভাঙে তো ভাঙুক, ওখানে যেতেই হবে। এরা জেনেছে, অশক্তকে শক্তি দেবার একটিমাত্র উপায় শিক্ষা—অন্ন স্বাস্থ্য শান্তি সমস্তই এরই 'পরে নির্ভর করে। ফাঁকা 'ল অ্যান্ড অর্ডার' নিয়ে না ভরে পেট, না ভরে মন। অথচ তার দাম দিতে গিয়ে সর্বস্ব বিকিয়ে গেল।

আধুনিক ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় আমি মানুষ, তাই এতকাল আমার মনে দৃঢ় ধারণা ছিল, প্রায় তেত্রিশ কোটি মূর্খকে বিদ্যাদান করা অসম্ভব বললেই হয়; এজন্য আমাদের মন্দ ভাগ্য ছাড়া আর কাউকে বুঝি দোষ দেওয়া চলে না। যখন শুনেছিলুম, এখানে চাষী ও কর্মীদের মধ্যে শিক্ষা হু হু করে এগিয়ে চলেছে আমি ভেবেছিলুম, সে শিক্ষা বুঝি সামান্য একটুখানি পড়া ও লেখা ও অঙ্ক কষা—কেবলমাত্র মাথা-গুনতিতেই তার গৌরব। সেও কম কথা নয়। আমাদের দেশে তাই হলেই রাজাকে আশীর্বাদ করে বাড়ি চলে যেতুম। কিন্তু এখানে দেখলুম, বেশ পাকা রকমের শিক্ষা, মানুষ করে তোলবার উপযুক্ত, নোট মুখস্থ করে এম. এ. পাস করবার মতন নয়।

কিন্তু এ-সব কথা আর-একটু বিস্তারিত করে পরে লিখব, আজ আর সময় নেই। আজই সন্ধ্যা-বেলায় বার্লিন অভিমুখে যাত্রা করব। তার পরে ৩রা অক্টোবর আটলান্টিক পাড়ি দেব—কত দিনের মেয়াদ আজও নিশ্চিত করে বলতে পারছি নে।

কিন্তু, শরীর মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। তবু এবারকার সুযোগ ছাড়তে সাহস হয় না—যদি কিছু কুড়িয়ে আনতে পারি তা হলেই বাকি যে-ক'টা দিন বাঁচি বিশ্রাম করতে পারব। নইলে দিনে দিনে মূলধন খুইয়ে দিয়ে অবশেষে বাতি নিবিয়ে দিয়ে বিদায় নেওয়া সেও মন্দ প্ল্যান নয়; সামান্য কিছু উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে রেখে গেলে জিনিসটা নোংরা হয়ে উঠবে। সম্বল যতই কমে আসতে থাকে মানুষের আন্তরিক দুর্বলতা ততই ধরা পড়ে—ততই শৈথিল্য, ঝগড়াঝাঁটি, পরস্পরের বিরুদ্ধে কানাকানি। ঔদার্য ভরা-উদরের উপরে অনেকটা নির্ভর করে। কিন্তু যেখানেই যথার্থ সিদ্ধির একটি চেহারা দেখতে পাই সেখানেই দেখা যায় সেটা কেবলমাত্র টাকা দিয়ে হাটে কেনবার নয়—দারিদ্র্যের জমিতেই সে সোনার ফসল ফলায়। এখানকার শিক্ষাব্যবস্থায় যে অক্লান্ত উদ্যম, সাহস, বুদ্ধিশক্তি, যে আত্মোৎসর্গ দেখলুম, তার অতি অল্প পরিমাণ থাকলেও কৃতার্থ হতুম। আন্তরিক শক্তি ও অকৃত্রিম উৎসাহ যত কম থাকে টাকা খুঁজতে হয় ততই বেশি করে। ইতি ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩০[১]

৪

মস্কৌ থাকতে সোভিয়েট ব্যবস্থা সম্বন্ধে দুটো বড়ো বড়ো চিঠি লিখেছিলুম। সে চিঠি কবে পাবে এবং পাবে কি না কী জানি।

বার্লিনে এসে একসঙ্গে তোমার দুখানা চিঠি পাওয়া গেল। ঘন বর্ষার চিঠি, শান্তিনিকেতনের আকাশে শালবনের উপরে মেঘের ছায়া এবং জলের ধারায় শ্রাবণ ঘনিয়ে উঠেছে, সেই ছবি মনে জাগলে আমার চিত্ত কিরকম উৎসুক হয়ে ওঠে সে তোমাকে বলা বাহুল্য।

কিন্তু এবারে রাশিয়া ঘুরে এসে সেই সৌন্দর্যের ছবি আমার মন থেকে মুছে গেছে। কেবলই ভাবছি আমাদের দেশ-জোড়া চাষীদের দুঃখের কথা। আমার যৌবনের আরম্ভকাল থেকেই বাংলা-দেশের পল্লীগ্রামের সঙ্গে আমার নিকট-পরিচয় হয়েছে। তখন চাষীদের সঙ্গে আমার প্রত্যহ ছিল দেখাশোনা—ওদের সব নালিশ উঠেছে আমার কানে। আমি জানি, ওদের মতো নিঃসহায় জীব অল্পই

[১] প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশকে লিখিত।

আছে, ওরা সমাজের যে তলায় তলিয়ে সেখানে জ্ঞানের আলো অল্পই পৌঁছয়, প্রাণের হাওয়া বয় না বললেই হয়।

তখনকার দিনে দেশের পলিটিক্‌স্‌ নিয়ে যাঁরা আসর জমিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনও ছিলেন না যাঁরা পল্লীবাসীকে এ দেশের লোক বলে অনুভব করতেন। আমার মনে আছে পাবনা কন্‌ফারেন্সের সময় আমি তখনকার খুব বড়ো একজন রাষ্ট্রনেতাকে বলেছিলুম, আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতিকে যদি আমরা সত্য করতে চাই তা হলে সব-আগে আমাদের এই তলার লোকদের মানুষ করতে হবে। তিনি সে কথাটাকে এতই তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিলেন যে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে, আমাদের দেশাত্মবোধীরা দেশ বলে একটা তত্ত্বকে বিদেশের পাঠশালা থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন, দেশের মানুষকে তাঁরা অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেন না। এইরকম মনোবৃত্তির সুবিধে হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশ আছে বিদেশীর হাতে এই কথা নিয়ে আক্ষেপ করা, উত্তেজিত হওয়া, কবিতা লেখা, খবরের কাগজ চালানো সহজ; কিন্তু দেশের লোক আমাদের আপন লোক, এ কথা বলবামাত্র তার দায়িত্ব তখন থেকেই স্বীকার করে নিতে হয়, কাজ শুরু হয় সেই মুহূর্তে।

সেদিনকার পরেও অনেক দিন চলে গেল। সেই পাবনা কন্‌ফারেন্সে পল্লী সম্বন্ধে যা বলেছিলুম তার প্রতিধ্বনি অনেকবার শুনেছি— শুধু শব্দ নয়, পল্লীর হিতকল্পে অর্থও সংগ্রহ হয়েছে, কিন্তু দেশের যে উপরিতলায় শব্দের আবৃত্তি হয় সেইখানটাতেই সেই অর্থও আবর্তিত হয়ে বিলুপ্ত হয়েছে, সমাজের যে গভীরতলায় পল্লী তলিয়ে আছে সেখানে তার কিছুই পৌঁছল না।

একদা আমি পদ্মার চরে বোট বেঁধে সাহিত্যচর্চা করেছিলুম। মনে ধারণা ছিল, লেখনী দিয়ে ভাবের খনি খনন করব এই আমার একমাত্র কাজ, আর কোনো কাজের আমি যোগ্যই নই। কিন্তু যখন এ কথা কাউকে বলে-কয়ে বোঝাতে পারলুম না যে, আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষিপল্লীতে, তার চর্চা আজ থেকেই শুরু করা চাই, তখন কিছুক্ষণের জন্যে কলম কানে গুঁজে এ কথা আমাকে বলতে হল— আচ্ছা, আমিই এ কাজে লাগব। এই সংকল্পে আমার সহায়তা করবার জন্যে সেদিন একটিমাত্র লোক পেয়েছিলুম, সে হচ্ছে কালীমোহন। শরীর তার রোগে জীর্ণ, দু-বেলা তার জ্বর আসে, তার উপরে পুলিসের খাতায় তার নাম উঠেছে।

তার পর থেকে দুর্গম বন্ধুর পথে সামান্য পাথেয় নিয়ে চলেছে সেই ইতিহাস। চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে, এই ছিল আমার অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে— জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর; দ্বিতীয়ত, সমবায়নীতি-অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আলবাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসিতে জল আনা একই কথা।

কিন্তু এই দুটো পন্থাই দুরূহ। প্রথমত চাষীকে জমির স্বত্ব দিলেই সে স্বত্ব পরমুহূর্তেই মহাজনের হাতে গিয়ে পড়বে, তার দুঃখভার বাড়বে বৈ কমবে না। কৃষিক্ষেত্র একত্রীকরণের কথা আমি নিজে একদিন চাষীদের ডেকে আলোচনা করেছিলুম। শিলাইদহে আমি যে বাড়িতে থাকতুম তার বারান্দা থেকে দেখা যায়, খেতের পর খেত নিরন্তর চলে গেছে দিগন্ত পেরিয়ে। ভোরবেলা থেকে হাল লাঙল এবং গোরু নিয়ে একটি-একটি করে চাষী আসে, আপন টুকরো খেতটুকু ঘুরে ঘুরে চাষ করে চলে যায়। এইরকম ভাগ-করা শক্তির যে কতটা অপচয় ঘটে প্রতিদিন সে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। চাষীদের ডেকে যখন সমস্ত জমি একত্র করে কলের লাঙলে চাষ করার সুবিধের কথা বুঝিয়ে বললুম, তারা তখনই সমস্ত মেনে নিলে। কিন্তু, বললে, আমরা নির্বোধ, এতবড়ো ব্যাপার করে তুলতে পারব কী করে। আমি যদি বলতে পারতুম, এ ভার আমিই নেব, তা হলে তখনই মিটে যেতে পারত। কিন্তু আমার সাধ্য কী! এমন কাজের চালনাভার নেবার দায়িত্ব আমার পক্ষে অসম্ভব; সে শিক্ষা, সে শক্তি আমার নেই।

কিন্তু এই কথাটা বরাবর আমার মনে জেগে ছিল। যখন বোলপুরের কো-অপারেটিভের ব্যবস্থা

বিশ্বভারতীর হাতে এল তখন আবার একদিন আশা হয়েছিল, এইবার বুঝি সুযোগ হতে পারবে। যাদের হাতে আপিসের ভার তাদের বয়স অল্প, আমার চেয়ে তাদের হিসাবী বুদ্ধি এবং শিক্ষা অনেক বেশি। কিন্তু আমাদের যুবকেরা ইস্কুলে-পড়া ছেলে, তাদের বই মুখস্থ করার মন। যে শিক্ষা আমাদের দেশে প্রচলিত তাতে করে আমাদের চিন্তা করার সাহস, কর্ম করবার দক্ষতা থাকে না, পুঁথির বুলি পুনরাবৃত্তি করার 'পরেই ছাত্রদের পরিত্রাণ নির্ভর করে।

বুদ্ধির এই পল্লবগ্রাহিতা ছাড়া আমাদের আর-একটা বিপদ ঘটে। ইস্কুলে যারা পড়া মুখস্থ করেছে আর ইস্কুলের বাইরে পড়ে থেকে যারা পড়া মুখস্থ করে নি, তাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ঘটে গেছে— শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত। ইস্কুলে-পড়া মনের আত্মীয়তাবোধ পুঁথি-পোড়োদের পাড়ার বাইরে পৌঁছতে পারে না। যাদের আমরা বলি চাষাভুষো, পুঁথির পাতায় পর্দা ভেদ করে তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পৌঁছয় না, তারা আমাদের কাছে অস্পষ্ট। এইজন্যেই ওরা আমাদের সকল প্রচেষ্টা থেকে স্বভাবতই বাদ পড়ে যায়। তাই কো-অপারেটিভের যোগে অন্য দেশে যখন সমাজের নীচের তলায় একটা সৃষ্টির কাজ চলছে, আমাদের দেশে টিপে টিপে টাকা ধার দেওয়ার বেশি কিছু এগোয় না। কেননা ধার দেওয়া, তার সুদ কষা এবং দেনার টাকা আদায় করা অত্যন্ত ভীরু মনের পক্ষেও সহজ কাজ, এমন-কি, ভীরু মনের পক্ষেই সহজ, তাতে যদি নামতার ভুল না ঘটে তা হলে কোনো বিপদ নেই।

বুদ্ধির সাহস এবং জনসাধারণের প্রতি দরদ-বোধ এই উভয়ের অভাব ঘটাতেই দুঃখীর দুঃখ আমাদের দেশে ঘোচানো এত কঠিন হয়েছে; কিন্তু এই অভাবের জন্যে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। কেননা কেরানি-তৈরির কারখানা বসাবার জন্যেই একদা আমাদের দেশে বণিক-রাজত্বে ইস্কুলের পত্তন হয়েছিল। ডেস্ক্‌-লোকে মনিবের সঙ্গে সাযুজ্যলাভই আমাদের সদ্‌গতি। সেইজন্যে উমেদারিতে অকৃতার্থ হলেই আমাদের বিদ্যাশিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়। এইজন্যেই আমাদের দেশে প্রধানত দেশের কাজ কংগ্রেসের পান্ডালে এবং খবরের কাগজের প্রবন্ধমালায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেদনা উদ্‌ঘোষণের মধ্যেই পাক খাচ্ছিল। আমাদের কলমে-বাঁধা হাত দেশকে গড়ে তোলবার কাজে এগোতেই পারলে না।

ঐ দেশের হাওয়াতেই আমিও তো মানুষ, সেইজন্যেই জোরের সঙ্গে মনে করতে সাহস হয় নি যে, বহু কোটি জনসাধারণের বুকের উপর থেকে অশিক্ষা ও অসামর্থ্যের জগদ্দল পাথর ঠেলে নামানো সম্ভব। অল্পস্বল্প কিছু করতে পারা যায় কি না এতদিন এই কথাই ভেবেছি। মনে করেছিলুম, সমাজের একটা চিরবাধাগ্রস্ত তলা আছে, সেখানে কোনোকালেই সূর্যের আলো সম্পূর্ণ প্রবেশ করানো চলবে না, সেইজন্যেই সেখানে অন্তত তেলের বাতি জ্বালাবার জন্যে উঠেপড়ে লাগা উচিত। কিন্তু সাধারণত সেটুকু কর্তব্যবোধও লোকের মনে যথেষ্ট জোরের সঙ্গে ধাক্কা মারতে চায় না; কারণ যাদের আমরা অন্ধকারে দেখতেই পাই নে তাদের জন্যে যে কিছু করা যেতে পারে এ কথা স্পষ্ট করে মনে আসে না।

এইরকম স্বল্পসাহস মন নিয়েই রাশিয়াতে এসেছিলুম; শুনেছিলুম, এখানে চাষী ও কর্মিকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের পরিমাণ অনেক বেড়ে চলেছে। ভেবেছিলুম, তার মানে ওখানে পল্লীর পাঠশালায় শিশুশিক্ষা প্রথমভাগ, বড়োজোর দ্বিতীয়ভাগ পড়ানোর কাজ সংখ্যায় আমাদের চেয়ে বেশি হয়েছে। ভেবেছিলুম, ওদের সাংখ্যিক তালিকা নেড়েচেড়ে দেখতে পাব ওদের কজন চাষী নাম সই করতে পারে আর কজন চাষীর নামতা দশের কোঠা পর্যন্ত এগিয়েছে।

মনে রেখো, এখানে যে বিপ্লবে জারের শাসন লয় পেলে সেটা ঘটেছে ১৯১৭ খৃস্টাব্দে। অর্থাৎ তেরো বছর পার হল মাত্র। ইতিমধ্যে ঘরে বাইরে এদের প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার সঙ্গে লড়ে চলতে হয়েছে। এরা একা, অত্যন্ত ভাঙাচোরা একটা রাষ্ট্রব্যবস্থার বোঝা নিয়ে। পথ পূর্বতন দুঃশাসনের প্রভূত আবর্জনায় দুর্গম। যে আত্মবিপ্লবের প্রবল ঝড়ের মুখে এরা নবযুগের ঘাটে পাড়ি দিলে সেই বিপ্লবের প্রচ্ছন্ন এবং প্রকাশ্য সহায় ছিল ইংলন্ড এবং আমেরিকা। অর্থসম্বল

এদের সামান্য; বিদেশের মহাজনী গদিতে এদের ক্রেডিট নেই। দেশের মধ্যে কলকারখানা এদের যথেষ্ট পরিমাণে না থাকাতে অর্থ-উৎপাদনে এরা শক্তিহীন। এইজন্যে কোনোমতে পেটের ভাত বিক্রি করে চলছে এদের উদ্যোগপর্ব। অথচ রাষ্ট্রব্যবস্থায় সকলের চেয়ে যে অনুৎপাদক বিভাগ— সৈনিক-বিভাগ— তাকে সম্পূর্ণরূপে সুদক্ষ রাখার অপব্যয় এদের পক্ষে অনিবার্য। কেননা আধুনিক মহাজনী যুগের সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি এদের শত্রুপক্ষ এবং তারা সকলেই আপন আপন অস্ত্রশালা কানায় কানায় ভরে তুলেছে।

মনে আছে, এরাই 'লীগ অব নেশন্‌স্‌'-এ অস্ত্রবর্জনের প্রস্তাব পাঠিয়ে দিয়ে কপট শান্তি-কামীদের মনে চমক লাগিয়ে দিয়েছিল। কেননা নিজেদের প্রতাপ-বর্ধন বা রক্ষণ সোভিয়েটদের লক্ষ্য নয়— এদের সাধনা হচ্ছে জনসাধারণের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্নসম্বলের উপায়-উপকরণকে প্রকৃষ্ট প্রণালীতে ব্যাপক করে গড়ে তোলা, এদেরই পক্ষে নিরুপদ্রব শান্তির দরকার সব চেয়ে বেশি। কিন্তু তুমি তো জান, 'লীগ অব নেশন্‌স্‌'-এর সমস্ত পালোয়ানই গুণ্ডাগিরির বহুবিস্তৃত উদ্যোগ কিছুতেই বন্ধ করতে চায় না, কিন্তু 'শান্তি চাই' বলে সকলে মিলে হাঁক পাড়ে। এইজন্যেই সকল সাম্রাজ্যিক দেশেই অস্ত্রশস্ত্রের কাঁটাবনের চাষ অন্নের চাষকে ছাপিয়ে বেড়ে চলেছে। এর মধ্যে আবার কিছুকাল ধরে রাশিয়ায় অতি ভীষণ দুর্ভিক্ষ ঘটেছিল; কত লোক মরেছে তার ঠিক নেই। তার ধাক্কা কাটিয়ে সবেমাত্র আট বছর এরা নূতন যুগকে গড়ে তোলবার কাজে লাগতে পেরেছে, বাইরের উপকরণের অভাব সত্ত্বেও।

কাজ সামান্য নয়— য়ুরোপ-এশিয়া জুড়ে প্রকাণ্ড এদের রাষ্ট্রক্ষেত্র। প্রজামণ্ডলীর মধ্যে যত বিভিন্ন জাতের মানুষ আছে ভারতবর্ষেও এত নেই। তাদের ভূপ্রকৃতি মানবপ্রকৃতির মধ্যে পরস্পর পার্থক্য অনেক বেশি। বস্তুত এদের সমস্যা বহুবিচিত্র-জাতি-সমাকীর্ণ, বহুবিচিত্র-অবস্থা-সংকুল বিশ্বপৃথিবীর সমস্যারই সংক্ষিপ্ত রূপ।

তোমাকে পূর্বেই বলেছি, বাহির থেকে মস্কৌ শহরে যখন চোখ পড়ল দেখলুম, য়ুরোপের অন্য সমস্ত ধনী শহরের তুলনায় অত্যন্ত মলিন। রাস্তায় যারা চলেছে তারা একজনও শৌখিন নয়, সমস্ত শহর আটপৌরে-কাপড়-পরা। আটপৌরে কাপড়ে শ্রেণীভেদ থাকে না, শ্রেণীভেদ পোশাকী কাপড়ে। এখানে সাজে পরিচ্ছদে সবাই এক। সবটা মিলেই শ্রমিকদের পাড়া; যেখানে দৃষ্টি পড়ে সেখানেই ওরা। এখানে শ্রমিকদের কৃষাণদের কিরকম বদল হয়েছে তা দেখবার জন্যে লাইব্রেরিতে গিয়ে বই খুলতে অথবা গাঁয়ে কিংবা বস্তিতে গিয়ে নোট নিতে হয় না। যাদের আমরা 'ভদ্দর লোক' বলে থাকি তারা কোথায় সেইটেই জিজ্ঞাস্য।

এখানকার জনসাধারণ ভদ্রলোকের আওতায় একটুও ছায়া-ঢাকা পড়ে নেই, যারা যুগে যুগে নেপথ্যে ছিল তারা আজ সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে। এরা যে প্রথমভাগ শিশুশিক্ষা পড়ে কেবলমাত্র ছাপার অক্ষর হাতড়ে বেড়াতে শিখেছে, এ ভুল ভাঙতে একটুও দেরি হল না। এরা মানুষ হয়ে উঠেছে এই ক'টা বছরেই।

নিজের দেশের চাষীদের মজুরদের কথা মনে পড়ল। মনে হল, আরব্য উপন্যাসের জাদুকরের কীর্তি। বছর-দশেক আগেই এরা ঠিক আমাদেরই দেশের জন-মজুরদের মতোই নিরক্ষর নিঃসহায় নিরন্ন ছিল, তাদেরই মতো অন্ধসংস্কার এবং মূঢ় ধার্মিকতা। দুঃখে বিপদে এরা দেবতার দ্বারে মাথা খুঁড়েছে; পরলোকের ভয়ে পাণ্ডাপুরুতদের হাতে এদের বুদ্ধি ছিল বাঁধা, আর ইহলোকের ভয়ে রাজপুরুষ মহাজন ও জমিদারের হাতে; যারা এদের জুতো-পেটা করত তাদের সেই জুতো সাফ করা এদের কাজ ছিল। হাজার বছর থেকে এদের প্রথাপদ্ধতির বদল হয় নি; যান-বাহন চরকা-ঘানি সমস্ত প্রপিতামহের আমলের, হালের হাতিয়ারে হাত লাগাতে বললে বেঁকে বসত। আমাদের দেশের ত্রিশ কোটির পিঠের উপরে যেমন চেপে বসেছে ভূতকালের ভূত, চেপে ধরেছে তাদের দুই চোখ— এদেরও ঠিক তেমনিই ছিল। ক'টা বছরের মধ্যে এই মূঢ়তার অক্ষমতার অভ্রভেদী পাহাড় নড়িয়ে দিলে যে কী করে, সে কথা এই হতভাগ্য ভারতবাসীকে যেমন একান্ত

বিস্মিত করেছে এমন আর কাকে করবে বলো। অথচ যে সময়ের মধ্যে এই পরিবর্তন চলছিল সে সময়ে এ দেশে আমাদের দেশের বহুপ্রশংসিত 'ল'অ্যান্ড অর্ডার' ছিল না।

তোমাকে পূর্বেই বলেছি, এদের জনসাধারণের শিক্ষার চেহারা দেখবার জন্যে আমাকে দূরে যেতে হয় নি, কিংবা স্কুলের ইন্‌স্‌পেক্টরের মতো এদের বানান তদন্ত করবার সময় দেখতে হয় নি 'কান'এ 'সোনা'য় এরা মূর্ধন্য ণ লাগায় কি না। একদিন সন্ধ্যাবেলা মস্কো শহরে একটা বাড়িতে গিয়েছিলুম, সেটা চাষীদের বাসা, গ্রাম থেকে কোনো উপলক্ষে যখন তারা শহরে আসে তখন সস্তায় ঐ বাড়িতে কিছু দিনের মতো থাকতে পায়। তাদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছিল। সে-রকম কথাবার্তা যখন আমাদের দেশের চাষীদের সঙ্গে হবে সেইদিন সাইমন কমিশনের জবাব দিতে পারব।

আর কিছু নয়, এটা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি, সবই হতে পারত কিন্তু হয় নি—না হোক, আমরা পেয়েছি 'ল অ্যান্ড অর্ডার'। আমাদের ওখানে সাম্প্রদায়িক লড়াই ঘটে বলে একটা অখ্যাতি বিশেষ ঝোঁক দিয়ে রটনা হয়ে থাকে—এখানেও য়িহুদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে খৃস্টান সম্প্রদায়ের লড়াই আমাদের দেশেরই আধুনিক উপসর্গের মতো অতিকুৎসিত অতিবর্বর ভাবেই ঘটত—শিক্ষায় এবং শাসনে একেবারে তার মূল উৎপাটিত হয়েছে। কতবার আমি ভেবেছি, আমাদের দেশে সাইমন কমিশন যাবার আগে একবার রাশিয়ায় তার ঘুরে যাওয়া উচিত ছিল।

তোমার মতো ভদ্রমহিলাকে সাধারণ ভদ্রগোছের চিঠি না লিখে এরকম চিঠি যে কেন লিখলুম তার কারণ চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে, দেশের দশা আমার মনের মধ্যে কিরকম তোলপাড় করছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের উপদ্রবের পর একবার আমার মনে এইরকম অশান্তি জেগেছিল। এবার ঢাকার উপদ্রবের পর আবার সেইরকম দুঃখ পাচ্ছি। সে ঘটনার উপর সরকারি চুনকামের কাজ হয়েছে, কিন্তু এরকম সরকারি চুনকামের যে কী মূল্য তা রাষ্ট্রনীতিবিৎ সবাই জানে। এইরকম ঘটনা যদি সোভিয়েট রাশিয়ায় ঘটত তা হলে কোনো চুনকামেই তার কলঙ্ক ঢাকা পড়ত না। সুধীন্দ্র, আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যার কোনো শ্রদ্ধা কোনোদিন ছিল না, সেও এবারে আমাকে এমন চিঠি লিখেছে যাতে বোঝা যাচ্ছে সরকারি ধর্মনীতির প্রতি ধিক্‌কার আজ আমাদের দেশে কতদূর পর্যন্ত পৌঁচেছে। যা হোক, তোমার চিঠি অসমাপ্ত রইল—কাগজ এবং সময় ফুরিয়ে এসেছে, পরের চিঠিতে এ চিঠির অসম্পূর্ণ অংশ সম্পূর্ণ করব। ইতি ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০[১]

৫

বর্লিন

মস্কৌ থেকে তোমাকে একটা বড়ো চিঠিতে রাশিয়া সম্বন্ধে আমার ধারণা লিখেছিলুম। সে চিঠি যদি পাও তো রাশিয়া সম্বন্ধে কিছু খবর পাবে।

এখানে চাষীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কতটা কাজ করা হচ্ছে তারই বিবরণ কিছু দিয়েছি। আমাদের দেশে যে শ্রেণীর লোক মূক মূঢ়, জীবনের সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাদের মন অন্তর-বাহিরের দৈন্যের তলায় চাপা পড়ে গেছে, এখানে সেই শ্রেণীর লোকের সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হল তখন বুঝতে পারলুম, সমাজের অনাদরে মানুষের চিত্তসম্পদ কত প্রভূত-পরিমাণে অবলুপ্ত হয়ে থাকে—কী অসীম তার অপব্যয়, কী নিষ্ঠুর তার অবিচার।

মস্কৌতে একটি কৃষিভবন দেখতে গিয়েছিলুম; এটা ওদের ক্লাবের মতো। রাশিয়ার সমস্ত ছোটোবড়ো শহরে এবং গ্রামে এরকম আবাস ছড়ানো আছে। এ-সব জায়গায় কৃষিবিদ্যা সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দেবার ব্যবস্থা আছে; যারা নিরক্ষর তাদের পড়াশুনো শেখানোর উপায়

[১] নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত।

করেছে; এখানে বিশেষ বিশেষ ক্লাসে বৈজ্ঞানিক রীতিতে চাষ করার ব্যবস্থা কৃষাণদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এইরকম প্রত্যেক বাড়িতে প্রাকৃতিক সামাজিক সকলপ্রকার শিক্ষণীয় বিষয়ে ম্যুজিয়ম, তা ছাড়া চাষীদের সকলপ্রকার প্রয়োজনের উপযোগী পরামর্শ দেবার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

চাষীরা কোনো উপলক্ষে গ্রাম থেকে যখন শহরে আসে তখন খুব কম খরচে অন্তত তিন সপ্তাহ এইরকম বাড়িতে থাকতে পারে। এই বহুব্যাপক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সোভিয়েট গবর্মেন্ট এককালে নিরক্ষর চাষীদের চিত্তকে উদ্‌বোধিত করে সমাজব্যাপী নবজীবন প্রতিষ্ঠার প্রশস্ততম ভিত্তি স্থাপন করেছে।

বাড়িতে ঢুকে দেখি, খাবার ঘরে কেউ কেউ বসে খাচ্ছে, পড়বার ঘরে এক দল খবরের কাগজ পড়তে প্রবৃত্ত। উপরে একটা বড়ো ঘরে আমি এসে বসলুম; সেখানে সবাই এসে জমা হল। তারা নানা স্থানের লোক, কেউ বা অনেক দূর প্রদেশ থেকে এসেছে। বেশ সহজ ওদের ভাবগতিক, কোনো-রকম সংকোচ নেই।

প্রথম অভ্যর্থনা ও পরিচয় উপলক্ষে বাড়ির পরিদর্শক কিছু বললে, আমিও কিছু বললুম। তার পরে ওরা আমাকে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলে।

প্রথমেই ওদের মধ্যে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া হয় কেন।

উত্তর দিলুম, 'যখন আমার বয়স অল্প ছিল কখনো এরকম বর্বরতা দেখি নি। তখন গ্রামে এবং শহরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্যের অভাব ছিল না। পরস্পরের ক্রিয়াকাণ্ডে পরস্পরের যোগ ছিল, জীবনযাত্রায় সুখে দুঃখে তারা ছিল এক। এ-সব কুৎসিত কাণ্ড দেখতে পাচ্ছি যখন থেকে আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন শুরু হয়েছে। কিন্তু প্রতিবেশীদের মধ্যে এইরকম অমানুষিক দুর্ব্যবহারের আশু কারণ যাই হোক, এর মূল কারণ হচ্ছে আমাদের জনসাধারণের মধ্যে অশিক্ষা। যে পরিমাণ শিক্ষার দ্বারা এইরকম দুর্বুদ্ধি দূর হয় আমাদের দেশে বিস্তৃত ভাবে তার প্রচলন করা আজ পর্যন্ত হয় নি। যা তোমাদের দেশে দেখলুম তাতে আমি বিস্মিত হয়েছি।'

প্রশ্ন। তুমি তো লেখক, তোমাদের চাষীদের কথা কি কিছু লিখেছ। ভবিষ্যতে তাদের কী গতি হবে।

উত্তর। শুধু লেখা কেন, তাদের জন্য আমি কাজ ফেঁদেছি। আমার একলার সাধ্যে যতটুকু সম্ভব তাই দিয়ে তাদের শিক্ষার কাজ চালাই, পল্লীর উন্নতিসাধনে তাদের সাহায্য করি। কিন্তু তোমাদের এখানে যে প্রকাণ্ড শিক্ষাব্যাপার যে আশ্চর্য অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি হয়েছে তার তুলনায় আমার এ উদ্যোগ অতি যৎসামান্য।

প্রশ্ন। আমাদের দেশে কৃষিক্ষেত্রের একত্রীকরণের যে চেষ্টা চলছে সে সম্বন্ধে তোমার মত কী।

উত্তর। মত দেবার মতো আমার অভিজ্ঞতা হয় নি, তোমাদেরই কাছ থেকে শুনতে চাই। আমার জানবার কথা এই যে, এতে তোমাদের ইচ্ছার উপর জবরদস্তি করা হচ্ছে কি না।

প্রশ্ন। ভারতবর্ষে সবাই কি এই ঐকত্রিকতা এবং সাধারণভাবে এখানকার অন্য সমস্ত উদ্যোগের কথা কিছু জানে না।

উত্তর। জানবার মতো শিক্ষা অতি অল্প লোকেরই আছে। তা ছাড়া তোমাদের খবর নানা কারণে চাপা পড়ে যায়। এবং যা-কিছু শোনা যায় তাও সব বিশ্বাসযোগ্য নয়।

প্রশ্ন। আমাদের দেশে এই-যে চাষীদের জন্যে আবাস-ব্যবস্থা হয়েছে, এর অস্তিত্বও কি তুমি আগে জানতে না।

উত্তর। তোমাদের কল্যাণের জন্যে কী করা হচ্ছে মস্কৌয়ে এসে তা প্রথম দেখলুম এবং জানলুম। যাই হোক, এবার আমার প্রশ্নের উত্তর তোমরা দাও। চাষী প্রজার পক্ষে এই ঐকত্রিকতার ফলাফল সম্বন্ধে তোমাদের মত কী, তোমাদের ইচ্ছা কী।

একজন যুবক চাষী য়ুক্রেন প্রদেশ থেকে এসেছে, সে বললে, 'দু বছর হল একটি ঐকত্রিক

কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হয়েছে, আমি তাতে কাজ করি। এই ক্ষেত্রের মধ্যে ফল-ফসলের বাগান আছে, তার থেকে আমরা সবজির জোগান দিই সব কারখানাঘরে। সেখানে সেগুলো টিনের কৌটোয় মোড়াই হয়। এ ছাড়া বড়ো বড়ো খেত আছে, সেখানে সব গমের চাষ। আট ঘণ্টা করে আমাদের খাটুনি, প্রত্যেক পঞ্চম দিনে আমাদের ছুটি। আমাদের প্রতিবেশী যে-সব চাষী নিজের খেত নিজে চষে তাদের চেয়ে আমাদের এখানে অন্তত দুনো ফল উৎপন্ন হয়।

'প্রায় গোড়াতেই আমাদের এই ঐকত্রিক চাষে দেড়শো চাষীর খেত মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯২৯ সালে অর্ধেক চাষী তাদের খেত ফিরিয়ে নিলে। তার প্রধান কারণ, সোভিয়েট কম্যুনিস্ট দলের প্রধান মন্ত্রী স্ট্যালিনের উপদেশ আমাদের কর্মচারীরা ঠিকমত ব্যবহার করে নি। তাঁর মতে, ঐকত্রিকতার মূলনীতি হচ্ছে সমাজবদ্ধ স্বেচ্ছাকৃত যোগ। কিন্তু অনেক জায়গায় আমলারা এই কথাটা মনে না রাখাতেই গোড়ার দিকে অনেক চাষী ঐকত্রিক কৃষিসমন্বয় ছেড়ে দিয়েছিল। তার পরে ক্রমে তাদের মধ্যেকার সিকি ভাগ লোক আবার ফিরে এসেছে। এখন আগেকার চেয়ে আরও আমরা বল পেয়েছি। আমাদের দলের লোকের জন্যে নতুন সব বাসা, একটা নতুন ভোজনশালা, আর-একটা ইস্কুল তৈরি আরম্ভ হয়েছে।'

তার পরে সাইবীরিয়ার একজন চাষী স্ত্রীলোক বললে, 'সমবেত খেতের কাজে আমি প্রায় দশ বছর আছি। একটা কথা মনে রেখো, ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে নারী-উন্নতি-প্রচেষ্টার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। আজ দশ বছরের মধ্যে এখানে চাষী-মেয়েদের বদল হয়েছে যথেষ্ট। নিজের উপর তাদের অনেক বেশি ভরসা হয়েছে। যে-সব মেয়ে পিছিয়ে আছে, ঐকত্রিক চাষের যারা প্রধান বাধা, এরাই তাদের মন গড়ে তুলছে। আমরা মেয়ে-ঐকত্রিকরা দল তৈরি করেছি; তারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ঘুরে বেড়ায়, মেয়েদের মধ্যে কাজ করে, চিত্তের এবং অর্থের উন্নতিসাধনে ঐকত্রিকতার সুযোগ কত তা ওদের বুঝিয়ে দেয়। ঐকত্রিক দলের চাষী-মেয়েদের জীবনযাত্রা সহজ করে দেবার জন্যে প্রত্যেক ঐকত্রিক ক্ষেত্রে একটি করে শিশুপালনাবাস, শিশুবিদ্যালয়, আর সাধারণ-পাকশালা স্থাপিত হয়েছে।'

সুখোজ প্রদেশে জাইগান্ট্ নামক একটি সুবিখ্যাত সরকারি কৃষিক্ষেত্র আছে। সেখানকার একজন চাষী রাশিয়ায় ঐকত্রিকতার কিরকম বিস্তার হচ্ছে সেই সম্বন্ধে আমাকে বললে, 'আমাদের এই খেতে জমির পরিমাণ এক লক্ষ হেক্‌টার (hectares)। গত বছরে সেখানে তিন হাজার চাষী কাজ করত। এ বছরে সংখ্যা কিছু কমে গেছে, কিন্তু ফসলের ফলন আগেকার চেয়ে বাড়বার কথা। কেননা জমিতে বিজ্ঞানসম্মত সার দেবার এবং কলের লাঙল ব্যবহার করবার ব্যবস্থা হয়েছে। এইরকম লাঙল এখন আমাদের তিনশো'র বেশি আছে। প্রতিদিন আমাদের আট ঘণ্টা কাজ করবার মেয়াদ। যারা তার বেশি কাজ করে তারা উপরি পারিশ্রমিক পায়। শীতের সময় খেতের কাজের পরিমাণ কমে; তখন চাষীরা বাড়ি-তৈরি রাস্তা-মেরামত প্রভৃতি নানা কাজে শহরে চলে যায়। এই অনুপস্থিতির সময়েও তারা বেতনের এক-তৃতীয়াংশ পেয়ে থাকে আর তাদের পরিবারের লোক তাদের নির্দিষ্ট ঘরে বাস করতে পায়।'

আমি বললেম, 'ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রে আপন স্বতন্ত্র সম্পত্তি মিলিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে তোমাদের আপত্তি কিংবা সম্মতি যদি থাকে আমাকে স্পষ্ট করে বলো।'

পরিদর্শক প্রস্তাব করলে, হাত তুলে মত জানানো হোক। দেখা গেল, যাদের সম্মতি নেই এমন লোকও অনেক আছে। অসম্মতির কারণ তাদের বলতে বললুম; ভালো করে বলতে পারলে না। একজন বললে, 'আমি ভালো বুঝতে পারি নে।' বেশ বোঝা গেল, অসম্মতির কারণ মানবচরিত্রের মধ্যে। নিজের সম্পত্তির প্রতি নিজের মমতা, ওটা তর্কের বিষয় নয়, ওটা আমাদের সংস্কারগত। নিজেকে আমরা প্রকাশ করতে চাই, সম্পত্তি সেই প্রকাশের একটা উপায়।

তার চেয়ে বড়ো উপায় যাদের হাতে আছে তারা মহৎ, তারা সম্পত্তিকে গ্রাহ্য করে না। সমস্ত খুইয়ে দিতে তাদের বাধা নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে আপন সম্পত্তি তার আপন ব্যক্তি-স্বরূপের ভাষা— সেটা হারালে সে যেন বোবা হয়ে যায়। সম্পত্তি যদি কেবল আপন জীবিকার জন্যে

হত, আত্মপ্রকাশের জন্যে না হত, তা হলে যুক্তির দ্বারা বোঝানো সহজ হত যে, ওটা ত্যাগের দ্বারাই জীবিকার উন্নতি হতে পারে। আত্মপ্রকাশের উচ্চতন উপায়, যেমন বুদ্ধি, যেমন গুণপনা কেউ কারও কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিতে পারে না; সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া চলে, ফাঁকি দেওয়া চলে। সেই কারণে সম্পত্তি-বিভাগ ও ভোগ নিয়ে সমাজে এত নিষ্ঠুরতা, এত ছলনা, এত অন্তহীন বিরোধ।

এর একটি মাঝামাঝি সমাধান ছাড়া উপায় আছে বলে মনে করি নে; অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। সেই সীমার বাইরেকার উদ্‌বৃত্ত অংশ সর্বসাধারণের জন্যে ছাপিয়ে যাওয়া চাই। তা হলেই সম্পত্তির মমত্ব লুব্ধতায় প্রতারণায় বা নিষ্ঠুরতায় গিয়ে পৌঁছয় না।

সোভিয়েটরা এই সমস্যাকে সমাধান করতে গিয়ে তাকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। সেজন্যে জবরদস্তির সীমা নেই। এ কথা বলা চলে না যে, মানুষের স্বাতন্ত্র্য থাকবে না; কিন্তু বলা চলে যে, স্বার্থপরতা থাকবে না। অর্থাৎ নিজের জন্যে কিছু নিজত্ব না হলে নয়, কিন্তু বাকি সমস্তই পরের জন্যে হওয়া চাই। আত্ম এবং পর উভয়কেই স্বীকার করে তবেই তার সমাধান সম্ভব। কোনো একটাকে বাদ দিতে গেলেই মানবচরিত্রের সত্যের সঙ্গে লড়াই বেঁধে যায়। পশ্চিম মহাদেশের মানুষ জোর জিনিসটাকে অত্যন্ত বেশি বিশ্বাস করে। যে ক্ষেত্রে জোরের যথার্থ কাজ আছে সে ক্ষেত্রে সে খুবই ভালো, কিন্তু অন্যত্র সে বিপদ ঘটায়। সত্যের জোরকে গায়ের জোরের দ্বারা যত প্রবলভাবেই আমরা মেলাতে চেষ্টা করি একদা তত প্রবলভাবেই তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।

মধ্য-এশিয়ার বাস্‌কির রিপাবলিকের (Bashkir Republic) একজন চাষী বললে, 'আজও আমার নিজের স্বতন্ত্র খেত আছে, কিন্তু নিকটবর্তী ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রে আমি শীঘ্রই যোগ দেব। কেননা, দেখছি, স্বাতন্ত্রিক প্রণালীর চেয়ে ঐকত্রিক প্রণালীতে ঢের ভালো জাতের এবং অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করানো যায়। যেহেতু প্রকৃষ্টভাবে চাষ করতে গেলেই যন্ত্র চাই; ছোটো খেতের মালিকের পক্ষে যন্ত্র কেনা চলে না। তা ছাড়া, আমাদের টুকরো জমিতে যন্ত্রের ব্যবহার অসম্ভব।'

আমি বললুম, 'কাল একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ হল। তিনি বললেন, মেয়েদের এবং শিশুদের সর্বপ্রকার সুযোগের জন্য সোভিয়েট গবর্মেন্টের দ্বারা যেরকম সব ব্যবস্থা হয়েছে এরকম আর কোথাও হয় নি। আমি তাঁকে বললুম, তোমরা পারিবারিক দায়িত্বকে সরকারি দায়িত্ব করে তুলে হয়তো পরিবারের সীমা লোপ করে দিতে চাও। তিনি বললেন, সেটাই যে আমাদের আশু সংকল্প তা নয়—কিন্তু শিশুদের প্রতি দায়িত্বকে ব্যাপক করে দিয়ে যদি স্বভাবতই একদা পরিবারের গণ্ডি লোপ পায় তা হলে এই প্রমাণ হবে, সমাজে পারিবারিক যুগ সংকীর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা-বশতই নবযুগের প্রসারের মধ্যে আপনিই অন্তর্ধান করেছে। যা হোক, এ সম্বন্ধে তোমাদের কী মত জানতে ইচ্ছে করি। তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের একত্রীকরণের নীতি বজায় রেখে পরিবার বজায় থাকতে পারে।'

সেই য়ুক্রেনিয়ার যুবকটি বললে, 'আমাদের নূতন সমাজব্যবস্থা পারিবারিকতার উপর কিরকম প্রভাব বিস্তার করেছে আমার নিজের দিক থেকে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমার পিতা যখন বেঁচে ছিলেন, শীতের ছয় মাস তিনি শহরে কাজ করতেন আর গরমের ছয় মাস ভাইবোনদের নিয়ে আমি ধনীর চাকরি নিয়ে পশুচারণ করতে যেতুম। বাবার সঙ্গে আমাদের দেখা প্রায়ই হত না। এখন এরকম বিচ্ছেদ ঘটে না। শিশুবিদ্যালয় থেকে আমার ছেলে রোজ ফিরে আসে, রোজই তার সঙ্গে দেখা হয়।'

একজন চাষী-মেয়ে বললে, 'শিশুদের দেখাশোনা ও শেখানোর স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়াতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি ঢের কমে গেছে। তা ছাড়া, ছেলেদের সম্বন্ধে দায়িত্ব যে কতখানি তা বাপ-মা ভালো করে শিখতে পারছে।'

একটি ককেশীয় যুবতী দোভাষীকে বললে, 'কবিকে বলো, আমরা ককেশীয় রিপাবলিকের লোকেরা বিশেষ করেই অনুভব করি যে, অক্টোবরের বিপ্লবের পর থেকে আমরা যথার্থ স্বাধীনতা এবং সুখ পেয়েছি। আমরা নতুন যুগ সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত, তার কঠিন দায়িত্ব খুবই বুঝি, তার জন্যে

চূড়ান্ত রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে আমরা রাজী। কবিকে জানাও, সোভিয়েট-সম্মিলনের বিচিত্র জাতির লোক তাঁর মারফত ভারতবাসীদের 'পরে তাদের আন্তরিক দরদ জানাতে চায়। আমি বলতে পারি, যদি সম্ভব হত, আমার ঘরদুয়োর, আমার ছেলেপুলে, সবাইকে ছেড়ে তাঁর স্বদেশীয়ের সাহায্য করতে যেতুম।'

দলের মধ্যে একজন ছিল তার মঙ্গোলীয় ছাঁদের মুখ। তার কথা জিজ্ঞাসা করতেই জবাব পেলুম, সে খির্‌গিজ-জাতীয় চাষীর ছেলে, মস্কো এসেছে কলে কাপড় বোনার বিদ্যা শিখতে। তিন বছর বাদে এঞ্জিনিয়র হয়ে তাদের রিপাবলিকে ফিরে যাবে— বিপ্লবের পরে সেখানে একটা বড়ো কারখানা স্থাপিত হয়েছে, সেইখানে সে কাজ করবে।

একটা কথা মনে রেখো, এরা নানা জাতির লোক কল-কারখানার রহস্য আয়ত্ত করবার জন্যে এত অবাধ উৎসাহ এবং সুযোগ পেয়েছে, তার একমাত্র কারণ যন্ত্রকে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না। যত লোকেই শিক্ষা করুক তাতে সকল লোকেরই উপকার, কেবল ধনীলোকের নয়। আমরা আমাদের লোভের জন্যে যন্ত্রকে দোষ দিই, মাতলামির জন্যে শাস্তি দিই তালগাছকে। মাস্টারমশায় যেমন নিজের অক্ষমতার জন্যে বেঞ্চির উপরে দাঁড় করিয়ে রাখেন ছাত্রকে।

সেদিন মস্কো কৃষি-আবাসে গিয়ে স্পষ্ট করে স্বচক্ষে দেখতে পেলুম, দশ বছরের মধ্যে রাশিয়ার চাষীরা ভারতবর্ষের চাষীদের কত বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছে। কেবল বই পড়তে শেখে নি, ওদের মন গেছে বদলে, ওরা মানুষ হয়ে উঠেছে। শুধু শিক্ষার কথা বললে সব কথা বলা হল না, চাষের উন্নতির জন্যে সমস্ত দেশ জুড়ে যে প্রভূত উদ্যম সেও অসাধারণ। ভারতবর্ষেরই মতো এ দেশ কৃষিপ্রধান দেশ, এইজন্যে কৃষিবিদ্যাকে যতদূর সম্ভব এগিয়ে দিতে না পারলে দেশের মানুষকে বাঁচানো যায় না। এরা সে কথা ভোলে নি। এরা অতি দুঃসাধ্য সাধন করতে প্রবৃত্ত।

সিভিল সার্ভিসের আমলাদের দিয়ে এরা মোটা মাইনেয় আপিস চালাবার কাজ করছে না— যারা যোগ্য লোক, যারা বৈজ্ঞানিক, তারা সবাই লেগে গেছে। এই দশ বছরের মধ্যে এদের কৃষিচর্চাবিভাগের যে উন্নতি ঘটেছে তার খ্যাতি ছড়িয়ে গেছে জগতের বৈজ্ঞানিক-মহলে। যুদ্ধের পূর্বে এ দেশে বীজ-বাছাইয়ের কোনো চেষ্টাই ছিল না। আজ প্রায় তিন কোটি মণ বাছাই-করা বীজ এদের হাতে জমেছে। তা ছাড়া নূতন শস্যের প্রচলন শুধু এদের কৃষি-কলেজের প্রাঙ্গণে নয়, দ্রুতবেগে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কৃষি সম্বন্ধে বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালা আজর্‌বাইজান উজ্‌বেকিস্তান জর্জিয়া য়ুক্রেন প্রভৃতি রাশিয়ার প্রত্যন্তপ্রদেশেও স্থাপিত হয়েছে।

রাশিয়ার সমস্ত দেশ-প্রদেশকে জাতি-উপজাতিকে সক্ষম ও শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে এতবড়ো সর্বব্যাপী অসামান্য অক্লান্ত উদ্যোগ আমাদের মতো ব্রিটিশ সাবজেক্টের সুদূর কল্পনার অতীত। এতটা দূর পর্যন্ত করে তোলা যে সম্ভব, এখানে আসবার আগে কখনো আমি তা মনেও করতে পারি নি। কেননা শিশুকাল থেকে আমরা যে 'ল অ্যান্ড অর্ডার'-এর আবহাওয়ায় মানুষ, সেখানে এর কাছে পৌঁছতে পারে এমন দৃষ্টান্ত দেখি নি।

এবার ইংলন্ডে থাকতে একজন ইংরেজের কাছে প্রথম শুনেছিলুম সাধারণের কল্যাণের জন্যে এরা কিরকম অসাধারণ আয়োজন করেছে। চোখে দেখলুম— এও দেখতে পেলুম, এদের রাষ্ট্রে জাতি-বর্ণবিচার একটুও নেই। সোভিয়েট শাসনের অন্তর্গত বর্বরপ্রায় প্রজার মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্যে এরা যে প্রকৃষ্ট প্রণালীর ব্যবস্থা করেছে ভারতবর্ষের জনসাধারণের পক্ষে তা দুর্লভ। অথচ এই অশিক্ষার অনিবার্য ফলে আমাদের বুদ্ধিতে চরিত্রে যে দুর্বলতা, ব্যবহারে যে মূঢ়তা, দেশ-বিদেশের কাছে তার রটনা চলছে। ইংরেজিতেই কথা চলিত আছে, যে কুকুরকে ফাঁসি দিতে হবে তাকে বদনাম দিলে কাজ সহজ হয়। যাতে বদনামটা কোনোদিন না ঘোচে তার উপায় করলে যাবজ্জীবন মেয়াদ ও ফাঁসি দুই'ই মিলিয়ে নেওয়া চলে। ইতি ১ অক্টোবর ১৯৩০[১]

[১] নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত।

৬

বার্লিন

রাশিয়া ঘুরে এসে আজ আমেরিকার মুখে চলেছি, এমন সন্ধিক্ষণে তোমার চিঠি পেলুম। রাশিয়ায় গিয়েছিলুম ওদের শিক্ষাবিধি দেখবার জন্যে। দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছি। আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল আজ তারা সমাজের অন্ধকুঠুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘটতে পারে, তা কল্পনা করা কঠিন। এদের এত কালের মরা গাঙে শিক্ষার প্লাবন বয়েছে দেখে মন পুলকিত হয়। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত সচেষ্ট সচেতন। এদের সামনে একটা নূতন আশার বীথিকা দিগন্ত পেরিয়ে অবারিত; সর্বত্র জীবনের বেগ পূর্ণমাত্রায়।

এরা তিনটে জিনিস নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে। শিক্ষা, কৃষি এবং যন্ত্র। এই তিন পথ দিয়ে এরা সমস্ত জাতি মিলে চিত্ত, অন্ন এবং কর্মশক্তিকে সম্পূর্ণতা দেবার সাধনা করছে। আমাদের দেশের মতোই এখানকার মানুষ কৃষিজীবী। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষক এক দিকে মূঢ়, আর-এক দিকে অক্ষম; শিক্ষা এবং শক্তি দুই থেকেই বঞ্চিত। তার একমাত্র ক্ষীণ আশ্রয় হচ্ছে প্রথা— পিতামহের আমলের চাকরের মতো সে কাজ করে কম, অথচ কর্তৃত্ব করে বেশি। তাকে মেনে চলতে হলে তাকে এগিয়ে চলবার উপায় থাকে না। অথচ শত শত বৎসর থেকে সে খুঁড়িয়ে চলছে।

আমাদের দেশে কোনো-এক সময়ে গোবর্ধনধারী কৃষ্ণ বোধ হয় ছিলেন কৃষির দেবতা, গোয়ালার ঘরে তাঁর বিহার; তাঁর দাদা বলরাম, হলধর। ঐ লাঙল-অস্ত্রটা হল মানুষের যন্ত্রবলের প্রতীক। কৃষিকে বল দান করেছে যন্ত্র। আজকের দিনে আমাদের কৃষিক্ষেত্রের কোনো কিনারায় বলরামের দেখা নেই— তিনি লজ্জিত— যে দেশে তাঁর অস্ত্রে তেজ আছে সেই সাগরপারে তিনি চলে গেছেন। রাশিয়ায় কৃষি বলরামকে ডাক দিয়েছে; দেখতে দেখতে সেখানকার কেদারখণ্ডগুলো অখণ্ড হয়ে উঠল, তাঁর নূতন হলের স্পর্শে অহল্যাভূমিতে প্রাণসঞ্চার হয়েছে।

একটা কথা আমাদের মনে রাখা উচিত, রামেরই হলযন্ত্রধারী রূপ হচ্ছে বলরাম।

১৯১৭ খৃস্টাব্দে এখানে যে বিপ্লব হয়ে গেল তার আগে এ দেশে শতকরা নিরানব্বই জন চাষী আধুনিক হলযন্ত্র চক্ষেও দেখে নি। তারা সেদিন আমাদেরই চাষীদের মতো সম্পূর্ণ দুর্বলরাম ছিল, নিরন্ন, নিঃসহায়, নির্বাক্। আজ দেখতে দেখতে এদের খেতে হাজার হাজার হলযন্ত্র নেমেছে। আগে এরা ছিল যাকে আমাদের ভাষায় বলে কৃষ্ণের জীব, আজ এরা হয়েছে বলরামের দল।

কিন্তু শুধু যন্ত্রে কোনো কাজ হয় না যন্ত্রী যদি মানুষ না হয়ে ওঠে। এদের খেতের কৃষি মনের কৃষির সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছে। এখানকার শিক্ষার কাজ সজীব প্রণালীতে। আমি বরাবর বলে এসেছি শিক্ষাকে জীবযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে চালানো উচিত। তার থেকে অবচ্ছিন্ন করে নিলে ওটা ভাণ্ডারের সামগ্রী হয়, পাকযন্ত্রের খাদ্য হয় না।

এখানে এসে দেখলুম, এরা শিক্ষাটাকে প্রাণবান করে তুলেছে। তার কারণ এরা সংসারের সীমা থেকে ইস্কুলের সীমাকে সরিয়ে রাখে নি। এরা পাস করবার কিংবা পণ্ডিত করবার জন্যে শেখায় না— সর্বতোভাবে মানুষ করবার জন্যে শেখায়। আমাদের দেশে বিদ্যালয় আছে, কিন্তু বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধি বড়ো, সংবাদের চেয়ে শক্তি বড়ো, পুঁথির পঙ্‌ক্তির বোঝার ভারে চিত্তকে চালনা করবার ক্ষমতা আমাদের থাকে না। কতবার চেষ্টা করেছি আমাদের ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতে, কিন্তু দেখতে পাই তাদের মনে কোনো প্রশ্নও নেই। জানতে চাওয়ার সঙ্গে জানতে পাওয়ার যে যোগ আছে সে যোগ ওদের বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ওরা কোনোদিন জানতে চাইতে শেখে নি— প্রথম থেকেই কেবলই বাঁধা নিয়মে ওদের জানিয়ে দেওয়া হয়, তার পরে সেই শিক্ষিত বিদ্যার পুনরাবৃত্তি করে ওরা পরীক্ষার মার্কা সংগ্রহ করে।

আমার মনে আছে শান্তিনিকেতনে যখন দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে মহাত্মাজীর ছাত্রেরা ছিল তখন একদিন তাদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আমাদের ছেলেদের সঙ্গে পারুল-বনে বেড়াতে যেতে ইচ্ছা কর কি। সে বললে, জানি নে। এ সম্বন্ধে সে তাদের দলপতিকে জিজ্ঞাসা করতে চাইলে। আমি বললুম, জিজ্ঞাসা পরে কোরো, কিন্তু বেড়াতে যেতে তোমার ইচ্ছা আছে কি না আমাকে বলো। সে বললে, আমি জানি নে। অর্থাৎ এ ছাত্র স্বয়ং কোনো বিষয়ে কিছু ইচ্ছা করবার চর্চাই করে না; তাকে চালনা করা হয়, সে চলে, আপনা থেকে তাকে কিছু ভাবতে হয় না।

এরকম সামান্য বিষয়ে মনের এতটা অসাড়তা যদিও সাধারণত আমাদের ছাত্রদের মধ্যে দেখা যায় না, কিন্তু এর চেয়ে আরও একটুখানি শক্ত রকমের চিন্তনীয় বিষয় যদি পাড়া যায় তবে দেখা যাবে সেজন্যে এদের মন একটুখানিও প্রস্তুত নেই। এরা কেবলই অপেক্ষা করে থাকে আমরা উপরে থেকে কী বলতে পারি তাই শোনবার জন্যে। সংসারে এরকম মনের মতো নিরুপায় মন আর হতে পারে না।

এখানে শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে নানারকম পরীক্ষা চলছে, তার বিস্তারিত বিবরণ পরে দেবার চেষ্টা করব। শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে রিপোর্ট এবং বই পড়ে অনেকটা জানা যেতে পারে, কিন্তু শিক্ষার চেহারা মানুষের মধ্যে যেটা প্রত্যক্ষ দেখা যায় সেটাই সব চেয়ে বড়ো কাজের। সেইটে সেদিন দেখে এসেছি। পায়োনিয়র্‌স্‌ কম্যুন বলে এ দেশে যে-সব আশ্রম স্থাপিত হয়েছে তারই একটা দেখতে সেদিন গিয়েছিলুম। আমাদের শান্তিনিকেতনে যেরকম ব্রতীবালক ব্রতীবালিকা আছে এদের পায়োনিয়র্‌স্‌ দল কতকটা সেই ধরনের।

বাড়িতে প্রবেশ করেই দেখি আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সিঁড়ির দু ধারে বালকবালিকার দল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে আসতেই ওরা আমার চার দিকে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল, যেন আমি ওদেরই আপন দলের। একটা কথা মনে রেখো, এরা সকলেই পিতৃমাতৃহীন। এরা যে শ্রেণী থেকে এসেছে একদা সে শ্রেণীর মানুষ কারও কাছে কোনো যত্নের দাবি করতে পারত না, লক্ষ্মীছাড়া হয়ে নিতান্ত নীচ বৃত্তির দ্বারা দিনপাত করত। এদের মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, অনাদরের অসম্মানের কুয়াশা-ঢাকা চেহারা একেবারেই নয়। সংকোচ নেই, জড়তা নেই। তা ছাড়া সকলেরই মনের মধ্যে একটা পণ, সামনে একটা কর্মক্ষেত্র আছে বলে মনে হয় যেন সর্বদা তৎপর হয়ে আছে, কোনো-কিছুতে অনবধানের শৈথিল্য থাকবার জো নেই।

অভ্যর্থনার জবাবে আমি ওদের অল্প যা বলেছিলুম তারই প্রসঙ্গক্রমে একজন ছেলে বললে, 'পরশ্রমজীবীরা (bourgeoisie) নিজের ব্যক্তিগত মুনফা খোঁজে, আমরা চাই দেশের ঐশ্বর্যে সকল মানুষের সমান স্বত্ব থাকে। এই বিদ্যালয়ে আমরা সেই নীতি অনুসারে চলে থাকি।'

একটি মেয়ে বললে, 'আমরা নিজেরা নিজেদের চালনা করি। আমরা সকলে মিলে পরামর্শ করে কাজ করে থাকি, যেটা সকলের পক্ষেই শ্রেয় সেইটেই আমাদের স্বীকার্য।'

আর-একটি ছেলে বললে, 'আমরা ভুল করতে পারি, কিন্তু যদি ইচ্ছা করি যারা আমাদের চেয়ে বড়ো তাদের পরামর্শ নিয়ে থাকি। প্রয়োজন হলে ছোটো ছেলেমেয়েরা বড়ো ছেলেমেয়েদের মত নেয় এবং তারা যেতে পারে তাদের শিক্ষকদের কাছে। আমাদের দেশের শাসনতন্ত্রের এই বিধি। আমরা এখানে সেই বিধিরই চর্চা করে থাকি।'

এর থেকে বুঝতে পারবে, এদের শিক্ষা কেবল পুঁথিপড়ার শিক্ষা নয়। নিজের ব্যবহারকে চরিত্রকে একটা বৃহৎ লোকযাত্রার অনুগত করে এরা তৈরি করে তুলছে। সেই সম্বন্ধে এদের একটা পণ আছে এবং সেই পণ রক্ষায় এদের গৌরববোধ।

আমার ছেলেমেয়ে এবং শিক্ষকদের আমি অনেকবার বলেছি, লোকহিত এবং স্বায়ত্তশাসনের যে দায়িত্ববোধ আমরা সমস্ত দেশের কাছ থেকে দাবি করে থাকি শান্তিনিকেতনের ছোটো সীমার মধ্যে তারই একটি সম্পূর্ণ রূপ দিতে চাই। এখানকার ব্যবস্থা ছাত্র ও শিক্ষকদের সমবেত স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার— সেই ব্যবস্থায় যখন এখানকার সমস্ত কর্ম সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে

তখন এইটুকুর মধ্যে, আমাদের সমস্ত দেশের সমস্যার পূরণ হতে পারবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সাধারণ হিতের অনুগত করে তোলবার চর্চা রাষ্ট্রীয় বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে হতে পারে না, তার জন্যে ক্ষেত্র তৈরি করতে হয়—সেই ক্ষেত্র আমাদের আশ্রম।

একটা ছোটো দৃষ্টান্ত তোমাকে দিই। আহারের রুচি এবং অভ্যাস সম্বন্ধে বাংলাদেশে যেমন কদাচার এমন আর কোথাও নেই। পাকশালা এবং পাকযন্ত্রকে অত্যন্ত অনাবশ্যক আমরা ভারগ্রস্ত করে তুলেছি। এ সম্বন্ধে সংস্কার করা বড়ো কঠিন। স্বজাতির চিরন্তন হিতের প্রতি লক্ষ করে আমাদের ছাত্ররা ও শিক্ষকেরা পথ্য সম্বন্ধে নিজের রুচিকে যথোচিতভাবে নিয়ন্ত্রিত করবার পণ গ্রহণ করতে যদি পারত তা হলে আমি যাকে শিক্ষা বলি সেই শিক্ষা সার্থক হত। তিন-নয়ে সাতাশ হয় এইটে মুখস্থ করাকে আমরা শিক্ষা বলে গণ্য করে থাকি, সে সম্বন্ধে ছেলেরা কোনোমতেই ভুল না করে তার প্রতি লক্ষ না করাকে গুরুতর অপরাধ বলে জানি, কিন্তু যে জিনিসটাকে উদরস্থ করি সে সম্বন্ধে শিক্ষাকে তার চেয়ে কম দাম দেওয়াই মূর্খতা। আমাদের প্রতিদিনের খাওয়া সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত দেশের কাছে দায়িত্ব আছে এবং সে দায়িত্ব অতি গুরুতর—সম্পূর্ণ উপলব্ধির সঙ্গে এটাকে মনে রাখা পাসের মার্কার চেয়ে অনেক বড়ো।

আমি এদের জিজ্ঞাসা করলুম, 'কেউ কোনো অপরাধ করলে এখানে তার বিধান কী।'

একটি মেয়ে বললে, 'আমাদের কোনো শাসন নেই, কেননা আমরা নিজেদের শাস্তি দিই।'

আমি বললুম, 'আর-একটু বিস্তারিত করে বলো। কেউ অপরাধ করলে তার বিচার করবার জন্যে তোমরা কি বিশেষ সভা ডাক। নিজেদের মধ্যে থেকে কাউকে কি তোমরা বিচারক নির্বাচন কর। শাস্তি দেবার বিধিই বা কী রকমের।'

একটি মেয়ে বললে, 'বিচারসভা যাকে বলে তা নয়, আমরা বলা-কওয়া করি। কাউকে অপরাধী করাই শাস্তি, তার চেয়ে শাস্তি আর নেই।'

একটি ছেলে বললে, 'সেও দুঃখিত হয় আমরাও দুঃখিত হই, বাস্‌ চুকে যায়।'

আমি বললুম, 'মনে করো কোনো ছেলে যদি ভাবে তার প্রতি অযথা দোষারোপ হচ্ছে তা হলে তোমাদের উপরেও আর-কারও কাছে কি সে ছেলের আপিল চলে।'

ছেলেটি বললে, 'তখন আমরা ভোট নিই—অধিকাংশের মতে যদি স্থির হয় যে সে অপরাধ করেছে তা হলে তার উপরে আর কথা চলে না।'

আমি বললুম, 'কথা না চলতে পারে, কিন্তু তবু ছেলেটি যদি মনে করে অধিকাংশই তার উপরে অন্যায় করছে তা হলে তার কোনো প্রতিবিধান আছে কি।'

একটি মেয়ে উঠে বললে, 'তা হলে হয়তো আমরা শিক্ষকদের পরামর্শ নিতে যাই—কিন্তু এরকম ঘটনা কখনো ঘটে নি।'

আমি বললুম, 'যে-একটি সাধনার মধ্যে সকলে আছ সেইটেতেই আপনা হতেই অপরাধ থেকে তোমাদের রক্ষা করে।'

ওদের কর্তব্য কী প্রশ্ন করাতে বললে, 'অন্য দেশের লোকেরা নিজের কাজের জন্য অর্থ চায়, সম্মান চায়, আমরা তার কিছুই চাই নে, আমরা সাধারণের হিত চাই। আমরা গাঁয়ের লোকদের শিক্ষা দেবার জন্যে পাড়াগাঁয়ে যাই—কী করে পরিষ্কার হয়ে থাকতে হয়, সকল কাজ কী করে বুদ্ধিপূর্বক করতে হয়, এই-সব তাদের বুঝিয়ে দিই। অনেক সময়ে আমরা তাদের মধ্যে গিয়েই বাস করি, নাটক-অভিনয় করি, দেশের অবস্থার কথা বলি।'

তার পরে আমাকে দেখাতে চাইলে কাকে ওরা বলে সজীব সংবাদপত্র। একটি মেয়ে বললে, 'দেশের সম্বন্ধে আমাদের অনেক খবর জানতে হয়, আমরা যা জানি তাই আবার অন্য সবাইকে জানানো আমাদের কর্তব্য। কেননা, ঠিকমত করে তথ্যগুলিকে জানতে এবং তাদের সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারলে তবেই আমাদের কাজ খাঁটি হতে পারে।'

একটি ছেলে বললে, 'প্রথমে আমরা বই থেকে, আমাদের শিক্ষকের কাছ থেকে শিখি, তার পরে

তাই নিয়ে আমরা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করি, তার পরে সেইগুলি সাধারণকে জানাবার জন্যে যাবার হুকুম হয়।'

সজীব সংবাদপত্র অভিনয় করে আমাকে দেখালে। বিষয়টা হচ্ছে এদের পাঞ্চবার্ষিক সংকল্প। ব্যাপারটা হচ্ছে, এরা কঠিন পণ করেছে পাঁচ বছরের মধ্যে সমস্ত দেশকে যন্ত্রশক্তিতে সুদক্ষ করে তুলবে, বিদ্যুৎশক্তি বাষ্পশক্তিকে দেশের এক ধার থেকে আর-এক ধার পর্যন্ত কাজে লাগিয়ে দেবে। এদের দেশ বলতে কেবল য়ুরোপীয় রাশিয়া বোঝায় না। এশিয়ার অনেক দূর পর্যন্ত তার বিস্তার। সেখানেও নিয়ে যাবে এদের শক্তির বাহনকে। ধনীকে ধনীতর করবার জন্যে নয়, জনসমষ্টিকে শক্তিসম্পন্ন করবার জন্যে—সেই জনসমষ্টির মধ্যে মধ্য-এশিয়ার অসিতচর্ম মানুষও আছে। তারাও শক্তির অধিকারী হবে বলে ভয় নেই, ভাবনা নেই।

এই কাজের জন্য এদের প্রভূত টাকার দরকার—য়ুরোপীয় বড়োবাজারে এদের হুণ্ডি চলে না, নগদ দামে কেনা ছাড়া উপায় নেই। তাই পেটের অন্ন দিয়ে এরা জিনিস কিনছে, উৎপন্ন শস্য পশুমাংস ডিম মাখন সমস্ত চালান হচ্ছে বিদেশের হাটে। সমস্ত দেশের লোক উপবাসের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। এখনো দেড় বছর বাকি। অন্য দেশের মহাজনরা খুশি নয়। বিদেশী এঞ্জিনিয়াররা এদের কল-কারখানা অনেক নষ্টও করেছে। ব্যাপারটা বৃহৎ ও জটিল, সময় অত্যন্ত অল্প। সময় বাড়াতে সাহস হয় না, কেননা সমস্ত ধনী-জগতের প্রতিকূলতার মুখে এরা দাঁড়িয়ে, যত শীঘ্র সম্ভব আপন শক্তিতে ধন উৎপাদন এদের পক্ষে নিতান্ত দরকার। তিন বছর কষ্টে কেটে গেছে, এখনো দু বছর বাকি।

'সজীব খবরের কাগজ'টা অভিনয়ের মতো; নেচে গেয়ে পতাকা তুলে এরা জানিয়ে দিতে চায় দেশের অর্থশক্তিকে যন্ত্রবাহিনী করে ক্রমে ক্রমে কী পরিমাণে এরা সফলতা লাভ করছে। দেখবার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। যারা জীবনযাত্রার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে বহু কষ্টে কাল কাটাচ্ছে তাদের বোঝানো চাই অনতিকালের মধ্যে এই কষ্টের অবসান হবে এবং বদলে যা পাবে তার কথা স্মরণ করে যেন তারা আনন্দের সঙ্গে, গৌরবের সঙ্গে, কষ্টকে বরণ করে নেয়।

এর মধ্যে সান্ত্বনার কথাটা এই যে, কোনো এক-দল লোক নয়, দেশের সকল লোকই একসঙ্গে তপস্যায় প্রবৃত্ত। এই 'সজীব সংবাদপত্র' অন্য দেশের বিবরণও এইরকম ক'রে প্রচার করে। মনে পড়ল পতিসরে দেহতত্ত্ব মুক্তিতত্ত্ব নিয়ে এক যাত্রার পালা শুনেছিলুম—প্রণালীটা একই, লক্ষ্যটা আলাদা। মনে করছি দেশে ফিরে গিয়ে শান্তিনিকেতনে সুরুলে 'সজীব সংবাদপত্র' চালাবার চেষ্টা করব।

ওদের দৈনিক কার্যপদ্ধতি হচ্ছে এইরকম—সকাল সাতটার সময় ওরা বিছানা থেকে ওঠে। তার পর পনেরো মিনিট ব্যায়াম, প্রাতঃকৃত্য, প্রাতরাশ। আটটার সময় ক্লাস বসে। একটার সময় কিছুক্ষণের জন্য আহার ও বিশ্রাম। বেলা তিনটে পর্যন্ত ক্লাস চলে। শেখবার বিষয় হচ্ছে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, প্রাথমিক প্রাকৃতবিজ্ঞান, প্রাথমিক রসায়ন, প্রাথমিক জীববিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, হাতের কাজ, ছুতোরের কাজ, বই-বাঁধাই, হাল আমলের চাষের যন্ত্র প্রভৃতি ব্যবহার ইত্যাদি। রবিবার নেই। প্রত্যেক পঞ্চম দিনে ছুটি। তিনটের পরে বিশেষ দিনের কার্যতালিকা অনুসারে পায়োনিয়ররা (পুরোযায়ীর দল) কারখানা, হাসপাতাল, গ্রাম প্রভৃতি দেখতে যায়।

পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করতে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। মাঝে মাঝে নিজেরা অভিনয় করে; মাঝে মাঝে থিয়েটার দেখতে, সিনেমা দেখতে যায়। সন্ধ্যাবেলায় গল্প পড়া, গল্প বলা, তর্কসভা, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সভা। ছুটির দিনে পায়োনিয়ররা কিছু পরিমাণে নিজেদের কাপড় কাচে, ঘর পরিষ্কার করে, বাড়ি এবং বাড়ির চার দিক পরিষ্কার করে, ক্লাস-পাঠ্যের অতিরিক্ত পড়া পড়ে, বেড়াতে যায়। ভর্তি হবার বয়েস সাত-আট, বিদ্যালয় ত্যাগ করবার বয়েস ষোলো। এদের

অধ্যয়নকাল আমাদের দেশের মতো লম্বা লম্বা ছুটি দিয়ে ফাঁক করে দেওয়া নয়, সুতরাং অল্পদিনে অনেক বেশি পড়তে পারে।

এখানকার বিদ্যালয়ের মস্ত একটা গুণ, এরা যা পড়ে, তার সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকে। তাতে পড়ার বিষয় মনে চিত্রিত হয়ে ওঠে, ছবির হাত পেকে যায়—আর পড়ার সঙ্গে রূপসৃষ্টি করার আনন্দ মিলিত হয়। হঠাৎ মনে হতে পারে, এরা বুঝি কেবলই কাজের দিকে ঝোঁক দিয়েছে গোঁয়ারের মতো ললিতকলাকে অবজ্ঞা ক'রে। একেবারেই তা নয়। সম্রাটের আমলের তৈরি বড়ো বড়ো রঙ্গশালায় উচ্চ অঙ্গের নাটক ও অপেরার অভিনয়ে বিলম্বে টিকিট পাওয়াই শক্ত হয়। নাট্যাভিনয়কলায় এদের মতো ওস্তাদ জগতে অল্পই আছে, পূর্বতন কালে আমীর-ওমরাওরাই সে-সমস্ত ভোগ করে এসেছেন—তখনকার দিনে যাদের পায়ে না ছিল জুতো, গায়ে ছিল ময়লা ছেঁড়া কাপড়, আহার ছিল আধ-পেটা, দেবতা মানুষ সবাইকেই যারা অহোরাত্র ভয় করে করে বেড়িয়েছে, পরিত্রাণের জন্যে পুরুত-পাণ্ডাকে দিয়েছে ঘুষ, আর মনিবের কাছে ধুলোয় মাথা লুটিয়ে আত্মাবমাননা করেছে, তাদেরই ভিড়ে থিয়েটারে জায়গা পাওয়া যায় না।

আমি যেদিন অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম সেদিন হচ্ছিল টলস্টয়ের 'রিসারেক্‌শান'। জিনিসটা জনসাধারণের পক্ষে সহজে উপভোগ্য বলে মনে করা যায় না। কিন্তু শ্রোতারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে শুনছিল। অ্যাংলোস্যাক্‌শন চাষী-মজুর শ্রেণীর লোকে এ জিনিস রাত্রি একটা পর্যন্ত এমন স্তব্ধ শান্ত ভাবে উপভোগ করছে এ কথা মনে করা যায় না, আমাদের দেশের কথা ছেড়েই দাও।

আর-একটা উদাহরণ দিই। মস্কৌ শহরে আমার ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল। এ ছবিগুলো সৃষ্টিছাড়া সে কথা বলা বাহুল্য। শুধু যে বিদেশী তা নয়, বলা চলে যে তারা কোনোদেশীই নয়। কিন্তু লোকের ঠেলাঠেলি ভিড়। অল্প কয় দিনে পাঁচ হাজার লোক ছবি দেখেছে। আর যে যা বলুক, অন্তত আমি তো এদের রুচির প্রশংসা না করে থাকতে পারব না।

রুচির কথা ছেড়ে দাও, মনে করা যাক এ একটা ফাঁকা কৌতূহল। কিন্তু কৌতূহল থাকাটাই যে জাগ্রত চিত্তের পরিচয়। মনে আছে একদা আমাদের ইঁদারার জন্যে আমেরিকা থেকে একটা বায়ুচল চক্রযন্ত্র এনেছিলুম, তাতে কুয়োর গভীর তলা থেকে জল উঠেছিল। কিন্তু যখন দেখলুম ছেলেদের চিত্তের গভীর তলদেশ থেকে একটুও কৌতূহল টেনে তুলতে পারলে না তখন মনে বড়োই ধিক্‌কার লাগল। এই তো আমাদের ওখানে আছে বৈদ্যুত আলোর কারখানা, কজন ছেলের তাতে একটুও ঔৎসুক্য আছে? অথচ এরা তো ভদ্রশ্রেণীর ছেলে। বুদ্ধির জড়তা যেখানে সেইখানে কৌতূহল দুর্বল।

এখানে ইস্কুলের ছেলেদের আঁকা অনেকগুলি ছবি আমরা পেয়েছি—দেখে বিস্মিত হতে হয়; সেগুলো রীতিমত ছবি, কারও নকল নয়, নিজের উদ্ভাবন। এখানে নির্মাণ এবং সৃষ্টি দুইয়েরই প্রতি লক্ষ দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছি। এখানে এসে অবধি স্বদেশের শিক্ষার কথা অনেক ভাবতে হয়েছে। আমার নিঃসহায় সামান্য শক্তি দিয়ে কিছু এর আহরণ এবং প্রয়োগ করতে চেষ্টা করব। কিন্তু আর সময় কই—আমার পক্ষে পাঞ্চবার্ষিক সংকল্পও হয়তো পূরণ না হতে পারে। প্রায় ত্রিশ বছর কাল যেমন একা একা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লগি ঠেলে কাটিয়েছি আরও দু-চার বছর তেমনি করেই ঠেলতে হবে—বিশেষ এগোবে না তাও জানি, তবু নালিশ করব না। আজ আর সময় নেই। আজ রাত্রের গাড়িতে জাহাজের ঘাটের অভিমুখে যেতে হবে, সমুদ্রে কাল পাড়ি দেব। ইতি ২ অক্টোবর ১৯৩০[১]

[১] আশা অধিকারীকে লিখিত।
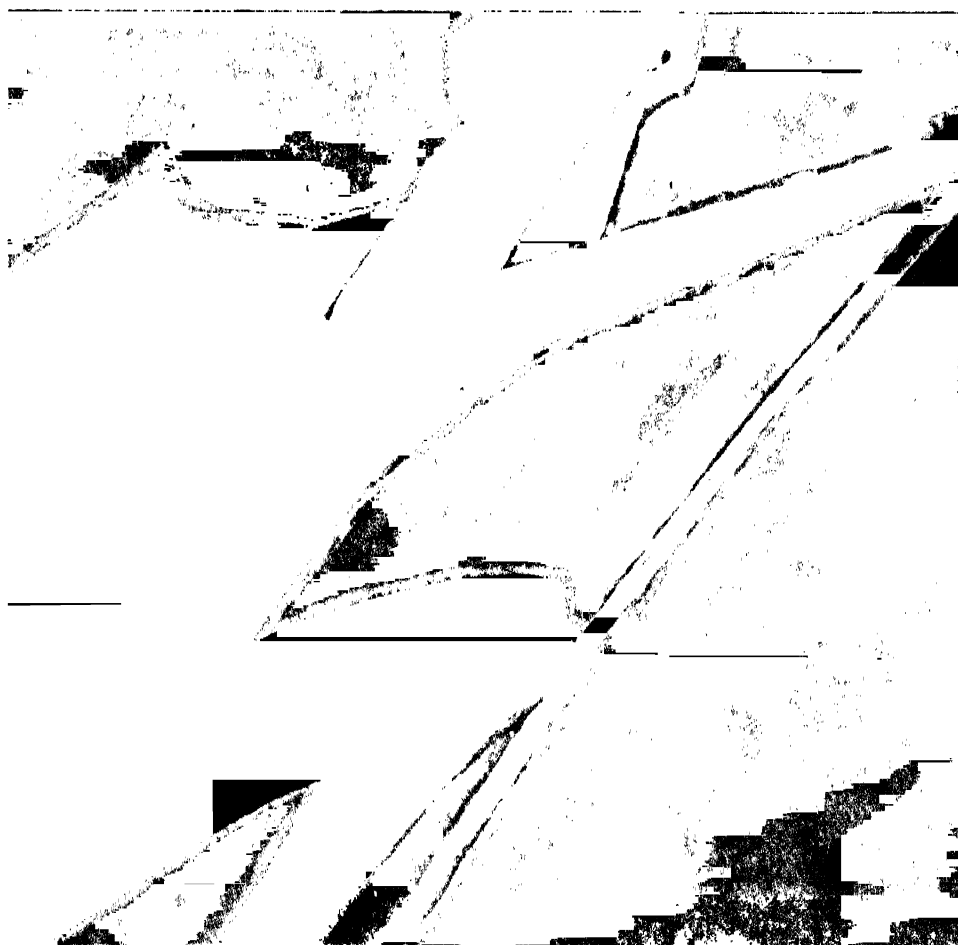
'SPIRIT OF RUSSIA'
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত

৭

ব্রেমেন স্টীমার
অতলান্তিক

রাশিয়া থেকে ফিরে এসে আজ চলেছি আমেরিকার ঘাটে। কিন্তু রাশিয়ার স্মৃতি আজও আমার সমস্ত মন অধিকার করে আছে। তার প্রধান কারণ— অন্যান্য যে-সব দেশে ঘুরেছি তারা সমগ্রভাবে মনকে নাড়া দেয় না, তাদের নানা কর্মের উদ্যম আছে আপন আপন মহলে। কোথাও আছে পলিটিক্স্, কোথাও আছে হাসপাতাল, কোথাও আছে বিশ্ববিদ্যালয়, কোথাও আছে ম্যুজিয়ম— বিশেষজ্ঞরা তাই নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে সমস্ত দেশটা এক অভিপ্রায় মনে নিয়ে সমস্ত কর্মবিভাগকে এক স্নায়ুজালে জড়িত করে এক বিরাট দেহ বৃহৎ ব্যক্তিস্বরূপ ধারণ করেছে। সব-কিছু মিলে গেছে একটি অখণ্ড সাধনার মধ্যে।

যে-সব দেশে অর্থ এবং শক্তির অধ্যবসায় ব্যক্তিগত স্বার্থদ্বারা বিভক্ত সেখানে এরকম চিত্তের নিবিড় ঐক্য অসম্ভব। যখন এখানে পাঁচবার্ষিক য়ুরোপীয় যুদ্ধ চলছিল তখন দায়ে পড়ে দেশের অধিকাংশ ভাবনা ও কাজ এক অভিপ্রায়ে মিলিত হয়ে এক চিত্তের অধিকারে এসেছিল, এটা হয়েছিল অস্থায়ীভাবে। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় যে কাণ্ড চলছে তার প্রকৃতিই এই— সাধারণের কাজ, সাধারণের চিত্ত, সাধারণের স্বত্ব বলে একটা অসাধারণ সত্তা এরা সৃষ্টি করতে লেগে গেছে।

উপনিষদের একটা কথা আমি এখানে এসে খুব স্পষ্ট করে বুঝেছি— 'মা গৃধঃ', লোভ কোরো না। কেন লোভ করবে না। যেহেতু সমস্ত-কিছু এক সত্যের দ্বারা পরিব্যাপ্ত; ব্যক্তিগত লোভেতেই সেই একের উপলব্ধির মধ্যে বাধা আনে। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'— সেই একের থেকে যা আসছে তাকেই ভোগ করো। এরা আর্থিক দিক থেকে সেই কথাটা বলছে। সমস্ত মানবসাধারণের মধ্যে এরা একটি অদ্বিতীয় মানবসত্যকেই বড়ো বলে মানে— সেই একের যোগে উৎপন্ন যা-কিছু, এরা বলে, তাকেই সকলে মিলে ভোগ করো— 'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং'— কারও ধনে লোভ কোরো না। কিন্তু ধনের ব্যক্তিগত বিভাগ থাকলেই ধনের লোভ আপনিই হয়। সেইটিকে ঘুচিয়ে দিয়ে এরা বলতে চায়, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।'

য়ুরোপে অন্য সকল দেশেরই সাধনা ব্যক্তির লাভকে, ব্যক্তির ভোগকে নিয়ে। তারই মন্থন-আলোড়ন খুবই প্রচণ্ড, আর পৌরাণিক সমুদ্রমন্থনের মতোই তার থেকে বিষ ও সুধা দুই-ই উঠছে। কিন্তু সুধার ভাগ কেবল এক দলই পাচ্ছে অধিকাংশই পাচ্ছে না— এই নিয়ে অসুখ-অশান্তির সীমা নেই। সবাই মেনে নিয়েছিল এইটেই অনিবার্য; বলেছিল মানবপ্রকৃতির মধ্যেই লোভ আছে এবং লোভের কাজই হচ্ছে ভোগের মধ্যে অসমান ভাগ করে দেওয়া। অতএব প্রতিযোগিতা চলবে এবং লড়াইয়ের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকা চাই। কিন্তু সোভিয়েটরা যা বলতে চায় তার থেকে বুঝতে হবে মানুষের মধ্যে ঐক্যটাই সত্য, ভাগটাই মায়া, সম্যক্ চিন্তা সম্যক্ চেষ্টা-দ্বারা সেটাকে যে মুহূর্তে মানব না সেই মুহূর্তেই স্বপ্নের মতো সে লোপ পাবে।

রাশিয়ায় সেই না-মানার চেষ্টা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকাণ্ড করে চলছে। সব-কিছু এই এক-চেষ্টার অন্তর্গত হয়ে গেছে। এইজন্যে রাশিয়ায় এসে একটা বিরাট চিত্তের স্পর্শ পাওয়া গেল। শিক্ষার বিরাটপর্ব আর কোনো দেশে এমন করে দেখি নি, তার কারণ অন্য দেশে শিক্ষা যে করে শিক্ষার ফল তারই— 'দুধুভাতু খায় সেই।' এখানে প্রত্যেকের শিক্ষায় সকলের শিক্ষা। একজনের মধ্যে শিক্ষার যে অভাব হবে সে অভাব সকলকেই লাগবে। কেননা সম্মিলিত শিক্ষারই যোগে এরা সম্মিলিত মনকে বিশ্বসাধারণের কাজে সফল করতে চায়। এরা 'বিশ্বকর্মা'; অতএব এদের বিশ্বমনা হওয়া চাই। অতএব এদের জন্যেই যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষা-ব্যাপারকে এরা নানা প্রণালী দিয়ে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে

ম্যুজিয়ম। নানাপ্রকার ম্যুজিয়মের জালে এরা সমস্ত গ্রাম-শহরকে জড়িয়ে ফেলেছে। সে ম্যুজিয়ম আমাদের শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরির মতো অকারী (passive) নয়, সকারী (active)।

রাশিয়ার region study অর্থাৎ স্থানিক তথ্যসন্ধানের উদ্যোগ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এরকম শিক্ষাকেন্দ্র প্রায় দু হাজার আছে, তার সদস্যসংখ্যা সত্তর হাজার পেরিয়ে গেছে। এই-সব কেন্দ্রে তত্তৎ স্থানের অতীত ইতিহাস এবং অতীত ও বর্তমানের আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধান হয়। তা ছাড়া সে-সব জায়গার উৎপাদিকা শক্তি কিরকম শ্রেণীর কিংবা কোনো খনিজ পদার্থ সেখানে প্রচ্ছন্ন আছে কি না, তার খোঁজ হয়ে থাকে। এই-সব কেন্দ্রের সঙ্গে যে-সব ম্যুজিয়ম আছে তারই যোগে সাধারণের শিক্ষাবিস্তার একটা গুরুতর কর্তব্য। সোভিয়েট রাষ্ট্রে সর্বসাধারণের জ্ঞানোন্নতির যে নবযুগ এসেছে, এই স্থানিক তথ্যসন্ধানের ব্যাপক চর্চা এবং তৎসংশ্লিষ্ট ম্যুজিয়ম তার একটা প্রধান প্রণালী।

এইরকম নিকটবর্তী স্থানের তথ্যানুসন্ধান শান্তিনিকেতনে কালীমোহন কিছু পরিমাণে করেছেন; কিন্তু এই কাজের সঙ্গে আমাদের ছাত্র ও শিক্ষকেরা যুক্ত না থাকাতে তাদের এতে কোনো উপকার হয় নি। সন্ধান করবার ফল পাওয়ার চেয়ে সন্ধান করার মন তৈরি করা কম কথা নয়। কলেজ-বিভাগের ইকনমিক্স্ ক্লাসের ছাত্রদের নিয়ে প্রভাত এইরকম চর্চার পত্তন করছেন শুনেছিলুম; কিন্তু এ কাজটা আরও বেশি সাধারণভাবে করা দরকার, পাঠভবনের ছেলেদেরও এই কাজে দীক্ষিত করা চাই, আর এইসঙ্গে সমস্ত প্রাদেশিক সামগ্রীর ম্যুজিয়ম স্থাপন করা আবশ্যক।

এখানে ছবির ম্যুজিয়মের কাজ কিরকম চলে তার বিবরণ শুনলে নিশ্চয় তোমার ভালো লাগবে। মস্কো শহরে ট্রেটিয়াকভ গ্যালারি (Tretyakov Gallery) নামে এক বিখ্যাত চিত্রভাণ্ডার আছে। সেখানে ১৯২৮ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত এক বছরের মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ লোক ছবি দেখতে এসেছে। যত দর্শক আসতে চায় তাদের ধরানো শক্ত হয়ে উঠেছে। সেইজন্যে ছুটির দিনে আগে থাকতে দর্শকদের নাম রেজেস্ট্রি করানো দরকার হয়েছে।

১৯১৭ খৃস্টাব্দে সোভিয়েট-শাসন প্রবর্তিত হবার পূর্বে যে-সব দর্শক এইরকম গ্যালারিতে আসত তারা ধনী মানী জ্ঞানী দলের লোক এবং তারা, যাদের এরা বলে bourgeoisie, অর্থাৎ পরশ্রমজীবী। এখন আসে অসংখ্য স্বশ্রমজীবীর দল, যথা রাজমিস্ত্রি, লোহার, মুদি, দরজি ইত্যাদি। আর আসে সোভিয়েট সৈনিক, সেনানায়ক, ছাত্র এবং চাষী-সম্প্রদায়।

আর্টের বোধ ক্রমে ক্রমে এদের মনে জাগিয়ে তোলা আবশ্যক। এদের মতো আনাড়িদের পক্ষে চিত্রকলার রহস্য প্রথম দৃষ্টিতে ঠিকমত বোঝা অসাধ্য। দেয়ালে দেয়ালে ছবি দেখে দেখে এরা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, বুদ্ধি যায় পথ হারিয়ে। এই কারণে প্রায় সব ম্যুজিয়মেই উপযুক্ত পরিচায়ক রেখে দেওয়া হয়েছে। ম্যুজিয়মের শিক্ষাবিভাগে কিংবা অন্যত্র তদনুরূপ রাষ্ট্রকর্মশালায় যে-সমস্ত বৈজ্ঞানিক কর্মী আছে তাদেরই মধ্যে থেকে পরিচায়ক বাছাই করে নেওয়া হয়। যারা দেখতে আসে তাদের সঙ্গে এদের দেনাপাওনার কোনো কারবার থাকে না। ছবিতে যে বিষয়টা প্রকাশ করছে সেইটে দেখলেই যে ছবি দেখা হয়, দর্শকেরা যাতে সেই ভুল না করে পরিদর্শয়িতার সেটা জানা চাই।

চিত্রবস্তুর সংস্থান (composition), তার বর্ণকল্পনা (colour scheme), তার অঙ্কন, তার অবকাশ (space), তার উজ্জ্বলতা (illumination), যাতে করে তার বিশেষ সম্প্রদায় ধরা পড়ে সেই তার বিশেষ আঙ্গিক (technique)—এ-সকল বিষয়ে আজও অল্প লোকেরই জানা আছে। এইজন্যে পরিচায়কের বেশ দস্তুরমত শিক্ষা থাকা চাই, তবেই দর্শকদের ঔৎসুক্য ও মনোযোগ সে জাগিয়ে রাখতে পারে। আর-একটি কথা তাকে বুঝতে হবে, ম্যুজিয়মে কেবল একটিমাত্র ছবি নেই, অতএব একটা ছবিকে চিনে নেওয়া দর্শকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়; ম্যুজিয়মে যে-সব বিশেষ শ্রেণীর ছবি রক্ষিত আছে তাদের শ্রেণীগত রীতি বোঝা চাই। পরিচায়কদের কর্তব্য কয়েকটি করে বিশেষ ছাঁদের ছবি বেছে নিয়ে তাদের প্রকৃতি বুঝিয়ে দেওয়া। আলোচ্য ছবিগুলির সংখ্যা খুব বেশি হলে চলবে না এবং সময়ও বিশ মিনিটের বেশি হওয়া ঠিক নয়। ছবির যে-একটি স্বকীয়

ভাষা, একটি ছন্দ আছে সেইটেই বুঝিয়ে দেবার বিষয়; ছবির রূপের সঙ্গে ছবির বিষয়ের ও ভাবের সম্বন্ধ কী সেইটে ব্যাখ্যা করা দরকার। ছবির পরস্পর-বৈপরীত্য দ্বারা তাদের বিশেষত্ব বোঝানো অনেক সময় কাজে লাগে। কিন্তু দর্শকদের মন একটুমাত্র শ্রান্ত হলেই তাদের তখনই ছুটি দেওয়া চাই।

অশিক্ষিত দর্শকদের এরা কী করে ছবি দেখতে শেখায় তারই একটা রিপোর্ট থেকে উল্লিখিত কথাগুলি তোমাকে সংগ্রহ করে পাঠালুম। এর থেকে আমাদের দেশের লোকের যেটি ভাববার কথা আছে সেটি হচ্ছে এই—

পূর্বে যে চিঠি লিখেছি তাতে আমি বলেছি, সমস্ত দেশকে কৃষিবলে যন্ত্রবলে অতিদ্রুতমাত্রায় শক্তিমান করে তোলবার জন্যে এরা একান্ত উদ্যমের সঙ্গে লেগে গেছে। এটা ঘোরতর কেজো কথা। অন্য-সব ধনী দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজের জোরে টিঁকে থাকবার জন্যে এদের এই বিপুল সাধনা। আমাদের দেশে যখন এই-জাতীয় দেশব্যাপী রাষ্ট্রিক সাধনার কথা ওঠে তখনই আমরা বলতে শুরু করি, এই একটিমাত্র লাল মশাল জ্বালিয়ে তুলে দেশের অন্য সকল বিভাগের সকল আলো নিবিয়া দেওয়া চাই, নইলে মানুষ অন্যমনস্ক হবে। বিশেষত ললিতকলা সকল প্রকার কঠোর সংকল্পের বিরোধী। স্বজাতিকে পালোয়ানি করবার জন্যে কেবলই তাল ঠুকিয়ে পাঁয়তারা করাতে হবে, সরস্বতীর বীণাটাকে নিয়ে যদি লাঠি বানানো সম্ভব হয় তবেই সেটা চলবে, নতুবা নৈব নৈব চ। এই কথাগুলো যে কতখানি মেকি পৌরুষের কথা তা এখানে এলে স্পষ্ট বোঝা যায়। এখানে এরা দেশ জুড়ে কারখানা চালাতে যে-সব শ্রমিকদের পাকা করে তুলতে চায়, তারাই যাতে শিক্ষিত মন নিয়ে ছবির রস বুঝতে পারে তারই জন্যে এত প্রভূত আয়োজন। এরা জানে, রসজ্ঞ যারা নয় তারা বর্বর; যারা বর্বর তারা বাইরে রুক্ষ, অন্তরে দুর্বল। রাশিয়ায় নবনাট্যকলার অসামান্য উন্নতি হয়েছে। এদের ১৯১৭ খৃস্টাব্দের বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরতর দুর্দিন দুর্ভিক্ষের মধ্যেই এরা নেচেছে, গান গেয়েছে, নাট্যাভিনয় করেছে—এদের ঐতিহাসিক বিরাট নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ ঘটে নি।

মরুভূমিতে শক্তি নেই। শক্তির যথার্থ রূপ দেখা যায় সেইখানেই যেখানে পাথরের বুক থেকে জলের ধারা কল্লোলিত হয়ে বেরিয়ে আসে, যেখানে বসন্তের রূপহিল্লোলে হিমাচলের গাম্ভীর্য মনোহর হয়ে ওঠে। বিক্রমাদিত্য ভারতবর্ষ থেকে শক শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু কালিদাসকে নিষেধ করেন নি মেঘদূত লিখতে। জাপানীরা তলোয়ার চালাতে পারে না এ কথা বলবার জো নেই, কিন্তু সমান নৈপুণ্যেই তারা তুলিও চালায়। রাশিয়ায় এসে যদি দেখতুম এরা কেবলই মজুর সেজে কারখানাঘরের সরঞ্জাম জোগাচ্ছে আর লাঙল চালাচ্ছে, তা হলেই বুঝতুম, এরা শুকিয়ে মরবে। যে বনস্পতি পল্লবমর্মর বন্ধ করে দিয়ে খট্ খট্ আওয়াজে অহংকার করে বলতে থাকে 'আমার রসের দরকার নেই' সে নিশ্চয়ই ছুতোরের দোকানের নকল বনস্পতি—সে খুবই শক্ত হতে পারে, কিন্তু খুবই নিষ্ফল। অতএব আমি বীরপুরুষদের বলে রাখছি এবং তপস্বীদের সাবধান করে দিচ্ছি যে, দেশে যখন ফিরে যাব পুলিসের যষ্টিধারার শ্রাবণবর্ষণেও আমার নাচগান বন্ধ হবে না।

রাশিয়ার নাট্যমঞ্চে যে কলাসাধনার বিকাশ হয়েছে সে অসামান্য। তার মধ্যে নূতন সৃষ্টির সাহস ক্রমাগতই দেখা দিচ্ছে, এখনো থামে নি। ওখানকার সমাজবিপ্লবে এই নূতন সৃষ্টিরই অসমসাহস কাজ করেছে। এরা সমাজে রাষ্ট্রে কলাতত্ত্বে কোথাও নূতনকে ভয় করে নি।

যে পুরাতন ধর্মতন্ত্র এবং পুরাতন রাষ্ট্রতন্ত্র বহু শতাব্দী ধরে এদের বুদ্ধিকে অভিভূত এবং প্রাণশক্তিকে নিঃশেষপ্রায় করে দিয়েছে এই সোভিয়েট-বিপ্লবীরা তাদের দুটোকেই দিয়েছে নির্মূল করে; এত বড়ো বন্ধনজর্জর জাতিকে এত অল্পকালে এত বড়ো মুক্তি দিয়েছে দেখে মন আনন্দিত হয়। কেননা, যে ধর্ম মূঢ়তাকে বাহন ক'রে মানুষের চিত্তের স্বাধীনতা নষ্ট করে, কোনো রাজাও তার চেয়ে আমাদের বড়ো শত্রু হতে পারে না—সে রাজা বাইরে থেকে প্রজাদের

স্বাধীনতাকে যতই নিগড়বদ্ধ করুক-না। এ-পর্যন্ত দেখা গেছে, যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে সে রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে রাখে। সে ধর্ম বিষকন্যার মতো; আলিঙ্গন ক'রে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ ক'রে সে মারে। শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেননা তার মার আরামের মার।

সোভিয়েটরা রুশসম্রাট-কৃত অপমান এবং আত্মকৃত অপমানের হাত থেকে এই দেশকে বাঁচিয়েছে—অন্য দেশের ধার্মিকেরা ওদের যত নিন্দাই করুক আমি নিন্দা করতে পারব না। ধর্ম-মোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো। রাশিয়ার বুকের 'পরে ধর্ম ও অত্যাচারী রাজার পাথর চাপা ছিল; দেশের উপর থেকে সেই পাথর নড়ে যাওয়ায় কী প্রকাণ্ড নিষ্কৃতি হয়েছে, এখানে এলে সেটা স্বচক্ষে দেখতে পেতে। ইতি ৩ অক্টোবর ১৯৩০[১]

৮

অতলান্তিক মহাসাগর

রাশিয়া থেকে ফিরে এসেছি, চলেছি আমেরিকার পথে। রাশিয়াযাত্রায় আমার একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—ওখানে জনসাধারণের শিক্ষাবিস্তারের কাজ কিরকম চলছে আর ওরা তার ফল কিরকম পাচ্ছে সেইটে অল্প সময়ের মধ্যে দেখে নেওয়া।

আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের বুকের উপর যত-কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটিমাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য — সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে। সাইমন কমিশনে ভারতবর্ষের সমস্ত অপরাধের তালিকা শেষ করে ব্রিটিশ শাসনের কেবল একটিমাত্র অপরাধ কবুল করেছে। সে হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষাবিধানের ত্রুটি। কিন্তু আর-কিছু বলবার দরকার ছিল না। মনে করুন যদি বলা হয়—গৃহস্থ সাবধান হতে শেখে নি; এক ঘর থেকে আর-এক ঘরে যেতে চৌকাঠে হুঁচট লেগে সে আছাড় খেয়ে পড়ে; জিনিসপত্র কেবলই হারায়, তার পরে খুঁজে পায় না; ছায়া দেখলে তাকে জুজু বলে ভয় করে; নিজের ভাইকে দেখে চোর এসেছে বলে লাঠি উঁচিয়ে মারতে যায়; কেবলই বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকে; উঠে হেঁটে বেড়াবার সাহসই নেই; খিদে পায়, কিন্তু খাবার কোথায় আছে খুঁজে পায় না, অদৃষ্টের উপর অন্ধ নির্ভর করে থাকা ছাড়া অন্য সমস্ত পথ তার কাছে লুপ্ত; অতএব নিজের গৃহস্থালির তদারকের ভার তার উপর দেওয়া চলে না—তার পরে সবশেষে গলা অত্যন্ত খাটো করে যদি বলা হয় 'আমি ওর বাতি নিবিয়ে রেখেছি'—তা হলে সেটা কেমন হয়।

ওরা একদিন ডাইনী বলে নিরপরাধাকে পুড়িয়েছে, পাপিষ্ঠ বলে বৈজ্ঞানিককে মেরেছে, ধর্ম-মতের স্বাতন্ত্র্যকে অতি নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করেছে, নিজেরই ধর্মের ভিন্ন সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রাধিকারকে খর্ব করে রেখেছে, এ ছাড়া কত অন্ধতা কত মূঢ়তা কত কদাচার মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে তার তালিকা স্তূপাকার করে তোলা যায়। এ-সমস্ত দূর হল কী করে। বাইরেকার কোনো কোর্ট্ অফ ওয়ার্ড্সের হাতে ওদের অক্ষমতার সংস্কারসাধনের ভার দেওয়া হয় নি; একটিমাত্র শক্তি ওদের এগিয়ে দিয়েছে, সে হচ্ছে ওদের শিক্ষা।

জাপান এই শিক্ষার যোগেই অল্পকালের মধ্যেই দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে সর্বসাধারণের ইচ্ছা ও চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে, দেশের অর্থ-উৎপাদনের শক্তিকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে। বর্তমান তুরস্ক প্রবলবেগে এই শিক্ষা অগ্রসর করে দিয়ে ধর্মান্ধতার প্রবল বোঝা থেকে দেশকে মুক্ত করবার পথে চলেছে। 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়'। কেননা ঘরে আলো আসতে দেওয়া হয় নি; যে আলোতে আজকের পৃথিবী জেগে সেই শিক্ষার আলো ভারতের রুদ্ধ দ্বারের বাইরে।

---

[১] সুরেন্দ্রনাথ করকে লিখিত।

রাশিয়ায় যখন যাত্রা করলুম খুব বেশি আশা করি নি। কেননা, কতটা সাধ্য এবং অসাধ্য তার আদর্শ ব্রিটিশ-ভারতবর্ষ থেকেই আমি পেয়েছি। ভারতের উন্নতিসাধনের দুরূহতা যে কত বেশি সে কথা স্বয়ং খৃস্টান পাদ্রি টমসন অতি করুণস্বরে সমস্ত পৃথিবীর কাছে জানিয়েছে। আমাকেও মানতে হয়েছে দুরূহতা আছে বৈকি, নইলে আমাদের এমন দশা হবেই বা কেন। একটা কথা আমার জানা ছিল, রাশিয়ায় প্রজাসাধারণের উন্নতিবিধান ভারতবর্ষের চেয়ে বেশি দুরূহ বৈ কম নয়। প্রথমত এখানকার সমাজে যারা ভদ্রেতর শ্রেণীতে ছিল আমাদের দেশের সেই শ্রেণীর লোকের মতোই তাদের অন্তর-বাহিরের অবস্থা। সেইরকমই নিরক্ষর নিরুপায়, পূজার্চনা পুরুতপাণ্ডা দিনক্ষণ তাগা-তাবিজে বুদ্ধিশুদ্ধি সমস্ত চাপা-পড়া, উপরওআলাদের পায়ের ধুলোতেই মলিন তাদের আত্মসম্মান, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের সুযোগ-সুবিধা তারা কিছুই পায় নি, প্রপিতামহদের ভূতে-পাওয়া তাদের ভাগ্য, সেই ভূত তাদের বেঁধে রেখেছে হাজার বছরের আগেকার অচল খোঁটায়—মাঝে মঝে য়িহুদী প্রতিবেশীদের 'পরে খুন চেপে যায়, তখন পাশবিক নিষ্ঠুরতার আর অন্ত থাকে না। উপরওআলাদের কাছ থেকে চাবুক খেতে যেমন মজবুত, নিজেদের সমশ্রেণীর প্রতি অন্যায় অত্যাচার করতে তারা তেমনি প্রস্তুত।

এই তো হল ওদের দশা—বর্তমানে যাদের হাতে ওদের ভাগ্য ইংরেজের মতো তারা ঐশ্বর্যশালী নয়, কেবলমাত্র ১৯১৭ খৃস্টাব্দের পর থেকে নিজের দেশে তাদের অধিকার আরম্ভ হয়েছে; রাষ্ট্র-ব্যবস্থা আটে-ঘাটে পাকা হবার মতো সময় এবং সম্বল তারা পায় নি; ঘরে-বাইরে প্রতিকূলতা; তাদের মধ্যে আত্মবিদ্রোহ সমর্থন করবার জন্যে ইংরেজ এমন-কি, আমেরিকানরাও গোপনে ও প্রকাশ্যে চেষ্টা করছে। জনসাধারণকে, সক্ষম ও শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে তারা যে পণ করেছে তার 'ডিফিকাল্‌টি' ভারতকর্তৃপক্ষের ডিফিকাল্‌টির চেয়ে বহুগুণে বড়ো।

অতএব রাশিয়ায় গিয়ে বেশি কিছু দেখতে পাব এরকম আশা করা অন্যায় হত। কীই বা জানি, কীই বা দেখেছি যাতে আমাদের আশার জোর বেশি হতে পারে। আমাদের দুঃখী দেশে লালিত অতি-দুর্বল আশা নিয়ে রাশিয়ায় গিয়েছিলুম। গিয়ে যা দেখলুম তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি। 'ল অ্যান্ড অর্ডার' কী পরিমাণে রক্ষিত হচ্ছে বা না হচ্ছে তার তদন্ত করবার যথেষ্ট সময় পাই নি—শোনা যায়, যথেষ্ট জবরদস্তি আছে; বিনা বিচারে দ্রুত পদ্ধতিতে শাস্তি, সেও চলে; আর-সব বিষয়ে স্বাধীনতা আছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষের বিধানের বিরুদ্ধে নেই। এটা তো হল চাঁদের কলঙ্কের দিক, কিন্তু আমার দেখবার প্রধান লক্ষ্য ছিল আলোকের দিক। সে দিকটাতে যে দীপ্তি দেখা গেল সে অতি আশ্চর্য—যারা একেবারেই অচল ছিল তারা সচল হয়ে উঠেছে।

শোনা যায় য়ুরোপের কোনো কোনো তীর্থস্থানে দৈবকৃপায় এক মুহূর্তে চিরপঙ্গু তার লাঠি ফেলে এসেছে। এখানে তাই হল; দেখতে দেখতে খুঁড়িয়ে চলবার লাঠি দিয়ে এরা ছুটে চলবার রথ বানিয়ে নিচ্ছে, পদাতিকের অধম যারা ছিল তারা বছর দশেকের মধ্যে হয়ে উঠেছে রথী। মানবসমাজে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাদের বুদ্ধি স্ববশ, তাদের হাত-হাতিয়ার স্ববশ।

আমাদের সম্রাট্‌বংশীয় খৃস্টান পাদ্রিরা বহুকাল ভারতবর্ষে কাটিয়েছেন, ডিফিকাল্‌টিজ যে কিরকম অনড় তা তাঁরা দেখে এসেছেন। একবার তাঁদের মস্কৌ আসা উচিত। কিন্তু এলে বিশেষ ফল হবে না। কারণ বিশেষ করে কলঙ্ক দেখাই তাঁদের ব্যাবসা-গত অভ্যাস; আলো চোখে পড়ে না, বিশেষত যাদের উপর বিরাগ আছে। ভুলে যান তাঁদের শাসনচন্দ্রেও কলঙ্ক খুঁজে বের করতে বড়ো চশমার দরকার করে না।

প্রায় সত্তর বছর আমার বয়স হল; এতকাল আমার ধৈর্যচ্যুতি হয় নি। নিজেদের দেশের অতি দুর্বহ মূঢ়তার বোঝার দিকে তাকিয়ে নিজের ভাগ্যকেই বেশি করে দোষ দিয়েছি। অতি সামান্য শক্তি নিয়ে অতি সামান্য প্রতিকারের চেষ্টাও করেছি, কিন্তু জীর্ণ আশার রথ যত মাইল চলেছে তার চেয়ে বেশি সংখ্যায় দড়ি ছিঁড়েছে, চাকা ভেঙেছে। দেশের হতভাগাদের দুঃখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত অভিমান বিসর্জন দিয়েছি। কর্তৃপক্ষের কাছে সাহায্য চেয়েছি; তাঁরা বাহবাও

দিয়েছেন; যেটুকু ভিক্ষে দিয়েছেন তাতে জাত যায় পেট ভরে না। সব চেয়ে দুঃখ এবং লজ্জার কথা এই যে, তাঁদের প্রসাদলালিত আমাদের স্বদেশী জীবরাই সব চেয়ে বাধা দিয়েছে। যে দেশ পরের কর্তৃত্বে চালিত সেই দেশে সব চেয়ে গুরুতর ব্যাধি হল এই— সে-সব জায়গায় দেশের লোকের মনে যে ঈর্ষ্যা যে ক্ষুদ্রতা যে স্বদেশবিরুদ্ধতার কলুষ জন্মায় তার মতো বিষ নেই।

বাইরের সকল কাজের উপরেও একটা জিনিস আছে যেটা আত্মার সাধনা। রাষ্ট্রিক আর্থিক নানা গোলেমালে যখন মনটা আবিল হয়ে ওঠে তখন তাকে স্পষ্ট দেখতে পাই নে বলেই তার জোর কমে যায়। আমার মধ্যে সে বিপদ আছে, সেইজন্যেই আসল জিনিসকে আঁকড়ে ধরতে চাই। কেউ বা আমাকে উপহাস করে, কেউ বা আমার উপর রাগ করে, তাদের নিজের পথেই আমাকে টেনে নিতে চায়। কিন্তু কোথা থেকে জানি নে আমি এসেছি এই পৃথিবীর তীর্থে, আমার পথ আমার তীর্থদেবতার বেদীর কাছে। মানুষের দেবতাকে স্বীকার করে এবং প্রণাম করে যাব আমার জীবন-দেবতা আমাকে সেই মন্ত্র দিয়েছেন। যখন আমি সেই দেবতার নির্মাল্য ললাটে প'রে যাই তখন সব জাতের লোকই আমাকে ডেকে আসন দেয়, আমার কথা মন দিয়ে শোনে। যখন ভারতবর্ষীয়ের মুখোশ পরে দাঁড়াই তখন বাধা বিস্তর। যখন আমাকে এরা মানুষরূপে দেখে তখনই এরা আমাকে ভারতবর্ষীয়রূপেই শ্রদ্ধা করে; যখন নিছক ভারতবর্ষীয়রূপে দেখা দিতে চাই তখন এরা আমাকে মানুষরূপে সমাদর করতে পারে না। আমার স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে আমার চলবার পথ ভুল-বোঝার দ্বারা বন্ধুর হয়ে ওঠে। আমার পৃথিবীর মেয়াদ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে; অতএব আমাকে সত্য হবার চেষ্টা করতে হবে, প্রিয় হবার নয়।

আমার এখানকার খবর সত্য মিথ্যা নানাভাবে দেশে গিয়ে পেঁছয়। সে সম্বন্ধে সব সময় উদাসীন থাকতে পারি নে বলে নিজের উপর ধিক্‌কার জন্মে। বার বার মনে হয়, বানপ্রস্থের বয়সে সমাজস্থের মতো ব্যবহার করতে গেলে বিপদে পড়তে হয়।

যাই হোক এ দেশের 'এনর্মাস্‌ ডিফিকাল্‌টিজ'এর কথা বইয়ে পড়েছিলুম, কানে শুনেছিলুম, কিন্তু সেই ডিফিকাল্‌টিজ অতিক্রমণের চেহারা চোখে দেখলুম। ইতি ৪ অক্টোবর ১৯৩০[১]

৯

ব্রেমেন জাহাজ

আমাদের দেশে পলিটিক্‌স্‌কে যারা নিছক পালোয়ানি বলে জানে সব-রকম ললিতকলাকে তারা পৌরুষের বিরোধী বলে ধরে রেখেছেন। এ সম্বন্ধে আমি আগেই লিখেছি। রাশিয়ার জার ছিল একদিন দশাননের মতো সম্রাট; তার সাম্রাজ্য পৃথিবীর অনেকখানিকেই অজগর সাপের মতো গিলে ফেলেছিল, লেজের পাকে যাকে সে জড়িয়েছে তার হাড়গোড় দিয়েছে পিষে।

প্রায় বছর-তেরো হল এরই প্রতাপের সঙ্গে বিপ্লবীদের ঝুটোপুটি বেধে গিয়েছিল। সম্রাট যখন গুষ্টিসুদ্ধ গেল সরে তখনো তার সাঙ্গোপাঙ্গরা দাপিয়ে বেড়াতে লাগল, তাদের অস্ত্র এবং উৎসাহ জোগালে অপর সাম্রাজ্যভোগীরা। বুঝতেই পারছ ব্যাপারখানা সহজ ছিল না। একদা যারা ছিল সম্রাটের উপগ্রহ, ধনীর দল, চাষীদের 'পরে যাদের ছিল অসীম প্রভুত্ব, তাদের সর্বনাশ বেধে গেল। লুটপাট কাড়াকাড়ি চলল; তাদের বহুমূল্য ভোগের সামগ্রী ছারখার করবার জন্যে প্রজারা হন্যে হয়ে উঠেছে। এতবড়ো উচ্ছৃঙ্খল উৎপাতের সময় বিপ্লবী নেতাদের কাছ থেকে কড়া হুকুম এসেছে— আর্ট-সামগ্রীকে কোনোমতে যেন নষ্ট হতে দেওয়া না হয়। ধনীদের পরিত্যক্ত প্রাসাদ থেকে ছাত্ররা অধ্যাপকেরা অর্ধ-অভুক্ত শীতক্লিষ্ট অবস্থায় দল বেঁধে যা-কিছু রক্ষাযোগ্য জিনিস সমস্ত উদ্ধার করে য়ুনিভার্সিটির ম্যুজিয়মে সংগ্রহ করতে লাগল।

[১] রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত।

মনে আছে আমরা যখন চীনে গিয়েছিলুম কী দেখেছিলুম। য়ুরোপের সাম্রাজ্যভোগীরা পিকিনের বসন্তপ্রাসাদকে কিরকম ধূলিসাৎ করে দিয়েছে, বহু যুগের অমূল্য শিল্পসামগ্রী কিরকম লুটে পুটে ছিঁড়ে ভেঙে দিয়েছে উড়িয়ে-পুড়িয়ে। তেমন সব জিনিস জগতে আর কোনোদিন তৈরি হতেই পারবে না।

সোভিয়েটরা ব্যক্তিগতভাবে ধনীকে বঞ্চিত করেছে, কিন্তু যে ঐশ্বর্যে সমস্ত মানুষের চির-দিনের অধিকার, বর্বরের মতো তাকে নষ্ট হতে দেয় নি। এতদিন যারা পরের ভোগের জন্যে জমি চাষ করে এসেছে এরা তাদের যে কেবল জমির স্বত্ব দিয়েছে তা নয়; জ্ঞানের জন্যে, আনন্দের জন্যে, মানবজীবনের যা-কিছু মূল্যবান সমস্ত তাদের দিতে চেয়েছে; শুধু পেটের ভাত পশুর পক্ষে যথেষ্ট, মানুষের পক্ষে নয়—এ কথা তারা বুঝেছিল এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বের পক্ষে পালোয়ানির চেয়ে আর্টের অনুশীলন অনেক বড়ো এ কথা তারা স্বীকার করেছে।

এদের বিপ্লবের সময় উপরতলার অনেক জিনিস নীচে তলিয়ে গেছে এ কথা সত্য, কিন্তু টিঁকে রয়েছে এবং ভরে উঠেছে ম্যুজিয়ম, থিয়েটর লাইব্রেরি সংগীতশালা।

আমাদের দেশের মতোই একদা এদের গুণীর গুণপনা প্রধানত ধর্মমন্দিরেই প্রকাশ পেত। মোহন্তেরা নিজের স্থূল রুচি নিয়ে তার উপরে যেমন-খুশি হাত চালিয়েছে। আধুনিক শিক্ষিত ভক্ত বাবুরা পুরীর মন্দিরকে যেমন চুনকাম করতে সংকুচিত হয় নি, তেমনি এখানকার মন্দিরের কর্তারা আপন সংস্কার-অনুসারে সংস্কৃত করে প্রাচীন কীর্তিকে অবাধে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে—তার ঐতিহাসিক মূল্য যে সর্বজনের সর্বকালের পক্ষে এ কথা তারা মনে করে নি, এমন-কি, পুরোনো পুজোর পাত্রগুলিকে নূতন করে ঢালাই করেছে। আমাদের দেশেও মঠে মন্দিরে অনেক জিনিস আছে, ইতিহাসের পক্ষে যা মূল্যবান। কিন্তু কারও তা ব্যবহার করবার জো নেই—মোহন্তেরাও অতলস্পর্শ মোহে মগ্ন—সেগুলিকে ব্যবহার করবার মতো বুদ্ধি ও বিদ্যার ধার ধারে না; ক্ষিতিবাবুর কাছে শোনা যায়, প্রাচীন অনেক পুঁথি মঠে মঠে আটক পড়ে আছে, দৈত্যপুরীতে রাজকন্যার মতো, উদ্ধার করবার উপায় নেই।

বিপ্লবীরা ধর্মমন্দিরের সম্পত্তির বেড়া ভেঙে দিয়ে সমস্তকেই সাধারণের সম্পত্তি করে দিয়েছে। যেগুলি পুজোর সামগ্রী সেগুলি রেখে বাকি সমস্ত জমা করা হচ্ছে ম্যুজিয়মে। এক দিকে যখন আত্মবিপ্লব চলছে, যখন চার দিকে টাইফয়িডের প্রবল প্রকোপ, রেলের পথ সব উৎখাত, সেই সময়ে বৈজ্ঞানিক সন্ধানীর দল গিয়েছে প্রত্যন্তপ্রদেশ সমস্ত হাতড়িয়ে পুরাকালীন শিল্পসামগ্রী উদ্ধার করবার জন্যে। কত পুঁথি কত ছবি কত খোদকারির কাজ সংগ্রহ হল তার সীমা নেই।

এ তো গেল ধনীগৃহে বা ধর্মমন্দিরে যা-কিছু পাওয়া গেছে তারই কথা। দেশের সাধারণ চাষীদের কর্মিকদের কৃত শিল্পসামগ্রী, পূর্বতন কালে যা অবজ্ঞাভাজন ছিল তার মূল্য নিরূপণ করবার দিকেও দৃষ্টি পড়েছে। শুধু ছবি নয়, লোকসাহিত্য লোকসংগীত প্রভৃতি নিয়েও প্রবলবেগে কাজ চলছে।

এই তো গেল সংগ্রহ, তার পরে এই-সমস্ত সংগ্রহ নিয়ে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা। ইতিপূর্বেই তার বিবরণ লিখেছি। এত কথা যে তোমাকে লিখছি তার কারণ এই, দেশের লোককে আমি জানাতে চাই, আজ কেবলমাত্র দশ বছরের আগেকার রাশিয়ার জনসাধারণ আমাদের বর্তমান জনসাধারণের সমতুল্যই ছিল; সোভিয়েট শাসনে এইজাতীয় লোককেই শিক্ষার দ্বারা মানুষ করে তোলবার আদর্শ কতখানি উচ্চ। এর মধ্যে বিজ্ঞান সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা সমস্তই আছে—অর্থাৎ আমাদের দেশের ভদ্রনামধারীদের জন্যে শিক্ষার যে আয়োজন তার চেয়ে অনেক গুণেই সম্পূর্ণতর।

কাগজে পড়লুম, সম্প্রতি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন উপলক্ষে হুকুম পাস হয়েছে প্রজাদের কান মলে শিক্ষাকর আদায় করা, এবং আদায়ের ভার পড়েছে জমিদারের 'পরে। অর্থাৎ যারা অমনিতেই আধমরা হয়ে রয়েছে শিক্ষার ছুতো করে তাদেরই মার বাড়িয়ে দেওয়া।

শিক্ষাকর চাই বৈকি, নইলে খরচ জোগাবে কিসে। কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্যে যে কর, কেন

দেশের সবাই মিলে স্কে কর দেবে না। সিভিল সার্ভিস আছে, মিলিটারি সার্ভিস আছে, গভর্নর ভাইসরয় ও তাঁদের সদস্যবর্গ আছেন, কেন তাঁদের পরিপূর্ণ পকেটে হাত দেবার জো নেই। তাঁরা কি এই চাষীদের অন্নের ভাগ থেকেই বেতন নিয়ে ও পেনসন নিয়ে অবশেষে দেশে গিয়ে ভোগ করেন না। পাটকলের যে-সব বড়ো বড়ো বিলাতি মহাজন পাটের চাষীর রক্ত দিয়ে মোটা মুনফার সৃষ্টি ক'রে দেশে রওনা করে, সেই মৃতপ্রায় চাষীদের শিক্ষা দেবার জন্যে তাদের কোনোই দায়িত্ব নেই? যে-সব মিনিস্টার শিক্ষা-আইন পাস নিয়ে ভরা পেটে উৎসাহ প্রকাশ করেন তাঁদের উৎসাহের কানাকড়ি মূল্যও কি তাঁদের নিজের তহবিল থেকে দিতে হবে না।

একেই বলে শিক্ষার জন্যে দরদ? আমি তো একজন জমিদার, আমার প্রজাদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে কিছু দিয়েও থাকি—আরও দ্বিগুণ তিনগুণ যদি দিতে হয় তো তাও দিতে রাজি আছি, কিন্তু এই কথাটা প্রতিদিন তাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার হবে যে, আমি তাদের আপন লোক, তাদের শিক্ষায় আমারই মঙ্গল এবং আমিই তাদের দিচ্ছি, দিচ্ছে না এই রাজ্যশাসকদের সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন শ্রেণীর একজনও এক পয়সাও।

সোভিয়েট রাশিয়ায় জনসাধারণের উন্নতিবিধানের চাপ খুবই বেশি, সেজন্যে আহারে বিহারে লোকে কষ্ট পাচ্ছে কম নয়, কিন্তু এই কষ্টের ভাগ উপর থেকে নীচে পর্যন্ত সকলেই নিয়েছে। তেমন কষ্টকে তো কষ্ট বলব না, সে যে তপস্যা। প্রাথমিক শিক্ষার নামে কণামাত্র শিক্ষা চালিয়ে ভারত-গবর্মেন্ট এতদিন পরে দুশো বছরের কলঙ্ক মোচন করতে চান—অথচ তার দাম দেবে তারাই যারা দাম দিতে সকলের চেয়ে অক্ষম; গবর্মেন্টের প্রশ্রয়লালিত বহুব্যাশী বাহন যারা তারা নয়, তারা আছে গৌরব ভোগ করবার জন্যে।

আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতম তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায় নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে। শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্য জাতের জন্যেও এদের সমান চেষ্টা। অথচ সাম্প্রদায়িক ধর্মের মানুষেরা এদের অধার্মিক বলে নিন্দা করে। ধর্ম কি কেবল পুঁথির মন্ত্রে, দেবতা কি কেবল মন্দিরের প্রাঙ্গণে। মানুষকে যারা কেবলই ফাঁকি দেয় দেবতা কি তাদের কোনোখানে আছে।

অনেক কথা বলবার আছে। এরকম তথ্য সংগ্রহ করে লেখা আমার অভ্যস্ত নয়, কিন্তু না-লেখা আমার অন্যায় হবে বলে লিখতে বসেছি। রাশিয়ার শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে লিখব বলে আমার সংকল্প আছে। কতবার মনে হয়েছে আর-কোথাও নয়, রাশিয়ায় এসে একবার তোমাদের সব দেখে যাওয়া উচিত। ভারতবর্ষ থেকে অনেক চর সেখানে যায়, বিপ্লবীপন্থীরাও আনাগোনা করে; কিন্তু আমার মনে হয় কিছুর জন্যে নয়, কেবল শিক্ষাসম্বন্ধে শিক্ষা করতে যাওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত দরকার।

যাক, আমার নিজের খবর দিতে উৎসাহ পাই নে। আমি যে আর্টিস্ট এই অভিমান মনে প্রবল হবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু এ পর্যন্ত বাইরে খ্যাতি পেয়েছি, অন্তরে পৌঁছয় না। কেবলই মনে হয়, দৈবগুণে পেয়েছি, নিজগুণে নয়।

ভাসছি এখন মাঝ-সমুদ্রে। পারে গিয়ে কপালে কী আছে জানি নে। শরীর ক্লান্ত, মন অনিচ্ছুক। শূন্য ভিক্ষাপাত্রের মতো ভারী জিনিস জগতে আর কিছুই নেই, সেটা জগন্নাথকে শেষ নিবেদন করে দিয়ে কবে আমি ছুটি পাব? ইতি ৫ অক্টোবর ১৯৩০[১]

---

[১] নন্দলাল বসুকে লিখিত।

১০

D. 'Bremen'

বিজ্ঞানশিক্ষায় পুঁথির পড়ার সঙ্গে চোখের দেখার যোগ থাকা চাই, নইলে সে শিক্ষার বারো-আনা ফাঁকি হয়। শুধু বিজ্ঞান কেন, অধিকাংশ শিক্ষাতেই এ কথা খাটে। রাশিয়াতে বিবিধ বিষয়ের মুজিয়মের যোগে সেই শিক্ষার সহায়তা করা হয়েছে। এই মুজিয়ম শুধু বড়ো বড়ো শহরে নয়, প্রদেশে প্রদেশে, সামান্য পল্লীগ্রামের লোকেরও আয়ত্তগোচরে।

চোখে দেখে শেখার আর-একটা প্রণালী হচ্ছে ভ্রমণ। তোমরা তো জানই আমি অনেক দিন থেকেই ভ্রমণ-বিদ্যালয়ের সংকল্প মনে বহন করে এসেছি। ভারতবর্ষ এতবড়ো দেশ, সকল বিষয়েই তার এত বৈচিত্র্য বেশি যে, তাকে সম্পূর্ণ করে উপলব্ধি করা হন্টারের গেজেটিয়র পড়ে হতে পারে না। একসময়ে পদব্রজে তীর্থভ্রমণ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল— আমাদের তীর্থগুলিও ভারতবর্ষের সকল অংশে ছড়ানো। ভারতবর্ষকে যথাসম্ভব সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ অনুভব করবার এই ছিল উপায়। শুধুমাত্র শিক্ষাকে লক্ষ্য করে পাঁচ বছর ধরে ছাত্রদের যদি সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়ে নেওয়া যায় তা হলে তাদের শিক্ষা পাকা হয়।

মন যখন সচল থাকে সে তখন শিক্ষার বিষয়কে সহজে গ্রহণ ও পরিপাক করতে পারে। বাঁধা খোরাকের সঙ্গে সঙ্গেই ধেনুদের চরে খেতে দেওয়ারও দরকার হয়— তেমনি বাঁধা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই চরে শিক্ষা মনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। অচল বিদ্যালয়ে বন্দী হয়ে অচল ক্লাসের পুঁথির খোরাকিতে মনের স্বাস্থ্য থাকে না। পুঁথির প্রয়োজন একেবারে অস্বীকার করা যায় না— জ্ঞানের বিষয় মানুষের এত বেশি যে, ক্ষেত্রে গিয়ে তাদের আহরণ করবার উপায় নেই, ভাণ্ডার থেকেই তাদের বেশির ভাগ সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু পুঁথির বিদ্যালয়কে সঙ্গে করে নিয়ে যদি প্রকৃতির বিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে ছাত্রদের বেড়িয়ে নিয়ে আসা যায় তা হলে কোনো অভাব থাকে না। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আমার মনে ছিল, আশা ছিল যদি সম্বল জোটে তবে কোনো-এক সময়ে শিক্ষাপরিব্রজন চালাতে পারব। কিন্তু আমার সময়ও নেই, সম্বলও জুটবে না।

সোভিয়েত রাশিয়ায় দেখছি সর্বসাধারণের জন্য দেশভ্রমণের ব্যবস্থা ফলাও করে তুলছে। বৃহৎ এদের দেশ, বিচিত্রজাতীয় মানুষ তার অধিবাসী। জার-শাসনের সময়ে এদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ জানাশোনা মেলামেশার সুযোগ ছিল না বললেই হয়। বলা বাহুল্য, তখন দেশভ্রমণ ছিল শখের জিনিস, ধনী লোকের পক্ষেই ছিল সম্ভব। সোভিয়েট আমলে সর্বসাধারণের জন্য তার উদ্যোগ। শ্রমক্লান্ত এবং রুগ্‌ণ কর্মিকদের শ্রান্তি এবং রোগ দূর করবার জন্যে প্রথম থেকেই সোভিয়েটেরা দূরে নিকটে নানা স্থানে স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের চেষ্টা করেছে। আগেকার কালের বড়ো বড়ো প্রাসাদ তারা এই কাজে লাগিয়েছে। সে-সব জায়গায় গিয়ে বিশ্রাম এবং আরোগ্যলাভ যেমন একটা লক্ষ্য তেমনি শিক্ষালাভ আর-একটা।

লোকহিতের প্রতি যাদের অনুরাগ আছে এই ভ্রমণ-উপলক্ষে তারা নানা স্থানে নানা লোকের আনুকূল্য করবার অবকাশ পায়। জনসাধারণকে দেশভ্রমণে উৎসাহ দেওয়া এবং তার সুবিধা করে দেওয়ার জন্যে পথের মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ শিক্ষাবিতরণের উপযোগী প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে, সেখানে পথিকদের আহারনিদ্রার ব্যবস্থা আছে, তা ছাড়া সকল-রকম দরকারি বিষয়ে তারা পরামর্শ পেতে পারে। ককেশীয় প্রদেশ ভূতত্ত্ব-আলোচনার উপযুক্ত স্থান। সেখানে এইরকম পান্থ-শিক্ষালয় থেকে ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ পাবার আয়োজন আছে। যে-সব প্রদেশ বিশেষভাবে নৃতত্ত্ব-আলোচনার উপযোগী সে-সব জায়গায় পথিকদের জন্যে নৃতত্ত্ববিৎ উপদেশক তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

গ্রীষ্মের সময় হাজার হাজার ভ্রমণেচ্ছু আপিসে নাম রেজেস্ট্রি করে। মে মাস থেকে আরম্ভ করে দলে দলে নানা পথ বেয়ে প্রতিদিন যাত্রা চলে— এক-একটি দলে পঁচিশ-ত্রিশটি করে যাত্রী।

১৯২৮ খৃস্টাব্দে এই যাত্রীসংঘের সভ্যসংখ্যা ছিল তিন হাজারের কাছাকাছি— ২৯-এ হয়েছে বারো হাজারের উপর।

এ সম্বন্ধে য়ুরোপের অন্যত্র বা আমেরিকার সঙ্গে তুলনা করা সংগত হবে না; সর্বদাই মনে রাখা দরকার হবে যে, রাশিয়ায় দশ বছর আগে শ্রমিকদের অবস্থা আমাদের মতোই ছিল— তারা শিক্ষা করবে, বিশ্রাম করবে, বা আরোগ্য লাভ করবে, সেজন্যে কারও কোনো খেয়াল ছিল না— আজ এরা যে-সমস্ত সুবিধা সহজেই পাচ্ছে তা আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের আশাতীত এবং ধনীদের পক্ষেও সহজ নয়। তা ছাড়া শিক্ষালাভের ধারা সমস্ত দেশ বেয়ে একসঙ্গে কত প্রণালীতে প্রবাহিত তা আমাদের সিবিল-সার্বিসে-পাওয়া দেশের লোকের পক্ষে ধারণা করাই কঠিন।

যেমন শিক্ষার ব্যবস্থা তেমনি স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা। স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সোভিয়েট রাশিয়ায় যেরকম বৈজ্ঞানিক অনুশীলন চলছে তা দেখে য়ুরোপ আমেরিকার পণ্ডিতেরা প্রচুর প্রশংসা করছেন। শুধু মোটা বেতনের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পুঁথি সৃষ্টি করা নয়, সর্বজনের মধ্যে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রয়োগ যাতে পরিব্যাপ্ত হয়, এমন-কি, এ দেশের চৌরঙ্গি থেকে যারা বহু দূরে থাকে তারাও যাতে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে অযত্নে বা বিনা চিকিৎসায় মারা না যায় সে দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি আছে।

বাংলাদেশে ঘরে ঘরে যক্ষ্মারোগ ছড়িয়ে পড়ছে— রাশিয়া দেখে অবধি এ প্রশ্ন মন থেকে তাড়াতে পারছি নে যে, বাংলাদেশের এই-সব অল্পবিত্ত মুমূর্ষুদের জন্যে কটা আরোগ্যাশ্রম আছে। এ প্রশ্ন আমার মনে সম্প্রতি আরও জেগেছে এইজন্যে যে, খৃস্টান ধর্মযাজক ভারতশাসনে অসাধারণ ডিফিকল্‌টিজ নিয়ে আমেরিকার লোকের কাছে বিলাপ করছেন।

ডিফিকল্‌টিজ আছে বৈকি। এক দিকে সেই ডিফিকল্‌টিজের মূলে আছে ভারতীয়দের অশিক্ষা, অপর দিকে ভারতশাসনের ভূরিব্যয়িতা। সেজন্যে দোষ দেব কাকে। রাশিয়ায় অন্নবস্ত্রের সচ্ছলতা আজও হয় নি, রাশিয়াও বহুবিস্তৃত দেশ, সেখানেও বহু বিচিত্র জাতির বাস, সেখানেও অজ্ঞান এবং স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অনাচার ছিল পর্বতপ্রমাণ; কিন্তু শিক্ষাও বাধা পাচ্ছে না, স্বাস্থ্যও না। সেইজন্যেই প্রশ্ন না করে থাকা যায় না, ডিফিকল্‌টিজটা ঠিক কোন্‌খানে।

যারা খেটে খায় তারা সোভিয়েট স্বাস্থ্যনিবাসে বিনাব্যয়ে থাকতে পারে, তা ছাড়া এই স্বাস্থ্য-নিবাসের সঙ্গে সঙ্গে থাকে আরোগ্যালয় (sanatorium)। সেখানে শুধু চিকিৎসা নয়, পথ্য ও শুশ্রূষার উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। এই-সমস্ত ব্যবস্থাই সর্বসাধারণের জন্যে। সেই সর্বসাধারণের মধ্যে এমন-সব জাত আছে যারা য়ুরোপীয় নয় এবং য়ুরোপীয় আদর্শ-অনুসারে যাদের অসভ্য বলা হয়ে থাকে।

এইরকম পিছিয়ে-পড়া জাত, যারা য়ুরোপীয় রাশিয়ার প্রাঙ্গণের ধারে বা বাইরে বাস করে তাদের শিক্ষার জন্য ১৯২৮ খৃস্টাব্দের বজেটে কত টাকা ধরে দেওয়া হয়েছে তা দেখলে শিক্ষার জন্যে কী উদার প্রয়াস তা বুঝতে পারবে। য়ুক্রেনিয়ান রিপবলিকের জন্য ৪০ কোটি ৩০ লক্ষ, অতি-ককেশীয় রিপবলিকের জন্য ১৩ কোটি ৪০ লক্ষ, উজবেকিস্তানের জন্য ৯ কোটি ৭০ লক্ষ, তুর্কমেনিস্তানের জন্য ২ কোটি ৯ লক্ষ রুব্‌ল্‌।

অনেক দেশে আরবী অক্ষরের চলন থাকাতে শিক্ষাবিস্তারের বাধা হচ্ছিল, সেখানে রোমক বর্ণমালা চালিয়ে দেওয়াতে শিক্ষার কাজ সহজ হয়েছে।

যে বুলেটিন থেকে তথ্য সংগ্রহ করছি তারই দুটি অংশ তুলে দিই :

Another of the most important tasks in the sphere of culture is undoubtedly the stabilization of local administrative institutions and the transfer of all local government and administrative work in the federative and auto-

nomous republics to a language which is familiar to the toiling masses. This is by no means simple, and great efforts are still needed in this regard, owing to the low cultural level of the mass of the workers and peasants, and lack of sufficient skilled labour.

একটুখানি ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। সোভিয়েট সম্মিলনীর অন্তর্গত কতকগুলি রিপাব্লিক ও স্বতন্ত্রশাসিত (autonomous) দেশ আছে। তারা প্রায়ই য়ুরোপীয় নয়, এবং তাদের আচারব্যবহার আধুনিক কালের সঙ্গে মেলে না। উদ্ধৃত অংশ থেকে বোঝা যাবে যে, সোভিয়েটদের মতে দেশের শাসনতন্ত্র দেশের লোকের শিক্ষারই একটা প্রধান উপায় ও অঙ্গ। আমাদের দেশের রাষ্ট্রচালনার ভাষা যদি দেশের লোকের আপন ভাষা হত, তা হলে শাসনতন্ত্রের শিক্ষা তাদের পক্ষে সুগম হত। ভাষা ইংরেজি হওয়াতে শাসননীতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা সাধারণের আয়ত্তাতীত হয়েই রইল। মধ্যস্থের যোগে কাজ চলছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ যোগ রইল না। আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্রচালনার শিক্ষা ও অভ্যাস থেকে যেমন জনসাধারণ বঞ্চিত, দেশশাসননীতির জ্ঞান থেকেও তারা তেমনি বঞ্চিত। রাষ্ট্রশাসনের ভাষাও পরভাষা হওয়াতে পরাধীনতার নাগপাশের পাক আরও বেড়ে গেছে। রাজমন্ত্রসভায় ইংরেজি ভাষায় যে আলোচনা হয়ে থাকে তার সফলতা কতদূর আমি আনাড়ি তা বুঝি নে, কিন্তু তার থেকে প্রজাদের যে শিক্ষা হতে পারত তা একটুও হল না।

আর-একটা অংশ :

Whenever questions of cultural-economic construction in the national republics and districts come before the organs of the Soviet government, they are settled not on the lines of guardianship but on the lines of the maximum development of independence among the broad masses of workers and peasants and of initiative of the local Soviet organs.

যাদের কথা বল হল তারা হচ্ছে পিছিয়ে-পড়া জাত। তাদের আগাগোড়া সমস্তই ডিফিকল্‌টিজ, কিন্তু এই ডিফিকল্‌টিজ সরিয়ে দেবার জন্যে সোভিয়েটরা দুশো বছর চুপচাপ বসে থাকবার বন্দোবস্ত করে নি। ইতিমধ্যে দশ বছর কাজ করেছে। দেখেশুনে ভাবছি, আমরা কি উজবেকদের চেয়ে, তুর্কমানীদের চেয়েও, পিছিয়ে-পড়া জাত। আমাদের ডিফিকল্‌টিজের মাপ কি এদের চেয়েও বিশগুণ বেশি।

একটা কথা মনে পড়ল। এদের এখানে খেলনার ম্যুজিয়ম আছে। এই খেলনা-সংগ্রহের সংকল্প বহুকাল থেকে আমার মনের মধ্যে ঘুরেছে। তোমাদের নন্দনালয়ে কলাভাণ্ডারে এই কাজ অবশেষে আরম্ভও হল। রাশিয়া থেকে কিছু খেলনা পেয়েছি। অনেকটা আমাদেরই মতো।

পিছিয়ে-পড়া জাতের সম্বন্ধে আরও কিছু জানাবার আছে। কাল লিখব। পরশু সকালে পৌঁছব নিয়ুইয়র্কে—তার পরে লেখবার যথেষ্ট অবসর পাব কি না কে জানে। ইতি ৭ অক্টোবর ১৯৩০[১]

---

[১] সুরেন্দ্রনাথ করকে লিখিত।

১১

ব্রেমেন জাহাজ

পিছিয়ে-পড়া জাতের শিক্ষার জন্যে সোভিয়েট রাশিয়ায় কিরকম উদ্যোগ চলছে সে কথা তোমাকে লিখেছি। আজ দুই-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

উরাল পর্বতের দক্ষিণে বাষ্‌কির্‌দের বাস। জারের আমলে সেখানকার সাধারণ প্রজার অবস্থা আমাদের দেশের মতোই ছিল। তারা চির-উপবাসের ধার দিয়ে দিয়েই চলত। বেতনের হার ছিল অতি সামান্য, কোনো কারখানায় বড়োরকমের কাজ করবার মতো শিক্ষা ছিল না, অবস্থাগতিকে তাদের ছিল নিতান্তই মজুরের কাজ। বিপ্লবের পরে এই দেশের প্রজাদের স্বতন্ত্র শাসনের অধিকার দেবার চেষ্টা আরম্ভ হল।

প্রথমে যাদের উপর ভার পড়েছিল তারা আগেকার আমলের ধনী জোতদার, ধর্মযাজক এবং বর্তমানে আমাদের ভাষায় যাদের বলে থাকি শিক্ষিত। সাধারণের পক্ষে সেটাতে সুবিধা হল না। আবার এইসময়ে উৎপাত আরম্ভ করলে কল্‌চাকের সৈন্য। সে ছিল জার-আমলের পক্ষপাতী, তার পিছনে ছিল ক্ষমতাশালী বহিঃশত্রুদের উৎসাহ এবং আনুকূল্য। সোভিয়েটরা যদি বা তাদের তাড়ালে, এল ভীষণ দুর্ভিক্ষ। দেশে চাষ-বাসের ব্যবস্থা ছারখার হয়ে গেল।

১৯২২ খৃস্টাব্দ থেকে সোভিয়েট আমলের কাজ ঠিকমত শুরু হতে পেরেছে। তখন থেকে দেশে শিক্ষাদান এবং অর্থোৎপত্তির ব্যবস্থা প্রবলবেগে গড়ে উঠতে লাগল। এর আগে বাষ্‌কিরিয়াতে নিরক্ষরতা ছিল প্রায় সর্বব্যাপী। এই কয় বছরের মধ্যে এখানে আটটি নর্মাল স্কুল, পাঁচটি কৃষিবিদ্যালয়, একটি ডাক্তারি শিক্ষালয়, অর্থকরী বিদ্যা শেখবার জন্যে দুটি, কারখানার কাজে হাত পাকাবার জন্যে সতেরোটি, প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে ২৪৯৫টি এবং মধ্য-প্রাথমিকের জন্যে ৮৭টি স্কুল শুরু হয়েছে। বর্তমানে বাষ্‌কিরিয়াতে দুটি আছে সরকারি থিয়েটার, দুটি ম্যুজিয়ম, চৌদ্দটি পৌরগ্রন্থাগার, ১১২টি গ্রামের পাঠগৃহ (reading room), ৩০টি সিনেমা শহরে এবং ৪৬টি গ্রামে, চাষীরা কোনো উপলক্ষে শহরে এলে তাদের জন্যে বহুতর বাসা, ৮৯১টি খেলা ও আরামের জায়গা (recreation corners), তা ছাড়া হাজার হাজার কর্মী ও চাষীদের ঘরে রেডিয়ো শ্রুতিযন্ত্র। বীরভূম জেলার লোক বাষ্‌কির্‌দের চেয়ে নিঃসন্দেহ স্বভাবত উন্নততর শ্রেণীর জীব। বাষ্‌কিরিয়ার সঙ্গে বীরভূমের শিক্ষা ও আরামের ব্যবস্থা মিলিয়ে দেখো। উভয় পক্ষের ডিফিকল্‌টিজেরও তুলনা করা কর্তব্য হবে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে যতগুলি রিপাবলিক হয়েছে তার মধ্যে তুর্কমেনিস্তান এবং উজবেকিস্তান সব চেয়ে অল্পদিনের। তাদের পত্তন হয়েছে ১৯২৪ খৃস্টাব্দের অক্টোবরে, অর্থাৎ বছর-ছয়েকের চেয়েও তাদের বয়স কম। তুর্কমেনিস্তানের জনসংখ্যা সবসুদ্ধ সাড়ে দশ লক্ষ। এদের মধ্যে নয় লক্ষ লোক চাষের কাজ করে। কিন্তু নানা কারণে খেতের অবস্থা ভালো নয়, পশুপালনের সুযোগও তদ্রূপ।

এরকম দেশকে বাঁচাবার উপায় কারখানার কাজ খোলা, যাকে বলে industrialization। বিদেশী বা স্বদেশী ধনী মহাজনদের পকেট ভরাবার জন্যে কারখানার কথা হচ্ছে না, এখানকার কারখানার উপস্বত্ব সর্বসাধারণের। ইতিমধ্যেই একটা বড়ো সুতোর কল এবং রেশমের কল খোলা হয়েছে। আশকাবাদ শহরে একটা বৈদ্যুতজনন স্টেশন বসেছে, অন্যান্য শহরেও উদ্যোগ চলছে। যন্ত্রচালনক্ষম শ্রমিক চাই, তাই বহুসংখ্যক তুর্কমেনি যুবকদের মধ্যরুশিয়ার বড়ো বড়ো কারখানায় শিক্ষার জন্যে পাঠানো হয়ে থাকে। আমাদের যুবকদের পক্ষে বিদেশী-চালিত কারখানায় শিক্ষার সুযোগলাভ যে কত দুঃসাধ্য তা সকলেরই জানা আছে।

বুলেটিনে লিখছে, তুর্কমেনিস্তানে শিক্ষার ব্যবস্থা করা এত কঠিন যে, তার তুলনা বোধ হয় অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। বিরলবসতি জনসংস্থান দূরে দূরে, দেশে রাস্তার অভাব, জলের

অভাব, লোকালয়ের মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো মরুভূমি, লোকের আর্থিক দুরবস্থা অত্যন্ত বেশি।

আপাতত মাথা-পিছু পাঁচ রুব্‌ল করে শিক্ষার খরচ পড়ছে। এ দেশের প্রজাসংখ্যার সিকি পরিমাণ লোক যাযাবর (nomads)। তাদের জন্যে প্রাথমিক পাঠশালার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডিং স্কুল খোলা হয়েছে, ইঁদারার কাছাকাছি, যেখানে বহু পরিবার মিলে আড্ডা করে সেইরকম জায়গায়। পড়ুয়াদের জন্যে খবরের কাগজও প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

মস্কৌ শহরে নদীতীরে সাবেক কালের একটি উদ্যানবেষ্টিত সুন্দর প্রাসাদে তুর্কমেনদের জন্য শিক্ষক শিক্ষিত করবার একটি বিদ্যাভবন (Turcomen People's Home of Education) স্থাপিত হয়েছে। সেখানে সম্প্রতি একশো তুর্কমেন ছাত্র শিক্ষা পাচ্ছে, বারো-তেরো বছর তাদের বয়স। এই বিদ্যাভবনের ব্যবস্থা স্বায়ত্তশাসন নীতি-অনুসারে। এই ব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি কর্মবিভাগ আছে। যেমন স্বাস্থ্যবিভাগ, গার্হস্থ্যবিভাগ (household commission), ক্লাস-কমিটি। স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে দেখা হয়, সমস্ত মহলগুলি (compartments), ক্লাসগুলি, বাসের ঘর, আঙিনা পরিষ্কার আছে কি না। কোনো ছেলের যদি অসুখ করে, তা সে যতই সামান্য হোক, তার জন্যে ডাক্তার দেখাবার বন্দোবস্ত এই বিভাগের 'পরে। গার্হস্থ্যবিভাগের অন্তর্গত অনেকগুলি উপবিভাগ আছে। এই বিভাগের কর্তব্য হচ্ছে দেখা—ছেলেরা পরিষ্কার পরিপাটি আছে কি না। ক্লাসে পড়বার কালে ছেলেদের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখা ক্লাস-কমিটির কাজ। প্রত্যেক বিভাগ থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে অধ্যক্ষসভা গড়ে ওঠে। এই অধ্যক্ষসভার প্রতিনিধিরা স্কুল-কৌন্সিলে ভোট দেবার অধিকার পায়। ছেলেদের নিজেদের মধ্যে বা আর-কারও সঙ্গে বিবাদ হলে অধ্যক্ষসভা তার তদন্ত করে; এই সভার বিচার স্বীকার করে নিতে সব ছাত্রই বাধ্য।

এই বিদ্যাভবনের সঙ্গে একটি ক্লাব আছে। সেখানে অনেক সময়ে ছেলেরা নিজের ভাষায় নিজেরা নাট্যাভিনয় করে, গান-বাজনার সংগত হয়। ক্লাবের একটি সিনেমা আছে, তার থেকে মধ্য-এশিয়ার জীবনযাত্রার চিত্রাবলী ছেলেরা দেখতে পায়। এ ছাড়া দেওয়ালে-টাঙানো খবরের কাগজ বের করা হয়।

তুর্কমেনিস্তানের চাষের উন্নতির জন্যে সেখানে বহুসংখ্যক কৃষিবিদ্যার ওস্তাদ পাঠানো হচ্ছে। দুশোর বেশি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র খোলা হয়েছে। তা ছাড়া জল এবং জমি ব্যবহার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হল তাতে কুড়ি হাজার দরিদ্রতম কৃষক-পরিবার কৃষির খেত, জল এবং কৃষির বাহন পেয়েছে।

এই বিরলপ্রজ দেশে ১৩০টা হাসপাতাল খোলা হয়েছে, ডাক্তারের সংখ্যা ছয়শো। বুলেটিনের লেখক সলজ্জ ভাষায় বলছেন :

However, there is no occasion to rejoice in the fact since there are 2,640 inhabitants to each hospital bed and, as regards doctors, Turcmenistan must be relegated to the last place in the Union. We can boast of some attainments in the field of modernization and the struggle against crass ignorance, though again we must warn the reader that Turcmenistan being on a very low level of civilization has preserved a good many customs of the distant past. However, the recent laws, passed in order to combat the selling of women into marriage and child marriages had produced the desired effect.

তুর্কমেনিস্তানের মতো মরুপ্রদেশে ছয় বৎসরের মধ্যে আপাতত ১৩০টা হাসপাতাল স্থাপন করে এরা লজ্জা পায়—এমনতরো লজ্জা দেখা আমাদের অভ্যাস নেই বলে বড়ো আশ্চর্য বোধ হল। আমাদের ভাগ্যদোষে বিস্তর 'ডিফিকল্‌টিজ' দেখতে পেলুম, সেগুলো নড়ে বসবার কোনো লক্ষণ দেখায় না তাও দেখলুম, কিন্তু বিশেষ লজ্জা দেখতে পাই নে কেন।

সত্যি কথা বলি, ইতিপূর্বে আমারও মনে দেশের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে আশা করবার মতো সাহস চলে গিয়েছিল। খৃস্টান পাদ্রির মতো আমিও ডিফিকল্‌টিজের হিসাব দেখে স্তম্ভিত হয়েছি— মনে মনে বলেছি, এত বিচিত্র জাতের মানুষ, এত বিচিত্র জাতের মূর্খতা, এত পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম, কী জানি কত কাল লাগবে আমাদের ক্লেশের বোঝা, আমাদের কলুষের আবর্জনা নড়াতে।

সাইমন কমিশনের ফসল যে আবহাওয়ায় ফলেছে স্বদেশ সম্বন্ধে আমার প্রত্যাশার ভীরুতা সেই আবহাওয়ারই। সোভিয়েট রাশিয়াতে এসে দেখলুম, এখানকার উন্নতির ঘড়ি আমাদেরই মতো বন্ধ ছিল, অন্তত জনসাধারণের ঘরে— কিন্তু বহু শত বছরের অচল ঘড়িতেও আট-দশ বছর দম লাগাতেই দিব্যি চলতে লেগেছে। এতদিন পরে বুঝতে পেরেছি আমাদের ঘড়িও চলতে পারত, কিন্তু দম দেওয়া হল না। ডিফিকল্‌টিজের মন্ত্র আওড়ানোতে এখন থেকে আর বিশ্বাস করতে পারব না।

এইবার বুলেটিন থেকে দুই-একটি অংশ উদ্ধৃত করে চিঠি শেষ করব :

The imperialist policy of the Czarist generals, after the conquest of Azerbaijan, consisted in converting the districts, inhabitated by Mahommedans into colonies, destined to supply raw material to the central Russian markets.

মনে আছে অনেক কাল হল, পরলোকগত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় একদা রেশমগুটির চাষ প্রচলন সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন! তাঁরই পরামর্শ নিয়ে আমিও রেশমগুটির চাষ প্রবর্তনের চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলুম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, রেশমগুটির চাষে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে যথেষ্ট আনুকূল্য পেয়েছিলেন। কিন্তু যতবার এই গুটি থেকে সুতো ও সুতো থেকে কাপড় বোনা চাষীদের মধ্যে চলতি করবার ইচ্ছা করেছেন ততবারই ম্যাজিস্ট্রেট দিয়েছেন বাধা।

The agent of the Czar's Government were ruthlessly carrying out the principle of 'Divide and Rule' and did all in their power to sow hatred and discord between the various races. National animosities were fostered by the Government and Mahommedans and Armenians were systematically incited against each other. The ever-recurring conflicts between these two nations at times assumed the form of massacres.

হাসপাতালের সংখ্যাল্পতা নিয়ে বুলেটিন-লেখক লজ্জা স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু একটা বিষয়ে গৌরব প্রকাশ না করে থাকতে পারেন নি :

It is an undoubted fact, which even the worst enemies of the Soviets cannot deny: for the last eight years the peace between the races of Azerbaijan has never been disturbed.

ভারতবর্ষের রাজত্বে লজ্জা-প্রকাশের চলন নেই, গৌরব-প্রকাশেরও রাস্তা দেখা যায় না।

এই লজ্জা স্বীকারের উপলক্ষে একটা কথা পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার। বুলেটিনে আছে, সমস্ত তুর্কমেনিস্তানে শিক্ষার জন্য জন-পিছু পাঁচ রুব্‌ল খরচ হয়ে থাকে। রুব্‌লের মূল্য আমাদের টাকার হিসাবে আড়াই টাকা। পাঁচ রুব্‌ল বলতে বোঝায় সাড়ে বারো টাকা। এই বাবদ কর আদায়ের কোনো একটা ব্যবস্থা হয়তো আছে, কিন্তু সেই কর আদায় উপলক্ষে প্রজাদের নিজেদের মধ্যে আত্মবিরোধ ঘটিয়ে দেবার কোনো আশঙ্কা নিশ্চয় সৃষ্টি করা হয় নি। ইতি

৮ অক্টোবর ১৯৩০[১]

---

[১] সুরেন্দ্রনাথ করকে লিখিত।

১২

বেরমেন জাহাজ

তুর্কোমেনদের কথা পূর্বেই বলেছি, মরুভূমিবাসী তারা, দশ লক্ষ মানুষ। এই চিঠি তারই পরিশিষ্ট। সোভিয়েত গবর্মেন্ট সেখানে কী কী বিদ্যায়তন-স্থাপনের সংকল্প করেছে তার একটা ফর্দ তুলে দিচ্ছি।

Beginning with October 1st, 1930, the new budget year, a number of new scientific institutions and Institutes will be opened in Turcomenia, namely :

1. Turcomen Geological Committee
2. Turcomen Institute of Applied Botany
3. Institute for study and research of stock breeding
4. Institute of Hydrology and Geophysics
5. Institute for Economic Research
6. Chemico-Bacteriological Institute, and Institute of Social Hygiene.

The activity of all the scientific institutions of Turcomenia will be regulated by a special scientific management attached to the Council of People's Commissars of Turcomenia.

In connection with the removal of the Turcomen Government from Ashkhabad to Chardjni the construction of buildings for the following museums has been started : Historical, Agricultural, Industrial and Trade Museum, Art Museum, Museum of the Revolution. In addition, the construction of an Observatory, State Library, House of Published Books and House of Science and Culture is planned.

The Department of Language and Literature of the Institute of the Turcomen Culture has completed the revision and translation into Russian of Turcomenian poetry, including folk-lore material and old poetry texts.

Five itinerant cultural bases have been organized in Turcomenia. During the year 1930 two courses for training practical nurses and midwives were completed. Altogether 46 persons were graduated. All graduates are sent to the village. ইতি ৮ অক্টোবর ১৯৩০[১]

১৩

সোভিয়েট রাশিয়ায় জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্যে কত বিবিধ রকমের উপায় অবলম্বন করা হয়েছে তার কিছু কিছু আভাস পূর্বের চিঠিপত্র থেকে পেয়ে থাকবে। আজ তোমাকে তারই মধ্যে একটা উদ্যোগের সংক্ষেপ বিবরণ লিখে পাঠাচ্ছি।

কিছুদিন হল মস্কো শহরে সাধারণের জন্য একটি আরামবাগ খোলা হয়েছে। বুলেটিনে তার নাম দিয়েছে Moscow Park of Education and Recreation। তার মধ্যে প্রধান মণ্ডপটি প্রদর্শনীর জন্যে। সেখানে ইচ্ছা করলে খবর পাওয়া যায় সমস্ত প্রদেশে কারখানার শতসহস্র

[১] সুরেন্দ্রনাথ করকে লিখিত।

শ্রমিকদের জন্যে কত ডিস্‌পেন্সারি খোলা হয়েছে, মস্কো প্রদেশে স্কুলের সংখ্যা কত বাড়ল; ম্যুনিসিপ্যাল বিভাগে দেখিয়েছে কত নতুন বাসাবাড়ি তৈরি হল, কত নতুন বাগান—শহরের কত বিষয়ে কতরকমের উন্নতি হয়েছে। নানারকমের মডেল আছে, পুরানো পাড়াগাঁ এবং আধুনিক পাড়াগাঁ, ফুল ও সবজি উৎপাদনের আদর্শ খেত, সোভিয়েট আমলে সোভিয়েট কারখানায় যে-সব যন্ত্র তৈরি হচ্ছে তার নমুনা, হাল আমলের কো-অপারেটিভ ব্যবস্থায় কী রুটি তৈরি হচ্ছে আর ওদের বিপ্লবের সময়েতেই বা কিরকম হত। তা ছাড়া নানা তামাশা, নানা খেলার জায়গা, একটা নিত্য-মেলার মতো আর-কি!

পার্কের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র জায়গা কেবল ছোটো ছেলেদের জন্যে, সেখানে বয়স্ক লোকদের প্রবেশ নিষেধ, সেখানকার প্রবেশদ্বারে লেখা আছে 'ছেলেদের উৎপাত কোরো না'। এইখানে ছেলেদের যতরকম খেলনা, খেলা, ছেলেদের থিয়েটার—সে থিয়েটারের ছেলেরাই চালক, ছেলেরাই অভিনেতা।

এই ছেলেদের বিভাগ থেকে কিছু দূরে আছে creche, বাংলায় তার নাম দেওয়া যেতে পারে শিশুরক্ষণী। মা-বাপ যখন পার্কে ঘুরে বেড়াতে প্রবৃত্ত তখন এই জায়গায় ধাত্রীদের জিম্মায় ছোটো শিশুদের রেখে যেতে পারে। একটা দোতলা মণ্ডপ (pavillion) আছে ক্লাবের জন্যে। উপরের তলায় লাইব্রেরি। কোথাও বা সতরঞ্চ-খেলার ঘর, কোথাও আছে মানচিত্র আর দেয়ালে-ঝোলানো খবরের কাগজ। তা ছাড়া সাধারণের জন্যে আহারের বেশ ভালো কো-অপারেটিভ দোকান আছে, সেখানে মদ বিক্রি বন্ধ। মস্কো পশুশালাবিভাগ থেকে এখানে একটা দোকান খুলেছে; এই দোকানে নানারকম পাখি মাছ চারাগাছ কিনতে পাওয়া যায়। প্রাদেশিক শহরগুলিতেও এইরকমের পার্ক খোলবার প্রস্তাব আছে।

যেটা ভেবে দেখবার বিষয় সেটা হচ্ছে এই যে, জনসাধারণকে এরা ভদ্রসাধারণের উচ্ছিষ্টে মানুষ করতে চায় না। শিক্ষা, আরাম, জীবনযাত্রার সুযোগ সমস্তই এদের ষোলো আনা পরিমাণে। তার প্রধান কারণ, জনসাধারণ ছাড়া এখানে আর-কিছুই নেই। এরা সমাজগ্রন্থের পরিশিষ্ট অধ্যায় নয়; সকল অধ্যায়েই এরা।

আর-একটা দৃষ্টান্ত তোমাকে দিই। মস্কো শহর থেকে কিছু দূরে সাবেক কালের একটি প্রাসাদ আছে। রাশিয়ার প্রাচীন অভিজাত বংশীয় কাউন্ট আপ্রাক্‌সিনদের সেই ছিল বাসভবন। পাহাড়ের উপর থেকে চারি দিকের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখতে—শস্যক্ষেত্র, নদী এবং পার্বত্য অরণ্য। দুটি আছে সরোবর, আর অনেকগুলি উৎস। থামওয়ালা বড়ো বড়ো প্রকোষ্ঠ, উঁচু বারান্দা, প্রাচীনকালের আসবাব ছবি ও পাথরের মূর্তি দিয়ে সাজানো দরবারগৃহ; এ ছাড়া আছে সংগীতশালা, খেলার ঘর, লাইব্রেরি, নাট্যশালা; এ ছাড়া অনেকগুলি সুন্দর বহির্ভবন বাড়িটিকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে আছে।

এই বৃহৎ প্রাসাদে অল্‌গভো নাম দিয়ে একটি কো-অপারেটিভ স্বাস্থ্যাগার স্থাপন করা হয়েছে, এমন সমস্ত লোকদের জন্য যারা একদা এই প্রাসাদে দাসশ্রেণীতে গণ্য হত। সোভিয়েট রাষ্ট্রসংঘে একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে, শ্রমিকদের জন্যে বাসা-নির্মাণ যার প্রধান কর্তব্য; সেই সোসাইটির নাম বিশ্রান্তিনিকেতন : The Home of Rest। এই অল্‌গভো তারই তত্ত্বাধীনে।

এমনতরো আরও চারটে সানাটোরিয়ম এর হাতে আছে। খাটুনির ঋতুকাল শেষ হয়ে গেলে অন্তত ত্রিশ হাজার শ্রমক্লান্ত এই পাঁচটি আরোগ্যশালায় এসে বিশ্রাম করতে পারবে। প্রত্যেক লোক এক পক্ষকাল এখানে থাকতে পারে। আহারের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত, আরামের ব্যবস্থা যথেষ্ট, ডাক্তারের ব্যবস্থাও আছে। কো-অপারেটিভ প্রণালীতে এইরকম বিশ্রান্তিনিকেতন স্থাপনের উদ্যোগ ক্রমশই সাধারণের সম্মতি লাভ করছে।

আর-কিছু নয়, শ্রমিকদের বিশ্রামের প্রয়োজন এমনভাবে আর-কোথাও কেউ চিন্তাও করে নি, আমাদের দেশের অবস্থাপন্ন লোকের পক্ষেও এরকম সুযোগ দুর্লভ।

শ্রমিকদের জন্যে এদের ব্যবস্থা কিরকম সে তো শুনলে, এখন শিশুদের সম্বন্ধে এদের বিধান

কিরকম সে কথা বলি। শিশু জারজ কিংবা বিবাহিত দম্পতির সন্তান সে সম্বন্ধে কোনো পার্থক্য এরা গণ্যই করে না। আইন এই যে, শিশু যে-পর্যন্ত না আঠারো বছর বয়সে সাবালক হয় সে-পর্যন্ত তাদের পালনের ভার বাপ-মায়ের। বাড়িতে তাদের কী ভাবে পালন করা বা শিক্ষা দেওয়া হয় স্টেট সে সম্বন্ধে উদাসীন নয়। ষোলো বছর বয়সের পূর্বে সন্তানকে কোথাও খাটুনির কাজে নিযুক্ত করতে পারবে না। আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত তাদের কাজের সময়-পরিমাণ ছয় ঘণ্টা। ছেলেদের প্রতি পিতামাতা আপন কর্তব্য করছে কি না তার তদারকের ভার অভিভাবক-বিভাগের 'পরে। এই বিভাগের কর্মচারী মাঝে মাঝে পরিদর্শন করতে আসে, দেখে ছেলেদের স্বাস্থ্য কিরকম আছে, পড়াশুনা কিরকম চলছে। যদি দেখা যায় ছেলেদের প্রতি অযত্ন হচ্ছে তা হলে বাপ-মায়ের হাত থেকে ছেলেদের ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু তবু ছেলেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব থাকে বাপ-মায়েরই। এইরকম ছেলেমেয়েদের মানুষ করবার ভার পড়ে সরকারি অভিভাবক-বিভাগের উপর।

ভাবখানা এই, সন্তানেরা কেবল তো বাপ-মায়ের নয়, মুখ্যত সমস্ত সমাজের। তাদের ভালোমন্দ নিয়ে সমস্ত সমাজের ভালোমন্দ। এরা যাতে মানুষ হয়ে ওঠে তার দায়িত্ব সমাজের, কেননা তার ফল সমাজেরই। ভেবে দেখতে গেলে পরিবারের দায়িত্বের চেয়ে সমাজের দায়িত্ব বেশি বৈ কম নয়। জনসাধারণ সম্বন্ধেও এদের মনের ভাব ঐরকমেরই। এদের মতে জনসাধারণের অস্তিত্ব প্রধানত বিশিষ্টসাধারণেরই সুযোগ-সুবিধার জন্যে নয়। তারা সমগ্র সমাজের অঙ্গ, সমাজের কোনো বিশেষ অঙ্গের প্রত্যঙ্গ নয়। অতএব তাদের জন্যে দায়িত্ব সমস্ত স্টেটের। ব্যক্তিগতভাবে নিজের ভোগের বা প্রতাপের জন্যে কেউ সমগ্র সমাজকে ডিঙিয়ে যেতে গেলে চলবে না।

যাই হোক, মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিকমত ধরতে পেরেছে তা আমার বোধ হয় না। সে হিসাবে এরা ফ্যাসিস্ট্‌দেরই মতো। এই কারণে সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টির প্রতি পীড়নে এরা কোনো বাধাই মানতে চায় না। ভুলে যায়, ব্যষ্টিকে দুর্বল করে সমষ্টিকে সবল করা যায় না, ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয় তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না। এখানে জবরদস্ত লোকের একনায়কত্ব চলছে। এইরকম একের হাতে দশের চালনা দৈবাৎ কিছুদিনের মতো ভালো ফল দিতেও পারে, কিন্তু কখনোই চিরদিন পারে না। উপযুক্তমত নায়ক পরম্পরাক্রমে পাওয়া কখনোই সম্ভব নয়।

তা ছাড়া, অবাধ ক্ষমতার লোভ মানুষের বুদ্ধিবিকার ঘটায়। একটা সুবিধার কথা এই যে, যদিও সোভিয়েট মূলনীতি সম্বন্ধে এরা মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অতি নির্দয়ভাবে পীড়ন করতে কুণ্ঠিত হয় নি, তথাপি সাধারণভাবে শিক্ষার দ্বারা, চর্চার দ্বারা, ব্যক্তির আত্মনিহিত শক্তিকে বাড়িয়েই চলেছে—ফ্যাসিস্ট্‌দের মতো নিয়তই তাকে পেষণ করে নি। শিক্ষাকে আপন বিশেষ মতের একান্ত অনুবর্তী করে কতকটা গায়ের জোরে কতকটা মোহমন্ত্রের জোরে একঝোঁকা করে তুলেছে, তবুও সাধারণের বুদ্ধির চর্চা বন্ধ করে নি। যদিও সোভিয়েট নীতি-প্রচার সম্বন্ধে এরা যুক্তির জোরের উপরেও বাহুবলকে খাড়া করে রেখেছে, তবুও যুক্তিকে একেবারে ছাড়ে নি এবং ধর্মমূঢ়তা এবং সমাজপ্রথার অন্ধতা থেকে সাধারণের মনকে মুক্ত রাখবার জন্যে প্রবল চেষ্টা করেছে।

মনকে এক দিকে স্বাধীন করে অন্য দিকে জুলুমের বশ করা সহজ নয়। ভয়ের প্রভাব কিছুদিন কাজ করবে, কিন্তু সেই ভীরুতাকে ধিক্‌কার দিয়ে শিক্ষিত মন একদিন আপন চিন্তার স্বাতন্ত্র্যের অধিকার জোরের সঙ্গে দাবি করবেই। মানুষকে এরা দেহের দিকে নিপীড়িত করেছে, মনের দিকে নয়। যারা যথার্থই দৌরাত্ম্য করতে চায় তারা মানুষের মনকে মারে আগে; এরা মনের জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তুলছে। এইখানেই পরিত্রাণের রাস্তা রয়ে গেল।

আজ আর ঘণ্টা-কয়েকের মধ্যে পৌঁছব নিয়ুইয়র্কে। তার পর আবার নতুন পালা। এরকম করে সাত ঘাটের জল খেয়ে বেড়াতে আর ভালো লাগে না। এবারে এ অঞ্চলে না আসবার ইচ্ছায় মনে অনেক তর্ক উঠেছিল, কিন্তু লোভই শেষকালে জয়ী হল। ইতি ৯ অক্টোবর ১৯৩০[১]

[১] কালীমোহন ঘোষকে লিখিত।

১৪

ল্যান্স্‌ডাউন

ইতিমধ্যে দুই-একবার দক্ষিণ-দরজার কাছ ঘেঁষে গিয়েছি। মলয়-সমীরণের দক্ষিণদ্বার নয়, যে দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ু বেরোবার পথ খোঁজে। ডাক্তার বললে, নাড়ীর সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের মুহূর্তকালের যে বিরোধ ঘটেছিল সেটা যে অল্পের উপর দিয়েই কেটে গেছে এটাকে অবৈজ্ঞানিক ভাষায় মিরাক্‌ল্‌ বলা যেতে পারে। যাই হোক, যমদূতের ইশারা পাওয়া গেছে, ডাক্তার বলছে এখন থেকে সাবধান হতে হবে। অর্থাৎ, উঠে হেঁটে বেড়াতে গেলেই বুকের কাছটাতে বাণ এসে লাগবে—শুয়ে পড়লেই লক্ষ্য এড়িয়ে যাবে। তাই ভালোমানুষের মতো আধ-শোয়া অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি। ডাক্তার বলে, এমন করে বছর-দশেক নিরাপদে কাটতে পারে, তার পরে দশম দশাকে কেউ ঠেকাতে পারে না। বিছানায় হেলান দিয়ে আছি, আমার লেখার লাইনও আমার দেহ-রেখার নকল করতে প্রবৃত্ত। রোসো, একটু উঠে বসি।

দেখলুম কিছু দুঃসংবাদ পাঠিয়েছ, শরীরের এ অবস্থায় পড়তে ভয় করে, পাছে ঢেউয়ের ঘায়ে ভাঙন লাগে। বিষয়টা কী তার আভাস পূর্বেই পেয়েছিলুম—বিস্তারিত বিবরণের ধাক্কা সহ্য করা আমার পক্ষে শক্ত। তাই আমি নিজে পড়ি নি, অমিয়কে পড়তে দিয়েছি।

যে বাঁধনে দেশকে জড়িয়েছে টান মেরে মেরে সেটা ছিঁড়তে হয়। প্রত্যেক টানে চোখের তারা উল্টে যায়, কিন্তু এ ছাড়া বন্ধনমুক্তির অন্য উপায় নেই। ব্রিটিশরাজ নিজের বাঁধন নিজের হাতেই ছিঁড়ছে, তাতে আমাদের তরফে বেদনা যথেষ্ট, কিন্তু তার তরফে লোকসান কম নয়। সকলের চেয়ে বড়ো লোকসান এই যে, ব্রিটিশরাজ আপন মান খুইয়েছে। ভীষণের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ভয় করি, সেই ভয়ের মধ্যেও সম্মান আছে, কিন্তু কাপুরুষের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ঘৃণা করি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আজ আমাদের ঘৃণার দ্বারা ধিক্‌কৃত। এই ঘৃণায় আমাদের জোর দেবে, এই ঘৃণার জোরেই আমরা জিতব।

সম্প্রতি রাশিয়া থেকে এসেছি—দেশের গৌরবের পথ যে কত দুর্গম তা অনেকটা স্পষ্ট করে দেখলুম। যে অসহ্য দুঃখ পেয়েছে সেখানকার সাধকেরা, পুলিসের মার তার তুলনায় পুষ্পবৃষ্টি। দেশের ছেলেদের বোলো, এখনো অনেক বাকি আছে—তার কিছুই বাদ যাবে না। অতএব তারা যেন এখনই বলতে শুরু না করে যে বড়ো লাগছে—সে কথা বললেই লাঠিকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়।

দেশে বিদেশে ভারতবর্ষ আজ গৌরব লাভ করেছে কেবলমাত্র মারকে স্বীকার না করে—দুঃখকে উপেক্ষা করবার সাধনা আমরা যেন কিছুতে না ছাড়ি। পশুবল কেবলই চেষ্টা করছে আমাদের পশুকে জাগিয়ে তুলতে, যদি সফল হতে পারে তবেই আমরা হারব। দুঃখ পাচ্ছি সেজন্যে আমরা দুঃখ করব না। এই আমাদের প্রমাণ করবার অবকাশ এসেছে যে, আমরা মানুষ—পশুর নকল করতে গেলেই এই শুভযোগ নষ্ট হবে। শেষ পর্যন্ত আমাদের বলতে হবে, ভয় করি নে। বাংলাদেশের মাঝে মাঝে ধৈর্য নষ্ট হয়, সেটাই আমাদের দুর্বলতা। আমরা যখন নখদন্ত মেলতে যাই তখনই তার দ্বারা নখীদন্তীদের সেলাম করা হয়। উপেক্ষা কোরো, নকল কোরো না। অশ্রুবর্ষণ নৈব নৈব চ।

আমার সব চেয়ে দুঃখ এই, যৌবনের সম্বল নেই। আমি পড়ে আছি গতিহীন হয়ে পান্থশালায়—যারা পথে চলছে তাদের সঙ্গে চলবার সময় চলে গেছে। ইতি ২৮ অক্টোবর ১৯৩০[১]

[১] সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত।

উপসংহার

সোভিয়েট শাসনের প্রথম পরিচয় আমার মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে, সে কথা পূর্বেই বলেছি। তার কয়েকটি বিশেষ কারণ আছে, সেটা আলোচনার যোগ্য।

সেখানকার যে ছবিটি আমার মনের মধ্যে মূর্তি নিয়েছে তার পিছনে দুলছে ভারতবর্ষের দুর্গতির কালো রঙের পটভূমিকা। এই দুর্গতির মূলে যে ইতিহাস আছে তার থেকে একটি তত্ত্ব পাওয়া যায়, সেই তত্ত্বটিকে চিন্তা করে দেখলে আলোচ্য প্রসঙ্গে আমার মনের ভাব বোঝা সহজ হবে।

ভারতবর্ষে মুসলমান-শাসন-বিস্তারের ভিতরকার মানসটি ছিল রাজমহিমালাভ। সেকালে সর্বদাই রাজ্য নিয়ে যে হাত-চালাচালি হত তার গোড়ায় ছিল এই ইচ্ছা। গ্রীসের সেকেন্দর শাহ ধূমকেতুর অনলোজ্জ্বল পুচ্ছের মতো তাঁর রণবাহিনী নিয়ে বিদেশের আকাশ ঝেঁটিয়ে বেড়িয়েছিলেন সে কেবল তাঁর প্রতাপ প্রসারিত করবার জন্যে। রোমকদেরও ছিল সেই প্রবৃত্তি। ফিনীশীয়েরা নানা সমুদ্রের তীরে তীরে বাণিজ্য করে ফিরেছে কিন্তু তারা রাজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি করে নি।

একদা য়ুরোপ হতে বণিকের পণ্যতরী যখন পূর্ব-মহাদেশের ঘাটে ঘাটে পাড়ি জমালে তখন থেকে পৃথিবীতে মানুষের ইতিহাসে এক নূতন পর্ব ক্রমশ অভিব্যক্ত হয়ে উঠল; ক্ষাত্রযুগ গেল চলে, বৈশ্যযুগ দেখা দিল। এই যুগে বণিকের দল বিদেশে এসে তাদের পণ্যহাটের খিড়কিমহলে রাজ্য জুড়ে দিতে লাগল। প্রধানত তারা মুনফার অঙ্ক বাড়াতে চেয়েছিল; বীরের সম্মান তাদের লক্ষ্য ছিল না। এই কাজে তারা নানা কুটিল পন্থা অবলম্বন করতে কুণ্ঠিত হয় নি; কারণ তারা চেয়েছিল সিদ্ধি, কীর্তি নয়।

এই সময় ভারতবর্ষ তার বিপুল ঐশ্বর্যের জন্য জগতে বিখ্যাত ছিল—তখনকার বিদেশী ঐতিহাসিকেরা সে কথা বারংবার ঘোষণা করে গেছেন। এমন-কি, স্বয়ং ক্লাইভ বলে গেছেন যে, 'ভারতবর্ষের ধনশালিতার কথা যখন চিন্তা করে দেখি তখন অপহরণনৈপুণ্যে নিজের সংযমে আমি নিজেই বিস্মিত হই।' এই প্রভূত ধন, এ কখনো সহজে হয় না—ভারতবর্ষ এ ধন উৎপন্ন করেছিল। তখন বিদেশ থেকে যারা এসে এখানকার রাজাসনে বসেছে তারা এ ধন ভোগ করেছে, কিন্তু নষ্ট করে নি। অর্থাৎ তারা ভোগী ছিল, কিন্তু বণিক ছিল না।

তার পর বাণিজ্যের পথ সুগম করার উপলক্ষে বিদেশী বণিকেরা তাদের কারবারের গদিটার উপরে রাজতক্ত চড়িয়ে বসল। সময় ছিল অনুকূল। তখন মোগলরাজত্বে ভাঙন ধরেছে, মারাঠিরা শিখেরা এই সাম্রাজ্যের গ্রন্থিগুলো শিথিল করতে প্রবৃত্ত, ইংরেজের হাতে সেটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ধ্বংসের পথে।

পূর্বতন রাজগৌরবলোলুপেরা যখন এ দেশে রাজত্ব করত তখন এ দেশে অত্যাচার-অবিচার-অব্যবস্থা ছিল না এ কথা বলা চলে না। কিন্তু তারা ছিল এ দেশের অঙ্গীভূত। তাদের আঁচড়ে দেশের গায়ে যা ক্ষত হয়েছিল তা ত্বকের উপরে; রক্তপাত অনেক হয়েছে, কিন্তু অস্থিবন্ধনীগুলোকে নড়িয়ে দেয় নি। ধন-উৎপাদনের বিচিত্র কাজ তখন অব্যাহত চলছিল, এমন-কি, নবাব-বাদশাহের কাছ থেকে সে-সমস্ত কাজ প্রশ্রয় পেয়েছে। তা যদি না হত তা হলে এখানে বিদেশী বণিকের ভিড় ঘটবার কোনো কারণ থাকত না—মরুভূমিতে পঙ্গপালের ভিড় জমবে কেন।

তার পরে ভারতবর্ষে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের অশুভসংগমকালে বণিক রাজা দেশের ধনকল্পতরুর শিকড়গুলোকে কী করে ছেদন করতে লাগলেন, সে ইতিহাস শতবার-কথিত এবং অত্যন্ত শ্রুতিকটু। কিন্তু পুরাতন বলে সেটাকে বিস্মৃতির মুখঠুলি চাপা দিয়ে রাখবার চেষ্টা চলবে না। এ দেশের বর্তমান দুর্বহ দারিদ্র্যের উপক্রমণিকা সেইখানে। ভারতবর্ষের ধনমহিমা ছিল, কিন্তু সেটা কোন্ বাহন-যোগে দ্বীপান্তরিত হয়েছে সে কথা যদি ভুলি তবে পৃথিবীর আধুনিক

ইতিহাসের একটা তত্ত্বকথা আমাদের এড়িয়ে যাবে। আধুনিক রাষ্ট্রনীতির প্রেরণাশক্তি বীর্যাভিমান নয়, সে হচ্ছে ধনের লোভ, এই তত্ত্বটি মনে রাখা চাই। রাজগৌরবের সঙ্গে প্রজাদের একটা মানবিক সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু ধনলোভের সঙ্গে তা থাকতেই পারে না। ধন নির্মম, নৈর্ব্যক্তিক। যে মুরগি সোনার ডিম পাড়ে লোভ যে কেবল তার ডিমগুলোকেই ঝুড়িতে তোলে তা নয়, মুরগিটাকে সুদ্ধ সে জবাই করে।

বণিকরাজের লোভ ভারতের ধন-উৎপাদনের বিচিত্র শক্তিকেই পঙ্গু করে দিয়েছে। বাকি রয়েছে কেবল কৃষি, নইলে কাঁচা মালের জোগান বন্ধ হয় এবং বিদেশী পণ্যের হাটে মূল্য দেবার শক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। ভারতবর্ষের সদ্যঃপাতী জীবিকা এই অতিক্ষীণ বৃন্তের উপর নির্ভর করে আছে।

এ কথা মেনে নেওয়া যাক, তখনকার কালে যে নৈপুণ্য ও যে-সকল উপায়ের যোগে হাতের কাজ চলত ও শিল্পীরা খেয়ে-প'রে বাঁচত, যন্ত্রের প্রতিযোগিতায় তারা স্বতই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। অতএব প্রজাদের বাঁচাবার জন্যে নিতান্তই প্রয়োজন ছিল সর্বপ্রযত্নে তাদের যন্ত্রকুশল করে তোলা। প্রাণের দায়ে বর্তমান কালে সকল দেশেই এই উদ্যোগ প্রবল। জাপান অল্পকালের মধ্যে ধনের যন্ত্রবাহনকে আয়ত্ত করে নিয়েছে, যদি না সম্ভব হত তা হলে যন্ত্রী য়ুরোপের ষড়যন্ত্রে সে ধনে-প্রাণে মারা যেত। আমাদের ভাগ্যে সে সুযোগ ঘটল না, কেননা লোভ ঈর্ষ্যাপরায়ণ। এই প্রকাণ্ড লোভের আওতায় আমাদের ধনপ্রাণ মুষড়ে এল, তৎপরিবর্তে রাজা আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, 'এখনো ধনপ্রাণের যেটুকু বাকি সেটুকু রক্ষা করবার জন্যে আইন এবং চৌকিদারের ব্যবস্থাভার রইল আমার হাতে।' এ দিকে আমাদের অন্নবস্ত্র বিদ্যাবুদ্ধি বন্ধক রেখে কণ্ঠাগত প্রাণে আমরা চৌকিদারের উর্দির খরচ জোগাচ্ছি। এই-যে সাংঘাতিক ঔদাসীন্য এর মূলে আছে লোভ। সকলপ্রকার জ্ঞানে ও কর্মে যেখানে শক্তির উৎস বা পীঠস্থান সেখান থেকে বহু নীচে দাঁড়িয়ে এতকাল আমরা হাঁ করে উপরের দিকে তাকিয়ে আছি আর সেই ঊর্ধ্বলোক থেকে এই আশ্বাসবাণী শুনে আসছি, 'তোমাদের শক্তি ক্ষয় যদি হয় ভয় কী, আমাদের শক্তি আছে, আমরা তোমাদের রক্ষা করব।'

যার সঙ্গে মানুষের লোভের সম্বন্ধ তার কাছ থেকে মানুষ প্রয়োজন উদ্ধার করে, কিন্তু কখনো তাকে সম্মান করে না। যাকে সম্মান করে না তার দাবিকে মানুষ যথাসম্ভব ছোটো করে রাখে; অবশেষে সে এত সস্তা হয়ে পড়ে যে, তার অসামান্য অভাবেও সামান্য খরচ করতে গায়ে বাজে। আমাদের প্রাণরক্ষা ও মনুষ্যত্বের লজ্জারক্ষার জন্যে কতই কম বরাদ্দ সে কারও অগোচর নেই। অন্ন নেই, বিদ্যা নেই, বৈদ্য নেই, পানের জল পাওয়া যায় পাঁক ছেঁকে; কিন্তু চৌকিদারের অভাব নেই, আর আছে মোটা মাইনের কর্মচারী—তাদের মাইনে গাল্‌ফ্‌ স্ট্রীমের মতো সম্পূর্ণ চলে যায় ব্রিটিশ দ্বীপের শৈত্যনিবারণের জন্যে, তাদের পেন্‌সন জোগাই আমাদের অন্ত্যেষ্টি-সৎকারের খরচের অংশ থেকে। এর একমাত্র কারণ, লোভ অন্ধ, লোভ নিষ্ঠুর—ভারতবর্ষ ভারতেশ্বর-দের লোভের সামগ্রী।

অথচ কঠিন বেদনার অবস্থাতেও এ কথা আমি কখনো অস্বীকার করি নে যে, ইংরেজের স্বভাবে ঔদার্য আছে, বিদেশীয় শাসনকার্যে অন্য য়ুরোপীয়দের ব্যবহার ইংরেজের চেয়েও কৃপণ এবং নিষ্ঠুর। ইংরেজ জাতি ও তার শাসননীতি সম্বন্ধে বাক্যে ও আচরণে আমরা যে বিরুদ্ধতা প্রকাশ করে থাকি তা আর-কোনো জাতের শাসনকর্তাদের সম্বন্ধে সম্ভবপর হত না; যদি-বা হত তবে তার দণ্ডনীতি আরও অনেক দুঃসহ হত, স্বয়ং য়ুরোপে এমন-কি, আমেরিকাতেও তার প্রমাণের অভাব নেই। প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহঘোষণাকালেও রাজপুরুষদের কাছে পীড়িত হলে আমরা যখন সবিস্ময়ে নালিশ করি তখন প্রমাণ হয় যে, ইংরেজ জাতির প্রতি আমাদের নিগূঢ় শ্রদ্ধা মার খেতে খেতেও মরতে চায় না। আমাদের স্বদেশী রাজা বা জমিদারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা আরও অনেক কম।

ইংলন্ডে থাকার সময় এটা লক্ষ করে দেখেছি, ভারতবর্ষে দণ্ডবিধানব্যাপারে গ্লানিজনক ঘটনা ইংরেজ খবরের কাগজে প্রায় কিছুই এসে পেঁছত না। তার একমাত্র কারণ এ নয়, পাছে য়ুরোপে বা আমেরিকায় নিন্দা রটে। বস্তুত, কড়া ইংরেজ শাসনকর্তা স্বজাতির শুভবুদ্ধিকেই ভয় করে। বেশ করেছি, খুব করেছি, দরকার ছিল জবরদস্তি করবার—এটা বুক ফুলিয়ে বলা ইংরেজদের পক্ষে সহজ নয়, তার কারণ ইংরেজের মধ্যে বড়ো মন আছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আসল কথাগুলো ইংরেজ খুব কম জানে। নিজেদের উপর ধিক্‌কার দেবার কারণ চাপা থাকে। এ কথাও সত্য, ভারতের নিমক দীর্ঘকাল যে খেয়েছে তার ইংরেজি যকৃৎ এবং হৃদয় কলুষিত হয়ে গেছে, অথচ আমাদের ভাগ্যক্রমে তারাই হল অথরিটি।

ভারতবর্ষে বর্তমান বিপ্লব উপলক্ষে দণ্ডচালনা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ বলেছেন যে, তার পীড়ন ছিল ন্যূনতম মাত্রায়। এ কথা মেনে নিতে আমরা অনিচ্ছুক, কিন্তু অতীত ও বর্তমানের প্রচলিত শাসননীতির সঙ্গে তুলনা করে দেখলে কথাটাকে অত্যুক্তি বলতে পারব না। মার খেয়েছি, অন্যায় মারও যথেষ্ট খেয়েছি; এবং সব চেয়ে কলঙ্কের কথা গুপ্ত মার, তারও অভাব ছিল না। এ কথাও বলব, অনেক স্থলেই যারা মার খেয়েছে মাহাত্ম্য তাদেরই, যারা মেরেছে তারা আপন মান খুইয়েছে। কিন্তু সাধারণ রাষ্ট্রশাসন নীতির আদর্শে আমাদের মারের মাত্রা ন্যূনতম বৈকি। বিশেষত আমাদের 'পরে ওদের নাড়ির টান নেই, তা ছাড়া সমস্ত ভারতবর্ষকে জালিয়ানওআলাবাগ করে তোলা এদের পক্ষে বাহুবলের দিক থেকে অসম্ভব ছিল না। আমেরিকার সমগ্র নিগ্রোজাতি যুক্তরাজ্যের সঙ্গে নিজেদের যোগ বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে যদি স্পর্ধাপূর্বক অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হত তা হলে কিরকম বীভৎসভাবে রক্তপ্লাবন ঘটত, বর্তমান শান্তির অবস্থাতেও তা অনুমান করে নিতে অধিক কল্পনা-শক্তির প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া ইটালি প্রভৃতি দেশে যা ঘটেছে তা নিয়ে আলোচনা করা বাহুল্য।

কিন্তু এতে সান্ত্বনা পাই নে। যে মার লাঠির ডগায় সে মার দুদিন পরে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, এমন-কি, ক্রমে তার লজ্জা আসাও অসম্ভব নয়। কিন্তু যে মার অন্তরে অন্তরে সে তো কেবল কতকগুলো মানুষের মাথা ভেঙে তার পরে খেলাঘরের ব্রিজ-পার্টির অন্তরালে অন্তর্ধান করে না। সমস্ত জাতকে সে যে ভিতরে ভিতরে ফতুর করে দিলে। শতাব্দীর পর শতাব্দী তার তো বিরাম নেই। ক্রোধের মার থামে, লোভের মারের অন্ত পাওয়া যায় না।

টাইম্‌স্‌-এর সাহিত্যিক ক্রোড়পত্রে দেখা গেল Mackee-নামক এক লেখক বলেছেন যে, ভারতে দারিদ্র্যের root cause, মূল কারণ হচ্ছে, এ দেশে নির্বিচার বিবাহের ফলে অতিপ্রজন। কথাটার ভিতরকার ভাবটা এই যে, বাহির থেকে যে শোষণ চলছে তা দুঃসহ হত না যদি স্বল্প অন্ন নিয়ে স্বল্প লোকে হাঁড়ি চেঁচে-পুঁছে খেত। শুনতে পাই, ইংলন্ডে ১৮৭১ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯২১ খৃস্টাব্দের মধ্যে শতকরা ৬৬ সংখ্যা হারে প্রজাবৃদ্ধি হয়েছে। ভারতবর্ষে পঞ্চাশ বৎসরের প্রজা-বৃদ্ধির হার শতকরা ৩৩। তবে এক যাত্রায় পৃথক ফল হল কেন। অতএব দেখা যাচ্ছে root cause প্রজাবৃদ্ধি নয়, root cause অন্নসংস্থানের অভাব। তারও root কোথায়!

দেশ যারা শাসন করছে আর যে প্রজারা শাসিত হচ্ছে তাদের ভাগ্য যদি এককক্ষবর্তী হয় তা হলে অন্তত অন্নের দিক থেকে নালিশের কথা থাকে না, অর্থাৎ সুভিক্ষে দুর্ভিক্ষে উভয়ের ভাগ প্রায় সমান হয়ে থাকে। কিন্তু যেখানে কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষের মাঝখানে মহালোভ ও মহাসমুদ্রের ব্যবধান সেখানে অমাবস্যার তরফে বিদ্যাস্বাস্থ্যসম্মানসম্পদের কৃপণতা ঘুচতে চায় না, অথচ নিশীথরাত্রির চৌকিদারদের হাতে বৃষচক্ষু লণ্ঠনের আয়োজন বেড়ে চলে। এ কথা হিসাব করে দেখতে স্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের খুব বেশি খিটিমিটির দরকার হয় না যে আজ একশো ষাট বৎসর ধরে ভারতের পক্ষে সর্ববিষয়ে দারিদ্র্য ও ব্রিটেনের পক্ষে সর্ববিষয়ে ঐশ্বর্য পিঠোপিঠি সংলগ্ন হয়ে আছে। এর যদি একটি সম্পূর্ণ ছবি আঁকতে চাই তবে বাংলাদেশের যে চাষী পাট উৎপন্ন করে আর সুদূর ডান্ডিতে যারা তার মুনফা ভোগ করে উভয়ের জীবনযাত্রার দৃশ্য পাশাপাশি দাঁড়

করিয়ে দেখতে হয়। উভয়ের মধ্যে যোগ আছে লোভের, বিচ্ছেদ আছে ভোগের— এই বিভাগ দেড়শো বছরে বাড়ল বৈ কমল না।

যান্ত্রিক উপায়ে অর্থলাভকে যখন থেকে বহুগুণীকৃত করা সম্ভবপর হল তখন থেকে মধ্যযুগের শিভাল্‌রি অর্থাৎ বীরধর্ম বণিকধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। এই নিদারুণ বৈশ্যযুগের প্রথম সূচনা হল সমুদ্রযানযোগে বিশ্বপৃথিবী-আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে। বৈশ্যযুগের আদিম ভূমিকা দস্যুবৃত্তিতে। দাসহরণ ও ধনহরণের বীভৎসতায় ধরিত্রী সেদিন কেঁদে উঠেছিল। এই নিষ্ঠুর ব্যবসায় বিশেষভাবে চলেছিল পরদেশে। সেদিন মেক্সিকোতে স্পেন শুধু কেবল সেখানকার সোনার সঞ্চয় নয়, সেখানকার সমগ্র সভ্যতাটাকেও রক্ত দিয়ে মুছে দিয়েছে। সেই রক্তমেঘের ঝড় পশ্চিম থেকে ভিন্ন ভিন্ন দমকায় ভারতবর্ষে এসে পড়ল। তার ইতিহাস আলোচনা করা অনাবশ্যক। ধনসম্পদের স্রোত পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে ফিরল।

তার পর থেকে কুবেরের সিংহাসন পাকা হল পৃথিবীতে। বিজ্ঞান ঘোষণা করে দিলে, যন্ত্রের নিয়মই বিশ্বের নিয়ম, বাহ্য সিদ্ধিলাভের বাহিরে কোনো নিত্য সত্য নেই। প্রতিযোগিতার উগ্রতা সর্বব্যাপী হয়ে উঠল, দস্যুবৃত্তি ভদ্রবেশে পেল সম্মান। লোভের প্রকাশ্য ও চোরা রাস্তা দিয়ে কারখানাঘরে, খনিতে, বড়ো বড়ো আবাদে, ছদ্মনামধারী দাসবৃত্তি মিথ্যাচার ও নির্দয়তা কিরকম হিংস্র হয়ে উঠেছে সে সম্বন্ধে য়ুরোপীয় সাহিত্যে রোমহর্ষক বর্ণনা বিস্তর পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে যারা টাকা করে আর যারা টাকা জোগায় অনেক দিন ধরে তাদের মধ্যে হাতাহাতি বেধে গেছে। মানুষের সব চেয়ে বড়ো ধর্ম সমাজধর্ম, লোভ রিপু সব চেয়ে তার বড়ো হন্তারক। এই যুগে সেই রিপু মানুষের সমাজকে আলোড়িত করে তার সম্বন্ধবন্ধনকে শিথিল ও বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে।

এক দেশে এক জাতির মধ্যেই এই নির্মম ধনার্জন ব্যাপারে যে বিভাগ সৃষ্টি করতে উদ্যত তাতে যত দুঃখই থাক্‌ তবু সেখানে সুযোগের ক্ষেত্র সকলেরই কাছে সমান খোলা থাকে, শক্তির বৈষম্য থাকতে পারে কিন্তু অধিকারের বাধা থাকে না। ধনের জাঁতাকলে সেখানে আজ যে আছে পেষ্যবিভাগে কাল সেই উঠতে পারে পেষণবিভাগে। শুধু তাই নয়, ধনীরা যে ধন সঞ্চয় করে, নানা আকারে সমস্ত দেশের মধ্যে তার কিছু-না-কিছু ভাগ-বাঁটোয়ারা আপনিই হয়ে যায়। ব্যক্তিগত সম্পদ জাতীয় সম্পদের দায়িত্বভার অনেক পরিমাণে না নিয়ে থাকতে পারে না। লোকশিক্ষা, লোকস্বাস্থ্য, লোকরঞ্জন, সাধারণের জন্যে নানাপ্রকার হিতানুষ্ঠান—এ-সমস্তই প্রভূত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। দেশের এই-সমস্ত বিচিত্র দাবি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় লক্ষ্যত অলক্ষ্যত ধনীরা মিটিয়ে থাকে।

কিন্তু ভারতের যে ধনে বিদেশী বণিক বা রাজপুরুষেরা ধনী তার ন্যূনতম উচ্ছিষ্টমাত্রই ভারতের ভাগে পড়ে। পাটের চাষীর শিক্ষার জন্যে, স্বাস্থ্যের জন্যে সুগভীর অভাবগুলো অনাবৃষ্টির নালাডোবার মতো হাঁ করে রইল, বিদেশগামী মুনফা থেকে তার দিকে কিছুই ফিরল না। যা গেল তা নিঃশেষে গেল। পাটের মুনফা সম্ভবপর করবার জন্যে গ্রামের জলাশয়গুলি দূষিত হল— এই অসহ্য জলকষ্ট নিবারণের উদ্দেশে বিদেশী মহাজনদের ভরা থলি থেকে এক পয়সা খসল না। যদি জলের ব্যবস্থা করতে হয় তবে তার সমস্ত ট্যাক্সের টান এই নিঃস্ব নিরন্নদের রক্তের উপরই পড়ে। সাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্যে রাজকোষে টাকা নেই—কেন নেই। তার প্রধান কারণ, প্রভূত পরিমাণ টাকা ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণই ত্যাগ করে চলে যায়—এ হল লোভের টাকা, যাতে করে আপন টাকা যোলো-আনাই পর হয়ে যায়। অর্থাৎ জল উবে যায় এ পারের জলাশয়ে আর মেঘ হয়ে তার বর্ষণ হতে থাকে ও পারের দেশে। সে দেশের হাসপাতালে বিদ্যালয়ে এই হতভাগ্য অশিক্ষিত অসুস্থ মুমূর্ষু ভারতবর্ষ সুদীর্ঘকাল অপ্রত্যক্ষভাবে রসদ জুগিয়ে আসছে।

দেশের লোকের দৈহিক ও মানসিক অবস্থার চরম দুঃখদৃশ্য অনেককাল স্বচক্ষে দেখে আসছি। দারিদ্র্যে মানুষ কেবল যে মরে তা নয়, নিজেকে অবজ্ঞার যোগ্য করে তোলে। তাই সার্‌ জন সাইমন বললেন যে :

In our view the most formidable of the evils from which India is suffering

have their roots in social and economic customs of long-standing which can only be remedied by the action of the Indian people themselves.

এটা হল অবজ্ঞার কথা। ভারতের প্রয়োজনকে তিনি যে আদর্শ থেকে বিচার করছেন সেটা তাঁদের নিজেদের আদর্শ নয়। প্রচুর ধন-উৎপাদনের জন্যে যে অবারিত শিক্ষা, যে সুযোগ, যে স্বাধীনতা তাঁদের নিজেদের আছে, যে-সমস্ত সুবিধা থাকাতে তাঁদের জীবনযাত্রার আদর্শ জ্ঞানে কর্মে ভোগে নানা দিক থেকে প্রভূত পরিমাণে পরিপুষ্ট হতে পেরেছে, জীর্ণবস্ত্র শীর্ণতনু রোগক্লান্ত শিক্ষাবঞ্চিত ভারতের পক্ষে সে আদর্শ কল্পনার মধ্যেই আনেন না—আমরা কোনো-মতে দিনযাপন করব লোকবৃদ্ধি নিবারণ করে এবং খরচপত্র কমিয়ে, আর আজ তাঁরা নিজের জীবিকার যে পরিস্ফীত আদর্শ বহন করছেন তাকে চিরদিন বহুলপরিমাণে সম্ভব করে রাখব আমাদের জীবিকা খর্ব করে। এর বেশি কিছু ভাববার নেই, অতএব রেমেডি-র দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমাদেরই হাতে, যারা রেমেডি-কে দুঃসাধ্য করে তুলেছে তাদের বিশেষ কিছু করবার নেই।

মানুষ এবং বিধাতার বিরুদ্ধে এই-সমস্ত নালিশ ক্ষান্ত করে রেখেই অন্তরের দিক থেকে আমাদের নির্জীব পল্লীর মধ্যে প্রাণসঞ্চার করবার জন্যে আমার অতিক্ষুদ্র শক্তিকে কিছুকাল প্রয়োগ করছি। এ কাজে গবর্মেন্টের আনুকূল্য আমি উপেক্ষা করি নি, এমন-কি, ইচ্ছা করেছি। কিন্তু ফল পাই নি, তার কারণ দরদ নেই। দরদ থাকা সম্ভব নয়— আমাদের অক্ষমতা, আমাদের সকলপ্রকার দুর্দশা, আমাদের দাবিকে ক্ষীণ করে দিয়েছে। দেশের কোনো যথার্থ কৃত্যকর্মে গবর্মেন্টের সঙ্গে আমাদের কর্মীদের উপযুক্তমত যোগসাধন অসম্ভব বলেই অবশেষে স্থির করেছি। অতএব চৌকিদারদের উর্দির খরচ জুগিয়ে যে-কটা কড়ি বাঁচে তাই দিয়ে যা সম্ভব তাই করা যাবে, এই রইল কথা।

রাজকীয় লোভ ও তৎপ্রসূত দুর্বিষহ ঔদাসীন্যের চেহারাটা যখন মনের মধ্যে নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে বসেছে এমন সময়েই রাশিয়ায় গিয়েছিলুম। য়ুরোপের অন্যান্য দেশে ঐশ্বর্যের আড়ম্বর যথেষ্ট দেখেছি; সে এতই উত্তুঙ্গ যে দরিদ্র দেশের ঈর্ষ্যাও তার উচ্চ চূড়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। রাশিয়ায় সেই ভোগের সমারোহ একেবারেই নেই, বোধ করি সেইজন্যেই তার ভিতরকার একটা রূপ দেখা সহজ ছিল।

ভারতবর্ষ যার থেকে একেবারেই বঞ্চিত তারই আয়োজনকে সর্বব্যাপী করবার প্রবল প্রয়াস এখানে দেখতে পেলেম। বলা বাহুল্য, আমি আমার বহুদিনের ক্ষুধিত দেখার ভিতর দিয়ে সমস্তটা দেখেছি। পশ্চিম মহাদেশের অন্য কোনো স্বাধিকার-সৌভাগ্যশালী দেশবাসীর চক্ষে দৃশ্যটা কিরকম ঠেকে সে কথা ঠিকমত বিচার করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। অতীতকালে ভারতবর্ষের কী পরিমাণ ধন ব্রিটিশ দ্বীপে চালান গিয়েছে এবং বর্তমানে কী পরিমাণ অর্থ বর্ষে বর্ষে নানা প্রণালী দিয়ে সেই দিকে চলে যাচ্ছে তার অংকসংখ্যা নিয়ে তর্ক করতে চাই নে। কিন্তু অতি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি এবং অনেক ইংরেজ লেখকও তা স্বীকার করেন যে, আমাদের দেশের রক্তহীন দেহে মন চাপা পড়ে গেছে, জীবনে আনন্দ নেই, আমরা অন্তরে বাহিরে মরছি— এবং তার root cause যে ভারতবাসীরই মর্মগত অপরাধের সঙ্গে জড়িত, অর্থাৎ কোনো গবর্মেন্টই এর প্রতিকার করতে নিরতিশয় অক্ষম, এ অপবাদ আমরা একেবারেই স্বীকার করব না।

এ কথা চিরদিনই আমার মনে ছিল যে ভারতের সঙ্গে যে পরদেশবাসী শাসনকর্তার স্বার্থের সম্বন্ধ প্রবল এবং দরদের সম্বন্ধ নেই সে গবর্মেন্ট নিজের গরজেই প্রবল শক্তিতে বিধি ও ব্যবস্থা রক্ষা করতে উৎসাহপরায়ণ; কিন্তু যে-সকল ব্যাপারে গরজ একান্ত আমাদেরই, যেখানে আমাদের দেশকে সর্বপ্রকারে বাঁচিয়ে তুলতে হবে ধনে মনে ও প্রাণে, সেখানে যথোচিত পরিমাণে শক্তি প্রয়োগ করতে এ গবর্মেন্ট উদাসীন। অর্থাৎ এ সম্বন্ধে নিজের দেশের প্রতি শাসনকর্তাদের যত সচেষ্টতা, যত বেদনাবোধ, আমাদের দেশের প্রতি তার কিয়দংশও সম্ভব হয় না। অথচ আমাদের ধনপ্রাণ

তাদেরই হাতে, যে উপায়ে যে উপাদানে আমরা বিনাশ থেকে রক্ষা পেতে পারি সে আমাদের হাতে নেই।

এমন-কি, এ কথা যদি সত্য হয় যে, সমাজবিধি সম্বন্ধে মূঢ়তাবশতই আমরা মরতে বসেছি তবে এই মূঢ়তা যে-শিক্ষা যে-উৎসাহ দ্বারা দূর হতে পারে সেও ঐ বিদেশী গবর্মেন্টেরই রাজকোষে ও রাজমর্জিতে। দেশব্যাপী অশিক্ষাজনিত বিপদ দূর করবার উপায় কমিশনের পরামর্শমাত্র দ্বারা লাভ করা যায় না— সে সম্বন্ধে গবর্মেন্টের তেমনি তৎপর হওয়া উচিত যেমন তৎপর ব্রিটিশ গবর্মেন্ট নিশ্চয়ই হত যদি এই সমস্যা ব্রিটেন দ্বীপের হত। সাইমন কমিশনকে আমাদের প্রশ্ন এই যে, ভারতের অজ্ঞতা-অশিক্ষার মধ্যেই এতবড়ো মৃত্যুশেল নিহিত হয়ে এতদিন রক্তপাত করছে, এই কথাই যদি সত্য হয় তবে আজ একশো ষাট বৎসরের ব্রিটিশ শাসনে তার কিছুমাত্র লাঘব হল না কেন। কমিশন কি সাংখ্যতথ্যযোগে দেখিয়েছেন পুলিসের ডাণ্ডা জোগাতে ব্রিটিশরাজ যে খরচ করে থাকেন তার তুলনায় দেশকে শিক্ষিত করতে এই সুদীর্ঘকাল কত খরচ করা হয়েছে। দূরদেশবাসী ধনী শাসকের পক্ষে পুলিসের ডাণ্ডা অপরিহার্য কিন্তু সেই লাঠির বশংগত যাদের মাথার খুলি তাদের শিক্ষার ব্যয়বিধান বহু শতাব্দী মুলতবি রাখলেও কাজ চলে যায়।

রাশিয়ায় পা বাড়িয়েই প্রথমেই চোখে পড়ল, সেখানকার যে চাষী ও শ্রমিক-সম্প্রদায়, আজ আট বৎসর পূর্বে, ভারতীয় জনসাধারণেরই মতো নিঃসহায় নিরন্ন নির্যাতিত নিরক্ষর ছিল, অনেক বিষয়ে যাদের দুঃখভার আমাদের চেয়ে বেশি বৈ কম ছিল না, অন্তত তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এ অল্প কয় বৎসরের মধ্যেই যে উন্নতি লাভ করেছে দেড়শো বছরেও আমাদের দেশে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও তা হয় নি। আমাদের দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ স্বদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে যে দুরাশার ছবি মরীচিকার পটে আঁকতেও সাহস পায় নি এখানে তার প্রত্যক্ষ রূপ দেখলুম দিগন্ত থেকে দিগন্তে বিস্তৃত।

নিজেকে এ প্রশ্ন বার বার জিজ্ঞাসা করেছি— এতবড়ো আশ্চর্য ব্যাপার সম্ভবপর হল কী করে। মনের মধ্যে এই উত্তর পেয়েছি যে, লোভের বাধা কোনোখানে নেই। শিক্ষার দ্বারা সব মানুষই যথোচিত সক্ষম হয়ে উঠবে, এ কথা মনে করতে কোথাও খটকা লাগছে না। দূর এশিয়ার তুর্কমেনিস্তানবাসী প্রজাদেরও পুরোপুরি শিক্ষা দিতে এদের মনে একটুও ভয় নেই, প্রত্যুত প্রবল আগ্রহ আছে। তুর্কমেনিস্তানের প্রথাগত মূঢ়তার মধ্যেই সেখানকার লোকের সমস্ত দুঃখের কারণ, এই কথাটা রিপোর্টে নির্দেশ করে উদাসীন হয়ে বসে নেই।

কোচিন-চায়নায় শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে শুনেছি, কোনো ফরাসি পাণ্ডিত্যব্যবসায়ী বলেছেন যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজ দেশী লোককে শিক্ষা দিতে গিয়ে যে ভুল করেছেন ফ্রান্স যেন সে ভুল না করেন। এ কথা মানতে হবে যে, ইংরেজের চরিত্রে এমন একটা মহত্ত্ব আছে যেজন্যে বিদেশী শাসননীতিতে তাঁরা কিছু কিছু ভুল করে বসেন, শাসনের ঠাস বুনানিতে কিছু কিছু খেই হারায়, নইলে আমাদের মুখ ফুটতে হয়তো আরও এক-আধ শতাব্দী দেরি হত।

এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে শিক্ষার অভাবে অশক্তি অটল হয়ে থাকে, অতএব অশিক্ষা পুলিসের ডাণ্ডার চেয়ে কম বলবান নয়। বোধ হয় যেন লর্ড কার্জন সে কথাটা কিছু কিছু অনুভব করেছিলেন। শিক্ষাদান সম্বন্ধে ফরাসি পাণ্ডিত্যব্যবসায়ী স্বদেশের প্রয়োজনকে যে আদর্শে বিচার করে থাকেন, শাসিত দেশের প্রয়োজনকে সে আদর্শে করেন না। তার একমাত্র কারণ লোভ। লোভের বাহন যারা তাদের মনুষ্যত্বের বাস্তবতা লুব্ধের পক্ষে অস্পষ্ট, তাদের দাবিকে আমরা স্বভাবতই খর্ব করে থাকি। যাদের সঙ্গে ভারতের শাসনের সম্বন্ধ তাদের কাছে ভারতবর্ষ আজ দেড়শো বৎসর খর্ব হয়ে আছে। এইজন্যেই তার মর্মগত প্রয়োজনের 'পরে উপরওআলার ঔদাসীন্য ঘুচল না। আমরা যে কী অন্ন খাই, কী জলে আমাদের পিপাসা মেটাতে হয়, কী সুগভীর অশিক্ষায় আমাদের চিত্ত তমসাবৃত, তা আজ পর্যন্ত ভালো করে তাদের চোখে পড়ল না। কেননা, আমরাই তাদের প্রয়োজনের, এইটেই বড়ো কথা, আমাদেরও যে প্রাণগত প্রয়োজন আছে এ কথাটা জরুরি নয়।

তা ছাড়া আমরা এত অকিঞ্চিৎকর হয়ে আছি যে, আমাদের প্রয়োজনকে সম্মান করাই সম্ভব হয় না।

ভারতের যে কঠিন সমস্যা, যাতে করে আমরা এতকাল ধরে ধনে প্রাণে মনে মরছি, এ সমস্যাটা পাশ্চাত্যে কোথাও নেই। সে সমস্যাটি এই যে, ভারতের সমস্ত স্বত্ব দ্বিধাকৃত ও সেই সর্বনেশে বিভাগের মূলে আছে লোভ। এই কারণে রাশিয়ায় এসে যখন সেই লোভকে তিরস্কৃত দেখলুম তখন সেটা আমাকে যতবড়ো আনন্দ দিলে এতটা হয়তো স্বভাবত অন্যকে না দিতে পারে। তবুও মূল কথাটা মন থেকে তাড়াতে পারি নে, সে হচ্ছে এই যে, আজ কেবল ভারতে নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই যে-কোনো বড়ো বিপদের জালবিস্তার দেখা যাচ্ছে তার প্রেরণা হচ্ছে লোভ—সেই লোভের সঙ্গেই যত ভয়, যত সংশয়; সেই লোভের পিছনেই যত অস্ত্রসজ্জা, যত মিথ্যুক ও নিষ্ঠুর রাষ্ট্রনীতি।

আর-একটা তর্কের বিষয় হচ্ছে ডিক্‌টেটরশিপ অর্থাৎ রাষ্ট্রব্যাপারে নায়কতন্ত্র নিয়ে। কোনো বিষয়েই নায়কিয়ানা আমি নিজে পছন্দ করি নে। ক্ষতি বা শাস্তির ভয়কে অগ্রবর্তী করে অথবা ভাষায় ভঙ্গিতে বা ব্যবহারে জিদ প্রকাশের দ্বারা, নিজের মত-প্রচারের রাস্তাটাকে সম্পূর্ণ সমতল করবার লেশমাত্র চেষ্টা আমি কোনোদিন নিজের কর্মক্ষেত্রে করতে পারি নে। সন্দেহ নেই যে, একনায়কতার বিপদ আছে বিস্তর; তার ক্রিয়ায় একতানতা ও নিত্যতা অনিশ্চিত, যে চালক ও যারা চালিত তাদের মধ্যে ইচ্ছার অসম্পূর্ণ যোগসাধন হওয়াতে বিপ্লবের কারণ সর্বদাই ঘটে, তা ছাড়া সবলে চালিত হওয়ার অভ্যাস চিত্তের ও চরিত্রের বলহানি করে—এর সফলতা যখন বাইরের দিকে দুই-চার ফসলে হঠাৎ আঁজলা ভরে তোলে, ভিতরের শিকড়কে দেয় মেরে।

জনগণের ভাগ্য যদি তাদের সম্মিলিত ইচ্ছার দ্বারাই সৃষ্ট ও পালিত না হয় তবে সেটা হয় খাঁচা, দানাপানি সেখানে ভালো মিলতেও পারে, কিন্তু তাকে নীড় বলা চলে না, সেখানে থাকতে থাকতে পাখা যায় আড়ষ্ট হয়ে। এই নায়কতা শাস্ত্রের মধ্যেই থাক্, গুরুর মধ্যেই থাক্, আর রাষ্ট্রনেতার মধ্যেই থাক্, মনুষ্যত্বহানির পক্ষে এমন উপদ্রব কিছুই নেই।

আমাদের সমাজে এই ক্লীবত্বসৃষ্টি বহুযুগ থেকে ঘটে আসছে এবং এর ফল প্রতিদিন দেখে আসছি। মহাত্মাজি যখন বিদেশী কাপড়কে অশুচি বলেছিলেন আমি তার প্রতিবাদ করেছিলাম; আমি বলেছিলাম, ওটা আর্থিক ক্ষতিকর হতে পারে, অশুচি হতেই পারে না। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রচালিত অন্ধ চিত্ত ভোলাতে হবে, নইলে কাজ পাব না—মনুষ্যত্বের এমনতরো চিরস্থায়ী অবমাননা আর কী হতে পারে। নায়কচালিত দেশ এমনিভাবেই মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে—এক জাদুকর যখন বিদায় গ্রহণ করে তখন আর-এক জাদুকর আর-এক মন্ত্র সৃষ্টি করে।

ডিক্‌টেটরশিপ একটা মস্ত আপদ, সে কথা আমি মানি এবং সেই আপদের বহু অত্যাচার রাশিয়ায় আজ ঘটছে সে কথাও আমি বিশ্বাস করি। এর নঞর্থক দিকটা জবরদস্তির দিক, সেটা পাপ। কিন্তু সদর্থক দিকটা দেখেছি, সেটা হল শিক্ষা, জবরদস্তির একেবারে উলটো।

দেশের সৌভাগ্যসৃষ্টি-ব্যাপারে জনগণের চিত্ত সম্মিলিত হলে তবে সেটার ক্রিয়া সজীব ও স্থায়ী হয়; নিজের একনায়কত্বের প্রতি যারা লুব্ধ, নিজের চিত্ত ছাড়া অন্য সকল চিত্তকে অশিক্ষা-দ্বারা আড়ষ্ট করে রাখাই তাদের অভিপ্রায়-সিদ্ধির একমাত্র উপায়। জারের রাজত্বে শিক্ষার অভাবে জনগণ ছিল মোহাভিভূত, তার উপরে সর্বব্যাপী একটা ধর্মমূঢ়তা অজগর সাপের মতো সাধারণের চিত্তকে শত পাকে বেড়ে ধরেছিল। সেই মূঢ়তাকে সম্রাট অতি সহজে নিজের কাজে লাগাতে পারতেন। তখন য়িহুদির সঙ্গে খৃস্টানের, মুসলমানের সঙ্গে আর্মানির সকলপ্রকার বীভৎস উৎপাত ধর্মের নামে অনায়াসে ঘটানো যেতে পারত। তখন জ্ঞান ও ধর্মের মোহ দ্বারা আত্মশক্তিহারা শ্লথগ্রন্থি বিভক্ত দেশ বাহিরের শত্রুর কাছে সহজেই অভিভূত ছিল। একনায়কত্বের চিরাধিপত্যের পক্ষে এমন অনুকূল অবস্থা আর কিছুই হতে পারে না।

পূর্বতন রাশিয়ার মতোই আমাদের দেশে এই অবস্থা বহুকাল থেকে বর্তমান। আজ আমাদের

দেশ মহাত্মাজির চালনার কাছে বশ মেনেছে, কাল তিনি থাকবেন না, তখন চালকত্বের প্রত্যাশীরা তেমনি করেই অকস্মাৎ দেখা দিতে থাকবে যেমন করে আমাদের দেশের ধর্মাভিভূতদের কাছে নূতন নূতন অবতার ও গুরু যেখানে-সেখানে উঠে পড়ছে। চীনদেশে আজ নায়কত্ব নিয়ে জনকয়েক ক্ষমতালোভী জবরদস্তদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রলয়সংঘর্ষ চলেইছে, কারণ, জনসাধারণের মধ্যে সে শিক্ষা নেই যাতে তারা নিজের সম্মিলিত ইচ্ছা-দ্বারা দেশের ভাগ্য নিয়মিত করেত পারে; তাই সেখানে আজ সমস্ত দেশ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। আমাদের দেশে সেই নায়কপদ নিয়ে দারুণ হানাহানি ঘটবে না, এমন কথা মনে করতে পারি নে; তখন দলিতবিদলিত হয়ে মরবে উলুখড় জনসাধারণ, কারণ তারা উলুখড়, তারা বনস্পতি নয়।

রাশিয়াতেও সম্প্রতি নায়কের প্রবল শাসন দেখা গেল। কিন্তু এই শাসন নিজেকে চিরস্থায়ী করবার পন্থা নেয় নি—একদা সে পন্থা নিয়েছিল জারের রাজত্ব, অশিক্ষা ও ধর্মমোহের দ্বারা জনসাধারণের মনকে অভিভূত করে এবং কসাকের কশাঘাতে তাদের পৌরুষকে জীর্ণ করে দিয়ে। বর্তমান আমলে রাশিয়ায় শাসনদণ্ড নিশ্চল আছে বলে মনে করি নে, কিন্তু শিক্ষাপ্রচারের প্রবলতা অসাধারণ। তার কারণ এর মধ্যে ব্যক্তিগত বা দলগত ক্ষমতালিপ্সা বা অর্থলোভ নেই। একটা বিশেষ অর্থনৈতিক মতে সর্বসাধারণকে দীক্ষিত করে জাতি বর্ণ ও শ্রেণী-নির্বিশেষে সকলকেই মানুষ করে তোলবার একটা দুর্নিবার ইচ্ছা আছে। তা যদি না হত তা হলে ফরাসি পণ্ডিতের কথা মানতে হত যে, শিক্ষা দেওয়াটা একটা মস্ত ভুল।

অর্থনৈতিক মতটা সম্পূর্ণ গ্রাহ্য কি না সে কথা বলবার সময় আজও আসে নি। কেননা এ মত এতদিন প্রধানত পুঁথির মধ্যেই টলে টলে বেড়াচ্ছিল, এমন বৃহৎ ক্ষেত্রে এতবড়ো সাহসের সঙ্গে ছাড়া পায় নি। যে প্রবল লোভের কাছে এই মত প্রথম থেকেই সাংঘাতিক বাধা পেত সেই লোভকেই এরা সাংঘাতিকভাবে সরিয়ে দিয়েছে। পরীক্ষার ভিতর দিয়ে পরিবর্তন ঘটতে ঘটতে এ মতের কতটুকু কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা আজ নিশ্চিত কেউ বলতে পারে না। কিন্তু এ কথাটা নিশ্চিত বলা যেতে পারে যে, রাশিয়ায় জনসাধারণ এতকাল পরে যে শিক্ষা নির্বারিত ও প্রচুরভাবে পাচ্ছে তাতে করে তাদের মনুষ্যত্ব স্থায়ীভাবে উৎকর্ষ এবং সম্মানলাভ করল।

বর্তমান রাশিয়ায় নিষ্ঠুর শাসনের জনশ্রুতি সর্বদাই শোনা যায়—অসম্ভব না হতে পারে। নিষ্ঠুর শাসনের ধারা সেখানে চিরদিন চলে এসেছে, হঠাৎ তিরোভূত না হওয়াই সম্ভব। অথচ সেখানে চিত্রযোগে সিনেমাযোগে ইতিহাসের ব্যাখ্যায় সাবেক আমলের নিদারুণ শাসনবিধি ও অত্যাচারকে সোভিয়েট গবর্মেন্ট অবিরত প্রত্যক্ষ করিয়ে দিচ্ছে। এই গবর্মেন্ট নিজেও যদি এইরকম নিষ্ঠুর পথ অবলম্বন করে থাকে তবে নিষ্ঠুরাচারের প্রতি এত প্রবল করে ঘৃণা উৎপাদন করে দেওয়াটাকে, আর-কিছু না হোক, অদ্ভুত ভুল বলতে হবে। সিরাজউদ্দৌলা-কর্তৃক কালা-গর্তের নৃশংসতাকে যদি সিনেমা প্রভৃতি দ্বারা সর্বত্র লাঞ্ছিত করা হত তবে তার সঙ্গে সঙ্গেই জালিয়ান-ওআলাবাগের কাণ্ড করাটাকে অন্তত মূর্খতা বললে দোষ হত না। কারণ, এ ক্ষেত্রে বিমুখ অস্ত্র অস্ত্রীকেই লাগবার কথা।

সোভিয়েট রাশিয়ায় মার্ক্‌সীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচারবুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার একটা প্রবল প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ; সেই জেদের মুখে এ সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর করে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এই অপবাদকে আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি। সেদিনকার য়ুরোপীয় যুদ্ধের সময় এইরকম মুখ চাপা দেওয়া এবং গবর্মেন্ট-নীতির বিরুদ্ধবাদীর মত-স্বাতন্ত্র্যকে জেলখানায় বা ফাঁসিকাঠে বিলুপ্ত করে দেওয়ার চেষ্টা দেখা গিয়েছিল।

যেখানে আশু ফললাভের লোভ অতি প্রবল সেখানে রাষ্ট্রনায়কেরা মানুষের মতস্বাতন্ত্র্যের অধিকারকে মানতে চায় না। তারা বলে, ও-সব কথা পরে হবে, আপাতত কাজ উদ্ধার করে নিই। রাশিয়ার অবস্থা যুদ্ধকালের অবস্থা। অন্তরে বাহিরে শত্রু। ওখানকার সমস্ত পরীক্ষাকে পণ্ড করে দেবার জন্যে চারি দিকে নানা ছলবলের কাণ্ড চলছে। তাই ওদের নির্মাণকার্যের ভিতটা যত

শীঘ্র পাকা করা চাই, এজন্যে বলপ্রয়োগ করতে ওদের কোনো দ্বিধা নেই। কিন্তু গরজ যত জরুরিই হোক, বল জিনিসটা একতরফা জিনিস। ওটাতে ভাঙে, সৃষ্টি করে না। সৃষ্টিকার্যে দুই পক্ষ আছে; উপাদানকে স্বপক্ষে আনা চাই, মারধোর করে নয়, তার নিয়মকে স্বীকার করে।

রাশিয়া যে কাজে লেগেছে এ হচ্ছে যুগান্তরের পথ বানানো; পুরাতন বিধি-বিশ্বাসের শিকড়-গুলোকে তার সাবেক জমি থেকে উপড়ে দেওয়া; চিরাভ্যাসের আরামকে তিরস্কৃত করা। এরকম ভাঙনের উৎসাহে যে আবর্ত সৃষ্টি করে তার মাঝখানে পড়লে মানুষ তার মাতুনির আর অন্ত পায় না—স্পর্ধা বেড়ে ওঠে; মানবপ্রকৃতিকে সাধনা করে বশ করবার অপেক্ষা আছে, এ কথা ভুলে যায়; মনে করে, তাকে তার আশ্রয় থেকে ছিঁড়ে নিয়ে একটা সীতাহরণ-ব্যাপার করে তাকে পাওয়া যেতে পারে। তার পরে লংকায় আগুন লাগে তো লাগুক। উপযুক্ত সময় নিয়ে স্বভাবের সঙ্গে রফা করবার তর সয় না যাদের তারা উৎপাতকে বিশ্বাস করে; অবশেষে লাঠিয়ে পিটিয়ে রাতারাতি যা গড়ে তোলে তার উপরে ভরসা রাখা চলে না, তার উপরে দীর্ঘকালের ভর সয় না।

যেখানে মানুষ তৈরি নেই, মত তৈরি হয়েছে, সেখানকার উচ্চণ্ড দণ্ডনায়কদের আমি বিশ্বাস করি নে। প্রথম কারণ, নিজের মত সম্বন্ধে আগেভাগে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা সুবুদ্ধি নয়, সেটাকে কাজে খাটাতে খাটাতে তবে তার পরিচয় হয়। ও দিকে ধর্মতন্ত্রের বেলায় যে জননায়কেরা শাস্ত্রবাক্য মানে না তারাই দেখি অর্থতন্ত্রের দিকে শাস্ত্র মেনে অচল হয়ে বসে আছে। সেই শাস্ত্রের সঙ্গে যেমন করে হোক মানুষকে টুঁটি চেপে ঝুঁটি ধরে মেলাতে চায়—এ কথাও বোঝে না, জোর করে ঠেসে-ঠুসে যদি কোনো-এক রকমে মেলানো হয় তাতে সত্যের প্রমাণ হয় না; বস্তুত যে পরিমাণেই জোর সেই পরিমাণেই সত্যের অপ্রমাণ।

য়ুরোপে যখন খৃস্টান শাস্ত্রবাক্যে জবরদস্ত বিশ্বাস ছিল তখন মানুষের হাড়গোড় ভেঙে, তাকে পুড়িয়ে বিঁধিয়ে, তাকে টিলিয়ে, ধর্মের সত্যতা-প্রমাণের চেষ্টা দেখা গিয়েছিল। আজ বলশেভিক মতবাদ সম্বন্ধে তার বন্ধু ও শত্রু উভয় পক্ষেরই সেইরকম উদ্দাম গায়ের-জোরী যুক্তি-প্রয়োগ। দুই পক্ষেরই পরস্পরের নামে নালিশ এই যে, মানুষের মতস্বাতন্ত্র্যের অধিকারকে পীড়িত করা হচ্ছে। মাঝের থেকে পশ্চিম মহাদেশে আজ মানবপ্রকৃতি দুই তরফ থেকেই ঢেলা খেয়ে মরছে। আমার মনে পড়ছে আমাদের বাউলের গান—

নিঠুর গরজী,
তুই কি মানসমুকুল ভাজবি আগুনে?
তুই ফুল ফুটাবি বাস ছুটাবি সবুর বিহুনে।
দেখ্-না আমার পরমগুরু সাঁই,
সে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল, তাড়াহুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচণ্ড, তাই ভরসা দণ্ড—
এর আছে কোন্ উপায়।
কয় সে মদন দিস নে বেদন, শোন্ নিবেদন,
সেই শ্রীগুরুর মনে,
সহজধারা আপনহারা তাঁর বাণী শোনে
রে গরজী॥

সোভিয়েট রাশিয়ার লোকশিক্ষা সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য সে আমি বলেছি, তা ছাড়া সেখানকার পলিটিক্স্ মুনফা-লোলুপদের লোভের দ্বারা কলুষিত নয় বলে রাশিয়া-রাষ্ট্রের অন্তর্গত নানাবিধ প্রজা জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সমান অধিকারের দ্বারা ও প্রকৃষ্ট শিক্ষার সুযোগে সম্মানিত হয়েছে, এ কথাটারও আলোচনা করেছি। আমি ব্রিটিশ-ভারতের প্রজা বলেই এই দুটি ব্যাপার আমাকে এত গভীরভাবে আনন্দ দিয়েছে।

এখন বোধ করি একটি শেষ প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতে হবে। বলশেভিক অর্থনীতি সম্বন্ধে আমার মত কী, এ কথা অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে থাকেন। আমার ভয় এই যে, আমরা চিরদিন শাস্ত্রশাসিত পাণ্ডাচালিত দেশ, বিদেশের আমদানি বচনকে একেবারেই বেদবাক্য বলে মেনে নেবার দিকেই আমাদের মুগ্ধ মনের ঝোঁক। গুরুমন্ত্রের মোহ থেকে সামলিয়ে নিয়ে আমাদের বলা দরকার যে, প্রয়োগের দ্বারাই মতের বিচার হতে পারে, এখনো পরীক্ষা শেষ হয় নি। যে-কোনো মতবাদ মানুষসম্বন্ধীয় তার প্রধান অঙ্গ হচ্ছে মানবপ্রকৃতি। এই মানবপ্রকৃতির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য কী পরিমাণে ঘটবে তার সিদ্ধান্ত হতে সময় লাগে। তত্ত্বটাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করবার পূর্বে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু তবু সে সম্বন্ধে আলোচনা করা চলে, কেবলমাত্র লজিক নিয়ে বা অঙ্ক কষে নয়— মানবপ্রকৃতিকে সামনে রেখে।

মানুষের মধ্যে দুটো দিক আছে— এক দিকে সে স্বতন্ত্র, আর-এক দিকে সে সকলের সঙ্গে যুক্ত। এর একটাকে বাদ দিলে যেটা বাকি থাকে সেটা অবাস্তব। যখন কোনো একটা ঝোঁকে পড়ে মানুষ এক দিকেই একান্ত উধাও হয়ে যায় এবং ওজন হারিয়ে নানাপ্রকার বিপদ ঘটাতে থাকে তখন পরামর্শদাতা এসে সংকটটাকে সংক্ষেপ করতে চান; বলেন, অন্য দিকটাকে একেবারেই ছেঁটে দাও। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যখন উৎকট স্বার্থপরতায় পৌঁছিয়ে সমাজে নানাপ্রকার উৎপাত মথিত করে তখন উপদেষ্টা বলেন, স্বার্থ থেকে স্ব-টাকে এক কোপে দাও উড়িয়ে, তা হলেই সমস্ত ঠিক চলবে। তাতে হয়তো উৎপাত কমতে পারে, কিন্তু চলা বন্ধ হওয়া অসম্ভব নয়। লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়া গাড়িটাকে খানায় ফেলবার জো করে, ঘোড়াটাকে গুলি করে মারলেই যে তার পর থেকে গাড়িটা সুস্থভাবে চলবে, এমন চিন্তা না করে লাগামটা সম্বন্ধে চিন্তা করবার দরকার হয়ে ওঠে।

দেহে দেহে পৃথক বলেই মানুষ কাড়াকাড়ি হানাহানি করে থাকে, কিন্তু সব মানুষকে এক দড়িতে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে সমস্ত পৃথিবীতে একটিমাত্র বিপুল কলেবর ঘটিয়ে তোলবার প্রস্তাব বলগর্বিত অর্থতাত্ত্বিক কোনো জারের মুখেই শোভা পায়। বিধাতার বিধিকে একেবারে সমূলে অতিদিষ্ট করবার চেষ্টায় যে পরিমাণে সাহস তার চেয়ে অধিক পরিমাণে মূঢ়তা দরকার করে।

একদিন ভারতের সমাজটাই ছিল প্রধানত পল্লীসমাজ। এইরকম ঘনিষ্ঠ পল্লীসমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সমাজগত সম্পত্তির সামঞ্জস্য ছিল। লোকমতের প্রভাব ছিল এমন যে, ধনী আপনার ধন সম্পূর্ণ আপন ভোগে লাগাতে অগৌরব বোধ করত। সমাজ তার কাছ থেকে আনুকূল্য স্বীকার করেছে বলেই তাকে কৃতার্থ করেছে, অর্থাৎ ইংরেজি ভাষায় যাকে চ্যারিটি বলে এর মধ্যে তা ছিল না। ধনীর স্থান ছিল সেখানেই যেখানে ছিল নির্ধন; সেই সমাজে আপন স্থানমর্যাদা রক্ষা করতে গেলে ধনীকে নানা পরোক্ষ আকারে বড়ো অঙ্কের খাজনা দিতে হত। গ্রামে বিশুদ্ধ জল, বৈদ্য, পণ্ডিত, দেবালয়, যাত্রা, গান, কথা, পথঘাট, সমস্তই রক্ষিত হত গ্রামের ব্যক্তিগত অর্থের সমাজ-মুখীন প্রবাহ থেকে, রাজকর থেকে নয়। এর মধ্যে স্বেচ্ছা এবং সমাজের ইচ্ছা দুই মিলতে পেরেছে। যেহেতু এই আদানপ্রদান রাষ্ট্রীয় যন্ত্রযোগে নয়, পরন্তু মানুষের ইচ্ছাবাহিত, সেইজন্যে এর মধ্যে ধর্মসাধনার ক্রিয়া চলত, অর্থাৎ এতে কেবলমাত্র আইনের চালনায় বাহ্য ফল ফলত না, অন্তরের দিকে ব্যক্তিগত উৎকর্ষসাধন হত। এই ব্যক্তিগত উৎকর্ষই মানবসমাজের স্থায়ী কল্যাণময় প্রাণবান আশ্রয়।

বণিকসম্প্রদায়, বিত্ত খাটিয়ে লাভ করাটাই যাদের মুখ্য ব্যবসায়, তারা সমাজে ছিল পতিত। যেহেতু তখন ধনের বিশেষ সম্মান ছিল না এইজন্য ধন ও অধনের একটা মস্ত বিভেদ তখন ছিল অবর্তমান। ধন আপন বৃহৎ সঞ্চয়ের দ্বারা নয়, আপন মহৎ দায়িত্ব পূরণ করে তবে সমাজে মর্যাদা লাভ করত; নইলে তার ছিল লজ্জা। অর্থাৎ সম্মান ছিল ধর্মের, ধনের নয়। এই সম্মান সমর্পণ করতে গিয়ে কারও আত্মসম্মানের হানি হত না। এখন সেদিন গেছে বলেই সামাজিক-দায়িত্বহীন ধনের প্রতি একটা অসহিষ্ণুতার লক্ষণ নানা আকারে দেখা যাচ্ছে। কারণ, ধন এখন মানুষকে অর্ঘ্য দেয় না, তাকে অপমানিত করে।

য়ুরোপীয় সভ্যতা প্রথম থেকেই নগরে সংহত হবার পথ খুঁজেছে। নগরে মানুষের সুযোগ হয় বড়ো, সম্বন্ধ হয় খাটো। নগর অতিবৃহৎ, মানুষ সেখানে বিক্ষিপ্ত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য একান্ত, প্রতিযোগিতার মথন প্রবল। ঐশ্বর্য সেখানে ধনী-নির্ধনের বিভাগকে বাড়িয়ে তোলে এবং চ্যারিটির দ্বারা যেটুকু যোগসাধন হয় তাতে সান্ত্বনা নেই, সম্মান নেই। সেখানে যারা ধনের অধিকারী এবং যারা ধনের বাহন তাদের মধ্যে আর্থিক যোগ আছে, সামাজিক সম্বন্ধ বিকৃত অথবা বিচ্ছিন্ন।

এমন অবস্থায় যন্ত্রযুগ এল, লাভের অংক বেড়ে চলল অসম্ভব পরিমাণে। এই লাভের মহামারী সমস্ত পৃথিবীতে যখন ছড়াতে লাগল তখন যারা দূরবাসী অনাত্মীয়, যারা নির্ধন, তাদের আর উপায় রইল না—চীনকে খেতে হল আফিম; ভারতকে উজাড় করতে হল তার নিজস্ব; আফ্রিকা চিরদিন পীড়িত, তার পীড়া বেড়ে চলল। এ তো গেল বাইরের কথা, পশ্চিম মহাদেশের ভিতরেও ধনী নির্ধনের বিভাগ আজ অত্যন্ত কঠোর; জীবনযাত্রার আদর্শ বহুমূল্য ও উপকরণবহুল হওয়াতে দুই পক্ষের ভেদ অত্যন্ত প্রবল হয়ে চোখে পড়ে। সাবেক কালে, অন্তত আমাদের দেশে, ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ছিল প্রধানত সামাজিক দানে ও কর্মে, এখন হয়েছে ব্যক্তিগত ভোগে। তাতে বিস্মিত করে, আনন্দিত করে না; ঈর্ষ্যা জাগায়, প্রশংসা জাগায় না। সব চেয়ে বড়ো কথাটা হচ্ছে এই যে, তখন সমাজে ধনের ব্যবহার একমাত্র দাতার স্বেচ্ছার উপর নির্ভর করত না, তার উপরে ছিল সামাজিক ইচ্ছার প্রবল প্রভাব। সুতরাং দাতাকে নম্র হয়ে দান করতে হত; 'শ্রদ্ধয়া দেয়ং' এই কথাটা খাটত।

মোট কথা হচ্ছে, আধুনিক কালে ব্যক্তিগত ধনসঞ্চয় ধনীকে যে প্রবল শক্তির অধিকার দিচ্ছে তাতে সর্বজনের সম্মান ও আনন্দ থাকতে পারে না। তাতে এক পক্ষে অসীম লোভ, অপর পক্ষে গভীর ঈর্ষ্যা, মাঝখানে দুস্তর পার্থক্য। সমাজে সহযোগিতার চেয়ে প্রতিযোগিতা অসম্ভব বড়ো হয়ে উঠল। এই প্রতিযোগিতা নিজের দেশের এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর, এবং বাহিরে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের। তাই চার দিকে সংশয়হিংস্র অস্ত্র শাণিত হয়ে উঠছে, কোনো উপায়েই তার পরিমাণ কেউ খর্ব করতে পারছে না। আর, পরদেশী যারা এই দূরস্থিত ভোগরাক্ষসের ক্ষুধা মেটাবার কাজে নিযুক্ত তাদের রক্তবিরল কৃশতা যুগের পর যুগে বেড়েই চলেছে। এই বহুবিস্তৃত কৃশতার মধ্যে পৃথিবীর অশান্তি বাসা বাঁধতে পারে না, এ কথা যারা বলদর্পে কল্পনা করে তারা নিজের গোঁয়ার্তমির অন্ধতার দ্বারা বিড়ম্বিত। যারা নিরন্তর দুঃখ পেয়ে চলেছে সেই হতভাগারাই দুঃখবিধাতার প্রেরিত দূতদের প্রধান সহায়; তাদের উপবাসের মধ্যে প্রলয়ের আগুন সঞ্চিত হচ্ছে।

বর্তমান সভ্যতার এই অমানবিক অবস্থায় বলশেভিক নীতির অভ্যুদয়; বায়ুমণ্ডলের এক অংশে তনুত্ব ঘটলে ঝড় যেমন বিদ্যুদ্দন্ত পেষণ করে মারমূর্তি ধরে ছুটে আসে এও সেইরকম কাণ্ড। মানবসমাজে সামঞ্জস্য ভেঙে গেছে বলেই এই একটা অপ্রাকৃতিক বিপ্লবের প্রাদুর্ভাব। সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টির উপেক্ষা ক্রমশই বেড়ে উঠছিল বলেই সমষ্টির দোহাই দিয়ে আজ ব্যষ্টিকে বলি দেবার আত্মঘাতী প্রস্তাব উঠেছে। তীরে অগ্নিগিরি উৎপাত বাধিয়েছে বলে সমুদ্রকেই একমাত্র বন্ধু বলে এই ঘোষণা। তীরহীন সমুদ্রের রীতিমত পরিচয় যখন পাওয়া যাবে তখন কূলে ওঠবার জন্যে আবার আঁকুবাঁকু করতে হবে। সেই ব্যষ্টিবর্জিত সমষ্টির অবাস্তবতা কখনোই মানুষ চিরদিন সইবে না। সমাজ থেকে লোভের দুর্গগুলোকে জয় করে আয়ত্ত করতে হবে, কিন্তু ব্যক্তিকে বৈতরণী পার করে দিয়ে সমাজরক্ষা করবে কে। অসম্ভব নয় যে, বর্তমান রুগ্ণ যুগে বলশেভিক নীতিই চিকিৎসা; কিন্তু চিকিৎসা তো নিত্যকালের হতে পারে না, বস্তুত ডাক্তারের শাসন যেদিন ঘুচবে সেইদিনই রোগীর শুভদিন।

আমাদের দেশে আমাদের পল্লীতে পল্লীতে ধন-উৎপাদন ও পরিচালনার কাজে সমবায়নীতির জয় হোক, এই আমি কামনা করি। কারণ, এই নীতিতে যে সহযোগিতা আছে তাতে সহযোগীদের ইচ্ছাকে চিন্তাকে তিরস্কৃত করা হয় না বলে মানবপ্রকৃতিকে স্বীকার করা হয়। সেই প্রকৃতিকে বিরুদ্ধ করে দিয়ে জোর খাটাতে গেলে সে জোর খাটবে না।

এইসঙ্গে একটা কথা বিশেষ করে বলা দরকার। আমি যখন ইচ্ছা করি যে আমাদের দেশের গ্রামগুলি বেঁচে উঠুক, তখন কখনো ইচ্ছে করি নে যে গ্রাম্যতা ফিরে আসুক। গ্রাম্যতা হচ্ছে সেইরকম সংস্কার, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিশ্বাস ও কর্ম যা গ্রামসীমার বাইরের সঙ্গে বিযুক্ত—বর্তমান যুগের যে প্রকৃতি তার সঙ্গে যা কেবলমাত্র পৃথক নয়, যা বিরুদ্ধ। বর্তমান যুগের বিদ্যা ও বুদ্ধির ভূমিকা বিশ্বব্যাপী, যদিও তার হৃদয়ের অনুবেদনা সম্পূর্ণ সে পরিমাণে ব্যাপক হয় নি। গ্রামের মধ্যে সেই প্রাণ আনতে হবে যে প্রাণের উপাদান তুচ্ছ ও সংকীর্ণ নয়, যার দ্বারা মানবপ্রকৃতিকে কোনো দিকে খর্ব ও তিমিরাবৃত না রাখা হয়।

ইংলন্ডে একদা কোনো-এক গ্রামে একজন কৃষকের বাড়িতে ছিলুম। দেখলুম, লন্ডনে যাবার জন্যে ঘরের মেয়েগুলির মন চঞ্চল। শহরের সর্ববিধ ঐশ্বর্যের তুলনায় গ্রামের সম্বলের এত দীনতা যে, গ্রামের চিত্তকে স্বভাবতই সর্বদা শহরের দিকে টানছে। দেশের মাঝখানে থেকেও গ্রামগুলির যেন নির্বাসন। রাশিয়ায় দেখেছি, গ্রামের সঙ্গে শহরের বৈপরীত্য ঘুচিয়ে দেবার চেষ্টা। এই চেষ্টা যদি ভালো করে সিদ্ধ হয় তা হলে শহরের অস্বাভাবিক অতিবৃদ্ধি নিবারণ হবে। দেশের প্রাণশক্তি চিন্তাশক্তি দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আপন কাজ করতে পারবে।

আমাদের দেশের গ্রামগুলিও শহরের উচ্ছিষ্ট ও উদ্‌বৃত্ত-ভোজী না হয়ে মনুষ্যত্বের পূর্ণ সম্মান ও সম্পদ ভোগ করুক, এই আমি কামনা করি। একমাত্র সমবায়প্রণালীর দ্বারা গ্রাম আপন সর্বাঙ্গীণ শক্তিকে নিমজ্জনদশা থেকে উদ্ধার করতে পারবে, এই আমার বিশ্বাস। আক্ষেপের বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে সমবায়প্রণালী কেবল টাকা ধার দেওয়ার মধ্যেই ম্লান হয়ে আছে, মহাজনী গ্রাম্যতাকেই কিঞ্চিৎ শোধিত আকারে বহন করছে, সম্মিলিত চেষ্টায় জীবিকা উৎপাদন ও ভোগের কাজে সে লাগল না।

তার প্রধান কারণ যে শাসনতন্ত্রকে আশ্রয় করে আমলা-বাহিনী সমবায়নীতি আমাদের দেশে আবির্ভূত হল সে যন্ত্র, অন্ধ, বধির, উদাসীন। তা ছাড়া হয়তো এ কথা লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, চরিত্রে যে গুণ থাকলে সমবেত হওয়া সহজ হয় আমাদের সে গুণ নেই; যারা দুর্বল পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস তাদের দুর্বল। নিজের 'পরে অশ্রদ্ধাই অপরের প্রতি অশ্রদ্ধার ভিত্তি। যারা দীর্ঘকাল পরাধীন, আত্মসম্মান হারিয়ে তাদের এই দুর্গতি। প্রভুশ্রেণীর শাসন তারা নতশিরে স্বীকার করতে পারে, কিন্তু স্বশ্রেণীর চালনা তারা সহ্য করে না। স্বশ্রেণীকে বঞ্চনা করা এবং তার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা তাদের পক্ষে সহজ।

রুশীয় গল্পের বই পড়ে জানা যায়, সেখানকার বহুকাল-নির্যাতন-পীড়িত কৃষকদেরও এই দশা। যতই দুঃসাধ্য হোক, আর কোনো রাস্তা নেই, পরস্পরের শক্তিকে মনকে সম্মিলিত করবার উপলক্ষ সৃষ্টি করে প্রকৃতিকে শোধন করে নিতে হবে। সমবায়-প্রণালীতে ঋণ দিয়ে নয়, একত্র কর্ম করিয়ে পল্লীবাসীর চিত্তকে ঐক্যপ্রবণ করে তুলে তবে আমরা পল্লীকে বাঁচাতে পারব।[১]

---

[১] রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত।

পরিশিষ্ট

গ্রামবাসীদিগের প্রতি

শ্রীনিকেতন বাৎসরিক উৎসবে সমবেত গ্রামবাসীগণের নিকট কথিত

বন্ধুগণ, আমি এক বৎসর প্রবাসে পশ্চিম মহাদেশের নানা জায়গায় ঘুরে আবার আমার আপন দেশে ফিরে এসেছি। একটি কথা তোমাদের কাছে বলা দরকার— অনেকেই হয়তো তোমরা অনুভব করতে পারবে না কথাটি কতখানি সত্য। পশ্চিমের দেশ-বিদেশ হতে এত দুঃখ আজ প্রকাশ হয়ে পড়েছে ভিতর থেকে— এরকম চিত্র যে আমি দেখব মনে করি নি। তারা সুখে নেই। সেখানে বিপুল পরিমাণে আসবাবপত্র, নানারকম আয়োজন উপকরণের সৃষ্টি হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু গভীর অশান্তি তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে; সুগভীর একটা দুঃখ তাদের সর্বত্র অধিকার করে রয়েছে।

আমার নিজের দেশের উপর কোনো অভিমান আছে বলে এ কথাটি বলছি মনে কোরো না। বস্তুত য়ুরোপের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। পশ্চিম মহাদেশে মানুষ যে সাধনা করছে সে সাধনার যে মূল্য তা আমি অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করি। স্বীকার না করাকে অপরাধ বলে গণ্য করি। সে মানুষকে অনেক ঐশ্বর্য দিয়েছে, ঐশ্বর্যের পন্থা বিস্তৃত করে দিয়েছে। সব হয়েছে। কিন্তু, দুঃখ পাপে। কলি এমন কোনো ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে, তা প্রথমত চোখেই পড়ে না। ক্রমে ক্রমে তার ফল আমরা দেখতে পাই।

আমি সেখানকার অনেক চিন্তাশীল মনীষীর সঙ্গে আলাপ করেছি। তাঁরা উদ্‌বিগ্ন হয়ে ভাবতে বসেছেন— এত বিদ্যা, এত জ্ঞান, এত শক্তি, এত সম্পদ, কিন্তু কেন সুখ নেই, শান্তি নেই। প্রতি মুহূর্তে সকলে শঙ্কিত হয়ে আছে, কখন একটা ভীষণ উপদ্রব প্রলয়কাণ্ড বাধিয়ে দেবে। তাঁরা কী স্থির করলেন বলতে পারি না। এখনো বোধ হয় ভালো করে কোনো কারণ নির্ণয় করতে পারেন নি কিংবা তাঁদের মধ্যে নানান লোক আপন আপন স্বভাব-অনুসারে নানারকম কারণ কল্পনা করছেন। আমিও এসম্বন্ধে কিছু চিন্তা করেছি। আমি যেটা মনে করি সেটা সম্পূর্ণ সত্য কি না জানি না; কিন্তু আমার নিজের বিশ্বাস, এর কারণটি কোথায় তা আমি অনুভব করতে পেরেছি ঠিকমত।

পশ্চিম দেশ যে সম্পদ সৃষ্টি করেছে সে অতিবিপুল প্রচণ্ডশক্তিসম্পন্ন যন্ত্রের যোগে। ধনের বাহন হয়েছে যন্ত্র, আবার সেই যন্ত্রের বাহন হয়েছে মানুষ। হাজার হাজার বহু শতসহস্র। তার পর যান্ত্রিক সম্পৎ-প্রতিষ্ঠার বেদীরূপে তারা বড়ো বড়ো শহর তৈরি করেছে। সে শহরের পেট ক্রমেই বেড়ে চলেছে, তার পরিধি অত্যন্ত বড়ো হয়ে উঠল। নিউইয়র্ক লন্ডন প্রভৃতি শহর বহু গ্রাম-উপগ্রামের প্রাণশক্তি গ্রাস করে তবে একটা বৃহৎ দানবীয় রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে— শহরে মানুষ কখনো ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে না। দূরে যাবার দরকার নেই— কলিকাতা শহর, যেখানে আমরা থাকি, জানি, প্রতিবেশীর সঙ্গে সেখানে প্রতিবেশীর সুখে দুঃখে বিপদে আপদে কোনো সম্বন্ধ নেই। আমরা তাদের নাম পর্যন্ত জানি নে।

মানুষের একটি স্বাভাবিক ধর্ম আছে, সে তার সমাজধর্ম। সমাজের মধ্যে সে যথার্থ আপনার আশ্রয় পায় পরস্পরের যোগে। পরস্পর সাহায্য করে বলে মানুষ যে শক্তি পায় আমি তার কথা বলি না। মানুষের সম্বন্ধ যখন চারি দিকের প্রতিবেশীর মধ্যে, যখন আপন ঘরে এবং আপন ঘরের বাইরে ব্যাপ্ত হয়, তখন সে সম্বন্ধের বৃহত্ত্ব মানুষকে আপনি আনন্দ দেয়। আমাদের গভীর পরিতৃপ্তি সেখানে যেখানে কেবলমাত্র ব্যাবহারিক সম্বন্ধ নয়, সুযোগ-সুবিধার সম্বন্ধ নয়, ব্যাবসার সম্বন্ধ নয়, কিন্তু সকলরকম স্বার্থের অতীত আত্মীয়সম্বন্ধ। সেখানে মানুষ আর-সমস্ত থেকে বঞ্চিত হতে পারে, কিন্তু মানব-আত্মার তৃপ্তি তার প্রচুর পরিমাণে হয়।

বিদেশে আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেছেন—যাকে ওঁরা 'হ্যাপিনেস্' বলেন, আমরা বলি সুখ, এর আধার কোথায়। মানুষ সুখী হয় সেখানেই যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সত্য হয়ে ওঠে—এ কথাটি বলাই বাহুল্য। কিন্তু আজকের দিনে এটা বলার প্রয়োজন হয়েছে। কেননা, এই সম্বন্ধকে বাদ দিয়ে যেখানে ব্যাবসাঘটিত যোগ সেখানে মানুষ এত প্রচুর ফললাভ করে—বাইরের ফল—এত তাতে মুনফা হয়, এতরকম সুযোগ-সুবিধা মানুষ পায় যে মানুষের বলবার সাহস থাকে না, এটাই সভ্যতার চরম বিকাশ নয়। এত পায়! এত তার শক্তি! যন্ত্রযোগে যে শক্তি প্রবল হয়ে ওঠে তার দ্বারা এমনি করে সমস্ত পৃথিবীকে সে অভিভূত করেছে, বিদেশের এত লোককে তার নিজের দাসত্বে ব্রতী করতে পেরেছে—তার এত অহংকার! আর, সেইসঙ্গে এমন অনেক সুযোগ-সুবিধা আছে যা বস্তুত মানুষের জীবনযাত্রার পথে অত্যন্ত অনুকূল। সেগুলি ঐশ্বর্য-যোগে উদ্ভূত হয়েছে। এগুলিকে চরম লাভ বলে মানুষ সহজেই মনে করে। না মনে করে থাকতে পারে না। এর কাছে সে বিকিয়ে দিয়েছে মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস, সে হল মানবসম্বন্ধ।

মানুষ বন্ধুকে চায়, যারা সুখে দুঃখে আমার আপন, যাদের কাছে বসে আলাপ করলে খুশি হই, যাদের বাপ-মার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল, যাদের আমার পিতৃস্থানীয় বলে জেনেছি, যাদের ছেলেরা আমার পুত্রসন্তানের স্থানীয়। এ-সব পরিমণ্ডলীর ভিতর মানুষ আপনার মানবত্বকে উপলব্ধি করে।

এ কথা সত্য, একটা প্রকাণ্ড দানবীয় ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ আপনার শক্তিকে অনুভব করে। সেও বহুমূল্য, আমি তাকে অবজ্ঞা করব না। কিন্তু সেই শক্তি-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যদি মানুষী সম্বন্ধ-বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র কেবলই সংকীর্ণ হতে থাকে তবে সেই শক্তি শক্তিশেল হয়ে উঠে মানুষকে মারে, মারবার অস্ত্র তৈরি করে, মানুষের সর্বনাশ করবার জন্য ষড়যন্ত্র করে, অনেক মিথ্যার সৃষ্টি করে, অনেক নিষ্ঠুরতাকে পালন করে, অনেক বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করে সমাজে। এ হতেই হবে। দরদ যখন চলে যায়, মানুষ অধিকাংশ মানুষকে যখন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মতো দেখতে অভ্যস্ত হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষকে যখন দেখে 'তারা আমার কলের চাকা চালিয়ে আমার কাপড় সস্তা করবে, আমার খাবার জুগিয়ে দেবে, আমার ভোগের উপকরণ সুগম করবে'—এইভাবে যখন মানুষকে দেখতে অভ্যস্ত হয় তখন তারা মানুষকে দেখে না, মানুষের মধ্যে কলকে দেখে।

এখানে চালের কল আছে। সেই কল-দানবের চাকা সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা। ধনী তাদের কি মানুষ মনে করে। তাদের সুখদুঃখের কি হিসেব আছে। প্রতিদিনের পাওনা গুনে দিয়ে তার কাছে কষে রক্ত শুষে কাজ আদায় করে নিচ্ছে। এতে টাকা হয়, সুখও হয়, অনেক হয়, কিন্তু বিকিয়ে যায় মানুষের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানবত্ব। দয়ামায়া, পরস্পরের সহজ আনুকূল্য, দরদ—কিছু থাকে না। কে দেখে তাদের ঘরে কী হয়েছে না হয়েছে। একসময় আমাদের গ্রামে উচ্চনীচের ভেদ ছিল না তা নয়—প্রভু ছিল, দাস ছিল; পণ্ডিত ছিল, অজ্ঞান ছিল; ধনী ছিল, নির্ধন ছিল; কিন্তু সকলের সুখদুঃখের উপর সকলের দৃষ্টি ছিল। পরস্পর সম্মিলিত হয়ে একত্রীভূত একটা জীবনযাত্রা তারা তৈরি করে তুলেছিল। পূজাপার্বণে আনন্দ-উৎসবে সকল সম্বন্ধে প্রতিদিন তারা নানারকমে মিলিত হয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপে এসে গল্প করেছে দাদাঠাকুরের সঙ্গে। যে অন্ত্যজ সেও একপাশে বসে আনন্দের অংশ গ্রহণ করেছে। উপর-নীচ জ্ঞানী-অজ্ঞানীর মাঝখানে যে রাস্তা যে সেতু সেটা খোলা ছিল।

আমি পল্লীর কথা বলছি, কিন্তু মনে রেখো—পল্লীই তখন সব; শহর তখন নগণ্য বলতে চাই না, কিন্তু গৌণ, মুখ্য নয়, প্রধান নয়। পল্লীতে পল্লীতে কত পণ্ডিত, কত ধনী, কত মানী, আপনার পল্লীকে জন্মস্থানকে আপনার করে বাস করেছে। সমস্ত জীবন হয়তো নবাবের ঘরে, দরবারে কাজ করেছে। যা-কিছু সম্পদ তারা পল্লীতে এনেছে। সেই অর্থে টোল চলেছে, পাঠশালা বসেছে, রাস্তাঘাট হয়েছে, অতিথিশালা, যাত্রা-পূজা-অর্চনায় গ্রামের মনপ্রাণ এক হয়ে মিলেছে। গ্রামে আমাদের দেশের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ছিল, তার কারণ গ্রামে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সামাজিক সম্বন্ধ

সেটা সত্য হতে পারে। শহরে তা সম্ভব নয়। অতএব সামাজিক মানুষ আশ্রয় পায় গ্রামে। আর, সামাজিক মানুষের জন্যই তো সব। ধর্মকর্ম সামাজিক মানুষেরই জন্য। লক্ষপতি ক্রোড়পতি টাকার থলি নিয়ে গদিয়ান হয়ে বসে থাকতে পারে। বড়ো বড়ো হিসাবের খাতা ছাড়া তার আর কিছু নেই, তার সঙ্গে কারও সম্বন্ধ নেই। আপনার টাকার গড়খাই করে তার মধ্যে সে বসে আছে, সর্বসাধারণের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কোথায়।

এখনকার সঙ্গে তুলনা করলে অনেক অভাব আমাদের দেশে ছিল। এখন আমরা কলের জল খাই, তাতে রোগের বীজ কম; ভালো ডাক্তার পাই, ডাক্তারখানা আছে; জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক সুযোগ ঘটেছে। আমি তাকে অসম্মান করি নে; কিন্তু আমাদের খুব একটা বড়ো সম্পদ ছিল, সে হচ্ছে আত্মীয়তা। এর চেয়ে বড়ো সম্পদ নেই। এই আত্মীয়তার যেখানে অভাব সেখানে সুখশান্তি থাকতে পারে না।

সমস্ত পশ্চিম মহাদেশে মানুষে মানুষে আত্মীয়তা অত্যন্ত ভাসা-ভাসা। তার গভীর শিকড় নেই। সকলে বলছে, 'আমি ভোগ করব, আমি বড়ো হব, আমার নাম হবে, আমার মুনফা হবে।' যে তা করছে তার কতবড়ো সম্মান। তার ধনশক্তির পরিমাপ করতে গিয়ে সেখানকার লোকের মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত শক্তির এইরকম উপাসনা এমনভাবে আমাদের দেশে দেখি নি। কিছু না, একটা লোক শুধু ঘুষি চালাতে পারে। সে ঘুষির বড়ো ওস্তাদ রাস্তা দিয়ে বেরোল, রাস্তায় ভিড় জমে গেল। খবর এল সিনেমার নটী লন্ডনের রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে আসছে, গাড়ির ভিতর থেকে চকিতে তাকে দেখবে বলে জনতায় রাস্তা নিরেট হয়ে উঠল। আমাদের দেশে মহদাশয় যাঁকে বলি তিনি এলে আমরা সকলে তাঁর চরণধুলো নেব। মহাত্মা গান্ধী যদি আসেন দেশসুদ্ধ লোক খেপে যাবে। তাঁর না আছে অর্থ, না আছে বাহুবল, কিন্তু আছে হৃদয়, আছে আধ্যাত্মিক শক্তি। আমি যতদূর জানি তিনি ঘুষি মারতে জানেন না, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে তিনি বড়ো করে স্বীকার করেছেন; আপনাকে তিনি স্বতন্ত্র করে রাখেন নি, তিনি আমাদের সকলের, আমরা সকলে তাঁর। ব্যস্, হয়ে গেল, এর চেয়ে বেশি আমরা কিছু বুঝি নে। তাঁর চেয়ে অনেক বিদ্বান, অনেক জ্ঞানী, অনেক ধনী আছে; কিন্তু আমাদের দেশ দেখবে আত্মদানের ঐশ্বর্য। এ কি কম কথা। এর থেকে বুঝি, আমাদের দেশের লোক কী চায়। পাণ্ডিত্য নয়, ঐশ্বর্য নয়, আর কিছু নয়, চায় মানুষের আত্মার সম্পদ। কিন্তু দিনে দিনে পরিবর্তন হয়ে এসেছে। আমি গ্রামে অনেকদিন কাটিয়েছি, কোনোরকম চাটুবাক্য বলতে চাই নে। গ্রামের যে মূর্তি দেখেছি সে অতি কুৎসিত। পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ ছলনা বঞ্চনা বিচিত্র আকারে প্রকাশ পায়। মিথ্যা মকদ্দমার সাংঘাতিক জালে পরস্পরকে জড়িয়ে মারে। সেখানে দুর্নীতি কতদূর শিকড় গেড়েছে তা চক্ষে দেখেছি। শহরে কতকগুলি সুবিধা আছে, গ্রামে তা নেই; গ্রামের যেটা আপন জিনিস ছিল তাও আজ সে হারিয়েছে।

মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা নিয়ে আজ এসেছি গ্রামবাসী তোমাদের কাছে। পূর্বে তোমরা সমাজবন্ধনে এক ছিলে, আজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরকে কেবল আঘাত করছ। আর-একবার সম্মিলিত হয়ে তোমাদের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। বাহিরের আনুকূল্যের অপেক্ষা কোরো না। শক্তি তোমাদের মধ্যে আছে জেনেই সেই শক্তির আত্মবিস্মৃতি আমরা ঘোচাতে ইচ্ছা করেছি। কেননা তোমাদের সেই শক্তির উপর সমস্ত দেশের দাবি আছে। ভিত যতই যাচ্ছে ধসে উপরের তলায় ফাটল ধরছে—বাইরে থেকে পলস্তারা দিয়ে বেশি দিন তাকে বাঁচিয়ে রাখা চলবে না।

এসো তোমরা, প্রার্থীভাবে নয়, কৃতীভাবে। আমাদের সহযোগী হও, তা হলেই সার্থক হবে আমাদের এই উদ্যোগ। গ্রামের সামাজিক প্রাণ সুস্থ হয়ে সবল হয়ে উঠুক। গানে গীতে কাব্যে কথায় অনুষ্ঠানে আনন্দে শিক্ষায় দীক্ষায় চিত্ত জাগুক। তোমাদের দৈন্য দুর্বলতা আত্মাবমাননা ভারতবর্ষের বুকের উপর প্রকাণ্ড বোঝা হয়ে চেপে রয়েছে। আর-সকল দেশ এগিয়ে চলেছে, আমরা অজ্ঞানে অশিক্ষায় স্থাবর হয়ে পড়ে আছি। এ সমস্তই দূর হয়ে যাবে যদি নিজের নিজের শক্তি-

সম্বলকে সমবেত করতে পারি। আমাদের এই শ্রীনিকেতনে জনসাধারণের সেই শক্তিসমবায়ের সাধনা।

১৩৩৭

পল্লীসেবা

শ্রীনিকেতনের উৎসবে কথিত

বেদে অনন্তস্বরূপকে বলেছেন আবিঃ, প্রকাশস্বরূপ। তাঁর প্রকাশ আপনার মধ্যেই সম্পূর্ণ। তাঁর কাছে মানুষের প্রার্থনা এই যে : আবিরাবীর্ম এধি! হে আবি, আমার মধ্যে তোমার আবির্ভাব হোক। অর্থাৎ, আমার আত্মায় অনন্তস্বরূপের প্রকাশ চাই। জ্ঞানে প্রেমে কর্মে আমার অভিব্যক্তি অনন্তের পরিচয় দেবে, এতেই আমার সার্থকতা। আমাদের চিত্তবৃত্তি থেকে, ইচ্ছাশক্তি থেকে, কর্মোদ্যম থেকে, অপূর্ণতার আবরণ ক্রমে ক্রমে মোচন করে অনন্তের সঙ্গে নিজের সাধর্ম্য প্রমাণ করতে থাকব এই হচ্ছে মানুষের ধর্মসাধনা।

অন্য জীবজন্তু যেমন অবস্থায় সংসারে এসেছে সেই অবস্থাতেই তাদের পরিণাম। অর্থাৎ, প্রকৃতিই তাদের প্রকাশ করেছে এবং সেই প্রকৃতির প্রবর্তনা মেনেই তারা প্রাণযাত্রা নির্বাহ করে, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু, নিজের ভিতর থেকে নিজের অন্তরতর সত্যকে নিরন্তর উদ্ঘাটিত করতে হবে নিজের উদ্যমে—মানুষের এই চরম অধ্যবসায়। সেই আত্মোপলব্ধ সত্যেই তার প্রকাশ, প্রকৃতিনিয়ন্ত্রিত প্রাণযাত্রায় নয়। তাই তার দুরূহ প্রার্থনা এই যে, সকল দিকেই অনন্তকে যেন প্রকাশ করি। তাই সে বলে, ভূমৈব সুখং, মহত্ত্বেই সুখ, নাল্পে সুখমস্তি, অল্প-কিছুতেই সুখ নেই।

মানুষের পক্ষে তাই সকলের চেয়ে দুর্গতি যখন আপনার জীবনে সে আপন অন্তর্নিহিত ভূমাকে প্রকাশ করতে পারলে না—বাধাগুলো শক্ত হয়ে রইল। এই তার পক্ষে মৃত্যুর চেয়ে বড়ো মৃত্যু। আহারে বিহারে ভোগে বিলাসে সে পরিপুষ্ট হতে পারে; কিন্তু জ্ঞানের দীপ্তিতে, ত্যাগের শক্তিতে, প্রেমের বিস্তারে, কর্মচেষ্টার সাহসে সে যদি আপনার প্রবুদ্ধ মুক্তস্বরূপ কিছু পরিমাণেও প্রকাশ করতে না পারে তবে তাকেই বলে 'মহতী বিনষ্টিঃ'। সে বিনষ্টি জীবের মৃত্যুতে নয়, আত্মার অপ্রকাশে।

সভ্যতা যাকে বলি তার এক প্রতিশব্দ হচ্ছে 'ভূমাকে প্রকাশ'। মানুষের ভিতরকার যে 'নিহিতার্থ' যা তার গভীর সত্য, সভ্যতায় তারই আবিষ্কার চলছে। সভ্য মানুষের শিক্ষাবিধি এত ব্যাপক, এত দুরূহ এইজন্যেই। তার সীমা কেবলই অগ্রসর হয়ে চলেছে; সভ্য মানুষের চেষ্টা প্রকৃতিনির্দিষ্ট কোনো গণ্ডিকে চরম বলতে চাচ্ছে না।

মানুষের মধ্যে নিত্যপ্রসার্যমাণ সম্পূর্ণতার যে আকাঙ্ক্ষা তার দুটো দিক, কিন্তু তারা পরস্পরযুক্ত। একটা ব্যক্তিগত পূর্ণতা, আর-একটা সামাজিক, এদের মাঝখানে ভেদ নেই। ব্যক্তিগত উৎকর্ষের ঐকান্তিকতা অসম্ভব। মানবলোকে যাঁরা শ্রেষ্ঠ পদবী পেয়েছেন তাঁদের শক্তি সকলের শক্তির ভিতর দিয়েই ব্যক্ত, তা পরিচ্ছিন্ন নয়। মানুষ যেখানে ব্যক্তিগতভাবে বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের সহযোগিতা যেখানে নিবিড় নয়, সেইখানেই বর্বরতা। বর্বর একা একা শিকার করে, খণ্ড খণ্ড ভাবে জীবিকার উপযুক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, সেই জীবিকার ভোগ অত্যন্ত ছোটো সীমার মধ্যে। বহুজনের চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষসহযোগে নিজের চিত্তের উৎকর্ষ, বহুজনের শক্তিকে সংযুক্ত করে নিজের শক্তি, বহুজনের সম্পদকে সম্মিলিত করার দ্বারা নিজের সম্পদ সুপ্রতিষ্ঠিত করাই হল সভ্য মানবের লক্ষ্য।

উপনিষৎ বলেন, আমরা যখন আপনার মধ্যে অন্যকে ও অন্যের মধ্যে আপনাকে পাই তখনই

সত্যকে পাই—ন ততো বিজুগুপ্সতে—তখন আর গোপনে থাকতে পারি নে, তখনই আমাদের প্রকাশ। সভ্যতায় মানুষ প্রকাশমান, বর্বরতায় মানুষ অপ্রকাশিত। পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের আত্মোপলব্ধি যতই সত্য হতে থাকে ততই সভ্যতার যথার্থ স্বরূপ পরিস্ফুট হয়। ধর্মের নামে, কর্মের নামে, বৈষয়িকতার নামে, স্বাদেশিকতার নামে, যেখানেই মানুষ মানবলোকে ভেদ সৃষ্টি করেছে সেইখানেই দুর্গতির কারণ গোচরে অগোচরে বল পেতে থাকে। সেখানে মানব আপন মানবধর্মকে আঘাত করে, সেই হচ্ছে আত্মঘাতের প্রকৃষ্ট পন্থা। ইতিহাসে যুগে যুগে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সভ্যতা-বিনাশের কারণ সন্ধান করলে, একটিমাত্র কারণ পাওয়া যায়, সে হচ্ছে মানবসম্বন্ধের বিকৃতি বা ব্যাঘাত। যারা ক্ষমতাশালী ও যারা অক্ষম তাদের মধ্যেকার ব্যবধান প্রশস্ত হয়ে সেখানে সামাজিক সামঞ্জস্য নষ্ট হয়েছে। সেখানে প্রভুর দলে, দাসের দলে, ভোগীর দলে, অভুক্তের দলে, সমাজকে দ্বিখণ্ডিত করে সমাজদেহে প্রাণপ্রবাহের সঞ্চরণকে অবরুদ্ধ করেছে; তাতে এক অঙ্গের অতিপুষ্টি এবং অন্য অঙ্গের অতিশীর্ণতায় রোগের সৃষ্টি হয়েছে; পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই এই ছিদ্র দিয়ে আজ যমের চর আনাগোনা করছে। আমাদের দেশে তার প্রবেশপথ অন্য দেশের চেয়ে আরও যেন অবারিত। এই দুর্ঘটনা সম্প্রতি ঘটেছে।

একদিন আমাদের দেশে পল্লীসমাজ সজীব ছিল। এই সমাজের ভিতর দিয়েই ছিল সমস্ত দেশের যোগবন্ধন. আমাদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা ধর্মকর্মের প্রবাহ পল্লীতে পল্লীতে ছিল সঞ্চারিত। দেশের বিরাট চিত্ত পল্লীতে পল্লীতে প্রসারিত হয়ে আশ্রয় পেয়েছে. প্রাণ পেয়েছে। এ কথা সত্য যে. আধুনিক অনেক জ্ঞানবিজ্ঞান সুযোগ-সুবিধা থেকে আমরা বঞ্চিত ছিলুম। তখন আমাদের চেষ্টার পরিধি ছিল সংকীর্ণ, বৈচিত্র্য ছিল স্বল্প, জীবনযাত্রার আয়োজনে উপকরণে অভাব ছিল বিস্তর। কিন্তু, সামাজিক প্রাণক্রিয়ার যোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন। এখন তা নেই। নদীতে স্রোত যখন বহমান থাকে তখন সেই স্রোতের দ্বারাই এ-পারে ও-পারে, এ-দেশে ও-দেশে, আনাগোনা-দেনাপাওনার যোগ রক্ষা হয়। জল যখন শুকিয়ে যায় তখন এই নদীরই খাত বিষম বিঘ্ন হয়ে ওঠে। তখন এক কালের পথটাই হয় অন্য কালের অপথ। বর্তমানে তাই ঘটেছে।

যাদের আমরা ভদ্রসাধারণ নাম দিয়ে থাকি তারা যে বিদ্যালাভ করে, তাদের যা আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা, তারা যে-সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে, সে-সব হল মরা নদীর শুষ্ক গহ্বরের এক পাড়িতে—তার অপর পাড়ির সঙ্গে জ্ঞান-বিশ্বাস আচার-অভ্যাস দৈনিক জীবনযাত্রায় দুস্তর দূরত্ব। গ্রামের লোকের না আছে বিদ্যা, না আছে আরোগ্য, না আছে সম্পদ, না আছে অন্নবস্ত্র। ও দিকে যারা কলেজে পড়ে, ওকালতি করে, ডাক্তারি করে, ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেয়, তারা রয়েছে দ্বীপের মধ্যে; চারি দিকে অতলস্পর্শ বিচ্ছেদ।

যে স্নায়ুজালের যোগে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেদনা দেহের মর্মস্থানে পৌঁছয়, সমস্ত দেহের আত্মবোধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বোধের সম্মিলনে সম্পূর্ণ হয়, তার মধ্যে যদি বিচ্ছিন্নতা ঘটে তবে তো মরণদশা। সেই দশা আমাদের সমাজে। দেশকে মুক্তিদান করবার জন্যে আজ যারা উৎকট অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত এমন-সব লোকের মধ্যেও দেখা যায়, সমাজের মধ্যে গুরুতর ভেদ যেখানে, যেখানে পক্ষাঘাতের লক্ষণ, সেখানে তাঁদের দৃষ্টিই পড়ে না। থেকে থেকে বলে ওঠেন, কিছু করা চাই। কিন্তু কণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে হাত এগোয় না। দেশ সম্বন্ধে আমাদের যে উদ্যোগ তার থেকে দেশের লোক বাদ পড়ে। এটা আমাদের এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, এর বিপুল বিড়ম্বনা সম্বন্ধে আমাদের বোধ নেই। একটা তার দৃষ্টান্ত দিই।

আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষাবিধি বলে একটা পদার্থের আবির্ভাব হয়েছে। তারই নামে স্কুল কলেজ ব্যাঙের ছাতার মতো ইতস্তত মাথা তুলে উঠেছে। এমন ভাবে এটা তৈরি যে, এর আলো কলেজি মণ্ডলের বাইরে অতি অল্পই পৌঁছয়—সূর্যের আলো চাঁদের আলোয় পরিণত হয়ে যতটুকু বিকীর্ণ হয় তার চেয়েও কম। বিদেশী ভাষার স্থূল বেড়া তার চার দিকে। মাতৃভাষার

যোগে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে যখন চিন্তা করি সে চিন্তার সাহস অতি অল্প। সে যেন অন্তঃপুরিকা বধূর মতোই ভীরু। আঙিনা পর্যন্তই তার অধিকার, তার বাইরে চিবুক পেরিয়ে তার ঘোমটা নেমে পড়ে। মাতৃভাষার আমল প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যেই, অর্থাৎ সে কেবল শিশুশিক্ষারই যোগ্য— অর্থাৎ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা শেখবার সুযোগ নেই, সেই বিরাট জনসংঘকে বিদ্যার অধিকার সম্বন্ধে চিরশিশুর মতোই গণ্য করা হয়েছে। তারা কোনোমতেই পুরো মানুষ হয়ে উঠবে না, অথচ স্বরাজ সম্বন্ধে তারা পুরো মানুষের অধিকার লাভ করবে, চোখ বুজে এইটে আমরা কল্পনা করি।

জ্ঞানলাভের ভাগ নিয়ে দেশের অধিকাংশ জনমণ্ডলী সম্বন্ধে এতবড়ো অনশনের ব্যবস্থা আর-কোনো নবজাগ্রত দেশে নেই— জাপানে নেই, পারস্যে নেই, তুরস্কে নেই, ইজিপ্টে নেই। যেন মাতৃভাষা একটা অপরাধ, যাকে খৃস্টান ধর্মশাস্ত্রে বলে আদিম পাপ। দেশের লোকের পক্ষে মাতৃভাষাগত শিক্ষার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের সর্বাঙ্গসম্পূর্ণতা আমরা কল্পনার বাইরে ফেলে রেখেছি। 'ইংরেজি হোটেলওয়ালার দোকান ছাড়া আর কোথাও দেশের লোকের পুষ্টিকর অন্ন মিলবেই না' এমন কথা বলাও যা আর 'ইংরেজি ভাষা ছাড়া মাতৃভাষার যোগে জ্ঞানের সম্যক সাধনা হতেই পারবে না' এও বলা তাই।

এই উপলক্ষে এ কথা মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক সমস্ত বিদ্যাকে জাপানি ভাষার সম্পূর্ণ আয়ত্তগম্য করে তবে জাপানি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সত্য ও সম্পূর্ণ করে তুলেছে। তার কারণ, শিক্ষা বলতে জাপান সমস্ত দেশের শিক্ষা বুঝেছে— ভদ্রলোক বলে এক সংকীর্ণ শ্রেণীর শিক্ষা বোঝে নি। মুখে আমরা যাই বলি, দেশ বলতে আমরা যা বুঝি সে হচ্ছে ভদ্রলোকের দেশ। জনসাধারণকে আমরা বলি, ছোটোলোক; এই সংজ্ঞাটা বহুকাল থেকে আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। ছোটোলোকদের পক্ষে সকলপ্রকার মাপকাঠিই ছোটো। তারা নিজেও সেটা স্বীকার করে নিয়েছে। বড়ো মাপের কিছুই দাবি করবার ভরসা তাদের নেই। তারা ভদ্রলোকের ছায়াচর, তাদের প্রকাশ অনুজ্জ্বল, অথচ দেশের অধিকাংশই তারা, সুতরাং দেশের অন্তত বারো-আনা অনালোকিত। ভদ্রসমাজ তাদের স্পষ্ট করে দেখতেই পায় না, বিশ্বসমাজের তো কথাই নেই।

রাষ্ট্রীয় আলোচনার মত্ত অবস্থায় আমরা মুখে যাই কিছু বলি-না কেন, দেশাভিমান যত তারস্বরে প্রকাশ করি-না কেন, আমাদের দেশ প্রকাশহীন হয়ে আছে বলেই কর্মের পথ দিয়ে দেশের সেবায় আমাদের এত ঔদাসীন্য। যাদের আমরা ছোটো করে রেখেছি মানবস্বভাবের কৃপণতাবশত তাদের আমরা অবিচার করেই থাকি। তাদের দোহাই দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে অর্থসংগ্রহ করি; কিন্তু তাদের ভাগে পড়ে বাক্য, অর্থটা অবশেষে আমাদের দলের লোকের ভাগ্যেই এসে জোটে। মোট কথাটা হচ্ছে, দেশের যে অতিক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি বিদ্যা ধন মান, সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ লোকের সঙ্গে পঁচানব্বই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমরা এক দেশে আছি, অথচ আমাদের এক দেশ নয়।

শিশুকালে আমাদের ঘরে যে সেজের দীপ জ্বলত তার এক অংশে অল্প তেল অপর অংশে অনেকখানি জল ছিল। জলের অংশ ছিল নীচে, তেলের অংশ ছিল উপরে। আলো মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলত, অনেকখানি ছড়াত ধোঁয়া। এটা কতকটা আমাদের সাবেক কালের অবস্থা। ভদ্রসাধারণ এবং ইতরসাধারণের সম্বন্ধটা এইরকমই ছিল। তাদের মর্যাদা সমান নয় কিন্তু তবুও তারা উভয়ে একত্র মিলে একই আলো জ্বালিয়ে রেখেছিল। তাদের ছিল একটা অখণ্ড আধার। আজকের দিনে তেল গিয়েছে এক দিকে, জল গিয়েছে আর-এক দিকে; তেলের দিকে আলোর উপাদান অতি সামান্য, জলের দিকে একেবারেই নেই।

বয়স যখন হল, ঘরে এল কেরোসিনের ল্যাম্প বিদেশ থেকে; তাতে সবটাতেই এক তেল, সেই তেলের সমস্তটার মধ্যেই উদ্দীপনের শক্তি। আলোর উজ্জ্বলতাও বেশি। এর সঙ্গে য়ুরোপীয় সভ্যসমাজের তুলনা করা যেতে পারে। সেখানে এক জাতেরই বিদ্যা ও শক্তি দেশের সকল লোকের

মধ্যেই ব্যাপ্ত। সেখানে উপরিতল নিম্নতল আছে, সেই উপরিতলের কাছেই বাতি দীপ্ত হয়ে জ্বলে, নীচের তল অদীপ্ত। কিন্তু, সেই ভেদ অনেকটা আকস্মিক; সমস্ত তেলের মধ্যেই দীপ্তির শক্তি আছে। সে হিসাবে জ্যোতির জাতিভেদ নেই; নীচের তেল যদি উপরে ওঠে তা হলে উজ্জ্বলতার তারতম্য ঘটে না। সেখানে নীচের দলের পক্ষে উপরের দলে উত্তীর্ণ হওয়া অসাধ্য নয়; সেই চেষ্টা নিয়তই চলছে।

আর-এক শ্রেণীর বাতি আছে তাকে বলি বিজলি বাতি। তার মধ্যে তারের কুণ্ডলী আলো দেয়, তার আগাগোড়াই সমান প্রদীপ্ত। তার মধ্যে দীপ্ত-অদীপ্তের ভেদ নেই; এই আলো দিবালোকের প্রায় সমান। য়ুরোপীয় সমাজে এই বাতি জ্বালাবার উদ্যোগ সব দেশে এখন চলছে না; কিন্তু কোথাও কোথাও শুরু হয়েছে— এর যন্ত্রটাকে পাকা করে তুলতে হয়তো এখনো অনেক ভাঙচুর করতে হবে, যন্ত্রের মহাজন কেউ কেউ হয়তো দেউলে হয়ে যেতেও পারে, কিন্তু পশ্চিম মহাদেশে এই দিকে একটা ঝোঁক পড়েছে সে কথা আর গোপন করে রাখবার জো নেই। এইটে হচ্ছে প্রকাশের চেষ্টা, মানুষের অন্তর্নিহিত ধর্ম; এই ধর্মসাধনায় সকল মানুষই অব্যাহত অধিকার লাভ করবে এইরকমের একটা প্রয়াস ক্রমশই যেন ছড়িয়ে পড়ছে।

কেবল আমাদের হতভাগ্য দেশে দেখি, মাটির প্রদীপে যে আলো একদিন এখানে জ্বলেছিল তাতেও আজ বাধা পড়ল। আজ আমাদের দেশের ডিগ্রিধারীরা পল্লীর কথা যখন ভাবেন তখন তাদের জন্যে অতি সামান্য ওজনে কিছু করাকেই যথেষ্ট বলে মনে করেন। যতক্ষণ আমাদের এইরকমের মনোভাব ততক্ষণ পল্লীর লোকেরা আমাদের পক্ষে বিদেশী। এমন-কি, তার চেয়েও তারা বেশি পর, তার কারণ এই— আমরা স্কুলে কলেজে যেটুকু বিদ্যা পাই সে বিদ্যা য়ুরোপীয়। সেই বিদ্যার সাহায্যে য়ুরোপীয়কে বোঝা ও য়ুরোপীয়ের কাছে নিজেকে বোঝানো আমাদের পক্ষে সহজ। ইংলন্ড ফ্রান্স জার্মানির চিত্তবৃত্তি আমাদের কাছে সহজে প্রকাশমান; তাদের কাব্য গল্প নাটক যা আমরা পড়ি সে আমাদের কাছে হেঁয়ালি নয়; এমন-কি, যে কামনা, যে তপস্যা তাদের, আমাদের কামনা-সাধনাও অনেক পরিমাণে তারই পথ নিয়েছে। কিন্তু, যারা মা-ষষ্ঠী মনসা ওলাবিবি শীতলা ঘেঁটু রাহু শনি ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য গুপ্তপ্রেস-পঞ্জিকা পাণ্ডা পুরুতের আওতায় মানুষ হয়েছে তাদের থেকে আমরা খুব বেশি উপরে উঠেছি তা নয়, কিন্তু দূরে সরে গিয়েছি— পরস্পরের মধ্যে ঠিকমত সাড়া চলে না। তাদের ঠিকমত পরিচয় নেবার উপযুক্ত কৌতূহল পর্যন্ত আমাদের নেই।

আমাদের কলেজে যারা ইকনমিক্‌স্‌ এথ্‌নোলজি পড়ে তারা অপেক্ষা করে থাকে য়ুরোপীয় পণ্ডিতের— পাশের গ্রামের লোকের আচারবিচার বিধিব্যবস্থা জানবার জন্যে। ওরা ছোটোলোক, আমাদের মনে মানুষের প্রতি যেটুকু দরদ আছে তাতে করে ওরা আমাদের কাছে দৃশ্যমান নয়। পশ্চিম মহাদেশের নানাপ্রকার 'মুভ্‌মেন্ট্‌'এর পূর্বাপর ইতিহাস এঁরা পড়েছেন। আমাদের জন-সাধারণদের মধ্যেও নানা মুভ্‌মেন্ট্‌ চলে আসছে, কিন্তু সে আমাদের শিক্ষিত-সাধারণের অগোচরে। জানবার জন্যে কোনো ঔৎসুক্য নেই; কেননা তাতে পরীক্ষা-পাসের মার্কা মেলে না। দেশের সাধারণের মধ্যে আউল বাউল কত সম্প্রদায় আছে, সেটা একেবারে অবজ্ঞার বিষয় নয়; ভদ্রসমাজের মধ্যে নূতন নূতন ধর্মপ্রচেষ্টার চেয়ে তার মধ্যে অনেক বিষয়ে গভীরতা আছে; সে-সব সম্প্রদায়ের যে সাহিত্য তাও শ্রদ্ধা করে রক্ষা করবার যোগ্য— কিন্তু ওরা ছোটোলোক।

সকল দেশেই নৃত্য কলাবিদ্যার অন্তর্গত, ভাবপ্রকাশের উপায়রূপে শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে। আমাদের দেশে ভদ্রসমাজে তা লোপ পেয়ে গেছে বলে আমরা ধরে রেখেছি সেটা আমাদের নেই। অথচ জনসাধারণের নৃত্যকলা নানা আকারে এখনও আছে— কিন্তু ওরা ছোটোলোক। অতএব ওদের যা আছে সেটা আমাদের নয়। এমন-কি, সুন্দর সুনিপুণ হলেও সেটা আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয়। ক্রমে হয়তো এ-সমস্তই লোপ হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু সেটাকে আমরা দেশের স্মৃতি বলেই গণ্য করি নে, কেননা বস্তুতই ওরা আমাদের দেশে নেই।

কবি বলেছেন, 'নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে!' তিনি এইভাবেই বলেছিলেন যে, আমরা বিদেশীর

শাসনে আছি। তার চেয়ে সত্যতর গভীরতর ভাবে বলা চলে যে, আমাদের দেশে আমরা পরবাসী, অর্থাৎ আমাদের জাতের অধিকাংশের দেশ আমাদের দেশ নয়। সে দেশ আমাদের অদৃশ্য, অস্পৃশ্য। যখন দেশকে মা বলে আমরা গলা ছেড়ে ডাকি তখন মুখে যাই বলি মনে মনে জানি, সে মা গুটি-কয়েক আদুরে ছেলের মা। এই করেই কি আমরা বাঁচব। শুধু ভোট দেবার অধিকার পেয়েই আমাদের চরম পরিত্রাণ?

এই দুঃখেই দেশের লোকের গভীর ঔদাসীন্যের মাঝখানে, সকল লোকের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে, এখানে এই গ্রাম-কয়টির মধ্যে আমরা প্রাণ-উদ্‌বোধনের যজ্ঞ করেছি। যাঁরা কোনো কাজই করেন না তাঁরা অবজ্ঞার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, এতে কতটুকু কাজই বা হবে। স্বীকার করতেই হবে, তেত্রিশ কোটির ভার নেবার যোগ্যতা আমাদের নেই। কিন্তু, তাই বলে লজ্জা করব না। কর্মক্ষেত্রের পরিধি নিয়ে গৌরব করতে পারব এ কল্পনাও আমাদের মনে নেই, কিন্তু তার সত্য নিয়ে যেন গৌরব করতে পারি। কখনো আমাদের সাধনায় যেন এ দৈন্য না থাকে যে, পল্লীর লোকের পক্ষে অতি অল্পটুকুই যথেষ্ট। ওদের জন্যে উচ্ছিষ্টের ব্যবস্থা করে যেন ওদের অশ্রদ্ধা না করি। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্‌। পল্লীর কাছে আমাদের আত্মোৎসর্গের যে নৈবেদ্য তার মধ্যে শ্রদ্ধার যেন কোনো অভাব না থাকে।

১৩৩৭

কোরীয় যুবকের রাষ্ট্রিক মত

কোরীয় যুবকটি সাধারণ জাপানির চেয়ে মাথায় বড়ো। ইংরেজি সহজে বলেন, উচ্চারণে জড়তা নেই।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কোরিয়ায় জাপানি রাষ্ট্রশাসন তোমার পছন্দ নয়?'

'না।'

'কেন। জাপানি আমলে তোমাদের দেশে পূর্বেকার চেয়ে কি ব্যবস্থা ভালো হয় নি।'

'তা হয়েছে। কিন্তু আমাদের যে দুঃখ সেটা সংক্ষেপে বলতে গেলে দাঁড়ায়, জাপানি রাজত্ব ধনিকের রাজত্ব। কোরিয়া তার মুনফার উপায়, তার ভোজ্যের ভাণ্ডার। প্রয়োজনের আসবাবকে মানুষ উজ্জ্বল করে রাখে, কারণ সেটা তার আপন সম্পত্তি, তাকে নিয়ে তার অহমিকা। কিন্তু মানুষ তো থালা ঘটি বাটি কিংবা গাড়োয়ানের ঘোড়া বা গোয়ালের গোরু নয় যে বাহ্য যত্ন করলেই তার পক্ষে যথেষ্ট।'

'তুমি কি বলতে চাও জাপান যদি কোরিয়ার সঙ্গে প্রধানত আর্থিক সম্বন্ধ না পাতিয়ে তোমাদের 'পরে রাজপ্রতাপের সম্বন্ধ খাটাত, অর্থাৎ বৈশ্যরাজ না হয়ে ক্ষত্রিয়রাজ হত, তা হলে তোমাদের পরিতাপের কারণ থাকত না?'

'আর্থিক সম্বন্ধের যোগে বিরাট জাপানের সহস্রমুখী ক্ষুধা আমাদের শোষণ করে; কিন্তু রাজপ্রতাপের সম্বন্ধ ব্যক্তিগত, সীমাবন্ধ— তার বোঝা হালকা। রাজার ইচ্ছা কেবল যদি শাসনের ইচ্ছা হয়, শোষণের ইচ্ছা না হয়, তবে তাকে স্বীকার করেও মোটের উপর সমস্ত দেশ আপন স্বাতন্ত্র্য ও আত্মসম্মান রাখতে পারে। কিন্তু ধনিকের শাসনে আমাদের গোটা দেশ আর-একটি গোটা দেশের পণ্যদ্রব্যে পরিণত। আমরা লোভের জিনিস; আত্মীয়তার না, গৌরবের না।'

'এই-যে কথাগুলি ভাবছ এবং বলছ, এই-যে সমষ্টিগতভাবে জাতীয় আত্মসম্মানের জন্যে তোমার আগ্রহ, তার কি কারণ এই নয় যে, জাপানের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তোমরা আধুনিক যুগের রাষ্ট্রিক শিক্ষায় দীক্ষিত?'

কোরীয় যুবক দ্বিধার ভাবে চুপ করে রইলেন।

আমি বললুম, 'চেয়ে দেখো সামনে ঐ চীনদেশ। সেখানে স্বজাতীয় আত্মসম্মানবোধ শিক্ষার অভাবে দেশের জনসাধারণের মধ্যে অপ্রবুদ্ধ। তাই দেখি, ব্যক্তিগত ক্ষমতাপ্রাপ্তির দুরাশায় সেখানে

কয়েকজন লুব্ধ লোকের হানাহানি-কাটাকাটির ঘূর্ণিপাক। এই নিয়ে লুটপাট-অত্যাচারে, ডাকাতের হাতে, সৈনিকের হাতে, হতভাগ্য দেশ ক্ষতবিক্ষত, রক্তে প্লাবিত, অসহায়ভাবে দিনরাত সন্ত্রস্ত। শিক্ষার জোরে যেখানে সাধারণ লোকের মধ্যে স্বাধিকারবোধ স্পষ্ট না হয়েছে সেখানে স্বদেশী বা বিদেশী দুরাকাঙ্ক্ষীদের হাতে তাদের নির্যাতন ঠেকাবে কিসে। সে অবস্থায় তারা ক্ষমতা-লোলুপের স্বার্থসাধনের উপকরণমাত্র হয়ে থাকে। তুমি তোমার দেশকে ধনীর উপকরণদশাগ্রস্ত বলে আক্ষেপ করেছিলে, সেই পরের উপকরণদশা তাদের কিছুতেই ঘোচে না যারা মূঢ়, যারা কাপুরুষ, ভাগ্যের মুখপ্রত্যাশী, যারা আত্মকর্তৃত্বে আস্থাবান নয়। কোরিয়ার অবস্থা জানি নে, কিন্তু সেখানে নবযুগের শিক্ষার প্রভাবে যদি সাধারণের মধ্যে স্বাধিকারবোধের অংকুরমাত্র উদ্গত হয়ে থাকে তবে সে শিক্ষা কি জাপানের কাছ থেকেই পাও নি?'

'কার কাছ থেকে পেয়েছি তাতে কী আসে যায়। শত্রু হোক, মিত্র হোক, যে-কেউ আমাদের যে উপায়ে জাগিয়ে তুলুক-না কেন, জাগরণের যা ধর্ম তার তো কাজ চলবে।'

'সে কথা আমি মানি, সে তর্ক আমার নয়। বিচারের বিষয় এই যে, তোমার দেশে শিক্ষাবিস্তার এতটা হয়েছে কি না যাতে দেশের অধিকাংশ লোক স্বাধিকার উপলব্ধি এবং সেটা যথার্থভাবে দাবি করতে পারে। যদি তা না হয়ে থাকে তবে সেখানে বিদেশী নিরস্ত হলেও সর্বসাধারণের যোগে আত্মশাসন ঘটবে না, ঘটবে কয়েকজনের দৌরাত্ম্যে আত্মবিপ্লব। এই স্বল্প লোকের ব্যক্তিগত স্বার্থ-বোধকে সংযত করবার একমাত্র উপায় বহু লোকের সমষ্টিগত স্বার্থবোধের উদ্‌বোধন।'

'যে পরিমাণ ও যে প্রকৃতির শিক্ষায় বৃহৎ ভাবে সমস্ত দেশের চৈতন্য হতে পারে সেটা আমরা সম্পূর্ণভাবে পরের হাত থেকে প্রত্যাশা করব কেমন করে?'

'তোমরা শিক্ষিত লোকেরা দেশে সেই শিক্ষার অভাব যদি অনুভব কর তবে এই শিক্ষাবিস্তারের সাধনাকেই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্যরূপে নিজেরাই গ্রহণ করবে না কেন। দেশকে বাঁচাতে গেলে কেবল তো ভাবুকতা নয়, জ্ঞানের প্রয়োজন করে। আমার মনে আরও একটি চিন্তার বিষয় আছে। ভৌগোলিক ঐতিহাসিক বা জাতীয়প্রকৃতিগত কারণে কোরিয়া অনেক কাল থেকেই দুর্বল। আজকের দিনে যুদ্ধবিগ্রহ যখন বৈজ্ঞানিক-সাধনা-সাধ্য ও প্রভূতব্যয়সাধ্য তখন জাপান হতে নিজের শক্তিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তোমরা নিজের শক্তিতেই কি আত্মরক্ষা করতে পার—ঠিক করে বলো।'

'পারি নে সে কথা স্বীকার করতেই হবে।'

'যদি না পার তবে এ কথাও মানতে হবে যে, দুর্বল কেবল নিজের বিপদ নয়, অন্যেরও বিপদ ঘটায়। দুর্বলতার গহ্বর-কেন্দ্রে প্রবলের দুরাকাঙ্ক্ষা আপনিই দূর থেকে আকৃষ্ট হয়ে আবর্তিত হতে থাকে। সওয়ার সিংহের পিঠে চড়ে না; ঘোড়াকেই লাগামে বাঁধে। মনে করো, রাশিয়া যদি কোরিয়ায় ধ্বজা গেড়ে বসে তবে সেটা, কেবল কোরিয়ার পক্ষে নয়, জাপানের পক্ষেও বিপদ। এমন অবস্থায় অন্য প্রবলকে ঠেকাবার জন্যই কোরিয়ায় জাপানের নিজের শক্তিকেই প্রবল করতে হয়। এমন অবস্থায় কোনো একদিন জাপান বিনা পরাভবেই কোরিয়ার ক্ষীণ হস্তেই কোরিয়ার ভাগ্যকে সমর্পণ করবে, এ সম্ভবপর নয়। এর মধ্যে জাপানের শুধু মুনফার লোভ না, প্রাণের দায়।'

'আপনার প্রশ্ন এই যে, তা হলে কোরিয়ার উপায় কী। জানি, আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী সৈন্যদল বানিয়ে তুলতে পারব না। তার পরে যুদ্ধের জন্য ভাসান-জাহাজ, ডুব-জাহাজ, উড়ো-জাহাজ, এ-সমস্ত তৈরি করা, চালনা করা, বর্তমান অবস্থায় আমাদের কল্পনার অতীত। সেই উদ্দেশে চেষ্টা করাও বিদেশী শাসনাধীনে অসম্ভব। তবু তাই বলে হাল ছেড়ে দেব, এ কথা বলতে পারি নে।'

'এ কথা বলা ভালোও না। হাল ছাড়ব না, কিন্তু কোন্ দিক বাগে হাল চালাতে হবে সেটা যদি-না ভাবি ও বুদ্ধিসংগত তার একটা জবাব না দিই তবে মুখে যতই আস্ফালন করি, ভাষান্তরে তাকেই বলে হাল ছেড়ে দেওয়া।'

'আমি কী ভাবি তা বলা যাক। এমন একটা সময় আসবে যখন পৃথিবীতে জাপানি চীনীয়

রুশীয় কোরীয় প্রভৃতি নানা জাতির মধ্যে আর্থিক-স্বার্থগত রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতাই সব চেয়ে প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনারূপে থাকবে না। কেন থাকবে না তা বলি। যে দেশের মানুষকে চলিত ভাষায় স্বাধীন বলে থাকে তাদেরও ঐশ্বর্য এবং প্রতাপের ক্ষেত্রে দুই ভাগ। এক ভাগের অল্প লোকে ঐশ্বর্য ভোগ করে, আর-এক ভাগের অসংখ্য দুর্ভাগা সেই ঐশ্বর্যের ভার বয়; এক ভাগের দু-চারজন লোক প্রতাপযজ্ঞশিখা নিজের ইচ্ছায় উদ্দীপিত করে, আর-এক ভাগের বিস্তর লোক ইচ্ছা না থাকলেও নিজের অস্থিমাংস দিয়ে সেই প্রতাপের ইন্ধন জোগায়। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যুগে যুগে মানুষের মধ্যে এই মূলগত বিভাগ, এই দুই স্তর। এতদিন নিম্নস্তরের মানুষ নিজের নিম্নতা নতশিরেই মেনে নিয়েছে, ভাবতেই পারে নি যে এটা অবশ্যস্বীকার্য নয়।'

আমি বললুম, 'ভাবতে আরম্ভ করেছে, কেননা আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য মহাদেশে নিম্নস্তরের মধ্যে শিক্ষা পরিব্যাপ্ত।'

'তাই ধরে নিচ্ছি। কারণ যাই হোক, আজ পৃথিবীতে যে যুগান্তকারী দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছে সে ভিন্ন ভিন্ন মহাজাতির মধ্যে নয়, মানুষের এই দুই বিভাগের মধ্যে, শাসয়িতা এবং শাসিত, শোষয়িতা এবং শুষ্ক। এখানে কোরীয় এবং জাপানি, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য এক পঙ্‌ক্তিতেই মেলে। আমাদের দুঃখই আমাদের দৈন্যই আমাদের মহাশক্তি। সেইটেতেই জগৎ জুড়ে আমাদের সম্মিলন এবং সেইটেতেই ভবিষ্যৎকে আমরা অধিকার করব। অথচ যারা ধনিক তারা কিছুতেই একত্রে মিলতে পারে না, স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরে তারা বিচ্ছিন্ন। আমাদের মস্ত আশ্বাসের কথা এই যে, যারা সত্য করে মিলতে পারে তাদেরই জয়। য়ুরোপে যে মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে সেটা ধনিকের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধের বীজ আজ অসংখ্য পরিমাণে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রইল। সেই বীজ মানব-প্রকৃতির মধ্যেই; স্বার্থই বিদ্বেষবুদ্ধির জন্মভূমি, পালন-দোলা। এতকাল দুঃখীরাই দৈন্য-দ্বারা, অজ্ঞানের দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল; ধনের মধ্যে যে শক্তিশেল আছে তাই দিয়েই তাদের মর্ম বিদ্ধ হয়েছে। আজ দুঃখদৈন্যেই আমরা মিলিত হব, আর ধনের দ্বারাই ধনী হবে বিচ্ছিন্ন। পৃথিবীতে আজ রাষ্ট্রতন্ত্রে যে অশান্ত আলোড়ন, বলশালী জাতির মধ্যে যে দুরন্ত আশঙ্কা, তাতে এইটেই কি দেখতে পাচ্ছি নে।'

এর পরে আমাদের আর কথা কবার অবকাশ হয় নি। আমি মনে মনে ভাবলুম, অসংযত শক্তিলুব্ধতা নিজের মধ্যে বিষ উৎপাদন করেই নিজেকে মারে এ কথা সত্য, কিন্তু শক্ত ও অশক্তের ভেদ আজ যে একটা বিশেষ আকার ধরে প্রকাশ পাচ্ছে সেইটেকে রক্তপাত করে বিনাশ করলেই কি মানবপ্রকৃতি থেকে ভেদের মূল একেবারে চলে যায়। পৃথিবীর সমস্ত উচ্চভূমি ঝড়বৃষ্টির ঝাঁটার তাড়নায় ক্ষয় পেয়ে পেয়ে একদিন সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে যাবে এমন কথা শোনা যায়, কিন্তু সেই দিনেই কি পৃথিবীর মরবার সময় আসবে না। সমত্ব এবং পঞ্চত্ব কি একই কথা নয়। ভেদ নষ্ট করে মানবসমাজের সত্য নষ্ট করা হয়। ভেদের মধ্যে কল্যাণসম্বন্ধ স্থাপনই তার নিত্য সাধনা, আর ভেদের মধ্যকার অন্যায়ের সঙ্গেই তার নিত্য সংগ্রাম। এই সাধনায়, এই সংগ্রামেই মানুষ বড়ো হয়ে ওঠে। য়ুরোপ আজ সাধনাকে বাদ দিয়ে সংগ্রামকেই যখন একান্ত করতে চায় তখন তার চেষ্টা হয়— শক্তকে বিনাশ করে অশক্তকে সাম্য দেওয়া। যদি অভিলাষ সফল হয় তবে যে হিংসার সাহায্যে সফল হবে সেই রক্তবীজকেই জয়ডঙ্কা বাজিয়ে সেই সফলতার কাঁধের উপর চড়িয়ে দেবে। কেবলই চলতে থাকবে রক্তপাতের চক্রাবর্তন। শান্তির দোহাই পেড়ে এরা লড়াই করে এবং সেই লড়াইয়ের ধাক্কাতেই সেই শান্তিকে মারে; আজকের দিনের শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কালকের দিনের যে শক্তিকে জাগিয়ে তোলে আবার তারই বিরুদ্ধে পরদিন থেকে যুদ্ধের আয়োজন করতে থাকে। অবশেষে চরমশান্তি কি বিশ্বব্যাপী শ্মশানক্ষেত্রে?

কোরীয় যুবকের সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছিল তার ভাবখানা এই লেখায় আছে। এটা যথাযথ অনুলিপি নয়।

১৩৩৬

অবসান হোলো রাতি।
নিবাইয়া ফেলো কালিমামলিন
ঘরের কোণের বাতি।
নিখিলের আলো পূর্ব আকাশে
জ্বলিল পুণ্যদিনে;
একসাথে যারা চলিবে তাহারা
সকলেরে নিক চিনে।

The night has ended.
Put out the light of the lamp
of thine own narrow corner
smudged with smoke.
The great morning which is for all
appears in the East.
Let its light reveal us
to each other
who walk on
the same
path of pilgrimage.
Rabindranath
Tagore
Baghdad
May 24
1932

"অবসান হোলো রাতি"
রবীন্দ্রনাথ-বিচিত্রিত পাণ্ডুলিপি

জাপানে-পারস্যে

প্রকাশ : ১৯৩৬

১৯৩২ সালে পারস্য ভ্রমণান্তে রবীন্দ্রনাথ পারস্যযাত্রা এবং ইরান ও ইরাক-ভ্রমণ বৃত্তান্ত 'পারস্যযাত্রা' এবং 'পারস্য ভ্রমণ' নামে যথাক্রমে "প্রবাসী" ও "বিচিত্রা" পত্রিকায় ১৩৩৯-৪০ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেন। এই ভ্রমণবৃত্তান্ত ১৯৩৬ সালে সংক্ষিপ্ত আকারে 'জাপানে-পারস্যে' গ্রন্থভুক্ত হয়। এই গ্রন্থের প্রথমাংশ অর্থাৎ 'জাপানে'-অংশ ইতিপূর্বে 'জাপান-যাত্রী' নামে ১৯১৯ সালে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান সংকলনে 'জাপান-যাত্রী' প্রকাশকালানুযায়ী যথাস্থানে মুদ্রিত হয়েছে এবং 'পারস্যে'-অংশ 'জাপানে-পারস্যে' গ্রন্থের প্রকাশকাল অনুসারে অন্তর্ভুক্ত হল।

১

১১ এপ্রেল, ১৯৩২। দেশ থেকে বেরবার বয়স গেছে এইটেই স্থির করে বসেছিলুম। এমন সময় পারস্যরাজের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ এল। মনে হল এ নিমন্ত্রণ অস্বীকার করা অকর্তব্য হবে। তবু সত্তর বছরের ক্লান্ত শরীরের পক্ষ থেকে দ্বিধা ঘোচে নি। বোম্বাই থেকে আমার পারসী বন্ধু দিনশা ইরানী ভরসা দিয়ে লিখে পাঠালেন যে, পারস্যের বুশেয়ার বন্দর থেকে তিনিও হবেন আমার সঙ্গী। তা ছাড়া খবর দিলেন যে, বোম্বাইয়ের পারসিক কনসাল কেহান সাহেব পারসিক সরকারের পক্ষ থেকে আমার যাত্রার সাহচর্য ও ব্যবস্থার ভার পেয়েছেন।

এর পরে ভীরুতা করতে লজ্জা বোধ হল। রেলের পথ এবং পারস্য উপসাগর সেই গরমের সময় আমার উপযোগী হবে না বলে ওলন্দাজদের বায়ুপথের ডাকযোগে যাওয়াই স্থির হল। কথা রইল আমার শুশ্রূষার জন্যে বউমা যাবেন সঙ্গে, আর যাবেন কর্মসহায়রূপে কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অমিয় চক্রবর্তী। এক বায়ুযানে চারজনের জায়গা হবে না বলে কেদারনাথ এক সপ্তাহ আগেই শূন্যপথে রওনা হয়ে গেলেন।

পূর্বে আর-একবার এই পথের পরিচয় পেয়েছিলুম লন্ডন থেকে প্যারিসে। কিন্তু সেখানে যে ধরাতল ছেড়ে ঊর্ধ্বে উঠেছিলুম তার সঙ্গে আমার বন্ধন ছিল আলগা। তার জল-স্থল আমাকে পিছুডাক দেয় না, তাই নোঙর তুলতে টানাটানি করতে হয় নি। এবারে বাংলাদেশের মাটির টান কাটিয়ে নিজেকে শূন্যে ভাসান দিলুম, হৃদয় সেটা অনুভব করলে।

কলকাতার বাহিরের পল্লীগ্রাম থেকে যখন বেরলুম তখন ভোরবেলা। তারাখচিত নিস্তব্ধ অন্ধকারের নীচে দিয়ে গঙ্গার স্রোত ছলছল করছে। বাগানের প্রাচীরের গায়ে সুপুরিগাছের ডাল দুলছে বাতাসে, লতাপাতা-ঝোপঝাপের বিমিশ্র নিশ্বাসে একটা শ্যামলতার গন্ধ আকাশে ঘনীভূত। নিদ্রিত গ্রামের আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ গলির মধ্য দিয়ে মোটর চলল। কোথাও বা দাগধরা পুরোনো পাকা দালান, তার খানিকটা বাসযোগ্য, খানিকটা ভেঙে-পড়া; আধা-শহুরে দোকানে দ্বার বন্ধ; শিবমন্দির জনশূন্য; এবড়ো-খেবড়ো পোড়ো জমি; পানাপুকুর; ঝোপঝাড়। পাখিদের বাসায় তখনো সাড়া পড়ে নি, জোয়ার-ভাঁটার সন্ধিকালীন গঙ্গার মতো পল্লীর জীবনযাত্রা ভোরবেলাকার শেষ ঘুমের মধ্যে থমকে আছে।

গলির মোড়ে নিষুপ্ত বারান্দায় খাটিয়া-পাতা পুলিস-থানার পাশ দিয়ে মোটর পেঁছিল বড়ো রাস্তায়। অমনি নতুন কালের কড়া গন্ধ মেলে দিয়ে ধুলো জেগে উঠল, গাড়ির পেট্রোল-বাষ্পের সঙ্গে তার সগোত্র আত্মীয়তা। কেবল অন্ধকারের মধ্যে দুই সারি বনস্পতি পুঞ্জিত পল্লবস্তবকে প্রাচীন কালের নীরব সাক্ষ্য নিয়ে স্তম্ভিত; সেই যে কালে শতাব্দীপর্যায়ের মধ্যে দিয়ে বাংলার ছায়াস্নিগ্ধ অঙ্গনপার্শ্বে অতীত যুগের ইতিহাসধারা কখনো মন্দগম্ভীর গতিতে কখনো ঘূর্ণাবর্ত-সংকুল ফেনায়িত বেগে বয়ে চলেছিল। রাজপরম্পরার পদচিহ্নিত এই পথে কখনো পাঠান, কখনো মোগল, কখনো ভীষণ বর্গী, কখনো কোম্পানির সেপাই ধুলোর ভাষায় রাষ্ট্রপরিবর্তনের বার্তা ঘোষণা করে যাত্রা করেছে। তখন ছিল হাতি উট তাঞ্জাম ঘোড়সওয়ারদের অলংকৃত ঘোড়া; রাজপ্রতাপের সেই-সব বিচিত্র বাহন ধুলোর ধূসর অন্তরালে মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেছে। একমাত্র বাকি আছে সর্বজনের ভারবাহিনী করুণমন্থর গোরুর গাড়ি।

দমদমে উড়োজাহাজের আড্ডা ঐ দেখা যায়। প্রকাণ্ড তার কোটর থেকে বিজলি বাতির আলো বিচ্ছুরিত। তখনো রয়েছে বৃহৎ মাঠজোড়া অন্ধকার। সেই প্রদোষের অস্পষ্টতায় ছায়াশরীরীর মতো বন্ধুবান্ধব ও সংবাদপত্রের দূত জমে উঠতে লাগল।

সময় হয়ে এল। ডানা ঘুরিয়ে, ধুলো উড়িয়ে, হাওয়া আলোড়িত করে ঘর্ঘর গর্জনে যন্ত্রপক্ষীরাজ তার গহ্বর থেকে বেরিয়ে পড়ল খোলা মাঠে। আমি, বউমা, অমিয়, উপরে চড়ে

বসলুম। ঢাকা রথ, দুই সারে তিনটে করে চামড়ার দোলা-ওয়ালা ছয়টি প্রশস্ত কেদারা, আর পায়ের কাছে আমাদের পথে-ব্যবহার্য সামগ্রীর হালকা বাক্স। পাশে কাঁচের জানলা।

ব্যোমতরী বাংলাদেশের উপর দিয়ে যতক্ষণ চলল ততক্ষণ ছিল মাটির কতকটা কাছাকাছি। পানাপুকুরের চারি ধারে সংসক্ত গ্রামগুলি ধূসর বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো দ্বীপের মতো খণ্ড খণ্ড চোখে পড়ে। উপর থেকে তাদের ছায়াঘনিষ্ঠ শ্যামল মূর্তি দেখা যায় ছাড়া-ছাড়া, কিন্তু বেশ বুঝতে পারি আসন্ন গ্রীষ্মে সমস্ত তৃষাসন্তপ্ত দেশের রসনা আজ শুষ্ক। নির্মল নিরাময় জলগণ্ডূষের জন্যে ইন্দ্রদেবের খেয়ালের উপর ছাড়া আর-কারও 'পরে এই বহু কোটি লোকের যথোচিত ভরসা নেই।

মানুষ পশু পাখি কিছু যে পৃথিবীতে আছে সে আর লক্ষ হয় না। শব্দ নেই, গতি নেই, প্রাণ নেই; যেন জীববিধাতার পরিত্যক্ত পৃথিবী তালি-দেওয়া চাদরে ঢাকা। যত উপরে উঠছে ততই পৃথিবীর রূপবৈচিত্র্য কতকগুলো আঁচড়ে এসে ঠেকল। বিস্মৃতনামা প্রাচীন সভ্যতার স্মৃতিলিপি যেন অজ্ঞাত অক্ষরে কোনো মৃতদেশের প্রান্তর জুড়ে খোদিত হয়ে পড়ে আছে; তার রেখা দেখা যায়, অর্থ বোঝা যায় না।

প্রায় দশটা। এলাহাবাদের কাছাকাছি এসে বায়ুযান নামবার মুখে ঝুঁকল। ডাইনে জানালা দিয়ে দেখি নীচে কিছুই নেই, শুধু অতল নীলিমা, বাঁ দিকে আড় হয়ে উপরে উঠে আসছে ভূমিতলটা। খেচর-রথ মাটিতে ঠেকল এসে; এখানে সে চলে লাফাতে লাফাতে, ধাক্কা খেতে খেতে; অপ্রসন্ন পৃথিবীর সম্মতি সে পায় না যেন।

শহর থেকে জায়গাটা দূরে। চার দিক ধূ ধূ করছে। রৌদ্রতপ্ত বিরস পৃথিবী। নামবার ইচ্ছা হল না। কোম্পানির একজন ভারতীয় ও একজন ইংরেজ কর্মচারী আমার ফোটো তুলে নিলে। তার পরে খাতায় দু-চার লাইন স্বাক্ষরের দাবি করল যখন, আমার হাসি পেল। আমার মনের মধ্যে তখন শংকরাচার্যের মোহমুদ্গরের শ্লোক গুঞ্জরিত। ঊর্ধ্ব থেকে এই কিছু আগেই চোখে পড়েছে নির্জীব ধূলিপটের উপর অদৃশ্য জীবলোকের গোটাকতক স্বাক্ষরের আঁচড়। যেন ভাবী যুগাবসানের প্রতিবিম্ব পিছন ফিরে বর্তমানের উপর এসে পড়েছে। যে ছবিটা দেখলেম সে একটা বিপুল রিক্ততা; কালের সমস্ত দলিল অবলুপ্ত; স্বয়ং ইতিবৃত্তবিৎ চিরকালের ছুটিতে অনুপস্থিত; রিসার্চ বিভাগের ভিতটা-সুদ্ধ তলিয়ে গেছে মাটির নীচে।

এইখানে যন্ত্রটা পেট ভরে তৈল পান করে নিলে। আধঘণ্টা থেমে আবার আকাশ-যাত্রা শুরু। এতক্ষণ পর্যন্ত রথের নাড়া তেমন অনুভব করি নি, ছিল কেবল তার পাখার দুঃসহ গর্জন। দুই কানে তুলো লাগিয়ে জানালা দিয়ে চেয়ে দেখছিলুম। সামনের কেদারায় ছিলেন একজন দিনেমার, ইনি ম্যানিলা দ্বীপে আখের খেতের তদারক করেন, এখন চলেছেন স্বদেশে। গুটোনো ম্যাপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যাত্রাপথের পরিচয় নিচ্ছেন; ক্ষণে ক্ষণে চলছে চীজ রুটি, চকোলেটের মিষ্টান্ন, খনিজাত পানীয় জল। কলকাতা থেকে বহুবিধ খবরের কাগজ সংগ্রহ করে এনেছেন, আগাগোড়া তাই তন্ন তন্ন করে পড়ছেন একটার পর একটা। যাত্রীদের মধ্যে আলাপের সম্বন্ধ রইল না। যন্ত্রহুংকারের তুফানে কথাবার্তা যায় তলিয়ে। এক কোণে বেতারবার্তিক কানে ঠুলি লাগিয়ে কখনো কাজে কখনো ঘুমে কখনো পাঠে মগ্ন। বাকি তিনজন পালাক্রমে তরী-চালনায় নিযুক্ত, মাঝে মাঝে যাত্রার দফ্‌তর লেখা, কিছু বা আহার, কিছু বা তন্দ্রা। ক্ষুদ্র এক টুকরো সজনতা নীচের পৃথিবী থেকে ছিটকে পড়ে উড়ে চলেছে অসীম জনশূন্যতায়।

জাহাজ ক্রমে ঊর্ধ্বতর আকাশে চড়ছে, হাওয়া চঞ্চল, তরী টলোমলো। ক্রমে বেশ একটু শীত করে এল। নীচে পাথুরে পৃথিবী, রাজপুতানার কঠিন বন্ধুরতা শুষ্ক স্রোতঃপথের শীর্ণ রেখাজালে অঙ্কিত, যেন গেরুয়া-পরা বিধবাভূমির নির্জলা একাদশীর চেহারা।

অবশেষে অপরাহ্ণে দূর থেকে দেখা গেল রুক্ষ মরুভূমির পাংশুল বক্ষে যোধপুর শহর। আর তারই প্রান্তরে যন্ত্রপাখির হাঁ-করা প্রকাণ্ড নীড়। নেমে দেখি এখানকার সচিব কুন্‌বার

মহারাজ সিং সস্ত্রীক আমাদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত, তখনই নিয়ে যাবেন তাঁদের ওখানে চা-জলযোগের আমন্ত্রণে। শরীরের তখন প্রাণধারণের উপযুক্ত শক্তি কিছু ছিল, কিন্তু সামাজিকতার উপযোগী উদ্‌বৃত্ত ছিল না বললেই হয়। কষ্টে কর্তব্য সেরে হোটেলে এলুম।

হোটেলটি বায়ুতরীযাত্রীর জন্যে মহারাজের প্রতিষ্ঠিত। সন্ধ্যাবেলায় তিনি দেখা করতে এলেন। তাঁর সহজ সৌজন্য রাজোচিত। মহারাজ স্বয়ং উড়োজাহাজ-চালনায় সুদক্ষ। তার যতরকম দুঃসাহসী কৌশল আছে প্রায় সমস্তই তাঁর অভ্যস্ত!

পরের দিন ১২ই এপ্রেল ভোর রাত্রে জাহাজে উঠতে হল। হাওয়ার গতিক পূর্বদিনের চেয়ে ভালোই। অপেক্ষাকৃত সুস্থ শরীরে মধ্যাহ্নে করাচিতে পুরবাসীদের আদর-অভ্যর্থনার মধ্যে গিয়ে পৌঁছনো গেল। সেখানে বাঙালি গৃহলক্ষ্মীর সযত্নপক্ক অন্ন ভোগ করে আধ ঘণ্টার মধ্যে জাহাজে উঠে পড়লুম।

সমুদ্রের ধার দিয়ে উড়ছে জাহাজ। বাঁ দিকে নীল জল, দক্ষিণে পাহাড়ে মরুভূমি। যাত্রার শেষ অংশে বাতাস মেতে উঠল। ডাঙায় বাতাসের চাঞ্চল্য নানা পদার্থের উপর আপন পরিচয় দেয়। এখানে তার একমাত্র প্রমাণ জাহাজটার ধড়্‌ফড়ানি। বহুদূর নীচে সমুদ্রে ফেনার সাদা রেখায় একটু একটু তুলির পোঁচ দিচ্ছে। তার না শুনি গর্জন, না দেখি তরঙ্গের উত্তালতা।

এইবার মরুদ্বার দিয়ে পারস্যে প্রবেশ। বুশেয়ার থেকে সেখানকার গবর্নর বেতারে দূরলিপি-যোগে অভ্যর্থনা পাঠিয়েছেন। করাচি থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যোমতরী জাস্কে পৌঁছল। সমুদ্রতীরে মরুভূমিতে এই সামান্য গ্রামটি। কাদায় তৈরি গোটাকতক চৌকো চ্যাপটা-ছাদের ছোটো ছোটো বাড়ি ইতস্ততবিক্ষিপ্ত, যেন মাটির সিন্দুক।

আকাশযাত্রীদের পান্থশালায় আশ্রয় নিলুম। রিক্ত এই ভূখণ্ডে নীলাম্বুচুম্বিত বালুরাশির মধ্যে বৈচিত্র্যসম্পদ কিছুই নেই। সেইজন্যেই বুঝি গোধূলিবেলায় দিগঙ্গনার স্নেহ দেখলুম এই গরিব মাটির 'পরে। কী সুগম্ভীর সূর্যাস্ত, কী তার দীপ্যমান শান্তি, পরিব্যাপ্ত মহিমা। স্নান করে এসে বারান্দায় বসলুম, স্নিগ্ধ বসন্তের হাওয়া ক্লান্ত শরীরকে নিবিড় আরামে বেষ্টন করে ধরলে।

এখানকার রাজকর্মচারীর দল সম্মান-সম্ভাষণের জন্যে এলেন। বাইরে বালুতটে আমাদের চৌকি পড়েছে। যে দুই-একজন ইংরেজি জানেন তাঁদের সঙ্গে কথা হল। বোঝা গেল পুরাতনের খোলস বিদীর্ণ করে পারস্য আজ নূতন প্রাণের পালা আরম্ভ করতে প্রস্তুত। প্রাচ্য জাতির মধ্যে যেখানে জাগরণের চাঞ্চল্য সেখানে এই একই ভাব। অতীতের আবর্জনামুক্ত সমাজ, সংস্কারমুক্ত চিত্ত, বাধামুক্ত মানবসম্বন্ধের ব্যাপ্তি, বাস্তব জগতের প্রতি মোহমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, এই তাদের সাধনার প্রধান লক্ষ্য। তারা জানে, হয় বর্তমান কালের শিক্ষা নয় তার সাংঘাতিক আঘাত আমাদের গ্রহণ করতে হবে। অতীত কালের সঙ্গে যাদের দুশ্চ্ছেদ্য গ্রন্থিবন্ধনের জটিলতা, মৃত যুগের সঙ্গে আজ তাদের সহমরণের আয়োজন।

এখানে পরধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি কিরকম ব্যবহার এই প্রশ্নের উত্তরে শুনলুম, পূর্বকালে জরথুস্ত্রীয় ও বাহাইদের প্রতি অত্যাচার ও অবমাননা ছিল। বর্তমান রাজার শাসনে পরধর্মমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা দূর হয়ে গেছে; সকলেই ভোগ করছে সমান অধিকার, ধর্মহিংস্রতার নররক্তপঙ্কিল বিভীষিকা কোথাও নেই। ডাক্তার মহম্মদ ইসা খাঁ সাদিকের রচিত আধুনিক পারস্যের শিক্ষাপ্রণালী-সম্বন্ধীয় গ্রন্থে লিখিত আছে—অনতিকাল পূর্বে ধর্মযাজকমণ্ডলীর প্রভাব পারস্যকে অভিভূত করে রেখেছিল। আধুনিক বিদ্যাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভাবের প্রবলতা কমে এল। এর পূর্বে নানা শ্রেণীর অসংখ্য লোক, কেউ-বা ধর্মবিদ্যালয়ের ছাত্র, কেউ-বা ধর্মপ্রচারক, কোরানপাঠক, সৈয়দ—এরা সকলেই মোল্লাদের মতো পাগড়ি ও সাজসজ্জা ধারণ করত। যখন দেশের প্রধানবর্গের অধিকাংশ লোক আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষিত হলেন তখন থেকে বিষয়বুদ্ধিপ্রবীণ পুরোহিতদের ব্যবসায় সংকুচিত হয়ে এল। এখন যে খুশি মোল্লার বেশ ধরতে পারে না। বিশেষ পরীক্ষা পাস

করে অথবা প্রকৃত ধার্মিক ও ধর্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের সম্মতি-অনুসারে তবেই এই সাজ-ধারণের অধিকার পাওয়া যায়। এই আইনের তাড়নায় শতকরা নব্বই-সংখ্যক মানুষের মোল্লার বেশ ঘুচে গেছে। লেখক বলেন :

Such were the results of the contact of Persia with the Western world. They could not have been attained without the leadership of Reza Shah Pehlevi, the greatest man that Persia has produced for many centuries.

অন্তত একবার কল্পনা করে দেখতে দোষ নেই যে, হিন্দুভারতে যত অসংখ্য পাণ্ডা পুরোহিত ও সন্ন্যাসী আছে কোনো নূতন আইনে তাদের উপাধি-পরীক্ষা পাস আবশ্যিক বলে গণ্য হয়েছে। কে যথার্থ সাধু বা সন্ন্যাসী কোনো পরীক্ষার দ্বারা তার প্রমাণ হয় না স্বীকার করি— কিন্তু স্বেচ্ছাগৃহীত উপাধি ও বাহ্য বেশের দ্বারা তার প্রমাণ আরও অসম্ভব। অথচ সেই নিরর্থক প্রমাণ দেশ স্বীকার করে নিয়েছে। কেবলমাত্র অপরীক্ষিত সাজের ও অনায়াসলব্ধ নামের প্রভাবে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ লোকের মাথা নত হচ্ছে বিনা বিচারে এবং উপবাসপীড়িত দেশের অন্নমুষ্টি অনায়াসে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে, যার পরিবর্তে অধিকাংশ স্থলে আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কোনো প্রতিদান নেই। সাধুতা ও সন্ন্যাস যদি নিজের আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য হয় তা হলে সাজ পরবার বা নাম নেবার দরকার নেই, এমন-কি, নিলে ক্ষতির কারণ আছে; যদি অন্যের জন্য হয় তা হলে যথোচিত পরীক্ষা দেওয়া উচিত। ধর্মকে যদি জীবিকা, এমন-কি, লোকমান্যতার বিষয় করা যায়, যদি বিশেষ বেশ বা বিশেষ ব্যবহারের দ্বারা ধার্মিকতার বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় তবে সেই বিজ্ঞাপনের সত্যতা বিচার করবার অধিকার আত্মসম্মানের জন্য সমাজের গ্রহণ করা কর্তব্য এ কথা মানতেই হবে।

পরদিন তিনটে-রাত্রে উঠতে হল, চারটের সময় যাত্রা। ১৩ই এপ্রেল তারিখে সকাল সাড়ে-আটটার সময় বুশেয়ারে পৌঁছনো গেল।

বুশেয়ারের গবর্নর আমাদের আতিথ্যভার নিয়েছেন। যত্নের সীমা নেই।

মাটির মানুষের সঙ্গে আকাশের অন্তরঙ্গ পরিচয় হল, মনটা কী বললে এই অবকাশে লিখে রাখি।

ছেলেবেলা থেকে আকাশে যে-সব জীবকে দেখেছি তার প্রধান লক্ষণ গতির অবলীলতা। তাদের ডানার সঙ্গে বাতাসের মৈত্রীর মাধুর্য। মনে পড়ে ছাদের ঘর থেকে দুপুর-রৌদ্রে চিলের ওড়া চেয়ে চেয়ে দেখতেম; মনে হত দরকার আছে বলে উড়ছে না, বাতাসে যেন তার অবাধ গতির অধিকার আনন্দবিস্তার করে চলেছে। সেই আনন্দের প্রকাশ কেবল যে পাখার গতিসৌন্দর্যে তা নয়, তার রূপসৌন্দর্যে। নৌকোর পালটাকে বাতাসের মেজাজের সঙ্গে মানান রেখে চলতে হয়, সেই ছন্দ রাখবার খাতিরে পাল দেখতে হয়েছে সুন্দর। পাখির পাখাও বাতাসের সঙ্গে মিল করে চলে, তাই এমন তার সুষমা। আবার সেই পাখায় রঙের সামঞ্জস্য কত। এই তো হল প্রাণীর কথা, তার পরে মেঘের লীলা— সূর্যের আলো থেকে কত রকম রঙ ছেঁকে নিয়ে আকাশে বানায় খেয়ালের খেলাঘর! মাটির পৃথিবীতে চলায় ফেরায় দ্বন্দ্বের চেহারা, সেখানে ভারের রাজত্ব, সকল কাজেই বোঝা ঠেলতে হয়। বায়ুলোকে এতকাল যা আমাদের মন ভুলিয়েছে সে হচ্ছে ভারের অভাব, সুন্দরের সহজ সঞ্চরণ।

এতদিন পরে মানুষ পৃথিবী থেকে ভারটাকে নিয়ে গেল আকাশে। তাই তার ওড়ার যে চেহারা বেরল সে জোরের চেহারা। তার চলা বাতাসের সঙ্গে মিল করে নয়, বাতাসকে পীড়িত করে; এই পীড়া ভূলোক থেকে আজ গেল দ্যুলোকে। এই পীড়ায় পাখির গান নেই, জন্তুর গর্জন আছে। ভূমিতল আকাশকে জয় করে আজ চীৎকার করছে।

সূর্য উঠল দিগন্তরেখার উপরে। উদ্ধত যন্ত্রটা অরুণরাগের সঙ্গে আপন মিল করবার চেষ্টামাত্র করে নি। আকাশনীলিমার সঙ্গে ওর অসবর্ণতা বেসুরো, অন্তরীক্ষের রঙমহলে মেঘের সঙ্গে ওর অমানান রয়ে গেল। আধুনিক যুগের দূত, ওর সেন্টিমেন্টের বালাই নেই; শোভাকে ও

অবজ্ঞা করে; অনাবশ্যককে কনুইয়ের ধাক্কা মেরে চলে যায়। যখন পূর্বদিগন্ত রাঙা হয়ে উঠল, পশ্চিমদিগন্তে যখন কোমল নীলের উপর শুক্তিশুভ্র আলো, তখন তার মধ্য দিয়ে ঐ যন্ত্রটা প্রকাণ্ড একটা কালো তেলাপোকার মতো ভন্ ভন্ করে উড়ে চলল।

বায়ুতরী যতই উপরে উঠল ততই ধরণীর সঙ্গে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যোগ সংকীর্ণ হয়ে একটা মাত্র ইন্দ্রিয়ে এসে ঠেকল, দর্শন-ইন্দ্রিয়ে, তাও ঘনিষ্ঠভাবে নয়। নানা সাক্ষ্য মিলিয়ে যে পৃথিবীকে বিচিত্র ও নিশ্চিত করে জেনেছিলুম সে ক্রমে এল ক্ষীণ হয়ে, যা ছিল তিন আয়তনের বাস্তব তা হয়ে এল দুই আয়তনের ছবি। সংহত দেশকালের বিশেষ বিশেষ কাঠামোর মধ্যেই সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ রূপ। তার সীমানা যতই অনির্দিষ্ট হতে থাকে, সৃষ্টি ততই চলে বিলীনতার দিকে। সেই বিলয়ের ভূমিকার মধ্যে দেখা গেল পৃথিবীকে, তার সত্তা হল অস্পষ্ট, মনের উপর তার অস্তিত্বের দাবি এল কমে। মনে হল, এমন অবস্থায় আকাশযানের থেকে মানুষ যখন শতঘ্নী বর্ষণ করতে বেরয় তখন সে নির্মমভাবে ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে; যাদের মারে তাদের অপরাধের হিসাববোধ উদ্যত বাহুকে দ্বিধাগ্রস্ত করে না, কেননা, হিসাবের অংকটা অদৃশ্য হয়ে যায়। যে বাস্তবের 'পরে মানুষের স্বাভাবিক মমতা, সে যখন ঝাপসা হয়ে আসে তখন মমতারও আধার যায় লুপ্ত হয়ে। গীতায় প্রচারিত তত্ত্বোপদেশও এইরকমের উড়োজাহাজ— অর্জুনের কৃপাকাতর মনকে সে এমন দূরলোকে নিয়ে গেল, সেখান থেকে দেখলে মারেই-বা কে, মরেই-বা কে, কেই-বা আপন, কেই-বা পর। বাস্তবকে আবৃত করবার এমন অনেক তত্ত্বনির্মিত উড়োজাহাজ মানুষের অস্ত্রশালায় আছে, মানুষের সাম্রাজ্যনীতিতে, সমাজনীতিতে, ধর্মনীতিতে। সেখান থেকে যাদের উপর মার নামে তাদের সম্বন্ধে সান্ত্বনাবাক্য এই যে, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

বোগ্দাদে ব্রিটিশদের আকাশফৌজ আছে। সেই ফৌজের খৃস্টান ধর্মযাজক আমাকে খবর দিলেন, এখানকার কোন্ শেখদের গ্রামে তাঁরা প্রতিদিন বোমা বর্ষণ করছেন। সেখানে আবাল-বৃদ্ধবনিতা যারা মরছে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঊর্ধ্বলোক থেকে মার খাচ্ছে; এই সাম্রাজ্যনীতি ব্যক্তিবিশেষের সত্তাকে অস্পষ্ট করে দেয় বলেই তাদের মারা এত সহজ। খৃস্ট এই-সব মানুষকেও পিতার সন্তান বলে স্বীকার করেছেন, কিন্তু খৃস্টান ধর্মযাজকের কাছে সেই পিতা এবং তাঁর সন্তান হয়েছে অবাস্তব, তাঁদের সাম্রাজ্যতত্ত্বের উড়োজাহাজ থেকে চেনা গেল না তাদের, সেইজন্যে সাম্রাজ্য জুড়ে আজ মার পড়ছে সেই খৃস্টেরই বুকে। তা ছাড়া উড়োজাহাজ থেকে এই-সব মরুচারীদের মারা যায় এত অত্যন্ত সহজে, ফিরে মার খাওয়ার আশংকা এতই কম যে, মারের বাস্তবতা তাতেও ক্ষীণ হয়ে আসে। যাদের অতি নিরাপদে মারা সম্ভব মারওয়ালাদের কাছে তারা যথেষ্ট প্রতীয়মান নয়। এই কারণে, পাশ্চাত্য হননবিদ্যা যারা জানে না তাদের মানবসত্তা আজ পশ্চিমের অস্ত্রীদের কাছে ক্রমশই অত্যন্ত ঝাপসা হয়ে আসছে।

ইরাক বায়ুফৌজের ধর্মযাজক তাঁদের বায়ু-অভিযানের তরফ থেকে আমার কাছে বাণী চাইলেন, আমি যে বাণী পাঠালুম সেইটে এইখানে প্রকাশ করা যাক।

From the beginning of our days man has imagined the seat of divinity in the upper air from which comes light and blows the breath of life for all creatures on this earth. The peace of its dawn, the splendour of its sunset, the voice of eternity in its starry silence have inspired countless generations of men with an ineffable presence of the infinite urging their minds away from the sordid interests of daily life. Man has accepted this dust-laden earth for his dwelling place, for the enacting of the drama of his tangled life ever waiting for a call of perfection from the boundless depth of purity surrounding him in a translucent atmosphere. If in an evil moment man's cruel history should spread its black wings to invade that realm of divine dreams with its

cannibalistic greed and fratricidal ferocity then God's curse will certainly descend upon us for that hideous desecration and the last curtain will be rung down upon the world of Man for whom God feels ashamed.

নিকটের থেকে আমাদের চোখ যতটা দূরকে একদৃষ্টিতে দেখতে পায়, উপরের থেকে তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক দেশকে দেখে। এইজন্যে বায়ুতরী যখন মিনিটে প্রায় এক ক্রোশ বেগে ছুটছে তখন নীচের দিকে তাকিয়ে মনে হয় না তার চলন এত দ্রুত। বহু দূরত্ব আমাদের চোখে সংহত হয়ে ছোটো হয়ে গেছে বলেই সময়পরিমাণও আমাদের মনে ঠিক থাকল না। দুইয়ে মিলে আমাদের কাছে বাস্তবের যে প্রতীতি জন্মাচ্ছে সেটা আমাদের সহজ বোধের থেকে অনেক তফাত। জগতের এই যন্ত্র পরিমাপ যদি আমাদের জীবনের সহজ পরিমাপ হত তা হলে আমরা একটা ভিন্ন জগতে বাস করতুম। তাই ভাবছিলুম সৃষ্টিটা ছন্দের লীলা। যে তালের লয়ে আমরা এই জগৎকে অনুভব করি সেই লয়টাকে দুনের দিকে বিলম্বিতের দিকে বদলে দিলেই সেটা আর-এক সৃষ্টি হবে। অসংখ্য অদৃশ্য রশ্মিতে আমরা বেষ্টিত। আমাদের স্নায়ুস্পন্দনের ছন্দ তাদের স্পন্দনের ছন্দের সঙ্গে তাল রাখতে পারে না বলে তারা আমাদের অগোচর। কী করে বলব এই মুহূর্তেই আমাদের চার দিকে ভিন্ন লয়ের এমন অসংখ্য জগৎ নেই যারা পরস্পরেব অপ্রত্যক্ষ। সেখানকার মন আপন বোধের ছন্দ অনুসারে যা দেখে যা জানে যা পায় সে আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অগম্য, বিভিন্ন মনের যন্ত্রে বিভিন্ন বিশ্বের বিভিন্ন বাণী একসঙ্গে উদ্ভূত হচ্ছে সীমাহীন অজানার অভিমুখে।

এই ব্যোমবাহনে চড়ে মনের মধ্যে একটা সংকোচ বোধ না করে থাকতে পারি নে। অতি আশ্চর্য এ যন্ত্র, এর সঙ্গে আমার ভোগের যোগ আছে, কিন্তু শক্তির যোগ নেই। বিমানের কথা শাস্ত্রে লেখে— সে ছিল ইন্দ্রলোকের, মর্ত্যের দুষ্যন্তেরা মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত হয়ে অন্তরীক্ষে পাড়ি দিতেন— আমারও সেই দশা। এ কালের বিমান যারা বানিয়েছে তারা আর-এক জাত। শুধু যদি বুদ্ধির জোর এতে প্রকাশ হত তা হলে কথা ছিল না। কিন্তু চরিত্রের জোর— সেটাই সব চেয়ে শ্লাঘনীয়। এর পিছনে দুর্দম সাহস, অপরাজেয় অধ্যবসায়। কত ব্যর্থতা, কত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একে ক্রমে সম্পূর্ণ করে তুলতে হচ্ছে, তবু এরা পরাভব মানছে না। এখানে সেলাম করতেই হবে।

এই ব্যোমতরীর চার জন ওলন্দাজ নাবিকের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। বিপুল বপু, মোটা মোটা হাড়, মূর্তিমান উদ্যম। যে আবহাওয়ায় এদের জন্ম সে এদের প্রতিক্ষণে জীর্ণ করে নি, তাজা রেখে দিয়েছে। মজ্জাগত স্বাস্থ্য ও তেজ কোনো একঘেয়ে বাঁধা ঘাটে এদের স্থির থাকতে দিল না। বহু পুরুষ ধরে প্রভূতবলদায়ী অন্নে এরা পুষ্ট, বহু যুগের সঞ্চিত প্রচুর উদ্‌বৃত্ত এদের শক্তি। ভারতবর্ষে কোটি কোটি মানুষ পুরো পরিমাণ অন্ন পায় না। অভুক্তশরীর বংশানুক্রমে অন্তরে-বাহিরে সকল রকম শত্রুকে মাশুল দিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত। মনে প্রাণে সাধনা করে তবেই সম্ভব হয় সিদ্ধি, কিন্তু আমাদের মন যদিবা থাকে প্রাণ কই? উপবাসে ক্লান্তপ্রাণ শরীর কাজ ফাঁকি না দিয়ে থাকতে পারে না, সেই ফাঁকি সমস্ত জাতের মজ্জায় ঢুকে তাকে মারতে থাকে। আজ পশ্চিম মহাদেশে অন্নাভাবের সমস্যা মেটাবার দুশ্চিন্তায় রাজকোষ থেকে টাকা ঢেলে দিচ্ছে। কেননা, পর্যাপ্ত অন্নের জোরেই সভ্যতার আন্তরিক বাহ্যিক সব রকম কল পুরোদমে চলে। আমাদের দেশে সেই অন্নের চিন্তা ব্যক্তিগত, সে চিন্তার শুধু যে জোর নেই তা নয়, সে বাধাগ্রস্ত। ওদের দেশে সে চিন্তা রাষ্ট্রগত, সে দিকে সমস্ত জাতির সাধনার পথ স্বাধীনভাবে উন্মুক্ত, এমন-কি, নিষ্ঠুর অন্যায়ের সাহায্য নিতেও দ্বিধা নেই। ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তার দৃষ্টি হতে আমরা বহু দূরে, তাই আমাদের পক্ষে শাসন যত অজস্র সুলভ অশন তত নয়।

২

মহামানব জাগেন যুগে যুগে ঠাঁই বদল করে। একদা সেই জাগ্রত দেবতার লীলাক্ষেত্র বহু শতাব্দী ধরে এশিয়ায় ছিল। তখন এখানেই ঘটেছে মানুষের নব নব ঐশ্বর্যের প্রকাশ নব নব শক্তির পথ দিয়ে। আজ সেই মহামানবের উজ্জ্বল পরিচয় পাশ্চাত্য মহাদেশে। আমরা অনেক সময় তাকে জড়বাদপ্রধান বলে খর্ব করবার চেষ্টা করি। কিন্তু কোনো জাত মহত্ত্বে পৌঁছতেই পারে না একমাত্র জড়বাদের ভেলায় চড়ে। বিশুদ্ধ জড়বাদী হচ্ছে বিশুদ্ধ বর্বর। সেই মানুষই বৈজ্ঞানিক সত্যকে লাভ করবার অধিকারী সত্যকে যে শ্রদ্ধা ক'রে পূর্ণ মূল্য দিতে পারে। এই শ্রদ্ধা আধ্যাত্মিক, প্রাণপণ নিষ্ঠায় সত্যসাধনার শক্তি আধ্যাত্মিক। পাশ্চাত্য জাতি সেই মোহমুক্ত আধ্যাত্মিক শক্তি-দ্বারাই সত্যকে জয় করেছে এবং সেই শক্তিই জয়ী করছে তাদের। পৃথিবীর মধ্যে পাশ্চাত্য মহাদেশেই মানুষ আজ উজ্জ্বল তেজে প্রকাশমান।

সচল প্রাণের শক্তি যত দুর্বল হয়ে আসে দেহের জড়ত্ব ততই নানা আকারে উৎকট হয়ে ওঠে। একদিন ধর্মে কর্মে জ্ঞানে এশিয়ার চিত্ত প্রাণবান ছিল, সেই প্রাণধর্মের প্রভাবে তার আত্মসৃষ্টি বিচিত্র হয়ে উঠত। তার শক্তি যখন ক্লান্ত ও সুপ্তিমগ্ন হল, তার সৃষ্টির কাজ যখন হল বন্ধ, তখন তার ধর্মকর্ম অভ্যস্ত আচারের যন্ত্রবৎ পুনরাবৃত্তিতে নিরর্থক হয়ে উঠল। একেই বলে জড়তত্ত্ব, এতেই মানুষের সকল দিকে পরাভব ঘটায়।

অপর পক্ষে পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে বিপদের লক্ষণ আজ যা দেখা দিয়েছে সেও একই কারণে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও শক্তি তাকে প্রভাবশালী করেছে, এই প্রভাব সত্যের বরদান। কিন্তু সত্যের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কলুষিত হলেই সত্য তাকে ফিরে মারে। বিজ্ঞানকে দিনে দিনে য়ুরোপ আপন লোভের বাহন করে লাগামে বাঁধছে। তাতে করে লোভের শক্তি হয়ে উঠছে প্রচণ্ড, তার আকার হয়ে উঠছে বিরাট। যে ঈর্ষ্যা হিংসা মিথ্যাচারকে সে বিশ্বব্যাপী করে তুলছে তাতে করে য়ুরোপের রাষ্ট্রসত্তা আজ বিষজীর্ণ। প্রবৃত্তির প্রাবল্যও মানুষের জড়ত্বের লক্ষণ। তার বুদ্ধি তার ইচ্ছা তখন কলের পুতুলের মতো চালিত হয়। এতেই মনুষ্যত্বের বিনাশ। এর কারণ যন্ত্র নয়, এর কারণ আন্তরিক তামসিকতা, লোভ হিংসা পশুবৃত্তি। বাঁধনখোলা উন্মত্ত যখন আত্মঘাত করে তখন মুক্তিই তার কারণ নয়, তার কারণ মত্ততা।

বয়স যখন অল্প ছিল তখন য়ুরোপীয় সাহিত্য গভীর আনন্দের সঙ্গে পড়েছি, বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ সত্য আলোচনা করে তার সাধকের 'পরে ভক্তি হয়েছে মনে। এর ভিতর দিয়ে মানুষের যে পরিচয় আজ চারি দিকে ব্যাপ্ত হয়েছে তার মধ্যেই তো শাশ্বত মানুষের প্রকাশ; এই প্রকাশকে লোভান্ধ মানুষ অবমানিত করতে পারে। সেই পাপে হীনমতি নিজেকেই সে নষ্ট করবে কিন্তু মহৎকে নষ্ট করতে পারবে না। সেই মহৎ, সেই জাগ্রত মানুষকে দেখব বলেই একদিন ঘরের থেকে দূরে বেরিয়েছিলুম, য়ুরোপে গিয়েছিলুম ১৯১২ খৃস্টাব্দে।

এই যাত্রাকে শুভ বলেই গণ্য করি। কেননা, আমরা এশিয়ার লোক, য়ুরোপের বিরুদ্ধে নালিশ আমাদের রক্তে। যখন থেকে তাদের জলদস্যু ও স্থলদস্যু দুর্বল মহাদেশের রক্ত শোষণ করতে বেরিয়েছে সেই আঠারো শতাব্দী থেকে আমাদের কাছে এরা নিজেদের মানহানি করেছে। লজ্জা নেই, কেননা, এরা আমাদের লজ্জা করবার যোগ্য বলেও মনে করে নি। কিন্তু য়ুরোপে এসে একটা কথা আমি প্রথম আবিষ্কার করলুম যে, সহজ মানুষ আর নেশন এক জাতের লোক নয়। যেমন সহজ শরীর এবং বর্ম-পরা শরীরের ধর্মই স্বতন্ত্র। একটাতে প্রাণের স্বভাব প্রকাশ পায়, আর-একটাতে দেহটা যন্ত্রের অনুকরণ করে। দেখলুম সহজ মানুষকে আপন মনে করতে কোথাও বাধে না, তার মধ্যে যে মনুষ্যত্ব দেখা দেয় কখনো তা রমণীয় কখনো-বা বরণীয়। আমি তাকে ভালোবেসেছি, শ্রদ্ধা করেছি, ফিরেও পেয়েছি তার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। বিদেশে অপরিচিত মানুষের মধ্যে চিরকালের মানুষকে এমন স্পষ্ট দেখা দুর্লভ সৌভাগ্য।

কিন্তু সেই কারণেই একটা কথা মনে করে বেদনা বোধ করি। যে দেশে বহুসংখ্যক লোকের মন পলিটিক্সের যন্ত্রটার মধ্যেই পাক খেয়ে বেড়ায়, তাদের স্বভাবটা যন্ত্রের ছাঁদে পাকা হয়ে ওঠে। কাজ উদ্ধার করবার নৈপুণ্য একান্ত লক্ষ্য হয়। একেই বলে যান্ত্রিক জড়তা, কেননা, যন্ত্রের চরম সার্থক্য কাজের সাফল্যে। পাশ্চাত্য দেশে মানবচরিত্রে এই যান্ত্রিক বিকার ক্রমেই বেড়ে উঠছে এটা লক্ষ না করে থাকা যায় না। মানুষ-যন্ত্রের কল্যাণবুদ্ধি অসাড় হয়ে আসছে তার প্রমাণ পূর্বদেশে আমাদের কাছে আর ঢাকা রইল না। মনে পড়ছে ইরাকে একজন সম্মানযোগ্য সম্ভ্রান্ত লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ইংরেজ জাতের সম্বন্ধে আপনার কী বিচার।' আমি বললেম, 'তাঁদের মধ্যে যাঁরা best তাঁরা মানবজাতির মধ্যে best।' তিনি একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর যারা next best?' চুপ করে রইলুম। উত্তর দিতে হলে অসংযত ভাষার আশংকা ছিল। এশিয়ার অধিকাংশ কারবার এই next best-এর সংগেই। তাদের সংখ্যা বেশি, প্রভাব বেশি, তাদের স্মৃতি বহুব্যাপক লোকের মনের মধ্যে চিরমুদ্রিত হয়ে থাকে। তাদের সহজ মানুষের স্বভাব আমাদের জন্যে নয়, এবং সে স্বভাব তাদের নিজেদের জন্যেও ক্রমে দুর্লভ হয়ে আসছে।

দেশে ফিরে এলুম। তার অনতিকালের মধ্যেই য়ুরোপে বাধল মহাযুদ্ধ। তখন দেখা গেল বিজ্ঞানকে এরা ব্যবহার করছে মানুষের মহা সর্বনাশের কাজে। এই সর্বনাশা বুদ্ধি যে আগুন দেশে দেশে লাগিয়ে দিল তার শিখা মরেছে কিন্তু তার পোড়া কয়লার আগুন এখনো মরে নি। এতবড়ো বিরাট দুর্যোগ মানুষের ইতিহাসে আর কখনোই দেখা দেয় নি। একেই বলি জড়তত্ত্ব; এর চাপে মনুষ্যত্ব অভিভূত, বিনাশ সামনে দেখেও নিজেকে বাঁচাতে পারে না।

ইতিমধ্যে দেখা যায় এশিয়ার নাড়ী হয়েছে চঞ্চল। তার কারণ, য়ুরোপের চাপটা তার বাইরে থাকলেও তার মনের উপর থেকে সেটা সরে গেছে। একদিন মার খেতে খেতেও য়ুরোপকে সে সর্বতোভাবে আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে ধরে নিয়েছিল। আজ এশিয়ার এক প্রান্ত হতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত কোথাও তার মনে আর শ্রদ্ধা নেই। য়ুরোপের হিংস্রশক্তি যদিও আজ বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে, তৎসত্ত্বেও এশিয়ার মন থেকে আজ সেই ভয় ঘুচে গেছে যার সংগে সম্ভ্রম মিশ্রিত ছিল। য়ুরোপের কাছে অগৌরব স্বীকার করা তার পক্ষে আজ অসম্ভব, কেননা, য়ুরোপের গৌরব তার মনে আজ অতি ক্ষীণ। সর্বত্রই সে ঈষৎ হেসেই জিজ্ঞাসা করছে, 'But the next best?'

আমরা আজ মানুষের ইতিহাসে যুগান্তরের সময়ে জন্মেছি। য়ুরোপের রঙ্গভূমিতে হয়তো বা পঞ্চম অঙ্কের দিকে পটপরিবর্তন হচ্ছে। এশিয়ার নবজাগরণের লক্ষণ এক দিগন্ত হতে আর-এক দিগন্তে ক্রমশই ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। মানবলোকের উদয়গিরিশিখরে এই নবপ্রভাতের দৃশ্য দেখবার জিনিস বটে—এই মুক্তির দৃশ্য। মুক্তি কেবল বাইরের বন্ধন থেকে নয়, সুপ্তির বন্ধন থেকে, আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসের বন্ধন থেকে।

আমি এই কথা বলি, এশিয়া যদি সম্পূর্ণ না জাগতে পারে তা হলে য়ুরোপের পরিত্রাণ নেই। এশিয়ার দুর্বলতার মধ্যেই য়ুরোপের মৃত্যুবাণ। এই এশিয়ার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে যত তার চোখ-রাঙারাঙি, তার মিথ্যা কলঙ্কিত কূট কৌশলের গুপ্তচরবৃত্তি। ক্রমে বেড়ে উঠছে সমরসজ্জার ভার, পণ্যের হাট বহুবিস্তৃত করে অবশেষে আজ অগাধ ধনসমুদ্রের মধ্যে দুঃসহ করে তুলছে তার দারিদ্র্যতৃষ্ণা।

নূতন যুগে মানুষের নবজাগ্রত চৈতন্যকে অভ্যর্থনা করবার ইচ্ছায় একদিন পূর্ব-এশিয়ায় বেরিয়ে পড়েছিলুম। তখন এশিয়ার প্রাচ্যতম আকাশে জাপানের জয়পতাকা উড়েছে, লঘু করে দিয়েছে এশিয়ার অবসাদচ্ছায়াকে। আনন্দ পেলুম, মনে ভয়ও হল। দেখলুম জাপান য়ুরোপের অস্ত্র আয়ত্ত করে এক দিকে নিরাপদ হয়েছে, তেমনি অন্য দিকে গভীরতর আপদের কারণ ঘটল। তার রক্তে প্রবেশ করেছে য়ুরোপের মারী, যাকে বলে ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্‌, সে নিজের চারি দিকে মথিত করে তুলছে বিদ্বেষ। তার প্রতিবেশীর মনে জ্বালা ধরিয়ে দিল। এই প্রতিবেশীকে উপেক্ষা করবার নয়, আর এই জ্বালায় ভাবীকালের অগ্নিকাণ্ড কেবল সময়ের অপেক্ষা করে। ইতিহাসে ভাগ্যের

অনুকূল হাওয়া নিরন্তর বয় না। এমন দিন আসবেই যখন আজ যে দুর্বল তারই কাছে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব গণে দিতে হবে। কী করে মিলতে হয় জাপান তা শিখল না, কী করে মারতে হয় য়ুরোপের কাছ থেকে সেই শিক্ষাতেই সে হাত পাকিয়ে নিলে। এই মার মাটির নীচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে একদিন এসে ছোবল মারবে তারই বুকে।

কিন্তু এতে রাষ্ট্রনৈতিক হিসাবের ভুল হল বলেই এটা শোচনীয় এমন কথা আমি বলি নে। আমি এই বলতে চাই, এশিয়ায় যদি নতুন যুগ এসেই থাকে তবে এশিয়া তাকে নতুন করে আপন ভাষা দিক। তা না করে য়ুরোপের পশুগর্জনের অনুকরণই যদি সে করে সেটা সিংহনাদ হলেও তার হার। ধার-করা রাস্তা যদি গর্তের দিকে যাবার রাস্তা হয় তা হলে তার লজ্জা দ্বিগুণ মাত্রায়। যা হোক, এশিয়ার পশ্চিমপ্রান্ত যে ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে তার খবর দূর থেকে শোনা যায়। যখন ভাবছিলুম তুরুস্ক এবার ডুবল তখন হঠাৎ দেখা দিলেন কামালপাশা। তখন তাঁদের বড়ো সাম্রাজ্যের জোড়াতাড়া অংশগুলো যুদ্ধের ধাক্কায় গেছে ভেঙে। সেটা শাপে বর হয়েছিল। শক্ত করে নতুন করে রাজ্যটাকে তার স্বাভাবিক ঐক্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গড়ে তোলা সহজ হল ছোটো পরিধির মধ্যে। সাম্রাজ্য বলতে বোঝায়, যারা আত্মীয় নয় তাদের অনেককে এক দড়ির বাঁধনে বেঁধে কলেবরটাকে অস্বাভাবিক স্থূল করে তোলা। দুঃসময়ে বাঁধন যখন ঢিলে হয় তখন ঐ অনাত্মীয়ের সংঘাত বাঁচিয়ে আত্মরক্ষা দুঃসাধ্য হতে থাকে। তুরুস্ক হালকা হয়ে গিয়েই যথার্থ আঁট হয়ে উঠল। তখন ইংলন্ড তাকে তাড়া করেছে গ্রীসকে তার উপরে লেলিয়ে দিয়ে। ইংলন্ডের রাষ্ট্রতক্তে তখন বসে আছেন লয়েড জর্জ ও চার্চিহিল। ১৯২১ খৃস্টাব্দে ইংলন্ডে তখনকার মিত্রশক্তিরা একটা সভা ডেকেছিলেন। সেই সভায় আঙ্গোরার প্রতিনিধি বেকির সামী তুরুস্কের হয়ে যে প্রস্তাব করেছিলেন তাতে তাঁদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ অনেকটা পরিমাণে ত্যাগ করতেই রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু গ্রীস আপন ষোলো আনা দাবির 'পরেই জেদ ধরে বসে রইল, ইংলন্ড পশ্চাৎ থেকে তার সমর্থন করলে। অর্থাৎ কালনেমি-মামার লংকাভাগের উৎসাহ তখনো খুব ঝাঁঝালো ছিল।

এই গোলমালের সময় তুরুস্ক মৈত্রী বিস্তার করলে ফ্রান্সের সঙ্গে। পারস্য এবং আফগানিস্থানের সঙ্গেও তার বোঝাপড়া হয়ে গেল। আফগানিস্থানের সন্ধিপত্রের দ্বিতীয় দফায় লেখা আছে :

The contracting parties recognize the emancipation of the nations of the East and confirm the fact of their unrestricted freedom, their right to be independent and to govern themselves in whatever manner they themselves choose.

এ দিকে চলল গ্রীস-তুরুস্কের লড়াই। এখনো আঙ্গোরাপক্ষ রক্তপাত নিবারণের উদ্দেশে বার বার সন্ধির প্রস্তাব পাঠালে। কিন্তু ইংলন্ড ও গ্রীস তার বিরুদ্ধে অবিচলিত রইল। শেষে সকল কথাবার্তা থামল গ্রীসের পরাজয়ে। কামালপাশার নায়কতায় নূতন তুরুস্কের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল আঙ্গোরা রাজধানীতে।

নব তুরুস্ক এক দিকে য়ুরোপকে যেমন সবলে নিরস্ত করলে আর-এক দিকে তেমনি সবলে তাকে গ্রহণ করলে অন্তরে বাহিরে। কামালপাশা বললেন, মধ্যযুগের অচলায়তন থেকে তুরুস্ককে মুক্তি নিতে হবে। আধুনিক য়ুরোপে মানবিক চিত্তের সেই মুক্তিকে তাঁরা শ্রদ্ধা করেন। এই মোহমুক্ত চিত্তই বিশ্বে আজ বিজয়ী। পরাভবের দুর্গতি থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে এই বৈজ্ঞানিক চিত্তবৃত্তির উদ্‌বোধন সকলের আগে চাই। তুরুস্কের বিচারবিভাগের মন্ত্রী বললেন, 'Mediaeval principles must give way to secular laws. We are creating a modern civilised nation and we desire to meet contemporary needs. We have the will to live, and nobody can prevent us.' এই পরিপূর্ণভাবে বুদ্ধিসংগতভাবে প্রাণযাত্রানির্বাহের বাধা দেয় মধ্যযুগের পৌরাণিক অন্ধসংস্কার। আধুনিক লোকব্যবহারে তার প্রতি নির্মম হতে হবে এই তাঁদের ঘোষণা।

যুদ্ধজয়ের পরে কামালপাশা যখন স্মির্না শহরে প্রবেশ করলেন সেখানে একটি সর্বজন-সভা ডেকে মেয়েদের উদ্দেশে বললেন, 'যুদ্ধে আমরা নিঃসংশয়িত জয়সাধন করেছি, কিন্তু সে জয় নিরর্থক হবে যদি তোমরা আমাদের আনুকূল্য না কর। শিক্ষার জয়সাধন করো তোমরা, তা হলে আমরা যতটুকু করেছি তোমরা তার চেয়ে অনেক বেশি করতে পারবে। সমস্তই নিষ্ফল হবে যদি আধুনিক প্রাণযাত্রার পথে তোমরা দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর না হও। সমস্তই নিষ্ফল হবে যদি তোমরা গ্রহণ না কর আধুনিক জীবননির্বাহনীতি তোমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে।'

এ যুগে য়ুরোপ সত্যের একটি বিশেষ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে। সেই সাধনার ফল সকল কালের সকল মানুষের জন্যেই, তাকে যে না গ্রহণ করবে সে নিজেকে বঞ্চিত করবে। এই কথা এশিয়ার পূর্বতম প্রান্তে জাপান স্বীকার করেছে এবং পশ্চিমতম প্রান্তে স্বীকার করেছে তুরস্ক। ভৌতিক জগতের প্রতি সত্য ব্যবহার করা চাই এই অনুশাসন আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের, না করলেই বুদ্ধিতে এবং সংসারে আমরা ঠকব। এই সত্য ব্যবহার করার সোপান হচ্ছে মনকে সংস্কার-মুক্ত করে বিশুদ্ধ প্রণালীতে বিশ্বের অন্তর্নিহিত ভৌতিক তত্ত্বগুলি উদ্ধার করা।

কথাটা সত্য। কিন্তু আরও চিন্তা করবার বিষয় আছে। য়ুরোপ যেখানে সিদ্ধিলাভ করেছে সেখানে আমাদের দৃষ্টি পড়েছে অনেক দিন থেকে, সেখানে তার ঐশ্বর্য বিশ্বের প্রত্যক্ষগোচর। যেখানে করে নি, সে জায়গাটা গভীরে, মূলে, তাই সেটা অনেক কাল থেকে প্রচ্ছন্ন রইল। এইখানে সে বিশ্বের নিদারুণ ক্ষতি করেছে এবং সেই ক্ষতি ক্রমেই ফিরে আসছে তার নিজের অভিমুখে। তার যে লোভ চীনকে আফিম খাইয়েছে সে লোভ তো চীনের মরণের মধ্যেই মরে না। সেই নির্দয় লোভ প্রত্যহ তার নিজেকে মোহান্ধ করছেই, বাইরে থেকে সেটা আমরা স্পষ্ট দেখি বা না দেখি। কেবল ভৌতিক জগতে নয়, মানবজগতেও নিষ্কাম চিত্তে সত্য ব্যবহার মানুষের আত্মরক্ষার চরম উপায়। সেই সত্য ব্যবহারের সাধনার প্রতি পাশ্চাত্য দেশ প্রতিদিন শ্রদ্ধা হারাচ্ছে, তা নিয়ে তার লজ্জাও যাচ্ছে চলে। তাই জটিল হয়ে উঠেছে তার সমস্ত সমস্যা, বিনাশ হয়ে এল আসন্ন। য়ুরোপীয় স্বভাবের অন্ধ অনুবর্তী জাপান সিদ্ধিমদমত্ততায় নিত্যতত্ত্বের কথাটা ভুলেছে তা দেখাই যাচ্ছে, কিন্তু চিরন্তন শ্রেয়স্তত্ত্ব আপন অমোঘ শাসন ভুলবে না এ কথা নিশ্চিত জেনে রাখা চাই।

নবযুগের আহ্বানে পশ্চিম এশিয়া কী রকম সাড়া দিচ্ছে সেটা স্পষ্ট করে জানা ভালো। খুব বড়ো করে সেটা জানবার এখনো সময় হয় নি। এখানে ওখানে একটু একটু লক্ষণ দেখা যায়, সেগুলো প্রবল করে চোখে পড়বার নয়। কিন্তু সত্য ছোটো হয়েই আসে। সেই সত্য এশিয়ার সেই দুর্বলতাকে আঘাত করতে শুরু করেছে যেখানে অন্ধ সংস্কারে, জড় প্রথায়, তার চলাচলের পথ বন্ধ। এ পথ এখনো খোলসা হয় নি, কিন্তু দেখা যায় এই দিকে তার মনটা বিচলিত। এশিয়ার নানা দেশেই এমন কথা উঠেছে যে, সাম্প্রদায়িক ধর্ম মানবের সকল ক্ষেত্র জুড়ে থাকলে চলবে না। প্যালেস্টাইন-শাসনবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীকে বিদায়ভোজ দেওয়ার সভায় যখন সেই কর্মচারী বললেন, 'Palestine is a Mahommedan country, and its government should, therefore, be in the hands of the Mahommedans, on condition that the Jewish and Christian minorities are represented in it,' তখন জেরুজিলামের মুফ্‌তি হাজি এমিন এল্‌-হুসেইনি উত্তর করলেন, 'For us it is an exclusively Arab, not a Mahommedan question. During your sojourn in this country you have doubtless observed that here there are no distinctions between Mahommedan and Christian Arabs. We regard the Christians not as a minority, but as Arabs.'

জানি এই উদারবুদ্ধি সকলের, এমন-কি, অধিকাংশ লোকের নেই। তবু সে যে ছোটো বীজের মতো অতি ছোটো জায়গা জুড়েই নিজেকে প্রকাশ করতে চাইছে এইটে আশার কথা। বর্তমানে এ ছোটো, কিন্তু ভবিষ্যতে এ ছোটো নয়।

আর-একটা অখ্যাত কোণে কী ঘটেছে চেয়ে দেখো। রুশীয় তুর্কিস্থানে সোভিয়েট গবর্নমেন্ট্

অতি অল্পকালের মধ্যেই এশিয়ার মরুচর জাতির মধ্যে যে নূতন জীবন সঞ্চার করেছে তা আলোচনা করে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। এত দ্রুতবেগে এতটা সফলতা লাভের কারণ এই যে, এদের চিত্তোৎকর্ষ সাধন করতে, এদের আত্মশক্তিকে পূর্ণতা দিতে, সেখানকার সরকারের পক্ষে অন্তত লোভের সুতরাং ঈর্ষার বাধা নেই। মরুতলে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত এই-সব ছোটো ছোটো জাতিকে আপন আপন রিপাবলিক স্থাপন করেত অধিকার দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া এদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন প্রভূত ও বিচিত্র। পূর্বেই অন্যত্র বলেছি, বহুজাতিসংকুল বৃহৎ সোভিয়েট সাম্রাজ্যে আজ কোথাও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মারামারি কাটাকাটি নেই। জারের সাম্রাজ্যিক শাসনে সেটা নিত্যই ঘটত। মনের মধ্যে যে স্বাস্থ্য থাকলে মানবের আত্মীয়সম্বন্ধে বিকৃতি ঘটে না সেই স্বাস্থ্য জাগে শিক্ষায় এবং স্বাধীনতায়। এই শিক্ষা এবং স্বাধীনতা নতুন বর্ষার বন্যাজলের মতো এশিয়ার নদীনালার মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। তাই বহুযুগ পরে এশিয়ার মানুষ আজ আত্মাবমাননার দুর্গতি থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে দাঁড়াল। এই মুক্তিপ্রয়াসের আরম্ভে যতই দুঃখযন্ত্রণা থাক্, তবু এই উদ্যম, মনুষ্যগৌরব লাভের জন্যে এই-যে আপন সব-কিছু পণ করা, এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কিছু নেই। আমাদের এই মুক্তির দ্বারাই সমস্ত পৃথিবী মুক্তি পাবে। এ কথা নিশ্চিত মনে রাখতে হবে, য়ুরোপ আজ নিজের ঘরে এবং নিজের বাইরে আপন বন্দীদের হাতেই বন্দী।

১৯১২ খৃস্টাব্দে যখন য়ুরোপে গিয়েছিলুম তখন একজন ইংরেজ কবি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি এখানে কেন এসেছ।' আমি বলেছিলুম, 'য়ুরোপে মানুষকে দেখতে এসেছি।' য়ুরোপে জ্ঞানের আলো জ্বলছে, প্রাণের আলো জ্বলছে, তাই সেখানে মানুষ প্রচ্ছন্ন নয়, সে নিজেকে নিয়ত নানা দিকে প্রকাশ করছে।

সেদিন পারস্যেও আমাকে একজন ঠিক সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি বলেছিলেম, 'পারস্যে যে মানুষ সত্যিই পারসিক তাকেই দেখতে এসেছি।' তাকে দেখবার কোনো আশা থাকে না দেশে যদি আলো না থাকে। জ্বলেছে আলো জানি। তাই পারস্য থেকে যখন আহ্বান এল তখন আবার একবার দূরের আকাশের দিকে চেয়ে মন চঞ্চল হল।

রোগশয্যা থেকে তখন সবে উঠেছি। ডাক্তারকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলুম না— সাহস ছিল না— গরমের দিনে জলস্থলের উপর দিয়ে রৌদ্রের তাপ এবং কলের নাড়া খেতে খেতে দীর্ঘ পথ বেয়ে চলব সে সাহসেরও অভাব ছিল। আকাশযানে উঠে পড়লুম। ঘরের কোণে একলা বসে যে বালক দিনের পর দিন আকাশের দিকে তাকিয়ে দূরের আহ্বান শুনতে পেত আজ সেই দূরের আহ্বানে সে সাড়া দিল ঐ আকাশের পথ বেয়েই। পারস্যের দ্বারে এসে নামলুম দুদিন পরেই। তার পরদিন সকালে পৌঁছলুম বুশেয়ারে।

৩

বুশেয়ার সমুদ্রের ধারে জাহাজঘাটার শহর। পারস্যের অন্তরঙ্গ স্থান এ নয়।

বৈকালে পারসিক পার্লামেন্টের একজন সদস্য আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। জিজ্ঞাসা করতে চাইলেন আমি কী জানতে চাই। বললুম, পারস্যের শাশ্বত স্বরূপটি জানতে চাই, যে পারস্য আপন প্রতিভায় স্বপ্রতিষ্ঠিত।

তিনি বললেন, বড়ো মুশকিল। সে পারস্য কোথায় কে জানে। এ দেশে এক বৃহৎ দল আছে তারা অশিক্ষিত, পুরোনো তাদের মধ্যে অপভ্রষ্ট, নতুন তাদের মধ্যে অনুদ্গত। শিক্ষিত বিশেষগণে যারা খ্যাত তারা আধুনিক; নতুনকে তারা চিনতে আরম্ভ করেছে, পুরোনোকে তারা চেনে না।

এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে, সকলেরই মধ্যে দেশ প্রকাশমান নয়, বহুর মধ্যে সে অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট। দেশের যথার্থ প্রকাশ কোনো কোনো বিশেষ মানুষের জীবনে ও উপলব্ধিতে। দেশের

আন্তর্ভৌম প্রাণধারা ভাবধারা অকস্মাৎ একটা-কোন্ ফাটল দিয়ে একটি-কোনো উৎসের মুখেই বেরিয়ে পড়ে। যা গভীরের মধ্যে সঞ্চিত তা সর্বত্র বহুলোকের মধ্যে উদ্ঘাটিত হয় না। যা অধিকাংশের আবিল চিত্তের আড়ালে থাকে তা কারও কারও প্রকৃতিগত মানসিক স্বচ্ছতার কাছে সহজেই অভিব্যক্ত হয়। তাঁর পুঁথিগত শিক্ষা কতদূর, তাঁকে দেশ মানে কি মানে না, সে কথা অবান্তর। সেরকম কোনো কোনো দৃষ্টিমান লোক পারস্যে নিশ্চয়ই আছে; তারা সম্ভবত নাম-জাদাদের দলের মধ্যে নয়, এমন-কি, তারা বিদেশীদের কেউ হতেও পারে। কিন্তু পথিক মানুষ কোথায় তাদের খুঁজে পাবে।

যাঁর বাড়িতে আছি তাঁর নাম মাহ্‌মুদ রেজা। তিনি জমিদার ও ব্যবসায়ী। নিজের ঘরদুয়োর ছেড়ে দিয়ে আমাদের জন্য দুঃখ পেয়েছেন কম নয়, নতুন আসবাবপত্র আনিয়ে নিজের অভ্যস্ত আরামের উপকরণকে উল্টোপাল্টা করেছেন। আড়ালে থেকে সমস্তক্ষণ আমাদের প্রয়োজনসাধনে তিনি ব্যস্ত, কিন্তু সর্বদা সমুখে এসে সামাজিকতার অভিঘাতে আমাদের ব্যস্ত করেন না। এঁর বয়স অল্প, শান্ত প্রকৃতি, সর্বদা কর্মপরায়ণ।

সম্মানের সমারোহ এসে অবধি নানা আকারে চলছে। এই জিনিসটাকে আমার মন সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারে না, নিজের মধ্যে আমি এর হিসাব মিলিয়ে পাই নে। বুশেয়ারের এই জনতার মধ্যে আমি কেই-বা। আমার ব্যক্তিগত ইতিহাসে ভাষায় ভাবে কর্মে আমি যে বহুদূরের অজানা মানুষ। য়ুরোপে যখন গিয়েছি তখন আমার কবির পরিচয় আমার সঙ্গেই ছিল। একটা বিশেষ বিশেষণে তারা আমাকে বিচার করেছে। বিচারের উপকরণ ছিল তাদের হাতে। এরাও আমাকে কবি বলে জানে, কিন্তু সে জানা কল্পনায়; এদের কাছে আমি বিশেষ কবি নই, আমি কবি। অর্থাৎ কবি বলতে সাধারণত এরা যা বোঝে তাই সম্পূর্ণ আমার 'পরে আরোপ করতে এদের বাধে নি। কাব্য পারসিকদের নেশা, কবিদের সঙ্গে এদের আন্তরিক মৈত্রী। আমার খ্যাতির সাহায্যে সেই মৈত্রী আমি কোনো দান না দিয়েই পেয়েছি। অন্য দেশে সাহিত্যরসিক মহলেই সাহিত্যিকদের আদর, পলিটিশিয়নদের দরবারে তার আসন পড়ে না, এখানে সেই গণ্ডি দেখা গেল না। যাঁরা সম্মানের আয়োজন করেছেন তাঁরা প্রধানত রাজদরবারীদের দল। মনে পড়ল ঈজিপ্টের কথা। সেখানে যখন গেলেম রাষ্ট্রনেতারা আমার অভ্যর্থনার জন্যে এলেন। বললেন, এই উপলক্ষে তাঁদের পার্লামেন্টের সভা কিছুক্ষণের জন্যে মুলতবি রাখতে হল। প্রাচ্যজাতীয়ের মধ্যেই এটা সম্ভব। এদের কাছে আমি শুধু কবি নই, আমি প্রাচ্য কবি। সেইজন্যে এরা অগ্রসর হয়ে আমাকে সম্মান করতে স্বভাবত ইচ্ছা করেছে কেননা সেই সম্মানের ভাগ এদের সকলেরই। পারসিকদের কাছে আমার পরিচয়ের আরও-একটু বিশিষ্টতা আছে। আমি ইন্ডো-এরিয়ান। প্রাচীন ঐতিহাসিক কাল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত পারস্যে নিজেদের আর্য-অভিমানবোধ বরাবর চলে এসেছে, সম্প্রতি সেটা যেন আরও বেশি করে জেগে ওঠবার লক্ষণ দেখা গেল। এদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ। তার পরে এখানে একটা জনশ্রুতি রটেছে যে, পারসিক মরমিয়া কবিদের রচনার সঙ্গে আমার লেখার আছে সাজাত্য। যেখানে পাঠকের কাছে কবিকে নিজের পথ নিজে অবারিত করে যেতে হয় সেখানে ভূমি বন্ধুর। কিন্তু যে দেশে আমার পাঠক নেই এখানে আমি সেই নিরাপদ দেশের কবি, এখানকার বহুকালের সকল কবিরই রাজপথ আমার পথ। আমার প্রীতির দিক থেকেও এরা আমার কাছে এসেছে সহজ মানুষের সম্বন্ধে—এরা আমার বিচারক নয়, বস্তু যাচাই করে মূল্য দেনা-পাওনার কারবার এদের সঙ্গে নেই। কাছের মানুষ বলে এরা যখন আমাকে অনুভব করেছে তখন ভুল করে নি এরা, সত্যই সহজেই এদের কাছে এসেছি। বিনা বাধায় এদের কাছে আসা সহজ, সেটা স্পষ্টই অনুভব করা গেল। এরা যে অন্য সমাজের, অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের, অন্য সমাজগণ্ডির সেটা আমাকে মনে করিয়ে দেবার মতো কোনো উপলক্ষই আমার গোচর হয় নি। য়ুরোপীয় সভ্যতায় সামাজিক বাঁধা নিয়মের বেড়া, ভারতীয় হিন্দুসভ্যতায় সামাজিক সংস্কারের বেড়া আরও কঠিন। বাংলায় নিজের কোণ থেকে বেরিয়ে পশ্চিমেই যাই, দক্ষিণেই যাই, কারও ঘরের মধ্যে আপন স্থান

করে নেওয়া দুঃসাধ্য, পায়ে পায়ে সংস্কার বাঁচিয়ে চলতে হয়— এমন-কি, বাংলার মধ্যেও। এখানে অশনে আসনে ব্যবহারে মানুষে মানুষে সহজেই মিশে যেতে পারে। এরা আতিথেয় বলে বিখ্যাত, সে আতিথ্যে পঙ্‌ক্তিভেদ নেই।

১৬ এপ্রেল। সকাল সাতটার সময় শিরাজ অভিমুখে ছাড়বার কথা। শরীর যদিও অসুস্থ ও ক্লান্ত তবু অভ্যাসমত ভোরে উঠেছি, তখন আর-সকলে শয্যাগত। সকলে মিলে প্রস্তুত হয়ে বেরতে নটা পেরিয়ে গেল।

মেঠো রাস্তা। মোটরগাড়ির চালচলনের সঙ্গে রাস্তাটার ভঙ্গিমার বনিবনাও নেই। সেই অসামঞ্জস্যের ধাক্কা যাত্রীরা প্রতিমুহূর্তে বুঝেছিল। যাকে বলে হাড়ে হাড়ে বোঝা।

মাঠের পর মাঠ, তার আর শেষ নেই। কোথাও একটা ঘর বা গাছ বা বসতির চিহ্ন দেখি নে। পারস্যদেশের বেশির ভাগ উচ্চ মালভূমি, পাহাড়ে বেষ্টিত, আবার মাঝে মাঝে গিরিশ্রেণী। এই মালভূমি সমুদ্র-উপরিতল থেকে পাঁচ-ছয় হাজার ফিট উঁচু। এর মাঝখানটা নেমে গিয়েছে প্রকাণ্ড এক মরুভূমিতে। এই অধিত্যকায় পাহাড় ডিঙিয়ে মেঘ পেঁছতে বাধা পায়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অতি অল্প। পর্বত থেকে জলস্রোত নেমে মাঝে মাঝে উর্বরতা সৃষ্টি করে। কিন্তু ক্ষীণজল এই স্রোতগুলি সমুদ্র পর্যন্ত প্রায় পেঁছয় না, মরু নেয় তাদের শুষে কিংবা জলার মধ্যে তাদের দুর্গতি ঘটে।

বন্ধুর পথে নাড়া খেতে খেতে ক্রমে সেই বিশাল নীরস শূন্যতার মধ্যে দূরে দেখা যায় খেজুরের কুঞ্জ, কোথাও-বা বাবলা। এই জনবিরল জায়গায় দশ মাইল অন্তর সশস্ত্র পুলিস পাহারা। পথে পথিক প্রায় দেখি নে। আমাদের দেশ হলে আর্তনাদমুখর গোরুর গাড়ি দেখা যেত। এ দেশে তার জায়গায় পিঠের দুই পাশে বোঝা ঝুলিয়ে গাধা কিংবা দল-বাঁধা খচ্চর, মাঝে মাঝে ভেড়ার পাল নিয়ে মেষপালক, দুই-এক জায়গায় কাঁটাঝোপের মধ্যে চরে বেড়াচ্ছে উটের দল।

বেলা যায়, রৌদ্র বেড়ে ওঠে। মোটর-চক্রোৎক্ষিপ্ত ধুলো উড়িয়ে বাতাস বইছে, আমাদের শীতের হাওয়ার মতো ঠাণ্ডা। ক্বচিৎ এক-এক জায়গায় দেখি তোরণওয়ালা মাটির ছোটো কেল্লা, সেখানে মোটর দাঁড় করিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। ডান দিগন্তে একটা পাহাড়ের চেহারা ফুটে উঠছে, যাত্রা-আরম্ভে আকাশের ঘোলা নীলের মধ্যে এ পাহাড় অবগুণ্ঠিত ছিল।

এই অঞ্চলটায় বাখ্‌ত্রি জাতের বাস, তাদের ভাষা তুর্কি। পূর্বতন রাজার আমলে এখানে তাদের বসতি পত্তন হয়। এদের ব্যাবসা ছিল দস্যুবৃত্তি। নূতন আমলে এদের ঠাণ্ডা করা হচ্ছে। শোনা গেল কিছুদিন আগে পথের মধ্যে এরা একটা সাঁকো ভেঙে রেখেছিল। মালবোঝাই মোটরবাস উল্টে পড়তেই খুনজখম লুটপাট করে। এই ঘটনার পরে রাজা তাদের প্রধানের ছেলেকে জামিনস্বরূপে তেহেরানে নিয়ে রেখেছেন। শাস্তিটা কঠোর নয়, অথচ কেজো। এই জাতের দলপতি শাক্‌রুল্লা খাঁ তাঁর বসতিগ্রাম থেকে এসে আমাদের অভিবাদন জানিয়ে গেলেন। আর কয়েক বছর আগে হলে এই অভিবাদনের ভাষা সম্পূর্ণ অন্যরকম হত, যাকে বলা যেতে পারত মর্মগ্রাহী। বুশেয়ার থেকে বরাবর আমাদের গাড়ির আগে আগে আর-একটি মোটরে বন্দুকধারী পাহারা চলেছে। প্রথমে মনে করেছিলুম বুঝি-বা এটা রাজকায়দার বাহুল্য অলংকার, এখন বোধ হচ্ছে এর একটি জরুরি অর্থ থাকতেও পারে।

মেটে রাস্তা ক্রমে নুড়ি-বিছানো হয়ে এল। বোঝা যায় পাহাড়ের বুকে উঠছি। পথের প্রান্তে কোথাও-বা গিরিনদী চলেছে পাথরের মধ্য দিয়ে পথ কেটে। কিন্তু তারা তো লোকালয়ের ধাত্রীর কাজ করছে না। মানুষ কোথায়। মাঠে মাঝে মাঝে আকন্দগাছ কুলগাছ উইলো— মাঝে মাঝে গমের খেতে চাষের পরিচয় পাই, কিন্তু চাষীর পরিচয় পাই নে।

মধ্যাহ্ন পেরিয়ে যায়। শিরাজের পথ দীর্ঘ। এক দিনে যেতে কষ্ট হবে বলে স্থির হয়েছে খাজরুনে গবর্নরের আতিথ্যে মধ্যাহ্নভোজন সেরে রাত্রিযাপন করব। কিন্তু বিলম্বে বেরিয়েছি,

সময়মত সেখানে পেঁছবার আশা নেই, তাই পথে কোনার্‌তাখ্‌তে নামে এক জায়গায় প্রহরীদের মেটে আড্ডায় আমাদের মোটর গাড়ি থামল। মাটির মেঝের 'পরে তাড়াতাড়ি কম্বল কার্পেট বিছিয়ে দিলে। সঙ্গে আহার্য ছিল, খেয়ে নিলুম। মনে হল, এ যেন বইয়ে পড়া গল্পের পান্থশালা, খেজুর-কুঞ্জের মাঝখানে।

এবার পাহাড়ে আঁকাবাঁকা চড়াই পথে উঠছি। পাহাড়গুলো সম্পূর্ণ টাক-পড়া, এমন-কি, পাথরেরও প্রাধান্য কম। বড়ো বড়ো মাটির স্তূপ। যেন মুড়িয়ে দেওয়া দৈত্যের মাথা। বোঝা যায় এটা বৃষ্টিবিরল দেশ, নইলে গাছের শিকড় যে মাটিকে বেঁধে রাখে নি বৃষ্টির আঘাতে সে মাটি কতদিন টিঁকতে পারে। স্বল্পপথিক পথে মাঝে মাঝে কেরোসিনের বোঝা নিয়ে গাধা চলেছে। বোঝাই-করা বড়ো বড়ো সরকারি মোটর বাস আমাদের পথ বাঁচিয়ে নড়বড় করে ছুটেছে নীচের দিকে। পাহাড়ের পর পাহাড়, তৃণহীন জনহীন রুক্ষ, যেন পৃথিবীর বুক থেকে একটা তৃষার্ত দৈন্যের অশ্রুহীন কান্না ফুলে ফুলে উঠে শক্ত হয়ে গেছে।

বেলা যায়। এক জায়গায় দেখি পথের মধ্যে খাজরুনের গবর্নর ঘোড়সওয়ার পাঠিয়েছেন আমাদের আগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। বোঝা গেল তাঁরা অনেকক্ষণ ধরে প্রতীক্ষা করছেন।

প্রাসাদে পেঁছলুম। বড়ো বড়ো কমলালেবুগাছের ঘনসংহত বীথিকা; স্নিগ্ধচ্ছায়ায় চোখ জুড়িয়ে দিলে। সেকালের মনোরম বাগান, নাম বাঘ্‌-ই-নজর। নিঃস্ব রিক্ততার মাঝখানে হঠাৎ এইরকম সবুজ ঐশ্বর্যের দানসত্র, এইটেই পারস্যের বিশেষত্ব।

বাগানের তরুতলে আমাদের ভোজের আয়োজন। কিন্তু এখনকার মতো ব্যর্থ হল। আমি নিরতিশয় ক্লান্ত। একটি কার্পেট-বিছানো ছোটো ঘরে খাটের উপর শুয়ে পড়লুম। বাতাসে তাপ নেই, সামনে খোলা দরজা দিয়ে ঘন সবুজের উচ্ছ্বাস চোখে এসে পড়ছে।

কিছুক্ষণ পরে বিছানা ছেড়ে বাগানে গিয়ে দেখি, গাছতলায় বড়ো বড়ো ডেকচিতে মোটা মোটা পাচক রান্না চড়িয়েছে, আমাদের দেশে যজ্ঞের রান্নার মতো। বুঝলুম রাত্রিভোজের উদ্যোগপর্ব।

অতিথির সম্মানে আজ এখানে সরকারি ছুটি। সেই সুযোগে অনেকক্ষণ থেকে লোক জমায়েত হয়েছিল। আমাদের দেরি হওয়াতে ফিরে গেছে। যাঁরা বাকি আছেন তাঁদের সঙ্গে বসে গেলুম। সকলেরই মুখে তাঁদের রাজার কথা। বললেন, তিনি অসামান্য প্রতিভার জোরে দশ বছরের মধ্যে পারস্যের চেহারা বদলিয়ে দিয়েছেন।

এইখানে আধুনিক পারস্য-ইতিহাসের একটুখানি আভাস দেওয়া যেতে পারে।

কাজার-জাতীয় আগা মহম্মদ খাঁর দানবিক নিষ্ঠুরতায় এই ইতিহাসের বর্তমান অধ্যায় আরম্ভ হল। এরা খাঁটি পারসিক নয়। কাজাররা তুর্কিজাতের লোক। তৈমুরলঙ এদের পারস্যে নিয়ে আসে। বর্তমানে রেজা শা পহ্লবীর আমলের পূর্ব পর্যন্ত পারস্যের রাজসিংহাসন এইজাতীয় রাজাদের হাতেই ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শা নাসিরউদ্দিন ছিলেন রাজা। তখন থেকে রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা দেখা দিল। এইসময়ে পারস্যের মন যে জেগে উঠেছে তার একটা নিদর্শন দেখা যায় বাবিপন্থীদের ধর্মবিপ্লবে। ঠিক এই সময়েই রামমোহন রায় বাংলাদেশে প্রচার করেছিলেন ধর্মসংস্কার। নাসিরউদ্দিন অতি নিষ্ঠুরভাবে এই সম্প্রদায়কে দলন করেন।

পারস্যের রাজাদের মধ্যে নাসিরউদ্দিন প্রথম য়ুরোপে যান আর তাঁর আমল থেকেই দেশকে বিদেশীর ঋণজালে জড়িত করা শুরু হল। তাঁর ছেলে মজফ্‌ফরউদ্দিনের আমলে এই জাল বিস্তৃত হবার দিকে চলল। তামাকের ব্যাবসার একচেটে অধিকার তিনি দিলেন এক ইংরেজ কোম্পানিকে। এটা দেশের লোকের সইল না, তারা তামাক বয়কট করে দিলে। দেশসুদ্ধ তামাকখোরদের তামাক ছাড়া সোজা নয়, কিন্তু তাও ঘটল। এই উপায়ে এটা রদ হয়ে গেল, কিন্তু দণ্ড দিতে হল কোম্পানিকে খুব লম্বা মাপে। তার পরে লাগল রাশিয়া, তার হাতে রেলওয়ে। বেলজিয়ম থেকে কর্মচারী এল পারস্যে ট্যাক্স আদায়ের কাজে, ইংরেজও উঠে পড়ে লাগল পারস্য-বিভাগের কাজে।

এ দিকে দেশের লোকের কাছ থেকে ক্রমাগত তাগিদ আসছে রাষ্ট্রসংস্কারের। শেষকালে রাজাকে মেনে নিতে হল। প্রথম পারসিক পার্লামেন্ট খুলল ১৯০৬ খৃস্টাব্দে অক্টোবরে।

এ রাজা মারা গেলেন। ছেলে বসলেন গদিতে, শা মহম্মদ আলি। পারস্যে তখন প্রাদেশিক গবর্নররা ছিল এক-এক নবাববিশেষ, তারা সকল বিষয়েই দেয় বাধা। প্রজারা এদের বরখাস্ত করবার দাবি করলে, আর মাশুল-আদায়ের বেলজিয়ান কর্তাদেরও সরিয়ে দেবার প্রস্তাব পার্লামেন্টে উঠল।

বলা বাহুল্য, দেশের লোক পার্লামেন্ট শাসনপদ্ধতিতে ছিল আনাড়ি। দায়িত্ব হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমে ক্রমে তাদের হাত পেকে উঠল। কিন্তু রাজকোষ শূন্য, রাজস্ববিভাগ ছারখার।

অবশেষে একদা ইংরেজে রাশিয়ানে আপস হয়ে গেল। দুই কর্তার একজন পারস্যের মুণ্ডের দিকে আর-একজন তার লেজের দিকে দুই হাওদা চড়িয়ে সওয়ার হয়ে বসল, অংকুশরূপে সঙ্গে রইল সৈন্যসামন্ত। উত্তর দিকটা পড়ল রুশীয়ের ভাগে, দক্ষিণ দিকটা ইংরেজের, অল্প একটুখানি বাকি রইল সেখানে পারস্যের বাতি টিম্ টিম্ করে জ্বলছে।

রাজায় প্রজায় তকরার বেড়ে চলল। একদিন রাজার দল মোল্লার দলে মিশে পড়ল গিয়ে শহরের উপর, পার্লামেন্টের বাড়ি দিলে ভূমিসাৎ করে। কিন্তু দেশকে দাবিয়ে দিতে পারল না, আবার একবার নতুন করে কনস্টিট্যুশনের পত্তন হল।

ইংরেজ ও রুশ উভয়েই মনে অত্যন্ত ব্যথা পেয়েছে শাহকে দেশের লোক এমন বিশ্রীরকম ব্যস্ত করছে বলে। বলাই বাহুল্য, নতুন কনস্টিট্যুশনের প্রতি তাদের দরদ ছিল না। রুশীয় কর্নেল লিয়াকভ একদিন সৈন্য নিয়ে পড়ল পার্লামেন্টের উপরে। লড়াই বেধে গেল, বড়ো বড়ো অনেক সদস্য গেলেন মারা, কেউ-বা হলেন বন্দী, কেউ-বা গেলেন পালিয়ে। লন্ডন টাইম্‌স্ বললেন, স্পষ্টই প্রমাণ হচ্ছে স্বরাজতন্ত্র ওরিয়েন্টালদের ক্ষমতার অতীত।

তেহেরানকে ভীষণ অত্যাচারে নির্জীব করলে বটে, কিন্তু অন্য প্রদেশে যুদ্ধ চলতে লাগল। শেষে পালাতে হল রাজাকে দেশ ছেড়ে, তাঁর এগারো বছরের ছেলে উঠলেন রাজগদিতে। রাজা যাতে মোটা পেনসন পান ইংরেজ এবং রুশ তার ব্যবস্থা করলেন। রুশীয়ের সাহায্যে পলাতক রাজা আবার এসে দেশ আক্রমণ করলেন। হার হল তাঁর।

আমেরিকা থেকে মর্গ্যান শুস্‌টার এলেন পারস্যের বিধ্বস্ত রাজস্ববিভাগকে খাড়া করে তুলতে। ঠিক যে সময়ে তিনি কৃতকার্য হয়েছেন, রাশিয়া বিরুদ্ধে লাগল। পারস্যের উপর হুকুম জারি হল শুস্‌টারকে বিদায় করতে হবে। প্রস্তাব হল, ইংরেজ এবং রুশের সম্মতি ব্যতীত কোনো বিদেশীকে রাষ্ট্রকার্যে আহ্বান করা চলবে না। এ নিয়ে পার্লামেন্টে বিরুদ্ধ আন্দোলন চলল। কিন্তু টিঁকল না। শুস্‌টার নিলেন বিদায়, রাষ্ট্রসংস্কারকরা কেউ-বা গেলেন জেলে, কেউ-বা গেলেন বিদেশে। এইসময়কার বিবরণ নিয়ে শুস্‌টার *The Strangling of Persia*-নামক যে বই লিখেছেন তার মতো শোকাবহ ইতিহাস অল্পই দেখা যায়।

এ দিকে য়ুরোপের যুদ্ধ বাধল। তখন রুশিয়া সেই সুযোগে পারস্যে আপন আসন আরও ফলাও করে নেবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল। অবশেষে বলশেভিক বিপ্লবের তাড়ায় তারা গেল সরে। এই সুযোগে ইংরেজ বসল উত্তর-পারস্য দখল করে। নিরন্তর লড়াই চলল দেশবাসীদের সঙ্গে।

১৯১৯ খৃস্টাব্দে সার পার্সি কক্স্ এলেন পারস্যে ব্রিটিশ মন্ত্রী। তিনি পারসিক গবর্নমেন্টের এক দলের কাছ থেকে কড়ার করিয়ে নিলেন যে, সমগ্র পারস্যের আধিপত্য থাকবে ইংরেজের হাতে, তার শাসনকার্য ও সৈন্যবিভাগ ইংরেজের অঙ্গুলিসংকেতে চালিত হবে। একে ভদ্রভাষায় বলে প্রোটেক্‌টোরেট্। এর নিগূঢ় অর্থটা সকলেরই কাছে সুবিদিত— অর্থাৎ, ওর উপক্রমণিকা বৈষ্ণবের ঝুলিতে, ওর উপসংহার শাক্তের কবলে। যাই হোক, সম্পূর্ণ পার্লামেন্টের কাছে এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরের জন্যে পেশ করতে কারও সাহস হল না।

এই দুর্যোগের দিনে রেজা খাঁ তাঁর কসাক সৈন্য নিয়ে দখল করলেন তেহেরান। ও দিকে সোভিয়েট গবর্নমেন্ট সৈন্য পাঠিয়ে উত্তর-পারস্যে ইংরেজকে প্রতিরোধ করতে এল। ইংরেজ পারস্য

ত্যাগ করলে। এতকালের নিরন্তর নিপীড়নের পর পারস্য সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লাভ করল। সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন রাজদূত রট্‌স্টাইন এসে এই লেখাপড়া করে দিলেন যে, এত কাল সাম্রাজ্যিক রাশিয়া পারস্যের বিরুদ্ধে যে দলননীতি প্রবর্তন করেছিল সোভিয়েট গবর্নমেন্ট তা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করতে প্রস্তুত। পারস্যের যে-কোনো স্বত্ব রাশিয়ার কবলে গিয়েছিল সমস্তই তাঁরা ফিরিয়ে দিচ্ছেন; রাশিয়ার কাছে পারস্যের যে ঋণ ছিল তার থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হল এবং রাশিয়া পারস্যে যে-সমস্ত পথ বন্দর প্রভৃতি স্বয়ং নির্মাণ করেছিল কোনো মূল্য দাবি না করে সে সমস্তের স্বত্বই পারস্যকে অর্পণ করা হল।

রেজা খাঁ প্রথমে সামরিক বিভাগের মন্ত্রী, তার পরে প্রধান মন্ত্রী, তার পরে প্রজাসাধারণের অনুরোধে রাজা হলেন। তাঁর চালনায় পারস্য অন্তরে বাহিরে নূতন বলে বলিষ্ঠ হয়ে উঠছে। রাষ্ট্রের নানা বিভাগে যে-সকল বিদেশীর অধ্যক্ষতা ছিল তারা একে একে গেছে সরে। শোষণ-লুণ্ঠন-বিভ্রাটের শান্তি হয়ে এল, সমস্ত দেশ জুড়ে আজ কড়া পাহারা দাঁড়িয়ে আছে তর্জনী তুলে। উদ্‌ভ্রান্ত পারস্য আজ নিজের হাতে নিজেকে ফিরে পেয়েছে। জয় হোক রেজা শা পহ্লবীর।

এঁদের কাছে আর-একটা খবর পাওয়া গেল, দেশের টাকা বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। বিদেশ থেকে যারা কারবার করতে আসে সমান মূল্যের জিনিস এখান থেকে না কিনলে তাদের মাল বিক্রি বন্ধ। আমদানি রফতানির মধ্যে অসাম্য না থাকে সেই দিকে দৃষ্টি।

৪

আমার শরীর ক্লান্ত তাই রাত্রের আহার একলা আমার ঘরে পাঠাবেন বলে এঁরা ঠিক করেছিলেন। রাজি হলুম না। বাগানে গাছতলায় দীপের আলোকে সকলের সঙ্গে খেতে বসলুম। এখানকার দেশী ভোজ্য। পোলাও কাবাব প্রভৃতিতে আমাদের দেশের মোগলাই খানার সঙ্গে বিশেষ প্রভেদ দেখা গেল না।

ক্লান্ত শরীরে শুতে গেলুম। যথারীতি ভোরের বেলায় প্রস্তুত হয়ে যখন দরজা খুলে দিয়েছি তখন দুটি-একটি পাখি ডাকতে আরম্ভ করেছে।

যাত্রা যখন আরম্ভ হল তখন বেলা সাড়ে-সাতটা। বাইরে আফিমের খেতে ফুল ধরেছে। গেটের সামনে পথের ওপারে দোকান খুলেছে সবেমাত্র। সুন্দর স্নিগ্ধ সকালবেলা। বাঁ ধারে নিবিড় সবুজ-বর্ণ দাড়িমের বন— গমের খেত, তাতে নতুন চারা উঠেছে। এ বৎসর দীর্ঘ অনাবৃষ্টিতে ফসলে তেজ নেই, তবু এ জায়গাটি তৃণে গুল্মে রোমাঞ্চিত।

উপলবিকীর্ণ পথে ঠোকর খেতে খেতে গাড়ি চলেছে। উঁচু পাহাড়ের পথ অপেক্ষাকৃত নিম্ন-ভূমিতে এসে নামল। অন্যত্র সাধারণত নগরের কিছু আগে থাকতেই তার উপক্রমণিকা দেখা যায়, এখানে তেমন নয়, শূন্য মাঠের প্রান্তে অকস্মাৎ শিরাজ বিরাজমান। মাটির তৈরি পাঁচিলগুলোর উপর থেকে মাঝে মাঝে চোখে পড়ল পপলার কমলালেবু চেস্ট্‌নাট এল্‌ম্‌ গাছের মাথা।

শিরাজের গবর্নর আমাকে সমারোহ করে নিয়ে গেলেন এক বড়ো বাড়িতে সভাগৃহে। কার্পেট পাতা মস্ত ঘর। দুই প্রান্তের দেয়াল-বরাবর অভ্যাগতেরা বসেছেন, তাঁদের সামনে ফলমিষ্টান্ন-সহযোগে চায়ের সরঞ্জাম ছোটো ছোটো টেবিলে সাজানো। এখানে শিরাজের সাহিত্যিকদল ও নানা শ্রেণীর প্রতিনিধিরা উপস্থিত। শিরাজ-নাগরিকদের হয়ে একজন যে অভিবাদন পাঠ করলেন তার মর্ম এই— শিরাজ শহর দুটি চিরজীবী মানুষের গৌরবে গৌরবান্বিত। তাঁদের চিত্তের পরিমণ্ডল তোমার চিত্তের কাছাকাছি। যে উৎস থেকে তোমার বাণী উৎসারিত সেই উৎসধারাতেই এখানকার দুই কবিজীবনের পুষ্পকানন অভিষিক্ত। যে সাদির দেহ এখানকার একটি পবিত্র ভূখণ্ডতলে বহু শতাব্দীকাল চিরবিশ্রামে শয়ান তাঁর আত্মা আজ এই মুহূর্তে এই কাননের আকাশে ঊর্ধ্বে উত্থিত, এবং এখনই কবি হাফেজের পরিতৃপ্ত হাস্য তাঁর স্বদেশবাসীর আনন্দের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

আমি বললেম, যথোচিতভাবে আপনাদের সৌজন্যের প্রতিযোগিতা করি এমন সম্ভাবনা নেই।

কারণ, আপনারা যে ভাষায় আমাকে সম্ভাষণ করলেন সে আপনাদের নিজের, আমার এই ভাষা ধার করা। জমার খাতায় আমার তরফে একটিমাত্র অঙ্ক উঠল, সে হচ্ছে এই যে, আমি সশরীরে এখানে উপস্থিত। বঙ্গাধিপতি একদা কবি হাফেজকে বাংলায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি যেতে পারেন নি। বাংলার কবি পারস্যাধিপের নিমন্ত্রণ পেলে, সে নিমন্ত্রণ রক্ষাও করলে এবং পারস্যকে তার প্রীতি ও শুভকামনা প্রত্যক্ষ জানিয়ে কৃতার্থ হল।

সভার পালা শেষ হলে পর চললেম গবর্নরের প্রাসাদে। পথে যে শিরাজের পরিচয় হল সে নূতন শিরাজ। রাস্তা ঘরবাড়ি তৈরি চলছে। পারস্যের শহরে শহরে এই নূতন রচনার কার্য সর্বত্রই জেগে উঠল, নূতন যুগের অভ্যর্থনায় সমস্ত দেশ উৎসাহিত।

সৈনিকপঙ্‌ক্তির মধ্য দিয়ে বৃহৎ প্রাঙ্গণ পার হয়ে গবর্নরের প্রাসাদে প্রবেশ করলেম। মধ্যাহ্ন-ভোজনের আয়োজন সেখানে অপেক্ষা করছে। কিন্তু অন্য সকল অনুষ্ঠানের পূর্বেই যাতে বিশ্রাম করতে পারি সেই প্রার্থনামতই ব্যবস্থা হল। পরিষ্কার হয়ে নিয়ে আশ্রয় নিলুম শোবার ঘরে। তখন বেলা চারটে। রাত্রে নিমন্ত্রিতবর্গের সঙ্গে আহার করে দীর্ঘদিনের অবসান।

সকালে গবর্নর বললেন, কাছে এক ভদ্রলোকের বাগানবাড়ি আছে, সেটা আমাদের বাসের জন্য প্রস্তুত। সেখানেই আমার বিশ্রামের সুবিধা হবে বলে বাসা-বদল স্থির হল।

১৭ এপ্রেল। আজ অপরাহ্ণে সাদির সমাধিপ্রাঙ্গণে আমার অভ্যর্থনার সভা। গবর্নর প্রথমে নিয়ে গেলেন চেম্বার অফ কমার্সে। সেখানে সদস্যদের সঙ্গে বসে চা খেয়ে গেলেম সাদির সমাধি-স্থানে। পথের দুই ধারে জনতা। কালো কালো আঙরাখায় মেয়েদের সর্বাঙ্গ ঢাকা, মুখেরও অনেকখানি, কিন্তু বুরখা নয়। সাধারণত পুরুষদের কাপড় য়ুরোপীয়, ক্বচিৎ দেখা গেল পাগড়ি ও লম্বা কাপড়। বর্তমান রাজার আদেশে দেশের পুরুষেরা যে টুপি পরেছে তার নাম পহ্লবী টুপি। সেটা কপালের সামনে কানা-তোলা ক্যাপ।

আমাদের গান্ধিটুপি যেমন শ্রীহীন, ভারতের-প্রথা-বিরুদ্ধ ও বিদেশী-ঘেঁষা এও সেইরকম। কর্মিষ্ঠতার যুগে সাজের বাহুল্য স্বভাবতই খসে পড়ে। তা ছাড়া একেলে বেশ শ্রেণীনির্বিশেষে বড়ো ছোটো সকলেরই সুলভ ও উপযোগী হবার দিকে ঝোঁক। য়ুরোপে একদা দেশে দেশে, এমন-কি, এক দেশেই, বেশের বৈচিত্র্য যথেষ্ট ছিল। অথচ সমস্ত য়ুরোপ আজ এক পোশাক পরেছে, তার কারণ সমস্ত য়ুরোপের উপর দিয়ে বয়েছে একই হাওয়া। সময় অল্প, কাজের তাড়া বেশি, তার উপর সামাজিক শ্রেণীভেদ হালকা হয়ে এসেছে। আজ য়ুরোপের বেশ শুধু যে শক্ত মানুষের, তৎপর মানুষের তা নয়, এ বেশ সাধারণ মানুষের— যারা সবাই একই বড়ো রাস্তায় চলে। আজ পারস্য তুরুস্ক ঈজিপ্ট এবং আরবের যে অংশ জেগেছে সবাই এই সর্বজনীন উর্দি গ্রহণ করেছে, নইলে বুঝি মনের বদল সহজ হয় না। জাপানেও তাই। আমাদেরও ধুতি-পরা ঢিলে মন বদল করতে হলে হয়তো-বা পোশাক বদলানো দরকার। আমরা বহুকাল ছিলুম বাবু, হঠাৎ হয়েছি খণ্ড-ত-ওয়ালা শ্রীযুৎ অথচ বাবুর দোদুল্যমান বেশই কি চিরকাল থাকবে। ওটাতে যে বসনবাহুল্য আছে সেটা যাই-যাই করছে, হাঁটু পর্যন্ত ছাঁটা পায়জামা দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। যুগের হুকুম শুধু মনে নয়, গায়ে এসেও লাগল। মেয়েদের বেশে পরিবর্তনের ধাক্কা এমন করে লাগে নি— কেননা মেয়েরা অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সেতু, পুরুষরা বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের।

সাদির সমাধিতে স্থাপত্যের গুণপনা কিছুই নেই। আজকের মতো ফুল দিয়ে প্রদীপ দিয়ে কবরস্থান সাজানো হয়েছে। সেখান থেকে সমাধির পশ্চাতে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বৃহৎ জনসভার মধ্যে গিয়ে আসন নিলুম। চত্বরের সামনে সমুচ্চ প্রাচীর অতি সুন্দর বিচিত্র কার্পেটে আবৃত করা হয়েছে, মেজের উপরেও কার্পেট পাতা। সভাস্থ সকলেরই সামনে প্রাঙ্গণ ঘিরে ফল মিষ্টান্ন সাজানো। সভার ডান দিকে নীলাভ পাহাড়ের প্রান্তে সূর্য অস্তোন্মুখ। বামে সভার বাইরে পথের ও পারে উচ্চভূমিতে ভিড় জমেছে— অধিকাংশই কালো কাপড়ে আচ্ছন্ন স্ত্রীলোক, মাঝে মাঝে বন্দুকধারী প্রহরী।

তিনটি পারসিক ভদ্রলোক তেহেরান থেকে এসেছেন আমাদের পথের সুবিধা করে দেবার জন্যে। এঁদের মধ্যে একজন আছেন তিনি পররাষ্ট্রবিভাগীয় মন্ত্রীর ভাই ফেরুঘি। সকলে বলেন ইনি ফিলজফার; সৌম্য শান্ত এঁর মূর্তি। ইনি ফ্রেঞ্চ জানেন, কিন্তু ইংরেজি জানেন না। তবু কেবলমাত্র সংসর্গ থেকে এঁর নীরব পরিচয় আমাকে পরিতৃপ্তি দেয়। ভাষার বাধায় যে-সব কথা ইনি বলতে পারলেন না, অনুমানে বুঝতে পারি সেগুলি মূল্যবান। ইনি আশা প্রকাশ করলেন আমার পারস্যে আসা সার্থক হবে। আমি বললুম, আপনাদের পূর্বতন সূফীসাধক কবি ও রূপকার যাঁরা আমি তাঁদেরই আপন, এসেছি আধুনিক কালের ভাষা নিয়ে; তাই আমাকে স্বীকার করা আপনাদের পক্ষে কঠিন হবে না। কিন্তু নূতন কালের যা দান তাকেও আমি অবজ্ঞা করি নে। এ যুগে য়ুরোপ যে সত্যের বাহনরূপে এসেছে তাকে যদি গ্রহণ করতে না পারি তা হলে তার আঘাতকেই গ্রহণ করতে হবে। তাই বলে নিজের আন্তরিক ঐশ্বর্যকে হারিয়ে বাহিরের সম্পদকে গ্রহণ করা যায় না। যে দিতে পারে সেই নিতে পারে, ভিক্ষুক তা পারে না।

আজ সকালে হাফেজের সমাধি হয়ে বাগানবাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেবার কথা। তার পূর্বে গবর্নরের সঙ্গে এখানকার রাজার সম্বন্ধে আলাপ হল। একদা রেজা শা ছিলেন কসাক সৈন্যদলের অধিপতি মাত্র। বিদ্যালয়ে য়ুরোপের শিক্ষা তিনি পান নি, এমন-কি, পারসিক ভাষাতেও তিনি কাঁচা। আমার মনে পড়ল আমাদের আকবর বাদশাহের কথা। কেবল যে বিদেশীর কবল থেকে তিনি পারস্যকে বাঁচিয়েছেন তা নয়, মোল্লাদের আধিপত্যজালে দৃঢ়বন্ধ পারস্যকে মুক্তি দিয়ে রাষ্ট্রতন্ত্রকে প্রবল ও অচল বাধা থেকে উদ্ধার করেছেন।

আমি বললুম, দুর্ভাগা ভারতবর্ষ, জটিল ধর্মের পাকে আপাদমস্তক জড়ীভূত ভারতবর্ষ। অন্ধ আচারের বোঝার তলে পঙ্গু আমাদের দেশ, বিধিনিষেধের নিরর্থকতায় শতধাবিভক্ত আমাদের সমাজ।

গবর্নর বললেন, সাম্প্রদায়িক ধর্মের বেড়া ডিঙিয়ে যতদিন না ভারত একাত্ম হবে ততদিন গোলটেবিল বৈঠকের বরগ্রহণ করে তার নিষ্কৃতি নেই। অন্ধ যারা তারা ছাড়া পেলেও এগোয় না, এগোতে গেলেও মরে গর্তে পড়ে।

অবশেষে হাফেজের সমাধি দেখতে বেরলুম। নূতন রাজার আমলে এই সমাধির সংস্কার চলছে। পুরোনো কবরের উপর আধুনিক কারখানায় ঢালাই-করা জালির কাজের একটা মণ্ডপ তুলে দেওয়া হয়েছে। হাফেজের কাব্যের সঙ্গে এটা একেবারেই খাপ খায় না। লোহার বেড়ায় ঘেরা কবি-আত্মাকে মনে হল যেন আমাদের পুলিস-রাজত্বের অর্ডিনান্সের কয়েদী।

ভিতরে গিয়ে বসলুম। সমাধিরক্ষক একখানি বড়ো চৌকো আকারের বই এনে উপস্থিত করলে। সেখানি হাফেজের কাব্যগ্রন্থ। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, কোনো একটি বিশেষ ইচ্ছা মনে নিয়ে চোখ বুজে এই গ্রন্থ খুলে যে কবিতাটি বেরবে তার থেকে ইচ্ছার সফলতা নির্ণয় হবে। কিছু আগেই গবর্নরের সঙ্গে যে বিষয় আলোচনা করেছিলুম সেইটেই মনে জাগছিল। তাই মনে মনে ইচ্ছা করলুম ধর্মনামধারী অন্ধতার প্রাণান্তিক ফাঁস থেকে ভারতবর্ষ যেন মুক্তি পায়।

যে পাতা বেরল তার কবিতাকে দুই ভাগ করা যায়। ইরানী ও কয়জনে মিলে যে তর্জমা করেছেন তাই গ্রহণ করা গেল। প্রথম অংশের প্রথম শ্লোকটি মাত্র দিই। কবিতাটিকে রূপকভাবে ধরা হয়, কিন্তু সরল অর্থ ধরলে সুন্দরী প্রেয়সীই কাব্যের উদ্দিষ্ট।

প্রথম অংশ। মুকুটধারী রাজারা তোমার মনোমোহন চক্ষুর দাস, তোমার কণ্ঠ থেকে যে সুধা নিঃসৃত হয় জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমানেরা তার দ্বারা অভিভূত।

দ্বিতীয় অংশ। স্বর্গদ্বার যাবে খুলে, আর সেইসঙ্গে খুলবে আমাদের সমস্ত জটিল ব্যাপারের গ্রন্থি, এও কি হবে সম্ভব। অহংকৃত ধার্মিকনামধারীদের জন্যে যদি তা বন্ধই থাকে তবে ভরসা রেখো মনে ঈশ্বরের নিমিত্তে তা যাবে খুলে।

বন্ধুরা প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের সংগতি দেখে বিস্মিত হলেন।

এই সমাধির পাশে বসে আমার মনের মধ্যে একটা চমক এসে পৌঁছল, এখানকার এই বসন্ত-প্রভাতে সূর্যের আলোতে দূরকালের বসন্তদিন থেকে কবির হাস্যোজ্জ্বল চোখের সংকেত। মনে হল আমরা দুজনে একই পানশালার বন্ধু, অনেকবার নানা রসের অনেক পেয়ালা ভরতি করেছি। আমিও তো কতবার দেখেছি আচারনিষ্ঠ ধার্মিকদের কুটিল ভ্রূকুটি। তাদের বচনজালে আমাকে বাঁধতে পারে নি; আমি পলাতক, ছুটি নিয়েছি অবাধপ্রবাহিত আনন্দের হাওয়ায়। নিশ্চিত মনে হল আজ, কত-শত বৎসর পরে জীবনমৃত্যুর ব্যবধান পেরিয়ে এই কবরের পাশে এমন একজন মুসাফির এসেছে যে মানুষ হাফেজের চিরকালের জানা লোক।

ভরপুর মন নিয়ে বাগানবাড়িতে এলুম। যাঁর বাড়ি তাঁর নাম শিরাজী। কলকাতায় ব্যাবসা করেন। তাঁরই ভাইপো খলীলি আতিথ্যভার নিয়েছেন। পরিষ্কার নতুন বাড়ি, সামনেটি খোলা, অদূরে একটি ছোটো পাহাড়। কাঁচের শার্সির মধ্যে দিয়ে প্রচুর আলো এসে সুসজ্জিত ঘর উজ্জ্বল করে রেখেছে। প্রত্যেক ঘরেই ছোটো ছোটো টেবিলে বাদাম কিশমিশ মিষ্টান্ন সাজানো।

চা খাওয়া হলে পর এখানকার গান-বাজনার কিছু নমুনা পেলুম। একজনের হাতে কানুন, একজনের হাতে সেতারজাতীয় বাজনা, গায়কের হাতে তাল দেবার যন্ত্র—বাঁয়া-তবলার একত্রে মিশ্রণ। সংগীতের তিনটি ভাগ। প্রথম অংশটা চটুল, মধ্য অংশ ধীরমন্দ সকরুণ, শেষ অংশটা নাচের তালে। আমাদের দিশি সুরের সঙ্গে স্থানে স্থানে অনেক মিল দেখতে পাই। বাংলাদেশের সঙ্গে একটা ঐক্য দেখছি—এখানকার সংগীত কাব্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়।

ইস্ফাহানে যাত্রা করবার পূর্বে বিশ্রাম করে নিচ্ছি। বসে আছি দোতলার মাদুর-পাতা লম্বা বারান্দায়। সম্মুখপ্রান্তে রেলিঙের গায়ে গায়ে টবে সাজানো পুষ্পিত জেরেনিয়ম। নীচের বাগানে ফুলের কেয়ারির মাঝখানে ছোটো জলাশয়ে একটি নিষ্ক্রিয় ফোয়ারা, আর সেই কেয়ারিকে প্রদক্ষিণ করে কলশব্দে জলস্রোত বয়ে চলেছে। অদূরে বনস্পতির বীথিকা। আকাশে পাণ্ডুর নীলিমার গায়ে তরুহীন বলি-অঙ্কিত পাহাড়ের তরঙ্গায়িত ধূসর রেখা। দূরে গাছের তলায় কারা একদল বসে গল্প করছে। ঠাণ্ডা হাওয়া, নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন। শহর থেকে দূরে আছি, জনতার সম্পর্ক নেই, পাখিরা কিচিমিচি করে উড়ে বেড়াচ্ছে তাদের নাম জানি নে। সঙ্গীরা শহরে কে কোথায় চলে গেছে, চিরক্লান্ত দেহ চলতে নারাজ তাই একলা বসে আছি। পারস্যে আছি সে কথা বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবার কিছুই নেই। এই আকাশ, বাতাস, কম্পমান সবুজ পাতার উপর কম্পমান এই উজ্জ্বল আলো, আমারই দেশের শীতকালের মতো।

শিরাজ শহরটি যে প্রাচীন তা বলা যায় না। আরবেরা পারস্য জয় করার পরে তবে এই শহরের উদ্ভব। সাফাবি-শাসনকালে শিরাজের যে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল আফগান আক্রমণে তা ধ্বংস হয়ে যায়। আগে ছিল শহর ঘিরে পাথরের তোরণ, সেটা ভূমিসাৎ হয়ে তার জায়গায় উঠেছে মাটির দেয়াল। নিষ্ঠুর ইতিহাসের হাত থেকে পারস্য যেমন বরাবর আঘাত পেয়েছে পৃথিবীতে আর-কোনো দেশ এমন পায় নি, তবু তার জীবনীশক্তি বার বার নিজের পুনঃসংস্কার করেছে। বর্তমান যুগে আবার সেই কাজে সে লেগেছে, জেগে উঠেছে আপন মূর্ছিত দশা থেকে।

৫

চলেছি ইস্ফাহানের দিকে। বেলা সাতটার পর শিরাজের পুরদ্বার দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। গিরি-শ্রেণীর মধ্য দিয়ে চলা শুরু হল। পিছনে তাকিয়ে মনে হয় যেন গিরিপ্রকৃতি শিলাঞ্জলিতে শিরাজকে অর্ঘ্যরূপে ঢেলে দিয়েছে।

শিরাজের বাইরে লোকালয় একেবারে অন্তর্হিত, তার পরিশিষ্ট কিছুই নেই, গাছপালাও

দেখা যায় না। বৈচিত্র্যহীন রিক্ততার মধ্য দিয়ে যে পথ চলেছে এ'কেবে'কে সেটা মোটর-রথের পক্ষে প্রশস্ত ও অপেক্ষাকৃত অবন্ধুর।

প্রায় এক ঘণ্টার পথ পেরিয়ে বাঁয়ে দেখা গেল শস্যখেত, গম এবং আফিম। কিন্তু গ্রাম দেখি নে, দিগন্ত পর্যন্ত অবারিত। মাঝে মাঝে ঝাঁকড়া-লোম-ওয়ালা ভেড়ার পাল, কোথাও-বা ছাগলের কালো রোঁয়ায় তৈরি চৌকো তাঁবু। শস্যশ্যামল মাঠ ক্রমে প্রশস্ত হয়ে চলেছে। দূরের পাহাড়গুলো খাটো হয়ে এল, যেন তারা পাহাড়ের শাবক।

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল অনতিদূরে পার্সিপোলিস। দিগ্‌বিজয়ী দরিয়ুসের প্রাসাদের ভগ্নশেষ। উচ্চ মাটির মঞ্চ, তার উপরে ভাঙা ভাঙা বড়ো বড়ো পাথরের থাম, অতীত মহাযুগ যেন আকাশে অক্ষম বাহু তুলে নির্মম কালকে ধিক্কার দিচ্ছে।

আমাকে চৌকিতে বসিয়ে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে তুলে নিয়ে গেল। পিছনে পাহাড়, ঊর্ধ্বে শূন্য, নীচে দিগন্তপ্রসারিত জনশূন্য প্রান্তর, তারই প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে এই পাথরের রুদ্ধবাণীর সংকেত। বিখ্যাত পুরাবশেষবিৎ জর্মান ডাক্তার হর্ট্জ্‌ফেল্‌ট্‌ এই পুরাতন কীর্তি উদ্ঘাটন করবার কাজে নিযুক্ত। তিনি বললেন, বার্লিনে আমার বক্তৃতা শুনেছেন আর হোটেলেও আমার সঙ্গে তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন।

পাথরের থামগুলো কোনোটা ভাঙা, কোনোটা অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ। নিরর্থক দাঁড়িয়ে, ছড়িয়ে, ম্যুজিয়মে অতিকায় জন্তুর অসংলগ্ন অস্থিগুলোর মতো। ছাদের জন্যে যে-সব কাঠ লেগেছিল, হিসাবের তালিকায় দেখা গেছে, ভারতবর্ষ থেকে আনীত সেগুন কাঠও ছিল তার মধ্যে। খিলেন বানাবার বিদ্যা তখন জানা ছিল না বলে পাথরের ছাদ সম্ভব হয় নি। কিন্তু যে বিদ্যার জোরে এই-সকল গুরুভার অতি প্রকাণ্ড পাথরগুলি যথাস্থানে বসানো হয়েছিল সে বিদ্যা আজ সম্পূর্ণ বিস্মৃত। দেখে মনে পড়ে মহাভারতের ময়দানবের কথা। বোঝা যায় বিশাল প্রাসাদ-নির্মাণের বিদ্যা যাদের জানা ছিল তারা যুধিষ্ঠিরের স্বজাতি ছিল না। হয়তো-বা এই দিক থেকেই রাজমিস্ত্রি গেছে। যে পুরোচন পাণ্ডবদের জন্যে সুড়ঙ্গ বানিয়েছিল সেও তো যবন।

ডাক্তার বললেন, আলেকজান্ডার এই প্রাসাদ পুড়িয়ে ফেলেছিলেন সন্দেহ নেই। আমার বোধ হয় পরকীর্তি-অসহিষ্ণু ঈর্ষ্যাই তার কারণ। তিনি চেয়েছিলেন মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করতে, কিন্তু মহাসাম্রাজ্যের অভ্যুদয় তাঁর আগেই দেখা দিয়েছিল। আলেকজান্ডার আকেমেনীয় সম্রাটদের পারস্যকে লণ্ডভণ্ড করে গিয়েছেন।

এই পার্সিপোলিসে ছিল দরিয়ুসের গ্রন্থাগার। বহু সহস্র চর্মপত্রে রুপালি সোনালি অক্ষরে তাঁদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা লিপিকৃত হয়ে এইখানে রক্ষিত ছিল। যিনি এটাকে ভস্মসাৎ করেছিলেন তাঁর ধর্ম এর কাছে বর্বরতা। আলেকজান্ডার আজ জগতে এমন কিছুই রেখে যান নি যা এই পার্সিপোলিসের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপে তুলনীয় হতে পারে। এখানে দেয়ালে খোদিত মূর্তিশ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় দরিয়ুস আছেন রাজছত্রতলে, আর তাঁর সম্মুখে বন্দী ও দাসেরা অর্ঘ্য বহন করে আনছে। পরবর্তীকালে ইস্ফাহানের কোনো উজির এই শিলালেখ্য ভেঙে বিদীর্ণ বিকলাঙ্গ করে দিয়েছে।

পারস্যে আর-এক জায়গা খনন করে প্রাচীনতর বিস্মৃত যুগের জিনিস পাওয়া গেছে। অধ্যাপক তারই একটি নকশা-কাটা ডিমের খোলার পাত্র আমাকে দেখালেন। বললেন, মহেঞ্জদারোর যেরকম কারুচিত্র এও সেই জাতের। সার্ অরেল্‌স্টাইন মধ্য-এশিয়া থেকেও এমন কিছু কিছু জিনিস পেয়েছেন মহেঞ্জদারোয় যার সাদৃশ্য মেলে। এইরকম বহুদূরবিক্ষিপ্ত প্রমাণগুলি দেখে মনে হয় আধুনিক সকল সভ্যতার পূর্বে একটা বড়ো সভ্যতা পৃথিবীতে তার লীলা বিস্তার করে অন্তর্ধান করেছে।

অধ্যাপক এই ভগ্নশেষের এক অংশ সংস্কার করে নিজের বাসা করে নিয়েছেন। ঘরের চারি দিকে লাইব্রেরি এবং নানাবিধ সংগ্রহ। দরিয়ুস জারাক্সিস এবং আর্টাজারাক্সিস এই তিন-পুরুষ-বাহী সম্রাটের লুপ্তশেষ সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে অধ্যাপক নিভৃতে খুব আনন্দে আছেন।

এ দেশে আসবামাত্র সব চেয়ে লক্ষ করা যায় পূর্ব-এশিয়ার সঙ্গে পশ্চিম-এশিয়ার প্রাকৃতিক চেহারার সম্পূর্ণ পার্থক্য। উভয়ে একেবারেই বিপরীত বললেই হয়। আফগানিস্থান থেকে আরম্ভ করে মেসোপোটেমিয়া হয়ে আরব্য পর্যন্ত নির্দয়ভাবে নীরস কঠিন। পূর্ব-এশিয়ার গিরিশ্রেণী ধরণীর প্রতিকূলতা করে নি, তাদেরই প্রসাদবর্ষণে সেখানকার সমস্ত দেশ পরিপুষ্ট। কিন্তু পশ্চিমে তারা পৃথিবীকে বন্ধুর করেছে এবং অবরুদ্ধ করেছে আকাশের রসের দৌত্য। মাঝে মাঝে খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত আকারে এখানকার অনাদৃত মাটি উর্বরতার স্পর্শ পায়, দুর্লভ বলেই তার লোভনীয়তা প্রবল, মনোহর তার রমণীয়তা।

সৌভাগ্যক্রমে এরা বাহন পেয়েছে উট এবং ঘোড়া, আর জীবিকার জন্যে পালন করেছে ভেড়ার পাল। এই জীবিকার অনুসরণ করে এখানকার মানুষকে নিরন্তর সচল হয়ে থাকতে হল। এই পশ্চিম-এশিয়ার অধিবাসীরা বহু প্রাচীনকাল থেকেই বারে বারে বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে— তার মূল প্রেরণা পেয়েছে এখানকার ভূমির কঠোরতা থেকে, যা তাদের বাইরে ঠেলে বের করে দেয়। তারা প্রকৃতির অযাচিত আতিথ্য পায় নি, তাদের কেড়ে খেতে হয়েছে পরের অন্ন, আহার সংগ্রহ করতে হয়েছে নূতন নূতন ক্ষেত্রে এগিয়ে এগিয়ে।

এখানে পল্লীর চেয়ে প্রাধান্য দুর্গরক্ষিত প্রাচীরবেষ্টিত নগরের। কত প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসশেষ পাশ্চাত্য এশিয়ায় ধূলিপরিকীর্ণ। কৃষিজীবীদের স্থান পল্লী, সেখানে ধন স্বহস্তে উৎপাদন করতে হয়। নগর প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জয়জীবী যোদ্ধৃদের প্রতাপের উপরে। সেখানে সম্পদ সংগ্রহ ও রক্ষণ না করলে পরাভব। ভারতবর্ষে কৃষিজীবিকার সহায় গোরু, মধ্য ও পশ্চিম-এশিয়ায় জয়জীবিকার সহায় ঘোড়া। পৃথিবীতে কী মানুষের, কী বাহনের, কী অস্ত্রের ত্বরিত গতিই জয়সাধনের প্রধান উপায়। তাই একদিন মধ্য-এশিয়ার মরুবাহী অশ্বপালক মোগল বর্বরেরা বহুদূরে পৃথিবীতে ভীষণ জয়ের সর্বনেশে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। চিরচলিষ্ণুতাই তাদের করে তুলেছিল দুর্ধর্ষ। অন্নসংকোচের জন্যেই এরা এক-একটি জ্ঞাতিজাতিতে বিভক্ত, এই জ্ঞাতিজাতির মধ্যে দুর্ভেদ্য ঐক্য। যে কারণেই হোক, তাদের এই ঐক্য যখন বহু শাখাধারার সম্মিলিত ঐক্যে স্ফীত হয়েছে তখন তাদের জয়বেগকে কিছুতে ঠেকাতে পারে নি। বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন আরবীয় মরুবাসী জ্ঞাতিজাতিরা যখন এক অখণ্ড ধর্মের ঐক্যে এক দেবতার নামে মিলেছিল তখন অচিরকালের মধ্যেই তাদের জয়পতাকা উড়েছিল কালবৈশাখীর রক্তরাগরঞ্জিত মেঘের মতো দূরে পশ্চিমদিগন্ত থেকে দূরে পূর্বদিক্-প্রান্ত পর্যন্ত।

একদা আর্যজাতির এক শাখা পর্বতাবকীর্ণ মরুবেষ্টিত পারস্যের উচ্চভূমিতে আশ্রয় নিলে। তখন কোনো-এক অজ্ঞাতনামা সভ্যজাতি ছিল এখানে। তাদের রচিত যে-সকল কারুদ্রব্যের চিহ্নশেষ পাওয়া যায় তার নৈপুণ্য বিস্ময়জনক। বোধ করি বলা যেতে পারে মহেঞ্জদারো-যুগের মানুষ। তাদের সঙ্গে এদের হাতের কাজের মিল আছে। এই মিল এশিয়ায় বহুদূরবিস্তৃত। মহেঞ্জদারোর স্মৃতিচিহ্নের সাহায্যে তৎকালীন ধর্মের যে চেহারা দেখতে পাই অনুমান করা যায়, সে বৃষভবাহন শিবের ধর্ম। রাবণ ছিলেন শিবপূজক, রাম ভেঙেছিলেন শিবের ধনু। রাবণ যে জাতের মানুষ সে জাতি না ছিল অরণ্যচর, না ছিল পশুপালক। রামায়ণগত জনশ্রুতি থেকে বোঝা যায়, সে জাতি পরাভূত দেশ থেকে ঐশ্বর্যসংগ্রহ করে নিজের রাজধানীকে সমৃদ্ধ করেছে এবং অনেকদিন বাহুবলে উপেক্ষা করতে পেরেছে আর্যদেবতা ইন্দ্রকে। সে জাতি নগরবাসী। মহেঞ্জদারোর সভ্যতাও নাগরিক। ভারতের আদিম আরণ্যক বর্বরতর জাতির সঙ্গে যোগ দিয়ে আর্যেরা এই সভ্যতা নষ্ট করে। সেদিনকার দ্বন্দ্বের একটা ইতিহাস আছে পুরাণকথায়, দক্ষযজ্ঞে। একদা বৈদিক হোমের আগুন নিবিয়েছিল শিবের উপাসক, আজও হিন্দুরা সে উপাখ্যান পাঠ করে ভক্তির সঙ্গে। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের কাছে বৈদিক দেবতার খর্বতার কথা গৌরবের সঙ্গে পৌরাণিক ভারতে আখ্যাত হয়ে থাকে।

খৃস্টজন্মের দেড়হাজার বছর পূর্বে ইরানী আর্যরা পারস্যে এসেছিলেন, য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকদের এই মত। তাঁদের হোমাগ্নির জয় হল। ভারতবর্ষ বৃহৎ দেশ, উর্বর, জনসংকুল। সেখানকার

আদিমজাতের নানা ধর্ম, নানা রীতি। তার সঙ্গে জড়িত হয়ে বৈদিক ধর্ম আচ্ছন্ন পরিবর্তিত ও অনেক অংশে পরিবর্জিত হল— বহুবিধ, এমন-কি, পরস্পরবিরুদ্ধ হল তার আচার— নানা দেবদেবী নানা সম্প্রদায়ের সঙ্গে অভ্যাগত হওয়াতে ভারতবর্ষে ধর্মজটিলতার অন্ত রইল না। পারস্যে এবং মোটের উপর পাশ্চাত্য এশিয়ার সর্বত্রই বাসযোগ্য স্থান সংকীর্ণ এবং সেখানে অন্নক্ষেত্রের পরিধি পরিমিত। সেই ছোটো জায়গায় যে আর্যেরা বাসপত্তন করলেন তাঁদের মধ্যে একটি বিশুদ্ধ সংহতি রইল, অনার্যজনতার প্রভাবে তাঁদের ধর্মকর্ম বহু জটিল ও বিকৃত হল না। এশিয়ার এই বিভাগে কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোপ্রায় জাতির বসতি ছিল তার প্রমাণ পুরাতন সাহিত্যে আছে, কিন্তু ইরানীয়দের আর্যত্বকে তারা অভিভূত করতে পারে নি।

পারস্যের ইতিহাস যখন শাহনামার পুরাণকথা থেকে বেরিয়ে এসে স্পষ্ট হয়ে উঠল তখন পারস্যে আর্যদের আগমন হাজার বছর পেরিয়ে গেছে। তখন দেখি আর্যজাতির দুই শাখা পারস্য-ইতিহাসের আরম্ভকালকে অধিকার করে আছে, মীদিয় এবং পারসিক। মীদিয়েরা প্রথমে এসে উপনিবেশ স্থাপন করে, তার পরে পারসিক। এই পারসিকদের দলপতি ছিলেন হখমানিশ। তাঁরই নাম-অনুসারে এই জাতি গ্রীকভাষায় আকেমেনিড (Achaemenid) আখ্যা পায়। খৃস্টজন্মের সাড়ে-পাঁচশো বছর পূর্বে আকেমেনীয় পারসিকেরা মীদিয়দের শাসন থেকে সমস্ত পারস্যকে মুক্ত ক'রে নিজেদের অধীনে একচ্ছত্র করে। সমগ্র পারস্যের সেই প্রথম অদ্বিতীয় সম্রাট ছিলেন বিখ্যাত সাইরস, তাঁর প্রকৃত নাম খোরাস। তিনি শুধু যে সমস্ত পারস্যকে এক করলেন তা নয়, সেই পারস্যকে এমন এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের চূড়ায় অধিষ্ঠিত করলেন সে যুগে যার তুলনা ছিল না। এই বীরবংশের এক পরম দেবতা ছিলেন অহুরমজ্‌দা। ভারতীয় আর্যদের বরুণদেবের সঙ্গেই তাঁর সাজাত্য। বাহ্যিক প্রতিমার কাছে বাহ্যিক পূজা আহরণের দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টাই তাঁর আরাধনা ছিল না। তিনি তাঁর উপাসকদের কাছ থেকে চেয়েছিলেন সাধু চিন্তা, সাধু বাক্য ও সাধু কর্ম। ভারতবর্ষের বৈদিক আর্যদেবতার মতোই তাঁর মন্দির ছিল না, এবং এখানকার মতোই ছিল অগ্নিবেদী।

তখনকার কালের সেমেটিক জাতীয়দের যুদ্ধে দয়াধর্ম ছিল না। দেশজোড়া হত্যা লুঠ বিধ্বংসন বন্ধন নির্বাসন, এই ছিল রীতি। কিন্তু সাইরস ও তাঁর পরবর্তী সম্রাটদের রাষ্ট্রনীতি ছিল তার বিপরীত। তাঁরা বিজিত দেশে ন্যায়বিচার, সুব্যবস্থা ও শান্তি স্থাপন করে তাকে সমৃদ্ধিশালী করেছেন। য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকেরা বলেন, পারসিক রাজারা যুদ্ধ করেছেন মিতাচারিতার সঙ্গে, বিজিত জাতিদের প্রতি অনির্দয় হিতৈষণা প্রকাশ করেছেন, তাদের ধর্মে তাদের আচারে হস্তক্ষেপ করেন নি, তাদের স্বাদেশিক দলনায়কদের স্বপদে রক্ষা করেছেন। তার প্রধান কারণ, কী যুদ্ধে, কী দেশজয়ে, তাঁদের ধর্মনীতিকে তাঁরা ভুলতে পারেন নি। ব্যাবিলোনিয়ায় আসীরিয়ায় পূজার ব্যবহারে ছিল দেবমূর্তি। বিজেতারা বিজিত জাতির এই-সব মূর্তি নিয়ে যেত লুঠ করে। সাইরসের ব্যবহার ছিল তার বিপরীত। এইরকম লুঠ-করা মূর্তি তিনি যেখানে যা পেয়েছেন সেগুলি সব তাদের আদিম মন্দিরে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

তাঁর অনতিকাল পরে তাঁরই জ্ঞাতিবংশীয় দরিয়ুস সাম্রাজ্যকে শত্রুহস্ত থেকে উদ্ধার করে আরও বহুদূর প্রসারিত করেন। পর্সিপোলিসের স্থাপনা এঁরই সময় হতে। এই যুগের আসীরিয়া ব্যাবিলন ঈজিপ্ট্ গ্রীস প্রভৃতি দেশে বহু কীর্তি প্রধানত দেবমন্দির আশ্রয় করে প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু আকেমেনীয় রাজত্বে তার চিহ্ন পাওয়া যায় না। শত্রুজয়ের বিবরণচিত্র যে-যেখানে পাহাড়ের গায়ে খোদিত সেখানেই জরথুস্ত্রীয়দের বরণীয় দেবতা অহুরমজ্‌দার ছবি শীর্ষদেশে উৎকীর্ণ, অর্থাৎ নিজেদের সিদ্ধিলাভ যে তাঁরই প্রসাদে এই কথাটি তার মধ্যে স্বীকৃত। কিন্তু মন্দিরে মূর্তিস্থাপন করে পূজা হত তার প্রমাণ নেই। প্রতীকরূপে অগ্নিস্থাপনার চিহ্ন পাওয়া যায়। ইতিহাসের প্রথম আরম্ভ হতেই একদেবতার সরল পূজাপদ্ধতি পারসিক জাতিকে ঐক্য এবং শক্তি দেবার সহায়তা করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

বড়ো সাম্রাজ্য হাতে নিয়ে স্থির থাকবার জো নেই। কেবলই তাকে বৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে হয়, বিশেষত চারি দিকে যেখানে প্রতিকূল শক্তি। এইরকম নিত্য প্রয়াসে বলক্ষয় হয়ে ক্লান্তি দেখা দেয়। অবশেষে হঠাৎ আঘাতে অতি স্থূল রাষ্ট্রিক দেহটা চার দিক থেকে ভেঙে পড়ে। কোনো জাতির মধ্যে বা রাজবংশে সাম্রাজ্যভার অতি দীর্ঘকাল বহন করবার শক্তি টিঁকে থাকতেই পারে না। কেননা সাম্রাজ্য পদার্থটাই অস্বাভাবিক, যে এককগুলির সমষ্টিতে সেটা গঠিত তাদের মধ্যে ঐকান্তিকতা নেই, জবরদস্তির সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হবার জন্যে ভিতরে ভিতরে নিরন্তর চেষ্টা করে, তা ছাড়া বহু-বিস্তৃত সীমানা বহুবিচিত্র বিবাদের সংস্রবে আসতে থাকে। আকেমেনীয় সাম্রাজ্যও আপন গুরুভারে ক্রমেই হীনবল হয়ে অবশেষে আলেকজান্ডারের হাতে চরম আঘাত পেলে। এক আঘাতেই সে পড়ে গেল তার একমাত্র কারণ আলেকজান্ডার নয়। অতি বৃহদাকার প্রতাপের দুর্ভর ভার বাহকেরা একদিন নিশ্চিত বর্জন করতে বাধ্য, ভগ্ন-ঊরু ধূলিশায়ী মৃত দুর্যোধনের মতো ভগ্নাবশিষ্ট পার্সিপোলিস এই তত্ত্ব আজ বহন করছে। আলেকজান্ডারের জোড়াতাড়া-দেওয়া সাম্রাজ্যও অল্প-কালের আয়ু নিয়েই সেই তত্ত্বের উত্তরাধিকারী হয়েছিল সে কথা সুবিদিত।

এখান থেকে আর এক ঘণ্টার পথ গিয়ে সাদাতাবাদ গ্রামে আমাদের মধ্যাহ্নভোজন। একটি বড়ো রকমের গ্রাম, পথের দুই ধারে ঘনসংলগ্ন কাঁচা ইঁটের ও মাটির ঘর, দোকান ও ভোজনশালা। পেরিয়ে গিয়ে দেখি পথের ধারে ডান পাশে মাটি ছেয়ে নানা রঙের মেঠোফুল ভিড় করে আছে। দীর্ঘ এল্‌ম্‌ বনস্পতির ছায়াতলে তন্বী জলধারা স্নিগ্ধ কলশব্দে প্রবাহিত। এই রমণীয় উপবনে ঘাসের উপর কার্পেট বিছিয়ে আহার হল। পোলাও মাংস ফল ও যথেষ্ট পরিমাণে ঘোল।

আকাশে মেঘ জমে আসছে। এখান থেকে নব্বই মাইল পরে আবাদে-নামক ছোটো শহর, সেখানে রাত্রিযাপনের কথা। দূরে দেখা যাচ্ছে তুষাররেখার-তিলককাটা গিরিশিখর। দেহ্‌বিদ গ্রাম ছাড়িয়ে সুর্মাকে পৌঁছলুম। পথের মধ্যে সেখানকার প্রধান রাজকর্মচারী অভ্যর্থনা জানিয়ে আগে চলে গেলেন। বেলা পাঁচটার সময় পৌঁছলুম পুরপ্রাসাদে। কাল ভোরের বেলা রওনা হয়ে ইস্ফাহানে পৌঁছব দ্বিপ্রহরে।

যারা খাঁটি ভ্রমণকারী তারা জাতই আলাদা। এক দিকে তাদের শরীর মন চিরচলিষ্ণু, আর-এক দিকে অনভ্যস্তের মধ্যে তাদের সহজ বিহার। যারা শরীরটাকে স্তব্ধ রেখে মনটাকে চালায় তারা অন্য শ্রেণীর লোক। অথচ রেলগাড়ি-মোটরগাড়ির মধ্যস্থতায় এই দুই জাতের পঙ্‌ক্তিভেদ রইল না। কুনো মানুষের ভ্রমণ আপন কোণ থেকে আপন কোণেই আসবার জন্যে। আমাদের আধ্যাত্মিক ভাষায় যাদের বলে কনিষ্ঠ অধিকারী। তারা বাঁধা রাস্তায় সস্তায় টিকিট কেনে, মনে করে মুক্তিপথে ভ্রমণ সারা হল, কিন্তু ঘটা করে ফিরে আসে সেই আপন সংকীর্ণ আড্ডায়, লাভের মধ্যে, হয়তো সংগ্রহ করে অহংকার।

ভ্রমণের সাধনা আমার ধাতে নেই, অন্তত এই বয়সে। সাধক যারা, দুর্গমতার কৃচ্ছ্রসাধনে তাদের স্বভাবের আনন্দ, পথ খুঁজে বের করবার মহৎ ভার তাদের উপর। তারা শ্রেষ্ঠ অধিকারী, ভ্রমণের চরম ফল তারাই পায়। আমি আপাতত মোটরে চড়ে চললেম ইস্ফাহানে।

সকালবেলা মেঘাচ্ছন্ন, কাল বিকেল থেকেই তার আয়োজন। আজ শীত পড়েছে রীতিমত। একঘেয়ে শূন্যপ্রায় প্রান্তরে আসন্ন বৃষ্টির ছায়া বিস্তীর্ণ। দিগন্ত বেষ্টন করে যে গিরিমালা, নীলাভ অস্পষ্টতায় সে অবগুণ্ঠিত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেছি অন্তহীন, আলোর চিহ্নহীন মাঠের মধ্যে বিসর্পিত পথ দিয়ে। কিন্তু মানুষ কোথায়। চাষী কেন হাল লাঙল নিয়ে মাঠে আসে না। হাটের দিন হাট করতে যায় না কেউ; ফসলের খেত নিড়োবার বুঝি দরকার নেই? দূরে দূরে বন্দুকধারী পাহারাওয়ালা দাঁড়িয়ে, তার থেকে আন্দাজ করা যায় ঐ দিগন্তের বাইরে অদৃশ্য নেপথ্যে কোথাও মানুষের নানাদ্বন্দ্ববিঘটিত সংসারযাত্রা চলেছে। মাঠে কোথাও-বা ফসল, কোথাও-বা বহুদূর ধরে আগাছা, তাতে ঊর্ধ্বপুচ্ছ সাদা সাদা ফুলের স্তবক। মাঝে মাঝে ছোটো নদী, কিন্তু তাতে আঁকড়ে নেই গ্রাম। মেয়েরা জল তোলে না, কাপড় কাচে না, স্নান করে না, গোরু-

বাছুর জল খায় না; নির্জন পাহাড়ের তলা দিয়ে চলে, যেন সন্তানহীন বিধবার মতো। অনেকক্ষণ পরে বিনা ভূমিকায় এসে পড়ে মাটির পাঁচিলেঘেরা গ্রাম, একটু পরেই আর তার অনুবৃত্তি নেই। আবার সেই শূন্য মাঠ, আর মাঠের শেষে ঘিরে আছে পাহাড়।

পথে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখি এই উচ্চভূমি হঠাৎ বিদীর্ণ হয়ে নেমে গেছে, আর সেই গহ্বরতল থেকে খাড়া একটা পাহাড় উঠেছে। এই পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে খোপে খোপে মানুষের বাসা, ভাঙন-ধরা পদ্মার পাড়িতে গাঙশালিখের বাসার মতো। চারি দিক থেকে বিচ্ছিন্ন এই কোটর-নিবাসগুলিতে প্রবেশের জন্যে কাঠের তক্তা-ফেলা সংকীর্ণ সাঁকো। মানুষের চাকের মতো এই লোকালয়টির নাম ইয়েজদিখস্ত্।

দুপর বেজেছে। ইস্ফাহানের পৌরজনের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা বহন করে মোটর-রথে লোক এল। সেই অভ্যর্থনার সঙ্গে এই শা-রেজা গ্রামের একটি কবির কাব্য ছিল মিলিত। সেই কাব্যটির ইংরেজি তর্জমা এইখানে লিখে দিই :

The caravans of India always carry sugar but this time it has the perfume of the muse. O caravan, please stop your march, because burning hearts are following thee like the butterflies which burn around the flame of candles.

O zephyr, softly blow and whisper on the tomb of Saadi. Thereupon in joy Saadi will come to life in his tomb.

Tagore, he is the unique, the philosopher who knows what is past and what the future holds.

Let his arrival be blessed and fortunate in the land of the great Cyrus, an august descendant of whom to-day fortunately wears the crown of Persia.

পথের ধারে দেখা দিল এল্‌ম্‌ পপ্‌লার অলিভ ও তুঁত গাছের শ্রেণী। সামনে দেখা যায় ঢালু পাহাড়ের গায়ে দূরপ্রসারিত ইস্ফাহান শহর।

৬

পূর্বেই বলে রেখেছিলুম, আমি সম্মাননা চাই নে, আমাকে যেন একটি নিভৃত জায়গায় যথাসম্ভব শান্তিতে রাখা হয়। উপর থেকে সেইরকম হুকুম এসেছে। তাই এসেছি একটি বাগানবাড়িতে। বাগানবাড়ি বললে একে খাটো করা হয়। এ একটি মস্ত সুসজ্জিত প্রাসাদ। যিনি গবর্নর তিনি ধীর সুগম্ভীর, শান্ত তাঁর সৌজন্য, এঁর মধ্যে প্রাচ্যপ্রকৃতির মিতভাষী অচঞ্চল আভিজাত্য।

শুনতে পাই এই বাড়ির যিনি মালিক তিনি আমাদের দেশের সেকেলে কোনো কোনো ডাকাতে জমিদারদের মতো ছিলেন। একদা এখানে সশস্ত্রে সসৈন্যে অনেক দৌরাত্ম্য করেছেন। এখন অস্ত্র সৈন্য কেড়ে নিয়ে তাঁকে তেহেরানে রাখা হয়েছে, কারাবন্দীরূপে নয়, নজরবন্দীরূপে। তাঁর ছেলেদের য়ুরোপে শিক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। ভারত গবর্নমেন্টের শাসননীতির সঙ্গে কিছু প্রভেদ দেখছি। মোহ্‌মেরার শেখ, গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্তেজিত করবার চেষ্টা করাতে রাজা সৈন্য নিয়ে তাঁকে আক্রমণের উদ্যোগ করেন। তখন শেখ সন্ধির প্রার্থনা করতেই সে প্রার্থনা মঞ্জুর হল। এখন তিনি তেহেরানে বাসা পেয়েছেন। তাঁর প্রতি নজর রাখা হয়েছে, কিন্তু তাঁর গলায় ফাঁস বা হাতে শিকল চড়ে নি।

অপরাহ্নে যখন শহরে প্রবেশ করেছিলুম তখন ক্লান্ত দৃষ্টি শ্রান্ত মন ভালো করে কিছুই গ্রহণ করতে পারে নি। আজ সকালে নির্মল আকাশ, স্নিগ্ধ রৌদ্র। দোতলায় একটি কোণের বারান্দায় বসেছি। নীচের বাগানে এল্‌ম্‌ পপ্‌লার উইলো গাছে বেষ্টিত ছোটো জলাশয় ও ফোয়ারা। দূরে গাছপালার মধ্যে একটি মসজিদের চূড়া দেখা যাচ্ছে, যেন নীলপদ্মের কুঁড়ি, সুচিক্কণ নীল

পারসিক টালি দিয়ে তৈরি, এই সকালবেলাকার পাতলা মেঘে-ছোঁয়া আকাশের চেয়ে ঘনতর নীল। সামনেকার কাঁকর-বিছানো রাস্তায় সৈনিক প্রহরী পায়চারি করছে।

এ-পর্যন্ত সমস্ত পারস্যে দেখে আসছি এরা বাগানকে কী ভালোই না বাসে। এখানে চারি দিকে সবুজ রঙের দুর্ভিক্ষ, তাই চোখের ক্ষুধা মেটাবার এই আয়োজন। বাবর ভারতবর্ষে বাগানের অভাব দেখে অবজ্ঞা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি এসেছিলেন মরুপ্রদেশ থেকে, বাগান তাঁদের পক্ষে শুধু কেবল বিলাসের জিনিস ছিল না, ছিল অত্যাবশ্যক। তাকে বহুসাধনায় পেতে হয়েছে বলে এত ভালোবাসা। বাংলাদেশের মেয়েরা পশ্চিমের মেয়েদের মতো পরবার শাড়িতে রঙের সাধনা করে না, চারি দিকেই রঙ এত সুলভ। বাংলায় দোলাই-কাঁথায় রঙ ফলে ওঠে নি, লতাপাতার রঙিন ছাপওয়ালা ছিট পশ্চিমে। বাড়ির দেয়ালে রঙ লাগায় মারোয়াড়ি, বাঙালি লাগায় না।

আজ সকালবেলায় স্নান করবার অবকাশ রইল না। একে একে এখানকার ম্যুনিসিপালিটি, মিলিটারি-বিভাগ, শিক্ষাবিভাগ, বণিক্‌সভা আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে এসেছিলেন।

বেলা তিনটের পর শহর পরিক্রমণে বেরলুম। ইস্ফাহানের একটি বিশেষত্ব আছে, সে আমার চোখে সুন্দর লাগল। মানুষের বাসা প্রকৃতিকে একঘরে করে রাখে নি, গাছের প্রতি তার ঘনিষ্ঠ আনন্দ শহরের সর্বত্রই প্রকাশমান। সারিবাঁধা গাছের তলা দিয়ে দিয়ে জলের ধারা চলেছে, সে যেন মানুষেরই দরদের প্রবাহ। গাছপালার সঙ্গে নিবিড় মিলনে নগরটিকে সুস্থ প্রকৃতিস্থ বলে চোখে ঠেকে। সাধারণত উড়োজাহাজে চড়ে শহরগুলোকে দেখলে যেন মনে হয় পৃথিবীর চর্মরোগ।

মানুষের নিজের হাতের আশ্চর্য কীর্তি আছে এই শহরের মাঝখানে, একটি বৃহৎ ময়দান ঘিরে। এর নাম ময়দান-ই-শা অর্থাৎ বাদশাহের ময়দান। এখানে এক কালে বাদশাহের পোলো খেলবার জায়গা ছিল। এই চত্বরের দক্ষিণ সীমানার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মসজিদ-ই-শা। প্রথম শা আব্বাসের আমলে এর নির্মাণ আরম্ভ, আর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় শা আব্বাসের সময়ে তার সমাপ্তি। এখন এখানে ভজনার কাজ হয় না। বর্তমান বাদশাহের আমলে বহুকালের ধুলো ধুয়ে একে সাফ করা হচ্ছে। এর স্থাপত্য একাধারে সমুচ্চ গম্ভীর ও সযত্নসুন্দর, এর কারুকার্য বলিষ্ঠ শক্তির সুকুমার সুনিপুণ অধ্যবসায়ের ফল। এর পার্শ্ববর্তী আর-একটি মসজিদ মাদ্রাসে-ই-চাহার বাগে প্রবেশ করলুম। এক দিকে উচ্ছ্রিত বিপুলতায় এ সুমহান, যেন স্তবমন্ত্র, আর-এক দিকে সমস্ত ভিত্তিকে খচিত করে বর্ণসংগতির বিচিত্রতায় রমণীয়, যেন গীতিকাব্য। ভিতরে একটি প্রাঙ্গণ, সেখানে প্রাচীন চেনার গাছ এবং তুঁত, দক্ষিণ ধারে অত্যুচ্চগুম্বজওয়ালা সুপ্রশস্ত ভজনা-গৃহ। যে টালিতে ভিত্তি মণ্ডিত তার কোথাও কোথাও চিক্কণ পাতলা বর্ণপ্রলেপ ক্ষয়প্রাপ্ত, কোথাও-বা পরবর্তীকালে টালি বদল করতে হয়েছে, কিন্তু নূতন যোজনাটা খাপ খায় নি। আগেকার কালের সেই আশ্চর্য নীল রঙের প্রলেপ এ কালে অসম্ভব। এ ভজনালয়ের যে ভাবটি মনকে অধিকার করে সে হচ্ছে এর সুনির্মল সমুদার গাম্ভীর্য। অনাদর-অপরিচ্ছন্নতার চিহ্ন কোথাও নেই। সর্বত্র একটি সসম্ভ্রম সম্মান যথার্থ শুচিতা রক্ষা করে বিরাজ করছে।

এই মসজিদের প্রাঙ্গণে যাদের দেখলেম তাদের মোল্লার বেশ। নিরুৎসুক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখলে, হয়তো মনে মনে প্রসন্ন হয় নি। শুনলুম আর দশ বছর আগে এখানে আমাদের প্রবেশ সম্ভবপর হত না। শুনে আমি যে বিস্মিত হব সে রাস্তা আমার নেই। কারণ, আর বিশ বছর পরেও পুরীতে জগন্নাথের মন্দিরে আমার মতো কোনো ব্রাত্য যে প্রবেশ করতে পারবে সে আশা করা বিড়ম্বনা।

শহরের মাঝখান দিয়ে বালুশয্যার মধ্যে বিভক্ত-ধারা একটি নদী চলে গেছে। তার নাম জই আন্দেরু, অর্থাৎ জন্মদায়িনী। এই নদীর তলদেশে যেখানে খোঁড়া যায় সেখান থেকেই উৎস ওঠে, তাই এর এই নাম—উৎসজননী। কলকাতার ধারে গঙ্গা যেরকম ক্লিষ্ট কলুষিত শৃঙ্খলজর্জর, এ

সেরকম নয়। গঙ্গাকে কলকাতা কিংকরী করেছে, সখী করে নি, তাই অবমানিত নদী হারিয়েছে তার রূপলাবণ্য। এখানকার এই পুরবাসিনী নদী গঙ্গার তুলনায় অগভীর ও অপ্রশস্ত বটে, কিন্তু এর সুস্থ সৌন্দর্য নগরের হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে আনন্দ বহন করে।

এই নদীর উপরকার একটি ব্রিজ দেখতে এলুম, তার নাম আলিবর্দী খাঁর পুল। আলিবর্দী শা আব্বাসের সেনাপতি, বাদশার হুকুমে এই পুল তৈরি করেছিলেন। পৃথিবীতে আধুনিক ও প্রাচীন অনেক ব্রিজ আছে, তার মধ্যে এই কীর্তিটি অসাধারণ। বহুখিলানওয়ালা তিন-তলা এই পুল; শুধু এটার উপর দিয়ে পথিক পার হয়ে যাবে বলে এ তৈরি হয় নি— অর্থাৎ এ শুধু উপলক্ষ নয়, এও স্বয়ং লক্ষ্য। এ সেই দিলদরিয়া যুগের রচনা যা আপনার কাজের তাড়াতেও আপন মর্যাদা ভুলত না।

ব্রিজ পার হয়ে গেলুম এখানকার আর্মানি গির্জায়। গির্জার বাহিরে ও অঙ্গনে ভিড় জমেছে।

ভিতরে গেলেম। প্রাচীন গির্জা। উপাসনা-ঘরের দেয়াল ও ছাদ চিত্রিত, অলংকৃত। দেয়ালের নীচের দিকটায় সুন্দর পারসিক টালির কাজ, বাকি অংশটায় বাইবেল-বর্ণিত পৌরাণিক ছবি আঁকা। জনশ্রুতি এই যে, কোনো ইটালিয়ন চিত্রকর ভ্রমণ করতে এসে এই ছবিগুলি এঁকেছিলেন।

তিনশো বছর হয়ে গেল, শা-আব্বাস রুশিয়া থেকে বহু সহস্র আর্মানি আনিয়ে ইস্ফাহানে বাস করান। তারা কারিগর ছিল ভালো। তখনকার দেশবিজয়ী রাজারা শিল্পদ্রব্যের সঙ্গে শিল্পীদেরও লুঠ করতে ছাড়তেন না। শা-আব্বাসের মৃত্যুর পর তাদের উপর উৎপাত আরম্ভ হল। অবশেষে নাদির শাহের আমলে উপদ্রব এত অসহ্য হয়ে উঠল যে টিঁকতে পারলে না। সেই সময়েই আর্মানিরা প্রথম ভারতবর্ষে পালিয়ে আসে। বর্তমান বাদশাহের আমলে তাদের কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু সে কালে কারুনৈপুণ্য সম্বন্ধে তাদের যে খ্যাতি ছিল এখন তার আর কিছু বাকি আছে বলে বোধ হল না।

বাজারের মধ্য দিয়ে বাড়ি ফিরলুম। আজ কী-একটা পরবে দোকানের দরজা সব বন্ধ। এখানকার সুদীর্ঘ চিনার-বীথিকায় গিয়ে পড়লুম। বাদশাহের আমলে এই রাস্তার মাঝখান দিয়ে টালি-বাঁধানো নালায় জল বইত, মাঝে মাঝে খেলত ফোয়ারা, আর ছিল ফুলের কেয়ারি। দরকারের জিনিসকে করেছিল আদরের জিনিস; পথেরও ছিল আমন্ত্রণ, আতিথ্য।

ইস্ফাহানের ময়দানের চারি দিকে যে-সব অত্যাশ্চর্য মসজিদ দেখে এসেছি তার চিন্তা মনের মধ্যে ঘুরছে। এই রচনা যে যুগের সে বহুদূরের, শুধু কালের পরিমাপে নয়, মানুষের মনের পরিমাপে। তখন এক-একজন শক্তিশালী লোক ছিলেন সর্বসাধারণের প্রতিনিধি। ভূতলসৃষ্টির আদিকালে ভূমিকম্পের বেগে যেমন বড়ো পাহাড় উঠে পড়েছিল তেমনি। এই পাহাড়কে সংস্কৃত ভাষায় বলে ভূধর, অর্থাৎ সমস্ত ভূমিকে এই এক-একটা উচ্চচূড়া দৃঢ় ক'রে ধারণ করে এইরকম বিশ্বাস। তেমনি মানবসমাজের আদিকালে এক-একজন গণপতি সমস্ত মানুষের বল আপনার মধ্যে সংহত করে জনসাধারণকে নিজের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। তাতে সর্বসাধারণ আপনার সার্থকতা দেখে আনন্দ পেত। তাঁরা একলাই যেমন সর্বজনের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন তেমনি তাঁদেরই মধ্যে সর্বজনের গৌরব, বহুজনের কাছে বহুকালের কাছে তাঁদের জবাবদিহি। তাঁদের কীর্তিতে কোনো অংশে দারিদ্র্য থাকলে সেই অমর্যাদা বহুলোকের, বহুকালের। এইজন্যে তখনকার মহৎ ব্যক্তির কীর্তিতে দুঃসাধ্য সাধন হয়েছে। সেই কীর্তি এক দিকে যেমন আপন স্বাতন্ত্র্যে বড়ো তেমনি সর্বজনীনতায়। মানুষ আপন প্রকাশে বৃহতের যে কল্পনা করতে ভালোবাসে তাকে আকার দেওয়া সাধারণ লোকের সাধ্যের মধ্যে নয়। এইজন্য তাকে উপযুক্ত আকারে প্রকাশ দেবার ভার ছিল নরোত্তমের, নরপতির। রাজা বাস করতেন রাজপ্রাসাদে, কিন্তু বস্তুত সে প্রাসাদ সমস্ত প্রজার— রাজার মধ্য দিয়ে সমস্ত প্রজা সেই প্রাসাদের অধিকারী। এইজন্যে রাজাকে অবলম্বন করে প্রাচীনকালে মহাকায় শিল্পসৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছিল। পর্সিপোলিসে দরিয়ুস রাজার রাজগৃহে যে ভগ্নাবশেষ দেখা যায় সেটা দেখে মনে হয়,

কোনো একজন ব্যক্তিবিশেষের ব্যবহারের পক্ষে সে নিতান্ত অসংগত। বস্তুত একটা বৃহৎ যুগ তার মধ্যে বাসা বেঁধেছিল— সে যুগে সমস্ত মানুষ এক-একটি মানুষে অভিব্যক্ত।

পর্সিপোলিসের যে কীর্তি আজ ভেঙে পড়েছে তাতে প্রকাশ পায়, সেই যুগ গেছে ভেঙে। এরকম কীর্তির আর পুনরাবর্তন অসম্ভব। যে প্রান্তরে আজকের যুগ চাষ করছে, পশু চরাচ্ছে, যে পথ দিয়ে আজকের যুগ তার পণ্য বহন করে চলেছে, সেই প্রান্তরের ধারে, সেই পথের প্রান্তে এই অতিকায় স্তম্ভগুলো আপন সার্থকতা হারিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তবু মনে হয়, দৈবাৎ যদি না ভেঙে যেত তবু আজকেকার সংসারের মাঝখানে থাকতে পেত না। যেমন আছে অজন্তার গুহা, আছে তবু নেই। ঐ ভাঙা থামগুলো সেকালের একটা সংকেতমাত্র নিয়ে আছে, ব্যতিব্যস্ত বর্তমানকে পথ ছেড়ে দিয়ে। সেই সংকেতের সমস্ত সুমহৎ তাৎপর্য অতীতের দিকে। নীচের রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে ইতরের মতো গর্জন করে চলেছে মোটর-রথ। তাকেও অবজ্ঞা করা যায় না, তার মধ্যেও মানবমহিমা আছে। কিন্তু এরা দুই পৃথক জাত, সগোত্র নয়। একটাতে আছে সর্বজনের সুযোগ, আর-একটাতে আছে সর্বজনের আত্মশ্লাঘা। এই শ্লাঘার প্রকাশে আমরা দেখতে পেলুম সেই অতীতকালের মানুষ কেমন করে প্রবল ব্যক্তিস্বরূপের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে এক-একটি বিরাট আকারে আপনাকে দেখতে চেয়েছে। প্রয়োজনের পরিমাপে সে আকারের মূল্য নয়, প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশিকেই বলে ঐশ্বর্য— সেই ঐশ্বর্যকে তার অসামান্য-রূপে মানুষ দেখতে পায় না, যদি কোনো প্রবল শক্তিশালীর মধ্যে আপন শক্তিকে উৎসৃষ্ট করে এই ঐশ্বর্যকে ব্যক্ত করা না হয়। নিজের নিজের ক্ষুদ্র শক্তি ক্ষুদ্র প্রয়োজনের মধ্যে প্রতিদিন খরচ হয়ে যায়, সেই দিনযাত্রা প্রয়োজনের-অতীত মাহাত্ম্যকে বাঁধতে পারে না। সেই ঐশ্বর্য-যুগ, যে ঐশ্বর্য আবশ্যককে অবজ্ঞা করতে পারত, এখন চলে গেছে। তার সাজসজ্জা সমারোহভার এখনকার কাল বহন করতে অস্বীকার করে। অতএব সেই যুগের কীর্তি এখনকার চলতি কালকে যদি চেপে বসে তবে এই কালের অভিব্যক্তির পথকে বাধাগ্রস্ত করবে।

মানুষের প্রতিভা নবনবোন্মেষে, কোনো একটামাত্র আবির্ভাবকেই দীর্ঘায়িত করার দ্বারা নয়, সে আবির্ভাব যতই সুন্দর যতই মহৎ হোক। মাদুরার মন্দির, ইস্ফাহানের মসজিদ প্রাচীন কালের অস্তিত্বের দলিল— এখনকার কালকে যদি সে দখল করে তবে তাকে জবরদখল বলব। তারা যে সজীব নয় তার প্রমাণ এই যে, আপন ধারাকে আর তারা চালনা করতে পারছে না। বাইরে থেকে তাদের হয়তো নকল করা যেতে পারে, কিন্তু নিজের ভিতরে তাদের নূতন সৃষ্টির আবেগ ফুরিয়ে গেছে।

এদের কৈফিয়ত এই যে, এরা যে ধর্মের বাহন এখনো সে টিঁকে আছে। কিন্তু আজকের দিনে কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্ম ধর্মের বিশুদ্ধ প্রাণতত্ত্ব নিয়ে টিঁকে নেই। যে-সমস্ত ইঁটকাঠ নিয়ে সেই-সব সম্প্রদায়কে কালে কালে ঠেকো দিয়ে দিয়ে খাড়া করে রাখা হয়েছে তারা সম্পূর্ণ অন্য কালের আচার বিচার প্রথা বিশ্বাস জনশ্রুতি। তাদের অনুষ্ঠান, তাদের অনুশাসন এক কালের ইতিহাসকে অন্য কালের উপর চাপা দিয়ে তাকে পিছিয়ে রাখে।

সাম্প্রদায়িক ধর্ম জিনিসটাই সাবেক কালের জিনিস। পুরোকালের কোনো একটা বাঁধা মত ও অনুষ্ঠানকে সকল কালেই সকলে মিলে মানতে হবে, এই হচ্ছে সম্প্রদায়ের শাসন। বস্তুত এতকাল রাজশক্তি ও পৌরোহিতশক্তি জুড়ি মিলিয়ে চলেছে। উভয়েই জনসাধারণের আত্মশাসনভার, চিন্তার ভার, পূজার ভার, তাদের স্বাধীন শক্তি থেকে হরণ করে অন্যত্র এক জায়গায় সংহত করে রেখেছে। ব্যক্তিবিশেষ যদি নিজের চিত্তশক্তির প্রবর্তনায় স্বাতন্ত্র্যের চেষ্টা করে তবে সেটাকে বিদ্রোহের কোঠায় ফেলে তাকে প্রাণান্তকর কঠোরতার সঙ্গে শাসন করে এসেছে। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি ক্রমে এক কেন্দ্রের হাত থেকে সাধারণের পরিধিতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে, অথচ চিরকালের মতো বাঁধা মতের ধর্মসম্প্রদায় আজকের দিনে সকলেরই চিত্তকে এক শাসনের দ্বারা, ভয়ের দ্বারা, লোভের দ্বারা, মোহের দ্বারা অভিভূত করে স্থাবর করে রেখে দেবে— এ আর চলবে না। এই কারণে এইরকম

সাম্প্রদায়িক ধর্মের যা-কিছু প্রতীক তাকে আজ জোর করে রক্ষা করতে গেলে মানুষ নিজের মনের জোর খোয়াবে; বয়স উত্তীর্ণ হলেও যে ছেলে মায়ের কোল আঁকড়ে মেয়েলি স্বভাব নিয়ে থাকে তারই মতো অপদার্থ হয়ে থাকবে।

প্রাচীন কীর্তি টিঁকে থাকবে না এমন কথা বলি নে। থাক— কিন্তু সে কেবল স্মৃতির বাহন-রূপে, ব্যবহারের ক্ষেত্ররূপে নয়। যেমন আছে স্ক্যান্ডিনেবীয় সাগা— তাকে কাব্য বলে স্বীকার করব, ধর্মগ্রন্থ বলে ব্যবহার করব না। যেমন আছে প্যারাডাইস লস্ট্— তাকে ভোগ করবার জন্যে, মানবার জন্যে নয়। য়ুরোপে পুরাতন ক্যাথিড্রাল আছে অনেক, কিন্তু মানুষের মধ্যযুগীয় যে ধর্মবোধ থেকে তার উদ্ভব ভিতরে ভিতরে তার পরিবর্তন হয়ে গেছে। ঘাট আছে, জল গেছে সরে। সে ঘাটে নৌকো বেঁধে রাখতে বাধা নেই, কিন্তু সে নৌকোয় খেয়া চলবে না। যুগে যুগে জ্ঞানের পরিধিবিস্তার, তার অভিজ্ঞতার সংশোধন, তার অবস্থার পরিবর্তন চলছেই; মানুষের মন সেইসঙ্গে যদি অচল আচারে বিজড়িত ধর্মকে শোধন করে না নেয় তা হলে ধর্মের নামে হয় কপটতা নয় মূঢ়তা নয় আত্মপ্রবঞ্চনা জমে উঠতে থাকবেই। এইজন্যে সাম্প্রদায়িক ধর্মবুদ্ধি মানুষের যত অনিষ্ট করেছে এমন বিষয়বুদ্ধি করে নি। বিষয়াসক্তির মোহে মানুষ যত অন্যায়ী যত নিষ্ঠুর হয়, ধর্মমতের আসক্তি থেকে মানুষ তার চেয়ে অনেক বেশি ন্যায়ভ্রষ্ট অন্ধ ও হিংস্র হয়ে ওঠে, ইতিহাসে তার ধারাবাহিক প্রমাণ আছে; আর তার সর্বনেশে প্রমাণ ভারতবর্ষে আমাদের ঘরের কাছে প্রতিদিন যত পেয়ে থাকি এমন আর-কোথাও নয়।

এ সঙ্গে এ কথাও আমার মনে এসেছে যে মনুর পরামর্শ ছিল ভালো। সংসারের ধর্মই হচ্ছে সে সরে সরে যায়, অথচ একটা বয়সের পর যাদের মন আর কালের সঙ্গে তাল রেখে সরতে পারে না সংসারের ব্যবহার থেকে তাদের দূরে থাকা উচিত— যেমন দূরে আছে ইলোরার গুহা, খণ্ডগিরির মূর্তি সব। যদি তারা নিজের যুগকে পূর্ণতা দিয়ে থাকে তবে তাদের মূল্য আছে, কিন্তু সে মূল্য আদর্শের মূল্য। আদর্শ একটা জায়গায় স্থিরত্বে ঠেকেছে বলেই তাকে দিয়ে আমরা পরিমাপের কাজ করি। জলের মধ্যে যদি কোথাও পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে তবে বন্যার উচ্ছলতা কতদূর উঠল সেই পাহাড়ের সঙ্গে তুলনা করে সেটা আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু স্রোতের সঙ্গে সে পাহাড়ের কারবার নেই। তেমনি মানুষের কীর্তি ও ব্যক্তিত্ব যখন প্রচলিত জীবনযাত্রার সঙ্গে অসংসক্ত হয়ে পড়ে তখন তারা আমাদের অন্য কোনো কাজ না হোক আদর্শরচনার কাজে লাগে। এই আদর্শ নকল করায় না, শক্তির মধ্যে বেগ সঞ্চার করে। মহামানব নিজেকেই বহুগুণিত করবার জন্যে নয়, প্রত্যেক মানুষকে তার আপন শক্তিস্বাতন্ত্র্যের চরমতার দিকে অগ্রসর করবার জন্যে। পুরাতনকালের বৃদ্ধ যদি সেই আদর্শের কাজে লাগে তা হলে নূতনকালেও সে সার্থক। কিন্তু যদি সে নিজেকে চিরকাল পুনরাবর্তিত করবে বলে পণ করে বসে তবে সে আবর্জনা সৃষ্টি করবে।

অভ্যাসে যে মনকে পেয়ে বসে সে মনের মতগুলো মনন থেকে বিযুক্ত হয়ে যায়, অর্থাৎ চিত্তধারার সঙ্গে চিন্তিত বিষয়ের সম্বন্ধ শিথিল হয়। ফুলের বা ফলের পালা যখন ফুরোয় তখন শাখার রসধারা তাকে বর্জন করতে চেষ্টা করে, কিন্তু তবু সে যদি বৃন্ত আঁকড়িয়ে থাকে তবে সেটা নিছক লোকসান। এইজন্যেই মনুর কথা মানি— পঞ্চাশোধর্বং বনং ব্রজেৎ। স্বাধীন শক্তিতে চিন্তা করা, প্রশ্ন করা, পরীক্ষা করার দ্বারাই মানুষের মনোবৃত্তি সুস্থ ও বীর্যবান থাকে। যারা সত্যই জরায়-পাওয়া তারা সমাজের সেই নূতন অধ্যবসায়ী পরীক্ষাপরায়ণ প্রশ্নরত বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যকে নষ্ট না করুক, বাধা না দিক, মনুর এই ছিল অভিপ্রায়। পৃথিবীতে যে সমাজ তরুণ বৃদ্ধ বা প্রবীণ বৃদ্ধের অধিকৃত সে সমাজ পঙ্গু; বৃদ্ধের কর্মশক্তি অস্বাভাবিক, অতএব সে কর্ম স্বাস্থ্যকর নয়। তাদের মনের সক্রিয়তা স্বভাবের নিয়মে বাইরের দিক থেকে সরে এসে অন্তরের দিকে পরিণত হতে থাকে। তাই তাদের নিজের সার্থকতার জন্যেও অভিভাবকের পদ ছেড়ে দিয়ে সংসার থেকে নিভৃতে যাওয়াই কর্তব্য— তাতে ক্ষতি হবে এ কথা মনে করা অহংকার মাত্র।

আজ ছাব্বিশে। পনেরো দিন মাত্র দেশ থেকে চলে এসেছি। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অনেক দিন হয়ে গেল। ভেবে দেখলুম, তার কারণ এ নয় যে, অনভ্যস্ত প্রবাসবাসের দুঃখ সময়কে চিরায়মান করেছে। আসল কথা এই যে, দেশে থাকি নিজের সঙ্গে নিতান্ত নিকটে আবদ্ধ বহু খুচরো কাজের ছোটো ছোটো সময় নিয়ে। এখানে অনেকটা পরিমাণে নিজেকে ও নিজকীয়কে ছাড়িয়ে একটা ব্যাপক ভূমিকার উপরে থাকি। ভূমিতল থেকে নিঃসংসক্ত ঊর্ধ্বে যেমন অনেকখানি দেশকে দেখা যায় তেমনি নিজের সুখদুঃখের-জালে বন্ধ, প্রয়োজনের-স্তূপে-আচ্ছন্ন সময় থেকে দূরে এলে অনেকখানি সময়কে একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। তখন যেন দিনকে দেখি নে, যুগকে দেখি; দেখি ইতিহাসের পৃষ্ঠায়—খবরের কাগজের প্যারাগ্রাফে নয়।

গবর্নরের ব্যবস্থায় এ দুইদিন রাত্রির আহারের পর ঘণ্টাখানেক ধরে এখানকার সংগীত শুনতে পাই। বেশ লাগে। টার বলে যে তারের যন্ত্র, অতি সূক্ষ্ম মৃদুধ্বনি থেকে প্রবল ঝংকার পর্যন্ত তার গতিবিধি। তাল দেবার যন্ত্রটাকে বলে ডম্বক, তার বোলের আওয়াজে আমাদের বাঁয়া-তবলার চেয়ে বৈচিত্র্য আছে।

ইস্ফাহানে আজ আমার শেষদিন, অপরাহ্নে পুরসভার তরফ থেকে আমার অভ্যর্থনা। যে প্রাসাদে আমার আমন্ত্রণ সে শা আব্বাসের আমলের, নাম চিহিল সতুন। সমুচ্চ পাথরের স্তম্ভশ্রেণীবিরাজিত এর অলিন্দ, পিছনে সভামণ্ডপ, তার পিছনে প্রশস্ত একটি ঘর—দেয়ালে বিচিত্র ছবি আঁকা। এক সময়ে কোনো-এক কদুৎসাহী শাসনকর্তা চুনকাম করে সমস্তটা ঢেকে দিয়েছিলেন। হাল আমলে ছবিগুলিকে আবার প্রকাশ করা হচ্ছে।

এখানকার কাজ শেষ হল।

দৈবাৎ এক-একটি শহর দেখতে পাওয়া যায় যার স্বরূপটি সুস্পষ্ট, প্রতি মুহূর্তে যার সঙ্গে পরিচয় ঘটতে থাকে। ইস্ফাহান সেইরকম শহর। এটি পারস্যদেশের একটি পীঠস্থান। এর মধ্যে বহুযুগের, শুধু শক্তি নয়, প্রেম সজীব হয়ে আছে।

ইস্ফাহান পারস্যের একটি অতি প্রাচীন শহর। একজন প্রাচীন ভ্রমণকারীর লিখিত বিবরণে পাওয়া যায় সেলজুক-রাজবংশীয় সুলতান মহম্মদের মাদ্রাসা ও সমাধির সম্মুখে তখন একটি প্রকাণ্ড দেবমূর্তি পড়ে ছিল। কোনো-একজন সুলতান ভারতবর্ষ থেকে এটি এনেছিলেন। তার ওজন ছিল প্রায় হাজার মণ।

দশ শতাব্দীর শেষভাগে সম্রাট শা আব্বাস আর্দাবিল থেকে তাঁর রাজধানী এখানে সরিয়ে নিয়ে আসেন। সাফাবি-বংশীয় এই শা আব্বাস পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে একজন স্মরণীয় ব্যক্তি।

তিনি যখন সিংহাসনে উঠলেন তখন তাঁর বয়স ষোলো, ষাট বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু। যুদ্ধ-বিপ্লবের মধ্য দিয়েই তাঁর রাজত্বের আরম্ভ। সমস্ত পারস্যকে একীকরণ এঁর মহৎকীর্তি। ন্যায়বিচারে দাক্ষিণ্যে ঐশ্বর্যে তাঁর খ্যাতি ছিল সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তাঁর ঔদার্য ছিল অনেকটা দিল্লীশ্বর আকবরের মতো। তাঁরা এক সময়ের লোকও ছিলেন। তাঁর রাজত্বে পরধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি উৎপীড়ন ছিল না। কেবল শাসননীতি নয়, তাঁর সময়ে পারস্যে স্থাপত্য ও অন্যান্য শিল্পকলা সর্বোচ্চসীমায় উঠেছিল। ৪৩ বৎসর রাজত্বের পর তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর মহিমার অবসান। অবশেষে একদা তাঁর শেষ বংশধর শা সুলতান হোসেন পারস্যবিজয়ী সুলতান মামুদের আসনতলে প্রণতি করে বললেন, 'পুত্র, যেহেতু জগদীশ্বর আমার রাজত্ব আর ইচ্ছা করেন না, অতএব আমার সাম্রাজ্য এই তোমার হাতে সমর্পণ করি।'

এর পরে আফগান রাজত্ব। শাসনকর্তাদের মধ্যে হত্যা ও গুপ্তহত্যা এগিয়ে চলল। চারি দিকে লুঠপাট ভাঙাচোরা। অত্যাচারে জর্জরিত হল ইস্ফাহান।

অবশেষে এলেন নাদির শা। বাল্যকালে ছাগল চরাতেন; অবশেষে একদিন ভাগ্যের চক্রান্তে আফগান ও তুর্কিদের তাড়িয়ে দিয়ে এই রাখাল চড়ে বসলেন শা আব্বাসের সিংহাসনে। তাঁর জয়পতাকা দিল্লি পর্যন্ত উড়ল। স্বরাজ্যে যখন ফিরলেন সঙ্গে নিয়ে এলেন বহুকোটি টাকা দামের

লুঠের মাল ও ময়ূরতক্ত সিংহাসন। শেষবয়সে তাঁর মেজাজ গেল বিগড়ে, আপন বড়োছেলের চোখ উপড়িয়ে ফেললেন। মাথায় খুন চড়ল। অবশেষে নিদ্রিত অবস্থায় তাঁবুর মধ্যে প্রাণ দিলেন তাঁর কোনো-এক অনুচরের ছুরির ঘায়ে; শেষ হয়ে গেল বিজয়ী রাজমহিমা অখ্যাত মৃত্যুশয্যায়।

তার পরে অর্ধশতাব্দী ধরে কাড়াকাড়ি, খুনোখুনি, চোখ-ওপড়ানো। বিপ্লবের আবর্তে রক্তাক্ত রাজমুকুট লাল বুদ্‌বুদের মতো ক্ষণে ক্ষণে ফুটে ওঠে আর ফেটে যায়। কোথা থেকে এল খাজার-বংশীয় তুর্কি আগা মহম্মদ খাঁ। খুন করে, লুঠ করে, হাজার হাজার নারী ও শিশুকে বন্দী করে আপন পাশবিকতার চুড়ো তুললে ফর্মান শহরে, নগরবাসীর সত্তর হাজার উৎপাটিত চোখ হিসাব করে গ'নে নিলে। মহম্মদ খাঁর দস্যুবৃত্তির চরমকীর্তি রইল খোরাসানে, সেখানে নাদির শাহের হতভাগ্য অন্ধ পুত্র শা-রুখ ছিল রাজা। হিন্দুস্থান থেকে নাদির শাহের বহুমূল্য লুঠের মাল গুপ্ত রাজকোষ থেকে উদ্‌গীর্ণ করে নেবার জন্যে দস্যুশ্রেষ্ঠ প্রতিদিন শা-রুখকে যন্ত্রণা দিতে লাগল। অবশেষে একদিন শা-রুখের মুণ্ড ঘিরে একটা মুখোশ পরিয়ে তার মধ্যে সীসে গালিয়ে ঢেলে দিলে। এমনি করে শা-রুখের প্রাণ এবং ঔরঙ্গজেবের চুনি তার হস্তগত হল। তার পরে এশিয়ায় ক্রমে এসে পড়ল য়ুরোপের বণিকদল, ইতিহাসের আর-এক পর্ব আরম্ভ হল পূর্ব পশ্চিমের সংঘাতে। পারস্যে তার চক্রবাত্যা যখন পাক দিয়ে উঠছিল তখন ঐ খাজার-বংশীয় রাজা সিংহাসনে। বিদেশীর ঋণের নাগপাশে দেশকে জড়িয়ে সে ভোগবিলাসে উন্মত্ত, দুর্বল হাতের রাজদণ্ড চালিত হচ্ছিল বিদেশীর তর্জনীসংকেতে।

এমন সময় দেখা দিলেন রেজা শা। পারস্যের জীর্ণ জর্জর রাষ্ট্রশক্তি সর্বত্র আজ উজ্জ্বল নবীন হয়ে উঠছে। আজ আমি আমার সামনে যে ইস্ফাহানকে দেখছি তার উপর থেকে অনেক দিনের কালো কুহেলিকা কেটে গেছে। দেখা যায় এতকালের দুর্যোগে ইস্ফাহানের লাবণ্য নষ্ট হয় নি।

আশ্চর্যের কথা এই যে, আরবের হাতে, তুর্কির হাতে, মোগলের হাতে, আফগানের হাতে পারস্য বার বার দলিত হয়েছে, তবু তার প্রাণশক্তি পুনঃপুনঃ নিজেকে প্রকাশ করতে পারলে। আমার কাছে মনে হয় তার প্রধান কারণ—আকেমেনীয়, সাসানীয়, সাফাবি রাজাদের হাতে পারস্যের সর্বাঙ্গীণ ঐক্য বারংবার সুদৃঢ় হয়েছে। পারস্য সম্পূর্ণ এক, তার সভ্যতার মধ্যে কোনো আকারে ভেদবুদ্ধির ছিদ্র নেই। আঘাত পেলে সে পীড়িত হয়, কিন্তু বিভক্ত হয় না। রুশে ইংরেজে মিলে তার রাষ্ট্রিক সত্তাকে একদা দুখানা করতে বসেছিল। যদি তার ভিতরে ভিতরে বিভেদ থাকত তা হলে য়ুরোপের আঘাতে টুকরো টুকরো হতে দেরি হত না। কিন্তু যে মুহূর্তে শক্তিমান রাষ্ট্রনেতা সামান্যসংখ্যক সৈন্য নিয়ে এসে ডাক দিলেন, অমনি সমস্ত দেশ তাঁকে স্বীকার করতে দেরি করলে না; অবিলম্বে প্রকাশ পেলে যে, পারস্য এক।

পারস্য যে অন্তরে অন্তরে এক, তার প্রধান একটা প্রমাণ তার শিল্পের ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায়। আকেমেনীয় যুগে পারস্যে যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য উদ্ভাবিত হল তার মধ্যে আসীরিয়, ব্যাবিলনীয়, ঈজিপ্‌টীয় প্রভাবের প্রমাণ আছে। এমন-কি, তখনকার প্রাসাদনির্মাণ প্রভৃতি কাজে বিপুলসাম্রাজ্যভুক্ত নানাদেশীয় কারিগর নিযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু সেই বিচিত্র প্রভাব বিশিষ্ট ঐক্য লাভ করেছিল পারসিক চিত্তের দ্বারা। রজার ফ্রাই এ সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন এখানে উদ্ধৃত করি :

This extreme adaptability is, I think, a constant trait in Persian art.... We tend, perhaps, at the present time to exaggerate the importance of originality in an art; we admire in it the expression of an independent and selfcontained people, forgetting that originality may arise from a want of flexibility in the artist's make-up as well as from a new imaginative outlook.

নানা প্রভাব চারি দিক থেকে আসে; জড়বুদ্ধি তাকে ঠেকিয়ে রাখে, সচেতন বুদ্ধি তাকে গ্রহণ করে আপনার মধ্যে তাকে ঐক্য দেয়। নিজের মধ্যে একটা প্রাণবান ঐক্যতত্ত্ব থাকলে বাইরের বহুকে মানুষ একে পরিণত করে নিতে পারে। পারস্য তার ইতিহাসে, তার আর্টে বাইরের অভ্যাগমকে আপন অঙ্গীভূত করে নিয়েছে।

পারস্যের ইতিহাসক্ষেত্রে একদিন যখন আরব এল তখন অতি অকস্মাৎ তার প্রকৃতিতে একটা মূলগত পরিবর্তন ঘটল। এ কথা মনে রাখা দরকার যে, বলপূর্বক ধর্মদীক্ষা দেওয়ার রীতি তখনো আরব গ্রহণ করে নি। আরবশাসনের আরম্ভকালে পারস্যে নানা সম্প্রদায়ের লোক একত্রে বাস করত এবং শিল্পরচনায় ব্যক্তিগত স্বাধীন রুচিকে বাধা দেওয়া হয় নি। পারস্যে ইসলাম ধর্ম অধিবাসীদের স্বেচ্ছানুসারে ক্রমে ক্রমে সহজে প্রবর্তিত হয়েছে। তৎপূর্বে ভারতবর্ষেরই মতো পারস্যে সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ছিল কঠিন, তদনুসারে শ্রেণীগত অবিচার ও অবমাননা জনসাধারণের পক্ষে নিশ্চয়ই পীড়ার কারণ হয়েছিল। স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশ্বরপূজার সমান অধিকার ও পরস্পরের নিবিড় আত্মীয়তা এই ধর্মের প্রতি প্রজাদের চিত্ত আকর্ষণ করেছিল সন্দেহ নেই। এই ধর্মের প্রভাবে পারস্যে শিল্পকলার রূপ পরিবর্তন করাতে রেখালংকার ও ফুলের কাজ প্রাধান্য লাভ করেছিল। তার পরে তুর্কিরা এসে আরব সাম্রাজ্য ও সেইসঙ্গে তাদের বহুতর কীর্তি লণ্ডভণ্ড করে দিলে, অবশেষে এল মোগল। এই-সকল কীর্তিনাশার দল প্রথমে যত উৎপাত করুক, ক্রমে তাদের নিজেদেরই মধ্যে শিল্পোৎসাহ সঞ্চারিত হতে লাগল। এমনি করে যুগান্তে যুগান্তে ভাঙচুর হওয়া সত্ত্বেও পারস্যে বার বার শিল্পের নবযুগ এসেছে। আকেমেনীয় সাসানীয় আরবীয় সেলজুক মোগল এবং অবশেষে সাফাবি শাসনের পর্বে পর্বে শিল্পের প্রবাহ বাঁক ফিরে ফিরে চলেছে, তবু লুপ্ত হয় নি, এরকম দৃষ্টান্ত বোধ হয় আর-কোনো দেশে দেখা যায় না।

৭

২৯ এপ্রেল। ইস্ফাহান থেকে যাত্রা করা গেল তেহেরানের দিকে। নগরের বাহিরেও অনেক দূর পর্যন্ত সবুজ খেত, গাছপালা ও জলের ধারা। মাঝে মাঝে গ্রাম। কোথাও-বা তারা পরিত্যক্ত। মাটির প্রাচীর ও দেওয়ালগুলি জীর্ণতার নানা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, ভিতের উপরে ছাদ নেই। এক জায়গায় এইরকম ভাঙা শূন্য গ্রামের সামনেই পথের ধারে পড়ে আছে উটের কঙ্কাল। ঐ ভাঙা ঘরগুলো, আর ঐ প্রাণীটার বুকের পাঁজর একই কথা বলছে। প্রাণের ভারবাহী যে-সব বাহন প্রাণহীন কিছুদিন তারাই থাকে বোবার মতো পড়ে, আর প্রাণ যায় চলে। এখানকার মাটির ঘর যেন মাটির তাঁবু—উপস্থিত প্রয়োজনের ক্ষণিক তাগিদে খাড়া করা, তার পরে তার মূল্য ফুরিয়ে যায়। দেখি আর ভাবি, এই তো ভালো। গড়ে তোলাও সহজ, ফেলে যাওয়াও তাই। বাসার সঙ্গে নিজেকে ও অপরিচিত আগামীকালকে বেঁধে রাখবার বিড়ম্বনা নেই। মানুষের কেবল যদি একটা-মাত্র দেহ থাকত বংশানুক্রমে সকলের জন্যে, খুব মজবুত চতুর্দন্ত হাতির হাড় আর গণ্ডারের সাত-পুরু চামড়া দিয়ে খুব পাকা করে তৈরি চোদ্দ পুরুষের একটা সরকারি দেহ, যেটা অনেক-জনের পক্ষে মোটামুটিভাবে উপযোগী, কিন্তু কোনো-একজনের পক্ষে প্রকৃষ্টভাবে উপযুক্ত নয়, নিশ্চয় সেই দেহদুর্গটা প্রাণপুরুষের পছন্দসই হত না। আপন বসতবাড়িকে বংশানুক্রমে পাকা করে তোলবার চেষ্টা প্রাণধর্মের বিরুদ্ধ। পুরানো বাড়ি আপন যুগ পেরতে না পেরতে পোড়ো-বাড়ি হতে বাধ্য। পিতৃপুরুষের অপব্যয়কে উপেক্ষা ক'রে নতুন বংশ নতুন পাড়ায় গিয়ে বাসা করে। আশ্চর্য এই যে, সেও ভাবী ভগ্নাবশেষ সৃষ্টি করবার জন্যে দশ পুরুষের মাপে অচল ভিত বানাতে থাকে। অর্থাৎ, মরে গিয়েও সে ভাবীকালকে জুড়ে আপন বাসায় বাস করবে এই কল্পনাতেই মুগ্ধ। আমার মনে হয়, যে-সব ইমারত ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নয়, স্থায়িত্বকামী স্থাপত্য তাদেরই সাজে।

কিছু দূরে গিয়ে আবার সেই শূন্য শুষ্ক ধরণী, গেরুয়া চাদরে ঢাকা তার নিরলংকৃত নিরাসক্তি। মধ্যাহ্নে গিয়ে পৌঁছলুম দেলিজানে। ইস্ফাহানের গভর্নর এখানে তাঁবু ফেলে আমাদের জন্যে বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছেন। এই তাঁবুতে আমাদের আহার হল। কুমশহর এখান থেকে আরও কতকটা দূরে। তার পাশ দিয়ে আমাদের পথ। দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায় স্বর্ণমণ্ডিত তার বিখ্যাত মসজিদের চূড়া।

বেলা পাঁচটার সময় গাড়ি পৌঁছল তেহেরানের কাছাকাছি। শুরু হল তার আদ্যপরিচয়। নগরপ্রবেশের পূর্বে বর্তমানযুগের শৃঙ্গধ্বনিমুখর নকিবের মতো দেখা গেল একটা কারখানাঘর— এটা চিনির কারখানা। এরই সংলগ্ন বাড়িতে জরথুস্ত্রীয় সম্প্রদায়ের একদল লোক আমাকে অভ্যর্থনার জন্য নামালেন। ক্লান্তদেহের খাতিরে দ্রুত ছুটি নিতে হল। তার পরে তেহেরানের পৌরজনদের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা গ্রহণ করবার জন্যে একটি বৃহৎ তাঁবুতে প্রবেশ করলেম। এখানকার শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী ছিলেন সভাপতি। এখানে চা খেয়ে স্বাগতসম্ভাষণের অনুষ্ঠান যখন শেষ হল সভাপতি আমাকে নিয়ে গেলেন একটি বৃহৎ বাগানবাড়িতে। নানা বর্ণ ফুলে খচিত তার তৃণ-আস্তরণ। গোলাপের গন্ধমাধুর্যে উচ্ছ্বসিত তার বাতাস, মাঝে মাঝে জলাশয় এবং ফোয়ারা এবং স্নিগ্ধচ্ছায়া তরুশ্রেণীর বিচিত্র সমাবেশ। যিনি আমাদের জন্যে এই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র গেছেন তাঁকে যে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করব এমন সুযোগ পাই নি। তাঁরই একজন আত্মীয় আগা আসাদি আমাদের শুশ্রূষার ভার নিয়েছেন। ইনি ন্যুয়র্কের কলম্বিয়া য়ুনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট, আমার সমস্ত ইংরেজি রচনার সঙ্গে সুপরিচিত। অভ্যাগতবর্গের সঙ্গে আমার কথোপ-কথনের সেতুস্বরূপ ছিলেন ইনি।

কয়েকদিন হল ইরাকের রাজা ফইসল এখানে এসেছেন। তাঁকে নিয়ে এখানকার সচিবেরা অত্যন্ত ব্যস্ত। আজ অপরাহ্ণের মৃদু রৌদ্রে বাগানে যখন বসে আছি ইরাকের দুইজন রাজদূত আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। রাজা বলে পাঠিয়েছেন তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা করেন। আমি তাঁদের জানালেম, ভারতবর্ষে ফেরবার পথে বোগদাদে রাজার দর্শন নিয়ে যাব।

আজ সন্ধ্যার সময় একজন ভদ্রলোক এলেন, তাঁর কাছ থেকে বেহালায় পারসিক সংগীত শুনলুম। একটি সুর বাজালেন, আমাদের ভৈরোঁ রামকেলির সঙ্গে প্রায় তার কোনো তফাত নেই। এমন দরদ দিয়ে বাজালেন, তানগুলি পদে পদে এমন বিচিত্র অথচ সংযত ও সুমিত যে আমার মনের মধ্যে মাধুর্য নিবিড় হয়ে উঠল। বোঝা গেল ইনি ওস্তাদ, কিন্তু ব্যাবসাদার নন। ব্যাবসাদারিতে নৈপুণ্য বাড়ে, কিন্তু বেদনাবোধ কমে যায়— ময়রা যে কারণে সন্দেশের রুচি হারায়। আমাদের দেশের গাইয়ে-বাজিয়েরা কিছুতেই মনে রাখে না যে আর্টের প্রধান তত্ত্ব তার পরিমিতি। কেননা রূপকে সুব্যক্ত করাই তার কাজ। বিহিত সীমার দ্বারা রূপ সত্য হয়, সেই সীমা ছাড়িয়ে অতিকৃতিই বিকৃতি। মানুষের নাক যদি আপন মর্যাদা পেরিয়ে হাতির শুঁড় হওয়ার দিকে এগোতে থাকে, তার ঘাড়টা যদি জিরাফের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে মরিয়া হয়ে মেতে ওঠে, তা হলে সেই আতিশয্যে বস্তুগৌরব বাড়ে, রূপগৌরব বাড়ে না। সাধারণত আমাদের সংগীতের আসরে এই অতিকায় আতিশয্য মত্ত করীর মতো নামে পদ্মবনে। তার তানগুলো অনেক স্থলে সামান্য একটু-আধটু হেরফের করা পুনঃপুনঃ পুনরাবৃত্তি মাত্র। তাতে স্তূপ বাড়ে, রূপ নষ্ট হয়। তন্বী রূপসীকে হাজার পাকে জড়িয়ে ঘাগরা এবং ওড়না পরানোর মতো। সেই ওড়না বহুমূল্য হতে পারে, তবু রূপকে অতিক্রম করবার স্পর্ধা তাকে মানায় না। এরকম অদ্ভুত রুচিবিকারের কারণ এই যে, ওস্তাদেরা স্থির করে রেখেছেন সংগীতের প্রধান উদ্দেশ্য সমগ্র গানটিকে তার আপন সুষমায় প্রকাশ করা নয়, রাগরাগিণীকেই বীরবিক্রমে আলোড়িত ফেনিল করে তোলা— সংগীতের ইমারতটিকে আপন ভিত্তিতে সুসংযমে দাঁড় করানো নয়, ইঁটকাঠ-চুনসুরকিকে কণ্ঠ-কামানের মুখে সগর্জনে বর্ষণ করা। ভুলে যায় সুবিহিত সমাপ্তির মধ্যেই আর্টের পর্যাপ্তি। গান যে বানায় আর গান যে করে, উভয়ের মধ্যে যদি-বা দরদের যোগ থাকে তবু সৃষ্টিশক্তির সাম্য থাকা সচরাচর

সম্ভবপর নয়। বিধাতা তাঁর জীবসৃষ্টিতে নিজে কেবল যদি কঙ্কালের কাঠামোটুকু খাড়া করেই ছুটি নিতেন, যার-তার উপর ভার থাকত সেই কঙ্কালে যত খুশি মেদমাংস চড়াবার, নিশ্চয়ই তাতে অনাসৃষ্টি ঘটত। অথচ আমাদের দেশে গায়ক কথায় কথায় রচয়িতার অধিকার নিয়ে থাকে, তখন সে সৃষ্টিকর্তার কাঁধের উপর চড়ে ব্যায়ামকর্তার বাহাদুরি প্রচার করে। উত্তরে কেউ বলতে পারেন, ভালো তো লাগে। কিন্তু পেটুকের ভালো লাগা আর রসিকের ভালো লাগা এক নয়। কী ভালো লাগে তাই নিয়ে তর্ক। যে ময়রা রসগোল্লা তৈরি করে মিষ্টান্নের সঙ্গে যথাপরিমিত রস সে নিজেই জুগিয়ে দেয়। পরিবেশনকর্তা মিষ্টান্ন গড়তে পারে না, কিন্তু দেদার চিনির রস ঢেলে দেওয়া তার পক্ষে সহজ। সেই চিনির রস ভালো লাগে অনেকের; তা হোক গে, তবু সেই লাগাতেই আর্টের যথার্থ যাচাই নয়।

ইতিমধ্যে একজন সেকেলে ওস্তাদ এসে আমাকে বাজনা শুনিয়ে গেছেন, তার থেকে বুঝলুম এখানেও গানের পথে সন্ধ্যা হয় এবং বাঘের ভয় ঘটে। এখানেও যে-খুশি সরস্বতীর বীণায় রবারের তার চড়িয়ে তাকে কেবলমাত্র গায়ের জোরে টেনে টেনে দীর্ঘ করতে পারে।

আজ পারস্যরাজের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হল। প্রাসাদের বৃহৎ কার্পেট-পাতা ঘরে আসবাব আড়ম্বর নেই বললেই হয়। রাজার গায়ে খাকি-রঙের সৈনিক-পরিচ্ছদ। অতি অল্পদিনমাত্র হল অতি দ্রুতহস্তে পারস্যরাজত্বকে দুর্গতির তলা হতে উদ্ধার করে ইনি তার হৃদয় অধিকার করে বসে আছেন। এমন অবস্থায় মানুষ আপন সদ্যপ্রতিষ্ঠিত গৌরবকে অতিমাত্র সমারোহদ্বারা ঘোষণা করবার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু ইনি আপন রাজমহিমাকে অতিসহজেই ধারণ করে আছেন। খুব সহজ মহত্ত্বের মানুষ; এঁর মুখের গড়নে প্রবল দৃঢ়তা, চোখের দৃষ্টিতে প্রসন্ন ঔদার্য। সিংহাসনে না ছিল তাঁর বংশগত অধিকার, না ছিল আভিজাত্যের দাবি; তবু যেমনি তিনি রাজাসনে বসলেন অমনি প্রজার হৃদয়ে তাঁর স্থান অবিলম্বে স্বীকৃত হল। দশ বছর মাত্র তিনি রাজা হয়েছেন কিন্তু সিংহাসনের চারি দিকে আশঙ্কা উদ্‌বেগের দুর্গম বেড়া সতর্কতায় কণ্টকিত হয়ে ওঠে নি। সেদিন অমিয় দেখে এসেছেন নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে, রাজা স্বয়ং পথে দাঁড়িয়ে বিনা আড়ম্বরে পরিদর্শনে নিযুক্ত।

ইতিমধ্যে একদিন প্রধান রাজমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হল। তাঁকে বললুম, বহুযুগের উগ্র সংস্কারকে নম্র করে দিয়ে তাঁরা এ রাজ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধিকে নির্বিষ করেছেন এই দেখে আমি আনন্দিত।

তিনি বললেন, যতটা আমাদের ইচ্ছা ততটা সফলতা এখনো পাই নি। মানুষ তো আমরা সকলেই, আমাদের মধ্যে মানুষোচিত সম্বন্ধ সহজ ও ভদ্র না হওয়াই অদ্ভুত।

আমি যখন বললুম পারস্যের বর্তমান উন্নতিসাধনা একদিন হয়তো ভারতবর্ষের দৃষ্টান্তস্থল হতে পারে, তিনি বললেন, রাষ্ট্রীয় অবস্থা সম্বন্ধে ভারতবর্ষ ও পারস্যের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। মনে রাখতে হবে, পারস্যের জনসংখ্যা এক কোটি বিশ লাখ, ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটির উপর— এবং সেই ত্রিশ কোটি বহুভাগে বিভক্ত। পারস্যের সমস্যা অনেক বেশি সরল, কেননা আমরা জাতিতে ধর্মে ভাষায় এক। আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে শাসনব্যবস্থাকে নির্দোষ এবং সম্যক উপযোগী করে তোলা।

আমি বললুম, দেশের প্রকাণ্ড আয়তনটাই তার প্রকাণ্ড শত্রু। চীন ভারতবর্ষ তার প্রমাণ। জাপান ছোটো বলে এত শীঘ্র বড়ো হয়েছে। স্বভাবতই ঐক্যবদ্ধ অন্য সভ্যদেশের রাষ্ট্রনীতি ভারতবর্ষে খাটবে না। এখানকার বিশেষ নীতি নানা দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে এখানেই উদ্ভাবিত হবে।

তিনি চলে গেলে আমি বসে বসে ভাবতে লাগলুম ঐক্যটাই আমাদের দেশে প্রথম ও সব চেয়ে বেশি চাই, অথচ ঐটের বাধা আমাদের হাড়ে হাড়ে। ভারতীয় মুসলমানের গোঁড়ামি নিজের সমাজকে নিজের মধ্যে একান্ত কঠিন করে বাঁধে, বাইরেকে দূরে ঠেকায়; হিন্দুর গোঁড়ামি নিজের সমাজকে নিজের মধ্যে হাজারখানা করে, তার উপরেও বাইরের সঙ্গে তার অনৈক্য। এই

দুই বিপরীতধর্মী সম্প্রদায়কে নিয়ে আমাদের দেশ। এ যেন দুই যমজ ভাই পিঠে পিঠে জোড়া; একজনের পা ফেলা আর-একজনের পা ফেলাকে প্রতিবাদ করতেই আছে। দুইজনকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করাও যায় না, সম্পূর্ণ এক করাও অসাধ্য।

কয়েকজন মোল্লা এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। প্রধান মোল্লা প্রশ্ন করলেন, নানা জাতির নানা ধর্মগ্রন্থে নানা পথ নির্দেশ করে, তার মধ্য থেকে সত্যপথ নির্ণয় করা যায় কী উপায়ে।

আমি বললুম, ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, 'আলো পাব কী উপায়ে' তাকে কেউ উত্তর দেয় চকমকি ঠুকে— কেউ বলে তেলের প্রদীপ, কেউ বলে মোমের বাতি, কেউ বলে ইলেকট্রিক আলো জেবলে। সেই-সব উপকরণ ও প্রণালী নানাবিধ, তার ব্যয় যথেষ্ট, তার ফল সমান নয়। যারা পুঁথি সামনে রেখে কথা কয় না, যাদের সহজ বুদ্ধি, তারা বলে, দরজা খুলে দাও। ভালো হও, ভালোবাসো, ভালো করো, এইটেই হল পথ। যেখানে শাস্ত্র এবং তত্ত্ব এবং আচারবিচারের কড়াক্কড়ি সেখানে ধার্মিকদের অধ্যবসায় কথা-কাটাকাটি থেকে শুরু করে গলা-কাটাকাটিতে গিয়ে পৌঁছয়।

মোল্লার পক্ষে তর্কের উদ্যম ফুরোয় নি, কিন্তু আমার আর সময় ছিল না।

৮

আজ ৫ই মে তেহেরানের জনসভায় আমার প্রথম বক্তৃতা।

সভা ভঙ্গ হলে আমাদের নিয়ে গেল এখানকার একজন সংগীতগুণীর বাড়িতে। ছোটো একটি গলির ধারে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলুম। শানবাঁধানো চৌকো উঠোন, তারই মধ্যে একটুখানি জলাশয়, গোলাপ ধরেছে গাছে, ছোটো ছোটো টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম। সামনে দালান, সেখানে বাজিয়ের দল অপেক্ষা করছে। বাজনার মধ্যে একটি তারযন্ত্র, একটি বাঁশি, বাকি অনেকগুলি বেহালা। আমরা সেখানে আসন নিলে পর প্রধান গুণী বললেন, আমি জানি আপনি ইচ্ছা করেন দেশপ্রচলিত কলাবিদ্যার স্বরূপ নষ্ট না হয়। আমরাও তাই চাই। সংগীতের স্বদেশী স্বকীয়তা রক্ষা করে আমরা তার সঙ্গে য়ুরোপীয় স্বরসংগতিতত্ত্ব যোগ করতে চেষ্টা করি।

আমি বললুম, ইতিহাসে দেখা যায় পারসিকদের গ্রহণ করবার প্রবলশক্তি আছে। এশিয়ার প্রায় সকল দেশেই আজ পাশ্চাত্য ভাবের সঙ্গে প্রাচ্য ভাবের মিশ্রণ চলছে। এই মিশ্রণে নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা। এই মিলনের প্রথম অবস্থায় দুই ধারার রঙের তফাতটা থেকে যায়, অনুকরণের জোরটা মরে না। কিন্তু আন্তরিক মিলন ক্রমে ঘটে, যদি সে মিলনে প্রাণশক্তি থাকে; কলমের গাছের মতো নূতনে পুরাতনে ভেদ লুপ্ত হয়ে ফলের মধ্যে রসের বিশিষ্টতা জন্মে। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে এটা ঘটেছে, সংগীতেও কেন ঘটবে না বুঝি নে। যে চিত্তের মধ্যে দিয়ে এই মিলন সম্ভবপর হয় আমরা সেই চিত্তের অপেক্ষা করছি, য়ুরোপীয় সাহিত্যচর্চা প্রাচ্য শিক্ষিতসমাজে যে পরিমাণে অনেক দিন ধরে অনেকের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে য়ুরোপীয় সংগীতচর্চাও যদি তেমনি হত তা হলে নিঃসন্দেহই প্রাচ্য সংগীতে রসপ্রকাশের একটি নূতন শক্তিসঞ্চার হত। য়ুরোপের আধুনিক চিত্রকলায় প্রাচ্য চিত্রকলার প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছে এ তো দেখা গেছে; এতে তার আত্মতা পরাভূত হয় না, বিচিত্রতর— প্রবলতর হয়।

তার পরে তিনি একলা একটি সুর তাঁর তারযন্ত্রে বাজালেন। সেটি বিশুদ্ধ ভৈরবী, উপস্থিত সকলেরই সেটি অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করল। ইনি বললেন, জানি, এরকম সুর আমাদেরকে একভাবে মুগ্ধ করে, কিন্তু অন্যরকম জিনিসটারও বিশেষ মূল্য আছে। পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ্যা জন্মিয়ে দিয়ে একটার খাতিরে অন্যকে বর্জন করা নিজের লোকসান করা।

কী জানি, লোকটির যদি শক্তি থাকে তবে পারসিক সংগীতে ইনি যে নূতন বাণিজ্যের প্রবর্তন করছেন ক্রমে হয়তো কলারাজ্যে তা লাভের সামগ্রী হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের রাগরাগিণী স্বরসংগতিকে

ইরান, তোমার যত বুলবুল,
তোমার কাননে বসন্ত ফুল
বিদেশী কবির জন্মদিনেরে মানি
শুনালো তাহারে অভিনন্দনবাণী॥

ইরান, তোমার বীর সন্তান
প্রণয়-অর্ঘ্য করিয়াছে দান,
আজি এ বিদেশী কবির জন্মদিনে,
আপনার বলি নিয়েছে তাহারে চিনে॥

ইরান তোমার সম্মানমালে
নব গৌরব বহি নিজ ভালে
সার্থক হোলো কবির জন্মদিন।
চিরকাল তারি স্বীকার করিয়া ঋণ
তোমার ললাটে পরানু এ মোর শ্লোক, —
ইরানের জয় হোক॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"ইরান, তোমার যত বুলবুল"
পাণ্ডুলিপি চিত্র
পারস্য। ২৫ বৈশাখ ১৩৩৯

স্বীকার করেও আত্মরক্ষা করতে একেবারেই পারে না এ কথা জোর করে কে বলতে পারে। সৃষ্টির শক্তি কী লীলা করতে সমর্থ কোনো একটা বাঁধা নিয়মের দ্বারা আমরা আগে হতে তার সীমা নির্ণয় করতে পারি নে। কিন্তু সৃষ্টিতে নূতন রূপের প্রবর্তন বিশেষ শক্তিমান প্রতিভার দ্বারাই সাধ্য, আনাড়ির বা মাঝারি লোকের কর্ম নয়। য়ুরোপীয় সাহিত্যের যেমন তেমনি তার সংগীতেরও মস্ত একটা সম্পদ আছে। সে যদি আমরা বুঝতে না পারি তবে সে আমাদের বোধশক্তিরই দৈন্য; যদি তাকে গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব হয় তবে তার দ্বারা আভিজাত্যের প্রমাণ হয় না।

আজ ৬ই মে। য়ুরোপীয় পঞ্জিকার মতে আজ আমার জন্মদিন। আমার পারসিক বন্ধুরা এই দিনের উপর সকালবেলা থেকে পুষ্পবৃষ্টি করছেন। আমার চারি দিক ভরে গেছে নানাবর্ণের বসন্তের ফুলে, বিশেষত গোলাপে। উপহারও আসছে নানা রকমের। এখানকার গবর্নমেন্ট থেকে একটি পদক ও সেইসঙ্গে একটি ফর্মান পেয়েছি। বন্ধুদের বললুম, আমি প্রথমে জন্মেছি নিজের দেশে, সেদিন কেবল আত্মীয়েরা আমাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। তার পরে তোমরা যেদিন আমাকে স্বীকার করে নিলে আমার সেদিনকার জন্ম সর্বদেশের—আমি দ্বিজ।

অপরাহ্নে শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রীর বাড়িতে চায়ের মজলিসে নিমন্ত্রণ ছিল। সে সভায় এ দেশের প্রধানগণ ও বিদেশের রাষ্ট্রপ্রতিনিধি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সেখানে একজন পারসিক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপপ্রসঙ্গে কথা উঠল, বহুকাল থেকে বারংবার বিদেশী আক্রমণকারীদের, বিশেষত মোগল ও আফগানদের, হাত থেকে অতি নিষ্ঠুর আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও পারস্য যে আপন প্রতিভাকে সজীব রেখেছে এ অতি আশ্চর্য। তিনি বললেন, সমস্ত জাতিকে আশ্রয় করে পারস্যে যে ভাষা ও সাহিত্য বহমান তারই ধারাবাহিকতা পারস্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অনাবৃষ্টির রুদ্রতা যখন তাকে বাইরে থেকে পুড়িয়েছে তখন তার অন্তরের সম্বল ছিল তার আপন নদী। এতে শুধু যে পারস্যের আত্মস্বরূপকে রক্ষা করেছে তা নয়, যারা পারস্যকে মারতে এসেছিল তারাই পারস্যের কাছ থেকে নূতন প্রাণ পেলে—আরব থেকে আরম্ভ করে মোগল পর্যন্ত।

আরবরা তুর্কিরা মোগলরা এসেছিল দানশূন্য হস্তে, কেবলমাত্র অস্ত্র নিয়ে। আরব পারস্যকে ধর্ম দিয়েছে, কিন্তু পারস্য আরবকে দিয়েছে আপন নানা বিদ্যা ও শিল্পসম্পন্ন সভ্যতা। ইসলামকে পারস্য ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছে।

৭ মে। আজ সকালে প্রধান রাজমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। প্রকাণ্ড বড়ো বৈঠকখানা, স্ফটিকে মণ্ডিত, কিছু কিছু জীর্ণ হয়েছে। মন্ত্রী বৃদ্ধ, আমারই সমবয়সী। আমি তাঁকে বললুম ভারতবর্ষের আবহাওয়া আমাদের জীবনযাত্রার উপরে এখানকার চেয়ে অনেক বেশি মাশুল চড়িয়েছে।

তিনি বললেন, বয়সের উপর কালের দাবি তত বেশি লোকসান করে না যেমন করে আহারে ব্যবহারে অনিয়ম অসংযম। সাবেককালে আমাদের জীবনযাপনের অভ্যাসগুলি ছিল আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে মানানসই, এখন বিদেশী নতুন অভ্যাস এসে অসামঞ্জস্য ঘটিয়েছে। একটা দৃষ্টান্ত দেখাই। ঘরে কার্পেট পাতা আমাদের চিরকালের অভ্যাস, তারই সঙ্গে জুড়ি অভ্যাস হচ্ছে জুতো খুলে ঘরে ঢোকা। আজকাল য়ুরোপীয় প্রথামত পথের জুতোটাকে ধুলোসুদ্ধ ঘরের মধ্যে টেনে আনি। কার্পেট হয়ে ওঠে অস্বাস্থ্যকর। আগে কার্পেট-পাতা মেঝের উপর বসতুম, এখন সোফা-কেদারার খাতিরে বহুমূল্য বহুবিচিত্র কার্পেটের অর্থ ও সম্মান দিলুম পদদলিত করে।

এখান থেকে গেলেম পার্লামেন্টের সভানায়কের বাড়িতে। এঁরা চিন্তাশীল শিক্ষিত অভিজ্ঞ লোক, এঁদের সঙ্গে কথা কইবার বিষয় অনেক আছে, কিন্তু কথা চলে না। তর্জমার ভিতর দিয়ে আলাপ করা পায়ে পায়ে কোদালি দিয়ে পথ কেটে চলার মতো। যিনি আমার কালকেকার কবিতা পারসিক ভাষা ও ছন্দে তর্জমা করেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা হল। লোকটি হাসিখুশি, গোলগাল,

হৃদ্যতায় সমুচ্ছ্বসিত। কবিতা আবৃত্তি করেন প্রবল কণ্ঠে, প্রবল উৎসাহে দেহচালনা করেন। ওখান থেকে চলে আসবার সময় সভাপতিমশায় অতি সুন্দর লিপিনৈপুণ্যে লিখিত কবি আনওয়ারির রচিত একখানি কাব্যগ্রন্থ আমাকে উপহার দিলেন।

রাত্রে গেলেম থিয়েটারে অভিনয় দেখতে। নাটক এবং নাট্যাভিনয় পারস্যে হালের আমদানি। এখনো লোকের মনে ভালো করে বসে নি। তাই সমস্ত ব্যাপারটা কাঁচা রকমের ঠেকল। শাহ্‌নামা থেকে নাটকের গল্পটি নেওয়া। আমাদের দেশের নাটকের মতো প্রায়ই মাঝে মাঝে গান, এবং বোধ করি দেশাভিমানের উচ্ছ্বাস। মেয়েদের ভূমিকা অধিকাংশই মুসলমান মেয়েরা নিয়েছে দেখে বিস্ময় বোধ হল।

অপরাহ্ণে জরথুস্ত্রীয় বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন-অনুষ্ঠান। সেখান থেকে কর্তব্য সেরে ফিরে যখন এলুম তখন আমাদের বাগানে গাছের তলায় একটি জলাশয়ের চার ধারে বৃহৎ জনতা অপেক্ষা করছে। এখানকার সাহিত্যসভার নিমন্ত্রণে সকলে আহূত। আমার তরফে ছিল সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে ইংরেজিতে বক্তৃতার ধারা, আর এঁদের তরফে ছিল তারই মাঝে মাঝে এপারে ওপারে পারসিক ভাষার সাঁকো বেঁধে দেওয়া।

পথিকের মতো পথ চলতে চলতে আমি আজ এখানকার ছবি দেখতে দেখতে চলেছি। সম্পূর্ণ করে কিছু দেখবার সময় নেই। আমার মনে যে ধারণাগুলো হচ্ছে সে দ্রুত আভাসের ধারণা। বিচার করে উপলব্ধি নয়, কেবলমাত্র মানসিক হাত বুলিয়ে যাবার অনুভূতি। এই যেমন, সেদিন একজন মানুষের সঙ্গে হঠাৎ অল্পক্ষণের আলাপ হল। একটা ছায়াছবি মনে রয়ে গেল, সেটা নিমেষকালের আলোতে তোলা। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানবিৎ গাণিতিক। সৌম্য তাঁর মূর্তি, মুখে স্বচ্ছচিত্তের প্রকাশ। এঁর বেশ মোল্লার, কিন্তু এঁর বুদ্ধি সংস্কারমোহমুক্ত, ইনি আধুনিক অথচ চিরকালের পারসিক। ক্ষণকালের দেখাতেই এই মানুষের মধ্যে আমি পারস্যের আত্মসমাহিত স্বপ্রকৃতিস্থ মূর্তি দেখলুম, যে পারস্যে একদা আবিসেন্না ছিলেন বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের অদ্বিতীয় সাধক এবং জালালউদ্দিন গভীরতম আত্মোপলব্ধিকে সরসতম সংগীতে প্রবাহিত করেছিলেন। অধ্যাপক ফেরুঘির কথা পূর্বেই বলেছি। তিনিও আমার মনে একটি চিত্র এঁকে দিয়েছেন, সে চিত্রও চিত্তবান পারসিকের। অর্থাৎ এঁর স্বদেশীয় স্বভাব বিদেশীর কাছেও সহজে প্রকাশমান। যে মানুষ সংকীর্ণভাবে একান্ত-ভাবে স্বাদেশিকতার মধ্যে বদ্ধ, তিনি স্বদেশকে প্রকাশ করেন না, কেননা, মূর্তি আপন দেশের মাটিতে গড়া হলেও যে আলো তাকে প্রকাশ করবে সে আলো যে সার্বভৌমিক।

তেহেরান থেকে বিদায় নেবার দিন এল, প্রধান মন্ত্রীবর্গ এসে আমাকে বিদায় দিলেন।

৯

বেলা আড়াইটার সময় যাত্রা করলুম। তেহেরান থেকে বেরিয়ে প্রথমটা পারস্যের নীরস নির্জন চেহারা আবার দেখা দিল, কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। দৃশ্যপরিবর্তন হল। ফসলে সবুজ মাঠ, মাঝে মাঝে তরুসংহতি, যেখানে-সেখানে জলের চঞ্চল ধারা, মেটে ঘরের গ্রাম তেমন বিরল নয়। দিগন্তে বরফের আঙুল-বোলানো গিরিশিখর।

সূর্যাস্তের সময় কাজবিন শহরে পৌঁছলুম। এখানে একটি হোটেলে আমাদের জায়গা হয়েছে। বাংলাদেশে রেলপথের প্রধান জংশন যেমন আসানসোল, এখানে নানা পথের মোটরের সংগমতীর্থ তেমনি কাজবিন।

কাজবিন সাসানীয় কালের শহর, দ্বিতীয় শাপুর-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় সাফাবি রাজা তামাস্প এই শহরে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। দিল্লির পলাতক মোগল বাদশা হুমায়ুন দশবৎসরকাল এখানে তাঁরই আশ্রয়ে ছিলেন।

সাফাবি বংশের বিখ্যাত শা আব্বাসের সঙ্গে অ্যান্টনি ও রবার্ট শার্লি-নামক দুই ইংরেজ ভ্রাতার এইখানেই দেখা হয়। জনশ্রুতি এই যে, এঁরাই কামান প্রভৃতি অস্ত্রসহযোগে আধুনিককালীন যুদ্ধবিদ্যায় বাদশাহের সৈন্যদের শিক্ষিত করেন। যাই হোক, বর্তমানে এই ছোটো শহরটিতে সাবেক কালের রাজধানীর মর্যাদা কিছুই চোখে পড়ে না।

ভোরবেলা ছাড়লুম হামাদানের অভিমুখে। চড়াইপথে চলল আমাদের গাড়ি। দুই ধারে ভূমি সুজলা সুফলা, মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো গ্রাম, আঁকাবাঁকা নদী, আঙুরের খেত, আফিমের পুষ্পোচ্ছ্বাস। বেলা দুপুরের সময় হামাদানে পৌঁছিয়ে একটি মনোহর বাগানবাড়ির মধ্যে আশ্রয় পাওয়া গেল— পপ্‌লার-তরুসংঘের ফাঁকের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে বরফের-আঁচড়-কাটা পাহাড়।

তেহেরানে গরম পড়তে আরম্ভ করেছিল, এখানে ঠান্ডা। সমুদ্রের উপরিতল থেকে এ শহর ছ-হাজার ফুট উঁচু। এল্‌ভেন্দ পাহাড়ের পাদদেশে এর স্থান। একদা আকেমেনীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল এইখানে। সেই রাজধানীর প্রাচীন নাম ইতিহাসবিখ্যাত একবাতানা, আজ তার ধ্বংসাবশেষ প্রায় কিছু বাকি নেই।

আহার ও বিশ্রামের পর বিকেলবেলা শহর দেখতে বেরলুম। প্রথমে আমাদের নিয়ে গেল ঘন বনের মধ্য দিয়ে গলিপথ বেয়ে একটি পুরোনো বড়ো ইমারতের সামনে। বললে, এর উপরের তলা থেকে চারি দিকের দৃশ্য অবারিত দেখতে পাওয়া যায়। আমার সঙ্গীরা দেখতে গেলেন, কিন্তু আমার সাহস হল না। গাড়িতে বসে দেখতে লাগলুম একদল লোক এসেছে বনের ধারে চড়িভাতি করতে। মেয়েরাও তার মধ্যে আছে; তারা কালো চাদরে মোড়া; কিন্তু দেখছি বাইরে বেরতে রাস্তায় ঘাটে বেড়াতে এদের সংকোচ নেই।

আজ মহরমের ছুটি, সবাই ছুটি উপভোগ করতে বেরিয়েছে। অল্প কয়েক বছর আগে মহরমের ছুটি রক্তাক্ত হয়ে উঠত, আত্মপীড়নের তীব্রতায় মারা যেত কত লোক। বর্তমান রাজার আমলে ধীরে ধীরে তার তীব্রতা কমে আসছে।

বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে শহরে গেলেম। আজ দোকান বাজার বন্ধ, কিন্তু ছুটির দলের খুব ভিড়। পারস্যে এসে অবধি মানুষ কম দেখা আমাদের অভ্যাস, তাই রাস্তায় এত লোক আমাদের চোখে নতুন লাগল। আরও নতুন লাগল এই শহরটি। শহরের এমন চেহারা আর কোথাও দেখি নি। মাঝখান দিয়ে একটি অপ্রশস্ত খামখেয়ালী ঝরনা নানা ভঙ্গিতে কলশব্দে বহমান—কোথাও-বা উপর থেকে নীচে পড়ছে ঝরে, কোথাও-বা তার সমতলীন স্রোত রৌদ্রে ঝলমল করছে, ধারে ধারে পাথরের স্তূপ, মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো সাঁকো এপার থেকে ওপারে; ঝরনার সঙ্গে পথের আঁকাবাঁকা মিল; মানুষের কাজের সঙ্গে প্রকৃতির গলাগলি; বাড়ির শামিল উন্মুক্ত প্রাঙ্গণগুলি উপরের থাকে, নীচের থাকে, এ কোণে, ও কোণে। তারই নানা জায়গায় নানা দল বসে গেছে। বাঁকাচোরা রাস্তায় মোটরগাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, এমন-কি, মোটরবাস ভর্তি করে চলেছে সব ছুটি-সম্ভোগীর দল। গাড়ির ঘোড়াগুলি সুশ্রী সুপুষ্ট। এই ছুটির পরবে মত্ততা কিছুই দেখলুম না, চারি দিকে শান্ত আরামের ছবি এখানকার অরণ্য পর্বত ঝরনার সঙ্গে মিশে গেছে।

গবর্নর কাল শহরের বাইরে বনের মধ্যে বিকেলে আমাদের চায়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বাঁ ধারে পাহাড়, ডাইনে ঘন অরণ্যের অন্ধকার ছায়ায় ঝরনা ঝরে পড়ছে। পাহাড়ী পথ বেয়ে বহু চেষ্টায় মোটর গেল। সেই বহুযুগের মেষপালকদের ভেড়া-চড়া বনের মধ্যে চা খেয়ে সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে এলুম। হামাদানের যে মূর্তি চিরসজীব, শতাব্দীর পর শতাব্দী সেখানে বুলবুল গান করে আসছে, আলেকজান্ডারের লুঠের বোঝার সঙ্গে সে অন্তর্ধান করে নি, কিন্তু পথের ধারে প্রান্তরের মধ্যে অনাদরে পড়ে আছে একটি পাথরের পিণ্ড, সম্রাটের সিংহদ্বারের সিংহের এই অপভ্রংশ।

স্নানাহার সেরে দুপুরের পর হামাদান থেকে রওনা হলুম। যেতে হবে কির্মানশা। তখন ঝোড়ো হাওয়ায় ধুলো উড়িয়েছে, আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এল। চলেছি আসাদাবাদ গিরিপথ দিয়ে। দুই ধারে সবুজ খেত ফসলে ভরা, মাঝে মাঝে বনভূমি জলস্রোতে লালিত। মাঠে ভেড়া চরছে৷ পাহাড়গুলো

এগিয়ে এসে তাদের শিলাবক্ষপট প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে। থেকে থেকে এক-এক পসলা বৃষ্টি নেমে ধূলোকে দেয় পরাভূত করে। আমার কেবল মনে পড়ছিল 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্বনভুবঃশ্যামাঃ'... তমালদ্রুমে নয়, কী গাছ ঠিক জানি নে, কিন্তু এই মেঘলা দিনে উপস্থিতমত ওকে তমালগাছ বলতে দোষ নেই।

আমরা যে পথ দিয়ে চলেছি এরই কাছাকাছি কোনো-এক জায়গায় বিখ্যাত নিহাবন্দের রণক্ষেত্রে সাসানীয় সাম্রাজ্য আরবদের হাতে লীলা সমাপন করে। সেইদিন বহুকালীন প্রাচীন পারস্যের ইতিহাসে হঠাৎ সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় শুরু হল।

অবশেষে আমাদের রাস্তা এসে পড়ল বেহিস্তুনে। এখানে শৈলগাত্রে দরিয়ুসের কীর্তিলিপি পারসিক সুসীয় ও ব্যাবিলোনীয় ভাষায় খোদিত। এই খোদিত ভাষার ঊর্ধ্বে দরিয়ুসের মূর্তি। এই মূর্তির সামনে বন্দীবেশে দশজন বিদ্রোহীর প্রতিরূপ। এরা তাঁর সিংহাসন-অধিরোহণে বাধা দিয়েছিল। দরিয়ুসের পূর্ববর্তী রাজা ক্যাম্বাইসিস (পারসিক উচ্চারণ কাম্ব্যোজিয়) ঈর্ষ্যাবশত গোপনে তাঁর ভ্রাতা স্মর্দিস্‌কে হত্যা করিয়েছিলেন। যখন তিনি ঈজিপ্ট-অভিযানে তখন তাঁর অনুপস্থিতিকালে সৌমতে বলে এক ব্যক্তি নিজেকে স্মর্দিস্ নামে প্রচার করে সিংহাসন দখল করে বসে। ক্যাম্বাইসিস ঈজিপ্ট থেকে ফেরবার পথে মারা যান। তখন আকেমেনীয় বংশের অপর শাখাভুক্ত দরিয়ুস ছদ্মরাজাকে পরাস্ত করে বন্দী করেন। প্রতিমূর্তিতে ভূমিশায়ী সেই মূর্তির বুকে দরিয়ুসের পা, বন্দী ঊর্ধ্বে দুই হাত তুলে ক্ষমা ভিক্ষা করছে। দরিয়ুসের মাথার উপরে অহুরমজ্‌দার মূর্তি।

অধ্যাপক হর্টজ্‌ফেল্‌ড্ বলেন, সম্প্রতি একটি শিলালিপি বেরিয়েছে তাতে দরিয়ুস জানাচ্ছেন, তিনি যখন সিংহাসনে বসেন তখন তাঁর পিতা পিতামহ উভয়েই বর্তমান। এই প্রথাবিরুদ্ধ ব্যাপার কী করে সম্ভব হল তার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না।

সমুদ্রের মাঝে মাঝে এক-একটা দ্বীপ দেখা যায় যা ভূমিকম্পের হাতে তৈরি। তার সর্বত্র গলিত ধাতু আর অগ্নিস্রাবের চিহ্ন। তেমনি বহুযুগ ধরে ইতিহাসের ভূমিকম্পে এবং অগ্নি-উদ্গীরণে পারস্যের জন্ম। প্রাচীনকাল থেকে পারস্যে সাম্রাজ্য সৃষ্টি হয়ে এসেছে। মানুষের ইতিহাসে সব চেয়ে পুরাতন মহাসাম্রাজ্য সাইরাস স্থাপন করেন, তার পরেও দীর্ঘকাল পারস্যের ইতিহাসক্ষেত্রে সাম্রাজ্যিক দ্বন্দ্ব। তার প্রধান কারণ, পারস্যের চারি দিকেই বড়ো বড়ো প্রাচীন রাজ-শক্তির স্থান। হয় তাদের সকলকে দমন করে রাখতে হবে, নয় তাদের কেউ-না-কেউ এসে পারস্যকে গ্রাস করবে। নানা জাতির সঙ্গে এই নিরন্তর দ্বন্দ্ব থেকেই পারস্যের ঐতিহাসিক বোধ, ঐতিহাসিক সত্তা এত প্রবল হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষ সমাজ সৃষ্টি করেছে, মহাজাতির ইতিহাস সৃষ্টি করে নি। আর্যের সঙ্গে অনার্যের দ্বন্দ্ব প্রধানত সামাজিক। অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক আর্য বহুসংখ্যক অনার্যের মাঝখানে পড়ে নিজের সমাজকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। রামের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ রাষ্ট্রজয়ের নয়, সমাজরক্ষার—সীতা সেই সমাজনীতির প্রতীক। রাবণ সীতাহরণ করেছিল, রাজ্যহরণ করে নি। মহাভারতেও বস্তুত সমাজনীতির দ্বন্দ্ব, এক পক্ষ কৃষ্ণকে স্বীকার করেছে, কৃষ্ণাকে পণ রেখে তাদের পাশা খেলা, অন্য পক্ষ কৃষ্ণকে অস্বীকার ও কৃষ্ণাকে করেছে অপমান। শাহ্‌নামায় আছে প্রকৃত ইতিহাসের কথা, রাষ্ট্রীয় বীরদের কাহিনী, ইরানীদের সঙ্গে তাতারীদের বিরোধ। তাতে ভগবদ্‌গীতার মতো তত্ত্বকথা বা শান্তিপর্বের মতো নীতি-উপদেশ প্রাধান্য পায় নি।

পারস্য বার বার পরজাতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপন পারসিক ঐক্যকে দৃঢ় করবার ও জয়ী করবার চেষ্টা করেছে। গুপ্তরাজাদের আমলে ভারতবর্ষ একবার আপন সাম্রাজ্যিক একসত্তা অনুভব করবার সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু তার প্রভাব গভীর ও স্থায়ী হয় নি। তার প্রধান কারণ, ভারতবর্ষ অন্তরে অন্তরে আর্যে অনার্যে বিভক্ত, সাম্রাজ্যিক ঐক্য সামাজিক ঐক্যের উপর ভিত পাততে পারে নি। দরিয়ুস শিলাবক্ষে এমনভাবে আপন জয়ঘোষণা করেছেন যাতে চিরকাল তা স্থায়ী হয়। কিন্তু এই জয়ঘোষণা প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক, দরিয়ুস পারসিক রাষ্ট্রসত্তার জন্যে বৃহৎ আসন রচনা

করেছিলেন; যেমন সাইরসকে তেমনি দরিয়ুসকে অবলম্বন করে পারস্য আপন অখণ্ড মহিমা বিরাট ভূমিকায় অনুভব করতে পেরেছিল। পারস্যে পর্বে পর্বে এই রাষ্ট্রিক উপলব্ধি পরাভবকে অতিক্রম করে জেগেছে, আজও আবার তার জাগরণ হল। এখানকার প্রধানমন্ত্রী আমাকে যা বলেছিলেন তার মূল কথাটা হচ্ছে এই যে, আপন সমাজনিহিত দুর্বলতার কারণ দূর করাই ভারতবর্ষের সমস্যা, আর পারস্যের সমস্যা আপন শাসনব্যবস্থার অপূর্ণতা মোচন করা। পারস্য সেই কাজে লেগেছে, ভারতবর্ষ এখনো আপনার যথার্থ কাজে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে লাগে নি।

বেহিস্তুন থেকে বেরলুম। অদূরে তাকিবুস্তানের পাহাড়ে উৎকীর্ণ মূর্তি। শহর থেকে মাইল-চারেক দূরে। গবর্নরের দূত এসে পথের মধ্যে থেকে সেখানে আমাদের নিয়ে গেলেন। দূরে থেকেই দেখা যায় অগভীর গুহাগাত্রে খোদাই-করা মূর্তি, তার সামনে কৃত্রিম সরোবরে ঝরে পড়ছে জলস্রোত। দুটি মূর্তি দাঁড়িয়ে, পায়ের তলায় দলিত একজন বন্দী। কোনো লেখা পাওয়া যায় না, কিন্তু সাজসজ্জায় বোঝা যায় এরা সাসানীয়। পাহাড়ের মধ্যে খোদাই করে তোলা একটি গম্বুজাকৃতি কক্ষের ঊর্ধ্বভাগে বাম হাতে অভিষেকের পাত্র ও ডান হাতে মালা নিয়ে পাখা মেলে বিজয়দেবতা দাঁড়িয়ে, তার নীচে এক দাঁড়ানো মূর্তি এবং তার নীচে বর্মপরা অশ্বারোহী। পাশের দেয়ালে শিকারের ছবি। এই মূর্তিগুলিতে আশ্চর্য একটি শক্তি প্রকাশ পেয়েছে, দেখে মন স্তম্ভিত হয়।

সাসানীয় যুগ বলতে কী বোঝায় সংক্ষেপে বলে রাখি।

আলেকজান্ডারের আক্রমণে আকেমেনীয় রাজত্বের অবসান হল। পরে যে জাত পারস্যকে দখল করে তাদের বলে পার্থীয়। তারা সম্ভবত শকজাতীয়; প্রথমে গ্রীকদের প্রভাবে আসে, পরে তারা পারসিক সভ্যতা গ্রহণ করে। অবশেষে ২২৬ খৃস্টাব্দে সাসানের পৌত্র আর্দাশির পার্থীয় রাজার হাত থেকে পারস্যকে কেড়ে নিয়ে আর-একবার বিশুদ্ধ পারসিক জাতির সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এঁদের সময়কার প্রবল সম্রাট ছিলেন শাপুর, তিনিই রোমের সম্রাট ভ্যালেরিয়ানকে পরাস্ত ও বন্দী করেন।

আকেমেনীয়দের ধর্ম ছিল জরথুস্ত্রীয়, সাসানীয়দের আমলে আর-একবার প্রবল উৎসাহে এই ধর্মকে জাগিয়ে তোলা হয়।

ঋজু প্রশস্ত নূতন-তৈরি পথ বেয়ে আসছি। অদূরে সামনে পাহাড়ের গায়ে কির্মানশা শহর দেখা দিল। পথের দুই ধারে ফসলের খেত, আফিমের খেত ফুলে আচ্ছন্ন, মেঘের আড়াল থেকে অস্তসূর্যরশ্মির আভা পড়ে সদ্যধৌত গাছের পাতা ঝলমল করছে।

শহরে প্রবেশ করলুম। পরিষ্কার রাস্তার দুই ধারে নানাবিধ পণ্যের দোকান। পথের ধুলো মারবার জন্যে ভিস্তিরা মশকে করে জল ছিটচ্ছে। সুন্দর বাগানের মধ্যে আমাদের বাসা। দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন এখানকার গবর্নর। ঘরে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়ালেন। এই পরিষ্কার সুসজ্জিত নূতন বাড়িটি আমাদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিয়ে গৃহস্বামী চলে গেছেন।

১০

কির্মানশা থেকে সকালে যাত্রা করে বেরলুম। আজ যেতে হবে কাস্‌রিশিরিনে, পারস্যের সীমানার কাছে। তার পরে আসবে কানিকিন, আরব সীমানার রেলওয়ে স্টেশন।

পারস্যে প্রবেশপথে আমরা তার যে নীরস মূর্তি দেখেছিলুম এখন আর তা নেই। পাহাড়ের রাস্তার দুই ধারে খেত ভরে উঠেছে ফসলে, গ্রামও অপেক্ষাকৃত ঘন ঘন, চাষীরা চাষ করছে এ দৃশ্যও চোখে পড়ল, তা ছাড়া এই প্রথম গোরু চরতে দেখলুম।

ঘণ্টাদুয়েক পরে সাহাবাদে পৌঁছলুম। এখানে রাজার একটি প্রাসাদ নতুন তৈরি হয়েছে, গবর্নর সেখানে গাছের ছায়ায় বসিয়ে চা খাওয়ালেন, সঙ্গে চললেন, কেরেন্দ-নামক জায়গায় মধ্যাহ্ন-ভোজন করিয়ে আমাদের বিদায় দেবার জন্যে। বড়ো সুন্দর এই গ্রামের চেহারাটি। তরুচ্ছায়ানিবিড়

পাহাড়ের কোলে আশ্রিত লোকালয়, ঝরনা ঝরে পড়ছে এদিক-ওদিক দিয়ে, পাথর ডিঙিয়ে। গ্রামের দোকানগুলির মাঝখান দিয়ে উঁচুনিচু আঁকাবাঁকা পথ, কৌতূহলী জনতা জমেছে।

তার পরের থেকে ধরণীর ক্রমেই সেই আবার শুষ্কনৈরাশ্যের মূর্তি। আমরা পারস্যের উচ্চভূমি থেকে নেমে চলেছি। সকলেই ভয় দেখিয়েছিলেন এখান থেকে আমরা অত্যন্ত গরম পাব। তার কোনো লক্ষণ দেখলুম না। হাওয়াটা আমাদের দেশের মাঘ মাসের মতো। পারস্যের শেষ সীমানায় যখন পৌঁছলুম দেখা গেল বোগদাদ থেকে অনেকে এসেছেন আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে। কেউ কেউ রাজকর্মচারী, কেউ বা খবরের কাগজের সম্পাদক, অনেকে আছেন সাহিত্যিক, তা ছাড়া প্রবাসী ভারতীয়। এঁরা কেউ কেউ ইংরেজি জানেন। একজন আছেন যিনি ন্যুয়র্কে আমার বক্তৃতা শুনেছেন। সেখানে শিক্ষাতত্ত্ব অধ্যয়ন শেষ করে ইনি এখানকার শিক্ষাবিভাগের কাজে নিযুক্ত। স্টেশনের ভোজনশালায় চা খেতে বসলুম। একজন বললেন, যাঁরা এখানে আপনাকে অভ্যর্থনা করতে এসেছেন তাঁদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আছেন। 'আমরা সকলেই এক। ভারতীয় মুসলমানেরা ধর্মের নামে কেন যে এমন বিরোধ সৃষ্টি করছে আমরা একেবারেই বুঝতে পারি নে।' ভারতীয়েরাও বলেন, 'এখানকার মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতার লেশমাত্র অভাব নেই।' দেখা যাচ্ছে ঈজিপ্টে তুরুস্কে ইরাকে পারস্যে সর্বত্র ধর্ম মনুষ্যত্বকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। কেবল ভারতবর্ষেই চলবার পথের মাঝখানে ঘন হয়ে কাঁটাগাছ উঠে পড়ে, হিন্দুর সীমানায়, মুসলমানের সীমানায়। এ কি পরাধীনতার মরুদৈন্যে লালিত ঈর্ষ্যাবুদ্ধি, এ কি ভারতবর্ষের অনার্যচিত্তজাত বুদ্ধিহীনতা।

অভ্যর্থনাদলের মধ্যে একজন বৃদ্ধ কবি ছিলেন, আমার চেয়ে দুই-এক বছরের ছোটো। পঙ্গু হয়ে পড়েছেন, শান্ত স্তব্ধ মানুষটি। তাঁর মুখচ্ছবি ভাবুকতায় আবিষ্ট। ইরাকের মধ্যে ইনিই সব চেয়ে বড়ো কবি বলে এঁর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল।

অনেক দিন পরে মোটর ছেড়ে রেলগাড়িতে চড়া গেল। গাড়িগুলি আরামের। দেহটা এতকাল পথে পথে কেবলই ঠোকর খেয়ে নাড়া খেয়ে একদণ্ড নিজেকে ভুলে থাকতে পারছিল না, আজ বাহনের সঙ্গে অবিশ্রাম দ্বন্দ্ব তার মিটে গেল।

জানালার বাইরে এখনো মাঝে মাঝে ফসলের আভাস দেখা যায়, বোধ হয় যেন কোথাও কোথাও খাল-নালা দিয়ে জলসেকের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মোটের উপরে কঠিন এখানকার ধূসরবর্ণ মাটি।

মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো স্টেশনে অভ্যর্থনার জনতা পেরিয়ে এলুম। যখন শোনা গেল বোগদাদ আর পনেরো মিনিটের পথ দূরে তখনো তার পূর্বসূচনা কিছুই নেই, তখনো শূন্য মাঠ ধু ধু করছে।

অবশেষে বোগদাদে এসে গাড়ি থামল। স্টেশনে ভিড়ের অন্ত নেই। নানাশ্রেণীর প্রতিনিধি এসে আমাকে সম্মান জানিয়ে গেলেন, ভারতীয়েরা দিলেন মালা পরিয়ে। ছোটো ছোটো দুটি মেয়ে দিয়ে গেল ফুলের তোড়া। মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে একটি বাঙালি মেয়েকেও দেখলেম। বোগদাদের রাস্তা কতকটা আমাদেরই দেশের দোকান-বাজার-ওয়ালা পথের মতো। একটা বিশেষত্ব আছে, মাঝে মাঝে পথের ধারে কাঠের বেঞ্চি পাতা চা খাবার এবং মেলামেশা করবার জায়গা। ছোটোখাটো ক্লাবের মতো। সেখানে আসর জমেছে। এক-এক শ্রেণীর লোক এক-একটি জায়গা অধিকার করে থাকে, সেখানে আলাপের প্রসঙ্গে ব্যাবসার জেরও চলে। শহরের মতো জায়গায় এরকম সামাজিকতাচর্চার কেন্দ্র থাকা বিশেষ আবশ্যক সন্দেহ নেই। আগেকার দিনে গল্প বলবার কথক ছিল, তখন তারা এই-সকল পথপ্রান্তসভায় কথা শোনাত। আমাদের দেশে যেমন কথকের ব্যাবসা প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে, এদের এখানেও তাই। এই বিদ্যাটি ছাপার বইয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারলে না। মানুষ আপন রচিত যন্ত্রগুলোর কাছে আপন সহজ শক্তিকে বিকিয়ে দিচ্ছে।

টাইগ্রিস নদীর ধারে একটি হোটেলে আমাদের জায়গা হয়েছে। আমার ঘরের সামনে মস্ত ছাদ, সেখানে বসে নদী দেখা যায়। টাইগ্রিস প্রায় গঙ্গার মতোই প্রশস্ত, ওপারে ঘন গাছের সার,

খেজুরের বন, মাঝে মাঝে ইমারত। আমাদের ডান দিকে নদীর উপর দিয়ে ব্রিজ চলে গেছে। এই কাঠের ব্রিজ সৈন্য-পারাপারের জন্য গত যুদ্ধের সময় জেনেরাল মড অস্থায়ীভাবে তৈরি করিয়েছিলেন।

চেষ্টা করছি বিশ্রাম করতে, কিন্তু সম্ভাবনা অল্প। নানারকম অনুষ্ঠানের ফর্দ লম্বা হয়ে উঠেছে। সকালে গিয়েছিলুম ম্যুজিয়ম দেখতে; নূতন স্থাপিত হয়েছে, বেশি বড়ো নয়, একজন জর্মান অধ্যাপক এর অধ্যক্ষ। অতি প্রাচীন যুগের যে-সব সামগ্রী মাটির নীচে থেকে বেরিয়েছে সেগুলি দেখালেন। এ-সমস্ত পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগেকার পরিশিষ্ট। মেয়েদের গহনা, ব্যবহারের পাত্র প্রভৃতি সুদক্ষ হাতে রচিত ও অলংকৃত। অধ্যাপক বলেন, এই জাতের কারুকার্যে স্থূলতা নেই, সমস্ত সুকুমার ও সুনিপুণ। পূর্ববর্তী দীর্ঘকালের অভ্যাস না হলে এমন শিল্পের উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর হত না। এদের কাহিনী নেই জানা, কেবল চিহ্ন আছে। এটুকু বোঝা যায় এরা বর্বর ছিল না। পৃথিবীর দিনরাত্রির মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের স্মরণভ্রষ্ট এই-সব নরনারীর সুখদুঃখের পর্যায় আমাদেরই মতো বয়ে চলত। ধর্মে কর্মে লোকব্যবহারে এদেরও জীবনযাত্রার আর্থিক-পারমার্থিক সমস্যা ছিল বহুবিচিত্র। অবশেষে, কী আকারে ঠিক জানি নে, কোন্ চরম সমস্যা বিরাটমূর্তি নিয়ে এদের সামনে এসে দাঁড়াল, এদের জ্ঞানী কর্মী ভাবুক, এদের পুরোহিত, এদের সৈনিক, এদের রাজা, তার কোনো সমাধান করতে পারলে না, অবশেষে ধরণীর হাতে প্রাণযাত্রার সম্বল কিছু কিছু ফেলে রেখে দিয়ে সবাইকে চলে যেতে হল। কোথায় গেল এদের ভাষা, কোথায় এদের সব কবি, এদের প্রতিদিনের বেদনা কোনো ছন্দের মধ্যে কোথাও কি সংগ্রহ করা রইল না। কেবলমাত্র আর আট-দশ হাজার বছরের প্রান্তে ভাবীকালে দাঁড়িয়ে মানুষের আজকের দিনের বাণীর প্রতি যদি কান পাতি, কোনো ধ্বনি কি পৌঁছবে কানে এসে, যদি-বা পৌঁছয় তার অর্থ কি কিছু বুঝতে পারব।

আজ অপরাহ্নে আমার নিমন্ত্রণ এখানকার সাহিত্যিকদের তরফ থেকে। বাগানে গাছের ছায়ায় আমাদের আসন। ছোটো ছোটো টেবিলে চায়ের আয়োজন জনতার মধ্যে বিক্ষিপ্ত। একে একে নানা লোকে তাঁদের অভিনন্দন পাঠ শেষ করলে সেই বৃদ্ধ কবি তাঁর কবিতা আবৃত্তি করলেন। বজ্রমন্দ্র তাঁর ছন্দপ্রবাহ, আর উদ্দাম তাঁর ভঙ্গি। আমি তাঁদের বললেম, এমন কবিতার অর্থ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই; এ যেন উত্তাল তরঙ্গিত সমুদ্রের বাণী, এ যেন ঝঞ্ঝাহত অরণ্যশাখার উদ্গাথা।

অবশেষে আমার পালা উপস্থিত হলে আমি বললুম, আজ আমি একটি দরবার নিয়ে আপনাদের কাছে এসেছি। একদা আরবের পরম গৌরবের দিনে পূর্বে পশ্চিমে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক ভূভাগ আরব্যের প্রভাব-অধীনে এসেছিল। ভারতবর্ষে সেই প্রভাব যদিও আজ রাষ্ট্রশাসনের আকারে নেই, তবুও সেখানকার বৃহৎ মুসলমান সম্প্রদায়কে অধিকার করে বিদ্যার আকারে, ধর্মের আকারে আছে। সেই দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে আমি আপনাদের বলছি, আরবসাগর পার করে আরব্যের নববাণী আর-একবার ভারতবর্ষে পাঠান—যাঁরা আপনাদের স্বধর্মী তাঁদের কাছে—আপনাদের মহৎ ধর্মগুরুর পূজ্যনামে, আপনাদের পবিত্রধর্মের সুনাম রক্ষার জন্য। দুঃসহ আমাদের দুঃখ, আমাদের মুক্তির অধ্যবসায় পদে পদে ব্যর্থ; আপনাদের নবজাগ্রত প্রাণের উদার আহ্বান সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে, অমানুষিক অসহিষ্ণুতা থেকে, উদার ধর্মের অবমাননা থেকে, মানুষে মানুষে মিলনের পথে, মুক্তির পথে নিয়ে যাক হতভাগ্য ভারতবর্ষকে। এক দেশের কোলে যাদের জন্ম অন্তরে বাহিরে তারা এক হোক।

রাজা আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছেন নদীর ওপারে তাঁর একটি বাগানবাড়িতে। রাজা একেবারেই আড়ম্বরশূন্য মানুষ, অত্যন্ত সহজ ব্যবহার। খোলা চাতালে আমরা বসলুম, সামনে নীচে বাগান। রাজার ভাইও আছেন তাঁর সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী আছেন—অল্প বয়স, এখানকার সবাই বলেন, আজ পৃথিবীতে সব চেয়ে অল্প বয়সের মন্ত্রী ইনি। যিনি দোভাষীর কাজ করবেন তিনিও উপস্থিত। রাজা বললেন, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের যে দ্বন্দ্ব বেধেছে নিশ্চয়ই সেটা ক্ষণিক।

যখন কোনো দেশে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্‌বোধন আসে তখন প্রথম অবস্থায় তারা নিজেদের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশি সচেতন হয়ে ওঠে এবং সেইটেকে রক্ষা করবার জন্যে তাদের চেষ্টা প্রবল হয়। এই আকস্মিক বেগটা কমে গেলে মন আবার সহজ হয়ে আসে। আমি বললেম, আজ তুর্কি ঈজিপ্ট পারস্যে নবজাগ্রত জাতির যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তাতে দেখলুম, যে বিশিষ্টতা-বোধ সংকীর্ণভাবে আত্মনিহিত ও অন্যের প্রতি বিরুদ্ধ, সচেষ্টতার সঙ্গেই তার তীব্রতা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, নইলে সেই অন্ধতার দ্বারা জাতির রাষ্ট্রবুদ্ধি অভিভূত হয়। ভারতবর্ষের উদ্‌বোধনে যদি সেই সর্বজনের হিতজনক শুভবুদ্ধির আবির্ভাব দেখতে পেতেম তা হলে নিশ্চিন্ত হতেম। কিন্তু যখন দেখতে পাই হিন্দু-মুসলমান উভয়পক্ষেই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মঘাতী ধর্মান্ধতা প্রবল হয়ে উঠে রাষ্ট্রসংঘকে প্রতিহত করছে তখন হতাশ হতে হয়।

এই বাগানের ধারে চায়ের টেবিলে সহজ বাক্যালাপের মধ্যে সেদিনের ছবি মনে আনা দুরূহ, যেদিন এই রাজা পথশূন্য মরুভূমির মধ্যে বেদুয়িনদের বহু উপজাতিকে আপন নেতৃত্বের অধীনে এক করে নিয়ে জর্মানি ও তুরুস্কের সম্মিলিত অভিযানকে পদে পদে উদ্‌ভ্রান্ত করে বিধ্বস্ত করেছিলেন। মৃত্যুর মূল্যে কিনেছিলেন জীবনের গৌরব। কঠিন ভীষণ সেই রণপ্রাঙ্গণ, জয়ে-পরাজয়ে নিত্যসংশয়িত দুঃসাধ্য সেই অধ্যবসায়। সেই অক্লান্ত রণরঙ্গের অধিনায়ককে দেখলেম। তখনকার মৃত্যুচ্ছায়াক্রান্ত দিনরাত্রির সেই বিভীষিকার মধ্যে তাঁর উষ্ট্রবাহিনীর সঙ্গে কোথাও কোনো-একটা স্থান পাবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আজ বসেছি চায়ের টেবিলে এই নূতন ইতিহাসসৃষ্টিকর্তার পাশে সহজভাবে; কেননা আমিও অন্য উপকরণ নিয়ে মানুষের ইতিহাস-সৃষ্টিতে আপন শক্তি উৎসর্গ করেছি। সেই স্বতন্ত্র অথচ যথার্থ সহযোগিতার মূল্য যদি না এই বীর বুঝতে পারতেন তবে তাঁর যুদ্ধবিজয়ী শৌর্য আপন মূল্য অনেকখানি হারাত। কর্নেল লরেন্স বলেছেন, আরবের মহৎ লোকদের মধ্যে মহম্মদ ও সালাদিনের নীচেই রাজা ফয়সলের স্থান। এই মহত্ত্বের সরলমূর্তি দেখেছি তাঁর সহজ আতিথ্যে, এবং তাঁকে অভিবাদন করেছি। বর্তমান এসিয়ায় যাঁরা প্রবল শক্তিতে নূতন যুগের প্রবর্তন করেছেন তাঁদের দুজনকেই দেখলুম অল্পকালের ব্যবধানে। দুজনেরই মধ্যে স্বভাবের একটি মিল দেখা গেল— উভয়েই আড়ম্বরহীন স্বচ্ছ সরলতার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশমান।

১৯

এখান থেকে বিদায় হয়ে গেলেম এখানকার ছাত্রীদের নিমন্ত্রণসভায়। সংকীর্ণ সুদীর্ঘ আঁকাবাঁকা গলি। পুরাতন বাড়ি দুই ধারে সার বেঁধে উঠেছে, কিন্তু তার ভিতরকার লোকযাত্রা বাইরে থেকে কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। নিমন্ত্রণগৃহের প্রাঙ্গণে সব মেয়েরা বসেছে। এক ধারে কয়েকটি মেয়ে আলাদা স্থান নিয়েছেন, তাঁরা কালো কাপড়ে সংবৃত, কিন্তু মুখ ঢাকা নয়। বাকি সবাই বিলাতি পোশাক পরা, স্তব্ধ শান্ত হয়ে থাকবার চেষ্টামাত্র নেই, হাসিগল্পে সভা মুখরিত। প্রাঙ্গণের সম্মুখপ্রান্ত আমাদের দেশের চণ্ডীমণ্ডপের মতো। তারই রোয়াকে আমার চৌকি পড়েছে। অনুরোধে পড়ে কিছু আমাকে বলতে হল; বলা হলেই কয়েকজন মেয়ে এসে আমাকে ফরমাশ করলেন আমার কাব্য আবৃত্তি করতে। আগের দিনে এঁরা আবৃত্তি শুনেছিলেন। নিজের লেখা কিছু তো মনে পড়ে না। অনেক চেষ্টা করে 'খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে' কবিতার প্রথম শ্লোক পড়ে গেলেম, একটা জায়গায় ঠেকে যেতেই অর্থহীন শব্দ দিয়ে ছন্দ পূরণ করে দিলুম।

তার পর সন্ধ্যাবেলায় ভোজনের নিমন্ত্রণ। শিক্ষাবিভাগের লোকেরা আয়োজন করেছেন। নদীর ধারের দিকে প্রকাণ্ড একটা ছাদ, সেখানে আলোকমালার নীচে বসে গেছেন অনেক লোক। আমাদের সেই বৃদ্ধ কবিও আমার কাছেই ছিলেন। আহারের পর আমার অভিনন্দন সারা হলে আমাকে কিছু বলতে হল, কেননা শিক্ষা সম্বন্ধে আমার কী মত এঁরা শুনতে চেয়েছিলেন।

শ্রান্তি ঘনীভূত হয়ে আসছে। আমার পক্ষে নড়েচড়ে দেখেশুনে বেড়ানো অসম্ভব হয়ে এল। কথা ছিল সকালে টেসিফোনের (Ctesiphon) ভগ্নাবশেষ দেখতে যেতে হবে। আমি ছাড়া আমার দলের বাকি সবাই দেখতে গেলেন। একদা এই শহরের গৌরব ছিল অসামান্য। পার্থিয়ানেরা এর পত্তন করে। পারস্যে অনেকদিন পর্যন্ত এদের রাজত্ব ছিল। রোমকেরা বার বার এদের হাতে পরাস্ত হয়েছে। পূর্বেই বলেছি পার্থীয়েরা খাঁটি পারসিক ছিল না। তারা তুর্ক ছিল বলে অনুমান করা হয়, শিক্ষাদীক্ষা অনেকটা পেয়েছিল গ্রীকদের কাছ থেকে। ২২৮ খৃস্টাব্দে আর্দাশির পার্থীয়দের জয় করে আবার পারস্যকে পারসিক শাসন ও ধর্মের অধীনে এক করে তোলেন। ইনিই সাসানীয় বংশের প্রথম রাজা। তার পরে বার বার রোমানদের উপদ্রব এবং সবশেষে আরবদের আক্রমণ এই শহরকে অভিভূত করেছিল। জায়গাটা অস্বাস্থ্যকর বলে আরবেরা এখান থেকে সমস্ত মালমসলা সরিয়ে বোগদাদে রাজধানী স্থাপন করে—টেসিফোন ধুলোয় গেল মিলিয়ে, বাকি রইল বৃহৎ প্রাসাদের একটুখানি খিলান। এই প্রাসাদ প্রথম খসরুর আদেশে নির্মিত হয় সাসানীয় যুগের মহাকায় স্থাপত্যশিল্পের একটি অতি আশ্চর্য দৃষ্টান্তরূপে।

সন্ধ্যাবেলায় রাজার ওখানে আহারের নিমন্ত্রণ। ঐশ্বর্যগৌরব প্রমাণ করবার জন্যে কোথাও লেশমাত্র চেষ্টা নেই। রাজার এই অনাড়ম্বর গাম্ভীর্যে আমার চিত্তকে সব চেয়ে আকর্ষণ করে। পারিষদবর্গ যাঁরা একত্রে আহার করছিলেন হাস্যালাপে তাঁদের সকলের সঙ্গে এঁর অতি সহজ সম্বন্ধ। আমাদের দেশের সাধারণ লোকরাও বিশেষ ভোজে আহারের পরিমাণে ও আয়োজনে নির্বোধের মতো যে অতিবাহুল্য করে থাকে রাজার ভোজে তা দেখলুম না। লম্বা টেবিলের উপর সাদা চাদর পাতা। বিরলভাবে কয়েকটি ফুলের তোড়া আছে, তা ছাড়া সাজসজ্জার চমক নেই একটুও। এতে আতিথ্যের যথার্থ আরাম পাওয়া যায়।

বউমা রানীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন—ভদ্রঘরের গৃহিণীর মতো আড়ম্বরহীন সরল অমায়িক ব্যবহার, নিজেকে রানী বলে প্রমাণ করবার প্রয়াসমাত্র নেই।

আজ একজন বেদুয়িন দলপতির তাঁবুতে আমার নিমন্ত্রণ আছে। প্রথমটা ভাবলুম পারব না, শরীরটার প্রতি করুণা করে না যাওয়াই ভালো। তার পরে মনে পড়ল একদা আস্ফালন করে লিখেছিলুম, 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন।' তখন বয়স ছিল তিরিশের কাছ ঘেঁষে, সে তিরিশ আজ পিছনের দিগন্তে বিলীনপ্রায়। তা হোক, কবিতাটাকে কিছু পরিমাণে পরখ করে না এলে মনে পরিতাপ থাকবে। সকালে বেরিয়ে পড়লুম। পথের মধ্যে হঠাৎ নিয়ে গেল ট্রেনিং স্কুলের ছেলেদের মাঝখানে, হঠাৎ তাদের কিছু বলতেও হল। পথে পথে কত কথাই ছড়াতে হয়, সে পাকা ফল নয়, সে ঝরা পাতা, কেবলমাত্র ধুলোর দাবি মেটাবার জন্যে।

তার পরে গাড়ি চলল মরুভূমির মধ্যে দিয়ে। বালুমরু নয়, শক্ত মাটি। মাঝে মাঝে নদী থেকে জল এনেছে নালা কেটে, তাই এখানে ওখানে কিছু কিছু ফসলের আভাস দেখা দিয়েছে। পথের মধ্যে দেখা গেল নিমন্ত্রণকর্তা আর-এক মোটরে করে চলেছেন, তাঁকে আমাদের গাড়িতে তুলে নেওয়া হল। শক্ত মানুষ, তীক্ষ্ম চক্ষু; বেদুয়িনী পোশাক।

অর্থাৎ মাথায় একখন্ড সাদা কাপড় ঘিরে আছে কালো বিড়ের মতো বস্ত্রবেষ্টনী। ভিতরে সাদা লম্বা আঙিয়া, তার উপরে কালো পাতলা জোব্বা। আমার সঙ্গীরা বললেন, যদিও ইনি পড়াশুনো করেন নি বললেই হয়, কিন্তু তীক্ষ্মবুদ্ধি। ইনি এখানকার পার্লামেন্টের একজন মেম্বর।

রৌদ্রে ধু ধু করছে ধূসর মাটি, দূরে কোথাও কোথাও মরীচিকা দেখা দিল। কোথাও মেষ-পালক নিয়ে চলেছে ভেড়ার পাল, কোথাও চরছে উট, কোথাও বা ঘোড়া। হু হু করে বাতাস বইছে, মাঝে মাঝে ঘুর খেতে খেতে ছুটেছে ধূলির আবর্ত। অনেক দূর পেরিয়ে এঁদের ক্যাম্পে এসে পৌঁছলুম। একটা বড়ো খোলা তাঁবুর মধ্যে দলের লোক বসে গেছে, কফি সিদ্ধ হচ্ছে, খাচ্ছে ঢেলে ঢেলে।

আমরা গিয়ে বসলুম একটা মস্ত মাটির ঘরে। বেশ ঠাণ্ডা। মেঝেতে কার্পেট, এক প্রান্তে তক্তপোশের উপর গদি পাতা। ঘরের মাঝখান বেয়ে কাঠের থাম, তার উপরে ভর দিয়ে লম্বা লম্বা খুঁটির 'পরে মাটির ছাদ। আত্মীয়বান্ধবেরা সব এদিকে ওদিকে, একটা বড়ো কাঁচের গুড়গুড়িতে একজন তামাক টানছে। ছোটো আয়তনের পেয়ালা আমাদের হাতে দিয়ে তাতে অল্প একটু করে কফি ঢাললে, ঘন কফি, কালো তেতো। দলপতি জিজ্ঞাসা করলেন আহার ইচ্ছা করি কি না, 'না' বললে আনবার রীতি নয়। ইচ্ছা করলেম, অভ্যন্তরে তাগিদও ছিল। আহার আসবার পূর্বে শুরু হল একটু সংগীতের ভূমিকা। গোটাকতক কাঠির উপরে কোনোমতে চামড়া-জড়ানো একটা তেড়া-বাঁকা একতারা যন্ত্র বাজিয়ে একজন গান ধরলে। তার মধ্যে বেদুয়িনী তেজ কিছুই ছিল না। অত্যন্ত মিহিচড়া গলায় নিতান্ত কান্নার সুরে গান। একটা বড়ো জাতের পতঙ্গের রাগিণী বললেই হয়। অবশেষে সামনে চিলিম্‌চি ও জলপাত্র এল। সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে বসলুম। মেঝের উপর জাজিম পেতে দিলে। পূর্ণচন্দ্রের ডবল আকারের মোটা মোটা রুটি, হাতা-ওয়ালা অতি প্রকাণ্ড পিতলের থালায় ভাতের পর্বত আর তার উপর মস্ত এবং আস্ত একটা সিদ্ধ ভেড়া। দু-তিনজন জোয়ান বহন করে মেঝের উপর রাখলে। পূর্ববর্তী মিহিকরুণ রাগিণীর সঙ্গে এই ভোজের আকৃতি ও প্রকৃতির কোনো মিল পাওয়া যায় না। আহারার্থীরা সব বসল থালা ঘিরে। সেই এক থালা থেকে সবাই হাতে করে মুঠো মুঠো ভাত প্লেটে তুলে নিয়ে আর মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। ঘোল দিয়ে গেল পানীয়রূপে। গৃহকর্তা বললেন, আমাদের নিয়ম এই যে, অতিথিরা যতক্ষণ আহার করতে থাকে আমরা অভুক্ত দাঁড়িয়ে থাকি, কিন্তু সময়াভাবে আজ সে নিয়ম রাখা চলবে না। তাই অদূরে আর-একটা প্রকাণ্ড থালা পড়ল। তাতে তাঁর স্বজনবর্গ বসে গেলেন। যে অতিথিদের সম্মান অপেক্ষাকৃত কম আমাদের ভুক্তাবশেষ তাঁদের ভাগে পড়ল। এইবার হল নাচের ফরমাশ। একজন একঘেয়ে সুরে বাঁশি বাজিয়ে চলল, আর এরা তার তাল রাখলে লাফিয়ে লাফিয়ে। একে নাচ বললে বেশি বলা হয়। যে ব্যক্তি প্রধান, হাতে একখানা রুমাল নিয়ে সেইটে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আগে আগে নাচতে লাগল, তারই কিঞ্চিৎ ভঙ্গির বৈচিত্র্য ছিল। ইতিমধ্যে বউমা গেলেন এদের অন্তঃপুরে। সেখানে মেয়েরা তাঁকে নাচ দেখালেন, তিনি বলেন সে নাচের মতো নাচ বটে—বোঝা গেল য়ুরোপীয় নটীরা প্রাচ্য নাচের কায়দায় এদের অনুকরণ করে, কিন্তু সম্পূর্ণ রস দিতে পারে না।

তার পরে বাইরে এসে যুদ্ধের নাচ দেখলুম। লাঠি ছুরি বন্দুক তলোয়ার নিয়ে আস্ফালন করতে করতে, চীৎকার করতে করতে, চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে, তাদের মাতুনি—ও দিকে অন্তঃপুরের দ্বার থেকে মেয়েরা দিচ্ছে তাদের উৎসাহ। বেলা চারটে পেরিয়ে গেল, আমরা ফেরবার পথে গাড়িতে উঠলুম, সঙ্গে চললেন আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা।

এরা মরুর সন্তান, কঠিন এই জাত, জীবনমৃত্যুর দ্বন্দ্ব নিয়ে এদের নিত্য ব্যবহার। এরা কারও কাছে প্রশ্রয়ের প্রত্যাশা রাখে না, কেননা পৃথিবী এদের প্রশ্রয় দেয় নি। জীববিজ্ঞানে প্রকৃতি-কর্তৃক বাছাইয়ের কথা বলে; জীবনের সমস্যা সুকঠোর করে দিয়ে এদেরই মাঝে যথার্থ কড়া বাছাই হয়ে গেছে, দুর্বলেরা বাদ পড়ে যারা নিতান্ত টিঁকে গেল এরা সেই জাত। মরণ এদের বাজিয়ে নিয়েছে। এদের যে এক-একটি দল তারা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, এদের মাতৃভূমির কোলের পরিসর ছোটো; নিত্য বিপদে বেষ্টিত জীবনের স্বল্প দান এরা সকলে মিলে ভাগ ক'রে ভোগ করে। এক বড়ো থালে এদের সকলের অন্ন, তার মধ্যে শৌখিন রুচির স্থান নেই; তারা পরস্পরের মোটা রুটি অংশ করে নিয়েছে, পরস্পরের জন্যে প্রাণ দেবার দাবি এই এক রুটি ভাঙার মধ্যেই। বাংলদেশের নদীবাহুবেষ্টিত সন্তান আমি, এদের মাঝখানে বসে খাচ্ছিলুম আর ভাবছিলুম, সম্পূর্ণ আলাদা ছাঁচে তৈরি মানুষ আমরা উভয়ে। তবুও মনুষ্যত্বের গভীরতর বাণীর যে ভাষা সে ভাষায় আমাদের সকলেরই মন সায় দেয়। তাই এই অশিক্ষিত বেদুয়িন-দলপতি যখন বললেন 'আমাদের আদিগুরু বলেছেন যার বাক্যে ও ব্যবহারে মানুষের বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই

সেই যথার্থ মুসলমান', তখন সে কথা মনকে চমকিয়ে দিলে। তিনি বললেন, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানে যে বিরোধ চলছে এ পাপের মূল রয়েছে সেখানকার শিক্ষিত লোকদের মনে। এখানে অল্পকাল পূর্বে ভারতবর্ষ থেকে কোনো-কোনো শিক্ষিত মুসলমান গিয়ে ইসলামের নামে হিংস্র-ভেদবুদ্ধি প্রচার করবার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি বললেন, 'আমি তাঁদের সত্যতায় বিশ্বাস করি নে, তাই তাঁদের ভোজের নিমন্ত্রণে যেতে অস্বীকার করেছিলেম, অন্তত আরবদেশে তাঁরা শ্রদ্ধা পান নি।' আমি এঁকে বললেম, একদিন কবিতায় লিখেছি 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন'—আজ আমার হৃদয় বেদুয়িন-হৃদয়ের অত্যন্ত কাছে এসেছে, যথার্থই আমি তাদের সঙ্গে এক অন্ন খেয়েছি অন্তরের মধ্যে।

তার পরে যখন আমাদের মোটর চলল, দুই পাশের মাঠে এদের ঘোড়সওয়াররা ঘোড়া ছোটাবার খেলা দেখিয়ে দিলে। মনে হল মরুভূমির ঘূর্ণা-হাওয়ার দল শরীর নিয়েছে।

বোধ হচ্ছে আমার ভ্রমণ এই 'আরব বেদুয়িনে' এসেই শেষ হল। দেশে যাত্রা করবার আর দু-তিন দিন বাকি, কিন্তু শরীর এত ক্লান্ত যে এর মধ্যে আর-কোনো দেখাশোনা চলবে না। তাই এই মরুভূমির বন্ধুত্বের মধ্যে ভ্রমণের উপসংহারটা ভালোই লাগছে। আমার বেদুয়িন নিমন্ত্রণকর্তাকে বললুম যে, বেদুয়িন-আতিথ্যের পরিচয় পেয়েছি, কিন্তু বেদুয়িন-দস্যুতার পরিচয় না পেলে তো অভিজ্ঞতা শেষ করে যাওয়া হবে না। তিনি হেসে বললেন, তার একটু বাধা আছে। আমাদের দস্যুরা প্রাচীন জ্ঞানীলোকদের গায়ে হস্তক্ষেপ করে না। এইজন্যে মহাজনরা যখন আমাদের মরুভূমির মধ্যে দিয়ে পণ্য নিয়ে আসে তখন অনেক সময় বিজ্ঞ চেহারার প্রবীণ লোককে উটের 'পরে চড়িয়ে তাদের কর্তা সাজিয়ে আনে। আমি তাঁকে বললুম, চীনে ভ্রমণ করবার সময় আমার কোনো চৈনিক বন্ধুকে বলেছিলেম, 'একবার চীনের ডাকাতের হাতে ধরা পড়ে আমার চীনভ্রমণের বিবরণটাকে জমিয়ে তুলতে ইচ্ছা করে।' তিনি বললেন, 'চীনের ডাকাতেরা আপনার মতো বৃদ্ধ কবির 'পরে অত্যাচার করবে না, তারা প্রাচীনকে ভক্তি করে।' সত্তর বছর বয়সে যৌবনের পরীক্ষা চলবে না। নানা স্থানে ঘোরা শেষ হল, বিদেশীর কাছ থেকে কিছু ভক্তি নিয়ে, শ্রদ্ধা নিয়েই দেশে ফিরে যাব, তার পরে আশা করি কর্মের অবসানে শান্তির অবকাশ আসবে। যুবকে যুবকে দ্বন্দ্ব ঘটে, সেই দ্বন্দ্বের আলোড়নে সংসারপ্রবাহের বিকৃতি দূর হয়। দস্যু যখন বৃদ্ধকে ভক্তি করে তখন সে তাকে আপন জগৎ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। যুবকের সাজেই তার শক্তির পরীক্ষা, সেই দ্বন্দ্বের আঘাতে শক্তি প্রবল থাকে, অতএব ভক্তির সুদূর অন্তরালে পঞ্চাশোধর্বং বনং ব্রজেৎ।

পথে ও পথের প্রান্তে

প্রকাশ : ১৯৩৮

'পথে ও পথের প্রান্তে' স্বতন্ত্র সংস্করণ (পত্রধারা ৩ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫) প্রকাশের অব্যবহিত পরেই যখন 'পত্রধারা'র অন্তর্ভুক্ত হয় তখন স্বতন্ত্র সংস্করণের ভূমিকাটি 'পত্রধারা'র ভূমিকারূপে ব্যবহৃত হয়। এই ভূমিকাটিতে 'পত্রধারা'-ভুক্ত ছিন্নপত্র, ভানুসিংহের পত্রাবলী এবং পথে ও পথের প্রান্তে তিনটি গ্রন্থেরই উল্লেখ আছে। যেহেতু ভূমিকাটি প্রথমে 'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থের ভূমিকারূপে মুদ্রিত হয়েছিল, বর্তমান সংস্করণে তদনুযায়ী মুদ্রিত হল।

ভূমিকা

পৃথিবী আপনাকে প্রকাশ করে দু-রকমের চলন দিয়ে। একটা চলন তার নিজেকে ঘিরে ঘিরে, আর-একটা চলন বড়ো যাত্রাপথে— সূর্যের চার দিকে। পৃথিবীর বর্ষচক্র-মণ্ডলে দেখা দেয় তার ঋতুপর্যায়, নানা জাতের ফল-ফসলের ডালি ভরে ওঠে, সর্বজনের পণ্যশালায়। আর তার দিনযাত্রায় দেখা যায় জলে স্থলে আলো-ছায়ার ইশারা, আকাশে আকাশে প্রকৃতির মেজাজ-বদল, সকাল সন্ধ্যার দিক্‌সীমানায় রঙের খেয়াল, ঘুম জাগরণের আনাগোনার পথে নানা কণ্ঠের কলকাকলি।

পৃথিবীর এই দুই শ্রেণীর প্রদক্ষিণের সঙ্গে তুলনা করা চলে সর্বজনের দরবারে সাধারণ সাহিত্যের, আর অন্তরঙ্গ মহলে চিঠির সাহিত্যের গতিবিধির। সাধারণ সাহিত্যকে টানে বিরাট পাঠককেন্দ্র, চালায় দূরদেশ দূরকালের পথে, ব্যক্তিগত জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে। আর চিঠির সাহিত্য ধরা দেয় লেখকের কাছ-ঘেঁষা জগতের দৈনিক ছায়া প্রতিচ্ছায়া, ধ্বনি প্রতিধ্বনি, তার ক্ষণিক হাওয়ার মর্জি, আর তার সঙ্গে প্রধানত মিলিয়ে থাকে সদ্যপ্রত্যক্ষ সংসারপথের চলতি ঘটনা নিয়ে আলাপ প্রতিলাপ। অন্তত যে চিঠিগুলি এই পত্রধারায় প্রকাশ করা হল তাদের সম্বন্ধে এ কথা অনেকখানি সত্য।

পত্রধারার 'ছিন্নপত্র' পর্যায়ে যে চিঠির টুকরোগুলি ছাপানো হয়েছে তার অধিকাংশই আমার ভাইঝি ইন্দিরাকে লেখা চিঠির থেকে নেওয়া। তখন আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম বাংলার পল্লীতে পল্লীতে, আমার পথচলা মনে সেই-সকল গ্রামদৃশ্যের নানা নতুন পরিচয় ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগাচ্ছিল; তখনি তখনি তাই প্রতিফলিত হচ্ছিল চিঠিতে। কথা কওয়ার অভ্যাস যাদের মজ্জাগত, কোথাও কৌতুক, কৌতূহলের একটু ধাক্কা পেলেই তাদের মুখ খুলে যায়। যে বকুনি জেগে উঠতে চায় তাকে টেঁকসই পণ্যের প্যাকেটে সাহিত্যের বড়ো হাটে চালান করবার উদ্যোগ করলে তার স্বাদের বদল হয়। চার দিকের বিশ্বের সঙ্গে নানা কিছু নিয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় আমাদের মোকাবিলা চলছেই, লাউড্‌স্পীকারে চড়িয়ে তাকে ব্রডকাস্ট করা সয় না। ভিড়ের আড়ালে চেনালোকের মোকাবিলাতেই তার সহজ রূপ রক্ষা হতে পারে।

পত্রধারার দ্বিতীয় পর্যায়ের চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল একটি বালিকাকে। সে চিঠির বেশির ভাগ লেখা শান্তিনিকেতন থেকে। তাই সেগুলির মধ্যে দিয়ে স্বতই বয়ে চলেছে শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রার চলচ্ছবি। এগুলিতে মোটা সংবাদ বেশি কিছু নেই, হাসিতামাশায় মিশিয়ে আছে সেখানকার আবহাওয়া, জড়িয়ে আছে সাংসারিক ব্যাপারে আনাড়ি মেয়েটির ছেলেমানুষির আভাস; আর তারই সঙ্গে লেখকের সকৌতুক স্নেহ। বিশেষ কিছু বলতে হবে না মনে করে হালকা মনে আট-পৌরে রীতিতে যা বলা যেতে পারে তাকে কোনো শান-বাঁধানো পাকা সাহিত্যিক রাস্তায় প্রকাশ করবার উপায় নেই।

পত্রধারার তৃতীয় পর্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে 'পথে ও পথের প্রান্তে'। তার একটু ইতিহাস আছে। সেবার যখন ১৯২৬ খৃস্টাব্দে য়ুরোপভ্রমণে বেরিয়েছিলুম সেখানকার নানা দেশে আমার ডাক পড়েছিল। তখন অসুস্থদশায় রথীন্দ্রনাথ বন্দী ছিলেন বার্লিনে আরোগ্যশালায়। তাই আমার সাহচর্যের ভার পড়েছিল প্রশান্ত মহলানবিশের 'পরে, তাঁর স্ত্রী রানী ছিলেন তাঁর সঙ্গে। সমস্ত ভার বিনা বাক্যে কখনো বা প্রবল বাক্যব্যয়ে তিনিই নিয়েছিলেন নিজের হাতে। ভ্রমণকালীন ব্যবস্থার কাজে পুরুষ দুজনের অঘটন-

ঘটানো অপটুতা সংশোধন করে চলতে হয়েছিল তাঁকে। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা, গোছগাছ করা, বস্তুপুঞ্জ হিসেব করে রাখা, সামলিয়ে নিয়ে বেড়ানো, বিদেশী কর্তৃমহলে নিষ্পরোয়ায় অযথা বা যথোচিত দাবিদাওয়া করায় ঐ কয়েক মাসে রানীর অসামান্যতার পরিচয় পাওয়া গেছে। নতুন নতুন রেলের কামরায়, জাহাজের ক্যাবিনে, হোটেলের প্রকোষ্ঠে, বার বার ব্যবস্থা-পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন লোকের সঙ্গে ব্যবহার করে চলেছি; তার নানা প্রকার অভাবনীয় সমস্যাসমাধানের ভার তাঁর হাতে দিয়ে নির্লজ্জ নিশ্চিন্ত মনে অজস্র সেবা-শুশ্রূষায় দিন কাটিয়েছিলেম। অবশেষে য়ুরোপে ভ্রমণের পালা শেষ করে যখন আমরা গ্রীসের বন্দর থেকে ঘরমুখো জাহাজে চড়ে বেরিয়ে পড়লুম তাঁরা রয়ে গেলেন বিদেশে। তখন তাঁদের সাহচর্যে-গাঁথা পথযাত্রার ছিন্নসূত্রকে যে-সব চিঠির দ্বারা জুড়তে জুড়তে চলেছিলুম দেশের দিকে, সেইগুলি ও তারই পরবর্তী কালের চিঠিগুলি পত্রধারার তৃতীয় পর্যায়ে সংকলিত হল। কিছুকাল ধরে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নিরন্তর যে তর্কবিতর্ক আলোচনা চলেছিল তারই বাক্যালাপের বেগ এই চিঠিগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু য়ুরোপভ্রমণের বৃত্তান্ত যা কোথাও প্রকাশ পেল না তার দাম খুব বেশি।

যে-সকল চিন্তা ও চেষ্টার অনুষঙ্গে বলবার বিশেষ বিষয় মনের মধ্যে মথিত হয় ও রচনার মধ্যে দানা বাঁধে তাদের উপলক্ষ জীবনান্ত কাল পর্যন্ত থাকে। কিন্তু মানসিক জীবনে যে স্রোতোবেগে চলার সঙ্গে সঙ্গে বলা আপনি মুখরিত হয়ে ওঠে একদিন তার একটা অবসন্নতা বা অবসান আছে। ভরতি মনের অবস্থায় জরুরি কথা ছাপিয়েও উদ্‌বৃত্ত থাকে মুখরতা। যাঁরা মজলিসি স্বভাবের লোক তাঁদের সেই উদ্‌বৃত্ত প্রকাশ পায় বৈঠকে, যাঁরা অন্তর্নিবিষ্ট তাঁরা স্বগত উক্তি লেখেন ডায়ারিতে, আমার মতো যাঁদের রচনায় মৌতাত তাঁরা বকুনি চালান করেন এমন কারোর কাছে যাঁদের দিকে চিঠির রাস্তা সহজ হয়ে গেছে; অবশেষে মনটা এমন অবস্থায় এসে ঠেকে যখন উদ্‌বৃত্তের উদ্‌বেলতা তটসীমার নীচে তলিয়ে যায়, জীবননদীতে চলার ধারায় বলার কল্লোল মরে আসে। আজ কাছে এসেছে আমার সেই ধ্বনিহীনতার বয়েস, স্বেচ্ছারচিত চিঠি লেখার দিন গেছে পেরিয়ে— আমার যে চিঠিগুলো অনাবশ্যক একদিন ছড়িয়ে পড়ছিল সমুদ্রের ধারে রঙবেরঙের ঝিনুক শামুকের মতো, বাইরের পাঠকদের মতোই আমি তাদের কৌতূহলের চোখে দূরের থেকে দেখছি। এখনকার বিরলভাষার মন তখনকার প্লাবনধারার মনের প্রতি যে ঈর্ষ্যা করছে তার সঙ্গে কিছু আনন্দেরও রেশ আছে। যখন ফসল-ফলা শেষ হয়ে যায় তখন থেকে শস্য সংগ্রহ করে গোলায় তোলবার সময় আসে, আজ সেদিনকার বাণীমুখর ঋতুর ফসল গোলায় তোলা গেল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

আমরা ছিলুম অস্তসূর্যের শেষ আলোয়, তোমরা ছিলে ঘাটের ছায়ায় দাঁড়িয়ে। ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে এল, ক্রমে আড়াল পড়ল, বস্তুর আড়াল। ফিরলুম সেই ক্যাবিনে— মনে পড়ে ক্যাবিনটা ? মনে রাখবার মতো কিছুই না, দুদিনের বাসা। যেখানে আমরা পাকা করে বাসা বাঁধি সেখানে বাসার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধস্মৃতি জড়িয়ে যায়— কিন্তু পথে চলতে চলতে পান্থশালার সঙ্গে কোনো গ্রন্থি বাঁধে না— স্রোতের শৈবাল যেমন নদীর বাঁকে বাঁকে ক্ষণকালের জন্যে ঠেকতে ঠেকতে যায় তেমনি আর কি। তবু পথিক-জীবনের পথচলা-প্রবাহের মধ্যেও অনেক কথা মনের মধ্যে জড়িয়ে থাকে। প্রতিদিন তুমি নিজের হাতে সেবাযত্ন করেছিলে— কখন আমি কী পরি, কখন আমার কী চাই, সমস্ত তুমি জেনে নিয়েছিলে; তার পরে পথে পথে সমস্ত জিনিসপত্র তোমার হাতে বাঁধা আর খোলা। এ সবগুলো অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল— সেই অভ্যেসটা একদিনের মধ্যেই হঠাৎ আপন ছয়মাসব্যাপী প্রতিদিনের দাবি থেকে বঞ্চিত হয়ে বিমর্ষ হয়ে পড়ে।

এখনো প্রায় তিন হপ্তার পথ বাকি আছে। তার পরে শান্তিনিকেতন। আমার কেবলই মনে হচ্ছে সূর্যাস্তের দিক থেকে সূর্যোদয়ের পথে যাত্রা করেছি। যে পর্যন্ত না পৌঁছই, সে পর্যন্ত বেদনা। দিনের পর দিন, ঘটনার পরে ঘটনা যখন বাইরে থেকে বিচ্ছিন্নভাবে আসে তখন বুঝতে পারি আপনার সত্যকে পাই নি। তখনই এই বাইরের আঘাতগুলো ক্রোধ লোভ মোহের তুফান তোলে। অন্তরের মধ্যে এই-সমস্ত বহির্ব্যাপারের একটা কেন্দ্র খুঁজে পেলে তখন নিখিলের মহান ঐক্য নিজের ভিতর একান্তভাবে বুঝতে পারি, তাকেই বলে মুক্তি— প্রতিদিনের প্রতি জিনিসের প্রতি ঘটনার খাপছাড়া বিচ্ছিন্নতার থেকে মুক্তি। এই মুক্তির জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছি। ইতি ২৬ নভেম্বর ১৯২৬। জাহাজ

২

নিজেকে বিশেষ কোনো একজন মনে করতে আজও পারি নে— এ সম্বন্ধে আমার স্বদেশের অনেক লোকের সঙ্গেই আমার মতের মিল হয়। আমার অন্তরলোকে কোনো একটা অগমস্থানে একজন কেউ বাস করে, সে কোথা থেকে কথা কয়— সে কথার মূল্যেও আছে, কিন্তু আমিই যে সে তা ভাবতেও পারি নে, আমার মধ্যে তার বাসা আছে এই পর্যন্ত। যে আমি প্রত্যক্ষগোচর সে নিতান্তই বাজে লোক; তাকে সহ্য করা শক্ত, বন্দনা করা দূরের কথা। তাকে কোনো রকম করে তফাতে সরিয়ে দিতে পারলে তবেই আমার অন্তরতর মানুষটির মান রক্ষা হয়। সেই চেষ্টায় আছি।

এ জায়গায় অনেক দেখবার আছে। আমি তেমন দেখনেওয়ালা নই এই দুঃখ। কিন্তু তবু ম্যুজিয়মে যাবার লোভ সামলাতে পারি নি। দেখবার এত জিনিস খুব অল্প জায়গায় পাওয়া যায়। একটা ব্যাপার এখানে খুব সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে— গ্রীসের যে পার্থেনন গ্রীসের স্বকীয় কীর্তি বলে এতদিন চলে এসেছে সেই পার্থেননের মূল প্রতিরূপ ইজিপ্টের ভূগর্ভে পাওয়া গেছে। যে স্থপতি এই রীতির স্তম্ভ প্রথম তৈরি করেছিলেন অতি প্রাচীন ইজিপ্টে তিনি একজন অসামান্য রূপকার বলে পূজা পেয়েছিলেন। গ্রীকরা তাঁরই কাজের অনুকরণে নিজেদের মন্দির নির্মাণ করেছিল। এই ব্যাপার নিয়ে আরও অনেক মাটি ও মাথা খোঁড়াখুঁড়ি চলছে। মানুষ যে কত সুদূর যুগেও আপন প্রতিভা প্রকাশ করেছে তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। কত অজানা সভ্যতার কত বিচিত্র গৌরব মাটির নীচে সমুদ্রের তলায় সর্বভুক্ কালের গর্ভে বিলুপ্ত হয়ে গেছে তারই বা ঠিকানা কে জানে। আমাদের কাহিনীও একদিন লুপ্ত ইতিহাসের নীচের তলায় কবে অদৃশ্য হয়ে যাবে। যতদিন উপরের আলোতে আছি ততদিন কিছু গোলমাল করা গেল— সম্পূর্ণ চুপচাপ করবার সুদীর্ঘ সময় সামনে আছে। ইতি ২ ডিসেম্বর ১৯২৬

৩

কাল সুয়েজে এসে খবর পেলুম যে সন্তোষ মারা গেছে। মৃত্যুকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যে এত কঠিন তার কারণ অন্যের জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আমি আছি অথচ আর যে-একজন আমার সঙ্গে এমন একান্ত মিলিত ছিল সে একেবারেই নেই, এমন বিরুদ্ধ কথা ঠিকমত মনে করাই শক্ত। আমরা নিজেকে অনেকখানি পাই অন্যের মধ্যে— সন্তোষ সেই তাদেরই মধ্যে অন্যতম ছিল। আমার জীবনের একটা বিভাগ, সকলের চেয়ে বড়ো ও সত্য বিভাগ, তাকে নিয়ে সম্পূর্ণ ছিল। আমার মনে হচ্ছে সেইখানে যেন ফাঁক পড়ে গেল। সন্তোষের প্রতি আমার একটি যথার্থ নির্ভর ছিল, কেননা আমার গৌরবে সে একান্ত গৌরব বোধ করত— আমার প্রতি কোনো আঘাত তার নিজের পক্ষে সব চেয়ে বড়ো আঘাত ছিল। যে-একজন ব্যক্তি বাইরের দিক থেকে শ্রদ্ধার দ্বারা আমাকে ডাক দিতে পারত সে রইল না। ইতি ৫ ডিসেম্বর ১৯২৬

৪

ভেবেছিলুম জাহাজ এডেনে দাঁড়াবে তখন তোমার চিঠি ডাকে দেব। খবর পেলুম সুয়েজ থেকে কলম্বোর মধ্যে জাহাজ কোথাও দাঁড়াবে না। তাই ভাবছি আরও একটুখানি লিখি।

মৃত্যুর কথাটা মন থেকে কিছুতে যাচ্ছে না। আমাদের আপন সংসারের প্রত্যেককে নিয়ে বিশেষ কোনো-না-কোনো আমিই বিস্তৃত হয়ে আছি— কোথাও গভীর কোথাও অগভীর ভাবে। সেই সবটা নিয়েই আমার জীবন। বিশ্বজগতে আমার প্রায় কোনো কিছুতেই ঔদাসীন্য নেই, তার মানে আমি খুব ব্যাপকভাবে বেঁচে আছি। কিন্তু যত ব্যাপ্তি তত তার আনন্দও যেমন দুঃখও তেমনি। প্রাণের পরিধি যেখানে প্রসারিত মৃত্যুর বাণ সেখানে নানা জায়গায় এসে বিদ্ধ হবার জায়গা পায়। জীবনের সত্য সাধনা হচ্ছে অমরতার সাধনা, অর্থাৎ এমন কিছুতে বাঁচা যা মৃত্যুর অতীত। অনেক সময় প্রিয়জনের মৃত্যুতে-যে বৈরাগ্য আনে তার মানে হচ্ছে এই যে, তখন আহত প্রাণ সব ত্যাগ করে এমন-কিছুতে বাঁচতে চায় যার ক্ষয় নেই, বিলুপ্তি নেই। পিতৃদেবের জীবনীর প্রথম অধ্যায়ে সেই কথাটাই পাই। মৃত্যু যখন জীবনের সামনে আসে তখন এই কথাটাই প্রশ্ন করে, 'আমি যা নিলুম তার ভিতরকার কিছু কি বাকি আছে। কিছুই যদি বাকি না থাকে তা হলে সম্পূর্ণ ঠকেছি।' প্রাণ প্রাণকেই চায়, সে কোনোমতেই মৃত্যুর দ্বারা ঠকতে চায় না— যেই ঠিকমত বুঝতে পারে ঠকেছি, অমনি সে ব্যাকুল হয়ে বলে ওঠে: যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। মানুষ কতবার এই কথা বলে আর কতবার এই কথা ভোলে। ইতি ৭ ডিসেম্বর ১৯২৬

৫

কিছু খবর দেবার চেষ্টা করব। নইলে চিঠি বেশি ভারী হয়ে পড়ে। অনেক দিন থেকে চিঠিতে খবর চালান দেবার অভ্যাস চলে গেছে। এটা একটা ত্রুটি। কেননা আমরা খবরের মধ্যেই বাস করি। যদি তোমাদের কাছে থাকতুম তা হলে তোমরা আমাকে নানাবিধ খবরের মধ্যেই দেখতে, কী হল এবং কে এল এবং কী করলুম এইগুলোর মধ্যে গেঁথে নিয়ে তবে আমাকে স্পষ্ট ধরতে পারা যায়। চিঠির প্রধান কাজ হচ্ছে সেই গাঁথন-সূত্রটিকে যথাসম্ভব অবিচ্ছিন্ন করে রাখা। আমি-যে বেঁচে বর্তে আছি সেটা হল একটা সাধারণ তথ্য— কিন্তু সেই আমার থাকার সঙ্গে আমার চারি দিকের বিচিত্র যোগ-বিয়োগের ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বারাই আমি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষগোচর। এইজন্যেই চিঠিতে খবর দিতে হয়— দূরে থাকলে পরস্পরের মধ্যে সেই প্রত্যক্ষতাকে চালাচালি করবার দরকার হয়। প্রয়োজনটা বুঝি, কিন্তু সত্যিকার চিঠি লেখার যে আর্ট সেটা খুইয়ে বসে আছি। তার কারণ হচ্ছে কাছের মানুষ আমাকে আমার চারি দিকের নব নব ব্যাপারের সঙ্গে মিলিয়ে যেমন করে দেখতে পায়, আমি

নিজেকে তেমন করে দেখি নে। অন্যমনস্ক স্বভাবের জন্যে আমি চারি দিককে বড়ো বেশি বাদ দিয়ে ফেলি। সেইজন্যে যা ঘটে তা পরক্ষণেই ভুলে যাই—ঐতিহাসিকের মতো ঘটনাগুলিকে দেশকালের সঙ্গে গেঁথে রাখতে পারি নে। তার মুশকিল আছে। তোমরা কেউ যখন আমার সম্বন্ধে কোনো নালিশ উপস্থিত কর তখন তোমাদের পক্ষের প্রমাণগুলোকে বেশ সুসম্বদ্ধ সাজিয়ে ধরতে পার—আমার পক্ষের প্রমাণগুলো দেখি আমার আনমনা চিত্তের নানা ফাঁকের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আমি কেবল আমার ধারণা উপস্থিত করতে পারি। কিন্তু ধারণা জিনিসটা বহুবিস্মৃত প্রমাণের সম্মিলনে তৈরি। সে প্রমাণগুলোকে সপিনে দিয়ে সাক্ষ্যমঞ্চে আনা যায় না। যাদের ধারণাগুলো শনি-গ্রহের মতো বহু প্রমাণমণ্ডলের দ্বারা সর্বদাই পরিবেষ্টিত তাদের ধারণার সঙ্গে আমার ধারণার ঠোকাঠুকি হলে আমার পক্ষেই দুর্বিপাক ঘটে।

কিন্তু খবর সম্বন্ধে এতক্ষণ যে তত্ত্বালোচনা করলুম তাকে খবর বলা যায় না। কী দিয়ে আরম্ভ করব সেই কথা ভাবছি। আলেকজান্দ্রিয়ার থেকে খবরের ধারার মধ্যে এসে পড়েছি। যাঁরা আমার ইজিপ্টের পালা জমাবার ভার নিয়েছিলেন তাঁরা ইটালিয়ান, নাম 'সোয়ারেস', ধনী ব্যাঙ্কার। আমাকে তাঁদের যে বাগানবাড়িতে রেখেছিলেন সে অতি সুন্দর। সে বারান্দাগুলো খুব দিলদরিয়া গোছের—এক দিকে বাগান, আর-এক দিকে নীল সমুদ্র, আকাশ মেঘশূন্য, সূর্যের আলোয় শ্যামল পৃথিবী ঝলমল করছে, সমস্ত দিন নিস্তব্ধ নির্জন অবকাশের অভাব ছিল না। যেদিন সকালে পৌঁছলুম তার পরদিন সায়াহ্নে বক্তৃতা, সুতরাং মনটা গভীর বিশ্রামের মধ্যে অনেকক্ষণ তলিয়ে থাকতে পেরেছিল। সেইজন্যেই বক্তৃতাটি অতি সহজেই পাকা ফলের মতো বর্ণে গন্ধে রসে বেশ টস্‌টসে হয়ে উঠতে পেরেছিল। পরদিন কায়রোর পালা। ঘণ্টা-চারেক গেল রেলগাড়িতে। এবার হোটেল। হোটেল বলতে কী বোঝায় এবার তা তোমার খুব ভালো করেই জানা আছে। খুব বড়ো হোটেল—খুব মস্ত খাঁচা। পৌঁছলেম মধ্যাহ্নে। বৈকালেই সেখানকার সর্বোত্তম আরবি কবির বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ। কবির নিমন্ত্রণ ছাড়া এই নিমন্ত্রণের আর-একটি বিশেষত্ব এই যে, সেখানে ইজিপ্টের সমস্ত রাষ্ট্র-নায়কের দল উপস্থিত ছিলেন। পাঁচটার সময় পার্লামেন্ট বসবার সময়। আমার খাতিরে একঘণ্টা সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাকে জানানো হল এমন ব্যবস্থাবিপর্যয় আর কখনো আর কারও জন্যে হতে পারত না। বস্তুত এটা আমাকে সম্মান দেখাবার একটা অসামান্য প্রণালী উদ্ভাবন করা। আমি বললেম, এ হচ্ছে বিদ্যার কাছে রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রণতি, এ কেবলমাত্র প্রাচ্যদেশেই সম্ভবপর। ওখানে কানুন ও বেহালা যন্ত্রযোগে আরবি গান শোনা গেল—স্পষ্টই বোঝা গেল ভারতের সঙ্গে আরব-পারস্যের রাগরাগিণীর লেনদেন একসময় খুবই চলেছিল। মণ্টুকে বলব ইজিপ্টে এসে যেন সে এই তথ্যের গবেষণা করে। যখন ছুটি পেলুম তখন সমস্ত দিনের ক্লান্তির ভূত আমার মেরুদণ্ডের উপর চেপে বসেছে, তার উপরে একটা অত্যুগ্র অজীর্ণ পীড়া আমার পাকযন্ত্রের মধ্যে বিপাক বাধিয়েছে। পাকযন্ত্রের কোনো অপরাধ ছিল না। প্রথমত রুমানিয়ান জাহাজে যা খাদ্য ছিল তা পথ্য ছিল না, দ্বিতীয়ত সোয়ারেসের বাড়িতে যে ভোজের ব্যবস্থা ছিল সেটাও ছিল অভ্যাস-বিরুদ্ধ এবং গুরুপাক। এমন অবস্থায় ক্লান্তি ও ব্যাধি নিয়ে যখন বক্তৃতামঞ্চে উঠে দাঁড়ালুম তখন আমার মন কোনোমতে কথা কইতে চাচ্ছিল না। পালে হাওয়া ছিল না, কেবলই লগি মারতে হল। স্পষ্টই বুঝতে পারছিলুম পাড়ি জমছে না। যা হোক কোনোমতে ঘাটে পৌঁছনো গেল। সেটা কেবল আবৃত্তির জোরে। সুইডেনের সেই মিনিস্টর ছিলেন, বক্তৃতা তাঁর ভালো লেগেছিল বললেন। যে মেয়ের পাত্র জোটা সহজ নয় যখন দেখি তারও বেশ ভালো বিয়ে হয়ে গেল তখন যেরকম মনে হয় এঁর মুখে প্রশংসা শুনে আমার সেইরকম মনের ভাব হল। ইনি যদি য়ুরোপের উত্তর দেশের লোক না হতেন তা হলে মনে করতে পারতেম কথাটা অকৃত্রিম নয়। পরদিন ম্যুজিয়ম দেখতে গিয়েছিলেম—দেখবার জায়গা বটে, তার বর্ণনা করতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে। ফেরবার পথে তোমরা নিজেরাই দেখে যাবে—তোমাদের সেই স্বচক্ষের উপরেই বরাত দিয়েই চুপ করা গেল। এই-সব কীর্তি দেখে মনে মনে ভাবি যে, বাইরের মানুষ সাড়ে-তিন হাত কিন্তু ভিতরে সে কত প্রকাণ্ড।

এখানকার রাজার সঙ্গেও দেখা হল। তাঁকে বললেম য়ুরোপের অনেক রাজ্য থেকে বিশ্বভারতী অনেক গ্রন্থ উপহার পেয়েছেন; আরবি সাহিত্য সম্বন্ধে য়ুরোপে যে-সব ভালো বই বেরিয়েছে যদি তদীয় মহিমা তা আমাদের দিতে পারেন তাহলে রাজোচিত বদান্যতা দেখানো হবে। তদীয় মহিমা খুব উৎসাহের সঙ্গেই রাজি হয়েছেন।

ইতিমধ্যে মিস্ প— অবাধে অক্ষুণ্ণ শরীরে আমাদের দলে এসে ভিড়েছেন। হোটেলের বাইরে খোলা পৃথিবী থাকে, জাহাজের বাইরে মানুষের যোগ্যস্থান নেই। এইজন্যে সকল দলের লোকের সঙ্গে খুব ঘেঁষাঘেঁষি অনিবার্য। তাতেও নতুন মানুষ যে ঠিক কী তা জানা যায় না বটে কিন্তু কী নয় তা অনেকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। প্রথমত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এঁর কিছুই জানা নেই এবং ঔৎসুক্য আকর্ষণ নেই। বুদ্ধিগম্য বিষয় সম্বন্ধেও কোনো অনুরক্তি দেখা গেল না।— সাদা কথায় একটুমাত্র বাইরে গেলেই ওর পক্ষে ডুব জল হয়ে পড়ে।

মনে কোরো না, আমি কোনো সিদ্ধান্ত মনের ভিতর এঁটে বসে আছি। সিদ্ধান্ত দ্বারা মানুষের প্রতি অবিচার করার আশঙ্কা আছে। জন্তুরা তাদের অন্ধ সংস্কার থেকে ভয় পায়, সন্দেহ করে। প্রকৃতি তাদের বিচার করতে দেন নি, বিচারে যতগুলো প্রমাণের দরকার হয় তা সংগ্রহ করতে সময় লাগে; ইতিমধ্যে বিপদ এসে পড়ে, যেটা চূড়ান্ত প্রমাণ সেইটেই চূড়ান্ত বিপদ। হরিণ শব্দমাত্র শুনলেই অন্ধসংস্কারের তাড়ায় দৌড় মারে, শব্দটা ঝোপের ভিতরকার বাঘের কাছ থেকে এল কি না তার নিঃসংশয় প্রমাণ নিতে গেলে বাঘ এবং প্রমাণ ঠিক একসঙ্গেই এসে পড়ে। মানুষ যখন কোনো কারণে বিষম সংকটের অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ যখন খুব তাড়াতাড়ি মন স্থির করা অত্যাবশ্যক, মানুষেরও তখন হরিণের অবস্থা হয়। পৃথিবীতে যে-সব জাত নিজেদের সম্বন্ধে যথোচিত নিরাপদ ব্যবস্থা করতে পেরেছে, যাদের আইন যথোচিত পাকা, যাদের আত্মরক্ষাবিধি সুবিহিত তারা অন্ধ সংশয়ের হাত থেকে বেঁচেছে— কেননা ওটা তাদের পক্ষে সহায় নয়, বাধা।

ওর (Miss P-এর) জীবনে বিস্তর ভাঙাচোরা ঘটেছে— এদিকে ওদিকে অনেক ব্যথা অনেক আকারে ওর মধ্যে বাসা বেঁধে আছে। ও মনে করেছে আমি বুঝি কোনো একরকম করে ওকে সাহায্য করতে পারি। কেননা ও অনেকের কাছে শুনেছে যে আমি তাদের সাহায্য করেছি। অথচ আমি যে কোথায় সত্য, কোথায় আমার সম্পদ, তা ও জানে না, বুঝতেও পারে না। ও মনে করেছে আমার কাছাকাছি থাকার মধ্যেই বুঝি সাহায্য বলে একটা পদার্থ আছে। বুঝতে পারে না কাছাকাছি যাকে প্রত্যহ পাওয়া যায় সে অত্যন্ত সাধারণ ব্যক্তি, অনেক বিষয়ে সে নির্বোধ, অনেক বিষয়ে সে মন্দ। আসল কথা ও স্ত্রীলোক। আঁকড়ে থাকলেই একটা সত্য বস্তু পাওয়া যায় বলে ওর ধারণা। হায় রে পৌত্তলিক। প্রতিমার মাটি সত্য নয়, তাকে যতই গয়না দিয়ে সাজাই-নে কেন। অথচ প্রতিমার মধ্যে যে সত্য নেই এত বড়ো ঘোর ব্রাহ্মিক গোঁড়ামিও ঠিক নয়। আসল কথা তাকে আঁকড়ে ধরতে গেলেই ভুলটাকে ধরা হয়, তখন সত্য দেয় দৌড়। যে পোকা বইয়ের কাগজ কেটে খায়, সেই পৌত্তলিক; যে তাকে চিত্ত দিয়ে পড়তে পারে, কাগজ তার কাছে থেকেও নেই। এ পর্যন্ত মনে হচ্ছে মিস্ প— আমার বইখানার কাগজ নিয়ে ঝাড়পোঁচ করছে, কোনোদিন হয়তো তাতে সিন্দুর চন্দনও মাখাবে— তাতে কিছু তৃপ্তিও পাবে। কিন্তু কোনোকালে কি পড়তে পারবে মনে কর।

৬

সন্তোষের কথাটা ভুলতে পারি নে। নিজের জীবনের কথাটা ভাবি— কত সুদীর্ঘ কাল বেঁচে আছি, কত সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা ও সাধনা, কত বহু গ্রন্থিজটিল ইতিহাস বুনতে বুনতে জীবন গেল। তার তুলনায় সন্তোষের জীবন কতই অল্পপরিসর। যৌবন সমাপ্ত হতে-না-হতে ওর জীবন সমাপ্ত হল। তবুও ওর জীবনের ছবি সুব্যক্ত— বৈচিত্র্যবিহীন, কিন্তু অর্থবিহীন নয়। চার দিকে কত লোক ব্যাবসা করছে, চাকরি করছে, সংসার করছে, সমস্তটাই ঝাপসা। তাদের দিনগুলো

দিনের স্তূপ, একটার উপর আর-একটা জড়ো হয়ে উঠেছে, সবগুলো মিলে কোনো রূপ ধরছে না। সন্তোষের জীবন তেমন রূপহীন জীবন নয়। মনে পড়ছে, এই সেইদিন এল আমেরিকার শিক্ষা শেষ করে। শান্তিনিকেতনের কাজের মধ্যে এসে জায়গা করে নিলে। আরও অনেক অধ্যাপক এখানে কাজ করছেন—যেমন অন্য জায়গায় করতে পারতেন তেমনি, কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশি। কিন্তু সন্তোষ তার তরুণ হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা নিয়ে এই কাজের ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। অবশ্য এর সঙ্গে তার জীবিকার যোগ ছিল সন্দেহ নাই কিন্তু তার আত্মার যোগ আরও বেশি ছিল। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দাবিতে আমরা প্রতিদিন যে কাজ করে থাকি তার কোনো উদ্‌বৃত্ত নেই, নিজের মধ্যেই তা শোষিত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু এমন একটি সাধনার সঙ্গে সন্তোষের সমস্ত জীবন সম্পূর্ণ সম্মিলিত হয়ে ছিল যে-সাধনা তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনমণ্ডলের অনেক অতীত। তার শ্রদ্ধাপ্রদীপ্ত জীবনের সেই পরিণতির ছবিটি আমি খুব স্পষ্ট দেখছি, যেহেতু তার জীবন স্বচ্ছ ও সরল ছিল—তার মধ্যে উপাদানের বহুলতা ছিল না। তার সংসার এবং তার সাধনা, তার কর্ম এবং আদর্শ একত্র মিলিত ছিল, তার অল্পকালের আয়ুটুকু নিয়ে সে যে তারই মধ্যে জীবন যাপন করে যেতে পেরেছে এ তার সৌভাগ্য। আমি যদি প্রমাণের দ্বারা সন্তোষকে জানতুম তা হলে ভুল জানতুম—আমি তাকে সম্পূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা জানি। ভালোবাসার দ্বারা সব সময়েই যে দৃষ্টির বিকৃতি ঘটে তা নয়, দৃষ্টির সম্পূর্ণতাও ঘটে। আমার বুদ্ধি প্রমাণকে অস্বীকার করে না, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি প্রত্যক্ষবোধকেও শ্রদ্ধা করে। দুইয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে একান্ত বিরোধও ঘটে, তখনই রহস্য বড়ো কঠিন ও বড়ো দুঃখকর হয়ে ওঠে। স্বয়ং মৃত্যুর মধ্যেই এই বিরোধ আছে—আমাদের হৃদয়ের সহজ বোধ তাকে চরম বলে মানতে চায় না, কিন্তু বিরুদ্ধ প্রমাণের আর অন্ত নেই—এই দুই প্রতিপক্ষের টানাটানিতেই তো এত দুঃসহ বেদনা। আমার 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটি এই বেদনারই কবিতা।

আজ জাহাজের মধ্যশ্রেণীর যাত্রীদের দরবার নিয়ে গোরা এসেছিল। এই অপরাহ্নে তারা আমার মুখ থেকে কিছু শুনতে চায়। যদি প্রথমশ্রেণীর যাত্রী হত তা হলে হঠাৎ রাজি হতুম না—দ্বিতীয়-শ্রেণীর মনুষ্যত্বের আবরণ অনেক হালকা, সেখানে মানুষকে দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে যাবার সময় হয়ে এল।

৭

সমুদ্রে আজ নিয়ে আর চার দিন আছি। ১৬ই সকাল কলম্বো পৌঁছব। কিন্তু দেশে পৌঁছবার শান্তি পাব না। দীর্ঘ রেলযাত্রা নানা ভাগে বিচ্ছিন্ন। তার পরে পুপে যাকে বলতে শিখেছে 'মালপত্র', তার সংখ্যা বহু, তার আয়তন বিপুল এবং তার আধারগুলির অবস্থা শোকাবহ। কোনো বাক্স আছে যাত্রার সূচনাতেই চাবির সঙ্গে যার চিরবিচ্ছেদ, দড়িদড়ার বন্ধন ছাড়া যার আর গতি নেই; কোনো বাক্স আছে যার সর্বাঙ্গ আঘাতে জর্জর, কোনো বাক্স আছে যা ভূরিভোজপীড়িত রোগীর মতো উদ্গারের দ্বারা ভার প্রশমনের জন্য উৎসুক—অথচ যুদ্ধক্ষেত্রের হাঁসপাতালের রোগীর মতো এদের সম্বন্ধে রথীর উদ্‌বেগ সকরুণ। তা হোক, তবুও দেশের মুখে চলেছি এবং দীর্ঘপথের সেই তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন শেষ ভাগটা যেন দেখা যাচ্ছে। এখানে আমাদের দেশের সেই দাক্ষিণ্যপূর্ণ সূর্যালোক আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। শুক্লপক্ষের চাঁদ প্রতিদিন পূর্ণতর হয়ে উঠছে; আমাদের মর্মরমুখরিত শালবীথিকার পল্লবপুঞ্জের মধ্যে তার দোললীলা মনে মনে দেখতে পাচ্ছি। প্রবাসবাসের সমস্ত বোঝা উত্তরায়ণের বহির্দ্বারে নামিয়ে দিয়ে আপন মনে স্বেচ্ছাবিহারের পালা অনতিবিলম্বে শুরু করব বলে কল্পনা করছি। কিন্তু হায়, এও নিশ্চয় জানি যে, দেবলোকে আমাদের বাস নয়, যেখানেই থাকি-না কেন। অনেকের অনেক ইচ্ছার ভিড় ঠেলে ঠেলে নিজের ইচ্ছার জন্য অতি সংকীর্ণ একটুখানি পথ পাওয়া

যায়— একটু সুবিধা এই যে, পথ সংকীর্ণ হলেও সেটা অনেক কালের অভ্যস্ত পথ— ভিড়ের মধ্যেও খানিকটা আপন-মনে চলা সম্ভব।

আমাদের সহযাত্রীর মধ্যে একজন জর্মান নৃতত্ত্ববিদ্ সস্ত্রীক ভারতবর্ষে চলেছেন। তিনি আমাদের অধ্যাপকের নাম শুনেছেন। আমাকে বললেন, 'শুনেছি তিনি ফিজিক্সের অধ্যাপনা করেন। তা হলে বোঝা যাচ্ছে তিনি নৃতত্ত্ববিদ্যার আঙ্গিকক দিকটার চর্চা করেন; আমরা এর মানবিক দিকটা নিয়ে আছি।' মানবিক দিক বলতে যে কতখানি বোঝায় তা এঁর অধ্যবসায় দেখে একটু আন্দাজ করা যেতে পারে। দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের বন্যজাতিদের বিবরণ সংগ্রহ করতে চলেছেন, এ-সব জাতদের বিষয় এখনো অজ্ঞাত ও দুর্জ্ঞেয়, আমি তো এদের নামও শুনি নি। এরা খুব দুর্গম জায়গায় প্রচ্ছন্ন-ভাবে থাকে। ইনি তাদের সেই প্রচ্ছন্নতার মধ্যে প্রবেশ করতে চলেছেন। তাঁবুতে থাকলে পাছে তারা ভয় পায় সন্দেহ ক'রে একটা থলি নিয়েছেন; রাত্রে তারই মধ্যে থাকবেন। সাপ আছে, হিংস্র জন্তু আছে, অনিয়মে অপথ্যে ব্যাধির আশঙ্কা আছে। অর্থাৎ প্রাণ হাতে করে নিয়ে চলেছেন। একটি শিশু সন্তানকে আত্মীয়ের হাতে রেখে এসেছেন। পাছে অরণ্যে স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়েন এইজন্য সঙ্গে নিয়েছেন তাঁর স্ত্রী। ইতিমধ্যে ম্যাপ নিয়ে বই নিয়ে সমস্ত দিন নোট তৈরি করছেন, স্বামীর কাজ এগিয়ে দেবার জন্যে। যাদের সংবাদ সংগ্রহের জন্যে দুঃসহ কষ্ট ও বিপদ অগ্রাহ্য করে চলেছেন তারা আত্মীয়জাতি নয়, সভ্যজাতি নয়, মানবজাতিসম্বন্ধীয় তথ্য ছাড়া তাদের কাছ থেকে আর কোনো দুর্মূল্য জিনিস আদায় করা যাবে না। এরা পৃথিবীর সমস্ত তথ্যভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে বেরিয়েছে, আমরা পৃথিবীর মাটি জুড়ে ছেঁড়া মাদুর পেতে গড়াগড়ি দিচ্ছি। জায়গা ছেড়ে দেওয়াই ভালো— বিধাতা জায়গা সাফ করবার অনেক দূতও লাগিয়েছেন।

৮

কাল সকালে কলম্বো পৌঁছব। যখন য়ুরোপে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম আজকের এই দিনের ছবি অনেকদিন মনে মনে এঁকেছি— জাহাজ এসেছে ভারতবর্ষের কাছাকাছি; উজ্জ্বল আকাশ বুক বাড়িয়ে দিয়েছে; শকুন্তলায়, বালক ভরত যেমন সিংহের কেশর ধরে খেলছে, শীতের নির্মল রৌদ্র তেমনি তরঙ্গিত নীল সমুদ্রকে নিয়ে ছেলেমানুষি করছে, আর সেই নারকেল গাছের ঘন বন, যেন দূরে থেকে ডাঙার হাত-তোলা ডাক। সেই কল্পনার ছবি এখন সামনে এসেছে। কাল লাক্ষাডীভের খুব কাছ ঘেঁষে জাহাজ এল— শ্যামল তটভূমির কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পেলুম। ঐ তরুবেষ্টিত দিগন্তের ধারে মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা চলছে এই কথাটা যেন নতুন ও নিবিড় বিস্ময়ের সঙ্গে আমার মনে লাগল। আমি জানি যারা ঐখানে মাটি আঁকড়ে আছে তারা নিজে এর আনন্দ, এর সৌন্দর্য, এর মহার্ঘতা যে স্পষ্ট বুঝছে তা নয়। অভ্যাসে আমাদের চৈতন্যকে ম্লান করে দেয়, কিন্তু তবু যা সত্য তা সত্যই। দূরের থেকে শান্তিনিকেতন আমার কাছে যতখানি, কাছের থেকে ঠিক ততখানি না হতেও পারে— কিন্তু তার থেকে কী প্রমাণ হয়। দূরের দৃষ্টিতে যে-সমগ্রতা আমরা এক করে দেখতে পাই সেইটাই বড়ো দেখা, কাছের দৃষ্টিতে যে খুঁটিনাটিতে মন আবদ্ধ হয়ে সমষ্টিকে স্পষ্ট দেখতে দেয় না, সেইটেই আমাদের শক্তির অসম্পূর্ণতা। এই কারণেই আমাদের সমস্ত আয়ু নিয়ে আমরা যে জীবন যাপন করেছি তাকে আমরা পুরোপুরি জানতেই পারি নে। যা পাই নে তার জন্যে খুঁতখুঁত করি, যা হারিয়েছে তার জন্যে বিলাপ করি, এমনি করে যা পেয়েছি তার সবটাকে নিয়ে তাকে যাচাই করবার অবকাশ পাই নে। আসল কথা, শান্তিনিকেতনের আকাশ ও অবকাশে পরি-বেষ্টিত আমাদের যে জীবন তার মধ্যে সত্যই একটি সম্পূর্ণ রূপ আছে, যা কলকাতার সূত্রছিন্ন জীবনে নেই। সেই সম্পূর্ণ রূপের অন্তর্গত নানা অভাব ও ত্রুটি তার পক্ষে ঐকান্তিক নয়, সেগুলো অপ্রাসঙ্গিক, পর্বতের গায়ের গর্তের মতো, যা পর্বতের উচ্চতাকে বৃথা প্রতিবাদ করে। শান্তিনিকেতনের ভিতর দিয়ে মোটের উপর আমি নিজেকে কী রকম করে প্রকাশ করেছি সেইটের

দ্বারাই প্রমাণ হয় শান্তিনিকেতন আমার পক্ষে কী—মাঝে মাঝে কী রকম নালিশ করেছি, ছটফট করেছি তার দ্বারা নয়। শুধু আমি নই, শান্তিনিকেতনে অনেকেই আপন আপন সাধ্যমত একটি সুসংগতির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েছেন। এটা যে হয়েছে সে কেবল আমার জন্যেই হয়েছে এ কথা যদি বলি তা হলে অহংকারের মতো শুনতে হবে, কিন্তু মিথ্যে বলা হবে না। আমি নিজের ইচ্ছার দ্বারা বা কর্মপ্রণালীর দ্বারা কাউকে অত্যন্ত আঁট করে বাঁধি নে; তাতে করে কোনো অসুবিধে হয় না তা বলি নে—আমি নিজেই তার জন্য অনেক দুঃখ পেয়েছি কিন্তু তবু আমি মোটের উপর এইটে নিয়ে গৌরব করি। অধিকাংশ কর্মবীরই এর মধ্যে ডিসিপ্লিনের শিথিলতা দেখে—অর্থাৎ না-এর দিক থেকে, হাঁ-এর দিক থেকে দেখে না। স্বাধীনতা ও কর্মের সামঞ্জস্য সংঘটিত এই যে ব্যবস্থা এটি আমার একটি সৃষ্টি—আমার নিজের স্বভাব থেকে এর উদ্ভব। আমি যখন বিদায় নেব, যখন থাকবে সংসদ, পরিষদ ও নিয়মাবলী, তখন এ জিনিসটিও থাকবে না। অনেক প্রতিবাদ ও অভিযোগের সঙ্গে লড়াই করে এতদিন একে বাঁচিয়ে রেখেছি—কিন্তু যারা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ তারা একে বিশ্বাস করে না। এর পরে ইস্কুল-মাস্টারের ঝাঁক নিয়ে তারা অতি বিশুদ্ধ জ্যামিতিক নিয়মে চাক বাঁধবে—শান্তিনিকেতনের আকাশ ও প্রান্তর ও শাল-বীথিকা বিমর্ষ হয়ে তাই দেখবে ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবে। তখন তাদের নালিশ কি কোনো কবির কাছে পৌঁছবে।

৯

আমার মনটা স্বভাবতই নদীর ধারার মতো, চলে আর বলে একসঙ্গেই—বোবার মতো অবাক হয়ে বইতে পারে না। এটা যে ভালো অভ্যাস তা নয়। কারণ, মুছে ফেলবার কথাকে লিখে ফেললে তাকে খানিকটা স্থায়িত্ব দেওয়া হয়—যার বাঁচবার দাবি নেই সেও বাঁচবার জন্যে লড়তে থাকে। ডাক্তারি শাস্ত্রের উন্নতির কল্যাণে অনেক মানুষ খামকা বেঁচে থাকে, প্রকৃতি যাকে বাঁচবার পরোয়ানা দিয়ে পাঠান নি—তারা জীবলোকের অন্নধ্বংস করে। আমাদের মনে যখন যা উপস্থিত হয় তার পাসপোর্ট বিচার না করেই তাকে যদি লেখনরাজ্যে ঢুকতে দেওয়া হয় তা হলে সে গোলমাল ঘটাতে পারে। যে কথাটা ক্ষণজীবী তাকেও অনেকখানি আয়ু দেবার শক্তি সাহিত্যিকের কলমে আছে, সেটাতে বেশি ক্ষতি হয় না সাহিত্যে। কিন্তু লোকব্যবহারে হয় বৈকি। চিন্তাকে আমি তাড়াতাড়ি রূপ দিয়ে ফেলি—সব সময়েই যে সেটা অযথা হয় তা নয়; কিন্তু জীবনযাত্রায় পদে পদে এইরকম রূপকারের কাজের চেয়ে চুপকারের কাজ অনেক ভালো। আমি প্রগল্‌ভ কিন্তু যারা চুপ করতে জানে তাদের শ্রদ্ধা করি। যে-মনটা কথায় কথায় চেঁচিয়ে কথা কয় তাকে আমি এখানকার নির্মল আকাশের নীচে গাছতলায় বসে চুপ করাতে চেষ্টা করছি। এই চুপের মধ্যে শান্তি পাওয়া যায়, সত্যও পাওয়া যায়। প্রত্যেক নূতন অবস্থার সঙ্গে জীবনকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে নানা জায়গায় ঘা লাগে—তখনকার মতো সেগুলো প্রচণ্ড, নতুন চলতে গিয়ে শিশুদের পড়ে যাওয়ার মতো, তা নিয়ে আহা উহু করতে গেলেই ছেলেদের কাঁদিয়ে তোলা হয়। বুদ্ধি যার আছে সে এমন জায়গায় চুপ করে যায়—কেননা সব-কিছুকেই মনে রাখা মনের শ্রেষ্ঠ শক্তি নয়, ভোলবার জিনিসকে ভুলতে দেওয়াতেও তার শক্তির পরিচয়। ইতি ২৭ পৌষ ১৩৩৩

১০

আমি যে তোমাকে চিঠি লিখেছি এতদিন পরে তার একখানি প্রাপ্তিস্বীকার পাওয়া গেল। ইতিপূর্বে গত সপ্তাহে প্রশান্তর একখানি সুন্দর চিঠি পেয়েছি। তাতে বর্তমান য়ুরোপের সর্বত্রই যে একটা দুশ্চিন্তার আলোড়ন চলছে তার একটা বেশ স্পষ্ট ছবি দেওয়া হয়েছে। মনে করছি এর ইংরেজি অংশ বাংলা করে এটাকে কোনো একটা কাগজে ছাপানো যাবে।

এইমাত্র বিকেলের গাড়িতে রেখা চোখের জল মুছতে মুছতে ঢাকায় তার শ্বশুরবাড়ি অভিমুখে চলে গেল। অমিয় বললে, নতুন বিয়ের কালে যে-কোনো স্বামীকেই তার যে-কোনো স্ত্রীর উপযুক্ত বলে মনে হয় না। শুনে মনে হল তার কারণটা এই যে, নববধূ আপনার সব-কিছুকেই দান করে, তার চোখের জলের মধ্যে সেই কথাটাই প্রচ্ছন্ন থাকে। অতীতের সঙ্গে সম্বন্ধবন্ধনের তন্তুতে তন্তুতে বদ্ধ জীবনকে ছিন্ন করে নিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করে। কিন্তু তার স্বামী সব দিতে বাধ্য হয় না। এই আদানপ্রদানের অসমানতাকে নিজের পৌরুষসম্পদ দিয়ে ভরিয়ে দিতে পারে এমন সামর্থ্য অল্পলোকেরই আছে। তার পরে দিন যায়, স্ত্রী ক্রমে যখন নিজের গুণে ও শক্তিতে নিজের সংসার সৃষ্টি করে তোলে তখন সেইটেই তার পুরস্কার হয়। কেননা তার বাপমায়ের যে-সংসারে সে ছিল সে-সংসারে সে ছিল অকর্তা—সে সংসারে তার অধিকার আংশিক; তার দাম্পত্যের জগৎ তার আপনারই জগৎ। এইজন্যে তার চোখের জল শুকোতে দেরি হয় না। যে অতীতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ অনেক অংশে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, বর্তমানের তুলনায় সে অতীতের গৌরব কমে যায়, এইজন্যে তার আকর্ষণশক্তিও ক্ষীণ হয়ে আসে। তখন, যা সে দিয়ে এসেছে তার পরিবর্তে যা সে পায় তা বেশি বৈ কম হয় না।

আমার চিঠি লেখার বয়স চলে গেছে। কলমের ভিতর দিয়ে কথা কইতে গেলে কথার প্রাণগত অনেকটা অংশ ফসকে যায়। যখন মনের শক্তি প্রচুর থাকে তখন বাদসাদ দিয়েও যথেষ্ট উদ্‌বৃত্ত থাকে। তাই তখন লেখার বকুনিতে অভাবের লক্ষণ দেখা যায় না। এখন বাণী সহজে বকুনিতে উছলে উঠতে বাধা পায়—তাই কলমের ডগায় কথার ধারা ক্ষীণ হয়ে আসে, বোধ হয় এইজন্যেই লেখবার দুঃখ স্বীকার করতে মন রাজি হয় না।

তা হোক গে, তবু তোমাকে একটা ভিতরকার কথা বলি। সময় অনুকূল নয়, নানা চিন্তা, নানা অভাব, নানা আঘাত, সংঘাত। ক্ষণে ক্ষণে অবসাদের ছায়া ঘনিয়ে আসে, একটা পীড়ার হাওয়া মনের এক দিক থেকে আর-এক দিকে হুহু করে বইতে থাকে। এমন সময় চমকে উঠে মনে পড়ে যায় যে এ ছায়াটা 'আমি' বলে একটা রাহুর। সে রাহুটা সত্য পদার্থ নয়। তখন মনটা ধড়ফড় করে চেঁচিয়ে উঠে বলে ওঠে--ও নেই ও নেই। দেখতে দেখতে মন পরিষ্কার হয়ে যায়। বাড়ির সামনে কাঁকর-বিছানো লাল রাস্তায় বেড়াই আর মনের মধ্যে এই ছায়া-আলোর দ্বন্দ্ব চলে। বাইরে থেকে যারা দেখে তারা কে জানবে ভিতরে একটা সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে। এ সৃষ্টির কি আমারই মনের মধ্যে আরম্ভ আমারই মনের মধ্যে অবসান। বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে এর কি কোনো চিরন্তন যোগসূত্র নেই। নিশ্চয় আছে। জগৎ জুড়ে অসীম কাল ধরে একটা কী হয়ে উঠছে আমাদের চিত্তের মধ্যে বেদনায় বেদনায় তারই একটা ধাক্কা চলছে। সভ্যতার ইতিহাস-ধারায় মানুষ আজ যে অবস্থার মধ্যে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে, এই অবস্থাসৃষ্টির প্রক্রিয়ার মধ্যে কত কোটি কোটি নামহীন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের চিরবিস্মৃত চিত্তসংঘাত আছে। সৃষ্টির যা-কিছু রয়ে-যাওয়া তা সংখ্যাহীন চলে-যাওয়ার প্রতিমুহূর্তের হাতের গড়া। আজ আমার এই জীবনের মধ্যে সৃষ্টির সেই দূতগুলি, সেই চলে-যাওয়ার দল তার কাজ করছে—'আমি' বলে পদার্থটা উপলক্ষ মাত্র—বাড়ি তৈরির যে ভারা বাঁধা হয় আজকের দিনে এর প্রয়োজনীয়তার প্রাধান্য যতই থাক্‌ কালকের দিনে যখন এর চিহ্নমাত্র থাকবে না তখন কারও গায়ে একটুও বাজবে না। ইমারত আপন ভারার জন্যে কোথাও শোক করে না। মোদ্দা কথাটা এই যে, আজ আমার এ আমিটাকে নিয়ে যে-গড়াপেটা চলছে এই লাল কাঁকর-বিছানো রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে ভিতরে ভিতরে যা-কিছু উপলব্ধি করছি তার অনেকখানিই আমার নামের স্বাক্ষর মুছে ফেলে দিয়ে মানুষের সৃষ্টিভাণ্ডারে জমা হচ্ছে।·ইতি ২৫ মাঘ ১৩৩৩

১১

মার্চ মাসের শেষেই তোমরা দেশে এসে পৌঁছবে এই ভরসা দিয়েছিলে তাই ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত আমার চিঠির চরকায় সুতো কাটবার মেয়াদ ছিল। এমন সময় হঠাৎ শুনি তোমাদের আসা ঘটবে না, আর আমার চরকার মেয়াদও বেড়ে চলল। গত সপ্তাহে তোমার সেই পরিচিত ফাউন্টেন পেনটিকে বিশ্রাম করতে দিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে আমার শনিগ্রহ একদিন রাত্রি দুটোর সময় আমাকে তলব করলেন। তখন বিছানায় শুয়ে ছিলুম। হঠাৎ একটা তীব্র শীতের হাওয়া হুহু করে এসে আমাকে চঞ্চল করে তুললে। শিওরের কাছের দরজাটা প্রবল বেগে বন্ধ করবার চেষ্টা করতে গিয়ে দরজাটা আমার ডান হাতের মধ্যমাঙ্গুলির উপর পড়ে তাকে পেষণ করে ফেললে। ঐ মধ্যমাঙ্গুলিটিই শিশুকাল থেকে হেঁট হয়ে আমার লেখনীর ভার বহন করে এসেছে। আমার সাহিত্য-ইন্দ্রের দুটি বাহন: একটি হচ্ছে বুড়ো আঙুল— সে হল ঐরাবত, আর-একটি ঐ মধ্যমিকা— তাকে বলা যায় উচ্চৈঃশ্রবা। সে খুবই জখম হয়েছে। তাতে মিস্ পট্ কাজ পাবার সুবিধে পেল। শুশ্রূষা পুরো জোরে চলেছে। ব্যান্ডেজের আবরণে আঙুলটা ইজিপ্ট দেশীয় 'মমি'র আকার ধারণ করেছে। নখটা তার কর্মে ইস্তফা দিয়েও তবু নড়নড়ে অবস্থায় লেগে রইল। সে সম্পূর্ণ পদত্যাগ করলে আমি নিষ্কৃতি পাই। যাই হোক, রচনার কাজটা এখন দুঃখসাধ্য। লেখার বিষয়টা যাই হোক তার লাইনে লাইনে আমার এই খোঁড়া আঙুলটা করুণ রস সঞ্চার করছে। কথাটা জানিয়ে রাখলুম, কারণ চিঠির দৈর্ঘ্য-প্রস্থের পরিমাণ পরিমাপ করে যখন দেনাপাওনার তুলনামূলক সমালোচনা করবে তখন এই ব্যথার আয়তনটাকে আমার দিকে যোগ করে দিতে হবে। এবারে দায়ে পড়ে চিঠি সংক্ষেপ করতেই হবে। কেবল একটা কথা সংক্ষেপে বলে নিই।

যখন কারও সম্বন্ধে আমার মনে ব্যক্তিগত ক্ষোভ জন্মে তখন তার তীব্রতাটা ভিতরে ভিতরে আমার পক্ষে লজ্জার কারণ হয়ে ওঠে। এই আত্মপীড়ন থেকে অনেক জিনিস কুৎসিত হয়ে দেখা দেয়। তার কুৎসাটাকে ভিতরে যখন টেনে নিই তখন আমার মন বলতে থাকে হার হল। বাইরের 'পরে বিরক্ত হয়ে নিজের ভিতরকার সামঞ্জস্যকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করলে তাতে নিজের ভারি লোকসান। এ কথা অনেক সময়ই মনে থাকে না, কিন্তু মনের আন্দোলন কোনো কারণে একটু বেশিদিন স্থায়ী হলেই তখন লোকসানের চেহারাটা স্পষ্টই বুঝতে পারি। কোনো কারণেই নিজেকে ছোটো করবার মতো এমন বোকামি আর নেই।

ভালো করে আত্মবিশ্লেষণ করলে একটা জিনিস আমার নজরে পড়ে, সে হচ্ছে আমার কর্তব্য-বুদ্ধিটা আসলে সৌন্দর্যবোধ। যখন বাইরের সঙ্গে মন কলহ করতে উদ্যত হয় তখন সেই ইতরতায় আমি নিজেকে অসুন্দর দেখি। তাতেই কষ্ট পাই। আত্মমর্যাদার একটি শোভা আছে, প্রবৃত্তির বশে আত্মবিস্মৃত হয়ে সেইটেকে যখন ক্ষুণ্ণ করি তখন অনতিকাল পরে মনে ধিক্‌কার জন্মায়। আমার মধ্যে বন্ধনের জোর বেশি বলেই আমার মধ্যে মুক্তির আগ্রহ এত বেশি প্রবল। আমার ব্যবহারে এই দুই শক্তির পরস্পর-বিরোধের মধ্যে দিয়ে এ পর্যন্ত সংসারপথে যাত্রা করে এলেম। আজ মাঝে মাঝে আমার এই বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে একলা চলতে চলতে ভাবি— সব ভাঙাচোরাকে সেরে নেবার সময় আছে কি।

কথা বলতে গিয়ে কথা বেড়ে যায়— হায় রে, মধ্যমাঙ্গুলি আহত বলদের মতো কলম টেনেই চলেছে— ইতি ২ মার্চ ১৯২৭

১২

আমার সেই আঙুল আজও বন্দীশালায়। যারা তাকে এই অবস্থায় রেখেছে তারা বলছে ঐ হতভাগ্য এখনো আত্মশাসনের অধিকার পাবার যোগ্য হয় নি। তাই বন্ধনবশত তার আত্মপ্রকাশ অবরুদ্ধ। লেখার কাজ একপ্রকার বন্ধই আছে। আমার কলম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাঝে মাঝে এক-একটা গান

লেখে মাত্র।—'মাত্র' বলছি জনসাধারণের দাবির মাত্রার মাপে। কাব্যরচনাতেও তারা মাপের ফিতে লাগায়। কাব্যরাজ্যে দশলাইনের একটা গানেরও আভিজাত্য থাকতে পারে এ তাদের বোঝানো শক্ত। বোম্বাই-আমের চেয়ে চালকুমড়োকে যখন তারা বেশি গৌরব দেয় তখন সন্দেহ প্রকাশ করলে দাঁড়িপাল্লা এনে হাজির করে। মনে স্থির করেছি 'ম্যালেরিয়া-বধ' নাম দিয়ে একটা মহাকাব্য লিখব তাতে কুইনীনকে করব প্রধান নায়ক—কেরোসিনতৈল-বাণে মশক-সৈন্যদল বধ করবার পুনঃপুনঃ সংগ্রাম হবে তার প্রধান বর্ণনার বিষয়—সাতটা সর্গের ভিতর দিয়ে প্লীহা যকৃতের বিকৃতি মোচন ব্যাখ্যা করে ক্ষুদ্রকায়া কাব্যরচনার দুর্নাম দূর করবার ইচ্ছে রইল।

সম্প্রতি আমার শরীরটা খিটমিট করছে। দু-চার দিন থেকে একটু একটু জ্বরের আভাসও দেখা দেয়। মনটা ক্লান্ত। আমার চৈতন্যের অগোচরে বোধ হচ্ছে কোনো একটা কালো দুশ্চিন্তা তার ডিমে তা দিচ্ছে। এই ডিমগুলো ভেদ করেই বোধ হয় একটু ক্লান্তি একটু জ্বর ক্ষণে ক্ষণে বের হয়ে পড়ে। শীতের দস্যু হাওয়ায় কেবলই চারি দিকের গাছপালা রিক্ত করে হি হি ধরিয়ে দিয়েছে। আকাশ তারই দৌরাত্ম্যে আচ্ছন্ন, মন একটুও আরাম পায় না। মনে মনে ধ্যান করবার চেষ্টা করি এ সমস্তই বাইরের জিনিস—ইচ্ছা করি, আমার অন্তরলোকের সামঞ্জস্য এরা যেন নষ্ট না করে। জীবনের যে জিনিস এঁকে শেষ করতে হবে তার পট তো এই এতটুকু—এর মধ্যে নানা বাজে আঁচড় কাটতে দিলে জীবনরচনার দশা কী হবে।

১৩

ভ্রমণ শেষ করে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছি। আজ নববর্ষের দিন। মন্দিরের কাজ শেষ করে এলুম। বাইরের কেউ ছিল না কেবল আমাদের আশ্রমের সবাই।

এবার আমার জীবনে নূতন পর্যায় আরম্ভ হল। একে বলা যেতে পারে শেষ অধ্যায়। এই পরিশিষ্টভাগে সমস্ত জীবনের তাৎপর্যকে যদি সংহত করে সুস্পষ্ট করে না তুলতে পারি তা হলে অসম্পূর্ণতার ভিতর দিয়ে বিদায় নিতে হবে। আমার বীণায় অনেক বেশি তার—সব তারে নিখুঁত সুর মেলানো বড়ো কঠিন। আমার জীবনে সব চেয়ে কঠিন সমস্যা আমার কবিপ্রকৃতি। হৃদয়ের সব অনুভূতির দাবিই আমাকে মানতে হল—কোনোটাকে ক্ষীণ করলে আমার এই হাজার সুরের গানের আসর সম্পূর্ণ জমে না। অথচ নানা অনুভূতিকে নিয়ে যাদের ব্যবহার, জীবনের পথে সোজা রথ হাঁকিয়ে চলা তাদের পক্ষে একটুও সহজ নয়—এ যেন এক্কাগাড়িতে দশটা বাহন জুতে চালানো। তার সবগুলোই যদি ঘোড়া হত তা হলেও একরকম করে সারথ্য করা যেতে পারত। মুশকিল এই, এর কোনোটা উট, কোনোটা হাতি, কোনোটা ঘোড়া, আবার কোনোটা ধোবার বাড়ির গাধা—ময়লা কাপড়ের বাহক। এদের সকলকে এক রাশে বাগিয়ে এক চালে চালাতে পারে এমন মল্ল ক'জন আছে। কিন্তু আমি যদি নিছক কবি হতুম তা হলে এজন্যে মনে ভাবনাও থাকত না, এমন-কি, যখন ঘাড়ভাঙা গর্তর অভিমুখে বাহনগুলো চার পা তুলে ছুটত তখনো অট্টহাস্য করতে পারতুম—এমনসকল মরিয়া কবি সংসারে মাঝে মাঝে দেখা যায় তারা স্পর্ধার সঙ্গে বলতে পারে, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। কিন্তু আমার স্বধর্ম কী তা নিয়ে বিতর্ক আর ঘুচল না। এটুকু প্রতিদিনই বুঝতে পারি কবিধর্ম আমার একমাত্র ধর্ম নয়—রসবোধ এবং সেই রসকে রসাত্মক বাক্যে প্রকাশ করেই আমার খালাস নয়। অস্তিত্বের নানা বিভাগেই আমার জবাবদিহি—সব হিসাবকে একটা চরম অঙ্কে মেলাব কী করে। যদি না মেলাতে পারি তা হলে সমস্যা অত্যন্ত কঠিন বলে তো পরীক্ষক আমাকে পার করে দেবেন না—জীবনের পরীক্ষায় তো হাল আমলের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য পাওয়া যায় না। আমার আপনার মধ্যে এই নানা বিরুদ্ধতার বিষম দৌরাত্ম্য আছে বলেই আমার ভিতরে মুক্তির জন্যে এমন নিরন্তর এবং এমন প্রবল কান্না। ইতি ১ বৈশাখ ১৩৩৪

১৪

আমাকে পোর্ট্‌সায়েদে চিঠি দিতে লিখেছ। গেল সপ্তাহেই পাঠিয়েছি। দেনাপাওনার কোনো প্রত্যাশা না করেই এতদিন আমার চিঠিতে আমি নিজের মনের ঝোঁকে বকে গিয়েছি। বকবার সুযোগ পেলেই আমি বকি, এবং বকতে পারলেই আমি নিজের মনকে চিনি, তার বোঝা লাঘব করি—সাহিত্যিক মানুষের এইটেই হচ্ছে ধর্ম। কিন্তু বকতে পারা একান্ত আমার নিজের গুণ তা নয়—শ্রোতার পক্ষে বকুনি আদায় করে নেবার শক্তি থাকা চাই। ইচ্ছে করলেও মন মনের কথা দিতে পারে না। আমাদের এখানে প্রতিদিনই এই বৈশাখের আকাশে জলভরা মেঘ আনাগোনা করছে, প্রতিদিন ফিরে ফিরে যাচ্ছে, এক ফোঁটা জল দিতে পারছে না। যে বায়ুমণ্ডল জল নেবে, তার জোর পৌঁচচ্ছে না। মোট কথা হচ্ছে, আমার কথাভরা মনের পক্ষে বকুনিটা আমার নিজেরই গরজে। কিন্তু তাই বলে পোস্টআপিস বলে একটা বস্তাবাহক স্থূল পদার্থকে মনের সামনে খাড়া করে কথা বলতে চাইলেই যে নিরবধি বলে যেতে পারি এত বড়ো পৌত্তলিক আমি নই। সেইজন্যে যখন মনে ধোঁকা আসে যে পোস্টআপিসের চরম প্রান্তে কর্ণবান কেউ নেই, আছে আমেরিকান এক্সপ্রেসের আপিস, তখন কথার ধারা বন্ধ হয়ে যায়। তোমাদের চিঠি মনের কথার চিঠি নয়, খবর দেওয়ার চিঠি—সেই খবরগুলি কোথায় গিয়ে পৌঁছয় তাতে তেমন বেশি-কিছু আসে যায় না। কিন্তু কথাটা ভালো হল না। তুমি ভাববে তোমাকে খাটো করলেম। ইচ্ছে করে খোঁটা দেবার জন্যে করি নি—হয়তো অবচেতন চিত্ত থেকে করে থাকতে পারি। এ কথা বলতেই হবে মনের কথা বলাই আমার প্রকৃতি; বলতে পারি বলেই বলি, না বলতে পারলে খবর লিখতুম। তাতে দোষ নেই, পড়তে ভালোই লাগে—এমন-কি, চিঠিতে খবর লিখতে না পারার অক্ষমতা নিয়ে আমি নিজেকে নিন্দাও করি। ইতি ৮ বৈশাখ ১৩৩৪

১৫

আজ সকালে বিচ্ছিন্ন মেঘের মধ্যে দিয়ে চমৎকার সূর্যোদয় হয়েছিল, ঈষৎ বাষ্পাবিষ্ট তার সকরুণ আলো এখানকার গাছপালা বাড়িঘর সব-কিছুকে স্পর্শ করেছিল। এই তো চিরপরিপূর্ণতার সুর—এই তো বিশ্বকে চিরনবীন করে রেখেছে—যত বড়ো আঘাত যত নিবিড় কালিমাই জগতের গায়ে আঁচড় কাটতে থাকে তার কোনো চিহ্নই থাকে না—পরিপূর্ণের শান্তি সমস্ত ক্ষয়কে অনিষ্টকে নিয়তই পূরণ ক'রে বিরাজ করে। ঐ প্রতিদিন প্রভাতের কাঁচাসোনাকে কিছুতেই একটুও ম্লান করতে পারে নি, আর আমার দ্বারের কাছে নীলমণিলতা যে উচ্ছ্বসিত বাণী আকাশে প্রচার করছে আজ পর্যন্ত সে একটুও ক্লান্ত হতে জানল না। আমি ঐখান থেকে আমার জীবনের মন্ত্র নিতে চাই, কোনো গুরুভার গুরুবাক্য থেকে নয়—গাছ যেমন করে পাতা মেলে দিয়ে আকাশের আলো থেকে অদৃশ্য অচিহ্নিত পথে ডেকে নেয় আপনার প্রাণ আপনার তেজ। ইতি ৩০ কার্তিক ১৩৩৪

১৬

ঠিক সময়েই বর্ধমানে গাড়ি পৌঁছল। স্টেশনে নেমে সময় কাটাবার উপলক্ষে খাবারঘরে ঢুকে টানাপাখার নীচে বসলুম—এক পেয়ালা কফি হুকুম করতে হল—বলা বাহুল্য সেটা অনাবশ্যক ছিল; যখন এল কফি, তখন দেখা গেল সেটা পান করা অনাবশ্যকের চেয়েও মন্দ। দ্বিতীয় গাড়ি আসতে পাঁচ মিনিট বাকি—আরিয়াম এসে বললে আজকের দিনেই বিশেষ কারণে গাড়ি অন্য প্লাটফর্মে ভিড়বে—সাঁকো পার হয়ে যেতে হবে। আমাকে একটা ঝুলিবাহনে কুলিবাহন যোগে লাইন পার করবার ব্যবস্থা করেছিল—আমি এরকম অপ্রচলিত যানাধিষ্ঠিত হয়ে সাধারণের গোচর হতে আপত্তি করলুম। তার পরে সর্বসাধারণের নির্দিষ্ট পথে চলতে গিয়ে দেখলুম, প্রকৃতি সে

পথের পাথেয় আমার অনেক কমিয়ে দিয়েছেন; বুঝলুম প্রকৃতি আমাকে অনাবশ্যক বোধে সাধারণের পথ থেকে হাফ-পেন্সনে সরিয়ে রেখেছে, বছরে বছরে যখন তার বাজেট স্থির হবে আমার পেন্সন থেকে আরও বাদ পড়বে। পুরোনো সেবকের প্রতি প্রকৃতির দয়ামায়া নেই। এক মুহূর্তে কোনো কারণ না দেখিয়ে তাকে বরখাস্ত করতে তার একটুও বাধে না। কিন্তু আমি যে কর্মক্ষেত্র থেকে বরখাস্তের যোগ্য এ কথা ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যাই।

বোলপুর স্টেশনে এসে পৌঁছলুম। কী ঘনঘোর মেঘ, বৃষ্টিতে সমস্ত মাঠ ভেসে গেছে, চার দিকে সবুজ। এত বড়ো আকাশ এবং অবারিত মাঠ না থাকলে বর্ষার মেজাজটা ছিঁচকাঁদুনে গোছের হয়ে ওঠে, তার মর্যাদা নষ্ট হয়। যাই হোক এতদিনে এখানে এসে পুরো বহরের বর্ষা পাওয়া গেল— তার মধ্যে ছাঁটকাট নেই।

আড়িয়ার আশ্রমে মশার সংখ্যা এবং হিংস্রতা দেখে দেহ মন অভিভূত হয়েছিল— শান্তিনিকেতন-আশ্রম তার চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। এদের সঙ্গে যুদ্ধের একমাত্র উপায় বাষ্পবাণ; সন্ধ্যা থেকে সমস্ত রাত্রি কাটোল-ধূম প্রয়োগ করেছি, এই রূঢ় আচরণে কিছু তারা দুঃখিত হল দেখলুম। এমন-কি, একদল walk-out করলে, কিন্তু যে কয়টি die-hards টিঁকে রইল শান্তিভঙ্গের পক্ষে তারা যথেষ্ট। ভোরে উঠে প্রতিদিন একটুখানি বসি— কিন্তু তারা আমার চেয়েও ভোরে ওঠে। এ দিকে মুষলধারায় বৃষ্টি, দক্ষিণ ও পুব দিক থেকে বেগে হাওয়া দিচ্ছে, দরজা বন্ধ করে সকাল কাটল। আলো জ্বাললুম, তাতে মশাগুলো উৎসাহিত হয়ে মনে করলে তাদের ভোজে নিমন্ত্রণ করেছি— কিছুতেই চরণপ্রান্ত ছাড়তে চায় না। ইতি ২০ আষাঢ় ১৩৩৫

১৭

বৃষ্টি ধরে গেছে, মেঘও গেছে সরে। চারি দিকে সরস সবুজের চিকন আভা একেবারে ঝলমল করছে— বাঙ্গালোরের সেই সবুজ সিল্কের শাড়িতে যেন সোনালি সুতোর কাজ করা। একটু একটু হাওয়া দিচ্ছে। এখন বেলা দুটো। কেয়াফুলের গন্ধ আসছে— টেবিলের একপাশে কে রেখে দিয়েছে। এই বর্ষাদিনের দুপুরবেলাকার রোদ্দুর ঈষৎ আর্দ্র, তার উপরে যেন তন্দ্রার আবেশ; সামনের আকন্দগাছে ফুল ধরেছে, গোটাকতক প্রজাপতি কেবলই ফুরফুর করে বেড়াচ্ছে।— কোথাও কোনো শব্দটিমাত্র নেই, চাকরবাকর আহারে বিশ্রামে রত, ছুতোর-মিস্ত্রির দল এখনো কাজ করতে আসে নি। বসে বসে কোনো একটা খেয়ালের কাজ করতে ইচ্ছে করছে— এই 'রৌদ্রমাখানো অলস বেলায়' গুন গুন করে গান করতে, কিংবা সৃষ্টিছাড়া ধরনের ছবি আঁকতে; অথচ দুটোর কোনোটাই করা হবে না, সহজ ইচ্ছেগুলোরই সহজে পূরণ হয় না। আমার ক্লান্তিভরা কুঁড়েমির ডিগ্রিটা অতটুকু কাজ করারও নীচে। সেই 'মিতা' গল্পটায় মাজাঘষা করছিলুম— অল্প কিছু বেড়েও গেছে। এখানকার শ্রোতাদের ভালোই লাগল। আবার একটা নূতন গল্পে প্রথম ধাক্কা দেবার মতো জোর পাচ্ছি নে। যে গল্পের মানুষগুলো প্রচ্ছন্ন আছে, সে গল্পের বোঝা ভারী, তার কারণ একলাই তাকে ঠেলতে হয়— যখন তারা প্রস্তুত হয়ে বেরোয় তখন তারা অনেকটা পরিমাণ নিজেরাই ঠেলা লাগায়। ইতি ৮ জুলাই ১৯২৮

১৮

কলকাতায় যাই যাই করি, কিন্তু পা ওঠে না। তার কারণ এ নয় যে এখানকার শ্রাবণের টানে আটকা পড়েছি। কারণটা কিছু সূক্ষ্ম— সাইকোলজিকাল।

আজ চল্লিশ বছর হয়ে গেল আমার মনের মধ্যে একটা সংকল্পের সম্পূর্ণ ধ্যানমূর্তি জেগে উঠেছিল, ইংরেজিতে যাকে বলে vision। তখন বয়স ছিল অল্প, মনের দৃষ্টিশক্তিতে একটুও

চাল্‌শে পড়ে নি। জীবনের লক্ষ্যকে বড়ো করে সমগ্র করে স্পষ্ট করে দেখ্‌তে পাবার আনন্দ যে কতখানি তা ঠিকমত তোমরা বুঝতে পারবে কি না জানি নে। সে আনন্দের পরিমাণ পাবে আমার ত্যাগের পরিমাপে। আমার শিলাইদা, আমার সাহিত্যসাধনা, আমার সংসার—সমস্তকেই বঞ্চিত করে আমি বেরিয়ে এসেছিলুম। আমার ঋণের বোঝা ছিল প্রকাণ্ড, কাজের অভিজ্ঞতা ছিল নাস্তি। তার পরে সুদীর্ঘকাল এই দুস্তর অধ্যবসায়ে একলা পাড়ি দিয়েছিলুম। কাউকে দোষ দিই নি, কারও উপর দায় চাপাই নি, কারও কাছে ভিক্ষে চাই নি। তারই মাঝখানে সংসারের নানান দুঃখ গেল। কিন্তু সেই সময়টাতেই মনের ভিতরমহলে যেন সব আলোই জ্বলে উঠেছিল। সেটা বুঝতে পারবে যদি ভেবে দেখ তখনকার বঙ্গদর্শনে কী লিখেছি, তখনকার পার্টিশন-আন্দোলনে কী দোলা লাগিয়েছি—মনের মধ্যে ভারতবর্ষের একটা নিত্যরূপ দেখা দিচ্ছে অথচ তার সঙ্গে মানুষের বিশ্বরূপের বিরোধ নেই; পল্লীতে পল্লীতে নিজের চেষ্টায় স্বাতন্ত্র্যের কেন্দ্র স্থাপনের কল্পনা মনের মধ্যে খেপে বেড়াচ্ছে—শিলাইদহে নিজেদের জমিদারির মধ্যে তার চেষ্টাও চলছে। আমার এই নানামুখী চেষ্টার মাঝখানে গভীর একটা তপস্যা ছিল—একেবারে ছিলুম সন্ন্যাসী, সত্যের অন্বেষণে এবং সত্যকে রূপ দেবার একান্ত সাধনায়। তখন বিপদ ছিল চারি দিকে এবং দারিদ্র্য ছিল ঘরের মধ্যে। সেদিনকার ঢেউ থামল কিন্তু আমার অন্তরের মধ্যে নিয়ত কর্ম চলছেই। মনকে টানছে মানুষের দিকে—বাইরের বড়ো রাস্তায়। ডাকঘর লিখেছিলুম সেই কথাটা বলতে। দইওয়ালার হাঁক বল আর প্রহরীর ঘণ্টা বল কিছুই তুচ্ছ নয়—তারা বিরাট বাহিরের বাণীতেই প্রকাশ পাচ্ছে, সেই বাহির আমাকে সেদিন বলছিল আমার মধ্যে তোমার স্থান। সেই সময়েই রোজ সকালে বিকেলে রাত্তিরে লিখছি গীতাঞ্জলির গান—শারদোৎসবে ছেলেদের সঙ্গে উৎসব জমিয়েছি, এখানকার শাল-বীথিকায় জ্যোৎস্নানিশীথে পরিপূর্ণ মন নিয়ে একলা একলা ঘুরেছি। সেদিন ছেলেরা নিশ্চয়ই আমার প্রাণোচ্ছ্বাসের অংশ পাচ্ছিল, অন্তত আমি তাদের কৈশোরের রসে অভিষিক্ত ছিলুম।

এখন শরীর ক্লিষ্ট ক্লান্ত, মনের অনেকগুলো আলো নিভে গেছে—আমার সেদিনকার পরিচয়টাকে এখানকার প্রদোষান্ধকারে ভালো করে আর খুঁজে পাই নে। আমার সেদিনকার ধ্যানরূপের প্রতিবিম্ব আমার চারি দিকে কারও মধ্যে স্পষ্ট দেখা যায় না। বুঝতে পারি কাছের লোকের মধ্যে আমার প্রাণের অনুপ্রাণন ঠিকমত ঘটে ওঠে নি। আমার পিতৃদেব যেমন করে আপনার জীবনের দীক্ষাকে রেখে গেছেন আমি আমার অন্তরের ধ্যানটিকে তেমন করে রেখে যেতে পারব না। তার জায়গায় ব্যবস্থা আসবে, কর্মের চাকা চলবে। একটা কারণ, আমার মনঃপ্রকৃতির বিচিত্রতা—আমি সব দিকেই যাই, সব কথাই বলি, সব ছবিই আঁকি।

অথচ ক্ষণে ক্ষণে যখন দেখি বিদেশের লোক এ জায়গাটার ভাবের ছবি দেখে গেছে, তাদের অনেক লেখাতেই সেটা পড়লুম—তখন মনের ভিতরে একটা কান্না আসে; এই ছবিটিকে মুছতে দিয়ো না, এর দাম আছে, তোমার যা-কিছু বড়ো, যা-কিছু সজীব এখনো এর মধ্যে উৎসর্গ করো।

সেই যে সেদিন আমার জীবনের কেন্দ্রস্থল থেকে একটি উজ্জ্বল ধ্যান, নীহারিকার মাঝখানে নক্ষত্রের মতো অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল তাকে আবার দেখতে পাই এখানে যখন একলা বসে থাকি, চারি দিকে আর কোনো কথা থাকে না, কেবল থাকে আমার সেই অতীতকালের বাণী। তাকে হারাতে ভুলতে ঝাপসা হতে দিতে ইচ্ছে করে না। জীবনের সত্যযুগ মাঝে মাঝে আসে, তখন নিজেকে সত্য করে পাই, তখনকার চিন্তা এবং কর্ম একটা ধ্যানকেন্দ্রকে ভাবকেন্দ্রকে আশ্রয় করে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই সত্যযুগের সঙ্গে সঙ্গে আসে কর্মযুগ—কর্মযুগে নানা মানুষ নানা কথা তুচ্ছতায় মনের আকাশকে কেবল যে আবিল করে তা নয় উদ্যমকে ক্লান্ত করতে থাকে। আমাদের দেশের মন আধিভৌতিক, materialistic। সেই মনের ধ্যানসম্পদ নেই—আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে বড়ো খর্ব, বড়ো সংকীর্ণ, বড়ো কঠিন করে দেয়। যাদের ধ্যানরূপের দৃষ্টি নেই তাদের

কাছে ধ্যানরূপের মূল্য নেই। চারি দিকের এই ঔদাসীন্য থেকে এই স্থূলহস্তাবলেপ থেকে নিজের মনে উৎসাহের নবীনতাকে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন হয়। বিশেষত শরীর যখন দুর্বল।

এইজন্যেই এখান থেকে নড়তে এত অনিচ্ছা হয়। সেদিনকার বিশুদ্ধ আনন্দের স্পর্শ চুপচাপ বসে এখনো পাই— আজ বুধবার ভোরে আমার সেইদিনকার আমি আমাকে জাগিয়ে দিয়ে গেল। আমার দৌর্বল্যের উপলক্ষ নিয়ে একে আবার একপাশে সরিয়ে ফেলতে একটুও ইচ্ছে করে না। কেননা জীবনের সত্যকে যতই ম্লান করি ততই অবসাদে নৈরাশ্যে পেয়ে বসে। সত্য যখন সজাগ থাকে তখন কর্মের ফলাফল যাই হোক-না কেন পরিতৃপ্তির অভাব ঘটে না। ইতি ৯ শ্রাবণ ১৩৩৫

১৯

দীর্ঘকাল না করেছি কোনো কাজের মতো কাজ, বা পড়ার মতো পড়া। সেইজন্যেই ভিতরে ভিতরে মনটা আত্মঅসন্তোষের ভারে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে আছে। শূন্য দিনের মতো বোঝা জীবনে আর কিছুই নেই, বিশেষত জীবনের মেয়াদ যখন খাটো হয়ে এসেছে। নিজেকে যতই ছোটো করে আনছি ততই তার ভার বড়ো করে বইতে হচ্ছে। প্রতিদিনই মনে মনে নিজেকে লাঞ্ছনা করছি, মনে হচ্ছে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে নিজেকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি নে— কোথায় সে কোন্ অকিঞ্চিৎকরতার মধ্যে তলিয়ে গেছে তার ঠিকানা নেই। অনবধানতায় প্রত্যহ আমি আমার অধিকাংশ জিনিসই হারাই, কাগজ কলম ঘড়ি চশমা খাতা ইত্যাদি— নিজেকেও হঠাৎ হারিয়ে বসে আর তার টিকি দেখতে পাই নে। মরার চেয়ে এই হারানো আরও বেশি লোকসানের। এই হারিয়ে-যাওয়া ভূতে-পাওয়া অকর্মণ্য দিনগুলো থেকে এক দৌড়ে ছুটে পালাতে ইচ্ছে করছে। যে প্রদীপ সমস্ত রাত পরিষ্কার আলো দিয়েছে ভোরের বেলায় তার তৈল-দীন শিখা নিজের ধোঁয়াতে নিজেকে বন্দী করে কেন। ইতি ১৮ ভাদ্র ১৩৩৫

২০

কাল খুব ক্লান্ত হয়েই এসেছিলুম। আজ সকালে শরতের আকাশে আলোতে হাওয়াতে মিলে আমার শুশ্রূষায় লেগে গেছে। অন্য নার্সিংহোমের দোষ হচ্ছে সেটা যে রোগীরই আশ্রয় এ কথা তার সর্বাঙ্গে ছাপমারা, প্রকৃতির শুশ্রূষাগারে আয়ডোফর্মের গন্ধ নেই— জলে স্থলে আকাশে সবাই বলছে এটা নীরোগী নিকেতন। তাই মনও বলে ওঠে আমার কোনো বালাই নেই। আজ সকালে আমার ভাবখানা এই যে, কাজ করা চাই— কিন্তু কোনো ঝঞ্ঝাট পোহাতে পেরে উঠব না। কোনো কোনো ছেলেকে মাছের কাঁটা বেছে সাবধানে খাওয়াতে হয়, আমার অবস্থাটা সেইরকম— ঝঞ্ঝাট বাঁচিয়ে আমাকে কাজ করাতে হবে। মাছটা খাওয়াই চাই কিন্তু কাঁটা আর-কেউ বেছে দেবে— একেই খাঁটি গ্রাম্য বাংলায় বলে 'আহ্লাদ'। কবিত্বটাকে নিয়ে ষোলো-আনা মন ভরে না। পাহাড়টা আছে তার উপরে। যদি রঙবেরঙের মেঘের খেলা থাকে তা হলেই দৃশ্যটা বেশ ভরপুর হয়— শুধু মেঘ নিয়ে দৃশ্য জমে না। আমাকে কাজ করতেই হবে— অথচ ভীরু মনকে হাঙ্গামার ভয় থেকে বাঁচিয়ে চলা চাই। সংসার এত আবদার সইতে পারে না— কিন্তু সংসারের অনেক সেবা অনেক হাঙ্গামা পুইয়ে আমি করেছি— তাই শেষদশায় এই প্রশ্রয়টুকু দাবি করতেও পারি। ইতি ২৬ ভাদ্র ১৩৩৫

২১

আকাশ ঘন মেঘে আজ আচ্ছন্ন, কিছুদিন থেকে বৃষ্টির অভাব ঘটাতে তরুণ ধানের খেত পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেছে— তারা বিদায়কালীন বর্ষার দানের জন্যে উৎসুক হয়ে আকাশে চেয়ে আছে। মেঘের কৃপণতা নেই, কিন্তু বাতাস হয়েছে অন্তরায়। যেই বৃষ্টির আয়োজন প্রায় পূর্ণ হয়ে ওঠে অমনি কুমন্ত্রীর মতো প্রতিকূল হাওয়া কী যে কানে মন্ত্র দেয় উপরিওয়ালার সমস্ত পলিসি যায় বদলে।

আকাশের পার্লামেন্টে কয়েক দিন ধরে আশানৈরাশের বিতর্ক চলছে আজ বোধ হচ্ছে যেন বাজেট পাস হয়ে গেছে, বর্ষণ হতে বাধা ঘটবে না।—খুব ঝমাঝম যদি বৃষ্টি নামে তা হলে চমৎকার লাগবে। এ বৎসরটা আমার কপালে বাদলের সম্ভোগটা মারা গেছে। জোড়াসাঁকোর গলি জলে ভেসে গেছে কিন্তু মনের মধ্যে বর্ষার মৃদঙ্গনাচের তাল লাগায় নি। এবারকার বর্ষায় গান হল না—এমন কার্পণ্য আমার বীণায় অনেকদিন ঘটে নি। ইতি ৩১ ভাদ্র ১৩৩৫

২২

মহারানী ভিক্টোরিয়া যখন কোনোমতেই মরবার লক্ষণ দেখাচ্ছিলেন না, তখন তাঁর ছেলের রাজ্য-ভোগের আশা যেমন অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে এসেছিল এবারকার শরতের সেই দশা। বর্ষা শেষ পর্যন্ত তার আকাশের সিংহাসন আঁকড়ে রইল, মাঝে মাঝে দু-চার দিন ফাঁক পড়েছে—হোলির রাত্রে হিন্দুস্থানির দল ক্ষণকালের জন্য যেমন তাদের মাদল-পিটুনিতে ক্ষান্ত দেয়, তার পরেই আবার দ্বিগুণ উৎসাহে কোলাহল শুরু করে। এমনি করতে করতে শরতের মেয়াদ ফুরিয়ে গেল—হেমন্ত এসে হাজির। ধরাতলে শিউলি মালতী বর্ষার অভ্যর্থনার আয়োজন যথেষ্ট করেছে, কিন্তু আকাশ-তলে দেবতা পথ আটকে ছিলেন। শীতের বাতাস শুরু হয়েছে, গায়ে গরম কাপড় চড়িয়েছি। ভালোই লাগছে—বিশেষত বেলা দশটার পর থেকে প্রান্তরের উপর যখন পৃথিবীর রোদ পোহাবার সময় আসে—নির্মল আকাশে একটা ছুটির ঘোষণা হতে থাকে—পথ দিয়ে পথিকেরা চলে, মনে হয় যেন ছবি রচনায় সাহায্য করবার জন্যেই, তাদের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। আমি প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই আমার এই চেয়ে-দেখার বিবরণটা লিখি। পৃথিবী কিছুতেই আমার কাছে পুরানো হল না—ওর সঙ্গে আমার মোকাবিলা চলছে এইটেই আমার সব খবরের চেয়ে বড়ো খবর। ইতি ১৮ কার্তিক ১৩৩৫

২৩

রথীরা পথ খোলা পেয়েছে। শুক্রবার সকালে কলকাতায় এসে পেঁৗছবে। তার পরে কবে এখানে আসবে পরে জানতে পাব।

আমার এখনকার সর্বপ্রধান দৈনিক খবর হচ্ছে ছবি আঁকা। রেখার মায়াজাল আমার সমস্ত মন জড়িয়ে পড়েছে। অকালে অপরিচিতার প্রতি পক্ষপাতে কবিতা একেবারে পাড়া ছেড়ে চলে গেল। কোনোকালে যে কবিতা লিখতুম সে কথা ভুলে গেছি। এই ব্যাপারটা মনকে এত করে যে আকর্ষণ করছে তার প্রধান কারণ এর অভাবনীয়তা। কবিতার বিষয়টা অস্পষ্টভাবেও গোড়াতেই মাথায় আসে, তার পরে শিবের জটা থেকে গোমুখী বেয়ে যেমন গঙ্গা নামে তেমনি করে কাব্যের ঝরনা কলমের মুখে তট রচনা করে, ছন্দ প্রবাহিত হতে থাকে। আমি যে-সব ছবি আঁকার চেষ্টা করি তাতে ঠিক তার উলটো প্রণালী—রেখার আমেজ প্রথমে দেখা দেয় কলমের মুখে, তার পরে যতই আকার ধারণ করে ততই সেটা পেঁৗছতে থাকে মাথায়। এই রূপসৃষ্টির বিস্ময়ে মন মেতে ওঠে। আমি যদি পাকা আর্টিস্ট হতুম তা হলে গোড়াতেই সংকল্প করে ছবি আঁকতুম, মনের জিনিস বাইরে খাড়া হত—তাতেও আনন্দ আছে। কিন্তু নিজের বহির্বর্তী রচনায় মনকে যখন আবিষ্ট করে তখন তাতে আরও যেন বেশি নেশা। ফল হয়েছে এই যে, বাইরের আর সমস্ত দায়িত্ব দরজার বাইরে এসে উঁকি মেরে হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। যদি সেকালের মতো কর্ম-দায় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতুম, তা হলে পদ্মার তীরে বসে কালের সোনার তরীর জন্যে কেবলই ছবির ফসল ফলাতুম। এখন নানা দাবির ভিড় ঠেলেঠুলে ওর জন্যে অল্পই একটু জায়গা করতে পারি। তাতে মন সন্তুষ্ট হয় না। ও চাচ্ছে আকাশের প্রায় সমস্তটাই, আমারও দিতে আগ্রহ, কিন্তু গ্রহদের চক্রান্তে নানা বাধা এসে জোটে—জগতের হিতসাধন তার মধ্যে সর্বপ্রধান। ইতি ২১ কার্তিক ১৩৩৫

২৪

এতদিনে আমাদের মাঠের হাওয়ার মধ্যে শীত এসে পেঁাছল। এখনো তার সব গাঁঠরি খোলা হয় নি। কিন্তু আকাশে তাঁবু পড়েছে। বাতাসে ঘাসগুলো, গাছের পাতাগুলো একটু একটু সির সির করতে আরম্ভ করল। তরুণ শীতের এই আমেজটায় কঠোরে কোমলে মিশোল আছে। সন্ধ্যাবেলায় বাইরে বসি, কিন্তু ঘরের ভিতরকার নিভৃত আলোটি পিছন থেকে মৃদুস্বরে ডাক দিতে থাকে। প্রথমে গায়ের কাপড়টা একটু ভালো করে জড়িয়ে নিই, তার খানিকটা পরে মনটা উঠি উঠি করে, অবশেষে ঘরে ঢুকে কেদারাটায় আরাম করে বসে মনে হয় এটুকুর দরকার ছিল। এখন দুপুর বেলায় মেঘমুক্ত আকাশের রোদ্দুর সমস্ত মাঠে কেমন যেন তন্দ্রালসভাবে এলিয়ে রয়েছে; সামনে ওই দুটো বেঁটে পরিপুষ্ট জামগাছ পূর্ব-উত্তর দিকে ঘাসের উপর এক-এক পোঁচ ছায়া টেনে দিয়েছে। আজ ওখানে একটিও গোরু নেই, সমস্ত মাঠ শূন্য, সবুজ রঙের একটা প্রলেপ আছে কিন্তু তার প্রাচুর্য অনেক কম। ওই আমাদের টগরবীথিকার গাছগুলি রোদ্দুরে ঝিলিমিলি এবং হাওয়ায় দোলাদুলি করছে। বাতাস এখনো তেতে উঠল না। নিঃশব্দতার ভিতরে ওই রাঙা রাস্তায় গোরুর গাড়ির একটা আর্তস্বর মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে— আর, কী জানি কোন্ সব পাখির অনির্দিষ্ট ক্ষীণ আওয়াজ যেন নীরবতার সাদা খাতায় সরু সরু রেখায় ছেলেমানুষি হিজিবিজি কাটছে। জানি না, কেন আমার মনে পড়ছে বহুকাল আগে সেই যে হাজারিবাগে গিয়েছিলুম, ডাকবাংলার সামনের মাঠে হাতাওয়ালা কেদারায় আমি অর্ধশয়ান, রোদ্দুর পরিণত হয়ে উঠেছে, কাজকর্মের বেলা হল— মাঝে মাঝে অনতিদূরে ঘণ্টা বাজে। সেই ঘণ্টার ধ্বনি ভারি উদাস। আজ হাটের দিনে হাট করে পথিকরা রাস্তা দিয়ে ঘরে ফিরে চলেছে, কারও বা মাথায় পুঁটুলি, কারও বা কাঁধে বাঁক। আর সেই ঘণ্টার ধ্বনি যেন আকাশে নীরবে বাজছে, মুলতানে বলছে, বেলা যায়। ইতি ২৫ কার্তিক ১৩৩৫

২৫

রথীরা এসে পেঁাচেছে। বাড়ি ভরে উঠল, পুপু একটুখানি লম্বা হয়েছে; ভাবখানা আগেকার চেয়ে অল্প একটু গম্ভীর, কিন্তু তবু ওর বয়সের চেয়েও অনেকটা কমবয়সী। অসম্ভব রকমের বাঘের সম্বন্ধে ওর ঔৎসুক্য পূর্বের মতোই আছে। দাদামহাশয়ের লাঠি এবং পুপের চাবুকের ভয়ে বাঘ ব্যাকুল হয়ে লুকিয়ে আছে, এ সম্বন্ধে ওর সন্দেহ নেই। আজকাল মাঝে মাঝে আপনি দাদামহাশয়ের কাছে এসে বসে, যা মুখে আসে একটা কোনো ভূমিকা করে কথা শুরু করে দেয়। বিষয়টা যতই অসংলগ্ন হোক ওর ভাষার দৌড়ের ব্যাঘাত করে না। ওর বড়ো বড়ো চঞ্চল কালো চোখ ওর কথার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলজ্বল করতে থাকে, আমার যেন বুকের ভিতরটা ভরে ওঠে। দীর্ঘকাল আমার মন এই মাধুর্যটুকুর অপেক্ষায় ছিল। অথচ জিনিসটি খুব সহজ, হৃদয়ের মধ্যে এই শিশুর আবির্ভাব ভারি নির্মল, স্নিগ্ধ এবং অনির্বচনীয়, মনকে হরণ করে অথচ মুক্ত রাখে; নদীর প্রথম সূচনা যে ঝরনায় সেই ঝরনার মতো, সেইরকম নৃত্য, সেইরকম কলধ্বনি, সেইরকম শুভ্রচঞ্চল আলোর ঝলমলানি; গভীরতা নেই, কিন্তু প্রবলতা আছে, মগ্ন করে না, অভিষিক্ত করে, মর্ত্যের ভার ওতে যথেষ্ট নেই, তাতে করেই ও যেন আমারও জীবনের ভার মোচন করে। ইতি ২৭ কার্তিক ১৩৩৫

২৬

আমি আবার ঘর বদল করেছি। এই উদয়নের বাড়িতেই। বাড়িটার নাম উদয়ন, সে কথা জানিয়ে দেওয়া ভালো। উত্তরের দিকে দুটি ছোটো ঘর। এইরকম ছোটো ঘর আমি ভালোবাসি, তার কারণ তোমাকে বলি। ঘরটাই যদি বড়ো হয় তবে বাহিরটা থেকে দূরে পড়া যায়। বস্তুত বড়ো ঘরেই মানুষকে বেশি আবদ্ধ করে। তার মধ্যেই তার মনটা আসন ছড়িয়ে বসে, বাহিরটা বস্তু বেশি বাইরে সরে দাঁড়ায়। এই ছোটো ঘরে ঠিক আমার বাসের পক্ষে যতটুকু দরকার তার বেশি কিছুই নেই। সেখানে খাট আছে টেবিল আছে চৌকি আছে; সেই আসবাবের সঙ্গে একখণ্ড আকাশকে জড়িত ক'রে রেখে আকাশের শখ ঘরেই মেটাতে চাই নে। আকাশকে পেতে চাই তার স্বস্থানে বাইরে; পূর্ণভাবে বিশুদ্ধভাবে। দেয়ালের ভিতরে যে আকাশকে বেঁধে রাখা হয় তাকে আমি ছেড়ে দেবামাত্রই সে আমার যথার্থ কাছে এসে দাঁড়ায়। একেবারেই আমার বসবার চৌকির অনতিদূরে, আমার জানলার গা ঘেঁষে। তার কাজ হচ্ছে মনকে ছুটি দেওয়া; সে যদি নিজে যথেষ্ট ছুটি না পায়, মনকে ছুটি দিতে পারে না। এইবার আমার ঘরে-আকাশে যথার্থ মিল হয়েছে—বেশ লাগছে। চেয়ে দেখি যতদূর দেখা যায়, আবার পরক্ষণেই আমার ডেস্কের মধ্যে চোখ ফিরিয়ে আনতে দেরি হয় না। জানলার কাছে বসে বসে প্রায়ই ভাবি, দূর বলে একটা পদার্থ আছে, সে বড়ো সুন্দর। বস্তুত সুন্দরের মধ্যে একটি দূরত্ব আছে, নিকট তার স্থূল হস্ত নিয়ে তাকে যেন নাগাল পায় না। সুন্দর আমাদের সমস্ত দিগন্ত ছাড়িয়ে যায়, তাই সে আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে সংলগ্ন থাকলেও আমাদের প্রয়োজনের অতীত। আমাদের নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও এই দূর পদার্থকে যদি না রাখতে পারি তা হলে আমাদের ছুটি নেই, তা হলে সমস্ত অসুন্দর হয়ে পড়ে। যারা বিষয়কর্মে অত্যন্ত নিবিষ্ট, তাদের জীবনে নিকট আছে দূর নেই। কেননা স্বার্থ জিনিসটা মানুষের অত্যন্ত বেশি কাছের জিনিস, তার আসক্তি দেয়ালের মতো। আপন দেয়ালকে মানুষ ভালোবাসে, কেননা, দেয়াল আমারই, আর কারও নয়। সেই ভালোবাসা যখন একান্ত হয়ে ওঠে তখন মানুষ ভুলে যায় যে যা আমার অতীত তা কত আনন্দময় হতে পারে, তার প্রতি ভালোবাসার আর তুলনা হয় না।

কর্ম যখন বিষয়কর্ম না হয়, তখন সেই কর্ম মানুষকে দূরের স্বাদ দেয়, দূরের বাঁশি বাজায়। কবিতা লিখি, ছবি আঁকি, তার মধ্যে প্রয়োজনের অতীত দূরের আকাশ আছে বলেই এত ভালোবাসি, তাতে এমন মগ্ন হতে পারি। সেইসঙ্গে আজকাল আমার বিদ্যালয়ের কাজ যোগ দিয়েছে—এরকম কাজে মনের মুক্তি। এ কাজের ক্ষেত্র নিকটের ক্ষেত্র নয়। দেশকালে বহুদূর বিস্তীর্ণ; অব্যবহিত নিজের কাছে থেকে কতদূরে চলে গেছে তার ঠিকানা নেই; তাই এর জন্য ত্যাগ করা সহজ, এর জন্যে কাজ করতে ক্লান্তি নেই। সেইজন্য আজকাল আমি আমার মধ্যে যেন বহুদূরকে দেখি, আমি এখন আমার কাছে থাকি নে। আমার চোখের সামনে যেমন এই আকাশ, আমার চিন্তার মধ্যে সেই আকাশ, আমার চেষ্টা উড়ে চলেছে সেই আকাশে। এইরকমের কাজে অনেকে জড়িত হয়ে থাকে ব্যক্তিগত ক্ষমতা পাবার জন্যে; এমন উদার কাজও তাদের পক্ষে বন্ধন, মুক্তির ক্ষেত্রেও তারা interned। আমার কাজে আমি ক্ষমতা চাই নে, আমার নিজের দিকের কিছুই চাই নে, কাজের মধ্যে আমি বিরাট বাহিরকে চাই, দূরকে চাই—'আমি সুদূরের পিয়াসী'। বস্তুত বাহির থেকে দেখলে আজকাল আমার লেশমাত্র সময় নেই, কিন্তু ভিতর থেকে দেখলে প্রত্যেক মুহূর্তই আমার অবকাশ। নিজের দিকে কোনো ফল পাব এ কথা যখনই ভুলি তখনই দেখতে পাই কর্মের মতো ছুটি আর নেই। কর্মহীন শুধু ছুটিতে মুক্তি পাই নে, কেননা সে ছুটিও নিজেকে নিয়েই। ইতি ৬ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

২৭

অন্য কথা পরে হবে, গোড়াতেই বলে রাখি তুমি যে চা পাঠিয়েছিলে সেটা খুব ভালো। এতদিন যে লিখি নি সেটা আমার স্বভাবের বিশেষত্ববশত। যেমন আমার ছবি আঁকা তেমনি আমার চিঠি লেখা। একটা যা হয় কিছু মাথায় আসে সেটা লিখে ফেলি, প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় ছোটো বড়ো যে-সব খবর জেগে ওঠে তার সঙ্গে কোনো যোগ নেই। আমার ছবিও ঐরকম। যা হয় কোনো-একটা রূপ মনের মধ্যে হঠাৎ দেখতে পাই, চারু দিকের কোনো-কিছুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য বা সংলগ্নতা থাক্‌ বা না থাক্‌। আমাদের ভিতরের দিকে সর্বদা একটা ভাঙাগড়া চলাফেরা জোড়াতাড়া চলছেই; কিছু বা ভাব, কিছু বা ছবি নানা রকম চেহারা ধরছে— তারই সঙ্গে আমার কলমের কারবার। এর আগে আমার মন আকাশে কান পেতে ছিল, বাতাস থেকে সুর আসত, কথা শুনতে পেত, আজকাল সে আছে চোখ মেলে রূপের রাজ্যে, রেখার ভিড়ের মধ্যে। গাছপালার দিকে তাকাই, তাদের অত্যন্ত দেখতে পাই— স্পষ্ট বুঝতে পারি জগৎটা আকারের মহাযাত্রা। আমার কলমেও আসতে চায় সেই আকারের লীলা। আবেগ নয়, ভাব নয়, চিন্তা নয়, রূপের সমাবেশ। আশ্চর্য এই যে তাতে গভীর আনন্দ। ভারি নেশা। আজকাল রেখায় আমাকে পেয়ে বসেছে। তার হাত ছাড়াতে পারছি নে। কেবলই তার পরিচয় পাচ্ছি নতুন নতুন ভঙ্গির মধ্যে দিয়ে। তার রহস্যের অন্ত নেই। যে বিধাতা ছবি আঁকেন এতদিন পরে তাঁর মনের কথা জানতে পারছি। অসীম অব্যক্ত, রেখায় রেখায় আপন নতুন নতুন সীমা রচনা করছেন— আয়তনে সেই সীমা কিন্তু বৈচিত্র্যে সে অন্তহীন। আর কিছু নয়, সুনির্দিষ্টতাতেই যথার্থ সম্পূর্ণতা। অমিতা যখন সুমিতাকে পায় তখন সে চরিতার্থ হয়। ছবিতে যে আনন্দ, সে হচ্ছে সুপরিমিতির আনন্দ, রেখার সংযমে সুনির্দিষ্টকে সুস্পষ্ট করে দেখি— মন বলে ওঠে, নিশ্চিত দেখতে পেলুম— তা সে যাকেই দেখি-না কেন, এক টুকরো পাথর, একটা গাধা, একটা কাঁটাগাছ, একজন বুড়ি, যাই হোক। নিশ্চিত দেখতে পাই যেখানেই, সেখানেই অসীমকে স্পর্শ করি, আনন্দিত হয়ে উঠি। তাই বলে এ কথা ভুললে চলবে না যে তোমার চা খুব ভালো লেগেছে। ইতি ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

২৮

কাল গাড়ি চলতে চলতে তোমাকে একখানা চিঠি লিখেছিলুম। কিন্তু সে এমন-একটা নাড়া-খাওয়া চিঠি, ভূমিকম্পে আগাগোড়া ফাটল-ধরা বাড়ির মতো। তার অক্ষরগুলো অশোকস্তম্ভের প্রাচীন অক্ষরের মতো আকার ধরেছে, পড়িয়ে নিতে গেলে রাখাল বাঁড়ুজ্জের শরণ নিতে হয়। এইজন্যে সেই চিঠিখানার প্রত্যক্ষরীকরণে প্রবৃত্ত হতে হল। এইটুকু গেল আজকের তারিখের অন্তর্গত। নীচে বিগত কল্যকার বাণী—

আজ তোমাদের বিবাহের সাম্বৎসরিক। এদিন তোমাদের জন্মদিনের চেয়ে বড়ো দিন। সম্মিলিত জীবনের সৃষ্টির প্রথম দিন। সকল সৃষ্টির মূলে একটা দ্বৈততত্ত্ব আছে। মানুষের সংসার রচনার গোড়ায় দুই জীবনের গ্রন্থিবন্ধন চাই। উপনিষদে আছে— এক বললেন আমি বহু হব, তার থেকে বিশ্বসৃষ্টি। মানুষের জীবনে বহু বললে আমি এক হব তার থেকে মানুষের সমাজ, দুই বললে আমি এক হব তার থেকে মানুষের সংসার। তার পর থেকে সুখে দুঃখে ভালোয় মন্দয় বৈচিত্র্যের আর অন্ত নেই। আমি পূর্বে লিখেছি সৃষ্টির মূলে দ্বৈততত্ত্ব, কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ নয়— দ্বৈত এবং অদ্বৈতের সমন্বয়ই সৃষ্টি। তোমাদের মধ্যে এই দ্বৈত অদ্বৈতের সমন্বয়-রহস্য সার্থক হোক এবং জীবনের বিকাশ বৈচিত্র্যে সম্পদশালী হয়ে উঠুক।

খড়্গপুর থেকে বোম্বাই পর্যন্ত একলা গাড়িতে বসে যখন চলছিলুম তখন নানা দুঃখের ভাবনার

ভিতর দিয়েও নিজের অন্তরের চলতি স্রোতের মানুষটাকে উপলব্ধি করেছি। সেই আমার বলাকার কবি। দীর্ঘকাল এক জায়গায় বসে বসে এর কথা ভুলে যাই, চার দিকে আবরণ জেগে ওঠে, নিজের বিশুদ্ধ স্বরূপকে দেখতে পাই নে। চারি দিকে নানা লোকের নানা ইচ্ছার ভিড়ে ধুলো পড়ে, ধুলো জমে। ক্রমে তারই অবরোধের ভিতরকার সংকীর্ণ জগৎটা একান্ত হয়ে ওঠে, নিজের প্রকাশও সেইসঙ্গে সংকীর্ণ ও বিমিশ্র হয়। হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে এসে এক মুহূর্তেই বুঝতে পারি বিশ্বে আমার স্থান আছে, প্রয়োজন আছে, অতএব মানবলোকে আমার জীবন সার্থক হয়েছে। তা ছাড়া ব্যক্তিগত জীবনের দিকেও আমি যে বঞ্চিত হয়েছি তা নয়। আমার ব্যক্তিগত সত্তার প্রতি আমার নিজের শ্রদ্ধা নেই। যেখানে আমি বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত সেইখানেই আমার মূল্য। যেখানে আমি নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যে স্বতন্ত্র সেখানে আমি অকৃতার্থ— সেখানেও আমি যা-কিছু দান পেয়েছি সে আমার প্রাপ্যের অতীত। সংসার থেকে বিদায় নেবার পূর্বে সেজন্যে আমার কৃতজ্ঞতা রেখে যাব।

এই কিছুক্ষণ আগে বোম্বাই পৌঁছিয়ে অম্বালালের আতিথ্যভোগ করছি। তিনি আমাদের হোটেলে রেখেছেন। সঙ্গীরা শহরের মধ্যে কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে। কলকাতা থেকে কোনো খবর পাই নি। সুধাকান্ত আসবে কি না জানি না। দৈবক্রমে তারই হাতে আমার সমস্ত বাক্সের চাবি। হোটেলে এসে নতুন চাবি সংগ্রহের কাজে লেগেছি। ততক্ষণকার মতো ভদ্রতা বাঁচিয়ে চলবার সরঞ্জাম কিছু কিছু আছে।

জাহাজ এখনো আসে নি। আগামী কাল বেলা একটার সময় আসবে— চারটের আগে ছাড়বে না। অন্য সব ভাবনা ছেড়ে যে দিকে চলেছি সেই দিকের ভাবনা এখন থেকে ভাবতে আরম্ভ করব। ইতি ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯

২৯

মানুষ মাকড়সারই মতো। সে নিজের অন্তর থেকেই হাজার হাজার সূক্ষ্ম সূত্র বের করে জাল বাঁধে, নিজের অব্যবহিত পরিবেশের সঙ্গে নিজের বিশেষ সম্বন্ধ ধ্রুব করতে চেষ্টা করে। যখন সেই বাসা বাঁধে, গ্রন্থি এমন পাকা করে আঁটতে থাকে যে ভুলে যায় যে বারে বারে এগুলো ছিন্ন করতে হবে। এইজন্যেই যখন দূরে যাত্রা করবার সময় আসে তখন খোঁটা ওপড়ানো ও রশি টেনে ছেঁড়া এত কঠিন হয়ে ওঠে। মানুষ যখন বাড়ি তৈরি করে তখন নিজেকে মনে মনে আপন সুদূর ভাবী কালে বিস্তার করে দেয়— যে কালের মধ্যে তার নিজের স্থান নেই। তাই পয়লা নম্বরের ইঁট ও সেরা মার্কার দামী সিমেন্ট ফরমাশ করে— তার নিজের ইচ্ছের কঠিন স্তূপটাকে উত্তর কালের হাতে দিয়ে যায়, সেই কাল সেটার গ্রন্থি শিথিল করতে লেগে যায়, নয়তো নিজের চলতি ইচ্ছের সঙ্গে সেই স্থাবর ইচ্ছেটার মিল করবার জন্য নানাপ্রকার কসরত করতে থাকে। বস্তুত মানুষের বাস করা উচিত সেই তাঁবুতে যে তাঁবুর পত্তন মাটিকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে না এবং পাথরের দেয়াল উঁচিয়ে মুক্ত আকাশকে মুষ্টিঘাত করতে থাকে না। আমাদের দেহটাই যে আলগা বাসা, আমাদের যাযাবর আত্মার উপযোগী, ত্যাগ করবার সময় এলে সেটাকে কাঁধে করে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় না। এইজন্যেই আমি তোমাকে অনেকবার পরামর্শ দিয়েছি ইঁটকাঠের বাঁধন দিয়ে অচল ডাঙার উপর বাড়ি তৈরি কোরো না— স্রোতের উপর সচল বাসার ব্যবস্থা করো— যখন স্থির থাকতে চাও একটা নোঙর নামিয়ে দিলেই চলবে— আবার যখন চলতে চাও তখন নোঙরটাকে টেনে তোলা খুব বেশি কঠিন হবে না। আমাদের কালস্রোতে ভাসা জীবনের সঙ্গে বাসাগুলোর সামঞ্জস্য থাকে না বলেই টানাছেঁড়ায় পদে পদে দুঃখ পেতে হয়। আমাদের বাসাগুলোর মধ্যে দুটো তত্ত্বই থাকা চাই— স্থাবর এবং জঙ্গম। থাকবার বেলা থাকতে হবে ফেলবার বেলা ফেলতে হবে— আত্মার সঙ্গে দেহের সম্বন্ধের মতো। এ সম্বন্ধ সুন্দর কারণ এটা ধ্রুব নয়। সেইজন্য নিয়তই দেহের সঙ্গে দেহীর বোঝাপড়া করতে হয়। সাধনার অন্ত নেই; এর বেদনা আর আনন্দ সমস্তই অধ্রুবতার স্রোত থেকেই

আবর্তিত, এর সৌন্দর্যও সকরুণ, তার উপরে মৃত্যুর ছায়া। কালের এবং ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এর পরিবর্তন।

সংসারে আমাদের সব বাসাই এমনি হওয়াই ভালো। আমার ধ্যান যে রূপকে আশ্রয় করেছে পরের হাতে নিজেকে বেচবার জন্য সে যেন সেজেগুজে লোভনীয় হয়ে না বসে থাকে। নিজেকে সম্পূর্ণ করে তার পরে অন্যকালের অন্যলোকের তপস্যাকে ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ পথ ছেড়ে দিয়ে যেন একেবারেই সরে দাঁড়ায়। নইলে কালের পথ রোধ করতে চেষ্টা করলে তার দুর্গতি ঘটতে বাধ্য। টাকার জোরে আমরা আমাদের ধ্যানের রূপটাকে বেঁধে দিয়ে যেতে ইচ্ছে করি। তার মধ্যে অন্য পাঁচজনের ধ্যান যখন প্রবেশ করতে চেষ্টা করে তখন সেটা বেখাপ হতেই হবে। আমার উচিত ছিল বিশ্বভারতীর সম্পূর্ণতা সাধনের জন্যে বিশ্বভারতীর শেষ টাকা ফুঁকে দিয়ে চলে যাওয়া। তার পরে নতুন কাল নিজের সম্বল ও সাধনা নিয়ে নিজের ধ্যানমন্দির পাকা করুক। আমার সঙ্গে মেলে তো ভালো যদি না মেলে তো সেও ভালো। কিন্তু এটা যেন ধার করা জিনিস না হয়। প্রাণের জিনিসে ধার চলে না— অর্থাৎ তাতে প্রাণবান কাজ হয় না; আমগাছ নিয়ে তক্তপোষ করা চলে কিন্তু কাঁঠালব্যবসায়ী তা নিয়ে কাঁঠাল ফলাতে চেষ্টা যেন না করে। এর ভিতরকার কথাটা হচ্ছে— মা গৃধঃ।

আমি যে কথাটা বলতে বসেছিলুম সেটা এ নয়। তোমরা তাঁবুতে থাকবে কিংবা নৌকোতে থাকবে সে পরামর্শ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমার হাল খবরটা হচ্ছে এই যে কাল যখন জাহাজে চড়েছিলুম তখন মনটা তার নতুন দেহ না পেয়ে থেকে থেকে ডাঙা আঁকড়ে ধরছিল— কিন্তু তার দেহান্তরপ্রাপ্তি ঘটেছে। তবুও নতুন দেহ সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে কিছুদিন লাগে। কিন্তু খুব সম্ভব কাল থেকেই লেকচার লিখতে বসতে পারব। সেটাকে বলা যেতে পারে সম্পূর্ণ নতুন ঘরকন্না পাতানো। যে পার ছেড়ে এলুম সে পারের সঙ্গে এর দাবিদাওয়ার সম্পর্ক নেই। এর ভাষাও স্বতন্ত্র। বাজে কথা গেল। এবার সংবাদ শুনতে চাও। আজ সাতটা পর্যন্ত অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলুম। ক্লান্তি যেন অজগর সাপের মতো আমার বুক পিঠ জড়িয়ে ধরে চাপ দিচ্ছিল। তার পর থেকে নিজেকে বেশ ভদ্রলোকেরই মতো বোধ হচ্ছে। যুগল ক্যাবিনের অধীশ্বর হয়ে খুশি আছি। পূর্ব ক্যাবিনে দিন কাটে পশ্চিম ক্যাবিনে রাত্রি অর্থাৎ আমার আকাশের মিতার পন্থা অবলম্বন করেছি— পূর্বদিগন্তে ওঠা পশ্চিমদিগন্তে পড়া। আমার সহচরত্রয় ভালোই আছে— ত্রিবেণী সংগমের মতো— উত্তর প্রত্যুত্তর হাস্য প্রতিহাস্যের কলধ্বনি তুলে তাদের দিন বয়ে চলেছে। আমি আছি ঘরে, তারা আছে বাইরে। অপূর্ব মনে করেছে এখানে আমার যা-কিছু সুযোগ সুবিধা সমস্তই তার নিজের ব্যবস্থার গুণে। আমি তার প্রতিবাদ করি নে— প্রতিবাদের অভ্যাসটা খারাপ; স্থানবিশেষে সংসারে ছোটো ছোটো অসত্যকে যারা মেনে নিতে পারে না তারা অশান্তি ঘটায়। এইজন্যেই ভগবান মনু বলেছেন— সে কথা যাক। ইতি ২ মার্চ ১৯২৯

৩০

জাহাজ জিনিসটাই আগাগোড়া চলে, কিন্তু আর সব চলাকেই সে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। এই বাসাটুকুর বেড়ার মধ্যে সময়ের গতি অত্যন্ত মন্দবেগে। সময়ের এই মন্দাক্রান্তা ছন্দে যে-সব ঘটনা অত্যন্ত প্রধান হয়ে প্রকাশ পায় অন্যত্র ছন্দের বেগে সেগুলো চোখেই পড়তে চায় না। এই মুহূর্তেই ডাঙার মানুষ যে-সব খেলা খেলছে তা প্রচণ্ড খেলা— জীবনমরণ নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি। জাহাজের ছাদে দুই পক্ষের খেলোয়াড় বিড়ে নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। তাতেই উৎসাহ উত্তেজনার অন্ত নেই। এই-সব দেখলে এ কথা স্পষ্ট করেই বোঝা যায় যে, স্থানান্তরকে লোকান্তর বলে না। বিশেষ বিশেষ বেড়া বেঁধে সময়ের গতির মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে আমাদের জগতের বিশেষত্ব ঘটাই। তার মানেই হচ্ছে ছন্দ বদল হলেই রূপের বদল হয়। আমি এবং আমার প্রতিবেশী ইংরেজ এক জায়গায় বাস করি কিন্তু এক জগতে নয়। তার মানে তার জীবনে কালের

ছন্দ আমার থেকে স্বতন্ত্র। সেইজন্যেই তার খেলার সঙ্গে আমার খেলার তাল মেলে না। আমি ঠেলাগাড়িতে চলছি, সে মোটরে চলছে— আমাদের উভয়ের সময়ের পরিমাণ এক, লয় আলাদা।" বস্তুত এক হলেও ঝাঁপতালে এবং ঢিমেতেতালায় তার মূল্য সম্পূর্ণ বদলে দেয়। মানুষে মানুষে সুরের ঐক্য থাকতেও পারে; সব চেয়ে বড়ো অনৈক্য তালের। তালের দ্বারা জীবনের ঘটনাগুলোকে ভাগ করে, সাজায়, বিশেষ বিশেষ জায়গায় ঝোঁক দেয়। একেই বলে সৃষ্টি। জগৎ জুড়ে এই ব্যাপার চলছে। মহাকালের মৃদঙ্গ এক এক তাণ্ডব ক্ষেত্রে এক এক তালে বাজছে, সেই নৃত্যের রূপেই রূপের অসংখ্য বৈচিত্র্য। আমার জীবনের নটরাজ আমার মধ্যে যে নাচ তুলেছেন, সে আর কোথাও নেই— কোনো জীবনচরিতের পটে এর সম্পূর্ণ ছবি উঠবে কী করে। কোনো কালেই উঠবে না। আমাদের আর্টিস্ট যা গড়েন তার নব নব সংস্করণ ঘটতে দেন না, সাজানো টাইপ ভেঙে ফেলেন— অতএব রবীন্দ্রনাথ নিরবধিকালের চয়নিকায় একবার ধরা দেয়, তার পর তাকে ফেলে দেওয়া হয়— অনন্তকালে আর রবীন্দ্রনাথ নেই। হয়তো পরকালে আর-একটা ধারা চলতে পারে, কিন্তু তার এ নাম নয় এ রূপ নয়, এ পরিবেশ নয়, এ সমাবেশ নয়; সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পালা এইখানে চিরকালের মতো চুকিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। আর যাই হোক, বিশ্বসভায় কারও মেমোরিয়াল মিটিং হয় না। হয় কেবল আগমনী এবং বিসর্জন। আজ রাত্রে পিনাঙ। ইতি ৭ মার্চ ১৯২৯

৩১

চলেছি। নতুন নতুন মেয়ে-পুরুষের সঙ্গে আলাপ চলেছে। আলাপ জমতে না জমতে আবার ঘাটে ঘাটে মানুষ বদল হচ্ছে। অর্থাৎ দিনের পর দিন যাদের নিয়ে সময় কাটছে তারা যেন এমন জীব যাদের ভিতরটা নেই কেবল উপরটা আছে— যা ধাঁ করে চোখে পড়ে, মনের উপর ছায়া ফেলে সেইটুকু মাত্র। কেদারার পিঠে তাদের নামের ফলক ঝুলছে, আর তারা কেদারার উপর পা ছড়িয়ে বসে আছে— তারা আর কোথাও নেই কেবল ঐটুকুর উপরে। আমার সঙ্গে কেবল তিন জন মাত্র মানুষ আছে যারা জায়গা ওদের চেয়ে বেশি জোড়ে না, কিন্তু যারা অনেকখানি— যাদের সত্যতা দৃশ্য-অদৃশ্য বহু সাক্ষ্যের দ্বারা আমার মনের মধ্যে চার দিক থেকে প্রমাণীকৃত— এইজন্যে যাদের কাছ থেকে অনেকখানি পাই এবং যারা সরে গেলে অনেকখানি হারাই। যারা তাসের উপরকার ছবির মতো একতলবর্তী নয়, যাদের মধ্যে পূর্ণায়তন জগতের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ণায়তন জগতেই বাস্তবতার স্বাদ পাওয়া আমাদের অভ্যাস, তার চেয়ে কম পড়লে দুধের বদলে এক বাটি ফেনা খাবার চেষ্টা করার মতো হয়। যতটা চুমুক দিলে আমরা জানার পুরো স্বাদ পাই, এই জাহাজভরা যাত্রীদের মধ্যে তা পাবার জো নেই।— এই কারণে আমাদের পেট ভরে জানার অভ্যাস পীড়িত হচ্ছে। কিছুদিনের উপবাসে ক্ষতি হয় না কিন্তু বেশিদিন এমন অত্যল্প জানার খোরাকে চলে না। আত্মীয়ের মধ্যে আমাদের জানার ভরপুর খোরাক মেলে ব'লেই তাতে আমরা এত আরাম পাই। কেন এই কথাটা এমন জোরে মনে এল সেই কথাটা খুলে বলি। আজ বিকেলে সিঙ্গাপুরের ঘাটে জাহাজ থামতেই সরযূ জাহাজে এসে উপস্থিত। আমি তাঁকে গতবারে অল্প কয়দিনমাত্র দেখেছিলুম, সুতরাং তাঁকে সুপরিচিত বললে বেশি বলা হবে। কিন্তু তাঁকে দেখে মন খুশি হল এইজন্যে যে তিনি বাঙালি মেয়ে, অর্থাৎ এক মুহূর্তে অনেকখানি জানা গেল— তাঁর সরযূ নাম বিয়াট্রীস বা এলিয়োনোরের মতো পরিচয়সূচক নয়, আমার পক্ষে তাতে তার চেয়ে অনেক বেশি পদার্থ আছে। তার পরে তাঁর শাড়ি, তাঁর বালা, তাঁর কপালের মাঝখানের কুঙ্কুমের বিন্দু, কেবলমাত্র দৃশ্যগত নয়; তার পিছনে অনেকখানি অদৃশ্য সামগ্রী আছে, এক নিমিষেই সেই-সমস্ত এসে চোখ এবং মনকে ভরে ফেলে। ভালো করে ভেবে দেখো এই-সমস্ত চিহ্ন বচনীয় এবং অনির্বচনীয় কত বিচিত্র পদার্থকে সংক্ষেপে একই কালে বহন করে, তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে গেলে আঠারো পর্ব বই

ভরতি হয়ে যায়। এ জাহাজে অনেক মেয়ে আছে তাদের মধ্যে এই বাঙালি মেয়েকে দেখে মন এত খুশি হল— তার কারণ আর কিছু নয়, জানতেই মনের আনন্দ, মন যখন বলে 'জানলুম' তখন সে খুশি হয়, আমরা যাকে বলি মনকেমন-করা তার মানে হচ্ছে চারি দিকের জানা পদার্থটা যথেষ্ট পূর্ণায়তন নয়। ইতি ১০ মার্চ ১৯২৯

৩২

সেদিন হঠাৎ এক সময়ে, জানি নে কেন, ছেলেবেলাকার একটা ছবি খুব স্পষ্ট করে আমার মনে জেগে উঠল। শীতকালের সকাল বোধ হয় সাড়ে পাঁচটা। অল্প অল্প অন্ধকার আছে। চির-অভ্যাস-মত ভোরে উঠে বাইরে এসেছি। গায়ে খুব অল্প কাপড়, কেবল একখানা সুতোর জামা এবং ইজের। এইরকম খুব গরিবের মতোই আমাদের বাল্যকাল কেটেছে। ভিতরে ভিতরে শীত করছিল— তাই একটা কোণের ঘর, যাকে আমরা তোষাখানা বলতুম, যেখানে চাকররা থাকত— সেইখানে গেলুম। আধা অন্ধকারে জ্যোতিদার চাকর চিন্তে লোহার আঙটায় কাঠের কয়লা জ্বালিয়ে তার উপরে ঝাঁঝরি রেখে জ্যোদার জন্যে রুটি তোস করছে। সেই রুটির উপব মাখন গলার লোভনীয় গন্ধে ঘর ভরা। তার সঙ্গে ছিল চিন্তের গুন গুন রবে মধুকানের গান, আর সেই কাঠের আগুন থেকে বড়ো আরামের অল্প একটুখানি তাত। আমার বয়স বোধ হয় তখন নয় হবে। ছিলুম স্রোতের শেওলার মতো— সংসারপ্রবাহের উপরতলে হালকাভাবে ভেসে বেড়াতুম— কোথাও শিকড় পৌঁছয় নি— যেন কারও ছিলুম না, সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত চাকরদের হাতেই থাকতে হত, কারও কাছে কিছুমাত্র আদর পাবার আশা ছিল না। জ্যোদা তখন বিবাহিত, তাঁর জন্যে ভাববার লোক ছিল, তাঁর জন্যে ভোরবেলা থেকেই রুটি-তোস আরম্ভ। আমি ছিলুম সংসার-পদ্মার বালুচরের দিকে, অনাদরের কূলে— সেখানে ফুল ছিল না, ফল ছিল না, ফসল ছিল না; কেবল একলা বসে ভাববার মতো আকাশ ছিল। আর জ্যোদা পদ্মার যে কূলে ছিলেন, সেই কূল ছিল শ্যামল— সেখানকার দূর থেকে কিছু গন্ধ আসত, কিছু গান আসত, সচল জীবনের ছবি একটু-আধটু চোখে পড়ত। বুঝতে পারতুম ঐখানেই জীবনযাত্রা সত্য। কিন্তু পার হয়ে যাবার খেয়া ছিল না, তাই শূন্যতার মাঝখানে বসে কেবলই চেয়ে থাকতুম আকাশের দিকে। ছেলেবেলায় বাস্তব জগৎ থেকে দূরে ছিলুম ব'লেই তখন থেকে চিরদিন 'আমি সুদূরের পিয়াসী'। অকারণে ঐ ছবিটা অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়ে মনে জেগে উঠল। তার পরে ভেবে দেখলুম, সেদিন আমিই ছিলুম ছায়ার মতো, আমার সংসারে বস্তু ছিল না, ঘরে ছিল না আত্মীয়তা, বাইরে ছিল না বন্ধুত্ব। জ্যোতিদাদা ছিলেন নিবিড়ভাবে সত্য, তাঁর সংসার ছিল নিবিড়ভাবে তাঁর নিজের। সেদিন মনে করা অসম্ভব ছিল এই যেটুকু দেখছি, যা ঘটছে এর কিছু ব্যত্যয় হতে পারে। পূর্ণতার চেহারা দেখা যেত, কিছুতেই ভাবা যেতে পারত না তার কোনো কালে অন্ত আছে। সেদিনকার সেই রুটিতোস-সুগন্ধি সকালবেলা যে পূর্ণজীবনের রূপক ছিল সেদিন আমার সমস্ত জীবনে তার সমতুল্য কিছুই ছিল না। কিন্তু কোথায় সেই সকাল, সেই গুন গুন গান করা চিন্তে চাকর— আর জ্যোদা, তাঁর যা-কিছু সমস্ত নিয়ে কোথায়। আজ সেই শীতের সকালের অনাদৃত রবি জাহাজে চড়ে চলছে বৃহৎ জগতে। সেদিনের সব চেয়ে যা সত্য তার কোনো চিহ্ন নেই, আর সব চেয়ে যা ছায়া তা আজ অদ্ভুত রকমে প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে। আবার মনে হচ্ছে আজকের দিনের সমস্ত-কিছু যেন 'এইভাবেই বরাবর চলবে, পরিবর্তনের কথা মনে করা যায় কিন্তু মস্ত ফাঁকগুলোর কথা কল্পনায় আনতে পারি নে; তবু চলতে চলতে এমন-একটা বিশেষ দিন আসে রাত্রি আসে, যখন একটানা রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ মস্ত একটা গহ্বর দেখা দেয়— মনে করা যায় না এমন ফাঁক জীবনে সইবে কী করে। তার পরে তার উপর দিয়েও সময়ের রথ অনায়াসে পার হয়ে যায়, তার পরে সেই

রথের চিহ্নটাও যায় মুছে। অত্যন্ত পুরোনো কথা, কিন্তু অত্যন্ত অদ্ভুত কথা; একটা ধারা চলেইছে, যেটা চিরকালই আছে অথচ পদে পদেই নেই—'সমস্ত' বলে মস্ত একটা-কিছু আছে, অথচ তার প্রত্যেক অংশটাই থাকছে না—এক দিকে সে মায়া, তবু আর-এক দিকে সে সত্য। ইতি ১৪ মার্চ ১৯২৯

৩৩

কাল জাপানি বন্দরে এসেছি—নাম মোজি। আগামী কাল পৌঁছব কোবে। পাখি বাসা বাঁধে খড়কুটো দিয়ে, সে বাসা ফেলে যেতে তাদের দেরি হয় না; আমরা বাসা বাঁধি প্রধানত মনের জিনিস দিয়ে, কাজে-কর্মে লেখা-পড়ায় ভাবনা-চিন্তায় চার দিকে একটা অদৃশ্য আশ্রয় তৈরি হতে থাকে। হাওয়াগাড়ির গদি যেমন শরীরের মাপে টোল খেয়ে খোঁদলগুলি গড়ে তোলে, মন তেমনি, নড়তে-চড়তে তার হাওয়া-আসনে নানা আকারের খোঁদল তৈরি করে, তার মধ্যে যখন সে বসে তখন সে বসে যায়—তার পরে যখন সেটাকে ছাড়তে হয় তখন আর ভালো লাগে না। এ জাহাজে আমার তেমনি ঘটেছে। এই ক্যাবিনে এক পাশে একটি লেখবার ডেস্ক, আর-এক পাশে বিছানা; তা ছাড়া আয়নাওয়ালা দেরাজ আর কাপড় ঝোলাবার আলমারি, এর সংলগ্ন একটি নাবার ঘর এবং সেটা পেরিয়ে গিয়ে আর-একটা ক্যাবিন, সেখানে আমার বাক্স তোরঙ্গ প্রভৃতি। এরই মধ্যে মন নিজের আসবাব গুছিয়ে নিয়েছে। অল্প জায়গা বলেই আশ্রয়টি বেশ নিবিড়, প্রয়োজনের জিনিস সমস্ত হাতের কাছে। এখান থেকে নেমে দুদিনের জন্যে সাংহাইয়ে সু-র বাড়িতে ছিলুম—ভালো লাগে নি; অত্যন্ত ক্লান্ত করেছিল; তার প্রধান কারণ নূতন জায়গায় মন তার গায়ের মাপ পায় নি, চার দিকে এখানে ঠেকে ওখানে ঠেকে আর তার উপরে দিনরাত আদর অভ্যর্থনা গোলমাল।

প্রতিদিনের ভাবনা-কল্পনার মধ্যেই নতুনত্ব আছে, বাইরের নতুনত্ব তাকে বাধা দিতে থাকে। জীবনে আমরা যে-কোনো পদার্থকে গভীর করে পেয়েছি, অর্থাৎ অনেকদিন অনেক করে জেনেছি, সত্যিকার নতুন তারই মধ্যে—তাকে ছেড়ে নতুনকে খুঁজতে হয় না। অন্য সব মূল্যবান জিনিসেরই মতো নতুনকে সাধনা করে লাভ করতে হয়। অর্থাৎ পুরোনো করে তবে তাকে পাওয়া যায়। হঠাৎ যাকে পেয়েছি বলে মনে হয়, সে ফাঁকি, দুদিন বাদেই তার যথার্থ জীর্ণতা ধরা পড়ে। আজকের দিনে এই সস্তা নতুনত্বের মৃগয়ায় মানুষ মেতেছে, সেইজন্যেই মুহূর্তে মুহূর্তে তার বদল চাই। তার এই বদলের নেশায় বিজ্ঞান তার সহায়তা করছে, সে সময় পাচ্ছে না গভীরের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে চিরনূতনের পরিচয় পেতে। এইজন্যেই চার দিকে একটা পুঁথিপড়া ইতরতা ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। ধ্রুবসত্যকে সত্যরূপে পাবার সময় নেই, সময় নেই। সাহিত্যে যে অশ্লীলতা দেখা দিয়েছে তার কারণ এই—অশ্লীলতা অতি সহজেই প্রবলবেগে মনকে আঘাত করে, যাদের সময় নেই ও শক্তি কম তাদের পক্ষে অতি দ্রুতবেগে আমোদ পাবার এই অতি সস্তা উপায়। তীব্র উত্তেজনা চাই সেই মনেরই পক্ষে যে মন নির্জীব, যে মনের জীবনীশক্তি কমে গেছে অগভীর মাটিতে—তার শিকড়গুলি উপবাসী। ইতি ৯ চৈত্র ১৩৩৫

আশ্চর্য হবে যখন এই চিঠি লিখছিলুম অত্যন্ত ঘুম পাচ্ছিল, সেই ঘোর ঠেলতে ঠেলতে লেখা এগোচ্ছিল। এখনও ঘোর ছাড়ে নি। অথচ এখন সকালবেলা, এগারোটা বেজেছে—যাই স্নান করতে।

৩৪

কাল রাত্তিরে টোকিয়োতে এসে এক বিখ্যাত হোটেলে আশ্রয় নিয়েছি। বিখ্যাত হোটেলগুলি যে অর্থসম্বল কিংবা আরামের পক্ষে উপযোগী তা নয়, কিন্তু যেহেতু দুর্ভাগ্যক্রমে আমিও বিখ্যাত সেইজন্যে আমাকে আমার বিখ্যাত সমান মাপের উপদ্রব সহ্য করতে হয়। ছোটো জায়গায় লুকোনো সহজ, কিন্তু জগতে আমার লুকোবার পথ বন্ধ। একদিন জনতার হাত থেকে আত্মরক্ষা আমার

অত্যাবশ্যক হবে এ কথা একদা কল্পনা করতেও পারতুম না, সেই যেদিন ছিলুম আমার পদ্মার চরে বোটের মধ্যে একাকী। তাই লোক ঠেকিয়ে রাখবার অভ্যাস আমার হয় নি, যে খুশি এসে আমাকে টানা-হেঁচড়া করতে পারে। আজ সকালে যখন ক্লান্ত হয়ে বসেছিলুম একজন আমাকে নানা কথায় ভুলিয়ে মোটর চড়িয়ে গলির মধ্যে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। শেষকালে দেখি তাদের সঙ্গে ফোটোগ্রাফ তুলিয়ে নেবার জন্য এই উৎপাত।

আমরা প্রথম জন্মেছিলুম সহজ জীবনযাত্রার মধ্যে, আপন ঘরে, আপন মানুষের আদরযত্নের পরিবেষ্টনে। তখন ছিলুম সম্পূর্ণ বেসরকারি। তখন আড়াল বলে একটা অত্যন্ত আপন জিনিস ছিল। ক্রমে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের সংসারের সম্পর্ক বাড়তে লাগল। কিন্তু যতই বাড়ুক তার একটা সহজ পরিমাণ ছিল। তাই বেসরকারি আমি এবং সরকারি আমির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ছিল। অবশেষে দৈবদুর্যোগে অসাধারণ বলে খ্যাতি বাড়তে লাগল, আমি যতটা বেসরকারি তার চেয়ে অনেক বেশি সরকারি হয়ে উঠলুম— যে আড়ালটুকুর অধিকার আমার ছিল তাতে এখন আর কুলোয় না। অত্যন্ত পাকা ফলের মতো আমার উপরকার শক্ত খোসাটুকু সাতখানা হয়ে ফেটে গেছে, এখন যে-কোনো আগন্তুক পাখি যে মতলবেই হোক এসে ঠোকর দিতে পারে, কোনো বাধা নেই। ক্ষতি ছিল না যদি এতে তাদের সত্যিকার উপকার হত। আমার উপর দিয়ে তারা নিজেদের লোভ মিটিয়ে নিতে চায়, নিক; কিন্তু এতে আমার যে গুরুতর ক্ষতি হয় ভেবে দেখতে গেলে সে ক্ষতি তাদেরও। ছোটো ছোটো দাবির আঘাতে চিত্ত বিপর্যস্ত হয়, নিজের যথেষ্ট কাজ করবার শক্তির অপব্যয় হতে থাকে। তা ছাড়া যখন বুঝতে পারি আমি অন্যের স্বার্থের বাহন হয়ে পড়েছি এবং সে স্বার্থও তুচ্ছ তখন বড়ো ধিক্‌কার লাগে, বড়ো ইচ্ছে করে আপনার সেই সাবেক খ্যাতিহীন ছোটো বাসার মধ্যে ফিরে যাই, এবং যারা কেবলমাত্র আমার অস্তিত্বের মূল্য দিতে প্রস্তুত আছে তাদের কাছেই আশ্রয় নিই। অথচ মাঝে মাঝে এমন লোকের সঙ্গে দেখা হয় যারা আমার অপরিচিত, অথচ যারা দূরের থেকে আমাকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছে। তারা আমার কাছে কিছুই চায় না— তারা খ্যাতির দ্বারা আমাকে বিচার করে না, তারা নিজের আনন্দের দ্বারা আমাকে স্বীকার করে। এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কিছু হতে পারে না। এবারে কোবে শহরে যখন আমার স্বদেশীয়দের অবাস্তব সস্তা সম্মাননার দ্বারা পীড়িত হচ্ছিলুম তখন ওখানকার ইংরেজ কন্সালের স্ত্রী আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে অনেক দুঃখ দূর হল। অনুভব করলুম কোনো কোনো লোকের পক্ষে আমার কর্ম গভীরভাবে সফল হয়েছে— তাঁরা আমার অগোচরেই আমার কাছ থেকে যা পেয়েছেন তার চেয়ে আর কিছু চান না।

আজ টোকিয়োতে আমার তিনটে নিমন্ত্রণ আছে— বেলা একটা থেকে রাত্রে ডিনার পর্যন্ত গড়াবে। তার পর মোটর করে য়োকোহামায় যাব— তার পরে কাল ভারতীয়দের নিমন্ত্রণে মধ্যাহ্ন-ভোজন সেরে বেলা তিনটের সময় কানাডায় পাড়ি দেব। তার পরে জানি নে। ২৭ মার্চ ১৯২৯

৩৫

ঘোর বর্ষা নেমেছে। এমনতরো বাদলে আমার মনের শিখরদেশে প্রায়ই সুরের মেঘ ঘনিয়ে আসে আর হৃদয়ের মধ্যে পেখম-মেলা ময়ূরের নাচও শুরু হয়। কিন্তু এবারে কী হল, এখনো আষাঢ়ের আহ্বানে আমার অন্তর সাড়া দিল না। হয়তো ছবি আঁকতে যদি বসি তা হলে কলম সরবে কিন্তু কাব্যভাবনার স্পর্শে তাকে চঞ্চল করতে পারছে না। এসে অবধিই কেমন আমার মনে হচ্ছে দেশের হাওয়ায় আমার নিমন্ত্রণ বন্ধ হয়ে গেছে, এখানে দরজা খোলা হল না। বুঝি সেইজন্যেই কী ভাবা, কী লেখা, কী কাজ করা কিছুই সহজ হয়ে উঠছে না; সামান্য কর্তব্যগুলোও মনকে ভারাক্রান্ত করছে। কিছুকাল পূর্বে এমন একদিন ছিল যখন আমার মনের নিভৃত দেশে একটি পূজার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, তখন সংসারের সমস্ত বিক্ষোভ থেকে সেইখানে প্রতিদিন

যাতায়াত করবার একটি যেন পায়ে-চলা পথ তৈরি হয়ে আমাকে আমার কাছ থেকে দূরে আনতে পেরেছে। তার পরে নানা কঠিন চিন্তা, নানা জটিল কাজ, নানা চিত্তবিক্ষেপ আমাকে কোথায় সরিয়ে নিয়ে গেছে—সে পথের নাগাল পাচ্ছি নে। চিত্তের মধ্যে যেখানে গভীরতা সেখানে প্রতিষ্ঠালাভ করলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাড়ায় বিচলিত করতে পারে না। সেখানে 'আমি'-নামক উৎপাতটা সাহস করে ঢুকতে চায় না। সেইখানকার বেদীর নীচে অচঞ্চল আসন পেতে বসবার জন্যে আজকাল আমাকে কেবলই তাগিদ করছে। এই বেদনাও ভালো কিন্তু উদাসীনতা ভালো নয়। মনে করছি, দেশের হাওয়ায় যে-সব ছোটো কথার ঝাঁক গুঞ্জন করে বেড়ায় তাদের কাছ থেকে মনটাকে অবরুদ্ধ করব—চিরন্তনের নির্মল নিঃশব্দতার মাঝখানে বসে নিজের অন্তরতম সত্য বাণীকে নিজের কাছে উদ্ধার করে আনব। এই জায়গাতে সঙ্গ পাবার আশা নেই, একলা মনের প্রদীপ জ্বালতে হবে। একদা সঙ্গের অভাবটাকে অনুভব করি নি—আপনার মধ্যেই আপনার নিরন্তর একটা পূর্ণ দরবার জমেছিল। তার পরে কখন বুঝি শরীরের দুর্বলতার সঙ্গে আমার চিত্তলোকের আলোক কমে এল—তখনি আপনার মধ্যে সঙ্গলাভ করবার শক্তি ম্লান হয়ে এসেছে, তখন থেকেই বাইরের সঙ্গকে আগ্রহের সঙ্গে ইচ্ছা করেছি। কিন্তু আমার সত্যকার স্বভাবটা বোধ হয় নৈঃসঙ্গিক—সঙ্গের প্রভাব তাকে বল দেয় না, তাকে অলস করে। এই আলস্যের মন্থরতায় নিজের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ সে-সমস্ত আচ্ছন্ন হয়ে যায়—আর তার থেকেই আসে ক্লান্তি। এ পর্যন্ত আমি যা-কিছু শক্তি পেয়েছি, যা-কিছু শিক্ষা পেয়েছি, সমস্তই একলা নিজের মধ্যে। আমি চিরদিনের ইস্কুল-পালানো ছেলে—জনহীন আকাশের ডাক শুনে যখনি গড়িমসি করেছি, যখনি সামনে না এগিয়ে পিছনে তাকিয়েছি, তখনি বিপদ ঘটেছে। সেই ডাক আজ কানে এসে পৌঁচেছে—প্রদোষের আবছায়ায় পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি। ইতি ২৮ আষাঢ় ১৩৩৬

৩৬

প্ল্যাটিনমের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে—আকাশের দিগন্ত ঘিরে মেঘ জমেছে, তার মাঝখানের ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর পড়েছে পরিপুষ্ট শ্যামল পৃথিবীর উপরে। আজ আর বৃষ্টি নেই—হুহু করে হাওয়া দিচ্ছে, সামনে পেঁপে গাছের পাতা কাঁপছে, আরও দূরে উত্তরের মাঠে আমার পঞ্চবটীর নিম-গাছের ডালে ডালে চলছে আন্দোলন, আর তার পিছনে একা দাঁড়িয়ে আছে তালগাছ, তার মাথায় যেন বিস্তর বকুনি। বেলা এখন আড়াইটে। আমার আবার দৃশ্য পরিবর্তন হয়েছে—উদয়নের দোতলায় বসবার ঘরের পশ্চিম পাশে যে-নাবার ঘর ছিল, প্রোমোশন হয়ে সেটাই হয়েছে বসবার ঘর—তার পাশের ছাদটুকুতে নাবার ঘরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। মস্ত একটা টেবিল পেতে বসেছি—পিছনে দক্ষিণ দিকের আকাশ, সামনে উত্তর দিকের। আষাঢ় মাসের স্নাননির্মল স্নিগ্ধ মধ্যাহ্নটি এই দুদিকের খোলা জানলা দিয়ে আমার এই নির্জন ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। মনে মনে ভাবছি কেন এমন দিনে বহু আগেকার দিনের একটা আভাস চিত্তআকাশের দিক্‌প্রান্তে অদৃশ্য কোন্ রাখালের মতো মুলতানে বাঁশি বাজায়। অর্থাৎ এরকম দিন যেন বর্তমানের কোনো দায়কে স্বীকার করে না, এর কাছে জরুরি কিছুই নেই—যে-সব দিন একেবারে চলে গেছে এ তারই মতো বর্তমান ভবিষ্যতের বাঁধনছেঁড়া উদাসী—কারও কাছে কোনো জবাবদিহির ধার ধারে না। কিন্তু এই অতীত বস্তুত কোনোদিনই ছিল না, যা ছিল তা বর্তমান—তার প্রত্যেক মুহূর্ত বোঝাপিঠে সার বেঁধে চলেছিল তার হিসেব দিতে হয়েছে। 'গত কাল' ব'লে যে অতীত সে আজই আছে, গতকাল সে ছিলই না। স্বপ্নরূপিণী সে, বর্তমানের বাঁ পাশে বসে আছে—মধুর হয়ে উঠতে তার কোনো খরচ নেই। সেইজন্যেই বর্তমান কালের মধ্যে যখন কোনো একটা দিনের বিশুদ্ধ সুন্দর চেহারা দেখি তখন বলি সে অতীতকালের সাজ পরে এসেছে—প্রেয়সীকে বলি তুমি যেন আমার জন্মান্তরের জানা, অর্থাৎ এমন কালের জানা যে কাল সকল কালের অতীত—যে কালে স্বর্গ, যে কালে সত্য যুগ—

যে কাল চির অনায়ত্ত। আজকের এই-যে সোনায় পান্নায় ছায়ায় আলোয় বিজড়িত সুগভীর অবকাশের মধুতে ভরা মধ্যাহ্নটি সুদূরবিস্তৃত সবুজ মাঠের উপর বিহ্বল হয়ে পড়ে আছে এর অনুভূতির মধ্যে একটা বেদনা এই আছে-যে একে পাওয়া যায় না, ছোঁয়া যায় না, সংগ্রহ করা যায় না— অর্থাৎ এ আছে তবুও নেই। সেইজন্যেই একে দূর অতীতের ভূমিকার মধ্যে দেখি। সেই অতীতের যা মাধুরী তা বিশুদ্ধ; সেই অতীতে যা হারিয়েছে বলে নিশ্বাস ফেলি তার সঙ্গে এমন আরও অনেক হারিয়েছে যা সুন্দর নয় সুখকর নয়, কিন্তু সেগুলি অতীত নয়, তা বিনষ্ট। যা সুন্দর, যা সুখের তাই চির অতীত। তা কোনোদিন মরে না, অথচ তার মধ্যে অস্তিত্বের কোনো ভার নেই। আজকের এই দিনটা সেইরকমের— এ আছে তবু নেই। এই মধ্যাহ্নের উপর বিশ্বভারতীর কোনো দাবি নেই— এ গৌড়সারঙের আলাপ, যখন সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন হিসাবের খাতায় কোনো অঙ্ক রেখে যাবে না।

দূর হোক গে! তবু বিশ্বভারতী আছে, কাজের কথাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। অতএব একটা কথা বিশেষ করে প্রশান্তকে বোলো— শনিবারে যখন আসবে আমার সব গদ্য লেখার ঝুড়িটা যেন নিয়ে আসে। আমার সমস্ত লেখা সম্বন্ধে শেষ কর্তব্য সেরে দিয়ে যাবার অপরাহ্নকাল এসেছে— বিলম্ব করলে আর আলো দেখতে পাওয়া যাবে না। ইতি ৩২ আষাঢ় ১৩৩৬

তোমার ছশো টাকার ছবিতে আমার বিনামূল্যের কবিতা লিখে দেব।

৩৭

আমার চিঠিগুলো চিঠি নয় এই তর্ক উঠেছে। আমি নিজে অনেকবার স্বীকার করেছি যে আমি চিঠি লিখতে পারি নে। এটা গর্ব করবার কথা নয়। আমরা যে জগতে বাস করি সেখানে কেবল-যে চিন্তা করবার কিংবা কল্পনা করবার বিষয় আছে তা নয়। সেখানকার অনেকটা অংশই ঘটনার ধারা— অন্তত যেটা আমাদের চোখে পড়ে সেটা একটা ব্যাপার; সে কেবল হচ্ছে চলছে আসছে যাচ্ছে; অস্তিত্বের সদর রাস্তা দিয়ে চলাচল, তার ভিতরকার সব আসল খবর আমাদের নজরে পড়ে না। মাঝে মাঝে যদি বা পড়ে, তাদের ধরে রাখি নে, পথ ছেড়ে দিই; সমস্ত ধরতে গেলে মনের বোঝা অসহ্য ভারী হয়ে উঠত। আমাদের ঘরের ভিতর দিকটাতে সংসারের সংকীর্ণ দেয়াল-ঘেরা সীমানার মধ্যে আমাদের অনেক ভাবনার জিনিস, অনেক চেষ্টার বিষয় আছে, তার ভার আমাদের বহন করতে হয়। কিন্তু যখন জানলায় এসে বসি তখন রাস্তায় দেখি চলাচলের চেহারা। ভালো করে যদি খোঁজ নিতে পারতুম তা হলে দেখতুম তার কোনো অংশই হালকা নয়— ট্রাম হুহু করে চলে গেল কিন্তু তার পিছনে মস্ত একটা ট্রাম কোম্পানি, সমুদ্রের এপারে ওপারে তার হিসেব-চালাচালি। মানুষটা ছাতা বগলে নিয়ে চলেছে, মোটরগাড়ি তার সর্বাঙ্গে কাদা ছিটিয়ে চলে গেল, তার সব কথাটা যদি চোখে পড়ত তা হলে দেখতুম বৃহৎ কাণ্ড— সুখে দুঃখে বিজড়িত একটা বিপুল ইতিহাস। কিন্তু সমস্তই আমাদের চোখে হালকা হয়ে ঘটনাপ্রবাহ আকারে দেখা দিচ্ছে।

অনেক মানুষ আছে যারা এই জানলার ধারে বসে যা দেখে তাতে একরকমের আনন্দ পায়। যারা ভালো চিঠি লেখে তারা মনের জানলার ধারে বসে লেখে, আলাপ করে যায়— তার কোনো ভার নেই, বেগও নেই, স্রোত আছে। এই-সব চলতি ঘটনার 'পরে লেখকের বিশেষ অনুরাগ থাকা চাই, তা হলেই তার কথাগুলি পতঙ্গের মতো হালকা পাখা মেলে হাওয়ার উপর দিয়ে নেচে যায়। অত্যন্ত সহজ বলেই জিনিসটি সহজ নয়— ছাগলের পক্ষে একটুও সহজ নয় ফুলের থেকে মধু সংগ্রহ করা। ভারহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস। সেই রস পাওয়া এবং দেওয়া অল্পলোকের শক্তিতেই আছে। কথা বলবার বিষয় নেই অথচ কথা বলবার রস আছে এমন ক্ষমতা কজন লোকের দেখা যায়। জলের স্রোত কেবল আপন গতির সংঘাতেই ধ্বনি জাগিয়ে তোলে, তার সেই সংঘাতের উপকরণ অতি সামান্য— তার নুড়ি, বালি, তার তটের বাঁকচোর, কিন্তু আসল জিনিসটা হচ্ছে তার

ধারার চাঞ্চল্য। তেমনি যে মানুষের মধ্যে প্রাণস্রোতের বেগ আছে সে মানুষ হাসে, আলাপ করে, সে তার প্রাণের সহজ কল্লোল—চারি দিকের যে কোনো কিছুতেই তার মনটা একটুমাত্র ঠেকে তাতেই তার ধ্বনি ওঠে। এই অতিমাত্র অর্থভারহীন ধ্বনিতে মন খুশি হয়—গাছের মর্মরধ্বনির মতো প্রাণ-আন্দোলনের এই সহজ কলরব।

যদি না মনে কর আমি অহংকার করছি তা হলে সত্য কথা বলি, অল্প বয়সে আমি চিঠি লিখতে পারতুম, যা-তা নিয়ে। মনের সেই হালকা চাল অনেক দিন থেকে চলে গেছে—এখন মনের ভিতর দিকে তাকিয়ে বক্তব্য সংগ্রহ করে চলি। চিন্তা করতে করতে কথা কয়ে যাই—দাঁড় বেয়ে চলি নে, জাল ফেলে ধরি। উপরকার ঢেউয়ের সঙ্গে আমার কলমের গতির সামঞ্জস্য থাকে না। যাই হোক একে চিঠি বলে না। পৃথিবীতে চিঠি লেখায় যারা যশস্বী হয়েছে তাদের সংখ্যা অতি অল্প। যে দু-চারজনের কথা মনে পড়ে তারা মেয়ে। আমি চিঠি-রচনায় নিজের কীর্তি প্রচার করব এ আশা করি নে।

নীলমণি দ্বিতীয়বার এসে বললে চা তৈরি। চা বিলম্ব সয় না—পোস্টআপিসের পেয়াদাও তথৈবচ। অতএব ইতি ৪ শ্রাবণ ১৩৩৬

৩৮

সকাল থেকেই আজ বাদলা। চার দিক ঝাপসা। ঘোর ঘনঘটা বললে যা বোঝায় তা নয়। মেঘদূত যেদিন লেখা হয়েছিল সেদিন পাহাড়ের উপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। সেদিনকার নববর্ষায় আকাশে বাতাসে চলার কথাটাই ছিল বড়ো। দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটেছিল মেঘ, পূবে হাওয়া বয়েছিল, 'শ্যামজম্বুবনান্ত'কে দুলিয়ে দিয়ে, যক্ষনারী ব'লে উঠছিল, 'মাগো, পাহাড় সুদ্ধ উড়িয়ে নিলে বুঝি।' তাই মেঘদূতে যে বিরহ সে ঘরে বসে থাকার বিরহ নয়, সে উড়ে চলে যাওয়ার বিরহ। তাই তাতে দুঃখের ভার নেই বললেই হয়; এমন-কি তাতে মুক্তির আনন্দ আছে। প্রথম বর্ষাধারায় যে পৃথিবীকে উচ্ছল ঝরনায়, উদ্‌বেল নদীস্রোতে, মুখরিত বনবীথিকায় সর্বত্র জাগিয়ে তুলেছে সেই পৃথিবীর বিপুল জাগরণের সুরে লয়ে যক্ষের বেদনা মন্দাক্রান্তা ছন্দে নৃত্য করতে করতে চলেছে। মিলনের দিনে মনের সামনে এত বড়ো বিচিত্র পৃথিবীর ভূমিকা ছিল না; ছোটো তার বাসকক্ষ, নিভৃত; কিন্তু বিচ্ছেদ পেয়েছে ছাড়া নদী-গিরি-অরণ্যশ্রেণীর মধ্যে। মেঘদূতে তাই কান্না নেই, উল্লাস আছে। যাত্রা যখন শেষ হল, মন যখন কৈলাসে পৌঁচেছে, তখনি যেন সেখানকার নিশ্চল নিত্য ঐশ্বর্যের মধ্যেই ব্যথার রূপ দেখা গেল—কেননা সেখানে কেবলই প্রতীক্ষা। এর মধ্যে একটা স্বতোবিরুদ্ধ তত্ত্ব দেখতে পাই। অপূর্ণ যাত্রা করে চলেছে পূর্ণের অভিমুখে—চলেছে বলেই তার বিচ্ছেদ নব নব পর্যায়ে গভীর একটা আনন্দ পায়; কিন্তু যে পরিপূর্ণ সে তো চলে না, সে চিরযুগ প্রতীক্ষা করে থাকে—তার নিত্য পুষ্প, নিত্য দীপালোক, কিন্তু সে নিত্যই একা, সেই হচ্ছে যথার্থ বিরহী। সুর-বাঁধার মধ্যেও বীণায় সংগীতের উপলব্ধি পর্বে পর্বে শুরু হয়েছে, কিন্তু অগীত সংগীত অসীম অব্যক্তির মধ্যে অপেক্ষা করেই আছে। যে অভিসারিকা তারই জিত, কেননা আনন্দে সে কাঁটা মাড়িয়ে চলে। কিন্তু বৈষ্ণব এইখানে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলবে যাঁর জন্যে অভিসার তিনিও থেমে নেই, সমস্তক্ষণ বাঁশি বাজাচ্ছেন, প্রতীক্ষার বাঁশি—তাই অভিসারিণীর চলা আর বাঞ্ছিতের আহ্বান পদে পদেই মিলে যাচ্ছে; তাই নদী চলেছে যাত্রার সুরে, সমুদ্র দুলছে আহ্বানের ছন্দে—বিশ্বজোড়া বিচ্ছেদের আসর মিলনের গানে জমজমাট হয়ে উঠেছে; অথচ পূর্ণ অপূর্ণের সে মিলন কোনো দিন বাস্তবের মধ্যে ঘটছে না, সে আছে ভাবের মধ্যে। বাস্তবের মধ্যে ঘটলে সৃষ্টি থাকত না, কেননা সৃষ্টির মর্মকথাই হচ্ছে চির-অভিসার চির-প্রতীক্ষার দ্বন্দ্ব। এভোল্যুশ্যন বলতে তাই বোঝায়। যাক গে, আমার বলবার কথা ছিল বাদলার দিন মেঘদূতের দিন নয়, এ যে অচলতার দিন—মেঘ চলছে না, হাওয়া চলছে না, বৃষ্টি যে চলছে তা মনে হয় না,

ঘোমটার মতো দিনের মুখ আবৃত করেছে। প্রহর চলছে না, বেলা কত হয়েছে বোঝা যায় না। সুবিধা এই যে, চার দিকে বৃহৎ মাঠ, অবারিত আকাশ, প্রশস্ত অবকাশ। চঞ্চল কালের প্রবল রূপ দেখছি নে বটে কিন্তু অচঞ্চল দেশের বৃহৎ রূপ দেখা যাচ্ছে— শ্যামাকে দেখলুম না কিন্তু শিবের দর্শন মিলল। ইতি ৮ শ্রাবণ ১৩৩৬

৩৯

পুত্রসন্তান লাভ হলে সে সংবাদ খুব উৎসাহ করে প্রচার করা হয়। গতকল্য আমার লেখনী একটি সর্বাঙ্গসুন্দর নাটককে জন্ম দিয়েছে, দশমাস তার গর্ভবাস হয় নি— বোধ করি দিন-দশেকের বেশি সময় নেয় নি। 'সর্বাঙ্গসুন্দর' বিশেষণটা পড়ে হয়তো তোমার ওষ্ঠাধর হাস্যকুটিল হয়ে উঠবে। ওর মধ্যে একটুখানি সাইকলজির খেলা আছে। বাক্যটা যখন মনের মধ্যে রচিত হয়েছিল তখন কথাটা ছিল 'সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ', কিন্তু যখন লেখা হল, তখন দেখি কথাটা বদলে গেছে। কেটে সংশোধন করা অসম্ভব ছিল না, কিন্তু ভেবে দেখলুম যেটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করি সেইটেই লেখা হয়ে গেছে। বিনয়টাকে তখনি সদ্‌গুণ বলতে রাজি আছি যখন সেটা অসত্য নয়। তোমরা বলবে নিজের লেখা সম্বন্ধে সত্য নির্ণয় করা লেখকের পক্ষে সহজ নয়। সে কথা যদি বল তা হলে কোনো লেখা সম্বন্ধে সুনিশ্চিতভাবে সত্যনির্ণয় কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। টেনিসনকে খুব ভালো বলেছিল এক যুগে, অনতিপরবর্তী যুগে তাকে যথেষ্ট পরিমাণ ভালো বলতে লোকে লজ্জিত হচ্ছে। আমি যেদিন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ প্রথম লিখেছিলেম সেদিন ওটা লিখে আনন্দে বিস্মিত হয়েছিলুম, আজ ওটাকে যদি কোনো নির্মলনলিনী দেবীর নামে চালিয়ে দিতে পারতুম কিছুমাত্র দুঃখিত হতুম না, এমন-কি অনেকখানিই আরাম পাওয়া যেত। এমন অবস্থায়, না-হয়, আজ যেটা ভালো লেগেছে আজই সেটাকে অসংকোচে ভালো বলাই গেল। এ তো সত্যাগ্রহ নয়। নিজের লেখা খারাপ লাগতে যার বাধে না, এবং সেটাকে অকুণ্ঠিতভাষায় স্বীকার করতে যার বেদনা নেই, নিজের লেখার প্রশংসা করা তার পক্ষে অহংকার নয়। অতএব খুব জোরের সঙ্গেই বলব নাটকটা সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে। যারা শুনেছিল তাদের মধ্যে সকলেরই মত আমার সঙ্গে মিলেছিল, বলা বাহুল্য তাদের মধ্যে ... ছিল না। তুমি হয়তো বলবে তোমাকে কলকাতায় গিয়ে এটা শোনাতে হবে। কিন্তু এতটা শোনার উত্তেজনা তোমার ডাক্তার কখনোই ভালো বলবেন না— বিশেষত শেষ পর্যন্ত এতে উত্তেজনার উপকরণ যথেষ্ট আছে। অতএব অপেক্ষা করো, জ্বরের মাত্রা কমুক, জোরের মাত্রা বাড়ুক, তার পরে ঢের সময় আছে।

ঠিক এইখানটাতে খুব একটা ঘুমের বেগ এসে পড়ল মাথার মধ্যে— হঠাৎ প্রবল বর্ষণে যেমন চার দিক থেকে ঘোলা জলের ধারা নেমে আসে সেইরকমটা। বুদ্ধিটা একেবারেই স্বচ্ছ রইল না। অনেক সময়ে তৎসত্ত্বেও যে কাজটা হাতে নেওয়া গেছে সেটা আমি জোর করে সেরে ফেলি, টলমল করতে করতেই লেখা চলে— ক'ষে মদ খেয়ে নাচতে গেলে যেরকমটা হয়। আমার অনেক লেখার মাঝে মাঝে এইরকম ঘুমের প্রবাহ বয়ে গেছে— সেই-সব জায়গার হাতের অক্ষর দেখলে সেটা ধরা পড়ে। কিন্তু জাহাজ যেমন কুয়াশার ভিতর দিয়েও গম্যস্থানের দিকে এগোয় আমার লেখাও তেমনি কল একেবারে বন্ধ করে না। যাক গে। বিষয়টা ছিল আমার নতুন নাটক রচনা। রাজা ও রানীর রূপান্তরীকরণ। সেই নাম রইল; সেই রূপ রইল না। বিশ্বভারতীর কর্মসচিবকে খাজনা দিতে হবে না। যদি সাবেক নামটার জন্যে ভাড়ার দাবি করেন সেটাকে বদলাতে কতক্ষণ। 'সুমিত্রা' নামই ঠিক করেছি। প্রশান্ত মাঝে মাঝে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যেন আমি নেড়াছন্দে ব্ল্যাংক্‌ভার্সে নাটক লিখি। আমি স্পষ্টই দেখলুম গদ্যে তার চেয়ে ঢের বেশি জোর পাওয়া যায়। পদ্য জিনিসটা সমুদ্রের মতো— তার যা বৈচিত্র্য তা প্রধানত তরঙ্গের— কিন্তু গদ্যটা স্থলদৃশ্য, তাতে নানা মেজাজের রূপ আনা যায়— অরণ্য পাহাড় মরুভূমি সমতল অসমতল প্রান্তর কান্তার ইত্যাদি ইত্যাদি। জানা আছে

পৃথিবীর জলময় রূপ আদিম যুগের, স্থলের আবির্ভাব হাল আমলের। সাহিত্যে পদ্যটাও প্রাচীন, গদ্য ক্রমে ক্রমে জেগে উঠছে—তাকে ব্যবহার করা অধিকার করা সহজ নয়, সে তার আপন বেগে ভাসিয়ে নিয়ে যায় না—নিজের শক্তি প্রয়োগ করে তার উপর দিয়ে চলতে হয়—ক্ষমতা অনুসারে সেই চলার বৈচিত্র্য কত তার ঠিক নেই, ধীরে চলা, ছুটে চলা, লাফিয়ে চলা, নেচে চলা, মার্চ করে চলা; তার পরে না-চলারও কত আকার, কত রকমের শোয়া বসা দাঁড়ানো। বস্তুত গদ্যরচনায় আত্মশক্তির সুতরাং আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। হয়তো ভাবীকালে সংগীতটাও বন্ধনহীন গদ্যের গূঢ়তর বন্ধনকে আশ্রয় করবে। কখনও কখনও গদ্যরচনায় সুরসংযোগ করবার ইচ্ছা হয়। লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবছ। মনে রাখা দরকার ভাষা এখন সাবালক হয়েছে, ছন্দের কোলে চড়ে বেড়াতে তার লজ্জা হবার কথা। ছন্দ বলতে বোঝাবে বাঁধা ছন্দ। ২৩ শ্রাবণ ১৩৩৬

৪০

আজ সুরুলে হলচালন-উৎসব হবে। লাঙল ধরতে হবে আমাকে। বৈদিক মন্ত্রযোগে কাজটা করতে হবে বলে এর অসম্মানের অনেকটা হ্রাস হবে। বহু হাজার বৎসর পূর্বে এমন একদিন ছিল যখন হাল লাঙল কাঁধে করে মানুষ মাটিকে জয় করতে বেরিয়েছিল, তখন হলধরকে দেবতা বলে দেখেছে, তার নাম দিয়েছে বলরাম। এর থেকে বুঝবে নিজের যন্ত্রধারী স্বরূপকে মানুষ কতখানি সম্মান করেছে—বিষ্ণুকে বলেছে চক্রধারী, কেননা এই চক্র হচ্ছে বস্তুজগতে মানুষের বিজয়রথের বাহন। মাটি থেকে মানুষ ফসল আদায় করেছে এটা তার বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হচ্ছে হাল-লাঙলের উদ্ভাবন। এমন জন্তু আছে যে আপনার দাঁত দিয়ে পৃথিবী বিদীর্ণ করে খাদ্য উদ্ধার করে, মানুষের গৌরব হচ্ছে সে আপন দেহের উপর চূড়ান্ত নির্ভর করে না, তার নির্ভর যন্ত্র-উদ্ভাবনী বুদ্ধির উপর। এরই সাহায্যে শারীর কর্মে একজন মানুষ হয়েছে বহু মানুষ। গৌরবে বহুবচন। আজ আমরা একটা মিথ্যে কথা প্রায় বলে থাকি dignity of labour, অর্থাৎ শারীর শ্রমের সম্মান। অন্তরে অন্তরে মানুষ এটাকে আত্মাবমাননা বলেই জানে। আজ আমাদের উৎসবে আমরা হাল-লাঙলের অভিবাদন যদি করে থাকি তবে সেটা আপন উদ্ভাবন-কৌশলের আদিম প্রকাশ বলে। সেইখানে খতম করতে বলা মনুষ্যত্বকে অপমানিত করা। চরকাকে যদি চরম আশ্রয় বলি তা হলে চরকাই তার প্রতিবাদ করবে—আপন দেহশক্তির সহজ সীমাকে মানুষ মানে না এই কথাটা নিয়ে চরকা পৃথিবীতে এসেছে, সেই চরকার দোহাই দিয়েই কি মানুষের বুদ্ধিকে বেড়ার মধ্যে আটকাতে হবে। আজ দেখলুম একটা বাংলা কাগজ এই বলে আক্ষেপ করছে যে, বেহারের ইংরেজ মহাজন কলের লাঙলের সাহায্যে চাষ শুরু করেছে, তাতে করে আমাদের চাষীদের সর্বনাশ হবে। লেখকের মত এই যে, আমাদের চাষীদের আধপেটা খাওয়াবার জন্যে মানুষের বুদ্ধিশক্তিকে অনন্তকাল নিষ্ক্রিয় করে রেখে দিতে হবে। লেখক এ কথা ভুলে গেছেন যে, চাষীরা বস্তুত মরছে নিজের জড়-বুদ্ধির ও নিরুদ্যমের আক্রমণে। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যাপারে আমি আর-আর অনেক প্রকারের আয়োজন করেছি, কিন্তু যে শিক্ষার সাহায্যে মানুষ একান্ত দৈহিক শ্রমপরতার অসম্মান থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে তার আয়োজন করতে পারলুম না এই দুঃখ অনেক দিন থেকে আমাকে বাজছে। দেহের সীমা থেকে যে বিজ্ঞান আমাদের মুক্তি দিচ্ছে আজ য়ুরোপীয় সভ্যতা তাকে বহন করে এনেছে—একে নাম দেওয়া যাক বলরামদেবের সভ্যতা। তুমি জান বলরামদেবের একটু মদ খাবারও অভ্যাস আছে, এই সভ্যতাতেও শক্তিমত্ততা নেই তা বলতে পারি নে, কিন্তু সেই ভয়ে শক্তিহীনতাকেই শ্রেয় গণ্য করতে হবে এমন মূঢ়তা আমাদের না হোক। শান্তিনিকেতনকে কেউ কেউ মনে করে পৌরাণিক যুগের জিনিস, তপোবনের বল্কলে আগাগোড়া ঢাকা। হায় রে দূরদৃষ্ট, শান্তিনিকেতন যে কী সেটা কিছুতেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল না। যারা প্রাচীনপন্থী তারা আমাদের ললাটে সনাতনের ছাপ না দেখে চটে যায়, যারা তরুণ আমাদের মধ্যে পুরাতনের পরিচয় পেয়ে

শ্রদ্ধা হারায়। কেউ আমাদের আমল দেয় না। কিছুই করে উঠতে পারলুম না। টানাটানি ঘোচে না, মাথার পাগড়ি থেকে আরম্ভ করে পায়ের জুতোটা পর্যন্ত কোনোটা আঁট, কোনোটা ছেঁড়া, কোনোটা একেবারেই ফাঁক। কিছু-যে করেছি দেশের লোক এ কথা মানে না— কিছু-যে করতে পারি আমার উপর এ ভরসাও রাখে না, অবশেষে এমন কথাও শুনতে হল যে আমার কবিতায় ছন্দোভঙ্গ হয়। এতদিন মনে এই আশা ছিল যে, আর কিছুই না পারি অন্তত ছন্দ মেলাতে পারি এইটুকু বিশ্বাস আমার 'পরে দেশের লোকের আছে। যাবার বেলায় সেটুকুও ভাসিয়ে দিতে হল। 'আমার জন্মভূমি' আমাকে গ্রহণ করেছেন নগ্নদেহে, বিদায় দেবেন নগ্নসম্মানে। ইতি ২৫ শ্রাবণ ১৩৩৬

৪১

সেদিন একটা কোনো বাংলা কাগজে বঙ্কিমের গল্পের কথা পড়ছিলুম। দেখলুম, লেখক প্রশংসা করেছেন বটে কিন্তু বেশ একটু জোর করে সুর চড়াতে হচ্ছে পাছে অন্যমনস্ক পাঠকের কানে গিয়ে না পৌঁছয়। মনে পড়ল যখন বঙ্গদর্শন প্রথম দেখা দিয়েছে, বিষবৃক্ষ মাসে মাসে খণ্ডশঃ বের হচ্ছে, ঘরে ঘরে দেশের মেয়েপুরুষ সকলের মধ্যে কী ঔৎসুক্য, রসভোগের কী নিবিড় আনন্দ। মনে করা সেদিন অসম্ভব ছিল যে, এই আনন্দের বেগ কোনোদিন এতটা ক্ষয় হতে পারে যাতে এর উৎকর্ষ প্রমাণ করতে জোর গলায় ওকালতির দরকার হবে। কিন্তু দেখতে দেখতে সেদিনও এল। এমন-কি, অপ্রকাশ্যে বঙ্কিমের যশ আজকাল অনেকেই হরণ করে থাকেন। আমি ছাড়া আমাদের দেশের আর কোনো খ্যাত লেখকের সম্বন্ধে প্রকাশ্যে এমন কাজ করতে কেউ সাহস করে না। মনে মনে ভাবলুম, ভালোমন্দ লাগার আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ-শক্তির দ্বারা মানুষের ইতিহাসে যে মানস-সৃষ্টির উদ্যম চলেছে সে মায়ার সৃষ্টি। বঙ্কিমকে যেদিন খুব ভালো লাগছিল সেদিন পাঠক-সমাজে কতকগুলি মানস-উপাদান কিছু বা বেশি ছিল, কিছু ছিল না বা কম ছিল, সেগুলি বিশেষ আকারে বিশেষ পরিমাণে সম্মিলিত ও সজ্জিত ছিল— এই কারণবশতই তার সম্ভোগসুখরূপ ফলটা এত অত্যন্ত প্রবল হতে পেরেছে। ইতিমধ্যেই, ২০।২৫ বছর না যেতে যেতেই, প্রবহমান কালের ধাক্কায় তারা নড়ে চড়ে গেছে; সামনের জিনিস পিছনে পড়ল, উপরের জিনিস নীচে পড়ল, অমনি সেদিনকার অত দীপ্তিমান অত বেগবান উপলব্ধিও আজ অবাস্তব হয়ে দাঁড়াল— অন্তত অনেক লোকের পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য হয়েছে সেদিনকার ভালোলাগা কী করে সম্ভবপর হল। আজকের পাঠক সগর্বস্মিত হাস্যে ভাবছে সেদিনকার পাঠকদের মন ছিল নেহাত কাঁচা, এইজন্যেই সেই কাঁচা ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যবিচার স্থায়ী হতে পারে না। নিজের মনের একান্ত উপলব্ধির মতো বাস্তব আমাদের কাছে আর কিছুই নেই। চোখে যেটাকে যা দেখছি সেটা যে তাই না হতেও পারে এমন সন্দেহকে মনে স্থান দিলে বোধশক্তি সম্বন্ধে নাস্তিকতায় পৌঁছতে হয়— এতে কাজ চলে না। ভাগ্যক্রমে আমাদের দৈহিক চোখের বদল হয় না অথবা বহু লক্ষ বৎসরে হয়ে থাকে— তাই আমাদের আজকের দেখার সঙ্গে কালকের দেখার গুরুতর বিরোধ নেই, এই কারণে আমাদের দৃশ্যলোক ব'লে যে-একটা সৃষ্টি আছে সেটাকে অন্তত সাধারণ লোকে মায়া বলতে পারে না। কিন্তু আমাদের দৈহিক চোখের স্নায়ু পেশী এবং তার উপকরণ যদি কেবলই নড়াচড়া করত তা হলে এই দেখার জগৎ আকাশের মেঘের মতো রূপান্তর ধরতে ধরতেই চলত। কিন্তু কালে কালে আমাদের মনের দৃষ্টির বদল চলছেই। আজ সেই দৃষ্টির যে-সব উপকরণের যোগে একটা বিশেষ অনুভূতি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়েছে এবং এত স্পষ্ট হয়েছে বলেই এত নিত্যরূপে সে প্রতীত, কাল তাদের আগাগোড়া বদল হয় না বটে কিন্তু অনেকখানি এদিক-ওদিক হয়ে যায়; তখন বোঝা যায় না বিষবৃক্ষকে এত বেশি ভালো লেগেছিল কী করে। একেই বলতে হয় মায়া। এই মায়ার উপরে দাঁড়িয়ে কত গালমন্দ তর্কবিতর্ক রক্তপাত। অথচ মানুষের মনের প্রকৃতিতে মোটামুটি অনেকখানি নিত্যতার বন্ধন যে নেই তা বলতে পারি নে, না থাকলে মানবসমাজ হত

প্রকাণ্ড একটা পাগলা-গারদ। বস্তুজগতের মূলভূতের উপাদানসংস্থানে মোটের উপর একটা বন্ধন আছে, সেইজন্যেই কার্বনটা কার্বন, অক্সিজেনটা অক্সিজেন। কিন্তু বহুদীর্ঘকালের ভূমিকায় আদিসূর্য থেকে বর্তমান পৃথিবী পর্যন্ত সৃষ্টিসংঘটনের যে ব্যাপার চলছে তাতে সেই-সব মূলভূতের মধ্যেও টানা-ছেঁড়া ঘটেছে, সেটা ভেবে দেখতে গেলে দেখি সৃষ্টিটা অনাদিকালের ক্ষেত্রে অনন্ত মরীচিকার প্রবাহ! এতদিন বিজ্ঞান বলে আসছিল সেই পরিবর্তনের মধ্যে একটা বাঁধা নিয়মের সুদৃঢ় ধ্রুবসূত্র আছে। আজ বলছে সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়; থেকে থেকে অঘটন ঘটে, দুই-দুইয়ে পাঁচও হয়। নিত্য এবং আকস্মিকের দ্বন্দ্বসমাসে। বস্তুজগতের তত্ত্বালোচনা আমার কলমে শোভা পায় না; বলছিলুম ভাবজগতের কথা, বিশেষভাবে সাহিত্যকে নিয়ে। এই জগতে নিন্দাপ্রশংসার নিত্যতার কথা কে বলতে পারে। সমালোচকেরা দৈবজ্ঞের সাজ পরে গণনা করে কুষ্টি তৈরি করছেন, তখনকার মতো সে কুষ্টি দাম দিয়ে কিনে লোকে মাথায় করে নিচ্ছে। কিন্তু হায় রে, শেষকালে আয়ুর কোঠায় মিল পায় না, গুণাগুণ ফলাফলও তথৈবচ। তবুও মানবপ্রকৃতি একেবারে উন্মাদ নয়, মোটামুটি তার মধ্যে একটা হিসাবের ধারা পাওয়া যায়। যদিচ সে হিসাব সম্বন্ধে গণনার ভুল প্রতিদিন ঘটে। গতকল্যের গণনার ভুল আজকে দেখে যাঁরা খুব উচ্চকণ্ঠে হাসছেন আবার তাঁরাই দেখি খুব দম্ভসহকারে ছক কেটে গণনায় বসে গেছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁদের গণনা অপ্রমাণ হয় ভাবীকালে, আশু তাঁরা নগদবিদায় পান। লোকে যেটা শুনতে চায় সেইটেকে খুব বিজ্ঞের মতো বিদ্যে ফলিয়ে বলবার শক্তি আছে তাঁদের, নিজের ও অন্যের ঈর্ষ্যাবিদ্বেষকে তাঁরা উপস্থিতমত খোরাক জুগিয়ে তাদের পালোয়ান করে তোলেন; অবশেষে দুদিন বাদে তাঁদের কথা কারও মনেও থাকে না, সুতরাং তখন তাঁদের মিথ্যে ধরা পড়লেও জবাবদিহি করবার জন্য কোনো আসামীকে হাজির পাওয়া যায় না। সন্দেহ হচ্ছে মনের মধ্যে অনেক দিনের অনেক ঝগড়া জমা হয়ে রয়েছে, তোমার পত্রযোগে সেগুলোকে নিরাপদে ব্যক্ত করতে বসেছি। কিন্তু কিসেরই বা আক্ষেপ। খ্যাতি জিনিসটার পনেরো-আনাই মৃত্যুর পরবর্তী ভাবীকালের সম্পদ, সে সম্পদ খাঁটি কি মেকি তাতে কার কী আসে যায়। যিনি প্রশংসা পেতে চান তিনিও পান এমন কিছু যা কিছুই নয়, আর যিনি গাল দিয়ে খুশি হতে চান তাঁরও সে খুশি শূন্যের উপর। মায়া! 'অতএব বলি শুন ত্যজ দম্ভ তমোগুণ'। অতএব যা চার দিকে রয়েছে তাকে সহজ মনে গ্রহণ করে হও খুশি। অতএব যদিচ আজ ভাদ্র মাসের মধ্যাহ্নের অসহ্য গরম তবু সর্বত্রই শরৎকালের মাধুর্য অজস্র, এইটাই যদি পরিপূর্ণ মনে ভোগ করে নিতে পারি তবে সেটাকে ফাঁকি বলতে পারব না—যদিও এর পরবর্তী ফাল্গুন মাসের সৌন্দর্য অন্য জাতের তবুও সেই বসন্তের দোহাই পেড়ে এই শরতের দামে খুঁত ধরে তার থেকে বৃথা নিজেকে বঞ্চিত করা কেন। ইতি ১৮ ভাদ্র ১৩৩৬

৪২

ফুল ফোটে গাছের ডালে, সেই তার আশ্রয়। কিন্তু মানুষ তাকে আপনার মনে স্থান দেয় নাম দিয়ে। আমাদের দেশে অনেক ফুল আছে যারা গাছে ফোটে, মানুষ তাদের মনের মধ্যে স্বীকার করে নি। ফুলের প্রতি এমন উপেক্ষা আর কোনো দেশেই দেখা যায় না। হয়তো বা নাম আছে কিন্তু সে নাম অখ্যাত। গুটিকয়েক ফুল নামজাদা হয়েছে কেবল গন্ধের জোরে—অর্থাৎ উদাসীন তাদের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ না করলেও তারা এগিয়ে এসে গন্ধের দ্বারা স্বয়ং জানান দেয়। আমাদের সাহিত্যে তাদেরই বাঁধা নিমন্ত্রণ। তাদেরও অনেকগুলির নামই জানি, পরিচয় নেই, পরিচয়ের চেষ্টাও নেই। কাব্যের নামমালায় রোজই বার বার পড়ে আসছি যূথী জাতি সেঁউতি। ছন্দ মিললেই খুশি থাকি, কিন্তু কোন্ ফুল জাতি কোন্ ফুল সেঁউতি সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবারও উৎসাহ নেই। জাতি বলে চামেলিকে, অনেক চেষ্টায় এই খবর পেয়েছি, কিন্তু সেঁউতি কাকে বলে আজ পর্যন্ত অনেক প্রশ্ন করে উত্তর পাই নি। শান্তিনিকেতনে একটি গাছ আছে তাকে কেউ কেউ পিয়াল্ল বলে, কিন্তু

সংস্কৃত কাব্যে বিখ্যাত পিয়ালের পরিচয় কয়জনেরই বা আছে। অপর পক্ষে দেখো, নদীর সম্বন্ধে আমাদের মনে ঔদাস্য নেই, নিতান্ত ছোটো নদীও আমাদের মনে প্রিয়নামের আসন পেয়েছে— কপোতাক্ষী ময়ূরাক্ষী ইচ্ছামতী। তাদের সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের সম্বন্ধ। পুজার ফুল ছাড়া আর কোনো ফুলের সঙ্গে আমাদের অবশ্য প্রয়োজনের সম্বন্ধ নেই। ফ্যাশনের সম্বন্ধ আছে অচিরায়ু সীজন্‌ ফ্লাউয়ারের সঙ্গে— মালীর হাতে তাদের শুশ্রূষার ভার— ফুলদানিতে যথারীতি তাদের গতায়াত। একেই বলে তামসিকতা, অর্থাৎ মেটীরিয়ালিজ্‌ম্‌— স্থূল প্রয়োজনের বাইরে চিত্তের অসাড়তা। এই নামহীন ফুলের দেশে কবির কী দুর্দশা ভেবে দেখো, ফুলের রাজ্যে নিতান্ত সংকীর্ণ তার লেখনীর সঞ্চরণ। পাখি সম্বন্ধেও ঐ কথা, কাক কোকিল পাপিয়া বউ-কথা-কও-কে অস্বীকার করবার উপায় নেই, কিন্তু কত সুন্দর পাখি আছে যার নাম অন্তত সাধারণে জানে না। ঐ প্রকৃতিগত ঔদাসীন্য আমাদের সকল পরাভবের মূলে— দেশের লোকের সম্বন্ধে আমাদের ঔদাসীন্যও এই স্বভাব-বশতই প্রবল। পরীক্ষা-পাসের জন্যে ইতিহাসপাঠে উপেক্ষা করবার জো নেই— আমাদের স্বাদেশিকতা সেই পুঁথির ঝুলি দিয়ে তৈরি, দেশের লোকের 'পরে অনুরাগের ঔৎসুক্য দিয়ে নয়। আমাদের জগৎটা কত ছোটো ভেবে দেখো, তার থেকে কত জিনিসই বাদ পড়েছে। ইতি ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৯

৪৩

আমার জীবনে নিরন্তর ভিতরে ভিতরে একটি সাধনা ধরে রাখতে হয়েছে। সে সাধনা হচ্ছে আবরণ-মোচনের সাধনা, নিজেকে দূরে রাখবার সাধনা। আমাকে আমি থেকে ছাড়িয়ে নেবার সাধনা। স্থির হয়ে বসে এ কথা প্রায়ই আমাকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করতে হয় যে, যে আমি প্রতিদিনের সুখদুঃখে কর্মে চিন্তায় বিজড়িত, সে ঐ সংখ্যাহীন অনাত্মের নিরুদ্দেশ স্রোতে ভেসে যাওয়ার শামিল। তাকে দ্রষ্টারূপে স্বতন্ত্রভাবে দেখতে পারলেই ঠিক দেখা হয়— তার সঙ্গে নিজেকে অবিচ্ছিন্ন এক করে জানাই মিথ্যা জানা। আমার পক্ষে এই উপলব্ধির অত্যন্ত বেশি প্রয়োজন আছে বলেই আমি একে এত করে ইচ্ছা করি। আমার মনের বাসা চৌমাথায়, আমার সব দরজাই খোলা, সব রকমের হাওয়া এসেই পৌঁছয়, সব জাতেরই আগন্তুক একেবারে অন্দরে ঢুকে পড়ে। মানুষের জীবনে অন্দর বলে একটা জায়গা আছে, সেইটে তার বেদনার জায়গা, সেইখানে তার অনুভূতি। এইজন্যেই এর মধ্যে কেবল অন্তরঙ্গের প্রবেশ। তাদেরই নিয়ে সুখদুঃখের লীলাই সংসারের লীলা। ঐ সীমার মধ্যে সবই সহ্য করতে হয়। কিন্তু আমার জীবনদেবতা আমাকে কবি করবেন স্থির করেছেন বলেই আমার অন্দরমহলকে অরক্ষিত রেখেছেন, আমার খিড়কির দরজা নেই, চারি দিকেই সদর দরজা। সেইজন্যেই আমার অন্দরমহলে কেবল আহূত নয়, রবাহূত অনাহূতের আসা-যাওয়া। আমার বেদনাযন্ত্রে সকল সপ্তকের সকল সুর বাজবার মতোই তার চড়িয়ে রাখা হয়েছে। সুর থামালে আমার নিজের কাজ চলে না। সংসারকে বেদনার অভিজ্ঞতাতেই আমাকে জানতে হবে, নইলে প্রকাশ করব কী। আমার তো বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকের মতো জ্ঞানের ব্যাখ্যা নয়, আমার যে প্রাণের প্রকাশ। কিন্তু এক দিকে এই অনুভূতিতেই যেমন প্রকাশের প্রবর্তনা তেমনি আর-এক দিকে তাকে ছাড়িয়ে দূরে আসাও রচনার পক্ষে দরকার। কেননা দূরে না এলে সমগ্রকে দেখা যায় না, সুতরাং দেখানো যায় না। সংসারের সঙ্গে অত্যন্ত এক হয়ে গেলেই অন্ধতা জন্মায়, যাকে দেখতে হবে সেই জিনিসটাই দেখাকে অবরুদ্ধ করে। তা ছাড়া ছোটো হয়ে ওঠে বড়ো এবং বড়ো হয়ে যায় লুপ্ত। সংসারে বড়োর সুবিধে এই যে, সে আপনার ভার আপনি বহন করে, কিন্তু ছোটোগুলো হয়ে ওঠে বোঝা। তারাই সব চেয়ে অনর্থক অথচ সব চেয়ে বেশি চাপ দেয়। তার প্রধান কারণ তাদের ভার অসত্যের ভার। দুঃস্বপ্ন যখন বুকের উপর চেপে বসে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, তবুও সেটা মায়া। যখন 'আমি'র গণ্ডি দিয়ে জীবনের পরিমণ্ডলটাকে ছোটো করি তখনি সেই ছোটোর রাজ্যে ছোটোই

বড়োর মুখোশ পরে মনকে উদ্‌বেজিত করে। যা সত্যই বড়ো, অর্থাৎ যা 'আমি'র পরিধি ছাপিয়ে যায়, তার সামনে যদি এদের ধরা যায় তা হলে তখনি এদের মিথ্যে আতিশয্য ঘুচে গিয়ে এরা এতটুকু হয়ে যায়। তখন, যা কাঁদায় তাকে দেখে হাসি পায়। এই কারণেই 'আমি'র বড়োটাকে আমার থেকে সরানোই জীবনের সব চেয়ে বড়ো সাধনা, তা হলেই আমাদের অস্তিত্বের সব চেয়ে বড়ো অপমানটাই লুপ্ত হয়। অস্তিত্বের অপমানটা হচ্ছে ছোটো খাঁচায় থাকা, সেটা পশুপাখিকেই শোভা পায়। এই আমি'র খাঁচার মধ্যে সব মারই হয় বেঁধে মার, সব বোঝাই হয়ে ওঠে অচল বোঝা। এইজন্যেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অন্তত এক পঙ্‌ক্তি দূরে সরিয়ে বসিয়ে রাখাই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অত্যন্ত দরকার, নইলে নিজের দ্বারা নিজেকে পদে পদে লাঞ্ছিত হতে হয়। মৃত্যুশোকের দ্বারা বৈরাগ্য আনে, সেইরকম বৈরাগ্যের মুক্তি একাধিকবার অনুভব করেছি, কিন্তু যথার্থ বৈরাগ্য আনে যা-কিছু সত্য বড়ো তাকেই সত্য করে উপলব্ধি করার দ্বারায়। আমার নিজের মধ্যেই বড়ো আছে—যে দ্রষ্টা, আমার নিজের মধ্যে ছোটো হচ্ছে—যে ভোক্তা। ঐ দুটোকে এক করে ফেললে দৃষ্টির আনন্দ নষ্ট হয়, ভোগের আনন্দ দুষ্ট হয়। কাজ জিনিসটাকে বাইরে থেকে ঠেলাগাড়ির মতো ঠেলতে থাকলেই সেটা চলে ভালো, কিন্তু ঠেলাগাড়িটাকে যদি কাঁধে নিয়ে চলি তবে গলদ্‌ঘর্ম ব্যাপার হয়ে ওঠে। বিশ্বভারতী বলে একটা কাজ নিয়েছি, এ কাজটা সহজ হয় যদি একে আমি'র ঘাড়ে না চাপাই, যদি আমি'র থেকে বিযুক্ত করে রাখি। অবস্থাগতিকে কাজ সফলও হয় বিফলও হয়, কিন্তু সেটা যদি আমি'কে স্পর্শ না করে তা হলেই সেই আমি-নির্মুক্ত কাজ নিজেরও মুক্তি আনে, আমারও মুক্তি আনে। সব চেয়ে যিনি বড়ো তাঁরই কাছে আমাদের সব চেয়ে বড়ো প্রার্থনা এই—অসতো মা সদ্‌গময়। কেমন করে এ প্রার্থনা সার্থক হবে। না, আমার মধ্যে তাঁর আবির্ভাব যদি পূর্ণ হয়। তাঁকে যদি আমার মধ্যে সত্য করে দেখি তবেই আমি'র উপদ্রব শান্ত হতে পারে।

জানি না আমার এ চিঠি কবে পাবে। যদি জন্মদিনে পাও তো খুশি হব। যদি না'ও পাও তবে জন্মদিনকে আরও একটি দিন পর্যন্ত বাড়িয়ে নিলে বিশেষ ক্ষতি হবে না। যে-সব কথা নিজের অন্তরতম তা সব সময়ে বলতে পারা যায় না, অথচ বলা চাই নিজেরই জন্যে। তাই তোমার জন্মদিনকে উপলক্ষ করে এই চিঠি লিখলুম, কেননা প্রত্যেক জন্মের মূলমন্ত্র হচ্ছে মুক্তির মন্ত্র, অন্ধকার থেকে জ্যোতির মধ্যে মুক্তি। ইতি ৬ কার্তিক ১৩৩৬

৪৪

প্রশান্ত তার চিঠিতে লিখেছে বুলার পেন্সিল দিয়ে যে-লেখাগুলো বেরোয় বিশেষ করে তার পরীক্ষা আবশ্যক। আমার নিজের মনে হয় এ-সব ব্যাপারে অতি নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়। আমার আপন সম্বন্ধে যাকে ফ্যাক্‌ট্‌স্‌ বলা যায় তাই নিয়ে যদি তুমি পরীক্ষা কর তবে প্রমাণ হবে আমি রবীন্দ্রনাথ নই। যে গান নিজে রচনা করেছি পরীক্ষা দিতে গেলে তার কথাও মনে পড়বে না, তার সুরও নয়। একজন জিজ্ঞেসা করেছিল—চন্দননগরের বাগানে যখন ছিলুম তখন আমার বয়স কত; আমাকে বলতে হয়েছিল, আমি জানি নে। বলা উচিত ছিল, প্রশান্ত জানে। আমি যখন দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়েছিলুম, সে দু বছর হল না তিন বছর, না চার বছর, নিঃসংশয়ে বলতে পারি নে। আমার মেজো মেয়ের মৃত্যু হয়েছিল কবে মনে নেই—বেলার বিয়ে হয়েছিল কোন্‌ বছরে কে জানে। অথচ টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা কবার সময়ে তুমি যা নিয়ে আমার সম্বন্ধে নিঃসংশয় সেটা তোমার ধারণা মাত্র। তুমি জোর করে বলছ ঠিক আমার স্বর, আমার ভাষা, আমার ভঙ্গি। আর কেউ যদি বলে, না, তার পরে আর কথা নেই। কেননা তোমার মনে আমার ব্যক্তিত্বের যে একটা মোট ছবি আছে, অন্যের মনে তা না থাকতে পারে কিংবা অন্যরকম থাকতে পারে। অথচ এই ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্যই সব চেয়ে সত্য সাক্ষ্য, কেননা এটাকে কেউ বানাতে পারে না। আমার জীবনের বিশেষ বিশেষ তথ্য আমার চেয়ে প্রশান্ত বেশি জানে, কিন্তু হাজার চেষ্টা

করলেও আমার মোট ছবিটা সে নিজের মধ্যে ফোটাতে পারবে না। আত্মার চরম সত্য তথ্যে নয়, আত্মার আত্মীয়তায়।

ইতিমধ্যে পরশু বুলার হাতে একটা লেখা বেরিয়েছে তাতে নাম বেরোল না। বললে, নাম জিজ্ঞাসা কোরো না, তুমি মনে যা ভাবছ আমি তাই। তার পরে যে-সব কথা বেরোল সে ভারি আশ্চর্য। তার সত্যতা আমি যেমন জানি আর দ্বিতীয় কেউ না। কোনো-এক অবসরের সময় কপি করে তোমাকে পাঠাব। কিন্তু অবসর আর পাব কি না জানি নে। অনেক কাজ। প্রশান্ত এখনো ওখানে আছে কি না জানি নে। তাকে এই চিঠি দেখিয়ো। ইতি ১০ নবেম্বর ১৯২৯

৪৫

আমার কেমন মনে হয় আমি আবার যেন পৃথিবীর খুব কাছে এসেছি। যেমন কাছে ছিলুম ছেলেবেলায়। মন তখন আপন চিন্তায় জগৎ তৈরি করতে এত ব্যস্ত ছিল না— সেইজন্যে বাইরের সঙ্গে আমার যোগ অত্যন্ত সহজ ছিল। সেই সময় আমার অনুভব করবার শক্তি ছিল সজীব। তাই আমি ছিলুম আমার চারি দিকে— ঘরের লোকের যেমন ঘরের কোনো জায়গায় যাবার বাধা থাকে না, এই বাইরের পৃথিবীতে আমার যেন সেইরকম অধিকার ছিল। আমার কাছে ভাবের দাবি এবং চিন্তার দাবি দুইই খুব প্রবল। আমি ভালো করে চেয়ে দেখায় সুখ পাই, ভালো করে ভেবে না দেখেও থাকতে পারি নে। যেমন আমার চেয়ে-দেখাকে কাজে লাগিয়েছি সাহিত্যে, তেমনি আমার ভেবে-দেখাকেও কাজে লাগিয়েছি নানা প্রতিষ্ঠানে। এমনি করে অনেক দিন চলে আসছিল। কিন্তু চিন্তার শাসনটাই উঠছিল সব চেয়ে জবরদস্ত হয়ে— অন্তরে বাহিরে তার কর্মের তাগিদ নানা শাখাপ্রশাখায় আমার সমস্ত অবকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। জগতে সবাই অবকাশের অধিকার নিয়ে আসে না— অনেকের পক্ষেই অবকাশটা শূন্যতা— আমি কিন্তু শিশুকাল থেকেই বিধাতার কাছ থেকে আমার সব চেয়ে বড়ো দান পেয়েছি এই অবকাশের দান। আর-একবার এখান থেকে বিদায় নেবার আগে অবকাশের পশ্চিম দিগন্তে রঙের খেলা খেলিয়ে তার পরে অস্তসমুদ্রে ডুব দিতে ইচ্ছে করে। খ্যাতির বোঝা ঘাড়ে চেপেছে সেটাকে শেষ পর্যন্ত নামাতে পারব না— তবু যতটা পারি আমার অভিমানটাকে পরিষ্কার করে নিয়ে তাতে আলপনা কেটে যাব এই ইচ্ছেটা প্রতিদিন দরজায় ধাক্কা মেরে যাচ্ছে— শীতের মধ্যাহ্নে নীলাভ সুদূরের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি।

তুমি কেমন আছ তার খাপছাড়া খবর পাই। কোথায় কী ভাবে আছ তার ছবিটা আন্দাজ করা শক্ত। ইতি ২০ ভাদ্র

৪৬

তোমাকে চিঠি লিখব লিখব করছি এমন সময় তোমার চিঠি পেলুম। বিশেষ করে লেখবার বিষয় কিছু আছে তা নয়— কিন্তু যা লিখলেও হয়, না লিখলেও হয়, কিছুতেই আসে যায় না সেটা হচ্ছে উড়ো ভাবনা— তাকে ধরা শক্ত। যাকে বলে খবর সে—

এই পর্যন্ত লিখেছি তার পরে অনেক দিন হল, সময় চাপা পড়ে গেল নানা আকার-আয়তনের নানাপ্রকার কাজের তলায়। সেদিনকার উড়ো ভাবনা সেইদিনেই লীলা সাঙ্গ করে বৈতরণী পেরিয়ে চলে গেছে। সেদিন ছিল শীতের দুপুরবেলাটা আমার জগতে সব চেয়ে বড়ো স্থান নিয়ে— পেয়ালা উপচিয়ে পড়ছিল— আমার মনটা যেন সমস্ত আকাশ জুড়ে ছিল, আর তার মধ্যে জমে উঠেছিল সোনার আলোর নেশা— এই মন, আকাশ, আলো আর খোলা মাঠ নিয়ে সবসুদ্ধ ব্যাপারখানা যে কী তা তো স্পষ্ট করে বলবার জো ছিল না। অস্পষ্ট করেই বলতে বসেছিলুম এমন সময় কোনো একটা সুস্পষ্ট কর্তব্য কিংবা অকর্তব্য মনটাকে নিয়ে গেল সেই কলমের মুখ থেকে ছিনিয়ে। ঠিক

সেই জায়গাটাতে ফিরে আসা আর ঘটল না। যেটাকে 'সেই জায়গা' বলছি 'সেই জায়গাটা'-সুদ্ধ দৌড় মেরেছে।

সেদিন আমার এক বন্ধু এসেছিলেন, যারা আমার কুৎসা করছে তাদের সঙ্গে তাঁর যোগ নেই এই কথাটা জানিয়ে যেতে। অথচ আমার তরফেও কিছু কিছু ত্রুটি আছে এই আভাসও তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। আমার সহচরদের বাক্যে বা ব্যবহারে যত-কিছু মূঢ়তা প্রকাশ পায়, আমার জীবন-চরিতের অধ্যায়ে লোকে সেগুলো যোজনা করে আমার নামের উপর কালিমা লেপন করে। যেমন ঝড়ের উপর মারীর উপর মানুষ রাগ করে না, তেমনি এই-সমস্ত আঘাতকে স্বীকার করে নিয়ে আমি যেন রাগ না করি, যেন শান্ত থাকি— প্রতিদিনই নিজেকে এই কথাই বলছি এবং মনের ভিতর থেকে এর সায় পাচ্ছি। আজ সাতই পৌষ। সকালবেলাকার অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। ভিতরকার গভীর কথাকে প্রকাশ করার দ্বারা যে একটা শান্তি আসে আজ সেই শান্তি আমার মনের উপর বিরাজ করছে। ইতি ৭ পৌষ ১৩৩৬

৪৭

শরীর অলস, মনটা মন্থর। শক্তির গোধূলি। কেদারায় বসে আছি তো বসেই আছি, একটুখানি উঠে টেবিলে বসে সামান্য কিছু-একটা কাজ করব তাও কেবলই পিছিয়ে যাচ্ছে। রাত হয়ে যায়, বিছানায় শুতে যাব তাতে গড়িমসি; সকাল হল, রোদ উঠেছে, বিছানা ছেড়ে উঠব সেও তথৈবচ। কোনো বিশেষ অসুখ আছে তাও নয়, জীবনের স্রোতটা থম্‌থমে। বাইরের দিকে চেয়ে আছি তো চেয়েই আছি, ঠিক যেন ঐ রোদ-পোহানো জামগাছটার মতো। দুপুরবেলাকার আলোটা আমার মনের উপর ছড়িয়ে পড়েছে, সেখানকার দিগন্তে সুদূর নীলাভ রেখা আর সেখানকার ঝোপের মধ্যে কোথায় একটা ঘুঘু ডাকছে, প্রহর যাচ্ছে চলে। ঐ শূন্য মাঠের 'পর দিয়ে থেকে থেকে একটা ছিন্ন মেঘ যেমন তার ছায়া বুলিয়ে চলেছে, তেমনি কোন্ একটা দিশাহারা উড়ো বিষাদের ছায়া মনের উপর দিয়ে চলে যায়— মেঘেরই মতো খাপছাড়া— বাস্তব কিছুর সঙ্গেই জড়িত নয়।

এই পর্যন্ত কাল লিখেছি এমন সময় ডাক পড়ল। মেয়েরা ঋতুরঙ্গ অভিনয় করবে আজ সন্ধে-বেলায়। তাদের অভ্যাস করাতে হবে। ওরা অঙ্গভঙ্গিমার লতানে রেখা দিয়ে গানের সুরের উপর নকশা কাটতে থাকে। মনে মনে ভাবি এর অর্থটা কী। আমাদের প্রতিদিনটা দাগ-ধরা ছেঁড়াখোঁড়া, কাটাকুটিতে ভরা, তার মধ্যে এর সংগতি কোথায়। যারা লোকহিত-ব্রতপরায়ণ সন্ন্যাসী তারা বলে বাস্তব সংসারে দুঃখ দৈন্য শ্রীহীনতার অন্ত নেই, তার মধ্যে এই বিলাসের অবতারণা কেন। তারা জানে 'দরিদ্রনারায়ণ' তো নাচ শেখেন নি, তিনি নানা দায় নিয়ে কেবলই ছট্‌ফট্ করে বেড়ান, তাতে ছন্দ নেই। এরা এই কথাটা ভুলে যায় যে, দরিদ্র শিবের আনন্দ নাচে। প্রতিদিনের দৈন্যটাই যদি একান্ত সত্য হত তা হলে এই নাচটা আমাদের একেবারেই ভালো লাগত না, এটাকে পাগলামি বলতুম। কিন্তু ছন্দের এই সুসম্পূর্ণ রূপলীলাটি যখন দেখি তখন মন বলতে থাকে এই জিনিসটি অত্যন্ত সত্য— ছিন্নবিচ্ছিন্ন অপরিচ্ছন্নভাবে চার দিকে যা চোখে পড়তে থাকে তার চেয়ে অনেক গভীরভাবে নিবিড়ভাবে। পর্দাটার উপরেই প্রতিদিনের চলতি হাতের ছাপ পড়ছে, দাগ ধরছে, ধুলো লাগছে, পরিপূর্ণতার চেহারাটা কেবলই অপ্রমাণ হচ্ছে— একেই বলি বাস্তব। কিন্তু পর্দার আড়ালে আছে সত্য, তার ছন্দ ভাঙে না, সে অম্লান, সে অপরূপ। তাই যদি না হবে তবে গোলাপ-ফুল ফুটে ওঠে কিসের থেকে, কোন্ গভীরে কোথায় বাজে সেই বাঁশি যার ধ্বনি শুনে মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে যুগে যুগে গান চলে এসেছে আর মনে হয়েছে মানুষের কলহ-কোলাহলের চেয়ে মানুষের এই গানেই চিরন্তনের লীলা। অঙ্গে অঙ্গে যখন নাচ দেখা দিল তখন ঐ ময়লা ছেঁড়া পর্দাটার এক কোনা উঠে গেল— 'দরিদ্রনারায়ণ'কে হঠাৎ দেখা গেল বৈকুণ্ঠে, লক্ষ্মীর ডানপাশে। তাকেই অসত্য বলে উঠে চলে যাব, মন তো তাতে সায় দেয় না। দরিদ্রনারায়ণকে বৈকুণ্ঠের

সিংহাসনেই বসাতে হবে, তাঁকে লক্ষ্মীছাড়া করে রাখব না। আমাদের পুরাণে শিবের মধ্যে ঈশ্বরের দরিদ্রবেশ আর অন্নপূর্ণায় তাঁর ঐশ্বর্য, বিশ্বে এই দুইয়ের মিলনেই সত্য। সাধুরা এই মিলনকে যখন স্বীকার করতে চান না তখন কবিদের সঙ্গে তাঁদের বিবাদ বাধে। তখন শিবের ভক্ত কবি কালিদাসের দোহাই পেড়ে সেই যুগলকেই আমাদের সকল অনুষ্ঠানের নান্দীতে আবাহন করব যাঁরা 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ'। যাঁদের মধ্যে অভাব ও অভাবের পূর্ণতার নিত্যলীলা।

আর দুই-এক দিনের মধ্যেই আমাদের জাহাজের সঠিক খবর পেলে আমাদের গতিবিধির নিশ্চিত খবর তোমাকে জানাব। আজ আর সময় নেই। ইতি তারিখ ভুলেছি—ফেব্রুয়ারি ১৯৩০

৪৮

তোমাকে চিঠি লিখছি কোপেনহেগেন থেকে, পড়েছি ঘূর্ণির মধ্যে। কোথাও একদণ্ড থামতে দিলে না। অপরিচিতের পরিচয় কুড়োতে কুড়োতে চলেছি কিন্তু সে পরিচয় সঞ্চয় করে রাখবার মতো সময় নেই। তা ছাড়া আমার ভোলা মন, আমার স্মরণের ভাণ্ডারে তালা-চাবি নেই—একটা কিছু যেই মজুদ হয়েছে অমনি আর-একটা কিছু এসে তাকে সরিয়ে ফেলে। কিছু তলিয়ে যায়, কিছু দুমড়ে যায়; অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটাকে সম্পূর্ণ লোকসান বলে আক্ষেপ করব না, বর্জন করতে না পারলে অর্জন করা যায় না, জমাতে গেলে জমিয়ে বসতে হয়, নড়াচড়া বন্ধ। আমার মনোরথটাকে বহুকাল ধরে কেবলই চালিয়ে এসেছি, এক রাস্তা থেকে আর-এক রাস্তায়—গারাজে বন্ধ করে রাখবার সময়ই জুটল না। সঞ্চয়শালার দ্বারের সামনে গদিয়ান হয়ে বসতে যদি পারতুম তা হলে নামের বদলে বস্তু পাওয়া যেত বিস্তর। সামান্য কথাটা ভেবে দেখো-না, মনে রাখবার মতো বুদ্ধি যদি থাকত তা হলে অন্তত পরীক্ষা পাসের পালা শেষ পর্যন্ত চুকিয়ে সংসারটাকে সেলাম ঠুকে এবং সেলাম কুড়িয়ে বুক ফুলিয়ে চলে যেতে পারতুম। একটা কিছু বলতে যদি চাই তার রেফারেন্স দিতে পারি নে, পণ্ডিতসভায় বোকার মতো কেবল নিজের বকুনি দিয়েই বিদ্যের অভাব চাপা দিয়ে রাখি। কাব্যালোচনা-সভায় প্যারাফ্রেজ ও প্যারাল্যাল প্যাসেজ মাথায় জোটে না বলে কবিতা রচনা করে নিজের মান রাখি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুমি পড়ে যাচ্ছ আর হাসছ মনে মনে এবং প্রকাশ্যে। বলছ, এটা হল ফাঁকা বিনয়, অহংকারের বস্তা। উপায় নেই—সমাজনীতি-অনুসারে সত্যের খাতিরে অন্যকে প্রশংসা করতে পারি নিজেকে নয়। আত্মস্তুতি মনে মনেই করতে হয় তাতে পাপ বাড়ে বৈ কমে না। আসল কথা, স্বদেশ থেকে বিদেশে এলেই আত্মগৌরব অত্যন্ত বেড়ে ওঠে। যার কপালে ঠাণ্ডা জলও জোটে না সে হঠাৎ পায় শ্যাম্পেন। তখন তোমাদের অধ্যাপকমণ্ডলীকে ডাক দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, ওগো মাস্টারমশায়েরা, আমাকে তোমাদের ছাত্র বলে হঠাৎ ভ্রম কোরো না, আমি যে পেপারগুলো লিখেছি তাতে তোমাদের একজামিনেশন পেপার-এর মার্কা দিয়ো না, কেননা সেগুলো তোমাদের এখানকার অধ্যাপকেরা দাবি করেন। তুমি জান আমি স্বভাবত বিনয়ী, স্বদেশী মাস্টাররা মেরে মেরে আমাকে অহংকারী করে তুললে। এজন্যে মনে মনে প্রায়ই লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু সত্যি কথা বলি তোমাকে, খ্যাতি-সম্মান পেয়েছি প্রচুর, তবু মন ভারতসমুদ্রের পারের দিকে তাকিয়ে থাকে। শান্তিনিকেতন থেকে খুকু লিখেছে, 'কাল খুব ঝমাঝম বৃষ্টি গেছে, আজ সকালে উঠেছে কাঁচা সোনার মতো রোদ।'—ঐ কথা ক'টা যেন সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিলে; মন ধড়ফড় করে উঠল; বললে, আচ্ছা তাই সই, যাব সেই অধ্যাপকবর্গে, তারা যদি আমাকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দেয় তবু তো খোলা জানলা দিয়ে কাঁচা সোনার মতো রোদ পড়বে আমার ললাটে, সেই হবে আমার বরমাল্য। ইতিমধ্যে ভানুসিংহের পত্রাবলী নতুন ছাপা হয়ে পড়ল আমার হাতে এসে। শান্তিনিকেতনের বর্ষার মেঘ ও শরতের রৌদ্রে পরিপূর্ণ সেই চিঠিগুলি। দূরদেশে এসে সেই চিঠিগুলি পড়ছি বলে সেগুলো এত পরিস্ফুট হয়ে উঠল। ক্ষণকালের জন্যে ভুলে গেলুম—কোথায় আছি। এত তফাত। এখানকার ভালো আর সেখানকার ভালোয় প্রভেদটা এখানকার সংগীত

আর সেখানকার সংগীতের মতো। য়ুরোপের সংগীত প্রকাণ্ড এবং প্রবল, এবং বিচিত্র, মানুষের বিজয়রথের উপর থেকে বেজে উঠছে; ধ্বনিটা দিগ্‌দিগন্তের বক্ষস্থল কাঁপিয়ে তুলছে। বলে উঠতেই হয়, বাহবা! কিন্তু আমাদের রাখালী বাঁশিতে যে-রাগিণী বাজছে, সে আমার একলার মনকে ডাক দেয় একলার দিকে, সেই পথ দিয়ে যে পথে পড়েছে বাঁশবনের ছায়া, চলেছে জলভরা কলসী নিয়ে গ্রামের মেয়ে, ঘুঘু ডাকছে আমগাছের ডালে, আর দূর থেকে শোনা যাচ্ছে মাঝিদের সারিগান— মন উতলা করে দেয়, চোখটা ঝাপসা করে দেয় একটুখানি অকারণ চোখের জলে। অত্যন্ত সাদাসিধে, সেইজন্যে অত্যন্ত সহজে মনের আঙিনায় এসে আঁচল পেতে বসে। আমার নিজের সেদিনকার চিঠি যেন আমার আজকের দিনকে লেখা। কিন্তু জবাব ফিরিয়ে দেবার জো নেই। সেদিনকার ডাকঘর বন্ধ। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চিঠি বন্ধ করা যাক। সামনে আছে, যাকে বলে এনগেজমেন্ট; আর আছে ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। ইতি ৮ অগস্ত্য ১৯৩০

৪৯

বাংলাভাষায় একটা শব্দ প্রচলিত হয়েছে, 'সাময়িক পত্র'। কিন্তু পত্রপুটে সময়কে ধরবার এবং পাঠাবার উপায় নেই। জর্মনিতে যখন আমার ছবির আসর জমেছিল তার সংবাদ পৌঁচেছে কবে জানি নে— অথচ আজ তোমার চিঠিতে যখন জানলুম ছবির খবর তোমরা পাও নি তখন সেই খবরের সময়ও নিশ্চয় পেরিয়ে গেছে। এদিকে আজ আমার জর্মনির পালা সাঙ্গ হল, কাল যাব জেনিভায়। এ পত্র পাবার অনেক আগেই জানতে পেরেছ যে জর্মনিতে আমার ছবির আদর যথেষ্ট হয়েছে। বর্লিন ন্যাশনাল গ্যালারি থেকে আমার পাঁচখানা ছবি নিয়েছে। এই খবরটার দৌড় কতটা আশা করি তোমরা বোঝ। ইন্দ্রদেব যদি হঠাৎ তাঁর উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া পাঠিয়ে দিতেন আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্যে তা হলে আমার নিজের ছবির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতুম। কিন্তু এ-সব কথা আমার আলোচনা করবার উৎসাহ হয় না— কে জানে কেন। বোধ হয় আমার মনের ভিতরে একটা বৈরাগ্য আছে, আমাদের দেশের সঙ্গে আমার চিত্র-ভারতীর সম্বন্ধ নেই বলে মনে হয়। কবিতা যখন লিখি তখন বাংলার বাণীর সঙ্গে তার ভাবের যোগ আপনি জেগে ওঠে। ছবি যখন আঁকি তখন রেখা বল রঙ বল কোনো বিশেষ প্রদেশের পরিচয় নিয়ে আসে না। অতএব এ জিনিসটা যারা পছন্দ করে তাদেরই, আমি বাঙালি বলে এটা আপন হতেই বাঙালির জিনিস নয়। এইজন্যে স্বতঃই এই ছবিগুলিকে আমি পশ্চিমের হাতে দান করেছি। আমার দেশের লোক বোধ হয় একটা জিনিস জানতে পেরেছে যে আমি কোনো বিশেষ জাতের মানুষ নই; এইজন্যেই ভিতরে ভিতরে তারা আমার প্রতি বিমুখ, কটূক্তি করতে তাদের একটুও বাধে না। আমি যে শতকরা একশো হারে বাঙালি নই, আমি যে সমান পরিমাণে য়ুরোপেরও, এই কথাটারই প্রমাণ হোক আমার ছবি দিয়ে।

অনেক পূর্বপরিচিত জায়গা দিয়ে ঘুরে এলুম, তেমনি করে বক্তৃতাও দিয়েছি। কিন্তু এই যাত্রায় আগের বারের চেয়ে জর্মনির অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে আমার প্রবেশাধিকার ঘটেছে। ওদের কাছাকাছি এসেছি। এদের মধ্যে যে যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বজাতীয়তা আছে তা নয়, য়ুরোপের অন্য সকল জাতের হাতের ঠেলা খেয়ে এরা ভিতরে ভিতরে খুব কঠোরভাবেই ন্যাশনালিস্ট হয়ে উঠেছে। অথচ আমার উপরে এদের একটা বিশেষ প্রীতি কেন আছে ঠিক ভেবে পাই নে। আর যাই হোক অসামান্য এদের শক্তি, প্রকাণ্ড এদের বুদ্ধি, তা ছাড়া সব জিনিসকে সমষ্টিকরণের ক্ষমতা এদের আশ্চর্য। আমার তো মনে হয় য়ুরোপের কোনো জাতেরই সকল বিষয়েই এত বেশি জোর নেই। জর্মনির বিভীষিকা ফ্রান্সের মনে কিছুতেই যে ঘুচতে চায় না তার মানে বুঝতে পারি। এরা ভয়ংকর এক-রোখা। দারিদ্র্যের ঠেলা খেয়েই এদের শক্তি আরও যেন দুর্দম হয়ে উঠেছে।

বিশ্বজাতীয়তার উদ্যম সংঘীভূত হয়ে উঠেছে জেনিভায়। লীগ অব নেশনে ঠিক সুর বাজে

নি—হয়তো বাজবেও না—কিন্তু আপনা-আপনিই ঐ শহর সমস্ত জগতের মহানগরী হয়ে উঠছে। যাদের প্রকৃতি বিশ্বপ্রাণ তারা আপনা-আপনি ঐখানে এসে মিলবে। ঐ ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের একটা মহাকল্যাণশক্তির উদ্‌বোধন ঘটছে বলে আমার বিশ্বাস। ইতি ১৮ অগস্ট ১৯৩০

৫০

যাই যাই করতে করতে এতদিন পরে যাবার সময় কাছে এল। প্রায় এক বৎসর কাটবে। যতদিন য়ুরোপে ছিলুম লাগছিল ভালো। আমেরিকায় গিয়ে মনটা যেন চাপা পড়ল, শরীরেও খুব একটা ধাক্কা লেগেছিল। আমেরিকায় বাইরে বলে পদার্থটা বড়ো বেশি উগ্র এবং চঞ্চল, কিছুদিন নিরন্তর নাড়া খাওয়ার পরে ভারি একটা বৈরাগ্য আসে। আমি সেই অবস্থায় আছি, অন্তরের মধ্যে আশ্রয় পাবার জন্যে কিছুকাল থেকে একটা ব্যাকুলতা লেগে আছে। নানান কাণ্ডকারখানা নিয়ে চিত্ত আমার বহির্মুখ হয়ে পড়েছিল, নিজের সত্য যেখানে সেখানকার তালা-চাবিতে মরচে পড়ে আসছিল। এমন সময় আমেরিকায় এসে চোখে পড়ল মানুষ কতই অনাবশ্যক ব্যর্থতায় সমাজকে একঝোঁকা করে তুলেছে, আবর্জনাকে ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে সাজিয়েছে, আর তারই পিছনে দিনরাত্রি নিযুক্ত হয়ে আছে, পৃথিবীর বুকের উপর কী অভ্রভেদী বোঝা চাপিয়েছে। এই-সমস্ত জবড়জঙ্গের বিষম ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রাণ যখন অস্থির হয়ে ওঠে তখন ভিতরকার মানুষের চিরন্তনের দাবি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সন্ধ্যাবেলায় ধেনুকে গোষ্ঠে ফেরাবার মতো নিজের ছড়িয়ে পড়া আপনাকে আপনার গভীরের মধ্যে প্রত্যাহরণ করে আনার জন্যে ডাক দিচ্ছি। হয়তো জীবনের অপরাহ্ণের উপর প্রদোষের ছায়া নেমেছে, মনের যে শক্তি নিজের উদ্যমকে বাইরের নানা কাজে নানা দিকে চালান করে দিয়েছিল তার মেয়াদ শেষ হয়ে এল—দেউড়ির দ্বারী সদর দরজা বন্ধ করবে বলে ঘণ্টা দিয়েছে, অন্দরমহলে দীপ না জ্বাললে আর চলবে না।

অনেক দিন কিছু লিখি নি—লিখতে ইচ্ছেই করে না—তার মানে প্রকাশ করবার শক্তি পরিশিষ্টে এসেছে; তার তহবিলে বাড়তির অংশ নেই বলেই সহজেই সে বাইরের বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়েছে—অথচ সেটা খারাপ লাগছে না—ভিতরে ফল যদি ধরে তবে ফুলের পাপড়ি ঝরলে লোকসান নেই।

আগামী ৯ই জানুয়ারিতে নার্কন্ডা জাহাজে (P & O) যাত্রা করব, মাসের শেষে পৌঁছব দেশে। ইতি ২৯ ডিসেম্বর ১৯৩০

৫১

যেটা আমার নিত্য কাজ এতদিন পরে দেখছি সেটাতে আমার মন বসছে না। মন চঞ্চল হয়েছে বলেই যে এটা ঘটল তা নয়, মন স্তব্ধ হয়েছে বলেই বাহিরের তাড়ায় সে আর আগের মতো সাড়া দিতে চায় না। ডুবো জাহাজ থেকে মাল তোলবার একটা ব্যাবসা আছে, সেই কাজের ডুবারীর মতো অবকাশের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে নিজের সমস্ত ডুবে যাওয়া দামী দিনগুলিকে উদ্ধার করে আনবার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠছে। অন্য সব কাজের পক্ষে যে উদ্যম আবশ্যক তার তেজ বোধ করি ক্রমেই কমে এল তাই এই গোধূলির আলোয় নিজের অন্তরতর সঙ্গলাভ করবার জন্যে মনটা আজ আত্মনিবিষ্ট হয়ে আছে।

শরৎকালের মতো ভাবগতিক। মেঘও আছে স্তূপে স্তূপে, রৌদ্রও আছে খরতর, দুটোই একসঙ্গে। শ্রাবণ তেড়ে এসে এক-একদিন নিজেকে সপ্রমাণ করবার চেষ্টা করে, খুব ঝমাঝম বৃষ্টি পড়ে, মাঠ ভেসে যায়, বড়ো বড়ো গাছগুলো তাদের অচল গাম্ভীর্য ভুলে গিয়ে মাতামাতি করতে থাকে। তার পরেই দেখি পালা শেষ হয়ে যায়, আকাশ কে যেন নিকিয়ে দিয়ে গেল, শূন্য আকাশটায় জাজিম বিছিয়ে দিয়ে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ এসে দখল জারি করে। চেয়ে চেয়ে দেখি, আর এক-একবার

মনের মধ্যে এই কথাটা আসে, যে, এইরকম দেখে নেওয়াটা দুর্লভ। ভিতর থেকে কে এই-সব দেখিয়ে দিলে এই সত্তরটা বছর— কত চলতি মুহূর্তের খেয়ায় বোঝাই করা কত আশ্চর্য রকমের যোগাযোগ।

তোমরা কি এবারকার হপ্তাশেষের রেলপথে এ অঞ্চলে আসছ। একটা জরুরি কাজে প্রশান্তকে ডেকেছিলুম। ইতি ১৮ শ্রাবণ ১৩৩৮

৫২

মেঘদূতের মন্দাক্রান্তাছন্দে বৃষ্টিবাদল হয়ে গেল কিছুদিন। বৈশাখের রৌদ্রকে কালো ভিজে ব্লটিং চাপা দিয়ে শুষে নিয়েছিল। দুদিন ফাঁক পড়তেই বৈশাখ আবার আকাশে বাগিয়ে বসেছিল তার আগুন-রঙের চিত্রপটখানা, তার জ্বলন-লেপা তুলি নিয়ে। আজ আবার দেখি দিগন্তের প্রাঙ্গণে মেঘদূতের উঁকিঝুঁকি কানাকানি। এ বছরটার গ্রীষ্মের আসরে দুই পক্ষে বোধ করি এইরকম ছড়া-কাটাকাটি চলবে। তবে আর পাহাড় পর্বতের দিকে ছুটোছুটি করব কিসের প্রত্যাশায়।

ঠিক যে সময়ে বৃষ্টি আসন্ন এমন একটা লগ্ন দেখে যদি আসতে পার তা হলে তাপ বা পরিতাপ বোধ করবে না। আগামী অমাবস্যার ডাক পড়েছে, চাঞ্চল্য তাই দেখছি আকাশে— শ্যামলের মজলিস জমবে বোধ হচ্ছে। দেখে রৌদ্রতপ্ত আঁখি জুড়িয়ে যাবে। আর-এক দফায় পাঁচ পয়সার খরচ লিখলুম খাতায়। ইতি ৮ বৈশাখ ১৩৩৯

৫৩

গাছপালাগুলো দুলছে— হাওয়া দিয়েছে পশ্চিমের দিক থেকে। রোদ্দুরে সোনার রঙ ধরেছে। এই রঙটাতে মন ভোলায়— অনির্দিষ্ট কোন্ সুদূরের জন্যে মন কেমন করে। মানুষের মন দুই বাসার পাখি, একটা কাছের বাসা, একটা দূরের। শরৎকালটা হচ্ছে দূরের কাল— আকাশের আবরণটা উঠে গেছে কিনা, আর যে আলোটা সমস্ত ভাবনাকে রাঙিয়ে তোলে সেটা যেন দিগন্তপারের প্রাসাদ-বাতায়ন থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে আসছে, আর তারই সঙ্গে ভেসে আসছে একটি অশ্রুত ধ্বনির সানাইয়ে মুলতানের আলাপ। এখন বেলা তিনটে হবে— রথী বৌমা পুপে এই ট্রেনে যাত্রা করছে দার্জিলিঙের উদ্দেশে। আজ ছুটি-পাওয়া ছেলেমেয়ের দলও চলল বাড়িমুখে। আজ অপরাহ্ণের আকাশে এই যানেওয়ালাদের স্রোতের টান ধরেছে— মনে হচ্ছে ঐ শিউলিগাছগুলোও উন্মনা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দুটো-একটা চলতি মেঘের দিকে তাকিয়ে। মনকে বোঝাচ্ছি, কর্তব্য আছে— কিন্তু আজ এই দিগন্তব্যাপী ছুটির বেলায় কর্তব্যটা উজোনের নৌকো, গুণ টেনে হাঁপিয়ে মরতে হবে— প্রাণটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ছুটির ঘণ্টা বাজছে আমার বুকের মধ্যে, শিরায় শিরায় রব উঠছে দৌড় দৌড় দৌড়। কিন্তু হায় রে, আমার বয়েস আমাকে শিকল দিয়ে বেঁধেছে— স্থাবর শক্তিকে নড়তে গেলে অনেক টানাটানির দরকার, ফস্ করে কোমর বেঁধে বেরিয়ে পড়লেই হল না। তাই ডাঙার বটগাছের মতো মস্ত ছায়া মেলে তাকিয়ে দেখছি, ঢেউগুলো লাফ দিয়ে দিয়ে চলেছে রৌদ্রে ঝিলমিল করতে করতে— তাদের সঙ্গে সুর মেলাতে চায় আমার অন্তরের মর্মরধ্বনি— কিন্তু তাতে দীর্ঘনিশ্বাসের সুর লাগে। আমিও তো যানেওয়ালা, কিন্তু আমার যাত্রা একান্ত ডুবে-যাওয়ার দিকে, সামনের পথে ছুটে যাওয়ার দিকে নয়। ছুটির এই চঞ্চলতা কাল পরশুর মধ্যেই শান্ত হয়ে যাবে, তখন মনের পালে উদাস হাওয়ার বেগ যাবে কমে, তখন কর্মহীন প্রহরগুলোর স্তব্ধতার মাঝখানে বসে ঐ বিলিতি নিমের নিঃশব্দ বীথিকার দিকে চুপ করে চেয়ে থাকবার সময় আসবে।

অভিনয়ের খবর দিতে অনুরোধ করেছিলে, তারই ভূমিকাটা লেখা হল। অভিনয়টা হয়ে চুকে গেছে এই খবরটাতেই মন আছে ভরে। ওস্তাদজি গান বন্ধ করলেন— এসরাজের তার দিলে আলগা

করে, বন্ধ রঙ্গমঞ্চের সাজসজ্জা সব খুলে ফেলেছে— ছেলেরা প্রায় কেউ নেই, কুকুরগুলো আসন্ন উপবাসের উদ্‌বেগ মনে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আসল খবরটা দিয়ে ফেলি। ভালোই হয়েছিল অভিনয়, দেখলে খুশি হতে, মেয়েরা নাচে নি, নেচেছিল ছেলেরা, সেটা পীড়াজনক হয় নি।

বৌমা পুপে বিদায় নিয়ে গেল। হঠাৎ আজ লাল এসে পেঁচেছে, তাই রথী আজ যেতে পারলে না— কাল যাবে বলে জনরব। তোমার ঘরে সঙ্গের অভাব নেই— মিস্ত্রিদের নিয়ে দিন ভরতি হয়ে আছে। কবে যাবে গিরিডিতে। ৩ অক্টোবর ১৯৩২

৫৪

মনে পড়ছে সেই শিলাইদহের কুঠি, তেতলার নিভৃত ঘরটি— আমের বোলের গন্ধ আসছে বাতাসে— পশ্চিমের মাঠ পেরিয়ে বহুদূরে দেখা যাচ্ছে বালুচরের রেখা, আর গুণটানা মাস্তুল। দিনগুলো অবকাশে ভরা— সেই অবকাশের উপর প্রজাপতির ঝাঁকের মতো উড়ে বেড়াচ্ছে রঙিন পাখাওয়ালা কত ভাবনা এবং কত বাণী। কর্মের দায়ও ছিল তারই সঙ্গে— আর হয়তো মনের গভীরে ছিল অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, পরিচয়হীন বেদনা। সব নিয়ে ছিল যে আমার নিভৃত বিশ্ব সে আজ চলে গিয়েছে বহুদূরে। এই বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে ছিল আমার পরিণত যৌবন— কোনো ভারই তার কাছে ভার ছিল না— নদী যেমন আপন স্রোতের বেগেই আপনাকে সহজে নিয়ে চলে, সেও তেমনি আপনার ব্যক্ত অব্যক্ত সমস্ত কিছুকে নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে চলেছিল— যে ভবিষ্যৎ ছিল অশেষের দিকে অভাবনীয়। এখন আমার ভবিষ্যৎ এসেছে সংকীর্ণ হয়ে। তার প্রধান কারণ যে লক্ষ্যগুলো এখন আমার দিনরাত্রির প্রয়াসগুলিকে অধিকার করেছে তারা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। তার মধ্যে অচরিতার্থ অসম্পূর্ণ আছে অনেক কিন্তু অপ্রত্যাশিত নেই। এইটেতেই বোঝা যায় যৌবন দেউলে হয়েছে, কেননা যৌবনের প্রধান সম্পদ হচ্ছে অকৃপণ ভাগ্যের অভাবনীয়তা। তখন সামনেকার যে অজানা ক্ষেত্রের ম্যাপ আঁকা বাকি ছিল মাইলপোস্ট্ বসানো হয় নি সেখানে, সম্ভবপরতার ফর্দ তলায় এসে ঠেকে নি। আমার শিলাইদহের কুঠি, পদ্মার চর, সেখানকার দিগন্তবিস্তৃত ফসল-খেত ও ছায়ানিভৃত গ্রাম ছিল সেই অভাবনীয়কে নিয়ে, যার মধ্যে আমার কল্পনার ডানা বাধা পায় নি। যখন শান্তি-নিকেতনে প্রথম কাজ আরম্ভ করেছিলাম তখন সেই কাজের মধ্যে অনেকখানিই ছিল অভাবনীয়, কর্তব্যের সীমা তখন সুনির্দিষ্ট হয়ে কঠিন হয়ে ওঠে নি, আমার ইচ্ছা আমার আশা আমার সাধনা তার মধ্যে আমার সৃষ্টির ভূমিকাকে অপ্রত্যাশিতের দিকে প্রসারিত করে রেখেছিল— সেই ছিল আমার নবীনের লীলাভূমি— কাজে খেলায় প্রভেদ ছিল না। প্রবীণ এল বাইরে থেকে, এখানে কেজো লোকের কারখানাঘরের ছক কেটে দিলে, কর্তব্যের রূপ সুনির্দিষ্ট করে দিলে, এখন সেইটের আদর্শকে নিয়ে ঢালাই পেটাই করা হল প্রোগ্রাম— হাপরের হাঁপানি-শব্দ উঠছে, আর দমাদম চলছে হাতুড়ি-পেটা। যথা-নির্দিষ্টের শাসন আইনে-কানুনে পাকা হল, এখানে অভাবনীয়কেই অবিশ্বাস করে ঠেকিয়ে রাখা হয়। যে পাথিকটা একদিন শিলাইদহ থেকে এখানকার প্রান্তরে শালবীথিচ্ছায়ায় আসন বিছিয়ে বসেছিল তাকে সরতে সরতে কতদূরে চলে যেতে হয়েছে তার আর উদ্দেশ মেলে না— সেই মানুষটার সমস্ত জায়গা জুড়ে বসেছে অত্যন্ত পাকা গাঁথুনির কাজ। মাঝখানে পড়ে শুকিয়ে এল কবির যৌবন, বৈশাখে অজয় নদীর মতো। নইলে আমি শেষদিন পর্যন্তই বলতে পারতুম আমার পাকবে না চুল, মরব না বুড়ো হয়ে। জিত হল কেজো লোকের। এখন যে কর্মের পত্তন তার পরিমাপ চলে, তার সীমানা সুস্পষ্ট, অন্য বাজারের সঙ্গে তার বাজারদর খতিয়ে হিসাব মিলবে পাকা খাতায়। মন বলছে, ‘নিজবাসভূমে পরবাসী হলে।’ এর মধ্যে যেটুকু ফাঁকা আছে সে ঐ সামনে যেখানে রক্তকরবী ফোটে, সে দিকে তাকাই আর ভুলে যাই যে পাঁচজনে মিলে আমাকে কারখানাঘরের মালিকগিরিতে চেপে বসিয়ে দিয়ে গেছে। ইতি ৮ এপ্রেল ১৯৩৫

৫৫

ব্যালাটন ফ্যুরেডের ছবিটির উপরে কালের দূরত্বের ছায়া আছে। অনুভব করলুম তখনকার ঘাট থেকে পাড়ি দিয়ে যে পরপারের কাছে এসে পৌঁচেছি সেখান থেকে ঐদিনকার দৃশ্য স্বপ্নের মতো দেখায়! এক জীবনের মধ্যেই কত জন্মান্তর ঘটে সেই কথাই ভাবি। সেদিনকার বাগান থেকে হয়তো ফুল সঙ্গে আনা যায় কিন্তু সেই বাগানের পথটা লুপ্ত। পরিবর্তমান সময়ের সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে চলতে হবেই, অতীতের সঙ্গে পদে পদে হিসেব চুকিয়ে না দিয়ে উপায় নেই। সেই হিসাবের পুরানো খাতাটা মাঝে মাঝে হাতে পড়ে কিন্তু পুরানো তহবিলটার উপর দাবি খাটে না। পিছন থেকে কেবলই ধাক্কা আসছে, 'চলো, চলো, নিজের রাস্তা নিজে রোধ করে দাঁড়িয়ে থেকো না।' চলেইছি, চলেইছি, পিছনের দিগন্তে পথচিহ্নগুলো একে একে ঝাপসা হয়ে আসছে।

রাজার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা-নৃত্যাভিনয়ের মহড়া সমানই চলছে। খুব ভালো লাগছে। আর সবই অস্পষ্ট অবাস্তব ঠেকতে পারে কিন্তু আর্ট জিনিসটাকে সত্য অত্যন্তই মানতে হয়। কেননা তার তো বয়স নেই—আমাদের প্রাত্যহিক সংসারের খাঁচায় তার বাস নয়, অমরাবতীর আকাশে চলে সে রঙিন পাখা মেলে, মনটা যতক্ষণ সওয়ার হয়ে থাকে তার পিঠে ততক্ষণ ভুলে থাকে আপন ধুলোর রাস্তায় ভ্রমণের ক্লান্ত ভাগ্যকে।

জিজ্ঞাসা করেছ কবে কলকাতায় যাব। হয়তো ৬ই ফেব্রুয়ারি অথবা তারই কাছাকাছি কোনো-সময়ে। নিশ্চিত তারিখটা বলার অভ্যেস আমার কোনোকালে নেই, এ সম্বন্ধে স্পষ্ট খবর জানলেও সেটা অস্পষ্ট হয়ে আসে। চিঠিতে আন্দাজে আমি তারিখ বসিয়ে দিই—সেই আন্দাজের বহর অনেক সময়ে খুব মস্ত। অতএব বলে রাখলুম আমার চিঠিকে কখনো গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার কাজে লাগিয়ো না। ইতি বোধ করি ২২ জানুয়ারি ১৯৩৬

৫৬

তথাস্তু। চললুম। কলকাতায় এক-আধ দিন কাজ আছে—আরও বেশি কাজ আছে শান্তিনিকেতনে। দশ হাজার টাকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে অত্যন্ত বিচলিত হই নি। এ পর্যন্ত আমার কুষ্ঠিতে ব্যয়ের স্থানের চঞ্চলতা। আয়ের সংবাদ নিয়ে যাঁরা আনন্দ করবেন তাঁদের সঙ্গে আমার তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই। টাকাটাও পূর্বপ্রতিশ্রুত অতএব প্রাপ্তি উপলক্ষে নূতন পুলকসঞ্চারের কারণ নেই। ইতিমধ্যে কা— মসূরি থেকে আমার দর্শনের জন্যে এসে দুদিন কাটিয়ে গেছেন। তাঁর দুঃখের দিনে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে পেরেছিলুম, সে কথা ভুলতে পারেন নি—এইটেই আমার যথার্থ পুরস্কার। দৈব সুযোগে এমন কিছু দিতে পারা যায়—প্রতিদান অক্ষয় হয়ে থাকে, শ্রদ্ধা যার ম্লান হয় না। যখন কোনো উপলক্ষে আবিষ্কার করা যায় যে আমার কিছু সম্পদ আছে যা বিশুদ্ধভাবে দানেরই জন্য, তখন নিজের সেই মূল্য উপলব্ধি করে কৃতজ্ঞ হই ভাগ্যবিধাতার কাছে। অন্যকে দান করতে পারাই সব চেয়ে বড়ো দান নিজের প্রতি। হয়তো এই দানের ধারা সাহিত্যের ভিতর দিয়ে কিছু কিছু প্রবাহিত হয়ে থাকবে—কিন্তু সেটা অত্যন্ত বেশি নৈর্ব্যক্তিক। প্রত্যক্ষ কৃতজ্ঞতার দীপ্তি তাতে অন্তরালে পড়ে, তার মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে খ্যাতি নিন্দার বিচার। তাতে আমার লোভ ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে এসেছে। মানুষের বুদ্ধির যাচাইয়ের চেয়ে মানুষের হৃদয়ের অর্ঘ্য অনেক বেশি মূল্যবান। সেটাকেও যেন আত্মদানের সহজ পন্থা দিয়েই পাওয়া সম্ভব হয়—তার জমা ওয়াসিল বাকির খাতাটা যেন চিতাভস্মের পূর্বেই সম্পূর্ণ ভস্মসাৎ হতে পারে এই কামনা করছি—পরশু যাব আমরা। বিদায়কালের দিনগুলি মধুর হয়ে উঠেছে। বসন্তকালের মতো আতপ্ত, শরৎকালের মতো নির্মল। নীল আকাশে বরফের পাহাড়গুলি অত্যন্ত একটি কোমল শুভ্রতা ও লাবণ্য বিস্তার করেছে। এর থেকে যে ভাষা প্রকাশ পায় কোনোমতেই তার উত্তর দিতে পারি নে। কত অল্পই বলা হয়েছে। সেই অকথিত বেদনা কি সঙ্গে থেকে যাবে। ইতি ২৪।৬।৩৭

৫৭

তুমি রেগে বসে আছ বরানগরে, আর আমি রেগে বসে আছি শান্তিনিকেতনে। মাঝখানে ৯৯ মাইলের ব্যবধান বলে কোনো অপঘাতের সম্ভাবনা নেই। তোমরা মেয়েরা আজকাল কাগজে প্রায় নিজেদেরই দয়ামায়াপ্রবণ চিত্তবৃত্তি এবং মাতৃধর্ম নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে ব্যস্ত আছ, তা না করে যদি অবসরমত দুই-একখানা দেড় পৃষ্ঠা আন্দাজ চিঠি লিখতে তা হলে রোগদুঃখসন্তপ্ত সংসারে অনেকখানি সান্ত্বনা দিতে পারতে। চার পয়সা দামের একখানা প্রশ্ন যে, শরীরটা আছে কেমন, তার সঙ্গে দুটো লাইন অত্যুক্তি জুড়ে দেওয়া যে 'খবর না পেয়ে উৎকণ্ঠায় দিন যাপন করছি'— এর মূল্য চার পয়সা ছাড়িয়ে কত সংখ্যায় গিয়ে পৌঁছয় তার সীমা নেই। আমার বোলপুর যাত্রার প্রথম দিনকার খবরটা বিবৃতির যোগ্য। সেক্রেটারি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, রসুলপুর— বলতে বলতে দুই চক্ষু ভাবাবেশে মুদে এল। পৌঁছলুম রসুলপুরে, অপরাহ্নের রৌদ্রে বেনারসির শাড়ির আঁচলা জড়িয়ে দিয়েছে বনশ্রীর শ্যামলচিক্কণ দেহ ঘিরে। এ কথা সত্য যে রেল-ডিঙোনো ঊর্ধ্বসেতুর ঔদ্ধত্য নেই সেখানে। পদচালনা করে স্টেশনঘর পর্যন্ত যেতে যেতে মনে হল বুক বিদীর্ণ হয়ে যাবে। শেষের দশ পা বাকি থাকতে পড়ে গেলুম অসমর্থ দেহে। এই প্রথম পতন— শেষ পতনে গিয়ে পৌঁছবার উপক্রমণিকা। একটা চৌকিতে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলে, দেহমর্যাদানাশের দৃশ্যে হেসে উঠতে পারে, এমন রসিকা নারী তখন কেবলমাত্র উপস্থিত ছিলেন আমার ভাগ্যদেবী। এর থেকে বুঝতে পারবে শরীরের উপর অকুণ্ঠিত মনে নির্ভর করবার দিন আমার গেছে— বিশ্বাসঘাতক হঠাৎ একদিন নিশ্বাসঘাতকতা করবে বলে সন্দেহ হচ্ছে। করুণ হৃদয়ে উৎকণ্ঠা উৎপাদনের আনন্দ সম্ভোগ করবার ইচ্ছায় খবরটা বিস্তারিত করে জানালুম। আশা করি যথোচিত দুঃখ বোধ করবে— এই দুঃখ, রাগের তাপ নিবারণের বেলেস্তারার কাজ করতেও পারে।

বাষ্পভারমন্থর বাতাসের মধ্যে আবৃত হয়ে আছি— রাত্রে যখন সুখনিদ্রার প্রত্যাশা ত্যাগ করতে হয় তখন একাধিক সহস্র রজনীর আয়োজনের কথা স্মরণ করে মন লুব্ধ হয়— ঘন ঘন হাতপাখা সঞ্চালন করে দুরাশাটাকে উড়িয়ে ফেলতে চেষ্টা করি। এঞ্জিন যায় বিগড়িয়ে, মনটা তার সঙ্গে যোগ দেয়।

তোমাদের বরানগরের নতুন বাসায় আমার স্থান সংকুলান হবে এ কথাটা মনে রাখলুম। স্থান হয় তো অবসর হয় না— সুযোগ বিদ্রূপ করতে থাকে— উপরের দিকে কল খুলে দেয়, ঘড়ার তলায় রেখে দেয় ছেঁদা। কোনো এক সময়ে দেশকালপাত্রের সামঞ্জস্য হবেই। অলমতিবিস্তরেণ। ইতি

৯ জুলাই ১৯৩৭

৫৮

নিজের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে আমি যেন সপ্তম শতাব্দীর একটা ভগ্নাবশেষ— অধিকাংশ মহলটাই কাজের বার হয়ে গেছে, কেবল একটা অংশে শেলাই-করা চট আর কেরোসিনের টিনে মিলিয়ে একটা বাসা তৈরি করা আছে, উইয়ে-কাটা প্যাকবাক্সের উপরে বসে আছি। বসে বসে চেয়ে আছি বাইরের দিকে— গরমে ফলের গুটি-ঝরে-পড়া আমগাছ ছেয়ে গেছে নিবিড় কচি পাতায়; ফুলের অর্ঘ্য আকাশের দিকে তুলে ধরে দাঁড়িয়ে আছে পাতাহীন গোলকচাঁপার আঁকাবাঁকা ডালের গাছ, লাল কাঁকরের রাস্তার ধারে অশোক গাছ দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর প্রথম অশোকগুচ্ছ ধরিয়েছে ঐ কাঁকরেরই মতো ঘন লাল রঙের। আমার এই জীর্ণ দেহের জানলার ফাঁক দিয়ে এখনো মোকাবিলা চলেছে বাইরের জগতের সঙ্গে, কিন্তু মনে হচ্ছে ওর উপরে ক্রমে আড়াল করে আসছে একটা ঝুঁকে-পড়া ভাঙা ছাত। অকস্মাৎ দৃষ্টি ঝাপসা হতে আরম্ভ করেছে। শেষ বয়সে মস্তিষ্ক যখন ক্লান্ত হবে তখন ছবি এঁকে দিন যাবে এই ভরসা করে ছিলুম, কিন্তু সন্দেহ ধরিয়ে দিয়েছে।

বাইরের সঙ্গে আনাগোনার রাস্তা যদি বন্ধ হয়ে যায় তা হলে আপন অন্তর্লোকে নির্জনবাসের একটা পালা আরম্ভ হবে, হয়তো তাতে মৃত্যুর উপক্রমণিকার একটা অভিজ্ঞতা লাভ করব—হয়তো তারও একটা কোনো রকমের সার্থকতা আছে—আগাম কল্পনায় যে শূন্যতার আশঙ্কা করি সেটা হয়তো মিথ্যা। কিন্তু যেটা মনে করতে সকলের চেয়ে খারাপ লাগে সে হচ্ছে দেহযাত্রায় পরের উপর নির্ভরতা—আশা করি এঞ্জিন একেবারে বিগড়বার পূর্বেই শেষ টর্মিনাসে এসে থামব; অসমাপ্ত পথের মাঝখানে ঠেলাগাড়ির জন্যে কুলি ডাকতে হবে না।

খুবই গরম। কিন্তু গরম নিয়ে নালিশ করতুম না যদি আমার চোখের দুর্বলতার জন্যে ঘর অন্ধকার করে থাকতে না হত। জীবনে গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নকে এই প্রথম দরজার বাইরে খেদিয়ে রেখেছি। ইতি ৩১।৩।৩৮

৫৯

নির্মল নীল আকাশ, কাঁচা সোনা-রঙের রোদ্দুর, পাতলা রেশমি চাদরে ঢাকা ছোটো পাহাড়গুলির ঊর্ধ্বে নগাধিরাজের তুষারকিরীটী মহিমা, মহাদেবের ধ্যানোদ্দীপ্ত শুভ্র ললাট। আমাদের কাছের অধিত্যকার বনে বনে স্নিগ্ধ চিক্কণ পুঞ্জীভূত সবুজে লেগেছে পরশমণির স্পর্শ, পাতায় পাতায় জেগেছে সোনার রোমাঞ্চ, নীল নিস্তব্ধতার উপর পাখিদের মিশ্রিত কাকলি নীলাম্বরী কাপড়ের উপর জরির কাজের মতো ঝিলিমিলি করছে। এইমাত্র খেয়ে উঠলুম, একটা আম, গোটাকতক লিচু, টোস্ট-করা রুটি, পাহাড়ী গোষ্ঠের মাখনে আর পাহাড়ী মৌচাকের মধুতে লিপ্ত। এসে বসেছি মুক্তম্বার ঘরে। প্রচুর আলোতে আমার মন গিয়েছে তলিয়ে, আমার উড়ো ভাবনা ঝাপসা বেগনি কুহেলিকায় অস্পষ্ট, কর্তব্যবুদ্ধিটা যেন নেশা করে ভোলানাথ হয়ে বসে আছে। ঈর্ষ্যা হচ্ছে না? সেইজন্যেই লেখা। কালিম্পঙ, ১৪ মে শনিবার ১৯৩৮

৬০

গত কালকার চিঠির প্রান্তে তোমাকে যা লিখেছিলুম তার সংক্ষেপ মর্ম এই, আরামের চরম আরাম হচ্ছে অন্যের অনারাম উপলব্ধি করে। এই ধরনের একটা ইংরাজি বচন আছে, তাতে কবি বলেছেন দুঃখের চূড়ান্ত দুঃখ হচ্ছে সুখীতর দিনকে স্মরণ করা। পূর্ববাক্য আজ আমি চার পয়সা খরচ করে শোধন করতে চাই—বলতে চাই, আরামের পরম আরাম হচ্ছে অন্যকে সেই আরামের শরিক করতে ডাক দেওয়া, এর থেকে যা বোঝ তাই বুঝো। দেবতার সোনার রঙের মদের পাত্র ভোর থেকে উল্টে পড়ে গেছে—মাতাল হয়ে উঠল গাছপালাগুলো, নীল আকাশের চোখে লেগেছে বিহ্বলতা, আর ক্ষীণ-কুয়াশায় আবছায়া-করা পাহাড়গুলোর গদগদ ভাষা। একটা কথা বলে রাখি—ধ্বনি প্রেরণ করি প্রতিধ্বনির প্রত্যাশায়, তা মনে কোরো না। বাচালতা যাদের স্বধর্ম তাদের বকুনি অহৈতুক আবেগে। বাইরে থেকে এর মজুরি সব সময় মেলে না, দরকারও নেই। ১ কিংবা ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

পথের সঞ্চয়

প্রকাশ : ১৯৩৯

১৩১৯ (১৯১২) সালের জৈষ্ঠ মাসে রবীন্দ্রনাথ তৃতীয়বার বিলাতযাত্রা করেন এবং ইংলন্ড ও আমেরিকা হয়ে ১৩২০ (১৯১৩) সালের আশ্বিন মাসে প্রত্যাবর্তন করেন। বিদেশযাত্রার প্রারম্ভে ও পথে এবং ইংলন্ড ও আমেরিকায় পরিভ্রমণকালে তিনি যে-সকল প্রবন্ধ রচনা করেন সেগুলি ১৩১৯ সালে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে (তত্ত্ববোধিনী, প্রবাসী, ভারতী) আষাঢ় থেকে ফাল্গুন সংখ্যার মধ্যে প্রকাশিত হয়।

সাতাশ বছর পরে ১৯৩৯ সালে কবি পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'পরিবর্তিত আকারে' ১২টি প্রবন্ধের সঙ্গে ১৯২০ সালে লিখিত 'বিলাতযাত্রীর পত্র' 'বিচিত্র' নামে এবং তৎসহ 'পরিশিষ্ট' অংশে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা ৭টি পত্র একত্রিত করে 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'র প্রথম গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ করেন। বর্তমান সংস্করণে কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত এই সংস্করণ অনুযায়ী 'পথের সঞ্চয়' মুদ্রিত হল তবে 'পথের সঞ্চয়'-এর প্রবন্ধগুলির সমসাময়িককালে মুদ্রিত অপর ৮টি প্রবন্ধ, যা পরবর্তীকালে (১৩৫৪) প্রকাশিত 'পথের সঞ্চয়'-এর সংস্করণে গ্রন্থভুক্ত হয়েছিল, 'সংযোজন' অংশে রক্ষিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৩৫৪ সংস্করণে 'পথের সঞ্চয়'-এর যাবতীয় রচনায় সাময়িকপত্রে সাধুভাষায় রচিত বিস্তৃততর পাঠ গৃহীত এবং সেখানে 'পরিশিষ্ট' অংশ বর্জিত। ১৯৩৯ সালে প্রথম সংস্করণ প্রকাশকালে কবি-কর্তৃক সম্পাদিত এবং বিন্যস্ত রূপই বর্তমান রচনাবলীতে অনুসৃত হয়েছে। প্রথম সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'র ভূমিকা বর্তমান রচনাবলীর অন্যত্র অন্তর্ভুক্ত হবে।

যাত্রার পূর্বপত্র

ঘর আমাদের এমন করে বেঁধেছে, চৌকাঠের বাইরে পা বাড়াবার সময় আমাদের এত অযাত্রা, এত অবেলা, এত হাঁচি-টিকটিকি, এত অশ্রুপাত যে, বাহির আমাদের পক্ষে অত্যন্তই বাহির হয়ে পড়েছে, ঘরের সঙ্গে তার সম্বন্ধ অত্যন্ত ভিন্ন। আত্মীয়মণ্ডলী আমাদের দেশে এত নীরন্ধ্র নিবিড় যে, পরের মতো পর আমাদের কাছে আর কিছুই নেই। এইজন্যই অল্প সময়ের জন্যও বাইরে যেতে হলে সকলের কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হয়। কিন্তু কেবলমাত্র অভ্যস্ত পরিবেষ্টনী থেকে বেরিয়ে পড়াই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, য়ুরোপে মনুষ্যত্বের যে সার্বভৌম বিকাশ ঘটেছে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাবার ইচ্ছা অনেক দিন থেকে প্রবল হয়েছে আমার মনে।

য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তুগত, তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নেই, এই একটা বুলি আমাদের দেশে চারি দিকে প্রচলিত। যে কারণেই হোক, এই জনশ্রুতি যখন প্রচার লাভ করতে আরম্ভ করে, তখন তার সত্য প্রমাণের প্রয়োজন থাকে না। পাঁচজনে যা বলে, ষষ্ঠ ব্যক্তির তা উচ্চারণ করতে বাধে না এবং নানা কণ্ঠের আবৃত্তিই যুক্তির স্থান গ্রহণ করে বসে।

কিন্তু তর্কের দ্বারা এ কথা প্রমাণের প্রয়োজন নেই যে সমাজের যেখানেই আমরা যে-কোনো মাহাত্ম্যই দেখি-না কেন, তার গোড়াতেই আছে আত্মিক শক্তি। অর্থাৎ মানুষ কখনোই সত্যকে কল দিয়ে পেতে পারে না, তাকে আত্মা দিয়েই লাভ করতে হয়।

য়ুরোপে মানুষ মানবাত্মাকে প্রকাশ করছে না, কেবল জড়বস্তুকেই স্তূপাকার করছে, এ কথাও যা আর যদি বলি বনস্পতি কেবল শুকনো পাতা ঝরিয়ে মাটি ছেয়ে ফেলে, সে আপনার জীবনকে প্রকাশ করে না, তবে সে-ও তেমনি। বস্তুত বনস্পতির প্রবল প্রাণশক্তিই প্রচুর পল্লব বর্ষণ করে—অবিশ্রাম পরিত্যক্ত মৃত পত্রে তার মৃত্যু প্রমাণ করে না।

মানুষকে যথেষ্ট পীড়া দেয় য়ুরোপ, মানুষকে যথেষ্ট সেবাও করে য়ুরোপ। সুর অসুর, দৈত্য ও আদিত্য, একই জাতের। উভয়েরই মধ্যে আছে শক্তির ঐশ্বর্য, সে শক্তি পীড়নেও যেমন পালনেও তেমনি। আর যাই হোক সে শক্তিতে ঔদাসীন্য নেই। এই ঔদাসীন্যেই তামসিকতা।

কোনো সমাজে যথার্থ কোনো উন্নতিই হতে পারে না যার ভিত্তি কৃচ্ছ্রসাধনের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এই কৃচ্ছ্রতাকে তারাই বরণ করতে পারে না যারা মেটিরিয়ালিস্ট, যারা জড় বস্তুর দাস। বস্তুতেই যাদের চরম আনন্দ, কল্যাণকে লক্ষ্য করে বস্তুকে তারা ত্যাগ করবে কেন। কল্যাণ বলতে বসে বসে মালা জপ করা নয়, লোকহিতব্রতকে মানবসমাজে সার্থক করা।

শাস্ত্রবিহিত যে পুণ্যকে মানুষ পারলৌকিক বিষয়-সম্পত্তির মতোই জানে, সেই স্বার্থপর পুণ্যের জন্যও সে দুঃখ স্বীকার করতে পারে। কিন্তু যে পুণ্য শাস্ত্রবিধির সামগ্রী নয়, যা তীর্থ-যাত্রার দুঃখ নয়, যা শুভনক্ষত্র যোগের দান নয়, যা হৃদয়ের স্বাধীন প্ররোচনা, সেই দুঃখ সেই মৃত্যুকে কি কখনো কোনো বস্তু-উপাসক গ্রহণ করতে পারে।

য়ুরোপে দেশের জন্য, মানুষের জন্য, জ্ঞানের জন্য, হৃদয়ের স্বাধীন আবেগে সেই দুঃখকে, সেই মৃত্যুকে চিরদিনই বরণ করতে দেখেছি।

এর মধ্যে সমস্তটাই খাঁটি নয়, এর মধ্যে অনেকটা আছে, যা বাহাদুরি, কিন্তু সেই অপবাদ দিয়ে সত্যকে খর্ব করবার চেষ্টা করা উচিত নয়। কোনো কোনো রাত্রে চন্দ্রের চারি দিকে একটা জ্যোতির চক্র দেখা যায়। আমরা জানি, তা চন্দ্র নয়, তা ছায়া, তা মিথ্যা। কিন্তু চন্দ্র মাঝখানে না থাকলে সেই চন্দ্রের ভানটুকুও থাকতে পারে না। সকল সমাজেই যেটি শ্রেষ্ঠ পদার্থ, তাকে ঘিরে তার আলোক ধার করে নিয়ে একটা ভানের মণ্ডল সৃজিত হয়ে থাকে। কিন্তু সেই নকলটা আসলকে প্রতিবাদ করে না, তারই সমর্থন করে। ভণ্ড সন্ন্যাসীকে দেখে আমাদের দেশের সাধু-সন্ন্যাসীকে অবিশ্বাস করে বসলে ঠকতে হয়।

য়ুরোপের যারা অসামান্য লোক, তাঁদের কথা আমরা বইয়ে পড়েছি, তাঁদের কাছে দেখি নি। কাছে যে দুই-একজনকে দেখেছি, য়ুরোপের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তাঁরা স্থান পান নি। অনেকদিন হল, একটি সুইডেনের মানুষকে দেখেছিলুম, তাঁর নাম হ্যামারগ্রেন। তিনি সেই দূর দেশে বসে দৈবক্রমে রামমোহন রায়ের কী একটু পরিচয় কোনো একটা বইয়ে পেয়েছিলেন। তাতে তাঁর মনে এমন একটি ভক্তি জেগে উঠেছিল যে, তাঁর দারিদ্র্য সত্ত্বেও দেশ ছেড়ে তিনি বহু কষ্টে সমুদ্র পার হয়ে এই বাংলা দেশে এসে উপস্থিত হলেন। এখানকার ভাষা জানতেন না, মানুষকে চিনতেন না, তবু বাঙালির বাড়িতেই আশ্রয় নিয়ে এই রামমোহন রায়ের দেশকেই তিনি বরণ করে নিলেন। যে অল্প কয়দিন বেঁচে ছিলেন, কী দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করে কী নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে, অথচ কী সম্পূর্ণ নম্রতার মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে এই দেশের হিতের জন্য তিনি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন, তা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা কখনোই ভুলতে পারবেন না। আশ্চর্যের কথা এই, নিমতলার ঘাটে তাঁর মৃতদেহ দাহ করা হয়েছিল, তদুপলক্ষে হিন্দুর শ্মশান কলুষিত করা হল ব'লে আমাদের কোনো সাপ্তাহিক পত্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল।

ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি ভক্তি বহন করে কিরূপ অদ্ভুত আত্মত্যাগের সহিত ভারতবর্ষের নিকট আপনাকে উৎসর্গ করেছিলেন তা কারও অবিদিত নেই।

এই দুটি দৃষ্টান্তেই আমরা দেখেছি, এই দুটি ভক্ত এমন স্থানে এমন অবস্থার মধ্যে আত্মদান করেছেন, যেখানে তাঁদের জীবনে কোনো পূর্বাভ্যস্ত সহজ পথ সম্মুখে ছিল না। যেখানে তাঁদের হৃদয়মনের আজন্মকালের সংস্কার পদে পদে কঠোর বাধা পেয়েছে, সেখানে কেবল যে তাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছেন তা নয়, পদে পদে আত্মোৎসর্গের পথ তাঁদের নিজেকে খনন করে চলতে হয়েছে— কেননা, তাঁদের প্রবেশ চারি দিকেই অবরুদ্ধ।

সত্যকে ভক্তি করবার এই ক্ষমতা এবং সত্যের জন্য দুর্গম বাধা লঙ্ঘন করে দিনের পর দিন আপনাকে অকুণ্ঠিতভাবে নিঃশেষে দান করবার এই শক্তি, এ যে তাঁদের জাতীয় সাধনা থেকেই তাঁরা পেয়েছিলেন। এই আশ্চর্য শক্তি, বস্তু-উপাসনার সাধনা থেকে কেউ কোনো দিন কি লাভ করতে পারে। এ কি যথার্থ আধ্যাত্মিক নয়। এবং জিজ্ঞাসা করি, এই শক্তি কি আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে দেখতে পাই।

কেবল বস্তুসঞ্চয়ের উপরে কোনো জাতির উন্নতি টিঁকতে পারে না। কেবল বিষয়-বুদ্ধির জোরেই কোনো জাত বল লাভ করে না। প্রদীপে অজস্র তেল ঢালতে পারলেই প্রদীপ জ্বলে না। কেবল সল্‌তে পাকাবার নৈপুণ্যেই দীপকে দীপ্তি দেয় না। যে করেই হোক আগুন চাই।

তার কারণ এই, মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তখনই আনন্দে তার সকল শক্তিই পূর্ণ বিকাশের দিকে উদ্যম লাভ করে। আধ্যাত্মিকতা মানুষের সকল শক্তির কেন্দ্রগত, কেননা, তা আত্মারই শক্তি। পরিপূর্ণতা তার স্বভাব। তা অন্তর বাহির কোনো দিকেই মানুষকে খর্ব করে আপনাকে আঘাত করতে চায় না।

যে শক্তি য়ুরোপের, তার বাহ্যরূপ যাই হোক-না কেন, তার আন্তর রূপ যে আত্মিক বল, সে সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ মাত্র নেই।

তত্ত্বজ্ঞান যখন বলে, সর্বভূতই এক, সে একটা বাক্য মাত্র— সেই তত্ত্বকথার দ্বারা সর্বভূতকে আত্মবং করা যায় না। যে মৈত্রী, যে শ্রেয়োনিষ্ঠা, যা আত্মার চারিত্র শক্তি— যার ধৈর্য অসীম, আপনাকে ত্যাগ করাতেই যার স্বাভাবিক আনন্দ, সেই সেবাতৎপর সহজশক্তি নইলে আর কিছুতেই পরকে আপন করা যায় না। এই শক্তির দ্বারাই দেশপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত দেশের মধ্যে উপলব্ধি করেন— মানবপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত মানবের মধ্যে লাভ করেন।

সেইজন্য দেখতে পাই, বৌদ্ধ যুগে ভারতবর্ষ যখন প্রেমের সেই ত্যাগধর্মকে বরণ করে নিয়েছিল, তখনি সমাজে তার এমন বিকাশ ঘটেছিল। রোগীদের জন্য ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা, এমন-কি, পশুদের জন্য চিকিৎসালয় এখানে স্থাপিত হয়েছিল এবং জীবের দুঃখ নিবারণের চেষ্টা নানা আকার ধারণ

করে দেখা দিয়েছিল। তখন নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে ধর্মাচার্যগণ দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হয়ে পরদেশীয় ও বর্বর জাতীয়দের সদ্গতির জন্য দলে দলে এবং অকাতরে দুঃখ সহ্য করেছেন। সেইজন্যই ভারতবর্ষ সেদিন ধর্মের দ্বারা কেবল আপনার আত্মাকে নয়, পৃথিবীকে জয় করতে পেরেছিল এবং আধ্যাত্মিকতার তেজে ঐহিক পারত্রিক উন্নতিকে একত্র সম্মিলিত করেছিল।

শক্তির আগুন যেখানে প্রচুর পরিমাণে জ্বলে, সেখানে ছাই-ভস্ম প্রভূত হয়ে ওঠে, এ কথা মনে রাখতে হবে। নির্জীবতার উৎপাত অল্প, তার দাম সামান্য, তার দুর্গতির মূর্তিও প্রশান্ত। অশান্তি ভোগ এবং পাপের প্রচণ্ডতা য়ুরোপীয় সমাজে যেমন প্রত্যক্ষ হয়, এমন আমাদের দেশে নয়, এ কথা স্বীকার করতে হবে।

কিন্তু তাকে তারা উদাসীন ভাবে মেনে নেয় নি। ম্যালেরিয়ার বাহন মশা থেকে আরম্ভ করে সমাজের ভিতরকার পাপ পর্যন্ত সকল অসুরের সঙ্গেই সেখানে হাতাহাতি লড়াই চলেছে, অদৃষ্টের উপর বরাত দিয়ে কেউ বসে নেই— নিজের প্রাণকেও সংকটাপন্ন করে বীরের দল সংগ্রাম করছে।

য়ুরোপের দুর্বল জাতির প্রতি ন্যায়ধর্মের ব্যভিচার যথেষ্ট দেখা যায়। কিন্তু সেইসঙ্গেই সেই নিষ্ঠুর বলদৃপ্ত লুব্ধতার মধ্য হতেই ধিক্‌কার ও ভর্ৎসনা উচ্ছ্বসিত হচ্ছে। প্রবল অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারেন এবং প্রতিকার করতে চান, এমন সাহসিক বীরও সেখানে অনেক আছেন। দূরবর্তী পরজাতির পক্ষ অবলম্বন করে নির্যাতন সহ্য করতে কুণ্ঠিত নন, এমন দৃঢ়নিষ্ঠ সাধু ব্যক্তির সেখানে অভাব নেই। যাঁরা আত্মীয়দের প্রতিকূলতা স্বীকার করে স্বার্থপরতার ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করবার জন্য দেশের লোককে ধর্মের দোহাই দিচ্ছেন, তাঁরা কোন্ দেশের মানুষ। তাঁরা সংখ্যায় অল্প, কিন্তু সত্য দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে, তাঁরা সংখ্যায় অল্প নন। কেননা তাঁদের মধ্যেই তাঁদের শেষ নয়। দেশের মধ্যে গোচর এবং অগোচর তাঁদের একটি পরম্পরা আছে— তাঁরা সকলেই এক কাজ করছেন বা এক সময়ে আছেন, তা নয় কিন্তু তাঁরাই সমাজের ভিতরকার ন্যায়পরতার শক্তি। তাঁরাই ক্ষত্রিয়; পৃথিবীর সমস্ত দুর্বলকে ক্ষয় থেকে ত্রাণ করবার জন্য তাঁরা সহজ কবচ ধারণ করেছেন।

আমরা সর্বদাই নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়ে থাকি যে, আমরা ধর্মপ্রাণ আধ্যাত্মিক জাতি— বাইরের বিষয়ে আমাদের মনোযোগ নেই, এইজন্যই বহির্বিষয়েই আমরা দুর্বল। বাইরের দৈন্য সম্বন্ধে আমাদের লজ্জাকে এমনি করে আমরা খর্ব করতে চাই। আমাদের অনেকেই মুখে আস্ফালন করে বলে থাকেন, দারিদ্র্যই আমাদের ভূষণ।

ঐশ্বর্যকে অর্জন ও অধিকার করবার শক্তি যাদের আছে, দারিদ্র্য তাদেরই ভূষণ। যে ভূষণের কোনো মূল্য নেই, তা ভূষণই নয়। এইজন্য ত্যাগের দারিদ্র্যই ভূষণ, অভাবের দারিদ্র্য ভূষণ নয়: শিবের দারিদ্র্যই ভূষণ, অলক্ষ্মীর দারিদ্র্য কদর্য। যারা পেট ভরে খেতে পায় না বলে নিয়ত অবসাদে মলিন, যারা কোনোমতে প্রাণ বাঁচাতে চায় অথচ প্রাণ বাঁচাবার কঠিন উপায় গ্রহণ করবার শক্তি নেই বলে যারা বার বার ধুলায় লুটিয়ে পড়ে, দরিদ্র বলেই যারা সুযোগ পেলে অন্য দরিদ্রকে শোষণ করে এবং অক্ষম বলেই ক্ষমতা পেলে যারা অন্য অক্ষমকে আঘাত করে, কখনোই দারিদ্র্য তাদের ভূষণ নয়।

তাই বলছিলাম, তীর্থযাত্রার মানস করেই যদি য়ুরোপে যেতে হয়, তবে তা নিষ্ফল হবে না। সেখানেও আমাদের গুরু আছেন, সে গুরু সেখানকার মানবসমাজের অন্তরতম দিব্য শক্তি। সর্বত্রই গুরুকে শ্রদ্ধার গুণে সন্ধান করে নিতে হয়— চোখ মেললেই তাঁকে দেখা যায় না। সেখানে সমাজের যিনি প্রাণপুরুষ, অন্ধতা ও অহংকারবশত তাঁকে না দেখে ফিরে আসা অসম্ভব নয়, এবং এমন একটি অদ্ভুত ধারণা নিয়ে আসাও আশ্চর্য নয় যে, ইংলন্ডের প্রতাপ পার্লামেন্টের দ্বারা সৃষ্ট হচ্ছে, য়ুরোপের ঐশ্বর্য কারখানাঘরে প্রস্তুত হচ্ছে এবং পাশ্চাত্য মহাদেশের সমস্ত মাহাত্ম্য যুদ্ধের অস্ত্র, বাণিজ্যের জাহাজ এবং বাহ্য বস্তুপুঞ্জের দ্বারা সংঘটিত। নিজের মধ্যে শক্তির সত্য অনুভূতি যার নেই, অতি সহজেই সে মনে করে বসে, শক্তি বাইরেই আছে এবং যদি কোনো সুযোগে

আমরাও কেবলমাত্র ঐ বাহ্য জিনিসগুলো দখল করতে পারি, তা হলেই আমাদের অভাবপূরণ হওয়া সম্ভব।

অর্থহীন আচারের জালে দিনরাত জড়িত থেকে বস্তুজয়ী চিত্তবীর্যকে যারা বস্তুতন্ত্রতা বলে অবজ্ঞা করে তারা বুদ্ধির পরিচয় দেয় না। মাঝে মাঝে দারুণ অমঙ্গল দেখা দিচ্ছে, সংঘাতে সংঘর্ষে বহ্নি জ্বলে উঠছে, সমুদ্র মন্থনে মাঝে মাঝে বিষও উদ্‌গীর্ণ হচ্ছে, কিন্তু মন্দকে যারা কোনোমতেই মেনে নিচ্ছে না, নির্ভীক যাদের অধ্যবসায় সত্যের দীক্ষায় তারা মৃত্যুজয়ী বল লাভ করেছে। তাই বলছি সত্যসাধনার দায়িত্বকে সর্বান্তঃকরণে বীরের মতো স্বীকার করবার দীক্ষা নিতে চাই যদি তবে য়ুরোপে যাত্রা কখনোই নিষ্ফল হতে পারে না; অবশ্য যদি মনে শ্রদ্ধা থাকে এবং সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতাকেই যদি আধ্যাত্মিক সাফল্যের সত্য পরিচয় বলে বিশ্বাস করি।

বোম্বাই শহর

বোম্বাই শহরটির উপর একবার চোখ বুলিয়ে আসবার জন্য কাল বিকালে বার হয়েছিলুম। প্রথম ছবিটা দেখেই মনে হল, বোম্বাই শহরের একটা বিশেষ চেহারা আছে; কলকাতার কোনো চেহারা নেই, সে যেন যেমন-তেমন করে জোড়াতাড়া দিয়ে তৈরি।

আসল কথা, সমুদ্র বোম্বাই শহরকে আকার দিয়েছে, নিজের অর্ধচন্দ্রাকৃতি বেলাভূমি দিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরেছে। সমুদ্রের আকর্ষণ বোম্বাইয়ের সমস্ত রাস্তা-গলির ভিতর দিয়ে কাজ করেছে। আমার মনে হচ্ছে, যেন সমুদ্রটা একটা প্রকাণ্ড হৃৎপিণ্ড, প্রাণধারাকে বোম্বাইয়ের শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়ে টেনে নিচ্ছে এবং ভরে দিচ্ছে। সমুদ্র চিরদিন এই শহরটিকে বৃহৎ বাইরের দিকে অভিমুখীন করে রেখেছে।

প্রকৃতির সঙ্গে কলকাতার মিলনের একটি বন্ধন ছিল গঙ্গা। এই গঙ্গার ধারাই সুদূরের বার্তাকে সুদূর রহস্যের অভিমুখে বয়ে নিয়ে যাবার খোলাপথ ছিল। শহরের এই একটি জানালা ছিল যেখানে মুখ বাড়ালে বোঝা যেত, জগৎটা এই লোকালয়ের মধ্যেই বদ্ধ নয়। কিন্তু গঙ্গার প্রাকৃতিক মহিমা আর রইল না, তাকে দুই তীরে এমনি আঁটাসাঁটা পোশাক পরিয়েছে এবং তার কোমর-বন্ধ এমনি কষে বেঁধেছে যে, গঙ্গাও লোকালয়েরই পেয়াদার মূর্তি ধরেছে; গাধাবোট বোঝাই করে পাটের বস্তা চালান করা ছাড়া তার যে আর কোনো বড়ো কাজ ছিল, তা আর বোঝবার জো নেই। জাহাজ-মাস্তুলের কণ্টকারণ্যে মকরবাহিনীর মকরের শুঁড় কোথায় লজ্জায় লুকোল।

সমুদ্রের বিশেষ মহিমা এই যে, মানুষের কাজ সে করে দেয়, কিন্তু দাসত্বের চিহ্ন সে গলায় পরে না। পাটের কারবার তার বিশাল বক্ষের নীলকান্ত মণিটিকে ঢেকে ফেলতে পারে না। তাই এই শহরের ধারে সমুদ্রের মূর্তিটি অক্লান্ত; যেমন একদিকে সে মানুষের কাজকে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিচ্ছে তেমনি আর-একদিকে সে মানুষের শ্রান্তি হরণ করছে; ঘোরতর কর্মের সম্মুখেই বিরাট একটি অবকাশকে মেলে রেখেছে।

তাই আমার ভারি ভালো লাগল যখন দেখলুম, শতশত নরনারী সাজসজ্জা করে সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসেছে, অপরাহ্ণের অবসরের সময় সমুদ্রের ডাক অমান্য করতে পারে নি। সমুদ্রের কোলের কাছে এদের কাজ এবং সমুদ্রের কোলের কাছে এদের আনন্দ। আমাদের কলকাতা শহরে এক ইডেন গার্ডেন আছে— কিন্তু সে কৃপণের ঘরের মেয়ে, তার কণ্ঠে আহ্বান নেই। সেই রাজপুরুষের তৈরি বাগান, সেখানে কত শাসন কত নিষেধ। কিন্তু সমুদ্র তো কারও তৈরি নয়, একে তো বেষ্টন করে রাখবার জো নেই। এইজন্য সমুদ্রের ধারে বোম্বাই শহরের এমন নিত্যোৎসব। কলকাতার কোথাও তো সেই অসংকোচ আনন্দের একটুকু স্থান নেই।

সব চেয়ে যা দেখে মন জুড়িয়ে যায়, তা হচ্ছে এখানকার নরনারীর মেলা। নারীবর্জিত

কলকাতার দৈন্যটা যে কতখানি, তা এখানে এলেই দেখা যায়। কলকাতায় আমরা মানুষকে আধখানা করে দেখি, এইজন্য তার আনন্দরূপ দেখি না। নিশ্চয়ই সেই না দেখার একটা দণ্ড আছে।

নিশ্চয়ই তা মানুষের মনকে সংকীর্ণ করছে, তার স্বাভাবিক বিকাশ থেকে তাকে বঞ্চিত করছে। বিকালে স্ত্রী পুরুষ ও শিশুরা সমুদ্রের ধারে একই আনন্দে মিলিত হয়েছে, সত্যের এই একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক শোভা না দেখতে পাওয়ার মতো ভাগ্যহীনতা মানুষের আর কিছুই হতে পারে না। যে দুঃখ আমাদের অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তা আমাদের অচেতন করে রাখে; কিন্তু তার ক্ষতি প্রত্যহ জমা হতে থাকে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঘরের কোণের মধ্যে আমরা নরনারী মিলে থাকি, কিন্তু সে মিলন কি সম্পূর্ণ। বাইরে মেলবার যে উদার বিশ্ব রয়েছে, সেখানে কি সরল আনন্দে একদিনও আমাদের পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হবে না।

আমাদের গাড়ি ম্যাথেরান পাহাড়ের উপরে একটা বাগানের সামনে এসে দাঁড়াল। ছোটো বাগানটিকে ঘিরে চারি দিকে বেঞ্চ পাতা। সেখানেও দেখি, কুলস্ত্রীরা আত্মীয়দের সঙ্গে বসে হাওয়া খাচ্ছেন। কেবল পার্সি মেয়ে নয়, কপালে কুঙ্কুমের ফোঁটা-পরা মারাঠি মেয়েরাও বসে আছেন—নিজের অস্তিত্বটা যে একটা বিষম বিপদ, সেটাকে চারি দিকের দৃষ্টি হতে কেমন করে ঠেকিয়ে রাখা যায়, এ ভাবনা লেশমাত্র তাঁদের মনে নেই। মনে মনে ভাবলুম, সমস্ত দেশের মাথার উপর থেকে কত বড়ো একটা সংকোচের বোঝা নেমে গেছে এবং তাতে এখানকার জীবনযাত্রা আমাদের চেয়ে কত দিকে কত সহজ ও সুন্দর হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর মুক্ত বায়ু ও আলোকে বেড়াবার সহজ অধিকারটি লোপ করে দিলে মানুষ নিজেই নিজের পক্ষে কী রকম একটা অস্বাভাবিক বিঘ্ন হয়ে ওঠে, তা আমাদের দেশের মেয়েদের সর্বদা সসংকোচ অসহায়তা দেখলে বুঝতে পারা যায়। রেলোয়ে স্টেশনে আমাদের মেয়েদের দেখলে তাদের উপর সমস্ত দেশের বহুকালের নিষ্ঠুরতা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। ম্যাথেরানের এই বাগানে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের বীডনপার্ক ও গোলদীঘিকে মনে করে দেখলুম—তার সে কী লক্ষ্মীছাড়া কৃপণতা।

প্রজাপতির দল যখন ফুলের বনে মধু খুঁজে ফেরে, তখন তারা যে বাবুয়ানা করে বেড়ায়, তা নয়, বস্তুত তখন তারা কাজে ব্যস্ত। কিন্তু তাই বলে তারা আপিসে যাবার কালো আচকান পরে না। এখানকার জনতার বেশভূষায় যখন নানা রঙের সমাবেশ দেখি, তখন আমার সেই কথা মনে পড়ে। কাজকর্মের ব্যস্ততাকে গায়ে পড়ে শ্রীহীন করে তোলবার যে কোনো একান্ত প্রয়োজন আছে, আমার তো তা মনে হয় না। এদের পাগড়িতে মেয়েদের শাড়িতে যে বর্ণচ্ছটা দেখতে পাই, তাতে একটা জীবনের আনন্দ প্রকাশ পায় এবং জীবনের আনন্দকে জাগ্রত করে। বাংলাদেশ ছাড়িয়ে অনেক দূর থেকে আমি এইটেই দেখতে দেখতে এসেছি। চাষা চাষ করছে, কিন্তু তার মাথায় পাগড়ি এবং গায়ে একটা মেরজাই পরা। মেয়েদের তো কথাই নেই। আমাদের সঙ্গে এখানকার বাইরের এই প্রভেদটি আমার কাছে সামান্য বলে ঠেকল না। কারণ, এই প্রভেদটুকু অবলম্বন করে এদের উপর আমার মনে একটি শ্রদ্ধার সঞ্চার হল। এরা নিজেকে অবজ্ঞা করে না—পরিচ্ছন্নতা দ্বারা এরা নিজেকে বিশিষ্টতা দান করেছে। এটুকু মানুষের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্তব্য। এইটুকু আবরণ, এইটুকু সজ্জা প্রত্যেকের না থাকলে মানুষের রিক্ততা অত্যন্ত কুশ্রী হয়ে দেখা দেয়। আপনার সমাজকে কুদৃশ্য দীনতা হতে প্রত্যেকেই যদি রক্ষার চেষ্টা না করে, তবে কত বড়ো একটা শৈথিল্য সমস্ত দেশকে বিশ্বের চক্ষে অপমানিত করে রাখে, তা অভ্যাসের অসাড়তাবশতই আমরা বুঝতে পারি না।

আর একটা জিনিস বোম্বাই শহরে অত্যন্ত বড়ো করে চোখে পড়ল, সে এখানকার দেশী লোকের ধনশালিতা। কত পার্সি, মুসলমান ও গুজরাটি বণিকদের নাম এখানকার বড়ো বড়ো বাড়ির গায়ে খোদা দেখলুম। এত নাম কলকাতার কোথাও দেখা যায় না। সেখানকার ধন চাকরিতে ও জমিদারিতে, এইজন্য তা বড়ো ম্লান। জমিদারি সম্পদ বদ্ধ জলের মতো, তা কেবলই ব্যবহারে ক্ষীণ ও বিলাসে দূষিত হতে থাকে। তাতে মানুষের শক্তির প্রকাশ দেখি না, তাতে ধনাগমের নব নব

তরঙ্গলীলা নেই। এইজন্য আমাদের দেশে যেটুকু ধন সঞ্চয় আছে তার মধ্যে অত্যন্ত একটা ভীরুতা দেখি। মাড়োয়ারি, পার্সি, গুজরাটি, পাঞ্জাবিদের মধ্যে দানে মুক্তহস্ততা দেখতে পাই, কিন্তু বাংলাদেশ সকলের চেয়ে অল্প দান করে। আমাদের দেশের চাঁদার খাতা আমাদের দেশের গোরুর মতো— তার চরবার জায়গা নেই বললেই হয়। ধন জিনিসটাকে আমাদের দেশ সচেতনভাবে অনুভব করতেই পারল না, এইজন্য আমাদের দেশের কৃপণতাও কুশ্রী। এখানকার ধনীদের জীবনযাত্রা সরল, অথচ ধনের মূর্তি উদার, এ দেখে আনন্দ বোধ হয়।

যাত্রা

একদিন মানুষ ছিল বুনো, ঘোড়াও ছিল বনের জন্তু। মানুষ ছুটতে পারত না— ঘোড়া বাতাসের মতো ছুটত। কী সুন্দর তার ভঙ্গি; কী অবাধ তার স্বাধীনতা। ঘোড়ার সর্বাঙ্গে যে একটি ছোটবার আনন্দ দ্রুততালে নৃত্য করত সেইটের প্রতি মানুষের মনে মনে ভারি একটা লোভ হল।

একদিন সে ফাঁস লাগিয়ে বনের ঘোড়াকে ধরল। কেশর ধরে তার পিঠের ওপর চড়ে বসে নিজের দেহের সঙ্গে ঘোড়ার চার পা জুড়ে নিলে। এই চারটে পা'কে সম্পূর্ণ নিজের বশ করতে তার অনেকদিন লেগেছে, সে অনেক পড়েছে, অনেক মরেছে কিন্তু কিছুতেই দমে নি। ঘোড়ার গতিবেগকে সে ডাকাতি করে নেবে এই তার পণ। তারই জিত হল। মন্দগামী মানুষ দ্রুতগমনকে বেঁধে ফেলে আপনার কাজে খাটাতে লাগল।

ডাঙায় চলতে চলতে মানুষ এক জায়গায় এসে দেখলে সম্মুখে তার সমুদ্র। আর তো এগোবার জো নেই। নীলজল, তার তল কোথায়, তার কূল দেখা যায় না। আর লক্ষ লক্ষ ঢেউ তর্জনী তুলে ডাঙার মানুষদের শাসাচ্ছে, বলছে এক পা যদি এগোও তবে দেখিয়ে দেব, এখানে তোমার জারি-জুরি খাটবে না। মানুষ তীরে বসে এই অকূল নিষেধের দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু নিষেধের ভিতর দিয়ে একটি মস্ত আহ্বানও আসছে। তরঙ্গগুলো অট্টহাস্যে নাচছে— ডাঙার মাটির মতো কিছুতেই তাদের বেঁধে রাখতে পারে নি। দেখলে মনে হয় লক্ষ লক্ষ ইস্কুলের ছেলে ছুটি পেয়েছে, পৃথিবীটাকে তারা যেন ফুটবলের গোলার মতো লাথি ছুঁড়ে ছুঁড়ে আকাশে উড়িয়ে দিতে চায়। তা দেখে মানুষের মন তীরে বসে শান্ত হয়ে পড়ে থাকতে পারে না। সমুদ্রের এই মাতুনি মানুষের রক্তের মধ্যে করতাল বাজাতে থাকে, বাধাহীন জলরাশির এই দিগন্তবিস্তৃত মুক্তিকে মানুষ আপন করতে চায়।

কিন্তু এমন অদ্ভুত সাধ মিটবে কী করে। এই তীরের রেখাটা পর্যন্ত মানুষের অধিকারের সীমা, তার সমস্ত ইচ্ছাটাকে এই দাঁড়ির কাছে এসে শেষ করতে হবে। কিন্তু মানুষের ইচ্ছাকে যেখানে শেষ করতে চাওয়া যায় সেইখানেই সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কোনোমতেই সে বাধাকে চরম বলে মানতে চাইল না।

শেষে একদিন বুনো ঘোড়াটার মতোই সমুদ্রের ফেন-কেশর ধরে মানুষ তার পিঠের উপর চড়ে বসল। ক্রুদ্ধ সাগর পিঠনাড়া দিল; মানুষ কত ডুবল কত মরল তার সীমা নেই। অবশেষে একদিন মানুষ এই অবাধ্য সাগরকেও আপনার সঙ্গে জুড়ে নিল। তার এক কূল থেকে আর-এক কূল পর্যন্ত মানুষের পায়ের কাছে এসে মাথা হেঁট করে দিলে।

বিশাল সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত মানুষটা যে কী রকম আজ আমরা জাহাজে চড়ে তাই অনুভব করছি। আমি তো এই একটুখানি জীব, তরণীর একপ্রান্তে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু দূর দূর বহুদূর পর্যন্ত সমস্ত আমার সঙ্গে মিলেছে। দূরকে আজ রেখা মাত্রও দেখতে পাচ্ছি না। তাকেও আমি এইখানে স্থির দাঁড়িয়ে অধিকার করে নিয়েছি। যা বাধা তাই আমাকে পিঠে করে নিয়ে এগিয়ে দিচ্ছে। সমস্ত সমুদ্র আমার, যেন আমারই বিরাট শরীর, যেন তা আমার প্রসারিত ডানা। যা-কিছু আমাদের বাধা তাকেই আমাদের চলবার পথ, আমাদের মুক্তির উপায় করে নিতে

হবে, আমাদের উপর এই আদেশ আছে। যারা এই আদেশ মেনেছে তারাই পৃথিবীতে ছাড়া পেয়েছে। যারা মানে নি এই পৃথিবীটা তাদের পক্ষে কারাগার। নিজের গ্রামটুকু তাদের ঘিরে আছে, ঘরের কোণটুকু তাদের বেঁধেছে, প্রত্যেক পা ফেলতেই তাদের শিকল ঝম্‌ঝম্‌ করে।

মনের আনন্দে চলেছি। ভয় ছিল সমুদ্রের দোলা আমার শরীরে সইবে না। সে ভয় কেটে গেছে। যেটুকু নাড়া খাচ্ছি তাতে আঘাত করছে না, যেন আদর করছে। সমুদ্র আমাকে কোলে করে বয়ে চলেছে—রুগ্‌ণ বালককে তার পিতা যেমন করে নিয়ে যায় তেমনি সাবধানে। এইজন্য এ যাত্রায় এখন পর্যন্ত আমার চলবার কোনো পীড়া নেই, চলবার আনন্দ ভোগ করছি।

কেবলমাত্র এই চলবার আনন্দটুকুই পাব ব'লে আমি বার হয়েছি। অনেকদিন থেকে এই চলবার এই বার হয়ে পড়বার একটা বেগ আমাকে উতলা করে তুলেছিল। অনেকদিন আমাদের আশ্রমের বাড়িতে দোতলার বারান্দায় একলা বসে যখন আমাদের সামনের শালগাছগুলোর উপরের আকাশের দিকে তাকিয়েছি তখন সেই আকাশ দূরের দিকে তার তর্জনী বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে সংকেত করেছে। যদিও সেই আকাশটি নীরব তবু দেশ দেশান্তরের যত অপরিচিত গিরি-নদী-অরণ্যের আহ্বান কত দিক্‌দিগন্তরের থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে এই আকাশের নীলিমাকে পরিপূর্ণ করেছে। নিঃশব্দ আকাশ বহুদূরের সেই-সমস্ত মর্মর ধ্বনি সেই-সমস্ত কলগুঞ্জন আমার কাছে বয়ে আনত। আমাকে কেবলই বলত, চলো, চলো, বার হয়ে এসো। সে কোনো প্রয়োজনের চলা নয়, চলার আনন্দেই চলা।

প্রাণ আপনি চায় চলতে; সে তার ধর্ম। না চললে সে যে মৃত্যুতে গিয়ে ঠেকে। এইজন্য নানা প্রয়োজনে ও খেলার ছুতোয় সে কেবল চলে। পদ্মার চরে শরতের সময়ে তো হাঁসের দল দেখেছ। তারা কোনো দুর্গম হিমালয়ের শিখর-বেষ্টিত নির্জন সরোবর তীরের নীড় ছেড়ে কত দিনরাত্রি ধরে উড়তে উড়তে এই পদ্মার বালুতটের উপর এসে পড়েছে। শীতের দিনে বাষ্পে বরফে ভীষণ হয়ে উঠে হিমালয় তাদের তাড়া লাগিয়ে দেয়—তারা বাসা বদল করতে চলে। সুতরাং সেই সময়ে হাঁসেদের পক্ষে দক্ষিণ পথে যাত্রার একটা প্রয়োজন আছে বটে। কিন্তু সেই প্রয়োজনের অধিক আর-একটা জিনিস আছে। সেই যে বহুদূরের গিরিনদী পার হয়ে উড়ে যাওয়া এতেই এই পাখিদের ভিতরকার প্রাণের বেগ আনন্দ লাভ করে। ক্ষণে ক্ষণে বাসা বদল করবার ডাক পড়ে, তখনি সমস্ত জীবনটা নাড়া খেয়ে আপনাকে আপনি অনুভব করবার সুযোগ পায়।

আমার ভিতরেও বাসা-বদল করবার ডাক পড়েছিল। যে বেষ্টনের মধ্যে আছি সেখান থেকে আর একটা কোথায় যেতে হবে। চলো, চলো, চলো। ঝরনার মতো, অরুণোদয়ের আলোর মতো চলো। সেইজন্যই পৃথিবী এমন বৃহৎ, জগৎ এমন বিচিত্র, আকাশ এমন অসীম। সেইজন্যই তো বিশ্ব জুড়ে অণুপরমাণু নৃত্য করছে এবং অগণ্য নক্ষত্রলোক আপন আপন আলোকের শিবির নিয়ে প্রান্তরচারী বেদুয়িনদের মতো আকাশের ভিতর দিয়ে কোথায় চলেছে তার ঠিকানা নেই।

তাই আমি আজ চলেছি—রূপকথার রাজপুত্র যেমন হঠাৎ একদিন অকারণে সাতসমুদ্র পার হবার জন্য বার হয়ে পড়ত তেমনি করে আজ বাইরে চলেছি।

লোহিত সমুদ্র
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

জলস্থল

যে জল মানুষের বন্ধু সে জল ডাঙার মাঝখান দিয়েই বয়। সেই নদীগুলো ডাঙার ভগিনীদের মতো। তারা কত দূরের পাথর-বাঁধা ঘাট থেকে কাঁখে করে জল নিয়ে আসে—তারাই আমাদের তৃষ্ণা দূর করে আমাদের অন্নের আয়োজন করে দেয় কিন্তু আমাদের সঙ্গে সমুদ্রের এ কী বিষম বিরোধ। তার অগাধ জলরাশি সাহারার মরুভূমির মতোই পিপাসায় পরিপূর্ণ। আশ্চর্য, তবু সে

মানুষকে নিরস্ত করতে পারল না। সে যমরাজের নীল মহিষটার মতো কেবলই শিং তুলে মাথা ঝাঁকাচ্ছে কিন্তু কিছুতেই মানুষকে পিছু হঠাতে পারল না।

পৃথিবীর এই দুটো ভাগ—একটা আশ্রয় একটা অনাশ্রয়, একটা স্থির একটা চঞ্চল, একটা শান্ত একটা ভীষণ। পৃথিবীর যে-সন্তান সাহস করে এই উভয়কেই গ্রহণ করতে পেরেছে সেই তো পৃথিবীর পূর্ণ-সম্পদ লাভ করেছে। বিঘ্নের কাছে যে মাথা হেঁট করেছে, ভয়ের কাছে যে পাশ কাটিয়ে চলেছে, লক্ষ্মীকে সে পেল না। এইজন্য আমাদের পুরাণ কথায় আছে, চঞ্চলা লক্ষ্মী চঞ্চল সমুদ্র হতে উঠেছেন, তিনি আমাদের স্থির মাটিতে জন্মগ্রহণ করেন নি।

বীরকে তিনি আশ্রয় করবেন লক্ষ্মীর এই পণ। এইজন্যই মানুষের সামনে তিনি একান্ত এই ভয়ের তরঙ্গ বিস্তার করেছেন। পার হতে পারলে তবে তিনি ধরা দেবেন। যারা কূলে বসে কলশব্দে ঘুমিয়ে পড়ল, হাল ধরল না, পাল মেলল না, পাড়ি দিল না তারা পৃথিবীর ঐশ্বর্য হতে বঞ্চিত হল।

আমাদের জাহাজ যখন নীলসমুদ্রের রুদ্ধ হৃদয়কে ফেনিল করে সগর্বে পশ্চিম দিগন্তের কূলহীনতার অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগল তখন এই কথাটাই আমি ভাবতে লাগলুম। স্পষ্টই দেখতে পেলুম য়ুরোপীয় জাতিরা সমুদ্রকে যেদিন বরণ করল সেদিনই লক্ষ্মীকে বরণ করেছে। আর যারা মাটি কামড়ে পড়ল, তারা আর অগ্রসর হল না, এক জায়গায় এসে থেমে গেল।

মাটি যে বেঁধে রাখে। সে অতি স্নেহশীলা মাতার মতো সন্তানকে কোনোমতে দূরে যেতে দেয় না। শাক-ভাত-তরিতরকারি দিয়ে পেট ভরে খাওয়ায়, তার পরে ঘনছায়াতলে শ্যামল অঞ্চলের উপর ঘুম পাড়িয়ে দেয়। ছেলে যদি একটু ঘরের বার হতে চায় তবে তাকে অবেলা অযাত্রা প্রভৃতি জুজুর ভয় দেখিয়ে শান্ত করে রাখে।

কিন্তু মানুষের দূরে যাওয়া চাই। মানুষের মন এতবড়ো যে কেবল কাছটুকুর মধ্যে তার চলা ফেরা বাধা পায়, জোর করে সেটুকুর মধ্যে ধরে রাখতে গেলেই তার অনেকখানি বাদ পড়ে। মানুষের মধ্যে যারা দূরে যেতে পেরেছে তারাই আপনাকে পূর্ণ করতে পেরেছে। সমুদ্রই মানুষের সম্মুখবর্তী সেই অতিদূরের পথ—দুর্লভের দিকে দুঃসাধ্যের দিকে সেই তো কেবলই হাত তুলে তুলে ডাক দিচ্ছে, সেই ডাক শুনে যাদের মন উতলা হল, যারা বের হয়ে পড়ল তারাই পৃথিবীতে জিতল।

পৃথিবীর মধ্যে যে জাতি এই সমুদ্রকে বিশেষভাবে বরণ করেছে তারা সমুদ্রের এই কূলহীন প্রয়াসকে আপন চরিত্রের মধ্যে পেয়েছে। তারাই এমন কথা বলে থাকে, কোনো একটা চরম পরিণাম মানবজীবনের লক্ষ্য নয়, কেবল অবিশ্রাম ধাবমান গতির মধ্যেই আপনাকে প্রসারিত করে চলাই জীবনের উদ্দেশ্য। তারা অনিশ্চিতের মধ্যে নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কেবলই নব নব সম্পদকে আহরণ করে আনে, তারা কোনো একটা কোণে বাসা বেঁধে থাকতে পারল না। দূর তাদের ডাক দেয়, দুর্লভ তাদের আকর্ষণ করতে থাকে। অসন্তোষের ঢেউ দিবারাত্রি হাজার হাজার হাতুড়ি পিটিয়ে তাদের চিত্তের মধ্যে কেবলই ভাঙাগড়ায় প্রবৃত্ত আছে। রাত্রি এসে যখন সমস্ত জগতের চোখে পলক টেনে দেয় তখনো তাদের কারখানাঘরের দীপচক্ষু নিমেষ ফেলতে জানে না। এরা সমাপ্তিকে স্বীকার করবে না, বিশ্রামের সঙ্গেই এদের হাতাহাতি লড়াই।

আরব সমুদ্র
১৬ জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩১৯

সমুদ্র পাড়ি

বন্দর পার হয়ে জাহাজে গিয়ে উঠলুম। আরও অনেকবার জাহাজে চড়েছি। প্রত্যেকবারেই প্রথমটা কেমন মনের মধ্যে একটা সংকোচ উপস্থিত হয়। সে সংকোচ অপরিচিত স্থানে অপরিচিত মানুষের মধ্যে প্রবেশ করবার সংকোচ নয়। জাহাজটার সঙ্গে নিজের জীবনের বিচ্ছেদ অত্যন্ত বেশি করে

অনুভব করি। এ জাহাজ যারা গড়েছে, যারা চালাচ্ছে, তারাই এ জাহাজের প্রভু—আমি টাকা দিয়ে টিকিট কিনে এখানে স্থান পেয়েছি। এই সমুদ্রের চিহ্নহীন পথের উপর দিয়ে কত বংশ ধরে এদের কত নাবিক আপনার জীবনের অদৃশ্য রেখা রেখে গেছে; বারংবার কত শত মৃত্যুর দ্বারা তবে এই পথ ক্রমে সরল হয়ে উঠছে। আমি যে আজ এই জাহাজে দিনে নির্ভয়ে আহার বিহার করছি ও রাত্তিরে নিশ্চিত মনে ঘুমচ্ছি এই নির্ভয়তা কি শুধু টাকা দিয়ে কেনবার জিনিস। এর পিছনে স্তরে স্তরে কত চিন্তা কত সাহসের সঞ্চয় সমুচ্চ হয়ে রয়েছে সেখানে আমাদের কোনো অর্ঘ্য জমা হয় নি।

যখন এই ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষদের দেখি তারা ডেকের উপর খেলছে, ঘুমচ্ছে, হাস্যালাপ করছে, তখন আমি দেখতে পাই এরা তো কেবলমাত্র জাহাজের উপরে নেই, এরা স্বজাতির শক্তির উপর নির্ভর করে আছে। এরা নিশ্চয় জানে যা করবার তা করা হয়েছে এবং যা করবার তা করা হবে, সেজন্য এদের সমস্ত জাতি জামিন রয়েছে। যদি প্রাণ সংশয় সংকট উপস্থিত হয় তবে কেবল যে কাপ্তেন আছে তা নয়, এদের সমস্ত জাতির প্রকৃতিগত উদ্যম ও নিরলস সতর্কতা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। এরা সেই দৃঢ় ক্ষেত্রের উপর এমন প্রফুল্ল মুখে প্রসন্নচিত্তে বেড়াচ্ছে, চারি দিকের তরঙ্গের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করছে না। এই জায়গায় এরা নিজেরা যা দিয়েছে তাই পাচ্ছে—আর আমরা যা দিই নি তাই নিচ্ছি—সুতরাং সমুদ্র পার হতে হতে দেনা রেখে রেখে যাচ্ছি। তাই জাহাজে ডেকের উপরে ইংরেজ যাত্রীদের সঙ্গে একত্র মিলে বসতে আমার মন থেকে কিছুতে সংকোচ ঘুচতে চায় না।

ডাঙায় বসে অনেক বিলিতি জিনিস ব্যবহার করে থাকি সেজন্য মনের মধ্যে এমনতরো দৈন্যবোধ হয় না। জাহাজে আমরা আরও যেন কিছু বেশি নিচ্ছি। এ তো শুধু কলকারখানা নয়, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আছে। জাহাজ যারা চালাচ্ছে তারা নিজের সাহস দিয়ে শক্তি দিয়ে পার করছে; তাদের যে মনুষ্যত্বের উপর ভর দিয়ে আছি নিজেদের মধ্যে তারই যদি কোনো পরিচয় থাকত তবে যে টাকাটা দিয়ে টিকিট কিনেছি তার ঝমঝমানির সঙ্গে অন্য মূল্যের আওয়াজটাও মিশে থাকত। আজ মনের মধ্যে এই বড়ো একটা বেদনা বাজে যে ওরা প্রাণ দিয়ে চালাচ্ছে আর আমরা টাকা দিয়ে চলছি এর মাঝখানে যে একটা প্রকাণ্ড সমুদ্র পড়ে রইল তা আমরা কবে কোন্ কালে পার হতে পারব। এখনো আরম্ভও করা হয় নি, এখনো অকাতরে প্রাণ দেওয়া বাকি রয়েছে—এখনো কত বন্ধন ছিঁড়তে হবে, কত সংস্কার দলতে হবে সে কথা যখন ভাবি তখন বুঝতে পারি আজ গোটাকয়েক খবরের কাগজের নৌকা বানিয়ে তারই খেলার পালের উপর আমরা যে বচনের ফুঁ লাগাচ্ছি তাতে আমাদের কিছুই হবে না।

কূলকিনারার বন্ধন ছাড়িয়ে একেবারে নীল সমুদ্রের মাঝখানে এসে পড়েছি। ভয় ছিল, ডাঙার জীব সমুদ্রের দোলা সইতে পারব না—কিন্তু আরব সমুদ্রে এখনো মৈসুমের মাতামাতি আরম্ভ হয় নি। কিন্তু চঞ্চলতা নেই তা নয়, কারণ পশ্চিমের উজান হাওয়া বয়েছে, জাহাজের মুখের উপর ঢেউয়ের আঘাত লাগছে কিন্তু এখনো তাতে আমার শরীরের অন্তর্বিভাগে কোনো আন্দোলন তুলতে পারে নি। তাই সমুদ্রের সঙ্গে আমার প্রথম সম্ভাষণটা প্রণয় সম্ভাষণ দিয়েই শুরু হয়েছে। মহাসাগর কবির কবিত্বটুকুকে ঝাঁকানি দিয়ে নিঃশেষ করে দেন নি; তিনি যে ছন্দে মৃদঙ্গ বাজাচ্ছেন আমার রক্তের নাচ তার সঙ্গে দিব্যি তাল রেখে চলতে পারছে। যদি হঠাৎ খেয়াল যায় এবং একবার তার সহস্র উদ্যত হস্তে তাণ্ডব নৃত্যের রুদ্রবোল বাজাতে থাকেন তা হলে আর মাথা তুলতে পারব না। কিন্তু ভাবখানা দেখে মনে হচ্ছে ভীরু ভক্তের উপর এ যাত্রায় তাঁর সে অট্টহাস্যের তুমুল পরিহাস প্রয়োগ করবেন না।

তাই জাহাজের রেলিং ধরে জলের দিকে তাকিয়ে আমার দিন কাটছে। শুক্লপক্ষের শেষ দিকে আমাদের যাত্রা আরম্ভ হয়েছে। যেমন সমুদ্র তেমনি সমুদ্রের উপরকার রাত্রি; স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দুই অন্তহীনের সুন্দর মিলনটি দেখতে থাকি; স্তব্ধের সঙ্গে চঞ্চলের নীরবের সঙ্গে মুখরের

দিগন্তব্যাপী আলাপ চুপ করে শুনে নিই। জাহাজের দুই ধারে জ্বলন্ত ফেনরাশি কেটে কেটে পড়ে, তার ভঙ্গিটি আমার দেখতে বড়ো সুন্দর লাগে। ঠিক মনে হয় যেন জাহাজটাকে ফুলের বীজকোষের মতো করে তার দুই পাশে সাদা পাপড়ি মুহূর্তে মুহূর্তে বিকশিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

এই জাহাজটার মধ্যে কী আশ্চর্য আয়োজন। এই যে জাহাজ দেশকালের সঙ্গে অহরহ লড়াই করতে করতে চলেছে তার সমস্ত রহস্যটা আমাদের গোচর নয়। তার লৌহকঠিন হৃৎপিণ্ড উঠছে পড়ছে, দিনরাত সেই ধুক ধুক স্পন্দন অনুভব করছি যেখানে তার জঠরানল জ্বলেছে এবং তার নাড়ীর মধ্যে উত্তপ্ত বাষ্পের বেগ আলোড়িত হয়ে উঠেছে সেখানকার প্রচণ্ড শক্তির সমস্ত উদ্যোগ আমাদের চোখের আড়ালে রয়েছে। আমাদের উপরতলায় এই প্রচুর আকাশ ও আলস্যের মাঝে মাঝে ঘণ্টাধ্বনি স্নানাহারের সময় জানিয়ে দিচ্ছে। এই যে দেড়শো-দুশো যাত্রীর আহার-বিহারের আয়োজন এ কোথায় হচ্ছে সেই কথা ভাবি। সেও চোখের আড়ালে। তারও শব্দ মাত্র শুনি না, গন্ধ মাত্র পাই না। আহারের টেবিলে গিয়ে যখন বসি, সমস্ত সুসজ্জিত প্রস্তুত। ভোজ্যসামগ্রীর পরিবেশনের ধারা যেন নদীর প্রবাহের মতো অনায়াসে চলতে থাকে।

এদের মধ্যে যেটা বিশেষ করে ভাববার কথা সেটা এই যে, এরা লেশমাত্র অসুবিধাকেও মেনে নিতে চায় না। এতবড়ো একটা পাড়ি—না-হয় আহার-বিহারে কিছু টানাটানিই হল—না-হয় মোটামুটি রকমেই কাজ সেরে নেওয়া গেল। কিন্তু তা নয়—এরা কোনো ওজরকেই ওজর বলে গণ্য করবে না—এরা সকল অবস্থাতেই আপনার সকল রকম দাবিকে সর্বোচ্চ সীমায় টেনে রাখতে চায়। তার ফল হয় যে, অবশেষে সেই অসম্ভব দাবিও মেটে। দাবি করবার সাহস যাদের নেই তারাই কোনোমতে অভাবের সঙ্গে আপস করে দিন কাটায়—তারাই বলে, অর্ধংত্যজতি পণ্ডিতঃ। তাতে হয় এই যে সেই অর্ধের মধ্য থেকেও কেবলিই অর্ধ বাদ পড়ে যায় এবং পণ্ডিত আপনার পাণ্ডিত্যের মধ্যেই ক্রমাগত পণ্ড হতে থাকেন।

একজন উচ্চপদস্থ রেলোয়ে ইঞ্জিনিয়ার আমাদের সহযাত্রী, তিনি আমাকে বলছিলেন, চাবিতালা প্রভৃতি নানা ছোটোখাটো প্রয়োজনের জিনিস আমি রেলোয়ে বিভাগের জন্য এই দেশ থেকেই সংগ্রহ করতে অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু বরাবর দেখতে পাই তার মূল্য বেশি। অথচ জিনিস তেমন ভালো নয়। এদিকে পণ্য দ্রব্যের দাম এবং বেতনের পরিমাণ বেড়েই চলেছে অথচ এখানে যে-সমস্ত জিনিস তৈরি হচ্ছে পৃথিবীর বাজার দরের সঙ্গে তা তাল রেখে চলতে পারছে না। তিনি বললেন য়ুরোপীয় কর্তৃত্বে এ দেশে যে-সমস্ত কারখানা চলছে এ দেশের লোকের উপর তার প্রভাব অতি সামান্য। আর দেশীয় কর্তৃত্বে যেখানে কাজ চলে সেখানে দেখতে পাই পুরো কাজ আদায় হয় না—মানুষের যতখানি শক্তি আছে তার অধিকাংশকেই খাটিয়ে নেবার যেন তেজ নেই। এইজন্যই মজুরির পরিমাণ অল্প সত্ত্বেও মূল্য কমতে চায় না। কেননা, মানুষ যতগুলি খাটছে, শক্তি ততটা খাটছে না।

আমি সেই ইঞ্জিনিয়ারটিকে বললাম, তোমাদের দেশে যৌথ কারবার ও কলকারখানার গুণেই কি জিনিসের মূল্য কম হচ্ছে না। তিনি বললেন, তা হতে পারে কিন্তু কোনো দেশে যৌথ কারবার আগে এবং উন্নতি তার পরে এমন কথা বলা যায় না। মানুষ যখন যৌথ কারবারে মেলবার উপযুক্ত হয় তখনি যৌথ কারবার আপনিই ঘটে ওঠে। তিনি বললেন, আমি মান্দ্রাজের দিকে দক্ষিণ ভারতে অনেক দেশীয় যৌথ কারবারের উৎপত্তি ও বিলুপ্তি দেখেছি। দেখতে পাই অনুষ্ঠানটির প্রতি যে লয়ালটি অর্থাৎ যে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার প্রয়োজন তা কারও নেই; প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে নিজের দিকে তাকায়। এতে কখনোই কোনো জিনিস বাঁধতে পারে না; এই দৃঢ়নিষ্ঠ প্রাণপণ লয়ালটি যদি জাতীয় চরিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তবে সমস্ত সম্মিলিত শুভানুষ্ঠান সম্ভবপর হয়।

কথাটা আমার মনে লাগল। অনুষ্ঠানের দ্বারা মঙ্গল সাধন করা যায় এ কথাটা সত্য নয়—গোড়াতেই মানুষ আছে। আমাদের দেশে একজন মানুষকে আশ্রয় করে এক-একটা কাজ জেগে

ওঠে তার পরে সেই কাজকে যারা গ্রহণ করে তারা তাকে যতটা আশ্রয় করে ততটা আশ্রয় দেয় না। কথায় কথায় তাদের মুষ্টি শিথিল হয়ে পড়ে, বাধাকে তারা অতিক্রমের চেষ্টা না করে বাধাকে ত্যাগ করে পালাতে চায়। এমনি করে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়—একটা হতে পাঁচটা টুকরো দাঁড়ায় এবং পাঁচটাই ব্যর্থ হয়। ভালোমন্দ বাধা-বিপত্তি সমস্তটাকে বীরের মতো স্বীকার করে আরব্ধ কাজকে একান্ত লয়ালটির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বহন করবার অধ্যবসায় যতদিন আমাদের সাধারণের চিত্তে না জাগবে ততদিন সম্মিলিত হিতানুষ্ঠান ও যৌথ বাণিজ্য আমাদের দেশে একেবারে অসম্ভব হবে।

এই লয়ালটি—এ বুদ্ধিগত, এ হৃদয়গত, জীবনগত। সমস্ত অপূর্ণতার ভিতর দিয়ে মানুষ নিজেকে কিসের জোরে বহন করে। একটা প্রাণশক্তির গভীর আকর্ষণে। লাভ-লোকসানের সমস্ত হিসেব সেই প্রাণশক্তির টানের কাছে লঘু। যে কাজে আমরা লেগেছি তার প্রতি যদি আমাদের জীবনগত নিষ্ঠা না থাকে, তার প্রতি যদি আমাদের একটা বেহিসেবী আকর্ষণ না থাকে, তার প্রতি অপরাহত শ্রদ্ধা নিয়ে আমরা যদি পরাভবের দলেও দাঁড়াতে না পারি, যদি মৃত্যুর মুখেও তার জয় পতাকাকে সর্বোচ্চে তুলে ধরবার বল না পাই, যদি অভিমন্যুর মতো ব্যূহের মধ্য থেকে বার হবার বিদ্যাটাকে আমরা একেবারে অগ্রাহ্য না করি তা হলে আমরা কিছুই সৃষ্টি করতেও পারব না রক্ষা করতেও পারব না। 'এ আমাদের অতএব এ আমারই' এই কথাটাকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত লাভক্ষতি সমস্ত হারজিতের মধ্যে প্রাণপণে বলবার শক্তি সকলের আগে আমাদের চাই, তার পরে যে-কোনো অনুষ্ঠানকেই আশ্রয় করি-না কেন একদিন না একদিন বিঘ্ন সমুদ্র পার হতে পারব।

নিরতিশয় কর্মের প্রয়াসের দ্বারা য়ুরোপের জীবন জীর্ণ হচ্ছে এই কথাটা আজকাল পশ্চিম দেশেও শোনা যায় এবং এই কথাটা একেবারে মিথ্যেও নয়। আমি আগেই বলেছি য়ুরোপ কোনো অভাব কোনো অসুবিধাকেই কিছুমাত্র মানবে না এই তার পণ। নিজের শক্তির উপরে তার অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস থাকাতেই তার শক্তি পূর্ণ গৌরবে কাজ করছে এবং অসাধ্য সাধন করে তুলছে। কিন্তু তবুও শক্তির সীমা আছে। বাতিও খুব বড়ো করে জ্বালাব অথচ সলতেও ক্ষয় করব না এ তো কোনোমতেই হয় না।

এইজন্য পাশ্চাত্যদেশে জীবনযাত্রার দাবি একদিকে যত বাড়ছে আর-একদিকে ততই সে দাহন করছে। আরামকে সুবিধাকে কোথাও খর্ব করব না পণ করে বসাতে তার বোঝা কেবলই প্রকাণ্ড বড়ো হয়ে উঠছে। এই বোঝা একটা জায়গায় চাপ দিচ্ছে। যেখানে সেই চাপ পড়ছে সেখানে যে পরিমাণে দুঃখ জন্মাচ্ছে সে পরিমাণে ক্ষতি পূরণ হচ্ছে না। এইজন্য ভার-সামঞ্জস্যের প্রয়াস আগ্নেয় ভূমিকম্পের আকারে সমস্ত পীড়িত সমাজের ভিতর থেকে ক্ষণে ক্ষণে মাথা তোলবার উপক্রম করছে। মানুষের সুবিধা সৃষ্টি করবার জন্য কল কেবলই বেড়ে চলেছে এবং মানুষের জায়গা কল জুড়ে বসছে। কোথায় এর অন্ত। মানুষ আপনাকে আপনার অভাব পূরণের যন্ত্র করে তুলছে—কিন্তু সেই আপনাকে সে পাবে কোন্ অবসরে। যেমন করেই হোক এক জায়গায় তাকে দাঁড়ি টেনে দিয়ে বলতেই হবে এই রইল আমার উপকরণ এখন আমাকেই আমার উদ্ধার করা চাই।

আরব সমুদ্র
১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

লন্ডনে

মার্সেল্‌স্ হতে এক দৌড়ে পারিসে এসে এক দিনের মতো হাঁপ ছাড়লুম। শরীর হতে সমুদ্রের নিমক সাফ করে ফেলে ডাঙার হাতে আত্মসমর্পণ করলুম। স্নানাহারের পর একটা মোটরগাড়িতে চড়ে পারিসের রাস্তায় রাস্তায় একবার হুহু করে ঘুরে এলুম।

বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় পারিস সমস্ত য়ুরোপের খেলাঘর। এখানে রঙ্গশালার প্রদীপ আর নেবে না। চার দিকে আমোদ-আহ্লাদের বিরাট আয়োজন। মানুষকে খুশি করবার জন্য সুন্দরী পারিস নগরীর কতই সাজসজ্জা। এই কথাই কেবল মনে হয় সে কাজটা সহজে সারবার কোনো চেষ্টা নেই।

যখন পৃথিবীতে রাজাদের একাধিপত্যের দিন ছিল তখন প্রমোদের চূড়ান্ত ছিল কেবল রাজারই ঘরে। এখন সমস্ত মানুষ রাজা। এই সমগ্র মানুষের বিলাসভবনটি প্রকাণ্ড ব্যাপার। এর জন্য কত দাস যে অহোরাত্র খেটে মরছে তার সীমা নেই। এর জন্য প্রতিদিন কত জাহাজ, কত রেলগাড়ি বোঝাই করে পৃথিবীর কত দুর্গম দেশ হতে উপকরণ এসেছে তার ঠিকানা কে রাখে।

এই মানুষ-রাজার আমোদ এমন প্রকাণ্ড এমন বিচিত্র হয়ে উঠেছে যে, একে অলস বিলাসীর প্রমোদের সঙ্গে তুলনা করতে প্রবৃত্তি হয় না। এ প্রবল চিত্তের প্রবল আমোদ; যে সহজে সন্তুষ্ট হতে চায় না তাকে খুশি করবার দুঃসাধ্য সাধন। বহুলোক ভোগ করতে করতে এবং বহুলোক ভোগ জোগাতে জোগাতে এই প্রমোদপারাবারের মধ্যে তলিয়ে মরছে কিন্তু তবুও মোটের উপরে এর ভিতর হতে মানুষের যে একটা বিজয়ী শক্তির মূর্তি দেখা যাচ্ছে তাকে অবজ্ঞা করতে পারি নে।

রবিবারের দিন ক্যালে থেকে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে ডোভারে পৌঁছলুম। সেখানে ইংরেজ যাত্রীর সঙ্গে যখন রেলগাড়িতে চড়ে বসলুম তখন মনের মধ্যে আরাম বোধ হল।

অনেককাল পরে লন্ডনে এলুম। তখনো লন্ডনের রাস্তায় যথেষ্ট ভিড় দেখেছি কিন্তু এখন মোটরগাড়ির একটা নূতন উপসর্গ জুটেছে। তাতে শহরের ব্যস্ততা আরও প্রবলভাবে মূর্তিমান হয়ে উঠেছে। মোটর রথ, মোটর বিশ্বম্বহ (অম্নিবাস্), মোটর মালগাড়ি লন্ডনের নাড়ীতে নাড়ীতে শতধারায় ছুটে চলছে। আমি ভাবি লন্ডনের সমস্ত রাস্তার ভিতর দিয়ে কেবলমাত্র এই চলবার বেগ পরিমাণে কী ভয়ানক প্রকাণ্ড। যে মনের বেগের এটা বাহ্যমূর্তি তাই বা কী ভীষণ। দেশকালকে নিয়ে কী প্রচণ্ড বলে এরা টানাটানি করছে। পথ দিয়ে পদাতিক যারা চলছে প্রতিদিন তাদের সতর্কতা তীব্রতর হয়ে উঠছে। মন অন্য যে-কোনো ভাবনাই ভাবুক-না কেন তার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের এই বিচিত্র গতিবিধির সঙ্গে তাকে প্রতিনিয়ত আপস করে চলতে হবে। হিসেবের ভুল হলেই বিপদ। হিংস্র পশুর হাত হতে পরিত্রাণ পাবার প্রয়াসে হরিণের সতর্কতাবৃত্তি যেমন প্রখর হয়ে উঠেছে, চার দিকে ব্যস্ততার তাড়া খেয়ে খেয়ে এখানকার মানুষের সাবধানতা তেমনি অসামান্য তীক্ষ্ণতা লাভ করছে। দ্রুত দেখা, দ্রুত শোনা ও দ্রুত চিন্তা করে কর্তব্য স্থির করবার শক্তি কেবলই বেড়ে উঠছে। দেখতে, শুনতে ও ভাবতে যার সময় লাগে সেই এখানে হঠে যাবে।

বন্ধু

লন্ডনে এসে একটা হোটেলে আশ্রয় নিলুম, মনে হল এখানকার লোকালয়ের দেউড়িতে আনাগোনার পথে এসে বসলুম। ভিতরে কী হচ্ছে খবর পাই না— লোকের সঙ্গে পরিচয়ও হয় না— কেবল দেখি মানুষ যাচ্ছে আর আসছে। এইটুকুই চোখে পড়ে মানুষের ব্যস্ততার সীমা পরিসীমা নেই। এত অত্যন্ত বেশি দরকার কিসের তা আমরা বুঝতে পারি না। এই প্রচণ্ড ব্যস্ততার ধাক্কাটা কোন্‌খানে গিয়ে লাগছে তাতে ক্ষতি করছে কি বৃদ্ধি করছে তার কোনো হিসেব কেউ রাখছে কি না কিছুই জানি না। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজে। খাওয়ার জায়গায় গিয়ে দেখি, এক-একটা ছোটো টেবিল ঘিরে দুই-তিনটি করে স্ত্রীপুরুষ নিঃশব্দে খাচ্ছে; পাত্র হাতে দীর্ঘকায় পরিবেশক গম্ভীর মুখে দ্রুতপদে ক্ষিপ্রহস্তে পরিবেশন করে চলেছে; কেউ কেউবা খেতে খেতেই খবরের কাগজ পড়া সেরে নিচ্ছে; তার পরে ঘড়িটা খুলে একবার তাকিয়ে টুপিটা মাথায় চাপিয়ে দিয়ে হন্ হন্ করে চলে যাচ্ছে— ঘর শূন্য হচ্ছে। কেবল আহারের সময় বার-কয়েক কয়েকজন মানুষ একত্র হয়, তার পরে কে কোথায় যায় কেউ তার ঠিকানা রাখে না। আমার কোনো প্রয়োজন নেই; সকলের দেখাদেখি মিথ্যা এক-একবার
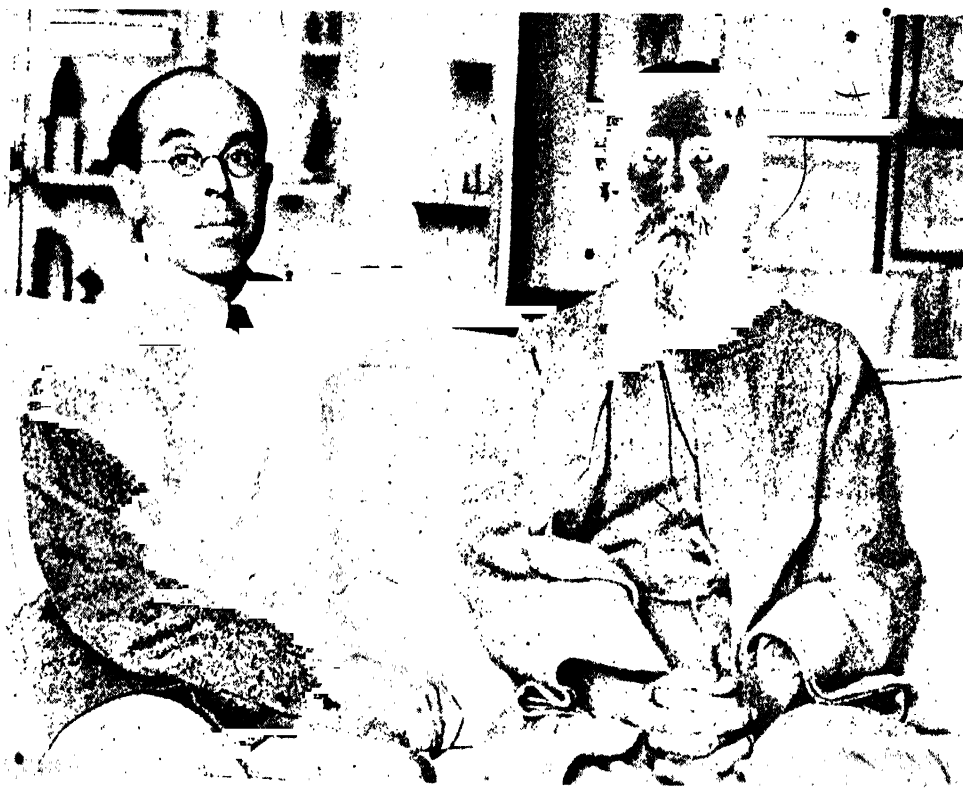
রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন। ১৯১২

ঘড়ি খুলে দেখি আবার বন্ধ করে পকেটে রাখি। যখন আহারেরও সময় নয়, নিদ্রারও সময় নয়, তখন হোটেল যেন ডাঙায় বাঁধা নৌকার মতো—তখন যদি সেখানে থাকতে হয় তবে কেন যে আছি তার কোনো কৈফিয়ত ভেবে পাওয়া যায় না। যাদের বাসস্থান নেই কেবল কর্মস্থানই আছে তাদেরই পক্ষে হোটেল মানায়। যারা আমার মতো নিতান্ত অনাবশ্যক লোক তাদের পক্ষে বাসের আয়োজনটা এমনতরো পাইকারি রকমের হলে পোষায় না। জানলা খুলে দেখি জনস্রোত নানা দিকে ছুটে চলেছে। মনে মনে ভাবি, এরা যেন কোন্ এক অদৃশ্য কারিগরের হাতুড়ি। যে জিনিসটা গড়ে উঠেছে সেটাও মোটের উপর অদৃশ্য; মস্ত একটা ইতিহাসের কারখানা; লক্ষ লক্ষ হাতুড়ি দ্রুত প্রবল বেগে লক্ষ লক্ষ জায়গায় এসে পড়ছে। আমি সেই এঞ্জিনের বাইরে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকি, দেখতে পাই ক্ষুধার স্টীমে চালিত এই সজীব হাতুড়িগুলোর দুর্দামতা।

যারা বিদেশী, প্রথম এখানে এসে এখানকার ইতিহাস-বিধাতার এই অতি বিপুল মানুষকলের চেহারাটাই তাদের চোখে পড়ে। কী দাহ কী শব্দ, কী চাকার ঘূর্ণি। এই লন্ডন শহরের সমস্ত গতি সমস্ত কর্মকে একবার চোখ বুজে ভেবে দেখতে চেষ্টা করি কী ভয়ংকর অধ্যবসায়। এই অবিশ্রাম বেগ কোন্ লক্ষ্যের অভিমুখে আঘাত করছে এবং কোন্ অব্যক্তকে প্রকাশের অভিমুখে জাগিয়ে তুলছে।

কিন্তু মানুষকে কেবল এই যন্ত্রের দিক হতে দেখে তো দিন কাটে না। যেখানে সে মানুষ সেখানে তার পরিচয় না পেলে কী করতে এলুম। কিন্তু মানুষ যেখানে কল সেখানে দৃষ্টি পড়া যত সহজ মানুষ যেখানে মানুষ সেখানে তত সহজ নয়। ভিতরকার মানুষ আপনি এসে সেখানে ডেকে না নিয়ে গেলে প্রবেশ পাওয়া যায় না। কিন্তু সে তো থিয়েটারের টিকিট কেনার মতো নয়—সে দাম দিয়ে মেলে না, সে বিনামূল্যের জিনিস।

আমার সৌভাগ্যক্রমে একটি সুযোগ ঘটে গেল—আমি একজন বন্ধুর দেখা পেলুম। এক-একটি লোক আছেন পৃথিবীতে তাঁরা বন্ধু হয়েই জন্মগ্রহণ করেন। বন্ধু হবার শক্তি আমাদের সকলের নেই। বন্ধু হতে গেলে সঙ্গদান করতে হয়। অন্যান্য সকল দানের মতো এ দানেরও একটা তহবিল দরকার, কেবলমাত্র ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়।

যাঁর কথা বলছি ইনি একজন সুবিখ্যাত চিত্রকর; এঁর নাম উইলিয়ম রোটেনস্টাইন। ভারতবর্ষে এঁর সঙ্গে আমার ক্ষণকালের জন্য আলাপ হয়েছিল। এঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে পারব এই লোভটি য়ুরোপে যাত্রার সময় আমার মনকে টেনেছিল।

এঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটবামাত্র একমুহূর্তেই হোটেলের দেউড়ি পার হয়ে গেলুম, কেউ আর বাধা দেবার রইল না। হ্যাম্পস্টেডহীথ-এ এঁর বাসা। এই জায়গাটা একটা পাহাড়ে মাঠ, যেন লন্ডনের বিস্ফারিত বক্ষঃস্থল।

এঁর বাড়িটির পিছন দিকে ঢালু পাহাড়ের গায়ে ছোটো একটুকরা বাগান। বাগানের দিকে মুখ করে তাঁদের বৈঠকখানা ঘরের সংলগ্ন একটি লম্বা বারান্দা অপর্যাপ্ত ফুলের স্তবকে আমোদিত, গোলাপের লতায় অর্ধপ্রচ্ছন্ন। এই বারান্দায় আমি যখন খুশি একখানা বই হাতে করে বসি, তাও পরে আর বই পড়বার কোনো প্রয়োজন বোধ করি না। এঁর দুটি ছোটো ছেলে ও ছোটো মেয়ের মধ্যে বাল্যবয়সের চিরানন্দময় নবীনতার উচ্ছ্বাস দেখতে আমার ভালো লাগে।

অপরিচয় হতে পরিচয়ের পথ অতি দীর্ঘ। সেই দুঃসাধ্য পথ অতিক্রম করবার মতো সময় আমার ছিল না। আমার শক্তিও অল্প। বরাবর কোণে থাকা অভ্যাস বলে নিজের জোরে ভিড় ঠেলে ঠুলে ইচ্ছিত জায়গাটিতে পেঁছনোর চেষ্টা করতেও আমি পারি না। তা ছাড়া ইংরেজি ভাষার সদর দরজার চাবিটা আমার হাতে নেই; আমাকে কেবলই বেড়া ডিঙিয়ে চলতে হয়—তেমন করে পথ চলা একটা ব্যায়াম—তেমন করে আপনার স্বভাবকে রক্ষা করে চলা যায় না। নিজেকে অবাধে পরিচিত করবার শক্তি না থাকলে অন্যের সহজ পরিচয় পাওয়া সম্ভবপর হয় না। সুতরাং কিছুকাল এখানকার মোটর-গাড়ির দানব-রথের চাকা এড়িয়ে চলবার চেষ্টায় শ্রান্ত হয়ে অবশেষে এখানকার পথ হতেই ফিরতুম

আমার সেই নদীব্যূহপাশে ঘেরা বাংলাদেশের শরৎরৌদ্রালোকিত আমন ধানের খেতের ধারে। এমন সময় প্রবেশ করলেন বন্ধু; পর্দা তুলে দিলেন; দেখলুম আসন-পাতা, দেখলুম আলো জ্বলছে; বিদেশীর অপরিচয়ের মস্ত বোঝাটা বাইরে রেখে পথিকের ধূলিলিপ্ত বেশ ছেড়ে ফেলে মুহূর্তেই ভিড়ের মধ্যে থেকে নিভৃতে এসে প্রবেশ করলুম।

ভাবুক সমাজ

বাইরের কাজের ক্ষেত্রে এই যেমন হাঁকাহাঁকি দৌড়াদৌড়ি, চিন্তার ক্ষেত্রে ঠিক তেমনিই। কত হাজার হাজার লোক যে ঊর্ধ্বশ্বাসে চিন্তা করে চলেছে, তার ঠিকানা নেই। দৈনিক কাগজে, সাপ্তাহিকে, মাসিকে, ত্রৈমাসিকে, বক্তৃতাসভায়, শিক্ষাশালায়, পার্লামেন্টে, পুঁথিতে চটিতে মনের ধারা অবিশ্রাম বয়ে চলছে। মানসিক শক্তি যার যে রকমের এবং যে পরিমাণে আছে, তার সমস্তটার উপর টান পড়েছে। 'চাই, আরও চাই' দেশের মর্মস্থান থেকে এই একটা ডাক সর্বদা পেঁচচ্ছে। এত বড়ো একটা ডাকে কারও সবুর সয় না, ক্ষণকাল চুপ করে থাকতে হলে মন উতলা হয়ে ওঠে। দেশের এই মানস-ভাণ্ডারে যে লোক একবার একটা কিছু জুগিয়েছে, তার আর নিষ্কৃতি নেই; সে লোকের উপর আরোর তাগিদ পড়ল; খেজুর গাছের মতো বছরের পর বছরে কাটের পর কাট চলতে থাকে; কোনো বারে রসের একটু কমতি বা বিরাম পড়লে সে পাড়াসুদ্ধ লোকের প্রশ্নের বিষয় হয়ে ওঠে।

এদের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব বেশি দিনেরও নয়; খুব অন্তরঙ্গও নয়; ক্ষণকালের দেখা-সাক্ষাৎ মাত্র। কিন্তু সেই সময়টুকুর মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ করে আমি বিস্মিত হয়েছি, সেটা এদের মনের ক্ষিপ্রগতি। মন ইলেকট্রিক আলোর তারের মতো সর্বদা যেন প্রস্তুত হয়েই আছে, বোতামটি টেপবামাত্র তখনি জ্বলে ওঠে। আমাদের প্রদীপের আলোর ব্যবহার; সলতে পাকিয়ে, তেল ঢেলে, চকমকি ঠুকে কাজ চালিয়ে থাকি; বিশেষ কোনো তাগিদ নেই; সুতরাং দেরি হলে কিছুই আসে যায় না। অতএব আমাদের যেরূপ অভ্যাস, তাতে আমার পক্ষে এই ইলেকট্রিক আলোর ক্ষিপ্রতা সম্পূর্ণ নূতন।

এখনকার কালের সুবিখ্যাত লেখক ওয়েল্‌স্‌ সাহেবের দুই-একখানি নভেল ও আমেরিকার সভ্যতা সম্বন্ধে একখানা বই আগেই পড়েছিলুম। তাতেই জানতুম, এঁর চিন্তাশক্তি ইস্পাতের তরবারির মতো যেমন ঝক্‌মক করে, তেমনি তা খরধার। আমার বন্ধু যেদিন এঁর সঙ্গে এক ডিনরে আমাকে নিমন্ত্রণ করেন, সেদিন আমার মনের মধ্যে একটু ভয় ছিল। আমার মনে ছিল, সংসারে খরতর বুদ্ধি জিনিসটাতে নিশ্চয়ই অনেক কাজ হয়, কিন্তু তার সংস্রব হয়তো আরামের নয়।

যা হোক, সেদিন সন্ধেবেলা এঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ পরিচয় হল। প্রথমেই আশ্বস্ত হলুম, যখন দেখা গেল, মানুষটি সজারু জাতীয় নয়। সম্পূর্ণ মোলায়েম। দেখতে পেলুম এঁর প্রখরতা চিন্তায়, কিন্তু প্রকৃতিতে নয়। আসল কথা, মানুষের প্রতি এঁর আন্তরিক দরদ আছে; অন্যায়ের প্রতি বিদ্বেষ এবং মানুষের সার্বজনীন উন্নতির প্রতি অনুরাগ আছে; সেইটে থাকলেই মানুষের মন কেবলমাত্র চিন্তার তুবড়িবাজি করে সুখ পায় না। এই দেশে সেইটে একটা মস্ত জিনিস। মানুষ এখানে সর্বদা প্রত্যক্ষগোচর হয়ে আছে; মানুষের সম্বন্ধে এখানে ঔৎসুক্যের অন্ত নেই। শুধু বীজে ও মাটিতে ফসল ভালো হয় না, জমিতে সর্বদা রস থাকা চাই; মানুষের প্রতি মানুষের টানই সেই চিরন্তন রস—যাতে করে মনের সকল রকম ফসল একেবারে অপর্যাপ্ত হয়ে ফলে ওঠে। আমাদের দেশে অনেক শক্তিশালী লোক দেখেছি, মানুষের সঙ্গে তাঁদের হৃদয়ের সংস্রব সুগভীর ও সর্বক্ষণ স্থায়ী নয় বলেই তাঁরা আপনার সাধ্যকে পূর্ণভাবে সাধিত করে তুলতে পারেন না। মানুষ তাঁদের কাছে তেমন করে চাইছে না বলেই মানুষের প্রাপ্য ধন তাঁরা পুরো পরিমাণ বার করতে পারছেন না। বিরলবসতি লোকালয়ে মানুষ নিজের নিতান্ত প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কিছু ফলায় না; এবং তারও অনেক নষ্ট হয় ফেলা যায়। আমাদের সেইরকম বিরলে বাস। সেইজন্য আমরা অনেক

চিন্তা করতে পারি, কিন্তু সে চিন্তা আলস্য ঘুচিয়ে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে না; অনেকের হৃদয় আছে, কিন্তু সে হৃদয় ছেলেপুলে ভাইপো ভাগনের বাইরে খাটবার ক্ষেত্র পায় না।

ওয়েলসের সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে এইটে বুঝতে পারলুম, এঁদের চিন্তাশীলতা ও রচনাশক্তির অবলম্বন মানুষ; এইজন্য তা শিকারীর শিকার ইচ্ছার মতো কেবলমাত্র শক্তির খেলা নয়। এইজন্য এঁদের চিন্তার যে তীক্ষ্ণতা, তার সঙ্গে হৃদয় আছে জীবন আছে।

আর-একটা জিনিস দেখে বিস্মিত হলুম, সে কথা আগেই বলেছি। সে এঁদের চিন্তার ক্ষিপ্রতা। আমার বন্ধুর সঙ্গে ওয়েল্সের যতক্ষণ কথা চলল, ততক্ষণ পদে পদে কথাবার্তার প্রবাহ উজ্জ্বল চিন্তার নির্ঝর শীকরে ঝল্‌মল্‌ করতে লাগল। কথার সঙ্গে কথার স্পর্শে আপনি স্ফুলিঙ্গ বার হতে থাকে, মুহূর্তকাল বিলম্ব হয় না। এতে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, এঁদের মন প্রস্তুত হয়েই আছে। এঁরা যে চিন্তা করছেন, তা নয়, চার দিকের ঠেলায় এঁদের নিয়ত চিন্তা করাচ্ছে; তাই এঁদের মন ছুটতে ছুটতেও ভাবতে পারে এবং ভাবতে ভাবতেও কথা বলে যায়। এঁদের ব্যক্তিগত মনের পিছনে সমস্ত দেশের মন জেগে আছে; চিন্তার ঢেউ কথার কল্লোল কেবলই নানা দিক থেকে নানা আকারে পরস্পরের চিত্তকে আঘাত করছে, এতে মনকে জাগ্রত ও মুখরিত না করে থাকতে পারে না।

আমার বন্ধু চিত্রশিল্পী, কথার কারবার তাঁর নয়। তাঁর সঙ্গে আমার অনেকদিন অনেক আলাপ হয়েছে, সর্বদা এই লক্ষ করেছি, যে কথাটাই এঁর সামনে উপস্থিত হয়, তৎক্ষণাৎ সেটাকে ইনি জোরের সঙ্গে ভাবতে পারেন ও জোরের সঙ্গে বলতে পারেন। এঁর অনুভূতিশক্তিও দ্রুত এবং প্রবল। যেটা ভালো লাগবার জিনিস, সেটাকে ভালো লাগতে এঁর ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয় না—সে সম্বন্ধে এঁকে আর কারও মুখাপেক্ষা করতে হয় না; যেটাকে নিতে হবে, সেটাকে ইনি একেবারে অসংশয়ে নেন। মানুষকে ও মানুষের শক্তিকে গ্রহণ করবার সহজ ক্ষমতা এঁর প্রবল বলেই ইনি এঁর দেশের নানা শক্তিশালী নানা শ্রেণীর লোককে এমন করে বন্ধুত্বপাশে বাঁধতে পেরেছেন।

আমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে আমার এই মনে হতে থাকে, অনেক বিষয়েই এঁদের এখন আর গোড়া থেকে ভাবতে হয় না; এঁরা অনেক কথা অনেক দূর পর্যন্ত ভেবে রেখেছেন। এঁদের দেশে ভাবনা জিনিসটা চলার মুখেই আছে, তার চাকা আপনিই সরে; মানুষের চিন্তার অধিকাংশ বিষয়েই মাঝ রাস্তায়।

কেম্ব্রিজের কলেজ-ভবনে একজন অধ্যাপকের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে আমি দিন-দুয়েক বাস করেছিলুম। এঁর নাম লোয়েস্‌ ডিকিন্সন্‌। ইনিই 'জন্‌ চীনামেনের পত্র' বইখানার লেখক। সে বইখানা যখন প্রথম বার হয়, তখন আমাদের দেশে প্রাচ্য দেশাভিমানের একটা প্রবল হাওয়া দিয়েছিল। সেইসময়ে এই চীনামেনের পত্র বইখানা অবলম্বন করে আমি এক মস্ত প্রবন্ধ লিখে সভায় পড়েছিলুম। তখন জানতুম, সে বইখানা সত্যই চীনামেনের লেখা। যিনি লেখক তাঁকে দেখলুম, তিনি চীনামেন নন, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু তিনি ভাবুক, অতএব তিনি সকল দেশের মানুষ। যে দুদিন এঁর বাসায় ছিলুম, এঁর সঙ্গে প্রায় নিয়ত আমার কথাবার্তা হয়েছে। স্রোতের সঙ্গে স্রোত যেমন অনায়াসে মেশে, তেমনি অশ্রান্ত আনন্দে তাঁর চিত্তবেগের টানে আমার চিত্ত ধাবিত হয়ে চলছিল। এই মননশীল অধ্যাপকের গ্রন্থমণ্ডিত বাসাটুকুর মধ্যে একদিন জুটলেন বার্ট্রান্ড রাসেল। রাসেলের মন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আলোকে দীপ্তিমান। সেই চিন্তার আলোকের সঙ্গে সঙ্গে অপর্যাপ্ত হাস্যরশ্মি মিলিত হয়ে আছে। রাত্তিরে খাবার পর আমরা কলেজের বাগানে গিয়ে বসতুম। এই দুই অধ্যাপক বন্ধুর আলাপের বিষয় বহুদূরব্যাপী। তার মধ্যে সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, সকল রকম জিনিসই ছিল। আমার কাছে সেই রাত্রির স্মৃতিটি রমণীয়।

স্টপফোর্ড ব্রুক

আমি কোনো একটা অবকাশের কালে নিজের কতকগুলো কবিতা ও গান ইংরেজি গদ্যে তর্জমা করবার চেষ্টা করেছিলুম। ইংরেজি লিখতে পারি এ অভিমান আমার কোনো কালেই নেই; অতএব ইংরেজি রচনার বাহবা নেবার প্রতি আমার লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু নিজের আবেগকে বিদেশী ভাষার মুখ থেকে আবার একটুখানি নূতন করে গ্রহণ করবার যে সুখ তা আমাকে পেয়ে বসেছিল। মনের খেয়ালে আমার রচনাকে আমি বিদেশিনী সাজিয়েছিলুম।

বিলেতে আসার পর এই তর্জমাগুলো যখন আমার বন্ধুর হাতে পড়ল তিনি প্রবল উৎসাহে সেগুলো গ্রহণ করলেন। এবং তার কয়েকখানা কপি করিয়ে এখানকার কয়েকজন সাহিত্যিককে পড়তে দিলেন। আমার এই বিদেশী হাতের ইংরেজিতে আমার এই লেখাগুলো তাঁদের ভালো লেগেছে। বোধ হয় তার একটা কারণ এই যে ইংরেজি রচনার শক্তি আমার এতটা প্রবল নয় যাতে আমার তর্জমা থেকে বিদেশী রসটুকুকে আমি নিঃশেষে নষ্ট করে ফেলতে পারি।

স্টপফোর্ড ব্রুকের হাতে আমার এই তর্জমাগুলির একটি কপি পড়েছিল। সেই উপলক্ষে তিনি একদিন আমাকে ডিনরের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তিনি বৃদ্ধ, বোধ করি তাঁর বয়স সত্তর বছর পার হয়ে গেছে। তাঁর একটা পায়ের রক্তপ্রণালীতে প্রদাহের মতো হয়েছে; চলা তাঁর পক্ষে কষ্টকর। সেই পা একটা চৌকির উপর তুলে বসে আছেন। বার্ধক্যে কোনো কোনো মানুষকে পরাভূত ক'রে পদানত করে। আবার কোনো কোনো মানুষের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন ক'রে তার সঙ্গে বন্ধুর মতো বাস করে। এ'র শরীর মনে বার্ধক্য তার জয়পতাকা তুলতে পারে নি। আমার বার বার মনে হতে লাগল, বৃদ্ধের মধ্যে যখন যৌবনকে দেখা যায় তখনি তাকে সকলের চেয়ে ভালো করে দেখা যায়; শরীরের রক্তমাংসের সঙ্গে জীর্ণ হতে জানে না, তা রোগতাপকে আপনার জোরেই উপেক্ষা করতে পারে। তাঁর দেহের আয়তন প্রশস্ত, তাঁর মুখশ্রী সুন্দর; কেবল তাঁর পীড়িত পায়ের দিকে তাকিয়ে মনে হল অর্জুন যখন দ্রোণাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তখন প্রণাম নিবেদনের স্বরূপ প্রথম তীর তাঁর পায়ের তলায় ফেলেছিলেন, তেমনি বার্ধক্য তার যুদ্ধ আরম্ভের প্রথম তীরটা এ'র পায়ের কাছে নিক্ষেপ করেছে।

বিধাতা যে জীবনটা এ'কে দান করেছেন, সেটাকে সকল দিক থেকে আনন্দের সামগ্রী করে দিয়েছেন। ছবি, কবিতা, প্রকৃতির সৌন্দর্য, এবং লোকালয়ে মানবজীবনের বিচিত্র লীলা, সকলের প্রতিই তাঁর চিত্তের ঔৎসুক্য প্রবল। চারি দিকের জগতের এই স্পর্শানুভূতি, এই রস-গ্রহণের শক্তি তাঁর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কমে আসে নি। এই গ্রহণের শক্তিই তো যৌবন।

এ'র ধর্মোপদেশ ও কাব্য সমালোচনা আমি আগেই পড়েছি। সেদিন দেখলুম ছবি আঁকতেও এ'র বিলাস। এ'র আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি ঘরের কোণে অনেক জমা হয়ে আছে। এগুলো সব মনে থেকে আঁকা। আমার চিত্রশিল্পী বন্ধু এই ছবিগুলো দেখে বিশেষ করে প্রশংসা করলেন। এই ছবিগুলো প্রদর্শনীতে দেবার বা লোকের মনোরঞ্জন করবার জন্য নয়, এ নিতান্তই মনের লীলা মাত্র। জীবনীশক্তির প্রবলতা এ'র কাজের মধ্যে খেলা করবারও অবকাশ পায়। এই খেলার দ্বারাই প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় কাজের চার দিকে একটা মুক্তির ক্ষেত্রেই মানুষের ঐশ্বর্য।

অনেক সিঁড়ি ভেঙে উপরের তলায় একটি ছোটো কামরায় এ'র সঙ্গে দেখা হল। অনেকক্ষণ আমাদের দুজনের নিভৃত আলাপের অবকাশ ঘটেছিল। তাঁর কথাবার্তা থেকে আমি এইটে বুঝলুম যে, খৃস্টান ধর্মের বাহ্য কাঠামো, যেটাকে ইংরেজি ভাষায় বলে ক্রীড, কোনো এককালে তার যেমনি প্রয়োজন থাক্ এখন তাতে ধর্মের বিশুদ্ধ রস-প্রবাহের বাধা ঘটাচ্ছে। মানুষের মন যখনই আপনার আশ্রয়কে ছাড়িয়ে বেড়ে ওঠে তখন সেই আশ্রয়ের মতো শত্রু তার আর কেউ নেই। এ দেশে ধর্মের প্রতি অনেকের মন যে বিমুখ হয়েছে তার প্রধান কারণ, ধর্মের এই বাইরের আয়তনটা। তিনি

কবি য়েট্‌স
উইলিয়াম রোটেনস্টাইন-অঙ্কিত

আমাকে বললেন, তোমার এই কবিতাগুলিতে কোনো ধর্মের কোনো ক্রীড-এর গন্ধ নেই; এগুলি আমাদের দেশের লোকের বিশেষ উপকারে লাগবে বলে আমি মনে করি।

কথায় কথায় তিনি একসময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি জন্মান্তরে বিশ্বাস করি কি না। আমি বললুম আমাদের বর্তমান জন্মের বাইরের অবস্থা সম্বন্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট কল্পনা আমার মনে নেই এবং সে সম্বন্ধে আমি চিন্তা করা আবশ্যক মনে করি নে কিন্তু যখন চিন্তা করে দেখি তখন মনে হয়, এ কখনো হতেই পারে না যে, আমার জীবনধারার মাঝখানে এই মানব-জন্মটা একেবারেই খাপছাড়া জিনিস; এর আগেও এমন কখনো ছিল না, এর পরেও এমন কখনো হবে না, যে কারণবশত জীবনটা বিশেষ দেহ ধরে প্রকাশ পেয়েছে সে কারণটা এই জন্মের মধ্যেই প্রথম আরম্ভ হয়ে এ জন্মের মধ্যেই সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেল। এ মতটা স্বীকার করতে মনে বাধে। শরীরী জন্ম পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হতে হতে আপনাকে পূর্ণতর করে তুলছে এইটেই সম্ভবপর বলে বোধ হয়। কিন্তু পূর্বজন্মে কোনো মানুষ পশু ছিল এবং পরজন্মেই সে পশুদেহ ধরবে এ কথাও আমি মনে করতে পারি নে। কেননা প্রকৃতির মধ্যে একটা অভ্যাসের ধারা দেখা যায়;-সেই ধারার হঠাৎ অত্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটা অসংগত। স্টপফোর্ড ব্রুক বললেন, তিনিও জন্মান্তরে বিশ্বাসটাকে সংগত মনে করেন। তাঁর বিশ্বাস, নানা জন্মের মধ্য দিয়ে যখন আমরা একটা জীবনচক্র সমাপ্ত করব, তখন আমাদের পূর্বজন্মের সমস্ত স্মৃতি সম্পূর্ণ হয়ে জাগ্রত হবে। এ কথাটা আমার মনে লাগল। আমার মনে হল, একটা কবিতা পড়া যখন আমরা শেষ করে ফেলি তখন তার সমস্তর ভাবটা পরস্পর-গ্রথিত হয়ে আমাদের মনে উদিত হয়; শেষ না করলে সকল সময় সেই সূত্রটি পাওয়া যায় না। আমরা প্রত্যেকে একটা অভিপ্রায়কে অবলম্বন করে এক-একটা জন্মমালা গেঁথে চলেছি; গাঁথা শেষ হলেই যে একেবারে ফুরিয়ে যায় তা নয় কিন্তু একটা পালা শেষ হয়ে যায়। তখনি সমস্তটাকে স্পষ্ট করে গ্রহণ করতে পারি।

কবি য়েট্স

ভিড়ের মাঝখানেও কবি য়েট্স চাপা পড়েন না; তাঁকে একজন বিশেষ কেউ বলে চেনা যায়। যেমন তিনি তাঁর দীর্ঘ শরীর নিয়ে মাথায় প্রায় সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন, তেমনি তাঁকে দেখলে মনে লাগে এঁর একটা সৃজনীশক্তির বেগ প্রবল হয়ে এঁকে যেন ফোয়ারার মতো চার দিকের সমতলতা থেকে উপরে উচ্ছ্বসিত করে তুলেছে, সেজন্য দেহে মনে প্রাণে এঁকে এমন অজস্র বলে বোধ হয়।

ইংলন্ডের বর্তমান কালের কবিদের কাব্য যখন পড়ে দেখি তখন এঁদের অনেককেই আমার মনে হয় এঁরা সাহিত্যজগতের গ্রন্থপ্রবাহিণীর কবি। কবিরা যেন ওস্তাদ হয়ে উঠেছে; অর্থাৎ প্রাণ হতে গান করবার প্রয়োজনবোধই তাদের চলে গেছে; এখন কেবল গান হতেই গানের উৎপত্তি চলছে। যখন ব্যথা থেকে কথা আসে না, কথা থেকেই কথা আসে, তখন কথার কারুকার্য ক্রমশ জটিল ও নিপুণতর হয়ে উঠতে থাকে; আবেগ তখন প্রত্যক্ষ ও গভীর ভাবে হৃদয়ের সামগ্রী না হওয়াতে সে সরল হয় না; সে আপনাকে আপনি বিশ্বাস করে না বলেই বলপূর্বক অতিশয়ের দিকে ছুটতে থাকে; নবীনতা তার পক্ষে সহজ নয় বলেই আপনার অপূর্বতা প্রমাণের জন্য কেবলই তাকে অদ্ভুতের সন্ধানে ফিরতে হয়।

যখনি কোনো মানুষ অব্যবহিতভাবে জগৎকে দেখে ও তার খবর দেয়, তখন দেখতে পাই মানুষের পুরাতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার একটা মিল আছে; তা খাপছাড়া নয়। যারা সরলচোখে দেখেছে, সকলেই এমনি করে দেখেছে। বৈদিক কবিরাও জলে স্থলে প্রাণকে দেখেছেন, হৃদয়কে দেখেছেন। নদী, মেঘ, উষা, অগ্নি, ঝড় বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে নয়, ইচ্ছাময় মূর্তিরূপে তাঁদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে। মানুষের জীবনের মধ্যে সুখদুঃখের যে অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায় তাই যেন নানা অপরূপ ছদ্মবেশে ভূলোক দ্যুলোকে আপন লীলা বিস্তার করেছে। যেমন আমাদের চিত্তে তেমনি সমস্ত

প্রকৃতিতে। হাসিকান্নার বেদনা, চাওয়া পাওয়া এবং হারানোর খেলা যেমন আমাদের এই ছোটো হৃদয়টিতে তেমনি তাই খুব প্রকাণ্ড আকারে এই মহাকাশের আলো-অন্ধকারের রঙ্গমঞ্চে। তা এত বৃহৎ যে তাকে আমরা একসঙ্গে দেখতে পাই নে বলে আমরা জল দেখি, মাটি দেখি, সমস্তটার ভিতরকার বিপুল খেলাটাকে দেখতে পাই নে। কিন্তু মানুষ যখন শিক্ষা ও অভ্যাসের ঠুলির ভিতর দিয়ে দেখে না, যখন সে আপনার সমস্ত হৃদয় মন জীবন দিয়ে দেখে, তখন সে এমন একটা বেদনার লীলাকে সব জায়গাতেই অনুভব করে যে, তাকে গল্পের মধ্য দিয়ে রূপকের মধ্যে দিয়ে ছাড়া প্রকাশ করতে পারে না। মানুষ যখন জাগতিক ব্যাপারের মধ্যে আপনারই খুব একটা বড়ো পরিচয় পাচ্ছিল, এইটে একরকম করে বুঝছিল যে, সমস্ত জগতের মধ্যে যা নেই তা তার নিজের মধ্যেও নেই, যা তার মধ্যে আছে তাই বিপুল আকারে বিশ্বের মধ্যে আছে, তখনি সে কবির দৃষ্টি অর্থাৎ হৃদয়ের দৃষ্টি জীবনের দৃষ্টিতে সমস্তকে দেখতে পেয়েছিল; তা অক্ষিগোলক ও স্নায়ু শিরা ও মস্তিষ্কের দৃষ্টি নয়। তার সত্যতা তথ্যগত নয়, তা ভাবগত, বেদনাগত। এ ভাষাই মানুষের সাহিত্যে সকলের চেয়ে পুরাতন ভাষা। অথচ আজ যখন কোনো কবি বিশ্বকে আপনার বেদনা দিয়ে অনুভব করেন তখন তার ভাষার সঙ্গে মানুষের পুরাতন ভাষার মিল পাওয়া যায়। এই কারণে বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের পৌরাণিক কাহিনী আর কোনো কাজে লাগে না; কেবল কবির ব্যবহারের পক্ষে তা পুরাতন হল না। মানুষের নবীন বিশ্বানুভূতি ঐ কাহিনীর পথ দিয়ে আনাগোনা করে ঐখানে আপন চিহ্ন রেখে গিয়েছে। অনুভূতির সেই নবীনতা যার চিত্তকে উদ্‌বোধিত করে সে ঐ পুরাতন পথটাকে স্বভাবতই ব্যবহার করতে প্রবৃত্ত হয়।

কবি য়েট্‌স তাঁর কাব্যসৃষ্টির আরম্ভে আয়র্লন্ডের সেই পৌরাণিক পথ দিয়ে নিজের কাব্য-ধারাকে প্রবাহিত করেছেন। এ তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়েছিল বলেই এ পথে তিনি এমন অসামান্য খ্যাতি উপার্জন করতে পেরেছেন। তিনি আপন জীবন দিয়ে কল্পনা দিয়ে জগৎকে স্পর্শ করছেন, চোখ দিয়ে দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে নয়। এজন্য জগৎকে তিনি কেবল বস্তুজগৎরূপে দেখেন না, এর পর্বতে প্রান্তরে ইনি এমন একটি লীলাময় সত্তাকে অনুভব করেন যা ধ্যানের দ্বারাই গম্য। আধুনিক সাহিত্যে অভ্যস্ত প্রণালীর মধ্য দিয়ে তাকে প্রকাশ করতে গেলে তার রস ও প্রাণ নষ্ট হয়ে যায়।

সকলেই জানেন কিছুকাল থেকে আয়র্লন্ডে একটা স্বাদেশিকতার বেদনা জেগে উঠেছে। ইংলন্ডের শাসন সকল দিক থেকেই আয়র্লন্ডের চিত্তকে অত্যন্ত চাপা দিয়েছিল বলেই এ বেদনা একসময়ে এমন প্রবল হয়ে উঠেছিল। অনেক দিন থেকে এই বেদনা প্রধানত পোলিটিকাল বিদ্রোহ-রূপেই আপনাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছে। অবশেষে তার সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা চেষ্টা দেখা দিল। আয়র্লন্ড আপনার চিত্তের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করে তাই প্রকাশ করতে উদ্যত হল।

এ উপলক্ষে আমাদের নিজের দেশের কথা মনে পড়ে। আমাদের দেশেও অনেকদিন থেকে পোলিটিকাল অধিকার লাভের একটা চেষ্টা শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল। দেখা গেছে এ চেষ্টার যাঁরা নেতা ছিলেন, তাঁদের অনেকেরই দেশের ভাষা সাহিত্য আচার ব্যবহারের সঙ্গে সংস্রব ছিল না। দেশের জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের যোগ ছিল না বললেই হয়। দেশের উন্নতি সাধনের জন্য তাঁদের যা-কিছু করবার সমস্তই ইংরেজি ভাষায় ও ইংরেজি গবর্নমেন্টের সঙ্গে। দেশের লোককে নিয়ে যে দেশের কোনো কাজ করতে হবে সেদিকে তাঁদের দৃষ্টিমাত্রই ছিল না।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, অন্তত বাংলাদেশে, আমরা সাহিত্যের ভিতর দিয়ে নিজের চিত্তকে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছিলুম। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান গৌরব এই যে, তিনি বঙ্গসাহিত্যে এমন একটি যুগের প্রবর্তন করেছিলেন যখন বাঙালি আপনার কথা আপনার ভাষায় বলে আনন্দ ও গর্ব অনুভব করতে পেরেছিল। তার আগে আমরা ইস্কুলের বালক ছিলুম; অভিধান ও ব্যাকরণ মিলিয়ে ইংরেজি ইস্কুলের এক্সেসাইজ লিখতুম; নিজের ভাষা ও সাহিত্যকে অবজ্ঞা করতুম। হঠাৎ বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নিজের একটা ক্ষমতা দেখতে পেলুম।

আমাদের দেশের মতো আয়র্লন্ডেও আপনার চিত্তশক্তিকে স্বাতন্ত্র্য দেবার জন্য একটা উদ্যম কিছুকাল থেকে কাজ করছে। সেই উদ্যমের প্রথম প্রকাশের মধ্যে স্বভাবতই বিস্তর ফেনিলতা দেখা দেয়; তা অনেক সময় ওজন রাখতে না পেরে অদ্ভুতরূপে হাস্যকর হয়ে ওঠে; আয়র্লন্ডেও যে সেরূপ ঘটেছিল তা আইরিশ বিখ্যাত লেখক জর্জ মুরের Hail and Farewell নামক বই পড়লে কতকটা বোঝা যায়।

যা হোক আয়র্লন্ড নিজের চিত্তস্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করবার চেষ্টায় নিজের ভাষা, কথা, কাহিনী ও পৌরাণিকতাকে অবলম্বন করবার যে উদ্যোগ করেছে সেই উদ্যোগের মধ্যে একজন অসামান্য লোকের প্রতিভা আপনার যথার্থ ক্ষেত্র পেয়েছে। কবি য়েট্‌স তাঁহাদেরই মধ্যে একজন। ইনি আয়র্লন্ডের বাণীকে বিশ্বসাহিত্যে জয়যুক্ত করতে পেরেছেন।

য়েট্‌স যখন সাহিত্যক্ষেত্রে আয়র্লন্ডের জয়পতাকা বহন করে আনলেন তার কিছুদিন আগে থেকে আয়র্লন্ডে সাহিত্যের উদ্যম দুর্বল হয়েছিল। তখন আয়র্লন্ডে পোলিটিকাল বিদ্রোহের দিন ঘুচে গিয়ে পোলিটিকালের বাঁকা চলের কাল এসেছিল; তখন দেশের ভাবের শক্তিকে ঠেলে ফেলে কূটবুদ্ধিরই প্রাধান্য ঘটেছিল।

য়েট্‌সের কোনো একজন সমালোচক লিখছেন, 'এমন সময়ে রণদূত আর-একবার এসে দেখা দিল; এবার দুর্দাম হৃদয়াবেগের বিদ্যুদ্‌বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কোনো সামাজিক প্রলয়যুগের বজ্র-ধ্বনি শোনা গেল না। যে সর্বজয়ী মানবাত্মা আপনাকে আপনি উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং মানুষের জগতে যার গোপন অঙ্গুলি সমস্ত বড়ো বড়ো ভাঙাগড়ার রহস্যকে গিয়ে স্পর্শ করছে সেই আত্মতৃপ্ত মানবাত্মার বিরাট বিপুল শান্তি আকাশ অধিকার করল। নিজের মধ্যে মানবহৃদয়ের পূর্ণতর বন্ধন মোচন প্রকাশ করে য়েট্‌স আর-একবার গভীরতর ও সূক্ষ্মতর শক্তির সঙ্গে বিদ্রোহের বাণীকে জাগ্রত করলেন। এবার বাইরের কোলাহল নয়, এবার কবি মানবাত্মার অন্তরের কথা বললেন, তাই আয়র্লন্ডের কথা এবং সমস্ত মানুষের কথা। তিনি গভীরভাবে চিন্তা করলেন এবং পঞ্চাশ বছর আগে যে কবিত্বরীতি প্রচলিত ছিল তা ত্যাগ করলেন। কিন্তু তিনি রচনার যে প্রণালীকে শেষকালে সম্পূর্ণতা দান করলেন তা পুরাতন কবিদের রচনারীতিরই উৎকর্ষসাধন। তাঁর কবিত্ব প্রকৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টিপ্রয়োগ করেছে এবং ধ্বনিমাধুর্যের অন্তরতর সংগীতটিকে আয়ত্ত করতে পেরেছে। যে-সকল চিন্তাসামগ্রীকে তিনি তাঁর প্রথমকালের অতুলনীয় গীতিকাব্যে গেঁথে তুলেছেন তা তাঁর পূর্বতন দ্রুয়িদ্‌ পিতামহদের নিকট থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার; তা এই প্রকাশবান বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করে প্রকৃতি, মানুষ ও দেবতার পরম ঐক্যটিকে উদ্ধার করেছে।'

সমালোচক লিখেছেন,

'It was with the publication of The Wandering of Oisin in 1889,—if I remember aright,—that Yeats sprang into the front rank of contemporary poets, and threatened to add to the august company of the immortals. In the qualities by which he succeeded—an exquisitely delicate music, intensity of imaginative conviction, intimacy with natural and (dare I say?) supernatural manifestations—he was typically Celtic.'

এই imaginative conviction কথাটা য়েট্‌স সম্বন্ধে খুব সত্য। কল্পনা তাঁর পক্ষে কেবল লীলার সামগ্রী নয়; কল্পনার আলোকে তিনি যা দেখেছেন তার সত্যতাকে তিনি জীবনে গ্রহণ করতে পেরেছেন। অর্থাৎ তাঁর হাতে কল্পনা জিনিসটি কেবলমাত্র কবিত্ব-ব্যবসায়ের একটা হাতিয়ার নয়, তা তাঁর জীবনের সামগ্রী; এই দিয়েই বিশ্বজগৎ হতে তিনি তাঁর আত্মার খাদ্যপানীয় আহরণ করছেন। তাঁর সঙ্গে নিভৃতে যতবার আমার আলাপ হয়েছে ততবার এই কথাই আমি অনুভব করেছি। তিনি যে কবি তা তাঁর কবিতা পড়ে জানবার সুযোগ এখনো আমার সম্পূর্ণরূপে ঘটে নি,

কিন্তু তিনি যে কল্পনালোকিত হৃদয়ের দ্বারা তাঁর চারি দিককে প্রাণবানরূপে স্পর্শ করছেন তা তাঁর কাছে এসেই আমি অনুভব করতে পেরেছি।

৩৭ আলফ্রেড প্লেস
সাউথ কেন্সিংটন। লন্ডন
১৯ ভাদ্র ১৩১৯

ইংলন্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রি

অ্যান্ড্রুজসাহেবের একজন বন্ধু স্টাফোর্ডশিয়রে এক পল্লীতে পাদ্রির কাজ করে থাকেন; তাঁরই বাড়িতে সাহেব কিছুদিন আমাদের বাসের ব্যবস্থা করে দিলেন।

আগস্ট মাস এদেশে গ্রীষ্মঋতুর অধিকারের মধ্যে গণ্য। সে সময়ে শহরের লোক পাড়াগাঁয়ে হাওয়া খেয়ে আসবার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। ছুটির দিনে এরা যেখানে একটু খোলা মাঠ আছে সেইখানেই দলে দলে ছুটে যায়—বড়ো ছুটি পেলেই শহর হতে বার হয়ে পড়ে। ছুটির ট্রেনগুলো একেবারে লোকে ভর্তি; বসবার জায়গা পাওয়া যায় না। সেই শহরের উড়ুক্ষু মানুষের ঝাঁকের সঙ্গে মিশে আমরা বার হয়ে পড়লুম।

গম্যস্থানের স্টেশনে আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা তাঁর খোলা গাড়িটি নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। গাড়িতে যখন চড়লুম, তখন আকাশে মেঘ। অল্পকিছু দূর যেতেই বৃষ্টি আরম্ভ হল।

বাড়িতে গিয়ে যখন পৌঁছলুম, গৃহস্বামিনী তাঁর আগুনজ্বালা বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। বাড়িটি পুরোনো পাদ্রিনিবাস নয়, নূতন তৈরি। বাগানটি নূতন, বোধ হয় এঁরাই তৈরি করেছেন। ঘন সবুজ তৃণক্ষেত্রের ধারে ধারে বিচিত্র রঙের ফুলের পুঞ্জ। গ্রীষ্মঋতুতে ইংলন্ডের ফুল-পল্লবের যেমন সরসতা ও প্রাচুর্য, এমন তো আমি কোথাও দেখি নি। এখানে মাটির উপরে ঘাসের আস্তরণ যে কী ঘন ও তা কী নিবিড় সবুজ, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

বাড়িটির ঘরগুলো পরিপাটি পরিচ্ছন্ন, লাইব্রেরি নানা গ্রন্থে পরিপূর্ণ; ভিতরে বাহিরে কোথাও লেশমাত্র অযত্নের চিহ্ন নেই। এঁদের ব্যবহারের, আরামের ও গৃহসজ্জার উপকরণ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি, অথচ ঘরের প্রত্যেক সামান্য জিনিসটির প্রতি গৃহস্থের চিত্ত সতর্কভাবে জাগ্রত। ত্রুটি জিনিসটাকে এরা কোনো কারণেই কোনো জায়গাতেই মাপ করতে চায় না।

বিকেলের দিকে আমাদের নিয়ে গৃহস্বামী উট্রম সাহেব বেড়াতে বেরলেন। তখন বৃষ্টি থেমেছে, কিন্তু আকাশে মেঘের ফাঁক নেই। চার দিকে বঁইচি জাতীয় বেঁটে গাছের বেড়া দিয়ে ভাগ করা ঢেউ-খেলানো প্রান্তরের প্রগাঢ় শ্যামলিমা। জায়গাটা পাহাড়ে বটে, কিন্তু পাহাড়ের রুক্ষ বন্ধুরতা কোথাও নেই। এখানকার মাটির উচ্ছ্বাসগুলি ঢালু হয়ে পরস্পর গায়ে গায়ে মিলিয়ে রয়েছে।

পথ চলতে চলতে উট্রম সাহেব একজন পথিকের সঙ্গে কিছু কাজের কথা আলাপ করে নিলেন। ব্যাপারটা এই—স্থানীয় চাষী গৃহস্থদেরকে নিজেদের ভিটার চার দিকে খানিকটা করে বাগান করতে উৎসাহ দেবার জন্য এরা একটি কমিটি করে উৎকর্ষসাধন অনুসারে পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন। অল্পদিন হল পরীক্ষা হয়ে গেছে, তাতে এই পথিকটি পুরস্কারের অধিকারী হয়েছে। উট্রম সাহেব আমাকে কয়েকটি চাষী গৃহস্থের বাড়ি দেখাতে নিয়ে গেলেন। তারা প্রত্যেকেই নিজের কুটীরের চার দিকে বহুযত্নে খানিকটা করে ফুলের ও তরকারির বাগান করেছে। এরা সমস্তদিন মাঠের কাজে খেটে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে এই বাগানে কাজ করে। এমনি করে গাছপালার প্রতি এদের এমন একটা আনন্দের টান হয় যে, এই অতিরিক্ত পরিশ্রম এদের গায়ে লাগে না। এর আর একটি সুফল এই যে, এই উৎসাহে মদের নেশাকে খেদিয়ে রাখে। এখানকার পল্লীবাসীর সঙ্গে উট্রম সাহেবের হিতানুষ্ঠানের সম্বন্ধ আরও নানাদিক থেকে দেখেছি।

পাদ্রিরা এই যে ধর্মমতের জাল দিয়ে সমস্ত দেশকে বেষ্টন করে বসে আছে, এতে সময়ে সময়ে দেশের উন্নতিকে কিছু বাধা দেওয়া সত্ত্বেও মোটের উপর এতে যে দেশের ভিতরকার উচ্চ সুরকে বেঁধে রেখেছে, তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণদের এই কাজ ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণের কর্তব্য বর্ণগত হওয়াতে তা স্বভাবতই আপন কর্তব্যের দায়িত্ব হারিয়ে ফেলেছে। এখানে প্রত্যেক পাদ্রিই যে অকৃত্রিম নিষ্ঠার সঙ্গে খৃস্টান ধর্মের আদর্শ নিজের জীবনে গ্রহণ করেছে এ কথা আমি বিশ্বাস করি না; কিন্তু এরা বংশগত পাদ্রি নয়, সমাজের কাছে এদের জবাবদিহি আছে; নিজের চরিত্রকে, আচরণকে এরা কলুষিত করতে পারে না— সুতরাং, আর কিছুই না হোক, সেই নির্মল চরিত্রের সেই ধর্মনৈতিক সাধনার সুরটিকে যথাসাধ্য দেশের কাছে এরা ধরে রেখেছে। শাস্ত্রে যাই বলুক ব্যবহারত অধার্মিক ব্রাহ্মণকে দিয়ে ধর্ম কর্ম করাতে আমাদের সমাজের কিছুমাত্র লজ্জা সংকোচ নেই। এতে ধর্মের সঙ্গে পুণ্যের আন্তরিক বিচ্ছেদ না ঘটে থাকতে পারে না— এতে আমাদের মনুষ্যত্বকে আমরা প্রত্যহ অপমান করছি। এখানে অধার্মিক পাদ্রিকে সমাজ কখনোই ক্ষমা করবে না; সে পাদ্রি হয়তো ভক্তিমান না হতে পারে, কিন্তু তাকে চরিত্রবান হতেই হবে— এই উপায়েই সমাজ নিজের মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান রক্ষা করেছে এবং নিঃসন্দেহই তার পুরস্কার পাচ্ছে।

তাই বলছিলুম, এখানকার পাদ্রির দল সমস্ত দেশের জন্য একটা ধর্মনৈতিক মোটাভাত মোটা-কাপড়ের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু সেইটুকুতেই তো সন্তুষ্ট হওয়ার কথা নয়। সমস্ত দেশের সামনে ক্ষণে ক্ষণে যে বড়ো বড়ো ধর্মসমস্যা উপস্থিত হয়, খৃস্টের বাণীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে পাদ্রিরা তো তার মীমাংসা করে না। দেশের চিত্তের মধ্যে খৃস্টকে প্রতিষ্ঠিত করে রাখবার যে ভার তাঁরা নিয়েছেন, এইখানে পদে পদে তার ব্যত্যয় দেখতে পাই। যখন বোয়ার যুদ্ধ লেগেছিল তখন সমস্ত দেশের পাদ্রিরা তার কী রকম বিচার করেছিলেন। এই যে পারস্যকে দুই টুকরা করে কুটে ফেলবার জন্য য়ুরোপের দুই মোটা গৃহিণী বঁটি পেতে বসেছেন, পাদ্রিরা চুপ করে আছেন কেন। এমন দুর্দিনে অনেক মহাত্মাকে স্বজাতির এই সার্বজনীন শয়তানির বিরুদ্ধে নির্ভয়ে লড়তে দেখেছি কিন্তু তাঁদের মধ্যে পাদ্রি ক'জন। এমন-কি গুণলে দেখা যাবে, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই প্রচলিত খৃস্টান ধর্মে আস্থাবান নন। অথচ চার্চের চির-প্রথাসম্মত কোনো বাহ্য পূজাবিধিতে সামান্য একটু নড়চড় ঘটলে সমস্ত পাদ্রিসমাজে বিষম হুলস্থূল পড়ে যায়। ধর্ম মানুষকে মুক্তি দেয়, এইজন্য ধর্মকে সকলের চেয়ে মুক্ত রাখা চাই; কিন্তু ধর্ম যেখানে দলের বেড়ায় আটকা পড়ে, সেখানেই ক্রমশ তার ছোটো দিকটাই বড়ো দিকের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। এইজন্যই সমস্ত দেশ জুড়ে পাদ্রির দল বসে থাকা সত্ত্বেও নিদারুণ দস্যুবৃত্তি ও কসাইবৃত্তি করতে রাষ্ট্রনৈতিক অধিনায়কদের লেশমাত্র সংকোচ বোধ হয় না; তাঁদের সেই পুণ্যজ্যোতি নেই যার সামনে এই সব বিরাট পাপের কলঙ্ককালিমা সর্বসমক্ষে বীভৎসরূপে উদ্ঘাটিত হয়।

অন্তর বাহির

ভোরে ক্যাবিনে বিছানায় যখন প্রথম ঘুম ভেঙে গেল— গবাক্ষের ভিতর দিয়ে দেখলুম সমুদ্রে আজ ঢেউ দিয়েছে; পশ্চিম দিক হতে বেগে বাতাস বইছে। কান পেতে তরঙ্গের কলশব্দ শুনতে শুনতে একসময় মনে হল কোনো একটা অদৃশ্য যন্ত্রে গান বেজে উঠেছে। সে গানের শব্দ যে মেঘগর্জনের মতো প্রবল তা নয়, তা গভীর এবং বিলম্বিত; কিন্তু যেমন মৃদঙ্গ-করতালের বলবান শব্দের ঘটার মধ্যে বেহালার একটা একটানা তান সকলকে ছাপিয়ে বুকের ভিতরে বাজতে থাকে তেমনি সেই ধীর গম্ভীর সুরের অবিরামধারা সমস্ত আকাশের মর্মস্থলকে পূর্ণ করে উচ্ছ্বলিত হচ্ছিল। শেষকালে এমন হল, আমার মনের মধ্যে যে সুর শুনছিলুম তাই কণ্ঠে আনবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু এরকম চেষ্টা একটা দৌরাত্ম্য; এতে সেই বড়ো সুরটির শান্তি নষ্ট করে দেয়; তাই আমি চুপ করলুম।

একটা কথা আমার মনে হল, প্রভাতে মহাসমুদ্র আমার মনের মধ্যে এই যে গান জাগালো তা তো বাতাসের গর্জন ও তরঙ্গের কলধ্বনির প্রতিধ্বনি নয়। তাকে কিছুতেই এই আকাশব্যাপী জল-বাতাসের শব্দের অনুকরণ বলতে পারি না। তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তা একটি গান; তাতে সুরগুলি ফুলের পাপড়ির মতো একটির পরে আরেকটি ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে উদ্ঘাটিত হচ্ছিল।

আমাদের গুণীরা ভৈরোঁতে টোড়িতে সুর বেঁধে বললেন, এ সকালবেলাকার গান। কিন্তু তার মধ্যে সকালবেলার নবজাগ্রত সংসারের নানাবিধ ধ্বনির কি কোনো নকল দেখতে পাওয়া যায়। কিছুমাত্র না। তবে ভৈরোঁকে টোড়িকে সকালবেলার রাগিণী বলবার কী মানে হল। তার মানে এই, সকালবেলাকার সমস্ত শব্দ ও নিঃশব্দতার অন্তরতর সংগীতটিকে গুণীরা তাঁদের অন্তঃকরণ দিয়ে শুনেছেন। সকালবেলাকার কোনো বহিরঙ্গের সঙ্গে এই সংগীতটিকে মেলাবার চেষ্টা করতে গেলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

আমাদের দেশে প্রভাত মধ্যাহ্ন অপরাহ্ণ সায়াহ্ন অর্ধরাত্রি ও বর্ষা-বসন্তের রাগিণী রচিত হয়েছে। সে রাগিণীর সবগুলো সকলের কাছে ঠিক লাগবে কি না জানি না। অন্তত আমি সারং রাগকে মধ্যাহ্নকালের সুর বলে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি না। তা হোক, কিন্তু বিশ্বেশ্বরের খাসমহলের গোপন নহবৎখানায় যে কালে কালে ঋতুতে ঋতুতে নব নব রাগিণী বাজছে আমাদের গুণীদের অন্তঃকর্ণে তা প্রবেশ করেছে। বাইরের প্রকাশের অন্তরালে যে একটি গভীরতর অন্তরের প্রকাশ আছে আমাদের দেশের টোড়ি কানাড়া তাই জানাচ্ছে।

য়ুরোপের বড়ো বড়ো সংগীত রচয়িতারা নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো দিক দিয়ে তাঁদের গানে বিশ্বের সেই অন্তরের বার্তাই প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। তাঁদের রচনার সঙ্গে যদি তেমন করে পরিচয় হয় তবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে। আপাতত য়ুরোপীয় সংগীতসভার বার দেউড়িতে বাজে লোকের ভিড়ের মধ্যে যেটুকু শোনা যায় তার সম্বন্ধে দুই-একটা কথা আমার মনে উঠেছে।

আমাদের জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ সন্ধ্যার সময় গান বাজনা করে থাকেন। যখনি সে রকম বৈঠক বসে আমিও সেই ঘরের এক কোণে গিয়ে বসি। বিলাতি গান আমার স্বভাবত ভালো লাগে বলেই যে আমাকে টেনে আনে তা নয়। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি ভালো জিনিস ভালো লাগার একটা সাধনা আছে। বিনা সাধনায় যা আমাদের মুগ্ধ করে তা অনেক সময়েই মোহ এবং যা নিরস্ত করে তাই যথার্থ উপাদেয়। সেইজন্য য়ুরোপীয় সংগীত আমি শোনবার অভ্যাস করি। যখন আমার ভালো না লাগে তখনো তাকে অশ্রদ্ধা করে চুকিয়ে দিই না।

এ জাহাজে একজন যুবক ও দুই-একজন মহিলা আছেন, তাঁরা বোধ হয় মন্দ গান করেন না। দেখতে পাই শ্রোতারা তাঁদের গানে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। যেদিন সভা ভালো করে জমে ওঠে সেদিন একটির পর একটি করে অনেকগুলো গান চলতে থাকে। কোনো গান বা ইংলন্ডের গৌরব গর্ব; কোনো গান বা হতাশ প্রণয়িনীর বিদায় সংগীত; কোনো গান বা প্রেমিকের প্রেম নিবেদন। সবগুলির মধ্যে একটা বিশেষত্ব আমি এই দেখি, গানের সুরে এবং গায়কের কণ্ঠে পদে পদে খুব একটা জোর দেবার চেষ্টা। হৃদয়াবেগের উত্থান-পতনকে সুরের ও কণ্ঠস্বরের ঝোঁক দিয়ে খুব করে প্রত্যক্ষ করে দেবার চেষ্টা।

আমরা চোখের জল ফেলে কাঁদি ও হেসে আনন্দ প্রকাশ করি, এই স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের গানে গায়ক যদি সেই অশ্রুপাতের এবং সুখের গানে হাস্যধ্বনির সহায়তা গ্রহণ করে তবে তাতে সংগীতের সরস্বতীর অবমাননা করা হয় সন্দেহ নেই। বস্তুত যেখানে অশ্রুর ভিতরকার অশ্রুটি ঝরে পড়ে না এবং হাসির ভিতরকার হাসিটি ধ্বনিত হয়ে ওঠে না সেইখানেই সংগীতের প্রভাব। সেখানে মানুষের হাসি-কান্নার ভিতর দিয়ে এমন একটা অসীমের মধ্যে চেতনা পরিব্যাপ্ত হয় যেখানে আমাদের সুখদুঃখের সুরে সমস্ত গাছপালা নদী নির্ঝরের বাণী ব্যক্ত হয়ে ওঠে এবং আমাদের হৃদয়ের তরঙ্গকে বিশ্বহৃদয় সমুদ্রেরই লীলা বলে বুঝতে পারি।

কিন্তু সুরে ও কণ্ঠে জোর দিয়ে হৃদয়াবেগের নকল করতে গেলে সংগীতের সেই গভীরতাকে

বাধা দেওয়া হয়। সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার মতো সংগীতের নিজের একটা ওঠানামা আছে কিন্তু সে তার নিজেরই জিনিস; কবিতার ছন্দের মতো সে তার সৌন্দর্য-নৃত্যের পাদবিক্ষেপ; তা আমাদের হৃদয়াবেগের পুতুলনাচের খেলা নয়।

অভিনয় জিনিসটা যদিও মোটের উপর অন্যান্য কলাবিদ্যার চেয়ে নকলের দিকে. বেশি ঝোঁক দেয় তবু তা একেবারে হরবোলার কান্ড নয়। তা স্বাভাবিকের পর্দা ফাঁক করে তার ভিতর দিকের লীলা দেখবার ভার নিয়েছে। স্বাভাবিকের দিকে বেশি ঝোঁক দিতে গেলেই সেই ভিতরের দিকটাকে আচ্ছন্ন করে দেওয়া হয়। রঙ্গমঞ্চে প্রায়ই দেখা যায় মানুষের হৃদয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করে দেখাবার জন্য অভিনেতারা কন্ঠস্বরে ও অংগভঙ্গে জবরদস্তি প্রয়োগ করে থাকে। তার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না করে সত্যকে নকল করতে চায় সে মিথ্যাসাক্ষ্যদাতার মতো বাড়িয়ে বলে। সংযম আশ্রয় করতে তার সাহস হয় না। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চে রোজই মিথ্যাসাক্ষীর সেই গলদ্‌ঘর্ম ব্যায়াম দেখা যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখেছিলুম বিলাতে। সেখানে বিখ্যাত অভিনেতা আর্ভিং-এর হ্যামলেট ও ব্রাইড অফ্ লামার্মুরে দেখতে গিয়েছিলুম। আর্ভিং-এর প্রচন্ড অভিনয় দেখে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম। এরূপ অসংযত আতিশয্যে অভিনেতব্য বিষয়ের স্বচ্ছতা একেবারে নষ্ট করে ফেলে; তাতে কেবল বাইরের দিকেই দোলা দেয়, গভীরতার মধ্যে ঢোকবার এমন বাধা তো আমি আর কখনো দেখি নি।

আর্ট জিনিসটাতে সংযমের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশি। কারণ, সংযমই অন্তরলোকে প্রবেশের সিংহদ্বার। মানবজীবনের সাধনাতেও যাঁরা আধ্যাত্মিক সত্যকে উপলব্ধি করতে চান তাঁরাও বাহ্য উপকরণকে সংক্ষিপ্ত করে সংযমকে আশ্রয় করেন। এইজন্য আত্মার সাধনায় এমন একটি অদ্ভুত কথা বলা হয়েছে 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে। আর্টেরও চরম সাধনা ভূমার সাধনা। এইজন্য প্রবলভাবে আঘাত দিয়ে হৃদয়কে মাদকতার দোলা দেওয়া আর্টের সত্যকার ব্যবসায় নয়। সংযমের দ্বারা তা আমাদের অন্তরের গভীরতার মধ্যে নিয়ে যাবে এই তার সত্য লক্ষ্য। যা চোখে দেখেছি তাকেই নকল করবে না, কিংবা তারই উপর খুব মোটা তুলির দাগা বুলিয়ে তাকেই অতিশয় করে তুলে ছেলে ভোলাবে না।

আমাদের দেশে বৌদ্ধযুগে একদা গ্রীকশিল্পীরা তাপস বুদ্ধের মূর্তি গড়েছিল। তা উপবাস-জীর্ণ কৃশ শরীরের যথাযথ প্রতিরূপ—তাতে পাঁজরের প্রত্যেক হাড়টির হিসাব গুণে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় শিল্পীও তাপস বুদ্ধের মূর্তি গড়েছিল কিন্তু তাতে উপবাসের বাস্তব ইতিহাস নেই—তা ডাক্তারের সার্টিফিকেট নেবার জন্য নয়। তা বাস্তবকে কিছুমাত্র আমল দেয় নি বলেই সত্য প্রকাশ করতে পেরেছে। ব্যবসায়ী আর্টিস্ট বাস্তবের সাক্ষী। বাস্তবকে চোখ দিয়ে দেখি আর সত্যকে মন দিয়ে দেখতে গেলেই চোখের সামগ্রীর দৌরাত্ম্যকে খর্ব করতেই হবে, বাইরের রূপটাকে সাহসের সঙ্গে বলতেই হবে তুমি চরম নও, তুমি পরম নও, তুমি লক্ষ্য নও, তুমি সামান্য উপলক্ষ মাত্র।

বিচিত্র

জাহাজে বড়ো বেশি ভিড়। ডাঙার হাটে যে ভিড় হয় সে চলতি ভিড়—নদীতে জোয়ারের জলের মতো—কিন্তু এই ভিড় বন্ধ ভিড়। আমরা যেন কোনো এক দৈত্যের মুঠোর মধ্যে চাপা রয়েছি, কোনো ফাঁকি দিয়ে বেরবার জো নেই। আমরা আছি তার ডান হাতের মুঠোয়, আমরা হলুম প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। কিন্তু যারা পড়েছে বাম হাতের ভাগে, তাদের সংখ্যা বেশি, চাপ বেশি, স্থান কম। ঐ দিককার ডেকের দিকে চেয়ে দেখলে মনে হয়, যেন ঐ অংশে জাহাজের হাঁপানির ব্যামো। যথেষ্ট পরিমাণে নিশ্বাস নিয়ে উঠতে পারছে না। আমরা আছি সভ্যতার সেই যুগে—যেটার নাম দেওয়া যেতে পারে সরকারি যুগ। রেলগাড়ি বল, স্টীমার বল, হোটেল বল, ইস্কুল বল আর পাগলা গারদ বল—সমস্তই পিন্ডপাকানো প্রকান্ড ব্যাপার। এখনকার সভ্যতা বলেছে, বহুকে দলন করে যে পিন্ড হয়,

সেই পিণ্ডই আমার বরাদ্দ অন্ন। প্রত্যেকের পুরো ব্যবস্থা করবার উপযুক্ত স্থান এবং সামর্থ্য আমার নেই। এইরকম সরকারি ব্যবস্থা ও নিষ্ঠুরতা কী সাম্রাজ্যে কী সমাজে প্রতিদিন স্তূপাকার হয়ে উঠছে।

এমনি করে প্রভূত নরবলির উপরে মানুষের রাষ্ট্র ও সমাজধর্ম প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু নিশ্চয়ই এমন একদিন আসছে, যখন বলির মানুষ মেলা সহজ হবে না, যখন ব্যষ্টি আপন পুরা মূল্য দাবি করবে। আজ কর্মিকের দল ধনিকের শাসন অমান্য করছে; তাতে ক্রুদ্ধ সমাজ অর্থাৎ সমষ্টিদেবতা তাদের প্রতি চোখ রাঙাতে ত্রুটি করছে না, এবং রাষ্ট্রধর্মেরও দোহাই দিচ্ছে; বলছে, তোমরা যদি বাড়াবাড়ি কর, তা হলে নেশনের ক্ষতি হবে, অন্য নেশন বাণিজ্যবিস্তারে এগিয়ে যাবে। কিন্তু কর্মিক আজ সে দোহাই মানতে চাচ্ছে না, বলছে, আমার প্রতি অন্যায় করতে দেব না, আমার যা পুরা মূল্য, তা আমাকে দিতেই হবে। আমাদের দেশে সমাজধর্মের দোহাই দিয়ে আমরা এতকাল নরবলি দাবি করে এসেছি; শূদ্রকে বলে এসেছি অগৌরবে তুমি সম্মত হও; কেননা, সমষ্টিদেবতার সেই আদেশ, অতএব এই তোমার ধর্ম; নারীকে বলে এসেছি, কারাবেষ্টনে তুমি সম্মত হও, তা হলেই সমষ্টি-দেবতার কাছে তুমি বরলাভ করবে, তোমার ধর্ম রক্ষা হবে। কিন্তু সমষ্টিদেবতা সর্বকালের দেবতার প্রতিযোগী হয়ে আমাদের বাঁচাতে পারবে না। মানুষকে খর্ব করবার অন্যায় এবং দুঃখ রাষ্ট্রের এবং সমাজের স্তরে স্তরে জমে উঠেছে, এমনি করে প্রলয়ের ভূমিকম্পকে গর্ভে ধারণ করছে। রাষ্ট্রের এবং সমাজের ভিত্তি টলে উঠবে—হিসাব তলব হবে, তখন বহুকালের ঋণ পরিশোধের পালায় ব্যষ্টির কাছে সমষ্টিকে একদিন বিকিয়ে যেতেই হবে। ব্যষ্টির পূর্ণতা অপহরণ করে সমষ্টি যে পূর্ণতার বড়াই করে, সে পূর্ণতা মায়ামাত্র, সে কখনোই টিঁকতে পারে না। আজ আমরা তাকে ধর্মের আবরণ দিয়েছি, কিন্তু এমন কত বলিরক্তলোলুপ ধর্ম কিছুকালের জন্য জননী বসুন্ধরাকে পীড়িত এবং অশুচি করে আজ অন্তর্ধান করেছে।

এই কথা কয়দিন আমাকে বিশেষ করে বেদনা দিচ্ছে, তার কারণ বলি। আমাদের যাত্রার আরম্ভে জাহাজ অল্প কিছু মন্থর গমনে চলছে বলে যাত্রীরা দুঃখ বোধ করছিল। মন্থরতার কারণ শোনা গেল এই যে, এঞ্জিনের জঠরানলে কয়লা জোগান দেবার ভার যাদের—সেই হতভাগ্য 'স্টোকার' দল নূতন ব্রতী, তারা পুরাদমে কাজ করতে পেরে উঠছে না। শোনা গেছে বোম্বাইয়ে বিশেষ এক তারিখে ঘাটের খালাসিদের ধর্মঘট করবার কথা ছিল। সেই তারিখের আগে কোনোক্রমে জাহাজ ঘাটে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য অতিরিক্ত মজুরির প্রলোভন দিয়ে স্টোকারদের অতিরিক্ত কাজ করানো হয়েছিল। একজন স্টোকার হাতায় কয়লা নিয়ে দারুণ শ্রান্তি এবং অসহ্য উত্তাপে এঞ্জিনের সামনে পড়ে মরে গেল। কিন্তু জাহাজ ধর্মঘটের আগেই পৌঁচেছিল, খনি-কারদের বলি না দিলে খনি থেকে কয়লা ওঠে না, স্টোকারদের বলি না দিলে জাহাজ সমুদ্র পার হয়ে খেয়াঘাটে পৌঁছয় না এইজন্যে এদের সম্বন্ধে দুঃখবোধ করা অনাবশ্যক—সভ্যতার মধ্যে যে একটা সমষ্টিগত ধন ও প্রয়োজন আছে, তারই কথাটা এদের সকল দুঃখের উপর মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখতে হবে। সবই মানি, কিন্তু এও মানতে হবে যে, যত সুবিধা, যত সুখই হোক-না, তাকে সভ্যতা বল আর যাই বল-না কেন, দুঃখ এবং অন্যায়ের হিসাব কিছুতেই চাপা পড়বে না। বলির মানুষরা আপাতত মরে, কিন্তু পরে তারাই বলিদাতাকে মারে। এই কথা নিশ্চয় জেনো, গ্রীস, রোম, ইজিপ্ট তার বলিদের হাতেই মরেছে আর ভারতও তার বলিদের হাতেই বহুকাল থেকে মরছে। ইতিহাসে এ নিয়মের কিছুতেই ব্যতিক্রম হতে পারে না—আমাদের শাস্ত্রে বলে, ধর্ম হত হয়েই নিহত করে—কিন্তু সেই ধর্ম নিষ্ঠুর সমষ্টিদেবতার ধর্ম নহে, সেই ধর্ম শাশ্বত দেবতার ধর্ম। ১৯ মে ১৯২০

***

এডেন পার হয়ে লোহিত সমুদ্রের ভিতর দিয়ে চলেছি। এদিকে গরম হাওয়ার আকাশ পেরিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার আকাশে প্রবেশ করছি। নানা নামের নানা দেশে মানুষ পৃথিবীকে ভাগ করেছে, কিন্তু আসল ভাগ হচ্ছে ঠাণ্ডা দেশ আর গরম দেশ। এই ভাগ অনুসারে পৃথিবীর জলস্রোত, পৃথিবীর বায়ুস্রোত প্রবাহিত হয়ে আকাশে মেঘবৃষ্টি ও ধরণীতে ফলশস্যের বৈচিত্র্য এমন বহুধা হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের নানা ধারা পৃথিবীর একদিক থেকে আর-একদিকে প্রবাহিত হচ্ছে এবং পরস্পর আহত প্রতিহত হয়ে ঐতিহাসিক উনপঞ্চাশ পবনের রুদ্রনৃত্য রচনা করে চলেছে, সেও এই ঠাণ্ডা ও গরমের বিপরীত শক্তির ক্রিয়া। ঠাণ্ডা-গরমের এই স্বাভাবিক বিরোধ এবং বৈচিত্র্য মিটবে না। আমরা গরম দেশের লোক, একভাবে চিন্তা করব, কাজ করব, ওরা ঠাণ্ডা দেশের লোক আরেক ভাবে। আমাদের জিনিস ওদের হাটে এবং ওদের জিনিস আমাদের হাটে চালাচালি করতে পারব, কিন্তু ওদের ফল আমাদের ডালে আর আমাদের ফল ওদের ডালে ফলবে এ কোনোদিনই ঘটবে না। ওরা যে শক্তি জগতে চালাচ্ছে, সে ঠাণ্ডা হাওয়ার শক্তি—সে শক্তি জাপানের পক্ষে সহজ, কেননা জাপান আছে ঠাণ্ডা হাওয়ার দেশে, আমাদের পক্ষে দুর্লভ। কোনো বিশেষ শক্তি ক্ষণকালের জন্যে চালনা করতে সকল মানুষই পারে, কিন্তু উপযুক্ত হাওয়ার আনুকূল্য না পেলে সে শক্তিকে নিরন্তর রক্ষা করা এবং তাকে নিয়ত বিকশিত করে তোলা অসম্ভব। দেবতার অনবচ্ছিন্ন প্রতিকূলতায় ক্রমে শৈথিল্য এবং ক্লান্তি এসে পড়বে এবং ক্রমে বিকৃতি ঘটতে থাকবে। জাহাজে করে পৃথিবীর এক ভাগ থেকে আরেক ভাগে চলবার সময় এই কথাটা বোঝা খুব সহজ হয়। সৃষ্টিক্রিয়ার উত্তাপের বৈচিত্র্যই শক্তি-বৈচিত্র্য সে কথাটা ভারত সমুদ্র থেকে মধ্যধরণী সাগরের দিকে আসবার সময় নিজের সমস্ত শরীর মন দিয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়। আমার এ কথা শুনে তোমরা হয়তো বলবে, 'তবে কি তুমি বলতে চাও, বাহ্যপ্রকৃতির ক্রিয়ার কাছে নিশ্চেষ্টভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আমরা কি ইচ্ছা-শক্তির জোরে তার উপর উঠতে পারি নে।' এ কথার উত্তর হচ্ছে, নিশ্চেষ্ট হতে হবে, এমন কথা বলা চলবে না, কিন্তু চেষ্টাকে বিশেষত্ব দেওয়া চাই। বাহ্যপ্রকৃতি ও মানসপ্রকৃতির যোগেই মানুষের সমস্ত সভ্যতা তৈরি হয়েছে, এই বাহ্যপ্রকৃতিকে মানুষ কিছু পরিমাণে বদলও করতে পারে; কিন্তু সে বদল খুচরো বদল, সেটা সম্পূর্ণ বদল হবার জো নেই। তা হলে আমাদের ইচ্ছাশক্তির কাজটা কী। তার কাজ হচ্ছে এই, যেটা পাওয়া গেছে—সেটাকেই পূর্ণ উদ্যমে সফল করে তোলা, জড়তার দ্বারা সেটাকে নিরর্থক না করা। অবস্থার যেমন বৈচিত্র্য আছে, তেমনি সফলতারও বৈচিত্র্য আছে।

* * *

দুই মহাদেশের মাঝখান দিয়ে চলেছি। বামে ইজিপ্ট, দক্ষিণে আরব। দুই তীরেই জনহীন তৃণহীন ধূসরবর্ণ পাহাড় যেন ঈর্ষ্যাপরায়ণ দৈত্যভ্রাতার মতো পরস্পরের প্রতি কঠোর কটাক্ষপাত করছে, আর যে সমুদ্রের গর্ভ থেকে তারা উভয়েই জন্ম নিয়েছে, সেই সমুদ্র যেন দিতি মাতার দুই হননোন্মুখ পুত্রের মাঝখানে পড়ে অশ্রুপরিপূর্ণ অনুনয়ের দ্বারা দুই পক্ষকে তফাত করে রেখেছে। বামের তীর শব্দহীন নিস্তব্ধ, দক্ষিণের তীরও তাই। কিন্তু এই দুই তীরের ভূরঙ্গমঞ্চে মানব-ইতিহাসের যে নাট্যাভিনয় হয়ে গেছে, আমি মনে মনে তারই কথা চিন্তা করে দেখছি। ইজিপ্টে যে মানব-সভ্যতা বিকাশ পেয়েছিল, সে বহুদিনের এবং সে বহু সম্পৎশালী। তার কত চিত্র, কত অনুষ্ঠান, কত মন্দির। আর আরবে যে জাগরণ হঠাৎ দেখা দিয়েছিল, তার কত উদ্যম, কত উদ্যোগ, কত শক্তি। কিন্তু দুই বিপরীত তীরে মানবচিত্তে এই দুই উদ্‌বোধন সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির। ইজিপ্ট আপনার বিপুল আয়োজনের মধ্যেই আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আর আরব আপন দুর্দমনীয় বেগে দেশ-দেশান্তরে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। এই দুই সভ্যতার প্রকৃতিগত পার্থক্যের কারণ ছিল দুই দেশের ভৌগোলিক পার্থক্যের মধ্যে। নীল নদীর জলধারায় পরিপুষ্ট ইজিপ্ট ফলে শস্যে পরিপূর্ণ; অভাবের কঠিন তাড়নায় সেখানকার মানুষকে নিরন্তর আঘাত করে নি।

স্তন্যরসহীন আরব-মরুভূমির সন্তানেরা নিজে অস্থির হয়েছিল এবং পৃথিবীর সকলকে অস্থির করেছিল।

বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র যেমন দুই স্বতন্ত্র প্রকৃতির ঋষি ছিলেন, তেমনি ইজিপ্ট এবং আরব দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীর দেশ। পৃথিবীর সকল দেশের লোককেই দুই মোটা ভাগে বিভক্ত করে বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের কোঠায় ফেলা যায়। বশিষ্ঠ বাস করেন আর বিশ্বামিত্র ব্যাপ্ত হন। বশিষ্ঠ ধেনু পালন করেন, আর বিশ্বামিত্র ধেনু হরণ করেন। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের কানে মন্ত্র দেন, আর বিশ্বামিত্র হাতে অস্ত্র দেন। বশিষ্ঠ ঐশ্বর্যশালী গৃহের পুরোহিত আর বিশ্বামিত্র দুর্গম পথের নেতা।

বর্তমান যুগে ভারতবর্ষ এবং চীন বশিষ্ঠের মন্ত্রে দীক্ষিত। আর য়ুরোপ বিশ্বামিত্রের আহ্বানে চঞ্চল। এই ঋষি কি কোনোদিন প্রেমে মিলবেন। আর যদি মিলতে পারেন তা হলে পৃথিবীতে কি কোনোকালে বিরোধের অবসান হবে। যদি এমন আশা কর যে, দুইয়ের মধ্যে এক ঋষি যেদিন মারা যাবেন, সেই দিনই পৃথিবীতে শান্তি দেখা দেবে, তবে সে আশা সফল হবে না, কেননা, জগতে বশিষ্ঠও অমর, বিশ্বামিত্রও অমর। আমার বিশ্বাস একদিন এই দুই ঋষিই এক যজ্ঞের ভার নেবেন, মন্ত্র এবং অস্ত্র, অমৃত এবং উপকরণ একত্রে মিলিত হবে, সেই যজ্ঞের অগ্নিশিখা আর নিববে না। এশিয়া য়ুরোপ যদি কোনোদিন সত্যে মিলতে পারে তা হলেই মানুষের সাধনা সিদ্ধ হবে— নইলে রক্তবৃষ্টিতে মানুষের তপস্যা বারংবার কলুষিত হতে থাকবে। ২৪ মে ১৯২০

সংগীত

আমরা গ্রীষ্মঋতুর অবসানের দিকে এ দেশে এসে পৌঁচেছি; এখন এখানে সংগীতের আসর ভাঙবার মুখে।

আমার ভাগ্যক্রমে এবারে আমি লন্ডনে আসার কয়েক সপ্তাহ পরেই ক্রিস্টলপ্যালাসের গীতশালায় হ্যান্ডেল উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। প্রসিদ্ধ সংগীত-রচয়িতা হ্যান্ডেল ছিলেন জর্মান কিন্তু ইংলন্ডেই তিনি জীবনের অধিকাংশ ভাগ কাটিয়েছিলেন। বাইবেলের কোনো কোনো অংশ ইনি সুরে বসিয়েছিলেন, সেগুলো এ দেশে বিশেষ আদর পেয়েছে। এই গানগুলোই বহুশত যন্ত্রযোগে বহুশত কণ্ঠে মিলে হ্যান্ডেল-উৎসবে গাওয়া হয়ে থাকে। চার হাজার যন্ত্রী ও গায়কে মিলে এবারকার উৎসব সম্পন্ন হয়েছিল।

বিরাট সভাগৃহের গ্যালারিতে স্তরে স্তরে গায়ক ও বাদক বসে গিয়েছে। এত বৃহৎ ব্যাপার যে দূরবীনের সাহায্য ব্যতীত স্পষ্ট করে কাউকে দেখা যায় না; মনে হয় যেন পুঞ্জে পুঞ্জে মানুষের মেঘ। স্ত্রী ও পুরুষ গায়কেরা উদারা মুদারা ও তারা সুরের কণ্ঠ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বসেছে। একই রঙের একই রকমের কাপড়; সবসুদ্ধ মনে হয় প্রকাণ্ড একটা পটের উপর কে যেন লাইনে লাইনে পশমের বুনুনি করে গিয়েছে।

চার হাজার কণ্ঠে ও যন্ত্রে সংগীত জেগে উঠল। এর মধ্যে একটি সুর পথ ভুলল না। চার হাজার সুরের ধারা নৃত্য করতে করতে একসঙ্গে বার হল, কোনো সুরের অপঘাত ঘটল না। অথচ সমতান নয়; বিচিত্র তানের বিপুল সম্মিলন। এই বহু বিচিত্রকে অনিন্দনীয় সুসম্পূর্ণতায় এক করে তোলবার মধ্যে যে একটা বৃহৎ শক্তি আছে আমি তাই অনুভব করে বিস্মিত হয়ে গেলুম। এত বড়ো বৃহৎ ক্ষেত্রে অন্তরে বাইরে জাগ্রত শক্তির কোথাও কিছুমাত্র ঔদাস্য নেই, জড়ত্ব নেই। আসন বসন হতে আরম্ভ করে গীতকলার পারিপাট্য পর্যন্ত সর্বত্র তার অমোঘ বিধান প্রত্যেক অংশটিকে সমগ্রের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ন্ত্রিত করছে।

মাঝে মাঝে ছাপানো প্রোগ্রাম খুলে গানের কথার সঙ্গে সুরকে মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করছিলুম। কিন্তু মিল যে দেখতে পেয়েছিলুম তা বলতে পারি না। এত বড়ো একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার গড়ে তুললে সেটা যে একটা যন্ত্রের জিনিস হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নেই। বাইরের আয়তন

বৃহৎ, বিচিত্র ও নির্দোষ হয়ে উঠেছে কিন্তু ভাবের রসটি চাপা পড়েছে। আমার মনে হল বৃহৎ ব্যূহবদ্ধ সৈন্যদল যেমন করে চলে এই সংগীতের গতি সেইরূপ; এতে শক্তি আছে কিন্তু লীলা নেই।

কিন্তু তাই বলে সমস্ত য়ুরোপীয় সংগীত পদার্থটাই এই শ্রেণীর নয়। য়ুরোপীয় সংগীতে আকারের নৈপুণ্যই প্রধান, ভাবের রস প্রধান নয়, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। কারণ এ প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে সংগীতের রসসুধায় য়ুরোপকে কী রকম মাতিয়ে তোলে। ফুলের প্রতি মৌমাছির আগ্রহ দেখলেই বোঝা যাবে ফুলে মধু আছে, সে মধু আমার গোচর না হতেও পারে।

য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের দেশের সংগীতের একজায়গায় মূলত প্রভেদ আছে। হার্মনি বা স্বরসংগতি য়ুরোপীয় সংগীতের প্রধান বস্তু, আর রাগরাগিণীর ব্যাকরণ আমাদের সংগীতের মুখ্য অবলম্বন। বার বার অনুভব করেছি আমাদের সংগীত আমাদের সুখদুঃখকে অতিক্রম করে চলে যায়। আমাদের বিবাহের রাত্রিতে রসনচৌকিতে সাহানা বাজে। কিন্তু সেই সাহানার তানের মধ্যে প্রমোদের ঢেউ খেলে কোথায়। তার মধ্যে যৌবনের চাঞ্চল্য কিছুমাত্র নেই; তা গম্ভীর, তার মীড়ের ভাঁজে ভাঁজে করুণা। আমাদের দেশে আধুনিক বিবাহে সানাইয়ের সঙ্গে বিলিতি ব্যান্ড বাজানো বড়োমানুষি বর্বরতার একটা অঙ্গ। উভয়ের প্রভেদ একেবারে সুস্পষ্ট। বিলিতি ব্যান্ডের সুরে মানুষের আমোদ-আহ্লাদের সমারোহ ধরণী কাঁপিয়ে তুলছে; যেমন লোকজনের ভিড়, যেমন হাস্যালাপ, যেমন সাজসজ্জা, যেমন ফুলপাতা আলোকের ঘটা, ব্যান্ডের সুরের উচ্ছ্বাসও ঠিক তেমনি। কিন্তু বিবাহের প্রমোদসভাকে চারি দিকে বেষ্টন করে যে অন্ধকার রাত্রি নিস্তব্ধ হয়ে আছে, সেখানে লোকলোকান্তরের অনন্ত উৎসব নীরব নক্ষত্রসভায় প্রশান্ত আলোকে দীপ্তিমান, সাহানার সুর সেইখানকার বাণী নিয়ে প্রবেশ করে। আমাদের সংগীত মানুষের প্রমোদশালার সিংহদ্বারটা ধীরে ধীরে খুলে দেয় এবং জনতার মাঝখানে অসীমকে আহ্বান করে আনে। আমাদের সংগীত একের গান—একলার গান; কিন্তু তা কোণের এক নয় তা বিশ্বব্যাপী এক।

গ্রামে হপ্তায় বিশেষ একদিন হাট বসে, বছরের বিশেষ একদিন মেলা হয়। সেইদিন পরস্পরের পণ্য বিনিময় করে মানুষ যার যা অভাব আছে মিটিয়ে নেয়। মানুষের ইতিহাসেও তেমনি এক-একটা যুগে হাটের দিন আসে; সেদিন যে যার আপন আপন সামগ্রী সংগ্রহ করতে আসে। সেদিন মানুষ বুঝতে পারে একমাত্র নিজের উৎপন্ন জিনিসে মানুষের দৈন্য দূর হয় না; বুঝতে পারে নিজের ঐশ্বর্যের একমাত্র সার্থকতা এই যে তাতে পরের জিনিস পাবার অধিকার জন্মে। এইরূপ যুগকে য়ুরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁসের যুগ বলে থাকে। পৃথিবীতে বর্তমান যুগে যে রেনেসাঁসের হাট বসে গেছে এত বড়ো হাট এর আগে আর কোনোদিন বসে নাই। তার প্রধান কারণ, আজ পৃথিবীতে চার দিকের রাস্তা যেমন খোলসা হয়েছে এমন আর কোনোদিন ছিল না।

আমি ভারতবর্ষে থাকতেই দেখেছি য়ুরোপীয় শ্রোতা তন্ময় হয়ে সুরবাহারে বাগেশ্রী রাগিণীর আলাপ শুনছেন। গায়ক দুইজন বেদমন্ত্রে ইমন-কল্যাণ ভৈরবী প্রভৃতি বৈঠকি সুর যোগ করে তাঁকে সামগান বলে শোনাচ্ছেন। তাঁকে আমার বলতে হল এ জিনিসটাকে সামগান বলে গ্রহণ করা চলবে না। দেখলুম তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত বাহুল্য; কারণ তিনি আমার চেয়ে বেশি জানেন। আমাকে তিনি বেদমন্ত্র আবৃত্তি করতে বললে আমি অল্প যেটুকু জানি সেই অনুসারে আবৃত্তি করলুম। তখনি তিনি বললেন, এ তো যজুর্বেদের আবৃত্তির প্রণালী। বস্তুত আমি যজুর্বেদের মন্ত্রই আবৃত্তি করেছিলুম। বেদগান হতে আরম্ভ করে ধ্রুপদ খেয়ালের রাগমান-লয় তিনি তন্ন তন্ন করে সন্ধান করেছেন—তাঁকে সহজে ফাঁকি দেবার জো নেই। ইনি ভারতবর্ষীয় সংগীত সম্বন্ধে বই লিখছেন।

শ্রীমতী মড্ মেকার্থির লেখা মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকায় মাঝে মাঝে বার হয়েছে। নবছর বয়স থেকেই ইনি প্রকাশ্য সভায় বেহালা বাজিয়ে শ্রোতাদের বিস্মিত করেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এঁর হাতে

স্নায়ুঘটিত পীড়া হওয়াতে এঁর বাজনা বন্ধ হয়ে গেছে। ইনি ভারতবর্ষে থেকে কিছুকাল বিশেষভাবে দক্ষিণ ভারতের সংগীত আলোচনা করেছেন; ইনিও সে সম্বন্ধে বই লিখতে প্রবৃত্ত আছেন।

একদিন ডাক্তার কুমারস্বামীর এক নিমন্ত্রণ-পত্রে পড়লুম তিনি আমাকে রতন দেবীর গান শোনাবেন। রতন দেবী কে বুঝতে পারলুম না; ভাবলুম কোনো ভারতবর্ষীয় মহিলা হবেন। দেখলুম তিনি ইংরেজ মেয়ে, যেখানে নিমন্ত্রিত হয়েছি সেইখানকার তিনি গৃহস্বামিনী।

মেঝের উপর বসে কোলে তম্বুরা নিয়ে তিনি গান ধরলেন, আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম। এ তো 'হিলি মিলি পনিয়া' নয়; রীতিমত আলাপ করে তিনি কানাড়া মালকোষ বেহাগ গান করলেন। তাতে সমস্ত দুরূহ মীড় এবং তাল লাগালেন; বিলিতি সম্মার্জনী বুলিয়ে আমাদের সংগীত হতে তার ভারতবর্ষীয়ত্ব বারো আনা ঘষে তুলে ফেললেন না। আমাদের ওস্তাদের সঙ্গে প্রভেদ এই যে এঁর কণ্ঠস্বরে কোথাও যেন কোনো বাধা নেই; শরীরের মুদ্রায় বা গলার সুরে কোনো কষ্টকর প্রয়াসের লক্ষণ দেখা গেল না। গানের মূর্তি একেবারে অক্ষুণ্ণ অক্লান্ত হয়ে দেখা দিতে লাগল।

একদিন আমাকে ডাক্তার কুমারস্বামী বলেছিলেন, হয়তো এমন সময় আসবে যখন তোমাদের সংগীতের পরিচয় নিতে তোমাদের য়ুরোপে আসতে হবে। আমাদের দেশের অনেক জিনিসকেই য়ুরোপের হাত থেকে পাবার জন্য আমরা হাত পেতে বসেছি। আমাদের সংগীতকেও একবার সমুদ্রপার করে তার পরে যখন তাকে ফিরে পাব তখনি হয়তো ভালো করে পাব। যেখানে মানুষের সমস্ত সম্পদ জীবনের বৃহৎ কারবারে খাটছে এবং মুনাফায় বেড়ে চলেছে সেইখানে আপনাদের সামগ্রীকে না আনলে সেই চলতি কারবারের সঙ্গে যোগ দিতে না পারলে আমরা আপনার পুরো পরিচয় পেতে পারব না। পাছে য়ুরোপের সংসর্গে আমরা আপনাকে বিস্মৃত হই এই ভয়ের কথাই আমরা শুনে আসছি কিন্তু সত্য নয়, তার উল্টা কথাই সত্য। এই প্রবল সজীব শক্তির প্রথম সংঘাতে কিছুকালের জন্য আমরা দিশে হারিয়ে থাকি কিন্তু শেষকালে আমরা নিজের প্রকৃতিকেই জাগ্রততর করে পাই। য়ুরোপের প্রাণবান সাহিত্য আমাদের সাহিত্যের প্রয়াসকে জাগিয়েছে; তা যতই বলবান হয়ে উঠছে ততই অনুকরণের হাত এড়িয়ে আত্মপ্রকাশের পথে আমাদের অগ্রসর করে দিচ্ছে। আমাদের শিল্পকলায় সম্প্রতি যে উদ্‌বোধন দেখা যাচ্ছে তার মূলেও য়ুরোপের প্রাণশক্তির আঘাত রয়েছে। আমার বিশ্বাস সংগীতেও আমাদের সেই বাইরের সংস্রব প্রয়োজন হয়েছে। তাকে প্রাচীন দপ্তরের লোহার সিন্ধুক হতে মুক্ত করে বিশ্বের হাটে ভাঙাতে হবে। য়ুরোপীয় সংগীতের সঙ্গে ভালো করে পরিচয় হলে আমাদের সংগীতকে আমরা সত্যকার বড়ো করে ব্যবহার করতে শিখব।

পরিশিষ্ট

নিউ ইয়র্ক
১৩ কার্তিক ১৩১৯

বিনয় নমস্কারপূর্বক নিবেদন

দেবাসুরে মিলে যখন সমুদ্র মন্থনে লেগেছিলেন তখন মহাসমুদ্রের পেটে যা-কিছু ছিল সমস্ত তাঁকে নিঃশেষে উদ্গার করতে হয়েছিল। সে সময়ে তাঁর যে কী রকম পীড়া উপস্থিত হয়েছিল সেটা তিনি মহাভারতের বেদব্যাসকে কোনোদিন বোঝাবার সুযোগ পেয়েছিলেন কিনা জানি নে। কিন্তু এই বর্তমান কবিটিকে খুব স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমার জঠর তাঁর জঠরের মতো এমন বিরাট নয় এবং তার মধ্যে বহুমূল্য জিনিস কিছুই ছিল না কিন্তু বেদনার পরিমাণ আয়তনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না; সেইজন্যে অতলান্তিক পার হবার সময়ে তার অপার দুঃখ অল্পকালের মধ্যেই উপলব্ধি করে নিয়েছিলুম। আমরা যে নিতান্তই মাটির মানুষ সেটা বুঝতে বাকি ছিল না। এখন কেবলই মনে হচ্ছে, কালো জল আর হেরব না গো দূতী, সমুদ্র আর পার হব না—স্টীমারের বংশীধ্বনি যত জোরেই বাজুক আর কূল ছাড়তে মন যাচ্ছে না। ডাঙায় নেমে এখনো শরীরটা ক্লান্ত হয়ে আছে। দিন রাত্রি নাড়া খেয়ে খেয়ে প্রাণটা যেন শরীরের থেকে আলগা হয়ে নড়নড় করছে। সমুদ্র আমাকে যেন তার ঝুমঝুমি পেয়েছিল—দুহাতে করে ডাইনে বাঁয়ে নাড়া দিয়েছিল, ভেবেছিল কবির পেটের মধ্যে ত্রিপদী চতুষ্পদী যা-কিছু আছে সমস্তয় মিলে একটা হট্টগোল বাধিয়ে তুলবে—কিন্তু উল্টে পাল্টে খানাতল্লাসি করে জঠরের মধ্যে থেকে ছন্দোবন্ধের কোনো সন্ধানই যখন পাওয়া গেল না তখন মহাসমুদ্র আমাকে নিষ্কৃতি দিলেন।

সুরুলের বাড়িটা পাওয়া গেছে।

৫০৮ হাই স্ট্রীট
আরবানা, ইলিনয়

সবিনয় নমস্কার নিবেদন

ইলিনয়ে এসে আমরা বাসা বেঁধে বসেছি। বাড়িটি বেশ ছোটোখাটো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিভৃত নিরালা। এখানে দাসী চাকর পাওয়া যায় না—যারা ঘরের কাজ করে দেয় তাদের হেল্প বলে। তারা ভৃত্য নয়—অনেক ভদ্র গৃহস্থের ছেলেমেয়েরা এই করে খরচ চালিয়ে দেয়। এখানকার গৃহিণীদের অধিকাংশকেই রীতিমত পরিশ্রম করতে হয়—রাঁধাবাড়া, ঘর সাফ করা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা ইত্যাদি। যে শ্রেণীর লোকদের এইরকম খাটতে হয় আমাদের দেশে সে শ্রেণীর মেয়েরা তার সিকি পরিমাণ কাজও করে না। এদের আবার আরও অনেক উপসর্গ আছে। কেবলমাত্র ঘরকরনার কাজ করে এলোমেলো হয়ে অন্তঃপুরে প্রচ্ছন্ন হয়ে দিন কাটালে চলে না। তার উপরে পড়াশুনা, বক্তৃতা আদি শোনা এবং করা, অতিথি-অভ্যাগতদের আদর অভ্যর্থনা করা, এবং সর্বদাই সুপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকা। আবার ছেলেমেয়েদের পড়ানোও অনেকটা পরিমাণে নিজেরাই করে। এখানকার অধ্যাপক সীমুরের বাড়িতে একজনও চাকর নেই। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী মিলে ঘরের সমস্ত ছোটোখাটো কাজ আদ্যোপান্ত নিজের হাতে করেন—তার উপরে মিসেস সীমুর বৌমাকে প্রত্যহ ইংরজি শেখাবার ভার নিয়েছেন। যাঁকে অমন অশ্রান্ত খাটতে হয় তিনি যে কী করে আবার এরকম অনাবশ্যক দায়িত্ব কেবলমাত্র রথীর প্রতি স্নেহবশত গ্রহণ করতে পারেন আমি তো বুঝতে পারি নে। আমাদের ছোটোখাটো ঘরকরনার ভার বৌমাকে নিতে হয়েছে—আমরাও আজ পর্যন্ত হেল্প জোটাতে পারি নি। তাঁকে রাঁধতে, ঘর ঝাঁট দিতে, বিছানা তৈরি করতে হয়—অবকাশ মতো রথীকেও এ-সব কাজে যোগ দিতে হচ্ছে। বঙ্কিম ও সোমেন্দ্র আমাদের সঙ্গে আছেন।

৫০৮ হাই স্ট্রীট
আরবানা
ইলিনয় এম, এ

কল্যাণীয়েষু

এখানে এসে এ পর্যন্ত আমি অধ্যাপক ব্রুক্‌সের বাড়িতে এবং রথী ও বৌমা সীমুরদের ওখানে অতিথিরূপে কাটিয়েছে। কাল নিজেদের বাসায় এসে প্রবেশ করা গেছে। ওখানকার ঘর-করনার বিলি ব্যবস্থা সবই তো তুমি জান। সেই আমেরিকান চালে আপাতত আমাদের জীবনযাত্রা আরম্ভ করা গেছে। অর্থাৎ ঘরে চাকর দাসী রাঁধুনি কেউই নেই, আমাদের গৃহকর্ত্রীই সমস্ত নির্বাহ করছেন। বৌমাই রাঁধেন, ঘর সাফ করেন। বঙ্কিম তাঁর কতকটা সাহায্য করছে তার পরিবর্তে বিনামূল্যে তার এখানে আহার ও অবস্থান চলে যাচ্ছে। অবশ্য এখানে ঘরে বাহিরে সকল প্রকার সুবিধা থাকাতে এরকমটা সম্ভব হতে পেরেছে। দেয়ালের গায়ে বোতাম টিপেই এখানকার প্রায় বারো আনা কাজ হয়ে যায়। রথী এখানকার কলেজে যোগ দিয়েছে—তাকে পেয়ে তোমাদের অধ্যাপকেরা খুব খুশি—বৌমাকেও সকলের খুব ভালো লেগেছে। আমার এখানে বেশ মন বসেছে। কোথাও কোনো গোলমাল নেই—আকাশ খোলা, আলোক অপর্যাপ্ত, অবকাশ অব্যাহত। মাঝে মাঝে একেবারে ভুলে যাই যে আমেরিকায় এসেছি—ঠিক মনে হয় যেন দেশে আছি। মনে করছি কিছুদিন সবরকম লেখা থেকে ছুটি নিয়ে আরামে কেবল কষে বই পড়ব। আজ আমার এই সামনের জানালার ভিতর দিয়ে যে নির্মল প্রভাত উঁকি মারছে তার কী প্রসন্ন শ্রী—সে আর তোমাকে কী বলব। আমাদের দেশের শিশিরে ধোয়া একটি কোনো পৌষের সকাল আমার মনে পড়ছে। বড়ো ভালো লাগছে।

২১ ক্রমওয়েল রোড
সাউথ কেন্সিংটন,
এস, ডব্লিউ

কল্যাণীয়েষু

সন্তোষ, দুই তিন মেল তোমার চিঠি পাই নি তাই তোমাকে লিখি নি, জানি যে আমার চিঠি তোমরা কোনো-না-কোনো নামে পাচ্ছ। আমার এ চিঠি যখন শান্তিনিকেতনে পৌঁছবে তখন শিউলি ফুলের গন্ধে তোমাদের বন আমোদিত হয়ে উঠেছে এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, শারদশ্রীর সোনার পদ্মবনের আশ্চর্য শোভা ধরে দেখা দিচ্ছে। সেই চিরপরিচিত আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে এখানকার আকাশের বিরুদ্ধে আমার মাথায় অত্যুক্তি জাগছে। আমার মন বলছে, এখানকার আকাশের মধ্যে রূপের খেয়াল নেই, সে মানুষের মন ভোলাতে চায় না। এখন জ্যোৎস্না রাত্রি কিন্তু সে কেবল পাঁজিতেই দেখি—নিশ্চয়ই আকাশে তারা আছে কেননা অ্যাস্ট্রনমিতে তার বিবরণ পাওয়া যায় এবং মেঘ আছে সে-সম্বন্ধে সন্দেহ করবার লেশমাত্র হেতু নেই। এখানকার আকাশ এইরকম কালো ফ্রক কোট এবং কালো চিম্‌নিপট্‌ টুপি পরে অত্যন্ত ভব্যভাবে থাকে বলেই এখানকার লোকের কাজকর্মের কোনো ব্যাঘাত হয় না। আমাদের দেশের আকাশ আমাদের কাজ ভোলায়। শরৎকালের সোনালি আলোয় আপিস আদালত মাটি করে দেয়—আকাশ আপনার সমস্ত জানালা দরজা এমন করে অহোরাত্র খুলে রেখে দিয়েছে যে মন সে আমন্ত্রণ একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারে না। আমাদের বৈষ্ণব কাব্যে সেইজন্যেই যে বাঁশি বাজে সে বাঁশি কুলবধূর কুলের কাজ ভুলিয়ে দেয়—সে আমাদের সমস্ত ভালো-মন্দ থেকে বাহির করে আনে।

আমাদের আকাশ যে ছুটির আকাশ; এদের আকাশ, আপিসের আকাশ। এদের আকাশে ঘণ্টা বাজে আমাদের আকাশে বাঁশি বাজায়। সেইজন্যে এরা বলে জীবন সংগ্রাম, আমরা বলি জীবলীলা। ভগবানের লীলার রূপ এখানে আবৃত হয়ে রয়েছে। এইজন্যেই এরা বলতে চায় তিনি নিজেকে পাবার জন্যে নিজে যুঝছেন। তাঁর মধ্যে কোনোখানে বিরাম নেই। আমরা সেই বিরামকে দেখেছি,

সেই সুন্দরকে দেখেছি, আমরা সেই বাঁশি শুনেছি। কিন্তু বাঁশি যখন আমাদের টেনে আনে তখন যে পথ দিয়ে আমাদের নিয়ে আসে, সেই দুর্গম পথটাকে আমরা এড়িয়ে চলতে চেয়েছি। এইখানেই আমরা একেবারে ঠকে গেছি। কেবল বাঁশি শুনলেই তো হয় না, বাঁশি শুনে যে চলতে হবে; তখন যে দুঃখের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। কাঁটা পায়ে ফুটবে— কিন্তু তাই যদি সহ্য করতে না পারব তবে বাঁশির সুর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করলে কই। আজ পর্যন্ত দুঃখের পথেই আনন্দের অভিসার হয়ে এসেছে, আর কোনো পথ নেই। আরামের শয্যা থেকে আমাদের যে ডাক দিচ্ছে সে তো শমনের পিয়াদা নয়, সে বাঁশির সুর। ৯ আশ্বিন ১৩১৯

লন্ডন

কল্যাণীয়েষু

অজিত, এখানে শীত কাটানোটা আমার একেবারেই ইচ্ছা নয়। কিন্তু মোটের উপর শরৎকালটা ভদ্র-ব্যবহার করছে— মনে হচ্ছে গ্রীষ্মকাল-ভোর এখানকার আকাশ যেরকম মাতলামি করছিল এখন তার জন্যে অনুতাপ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। সেপ্টেম্বরের শেষ দুই সপ্তাহ দিব্য সূর্যালোক ভোগ করা গেছে। গত দুই দিন আবার বাদল করে ভয় লাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজ সকালে রৌদ্রে আকাশ ঝলমল করছে। আমাদের দেশে সূর্যালোকের তো কৃপণতা নেই কিন্তু তবু আজ পর্যন্ত আমার সূর্যালোকের তৃষ্ণা মিটল না। যেদিন এখানে সূর্য দেখা দেয় সেইদিনই তার আহ্বানে আমার মন উতলা হয়ে ওঠে। ইচ্ছা করে কোনো দূর সমুদ্র পারে আলোর দেশে গিয়ে ঘর বাঁধি— পিছনে আমার তমালতালীবনরাজিনীলা সমুদ্রবেলা; সামনে নিস্তব্ধ শুভ্র বালুতটের পাশে নীলাম্বুরাশির সফেন চাঞ্চল্য, পশ্চিম তীরে পৃথিবীর আকাশমুখী দুরাশার মতো পাহাড় উঠেছে এবং ঝাউ বনের ভিতর দিয়ে নদীটি বয়ে এসে সমুদ্রে পড়েছে; আকাশে 'সিন্ধু শকুন' উড়ে চলেছে, নীল জলের উপর জেলেদের নৌকো সাদা পাল মেলে দিয়েছে— এবং এই সমস্ত দৃশ্যটির উপর অবাধ প্রসারিত আলো, আমার কল্পচিত্রখচিত অবকাশের গভীর পাত্রটি সোনার আলোয় উপচে পড়ছে— এবং গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া বাজছে আমার মনোবীণা আকাশের আলোর সমান সুরে সমান তালে। সময় নদীর জলের মতো মৃদু মন্দ কলস্বরে কাল সমুদ্রে মিলিয়ে যাচ্ছে, কেউ তার কোনো হিসাব দাবি করছে না। মানুষকে বিধাতা মন্থরগামী করে সৃষ্টি করেছেন সে ঘোড়ার মতো দৌড়তে পারে না, পাখির মতো উড়তে পারে না, তার পালাবার পথে অনেক বাধা— সেইজন্যেই সাহস করে তার মনের মধ্যে এত গতি সঞ্চার করে দিয়েছেন। নইলে আজ এমন সকালে কে আমাকে ধরে রাখতে পারত। ইতি ১৫ আশ্বিন ১৩১৯

৫০৮ হাই স্ট্রীট
আরবানা, ইলিনয়
ইউ. এস. এ.

কল্যাণীয়েষু

অজিত, আমার মনে আশা ছিল যে এই জায়গায় এসে দিব্যি চুপচাপ করে সারা বেলা কেবল রোদ পোহাব এবং নিজের মনটাকে নীল আকাশে মেলে দিয়ে পড়ে থাকব। দেখো, এই ভরপুর কুঁড়েমিটাই আমার স্বভাব— সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে আমি এই জ্যোতির্ময় সুনিস্তব্ধ সুগভীর অবকাশের আশাটা মনে জাগিয়ে রেখে দিই। পকেটে হাত দিয়ে ভাবি আমার উইক্-এন্ড টিকিট কেনা রয়েছে— শনিবারটা এলেই একেবারে ট্রেনে চড়ে বসব। কিন্তু আমার ভাগ্যে সে শনিবার কিছুতেই আসতে চায় না— আমি দেখতে পাচ্ছি আমার হপ্তা সাত দিনের সপ্তাহ নয়, কত দিনের যে তাও আমার পঞ্জিকায় লেখে নি। আমার মতন এমন পলাতক মন বোধ হয় আর কারও নয়। ছেলেবেলা স্কুল থেকে পালিয়েছি, বড়ো হয়েও কিছুতে আমাকে ধরে রাখতে পারে নি, কেবলই

পাঁচিল ডিঙিয়ে দৌড় দিয়েছি; এখনও নিজের কর্ম সৃষ্টি থেকে নিজে পালাবার জন্যে মনটা ব্যাকুল হয়ে বেড়ায়। এমনতরো আত্মবিরোধ জগতে বোধ হয় খুব অল্প লোকের মধ্যে দেখা যায়। আমি তো এ-পর্যন্ত একটার পর একটা কেবল কাজের জালই বুনেছি—অথচ মাছের পক্ষে জল যেমন আমার পক্ষে প্রশস্ত অবারিত আকাশ ঠিক তেমনিই—তা না পেলেই আমার সমস্ত স্বভাব আগাগোড়া ক্লিষ্ট হয়ে উঠে। এখানে এসে খুব জড়িয়ে পড়েছি। লন্ডনে আমার পদ্যের ধারা নিয়ে পড়েছিলুম এখানে গদ্যের ধারা। তোমাকে বোধ হয় পূর্বেই লিখেছি এখানকার য়ুনেটিরিয়ান গির্জার হলে একদিন বিশ্ববোধ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়েছিলুম, সেটাতে আমাকে তত বেশি দুঃখ দেয় নি কেননা তার অনেকটা সতীশবাবু তর্জমা করে দিয়েছিলেন, আমি সেটাকে বদলে ও বাড়িয়ে কাজ চালিয়ে দিয়েছিলুম। দ্বিতীয় বারে সমস্তটাই আমাকে লিখতে হয়েছিল। তাতে ভালোই হয়েছে। তার বিষয়টা ছিল আত্মবোধ। যেটা বাংলায় আছে তারই তর্জমা নয়—সেই বিষয়টাই নূতন করে লিখেছি। এখানকার অধ্যাপকমণ্ডলীর সেটা ভালো লেগেছে। এঁদের মধ্যে দুই-একজন জর্মান আছেন তাঁদের কাছ থেকে খুব উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছে। কুন্‌জে নামে এখানকার একজন ফিজিক্সের অধ্যাপক আছেন, তিনি বিজ্ঞানে এদেশের মধ্যে বিশেষজ্ঞ বলে খ্যাত, জর্মান, সকল বিষয়েই তাঁর গভীর গবেষণা ও চিত্তের গতি। সেদিন বক্তৃতার পর অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে অনেক আলোচনা হয়েছে। তাঁর উৎসাহ দেখে আমি উৎসাহ পেয়েছি। এ সপ্তাহটা আর-একটা লিখেছি, তার বিষয়টা ব্রহ্মসাধন, সেটা কাল পড়ব এবং পর সপ্তাহের জন্যও আর-একটা লেখার সূত্রপাত করেছি। কবে এবং কোন্‌খানে গিয়ে যে থামতে পারব কিছুই ভেবে পাচ্ছি নে। মনে হচ্ছে এই আর-একটা আবর্তের সৃষ্টি হল, আমেরিকায় এইটের ঘূর্ণিই ঘুরপাক খাওয়াবে। আর আমার ছুটি নেই—অথচ আমার মন চায় ছুটি। আমার কোন্ মন যে কাজ করে এবং কোন্ মন যে ছুটি খোঁজে তা আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারি নি। স্কুল থেকে পালিয়েছিলুম, সে কাজ ছিল সহজ; কিন্তু নিজের ফাঁদ থেকে নিজে কেটে বেরনো তেমন সহজ নয়। মনে মনে ভাবি, প্রজাপতি একদিন লক্ষ সুতার জালে আপনাকে আপাদমস্তক জড়ায়, আবার সেই প্রজাপতিই সময় উপস্থিত হলে নিজের সেই জাল নিজেই কেটে বেরোয়। আমারও কাটবার দিন একদা আসবেই—তখন নিজের অবকাশের চারি দিকে অহরহ এই কালিকলমের সূক্ষ্ম রেখার সূত্র আর টানব না—তখন কিছু না করলেও আমার করা হবে, কিছু না বললেও আমার বলা হবে। ইতি ৮ অগ্রহায়ণ ১৩১৯

৫০৮ হাই স্ট্রীট
আরবানা, ইলিনয়

সবিনয় নমস্কারপূর্বক নিবেদন

জগদানন্দ, আমরা এখানে এতকাল পর্যন্ত প্রায় নিরবচ্ছিন্ন সূর্যালোক ভোগ করে এসেছি। নবেম্বর ডিসেম্বরে প্রকৃতির এরকম প্রসন্ন মুখচ্ছবি এখানকার লোকেরা প্রায় দেখতে পায় না। জানুয়ারির দুই-তিন দিন থেকে বৃষ্টি বাদলার সূত্রপাত হয়েছে। সেদিন একচোট বরফ পড়ে সমস্ত সাদা হয়ে গেল, তার পর সমস্ত রাত খুব কষে বৃষ্টি হল—একেবারে আমাদের দেশের বর্ষার ধারার মতো। সকালে দেখি সেই বৃষ্টি রাস্তার উপরে, গাছের উপরে, টেলিফোনের তারের উপরে জমে বরফ হয়ে গেছে। রাস্তা ভয়ংকর পিছল—সোমেন্দ্র তো প্রতিদিন দুই-একবার করে আছাড় খেয়ে নিয়েছে, পরের রাত্রি আবার বৃষ্টি। তার পরের দিনে বরফের আবরণ আরও ঘন আরও কঠিন। গাছগুলো আগাগোড়া যেন কাঁচ দিয়ে মোড়া—বরফের ভারে মড়মড় শব্দে গাছের ডাল ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ইলেকট্রিক আলোর তারের উপর গাছ পড়ে রাত্রে তো সব আলো নিভে গেল। রাস্তায় পথিকের সংখ্যা অল্প, মোটর গাড়ির আস্ফালন নেই বললেই হয়—আমি তো দুই-একদিন একেবারেই বেরই নি। অল্প বয়সে পদস্খলন হলে লোকসান পূরণ হয়, আমার বয়সে সেটা সাংঘাতিক হবার কথা—এইজন্য পিছলের সম্ভাবনা দেখলে ঘরে বসে থাকাই আমার পক্ষে বুদ্ধির কাজ। বসে বসে অনেকগুলো কবিতা তর্জমা করেছি। আজ সকালে সূর্যোদয় হয়েছে। এ কী সুন্দর

শোভা। শীতকালের পত্রহীন গাছের ডালগুলো একেবারে আগাগোড়া হীরের মতো ঝলমল করছে— যেন উৎসব বাড়িতে সারি সারি স্ফটিকের ঝাড় লাগিয়ে দিয়েছে। কাল রাস্তাগুলো আয়নার মতো স্বচ্ছ ছিল--রাত্রে তার উপর বরফ পড়ে সমস্ত শুভ্র হয়ে গেছে। আজ চিঠি লেখা সেরে মনে করছি একবার বাইরে ঘুরে আসব—পতনের সম্ভাবনা সম্পূর্ণই আছে—কিন্তু শক্তিসাধকদের মতো সময় বিশেষে 'পুনঃ পততি ভূতলে' হলেও উত্থায়চ পুনশ্চ অগ্রসর হওয়া উচিত—কেননা বরফের এরকম কারিগরি এখানেও দৈবাৎ দেখা যায়। ইতি ২৪ পৌষ ১৩১৯

সংযোজন

আজ সকালে জাহাজের ছাদের উপর রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। আকাশের পাণ্ডুর নীল ও সমুদ্রের নিবিড় নীলিমার মাঝখান দিয়া পশ্চিম দিগন্ত হইতে মৃদুশীতল বাতাস আসিতেছিল। আমার ললাট মাধুর্যে অভিষিক্ত হইল। আমার মন বলিতে লাগিল, 'এই তো তাঁহার প্রসাদসুধার প্রবাহ।'

সকল সময় মন এমন করিয়া বলে না। অনেক সময় বাহিরের সৌন্দর্যকে আমরা বাহিরে দেখি—তাহাতে চোখ জুড়ায়, কিন্তু তাহাকে অন্তরে গ্রহণ করি না। ঠিক যেন অমৃতফলকে আঘ্রাণ করি, তাহার স্বাদ লই না।

কিন্তু, সৌন্দর্য যেদিন অন্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ স্পর্শ করে সেইদিন তাহার মধ্যে হইতে অসীম একেবারে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে। তখনি সমস্ত মন এক মুহূর্তে গান গাহিয়া উঠে, 'নহে, নহে, এ শুধু বর্ণ নহে, গন্ধ নহে—এই তো অমৃত, এই তাঁহার বিশ্বব্যাপী প্রসাদের ধারা।'

আকাশ ও সমুদ্রের মাঝখানে প্রভাতের আলোকে এই-যে অনির্বচনীয় মাধুর্য স্তরে স্তরে দিকে দিকে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা আছে কোন্‌খানে? ইহা কি জলে? ইহা কি বাতাসে? এই ধারণার অতীতকে কে ধারণ করিতে পারে!

ইহাই আনন্দ, ইহাই প্রসাদ। ইহাই দেশে দেশে, কালে কালে, অগণ্য প্রাণীর প্রাণ জুড়াইয়া দিতেছে, মন হরণ করিতেছে—ইহা আর কিছুতেই ফুরাইল না। ইহারই অমৃতস্পর্শে কত কবি কবিতা লিখিল, কত শিল্পী শিল্প রচনা করিল, কত জননীর হৃদয় স্নেহে গলিল, কত প্রেমিকের চিত্ত প্রেমে ব্যাকুল হইয়া উঠিল—সীমার বক্ষ রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভেদ করিয়া এই অসীমের অমৃত-ফোয়ারা কত লীলাতেই যে লোকে লোকে উৎসারিত প্রবাহিত হইয়া চলিল তাহার আর অন্ত দেখি না—অন্ত দেখি না। তাহা আশ্চর্য, পরমাশ্চর্য।

ইহাই আনন্দরূপমমৃতম্। রূপ এখানে শেষ কথা নহে, মৃত্যু এখানে শেষ অর্থ নহে। এই-যে রূপের মধ্য দিয়া আনন্দ, মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমৃত। শুধুই রূপের মধ্যে আসিয়া মন ঠেকিল, মৃত্যুর মধ্যে আসিয়া চিন্তা ফুরাইল, তবে জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া কী পাইলাম! বস্তুকে দেখিলাম, সত্যকে দেখিলাম না!

আমার কি কেবলই চোখ আছে, কান আছে? আমার মধ্যে কি সত্য নাই, আনন্দ নাই? সেই আমার সত্য দিয়া আনন্দ দিয়া যখন পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে জগতের দিকে চাহিয়া দেখি তখনি দেখিতে পাই, সম্মুখে আমার এই তরঙ্গিত সমুদ্র—এই প্রবাহিত বায়ু—এই প্রসারিত আলোক—বস্তু নহে, ইহা সমস্তই আনন্দ, সমস্তই লীলা, ইহার সমস্ত অর্থ একমাত্র তাঁহারই মধ্যে আছে। তিনি এ কী দেখাইতেছেন, কী বলিতেছেন, আমি তাহার কী-ই বা জানি! এই আকাশপ্লাবী আনন্দের সহস্রলক্ষ ধারা যেখানে এক মহাস্রোতে মিলিয়া আবার তাঁহারই এই হৃদয়ের মধ্যে ফিরিয়া যাইতেছে সেইখানে মুহূর্তকালের জন্য দাঁড়াইতে পারিলে এই সমস্ত-কিছুর মহৎ অর্থ—ইহার পরম পরিণামটিকে দেখিতে পাইতাম। এই-যে অচিন্তনীয় শক্তি, এই-যে অবর্ণনীয় সৌন্দর্য, এই-যে অপরিসীম সত্য, এই-যে অপরিমেয় আনন্দ ইহাকে যদি কেবল মাটি এবং জল বলিয়া জানিয়া গেলাম তবে সে কি ভয়ানক ব্যর্থতা, কী মহতী বিনষ্টি। নহে, নহে, এই তো তাঁহার প্রসাদ, এই তো তাঁহার প্রকাশ, এই তো আমাকে স্পর্শ করিতেছে, আমাকে বেষ্টন করিতেছে, আমার চৈতন্যের তারে তারে সুর বাজাইতেছে, আমাকে বাঁচাইতেছে, আমাকে জাগাইতেছে, আমার মনকে বিশ্বের নানা দিক দিয়া ডাক দিতেছে, আমাকে পলে পলে যুগযুগান্তরে পরিপূর্ণ করিতেছে; শেষ নাই, কোথাও শেষ নাই, কেবলই আরও আরও আরও; তবু সেই এক, কেবলই এক, সেই আনন্দময়

অমৃতময় এক: সেই অতল অকূল অখণ্ড নিস্তব্ধ নিঃশব্দ সুগম্ভীর এক— কিন্তু, কত তাহার ঢেউ, কত তাহার কলসংগীত!

প্রাণ ভরিয়ে, তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ!
তব ভুবনে, তব ভবনে
মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান!
আরো আলো, আরো আলো
মোর নয়নে, প্রভু, ঢালো!
সুরে সুরে বাঁশি পুরে
তুমি আরো আরো আরো দাও তান!
আরো বেদনা, আরো বেদনা,
মোরে আরো আরো দাও চেতনা!
দ্বার ছুটায়ে, বাধা টুটায়ে
মোরে করো ত্রাণ, মোরে করো ত্রাণ!
আরো প্রেমে, আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক নেমে!
সুধাধারে আপনারে
তুমি আরো আরো আরো করো দান।

লোহিতসমুদ্র
২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

দুই ইচ্ছা

কেবল মানুষই বলে, আশার অন্ত নাই। পৃথিবীর আর-কোনো জীব এমন কথা বলে না। আর-সকল প্রাণী প্রকৃতির একটা সীমার মধ্যে প্রাণ ধারণ করে এবং তাহার মনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাও সেই সীমাকে মানিয়া চলে। জন্তুদের আহার বিহার নিজের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সীমাকে লঙ্ঘন করিতে চায় না। এক জায়গায় তাহাদের সাধ মেটে এবং সেখানে তাহারা ক্ষান্ত হইতে জানে। অভাব পূর্ণ হইলে তাহাদের ইচ্ছা আপনি থামিয়া যায়, তাহার পরে আবার সেই ইচ্ছাকে তাড়না করিয়া জাগাইবার জন্য তাহাদের দ্বিতীয় আর-একটা ইচ্ছা নাই।

মানুষের প্রকৃতিতে আশ্চর্য এই দেখা যায়, একটা ইচ্ছার উপর সওয়ার হইয়া আর-একটা ইচ্ছা চাপিয়া আছে। পেট ভরিয়া গেলে খাইবার ইচ্ছা যখন আপনি মিটিয়া যায়, তখনো সেই ইচ্ছাকে জোর করিয়া জাগাইয়া রাখিবার জন্য মানুষের আর-একটা ইচ্ছা তাগিদ করিতে থাকে। সে কোনোমতে চাট্‌নি খাইয়া, ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, আহারের অবসন্ন ইচ্ছাকে প্রয়োজনের ঊর্ধ্বেও চালনা করিতে থাকে।

ইহাতে মানুষের যথেষ্ট ক্ষতি করে। কারণ, ইহা স্বাভাবিক ইচ্ছা নহে। স্বাভাবিক ইচ্ছা সহজেই আপন প্রাকৃতিক স্বভাবের সীমার মধ্যে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। আর, মানুষের এই অস্বাভাবিক ইচ্ছা কিছুতেই তৃপ্তি মানিতে চায় না। তাহার মধ্যে একটা কী আছে যে কেবলই বলিতেছে,— আরও, আরও, আরও!

কিন্তু, যাহাতে মানুষের ক্ষতি করিতে পারে সে-ইচ্ছা মানুষের থাকে কেন। নিজের এই দুরন্ত ইচ্ছাটার দিকে তাকাইয়াই মানুষ বিশ্বব্যাপারে একটা শয়তানের কল্পনা করিয়াছে। য়িহুদি পুরাণের প্রথম নরনারী যখন স্বর্গোদ্যানে ছিল তখন ঈশ্বর তাহাদের ইচ্ছাকে প্রকৃতির সীমার

মধ্যে বাঁধিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, 'ইহার মধ্যেই সন্তুষ্ট থাকিয়ো। প্রাণের রাজ্যই তোমাদের রহিল, জ্ঞানের রাজ্যে লোভ দিয়ো না।' স্বর্গোদ্যানের প্রত্যেক জীবজন্তুই সেই সন্তোষের সীমার মধ্যে বন্ধ রহিল; কেবল মানুষই বলিল, 'যাহা পাওয়া গেছে তাহার চেয়ে আরও পাওয়া চাই।' এই যে আরো'র দিকে সে পা বাড়াইল এ বড়ো বিষম রাজ্য। এখানে স্বাভাবিক পরিতৃপ্তির কোনো সীমা কোথাও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া নাই, এইজন্য কোন্ দিকে কতদূর পর্যন্ত যে যাওয়া যায় তাহার পরামর্শদাতা পাওয়া শক্ত। এইজন্য এই অতৃপ্তির পথহীন রাজ্যে মরিবার আশঙ্কা চারি দিকেই বিকীর্ণ। এমন ভয়ানক ক্ষেত্রে মানুষকে দুর্নিবার বেগে যে টানিয়া আনিল মানুষ তাহাকে গালি দিয়া বলিল শয়তান।

কিন্তু, রাগই করি আর যাই করি, জগতে শয়তানকে তো মানিতে পারি না। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, মানুষের এই-যে ইচ্ছার উপরে আরো'র জন্য আরও একটা ইচ্ছা ইহা তাহার বাহিরের দিক হইতে একটা শত্রুর আক্রমণ নহে। ইহাকে মানুষ রিপু বলে বলুক, কিন্তু এই ইচ্ছাই তাহার যথার্থ মানবস্বভাবগত ইচ্ছা। সুতরাং যতক্ষণ এই ইচ্ছাকে সে জয়ী করিতে না পারিবে ততক্ষণ তাহার কিছুতেই শান্তি নাই— ততক্ষণ তাহাকে কেবলই আঘাত খাইয়া খাইয়া ঘুরিয়া মরিতে হইবে।

কিন্তু, এই আরো'র ইচ্ছাকে সে জয়ী করিবে কেমন করিয়া। আহার করিলে পেট তাহার ভরিবেই, ভোগ করিলে এক জায়গায় তাহার নিবৃত্তিতে আসিয়া ঠেকিতেই হইবে— আরো'র ইচ্ছাকে সেখানে কোনো একটা সীমায় আসিয়া হার মানিতেই হইবে। শুধু হার মানা নয়, সে জায়গায় সে দুঃখ পাইবে এবং দুঃখ ঘটাইবে। ব্যাধি আসিবে, বিকৃতি আসিবে, সে নিজেকে এবং অন্যকে বাধা দিতে থাকিবে। কেননা, প্রকৃতি যেখানে সীমা টানিয়াছেন তাহাকে লঙ্ঘন করিতে গেলেই শাস্তি আছে।

শুধু তাই নয়। প্রকৃতির সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আমাদের এই আরো'র ইচ্ছাকে দৌড় করাইতে গেলেই পরস্পরের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতে হয়। যেটুকু আমার আছে তাহার চেয়ে বেশি লইতে গেলেই যেটুকু তোমার আছে তাহার উপর হাত দিতে হয়। তখন, হয় গোপনে ছলনা নয় প্রকাশ্যে গায়ের জোর আশ্রয় করিতে হয়। তখন দুর্বলের মিথ্যাচার ও প্রবলের দৌরাত্ম্যে সমাজ লণ্ডভণ্ড হইতে থাকে।

এমনি করিয়াই পাপ আসে, বিনাশ আসে। কিন্তু, এই পাপ যদি না আসিত তবে মানুষ পথ দেখিতে পাইত না। এই আরো'র অতৃপ্তি যেখানে তাহাকে টানিয়া লইয়া যায় সেখানে যদি পাপের আগুন জ্বলে, তবে ঘোড়াটাকে কোনোমতে বাগ মানাইয়া ফিরাইয়া আনিবার কথা মনে আসে। এইজন্য মনুষ্যলোকে অন্যান্য সকল শিক্ষার উপরে সেই সাধনাটা প্রচলিত যাহাতে ঐ আরো'র ইচ্ছাটাকে বশে আনা যায়। কেননা, মানুষকে ঈশ্বর ঐ একটা ভয়ংকর বাহন দিয়াছেন, ও আমাদের কোথায় লইয়া গিয়া যে ফেলে তাহার ঠিকানা নাই। উহার মুখে লাগাম পরাও, উহাকে চালাইতে শিখ। কিন্তু তাই বলিয়া উহার দানাপানি একেবারে বন্ধ করিয়া উহাকে মারিয়া ফেলিলে চলিবে না। কেননা, এই আরো'র ইচ্ছাই মানুষের যথার্থ বাহন।

প্রয়োজন-সাধনের ইচ্ছা জন্তুদের বাহন। এইটে না থাকিলে তাহাদের জীবনযাত্রা একেবারেই চলিত না। এই ইচ্ছাটাই প্রাকৃতিক জীবনের মূল ইচ্ছা। ইহাই দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা যেখানে বাধা পায় সেইখানেই জন্তুদের দুঃখ, যেখানে তাহার পূরণ হয় সেইখানেই তাহাদের সুখ। তাই দেখা যায়, জন্তুদের সুখদুঃখ আছে, কিন্তু পাপপুণ্য নাই।

কিন্তু মানুষের মধ্যে এই-যে আরো'র ইচ্ছা ইহা আরামের ইচ্ছা নহে, সুখের ইচ্ছা নহে, বস্তুত ইহা দুঃখেরই ইচ্ছা। মানুষ যে কেবলই প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া আপন জ্ঞান প্রেম ও শক্তি-রাজ্যের উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু আবিষ্কার করিবার জন্য বারংবার বাহির হইয়া পড়িতেছে, ইহা তাহার সুখের সাধনা নহে। ইহা তাহার কোনো বর্তমান প্রয়োজন-সাধনের ইচ্ছা নহে।

বস্তুত মানুষের মধ্যে এই-যে দুই স্তরের ইচ্ছা আছে ইহার মধ্যে একটা প্রয়োজনের ইচ্ছা, আর-একটা অপ্রয়োজনের ইচ্ছা। একটা যাহা না হইলে কিছুতেই চলে না তাহার ইচ্ছা, এবং অন্যটা যাহা না হইলে অনায়াসেই চলে তাহার ইচ্ছা। আশ্চর্য এই যে, মানুষের মনে এই দ্বিতীয় ইচ্ছাটার শক্তি এমন প্রবল যে, সে যখন জাগিয়া উঠে তখন সে এই প্রথম ইচ্ছাটাকে একেবারে ছারখার করিয়া দেয়। তখন সে সুখ-সুবিধা-প্রয়োজনের কোনো দাবিতেই একেবারে কর্ণপাত করে না। তখন সে বলে, 'আমি সুখ চাহি না, আমি আরোকেই চাই; সুখ আমার সুখ নহে, আরোই আমার সুখ।' তখন সে বলে, 'ভূমৈব সুখম্।'

সুখ বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ভূমা নহে। ভূমা সুখ নহে, আনন্দ। সুখের সঙ্গে আনন্দের প্রভেদ এই যে, সুখের বিপরীত দুঃখ, কিন্তু আনন্দের বিপরীত দুঃখ নহে। শিব যেমন করিয়া হলাহল পান করিয়াছিলেন, আনন্দ তেমনি করিয়া দুঃখকে অনায়াসেই গ্রহণ করে। এমন-কি, দুঃখের দ্বারাই আনন্দ আপনাকে সার্থক করে, আপনার পূর্ণতাকে উপলব্ধি করে। তাই দুঃখের তপস্যাই আনন্দের তপস্যা।

তাই দেখিতেছি, অন্যান্য জন্তুদের ন্যায় মানুষের নীচের ইচ্ছাটা দুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছা, আর উপরের ইচ্ছাটা দুঃখকে আত্মসাৎ করিয়া আনন্দলাভের ইচ্ছা। এই ইচ্ছাই কেবলই আমাদিগকে বলিতেছে, 'নাল্পে সুখমস্তি, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।'

তাই প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে আপন সহজ বোধটুকু লইয়া জন্তু দুঃখনিবৃত্তিচেষ্টার সনাতন গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ হইয়া রহিল। মানুষ তাহার মানসক্ষেত্রে জ্ঞানপ্রেমশক্তির কোনো সীমাতেই বদ্ধ হইতে চাহিল না; সে বলিল, 'অভ্যাসকে নহে, সংস্কারকে নহে, প্রথাকে নহে, আমি ভূমাকে জানিব।'

তাই যদি হয় তবে এই আরোর ইচ্ছাকে, এই আনন্দের ইচ্ছাকে, এত করিয়া বশে আনিবার জন্য মানুষের এমন প্রাণপণ চেষ্টার প্রয়োজন কী ছিল। এই প্রকাণ্ড ইচ্ছার প্রবল স্রোতে চোখ বুজিয়া আত্মসমর্পণ করিলেই তো মানুষের মনুষ্যত্ব সার্থক হইত।

ইচ্ছাকে বল্‌গাবদ্ধ করিবার প্রধান কারণ এই যে, দুটা ইচ্ছার অধিকারনির্ণয় লইয়া মানুষকে বিষম সংকটে পড়িতে হইয়াছে। আমাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের একটা ক্ষেত্র আছে, সেখানে আমরা সীমাবদ্ধ। সেখানে আমাদের বাসনাকে তাহার সহজ সীমার চেয়ে জোর করিয়া টানিয়া বাড়াইতে গেলেই বিপদ ঘটিবে। এই সীমানার বেড়াটা কিছু পরিমাণে স্থিতিস্থাপক, এইজন্য কিছু দূর পর্যন্ত তাহা টান সয়। দুঃসাহসে ভর করিয়া সেই টান কেবলই বাড়াইতে গেলে, রাবণের স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংস হয়, ব্যাবিলনের সৌধচূড়া ভাঙিয়া পড়ে; আমাদের আরও ইচ্ছার মন্থন-দণ্ডকে ঐদিকেই পাক দিতে গেলে ব্যাধি বিকৃতি ও পাপের বিষ মথিত হইয়া উঠে।

দেখা যাইতেছে, মানুষের অহমের দিকটাই সংকীর্ণ। সেখানে অতিরিক্ত পরিমাণে যাহাই গ্রহণ করিতে চাও তাহাই বোঝা হইয়া উঠে। নিজের সুখ, নিজের স্বার্থ, নিজের ক্ষমতাকে অপরিসীম করিবার চেষ্টা আত্মহত্যার চেষ্টা। ও জায়গায় ভূমার ভর একেবারেই সয় না। আহারে বিহারে স্বার্থসাধনে ভূমা অতি বীভৎস।

এই কারণে মানুষের এই আরোর ইচ্ছাটা যখন মত্ত হস্তীর মতো তাহার ক্ষণভঙ্গুর অহমের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন তাহার বিষম বিপদ। কেবল যদি তাহাতে নিজের ও অন্যের দুঃখ আনিত তাহা হইলেও কথা ছিল না। কিন্তু, ইহার দুর্গতি তাহার চেয়ে আরও অনেক বেশি। ইহাতে পাপ আনে; দুঃখের পরিমাপে তাহার পরিমাপ নহে। কারণ, পূর্বেই আভাস দিয়াছি, কেবলমাত্র দুঃখের দ্বারা মানুষের ক্ষতি হয় না—এমন-কি, দুঃখের দ্বারা মানুষের মঙ্গল হইতে পারে—কিন্তু পাপই মানুষের পরম ক্ষতি।

ইহার উল্টা দিকটাও দেখো। মানুষের প্রয়োজনের ইচ্ছা, অর্থাৎ সীমাবদ্ধ সাংসারিক ইচ্ছা যখন স্বার্থের ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পরমার্থের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন সেও বড়ো কুৎসিত। তখন

সে কেবলই পুণ্যের হিসাব রাখিতে থাকে। যাহা পূর্ণ-আনন্দ, যাহা সকল ফলাফলের অতীত, তাহাকে ফলাফলের অঙ্কে গুণভাগ করিয়া গণনা করিতে থাকে। এবং সেই গণনার উপর নির্ভর করিয়া মানুষ অহংকৃত হইয়া উঠে, কেবলই বাহ্যিকতার জালে জড়াইয়া পড়ে এবং স্বার্থপর শুচিতাকে কৃপণের ধনের মতো সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে অত্যন্ত সাবধানে জমা করিয়া তুলিতে থাকে। তখন সে ভূমার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ সাংসারিকের মতো নিজের একটা বেড়া তুলিয়া দিয়া বৈষয়িকতার সৃষ্টি করে। ইহাও পাপের আর-এক মূর্তি। ইহা আধ্যাত্মিককে বাহ্যিক ও পরমার্থকে স্বার্থ করিয়া তোলা।

মানুষের মনে এই-যে একটা পাপের বোধ আসে সে জিনিসটা কী তাহা ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, আমাদের যে মহতী ইচ্ছা আমাদিগকে ভূমার দিকে লইয়া যাইবে তাহাকে ঠিক বিপরীত পথে ক্ষুদ্র অহমের অভিমুখে টানিয়া আনিলে কেবল যে দুঃখ ঘটে তাহা নহে— এমন-কি, স্থলবিশেষে দুঃখ না ঘটিতেও পারে— তাহাতে আমরা ভূমাকে হারাই। আমাদের বড়োর দিক, আমাদের সত্যের দিক, নষ্ট হইয়া যায়; জন্তুর পক্ষে তাহাতে কিছুই আসে যায় না, কিন্তু মানুষের পক্ষে তেমন বিনাশ আর-কিছু নাই। এই বিনাশের বোধ সকলের চিত্তে সমান নহে, এমন-কি, কারও কারও চিত্তে অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু, মোটের উপর সমগ্র মানবের মনে এই পাপের বোধ দুঃখবোধের চেয়ে অনেক বড়ো হইয়া আছে। এতই বড়ো যে বহু দুঃখের দ্বারা মানুষ এই পাপকে ক্ষয় করিতে চায়। পাপ-নামক শব্দের দ্বারা মানুষ নিজের যে একটি গভীরতম দুর্গতিকে ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে, ইহার দ্বারাই মানুষ আপনার সত্যতম পরিচয় দিয়াছে।

সে পরিচয়টি এই যে, সীমাবদ্ধ প্রকৃতির মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক বিহারক্ষেত্র নহে, অনন্তের মধ্যেই মানুষের আনন্দ; অহমের দিকই মানুষের চরম সত্যের দিক নহে, ব্রহ্মের দিকেই তাহার সত্য! মানুষ আপনার মধ্যে যে একটি পরম ইচ্ছাকে পাইয়াছে, যে-ইচ্ছা কোনোমতেই অল্পকে মানিতে চায় না, তাহা দুঃসহ তপস্যার মধ্য দিয়া জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পে সাহিত্যে মানুষের চিত্তকে আনন্দময় মুক্তির অভিমুখে কেবলই প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছে এবং তাহা প্রেম ভক্তি ও পবিত্রতায় মানুষের সমস্ত চেতনাধারাকে এক অপরিসীম অতলস্পর্শ অমৃতপারাবারের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছে। মানুষের সেই পরমগতিকে যাহা-কিছু বাধা দেয়, যাহা তাহাকে বিপরীত দিকে টানে তাহাই পাপ, তাহাই দুর্গতি, তাহাই তাহার মহতী বিনষ্টি।

লোহিতসমুদ্র
বুধবার। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

খেলা ও কাজ

ভূমধ্যসাগরের প্রথম ঘাট পোর্ট্-সৈয়দ। এইখান হইতে আমাদিগকে য়ুরোপের পারে পাড়ি দিতে হইবে। সন্ধ্যার সময় আমরা বন্দরে পৌঁছিলাম। শহরের বাতায়নগুলিতে তখন আলো জ্বলিয়াছে। আরোহীদিগকে ডাঙায় পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ছোটো ছোটো নৌকা এবং মোটর-বোট ঝাঁকে ঝাঁকে চারি দিকে আসিয়া আমাদের জাহাজ ঘিরিয়াছে। পোর্ট্-সৈয়দের দোকান-বাজার ঘুরিবার জন্য অনেকেই সেখানে নামিলেন। আমি সেই ভিড়ের মধ্যে নামিলাম না। জাহাজের রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। অন্ধকার সমুদ্র এবং অন্ধকার আকাশ— দুইয়ের সংগমস্থলে অল্প একটুখানি জায়গায় মানুষ আপনার আলো কয়টি জ্বালাইয়া রাত্রিকে একেবারে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছে।

পোর্ট্-সৈয়দে অনেকগুলি নূতন আরোহী উঠিবার কথা। পুরাতনের দল এই সংবাদে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। আর-সমস্ত নূতনকে মানুষ খুঁজিয়া বাহির করে, কিন্তু নূতন মানুষ! এমন উদ্‌বেগের বিষয় আর-কিছুই নাই। সে কাছে আসিলে তাহার সঙ্গে ভিতরে বাহিরে বোঝা-

পড়া করিয়া লইতেই হইবে। সে তো কেবলমাত্র কৌতূহলের বিষয় নহে। তাহার মন লইয়া সে অন্যের মনকে ঠেলাঠেলি করে। মানুষের ভিড়ের মতো এমন ভিড় আর নাই।

পোর্ট্-সৈয়দে যাহারা জাহাজে চড়িল তাহারা প্রায় সকলেই ফরাসি। আমাদের ডেক এখন মানুষে মানুষে ভরিয়া গিয়াছে। এখন পরস্পরের দেহতরী বাঁচাইয়া চলিতে হইলে রীতিমত মাঝিগিরির প্রয়োজন হয়।

সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত ডেকের উপর য়ুরোপীয় নরনারীদের প্রতিদিনের কালযাপন আমি আরও কয়েকবার দেখিয়াছি, এবারও দেখিতেছি। প্রথমটাই চোখে পড়ে, ইহারা সর্বদাই চঞ্চল হইয়া আছে। এতটা চাঞ্চল্য আমাদের অভ্যস্ত নহে। আমাদের গরম দেশে আমরা কোনোমতে ঠান্ডা থাকিতে চাই—চোখের সামনে অন্য কেহ অস্থিরতা প্রকাশ করিলেও আমাদের গরম বোধ হয়। 'চুপ করো, স্থির থাকো, মিছামিছি কাজ বাড়াইয়ো না'—ইহাই আমাদের সমস্ত দেশের অনুশাসন। আর, ইহারা কেবলই বলে, 'একটা-কিছু করা যাক।' এইজন্য ইহারা ছেলে বুড়া সকলে মিলিয়া কেবলই দাপাদাপি করিতেছে। হাসি গল্প খেলা আমোদের বিরাম নাই, অবসান নাই।

অভ্যাসের বাধা সরাইয়া দিয়া আমি যখন এই দৃশ্য দেখি আমার মনে হয়, আমি যেন বাহ্য প্রকৃতির একটা লীলা দেখিতেছি। যেন ঝরনা ঝরিতেছে, যেন নদী চলিতেছে, যেন গাছপালা বাতাসে মাতামাতি করিতেছে। আপনার সমস্ত প্রয়োজন সারিয়াও প্রাণের বেগ আপনাকে নিঃশেষ করিতে পারিতেছে না; তখন সে আপনার সেই উদ্‌বৃত্ত প্রাচুর্যের দ্বারা আপনাকেই আপনি প্রকাশ করিতেছে।

আমরা যখন ছোটো ছেলেকে কোথাও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই, তখন কিছু খেলনার আয়োজন রাখি; নহিলে তাহাকে শান্ত রাখা শক্ত হয়। কেননা, তাহার প্রাণের স্রোত তাহার প্রয়োজনের সীমাকে ছাপাইয়া চলিয়াছে। সেই উচ্ছলিত প্রাণের বেগ আপনার লীলার উপকরণ না পাইলে অধীর হইয়া উঠে। এইজন্যই ছেলেদের বিনা কারণে ছুটাছুটি করিতে হয়, তাহারা যে চেঁচামেচি করে তাহার কোনো অর্থই নাই এবং তাহাদের খেলা দেখিলে বিজ্ঞ ব্যক্তির হাসি আসে এবং কাহারও কাহারও বিরক্তি বোধ হয়। কিন্তু, তাহাদের এই খেলার উৎপাত আমাদের পক্ষে যত বড়ো উপদ্রব হউক, খেলা বন্ধ করিলে উপদ্রব আরও গুরুতর হইয়া উঠে সন্দেহ নাই।

এই-যে য়ুরোপীয় যাত্রীরা জাহাজে চড়িয়াছে, ইহাদের জন্যও কতরকম খেলার আয়োজন রাখিতে হইয়াছে তাহার আর সংখ্যা নাই। আমাদের যদি জাহাজ থাকিত তাহা হইলে তাস পাশা প্রভৃতি অত্যন্ত ঠান্ডা খেলা ছাড়া এ-সমস্ত দৌড়ধাপের খেলার ব্যবস্থা করার দিকে আমরা দৃকপাতমাত্র করিতাম না। বিশেষত কয়দিনের জন্য পথ চলার মুখে এ-সমস্ত অনাবশ্যক বোঝা নিশ্চয়ই বর্জন করিতাম এবং কেহ তাহাতে কিছু মনেও করিত না।

কিন্তু, য়ুরোপীয় যাত্রীদিগকে ঠান্ডা রাখিবার জন্য খেলা চাই। তাহাদের প্রাণের বেগের মধ্যে প্রাত্যহিক ব্যবহারের অতিরিক্ত মস্ত একটা পরিশিষ্ট ভাগ আছে, তাহাকে চুপ করিয়া বসাইয়া রাখিবে কে! তাহাকে নিয়ত ব্যাপৃত রাখা চাই। এইজন্য খেলনার পর খেলনা জোগাইতে হয় এবং খেলার পর খেলা সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখার প্রয়োজন।

তাই দেখি, ইহারা ছেলেবুড়ো কেবলই ছট্‌ফট্‌ এবং মাতামাতি করিতেছে। সেটা আমাদের পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক বলিয়া প্রথমটা কেমন অদ্ভুত ঠেকে। মনে ভাবি, বয়স্ক লোকের পক্ষে এ-সমস্ত ছেলেমানুষি নিরর্থক অসংযমের পরিচয়মাত্র। ছেলেদের খেলার বয়স বলিয়াই খেলা তাহাদিগকে শোভা পায়; কাজের বয়সে এতটা খেলার উৎসাহ অত্যন্ত অসংগত।

কিন্তু, যখন নিশ্চয় বুঝিতে পারি, য়ুরোপীয়ের পক্ষে এই চাঞ্চল্য এবং খেলার উদ্যম নিতান্তই স্বভাবসংগত তখন ইহার একটি শোভনতা দেখিতে পাই। ইহা যেন বসন্তকালের অনাবশ্যক প্রাচুর্যের মতো। যত ফল ধরিবে তাহার চেয়ে অনেক বেশি মুকুল ধরিয়াছে। কিন্তু, এই অনাবশ্যক ঐশ্বর্য না থাকিলে আবশ্যকে পদে পদে কৃপণতা ঘটিত।

ইহাদের খেলার মধ্যে কিছুমাত্র লজ্জার বিষয় নাই। কেননা, এই খেলা অলসের কালযাপন নহে—কেননা, আমরা দেখিয়াছি, ইহাদের প্রাণের শক্তি কেবলমাত্র খেলা করে না। কর্মক্ষেত্রে এই শক্তির নিরলস উদ্যম, ইহার অপ্রতিহত প্রভাব। কী আশ্চর্য ক্ষমতার সঙ্গে ইহারা সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া বিপুল কর্মজাল বিস্তার করিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাহার পশ্চাতে শরীর ও মনের কী অপরিমিত অধ্যবসায় নিযুক্ত। সেখানে কোথাও কিছুমাত্র জড়ত্ব নাই, শৈথিল্য নাই; সতর্কতা সর্বদা জাগ্রত; সুযোগের তিলমাত্র অপব্যয় দেখা যায় না।

যে শক্তি কর্মের উদ্যোগে আপনাকে সর্বদা প্রবাহিত করিতেছে সেই শক্তিই খেলার চাঞ্চল্যে আপনাকে তরঙ্গিত করিতেছে। শক্তির এই প্রাচুর্যকে বিজ্ঞের মতো অবজ্ঞা করিতে পারি না। ইহাই মানুষের ঐশ্বর্যকে নব নব সৃষ্টির মধ্যে বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। ইহা নিজেকে দিকে দিকে অনায়াসে অজস্র ত্যাগ করিতেছে, সেইজন্যই নিজেকে বহুগুণে ফিরিয়া পাইতেছে। ইহাই সাম্রাজ্যে বাণিজ্যে বিজ্ঞানে সাহিত্যে কোথাও কোনো সীমা মানিতেছে না—দুর্লভের রুদ্ধ দ্বারে অহোরাত্র প্রবল বেগে আঘাত করিতেছে।

এই যে উদ্যত শক্তি, যাহার এক দিকে ক্রীড়া ও অন্য দিকে কর্ম, ইহাই যথার্থ সুন্দর। রমণীর মধ্যে যেখানে আমরা লক্ষ্মীর প্রকাশ দেখিতে পাই সেখানে আমরা এক দিকে দেখি সাজসজ্জা লীলামাধুর্য, আর-এক দিকে দেখি অক্লান্ত কর্মপরতা ও সেবানৈপুণ্য। এই উভয়ের বিচ্ছেদই কুশ্রী। বস্তুত, শক্তিই সৌন্দর্যরূপে আপনাকে প্রকাশ করে, আর শক্তিহীনতাই শৈথিল্য ও অব্যবস্থার মধ্য দিয়া কেবলই কদর্যতার পঙ্কের মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করে। কদর্যতাই মানুষের শক্তির পরাভব; এইখানেই অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, অন্ধসংস্কার; এইখানেই মানুষ বলে, 'আমি হাল ছাড়িয়া দিলাম, এখন অদৃষ্টে যাহা করে!' এইখানেই পরস্পরে কেবল বিচ্ছেদ ঘটে, আরব্ধ কর্ম শেষ হয় না, এবং যাহাই গড়িয়া তুলিতে চাই তাহাই বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। শক্তিহীনতাই যথার্থ শ্রীহীনতা।

আমি জাহাজের ডেকের উপরে ইহাদের প্রচুর আমোদ-আহ্লাদের মধ্যেও ইহাই দেখিতে পাই। ইহাদের সমস্ত খেলাধুলার ভিতরে ভিতরে স্বভাবতই একটি বিধান দেখা দেয়। এইজন্য ইহাদের আমোদ-প্রমোদও কোনোমতে বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে না। যথাসময়ে যথাবিহিত ভদ্রবেশ প্রত্যেককেই পরিয়া আসিতে হয়। পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের ভিতরে ভিতরে নিয়ম প্রচ্ছন্ন আছে; সেই নিয়মের সীমা লঙ্ঘন করিবার জো নাই। বিধানের উপরে নির্ভর করিয়া থাকে বলিয়াই ইহাদের আমোদ-আহ্লাদ এমন উচ্ছ্বসিত প্রবল বেগে বিপত্তি বাঁচাইয়া প্রবাহিত হইতে পারে।

এই ডেকের উপরে আর কেহ নহে, কেবল আমাদের দেশের লোকে মিলিত হইয়াছে, সে দৃশ্য আমি মনে মনে কল্পনা না করিয়া থাকিতে পারি না। প্রথমেই দেখা যাইত, কোনো একই ব্যবস্থা দুইজনের মধ্যে খাটিত না। আমাদের অভ্যাস ও আচরণ পরস্পরের সঙ্গে আপনার মিল করিতে জানে না। য়ুরোপীয়দের মধ্যে একটা জায়গা আছে যেখানে ইহারা স্বতন্ত্র, আর-একটা জায়গা আছে যেখানে ইহারা সকলের। যেখানে ইহারা স্বতন্ত্র সে জায়গাটা ইহাদের প্রাইভেট। সেখানটা প্রচ্ছন্ন। সেখানে সকলের অবারিত অধিকার নাই এবং সেই অনধিকারকে সকলেই সহজেই মানিয়া চলে। সেখানে তাহারা নিজের ইচ্ছা ও অভ্যাস-অনুসারে আপনার ব্যক্তিগত জীবন বহন করে। কিন্তু, যখনই সেখান হইতে তাহারা বাহির হইয়া আসে তখনি সকলের বিধানের মধ্যে ধরা দেয়—সে জায়গায় কোনোমতেই তাহারা আপনার প্রাইভেটকে টানিয়া আনে না। এই দুই বিভাগ সুস্পষ্ট থাকাতেই পরস্পর মেলামেশা ইহাদের পক্ষে এত সহজ ও সুশৃঙ্খল। আমাদের মধ্যে এই বিভাগ নাই বলিয়া সমস্ত এলোমেলো হইয়া যায়, কেহ কোনোখানে সীমা মানিতে চায় না। আমরা এই ডেক পাইলে নিজের প্রয়োজন-মত চলিতাম। পোঁটলা-পুঁটলি যেখানে সেখানে ছড়াইয়া রাখিতাম। কেহ বা দাঁতন করিতাম, কেহ বা যেখানে খুশি বিছানা পাতিয়া পথ রোধ করিয়া নিদ্রা দিতাম, কেহ বা হুঁকার জল ফিরাইতাম ও কলিকাটা উপুড় করিয়া ছাই ও পোড়া তামাক যেখানে হোক

একটা জায়গায় ঢালিয়া দিতাম, কেহ বা চাকরকে দিয়া শরীর দলাইয়া সশব্দে তেল মাখিতে থাকিতাম। ঘটিবাটি জিনিসপত্র কোথায় কী পড়িয়া থাকিত তাহার ঠিকানা পাওয়া যাইত না, এবং ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির অন্ত থাকিত না। ইহার মধ্যে যদি কেহ নিয়ম ও শৃঙ্খলা আনিতে চেষ্টামাত্র করিত তাহা হইলে অত্যন্ত অপমান বোধ করিতাম এবং মহা রাগারাগির পালা পড়িয়া যাইত। তাহার পরে অন্য লোকের যে লেখাপড়া কাজকর্ম থাকিতে পারে, কিংবা মাঝে মাঝে সে তাঁহার অবসর ইচ্ছা করিতে পারে, সে সম্বন্ধে কাহারও চিন্তামাত্র থাকিত না; হঠাৎ দেখা যাইত যে বইটা পড়িতেছিলাম সেটা আর-একজন টানিয়া লইয়া পড়িতেছে; আমার দূরবীনটা পাঁচজনের হাতে হাতে ফিরিতেছে, সেটা আমার হাতে ফিরাইয়া দিবার কোনো তাগিদ নাই; অনায়াসেই আমার টেবিলের উপর হইতে আমার খাতাটা লইয়া কেহ টানিয়া দেখিতেছে, বিনা আহ্বানে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গল্প জুড়িয়া দিতেছে, এবং রসিক ব্যক্তি সময় অসময় বিচার না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতেছে— কণ্ঠে স্বরমাধুর্যের অভাব থাকিলেও কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করিতেছে না। যেখানে যেটা পড়িত সেখানে সেটা পড়িয়াই থাকিত। যদি ফল খাইতাম তবে তাহার খোসা ও বিচি ডেকের উপরেই ছড়ানো থাকিত, এবং ঘটিবাটি চাদর মোজা গলাবন্দ হাজার বার করিয়া খোঁজাখুঁজি করিতে করিতেই দিন কাটিয়া যাইত।

ইহাতে যে কেবল পরস্পরের অসুবিধা ঘটিত তাহা নহে, সুখ স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য চারি দিক হইতে অন্তর্ধান করিত। ইহাতে আমোদ-আহ্লাদও অব্যাহত হইত না এবং কাজকর্মের তো কথাই নাই। যে শক্তি কর্মের মধ্যে নিয়মকে মানিয়া সফল হয় সেই শক্তিই আমোদ-আহ্লাদের মধ্যেও নিয়মকে রক্ষা করিয়া তাহাকে সরস ও সুন্দর করিয়া তোলে। যোদ্ধা যেমন স্বভাবতই আপনার তলোয়ারকে ভালোবাসিয়া ধারণ করে শক্তিমান তেমনি স্বভাবতই নিয়মকে আন্তরিক প্রীতির সহিত রক্ষা করে। কারণ, ইহাই তাহার অস্ত্র; শক্তি যদি নিয়মকে না মানে তবে আপনাকেই ব্যর্থ করে।

শক্তি এই-যে নিয়মকে মানে সে কেবল নিয়মকে মানিবার জন্য নহে, আপনাকেই মানিবার জন্য। আর শক্তিহীনতা যখন নিয়মকে মানে তখন সে নিয়মকেই মানে; তখন সে ভয়ে হোক লোভে হোক, বা কেবলমাত্র চিরাভ্যাসের জড়ত্ব-বশত হোক, নিয়মকে নতজানু হইয়া শিরোধার্য করিয়া লয়। কিন্তু, যেখানে সে বাধ্য নয়, যেখানে কেবল নিজের খাতিরেই নিয়ম স্বীকার করিতে হয়, দুর্বলতা সেইখানেই নিয়মকে ফাঁকি দিয়া নিজেকে ফাঁকি দেয়। সেখানেই তাহার সমস্ত কুশ্রী ও যদৃচ্ছাকৃত।

যে দেশে মানুষকে বাহিরের শাসন চালনা করিয়া আসিয়াছে, যেখানেই মানুষের স্বাধীন শক্তিকে মানুষ শ্রদ্ধা করে নাই এবং রাজা গুরু ও শাস্ত্র বিনা যুক্তিতে মানুষকে তাহার হিতসাধনে বলপূর্বক প্রবৃত্ত করিয়াছে, সেখানেই মানুষ আত্মশক্তির আনন্দে নিয়মপালনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। মানুষকে বাঁধিয়া কাজ করানো একবার অভ্যাস করাইলেই, বাঁধন কাটিয়া আর তাহার কাছে কাজ পাওয়া যায় না। এইজন্য যেখানে আমরা নিয়ম মানি সেখানে দাসের মতো মানি, যেখানে মানি না সেখানে দাসের মতোই ফাঁকি দিই। সেইজন্য যখন আমাদের সমাজে শাসন ছিল তখন জলাশয়ে জল, চতুষ্পাঠীতে শিক্ষা, পান্থশালায় আশ্রয় সহজে মিলিত। যখন সামাজিক বাহ্যশাসন শিথিল হইয়াছে তখন আমাদের রাস্তা নাই, ঘাট নাই, জলাশয়ে জল নাই— সাধারণের অভাব দূর ও লোকের হিতসাধন করিবার কোনো স্বাভাবিক শক্তি কোথাও উদ্‌বোধিত হইয়া কাজ করিতেছে না। হয় আমরা দৈবকে নিন্দা করিতেছি নয় সরকার-বাহাদুরের মুখ চাহিয়া আছি।

কিন্তু, এ-সকল বিষয়ে কোন্‌টা যে কার্য এবং কোন্‌টা কারণ তাহা ঠাহর করিয়া বলা শক্ত। যাহারা বাহিরের নিয়মকে অবাধে শৃঙ্খল করিয়া পরে, বাহিরের নিয়ম তাহাদিগকেই বাঁধে; যাহারা নিজের শক্তির প্রাবল্যে সে নিয়মকে কোনোমতেই অন্ধভাবে স্বীকার করিতে পারে না তাহারাই

আপনার আনন্দে আপনার নিয়মকে উদ্ভাবিত করিবার অধিকার লাভ করে। নতুবা, এই অধিকারকে হাতে তুলিয়া দিলেই ইহাকে ব্যবহার করা যায় না। স্বাধীনতা বাহিরের জিনিস নহে, ভিতরের জিনিস, সুতরাং তাহা কাহারও কাছ হইতে চাহিয়া পাইবার জো নাই। যতক্ষণ নিজের স্বাভাবিক শক্তির দ্বারা আমরা সেই স্বাধীনতাকে লাভ না করি ততক্ষণ নানা আকারে বাহিরের শাসন আমাদের চোখে ঠুলি দিয়া ও গলায় দড়ি বাঁধিয়া চালনা করিবেই। ততক্ষণ আমরা মুখে যাহাই বলি, কাজের বেলায় আপনি আপনা হইতেই যেখানে সুযোগ পাইব সেইখানেই অন্যের প্রতি অনুশাসন প্রবর্তিত করিতে চাহিব। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার-লাভের বেলায় য়ুরোপীয় ইতিহাসের বচন আওড়াইব, আর সমাজনৈতিক গৃহনৈতিক ক্ষেত্রে কেবলই জ্যেষ্ঠ যিনি তিনি কনিষ্ঠের ও প্রবল যিনি তিনি দুর্বলের অধিকারকে সংকুচিত করিতে থাকিব। আমরা যখন কাহারও ভালো করিতে চাহিব সে আমারই নিজের মতে, আমারই নিজের নিয়মে— যাহার ভালো করিতে চাই তাহাকে তাহার নিজের নিয়মে ভালো হইতে দিতে আমরা সাহস করি না। এমনি করিয়া দুর্বলতাকে আমরা অস্থিমজ্জার মধ্যে পোষণ করিতে থাকি, অথচ সবলের অধিকারকে আমরা বাহিরের দিক হইতে স্বপ্নলব্ধ দৈবসম্পত্তির মতো লাভ করিতে চাই।

এইজন্যই পরম বেদনার সহিত দেখিতেছি, যেখানেই আমরা সম্মিলিত হইয়া কোনো কাজ করিতে গিয়াছি, যেখানেই নিজেদের নিয়মের দ্বারা নিজেদের কোনো প্রতিষ্ঠানকে চালনা করিবার সুযোগ পাইয়াছি, সেখানেই পদে পদে বিচ্ছেদ ও শৈথিল্য প্রবেশ করিয়া সমস্ত ছারখার করিয়া দিতেছে। বাহিরের কোনো শত্রুর হাত হইতে নহে, কিন্তু অন্তরের এই শক্তিহীনতা শ্রীহীনতা হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করা, ইহাই আমাদের একটিমাত্র সমস্যা। যে নিয়ম মানুষের গলার হার তাহাকে পায়ের বেড়ি করিয়া পরিব না, এই কথা একদিন আমাদিগকে সমস্ত মনের সঙ্গে বলিতে হইবে। এই কথা স্পষ্ট করিয়া জানিতে হইবে যে, সত্যকে যেমন করিয়া হউক মানিতেই হইবে— কিন্তু সত্যকে যখন অন্তরের মধ্যে মানি তখনি তাহা আনন্দ, বাহিরে যখন মানি তখনি তাহা দুঃখ। অন্তরে সত্যকে মানিবার শক্তি যখন না থাকে তখনি বাহিরে তাহার শাসন প্রবল হইয়া উঠে। সেজন্য যেন বাহিরকেই ধিক্‌কার দিয়া নিজেকে অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি দিবার চেষ্টা না করি।

সমাজভেদ

আমরা যখন বিলাতে যাত্রা করি তখন সেটা কেবল দেশ হইতে দেশান্তরে যাওয়া নয়, আমাদের পক্ষে সেটা একটা নূতন সংসারে প্রবেশ করা। জীবনযাত্রার বাহ্য প্রভেদগুলাতে বড়ো-একটা-কিছু আসে-যায় না। আমাদের সঙ্গে বসনে ভূষণে আহারে বিহারে বিদেশীর সাদৃশ্য থাকিবে না সেটা তো ধরা কথা, সুতরাং সেখানে বিশেষ বাধে না। কিন্তু, কেবল জীবনযাত্রায় নহে, জীবনতত্ত্বে একটা জায়গায় আমাদের গভীরতর অমিল আছে—সেইখানেই দিকনির্ণয় করা হঠাৎ আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে।

জাহাজে উঠিয়াই আমরা প্রথম সেটা অনুভব করিতে শুরু করি। বুঝিতে পারি, এখন হইতে আমাদিগকে আর-এক সংসারের নিয়মে চলিতে হইবে। হঠাৎ এতখানি পরিবর্তন মানুষের পক্ষে অপ্রিয়—এইজন্যই আমরা সেটাকে ভালো করিয়া বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করি না, কোনোমতে মানিয়া চলি কিংবা মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলি— ইহাদের চাল-চলনটা অত্যন্ত বেশি কৃত্রিম।

আসল কথা, ইহাদের সঙ্গে আমাদের সামাজিক অবস্থার যে প্রভেদ আছে সেইটেই গুরুতর। পরিবার এবং পল্লীমণ্ডলীর সীমায় আসিয়া আমাদের সমাজ থামিয়াছে। সেই সীমার মধ্যেই পরস্পরের ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলা বাঁধা নিয়ম আছে। সেই সীমার দিকে দৃষ্টি

রাখিয়াই আমাদের কী করিতে আছে এবং কী করিতে নাই তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেই নিয়মগুলির মধ্যে অনেক কৃত্রিমতাও আছে, অনেক স্বাভাবিকতাও আছে।

কিন্তু, যে সমাজের প্রতি লক্ষ করিয়া এই নিয়মগুলি তৈরি হইয়াছে সেই সমাজের পরিধি বড়ো নহে এবং সে সমাজ আত্মীয়সমাজ। সুতরাং, আমাদের আদবকায়দাগুলি ঘোরো রকমের। বাবার সামনে তামাক খাইতে নাই, গুরুঠাকুরের পায়ের ধুলা লইয়া তাঁহাকে দক্ষিণা দেওয়া কর্তব্য, ভাসুরকে দেখিলে মুখ আবৃত করা চাই এবং মামাশ্বশুরের নিকটসংস্রব বর্জনীয়। এই পরিবার বা পল্লীমণ্ডলীর বাহিরে যে নিয়মের ধারা চলিয়াছে তাহা মোটের উপর বর্ণভেদমূলক।

বলিতে গেলে বর্ণাশ্রমের সূত্র আমাদের পল্লীসমাজ ও পরিবারমণ্ডলীকে হারের মতো গাঁথিয়া তুলিয়াছে। আমরা একটা সমাপ্তিতে আসিয়াছি। ভারতবর্ষ তাহার সমাজে সমস্যার একটা সম্পূর্ণ সমাধান করিয়া বসিয়াছে এবং মনে করিয়াছে—এই ব্যবস্থাকে চিরকালের মতো পাকা করিয়া রাখিতে পারিলেই তাহার আর-কোনো ভাবনা নাই। এইজন্য বর্ণাশ্রমসূত্রের দ্বারা পরিবার-সমাজকে বাঁধিয়া রাখিবার বিধানকে সকল দিক হইতে দৃঢ় করিবার দিকেই আধুনিক ভারতবর্ষের সমস্ত চেষ্টা কাজ করিয়াছে।

ভারতবর্ষের সম্মুখে যে সমস্যা ছিল ভারতবর্ষ তাহার একটা-কোনো সমাধানে আসিয়া পৌঁছিতে পারিয়াছিল, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বিচিত্র জাতির বিরোধকে সে একরকম করিয়া মিটাইয়াছে, বিচিত্র শ্রেণীর বিরোধকে সে একরকম করিয়া ঠাণ্ডা করিয়াছে: বৃত্তিভেদের দ্বারা ভারতবর্ষে প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্বযুদ্ধকে নিবৃত্ত করিয়াছে এবং ধন ও ক্ষমতার পার্থক্য যে অভিমানকে সৃষ্টি করে জাতিভেদের বেড়ার দ্বারা তাহার সংঘাতকে সে ঠেকাইয়াছে। এক দিকে যদিও ভারতবর্ষ সমাজের নেতা ব্রাহ্মণদের সহিত অন্য বর্ণের স্বাতন্ত্র্যকে সর্বপ্রকার উপায়ে অভ্রভেদী করিয়া তুলিয়াছে, অন্য দিকে তেমনি সমস্ত সুখসুবিধা-শিক্ষাদীক্ষাকে সর্বসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিবার জন্য নানাবিধ ছোটো-বড়ো প্রণালী বিস্তারিত করিয়া দিয়াছে। এইজন্য ভারতবর্ষে ধনী যাহা ভোগ করে নানা উপলক্ষে সর্বসাধারণে তাহার অংশ পায় এবং জনসাধারণকে আশ্রয় দিয়া ও পরিতুষ্ট করিয়াই ক্ষমতাশালীর ক্ষমতা খ্যাতিলাভ করে। আমাদের দেশে ধনী-দরিদ্রের প্রচণ্ড সংঘাতের কোনো কারণ নাই, এবং অক্ষমকে আইনের দ্বারা বাঁচাইয়া রাখিবারও বিশেষ প্রয়োজন ঘটে নাই।

পাশ্চাত্যসমাজ পারিবারিক সমাজ নহে; তাহা জনসমাজ, তাহা আমাদের সমাজের চেয়ে ব্যাপ্ত। ঘরের মধ্যে ততটা পরিমাণে সে নাই যতটা পরিমাণে সে বাহিরে আছে। আমাদের দেশে পরিবার বলিতে যে জিনিস বোঝায় তাহা য়ুরোপে বাঁধে নাই বলিয়াই য়ুরোপের মানুষ ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

এই ছড়াইয়া-পড়া সমাজের স্বভাবই এই—এক দিকে তাহার বাঁধন যেমন আলগা আর-এক দিকে তাহা তেমনি বিচিত্র ও দৃঢ় হইয়া পড়ে। তাহা গদ্যরচনার মতো। পদ্যছন্দের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ হইয়া চলে বলিয়া তাহার বাঁধনটি সহজ; কিন্তু গদ্য ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এইজন্যই এক দিকে সে স্বাধীন বটে আর-এক দিকে তাহার পদক্ষেপ যুক্তির দ্বারা, চিন্তাবিকাশের বিচিত্র নিয়মের দ্বারা, বড়ো করিয়া বাঁধা।

ইংরেজি সমাজ বিস্তৃত ক্ষেত্রে আছে বলিয়া এবং তাহার সমস্ত কারবারকে বাহিরে প্রসারিত করিয়া ফাঁদিতে হইয়াছে বলিয়াই, নানা সামাজিক বিধানের দ্বারা তাহাকে সকল সময়েই প্রস্তুত থাকিতে হইয়াছে। আটপৌরে কাপড় পরিবার সময় তাহার অল্প। তাহাকে সাজিয়া থাকিতে হয়, কেননা সে আত্মীয়সমাজে নাই। আত্মীয়েরা ক্ষমা করে, সহ্য করে, কিন্তু বাহিরের লোকের কাছে প্রশ্রয় প্রত্যাশা করা যায় না। প্রত্যেককে প্রত্যেক কাজে ঠিক সময়মত চলিতেই হয়, নহিলে পরস্পর পরস্পরের ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। রেলের লাইন যদি আমার একলার হয় অথবা আমার গুটিকয়েক ভাইবন্ধুর অধিকারে থাকে, তাহা হইলে যেমন খুশি গাড়ি চালাইতে পারি এবং পরস্পরের গাড়িকে ইচ্ছামত যেখানে-সেখানে যখন-তখন দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারি। কিন্তু,

সাধারণের রেলের রাস্তায় যেখানে বিস্তর গাড়ির আনাগোনা সেখানে পাঁচ মিনিট সময়ের ব্যতিক্রম হইলেই নানা দিকে গোল বাধিয়া যায় এবং তাহা সহ্য করা শক্ত হয়। আমাদের অত্যন্ত ঘোরো সমাজ বলিয়াই অথবা সেই ঘোরো অভ্যাস আমাদের মজ্জাগত বলিয়াই, পরস্পরের সম্বন্ধে আমাদের ব্যবহারে দেশকালের বন্ধন নিতান্তই আলগা— আমরা যথেচ্ছা জায়গা জুড়িয়া বসি, সময় নষ্ট করি, এবং ব্যবহারের বাঁধাবাঁধিকে আত্মীয়তার অভাব বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকি। ইংরেজি সমাজে ঐখানেই সব-প্রথমে আমাদের বাধে; সেখানে বাহ্য ব্যবহারে আপন ইচ্ছামত যাহা-তাহা করিয়া সকলের কাছ হইতে ক্ষমা প্রত্যাশা করিবার অধিকার কাহারও নাই। গড়ে সকলের যাহাতে সুবিধা সেইটের অনুসরণ করিয়া ইহারা নানা বন্ধন স্বীকার করিয়াছে। ইহাদিগকে দেখা-সাক্ষাৎ নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ বেশভূষা আদর-অভ্যর্থনার নিয়ম পাকা করিয়া রাখিতে হইয়াছে। যাহা বস্তুত আত্মীয়-সমাজ নহে সেখানে আত্মীয়সমাজের ঢিলা নিয়ম চালাইতে গেলেই সমস্ত অত্যন্ত বীভৎস হইয়া পড়ে এবং জীবনযাত্রা অসম্ভব হইয়া উঠে।

য়ুরোপের এই ব্যাপক সমাজ এখনো কোনো সমাধানের মধ্যে আসিয়া পেঁছে নাই। তাহা আচারে ব্যবহারে বাহিরের দিকে একটা বাঁধাবাঁধির মধ্যে আপনাকে সংযত ও শ্রীসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সমাজের ভিতরকার শক্তিগুলি এখনো আপনাদিগকে কোনো-একটা ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া পরস্পরের সংঘাত সম্পূর্ণ বাঁচাইয়া চলিবার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। য়ুরোপ কেবলই পরীক্ষা পরিবর্তন এবং বিপ্লবের ভিতর দিয়া চলিতেছে। সেখানে স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের, ধর্মসমাজের সঙ্গে কর্মসমাজের, রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির, কারবারী-দলের সঙ্গে মজুর-দলের কেবলই দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিতেছে। চন্দ্রমণ্ডলের মতো তাহার যাহা হইবার তাহা হইয়া যায় নাই— এখনো তাহার আগ্নেয়গিরি অগ্নি-উদ্‌গারের জন্য প্রস্তুত আছে।

কিন্তু, আমরাই সমস্ত সমস্যার সমাধান করিয়া, সমাজব্যবস্থা চিরকালের মতো পাকা করিয়া, মৃতদেহের মতো সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি— এ কথা বলিলে চলিবে কেন? সময় উত্তীর্ণ হইলেও ব্যবস্থাকে কিছুদিনের মতো খাড়া রাখিতে পারি, কিন্তু অবস্থাকে তো সেইসঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে পারি না। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমরা মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইয়াছি, এখন ঘোরো সমাজ লইয়া আর আমাদের চলিতেই পারে না; ইহারা কেবলমাত্র বাপ দাদা খুড়া নহে, ইহারা বাহিরের লোক, ইহারা দেশ-বিদেশের মানুষ; ইহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইলে সতর্ক ও সচেষ্ট হইতেই হইবে— অন্যমনস্ক হইয়া, ঢিলেঢালা হইয়া, যদি চলিতে যাই তবে একদিন অচল হইয়া উঠিবেই।

আমরা সনাতন প্রথার দোহাই দিয়া গর্ব করি, কিন্তু এ কথা একেবারেই সত্য নহে যে, ভারতবর্ষের সমাজ ইতিহাসের মধ্য দিয়া উদ্‌ভিন্ন হয় নাই। ভারতবর্ষকেও অবস্থাভেদে নব নব বিপ্লবের তাড়নায় অগ্রসর হইতে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই— এবং ইতিহাসে তাহার চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু, তাহার চলা একেবারে শেষ হইয়াছে, এখন হইতে অনন্তকাল সে সনাতন হইয়া বসিয়া থাকিবে, এমন অদ্ভুত কথা মুখে উচ্চারণ করিতেও চাই না। এক-একটা বড়ো বড়ো বিপ্লবের পর সমাজের ক্লান্তি আসে; সেইসময় সে দ্বার বন্ধ করিয়া, আলো নিভাইয়া, ঘুমের আয়োজন করে। বৌদ্ধবিপ্লবের পর ভারতবর্ষ শক্ত নিয়মের হুড়কায় সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া একেবারে স্থির হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ঘুম আসিয়াছিল। কিন্তু, ইহাকে অনন্ত ঘুম বলিয়া গর্ব করিলে সেটা হাস্যকর অথচ সকরুণ হইয়া উঠিবে। ঘুম ততক্ষণই ভালো যতক্ষণ রাত্রি থাকে— বাহিরে যতক্ষণ লোকের ভিড় নাই, বড়ো বড়ো দোকান-বাজার যতক্ষণ বন্ধ। কিন্তু, সকালে যখন চারি দিকে হাঁকডাক পড়িয়া গেছে, তুমি চুপচাপ থাকিলেও আর-কেহ যখন চুপ করিয়া নাই, তখন সনাতন দরজা আটে-ঘাটে বন্ধ করিয়া থাকিলে অত্যন্ত ঠকিতে হইবে।

রাত্রিকালের বিধান সাদাসিধা; তাহার আয়োজন স্বল্প; তাহার প্রয়োজন সামান্য। এইজন্য সমস্ত ব্যবস্থা বেশ সহজেই সম্পূর্ণ করিয়া নিরুদ্‌বিগ্ন হইয়া চোখ বোজা সম্ভব হয়; তখন

যেখানে যেটি রাখি সেখানে সেটি পড়িয়া থাকে, কারণ, নাড়া দিবার কেহ নাই। দিনের বেলাকার ব্যবস্থা তত সহজ নহে এবং তাহা ভোরের বেলা একেবারের মতো সারিয়া ফেলিয়া তাহার পর সমস্ত দিনটা নিশ্চিন্ত হইয়া তামাক খাইতে থাকা চলে না। ঘাড়ের উপর কাজ আসিয়া পড়ে, নূতন নূতন চেষ্টা করিতেই হয় এবং বাহিরের জীবনস্রোতের সঙ্গে নিজের জীবনযাত্রাকে বনাইতে না পারিলে খাওয়া-দাওয়া কাজকর্ম সমস্তেরই ব্যাঘাত ঘটিতে থাকে।

কিছুকালের জন্য ভারতবর্ষ অত্যন্ত বাঁধা নিয়মের নিশ্চল ব্যবস্থার মধ্যে স্বচ্ছন্দে রাত্রিযাপন করিয়াছে। সেই অবস্থাটা গভীর আরামের বলিয়াই সেটা যে চিরকালই আরামের হইবে তাহা নহে। আঘাত সব চেয়ে কঠিন, বেদনাজনক, যখন তাহা ঘুমন্ত শরীরের উপর আসিয়া পড়ে। দিনের বেলা সেই আঘাতের সময়। এইজন্য দিনে জাগিয়া থাকাই সব চেয়ে আরামের।

ইচ্ছা করি আর না করি, সর্বাঙ্গে আলস্য জড়াইয়া থাক্‌ আর না থাক্‌, আমাদের জাগিবার সময় আসিয়াছে। আমরা সমাজের ভিতর হইতে ও বাহির হইতে আঘাত পাইতেছি, দুঃখ পাইতেছি। আমরা দৈন্যে দুর্ভিক্ষে পীড়িত। সমাজব্যবস্থায় ভাঙন ধরিয়াছে; একান্নবর্তী পরিবার খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িতেছে; এবং সমাজে ব্রাহ্মণের পদ ক্রমশই এমন খাটো হইয়া আসিতেছে যে 'ব্রাহ্মণসমাজ' প্রভৃতি সভাসমিতির সাহায্যে ব্রাহ্মণ চীৎকারশব্দে আপনাকে ঘোষণা করিয়া আপনার দুর্বলতা সপ্রমাণ করিয়া তুলিতেছে। পল্লীসমাজের পঞ্চায়েত-প্রথা গবর্মেন্টের চাপরাশ গলায় বাঁধিয়া আত্মহত্যা করিয়া ভূত হইয়া পল্লীর বুকে চাপিতেছে; দেশের অন্নে টোলের আর পেট ভরিতেছে না; দুর্ভিক্ষের দায়ে একে একে তাহারা সরকারি অন্নসত্রের শরণাপন্ন হইতেছে; দেশের ধনী-মানীরা জন্মস্থানের বাতি নিবাইয়া দিয়া কলিকাতায় মোটরগাড়ি চড়িয়া ফিরিতেছে; এবং বড়ো বড়ো কুলশীল আপনার যথাসর্বস্ব এবং কন্যাটিকে লইয়া বি. এ.-পাস-করা বরের পায়ে বৃথা মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে। এই-সমস্ত দুর্লক্ষণের জন্য কলিযুগকে বিদেশী রাজাকে বা স্বদেশী ইংরেজি-নবিশকে গালি দিয়া কোনো ফল নাই। আসল কথা, আমাদের দিনের বেলাকার প্রভু তাঁহার চাপরাশি পাঠাইয়াছেন; আমাদের সনাতন শয়নাগার হইতে সে আমাদিগকে টানিয়া বাহির না করিয়া ছাড়িবে না। জোর করিয়া চোখ বুজিয়া আমরা অকালে রাত্রি সৃজন করিতে পারিব না। যে পৃথিবী আমাদের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাকে আমাদের ঘরে আহ্বান করিয়া আনিতেই হইবে; যদি আদর করিয়া তাহাকে না আনি তবে সে আমাদের দ্বার ভাঙিয়া প্রবেশ করিবে। দ্বার কি এখনি ভাঙে নাই?

অতএব, আবার একবার আমাদিগকে নূতন করিয়া সমস্যা-সমাধানের জন্য ভাবিতে হইবে। য়ুরোপের নকল করিয়া সে কাজ চলিবে না; কিন্তু য়ুরোপের কাছ হইতে শিক্ষা করিতে হইবে। শিক্ষা করা এবং নকল করা একই কথা নহে। বস্তুত, ঠিকভাবে শিক্ষা করিলেই নকল করার ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। অন্যকে সত্যরূপে না জানিলে নিজেকে কখনোই সত্যরূপে জানা যায় না।

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম সে কথাটা এই যে, আমাদের ঘোরো ঢিলাঢালা অভ্যাস লইয়া য়ুরোপীয় সমাজে আমাদের অত্যন্ত বাধে। কোনোমতেই প্রস্তুত হইয়া উঠিতে পারি না। মনে হয়, সকলেই আমাকে ঠেলিয়া চলিয়া যাইতেছে, কেহ আমার জন্য কিছুমাত্র অপেক্ষা করিতেছে না। আমরা আদর-আবদারের জীব, আত্মীয়সমাজের বাহিরে আমাদের বড়ো বিপত্তি। আমি এখানে আসিয়া ইহা লক্ষ করিয়া দেখিলাম, আমাদের ঘরের ছেলের পরের বাড়িতে প্রবেশের অভ্যাস নাই বলিয়াই, আমাদের অধিকাংশ ছাত্র এখানে আসিয়া পড়া মুখস্থ করে কিন্তু এখানকার সমাজের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না। এখানকার সমাজ বড়ো বলিয়াই এখানকার সমাজের দায় বেশি। সেই দায় স্বীকার করিলে তবে এখানকার লোকের সঙ্গে সমাজের ক্ষেত্রে আমাদের মিল হইতে পারে। সেই মিল না ঘটিলে এখানকার সব চেয়ে বড়ো শিক্ষা হইতে আমরা বঞ্চিত হইব। কারণ, এখানকার সব চেয়ে বড়ো সত্য এখানকার সমাজ। বস্তুত, এখানকার সব চেয়ে বড়ো বীরত্ব বড়ো

মহত্ত্ব এখানকার সমাজের ক্ষেত্রে, যুদ্ধক্ষেত্রে নহে। প্রশস্ত সমাজের উপযোগী ত্যাগ এবং আত্মসম্মান এখানে পদে পদে প্রকাশ পাইতেছে; এইখানে ইহারা মানুষ হইতেছে এবং নানা পথে মানুষের কাজে আপনাকে দান করিবার জন্য ইহারা প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে। আধুনিক ভারতবর্ষের শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায় নিজের দেশেও স্কুলের শিক্ষাকেই শিক্ষা বলিয়া গণ্য করে—বৃহৎ সমাজের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত; এখানেও আসিয়া যদি তাহারা স্কুলের কারখানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কেবলমাত্র কলের সামগ্রী হইয়া বাহির হইয়া যায়, এখানকার সমাজে প্রত্যক্ষ মনুষ্যত্বের জন্মস্থানে প্রবেশ না করে, তবে বিদেশে আসিয়াও বঞ্চিত হইবে।

সীমার সার্থকতা

এ কথা মাঝে মাঝে শুনিয়াছি যে, কবিত্বের মধ্যে জীবনের সম্পূর্ণ সার্থকতা নাই। ঈশ্বরের সাধনাকে কাব্যালংকারের ক্ষেত্র হইতে সংসারে কর্মের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত না করিলে তাহা সত্যের দৃঢ়তা লাভ করে না।

মাঝে মাঝে অবসাদের দিনে নিজেও এ কথা ভাবিয়াছি। কিন্তু আমি জানি, এরূপ চিন্তা মনের মধ্যে মরীচিকাবিস্তার মাত্র। মানুষের যে রিপু তাহার কানে মিথ্যামন্ত্র জপ করে লোভ তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য। সে মানুষকে এই কথা বলে, 'তুমি যাহা তাহার মধ্যে সত্য নাই, তাহার বাহিরেই সত্য।'

কিন্তু, উপনিষৎ বলিয়াছেন : মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্। কাহারও ধনে লোভ করিও না। অর্থাৎ তোমার সীমার বাহিরে যাহা আছে তাহার পশ্চাতে চিত্তকে ও চেষ্টাকে ধাবিত করিয়ো না।

কেন করিব না ঐ শ্লোকে সে কথাটাও বলা আছে। উপনিষৎ বলিতেছেন, তিনিই সমস্তকে আচ্ছন্ন করিয়া আছেন; অতএব, যাহার মধ্যে তিনি আছেন, যাহা তাঁহার দান, তাহার মধ্যে কোনো অভাবই নাই। নিজের মধ্যে যখন ঐশ্বর্যকে উপলব্ধি করি না তখনি মনে করি, ঐশ্বর্য পরের মধ্যেই আছে। কিন্তু, যে দীনতাবশত ঐশ্বর্যকে নিজের মধ্যে পাই নাই, সেই দীনতাবশতই তাহাকে অন্যত্র পাইবার আশা নাই।

সীমা আছে এ কথা যেমন নিশ্চিত, অসীম আছেন এ কথা তেমনি সত্য। আমরা উভয়কে যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি তখনি আমরা মায়ার ফাঁদে পড়ি। তখনি আমরা এমন একটা ভুল করিয়া বসি যে, আপনার সীমাকে লঙ্ঘন করিলেই বুঝি আমরা অসীমকে পাইব—যেন আত্মহত্যা করিলেই অমরজীবন পাওয়া যায়। যেন আমি না হইয়া আর-কিছু হইলেই আমি ধন্য হইব। কিন্তু, আমি হওয়াও যা আর-কিছু হওয়া যে তাহাই, সে কথা মনে থাকে না। আমার এই আমির মধ্যে যদি ব্যর্থতা থাকে তবে অন্য কোনো আমিত্ব লাভ করিয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। আমার ঘটের মধ্যে ছিদ্র থাকাতে যদি জল বাহির হইয়া যায় তবে সে জলের দোষ নহে। দুধ ঢালিলেও সেই দশা হইবে, এবং মধু ঢালিলেও তথৈবচ।

জীবনে একটিমাত্র কথা ভাবিবার আছে যে, আমি সত্য হইব। আমি কবি হইব কি কর্মী হইব কি আর-কিছু হইব, সেটা নিতান্তই ব্যর্থ চিন্তা। সত্য হইব এ কথার অর্থই এই, কোথায় আমার সীমা সেটা নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিব। দুরাশার প্রলোভনে সেইটে সম্বন্ধে যদি মন স্থির না করি, তবে সত্য ব্যবহার হইতে ভ্রষ্ট হইব।

অহংকারকে যে আমরা রিপু বলি, লোভকে যে আমরা রিপু বলি, তাহার কারণ এই—আমাদের সীমা সম্বন্ধে সে আমাদিগকে ঠিকটা বুঝিতে দেয় না। সে আমাদের আপনাকে জানার তপস্যায় বাধা দিয়া কেবলই বলিতে থাকে, 'তুমি যাহা তুমি তাহার চেয়ে আরও বেশি অথবা অন্য-কিছু।' ইহা হইতে পৃথিবীতে যত দুঃখ, যত বিদ্বেষ, যত কাড়াকাড়ি-হানাহানির সৃষ্টি

হইতে থাকে এমন আর কিছুতেই না। যাহা মিথ্যা তাহাকেই গায়ের জোরে সত্য করিতে গিয়া পৃথিবীতে যত-কিছু অমঙ্গলের উৎপত্তি হয়।

সীমাহীনতার প্রতি আমাদের একটা প্রবল আকর্ষণ আছে, সেই আকর্ষণই আমাদের জীবনকে গতিদান করে। সেই আকর্ষণকে অবহেলা করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে মঙ্গল নাই। ভূমাকে আমাদের পাইতেই হইবে, সেই পাওয়াতেই আমাদের সুখ।

কিন্তু, নিজের সীমার মধ্যেই সেই অসীমকে পাইতে হইবে, ইহা ছাড়া গতি নাই। সীমার মধ্যে অসীমকে ধরে না, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে আমরা অসীমকে খর্ব করিয়া থাকি। এ কথা সত্য, এক সীমার মধ্যে অন্য সীমাবদ্ধ পদার্থ সম্পূর্ণ স্থান পায় না। কিন্তু, অসীমের সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। তিনি একটি বালুকণার মধ্যেও অসীম। এইজন্য একটি বালুকণাকেও যখন সম্পূর্ণরূপে সর্বতোভাবে আয়ত্ত করিতে যাই তখন দেখি, বিশ্বকে আয়ত্ত না করিলে তাহাকে পাইবার জো নাই; কারণ, এক জায়গায় নিখিলের সঙ্গে সে অবিচ্ছেদ্য, তাহার এমন একটা দিক আছে যে-দিকটাতে কিছুতেই তাহাকে শেষ করা যায় না।

আমরা নিজের সীমার মধ্যেই অসীমের প্রকাশকে উপলব্ধি করিব, ইহাই আমাদের সাধনা। কারণ, সেই অসীমেরই আনন্দ আমার মধ্যে সীমা রচনা করিয়াছেন; সেই সীমার মধ্যেই তাঁহার বিলাস, তাঁহার বিহার। তাঁহার সেই নিকেতনকে ভাঙিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে বেশি করিয়া পাইব, এমন কথা মনে করাই ভুল।

গোলাপ-ফুলের মধ্যে সৌন্দর্যের একটি অসীমতা আছে তাহার কারণ, সে সম্পূর্ণরূপেই গোলাপ-ফুল—সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ, কোনো অনির্দিষ্টতা নাই। এইজন্যই গোলাপ-ফুলের মধ্যে এমন একটি আবির্ভাব সুস্পষ্ট হইয়াছে যাহা চন্দ্রসূর্যের মধ্যে, যাহা জগতের সমস্ত সুন্দরের মধ্যে। সে সুনিশ্চিত সত্যরূপে গোলাপ-ফুল বলিয়াই সমস্ত জগতের সঙ্গে তাহার আত্মীয়তা সত্য।

বস্তুত অস্পষ্টতাই ব্যর্থতা; সুতরাং সেইখানেই ভূমার প্রকাশ প্রতিহত, ভূমার আনন্দ প্রচ্ছন্ন। তাঁহার আনন্দ রূপগ্রহণের দ্বারাই সার্থক। অসীম যিনি তিনি সীমার মধ্যেই সত্য, সীমার মধ্যেই সুন্দর। এইজন্য জগৎসৃষ্টির ইতিহাসে রূপের বিকাশ কেবলই সুব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে; সীমা হইতে সীমার অভিমুখে চলিয়াছে অসীমের অভিসারযাত্রা। কুঁড়ি হইতে ফুল, ফুল হইতে ফল, কেবলই রূপ হইতে ব্যক্ততর রূপ।

এইজন্যই আপনাকে স্পষ্ট করিয়া পাওয়াই মানুষের সাধনা। স্পষ্ট করিয়া পাওয়ার অর্থই সীমাবদ্ধ করিয়া পাওয়া। যখনি নানা পথে নানা দুরাশার বিক্ষিপ্ততা হইতে নিজেকে সংহৃত করিয়া সীমার মধ্যে আপনাকে স্পষ্ট করিয়া দাঁড় করানো যায়, তখনি জীবনের সার্থকতাকে লাভ করি।

সাঁতার যতক্ষণ না শিখি ততক্ষণ এলোমেলো হাত পা ছোঁড়া চলে। ভালো সাঁতার যেমনি শিখি অমনি আমাদের চেষ্টা সীমাবদ্ধ হইয়া আসে এবং তাহা সুন্দর হইয়া প্রকাশ পায়। পাখি যখন ওড়ে তখন সুন্দর দেখিতে হয়, কারণ, তাহার ওড়ার মধ্যে দ্বিধা নাই, তাহা সুনিয়ত, অর্থাৎ তাহা আপনার নিশ্চিত সীমাকে পাইয়াছে। এই সীমাকে পাওয়াই সৃষ্টি অর্থাৎ সত্য; এবং সীমার দ্বারা অসীমকে পাওয়াই সৌন্দর্য অর্থাৎ আনন্দ। সীমা হইতে ভ্রষ্ট হওয়াই কদর্যতা, তাহাই নিরানন্দ, তাহাই বিনাশ।

কাব্যালংকার তখনি ব্যর্থ যখনি তাহা মিথ্যা—অর্থাৎ যখনি তাহা আপনার সীমাকে না পাইয়া আর-কিছু হইবার চেষ্টা করিতেছে। তখনি সে ভান করে; তখনি সে ছোটোকে বড়ো করিয়া দেখায়, বড়োকে ছোটো করিয়া আনে। তখনি তাহা কথার কথামাত্র, তাহা সৃষ্টি নহে। কিন্তু, কবি যেখানে সত্য, যেখানে সে আপনার অসীমকে আপনার সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে, আপনার আনন্দকে আপনার শক্তির মধ্যে মূর্তিদান করে, সেখানে সে সৃষ্টি করে। জগতের সকল

সৃষ্টির মধ্যেই তাহার স্থান। সত্যকর্মী যে কর্মের সৃষ্টি করে, সত্যসাধক যে জীবনের সৃষ্টি করে, সকলেরই সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে আসন লইবার অধিকার তাহার। কার্লাইল প্রভৃতি বাক্যরচকেরা বাক্যের চেয়ে কাজকে যে বড়ো স্থান দিয়াছেন, ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় তাহার অর্থ এই যে, তাঁহারা মিথ্যা বাক্যের চেয়ে সত্য কাজকে গৌরব দান করিতে চান। সেইসঙ্গে এ কথাও বলা উচিত, মিথ্যা কাজের চেয়ে সত্য বাক্য অনেক বড়ো।

আসল কথাই এই, সত্য যে-কোনো আকারেই প্রকাশ পাক-না কেন তাহা একই; তাহাই মানুষের চিরসম্পদ। যেমন টাকা যেখানে সত্য, অর্থাৎ শক্তি যেখানে টাকা-আকারে প্রকাশ পায়, সেখানে সে টাকা কেবলমাত্র টাকা নহে; তাহা অন্নও বটে, বস্ত্রও বটে, শিক্ষাও বটে, স্বাস্থ্যও বটে; তখন সে টাকা সত্য মূল্যের সীমায় সুনির্দিষ্টরূপে বদ্ধ বলিয়াই আপনার নির্দিষ্ট সীমাকে অতিক্রম করে—অর্থাৎ সে আপনার সত্য মূল্যের দ্বারাই আপনার বাহিরের বিবিধ সত্য পদার্থের সহিত যোগযুক্ত হয়। তেমনি সত্য কবিতার সঙ্গে মানুষের সকলপ্রকার সত্য সাধনার যোগ ও সমতুল্যতা আছে। সত্য কবিতা কেবলমাত্র কতকগুলি বাক্যের মধ্যে কবিতা আকারেই থাকে না। তাহা মানুষের প্রাণের মধ্যে মিলিত হইয়া কর্মীর কর্ম ও তাপসের তপস্যার সহিত যুক্ত হইতে থাকে। এ কথা নিঃসন্দেহ যে, কবির কবিতা যদি পৃথিবীতে না থাকিত তবে মানবজীবনের সকলপ্রকার কর্মই অন্যপ্রকার হইত। কারণ, মানুষের সত্য বাক্য চিরদিনই মানুষের সত্য কর্মের সহিত মিশ্রিত হইতেছে, তাহাকে শক্তি দিতেছে, মূর্তি দিতেছে, তাহার পথকে লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর করিতেছে।

অতএব, এই কথাটি আমাদের বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, সত্য সীমাকে পাওয়াই সত্য অসীমকে পাওয়ার একমাত্র পন্থা। নিজের সীমাকে লঙ্ঘন করিলেই নিজের অসীমকে লঙ্ঘন করা হয়। পৃথিবীতে কবিতায় বা কর্মে বা ধর্মসাধনায় যে-কোনো মানুষ সত্য হইয়াছে তাহার সহিত অপর সাধারণের প্রভেদ এই যে, সে অসীমের সীমাকে স্পষ্টরূপে আবিষ্কার করিয়াছে, অন্য সকলে সীমাভ্রষ্ট অস্পষ্টতার মধ্যে যেমন-তেমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই অস্পষ্টতাই তুচ্ছ। নদী যখন আপন তটসীমাকে পায় তখনি সে অসীম সমুদ্রের অভিমুখে ছুটিয়া যাইতে পারে; যদি সে আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া আরও বড়ো হইবার জন্য আপনার তটকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহা হইলেই তাহার গতি বন্ধ হইয়া যায় এবং সে তুচ্ছ বিলের মধ্যে, জলার মধ্যে, ছড়াইয়া পড়ে।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, আপনার সত্য সীমার মধ্যে আবদ্ধ হওয়া সংকীর্ণতা নহে, নিশ্চেষ্টতা নহে। বস্তুত, সেই সীমার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারাই মানুষ উদার হয়, সেই সীমার মধ্যে বিধৃত হওয়ার দ্বারাই মানুষের চেষ্টা বেগবান হইয়া উঠে। ব্যক্তি ব্যক্তি-হওয়ার দ্বারাই মানুষের মধ্যে গণ্য হয়; জাতি জাতীয়ত্বলাভের দ্বারাই সর্বজাতির মধ্যে স্থান পাইতে পারে। যে জাতি জাতীয়তা লাভ করে নাই সে বিশ্বজাতীয়তাকে হারাইয়াছে। যে লোক বড়ো লোক সেই লোকই সকলের চেয়ে বিশেষ করিয়া নিজেকে পাইয়াছে। যে ব্যক্তি নিজেকে পাইয়াছে তাহার আর জড়তার মধ্যে পড়িয়া থাকিবার জো নাই; সে আপনার কাজ পাইয়াছে, সে আপনার স্থান পাইয়াছে, সে আপনার আনন্দ পাইয়াছে; নদীর মতো সে বিনা দ্বিধায় আপনার বেগে আপনিই চলিতে থাকে, তাহার সত্য সীমাই সত্য পরিণামের দিকে তাহাকে সহজে চালনা করিয়া লইয়া যায়।

আবিরাবীর্ম এধি। যিনি প্রকাশস্বরূপ তিনি আমার মধ্যে, আমারই সীমার মধ্যে, প্রকাশিত হউন—ইহাই আমাদের সত্য প্রার্থনা। যদি আমার সীমাকে অবজ্ঞা করি তবে সেই অসীমের প্রকাশকে বাধা দিব। পাহি মাং নিত্যম্‌। আমাকে সর্বদা রক্ষা করো। আমার সত্যের মধ্যে, সীমার মধ্যে আমাকে রক্ষা করো; আমি যেন সীমার বাহিরে আপনাকে হারাইয়া না ফেলি। আমি যাহা, পূর্ণরূপে তাহাই হইয়া যেন তোমার প্রসন্নতাকে তোমার আনন্দকে সুস্পষ্টরূপে নিজের মধ্যে

অনুভব করি। অর্থাৎ আমার যে সীমার মধ্যে তোমার বিলাস সেই সীমাকেই আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া আমি যেন নিজের জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারি, ইহাই আমার অস্তিত্বের মূলগত অন্তরতর প্রার্থনা।

লন্ডন

সীমা ও অসীমতা

ধর্ম শব্দের গোড়াকার অর্থ, যাহা ধরিয়া রাখে। religion শব্দের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করিলে বুঝা যায় তাহারও মূল অর্থ যাহা বাঁধিয়া তোলে।

অতএব, এক দিক দিয়া দেখিলে দেখা যায়, মানুষ ধর্মকে বন্ধন বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। ধর্মই মানুষের চেষ্টার ক্ষেত্রকে সীমাবন্ধ করিয়া সংকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এই বন্ধনকে স্বীকার করা, এই সীমাকে লাভ করাই মানুষের চরম সাধনা।

কেননা সীমাই সৃষ্টি। সীমারেখা যতই সুবিহিত সুস্পষ্ট হয় সৃষ্টি ততই সত্য ও সুন্দর হইতে থাকে। আনন্দের স্বভাবই এই, সীমাকে উদ্‌ভিন্ন করিয়া তোলা। বিধাতার আনন্দ বিধানের সীমায় সমস্ত সৃষ্টিকে বাঁধিয়া তুলিতেছে। কর্মীর আনন্দ, কবির আনন্দ, শিল্পীর আনন্দ কেবলই স্ফুটতররূপে সীমা রচনা করিতেছে।

ধর্মও মানুষের মনুষ্যত্বকে তাহার সত্য সীমার মধ্যে স্ফুটতর করিয়া তুলিবার শক্তি। সেই সীমাটি যতই সহজ হয়, যতই সুব্যক্ত হয়, ততই তাহা সুন্দর হইয়া উঠিতে থাকে। মানুষ ততই শক্তি ও স্বাস্থ্য ও ঐশ্বর্য লাভ করে, মানুষের মধ্যে আনন্দ ততই প্রকাশমান হইয়া উঠে।

ধর্মের সাহায্যে মানুষ আপনার সীমা খুঁজিতেছে, অথচ সেই ধর্মের সাহায্যেই মানুষ আপনার অসীমকে খুঁজিতেছে। ইহাই আশ্চর্য। বিশ্বসংসারে সমস্ত পূর্ণতার মূলেই আমরা এই দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই। যাহা ছোটো করে তাহাই বড়ো করে, যাহা পৃথক করিয়া দেয় তাহাই এক করিয়া আনে, যাহা বাঁধে তাহাই মুক্তিদান করে; অসীমই সীমাকে সৃষ্টি করে এবং সীমাই অসীমকে প্রকাশ করিতে থাকে। বস্তুত, এই দ্বন্দ্ব যেখানেই সম্পূর্ণরূপে একত্র হইয়া মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণতা। যেখানে তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়া একটা দিকই প্রবল হইয়া ওঠে সেইখানেই যত অমঙ্গল। অসীম যেখানে সীমাকে ব্যক্ত করে না সেখানে তাহা শূন্য, সীমা যেখানে অসীমকে নির্দেশ করে না সেখানে তাহা নিরর্থক। মুক্তি যেখানে বন্ধনকে অস্বীকার করে সেখানে তাহা উন্মত্ততা, বন্ধন যেখানে মুক্তিকে মানে না সেখানে তাহা উৎপীড়ন। আমাদের দেশে মায়াবাদে সমস্ত সীমাকে মায়া বলিয়াছে। কিন্তু, আসল কথা এই, অসীম হইতে বিযুক্ত সীমাই মায়া। তেমনি ইহাও সত্য, সীমা হইতে বিযুক্ত অসীমও মায়া।

যে গান আপনার সুরের সীমাকে সম্পূর্ণরূপে পাইয়াছে সে গান কেবলমাত্র সুরসমষ্টিকে প্রকাশ করে না—সে আপনার নিয়মের দ্বারাই আনন্দকে, সীমার দ্বারাই সীমার চেয়ে বড়োকে ব্যক্ত করে। গোলাপ-ফুল সম্পূর্ণরূপে আপনার সীমাকে লাভ করিয়াছে বলিয়াই সেই সীমার দ্বারা সে একটি অসীম সৌন্দর্যকে প্রকাশ করিতে থাকে। এই সীমার দ্বারা গোলাপ-ফুল প্রকৃতি-রাজ্যে একটি বস্তুবিশেষ কিন্তু ভাবরাজ্যে আনন্দ। এই সীমাই তাহাকে এক দিকে বাঁধিয়াছে আর-এক দিকে ছাড়িয়াছে।

এইজন্যই দেখিতে পাই, মানুষের সকল শিক্ষারই মূলে সংযমের সাধনা। মানুষ আপনার চেষ্টাকে সংযত করিতে শিখিলেই তবে চলিতে পারে, ভাবনাকে বাঁধিতে পারিলে তবেই ভাবিতে পারে। সেই কারুকরই সুনিপুণ যে লোক কর্মের সীমাকে অর্থাৎ নিয়মকে সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছে এবং মানিয়াছে। সেই লোকই নিজের জীবনকে সুন্দর করিতে পারিয়াছে যে তাহাকে সংযত করিয়াছে। এবং সতী স্ত্রী যেমন সতীত্বের সংযমের দ্বারাই আপনার প্রেমের পূর্ণ চরিতার্থতাকে

লাভ করে, তেমনি যে মানুষ পবিত্রচিত্ত, অর্থাৎ যে আপনার ইচ্ছাকে সত্য সীমায় বাঁধিয়াছে, সেই তাঁহাকে পায় যিনি সাধনার চরম ফল, যিনি পরম আনন্দস্বরূপ।

এই ধর্মকে বন্ধনরূপে দুঃখরূপে স্বীকার করা হইয়াছে; বলা হইয়াছে, ধর্মের পথ শাণিত ক্ষুরধারের মতো দুর্গম। সে পথ যদি অসীমবিস্তৃত হইত তবে সকল মানুষই যেমন-তেমন করিয়া চলিতে পারিত, কাহারও কোথাও কোনো বাধাবিপত্তি থাকিত না। কিন্তু, সে পথ সুনিশ্চিত নিয়মের সীমায় দৃঢ়রূপে আবদ্ধ, এইজন্যই তাহা দুর্গম। ধ্রুবরূপে এই সীমা-অনুসরণের কঠিন দুঃখকে মানুষের গ্রহণ করিতেই হইবে। কারণ, এই দুঃখের দ্বারাই আনন্দ প্রকাশমান হইতেছে। এইজন্যই উপনিষদে আছে, তিনি তপস্যার দুঃখের দ্বারাই এই যাহা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন।

কবি কীট্‌স্‌ বলিয়াছেন, সত্যই সৌন্দর্য এবং সৌন্দর্যই সত্য। সত্যই সীমা, সত্যই নিয়ম, সত্যের দ্বারাই সমস্ত বিধৃত হইয়াছে; এই সত্যের অর্থাৎ সীমার ব্যতিক্রম ঘটিলেই সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অসীমের সৌন্দর্য এই সত্যের সীমার মধ্যে প্রকাশিত।

সীমা ও অসীমতাকে যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিরুদ্ধ করিয়া দেখি তবে মানুষের ধর্মসাধনা একেবারেই নিরর্থক হইয়া পড়ে। অসীম যদি সীমার বাহিরে থাকেন তবে জগতে এমন কোনো সেতু নাই যাহার দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। তবে তিনি আমাদের পক্ষে চিরকালের মতোই মিথ্যা।

কিন্তু, মানুষের ধর্ম মানুষকে বলিতেছে, 'তুমি আপনার সীমাকে পাইলেই অসীমকে পাইবে। তুমি মানুষ হও; সেই মানুষ হওয়ার মধ্যেই তোমার অনন্তের সাধনা সফল হইবে।' এইখানেই আমাদের অভয়, আমাদের অমৃত। যে সীমার মধ্যে আমাদের সত্য সেই সীমার মধ্যেই আমাদের চরম পরিপূর্ণতা। এইজন্যই উপনিষৎ বলিয়াছেন, ইনিই ইহার পরমা গতি, ইনিই ইহার পরমা সম্পৎ, ইনিই ইহার পরম আশ্রয়, ইনিই ইহার পরম আনন্দ। অসীমতা এবং সীমা, ইনি এবং এই, একেবারেই কাছাকাছি; দুই পাখি একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন।

আমাদের দেশে ভক্তিতত্ত্বের ভিতরকার কথা এই যে, সীমার সঙ্গে অসীমের যে যোগ তাহা আনন্দের যোগ, অর্থাৎ প্রেমের যোগ। অর্থাৎ, সীমাও অসীমের পক্ষে যতখানি, অসীমও সীমার পক্ষে ততখানি; উভয়ের উভয়কে নহিলে নয়।

মানুষ কখনো কখনো ঈশ্বরকে দূর স্বর্গরাজ্যে সরাইয়া দিয়াছে। অমনি মানুষের ঈশ্বর ভয়ংকর হইয়া উঠিয়াছে। এবং সেই ভয়ংকরকে বশ করিবার জন্য ভয়গ্রস্ত মানুষ নানা মন্ত্রতন্ত্র আচার-অনুষ্ঠান পুরোহিত ও মধ্যস্থের শরণাপন্ন হইয়াছে। কিন্তু, মানুষ যখন তাঁহাকে অন্তরতর করিয়া জানিয়াছে তখন তাহার ভয় ঘুচিয়াছে, এবং মধ্যস্থকে সরাইয়া দিয়া প্রেমের যোগে তাঁহার সঙ্গে মিলিতে চাহিয়াছে।

মানুষ কখনো কখনো সীমাকে সকলপ্রকার দুর্নাম দিয়া গালি পাড়িতে থাকে। তখন সে স্বভাবকে পীড়ন করিয়া ও সংসারকে পরিত্যাগ করিয়া, অসম্ভব ব্যায়ামের দ্বারা অসীমের সাধনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। মানুষ তখন মনে করে, সীমা জিনিসটা যেন তাহার নিজেরই জিনিস, অতএব তাহার মুখে চুনকালি মাখাইলে সেটা আর-কাহারও গায়ে লাগে না। কিন্তু, মানুষ এই সীমাকে কোথা হইতে পাইল? এই সীমার অসীম রহস্য সে কীই বা জানে? তাহার সাধ্য কী সে এই সীমাকে লঙ্ঘন করে।

মানুষ যখন জানিতে পারে সীমাতেই অসীম, তখনি মানুষ বুঝিতে পারে—এই রহস্যই প্রেমের রহস্য; এই তত্ত্বই সৌন্দর্যতত্ত্ব; এইখানেই মানুষের গৌরব; আর, যিনি মানুষের ভগবান, এই গৌরবেই তাঁহারও গৌরব। সীমাই অসীমের ঐশ্বর্য, সীমাই অসীমের আনন্দ; কেননা সীমার মধ্যেই তিনি আপনাকে দান করিয়াছেন এবং আপনাকে গ্রহণ করিতেছেন।

লন্ডন

আমেরিকার চিঠি

আজ রবিবার। গির্জার ঘণ্টা বাজিতেছে। সকালে চোখ মেলিয়াই দেখিলাম, বরফে সমস্ত সাদা হইয়া গিয়াছে। বাড়িগুলির কালো রঙের ঢালু ছাদ এই বিশ্বব্যাপী সাদার আবির্ভাবকে বুক পাতিয়া দিয়া বলিতেছে, 'আধো আঁচরে বোসো!' মানুষের চলাচলের রাস্তায় ধুলাকাদার রাজত্ব একেবারে ঘুচাইয়া দিয়া শুভ্রতার নিশ্চল ধারা যেন শতধা হইয়া বহিয়া চলিয়াছে। গাছে একটিও পাতা নাই; শুক্রম্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ডালগুলির উপরের চূড়ায় তাঁহার আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন। রাস্তার দুই ধারের ঘাস যৌবনের শেষ চিহ্নের মতো এখনো সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয় নাই, কিন্তু তাহারা ধীরে ধীরে মাথা হেঁট করিয়া হার মানিতেছে। পাখিরা ডাক বন্ধ করিয়াছে, আকাশে কোথাও কোনো শব্দ নাই। বরফ উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে, কিন্তু তাহার পদসঞ্চার কিছুমাত্র শোনা যায় না। বর্ষা আসে বৃষ্টির শব্দে ডালপালার মর্মরে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া দিয়া রাজবদুন্নতধ্বনিঃ— কিন্তু আমরা সকলেই যখন ঘুমাইতেছিলাম, আকাশের তোরণদ্বার তখন নীরবে খুলিয়াছে; সংবাদ লইয়া কোনো দূত আসে নাই, সে কাহারও ঘুম ভাঙাইয়া দিল না। স্বর্গলোকের নিভৃত আশ্রম হইতে নিঃশব্দতা মর্ত্যে নামিয়া আসিতেছেন; তাঁহার ঘর্ঘরনিনাদিত রথ নাই; মাতলি তাঁহার মত্ত ঘোড়াকে বিদ্যুতের কশাঘাতে হাঁকাইয়া আনিতেছে না; ইনি নামিতেছেন ইঁহার সাদা পাখা মেলিয়া দিয়া— অতি কোমল তাহার সঞ্চার, অতি অবাধ তাহার গতি— কোথাও তাহার সংঘর্ষ নাই, কিছুকেই সে কিছুমাত্র আঘাত করে না। সূর্য আবৃত, আলোকের প্রখরতা নাই; কিন্তু, সমস্ত পৃথিবী হইতে একটি অপ্রগল্‌ভদীপ্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, এই জ্যোতি যেন শান্তি এবং নম্রতায় সুসম্বৃত, ইহার অবগুণ্ঠনই ইহার প্রকাশ।

স্তব্ধ শীতের প্রভাতে এই অপরূপ শুভ্রতার নির্মল আবির্ভাবকে আমি নত হইয়া নমস্কার করি— ইহাকে আমার অন্তরের মধ্যে বরণ করিয়া লই। বলি, 'তুমি এমনি ধীরে ধীরে ছাইয়া ফেলো; আমার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত কল্পনা, সমস্ত কর্ম আবৃত করিয়া দাও। গভীর রাত্রির অসীম অন্ধকার পার হইয়া তোমার নির্মলতা আমার জীবনে নিঃশব্দে অবতীর্ণ হউক, আমার নবপ্রভাতকে অকলঙ্ক শুভ্রতার মধ্যে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলুক— বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব— কোথাও কোনো কালিমা কিছুই রাখিয়ো না, তোমার স্বর্গের আলোক যেমন নিরবচ্ছিন্ন শুভ্র আমার জীবনের ধরাতলকে তেমনি একটি অখণ্ড শুভ্রতায় একবার সম্পূর্ণ সমাবৃত করিয়া দাও।'

অদ্যকার প্রভাতের এই অতলস্পর্শ শুভ্রতার মধ্যে আমি আমার অন্তরাত্মাকে অবগাহন করাইতেছি। বড়ো শীত, বড়ো কঠিন এই স্নান। নিজেকে যে একেবারে শিশুর মতো নগ্ন করিয়া দিতে হইবে, এবং ডুবিতে ডুবিতে একেবারে কিছুই যে বাকি থাকিবে না— ঊর্ধ্বে শুভ্র, অধোতে শুভ্র, সম্মুখে শুভ্র, পশ্চাতে শুভ্র, আরম্ভে শুভ্র, অন্তে শুভ্র— শিব এব কেবলম্— সমস্ত দেহমনকে শুভ্রের মধ্যে নিঃশেষে নিবিষ্ট করিয়া দিয়া নমস্কার— নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

বার্ধক্যের কান্তি যে কী মহৎ, কী গভীর সুন্দর, আমি তাহাই দেখিতেছি। যত-কিছু বৈচিত্র্য সমস্ত ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ঢাকা পড়িয়া গেল, অনবচ্ছিন্ন একের শুভ্রতা সমস্তকেই আপনার আড়ালে টানিয়া লইল। সমস্ত গান ঢাকা পড়িল, প্রাণ ঢাকা পড়িল, বর্ণচ্ছটার লীলা সাদায় মিলাইয়া গেল। কিন্তু, এ তো মরণের ছায়া নয়। আমরা যাহাকে মরণ বলিয়া জানি সে যে কালো; শূন্যতা তো আলোকের মতো সাদা নয়, সে যে অমাবস্যার মতো অন্ধকারময়। সূর্যের শুভ্র রশ্মি তাহার লাল নীল সমস্ত ছটাকে একেবারে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু, তাহাকে তো বিনাশ করে নাই, তাহাকে পরিপূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়াছে। আজ নিস্তব্ধতার অন্তর্নিগূঢ় সংগীত আমার চিত্তকে অন্তরে রসপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। আজ গাছপালা তাহার সমস্ত আভরণ খসাইয়া ফেলিয়াছে, একটি পাতাও বাকি রাখে নাই; সে তাহার প্রাণের সমস্ত প্রাচুর্যকে অন্তরের অদৃশ্য গভীরতার মধ্যে সম্পূর্ণ সমাহরণ করিয়া লইয়াছে। বনশ্রী

যেন তাহার সমস্ত বাণী নিঃশেষ করিয়া দিয়া নিজের মনে কেবল ওঁকারমন্ত্রটি নীরবে জপ করিতেছে। আমার মনে হইতেছে, যেন তাপসিনী গৌরী তাঁহার বসন্তপুষ্পাভরণ ত্যাগ করিয়া শুভ্রবেশে শিবের শুভ্রমূর্তি ধ্যান করিতেছে। যে কামনা আগুন লাগায়, যে কামনা বিচ্ছেদ ঘটায়, তাহাকে তিনি ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছেন। সেই অগ্নিদগ্ধ কামনার সমস্ত কালিমা একটু একটু করিয়া ঐ তো বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে; যতদূর দেখা যায় একেবারে সাদায় সাদা হইয়া গেল, শিবের সহিত মিলনে কোথাও আর বাধা রহিল না। এবার যে শুভপরিণয় আসন্ন, আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলের পূর্ণ্য-আলোকে যাহার বার্তা লিখিত আছে এই তপস্যার গভীরতার মধ্যে তাহার নিগূঢ় আয়োজন চলিতেছে; উৎসবের সংগীত সেখানে ঘনীভূত হইতেছে, মালাবদলের ফুলের সাজি বিশ্বচক্ষুর অগোচরে সেখানে ভরিয়া ভরিয়া উঠিতেছে। এই তপস্যাকে বরণ করো, হে আমার চিত্ত, আপনাকে নত করিয়া নিস্তব্ধ করিয়া দাও—শুভ্র শান্তি তোমাকে স্তরে স্তরে আবৃত করিয়া স্থিরপ্রতিষ্ঠ গূঢ়তার মধ্যে তোমার সমস্ত চেষ্টাকে আহরণ করিয়া লউক, নির্মলতার দেবদূত আসিয়া একবার এ জীবনের সমস্ত আবর্জনা এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিক; তাহার পরে এই তপস্যার স্তব্ধ আবরণটি একদিন উঠিয়া যাইবে, একেবারে দিগ্‌দিগন্তর আনন্দকলগীতে পূর্ণ করিয়া দেখা দিবে নূতন জাগরণ, নূতন প্রাণ, নূতন মিলনের মঙ্গলোৎসব।

৯ অগ্রহায়ণ
১৩১৯

শিরোনাম-সূচী